জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিক পত্র

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রথম ষাণ্মাসিক সূচীপত্র
১৯৫৭

দশম বর্ষ ; জানুয়ারী—জুন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড
(ফেডারেশন হল)
কলিকাতা-৯

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষান্মাসিক বিষয় সূচী

জানুয়ারী হইতে জুন : ১৯৫৭

(খ)

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষাণ্মাসিক লেখক সূচী

জানুয়ারী হইতে জুন—১৯৫৭

চিত্র-সূচী

বিবিধ

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিক পত্র

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক সূচীপত্র
১৯৫৭

দশম বর্ষ, জুলাই—ডিসেম্বর

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড
(ফেডারেশন হল)
কলিকাতা-৯

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয় সূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর ঃ ১৯৫৭

(ঠ)

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষাণ্মাসিক লেখকসূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর—১৯৫৭

চিত্র-সূচী

বিবিধ

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দশম বর্ষ | জানুয়ারী, ১৯৫৭ | প্রথম সংখ্যা

নববর্ষের নিবেদন

নিরবধি কালের পরিপ্রেক্ষিতে অকিঞ্চিৎকর হইলেও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক পত্রিকার পক্ষে নয় বৎসরের আয়ুষ্কাল নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। যাঁহাদের আন্তরিক উৎসাহ সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' আজ দশম বর্ষে পদার্পণ করিতেছে, সর্বাগ্রে তাঁহাদিগকে আমাদের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

অজ্ঞতা কল্যাণের অন্তরায়। মনের অন্তর্নিহিত জিজ্ঞাসা যতই তৃপ্ত হইবে ততই হইবে তাহার অগ্রগতি। জিজ্ঞাসার তৃপ্তি হইতে পারে, কিন্তু নিবৃত্তি নাই। ইহাই মনের সজীবতার প্রমাণ, কল্যাণের প্রতিশ্রুতি। পরভাষার আবরণ উন্মোচন করিয়া বিশ্বরহস্যের রূপ ও প্রকৃতি অনুধাবনে যে আয়াস স্বীকার করিতে হয়, মাতৃভাষায় সেরূপ করিতে হয় না। বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি তো সার্বকালীন, সার্বভৌম ও সার্বজনীন; তবে নিজের ভাষাতেই বা তাহা বুঝিব না কেন?

স্বাধীন ভারতের কল্যাণ রূপায়ণে দেশের সর্বস্তরের মানুষকেই একযোগে ব্রতী হইতে হইবে। বিজ্ঞান যোগাইবে এই কল্যাণ যজ্ঞের শক্তি। তাই আজ প্রয়োজন সাধারণ মানুষকে সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলা। বিজ্ঞানের বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিগণের এইদিকে আরও বেশী মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

বাংলা ভাষার শব্দসম্পদও এই প্রচেষ্টার ফলে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। যোগ্য পরিভাষার অভাবও ক্রমাগত অনুশীলনের ফলে আর দুর্লঙ্ঘ্য বাধা বলিয়া মনে হইবে না। আমাদের নয় বৎসরের অভিজ্ঞতায় এইরূপ আশা করিবার যথেষ্ট কারণ আমরা পাইয়াছি। একদা পরভাষাবাহিত যে বিজ্ঞান নীরস ও জটিল বলিয়া সাধারণের নিকট একরূপ ভীতির কারণই ছিল, আজ সেই ভীতির স্থলে আগ্রহের লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র ক্রমবর্ধিত জনপ্রিয়তা ইহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনাতেও শিক্ষিত সমাজ অধিকতর আগ্রহী হইতেছেন। এই আগ্রহ ও উৎসাহ সঞ্চারের উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার যে আয়োজন করিয়াছিলেন—তাহাতে সুধীসমাজ বিশেষ সাড়া দিয়াছিলেন। প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলি ইতিমধ্যেই 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'

প্রকাশিত হইয়াছে। মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান অনুশীলনের উদ্দেশ্য লইয়া বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রকাশ করিয়াছিলেন। জনসাধারণের উৎসাহ ও আনুকূল্যে সেই মহান উদ্দেশ্য পালনে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' সফলকাম হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। বর্তমান মাসেই কলিকাতা মহানগরীতে নিখিল ভারত বিজ্ঞান সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। এই উপলক্ষ্যে ভারত ও ভারতের বাহিরের বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানসাধক ও বিজ্ঞানাচার্য এখানে আসিয়া মিলিত হইবেন। এই শুভ সম্মেলন প্রত্যেক বিজ্ঞানানুরাগীকে আনন্দিত করিবে। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র দশম বর্ষের যাত্রাপথ এই মহাসম্মেলনের শুভ স্মৃতিচিহ্নিত হইয়া রাহল—ইহা আমাদের বিশেষ আনন্দের কারণ।

জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতাই আমাদের যাত্রাপথের পাথেয়।

পিথাগোরাস-দর্শনের পুনরভ্যুত্থান

শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পাল

প্রাকৃতিক রহস্য সমাধানের জন্যে সচরাচর যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি অবলম্বন করা হয়ে থাকে, সেটি মূলতঃ পরীক্ষামূলক। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, প্রাকৃতিক ঘটনার অন্তর্নিহিত মূল কারণগুলির সন্ধান করা। এজন্যে সর্বপ্রথম প্রকৃতির উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন তথ্যাদি আহরণ করা হয়। ঐ সব তথ্যের অন্তর্নিহিত পারস্পরিক মূল সম্বন্ধগুলি উদ্ঘাটিত করবার জন্যে অতঃপর আমরা সেগুলিকে গাণিতিক যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি দিয়ে পরীক্ষা করি। যখন কতকগুলি বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে এক বা একাধিক অচল সম্বন্ধ পাওয়া যায় তখন আমরা সেগুলিকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলে অভিহিত করি এবং প্রাকৃতিক সেই ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলি, ঐ প্রাকৃতিক নিয়মগুলিই এসব ঘটনার জন্যে দায়ী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পরীক্ষামূলক তথ্যগুলিই সমস্ত পদ্ধতিটির প্রাণস্বরূপ। সেগুলিই আমাদের প্রারম্ভিক সূত্র। কুম্ভকার যেমন মাটি নিয়ে সুরু করে, আমাদেরও তেমনি ঐ সব তথ্যকে ভিত্তি করেই অগ্রসর হতে হয়। অন্যথায় এক পা এগুবার উপায় নেই। পরীক্ষাই প্রাকৃতিক রহস্য উদ্ঘাটনের প্রথম এবং প্রধান অস্ত্র।

কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের এটি একান্ত অপরিহার্য অস্ত্র হলেও এর প্রবর্তন এবং প্রচলন খুব বেশী দিনের নয়। বিজ্ঞানজগতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূত্রপাত হয় গ্যালিলিওর আমলে। তার পূর্ব পর্যন্ত মানুষের বিশ্বাস ছিল, প্রাকৃতিক রহস্য সমাধান করবার জন্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোনও প্রয়োজন নেই। মানুষ তার গাণিতিক যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি দিয়েই সমস্ত কিছুর সমাধান করতে পারবে। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে পিথাগোরাস এই দর্শনের উদ্গাতা। এই অনন্যসাধারণ মনীষী সেই সুদূর অতীতে, কেমন করে জানি না, বুঝেছিলেন—ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিশ্বের সূক্ষ্ম রহস্য সমাধানের পথ ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। কারণ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাদের যে অনুভূতি তা মাত্র আংশিক সত্য। তাই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমরা কোন দিনই প্রাকৃতিক রহস্যের পুরাপুরি সমাধান করতে পারবো না। যদি সম্ভব হয় তবে মানুষের মনই এই বিপুল রহস্যের সমাধান করতে পারবে।

উচ্চবৃত্তিসম্পন্ন কোনও মানুষের ত্রুটিহীন চিন্তা ও যুক্তির মধ্যেই একদিন যাবতীয় রহস্যের সমাধান পাওয়া যাবে। আর পিথাগোরাসের মতে, মানুষের যুক্তিকে তখনই ত্রুটিহীন বলা যায় যখন তা সংখ্যা, অর্থাৎ গাণিতিক ভাষায় প্রকাশযোগ্য। তাই পিথাগোরাস অনাগত যুগের দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের পথের নিশানা দিয়ে গেলেন এই বলে যে, সব কিছুই সংখ্যা, অর্থাৎ গণিতের সাহায্যেই সব কিছু বোঝা যাবে। তাই বিশ্বকে জানতে হলে গাণিতিক চিন্তা ও যুক্তির উৎকর্ষ সাধন করতে হবে সর্বাগ্রে।

মহামনীষীর এই বাণীকে পরবর্তী কালের দার্শনিকেরা দীর্ঘকাল তাদের যাত্রাপথে দিগ্‌দর্শন যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এই দর্শনের সত্যতা সম্বন্ধে মানুষ এমনই নিঃসন্দেহ ছিল যে, মধ্যযুগে যাজকসম্প্রদায় অনায়াসে পিথাগোরাসের এই দর্শনের দোহাই দিয়ে প্রত্যক্ষ সত্যকে পর্যন্ত অস্বীকার করতে সক্ষম হয়েছে। পিথাগোরাস-দর্শনের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে তারা সাধারণ মানুষকে প্রত্যক্ষ সত্য গ্রহণ করতে দেয় নি, যার ফলে বিজ্ঞানের অগ্রগতি যথেষ্ট ব্যাহত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে পিথাগোরাস-দর্শনের কথা এই নয় যে, প্রত্যক্ষ সত্যকে অবিশ্বাস করতে হবে। তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, ইন্দ্রিয়ের বিস্তৃতি ক্ষুদ্র। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা আমাদের পরিচিত নিকট পারিপার্শ্বিক ঘটনা সম্বন্ধে হয়তো কিছু জানতে পারি—কিন্তু ঐ সামান্য তথ্যের ভিত্তিতে সমস্ত বিশ্বকে বোঝবার চেষ্টা করা যাবে না; চেষ্টা করলে ভুল বোঝবার আশঙ্কা থাকবে। সুতরাং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সময় ও পরিশ্রম নষ্ট না করে গাণিতিক যুক্তির পথেই অগ্রসর হওয়া উচিত। তা হলেই প্রকৃতির মূল কথাটি আমাদের কাছে ধরা পড়বে, যার ভিত্তিতে দৃশ্য যাবতীয় প্রাকৃতিক ঘটনার সমাধান পাওয়া যাবে। অর্থাৎ আধুনিক গাণিতিকের ভাষায়—এমন একটি গাণিতিক সূত্র খাড়া করতে হবে যা থেকে সব ঘটনার অনিবার্যতা আপনি ধরা পড়বে।

মধ্যযুগ পর্যন্ত বিজ্ঞানজগতে পিথাগোরাস-দর্শনের একাধিপত্য চললেও তার অবসান ঘটালেন গ্যালিলিও এবং নিউটন নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সূচনা করে। গ্যালিলিওই সর্বপ্রথম প্রাকৃতিক রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে বিশুদ্ধ যুক্তি-চিন্তার স্থলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রবর্তন করেন। নিউটনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষালব্ধ যাবতীয় তথ্যকে গাণিতিক ভাষায় ব্যক্ত করে প্রাকৃতিক রহস্য ব্যাখ্যা করবার এক অভিনব রীতির প্রচলন হলো, যা বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ও অপ্রতিহত-ভাবে বিজ্ঞানজগতে আধিপত্য করে এসেছে। এই নতুন পদ্ধতিতে কাজ করে বিজ্ঞানীরা এমন সাফল্য অর্জন করেছেন যে, অচিরকালের মধ্যেই সকলের মনে এই বিশ্বাস জন্মে গেল যে, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রকৃতির সব রহস্য ধরা দেবে। 'Experiment answers all'—এই-ই ছিল তখনকার দিনের মূলমন্ত্র। প্রকৃতির এমন রহস্য নেই, যা পরীক্ষা করে জানা যাবে না। যা আমাদের পরীক্ষায় ধরা পড়বে না, তাকে কোনও রকমেই প্রাকৃতিক ঘটনা বলে গণ্য করা হবে না, তার পক্ষে যতই যুক্তি থাকুক। কোনও কিছুর অস্তিত্ব এবং তথ্য জেনেই তবে তার কারণ সন্ধান করা সম্ভব। অন্যথায় প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কে কেবল কতকগুলি কাল্পনিক সূত্রে খাড়া করলেই সমাধান হবে না। সুতরাং সবার আগে চাই পরীক্ষার জন্যে যন্ত্রপাতি ও লেবরেটরী।

এই পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের ভিত্তিস্থাপনের ফলেই আজকের দিনের এমন ব্যাপক শিল্পপ্রসার সম্ভব হয়েছে। মানুষের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধির ব্যাপারে এর অবদানের তুলনা নেই। কিন্তু ব্যবহারিক দিক দিয়ে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান চর্চা করে আমাদের যথেষ্ট লাভ হলেও এই পদ্ধতিতে আমরা আমাদের মূল সমস্যার কতটুকু সমাধান করতে পেরেছি এবং

যা করেছি বলে মনে করি, সেটুকুও কতখানি ত্রুটিহীন—সে সম্বন্ধে আজকের দিনে আবার নতুন করে প্রশ্ন জেগেছে। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার কার্যকারিতা সম্বন্ধেও মনে সন্দেহ জেগেছে। এই শতকের কয়েকটি গাণিতিক ফল সে সন্দেহকে উত্তরোত্তর বাড়িয়েই তুলছে। সম্পূর্ণ গাণিতিক যুক্তির ভিত্তিতে একদিন যে সব প্রাকৃতিক ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, পরে পরীক্ষা করে সে সব ঘটনার অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষ নিঃসংশয় হওয়ার পর আজ আবার মানুষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ ছেড়ে গণিতের পথে চলবার প্রয়াসী হতে চাইছে। আর গণিত শুধু যে নতুন ঘটনারই ইঙ্গিত দিয়েছে, তাই নয়—পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে আমরা যে সব প্রাকৃতিক নিয়ম খাড়া করে বিশ্বকে বুঝেছিলাম, আধুনিক কালের গণিত প্রমাণ করেছে যে, সে বোঝাও এতকাল পরিপূর্ণ সত্য ছিল না। এর স্বপক্ষে আমরা কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করবো।

(১) স্ফটিকের মধ্যে গমনকালে আলোর কৌণিক প্রতিসরণ সম্বন্ধে হ্যামিল্টনের ভবিষ্যদ্বাণী—কোনও কোনও স্ফটিকের মধ্য দিয়ে যাবার সময় আলোর দ্বিত্ব-প্রতিসরণ হয়। হ্যামিল্টন সম্পূর্ণ গাণিতিক যুক্তির সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বিশেষ কোন কোন অবস্থায় প্রতিসরণের ফলে আপতিত আলোকরশ্মি নির্গমনকালে শঙ্কুর আকারে নির্গত হবে, অর্থাৎ তখন আলোকরশ্মি অসংখ্য দিকে প্রতিসরিত হবে। তাঁর এই ঘোষণার পর যথোচিত অবস্থায় পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সত্যিই সে সব ক্ষেত্রে আলোর কৌণিক প্রতিসরণ হয়।

(২) গাণিতিক গণনার দ্বারা অ্যাডাম্‌স্ ও লেভেরিয়র-এর নেপচুন আবিষ্কার—ইউরেনাসের কক্ষপথের গোলযোগ লক্ষ্য করে আগে থেকেই যদিও আরেকটি গ্রহের অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়েছিল তথাপি অ্যাডাম্‌স্ ও লেভেরিয়র-এর গণনার পূর্বে এর অবস্থান কোনরূপ পরীক্ষাকার্যের দ্বারাই নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। গাণিতিক গণনায় ঐ দুই বিজ্ঞানী গ্রহটি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য এমন নিখুঁতভাবে নির্ণয় করেছিলেন যে, আকাশে গ্রহটিকে খুঁজে বের করতে মাত্র আধ ঘণ্টা সময় লেগেছিল। বস্তুতঃপক্ষে নেপচুনের আবিষ্কার গাণিতিক গবেষণার এক অবিস্মরণীয় বিজয় গৌরব।

(৩) ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুচ্চৌম্বক সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গঠন এবং তার সাহায্যে বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্ষেত্রের যাবতীয় জানা ঘটনার ব্যাখ্যা এবং অনেক অনাবিষ্কৃত ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী—ম্যাক্সওয়েল যখন তাঁর এই সিদ্ধান্ত গঠন করেন, তখনও পর্যন্ত পরীক্ষা করে বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কে সামান্য ঘটনাই জানা গেছে। তাই তখন ম্যাক্সওয়েলের সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিকদের সমর্থন পায় নি। পরীক্ষামূলকভাবে সব ঘটনার হদিস পাওয়ার জন্যে বৈজ্ঞানিকেরা তারপর অর্ধ শতাব্দীকাল অপেক্ষা করেছিলেন।

(৪) আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব গঠন ও আপেক্ষিকতা তত্ত্বের পক্ষে প্রমাণস্বরূপ আলোর বক্রপথে গমন এবং নক্ষত্রের বর্ণালীতে বর্ণালীরেখার লালের দিকে অভিক্রান্তি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী—বলা বাহুল্য, উভয় ক্ষেত্রেই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পরীক্ষালব্ধ ফলের সঙ্গে মিলে গেছে। তা ছাড়া আপেক্ষিকতা তত্ত্ব এমন অনেক সমস্যার সমাধানও করেছে, পরীক্ষালব্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম খাটিয়ে যার সমাধান পাওয়া যায় নি। নিউটন গ্রহগুলির কক্ষপথ পর্যবেক্ষণ করে মাধ্যাকর্ষণ সংক্রান্ত নিয়ম বের করেছিলেন এবং মনে করেছিলেন, সমগ্র বিশ্ব এই নিয়মে চলে। কিন্তু সমগ্র বিশ্বের কথা দূরে থাক, এই নিয়মে সবগুলি গ্রহের গতিও ব্যাখ্যা করা যায় না। বুধের অনুসূর প্রতি শতাব্দীতে ৪৩ সেঃ হিসাবে আবর্তিত হয়, যার কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায় নি। কিন্তু আপেক্ষিকতা তত্ত্বের নিয়ম অনুসারে গণনা করে দেখা গেছে, বুধের কক্ষপথের বেলায় অনুসূরের গতি ওইভাবেই নিয়ন্ত্রিত হবে, অর্থাৎ অনুসূর প্রতি

শতাব্দীতে ৪৩ সেঃ হিসাবে আবর্তিত হবে। সুতরাং আপেক্ষিকতা তত্ত্ব শুধু প্রাকৃতিক ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণীই করলো না, এও প্রমাণিত হলো যে, পরীক্ষালব্ধ ফল থেকে আমরা যে নিয়ম খাড়া করি, তা মোটেই নিখুঁতভাবে বিশ্বরহস্য সমাধানে প্রযোজ্য নয়।*

(৫) গাণিতিক যুক্তির ভিত্তিতে এডিংটন কর্তৃক বর্ণালীর fine-structure constant ১৩৭-এর আবিষ্কার—এডিংটনের গাণিতিক প্রচেষ্টার বহু আগে থেকেই এই সংখ্যাটির আবিষ্কার নিয়ে প্রচুর পরীক্ষাকার্য চলে। কিন্তু বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্যে তারতম্যের ফলে এর প্রকৃত মান কখনই সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নি। এডিংটনই সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন, উহা একটি পূর্ণসংখ্যা (integer) এবং ঐ সংখ্যাটি হচ্ছে ১৩৭। পরে অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরণের পরীক্ষায় এডিংটনের সিদ্ধান্তই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

উপরের ঘটনাগুলির আর অধিক বিশ্লেষণ না করেও আমরা একথা এখন মেনে নিতে পারি যে, গাণিতিকের গবেষণালব্ধ ফল আমাদের পরীক্ষালব্ধ ফলের চেয়ে প্রকৃতির পক্ষে অধিকতর সত্য এবং গাণিতিক গবেষণালব্ধ সকল ফল আজ পর্যন্ত এমন অভ্রান্তভাবে যাচাই হয়ে গেছে যে, আজ আর পরীক্ষা করে তার সত্যাসত্য প্রমাণ করবার তাগিদ কেউ বড় একটা বোধ করেন না। এডিংটন তো বলেছেন, আজ আমাদের গণিতশাস্ত্র পূর্ণতার এমন এক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, গাণিতিক গবেষণালব্ধ ফলের সত্যতা নির্ধারণ করবার চিন্তা করা আর জ্যামিতির উপপাদ্য পরীক্ষা করে যাচাই করবার কথা ভাবা দুই-ই সমান বাতুলতার পরিচায়ক।

আজ গণিতের এমন সম্ভাবনার দিনে একবার পিথাগোরাসকে স্মরণ না করে পারি না। দীর্ঘ আড়াই হাজার বছর পরে এতদিনে তাঁর দর্শন সত্য বলে প্রমাণিত হতে চলেছে। বিশ্বকে "সংখ্যা" দিয়ে ব্যাখ্যা করবার যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, অচিরেই হয়তো তা সফল হবে।* ইন্দ্রিয় দিয়ে বিশ্বকে বোঝবার যে অপপ্রয়াস মানুষ এতদিন করেছিল, বিজ্ঞান তার হাত থেকে ছাড়া পেয়েছে। লেবরেটরীতে বসে যন্ত্রপাতি নিয়ে প্রকৃতির রহস্য সন্ধান করে মানুষ আর দীর্ঘদিন কালক্ষেপ করবে না। আর বেল তো বলেছেন—সেদিনেরও বেশী দেরী নেই যখন বিজ্ঞানীরা শুধু চেয়ারে বসে কাগজ-কলম নিয়ে বিশ্বরহস্যের সব কিছু সমাধান করবে; লেবরেটরীর সব যন্ত্রপাতি তখন যাদুঘরে জমা হয়ে থাকবে অতীতের দর্শনীয় বস্তু হিসাবে। আর ভবিষ্যৎ মানুষ তা দেখে স্মরণ করবে, বিজ্ঞানের এক পদস্খলনের যুগ, যখন মানুষ পিথাগোরাসের অভ্রান্ত দর্শন ভুলে নিষিদ্ধ পথে পা বাড়িয়েছিল। আর স্মরণ করবে, বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভ কালকে, যখন মহাগাণিতিক আইনষ্টাইন ও এডিংটন আবার পিথাগোরাস-দর্শন অনুযায়ী বিজ্ঞানের অভ্রান্ত পথের পুনরুদ্ধার সূচিত করেন।

* আলোর গতিপথ সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া গেছে, তা থেকেও আমরা এই একই সিদ্ধান্তে আসি। পূর্বে আমাদের ধারণা ছিল, আলোর গতি সরল রেখায়, কিন্তু তা এখন ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

* এডিংটন বলেছেন—বিশ্বের সকল রহস্যের মূলে সাতটি সংখ্যা। (১) প্রোটনের ভর, (২) ইলেকট্রনের ভর, (৩) ইলেকট্রনের আধান, (৪) প্লাঙ্কের ধ্রুবক, (৫) আলোর গতিবেগ, (৬) মাধ্যাকর্ষণ ধ্রুবক, (৭) বিশ্ব ধ্রুবক (cosmological constant)। এই সাতটিরই মান গাণিতিকেরা বিশুদ্ধ গাণিতিক গবেষণার দ্বারা নির্ণয় করেছেন।

অক্সিন

শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্তী

গাছের শিকড়, ভ্রূণ, ফল, কাণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন অংশের বৃদ্ধি, হর্মোন নামক একপ্রকার জটিল জৈব রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন শ্রেণীর হর্মোনের মধ্যে অক্সিন নামক একপ্রকার পদার্থ নানাকারণে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ-হর্মোনের মধ্যে অক্সিনই প্রথম আবিষ্কৃত হয় এবং উদ্ভিদের বিভিন্ন কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণেও এর কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অক্সিন গাছের ফল, কাণ্ড ও শিকড়ের বৃদ্ধি, কক্ষ-মুকুল সংকোচন, পাতা ও ফলের মোচন প্রভৃতি প্রায় বিশ প্রকার কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া গাছের অন্যান্য হর্মোনের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণও অক্সিনের একটি কাজ।

কৃষি সম্বন্ধীয় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে রাসায়নিক সংযোগে গাছের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ অক্সিন বিষয়ক জ্ঞান থেকেই সম্ভব হয়েছে। আজকাল গাছের কাটিং থেকে মূলোদ্গম, কৃত্রিম উপায়ে ফলোৎপাদন আরম্ভ, অপরিপক্ক ফলের পতন রোধ প্রভৃতি অক্সিন বিষয়ক জ্ঞান থেকেই সম্ভব হয়েছে। অক্সিন গাছের বিভিন্ন কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করলেও কোষ দীর্ঘায়তকরণের গুণই এর আবিষ্কারের পথ খুলে দেয়। সুতরাং অক্সিন সম্বন্ধীয় বিভিন্ন জ্ঞান এর কোষ দীর্ঘায়তকরণের ক্ষমতার সঙ্গেই সম্পর্কিত।

ডারুইন প্রমুখ বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ থেকে এফ. ডব্লু. ওয়েণ্ট ১৯২৮ সালে অক্সিনের চূড়ান্ত আবিষ্কার হৃদয়ঙ্গম করেন। ডারুইনের কাজ ছিল ফটোট্রপিজম সম্বন্ধে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তাঁর পরীক্ষার জন্যে তিনি ছায়ায় গজানো ঘাসের পত্রাবরণকেই নির্বাচন করেন। চারার বৃদ্ধির প্রথমদিকে পত্রাবরণ চারার অগ্রভাগকে আবৃত করে বাড়তে থাকে এবং প্রথম ৭০ থেকে ১০০ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রধানতঃ কোষ দীর্ঘায়তকরণের দ্বারাই বৃদ্ধি পায়। আরো বৃদ্ধির সঙ্গে প্রথম পাতাটি পত্রাবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসে এবং পত্রাবরণের বৃদ্ধি শেষ হয়।

পত্রাবরণের অগ্রভাগ কেটে দিলে তার নিম্নাংশের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। '৯২৩ সালে জার্মান উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ সডিং পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, পত্রাবরণের অগ্রভাগে এমন একটি পদার্থ তৈরী হয় যা তার কোষ দীর্ঘায়তকরণে একান্ত প্রয়োজনীয়। কর্তিত পত্রাবরণে তার অগ্রভাগ পুনরায় সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই আবার বৃদ্ধি আরম্ভ হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পত্রাবরণের বৃদ্ধির জন্যে দায়ী হর্মোন তার অগ্রভাগেই তৈরী হয়।

ওয়েণ্ট কর্তৃক সর্বপ্রথম এই বর্ধনকারী হর্মোন নিষ্কাশিত হয়। তিনি পত্রাবরণের কর্তিত অগ্রভাগ এক টুক্‌রা অ্যাগারের সংস্পর্শে রেখে দেখতে পান, অ্যাগারের টুক্‌রাটি বৃদ্ধি-সম্পাদনকারী ক্ষমতা আহরণ করে। এই অ্যাগারের টুক্‌রাটিকে অগ্রভাগ কর্তিত পত্রাবরণের উপর স্থাপন করলে পুনরায় তার বৃদ্ধি আরম্ভ হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বর্ধনকারী হর্মোন পত্রাবরণের অগ্রভাগ থেকে অ্যাগারের টুক্‌রায় এবং অ্যাগারের টুক্‌রা থেকে পুনরায় কর্তিত পত্রাবরণের গোড়ার অংশে পরিব্যাপ্ত হতে পারে। অক্সিন নামক বৃদ্ধি-সম্পাদনকারী এই হর্মোন বিভিন্ন উদ্ভিদে পাওয়া যায়।

পত্রাবরণের কর্তিত অগ্রভাগ অথবা অ্যাগারখণ্ড

অসমানভাবে পুনরায় স্থাপন করে পত্রাবরণের অগ্রভাগের বৃদ্ধি-সম্পাদনকারী গুণ স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করা যায়। এই অবস্থায় পত্রাবরণের নিম্নাংশে একপাশে হর্মোন প্রবাহিত হওয়ায় পত্রাবরণ এক-পাশে বৃদ্ধি পায়, ফলে পত্রাবরণ বেঁকে যায়। অবশ্য এই বক্রতা হর্মোন প্রবাহের বিপরীত দিকে হয়। একে বিপরীত বক্রতা অথবা ঋণাত্মক বক্রতা বলা হয়। এই বক্রতা হর্মোনের ঘনত্বের সমানানুপাতিক।

অক্সিনের শারীরবৃত্ত সম্পর্কিত তথ্যাদি নির্ধারণে প্রথমে পত্রাবরণের অগ্রভাগ কেটে ফেলা হয়; ফলে, পত্রাবরণের অক্সিন নিঃশেষিত হয়ে যায়। প্রায় ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে পত্রাবরণের কর্তিত পৃষ্ঠদেশে পুনরায় অক্সিন তৈরী হয় এবং পত্রাবরণ আবার বাড়তে আরম্ভ করে। এই সময় পত্রা-বরণের অগ্রভাগ পুনরায় কেটে ফেলা হয়। ইতি-মধ্যে চারার প্রথম পাতা বেরিয়ে আসায় চারার বৃদ্ধি ব্যাহত হয় না। দ্বিতীয়বার কর্তনের পর অক্সিন সমন্বিত অ্যাগারখণ্ড কর্তিত পত্রাবরণের একদিকে রাখা হয়; ফলে পত্রাবরণে বক্রতা দেখা দেয়। বক্রতার সঙ্গে নির্দিষ্ট মানের অক্সিনঘটিত বক্রতার তুলনা করে পরীক্ষাধীন উদ্ভিদের অক্সিনের পরিমাপ করা হয়।
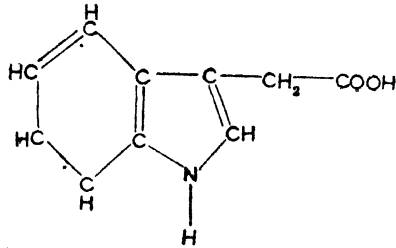
অক্সিনের রাসায়নিক গঠন জানবার জন্যে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক অনেকদিন থেকে চেষ্টা করছেন, কিন্তু এর সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ সম্ভব হয় নি। এর কারণ পত্রাবরণের অগ্রভাগে অক্সিনের পরিমাণ অতি অল্প। একটি পত্রাবরণে প্রাপ্ত অক্সিনের পরিমাণ মাত্র ১০$^{-১০}$ গ্র্যাম। প্রতিটি পত্রাবরণ থেকে এই সামান্যতম দ্রব্য সংগ্রহ করে রাসায়নিক পরীক্ষা করা অসম্ভব বললেই হয়।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, ওটের পত্রাবরণের বক্রতা সাধনোপযোগী সজীব দ্রব্য মানুষের মূত্রে বিদ্যমান। ডাচ বৈজ্ঞানিক কোগল এবং হোগেন স্মিথ ১৯৩৪ সালে মানুষের মূত্র থেকে এই সজীব পদার্থ পৃথক করতে সক্ষম হন এবং এর নাম দেন ইন্ডোল অ্যাসেটিক অ্যাসিড অথবা সংক্ষেপে আই. এ. এ। এর রাসায়নিক গঠন নিম্নরূপ—

প্রতি লিটারে ৫০ মাইক্রোগ্র্যাম ইনডোল অ্যাসেটিক অ্যাসিড দ্রবণ থেকে প্রস্তুত ১০ কিউবিক মিলিমিটার আয়তনের অ্যাগারখণ্ড ওটের পত্রাবরণে ১০° ডিগ্রী বক্রতা উৎপাদনে সক্ষম। এজন্যে আই. এ. এ. পত্রাবরণ থেকে ক্ষরিত সজীব পদার্থের ন্যায় বৃদ্ধির সাড়া আনয়ন করতে পারে।

তাহলে প্রশ্ন জাগে—আই. এ. এ.-ই কি ওটের অক্সিন? নানা তথ্য থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, অন্যান্য সমগুণবিশিষ্ট রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে ওটের পত্রাবরণে আই. এ. এ.-ও বিদ্যমান। নিম্ন ও উচ্চ উভয় শ্রেণীর গাছের কোষ থেকেই বিশুদ্ধ আই. এ. এ. পৃথক করা হয়েছে। তবে শস্য জাতীয় গাছের অঙ্কুরেই সব চেয়ে বেশী পরিমাণ আই. এ. এ. পাওয়া যায়। আঙ্গিক রাসায়নিক পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ওটের পত্রা-বরণের অক্সিনের প্রায় সবটাই আই. এ. এ.।

উপরোক্ত প্রমাণ ও অন্যান্য প্রমাণ থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, আই. এ. এ-ই গাছের সহজাত অক্সিন।

আই. এ. এ. আবিষ্কারের পূর্বে মূত্র থেকে অক্সিন-এ ও অক্সিন-বি নামক দুটি রসায়নিক পদার্থ পৃথক করা হয়েছিল। তারা আই. এ. এ.-র সমগুণ-সম্পন্ন, কিন্তু রাসায়নিক গঠনের দিক থেকে আই. এ. এ-র সঙ্গে এদের মোটেই সামঞ্জস্য নেই। আর সহজাত অক্সিন হিসাবে এদের গ্রহণ করবার কোন প্রমাণও আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। সুতরাং গাছের বৃদ্ধি ইত্যাদিতে এদের সঠিক কার্যকারিতা ঠিক করা কঠিন; তবে ভবিষ্যতে হয়তো এমন প্রমাণ আবিষ্কৃত হতে পারে যা থেকে দেখা যাবে, আই. এ. এ. ছাড়া অন্য প্রকার অক্সিনের অস্তিত্ব সম্ভব।

ওটের পত্রাবরণের বেলায় দেখা গেছে যে, অক্সিন পত্রাবরণের অগ্রভাগে উৎপন্ন হয়ে নীচের দিকের দীর্ঘায়তনশীল কোষে স্থানান্তরিত হয়; কারণ ঐ সকল কোষের অক্সিন উৎপাদনের কোন ক্ষমতা নেই। ছায়ায় গজানো অন্য কয়েক জাতীয় চারার ক্ষেত্রে অগ্রমুকুল অথবা বীজপত্রে অক্সিন তৈরী হয়। বাড়ন্ত শিকড়ের অগ্রভাগেও অক্সিন তৈরীর ক্ষমতা বিদ্যমান। কোন কোন ক্ষেত্রে পরিণত বয়স্ক পাতায়ও অক্সিন তৈরী হতে দেখা যায়।

অক্সিন গাছের কয়েকটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে তৈরী হলেও সর্বত্রই উহা সমভাবে পরিচালিত হয়, তবে শিকড় ও কাণ্ডের অগ্রভাগ থেকে অন্যান্য দূরত্ব যত বেশী হয় অক্সিনের পরিমাণও সেই অনুপাতে কম হয়। গাছের অগ্রমুকুল অথবা পত্রাবরণের অগ্রভাগ অপসারণ করে দেখা গেছে, অন্যান্য অংশের অক্সিনের পরিমাণ সঙ্গে সঙ্গে কমে যায়।

অক্সিন সম্বন্ধে পুরাপুরি জানতে হলে কি ভাবে অক্সিন তৈরী হয় এবং গাছের কোষে কি ভাবে তা অপসারিত হয় তা জানা দরকার। কিছু সংখ্যক গাছের কোষে একপ্রকার এন্‌জাইম তন্ত্র আছে, উহা অ্যামিনো অ্যাসিড ট্রিপটোফেইনকে আই. এ. এ-তে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে। এই রূপান্তর প্রক্রিয়া গাছের অক্সিন তৈরীতে সক্রিয় অংশ গ্রহণকারী কোষসমূহে দেখা যায় এবং রূপান্তরকারী হর্মোনগুলিও সেখানে বেশী পাওয়া যায়।

গাছের বৃদ্ধিসংক্রান্ত নানাবিধ কাজে অক্সিন বিশেষ দরকারী হলেও অতিরিক্ত পরিমাণ অক্সিনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে গাছে অক্সিন ধ্বংস-কারী একটি প্রণালী থাকে। তার একটি হলো অ্যামাইন ধ্বংসকারী একপ্রকার এন্‌জাইম। আই. এ. এ. অক্সিডেজ শ্রেণীর এন্‌জাইম আই. এ. এ-কে অক্সিজেন সহযোগে গাছের বৃদ্ধির পক্ষে অকেজো একপ্রকার পদার্থে রূপান্তরিত করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গাছে অক্সিনের সমতা নিয়ন্ত্রণ একটি জটিল প্রক্রিয়াধীন।

গাছের কোষে অক্সিন পরিবহন অন্যান্য দ্রবণ পরিবহন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। অক্সিন পরিবহন সাধারণতঃ প্রান্তদেশীয়; অর্থাৎ অক্সিন একটি কোষের মাধ্যমে গাছের অগ্রভাগ থেকে নিম্নভাগে পরিবাহিত হয়; কিন্তু এই নিয়মের বৈপরীত্য কখনো দেখা যায় না। গাছের কোন শাখার অগ্রমুকুলে যে অক্সিন তৈরী হয় তা সেই শাখার নিম্নভাগের কোষসমূহের বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু অন্য শাখার কোষগুলির বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে না। অক্সিন পরিবহনের এই প্রকৃতি ওয়েণ্ট কর্তৃক প্রথম নির্ধারিত হয়।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, অক্সিনের গতি ঘণ্টায় ১০ থেকে ১২ মিলিমিটার। তাপের তারতম্যে এই গতির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না, কিন্তু পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, প্রতি ১০° ডিগ্রি তাপ বৃদ্ধিতে প্রবহনের পরিমাণ দ্বিগুণায়িত হয়। পরীক্ষায় আরো দেখা গেছে যে, অক্সিন পরিবহন সাধারণ ব্যাপন প্রক্রিয়ায় সাধিত হয় না; বরং বিপাকক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তি ব্যয়েই এই প্রক্রিয়া সাধিত হয়।

অক্সিন পরিবহন গাছের কাণ্ডে সাধারণতঃ

জীবিত কোষের মাধ্যমেই হয়। কটিবন্ধন দ্বারা উহা বন্ধ হয়ে যায় এবং কটিবন্ধনের উপর অক্সিন জমে স্ফীতির সৃষ্টি করে এবং শিকড় বের হয়।

কোষ দীর্ঘায়তকরণে অক্সিন একান্ত প্রয়োজনীয়। আবার উহা গাছের কাণ্ড, ফুল ও পাতার বোঁটা, মধ্যশিরা প্রভৃতির কোষদীর্ঘায়তকরণও নিয়ন্ত্রণ করে।

অক্সিন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে হেইন প্রথম দেখেন যে, কর্তিত পত্রাবরণে অক্সিন প্রয়োগে কোষ-প্রাচীরের নমনীয়তা বাড়ে। পত্রাবরণের অগ্রভাগ কর্তনে কোষ-প্রাচীরের নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক প্রসারণ ক্ষমতা বন্ধ হয়ে যায়। অক্সিন, কোষের নমনীয় প্রসারণ ক্ষমতা বাড়ায়, স্থিতিস্থাপক প্রসারণ ক্ষমতা সরাসরি ভাবে না বাড়ালেও কোষের বৃদ্ধির উপর তা নির্ভরশীল। এজন্যেই দ্রুত বর্ধনশীল কোষের স্থিতিস্থাপকতা বেশী, আর অক্সিন প্রয়োগে যে সব কোষের বৃদ্ধি স্থগিত থাকে তাদের স্থিতিস্থাপকতাও কম। তবে অক্সিনের এই প্রভাব বিপাকক্রিয়াশীল কোষেই দেখা যায়।

অক্সিন কেবল গাছের দৈনিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণই করে না, কতকগুলি উদ্দীপনার সাড়ায় মধ্যস্থতাও করে। এদের একটি হলো ফটোট্রপিজম। ধনাত্মক ফটোট্রপিজমে গাছের আলোকিত অংশের বৃদ্ধি স্থগিত থাকে, কিন্তু অন্ধকার অংশ দ্রুত বাড়তে থাকে। এই অসম বৃদ্ধির ফলে গাছ আলোর দিকে বেঁকে যায়।

চার্লস ডারুইন ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, ঘাসের পত্রাবরণের অগ্রভাগই আলোক-সুবেদী। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ডেনমার্কের উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী বয়সেন-জেনসেন ডারুইন প্রদর্শিত পথে অনুসন্ধান করে দেখান যে, পত্রাবরণের অগ্রভাগ কেবল আলোক-সুবেদীই নয়, এই আলোক-উত্তেজনা পত্রাবরণের কর্তিত অগ্রভাগ থেকে নীচের দিকে প্রবাহিত হয়। তার পরীক্ষা থেকে দেখা যায়, আলোক-উত্তেজনা পত্রাবরণের কর্তিত অগ্রভাগ থেকে নীচের বর্ধনশীল অংশে ব্যাপনশীল পদার্থের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। অক্সিন সম্বন্ধীয় জ্ঞান থেকে এই তথ্যের ব্যাখ্যা করা যায়। ওয়েণ্ট ব্যাপন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দেখিয়েছেন যে, এক পক্ষীয় আলোক সম্পাতে পত্রাবরণের দু'পাশে অক্সিনের অসম বণ্টন হয়। ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন অ্যাগারখণ্ডে একপক্ষীয় আলোক সম্পাতিত পত্রাবরণের অক্সিন সংগ্রহ করে দেখা গেছে যে, পত্রাবরণের অন্ধকার অংশে পূর্বে আলোকিত অংশ অপেক্ষা অক্সিনের পরিমাণ বেশী। ওয়েণ্টের মতে, পত্রাবরণের আলোকিত অংশ থেকে অন্ধকার অংশে অক্সিনের সঞ্চরণের ফলেই এই অসম বণ্টন দেখা যায় এবং এজন্যে আলোর উৎসের প্রতি গাছের বক্রতা দেখা যায়। আলোর প্রভাবে অক্সিনের অসম ধ্বংসের ফলেও অক্সিন বণ্টনে অসাম্য দেখা যেতে পারে।

কোন গাছের কাণ্ডকে অনুভূমিক অবস্থায় রেখে দেখা গেছে যে, তার নিম্নাংশ ঊর্ধ্বাংশ অপেক্ষা তাড়াতাড়ি বাড়ে; ফলে গাছের অগ্রভাগ বেঁকে উপরের দিকে উঠতে থাকে। আবার শিকড়ের বেলায় এর বিপরীত অবস্থা দেখা যায়; অর্থাৎ শিকড় বেঁকে মাটিতে প্রবেশ করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গাছের কাণ্ড ঋণাত্মক জিওট্রপিক আর শিকড় ধনাত্মক জিওট্রপিক।

জিওট্রপিজমের সাড়াও অক্সিনের অসম বণ্টনেরই ফল—হার্‌ম্যান ডক-এর পরীক্ষার দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে। উপরিউক্ত পরীক্ষায় দেখা গেছে, অনুভূমিক পত্রাবরণের অগ্রভাগের নীচের অংশের অক্সিনের পরিমাণ উপরের অংশের অক্সিনের দ্বিগুণের চেয়ে বেশী।

শিকড়ের জিওট্রপিক সাড়া সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। পরীক্ষায় দেখা গেছে, যে পরিমাণ অক্সিন পত্রাবরণ, পত্রাবকাণ্ড প্রভৃতির দ্রুতবৃদ্ধির সহায়ক তা আবার শিকড়ের বৃদ্ধির পক্ষে অন্তরায়। অনুভূমিক শিকড় ও নীচের অংশে বেশী

অক্সিন সঞ্চিত হয়। অক্সিনের ঘনত্ব শিকড়ের বৃদ্ধির প্রতিকূল হওয়ায় অল্প অক্সিন সমন্বিত উপরের অংশ তাড়াতাড়ি বাড়ে; ফলে শিকড় নীচের দিকে বেঁকে যায়।

গাছের বিভিন্ন শারীরতাত্ত্বিক কার্যাবলীর মধ্যে পার্শ্ব-মুকুলের বৃদ্ধি, সংকোচন, পাতার মোচন রোধ, ক্যাম্বিয়াম ও ভাজক কলার বৃদ্ধি উদ্দীপন, ফুলের মুকুলের সূচনা ইত্যাদি প্রধান। অক্সিন সম্বন্ধীয় গবেষণার ফলে কৃষিকার্যে এর ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা ফল বা পাতার মোচন, সংকোচন, বৈষম্যমূলক আগাছা বিনাশ প্রভৃতি সম্ভব হয়েছে।

অনেক গাছের কর্তিত শাখা থেকে আস্থানিক শিকড় গজাতে দেখা যায়। অনেক বৈজ্ঞানিক নির্দেশ করেছেন যে, শাখার অগ্রমুকুলে প্রস্তুত এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ এসব শিকড় গঠনের জন্যে দায়ী। ওয়েন্ট এবং থিম্যান ১৯৩০ সালে পরীক্ষার সাহায্যে নির্ধারণ করেন যে, এই রাসায়নিক পদার্থ আই. এ. এ-র সমগোত্রীয়।

আজকাল নানাপ্রকার কাটিং থেকে মূলোদ্গমের কাজে আই. এ. এ. ব্যবহৃত হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে পাউডার, লেই, অথবা দ্রবণরূপে আই. এ. এ-এর প্রচুর ব্যবহার হয়ে থাকে। মূলের আদি সূচনায় অক্সিন একটি প্রধান এবং মৌলিক কারণ হলেও এতে অক্সিন ছাড়া অন্যান্য কারণও বিদ্যমান। কোন কোন সময় দেখা যায়, অক্সিনের প্রভাবে কাটিং-এ মূলোদ্গম হলেও থিয়ামিন অথবা পিরিডক্সিনের অভাবে তার বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

অধিকাংশ গাছে কক্ষমুকুল, অগ্রমুকুলের উপস্থিতিতে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। কিন্তু অগ্রমুকুল অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে তা বাড়তে আরম্ভ করে। কক্ষমুকুলের এই সুপ্তাবস্থা অগ্রপ্রাধান্য নামে পরিচিত। এই অগ্রপ্রাধান্যের উপরই গাছের শাখা-বিন্যাস ও আকার নির্ভর করে। অগ্রমুকুল থেকে বৃদ্ধি-সংকোচক প্রভাব নীচের দিকে প্রবাহিত হয়, কিন্তু উপরের দিকে প্রবাহিত হতে পারে না। এই সূত্র থেকে অক্সিনের সঙ্গে এর সম্বন্ধ দেখা যায়। থিম্যান এবং স্কুগ শীমের অগ্রমুকুল অপসারণ করে তাতে অক্সিন সমন্বিত অ্যাগারখণ্ড স্থাপন করে দেখেন যে, কক্ষমুকুল পূর্ববৎ সুপ্ত অবস্থায় আছে। অপর পক্ষে, অক্সিনবিহীন অ্যাগারখণ্ড স্থাপনে কক্ষমুকুলের দ্রুত বৃদ্ধি দেখা যায়।

অগ্রমুকুল অক্সিন উৎপাদনের কেন্দ্র হলেও অক্সিনের প্রভাবে তার বৃদ্ধি ব্যাহত হয় না, অথচ তার সামান্য অংশ নীচে প্রবাহিত হয়ে কক্ষমুকুলের বৃদ্ধি সংকোচন করে। এই সমস্যা সমাধানে নানা যুক্তির অবতারণা করা হলেও আজ পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় নি।

সূর্যমুখী অথবা শীম গাছের কাণ্ডের কর্তিত অংশে আই. এ. এ-র লেই লাগিয়ে দেখা গেছে যে, এতে কর্তিত অংশে ক্যালাস সৃষ্টি হয়। কলাস্থানীয় পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, কেবল কোষ সমূহের বৃদ্ধির ফলেই এসব ক্যালাস সৃষ্টি হয় না, পরন্তু এতে নতুন কোষেরও সৃষ্টি হয়ে থাকে। এমন কি, এই সব কোষে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাস্কুলার কোষও দেখা গেছে।

এসব ক্যালাসের বিচ্ছিন্ন অংশ বীজমুক্ত অবস্থায় অক্সিন সমন্বিত পোষক রসে রাখলে এদের বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। প্রতি লিটার পোষক রসে ০·১ মিলিগ্র্যাম অক্সিন প্রয়োগে ক্যালাস দ্রুত বৃদ্ধি পায়, আবার অক্সিনের পরিমাণ বাড়িয়ে ১০ মিলিগ্র্যাম করা হলে ভাজক বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু কোষ দীর্ঘায়তকরণ চলতে থাকে। পোষক রসে অক্সিনের অনুপস্থিতিতে ভাজক বৃদ্ধি অথবা কোষ দীর্ঘায়তকরণ কিছুই হয় না।

গাছের অগ্রমুকুলে প্রস্তুত অক্সিন ক্যাম্বিয়ামের কার্যাবলী উদ্দীপিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। গাছের মুকুলে উৎপন্ন অক্সিন থেকেই বসন্তকালে গাছের বৃদ্ধি পুনর্বার আরম্ভ হয়। কৃত্রিম অক্সিন প্রয়োগেও ক্যাম্বিয়ামের বৃদ্ধি সূচিত হতে দেখা যায়।

বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের পাতা ও ফল পতনের পূর্বে তাদের বৃন্তে মোচন-স্তরের সৃষ্টি হয়। মোচন-স্তরের কোষ-প্রাচীর খুব দুর্বল হয়ে পড়ে ; কাজেই কোষ প্রাচীর ভেদ দ্বারা ফল ও পাতা গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। জার্মান বৈজ্ঞানিক লাইবেক এবং মাই ১৯৩৩ সালে প্রথম দেখান যে, অক্সিন প্রয়োগে মোচনস্তর সৃষ্টি বিলম্বিত হয়। আজকাল অপরিপক্ক ফলের পতন রোধে অক্সিন স্প্রে করার বহুল প্রচলন দেখা যায়।

তাপ, দিনের দৈর্ঘ্য প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর গাছের ফুলের সূচনা নির্ভর করে। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেছে, আই. এ. এ. অথবা অন্য প্রকার অক্সিন প্রয়োগে ফুলের সূচনা বিলম্বিত হয়। আবার কোন কোন গাছে এর বিপরীত ফলও দেখা যায়।

ফলের বৃদ্ধির সঙ্গে অক্সিনের সম্বন্ধ সুপরিচিত। ফলের বর্ধনশীল বীজই এই সব অক্সিনের উৎস। পরাগযোগের পূর্ব পর্যন্ত ডিম্বাশয় সাধারণভাবে বাড়তে থাকে। পরাগযোগের অভাবে ডিম্বাশয়ের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় এবং সেগুলি গাছ থেকে ঝরে পড়ে। পরাগযোগে ডিম্বাশয়ের বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে এবং তা ফলে পরিণত হয়। সুতরাং পরাগযোগ অধিকাংশ ফল গঠনের পক্ষে অপরিহার্য। পরাগযোগের সঙ্গে অক্সিনের সম্পর্ক গুষ্টাফসন কর্তৃক ১৯৩৬ সালে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি পরীক্ষার সাহায্যে দেখান যে, টমেটো, পিটুনিয়া প্রভৃতির বেলায় পরাগযোগ ব্যতীতও গর্ভমুণ্ডে অক্সিন প্রয়োগে ফল উৎপাদন সম্ভব। পরবর্তীকালে বিভিন্ন গাছের গর্ভমুণ্ডে অক্সিন প্রয়োগে কৃত্রিম ফলোৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

আই. এ. এ. প্রয়োগে গাছের বৃদ্ধি সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বিভিন্ন অক্সিনের মধ্যে গাছে আই. এ, এ-র অস্তিত্বের বিষয় নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। আই, এ, এ-র সমগুণবিশিষ্ট কিছু সংখ্যক রাসায়নিক পদার্থ গাছে না পাওয়া গেলেও গাছের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে তারা আই. এ. এ-র মতই কার্যকরী। এই শ্রেণীর মধ্যে ইনডোল বিউটি্রক অ্যাসিড (আই. বি. এ.) এবং ন্যাপথলিন অ্যাসেটিক অ্যাসিড (এন. এ. এ.) প্রধান। এরা অক্সিন বিষয়ক সব রকম কাজে কার্যকরী ; বিশেষ করে এন. এ. এ, আই. এ. এ-র মত সহজে গাছের কোষে ধ্বংস হয় না। এজন্যে ফলের পতন রোধ, কাটিং থেকে মূলোদ্গমের কাজে তা বেশী ব্যবহৃত হয়। এছাড়া অপুংজনজ ফলোৎপাদনে বি-ন্যাপথক্সি অ্যাসেটিক অ্যাসিড এবং অপরিপক্ক লেবুর পতন রোধে ২:৪ ডাইক্লোরোফেনক্সি অ্যাসেটিক অ্যাসিড বিশেষভাবে উপযোগী। প্রকৃতপক্ষে অক্সিন সম্বন্ধীয় কার্যাবলী অনুসন্ধানে কয়েক হাজার রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হয়তো পরীক্ষা দ্বারা নূতন কার্যোপযোগী রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কৃত হবে।

আগাছা বিনাশে অক্সিনের বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে। কিছু সংখ্যক রাসায়নিক পদার্থ অল্প মাত্রায় অক্সিনের ন্যায় কার্যকরী, কিন্তু বেশী মাত্রায় গাছের পক্ষে বিষাক্ত। এদের মধ্যে ২:৪ ডাই-ক্লোরোফেনক্সি অ্যাসেটিক অ্যাসিড উল্লেখযোগ্য। অল্পমাত্রায় উহা অক্সিনের মত কোষসমূহের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, কিন্তু অধিক মাত্রায় উহা চওড়া পাতাবিশিষ্ট গাছের পক্ষে বিষাক্ত। পাতা দ্বারা সহজে শোষিত হওয়ায় স্প্রে করে ব্যবহার করা যায়। সরু পাতাবিশিষ্ট গাছের পক্ষে ক্ষতিকর না হওয়ায় বৈষম্যমূলকভাবে আগাছা বিনাশে এর ব্যবহার দেখা যায়।

বিভিন্ন কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণে অক্সিনের প্রভাব বিস্তার পদ্ধতি আজও একটি বড় রহস্য। কোষ দীর্ঘায়তকরণে কোষ-প্রাচীরের নমনীয়তা বাড়িয়ে উহা প্রভাব বিস্তার করে। আজকাল অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে কোষ-প্রাচীরের নমনীয়তা বৃদ্ধি খুব সম্ভবতঃ অক্সিনের জটিল কৌষিক বিপাক ক্রিয়ার একটি চূড়ান্ত ফল। অন্য কথায় অক্সিনকে

একটি জটিল প্রক্রিয়ার চাবিকাঠি বলা যায়। যার চূড়ান্ত ফলস্বরূপ গাছের বৃদ্ধি আমরা দেখতে পাই। এই জটিল প্রক্রিয়ার সঙ্গে আবার গাছের শ্বাস-ক্রিয়ার সম্বন্ধ রয়েছে, কারণ অক্সিন প্রয়োগে গাছের শ্বাসক্রিয়ার বৃদ্ধি দেখা যায়। তবে শ্বাস-ক্রিয়া এবং অক্সিন উদ্দীপ্ত শ্বাসক্রিয়ার সঙ্গে গাছের বৃদ্ধির সম্পর্ক আজও নিরূপিত হয় নি। তবে খুব সামান্য পরিমাণ অক্সিন দ্বারা এই জটিল প্রক্রিয়া সাধিত হওয়ায় মনে হয় অক্সিন একটি প্রোস্থেটিক গ্রুপ, অথবা কোন এন্‌জাইমের প্রোস্থেটিক গ্রুপের অংশ হিসাবে কাজ করে। এই এন্‌জাইমের প্রকৃত রহস্য নিরূপণে হয়তো উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হবে।

মানব মস্তিষ্ক

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

মস্তিষ্কের প্রভাবেই মানুষ জীবজগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। এই মস্তিষ্কের শক্তি সম্বল করিয়াই মানুষ প্রকৃতিকে পদানত করিবার সাধনায় অগ্রসর হইয়াছে।

মস্তিষ্ক একটি অদ্ভুত জটিল পদার্থ। ইন্দ্রিয়লব্ধ বিভিন্ন সঙ্কেতের বিচার-বিশ্লেষণ হইতে নিয়ত নানারকমের অনুভূতির সৃষ্টি এখানেই হইয়া থাকে। পেশী সঞ্চালন এবং বিভিন্ন পেশী সঞ্চালনের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের দ্বারা দেহের সর্ববিধ সক্রিয়তার মূলও মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক আমাদের স্মৃতিশক্তির আধার। অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি মস্তিষ্কের আছে বলিয়াই আমরা মননশক্তির অধিকারী হইয়াছি। বস্তুতঃ মন ও চিন্তাশক্তির অধিকারী হইয়াছে বলিয়াই মানুষ জীবজগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে।

ক্ষুদ্র জীব পিপীলিকার অদ্ভুত সংগঠনীশক্তি সম্বন্ধে আমাদের অনেক তথ্য জানা আছে। ইহাদের দলসংগঠন, গৃহনির্মাণ, খাদ্যসংগ্রহ ও সংরক্ষণ প্রভৃতি কাজে শৃঙ্খলা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। মাত্র ২৫০টি স্নায়ুকোষ সম্বল করিয়া পিপীলিকার এই কর্মনৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষের তুলনায় পিপীলিকার স্নায়ুতন্ত্র খুবই নগণ্য ব্যাপার। মানুষের মস্তিষ্কের স্নায়ু-কোষের সংখ্যাই প্রায় ১০০০ কোটি, অর্থাৎ পৃথিবীর লোকসংখ্যার চারগুণেরও অধিক। কাজেই স্নায়ু-কোষ যেখানে এমন বিপুলভাবে পুঞ্জীভূত হইয়াছে সেখানে তাহার শক্তি ও সম্ভাবনা যে বিরাট হইবে তাহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি আছে!

আমাদের গোটা মস্তিষ্ককে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়; যথা—সম্মুখ মস্তিষ্ক বা সেরিব্রাম, মধ্য মস্তিষ্ক বা সেরিবেলাম এবং পশ্চাৎ মস্তিষ্ক বা মেডুলা অবলঙ্গেটা। সম্মুখ মস্তিষ্কের মধ্যে আবার চারিটি বিভাগ আছে। ইহার উপরিভাগেই প্রধান অংশটি সেরিব্র্যাল কর্টেক্স বা গুরু মস্তিষ্ক। এই অংশটিকে নব্যমস্তিষ্কও বলা হয়। মেরুদণ্ডী জীবের বিবর্তনের পর্যায়ে এই অংশের গঠন অনেক পরে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়াই ঐরূপ বলা হইয়া থাকে। কর্টেক্সের অংশ বাদে বাকী অংশের গঠন অনেক পূর্বে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া ঐ সমুদয় অংশকে প্রত্নমস্তিষ্ক বলা হয়।

১০ কোটি বৎসর পূর্বে ডাইনোসোরের যুগেই প্রত্ন-মস্তিষ্কের অংশ যথেষ্ট উন্নত স্তরে পৌছিয়াছে।

মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে মৎস্য—এমন কি, ভেক প্রভৃতি উভচর প্রাণীর স্তরেও নব্যমস্তিষ্কের কোন অস্তিত্ব নাই। সরীসৃপের পর্যায়ে ইহার সামান্য সূচনা দেখা যায়। সরীসৃপ হইতেই পক্ষী ও স্তন্যপায়ী জীবের উদ্ভব হইয়াছে। পক্ষীর ক্ষেত্রে নব্যমস্তিষ্কের ভাগ বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই; কিন্তু স্তন্যপায়ী জীবের ক্রমবিবর্তনের স্তরে স্তরে এই অংশের উন্নতি ঘটিতে দেখা যায়। তবে বানরজাতীয় জীবের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত ইহার বৃদ্ধির গতি খুবই মন্থর ছিল। বানরের মস্তিষ্কে এই অংশের আয়তন হঠাৎ অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সর্বশেষে মানুষের মস্তিষ্কে এই অংশের অতিবৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

আমাদের মস্তিষ্কের এই প্রাচীন অংশের সাহায্যে আমাদের জীবনধারণের মূল প্রয়োজনগুলি সিদ্ধ হয়। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আহার অন্বেষণের প্রেরণা আমরা এই অংশ হইতেই লাভ করি। শ্বাসক্রিয়া, হৃদ্‌স্পন্দন প্রভৃতি প্রাণক্রিয়াগুলিও এই অংশের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। নব্যমস্তিষ্কের তুলনায় আমাদের প্রত্নমস্তিষ্কের অংশটি খুবই ছোট। শুধুমাত্র প্রত্নমস্তিষ্কই যদি আমাদের সম্বল হইত তবে আমাদের মস্তিষ্কের আকার মুষ্টিবদ্ধ হস্ত অপেক্ষা বড় হইত না। প্রত্নমস্তিষ্কের উপরে গম্বুজের আকারে নব্যমস্তিষ্কের অতিবিস্তৃতির ফলেই আমাদের মস্তিষ্কের আকার বৃদ্ধি পাইয়াছে। নব্যমস্তিষ্ক একটি বৃহৎ টিউমারের আকারে প্রত্ন-মস্তিষ্কের অংশটিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। নব্যমস্তিষ্কের মোট ওজন প্রায় দেড় সের। অগণিত আণুবীক্ষণিক স্নায়ুকোষের দ্বারা ইহা গঠিত। প্রত্যেক কোষ হইতে স্নায়ুসূত্র বাহির হইয়া পরস্পরের সঙ্গে নানারূপ জটিল যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার ফলে এখানে এক গভীর জঙ্গলের সৃষ্টি হইয়াছে। সমস্ত প্রকার বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি এই অংশেই নিহিত। ইহাই আমাদের চিন্তা ও মনের আধার।

নব্য ও প্রাচীন মস্তিষ্ক পরস্পরের উপর নির্ভরশীল; কাজেই উভয় অংশই দেহের সর্বস্থানের স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিয়া একযোগে কাজ করিয়া চলিয়াছে। দেহের আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত সঙ্কেতসমূহ এখানে গৃহীত হইতেছে। প্রহরী-স্বরূপ ইন্দ্রিয়গুলি সঙ্কেত প্রেরণ করিয়া চালয়াছে। স্নায়ুকেন্দ্রে এই সঙ্কেতগুলি অবহেলিত হইলে প্রতি মুহূর্তে আমাদের জীবন বিপন্ন হইতে পারে। কাজেই মস্তিষ্ককে ত্বরিত গতিতে এই সব সঙ্কেতের অর্থ উদ্ধার করিয়া উত্তর দিতে হইতেছে। মস্তিষ্কের সাহায্য ব্যতীত, এমন কি মুহূর্তকাল দাঁড়াইয়া থাকা পর্যন্ত সম্ভব নয়। এখানে দেহের পেশী ও পেশী-বন্ধনীগুলির অবস্থা সম্বন্ধে নানা সঙ্কেত যাচাই হইয়া অসংখ্য স্নায়বিক যোগাযোগ সৃষ্টি হওয়ার ফলেই আমাদের দাঁড়াইয়া থাকা সম্ভব হয়।

এইরূপ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে প্রতিনিয়ত নানা সঙ্কেতও মস্তিষ্ককে গ্রহণ ও যাচাই করিতে হইতেছে। কাজেই কিরূপ অদ্ভুত কর্মব্যস্ততা সেখানে ঘটিয়া চলিয়াছে তাহা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। মস্তিষ্কে বিভিন্নরূপ সঙ্কেত গ্রহণের জন্য বিভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট আছে—যথা, মস্তিষ্কের পার্শ্বদেশে কতকস্থানে শুধু শ্রবণ ও স্পর্শন সম্বন্ধীয় সঙ্কেতই গৃহীত হয়। এইরূপ মস্তিষ্কের পিছন দিকের কতক স্থান শুধু দর্শন সংশ্লিষ্ট সঙ্কেত গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট আছে।

দেহের অন্য অংশের সঙ্গে সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্য দিয়া মস্তিষ্কের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। কাজেই ইন্দ্রিয়লব্ধ সমস্ত সঙ্কেতই সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্য দিয়া মস্তিষ্কে পৌছায়। আবার ঐ সঙ্কেতসমূহ যাচাই হইয়া মস্তিষ্কের আদেশ সুষুম্নাকাণ্ডের ভিতর দিয়াই দেহের নানা অংশের তন্তুতে আসিয়া উপস্থিত হয়। আমরা এই আদেশ অনুসারেই

কাজ করিয়া চলি। কাজেই অন্তর্বাহী ও বহির্বাহী স্নায়ুগুচ্ছের মাধ্যমে সুষুম্নাকাণ্ডে ক্রমাগত ঝড়ের মত বিপরীতমুখী স্নায়বিক বার্তা বহিয়া চলিয়াছে।

কাজের চাপ সহ্য করিতে মস্তিষ্কের শক্তি যে অতি অদ্ভুত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রচণ্ড কাজের চাপ সহ্য করিতে হয় বলিয়াই হয়তো ইহার নিদ্রার প্রয়োজনও দেহের অপরাপর অংশ অপেক্ষা অধিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দুই শত ভলান্টিয়ারকে ৪।৫ দিন পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় রাখিয়া এই বিষয়ে চূড়ান্তভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। তদবস্থায় তাহাদের পেশীতে কোনরূপ অবসন্নতা প্রকাশ পাইতে দেখা যায় নাই, অথবা তাহাদের হৃদ্‌স্পন্দনের স্বাভাবিক গতিও ক্ষুণ্ন হয় নাই। কিন্তু এই অনিদ্রার ফল তাহাদের মস্তিষ্কে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। তাহারা নানারূপ অবাস্তব ব্যাপার দর্শনের বর্ণনা দিতে থাকে। তাহাদের বিরুদ্ধে কোন গভীর ষড়যন্ত্র চলিয়াছে, এইরূপ ধারণায় তাহাদিগকে বিচলিত দেখা যায়। এক কথায় মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণসমূহ তাহাদের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই কয়দিনেই তাহাদের কাহারো কাহারো অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়া পড়ে। কিন্তু মাত্র একটি রাত ঘুমাইবার পরেই তাহারা প্রায় সকলেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে।

এই পরীক্ষায় প্রকাশ পায় যে, প্রধানতঃ মস্তিষ্কের বিশ্রামের জন্যই আমরা নিদ্রা যাই। নিদ্রার সময় মস্তিষ্কের উন্নত অংশের বা নব্য-মস্তিষ্কের কোষসমূহের যোগাযোগ শিথিল হওয়ার ফলেই স্নায়বিক উত্তেজনার প্রবহন বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

অবশ্য নিদ্রার সময় ব্যতীতও মস্তিষ্ক পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় খুব কম সময়ই থাকে। কোন বিশেষজ্ঞের মতে, সাধারণ লোকের মস্তিষ্ক ঘণ্টাপ্রতি মাত্র এক মিনিটের মত সময় পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় থাকে। বাকী সময় মস্তিষ্ক প্রায় স্বয়ংক্রিয়ভাবেই কাজ করিয়া যায়। এক মাত্র ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ ঘটিলেই মস্তিষ্ক পূর্ণ জাগ্রত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

হিপ্‌নটিজমের ক্ষেত্রে সম্মোহিত ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে। ইহার ফলে নিদ্রিত ব্যক্তির মতই মস্তিষ্কের যোগাযোগ শিথিল হইয়া পড়ে। তদবস্থায় তাহার মস্তিষ্কের শুধু একটি দ্বার খোলা থাকে। সেই পথেই সম্মোহনকারীর সঙ্গে তাহার সংযোগ ঘটে। সে তখন জীবন্ত 'রবটে' পরিণত হয় এবং সম্মোহনকারীর ইচ্ছামত কাজ করিয়া চলে। সম্মোহনকারীর সঙ্গে এই অদ্ভুত সংযোগ-পথ ব্যতীত মস্তিষ্কের অন্য অংশ নিদ্রিত থাকায় সম্মোহনকারীর নির্দেশের অন্তরায় স্বরূপ কোন বিরুদ্ধ ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে না। এইভাবে মস্তিষ্কে কোন প্রতিবাদ সৃষ্টির অভাবে সে সম্মোহনকারীর নির্দেশ অনুসরণে বাধ্য হয়।

হিপনটিজমের অবস্থায় মানুষ বহুকালের বিস্মৃত ঘটনা স্মরণ করিতে পারে। অহরহ এমন অনেক সাধারণ ঘটনা ঘটে যাহা কাহারো মনে করিয়া রাখিবার কথা নয়। দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হইলে লোকে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও ঐ সব ঘটনা স্মরণ করিতে পারে না। কিন্তু হিপ্‌নটিজমের অবস্থায় মানুষকে এইরূপ পূর্বেকার অতি সাধারণ ঘটনাকে বিস্মৃতির গহ্বর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া উহার হুবহু বর্ণনা দিয়া যাইতে দেখা যায়। একবার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে এক রাজমিস্ত্রিকে হিপ্‌নটাইজ করা হইয়াছিল। তদবস্থায় সে দশ বৎসর পূর্বে তোলা একটি প্রাচীরের গাঁথুনির ব্যাপারের এমন হুবহু বর্ণনা দিয়া যায় যে, তাহাতে লোকের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। এমন কি, একখানা ইট ঈষৎ কালো ও অসমান ছিল, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাও তাহার মধ্যে ছিল। অথচ তাহার স্মৃতিশক্তি সাধারণ লোকের মতই, আর ঐ দিন হয়তো সে ঐরূপ হাজার হাজার ইটই গাঁথিয়া থাকিবে। তারপরেও দশ বৎসরের মধ্যে সে কত

ইটই না গাঁথিয়াছে! কাজেই স্বাভাবিক অবস্থায় এতদিন পূর্বেকার একখানা ইটের কথা তাহার স্মরণ করিয়া রাখিবার কথা নয়। হিপ্‌নটিজমের অবস্থায় মানুষ যে এইরূপ বহু পূর্বের অতি সামান্য ঘটনাও স্মরণ করিতে পারে, সে সম্বন্ধে ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে।

বহির্জগৎ-সংশ্লিষ্ট যে সব বার্তা মস্তিষ্কে পৌঁছায় তাহার শতকরা ৮৫ ভাগ চক্ষুর মাধ্যমে প্রেরিত হয়। সিনেমার ক্যামেরায় যেমন দ্রুতগতিতে সাটার খুলিয়া ও বন্ধ হইয়া পর পর ছবি উঠিয়া চলে, চক্ষের বার্তা প্রেরণ ব্যাপারটিও সেরূপেই ঘটে। সাটার খোলা ও বন্ধ হওয়ার মত চক্ষুও একবার সক্রিয় ও পরমুহূর্তেই নিষ্ক্রিয় হইতে থাকে। চক্ষু হইতে মস্তিষ্কে এবং পুনরায় মস্তিষ্ক হইতে চক্ষে বার্তার এই আদান-প্রদান প্রতি সেকেণ্ডে ৮ হইতে ১৩ বার ঘটিয়া থাকে। কাজেই আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে যে চিত্র ফুটিয়া উঠে তাহা নিরবচ্ছিন্ন নয়। পরপর কতকগুলি ছবির সমাবেশ মাত্র। মস্তিষ্কে এক একটি বার্তা বিশ্লেষিত হইয়া যে ছাপের সৃষ্টি হয়, সেই ছাপের অস্তিত্ব কিছুক্ষণ মস্তিষ্কে থাকে বলিয়াই আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে পর পর ছবিগুলির বিচ্ছিন্নতা অবলুপ্ত হয়। ঠিক একই কারণে সিনেমার ছবিগুলির নিরবচ্ছিন্নতা আমাদের চক্ষে ধরা পড়ে না।

আমাদের দর্শন-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মস্তিষ্কে যে চিত্রগুলি ফুটিয়া উঠে তাহারা আবার মস্তিষ্কেই স্মৃতিরূপী ফটোগ্রাফির ফাইলে জমা থাকে। এই কারণেই অতীতে দেখা কোন মুখ বা জনপদের ছবি আমরা স্মরণ করিতে ইচ্ছা করিলে আমাদের মানস-চক্ষে তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। অনেক সময় কোন বিশেষ দৃশ্য স্মরণ করা হয়তো কঠিন হয়, তখন আমরা উহার সমসাময়িক অপর দৃশ্যগুলি স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতে থাকি এবং এইভাবে কিছুক্ষণ চেষ্টার পরে হয়তো হঠাৎ এক সময় ঐ বিশেষ ছবিটি আমাদের মানস-চক্ষে প্রতিভাত হইয়া উঠে। ইহা ঠিক ফটোগ্রাফির ফাইল তচ্‌নচ্‌ করিয়া একখানা বিশেষ ফটো সংগ্রহ করিবারই অনুরূপ। এইরূপ মস্তিষ্কের স্মৃতিভাণ্ডারে যে শুধু আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়লব্ধ ছাপগুলিই জমা হইয়া থাকে, এমন নহে। আমরা যাহা শুনি এবং ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শন সম্বন্ধে আমাদের যে অনুভূতির সঞ্চার হয় তাহাও একইরূপে সেখানে নথিভুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপে স্মৃতির নথিতে একবার যাহা জমা হয় তাহা ধ্বংস করা খুবই কঠিন। একমাত্র মৃত্যুতেই তাহা ধ্বংস হইতে পারে।

অনেক সময় মস্তিষ্কে অথবা মনে কোন গুরুতর আঘাত পাওয়ার ফলে লোকে অতীতের ঘটনা বিস্মৃত হয়, অতি পরিচিত লোককেও চিনিতে অক্ষম হয়। এইরূপ অবস্থায় স্মৃতির জমা বই ঠিকই থাকে, শুধুমাত্র সেখানে পৌঁছিবার শক্তিই তাহার নষ্ট হয়।

স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের নব্যমস্তিষ্ক তাহার মধ্যে সযত্নে রক্ষিত স্মৃতির জমা বইটি সব সময়ই ঘাঁটিয়া চলে এবং অতীত অভিজ্ঞতার বিচার করিয়া ভবিষ্যতের প্ল্যান রচনা করিতে থাকে। অতীত অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়াই ভবিষ্যতের ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের ধারণার সৃষ্টি হয়।

প্রত্নমস্তিষ্কের কাজের তদারক করাও নব্য-মস্তিষ্কের কার্যসূচীর অন্তর্গত। প্রত্নমস্তিষ্ক নানারূপ ভাবোত্তেজনার ক্ষেত্র। ইহার উপর নব্য-মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণের প্রভাব আছে বলিয়াই ভাবো-ত্তেজনার উদ্দাম প্রকাশ ঘটিতে পারে না এবং ইহার ফলে সমাজ-শৃঙ্খলাও ঠিক থাকে। ব্রেন টিউমার বা কোন স্নায়বিক ব্যাধিতে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি হইলে সেরূপ অবস্থায় মানুষের মধ্যে নানারূপ ভাবাবেগ উদ্দাম ও অসংযতভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

প্রত্নমস্তিষ্ক যে নবীন মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় শুধু তাহার আদেশ পালন করিয়াই চলিয়াছে, এমন নহে। উভয়ের মধ্যে আদান-প্রদানের সম্বন্ধই

বর্তমান। প্রত্নমস্তিষ্ক হইতে নব্যমস্তিষ্কেও আদেশ প্রেরিত হইয়া থাকে। প্রত্নমস্তিষ্কে হর্ষ, বিষাদ, ক্রোধ প্রভৃতি যে সব ভাবোত্তেজনার সৃষ্টি হয় তাহাই নব্যমস্তিষ্ককে তাহাদের কারণ সম্বন্ধে অবহিত হইতে আদেশ করে। প্রত্ন ও নব্যমস্তিষ্কের মধ্যে প্রায় এক কোটি স্নায়ুসূত্র দ্বারা সংযোগ রক্ষিত হইতেছে। এই সব স্নায়ুসূত্রের কতকগুলি নব্যমস্তিষ্ক হইতে প্রত্নমস্তিষ্কে এবং অপরগুলি প্রত্নমস্তিষ্ক হইতে নব্যমস্তিষ্কে বার্তা বহন করে। উভয় মস্তিষ্কের মধ্যে এই যোগাযোগ ব্যবস্থায় কোনরূপ বিঘ্ন ঘটিবার ফলে নানরূপ মানসিক ব্যাধির উৎপত্তি হয়।

মানসিক ব্যাধির ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের স্নায়বিক উত্তেজনা প্রশমনের জন্য নানারূপ চেষ্টা হইয়া থাকে। অধুনা আবিষ্কৃত রেসারপাইন ও ক্লোরোপ্রোমেজাইন মস্তিষ্কের স্নায়বিক উত্তেজনা প্রশমনে বিশেষ সাফল্যের সহিত ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রত্নমস্তিষ্ক হইতে নানা অসংবদ্ধ উত্তেজনা অস্বাভাবিক বেগে নব্যমস্তিষ্কের দিকে প্রবাহিত হওয়ার ফলেই সেখানে নানা বিকৃত ধারণার সৃষ্টি হইতে থাকে এবং ইহার ফলেই মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হয়। এই সকল ঔষধের ক্রিয়ায় প্রত্নমস্তিষ্কের এই অস্বাভাবিক উত্তেজনাসমূহ নব্যমস্তিষ্কে প্রবেশে বাধা প্রাপ্ত হয়। প্রত্নমস্তিষ্কে উত্তেজনা সৃষ্টি হইতে থাকিলেও উহার পরিবহন শ্লথ হইয়া পড়ে।

মানসিক ব্যাধি নিরাময়কল্পে রাসায়নিক উপায় সম্বন্ধে নানারূপ গবেষণা চলিয়াছে। অধুনা সিজোফ্রেনিয়া নামক একটি মানসিক ব্যাধির ক্ষেত্রে এক নূতন পথের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই সব রোগীর রক্ত হইতে একটি বিশেষ প্রোটিন স্বতন্ত্র করিয়া উহা সুস্থ ব্যক্তির রক্তে সঞ্চালিত করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তদবস্থায় ঐ সুস্থ ব্যক্তিও সাময়িকভাবে উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়। ইহা হইতে রক্তের মধ্যে ক্রমাগত ঐ বিশেষ প্রোটিনটি সঞ্চালিত হওয়ার ফলেই সিজোফ্রেনিয়া রোগের উৎপত্তি হয়—এইরূপ অনুমান স্বাভাবিক; অর্থাৎ সিজোফ্রেনিয়া মানসিক ব্যাধিরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেও মস্তিষ্কের সঙ্গে তাহার উৎপত্তির সম্বন্ধ হয়তো গৌণ। দেহের রাসায়নিক সাম্যে বিঘ্ন সৃষ্টির ফলেই হয়তো মস্তিষ্কে বিশেষ প্রকারের পরিবর্তন আনয়ন করে। যাহা হউক, রোগের মূল কারণের যখন সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তখন প্রতিকারের উপায়ও হয়তো সহজ হইবে। রোগীর দেহের এই বিষাক্ত প্রোটিনটি নষ্ট করিবার রাসায়নিক উপায় আবিষ্কৃত হইলেই এই রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে।

মস্তিষ্কের জটিল তত্ত্বানুশীলনের পথে এখন পর্যন্ত আমরা খুব বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছি বলিয়া পণ্ডিত ব্যক্তিরা মনে করেন না। মস্তিষ্ক সম্বন্ধে আমরা যতখানি জ্ঞান লাভ করিতে চাই তাহার খুব সামান্য অংশই এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে প্রকাশ পাইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ আমাদের স্মৃতিশক্তির বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। একজন বিশেষজ্ঞের মতে, পৃথিবীর বৃহত্তম পুস্তকাগারে যত পুস্তক আছে এবং ঐসব পুস্তকে যত কথা লিখিত আছে আমাদের মস্তিষ্কের ধারণশক্তি তাহা অপেক্ষাও অধিক। কিন্তু মস্তিষ্ক ঠিক কোথায় এবং কি ভাবে এত সংবাদ সংরক্ষিত করিয়া রাখে তাহার সামান্য পরিচয়ও এখন পর্যন্ত আমরা লাভ করিতে পারি নাই।

স্মৃতির মত বুদ্ধিবৃত্তির রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যও মানুষের মস্তিষ্ক তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া কোন হদিস পাওয়া যায় নাই। মৃত্যুর পরে অতি প্রতিভাবান ব্যক্তি ও অতি নির্বোধ ব্যক্তির মাথার খুলি হইতে মস্তিষ্ক বাহির করিয়া উভয়ের পরীক্ষা হইতে কোন প্রভেদ ধরা পড়ে নাই। নব্যমস্তিষ্কের গভীর জঙ্গলের জটিল যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যেই হয়তো সেই রহস্য নিহিত আছে। কিন্তু সেই দুর্গম স্থানের অগণিত জটাজালের মধ্য হইতে উহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার সম্ভাবনা এখনও দেখা দেয় নাই।

তারপরে মনের যে শক্তি সর্বদা অসাধ্য সাধনের দিকে মানুষকে তাড়া করিয়া ফিরিতেছে, যাহার বলে সে সব কিছু বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া দুর্গম শৈলশৃঙ্গে বা মেরু প্রদেশে ছুটিয়া যায় এবং এভাবেই জয় করে, যাহার প্রেরণায় আজ সে গ্রহ-নক্ষত্রে পর্যন্ত অভিযানে উদ্যোগী হইয়াছে, অসাধ্যকে জয়, অজ্ঞানাকে জানিবার মানব মনের এই চির অতৃপ্ত বাসনা মস্তিষ্কের কোন্ নিভৃত কন্দরে আবাস রচনা করিয়া বিরাজ করিতেছে তাহার সন্ধানই বা আমরা কবে পাইব ?

হার্নিয়া

শ্রীঅজিতকুমার সিকদার

হার্নিয়া রোগটা কি—সে সম্বন্ধে অনেকেরই একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে। ব্যাপারটা মোটামুটি একটু বুঝিয়ে বলববার জন্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। শরীরের অভ্যন্তরের কোন যন্ত্র যদি তার আধারে অবস্থিত স্বাভাবিক অথবা দৈবাৎ সংঘটিত কোন ছিদ্রপথে উঁকি মারে বা খানিকটা বেরিয়ে আসে তখনই বলা হয় হার্নিয়া হয়েছে। কিন্তু সাধারণতঃ যখন কথাটা ব্যবহার করা হয় তখন আধারটা হচ্ছে পেটের চারদিকের দেয়াল, আর যন্ত্রাদি হচ্ছে ওর ভিতরের 'ভিসারা'। ব্যাপারটা বুঝতে হলে পেটের দেয়াল সম্বন্ধে প্রথমে কয়েকটা কথা জানা দরকার।

পেটের দেয়ালের একেবারে ভিতরের দিকে একটা পাত্‌লা আবরণ লেগে থাকে। এই আবরণটাকে বলা হয় পেরিটোনিয়াম। এই আবরণের আর একটা ভাঁজ ভিতরের যন্ত্রের কোনটার একদিক, দুদিক বা তিনদিকে, কোনটার বা সবদিকে লেগে থাকে। পেটের ভিতরের যন্ত্রের সঙ্গে পেরিটোনিয়ামের যে ভাঁজটা লেগে থাকে তার দরুণ অধিকাংশ যন্ত্রই দেয়ালে লেগে থাকতে বাধ্য হয়। কেবল কয়েকটা, নোঙর করা জাহাজের মত সামান্য নড়াচড়ার স্বাধীনতা পায়। পেটের ভিতর যে সব যন্ত্র এভাবের স্বাধীনতা পেয়ে থাকে তাদের মধ্যে ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্য (জেজুনাম) ও শেষ ভাগের (ইলিয়াম) নাম উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া বৃহদন্ত্রের প্রথম ভাগের প্রথম অংশ (সিকাম), দ্বিতীয় ভাগ এবং শেষ ভাগের মধ্যম অংশও (সিগ্‌ময়েড) খানিকটা নড়াচড়া করতে পারে। আর পেরিটোনিয়ামের একটা অংশ (গ্রেটার ওমেণ্টাম), যেটা পাকস্থলীকে ঢেকে চাদরের মত অন্ত্রের সামনে ঝুলে পড়ে, তার তো অবাধ স্বাধীনতা! পাকস্থলীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা না থাকলে সেটা বোধ হয় পেটের সর্বত্রই ঘুরে বেড়াতো।

পেটের দেয়ালের সামনের এবং পাশের দিকে পেরিটোনিয়ামের বাইরেই রয়েছে পাত্‌লা চর্বির আবরণ; তারপরে একটা আড়াআড়ি পর্দা (ফ্যাসা ট্রান্সভারস্যালিস) থাকে। তার বাইরে পর পর আছে তিনটি পেশী। পিছন এবং নীচের দেয়ালও একই রকম, কেবল পর্দার নামটা আলাদা। উপরের দেয়ালে আর পর্দাটা থাকে না। পেরিটোনিয়ামের পরেই উদর ও বক্ষ প্রভেদকারী একটা পেশী আছে। একে বলা হয় ডায়াফ্রাম।

এবারে হার্নিয়ার কথায় আসা যাক। হার্নিয়া বহুরকমের হয়। তার মধ্যে প্রধান কয়েকটা হলো—

(১) কুঁচকি প্রদেশের (ইঙ্গুইন্যাল) হার্নিয়া। এই হার্নিয়া আবার দু-রকমের—সরল (ডাইরেক্ট) ও তির্যক (ইন্‌ডাইরেক্ট)

(২) উরুশীর্ষের হার্নিয়া (ফিমোরাল)

(৩) নাভির (আম্‌বিলিক্যাল) হার্নিয়া।

(৪) উদর ও বক্ষ প্রভেদকারী পেশীর (ডায়াফ্রাগ্‌মেটিক) হার্নিয়া।

এর মধ্যে কুঁচ্‌কি প্রদেশের হার্নিয়াই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেন না, হার্নিয়া অধিকাংশই এই স্তরের। তাই সাধারণ লোকে হার্নিয়া বলতে কেবল এটাই বোঝে। পেট আর উরু যেখানে মিলেছে, সেই কুঁচ্‌কির প্রায় আধ ইঞ্চি উপরে আছে একটা সুরঙ্গ। এটাই উদর-গহ্বর থেকে অণ্ডকোষের থলিতে যাবার পথ। সুরঙ্গ হলেও এটা ঠিক নলের মত নয়। তাহলে তো জন্মাবার পরক্ষণেই পেটের যা কিছু সেই থলিতে গিয়ে ঢুকতো! সুরঙ্গ পথের সামনের এবং পিছনের দেয়াল পরস্পর লেগে থাকে। কুঁচকি প্রদেশের এই সুরঙ্গ পথকে ইংরেজীতে বলে ইঙ্গুইন্যাল ক্যানাল।

ছবিটা হচ্ছে শরীরের বাম অর্ধেকের তলপেট ও উরুর সংযোগস্থলের কাছাকাছি খানিকটা অংশের দৃশ্য। দেখা যাচ্ছে সামনে থেকে। চ হচ্ছে বাম উরু। ৩নং থেকে ৪নং পর্যন্ত যে মোটা কালো রেখাটা দেখা যায় ওকে বলে কুঁচ্‌কি প্রদেশের বন্ধনী (ইঙ্গুইন্যাল লিগামেণ্ট)। তার উপরে ১ ও ২ নম্বরে দুটা আংটির মত দেখা যায়। এই আংটি দুটা হচ্ছে কুঁচ্‌কির সুরঙ্গের দুটা মুখ। এবার পেটের সামনের দেয়ালের কথা বলছি। পেরিটোনিয়ামের বাইরেই যে আড়াআড়ি পর্দাটার কথা বলা হয়েছে, ছবির ক-চিহ্নিত ২ নং ছিদ্রটা (ইণ্টারন্যাল রিং) ওরই। ওর সামনে রয়েছে

খ-চিহ্নিত উদরের আড়াআড়ি পেশী (ট্র্যান্সভারস্যাস অ্যাব্‌ডোমিনিস)। তার সামনে গ চিহ্নিত অন্তস্থ তির্যক পেশী (ইণ্টারন্যাল অব্‌লিক)। এর সামনে আছে ঘ-চিহ্নিত বহিস্থ তির্যক পেশী (এক্সটারন্যাল অব্‌লিক)। ১ নং ছিদ্রটা (এক্সটারন্যাল রিং) এতেই রয়েছে।

দেখা যাচ্ছে কেবল ক আর ঘ—এই দুটা স্তরই তলপেটটাকে পুরাপুরি ঢেকে রাখে (কেবল ছিদ্র দুটা বাদে)। খ পেশীর নীচের অংশ ২নং রিং-এর উপর দিয়ে এগিয়ে ১নং রিং-এর পাশে এবং পিছনে হাড়ের সঙ্গে মিশে যায়। তাই কুঁচ্‌কির

বন্ধনী আর এর মাঝে একটা ফাঁক থেকে যায়। গ-চিহ্নিত পেশীর নীচের অংশ খ, ২ এবং কুঁচ্‌কির সুরঙ্গের সামনে দিয়ে খানিকটা এগিয়ে সুরঙ্গের উপর দিয়ে খ-এর সঙ্গে একই হাড়ে গিয়ে মিশে। খ আর গ-এর এই মিশ্র অংশটা খুব মজবুত। এর নাম কনজয়েণ্ট টেনডন। সুরঙ্গের সামনে থাকে ঘ আর গ-এর খানিকটা, পিছনের দেয়ালে থাকে ক, আর কন্‌জয়েণ্ট টেন্‌ডন। উপরে থাকে খ ও গ-এর পেরিয়ে যাওয়া বাঁকা আঁশগুলি, আর নীচে থাকে কুঁচকির বন্ধনী। আগেই বলেছি, এটা শক্ত নলের মত নয়। নামে সুরঙ্গ হলেও পিছনের দেয়াল সামনের দেয়ালে এমনভাবে ঠেসে থাকে যে, ওর সুরঙ্গত্বই ঘুচে যায়। এবার কুঁচ্‌কির তির্যক হার্নিয়া সম্বন্ধে বলছি। এটা ঐ সুরঙ্গ দিয়েই নেমে আসে অণ্ডকোষের দিকে। গর্ভস্থ শিশুর টেষ্টিস থাকে পেটের ভিতরে পিছনের দেয়ালে, মূত্রাশয়ের (কিড্‌নি) ঠিক নীচে। টেষ্টিসের নিম্নপ্রান্ত থেকে যে দড়ির মত জিনিষটা (গুবার্নাকুলাম) ঝুলে থাকে তারই অপর প্রান্ত কুঁচ্‌কির সুরঙ্গ দিয়ে গিয়ে লাগে ভাবী অণ্ডকোষের ত্বকে। দু-এক মাস করে বয়সও যত বাড়ে গুবার্নাকুলাম নীচের দিক থেকে ততই আস্তে আস্তে টান মারতে থাকে। এই কাজে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির রস খুবই সহায়ক। এই টানের ফলে গর্ভমধ্যে থাকাকালীন ছ'মাস বয়সেই টেষ্টিস অন্তস্থ ছিদ্র পর্যন্ত এসে যায়। তারপর সাত আট মাসে জন্মাবার আগেই সুরঙ্গ পেরিয়ে অণ্ডকোষে পৌঁছে যায়। কিছুদিন বাদেই গুবার্নাকুলাম মিলিয়ে যায়। স্ত্রীলোকের বেলায় গর্ভাশয়ও (ওভারী) অমনি ভাবেই নেমে আসে, কিন্তু আশ্রয় নেয় তলপেটে। টেষ্টিস অবতরণের ফলে সুরঙ্গটা সুন্দর-ভাবে তৈরী হয়ে যায়। তবে অবতরণের আগে পেরিটোনিয়ামের একটা অংশ লম্বা বেলুনের মত (প্রোসেসাস ভ্যাজাইন্যালিস্‌) ঝুলে পড়ে অণ্ড-কোষের ভিতরে এবং পরে টেষ্টিসকে পেতেই চাদরের মত ঘিরে ধরে সামনে থেকে। কিছুদিন বাদেই টেষ্টিসের (চিত্রে ঙ) উপরের দিকে বেলুনের মত অংশটা (চিত্রে জ) বুজে যায়। থাকে শুধু ওর তিন দিকের চাদরের মত অংশটা (চিত্রে ছ)।

কিন্তু কখনও কখনও উপরের অংশটা বুজে যায় না। আগেই বলেছি, পেটের ভিতরে ক্ষুদ্রান্ত্র এবং বৃহদন্ত্রের কতকাংশ ও গ্রেটার ওমেণ্টামের বেশ খানিকটা নড়াচড়ার ক্ষমতা আছে। তাই দৈবাৎ এদের একটা বা একাধিক অংশ কুঁচ্‌কির সুরঙ্গের মধ্যে ঢুকে উন্মুক্ত প্রোসেসাস ভ্যাজাই-ন্যালিসের মধ্যে নেমে আসতে পারে। একেই বলে সহজাত তির্যক কুঁচ্‌কির হার্নিয়া। এক্ষেত্রে প্রোসেসাস্‌কে বলে হার্নিয়ার আধার (স্যাক্‌)। কখনও কখনও জ অংশটা একবার বুজে গিয়েও ফের উন্মুক্ত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে বলা হয় অর্জিত তির্যক হার্নিয়া।

কুঁচ্‌কির সুরঙ্গ তো সবারই আছে, কিন্তু সবারই হার্নিয়া হয় না। সুরঙ্গটা বাঁকা ভাবে বসানো থাকায় একটা ছিদ্র অন্যটার ঠিক উল্টাদিকে নয়। তাই পেটের ভিতর থেকে যখন চাপ আসে তখন ছিদ্র দুটি সামনের এবং পিছনের দেয়াল দিয়ে আপনিই বন্ধ হয়ে যায় এবং সুরঙ্গত্বও একেবারে ঘুচে যায়। তাই ভিতরের যন্ত্রাদি বেরুতে পারে না। কিন্তু কতকগুলি অসুখে, বিশেষতঃ কোষ্ঠকাঠিন্য, পুরনো কাশি, প্রস্রাবে ক্লেশবোধ এবং অতিরিক্ত ভারোত্তলনের কাজ (যাতে থেকে থেকেই বার বার পেটের ভিতরের চাপ বাড়ে কমে) প্রভৃতি ব্যাপারে দৈবাৎ কোন যন্ত্র সুরঙ্গ পথে চলে আসতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই এই ধরণের একটা ইতিহাস রোগীর কাছ থেকে পাওয়া যায়। যন্ত্রটা যখন বাইরের ছিদ্রটার (১নং) ভিতরে থাকে, অর্থাৎ সুরঙ্গের প্রায় শেষ পর্যন্ত আসে তখন বলা হয় অসম্পূর্ণ এবং যখন বাইরের ছিদ্র পেরিয়ে অণ্ডকোষে চলে যায় তখন বলা হয় সম্পূর্ণ হার্নিয়া। এ অসুখটা শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্তই বেশী হয়।

সরল কুঁচ্কির হার্নিয়া হয় যখন পেটের পেশীর জোর কমে যায়, অর্থাৎ বেশীর ভাগই ৪০ বছরের উপরে। কুঁচ্কির সুরঙ্গের পিছনের দেয়ালটা পেটের ভিতরের বেশী চাপে ফেটে গেলে ভিতরের যন্ত্র বেরিয়ে আসে সামনে পেরিটোনিয়ামের একটা আবরণ নিয়ে। একেই বলে এই হার্নিয়ার স্যাক্। ছবিটা দেখলেই ভাল বুঝা যাবে। যন্ত্রটা আরও এগিয়ে আসে এবং কুঁচ্কির বন্ধনী ও গ-চিহ্নিত পেশীর মাঝখানের ফাঁক দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসে চামড়ার নীচে ২নং স্তর পর্যন্ত। এই হার্নিয়া দাঁড়ালেই বেরিয়ে আসে, আবার শুয়ে পড়লেই চলে যায়। নিজে না গেলে সামনে থেকে চাপ দিলেই ঢুকে যায়। তির্যক হার্নিয়ার বেলায়ও হাঁচি-কাশিতে কিম্বা আরও পুরানো যখন হয় তখন দাঁড়ালেই বেরিয়ে আসে। আবার শুয়ে পড়লেই অনেক ক্ষেত্রে ভিতরে চলে যায়। সময় সময় দেখা যায় হার্নিয়া ভিতরে ঢোকাতে রোগীরাই ডাক্তারের চেয়ে বেশী দক্ষ। কারণ তাদের অভ্যাস হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সামনে থেকে ধাক্কা মারলে হবে না। ১নং ছিদ্রের ভিতর দিয়ে এমন ভাবে সুরঙ্গে ঢোকাতে হবে যাতে যন্ত্রটা একেবারে পেটের ভিতর ঢুকে যেতে পারে। এবার বাইরে থেকে ২নং ছিদ্রে আঙুলের চাপ দিয়ে রাখলে কোন মতেই তির্যক হার্নিয়া নেমে আসতে পারে না। সব সময় এই চাপ রাখবার জন্যেই ট্রাস্ ব্যবহার করা হয়। যে সব হার্নিয়া সহজেই ভিতরে ঢোকানো যায়, সে সব ক্ষেত্রেই ট্রাস ব্যবহার করা চলে।

অনেক রোগীর ক্ষেত্রেই দেখা যায়, হার্নিয়া দিব্যি উঠছে-নামছে। কিন্তু মুস্কিল হয় তখন যখন নেমে আর ওঠে না। এমনিতে যন্ত্রণা না হলেও যদি একবার নীচে আটকা পড়ে তাহলে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা হয়। শুধু তাই নয়, আটক অবস্থায় ফুলে গরম হয়ে ওঠে। কোন কোন ক্ষেত্রে কোষ্ঠ একদম বন্ধ হয়ে যায়। আরও খারাপ যেসব কেস্ তাতে আটক যন্ত্রটার রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে যায়। টন্‌টন্ করে, বমি হয়, কোষ্ঠ বন্ধ হয়ে যায়, রোগী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে থাকে। যেসব ক্ষেত্রে ভিতরে ঢোকাবার কোন চেষ্টাই করা যায় না অথবা করেও লাভ হয় না, সে সব ক্ষেত্রে আর দেরী না করে অপারেশনের জন্যে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া দরকার। কোন কোন ক্ষেত্রে মৃত্যুও ঘটতে পারে।

এবার উরুশীর্ষের হার্নিয়ার কথা বলছি। এটা মেয়েদেরই বেশী হয়, কেন না এটা যে সুরঙ্গ দিয়ে নামে (ফিমোরাল ক্যানাল—চিত্রে অ) সেটা পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের বেশী চওড়া। আরও একটা কারণ হচ্ছে এই যে, বার বার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ায় পেটের পেশীগুলিও দুর্বল হয়ে পড়ে; কিন্তু কুঁচ্কির হার্নিয়ার বেলায় ঠিক উল্টা। ওটা পুরুষের বেশী হয় কেন না, কুঁচ্কির সুরঙ্গ পুরুষের বেশী চওড়া। পেটের দেয়ালে যে আড়াআড়ি পর্দার (ক) কথা বলা হয়েছে, সেটা কুঁচ্কির বন্ধনীর নীচ দিয়ে উরুশীর্ষের শিরা ও ধমনীর (আ) সামনে দিয়ে এসে নামে। সেগুলির নীচে যে তিনটি পেশী থাকে তাদের ঢেকেও থাকে একটা পর্দা (ইলিওপেক্‌টিনিয়্যাল ফ্যাসা)। পাশের দিকে এই দুটি পর্দা আ-এর পাশেই একসঙ্গে জুড়ে যায়। কিন্তু অন্যদিকে (অণ্ডকোষের দিকে) পর্দা দুটা একটু দূরে গিয়ে মিশে। তাই মাঝখানে তৈরী হয় এই সুরঙ্গ (অ)। এই সুরঙ্গ দিয়ে যখন কিছু ঠেলে বেরোয় তখন বোঝা যায়, হার্নিয়া হয়েছে। প্রথম অবস্থায় এই হার্নিয়ার আধারে কিছুই থাকে না। কেবল তার মাথায় কতকটা চর্বি এগিয়ে আসে। কিন্তু রোগ যতই পুরনো হতে থাকে ততই ভিতরের যন্ত্রও নেমে আসতে পারে। যে ক্ষেত্রে ভিতরে ঢোকানো যায় সে ক্ষেত্রে ট্রাস ব্যবহার করা চলে, অন্যথায় অপারেশন করে নেওয়াই ভাল।

এবার নাভির হার্নিয়ার কথা বলছি। বাচ্চাদের

মধ্যে কারুর কারুর নাভিটা বেশ খানিকটা বড় ও ঝুলানো থাকে। টিপলে চুপ্‌সে যায়, আবার কাঁদলেই ফুলে ওঠে। নাভির হার্নিয়ার জন্যে এরকম হয়। কারণ হচ্ছে—কখনও কখনও জন্ম থেকে পেটের সামনের দেয়ালে ত্রুটি থাকে। আবার কখনও হয় জন্মাবার পর নাড়ী কাটবার দিন চারেকের মধ্যেই। কাটা জায়গাটা শুকিয়ে যায়, কিন্তু পরে ৩।৪ মাস বয়সেই সেখানে একটা ছিদ্রের সৃষ্টি হয় এবং সেখান দিয়েই হার্নিয়া বেরোয়। চওড়া বেল্ট বাঁধলে কাজ চলে যায়, কিন্তু অপারেশন করে নেওয়াই ভাল।

উদর ও বক্ষ প্রভেদকারী পেশীর হার্নিয়ায় পেটের ভিতরের যন্ত্র পেশীর ভিতরের সহজাত অথবা অর্জিত ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বক্ষগহ্বরে ঢুকে যায়। সহজাত ছিদ্রগুলি কারুর কারুর জন্ম থেকেই থাকে। অর্জিত ছিদ্র তৈরী হয় কোন আঘাতের ফলে, পেশী ফুটো হয়ে। অন্যান্য হার্নিয়ার সঙ্গে এর তফাৎ হচ্ছে এই যে, এতে কোন আধার (স্যাক) থাকে না। আর যে যন্ত্রটা সাধারণতঃ বেরিয়ে যায়, সে হচ্ছে পাকস্থলীর অংশ বা সবটাই। ছিদ্রটা খুব বড় হলে আরও অনেক কিছু ঢুকে যেতে পারে। ফলে ভাত গিলতে, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। অসহ্য যন্ত্রণায় জীবনান্তও হতে পারে। অপারেশনেই এর প্রতীকার হতে পারে।

এছাড়া আরও বহুরকমের হার্নিয়া আছে; যেমন—ইন্‌সিশন্যাল, এপিগ্যাষ্ট্রিক, লাম্বার, সায়াটিক, অব্‌টুরেটর, পেরিনিয়্যাল ইত্যাদি। এগুলি অবশ্য কদাচিৎ দেখা যায়।

বিজ্ঞান সংবাদ

রক্তের লঘু চাপজনিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার অভিনব উপায়

যাঁহারা রক্তের লঘু-চাপ রোগে ভুগিতেছেন তাঁহাদের সাধারণ কাজের চাপেই হঠাৎ জীবন বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে। রোগী যতক্ষণ শয়ন করিয়া থাকে ততক্ষণ ভালই থাকে, কিন্তু হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইবা মাত্র—এমন কি, শয্যা হইতে উঠিয়া বসিবা মাত্র রক্তের চাপ আরও হ্রাস পাইবার ফলে তৎক্ষণাৎ জ্ঞান হারায়। ঐ অবস্থায়, অর্থাৎ রোগী উঠিয়া বসিবার সময় দেহের নিম্নাংশের ক্ষুদ্র ধমনীগুলির যথোপযুক্ত সঙ্কোচনের অক্ষমতায় হৃৎপিণ্ডের ভিতরে রক্তের পুনরাবর্তন ব্যাহত হয়। এইরূপ বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একপ্রকার দীর্ঘ স্থিতিস্থাপক অন্তর্বাস উদ্ভাবিত হইয়াছে। দেহের নিম্নাংশ স্থিতিস্থাপক আবরণের চাপে থাকিবার ফলে রোগী উঠিয়া দাঁড়াইবার সময় রক্তের চাপের হ্রাস নিবারিত হয়।

ডারহামের ডিউক ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের ডাঃ হার্বার্ট প্রমুখ কতিপয় বিজ্ঞানী এই পোষাক উদ্ভাবন করিয়া পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল পাইয়াছেন বলিয়া বিবৃতি দিয়াছেন।

ধূমপানে ফুস্‌ফুসের ক্ষতি

নিউ ইয়র্কের ন্যাশন্যাল টিউবারকিউলোসিস অ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় ডাঃ অ্যাটিংগার বলেন যে, ধূমপানের সময় বাতাসের পরিমাণ ফুস্‌ফুসের মধ্যে অল্প প্রবিষ্ট হইলেও শরীর সুস্থ থাকিলে শ্বাসক্রিয়ার কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু হৃৎপিণ্ড বা ফুস্‌ফুসের কোন রোগ থাকিলে ধূমপানের ফল খুবই ক্ষতিকর হয়। ইহাতে শ্বাসক্রিয়ার স্থায়ী অবনতিও ঘটিতে পারে।

বিজ্ঞানীরা বিশেষ একপ্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্র ব্যবহার করিয়া সিগারেট খাইবার পূর্বে এবং পরে সুস্থ ও রোগগ্রস্ত ব্যক্তির শ্বাসপ্রশ্বাসের অবস্থা, যেমন—ফুস্‌ফুসের মধ্যে বাতাস প্রবেশের বেগ ও উহার চাপ নির্ধারণ করেন।

ফুস্‌ফুসের স্থিতিস্থাপকতাই শ্বাসক্রিয়ার যান্ত্রিক রহস্যের মূল। উহার কাঠিন্য বর্ধিত হইলে ফুসফুসে বাতাসের পরিমাণও হ্রাস পায়। দেহের শ্বাসক্রিয়া চালাইবার জন্য কিছু পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে। ফুস্‌ফুসের কাঠিন্য ও নমনীয়তার উপর এই শক্তিক্ষয় নির্ভর করে, অর্থাৎ কাঠিন্য বৃদ্ধি পাইলে শ্বাসক্রিয়া চালইবার জন্য অধিক পরিমাণে শক্তি ব্যয়িত হইতে থাকে। আবার শ্বাসক্রিয়ায় অধিক শক্তি প্রযুক্ত হইলে দেহের অন্যান্য কার্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজনানুরূপ শক্তি সরবরাহের অপ্রতুলতা ঘটে।

ধূমপানের পর সুস্থ ব্যক্তির শ্বাসক্রিয়ার কোনরূপ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু রোগীদের পক্ষে নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস উভয় ক্ষেত্রেই শক্তি ক্ষয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় বলিয়া দেখা গিয়াছে এবং নিঃশ্বাস অপেক্ষা প্রশ্বাসেই ইহার প্রকোপ অধিকতর প্রকাশ পায়।

এন্‌জাইম প্রয়োগে হাঁপানির উপশম

লরেন্স কুইংলি মেমোরিয়্যাল হাসপাতালের অ্যালার্জি বিভাগের ডাঃ সিলবার্টের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, এন্‌জাইম ট্রিপসিন প্রয়োগে কয়েক প্রকার হাঁপানি রোগীর কষ্ট অনেকাংশে প্রশমিত হইয়াছে।

ঐ রাসায়নিক পদার্থটির প্রয়োগে রোগীর কণ্ঠনালী হইতে ঘন আঠালো শ্লেষ্মা বাহির হইয়া আসে এবং তাহাতেই রোগী শান্ত হয়। রোগীর ফুস্‌ফুসের এক্স-রে ছবি হইতেও প্রতীয়মান হয় যে, হাঁপানির জন্য ফুস্‌ফুসে যে সব স্থায়ী ক্ষতি সাধিত হয় বলিয়া জানা আছে, ট্রিপসিন প্রয়োগে সেগুলিরও অনেক উপশম হয়।

ট্রিপসিন হইল প্যাংক্রিয়াস হইতে উৎপন্ন একটি জারক এন্‌জাইম। ইহা প্রোটিনকে বিশ্লেষিত করে। দেহের কোন স্থানের আঘাতজনিত যন্ত্রণা বা স্ফীতি নিরাময়ে ট্রিপসিনের ব্যবহার বর্তমানে প্রচলিত হইয়াছে। ট্রিপসিন হইতে উৎপন্ন আর একটি ঔষধও আঘ্রাণ করিয়া হাঁপানি রোগীর কণ্ঠনালীর উপরের অংশ পরিষ্কার হয় বলিয়া জানা আছে। ডাঃ সিলবার্ট রোগীর দেহে ট্রিপসিন ইনজেকসন করিয়া বেশ সন্তোষজনক ফল পাইয়াছেন। পঁচিশ জন পুরাতন হাঁপানি রোগীর এই চিকিৎসার ফলে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গিয়াছে। ঔষধটির পূর্ণ মাত্রা ব্যবহার করিতে হইলে প্রথম পাঁচ দিন প্রত্যহ একটি করিয়া ইনজেকসন করিতে হয়। পরে দুই সপ্তাহ যাবৎ একদিন অন্তর একটি করিয়া ইনজেকসন এবং শেষেরটি হইল আরও এক সপ্তাহ পরে এক মাত্রা। যে সকল রোগীদের এই ঔষধের দ্বারা চিকিৎসা করা হয় তাহারা সকলেই প্রায় সাত বৎসর বা আরও অধিক দিন যাবৎ হাঁপানিতে ভুগিতেছিলেন।

উদ্ভিদ-হর্মোন প্রয়োগে বামন-ভুট্টার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত

ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটিতে এক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, নবাবিষ্কৃত একপ্রকার উদ্ভিদ-হর্মোন প্রয়োগে বামন-ভুট্টা গাছের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হইয়া উহা আবার সাধারণ আকার ধারণ করে। পরিব্যক্তির ফলেই সাধারণ ভুট্টা গাছ হইতে বামন-ভুট্টার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

ফিউসারিয়াম মনোলিফর্ম নামক একপ্রকার ছত্রাক হইতে সম্প্রতি একরকম নূতন হর্মোন নিষ্কাশিত হইয়াছে। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে গিবারিলিক অ্যাসিড। ডাঃ ফিনে বামন-ভুট্টার চারাগাছের উপর এই হর্মোন প্রয়োগ করিয়া

দেখেন যে, ইহাতে বামন-জাতীয় গাছগুলি দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সাধারণ গাছে রূপান্তরিত হয়। ছয়টি বিভিন্ন জাতীয় বামন-ভুট্টার চারা অবস্থায় ঐ হর্মোন প্রয়োগ করাতে উহাদের মধ্যে চারিটি সাধারণ ভুট্টার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে; অপর দুইটির কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই।

ডাঃ ফিনে বলেন যে, হর্মোন প্রয়োগে সাড়া দিবার ক্ষমতা উদ্ভিদের একটি মাত্র জিনের বিশেষত্বের উপর নির্ভরশীল। চারিটির উপর সক্রিয়তা এবং দুইটির উপর নিষ্ক্রিয়তা হইতে বুঝা যায় যে, গাছগুলির বামনত্বের কারণও বিভিন্ন, অর্থাৎ বিভিন্ন জিনের বৈশিষ্ট্য বামনত্ব আনয়ন করে। এই সম্বন্ধে আরও গবেষণা চলিতেছে।

রোগীকে সম্মোহিত করিয়া ফুস্‌ফুসে অস্ত্রোপচার

শিকাগোর আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় ডাঃ মারমার প্রকাশ করেন যে, রোগীকে সম্মোহিত করিয়া ফুস্‌ফুসে অস্ত্রোপচার সর্বপ্রথম সম্পন্ন হইয়াছে।

পঁচিশ বৎসর বয়স্কা এক স্ত্রী-রোগীর ফুস্‌ফুসে টিউমার হইয়াছিল। তাহাকে গভীরভাবে সম্মোহিত করিয়া অস্ত্রোপচার আরম্ভ করা হয় এবং প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাল অস্ত্রোপচার চালাইবার সময়েও সম্মোহনকারী রোগীকে ক্রমাগত সম্মোহন-নির্দেশ দিতে থাকেন। সম্মোহনকারীর সমস্ত আদেশই রোগী পালন করিয়াছিল, কেবল নিঃশ্বাস বন্ধ করিতে বলায় সে তাহা পালন করিতে পারে নাই। এই জন্য একপ্রকার ঔষধ প্রয়োগে তাহার শ্বাসক্রিয়া ৪৫ মিনিট যাবৎ স্তিমিত করিয়া রাখা হয়। এক সপ্তাহ পরে সেই রোগী সুস্থদেহে বাড়ী ফিরিয়া যায়।

ডাঃ মারমার বলেন যে, সম্মোহনকারী শিল্পী যদি বেশ পারদর্শী হয় তবে সম্মোহিত অবস্থায় অস্ত্রোপচার করাই সর্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট। ইহাতে রোগীর পক্ষে বিপত্তি ঘটিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। অস্ত্রচিকিৎসার পূর্বে রোগীর মনে ভয়ের উদ্রেক হয় না এবং চিকিৎসার পরেও রোগী বেশ শান্ত থাকে। আর একটি সুবিধা এই যে, ইহাতে রোগীর দেহে রক্ত চলাচল, শ্বাসক্রিয়া বা লিভার ও কিড্‌নীর স্বাভাবিক ক্রিয়ার উপর কোন অতিরিক্ত চাপ পড়ে না।

তবে বিভিন্ন রোগীর উপর সম্মোহনের প্রভাব বিভিন্ন। সাধারণের মধ্যে তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী এবং কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তিরা সম্মোহনের পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত। শিশুরা স্বভাবতঃই কল্পনাপ্রবণ; সেই জন্য তাহারা খুব সহজেই সম্মোহিত হয়। তবে রোগীকে সম্মোহিত করিলেই যে সে কলের মানুষের মত সকল নির্দেশ মানিবে, এমন না হইতেও পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে সে হয়তো আদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারে। আবার তাহার অবস্থা সহ্যশক্তির বাহিরে গেলে তাহার আবেশের ভাব কাটিয়া যাইবারও সম্ভাবনা আছে।

সম্মোহিত করিয়া অস্ত্রোপচার করিবার পক্ষে একমাত্র অসুবিধা এই যে, ইহাতে বড় বেশী সময় লাগে। কিন্তু ইহার যে সব সুবিধা আছে তাহা বিবেচনা করিলে এই অসুবিধা তেমন কিছুই নহে।

স্বয়ংক্রিয় টাইপ-রাইটার

ভবিষ্যতে টাইপ করিবার জন্য আর টাইপিষ্ট নিযুক্ত না করিলেও চলিবে। প্রতিষ্ঠানের কর্তা শ্রুতিলিখন টাইপ-রাইটারের সম্মুখে তাঁহার বক্তব্য বলিলেই উহাতে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় টাইপ করা সম্পন্ন হইবে।

আমেরিকার অ্যাকোষ্টিক্যাল সোসাইটির এক সভায় ডাঃ অলসন এবং ডাঃ বেলার ঐরূপ এক স্বয়ংক্রিয় টাইপ-রাইটারের বিষয় বর্ণনা করেন। ঐ ধরণের একটি নমুনা যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে। ইহাতে দশটি সচরাচর প্রচলিত ইংরেজি অক্ষর সন্নিবেশিত আছে; যেমন—are, see, a ইত্যাদি। উহার

সম্মুখে কথা বলিলে শতকরা ৮০ ভাগ নির্ভুল টাইপ করা হয়। ডাঃ অলসন বলেন যে, সাধারণ সেক্রেটারি ইহা অপেক্ষা নির্ভুল টাইপ করিতে পারে না।

ঐ ধরণের অপর একটি যন্ত্রের সম্বন্ধে এক বিবৃতিতে ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির ডাঃ চাও শব্দের শ্রুতি সম্বন্ধে বিচার করেন। তিনি বলেন যে, প্রথমে শব্দটিকে শ্রুতিগতভাবে বিশ্লেষিত করিয়া উহাকে আলোক তরঙ্গে রূপান্তরিত করা হয়। শেষের ব্যবস্থাটি হইল, ঐ শক্তির সাহায্যে টাইপ-রাইটারের প্রয়োজনীয় অংশগুলিকে উত্তেজিত করিয়া চালানো।

প্লীহা-নিঃসৃত রক্তের সাহায্যে তেজস্ক্রিয় রশ্মিজনিত ক্ষতি নিবারণ

ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভারসিটির রেডিও-লজিক্যাল রিসার্চ লেবোরেটরির ডাঃ ক্রস প্রমুখ কয়েকজন বিজ্ঞানী প্রকাশ করেন যে, প্লীহা হইতে নিঃসৃত টাট্‌কা রক্তের প্লাজমা প্রয়োগে তেজস্ক্রিয় রশ্মিজনিত দৈহিক ক্ষতি প্রতিরোধ করা সম্ভব।

বিজ্ঞানীরা খরগোস লইয়া এই বিষয়ে পরীক্ষা করেন। সরাসরি প্লীহা হইতে সংগৃহীত রক্ত সেণ্ট্রিফিউজ করিয়া উহা হইতে রক্তের কোষগুলি পৃথক করিলে প্লাজমা পাওয়া যায়। কতকগুলি খরগোসকে ১০০০ রয়েণ্টগেন এক্স-রে প্রয়োগ করিবার পর যত শীঘ্র সম্ভব ঐ প্লাজমা ইনজেকসন করা হয়। ত্রিশ দিন পরে দেখা যায় যে, প্লাজমা প্রয়োগের ফলে শতকরা ২৪টি খরগোস বাঁচিয়া থাকে; কিন্তু বিনা চিকিৎসায় রক্ষিত জন্তুগুলির মধ্যে মাত্র শতকরা ৪ টিকে বাঁচিয়া থাকিতে দেখা যায়।

ইতিপূর্বে দেখা গিয়াছিল যে, দেহের প্লীহার উপরিভাগ উপযুক্ত আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে এক্স-রে প্রয়োগে দেহের কোন ক্ষতি হয় না। ইহা হইতেই অনুমিত হয় যে, প্লীহার মধ্যে তেজস্ক্রিয়তা প্রতিরোধক কোন পদার্থ উৎপন্ন হয়। কাজেই প্লীহা-নিঃসৃত রক্তের মধ্যে ঐ পদার্থ থাকা খুবই সম্ভব। এই অনুমান সত্য কিনা তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য উক্ত পরীক্ষা করা হয়।

মদ্য প্রস্তুতের কারখানা হইতে পারমাণবিক শক্তির উপাদান

সুইডেনের মদ্য প্রস্তুতের কারখানার এক উদ্বৃত্ত দ্রব্য পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনকারীদের খুব কাজে লাগিতে পারে বলিয়া জানা গিয়াছে। সুইডেনের তিনজন বিজ্ঞানী তাঁহাদের বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, বালির দানার ভিতর দিয়া চুয়াইয়া সাধারণ জল হইতে ভারী জল পৃথক করা সম্ভব।

বালি হইতে সণ্ট প্রস্তুত করিবার সময় দানাগুলি অনেক পরিমাণে জল শোষণ করে। ষ্টকহোমের ডাঃ কার্লবম প্রমুখ তিনজন পদার্থবিদ বালি হইতে চুয়ানো জল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ওখানকার কলের জল অপেক্ষা বালির জলে ভারী জলের পরিমাণ অধিক।

দুইটি কারণে ইহা ঘটা সম্ভব—বালির দানাগুলি সাধারণ জল হইতে কেবল হাল্কা অংশ আত্মসাৎ করিবার ফলে ঐ জলে ভারী জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়; কিংবা চুয়ানোর সময় বালির দানাগুলি হাল্কা জল শোষণ করিয়া উহার ভিতরে সঞ্চিত ভারী জল বাহির করিয়া দিতে থাকে। যে উপায়েই ইহা ঘটুক না কেন, ভারী জল একটি মূল্যবান সামগ্রী। সুইডেনের বিজ্ঞানীরা এই উপায়ে কি ভাবে অধিক পরিমাণে ভারী জল সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতেছেন।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

সূর্য কি নিবে যাবে?

শ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীর বুকে জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্যে নিরন্তর তাপশক্তির প্রয়োজন, আর সে প্রয়োজন মেটাবার জন্যে পৃথিবীকে সূর্যের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, কেমন করে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর ধরে সূর্য তার বিপুল তাপ শক্তির ভাণ্ডার অক্ষুণ্ণ রেখেছে?

এই প্রশ্ন বৈজ্ঞানিকদের বিচলিত করে তুলেছে চিরকাল। বর্তমানে সূর্য থেকে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১২৫×১০^১৪ (সংখ্যায় প্রকাশ করলে ১২৫ এর পর ১৪টি শূন্য লিখতে হবে) টন কয়লা পোড়ানোর সমান উত্তাপ পৃথিবীতে এসে পৌঁছুচ্ছে। তাহলে পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে আজ অবধি (যা ২০০ থেকে ৩০০ কোটি বছরের মধ্যে পড়ে) যে পরিমাণ উত্তাপ পৃথিবীতে এসে পৌঁচেছে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫×১০^২৪ টন কয়লা পুড়িয়ে পাওয়া উত্তাপের সমান, যা দিয়ে সের দুই জলকে প্রায় ১০^৩২ (একের পিঠে বত্রিশটা শূন্য) ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড অবধি উত্তপ্ত করা যেতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে সূর্যের সৃষ্টি থেকে আজ অবধি যে পরিমাণ উত্তাপ বিকিরিত হয়েছে উল্লিখিত পরিমাণের চেয়ে তা বহু বহু গুণ বেশী। এখন প্রশ্ন এই যে, কেমন করে এই অপরিমেয় উত্তাপের সৃষ্টি হচ্ছে?

এর উত্তরে প্রথমেই যে কথা আমাদের মনে আসে তা হচ্ছে, তাপ সৃষ্টিকারী কোন রাসায়নিক ক্রিয়া; যেমন—কয়লা পোড়ানো, গ্যাস জ্বালানো ইত্যাদি। কিন্তু কথা হচ্ছে, এ উপায়ে যে পরিমাণ উত্তাপ পাওয়া যাবে তা আমাদের প্রয়োজনের লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের পরিচিত কোন রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে এই বিপুল পরিমাণ উত্তাপ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়।

বৈজ্ঞানিক হেল্মহোল্‌ৎজ্‌ তখন এক অভিনব মতবাদ উত্থাপিত করেন। তিনি বললেন, এই বিপুল উত্তাপের সৃষ্টি হচ্ছে সূর্যের মহাকর্ষীয় সঙ্কোচনের ফলে। কিন্তু হিসেব করে দেখা গেল, তাতে যে পরিমাণ সঙ্কোচনের প্রয়োজন তাতে মাত্র পঞ্চাশ লক্ষ বছরেই সূর্য অসীম বিস্তৃতি থেকে তার বর্তমান আয়তনে এসে পৌঁছতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কার্যক্ষেত্রে এ মতবাদ অচল।

প্রকৃতপক্ষে থার্মোনিউক্লিয়ার রিয়্যাকশন আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকেই সূর্যের তাপশক্তির উৎস সম্পর্কে সব কিছু জল্পনা-কল্পনার অবসান হয়ে গেল। কিন্তু সে প্রসঙ্গে যাবার আগে পদার্থের পারমাণবিক গঠন সম্পর্কে আমরা কিছুটা আলোচনা করবো।

বৈজ্ঞানিক ডাল্টনের মতবাদ অনুসারে প্রতিটি মৌলই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণুর সমবায়ে গঠিত। তাঁর মতবাদ অনুসারে প্রতিটি পরমাণুই অবিভাজ্য এবং রাসায়নিক ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে এরাই।

কিন্তু তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল যে, ডাল্টনের প্রস্তাব মত প্রতিটি পরমাণুই অবিভাজ্য—এ যুক্তি আর টেকে না, কেন না, তেজস্ক্রিয় পদার্থের মধ্যে সব সময়েই একটা ভাঙ্গন চলছে, যার ফলে বেরিয়ে আসছে আল্‌ফা ও বিটা কণা এবং গামা রশ্মি। এদের মধ্য আল্‌ফা কণা পজিটিভ বিদ্যুৎ-ভাবাপন্ন, বিটা কণা নেগেটিভ বিদ্যুৎ-ভাবাপন্ন এবং গামা রশ্মি বিদ্যুৎ-ধর্ম বর্জিত, অনেকটা আমাদের এক্স রে'র মত।

১৯০৮ সালে জিগার ও মার্সডেন এবং ১৯০৮ সালে রাদারফোর্ড দেখলেন, দ্রুতগতিসম্পন্ন আল্‌ফা কণাকে যদি সূক্ষ্ম ধাতব আস্তরণের মধ্য দিয়ে যেতে দেওয়া হয় তাহলে বেশীর ভাগ আল্‌ফা কণাই আস্তরণ ভেদ করে বেরিয়ে যায় বটে, কিন্তু সামান্য কয়েকটি তাদের গতিপথ থেকে ভীষণভাবে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। (১নং চিত্রে)। এখন আমরা জানি, আল্‌ফা

১নং চিত্র

কণা পজিটিভ বিদ্যুৎ-ভাবাপন্ন এবং সম বিদ্যুৎ-ভাবাপন্ন বস্তু পরস্পরকে বিপরীত দিকে ঠেলে দেয়। এথেকে রাদারফোর্ড সিদ্ধান্ত করেন যে, পরমাণুর কেন্দ্রে তার অতিক্ষুদ্র এক অংশ অধিকার করে রয়েছে কিছুটা পুঞ্জীভূত পজিটিভ চার্জ। এর নাম তিনি দিলেন নিউক্লিয়াস। প্রকৃতপক্ষে পরমাণুর গঠন সম্পর্কে তিনি যা ছবি আঁকেন তা অনেকটা আমাদের সৌরজগতের অনুরূপ। সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলি যেমন অবিশ্রান্তভাবে ঘুরে চলেছে, তার পাশে তেমনি পরমাণুর কেন্দ্রে কয়েকটা পজিটিভ কণা (প্রোটন) ও বিদ্যুৎ-ধর্ম বর্জিত নিউট্রন কণার সমন্বয়ে গঠিত নিউক্লিয়াসকে ঘিরে অবিরাম আবর্তিত হচ্ছে নেগেটিভ কণা ইলেকট্রন। যেহেতু বাহ্যতঃ প্রত্যেক পরমাণুই বিদ্যুৎ-ধর্ম বর্জিত, সেহেতু পজিটিভ ও নেগেটিভ চার্জের পরিমাণ নিশ্চয়ই সমান। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক মোজলে দেখালেন যে, কোন মৌলের স্বরূপ নির্ণয় করে তার নিউক্লিয়াসের প্রোটন-সংখ্যা। এর আগেই রাশিয়ান বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিফ দেখেছিলেন যে, বিভিন্ন মৌলকে যদি তাদের পারমাণবিক ওজন অনুসারে একটা শ্রেণীতে সাজানো যায় তাহলে দেখা যায়, একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা পেরিয়েই তাদের গুণের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। তিনি সব কয়টা মৌলকে একটা ছকে সুশৃঙ্খলভাবে সাজালেন এবং তার নাম দিলেন তিনি পিরিয়ডিক টেবল। মোজলে দেখালেন যে, কোন মৌলের নিউক্লিয়াসের প্রোটন-সংখ্যা সেই মৌলের পিরিয়ডিক টেবলে ক্রমিক সংখ্যার সমান। হাইড্রোজেন হলো সব চেয়ে হাল্‌কা মৌল। মেণ্ডেলিফ প্রবর্তিত পিরিয়ডিক টেবলে এর পরমাণু-সংখ্যা (ক্রমিক সংখ্যা) ১। তাহলে এর নিউক্লিয়াসে রয়েছে একটি প্রোটন এবং তাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে একটি মাত্র ইলেকট্রন (কারণ প্রোটন ও ইলেকট্রনের চার্জ সমান, কিন্তু বিপরীতধর্মী)। মিলিকান তাঁর অয়েল-ড্রপ পরীক্ষায় দেখালেন যে, ইলেকট্রনের ওজন খুবই কম, হাইড্রোজেন পরমাণুর $\frac{১}{১৮৪৫}$ ভাগ। অ্যাষ্টন তাঁর ভর-লিপি (mass-spectrograph) যন্ত্রে পরমাণুর ভর (স্থূল অর্থে এবার থেকে একে আমরা ওজনই বলবো) খুব সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করতে সক্ষম হন। তাতে দেখা গেল, হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন ১.৬৭৩৪×১০^{-২৪} (অথবা সংখ্যায় প্রকাশ করলে $\frac{১.৬৭৩৪}{১০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০}$) গ্র্যাম। যেহেতু ইলেকট্রনের ওজন নেই বললেই

চলে, সেহেতু প্রোটনের ওজন দাঁড়াচ্ছে ১.৬৭৩৪ × ১০⁻²⁴ গ্র্যাম। আগেই বলেছি, পরমাণুর নিউক্লিয়াস প্রোটন ও নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত এবং নিউট্রনের ওজন হচ্ছে প্রোটনের ওজনের প্রায় সমান ; অতএব কোন মৌলে নিউট্রনের সংখ্যা ওই মৌলের পারমাণবিক ওজন থেকে সহজেই নির্ণয় করা যায়।

নিউট্রন ও প্রোটনের ওজনই নিউক্লিয়াসের

$$E = mc^2$$

E হলো শক্তি, m হারানো ওজন এবং c আলোকের গতিবেগ। এখন মেণ্ডেলিফের পিরিয়ডিক টেবলে হাইড্রোজেনের পরেই হিলিয়ামের অবস্থান। হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াসে আছে একটি প্রোটন এবং তাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে একটি ইলেকট্রন। হিলিয়ামের নিউক্লিয়াসে আছে দুটি প্রোটন, দুটি নিউট্রন এবং তাদের ঘিরে
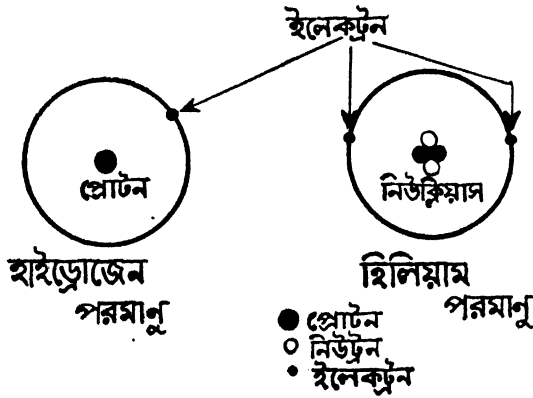
২নং চিত্র

ওজন এবং নিউট্রনের ওজন প্রোটনের ওজনের সমান। অতএব কোন মৌলের পারমাণবিক ওজন হওয়া উচিত প্রোটনের ওজনের কোন গুণক (দু গুণ, পাঁচ-গুণ, সাতগুণ ইত্যাদি)। কিন্তু কার্যতঃ অ্যাষ্টনের ভরলিপি যন্ত্রে মেপে দেখা যায় যে, ঠিক তা হয় না, কিছু কম হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই হারানো ওজনটুকু যায় কোথায় ?

এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতা তত্ত্বের বিশেষ সূত্রে উত্তর দিলেন, হারানো ওজনটুকু সত্যি সত্যিই হারিয়ে যায় না, সেটুকু পরিণত হয় শক্তিতে। এতদিন জানা ছিল, বস্তুর বিনাশ নেই এবং শক্তিরও বিনাশ নেই, কিন্তু দুয়ের মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে বলে জানা ছিল না। আইনষ্টাইন বললেন, তাদের মধ্যে যে নিবিড় যোগসূত্র আছে তাদের এইভাবে দেখানো যেতে পারে—

আবর্তিত হচ্ছে দুটি ইলেকট্রন। (২নং চিত্র)। অতএব হিলিয়াম পরমাণুর ওজন হওয়া উচিত হাইড্রোজেন পরমাণুর চার গুণ ; কিন্তু কার্যতঃ অ্যাষ্টনের ভরলিপি যন্ত্রে মেপে দেখা গেল, তার চাইতে কিছুটা কম হয়। যেটুকু কম হয় সেটুকু শক্তিতে পরিণত হলে প্রচণ্ড উত্তাপের সৃষ্টি করবে। এখন দেখা যাক, কেমন করে হাইড্রোজেন পরমাণু হিলিয়ামে রূপান্তরিত হতে পারে।

আগেই বলেছি, মৌলের স্বরূপ নির্ণয় করে তার নিউক্লিয়াসের প্রোটন সংখ্যা বা পজিটিভ চার্জ। অতএব কোন উপায়ে যদি নিউক্লিয়াসের প্রোটন সংখ্যার তারতম্য ঘটানো যায় তাহলে এক মৌল সহজেই আর এক মৌলে রূপান্তরিত হতে পারে। তেজস্ক্রিয় পদার্থের মধ্যে সব সময়েই এই রূপান্তর ঘটছে, যার ফলে ইউরেনিয়ামের মত বস্তু শেষ পর্যন্ত সীসায় পরিণত হয়। তেজ-

ক্রিয় পদার্থ থেকে সব সময়েই আল্‌ফা ও বিটা কণা এবং গামা রশ্মি বেরিয়ে আসছে। এদের মধ্যে আল্‌ফা কণা পজিটিভ বিদ্যুৎ-ভাবাপন্ন, বিটা কণা নেগেটিভ বিদ্যুৎ-ভাবাপন্ন এবং গামা রশ্মি বিদ্যুৎ-ধর্ম বর্জিত। আল্‌ফা কণার চার্জের পরিমাণ হচ্ছে দুই (দুটা প্রোটনের চার্জের সমান) এবং ওজন চার (হাইড্রোজেন পরমাণুর চার গুণ অথবা হিলিয়াম পরমাণুর সমান), বিটা কণার চার্জের পরিমাণ এক (একটা ইলেকট্রনের চার্জের সমান) এবং ওজন ইলেকট্রনের মতই নেই বললেই চলে। তাহলে আমরা আল্‌ফা কণাকে ইলেকট্রন-বর্জিত হিলিয়াম পরমাণু এবং বিটা কণাকে ইলেকট্রন বলে ধরে নিতে পারি। এখন কোন মৌলের পরমাণু থেকে যদি একটা আল্‌ফা ও দুটা বিটা কণা বেরিয়ে আসে তাহলে তার চার্জের কোনই তারতম্য ঘটবে না, অথচ চার ইউনিট কমে যাবে। এ দুই মৌলের মধ্যে মূলতঃ কোনই তফাৎ নেই, তফাৎ কেবল তাদের ওজনের। এদের নাম দেওয়া হলো আইসোটোপ বা সমপদ।

এতক্ষণ আমরা দেখলাম, কেবল তেজস্ক্রিয় পদার্থের পক্ষেই এক মৌল থেকে আর এক মৌলে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক রাদারফোর্ড দেখালেন, তথাকথিত স্থায়ী নিউ ক্লিয়াসকেও কৃত্রিম উপায়ে ভাঙ্গা সম্ভব। দ্রুত গতিসম্পন্ন আল্‌ফা কণা দিয়ে নাইট্রোজেন পরমাণুকে আঘাত করলে নাইট্রোজেন পরমাণু ভেঙ্গে যায় এবং তা থেকে সৃষ্ট হয় অক্সিজেন ও প্রোটন। (৩নং চিত্র)।

৩নং চিত্র

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, নাইট্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে আল্‌ফা কণার সংঘাত ঘটানো খুবই কঠিন ; কেন না, সম বিদ্যুৎ-ভাবাপন্ন আল্‌ফা কণা ও নাইট্রোজেন নিউক্লিয়াস পরস্পরকে বিপরীত দিকে ঠেলে দেয়। কার্যক্ষেত্রে প্রায় প্রতি পাঁচ হাজার আল্‌ফা কণায় একটি মাত্র সংঘাত ঘটাতে সমর্থ হয়।

ওই একই উপায়ে বেরিলিয়াম রূপান্তরিত হয় কার্বন মৌলে, সঙ্গে বেরিয়ে আসে আমাদের পূর্ব-পরিচিত বিদ্যুৎ ধর্ম বর্জিত নিউট্রন। (৪নং চিত্র)।

৪নং চিত্র

পদার্থের উপর মহাজাগতিক রশ্মির প্রতিক্রিয়া

সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে ১৯৩২ সালে বৈজ্ঞানিক অ্যাণ্ডারসন পজিটিভ ইলেকট্রন বা পজিট্রনের সন্ধান পান। পজিট্রন আবিষ্কারে রাদারফোর্ড ও বোর পরিকল্পিত পরমাণুর গঠনে কোন তারতম্য ঘটে নি; তার কারণ পজিট্রন অতি স্বল্পায়ু।

ইউরেনিয়াম-২৩৫ সমপদকে যদি নিউট্রন কণা দিয়ে আঘাত করা যায় তাহলে ইউরেনিয়াম পরমাণু দু-টুক্‌রা হয়ে যায়। এই ভাঙ্গনের ফলে যেটুকু পদার্থের বিলুপ্তি ঘটে সেটুকু শক্তিতে পরিণত হলে প্রতিগ্র্যাম ইউরেনিয়াম পিছু তার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ২২ টন কয়লা পুড়িয়ে পাওয়া উত্তাপের সমান। এ উত্তাপ এমন কিছু বেশী নয়; কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার আছে। ইউরেনিয়াম-২৩৫ সমপদ ভাঙ্গবার সঙ্গে সঙ্গে আবার একাধিক নিউট্রন জন্ম নেয়। তারা আবার নতুন করে ইউরেনিয়াম ভাঙ্গতে সুরু করে। এই রকম ভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রায় হাজারখানেক গ্র্যাম ইউরেনিয়াম ভেঙ্গে যায়। (৫নং চিত্র)। তখন যে শক্তির উদ্ভব হয় তার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ২৫০০ টন কয়লা পুড়িয়ে পাওয়া উত্তাপের সমান।

৫নং চিত্র

এরই উপর ভিত্তি করে তৈরী হলো অ্যাটম বোমা। সূর্যের বহির্ভাগের উষ্ণতা প্রায় ৬০০০° ডিগ্রীর কাছাকাছি, কেন্দ্রস্থলের উষ্ণতা ২২ কোটি ডিগ্রীরও উপর। প্রচণ্ড উত্তাপে কোন পরমাণুই (তা সে যত ভারী মৌলই হোক না কেন) আর স্বাভবিক অবস্থায় থাকে না; তাদের ইলেকট্রনও নিউক্লিয়াস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিভিন্ন মৌলের বন্ধনমুক্ত নিউক্লিয়াসসমূহের মধ্যে তখন সংঘাত সুরু হয়, যার ফলে এক মৌল রূপান্তরিত হয়ে যায় আর এক মৌলে। কিন্তু আগেই বলেছি, এক মৌল আর এক মৌলে রূপান্তরিত হওয়ার সময় কিছুটা পদার্থের বিলুপ্তি ঘটে, যার ফলে উৎপন্ন হয় প্রচণ্ড উত্তাপ। এই অপরিমেয় উত্তাপই সূর্যের তাপশক্তির উৎস।

এর উপর ভিত্তি করেই বৈজ্ঞানিক বেথে তৈরী করেন তার বিখ্যাত কার্বন সাইক্‌ল্‌ মতবাদ। কার্বন সাইক্লের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, কার্বন পরমাণু দিয়ে সংঘাত সুরু হয়, কিন্তু বার কয়েক সংঘাতের পর কার্বন পরমাণুকে আবার ফিরে পাওয়া যায়। মাঝখান থেকে চারটি প্রোটন মিলে তৈরী হয় একটা হিলিয়াম পরমাণু। দুটা বাড়তি পজিটিভ

৬নং চিত্র

চার্জ দুটা পজিট্রনের আকারে বেরিয়ে যায়। (৬নং চিত্র। হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়ামে রূপান্তরের ফলে যেটুকু পদার্থের বিলোপ ঘটে তা থেকে উদ্ভূত উত্তাপের পরিমাণের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এই প্রক্রিয়াই নিয়ত সংঘটিত হচ্ছে সূর্যের ভিতরে, যার ফলে অনাদি কাল থেকে সূর্য তার বিপুল উত্তাপ বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে সূর্য কি সত্যই নিবে যাবে না? উত্তর হচ্ছে, নিবে যাবে; তার কারণ হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়ামে রূপান্তরের ফলে যেটুকু পদার্থের বিলোপ ঘটছে তা তো আর কোন দিনই ফিরে পাওয়া যাবে না! অতএব এমন একদিন নিশ্চই আসবে, যেদিন বিলুপ্ত হতে সূর্যের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। অবশ্য তার আগেই তাপ হ্রাস পাওয়ায় সংঘাত বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু সেদিন যে কবে আসবে তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। একের পিঠে ক্রমাগত শূন্য বসিয়ে একটা হয়তো সংখ্যা নির্ণয় করা যেতে পারে, কিন্তু তার ভ্যালু কত আন্দাজ করতে গেলেই আমাদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। কাজেই এ নিয়ে এখন আমাদের দুর্ভাবনার কোন কারণ নেই।

কাগজ তৈরী

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

কাগজ তৈরীর মূল উপাদান এবং তা থেকে কিভাবে মণ্ড প্রস্তুত করতে হয়, সে সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। মণ্ড থেকে কিভাবে কাগজ তৈরী হয় সে বিষয়ে এখন আলোচনা করবো।

মূল উপাদান থেকে নিষ্কাশিত আঁশগুলি পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পাত তৈরী না করলে কাগজ ভাল হয় না। কাচ, কৃত্রিম রেশম কিংবা অ্যাজবেস্টসের আঁশ পরপস্পরের মধ্যে সংবদ্ধ হয় না; কাজেই এই সব আঁশ দিয়ে দৃঢ় কাগজ প্রস্তুত করা যায় না। অপরপক্ষে পরস্পরের মধ্যে আবদ্ধ হওয়া সেলুলোজ আঁশের বিশেষত্ব। সেলুলোজের আঁশ উপযুক্তরূপে পেষণ করলে আঁশগুলির পরস্পরের বাঁধন খুব দৃঢ় হয়; কাজেই এরূপ আঁশ দিয়ে খুব শক্ত কাগজ তৈরী করা যায়। অবশ্য কোন একটি মাত্র গুণ দিয়েই কাগজের কাঠিন্য নির্ধারণ করা যায় না। আঁশের দৈর্ঘ্য, আয়তন, উপরিভাগের অবস্থা, পাতের মধ্যে অবস্থানের ভঙ্গী, পাতের ঘনত্ব প্রভৃতির উপর কাগজের কাঠিন্য নির্ভর করে। তাহলেও পাতের মধ্যে আঁশগুলির পরস্পরের বাঁধন কিরূপ, তা থেকেই কাগজের কাঠিন্য অনেকটা নির্ণয় করা যায়। যদি কাগজ কম দৃঢ় হয়, তাহলে আঁশের কাঠিন্য সম্বন্ধে সন্দেহ না করে আঁশগুলির পরস্পরের বাঁধন ঠিকমত হয় নি, এরূপ বোঝা যাবে। দুটি ভিন্ন মূল উপাদানের আঁশ থেকে একই প্রক্রিয়ায় পেষণ করে পৃথকভাবে কাগজ তৈরী করলে দুটি পাতের কাঠিন্যের যে প্রভেদ হবে তা অবশ্য আঁশের বিশেষত্বের উপরই নির্ভর করবে।

আঁশ অধিক পেষণ করলে আঁশের উপরিভাগের অবস্থার পরিবর্তন হয়। প্রত্যেক আঁশের গা দিয়ে অনেক সূক্ষ্ম আঁশ বের হয়ে আঁশের

আয়তন বেড়ে যায়; কাজেই আঁশগুলি পরস্পরকে আরও অধিক জায়গায় আবদ্ধ করতে পারে। এজন্যে কাগজ আরও মজবুত হয়। অবশ্য পেষণ করবারও একটা সীমা আছে, তারপর কাগজের কাঠিন্য কমে যায়।

আঁশের ভিতর লিগ্‌নিন, হেমিসেলুলোজ, বিকৃত সেলুলোজ প্রভৃতির অস্তিত্বের জন্যেও আঁশের পরস্পরের বাঁধনের তারতম্য হয়। বেশী হেমিসেলুলোজ থাকলে আঁশ কম সময় পেষণ করেও দৃঢ় কাগজ তৈরী করা যায়। হেমিসেলুলোজ বন্ধনীর কাজ করে' আঁশগুলির ভিতর সংযোজন ঘটায়। ন্যাকড়ার মণ্ডে জাইলন যোগ করে অধিকতর দৃঢ় কাগজ তৈরী হয়েছে। ক্ষার দিয়ে নিষ্কাশন করা যায়, এরূপ হেমিসেলুলোজই এক্ষেত্রে সক্রিয়। অত্যধিক হেমিসেলুলোজ থাকলে বিপরীত ফল হয়। লিগ্‌নিন বেশী থাকলে আঁশ অনেকক্ষণ পেষণ করেও কাগজের কাঠিন্য বাড়ে না। আঁশের সঙ্গে ফট্‌কিরি, কলপ, পূরক, রঞ্জক প্রভৃতি যোগ করলে আঁশগুলির পরস্পরের বাঁধনের প্রতিকূলে কাজ করে। কেরোসিন এবং অন্যান্য ফেনাদমনকারী দ্রব্য কাগজ তৈরীর জালিতে অতিরিক্ত প্রয়োগ করলেও বিরুদ্ধ কাজ করে। ষ্টার্চ, প্রোটিন, উদ্ভিদের আঠা প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্য আঁশগুলিকে জোড়া লাগাতে সাহায্য করে এবং কাগজের কাঠিন্য বৃদ্ধি করে।

কাগজ তৈরীর সময় আঁশগুলি কতটা ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রত্যেকটি আঁশ কোন্ দিকে এবং কোন্ ভঙ্গীতে থেকে পাত তৈরী করে তার উপরই কাগজের গঠন নির্ভর করে। সব শ্রেণীর কাগজেরই সুন্দর গঠন হওয়া দরকার বটে, কিন্তু মোটা কাগজের চেয়ে কার্বন টিস্যুর ন্যায় পাত্‌লা কাগজের পক্ষে এই গুণ বেশী দরকারী।

আঁশগুলিকে বিক্ষিপ্ত করবার চেয়ে জালির উপর বিক্ষিপ্ত রাখাই মুস্কিল। কারণ বিক্ষিপ্ত আঁশগুলির ডেলা পাকানোর দিকেই ঝোঁক। মণ্ডে ডেলা হলেই পাত অসমান হবে। লম্বা আঁশের চেয়ে ছোট আঁশগুলিই ভালভাবে ছড়িয়ে থাকে। বেশী হেমিসেলুলোজ থাকলে আঁশগুলি কম ডেলা বাঁধে। অবিরঞ্জিত আঁশের চেয়ে বিরঞ্জিত আঁশই সমানভাবে বিক্ষিপ্ত থাকে। মণ্ডে বেশী ফট্‌কিরি থাকলেও ডেলা হয়। মণ্ড যত বেশী ঘন হবে তত বেশী ডেলা বাঁধবে এবং পাত অসমান হবে।

বিশেষ রকমের আঠা, মিথাইল সেলুলোজ, সোডিয়াম কার্বক্সিমিথাইল প্রভৃতি দ্রব্যবিশেষ মণ্ডে যোগ করলে আঁশগুলিকে বিক্ষিপ্ত থাকতে সাহায্য করে। টিস্যুর ন্যায় খুব পাত্‌লা কাগজ করতে হলে এই দ্রব্যগুলি খুব ফলপ্রদ; এমন কি, লম্বা আঁশযুক্ত মণ্ডে ওই সব দ্রব্য যোগ করলে সুগঠিত পাত করা যায়।

জালির উপরে পাত গঠিত হলেও ভিজা পাতে পরে কিভাবে চাপ দিয়ে জল নিষ্কাশন করা হয় এবং কোন্ প্রথায় শুকনো হয়, তার উপরও কাগজের গুণ নির্ভর করে।

১০৫ খৃষ্টাব্দে কাগজ আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে কাগজ তৈরী করবার ছাঁচ হাত দিয়ে পাত্‌লা মণ্ডে ডুবিয়ে ছোট ছোট পৃথক কাগজের পাত প্রস্তুত করা হয়। সেজন্যে এ প্রথায় উৎপন্ন কাগজকে হাতে-তৈরী কাগজ বলা হয়। পূর্বে ওরূপ কাগজ তৈরীর জন্যে প্রধানতঃ পুরনো ন্যাকড়া, শণের থলে এবং মাছ ধরবার জাল ব্যবহৃত হতো। এগুলি খুব ছোট ছোট করে কেটে ধোলাই করে হামানদিস্তা বা ঢেঁকির ন্যায় যন্ত্রে কোটা হতো। তারপর সাজিমাটি এবং চুন মিশিয়ে কয়েকদিন রেখে দেওয়ার পর বারবার কোটা ও ধোলাই করা হতো। বিরঞ্জিত করবার জন্যে মাঝে মাঝে রোদে দেওয়া হতো। এভাবে অনেকবার কোটা এবং ধোলাই হওয়ার পর আঁশগুলি পৃথক হয়ে কাগজ তৈরীর মণ্ড প্রস্তুত হতো।

খড়ের ডাঁটা অথবা তারের ন্যায় বাঁশের মিহি কঞ্চির জালি দিয়ে ছাঁচ নির্মিত হয়। ছাঁচটিকে ফটোর ফ্রেমের ন্যায় কাঠের একটি ফ্রেমে বসানো হয় যেন ছাঁচে পাত্‌লা মণ্ড উঠালে জালির চারদিকে বেরিয়ে না যায়। ফ্রেমটিকে ডেক্‌ল্ বলা হয়।

বর্তমানে উপরোক্ত প্রথার অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে। এ প্রথায় কেবল উচ্চ শ্রেণীর কাগজই প্রস্তুত করা হয়। খুব ভাল তুলা এবং লিনেনের ন্যাকড়া থেকেই এসব কাগজ তৈরী হয়। এসব উপাদান সাধারণতঃই বিশুদ্ধ। কাজেই খুব কম কষ্টিক দিয়ে মৃদু অবস্থায় ঘূর্ণায়মান অথবা স্থির পাত্রে সিদ্ধ করা হয়। হল্যাণ্ডার পেষণ যন্ত্রের ন্যায় ব্রেকার নামে বিশেষ যন্ত্রে ধোলাই ও বিরঞ্জিত করা হয়। তারপর হল্যাণ্ডার পেষণ যন্ত্রে মণ্ড প্রস্তুত করা হয়।

বর্তমানে পিতলের তার দিয়েই ছাঁচের জালি বোনা হয়। যে ছাঁচে কাগজ তৈরী করলে পাতে কোন দাগ হয় না তাকে ওভ-ছাঁচ বলে। যে ছাঁচের জালির উপর সমান্তরালে তার ঝালা হয় তাতে কাগজ করলে পাতে কতকগুলি সমান্তরাল রেখার দাগ হয়। এরূপ ছাঁচকে লেড-ছাঁচ বলে। তাছাড়া কাগজে বিশেষ নক্সার ছাপ দেবার জন্যে তার দিয়ে নক্সা তৈরী করে জালির উপর ঝালা হয় অথবা নক্সার ছাপ জালের উপর চেপে বসানো হয়।

একটি পাত্রে অনেকটা জলের সঙ্গে মণ্ড মেশানো হয়। জল আলোড়িত করবার বন্দোবস্ত করা হয় যাতে আঁশগুলি পাত্রের তলায় বসে না যায়। ডেক্‌ল্ সমেত ছাঁচটি পাতলা মণ্ডে ডুবিয়ে উঠালে জালি থেকে জল ঝরে পড়ে। তখন ছাঁচটি সমতল রেখে চারদিকে ঝাঁকানি দিলে আঁশগুলি ছাঁচের উপরে সর্বত্র সমান পরিমাণে আড়াআড়ি হয়ে বসবে এবং পাত তৈরী হবে। পাত কতটা মোটা হবে তা নির্ভর করে মণ্ডের ঘনত্ব ও জালি থেকে ডেক্‌লের উচ্চতার উপর। সমান ওজন ও আকারের পাত তৈরী করা নির্ভর করে যথেষ্ট অভিজ্ঞতার উপর।

খানিকটা জল ঝরে গেলে ডেক্‌ল্‌টি খুলে ফেলা হয় এবং পাতটি ছাঁচ থেকে একটি পশমী কম্বলের টুক্‌রার উপর স্থানান্তরিত করা হয়। ছাঁচ এবং ডেক্‌লের ফাঁক দিয়ে খানিকটা আঁশ বেরিয়ে আসে; কাজেই পাতের চারদিক পালকের ন্যায় ঢেউ খেলানো হয়। এরূপ অসমান ধারই হাতে-তৈরী কাগজের বিশেষত্ব। ইংরেজী ভাষায় একে ডেক্‌ল্ এজ বলে।

পূর্বোক্ত পাতটি আর একটি কম্বলের টুক্‌রা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। তার উপর আর একটি কাগজের পাত তৈরী করে রাখা হয়। এইভাবে পরপর পাত ও কম্বলের প্রায় আঠারো ইঞ্চি একটি থাক করা হয়। এই থাকটিতে যথেষ্ট চাপ দিয়ে জল অপসারিত করা হয়। তারপর কম্বলের টুক্‌রাগুলি সরিয়ে নিয়ে কাগজের পাতগুলি একটির উপর আর একটি ঠিকমত সাজিয়ে যে স্তর হবে তার উপরে ও নীচে দস্তার পাত রেখে আবার চাপ দিয়ে প্রায় একদিন রাখা হয়। পাতগুলি পৃথক করে আবার থাক করে দরকার হলে আবার চাপ দেওয়া হয়।

এরপর পাতগুলি শুকানো হয়। যথেষ্ট হাওয়া লাগে, এরূপ উপরের ঘরে লোমের দড়ির উপর পাতগুলি ঝুলিয়ে রেখে আস্তে আস্তে শুকানো হয়। এরূপভাবে রেখে শুকালে পাতের মধ্যে ভাঁজের দাগ হয়। সেজন্যে বর্তমানে দুটা কাঠের ডাণ্ডায় পাটের দড়ির টানা দিয়ে খাটিয়ার মত করে তার উপর পেতে পাতগুলি শুকানো হয়। তারপর পাতগুলি শুক্‌নো জায়গায় এনে বারবার উল্টেপাল্টে হাওয়া খাওয়ানো হয়, যাতে পাতের কোন জায়গা কোঁচকানো না থাকে। এরপর শিরিষ সিদ্ধ-করা জল দিয়ে কলপ দেওয়া হয়। পূর্বে পাতগুলি কলপে ডুবিয়ে চাপ দিয়ে তরল পদার্থ

অপসারিত করে শুকানো হতো। বর্তমানে দুটা পাতলা কম্বলের ভিতরে রেখে কাগজের পাতকে কলপের পাত্রের ভিতর দিয়ে চালানো হয় এবং পরে দুটি রোলারের মধ্যে চাপ দেওয়া হয়। কলপ মাখানোর পর পাতগুলি থাক করে একদিন রাখা হয়। তারপর আলাদা করে শুকিয়ে যন্ত্রে পালিশ করা হয়।

যাতে সেলুলোজ বিকৃত না হয়। হাতে এবং কলে তৈরী কাগজের প্রস্তুতপ্রণালীর তফাৎ আছে। কলের জালির উপর মালের গতির দিকে আঁশগুলি লম্বালম্বি হয়ে সার বেঁধে বসতে থাকে। এই কারণে কলে তৈরী কাগজের পাত চওড়া এবং লম্বা দুই দিকেই সমান মজবুত হয় না। কিন্তু হাতে কাগজ তৈরী করবার সময় ছাঁচ চারদিকে

ফোরড্রিনীয়ার কলের বিভিন্ন অংশ

ক—মণ্ডের বাক্স; খ—তারের জালি; গ—ডেকল্ স্ট্রাপ; ঘ—সাক্শন বক্স; চ—টেবল রোল; ছ—ড্যাণ্ডি রোল; জ—কুচ রোল; ঝ১ ঝ২—প্রেস রোল (১ম প্রস্থ); ঝ৩—কম্বল; ট১ ট২—প্রেস রোল (২য় প্রস্থ); ট৩—কম্বল; ঠ—ড্রাইং সিলিণ্ডার; ড—ক্যালেণ্ডার রোল; ঢ—রীল।

বর্তমানে যদিও কাগজের কল থেকেই অনেক প্রকার কাগজ তৈরী হয়, তবুও হাতে-তৈরী কাগজের বিশেষ স্থান আছে। হাতে-তৈরী কাগজের জন্যে উৎকৃষ্ট উপাদান ব্যবহৃত হয়। পাক, বিরঞ্জন ও পেষণ মৃদু অবস্থায় করা হয়,

ঝাঁকানি দেওয়া হয়; কাজেই আঁশগুলি সবদিকেই বিশৃঙ্খলভাবে পরস্পর সংবদ্ধ হয়ে থাকে। এরূপ পাত সবদিকেই সমান দৃঢ় হয় এবং কলের কাগজের চেয়ে অধিকতর মজবুত ও টেক্সই হয় এবং পাতগুলি দেখতেও সুন্দর হয়। কলের কাগজ অধিক তাপে

তাড়াতাড়ি শুকানো হয়, অপর পক্ষে হাতে তৈরী কাগজ অল্প তাপে আস্তে আস্তে শুকানো হয়। হাতে-তৈরী কাগজে জলছাপ অনেক ভাল হয়; কারণ পাত করবার সময় সারাক্ষণই আঁশগুলি নক্সার উপর পড়ে থাকে, অপরপক্ষে কলে ভিজা পাতের উপর এক এক স্থানে একবার করে নক্সার ছাপ দেওয়া হয়।

এসব কারণে হাতে-তৈরী কাগজের বেশী দাম হলেও চাহিদা আছে। বিয়ে এবং অন্যান্য উৎসবে সৌখীনতার জন্যে এই শ্রেণীর কাগজ ব্যবহৃত হয়। চিত্রকর কিংবা নক্সানবীস এক পাত কাগজের উপর অনেক শ্রম ও সময় ক্ষেপণ করে। কাজেই এসব ক্ষেত্রে খুব উচ্চ শ্রেণীর কাগজই তাদের দরকার। ব্যাঙ্কের নোট, লেজার ও হিসাবের খাতা, রাসায়নিক বিশ্লেষণে পরিস্রাবণ, দলিল, উইল, সনদ, শেয়ার সার্টিফিকেট প্রভৃতির জন্যেও এই শ্রেণীর কাগজ ব্যবহৃত হয়।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১০৫ খৃষ্টাব্দে কাগজ আবিষ্কারের পর থেকে এক একটি করে পৃথক পাত হাতে তৈরী করা হতো। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে নিকোলাস লুই রবার্ট একটি কল আবিষ্কার করে অবিচ্ছিন্ন পাত প্রস্তুত করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে ফোরড্রিনীয়ার ভ্রাতৃ-দ্বয়ের আনুকূল্যে ওই কল সাফল্যের সঙ্গে চালিত হয়। সেই থেকে অবিচ্ছিন্ন কাগজের পাত তৈরীর এরূপ কলকে "ফোরড্রিনীয়ার কল" বলা হয়।

এই প্রথায় কাগজ তৈরীর ছাঁচের জালি কলে চালানো হয় এবং বিভিন্ন যান্ত্রিক উপায়ে পাতের জল অপসারিত করে কাগজ অবিচ্ছিন্নভাবে একটি রীলে জড়ানো হয়। ফোরড্রিনীয়ার কলের প্রধান অংশ হলো ফস্‌ফর ব্রোঞ্জের মিহি তার দিয়ে বোনা একটি লম্বা জালির চাদর। জালির দুই প্রান্ত জোড়া লাগানো—একটি লম্বা সূতীর চাদরের দুই দিক সেলাই করলে যেরূপ হয়। জালিটি অনুভূমিক ভাবে বিছিয়ে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত কয়েকটি রোলারের উপর একটি বেল্টের ন্যায় ঘোরানো হয়। বিভিন্ন আকৃতির জালি বোনা হয়। ৩০/৩২০ ইঞ্চি চওড়া, ৪০/৮০ ফুট লম্বা। জালির সূক্ষ্মতা অনুসারে এক বর্গইঞ্চিতে ৫০-৯০টি ছিদ্র থাকতে পারে। বিভিন্ন কলের কৃতি অনুসারে প্রতি মিনিটে ১০০-২৫০০ ফুট কাগজ তৈরী হতে পারে। কাগজের শ্রেণী অনুসারে কল নির্মাণ করা হয়। উচ্চ শ্রেণীর কাগজের জন্যে কম চওড়া, মিহি জালি ও মন্দগতি কল; নিউজ প্রিণ্ট ও ক্রাফ্‌টের জন্যে অধিক চওড়া, মোটা জালি ও দ্রুতগতি কল এবং টিস্যুর জন্যে ভিন্ন প্রকারের কল ব্যবহৃত হয়।

জালির উপরে সরবরাহ করবার আগে মণ্ড মোটা এবং মিহি ছাঁকুনির ভিতর দিয়ে পর পর ছাঁকতে হয়, যাতে মণ্ডের সঙ্গে কোন ডেলা কিংবা ভেজাল এড়িয়ে না যায়। তারপর অনেক জল দিয়ে মণ্ড পাত্‌লা করতে হয়, যাতে আঁশগুলি উত্তমরূপে বিক্ষিপ্ত এবং অবলম্বিত থাকে। এরূপ তরল মণ্ডে শতকরা প্রায় এক ভাগ আঁশ, পূরক প্রভৃতি নিরেট বস্তু এবং অবশিষ্ট নিরানব্বই ভাগই জল থাকে। মণ্ডের ঘনত্ব সর্বত্র সমান হতে হবে; লম্বা, ছোট ও সূক্ষ্ম আঁশগুলি সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে থাকবে এবং সব সময়ই একই পরিমাণ মণ্ড যোগান দিতে হবে। তাহলেই কাগজের পাতের সর্বত্র ওজন, আয়তন, কাঠিন্য এবং মসৃণতা সমান হবে।

চলন্ত জালির উপর মণ্ড দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জালির উপরে ছড়িয়ে পড়ে। তরল মণ্ডের জল জালির ছিদ্র দিয়ে ঝরে পড়ে এবং পাত তৈরী হতে থাকে। জালি আড়াআড়িভাবে ঝাঁকানি দেওয়া হয়, যাতে আঁশগুলি ডেলা না বাঁধে এবং সমানভাবে ছড়িয়ে থাকে। পাত গঠনের সময় প্রথমে জালির উপরে একটি সূক্ষ্ম স্তর উৎপন্ন হয়, যা ছাঁকনির ন্যায় কাজ করে এবং মণ্ডের জলকে জালির ভিতর দিয়ে নীচে বের হয়ে যেতে দেয়; কিন্তু আঁশ, পূরক ও রঙ্গকের মিহি চূর্ণকে উপরে

ধরে রাখে। পেষণ করা আঁশগুলি যথেষ্ট ফুলে যায় এবং নমনীয় হয়; কাজেই জালির ছকের ভিতরে বসে যায়। এজন্যে পাতের নীচের দিক, অর্থাৎ যে দিক জালির দিকে থাকে তাতে সুস্পষ্ট জালির দাগ হয়। এই পাতের উপরের দিক পরে কম্বলের সংস্পর্শে আসে; কাজেই এইদিকে কম্বলের মসৃণ দাগ হয়। পরে ভিজা পাতে চাপ দিয়ে জল নিষ্কাশন করবার সময় এবং শুকিয়ে ইস্ত্রি করবার সময় জালি ও কম্বলের উভয় দাগই কতকটা মুছে যায়। তাহলেও তৈরী কাগজে এসব দাগ খানিকটা থেকেই যায়।

দুটি চতুষ্কোণ রবারের বেল্ট জালির উপরে দু-পাশে চেপে থেকে পুলির উপর ঘোরে। এজন্যে মণ্ড জালির দু-পাশ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে না। এদের ডেকল্ স্ট্রাপ বলে, হাতের ছাঁচের ডেকলের মত। এদের নিয়ন্ত্রণ করে ঠিক করা হয়—কাগজ কতটা চওড়া হবে। কয়েকটি সরু রোলার—এদের টেব্ল্ রোল বলে, জালির আড়াআড়িভাবে পর পর একটি টেবলের ন্যায় সাজিয়ে রেখে ঘোরানো হয়। এদের উপর দিয়ে জালি এগিয়ে যাবার সময় মণ্ড থেকে জল জালির নীচে পড়ে। তারপর জালি একাধিক সাক্শন বক্সের উপর দিয়ে যাবার সময় বাক্সগুলি মণ্ড থেকে অনেক জল টেনে নেয়। বাক্সগুলির ভিতর থেকে হাওয়া ও জল পাম্প করে বের করা হয়।

দুটো সাক্শন বক্সের মাঝখানে, যেখানে পাত থেকে অনেকটা জল অপসারিত করা হয়েছে, খুব কম চাপ দিয়ে একটি রোল ঘুরতে থাকে। একে ড্যাণ্ডি রোল বলে। ড্যাণ্ডি রোল পাতের অসমান আঁশগুলিকে চাপ দিয়ে সমান করে দেয় এবং দরকার মত পাতের উপর কোন নক্সার ছাপ দেয়। একে জল ছাপ বলে। ড্যাণ্ডি রোল তারের জালি দিয়ে আচ্ছাদিত, ভিতরে ফাঁকা। তার দিয়ে নক্সা তৈরী করে রোলের জালির উপর ঝালা হয়। রোল ঘোরবার সময় ভিজা পাতের উপর নক্সার ছাপ দিতে থাকে। রোলের জালির চেয়ে নক্সাটি উঁচুতে থাকে বলে যেখানে নক্সার ছাপ পড়ে সেখান থেকে আঁশগুলি সরে যায় এবং সেখানে আঁশের পরিমাণ পাতের অন্য জায়গার চেয়ে অনেক কম হয়। এজন্যে কাগজটি আলোর বিরুদ্ধে ধরলে কাগজের অন্য জায়গার চেয়ে নক্সায় চিহ্নিত জায়গার ভিতর দিয়ে বেশী আলো প্রবেশ করে, অর্থাৎ সেই স্থানটি অন্য জায়গার চেয়ে অধিকতর স্বচ্ছ দেখায়। সেজন্যে নক্সায় চিহ্নিত স্থানটি বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। যে ড্যাণ্ডি থেকে কাগজে কোন ছাপ পড়ে না তাকে ওভ-ড্যাণ্ডি বলে। যে ড্যাণ্ডির পরিধির উপর সমান্তরালে কয়েকটি তার ঝালা হয়, যাদের চাপে পাতের উপর লম্বা লম্বা রেখার দাগ হয়, তাকে লেড-ড্যাণ্ডি বলে।

এরপর জালি সাক্শন কুচ-রোলের উপরে এলে আরও জল অপসারিত হয়। কুচ-রোলের পাত যথেষ্ট দৃঢ় হওয়া দরকার; কারণ এরপর পাত জালি থেকে পরবর্তী প্রেস রোলের কম্বলের উপর স্থানান্তরিত করা হয়। জল অপসারিত হওয়ার পরিমাণ নির্ভর করে জালির বৈশিষ্ট্য, মণ্ডের ঘনত্ব, মণ্ড ভিজা কিংবা মুক্ত, জালির বেগ এবং মণ্ডের ভিতর নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের ক্রিয়ার উপর। কুচ-রোলের নীচ দিয়ে ঘুরে জালি আবার অপর প্রান্তে যায়। সেখানে এর উপর মণ্ড ঢালা হয়।

কুচ-রোলের পর একাধিক প্রস্থ প্রেস রোলের এক প্রস্থে দুটি রোল থাকে। এর ভিতর দিয়ে চালিয়ে ভিজা পাত থেকে যতটা সম্ভব আরও জল দূরীভূত করা হয়। কারণ পরবর্তী প্রক্রিয়ায় ষ্টীমের তাপে জল অপসারিত করতে খরচা বেশী হয়। এখানে ভিজা পাতকে পশমের কম্বলের উপর দিয়ে চালানো হয়, পাতকে অবলম্বন দেবার জন্যে যাতে ছিঁড়ে না যায় এবং পাত থেকে আরও জল শোষণ করবার

জন্তে। ভিজা পাতে চাপ দেওয়াতে আঁশগুলি সব জায়গায় সমানভাবে বসে, পাতের মসৃণতা বাড়ায়, জালি ও কম্বলের দাগ খানিকটা নষ্ট করে দেয়, আঁশগুলির পরস্পর সংবদ্ধ হওয়ার সাহায্য করে, কাগজের কাঠিন্য বাড়ায় এবং গঠনের উন্নতি করে। যত চাপ দেওয়া যায় কাগজও পরে তত নিরেট হয়। কাগজ মোটা ও অনচ্ছ করতে গেলে পাতের উপর অত্যধিক চাপ দেওয়ার আবশ্যকতা নেই।

চাপ প্রক্রিয়ার পর ভিজা পাতকে যথেষ্ট তাপ দিয়ে গরম করতে হয়, যাতে পাতের জল বাষ্প হয়ে উবে যায়। শুকানোর প্রথা ব্যয়সাপেক্ষ। বিভিন্ন শ্রেণীর কাগজের পাতে শুকানোর পূর্বে বিভিন্ন পরিমাণ জল থাকে। সাধারণতঃ শতকরা ৬৩-৭৩ ভাগ থাকে, শুকানোর পর পাতে মাত্র ৪ ৬ ভাগ জল থাকে। কতকগুলি ঘূর্ণায়মান পালিশ-করা লোহার সিলিণ্ডারের ভিতর ষ্টীম প্রবেশ করিয়ে উপরিভাগ উত্তপ্ত করা হয়। ভিজা পাত কম্বলের সঙ্গে সিলিণ্ডারগুলির গা বেয়ে চলবার সময় কম্বল ভিজা উত্তপ্ত সিলিণ্ডারগুলির গায়ে চাপ দিতে থাকে। এই উপায়ে পাতের জল বাষ্প হয়ে উবে যায় এবং পাত শুকিয়ে যায়।

পাত শুকানোর পর দুই অথবা তিন প্রস্থ ভারী লোহার রোলারের ভিতর দিয়ে অধিক চাপে চালিয়ে কাগজ ইস্ত্রি করা হয়। এক প্রস্থে প্রায় ৩-১০টি রোলার পর পর খাড়া থাকে। এই রোলারগুলিকে ক্যালেণ্ডার বলে। ইস্ত্রির পর কাগজ আরও পাত্‌লা, ঘন, মসৃণ এবং চকচকে হয়। পূরক, বিশেষতঃ চীনামাটি মসৃণতা ও ঔজ্জল্য বাড়ায়। ইস্ত্রি করবার সময় কাগজ খানিকটা আর্দ্র হলে পরে দেখতে আরও ভাল হয়। বেশী আর্দ্র হওয়া ভাল নয়, কাগজ কালো হয়ে যেতে পারে।

তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে কাগজের পাত একটি রীলে জড়ানো হতে থাকে। যথেষ্ট কাগজ জড়ানো হলে রীলটি সরিয়ে কাটাই করবার যন্ত্রে বসানো হয় এবং মাপমত পাত কাটা হয়।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের জন ডিকিন্সন কাগজ তৈরী করবার জন্তে সিলিণ্ডার কল আবিষ্কার করেন। এই প্রথাতে ফোরড্রিনীয়ার জালির বদলে একটি সিলিণ্ডারের জালির উপর পাত তৈরী হয়। ভিতর দিক ফাঁকা একটি সিলিণ্ডারকে তারের জালি দিয়ে আচ্ছাদিত করে একটি পাত্রের মধ্যে অর্ধনিমজ্জিত করা হয়। পাত্রের একদিকে মণ্ড সরবরাহকালে ঘূর্ণায়মান অর্ধনিমজ্জিত সিলিণ্ডারের জালির গায়ে আঁশ, পূরক প্রভৃতি বস্তু থেকে যায়; কিন্তু জল সিলিণ্ডারের ভিতরে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়। এভাবে জালির উপরে একটি পাত জমা হয়। এই পাতকে কুচ-রোলের কম্বলের উপর স্থানান্তরিত করা হয়। তারপর অন্যান্য প্রক্রিয়া ফোরড্রিনীয়ার কলের অনুরূপ। একাধিক সিলিণ্ডার এক একটি আলাদা পাত্রে পরপর বসিয়ে একাধিক পাত এক সঙ্গে চাপ দিয়ে জোড় লাগিয়ে একটি মোটা পাত করা যায়। বোর্ডের ন্যায় মোটা কাগজ তৈরী করতে এবং একটি পাতের দু-দিকে ভিন্ন রং করতে হলে এই কল ব্যবহৃত হয়। একটি সিলিণ্ডার ব্যবহার করে টিসুর ন্যায় পাত্‌লা কাগজও প্রস্তুত করা যায়। মোট উৎপন্ন কাগজের শতকরা প্রায় চল্লিশ ভাগ সিলিণ্ডার কলে তৈরী হয়।

সঞ্চয়ন

বিস্ময়কর ভেষজের কাহিনী

পেনিসিলিন সম্বন্ধে এস. জে. লুডোভিসি লিখিয়াছেন—পেনিসিলিন এই শব্দটি প্রথম মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হইবার পর পঁচিশ বৎসরেরও অধিক সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং ঠিক দশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে বৃটেনে ব্যাপক উৎপাদন আরম্ভ হইবার পর।

১৯২৯ সালে পেনিসিলিনের আবিষ্কারক লণ্ডনের সেণ্ট মেরী হাসপাতালের সার আলেকজেণ্ডার ফ্লেমিং একটি প্রবন্ধ লেখেন সদ্য আবিষ্কৃত এই পদার্থের দুইটি বিশেষ গুণের উপর। তিনি বলেন, ইহা শরীরের শ্বেতকোষগুলির তুলনায় জীবাণুর পক্ষে অধিকতর মারাত্মক। তাছাড়া ইহা শরীরে কোন বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে না। কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহার পক্ষে অধিক দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ ফ্লেমিং রসায়নবিদ্ ছিলেন না। তাছাড়া পেনিসিলিন সম্পর্কে ব্যাপকতর গবেষণা চালাইবার উপযোগী সময়, অর্থ—এমন কি, লেবরেটরীও তাঁহার ছিল না।

ইহার দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হয় ১০ বৎসর পরে যখন সার হোয়ার্ড ফ্লোরি এবং ডাঃ ই. বি. চেইন অক্সফোর্ডে সম্মিলিতভাবে পেনিসিলিন সম্পর্কে গবেষণা সুরু করেন এবং রোগ সম্পর্কে ইহার ব্যবহারের সম্ভাবনা পরীক্ষা করিয়া দেখেন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হইয়া যায় এবং বৃটিশ শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে তৎপর হইয়া উঠে। ফ্লোরি যুক্তরাষ্ট্রে গমন করিয়া এই বিশেষ ভেষজ উৎপাদন সম্পর্কে মার্কিন গভর্ণমেণ্ট এবং ভেষজ শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে প্ররোচিত করেন।

রাসায়নিক পরীক্ষায় পদার্থটির কেবল যে আশ্চর্যজনক কতকগুলি গুণ দেখা গেল তাহা নহে, ইহা মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের পত্নীর আশ্চর্যভাবে জীবন রক্ষাও করে। ফ্লেমিং বলেন, এই ঘটনাটি সাধারণের মনে যথেষ্ট উৎসাহের সৃষ্টি করে এবং ইহার পরে যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪৩ সালে ইহার ব্যাপকভাবে উৎপাদনের ব্যবস্থাও হয়।

ফ্লেমিং এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, পেনিসিলিনের ব্যাপার রোমাণ্টিক। ইহার কার্যকারিতা সম্পর্কে যখন সকলে নিশ্চিন্ত হন, তখনই যুদ্ধ সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ স্তরে আসিয়া উপনীত হয়। পেনিসিলিন ব্যবহার হয় অসংখ্য আহত সৈনিকের চিকিৎসায় এবং বহু আহত সৈনিক রোগযন্ত্রণার হাত হইতে রক্ষা পায়।

১৯৪৫ সালে, যে বৎসর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়, সেই বৎসরে সারাবিশ্বে প্রায় পাঁচ টন পেনিসিলিন ছিল এবং ইহার অধিকাংশই ছিল যুক্তরাষ্ট্রে। কিন্তু বৃটেনও পিছাইয়া থাকে নাই। ১৯৪৬ সালে তাহার প্রথম পেনিসিলিন কারখানার কাজ আরম্ভ হয় এবং সেই বৎসরেই বৃটেন বিশ্বের পেনিসিলিন সরবরাহের প্রায় এক-একাদশাংশ উৎপাদন করে। ১৯৫৩ সালে বৃটিশ ফার্মগুলি যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন মোট পরিমাণের এক-চতুর্থাংশ উৎপাদন করে। ১৯৫৪ সালে উৎপাদন প্রায় বাড়িয়া এক-তৃতীয়াংশ হয়। এই দুই দেশের আনুপাতিক উৎপাদনের পরিমাণ এখনও এইরূপই। বৃটেনের ন্যায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে তাহা নিশ্চয়ই কম কৃতিত্বের কথা নহে।

পেনিসিলিনের প্রতিষ্ঠার পর বিজ্ঞানীরা পেনিসিলিনের ন্যায় অন্যান্য পদার্থ আবিষ্কারের জন্য সর্বত্র অনুসন্ধান চালাইতে থাকেন। এই অনুসন্ধান-কার্যে তাঁহারা সাফল্য লাভ করেন। চিকিৎসকগণ এক্ষণে

নানাপ্রকার রোগের সহিত সংগ্রামে অ্যাণ্টিবায়োটিক ব্যবহারের সুযোগ লাভ করিয়াছেন।

কিন্তু পেনিসিলিনের কাহিনী এক্ষণে শেষ পর্যায়ে আসিয়া পৌছাইলেও এখনও তাহা শেষ হয় নাই। গবেষকগণ এক্ষণে প্রধানতঃ পেনিসিলিনের নূতন নূতন সল্ট আবিষ্কারে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, বিশেষ ভাবে যে সমস্ত সল্ট একটি মাত্র ইনজেকশনের ক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী করিবার পক্ষে যথেষ্ট এবং রোগীকে বারংবার হাইপোডারমিকের হাত হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম।

এই সম্পর্কে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। ১৯৫৩ সালে প্রোকেইন পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হওয়ায় এই উন্নতি আরও সুস্পষ্ট হয়। আজ নানা ধরণের পেনিসিলিন বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন—লজেন্স, ট্যাবলেট, ক্রিম, পাউডার, ড্রপস্ ইত্যাদি। উপরন্তু ইহা অন্যান্য অ্যাণ্টিবায়োটিক সহযোগেও ব্যবহৃত হইতেছে।

চিকিৎসকগণ সকলেই অবশ্য ইহার প্রয়োগ ব্যবস্থা সম্পর্কে এক মত নহেন, যদিও তাঁহারা মনে করেন, ইনজেক্শন রূপে দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইতে পারিলে তাহা অধিকতর ফলপ্রদ হইবে। এই সম্পর্কে অ্যালার্জির প্রশ্ন দেখা দিলে সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা হয় এবং ঝুঁকির পরিমাণ, তাহা যত সামান্যই হউক না কেন, হ্রাস পায়। ১৯৫৫ সালে ফ্লেমিং মৃত্যুর কিছু পূর্বে লিখিয়া যান—ইহা যে এখনও জীবাণুর আক্রমণ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ভেষজ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

লেবরেটরীর পরীক্ষায় জানা যায় যে, অতিরিক্ত মাত্রায় পেনিসিলিন ব্যবহৃত হইলে পেনিসিলিন-প্রতিরোধক জীবাণু উৎপত্তির সম্ভাবনা দেখা যায়। এই কারণে বৃটেনে পেনিসিলিন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে স্বাস্থ্যমন্ত্রী দপ্তর এবং মেডিক্যাল গবেষণা পরিষদ, উভয় পক্ষই বরাবর সতর্কতা অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন এবং থিরাপিউটিক সাবষ্ট্যান্সেস অ্যাক্টের অধীনে পেনিসিলিন ও কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ধরণের অ্যাণ্টিবায়োটিকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া যাহাতে বিক্রীত না হয়, তাহাও দেখা হইতেছে।

পরে দেখা গিয়াছে যে, একটি বিশেষ ধরণের জীবাণু (staphylococcus) প্রায়ই পেনিসিলিন প্রতিরোধের ক্ষমতা লাভ করে। হাসপাতালগুলিতে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, উক্ত জীবাণুর শতকরা ৫০ ভাগই পেনিসিলিন-প্রতিরোধক। হাসপাতালের বাহিরে ইহার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম।

বহু বৎসরের ব্যাপক ব্যবহারের পর, ফ্লেমিং বলিয়াছেন, প্রতিরোধ শক্তি অর্জন করিয়া জীবাণুগুলি পেনিসিলিনের কার্যকারিতা একেবারে নষ্ট করিয়া দিবে, এমন সম্ভাবনা আর নাই।

সেপ্টিসিমিয়া, নিউমোনিয়া, এণ্ডোকার্ডাইটিস, সাইনাসাইটিস, ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি রোগের চিকিৎসাতেও যে কেবল চিকিৎসকেরা পেনিসিলিন ব্যবহার করিতেছেন তাহা নহে, অস্ত্রোপচারের পর সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্যও পেনিসিলিন ব্যবহৃত হইতেছে।

ব্যবহারবাদ

শ্রীবিবেকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমান শতাব্দীতে মন সম্বন্ধে যতগুলি মতবাদ আছে তাদের মধ্যে ফ্রয়েডের থিওরীর কথা আজ কারুর অজানা নেই। কিন্তু আজ যে মতবাদটির কথা বলবো, সেটির কথা সাধারণের মধ্যে প্রচালত নেই—কিন্তু তার প্রভাব আছে পুরাদস্তুর। একে অনেকে যান্ত্রিক মতবাদ বলেন; কারণ তাঁরা মানুষকে এক ধরণের যন্ত্র বলেছেন। এই মতবাদের উদ্ভব আমেরিকায়, আর এর সঙ্গে জে. বি. ওয়াটসনের নাম বিশেষভাবে জড়িত রয়েছে।

ওয়াটসন (১৮৭৮) শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর মনোবিজ্ঞানের কাজ সুরু করেন; কিন্তু শীঘ্রই দেখলেন যে, যে যুগে পদার্থবিদ্যার মত বাস্তব বিজ্ঞানের প্রভাব অপরিসীম, সে যুগে মন, চেতনা, সংস্কার প্রভৃতিকে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা বলা যেতে পারে না। কিন্তু এগুলি যদি ভুলই হয় তবে মানুষের মন সম্বন্ধে ধারণাগুলি অন্য কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? বিবিধ পরীক্ষার পর তিনি উত্তেজনায় সাড়ার থিওরী প্রবর্তন করেন। এই থিওরীর মর্মার্থ এই যে, তথাকথিত মনের সব কাজের মূলে রয়েছে একটি বা কয়েকটি উত্তেজনা, আর শরীরের দিক থেকে তার একটি বা কয়েকটি সাড়া। উত্তেজনা শরীরের বাইরেও উপস্থিত থাকতে পারে, শরীরের ভিতরেও পারে। বাইরের জগতের যে কোন জিনিষকেই মানুষের পক্ষে বাইরের উত্তেজনা বলা যায়। দৈহিক পরিবর্তনের জন্যে শরীরের ভিতরের উত্তেজনা হয়। আমি খাবার দেখছি, আমার মুখে লালা আসছে—এই হচ্ছে ১ম প্রকার উত্তেজনার উদাহরণ। দ্বিতীয় প্রকার উত্তেজনা হলো, যৌন ইচ্ছা বাইরের কোন উত্তেজনা না পেয়েও স্বতঃপ্ররোচিত হয়ে পরিতৃপ্ত হওয়ার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে যৌনগ্রন্থি শরীরের ভিতরেই রয়েছে। একটি উত্তেজনা, আর একটি সাড়া নিয়ে একটি সরল ব্যবহার বা রিফ্লেক্স।

ওয়াটসন যে সময় আমেরিকায় পরীক্ষা করছিলেন, প্রায় ঠিক সেই সময়ে রাশিয়ায় প্যাভ্‌লভ্‌ আর বেকাটারেভ বলে দুজন শারীরবিদ্‌তত্ত্ব হঠাৎ এমন একটা জিনিষ আবিষ্কার করেন, যার সঙ্গে ওয়াটসনের মতবাদের বিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে। ১৯০০ সালের গোড়ার দিকে প্যাভ্‌লভ্‌ স্নায়ুর প্রতিক্রিয়া, আর বেকটারেভ অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির প্রতিক্রিয়া নিয়ে পরীক্ষা করবার সময় প্রায় এক জিনিষই দেখালেন। প্যাভলভ্‌ একটা কুকুরকে খাবার দেবার সময় ঘণ্টা বাজাতেন। কিছুদিন এই রকম করবার পর তিনি ঘণ্টা বাজালেন, কিন্তু খেতে দিলেন না। এর ফলে দেখা গেল, যদিও খাদ্য নেই তবুও কুকুরের মুখ দিয়ে লালা পড়ছে; অর্থাৎ খাদ্যের সঙ্গে ঘণ্টার শব্দ একই সময়ে হওয়ায় খাদ্যের মত শব্দও উত্তেজনা দেবার শক্তি পেয়েছে। এই নতুন উত্তেজনাজনিত সাড়াকে তাঁরা বললেন—নিয়ন্ত্রিত রিফ্লেক্স। কারণ এখানে আসল উত্তেজক নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

রাশিয়ার সরকারের সাহায্যে প্যাভলভ্‌ পরে আরও পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি দেখালেন, প্রাণীদের কতখানি ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করা যায়। একটা কুকুরকে খেতে দেবার সময় তিনি এক সুরে একটা বাঁশী বাজাতেন। যখন সেই বাঁশী শুনেই তার মুখ দিয়ে লালা পড়তো তখন কুকুরটাকে খেতে না দিয়েও তিনি অন্য সুরে বাঁধা একটা বাঁশী বাজাতে লাগলেন। দুটা কাজ এভাবে একসঙ্গে চলবার পর এমন হলো যে, প্রথম বাঁশী শুনে তার

লালা পড়তো, কিন্তু দ্বিতীয় বাঁশী শুনে লালা পড়তো না—যদিও তাদের সুরের পার্থক্য খুব সামান্যই ছিল। প্যাভ্‌লভ্‌ বলেন যে, এই রিফ্লেক্সকে নিয়ন্ত্রণ করবার কাজ বৃহৎ মস্তিষ্কের মধ্যে হয়—কারণ সেটা জখম হলে প্রাণী নিয়ন্ত্রিত রিফ্লেক্স গড়তে পারে না। জার্মেনীর ক্রাস্‌নোগোরস শিশুদের নিয়ে নিয়ন্ত্রিত রিফ্লেক্সের পরীক্ষা করেন। ওয়াটসনের সাধারণ রিফ্লেক্সকে অনিয়ন্ত্রিত রিফ্লেক্স বলা যায়।

এসব পরীক্ষার কথা ওয়াটসনের কাছে ১৯১২ সালের আগে আমেরিকায় এসে পৌঁছায় নি। আর পৌঁছাবার পরেও ১৯২৪ সালের আগে তিনি প্যাভ্‌লভের পরীক্ষাকে ব্যবহারবাদে মূল্যবান বলে মেনে নিতে পারেন নি। ১৯২৪ সালের পরে লেখা বইগুলিতে তিনি নিয়ন্ত্রিত রিফ্লেক্সের মূল্যের কথা বলেছেন। জন হপ্‌কিন্সের পরীক্ষাগারে ওয়াটসন নানাবিধ পরীক্ষা করেন।

তিনি বললেন, মানুষের মন বলে কোন জিনিষ নেই। কারণ, মন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। আর যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় বিজ্ঞানে তাকে মেনে নেওয়া যায় না। মানুষের ব্যবহারকেই বিজ্ঞানসম্মতভাবে পর্যবেক্ষণ করা চলে। সুতরাং এই মতবাদের নাম হলো ব্যবহারবাদ। তিনি বলেন, ব্যবহারবাদ একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান নয়; তার সঙ্গে শারীরবিদ্যারই সবচেয়ে বেশী সম্বন্ধ রয়েছে। মানুষ সারা দিনরাতে যে কাজ করে তার কারণ নির্দেশ করা (অর্থাৎ কি উত্তেজনায় কি সাড়া তা বলা), আর মানুষের ভবিষ্যৎ আচরণ নিয়ন্ত্রিত করাই ব্যবহারবাদের কাজ।

অনেকে বলবেন, মানুষের যে ব্যবহার তা তার মনেরই প্রকাশ। কিন্তু ব্যবহারবাদী বলবেন, মনের প্রকাশ বলে কিছু নেই সবই উত্তেজনার সাড়া। এঁদের মতবাদ ঠিক কি ভুল, এখানে তা বলা হচ্ছে না। তবে এই থিওরী দিয়ে মানুষের সব ব্যবহারকে ব্যাখ্যা করবার মনোভাবই এঁদের বিশেষত্ব তা মনে রাখতে হবে।

ওয়াটসন বললেন, মানুষের আচার-ব্যবহার যে এত জটিল তার কারণ তার মন নয়। সমগ্র মানুষের আচরণ অনেকগুলি ক্ষুদ্র সরল ব্যবহার বা রিফ্লেক্সের সমষ্টি। এই রিফ্লেক্স আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রিত; অর্থাৎ ঠিক যে জিনিষ শরীরের দিক থেকে যে সাড়া আনতে পারে, তা না এনে (খাদ্যের বদলে শব্দের মত) অন্য জিনিষ সেই সাড়া আনে। আবার যেমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, সেভাবে একটা উত্তেজনা একজনের যে সাড়া আনবে, অন্য লোকের কাছে অন্য উত্তেজনা সেই সাড়াই আনবে। যেমন ঘণ্টা বাজালে কুকুরের মুখ দিয়ে লালা পড়বে, তেমনই একটা নির্দিষ্ট লোকের আগমন দেখেও লালা পড়বে।

এঁরা বলেন, মনের যে প্রধান কাজ চিন্তা তা স্বরযন্ত্রের খুব মৃদু (এমন মৃদু যা সাধারণভাবে কানে শোনা যায় না) কম্পন। ইমোশনকে এঁরা শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থি, বিশেষ করে থাইরয়েড, অ্যাড্রিন্যাল প্রভৃতি নালীবিহীন গ্রন্থির প্রতিক্রিয়া বলেন। এঁদের মতে, শিশুর জন্মের সময় মাত্র দুটা জিনিষে ভয় থাকে; যেমন—হঠাৎ পড়ে যাবার অনুভূতিতে এবং ভীষণ শব্দে। পরে এগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন—কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনে কুকুর সম্বন্ধে ভয় হয়।

বলা বাহুল্য, তাঁরা মানুষের জীবনে তাদের অভ্যাস, আর পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ব্যবহারবাদীরা যতই ভুল করুন না কেন, শিশুদের সম্বন্ধে তাঁদের পরীক্ষাগুলি খুবই মূল্যবান।

কলিকাতার কথা

শ্রীবিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য

নব ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতি সাধনার স্নায়ুকেন্দ্র কলিকাতা মহানগরী। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৪তম অধিবেশনের স্থানরূপে এই মহানগরী নির্বাচিত হইয়াছে। কলিকাতার সঙ্গে বিজ্ঞান কংগ্রেসের সংযোগ খুব নিবিড়। ৪৩ বৎসর আগে ১৯১৪ সালের ১৪ই জানুয়ারী তারিখে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন এই কলিকাতাতেই ১নং পার্ক স্ট্রীটের এশিয়াটিক সোসাইটির ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতস্থ দুই জন বৃটিশ বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক ম্যাকমেহন এবং অধ্যাপক সাইমন্সেনের উদ্যোগে ১৯১২ সালের নভেম্বর মাসে ১৭ জন অগ্রগণ্য বিজ্ঞানীর এক বৈঠকে ১৯১৪ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতে বিজ্ঞান সাধনার অগ্রগতি পর্যালোচনা করিবার জন্য এবং বিজ্ঞানসেবীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ সাধনের জন্য ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদবধি নিয়মিতভাবে বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতেছে। বহুবার এই বার্ষিক অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য কলিকাতার হইয়াছে। কলিকাতায় অনুষ্ঠিত অধিবেশনের মধ্যে ১৯৩৮ সালের রজতজয়ন্তী অধিবেশন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রখ্যাত বৃটিশ বৈজ্ঞানিক স্যর জেম্‌স জীন্‌স ঐ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান কংগ্রেসের শেষ কলিকাতা অধিবেশন হয় ১৯৫২ সালে। ১৯৫৭ সালে কলিকাতা আবার বিজ্ঞান কংগ্রেসকে স্বাগত জানাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। যে ঐতিহাসিক মহানগরীতে এই অধিবেশন উপলক্ষ্যে দেশবিদেশের মনীষীবৃন্দ সমাগত হইতেছেন, সেই নগরীর প্রাচীন ইতিবৃত্তের কিঞ্চিৎ আলোচনা, আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

কলিকাতার ইতিহাস—অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটি নগরীর অভ্যুত্থানের ইতিহাস। এই নগরীর ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে একটি জাতির ইতিহাস অবগত হওয়া যায়। সে ইতিহাস বৃটিশ অধিকৃত ভারতের ইতিহাস, ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির নব পরিকল্পনায়ণের ইতিহাস, ভাবরাজ্যে বিবর্তনের ইতিহাস, বিজ্ঞানোন্নত পৃথিবীর অন্য অংশের সঙ্গে সমান্তরাল পথে চলিবার প্রয়াসের ইতিহাস।

১৬৯০ সালের ২৪শে অগাষ্ট। ভারতের ইতিহাসের একটি যুগসন্ধিক্ষণ। ভারতে মুঘল শক্তির অবসানে পশ্চিমী শক্তির আধিপত্য স্থাপনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ঐ সময়ে অবশ্য এই দিনটির বিশেষ তাৎপর্য বোঝা যায় নাই; কিন্তু পরবর্তী ইতিহাস অনুধাবনে বোঝা যায় এই দিনটির প্রভাব। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে অগাষ্ট ভারতে বাণিজ্যকারী বিলাতী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হুগলী কুঠীর প্রতিনিধি জবচার্ণক ৪ খানি বাণিজ্য জাহাজ, জনতিরিশেক সৈন্য এবং কিছু সংখ্যক অনুগামী সহ হুগলী হইতে নদীপথে ২৭ মাইল দূরে খাল, নালা, জলা ও জংলাভূমি দ্বারা বেষ্টিত এবং হুগলী নদীর উপকূলে অবস্থিত তিনখানি গ্রাম—সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর অঞ্চলে উপস্থিত হইলেন। ঐ দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সুতানুটির ঘাটে আসিয়া ভিড়িল চার্ণকের বহর। উদ্দেশ্য নূতন স্থানে বসতিস্থাপন এবং ইংরেজদের বাণিজ্যের প্রসার। ভারতে বৃটিশ

সাম্রাজ্যের বীজ উপ্ত হইল সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের মাটিতে। এই তিনখানি গ্রাম ভবিষ্যৎ কলিকাতার আদিমূল। দুরদৃষ্টিসম্পন্ন চার্ণক পূর্বেও দুইবার এই স্থান দেখিয়া গিয়াছিলেন, বুঝিতে পারিয়াছিলেন এই স্থানটির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা। প্রাকৃতিকভাবে সুরক্ষিত হওয়ায় ও জাহাজ চলাচলের উপযোগী নাব্য নদীপথ থাকায় ইহা বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন ও দুর্গ নির্মাণের আদর্শ স্থান। তাই যখন হুগলীর ফৌজদারের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, চার্ণক কালবিলম্ব না করিয়া তখন কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার শাসনকর্তা শাহ সুজা বার্ষিক ৩ হাজার টাকা খাজনার বিনিময়ে ইংরেজ কোম্পানীকে বাংলাদেশে বাণিজ্য করিবার অধিকার দিয়াছিলেন। বিভিন্ন স্থানে কুঠী নির্মাণ করিয়া কোম্পানী ক্রমাগত ব্যবসার প্রসার করিতে লাগিল। কাশিমবাজার, মালদা, ঢাকা, পাটনা ও হুগলীতে কুঠী প্রতিষ্ঠিত হইল। বণিক কোম্পানী, কিন্তু বেনিয়ার মত অহিংস নয়। যেন তেন উপায়ে স্বার্থসিদ্ধিতে কোম্পানী বদ্ধপরিকর। সত্য বটে, কোম্পানীর কাছে মোগল শাসকদের দাবী সময় সময় মাত্রা অতিক্রম করিত। কিন্তু দুঃসাহস বটে কোম্পানীর! রাজশক্তির প্রতিভূ ফৌজদারের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়া হুগলী লুণ্ঠনেও তাহারা পশ্চাদপদ হয় নাই। দেশীয় শাসকদের দুরদর্শিতার অভাব এই ইংরেজ কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্য বিস্তারে সহায়তা করিয়াছিল। যাহা হউক, হুগলী লুণ্ঠনের পর অনতিবিলম্বে চার্ণক কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

ভৌগলিক মানচিত্রে কলিকাতার আবির্ভাব কিন্তু বেশীদিনের কথা নয়। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে হাজার বৎসর আগে এই স্থানের কোন অস্তিত্ব ছিল না। প্রাকৃতিক কারণে ধীরে ধীরে জলের মধ্যে সৃষ্টি হইল ডাঙ্গার। কলিকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলের হইল ভৌগলিক আবির্ভাব। প্রাচীন সাহিত্যে প্রথম কলিকাতার উল্লেখ পাওয়া যায় বিপ্রদাস রচিত মনসামঙ্গল কাব্যে (১৪৯৫ খৃঃ)। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রণীত চণ্ডীকাব্যেও (১৫৭৭ খৃঃ—১৫৯৭ খৃঃ) কলিকাতার উল্লেখ আছে। আকবরের সভাসদ আবুল ফজল তাঁহার আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে কলিকাতাকে সপ্তগ্রাম পরগণার মধ্যে একটি মহালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

কলিকাতার নামকরণ সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন কালিঘাট বা কালিক্ষেত্র হইতে কলিকাতার নাম আসিয়াছে। কাহারো মতে পূর্বে এখানে কলিচুন বিক্রয়ের একটি বড় কেন্দ্র ছিল এবং সেইজন্য এই স্থানের নাম কলিকাতা হইয়াছে। একজন ডাচ পরিব্রাজক এই স্থানকে গল-গথা, অর্থাৎ মাথার খুলিতে ভর্তি নরককুণ্ডের মত স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। গল-গথা কালক্রমে কলিকাতায় পরিণত হওয়া অসম্ভব নহে। কলিকাতার আশেপাশে বহু খানা, খাল ইত্যাদি থাকায় খাল-কাটা কথা হইতেও কলিকাতার নাম আসিতে পারে। কবিরামের দিগ্বিজয় প্রকাশ গ্রন্থে কিলকিলা নামক স্থানের বিবরণ আছে। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এই মত পোষণ করিতেন যে, কিলকিলা হইতেই কলিকাতা নাম আসিয়াছে।

সুতানুটি ও গোবিন্দপুর গ্রাম দুইটির নাম সম্বন্ধেও অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। চার্ণকের আগমনের অনেক পূর্ব হইতেই সুতানুটি সুতা কেনা-বেচার বড় কেন্দ্র ছিল। পর্তুগীজ ও আর্মেনীয় ব্যবসায়ীরা দেশীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এই সুতার ব্যবসা করিতেন। হাটে দেশী চরকায় ও কাটনায় কাটা মিহি ও মোটা সুতা বিক্রয় হইত। সুতার ফেটি বা নুটি হইতে এই গ্রামের নাম সুতানুটি হইয়াছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। মতান্তরে এখানে সুতা ও নটির ব্যবসা চলিত বলিয়া স্থানটির নাম সুতানটি বা সুতানুটি হইয়াছে।

কলিকাতা অঞ্চলের আদি বাসিন্দা শেঠেদের

গৃহদেবতা গোবিন্দজীর নাম হইতে গোবিন্দপুর নাম হইয়াছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। ইহা ছাড়াও প্রবাদ আছে, গোবিন্দ দত্ত নামক এক ব্যক্তি স্বপ্নাদেশে এই অঞ্চলে প্রচুর অর্থের সন্ধান পান। কৃতজ্ঞ গোবিন্দ দত্ত কালীর অর্চনা করিয়া গোবিন্দপুর নামক গ্রামের প্রতিষ্ঠা করেন।

সুতানুটি ও গোবিন্দপুর নাম কালক্রমে অবলুপ্ত হইয়া যায় এবং কলিকাতা নামেরই সমধিক প্রসার ঘটে। ১৭০০ খৃঃ পর্যন্ত কোম্পানীর কাগজপত্রে সুতানুটি নামের ব্যবহার পাওয়া যায়। তাহার পর হইতে শুধু কলিকাতা নামের ব্যবহারই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ স্বরূপ অনুমান করা যায় যে, পর্তুগীজেরা কালিকটে প্রথম ব্যবসা-বাণিজ্য সুরু করেন। বিদেশের বাজারে কালিকটের মালের সুনাম ও চাহিদা ছিল। কালিকটের সহিত কলিকাতা নামের সাদৃশ্য থাকায় কালিকটের পণ্যের সুনামকে কাজে লাগাইবার জন্য ইংরেজ কোম্পানী কলিকাতা নাম ব্যবহার করাই শ্রেয় মনে করিল।

সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর—এই গ্রাম তিনখানি উত্তরে বাগবাজারের খাল হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে টালির নালা পর্যন্ত গঙ্গার ধার ধরিয়া প্রসারিত ছিল। ইহাদের পশ্চিমে গঙ্গা ও পূর্বদিকে ধাপা বা সল্ট লেক অঞ্চল। এই তিন গ্রামের মধ্য দিয়া দুইটি খাল ছিল। একটি গিয়াছিল চৌরঙ্গীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া কালিঘাট পর্যন্ত এবং অপরটি ক্রীক রো-র মধ্য দিয়া ধাপায় পড়িয়াছিল। বর্তমানে যেখানে হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, এই খালটি সেই অঞ্চল দিয়া গিয়াছিল।

চার্ণক কলিকাতায় আসিয়া বসিলেন এবং ইংরেজ বাণিজ্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল তখন এই জায়গা। ধাপার দূষিত বায়ু এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যেও আরম্ভ হইল ভবিষ্যৎ কলিকাতা গঠনের কাজ। দিনে ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ এবং রাত্রিতে তাঁবুতে, কাঁচা ঘরে বা নৌকায় বাস। এইভাবে অসহ্য কষ্টের মধ্যে থাকিয়াও কোম্পানীর বনিয়াদ গঠনের কাজে চার্ণকের অনুগামী ইংরেজেরা আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ধীরে ধীরে কলিকাতার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চার্ণকের চেষ্টায় নানা জাতি, ধর্ম ও বর্ণের লোকেরা কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরে বসবাস ও জীবিকা সন্ধানের আশায় আগমন করিতে লাগিল।

শেঠ ও বসাকেরা কলিকাতার প্রাচীনতম বাসিন্দা। সপ্তগ্রাম বন্দরের পতনের পর তাঁহারা সুতানুটিতে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন এবং হাট পত্তন করেন। শোভারাম বসাকের সুতার হাটের তখন খুব খ্যাতি ছিল। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরদের আদিপুরুষ পঞ্চানন ঠাকুরও কলিকাতার আদি বাসিন্দা ছিলেন। বড়িষা বেহালার সাবর্ণ চৌধুরীরা ছিলেন এই অঞ্চলের জমিদার। কালিঘাটের হালদারদের আদি পুরুষ রামগোবিন্দ, রামশরণ ও যাদবেন্দ্র প্রভৃতিও ছিলেন কলিকাতার (গোবিন্দপুর) প্রাচীনতম বাসিন্দাদের অন্যতম। বর্তমান ডালহৌসী অঞ্চলে চৌধুরীদের পাকা কাছারীবাড়ী ছিল। কথিত আছে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ শ্যামরায়ের দোলের সময় কাছারীর নিকটস্থ দীঘির জল আবিরে লাল হইয়া যাইত এবং তাহা হইতেই লালদীঘি নাম হইয়াছে। ইঁহারা ছাড়াও ইংরেজদের আগমনের পূর্বে ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যপদেশে কলিকাতায় আর্মেনিয়ান ও পর্তুগীজেরা বসবাস করিতেন।

কলিকাতায় আগমনের পর চার্ণক কিন্তু বেশী দিন জীবিত থাকেন নাই। ১৬৯২ সালের ১০ই জানুয়ারী তিনি পরলোক গমন করেন। বর্তমান হেষ্টিংস ষ্ট্রীটস্থ সেণ্টজন চার্চের প্রাঙ্গণে তাঁহার দেহ সমাধিস্থ হয়। ইহার পর কোম্পানীর স্থানীয় কর্তা হইলেন এলিস। কিন্তু তাঁহার কর্মদক্ষতা সম্পর্কে উচ্চতর মহলে কোন আস্থা না থাকায় তিনি শীঘ্রই অপসারিত হইলেন। তাঁহার স্থানে কলিকাতা কুঠীর অধ্যক্ষ হইয়া আসিলেন চার্ণকের জামাতা

চার্লস আয়ার। খুবই কর্মক্ষম লোক তিনি। কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্যের সত্বর প্রসার হইতে লাগিল। এমন সময় কোম্পানীর কমিসারী জেনারেল স্যর জন গোল্ডসবরো কলিকাতা পরিদর্শনে আসিলেন। তিনি কোম্পানীর দপ্তরের জন্য সাবর্ণ চৌধুরীদের পাকা কাছারী বাড়ীটি ভাড়া করিলেন। কলিকাতায় সেই সময় মাত্র দুইটি পাকা বাড়ী ছিল—একটি পূর্বোক্ত কাছারী বাড়ী এবং অন্যটি পর্তুগীজদের প্রার্থনা-গৃহ। দপ্তরের ব্যবস্থা করিয়াই তিনি একটি উপযুক্ত স্থানের সন্ধান করিতে লাগিলেন। অরক্ষিত অবস্থায় কোম্পানী থাকিবে, তাহা মোটেই তাঁহার মনঃপূত হইল না। স্থানের সন্ধান মিলিল, সুতানুটীর দক্ষিণে খাস কলিকাতায়—একটি উঁচু জায়গা—বর্তমানে যেখানে কাষ্টম্‌স্ হাউস, জেনারেল পোষ্ট অফিস প্রভৃতি অবস্থিত। আরম্ভ হইয়া গেল মাটির প্রাচীর দিয়া ঘেরা কুঠী নির্মাণের কাজ। নবাবের বিনা অনুমতিতে এই রকম সুরক্ষিত স্থান নির্মাণের জন্য কোম্পানীর কর্মচারীদের মনে প্রচুর আশঙ্কা ছিল। কিন্তু সুযোগ ঘটিয়া গেল। চেতোয়ার জমিদার শোভা সিংহ সেই সময় আফগান সর্দার রহিম খাঁর সহিত একযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করায় বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা অল্প কিছু দিনের জন্য খুব অনিশ্চিত হইয়া উঠিল। সুতরাং আত্মরক্ষার্থ সুরক্ষিত স্থান নির্মাণে নবাবের অনুমতি লাভ করিতে কোম্পানীর দেরী হইল না।

সৌভাগ্যের ইহা সূত্রপাত মাত্র। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দ। আজিম উশমান বাংলার নবাব। ১৬০০০ টাকার উপহার প্রেরিত হইল তাঁহার নিকট। প্রীত নবাব কোম্পানীকে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা ক্রয়ের অনুমতি দিলেন। মাত্র ১৩০০ টাকায় কোম্পানী গ্রাম তিনখানি ক্রয় করেন এবং মোগল সরকারে দেয় বার্ষিক রাজস্ব নির্ধারিত হইল ১২৮১।৹। এইভাবে উত্তর-দক্ষিণে ৩ মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১ মাইল প্রশস্ত স্থানের উপর ইংরেজদের বৈধ কর্তৃত্ব স্থাপিত হইল। আরম্ভ হইল কোম্পানীর ভূমিস্বত্ব দখলীকরণের ইতিহাস।

১৭০০ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের ইংরেজ কুঠীসমূহ মাদ্রাজ কুঠীর অধীনে ছিল। ইহার পর বাংলাকেই একটি প্রেসিডেন্সি রূপে ঘোষণা করা হয়। ১৭০১ সালে কলিকাতার জনসংখ্যা ছিল আনুমানিক ১০,০০০। ১৭০২ সালে এখানে পাকা বাড়ী ছিল ৮ খানি এবং কাঁচা ঘর ছিল ৮০০০। রাস্তা ছিল ২টি, গলি ২টি এবং পুকুর ১৭টি।

ধীরে ধীরে এই জনপদ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে যে লোকসংখ্যা ছিল, ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে তাহা দ্বিগুণ হইয়া যায়। প্রথম প্রথম যেখানে-সেখানে অসমঞ্জসভাবে বাড়ীঘর নির্মিত হইতেছিল। কর্তৃপক্ষ এই দিকে বিশেষ নজর দিয়া ১৭০৭ সালে একটি আদেশনামা জারী করিয়াছিলেন। উহাতে আছে, যত্র তত্র বিশৃঙ্খলভাবে বাড়ীঘর প্রস্তুত বা পুষ্করিণী খনন চলিবে না। দেশীয় অধিবাসীদের নিকট হইতে জরিমানার টাকা আদায় করিয়া উহা নগর উন্নয়নের কার্যে ব্যয় করা হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সহরের মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থাও রূপ পরিগ্রহ করিল। এদিকে গীর্জা, হাসপাতাল ও শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। ১৭০৯ সালে সাধারণের চাঁদায় ও কোম্পানীর দেওয়া ১ হাজার টাকায় সেণ্ট অ্যান গীর্জা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় লালদীঘির পঙ্কোদ্ধার করিয়া পানীয় জলেরও ব্যবস্থা করা হইল।

১৭১৭ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী আরও কয়েকখানি গ্রাম কিনিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইল। প্রায় দুই বৎসর আগে দিল্লীশ্বর ফরুখ্‌সিয়ারের কাছে কোম্পানী একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। এই দলে ছিলেন জন সারম্যান, এডওয়ার্ড ষ্টিফেনসন, খোজা শেরহ্বাও এবং ডাঃ হ্যামিলটন। প্রচুর উপঢৌকনে তৃপ্ত ও ডাঃ হ্যামিলটনের চিকিৎসা-

নৈপুণ্যে উপকৃত হইয়া সম্রাট ফরুখশিয়ার কোম্পানীকে এক ফরমান দিলেন। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে গঙ্গার উভয় তীরে ৩৮খানি গ্রাম ক্রয়ের অনুমতিও এই ফরমানে দেওয়া হইয়াছিল। গ্রামগুলির নাম যথাক্রমে - শালিখা, হাওড়া, কাসুন্দিয়া, রামকৃষ্ণপুর, ব্যাটরা, বাহির শুঁড়া, শিয়ালদহ, ধলন্দা, বির্জি, তিলজলা, দক্ষিণ পাইকপাড়া, চীৎপুর, হোগলকুড়িয়া, উল্টাডিঙ্গি, দক্ষিণবাড়ী, গোবরা, বাহির দক্ষিণবাড়ী, তোপসে, শাপগাছি, চৌরঙ্গী, কলিঙ্গা, চৌবাঘা, জলা কলিঙ্গা, শ্রীরামপুর ইটালী, ইটালী, গোঁদলপাড়া, কাঁকুড়-গাছি, কুলিয়া, মির্জাপুর, বেলগাছিয়া, শেখপাড়া, শিমলা, মাকন্দা, আকুলী, শুঁড়া, ট্যাংরা, কামার-পাড়া, বাঘমারী। এই ভাবে বৃহত্তর কলিকাতার অঞ্চলগুলিও কোম্পানীর অধিকারে আসিল।

সম্প্রসারণশীল কলিকাতা ১৭৩৭ সালে এক ভীষণ দুর্বিপাকের সম্মুখীন হইয়াছিল। প্রচণ্ড ঝড় ও ভূমিকম্পে অসংখ্য বাড়ীঘর বিধ্বস্ত হইয়া যায়। কথিত আছে এই দুর্যোগে গঙ্গায় ২০,০০০ নৌকা, ছোট ডিঙ্গি, বজরা, ভড় ও জাহাজ নিমজ্জিত হয়। প্রচুর প্রাণহানিও হয়। যাহা হউক, আপ্রাণ চেষ্টায় এই দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি সামলাইয়া কোম্পানী কলিকাতার পুনর্গঠন কার্যে অগ্রসর হয়। কলি-কাতার অধিবাসীবৃন্দও এই কার্যে যথাসাধ্য সহায়তা করিয়াছিল।

কলিকাতা আবার উন্নতির পথে অগ্রসর হইল। এই সময় ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে মহারাষ্ট্রীয় অভিযান আরম্ভ হয়। অশ্বারোহী মহারাষ্ট্র সৈন্যেরা বর্গী নামে পরিচিত। ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে তাহারা বাংলার নানাস্থানে লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। সারা দেশের জনসাধারণ সন্ত্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। বর্গীর আক্রমণ হইতে কলিকাতা রক্ষার জন্য ইংরেজেরা নবাব আলীবর্দী খাঁর নিকট হইতে অনুমতি লইয়া বাগবাজারের নিকট হইতে একটি খাল খনন আরম্ভ করিলেন। পরিকল্পনা ছিল, কলিকাতাকে পূর্বদিকে বেষ্টন করিয়া হেষ্টিংস ষ্ট্রীট পর্যন্ত এই খাল খনন করা হইবে। কিন্তু মাত্র ৩ মাইল খননের পর অর্ধপথে এই কাজ পরিত্যক্ত হয়। অর্ধখনিত এই খালটিই মারাঠা-ডিচ নামে পরিচিত ছিল। কালক্রমে সহরের আবর্জনা ইত্যাদিতে এই খালটি ভরাট হইয়া যায় এবং এই ভরাট জায়গার উপর দিয়া বর্তমান সারকুলার রোড রাস্তাটি বাহির হয়।

বর্গীর হাঙ্গামার সময়কালীন অরাজক অবস্থায় নিশ্চিত আশ্রয় লাভের জন্য সুরক্ষিত কলিকাতা সহরের প্রতি বহুজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ধনরত্ন, পরিবার-পরিজনসহ বহু আশ্রয়কামী কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করিতে লাগিল। আলীবর্দীর দৌহিত্র সিরাজ কিন্তু ইংরেজদের আচরণে প্রীত হইতে পারেন নাই। নবাবী তক্তে আরোহণ করিবার পরই সিরাজের সহিত কলিকাতার ইংরেজ কর্তৃপক্ষের বিরোধ উপস্থিত হয়। এই বিরোধের ফলে সিরাজ সসৈন্যে কলিকাতা আক্রমণ ও অধিকার করেন। অধিকৃত সহরের নাম হইল আলীনগর। কলিকাতার ইংরেজ অধিবাসীরা ফলতায় পলায়ন করেন। ক্লাইভ ও অ্যাডমিরাল ওয়াটসন কর্তৃক অবশ্য কলিকাতা পুনরধিকৃত হয়। সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের আলীনগরের সন্ধি সম্পাদিত হইল।

ইহার পরের ইতিহাস বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়-যন্ত্রের কালিমা কলঙ্কিত ইতিহাস। কলিকাতা ও মুর্শিদাবাদে ষড়যন্ত্র চলিল, সিরাজউদ্দৌলার পতন সংঘটনের জন্য। কলিকাতার অঙ্গুলী সঙ্কেতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ক্ষণ উপস্থিত হইল। ২৩শে জুন, ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতা রবি ১৯০ বৎসরের জন্য অস্তমিত হইল। ইংরেজের পৃষ্ঠপোষিত কলিকাতা অতঃপর বাংলাদেশের রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্যনিয়ন্তা হইল। শুধু বাংলাদেশ কেন, বৃটিশ অধিকৃত ভারতের ভাগ্য বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত এই কলিকাতা মহানগরী হইতেই নিয়ন্ত্রিত

হইত। পলাশী হইতে ১৯১২ সালের ১লা এপ্রিল পর্যন্ত সে ইতিহাস অন্যত্র আলোচ্য।

ক্ষুদ্র গ্রাম কলিকাতা আজ মহানগরীতে পরিণত। ১৭০১ সালে এই কলিকাতার জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১০,০০০, আর বর্তমানে সহরতলীসহ এই স্থানের লোকসংখ্যা ৩৬,৪৬,১১৩ জন (১৯৫১ সালের ১লা মার্চ পর্যন্ত)। ১৯৬১ সালের গণনায় এই সংখ্যা যে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নাই।

শুধু বিপুল জনসংখ্যাই কলিকাতার একমাত্র বিশেষত্ব নয়। নানা বৈচিত্র্যে আকর্ষণীয় কলিকাতা জ্ঞান ও বিজ্ঞান চর্চার পীঠভূমি। প্রতিষ্ঠানিক গৌরবেও কলিকাতা গৌরবান্বিত। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই উপলক্ষ্যে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

এশিয়াটিক সোসাইটি—কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি অতি পুরাতন প্রতিষ্ঠান। ১৭৮৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী ভারতে প্রাচ্যবিদ্যা গবেষণার জন্য সুপ্রীম কোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি প্রখ্যাত পণ্ডিত স্যার উইলিয়াম জোন্স এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০৫ সালে সরকার চৌরঙ্গী ও পার্ক ষ্ট্রীটের সঙ্গমস্থলে একখণ্ড জমি সোসাইটিকে দান করেন। ১৮০৮ সালে সোসাইটির নিজস্ব ভবন নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয়।

ভারতের জ্ঞান ও বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে এশিয়াটিক সোসাইটির দান অসামান্য। সোসাইটির অতি সমৃদ্ধ পাঠাগার ও মিউজিয়াম গবেষকদের নিকট অমূল্য সম্পদ। সোসাইটির নিজস্ব মুখপত্র (জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি) বিদ্বজ্জন সমাজে বহু আদৃত।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স—ভারতের প্রাচীনতম বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের উদ্যোগে ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাঃ সরকারের মনে বহু দিনের আশা ছিল যে, এমন একটি প্রতিষ্ঠান তিনি স্থাপন করিবেন যেখানে ভারতীয় ছাত্রেরা সর্ববিধ সুযোগ-সুবিধার মধ্য দিয়া বিজ্ঞান সাধনায় ব্রতী হইতে পারেন। কয়েকজন বদান্য ব্যক্তির সহায়তায় ডাঃ সরকারের আশা পূর্ণ হইল। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় এই প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদানের ব্যাপার ছাড়া বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। গবেষণা-কেন্দ্র হিসাবে এই প্রতিষ্ঠান প্রসিদ্ধিলাভ করিল ১৯০৭ সালে অধ্যাপক চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটারাম রামনের যোগদানের পর। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে ২১০ নং বৌবাজার ষ্ট্রীটস্থ এই প্রতিষ্ঠানে দেশের নানাস্থান হইতে বিজ্ঞানীরা গবেষণার উদ্দেশ্যে আসিতে লাগিলেন। এই অ্যাসোসিয়েশনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা কালেই অধ্যাপক রামন রয়্যাল সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৩০ সালে তিনি পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৩৩ সালে অধ্যাপক রামনের পর ডাঃ কৃষ্ণান অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক নিযুক্ত হন। এই প্রতিষ্ঠানে গবেষণাকার্যে নিয়োজিত থাকাকালে তিনিও লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হন। অ্যাসোসিয়েশনের ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর স্থানের সমস্যা দেখা দিল। সরকারী অর্থানুকুল্যে যাদবপুরে প্রায় ২৯ বিঘা জমির উপর এই প্রতিষ্ঠানের নূতন বাড়ী তৈয়ারী আরম্ভ হইল। ১৯৫১ সালের গোড়ার দিকে নূতন বাড়ীতে অ্যাসোসিয়েশন স্থানান্তরিত হইল। পরলোকগত ডাঃ মেঘনাদ সাহার উদ্যমে অ্যাসোসিয়েশনের এই উন্নয়ন প্রয়াস সফলতা লাভ করিল।

বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ—১৮৫৭ সালের ২৪শে জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগমনের সাক্ষ্য ইতিহাস বহন করিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে বিজ্ঞানের উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজ বিশ্বের বিজ্ঞানী সমাজের কাছে সুপরিচিত।

এই বিজ্ঞান কলেজ হইতে পরবর্তীকালের বহু যশস্বী ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের উদ্ভব হইয়াছে। দানবীর স্তর তারকনাথ পালিত ৯২ নং আপার সার্কুলার রোডের বাড়ীটি বিজ্ঞান কলেজকে দান করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া ৩৫নং বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে তাঁহার বসতবাটীও তিনি বিজ্ঞান কলেজকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বর্তমানে ঐ বাড়ীতে উদ্ভিদ, প্রাণী ও নৃতত্ত্ব বিভাগের কাজকর্ম চলিতেছে।

বসু বিজ্ঞান মন্দির—বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র বসু বিজ্ঞান মন্দির ১৯১৭ সালে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান কলেজের পার্শ্বেই ৯৩।১, আপার সার্কুলার রোডের উপর এই বিজ্ঞান মন্দির অবস্থিত। কলিকাতার ৩২ মাইল দক্ষিণে ফলতায় এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে কৃষি বিষয়ক গবেষণা পরিচালিত হয়। দার্জিলিং এর মায়াপুরীতেও আচার্য বসু তাঁহার গবেষণা কার্য চালাইয়াছিলেন। বর্তমানেও সেখানে গবেষণা চলিতেছে। অধুনা ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসুর পরিচালনায় বসু বিজ্ঞান মন্দিরে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বহু বিষয়ে মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ—ভারতে বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাসে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের অবদানও নিতান্ত কম নহে। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে লর্ড ডালহৌসী যখন ভারতের গভর্ণর জেনারেল, সেই সময় ১৮৫৫ সালে এই প্রতিষ্ঠান বর্তমান নাম গ্রহণ করে। ১৮২৪ সাল হইতে এখানে বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাদান আরম্ভ হইলেও সুসজ্জিত পরীক্ষাগার ইত্যাদির সাহায্যে বিজ্ঞানানুমোদিত ভাবে শিক্ষাদান আরম্ভ হয় ১৮৭৩ সাল হইতে। বাংলাদেশে বিজ্ঞান গবেষণায় প্রথম উল্লেখযোগ্য অবদান এই প্রেসিডেন্সি কলেজের। আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ জগদ্‌বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরা এই কলেজে সংশ্লিষ্ট থাকা কালেই খ্যাতি অর্জন করেন।

ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল্ ইনষ্টিটিউট—১৯৩১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর সামান্যভাবে যে প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হয়, সেই ভারতীয় সংখ্যা-বিজ্ঞান পরিষদ আজ সমগ্র প্রাচ্যের মধ্যে রাশি-বিজ্ঞান আলোচনার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত হইয়াছে। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের পরিচালনায় এই প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি ভারতকে রাশি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত মর্যাদা দান করিয়াছে। ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নে এই প্রতিষ্ঠানের দান অবিস্মরণীয়। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান হইতে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা আসিয়া এই প্রতিষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন। সম্প্রতি ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৫৬ সালে এই প্রতিষ্ঠানের রজত জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেন—১৭৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে লেঃ কর্ণেল রবার্ট কীডের পরামর্শক্রমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক শিবপুরে বোটানিক গার্ডেন প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ এবং ইঞ্জিনিয়ার কীড্ এই উদ্যানের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। কীডের নিজস্ব সংগৃহীত নানা ধরণের বৃক্ষলতা এবং নানা সূত্রে আহরিত দুর্লভ ও বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ লইয়া এই উদ্যানের সূত্রপাত হয়। ক্রমসম্প্রসারিত এই উদ্যান বর্তমানে ২৭৩ একর পরিমাণ ভূমি অধিকার করিয়া আছে। আয়তনে ইহা পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম বোটানিক্যাল গার্ডেন। এই উদ্যান একাধারে একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান এবং চিত্তাকর্ষক দ্রষ্টব্য স্থান।

জুলজিক্যাল গার্ডেন—সহরের অপর একটি দ্রষ্টব্য এবং বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, আলিপুরের পশুশালা প্রায় ৪৮ একর পরিমিত স্থান অধিকার করিয়া আছে। ১৮৭৫ সালে জনসাধারণের সহায়তায় বঙ্গীয় সরকার কর্তৃক এই পশুশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। তদানীন্তন প্রিন্স অব ওয়েলস, পরবর্তীকালের সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ইহার উদ্বোধন করেন।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম—চৌরঙ্গীর উপরে অবস্থিত

বর্তমান ভারতীয় যাদুঘরের সূত্রপাত হয় এশিয়াটিক সোসাইটির ভবনে। ১৮১৪ সালে ২রা ফেব্রুয়ারী কিছু পুরাকীর্তি সংগ্রহ লইয়া এশিয়াটিক সোসাইটি যাদুঘরের সূচনা করেন। প্রথম অবৈতনিক কিউরেটর নিযুক্ত হইলেন শ্রীরামপুরবাসী বিখ্যাত ডেনিস উদ্ভিদবিজ্ঞানী ডাঃ ন্যাথানিয়েল ওয়ালিস্। ডাঃ ওয়ালিসের পরিচালনায় মিউজিয়ামটি ক্রমশঃই প্রতিষ্ঠা ও প্রসার লাভ করিতে থাকে। অবশেষে ভারত সরকার কলিকাতায় একটি সরকারী মিউজিয়াম স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া ১৮৬৬ সালে কলিকাতা মিউজিয়াম আইন প্রণয়ন করেন। প্রস্তাবিত মিউজিয়ামে এশিয়াটিক সোসাইটি তাহাদের সংগৃহীত ভূতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব সম্পর্কিত সংগ্রহগুলি হস্তান্তরিত করিতে রাজী হইল। বহু ঐতিহাসিক সংগ্রহে এই মিউজিয়াম সমৃদ্ধ। সাধারণের জন্য প্রদর্শিত সংগ্রহ ছাড়াও সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য বহু মূল্যবান সংগ্রহ এখানে সংরক্ষিত আছে। পুরাতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, চারুকলা এবং কৃষিজ ও খনিজ শিল্প—এই ছয়টি বিভাগে মিউজিয়ামের গ্যালারীগুলি বিভক্ত। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা মহানগরীতে আরও অনেক বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে; ইহাদের মধ্যে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা হইল—

সার্ভে অব ইণ্ডিয়া—১৭৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, অবজার্ভেটরী অ্যাণ্ড মিটিওরলজিক্যাল অফিস, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, জুওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া।

রয়্যাল এগ্রি হর্টিকালচার‍্যাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া (১৮২০), ক্যালকাটা মেডিক্যাল ক্লাব (১৯০১), মাইনিং, মেটালার্জিক্যাল অ্যাণ্ড জিওলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট অব ইণ্ডিয়া (১৯০৭), ইণ্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটি (১৯২২), ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি (১৯২৪), জিওলজিক্যাল, মাইনিং অ্যাণ্ড মেটালার্জিক্যাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া (১৯২৪), ইণ্ডিয়ান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েসন (১৯২৫), ইনষ্টিটিউসন অব কেমিষ্টস্ (১৯২৮), ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (১৯২৮), জিওগ্র্যাফিক্যাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া (১৯৩৩), ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া (১৯৩৪), ইণ্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটি (১৯৩৪), সোসাইটি অব বায়োকেমিষ্ট্রী অ্যাণ্ড এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন (১৯৩৪), ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েসন (১৯৩৫), বোটানিক্যাল সোসাইটি অব বেঙ্গল (১৯৩৫), ইণ্ডিয়ান অ্যানথ্রপোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট (১৯৩৬), সায়েন্স ক্লাব (১৯৪০), ক্যালকাটা ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (১৯৪৫), ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব মেটাল্‌স্ (১৯৪৬), জুওলজিক্যাল সোসাইটি অব বেঙ্গল (১৯৪৬), কার্ডিওলজিক্যাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া (১৯৪৬), ইণ্ডিয়ান সাইকিয়াট্রিক সোসাইটি (১৯৪৭), বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ (১৯৪৮), ইণ্ডিয়ান পেডিয়াট্রিক সোসাইটি (১৯৪৮), অ্যানাটমিক্যাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া (১৯৫১)।

মেডিক্যাল কলেজ, স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন (১৯২১), পাস্তুর ইনষ্টিটিউট অব বেঙ্গল (১৯২৪), ইনষ্টিটিউট অব হাইজিন অ্যাণ্ড পাবলিক হেলথ (১৯৩৩), সেণ্ট্রাল গ্লাস অ্যাণ্ড সিরামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট (১৯৪৫), ষ্টেট এগ্রিকালচার‍্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট (১৯৫০), চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হস্‌পিটাল (১৯৫০), ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ইত্যাদি।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৪তম অধিবেশন

মূল সভাপতি ও শাখা সভাপতিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১৪ই জানুয়ারী (১৯৫৭) কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৪তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। সম্মেলনের উদ্বোধন করিবেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু। এই সম্মেলনে মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

ডাঃ বি. সি. রায়

মূল সভাপতি

স্বাধীন ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় নেতা, পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় বাংলা ও বাঙ্গালীর মুক্তিসংগ্রামের মহানায়ক, প্রাতঃস্মরণীয় বীরযোদ্ধা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বংশধর। বিধানচন্দ্রের পিতা প্রকাশচন্দ্র রায় ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁহাদের জীবনের বেশীর ভাগই কাটিয়াছে বিহারের বাঁকিপুর সহরে। ১৮৮২ সালের ১লা জুলাই বিধানচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনের বিশ বৎসর কাটিয়াছে বিহারে। ১৯০১ সালে অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স সহ বি. এ. পাশ করিবার পর তিনি কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। ১৯০৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এল. এম. এস. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯০৮ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ উপাধি এম. ডি. ডিগ্রি লাভ করিয়া বাংলা দেশের বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই কৃতী যুবক যে অদূর ভবিষ্যতেই ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরূপে পরিগণিত হইবেন, বিদ্বন্মণ্ডলীর অনেকেই তখন এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে উন্নততর শিক্ষালাভের জন্য বিধানচন্দ্র সেই বৎসরই বিলাতে যান এবং এক বৎসরের মধ্যেই এল. আর. সি. পি. (লণ্ডন) এবং এম. আর. সি. এস. (ইংল্যাণ্ড) ডিগ্রি অর্জন করেন। তাছাড়া ১৯১১ সালে এম. আর. সি. পি (লণ্ডন এবং এফ. আর. সি. এস (ইংল্যাণ্ড) ডিগ্রিও লাভ করেন। ১৯১১-'১৬ সাল পর্যন্ত তিনি ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে অধ্যাপনা করেন। ১৯১৬ সালে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে (বর্তমানে আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজে) যোগদান করেন।

কলিকাতা মহানগরীতে অল্পকালের মধ্যেই ডাঃ রায়ের চিকিৎসা-ব্যবসায়ে যেরূপ পসার হইয়াছিল, সেকালে তাঁহার সমব্যবসায়ী অনেক উচ্চশ্রেণীর চিকিৎসকের ভাগ্যেও সেরূপ ঘটে নাই।
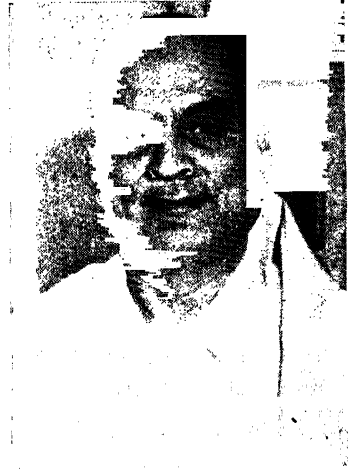
ডাঃ বি. সি. রায়
মূল সভাপতি

চিকিৎসা-বিদ্যায় নানা দিক দিয়া তিনি যে পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন তাহাতে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মন্ত্রিত্ব গ্রহণে আর্থিক দিক দিয়া তাঁহাকে বিপুল ক্ষতি স্বীকার করিতে হইলেও স্বদেশ ও স্বজাতির বৃহত্তর স্বার্থের বিষয় চিন্তা করিয়া তিনি অর্থোপায়ের পথ স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দিয়াছেন ; কিন্তু চিকিৎসাবিদ্যার

চর্চা তিনি এখনও ছাড়েন নাই। মুখ্যমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত থাকিয়াও ডাঃ রায় সপ্তাহে ছয় দিন বিনা পারিশ্রমিকে তাঁহার বাসভবনে নির্দিষ্ট সংখ্যক রোগীর চিকিৎসা করিয়া আসিতেছেন। ইহাতে বহু দরিদ্র রোগী উপকৃত হইতেছে।

ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে গান্ধীযুগ আরম্ভ হইবার পর ১৯২৩ সালে তিনি সর্বপ্রথম রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। সেই বৎসর কংগ্রেসের অনুমোদন লইয়া স্বরাজ্য দল মণ্টেগো-চেমস্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার অনুযায়ী গঠিত আইনসভায় প্রবেশের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন। ডাঃ রায় বিখ্যাত নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে দাঁড়াইয়া স্বরাজ্য দলের পূর্ণ সমর্থনে নির্বাচনে জয়ী হইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং অদ্যাবধি ভারতের সেই সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সক্রিয় সদস্য হিসাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। একাধিকবার তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন এবং বর্তমানেও তিনি উহার সদস্যরূপে কাজ করিতেছেন। তাঁহার ধীর স্থির রাজনীতিক বিচার-বুদ্ধি, বিতর্কের ক্ষমতা, জনসেবায় আগ্রহ, অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য তাঁহাকে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস যখন আবার নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে তখন ডাঃ রায় বাংলার পার্লামেণ্টারী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হইয়া কংগ্রেসের পক্ষে সাফল্যের সহিত নির্বাচন অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি তখন অবশ্য নিজে আইনসভার সদস্যপদের জন্য প্রার্থী হন নাই। ১৯৪৭ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন কেন্দ্র হইতে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ পদত্যাগ করিবার পর ডাঃ রায় ইউরোপ হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস কর্মীদের আহ্বানে নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালে গণতান্ত্রিক ভারত রাষ্ট্রে প্রথম নির্বাচনে তিনি কলিকাতার একটি নির্বাচন কেন্দ্র হইতে জয়লাভ করেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি গান্ধীপন্থী হইলেও বাংলার নির্যাতিত বিপ্লবীরা কোন দিনই তাঁহার সহানুভূতি ও সদয় ব্যবহার হইতে বঞ্চিত হন নাই। বৈপ্লবিক অভিযানের দুঃসাহসী সৈনিকগণের স্বদেশানুরক্তি, আদর্শনিষ্ঠা, ত্যাগ, দুঃখবরণ ও আত্মোৎসর্গের প্রতি তিনি বরাবরই শ্রদ্ধাশীল। ১৯৩১ সালের জুলাই মাসে কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় পৌরাধিপতিরূপে বিপ্লবী বীরদের উদ্দেশ্যে তিনি যে নির্ভীক ও প্রশস্তিপূর্ণ ভাষণে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন তাহা হইতেই ইহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

ডাঃ রায়ের কর্মজীবনে বহুবিধ কৃতিত্বের কয়েকটি বিষয়মাত্র উল্লিখিত হইল :—

১৯২০ সালে তিনি যাদবপুর যক্ষ্মা-হাসপাতাল ও স্যানাটোরিয়াম প্রতিষ্ঠা করেন। চিত্তরঞ্জন সেবাসদনেরও (১৯২৫) তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৩৫ তিনি সোসাইটি অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৩৯ ও ১৯৪৪ সালে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট। ১৯৪৫ সালে চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের সহিত ক্যান্সার হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা করেন। ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব এডুকেশন, যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সভাপতি। ১৯৪২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার নির্বাচিত হন। ১৯৪৪ সালে তাঁহাকে ডি. এস-সি ডিগ্রি (অনারারী) দ্বারা সম্মানিত করা হয়। গত বৎসর ডিসেম্বর মাসের শেষ হইতে যাদবপুর কলেজ বাংলার অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয়রূপে পরিগণিত হইয়াছে এবং ডাঃ রায় উহার বর্তমান সভাপতি।

ডাঃ কে. আর. দীক্ষিত

সভাপতি—পদার্থবিদ্যা শাখা

ডাঃ কে. আর. দীক্ষিত ১৯০৯ সালে জন্মগ্রহণ

করেন এবং বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়, লণ্ডন এবং লাইপজিগে শিক্ষালাভ করেন। এই সময়ে তিনি তিনজন নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক—স্যার জর্জ টমসন, ডাঃ পি. ডিবাই এবং অধ্যাপক ডব্লু. হাইসেনবার্গের সহিত কাজ করিবার সুযোগ লাভ করেন। অনেক বৎসর যাবৎ তিনি বোম্বাইয়ের ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স-এর পদার্থবিদ্যার ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ছিলেন। বর্তমানে তিনি আমেদাবাদের গুজরাট কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত আছেন। তিনি সি. এস. আই. আর (১৯৫৩-'৫৬)-এর ফিজি-

ডাঃ কে. আর. দীক্ষিত
সভাপতি—পদার্থবিদ্যা শাখা

ক্যাল রিসার্চ কমিটি ও কলিকাতার (১৯৫১-'৫৩) ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের গভর্নিং বডির সদস্য ছিলেন। তিনি বোম্বাই, বরোদা, গুজরাট ও পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যায় 'বোর্ড অব ষ্টাডিজ'-এর সদস্য। তিনি ১৯৫০, '৫১, '৫৩ ও '৫৪ সালে ইণ্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটির সহঃ সভাপতি ছিলেন এবং বর্তমানে (১৯৫৫-'৫৬) এই সোসাইটির সভাপতি। পরমাণু এবং নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে তিনি মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন। সলিড ষ্টেট ফিজিক্স, থিন ফিল্ম, সেমিকণ্ডাক্টর, রেক্টিফায়ার এবং ফেরোম্যাগনেটের গবেষণায় তাঁহার অবদান সুবিদিত। পাত্‌লা ফিল্মের পরমাণু বিন্যাস সংক্রান্ত তাঁহার গবেষণা 'দীক্ষিতের নিয়ম' নামে পরিচিত। তিনিই প্রথম কপার অক্সাইড রেক্টিফায়ারের পরিবর্তে ঘন তরল পদার্থ ব্যবহার করিয়া পরীক্ষামূলকভাবে কোন্ অবস্থায় লৌহ নন্-ম্যাগনেটিক আকারে আবির্ভূত হয় তাহা নির্ণয় করিবার পন্থা প্রবর্তন করেন। তিনিই প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণ করেন যে, পজিট্রন কখনও কখনও দুই কোয়াণ্টা বা তিন কোয়াণ্টা উৎপন্ন করিয়া নিজেকে বিলোপ করিতে পারে। পজিট্রোনিয়াম গঠনের ফলে এই অবস্থা ঘটে। মহাজাগতিক রশ্মি সংক্রান্ত গবেষণায়ও তাঁহার অবদান উল্লেখযোগ্য।

অধ্যাপক কে. চন্দ্রশেখরণ
সভাপতি—গণিত শাখা

অধ্যাপক চন্দ্রশেখরণ ১৯৩৫ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করেন এবং প্রিন্সটনের ইনষ্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড্ ষ্টাডির সদস্য হিসাবে তিন বৎসর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অতিবাহিত করেন। ১৯৪৯ সাল হইতে তিনি টাটা ইনষ্টিটিউট অব ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত আছেন। তাঁহার গবেষণামূলক প্রবন্ধ ৩০টিরও বেশী ইউরোপ ও আমেরিকার বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি দুইটি গ্রন্থের রচয়িতা—তন্মধ্যে একটি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এস. বক্‌নারের সহযোগিতায় ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মস্ সংক্রান্ত এবং অপরটি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের এস. মিনাক্ষিসুন্দরমের সহযোগিতায় টিপিক্যাল মিন্‌স্ সংক্রান্ত বিষয়ে লিখিত। তিনি ১৯৫০ সাল হইতে ভারতীয় গাণিতিক সমিতির পত্রিকার সম্পাদক এবং ১৯৫২ সাল হইতে ম্যাথেমেটিক্‌স্ ষ্টুডেণ্ট-এর সম্পাদক।

তিনি ১৯৫০ ও ১৯৫৪ সালে আন্তর্জাতিক গণিত সম্মেলনে বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত ও ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করিয়াছিলেন। অধ্যাপক চন্দ্রশেখরণ ১৯৫০ সালে নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক গাণিতিক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা সভায় এবং ১৯৫৪ সালে হেগে অনুষ্ঠিত এই সঙ্ঘের দ্বিতীয় সম্মেলনে ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি ১৯৫২ সাল হইতে ভারতবর্ষে গণিতের জাতীয় কমিটির

অধ্যাপক কে. চন্দ্রশেখরণ
সভাপতি—গণিত শাখা

আহ্বায়ক ও সম্পাদক। ১৯৫৫ সাল হইতে আন্তর্জাতিক গাণিতিক সঙ্ঘের কার্যকরী সমিতির একজন সদস্য। তাঁহার সভাপতিত্বে ১৯৫৬ সালে বোম্বাইতে জেটা-ফাংসন্‌স্ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আলোচনা ও গাণিতিক শিক্ষা সম্পর্কে দক্ষিণ এশীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির সরকার কর্তৃক গণিতের জন্য স্থাপিত কমিটির তিনি চেয়ারম্যান। তিনি ইউরোপ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়াছেন এবং তথায় বক্তৃতাও দিয়াছেন।

অধ্যাপক এস. এম. মেহতা
সভাপতি—রসায়ন শাখা

অধ্যাপক মেহতা ১৯০২ সালের ৪ঠা মে স্থরাটে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বোম্বাইয়ের এলফিনষ্টোন মিড্‌ল্ স্কুল, এলফিনষ্টোন হাইস্কুল, এলফিনষ্টোন কলেজ এবং রয়েল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স-এ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি যথাক্রমে ১৯২৪ এবং ১৯২৫ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পদার্থ-বিদ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স সহ বি. এ. এবং

অধ্যাপক এস. এম. মেহতা
সভাপতি—রসায়ন শাখা

রসায়ন বিদ্যায় প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ বি. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি বোম্বাইয়ের রয়্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের স্কলার এবং ফেলো (১৯২৫—'২৭) ছিলেন। ১৯২৮ সালে গবেষণার দ্বারা তিনি এম. এস-সি ডিগ্রী লাভ

করেন। তিনি ৩০ বৎসর শিক্ষাক্ষেত্রে জড়িত আছেন এবং বর্তমানে তিনি বোম্বাইয়ের ইনষ্টিটিউট অব্ সায়েন্সের ইনঅর্গ্যানিক কেমিষ্ট্রির অধ্যাপক এবং রসায়নশালার অধ্যক্ষ। ১৯৪২-'৪৩ সালে যুদ্ধের সময় তিনি বোম্বাই সরকারের রাসায়নিক উপদেষ্টা নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং রাওয়ালপিণ্ডির সি. ডি. আর. ই-তে গ্যাসীয় যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্তমানে তিনি রয়াল ইনষ্টিটিউট অব কেমিষ্ট্রির পশ্চিম ভারতীয় বিভাগের সভাপতি। যখন এই শাখা প্রথম স্থাপিত হয় তখন তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ছিলেন। ভারতীয় রাসায়নিক সমিতির বোম্বাই শাখার তিনি সভাপতি ছিলেন এবং বহু কাল তিনি এই সমিতির সম্পাদকের কাজও করিয়াছিলেন। তিনি বোম্বাইতে 'স্কুল অব ইন-অর্গ্যানিক কেমিষ্ট্রি রিসার্চ' গঠন করিয়াছেন। তাঁহার মৌলিক গবেষণা সম্পর্কিত অনেক প্রবন্ধ ভারতীয় এবং বৈদেশিক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯৩৪ সালে তিনি ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেণ্ট অব কেমিক্যাল টেক্‌নোলজীর কলয়েড কেমিষ্ট্রির আংশিক সময়ের জন্য লেক্‌চারার ছিলেন। তাঁহার বহু ছাত্র এম. এস-সি. ও পি-এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন এবং একজন ডি. এস-সি ডিগ্রী পাইয়াছেন। তিনি স্থানীয় দুইটি কলেজের গভর্ণিং বডির সদস্য।

অধ্যাপক এস. এন. দাশগুপ্ত

সভাপতি—উদ্ভিদবিদ্যা শাখা

অধ্যাপক এস. এন. দাশগুপ্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উদ্ভিদবিদ্যায় এম. এস-সি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি ১৯২৬-'৩৩ সাল পর্যন্ত ইউনিভার্সিটি অব লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স অ্যাণ্ড টেক্‌নোলজীতে উদ্ভিদের রোগ নির্ণয় সংক্রান্ত গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ইম্পিরিয়াল কলেজের ওল্ডবয়েজ ফেলোসিপ পুরস্কার লাভ করেন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর অব ফিলোসফি এবং ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রী লাভ করেন।

ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর ১৯৩৪ সালে ডাঃ দাশগুপ্ত লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার রিডারের পদে নিযুক্ত হন। ১৯৪৭-'৫০ সাল পর্যন্ত তিনি প্যারিসে ইউনেস্কোর সদর কার্যালয়ের ন্যাচারাল সায়েন্স ডিভিসনের কৃষিবিজ্ঞানের

অধ্যাপক—এস. এন. দাশগুপ্ত
সভাপতি—উদ্ভিদবিদ্যা শাখা

উপদেষ্টা ছিলেন। পরে উক্ত পদ ত্যাগ করিয়া তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকালটি অব সায়েন্সের ডীন নির্বাচিত হন।

অধ্যাপক দাশগুপ্তের গবেষণার বিষয়গুলি হইতেছে—উদ্ভিদের ছত্রাকঘটিত ব্যাধি, ফিজিওলজি অ্যাণ্ড জেনেটিক্‌স্ অব ফান্জি এবং এয়ার পলিউশন

ড্যামেজ টু ভেজিটেসন উইথ পার্টিকুলার রেফারেন্স টু ম্যাঙ্গো নেক্রোসিস। তিনি একদল সুদক্ষ গবেষক কর্মী তৈয়ারী করিয়াছেন। তিনি ব্যাপক ভিত্তিতে মাইকোলজি, অ্যাকোয়াটিক ও ডার্মাটোফাইটিক ফাঙ্গি সহ প্ল্যান্ট প্যাথোলজি, ভাইরোলজি, মাইক্রোবায়োলজি এবং ডেফিসিয়েন্সি রোগের ক্ষেত্রে গবেষণার সূত্রপাত করেন। স্যালটেসন ইন ফাঙ্গি সম্পর্কিত গবেষণা ব্যতীতও তাঁহার অন্যান্য মৌলিক গবেষণাবলী দেশবিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

তিনি দেশবিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত আছেন। তিনি আন্তর্জাতিক পত্রিকা "Mycopathologia et mycologia applicata" (হল্যাণ্ড)-এর সম্পাদকমণ্ডলীর একজন সদস্য। তিনি ইণ্ডিয়ান বটানিক্যাল সোসাইটি এবং ইণ্ডিয়ান ফাইটোপ্যাথোলজিক্যাল সোসাইটির সভাপতি। এতদ্ব্যতীত তিনি ক্রীড়া ও পর্বতারোহণে উৎসাহী।

ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সিং

সভাপতি—শারীরতত্ত্ব শাখা

ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সিং ভারতবর্ষের চিকিৎসা বিষয়ক গবেষকদের অগ্রণী এবং শারীরতত্ত্বের প্রবীণ অধ্যাপকবৃন্দের অন্যতম। করাচী এবং আগ্রায় তিনি ১২ বৎসরেরও অধিক সময় শারীরতত্ত্বের অধ্যাপক এবং উক্ত বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন।

অক্সিজেন থিরাপী সম্পর্কে গবেষণা করিয়া রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় গ্র্যাজুয়েট হন। তারপরে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রিলাভের জন্য কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিরার মাধ্যমে অক্সিজেন সরবরাহের দ্বারা শ্বাসক্রিয়া ব্যতীত প্রাণীদের সজীব রাখিবার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তাঁহার এই আবিষ্কৃত পদ্ধতি পৃথিবীর সংবাদপত্রসমূহে বিশিষ্ট স্থান লাভ করে। অধ্যাপক সিং-এর এই আবিষ্কার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক, এই উভয় ক্ষেত্রেই গবেষণা চালাইবার ভিত্তি স্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে এই পদ্ধতি আবিষ্কারের পর অন্যান্য প্রয়োজনীয় দৈহিক ক্রিয়া (যেমন বৃক্কের কাজ ও পরিপাক ক্রিয়া) ব্যতীত প্রাণীদিগকে বাঁচান সম্ভব হইয়াছে।

অধ্যাপক সিং ব্ল্যাকওয়াটার ফিভার-এর নূতন চিকিৎসা-পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তাঁহার আবিষ্কৃত চিকিৎসা-পদ্ধতি গত যুদ্ধের সময় আসামের সৈন্য-

ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সিং
সভাপতি—শারীরতত্ত্ব শাখা

বাহিনীর এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইয়াছিল। এই চিকিৎসা-পদ্ধতির ফলে এই ভয়াবহ ব্যাধিতে মৃত্যু হইত না বলিলেই চলে।

অধ্যাপক সিং পেশীসংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন। পেশীসংক্রান্ত তাঁহার উচ্চস্তরের মৌলিক গবেষণা বিশ্বের বৈজ্ঞানিকগণের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। পেশীসঙ্কোচন সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নূতন এক মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রোটিনের প্রকৃতি পরিবর্তন এবং প্রোটিও-লিটিক এন্‌জাইমের কর্মধারা সংক্রান্ত গবেষণায় অধ্যাপক সিং-এর মৌলিক অবদান উল্লেখযোগ্য। তাঁহার এই মৌলিক গবেষণা রাশিয়ায় যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করিয়াছে।

সম্প্রতি অধ্যাপক সিং মানুষের উচ্চ রক্তচাপের কারণ সম্পর্কে গবেষণা করিতেছেন। আমাদের খাদ্যভুক্ত লবণ কিরূপে রক্তচাপাধিক্য ঘটায়, ইহা তাঁহার গবেষণায় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

ডাঃ এস. এম. মহসীন

সভাপতি—মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞান শাখা

ডাঃ এস. এম. মহসীন ১৯১২ সালে বিহারের এক সম্ভ্রান্ত ও উচ্চশিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাটনার রামমোহন রায় সেমিনারী ও পাটনা কলেজ হইতে প্রশংসার সহিত তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি

ডাঃ এস. এম. মহসীন
সভাপতি—মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞান শাখা

মনস্তত্ত্বে গভর্ণমেণ্ট রিসার্চ স্কলার এবং ১৯৩৮ সালে পাটনা কলেজের দর্শন বিভাগের লেকচারার নিযুক্ত হন। ইহার অল্প কিছুদিন পরে তিনি হিন্দিতে গ্রুপ টেষ্ট অব ইনটেলিজেন্স-এর মান নির্ণয় করেন। এই দেশে বুদ্ধি পরীক্ষার যে সামান্য কয়েকটি উন্নত পদ্ধতি চালু আছে তন্মধ্যে ডাঃ মহসীনের পদ্ধতি অন্যতম। ডাঃ মহসীন ১৯৪৮ সালে এডিনরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মনস্তত্ত্বে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। সেখানে তিনি স্বর্গতঃ সার জি. টমসনের (শিক্ষা শাস্ত্রের অধ্যাপক) সান্নিধ্য লাভ করেন। তাঁহার প্রেরণায় ডাঃ মহসীন বুদ্ধির পরিমাপ নির্ণয়ে উৎসাহিত হন।

বুনিয়াদি ও প্রচলিত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কিত আগ্রহ ও ব্যক্তিত্বের উন্নতি সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য ১৯৫৩ সালে বিহার গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিয়োজিত কমিশনের সহিত ডাঃ মহসীন সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই কমিশনের রিপোর্ট এই সম্পর্কিত ভবিষ্যৎ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে একটি আদর্শ রিপোর্ট হিসাবে গণ্য হইয়াছে। ডাঃ মহসীনের সাইকোমেট্রিকস্ ও লেবরেটরী সাইকোলজি সম্পর্কিত মৌলিক গবেষণাবলী দেশ-বিদেশে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি বিদ্যালয়ের বিষয় সম্পর্কিত অবজেকটিভ টেষ্ট ও বুদ্ধি পরীক্ষার কয়েকটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন।

বিহাররাজ্য সরকারের আমন্ত্রণে ডাঃ মহসীন ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এডুকেশন্যাল এবং ভোকেশন্যাল গাইডেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টরের পদ গ্রহণ করেন এবং তিনিই এই প্রতিষ্ঠান বিহার রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক এম. এন. শ্রীনিবাস

সভাপতি—নৃতত্ত্ব শাখা

অধ্যাপক শ্রীনিবাস ১৯১৫ সালের নভেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং মহীশূর, বোম্বাই ও অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করেন। তিনি ১৯৪০ হইতে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের রিসার্চ অ্যাসিষ্টাণ্ট ও রিসার্চ ফেলো ছিলেন। তিনি ১৯৪৫—'৪৭ সালে অক্সফোর্ডে কার্নেগী গবেষণা সাহায্য পান। ১৯৪৮—'৫১ সাল পর্যন্ত

তিনি অক্সফোর্ডে ভারতীয় সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে ইউনিভার্সিটি লেকচারার হিসাবে কাজ করেন এবং ১৯৫১ সালে ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক অনুশীলন সম্পর্কিত সিম্যান রিসার্চ ফেলো ছিলেন। অধ্যাপক শ্রীনিবাস ১৯৫১ সাল হইতে বরোদার এম. এস. ইউনিভার্সিটির সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক। দেশীয় রীতিনীতি, জাতি, বংশ-

অধ্যাপক এম. এন. শ্রীনিবাস
সভাপতি—নৃতত্ত্ব শাখা

সম্পর্ক, গ্রাম সংগঠন এবং দক্ষিণ মহীশূর ও কুর্গের বিভিন্ন স্থানে তাঁহার গবেষণা অবলম্বনে তিনি অনেক মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত উল্লেখযোগ্য পুস্তক, মহীশূরের পরিবার এবং বিবাহ (১৯৪২), দক্ষিণ ভারতস্থ কুর্গের অধিবাসীদের ধর্ম ও সমাজ (১৯৫২)।

ডাঃ এম. বি. লাল

সভাপতি—প্রাণিতত্ত্ব শাখা

ডাঃ এম. বি. লাল ১৯০৭ সালের ৩১শে জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন এবং লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার অধিকাংশ শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়। তিনি ১৯২৮ সালে প্রথম শ্রেণীতে এম. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন এবং ইউনিভা।সটি রিসার্চ ফেলোসিপ অর্জন করেন। ১৯২৯ সালে প্রাণিবিদ্যার ডেমনষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন এবং লক্ষ্ণৌ হইতে ডি.এস-সি ডিগ্রী লাভ করিবার পর তিনি ১৯৩৭ সালে লেকচারার পদে উন্নীত হন। ১৯৪৬ সালে তিনি গ্রেট বৃটেনে যান এবং এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে

ডাঃ এম. বি. লাল
সভাপতি—প্রাণিতত্ত্ব শাখা

দুই বৎসর অতিবাহিত করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন এবং ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি প্রাণিবিদ্যার রীডার নিযুক্ত হন। ১৯৫২—'৫৩ সালে দ্বিতীয়বার তিনি যুক্তরাজ্যে ভ্রমণ করেন এবং সেখানকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা-কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করেন। তিনি ১৯৫৪ সালে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থার সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছেন। তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব জুওলজির সভাপতি,

ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স এবং জুওলজিক্যাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার ফেলো। ১৯৫৫ সালে আন্তর্জাতিক জীববিজ্ঞান ইউনিয়নের সাধারণ সম্মেলনে তিনি ভারত সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ইউনিয়নের নয়জন সদস্যবিশিষ্ট আন্তর্জাতিক প্রাণিবিজ্ঞান কমিটির একজন সদস্য নির্বাচিত হন। হেল্‌মিন্‌থোলজি সম্পর্কে ডাঃ লাল প্রধানতঃ গবেষণা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং পরীক্ষামূলক প্রাণিবিদ্যার ক্ষেত্রে তাঁহার মূল্যবান গবেষণা রহিয়াছে।

ডাঃ পি. কে. বসু

সভাপতি—পরিসংখ্যান শাখা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ফলিত গণিতে মাষ্টার ডিগ্রী লাভ করিবার পর ডাঃ বসু কলিকাতার ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটে যোগদান করেন এবং সেখানে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত পরিসংখ্যানবিদ্ হিসাবে কাজ করেন। তাহার পরে তিনি ১৯৪২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানের স্নাতকোত্তর বিভাগে যোগদান করেন এবং ১৯৫০ সালে অধ্যক্ষ হন। ১৯৪৪ সালে যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে পরিসংখ্যান শাখা স্থাপন করা হয় তখন তিনি সেখানে এক বৎসরের জন্য লেকচারার হিসাবে কাজ করেন। তিনিই প্রথম পরিসংখ্যানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব ফিলসফি ডিগ্রীলাভ করেন। তিনি তত্ত্বীয় ও ফলিত পরিসংখ্যান বিষয়ে গবেষণামূলক অনেক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন এবং বিভিন্ন পরিসংখ্যানিক সমীক্ষা পরিচালনা করিয়াছেন।

ডাঃ বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে ১৯৫০ সালে নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯৫৪ সালে আমষ্টার্ডামে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক গণিত সম্মেলনে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যালকাটা ম্যাথেমেটিক্যাল সোসাইটি এবং ক্যালকাটা ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল সোসাইটির প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন। তিনি ট্রায়ার-এ অনুষ্ঠিত জার্মান পরিসংখ্যান সম্মেলনে এবং ১৯৫৪ সালে বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত যুগোশ্লাভ পরিসংখ্যান সম্মেলনে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ইউরোপ ভ্রমণকালে যুক্তরাজ্য, জার্মেনী, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ইটালীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হেগ-এ অবস্থিত আন্তর্জাতিক ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল

ডাঃ পি. কে. বসু
সভাপতি—পরিসংখ্যান শাখা

ইনষ্টিটিউট এবং জেনেভার আন্তর্জাতিক শ্রমদপ্তরের কার্যালয় পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ডাঃ বসু প্ল্যানিং কমিশনের পক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান ও অর্থনীতি শাখা পরিচালিত কলিকাতার সামাজিক, অর্থনৈতিক সমীক্ষার যুগ্ম-পরিচালক। তিনি নয়া দিল্লী ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচার্যাল রিসার্চ-এর পরিসংখ্যান কমিটি, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত কৃষি ও অর্থনৈতিক গবেষণা কেন্দ্রের জন্য ভারত সরকারের অর্থনীতি ও পরিসংখ্যানের পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি ও উড়িষ্যা

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান কমিটির সদস্য। ডাঃ বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য এবং কলিকাতা পরিসংখ্যান সমিতির সম্পাদক।

ডাঃ সি. আর. দাশগুপ্ত

সভাপতি—চিকিৎসা ও পশু-চিকিৎসা শাখা

ডাঃ দাশগুপ্ত ১৯০০ সালে পূর্ব পাকিস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯২৪ সালে কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ হইতে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৩ সালে তিনি ডিষ্টিংশন সহ ডি. টি. এম পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বুবর্ণ পদক পুরস্কার পান। তিনি কলিকাতার স্কুল অব

ডাঃ সি. আর. দাশগুপ্ত
সভাপতি—চিকিৎসা ও পশু-চিকিৎসা শাখা

ট্রপিক্যাল মেডিসিনে সহকারী গবেষক হিসাবে কাজ করেন (১৯২৫—১৯৫৫) এবং ১৯৪২ সালে হিমাটোলজির গবেষক হিসাবে উক্ত বিভাগের পূর্ণ-দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি কিছু দিনের জন্য স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ডেপুটি ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি রকফেলার ফাউণ্ডেশন ফেলোসিপ পান এবং এক বৎসর লণ্ডনের সেণ্ট বারথোলমিউ হাসপাতালে অধ্যাপক এল. জে. উইট্‌স্-এর সহিত কাজ করেন। পরে তিনি হিমাটোলজি সম্পর্কিত ইউরোপের বিভিন্ন গবেষণা-কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। ১৯৫০ সালে কেম্ব্রিজে আন্তর্জাতিক রক্ত-বিজ্ঞান সম্পর্কিত সমিতির অধিবেশনে এবং নিউইয়র্কে বিশ্বচিকিৎসক সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি আমেরিকার বিভিন্ন হিমাটোলজি সম্পর্কিত গবেষণা-কেন্দ্রও পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে রক্ত-বিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণায় ডাঃ দাশগুপ্তের অবদান অত্যন্ত মূল্যবান। স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে রক্ত-বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিভাগ স্থাপন ও ইহার উন্নতি-সাধনে ডাঃ দাশগুপ্তের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। তিনি রক্ত-বিজ্ঞান সম্পর্কিত ১০০টিরও বেশী মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি গর্ভকালীন রক্তাল্পতা সম্পর্কে একটি মনোগ্রাফ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি Haematological Technique নামক পুস্তকের যুগ্ম লেখকের একজন। ডাঃ দাশগুপ্ত ১৯৫০ সালে বৈজ্ঞানিক কর্মী সমিতির কলিকাতা শাখার সভাপতি ছিলেন এবং ১৯৫১ সালে ইণ্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল কংগ্রেসের ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিষ্ট্রি শাখার সভাপতি ছিলেন। তিনি জার্নাল অব হিমাটোলজির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। এতদ্ব্যতীত তিনি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকা ও দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন।

ডাঃ জি. পি. চাটার্জী

সভাপতি—ইঞ্জিনীয়ারিং ও ধাতুবিজ্ঞান শাখা

ডাঃ জি. পি. চাটার্জী ১৯০৯ সালের ১৫ই মে জন্মগ্রহণ করেন। ডাঃ চাটার্জী ১৯২৯ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে পদার্থবিদ্যায় অনার্স সহ স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩১ সালে তিনি জামসেদপুরের টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউট হইতে গ্রাজুয়েট ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি টাটা আয়রন

অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর কাজে নিযুক্ত হন এবং পরে হাওড়ার বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যোগদান করেন। ফাইনাল বি. মেট. পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি

ডাঃ জি. পি. চাটার্জী
সভাপতি—ইঞ্জিনীয়ারিং ও ধাতুবিজ্ঞান শাখা

পাইয়া ১৯৪৩ সালে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে সর্বাধিক নম্বর পাইয়া বি. মেট. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি টাটা আয়রন অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানীতে সতেরো বৎসরের অধিক সময় কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। তৎপরে তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন এবং পিট্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৪৮ সালে ধাতুবিজ্ঞানে এবং ১৯৪৯ সালে পদার্থবিদ্যায় ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ধাতুবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন এবং ১৯৫২ সালে রসায়ন ও ধাতুবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। ডাঃ চাটার্জীর ৭০টির বেশী মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটি প্রবন্ধের জন্য তিনি স্বর্ণপদক পুরস্কার পাইয়াছেন। ভারত সরকারের মেটাল রিসার্চ কমিটি, জামসেদপুরস্থ ন্যাশন্যাল মেটালার্জিক্যাল লেবরটরীর সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইসরি কমিটি, কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ প্রভৃতি সংস্থার ডাঃ চাটার্জী সদস্য। এতদ্ব্যতীত ডাঃ চাটার্জী আরও বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য সংস্থার সহিত যুক্ত আছেন। ডাঃ চাটার্জী একজন ভাল ব্যায়ামবিদ ও খেলোয়াড়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—ভূগোল ও ভূ-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন—ডাঃ ভবেশচন্দ্র রায় এবং কৃষিবিজ্ঞান শাখার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন, ডাঃ এ. এস. নারায়ণ; কিন্তু যথাসময়ে তাঁহাদের জীবন বৃত্তান্ত হস্তগত না হওয়ায় এখানে প্রকাশ করা সম্ভব হইল না।—স।

একখানা চিঠি

সম্পাদক মহাশয়,

আপনার কাছে একটি চিঠি পাঠালাম, যেটি ৺প্রমথনাথ চৌধুরী (বীরবল) লিখেছিলেন চল্লিশ বৎসর পূর্বে, বিজ্ঞান পরিষদের বর্তমান সভাপতি মহাশয়কে। মনে হয়, পত্রটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। একজন 'সবুজ-পাত্রিক' হিসাবে আমি বন্ধুবর সত্যেন বোসকে যখন নিয়ে যাই প্রমথবাবুর কাছে, তার অল্পদিন পরেই এই পত্রটি লেখা। সবুজ পাতায় বসু মহাশয়ের কোন রচনা রূপায়িত হয় নি বটে, কিন্তু 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'

পত্রিকায় বীরবলের প্রিয় আদর্শ আজ প্রিয়দর্শন রূপ নিয়ে বিরাজমান। সুতরাং 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' হচ্ছে পরলোকগত 'সবুজ পত্রের' উত্তরাধিকারী এবং স্মৃতিতর্পণ কার্যে আপনাদের সভাপতির বিশেষ অধিকার আছে। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথাও স্মরণীয়। প্রমথনাথই অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিশ্ব-পরিচয়' গ্রন্থটি সত্যেন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। সেই যোগসূত্র ধরে আমরা আনন্দ অনুভব করতে পারি যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারের সাধনায় সিদ্ধিলাভের বৈজ্ঞানিক সহায়ক আজ বিশ্ব-ভারতীর কূটস্থানে সমাসীন।

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

বীরবলের চিঠি

(বিশ্ব-ভারতীর উপাচার্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে লিখিত পত্র)

১নং ব্রাইট ষ্ট্রীট, বালিগঞ্জ ২৪-১১-১৬

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীমান হারিতকৃষ্ণ লিখেছেন যে, নানা কারণে তাঁর পক্ষে কাল বিকেলে এখানে আসার সুবিধে হবে না। তবে আপনি যদি আসেন তো বড় সুখী হব। যাঁরা লেখাপড়া করেছেন অর্থাৎ মন নামক পদার্থটির চর্চ্চা করেছেন তাঁদের সঙ্গে আমি মিসতে, কথাবার্ত্তা কইতে ভালবাসি। পরস্পরের ভাবের আদান প্রদানে যে আনন্দ পাওয়া যায় শুধু তাই নয়, শিক্ষাও পাওয়া যায়। আমাদের নতুন মনোভাব সব অবশ্য আমরা সকলেই বই থেকেই পেয়েছি কিন্তু সেই সব বইয়ের কথা প্রতি লোকের মনের ভিতর থেকে অল্পবিস্তর নূতন মূর্ত্তি ধারণ করে বেরিয়ে আসে। যেন মরা জিনিষ জ্যান্ত হয়ে ওঠে। মুখের কথার ভিতর যে প্রাণ ও বৈচিত্র্য আছে তা লেখার কথায় সচরাচর পাওয়া দুর্ঘট। এই কারণেই আমি নিজে বকতে ও পরের কথা শুনতে এত ভালবাসি। তা ছাড়া যাঁরা পড়েছেন তাঁদের আমি লেখাতে চাই। কেননা বাঙ্গালা সাহিত্যে জ্ঞানের দিকটে আজ পর্য্যন্ত ফাঁক রয়ে গিয়েছে। আর যতদিন বাঙ্গালা সাহিত্য জ্ঞানের ভাণ্ডার না হবে ততদিন উঁচু দরের কাব্য ও সমালোচনার জন্যও আমাদের দু-একটি প্রতিভাশালী লেখকের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। এক বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের লেখা বাদ দিয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন কিছু থাকে না যা ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া যায়—তা নিয়ে গৌরব করা ত দূরের কথা। আর বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যে যুগে যুগে জন্মাতে বাধ্য প্রকৃতির এমন কোনও বাঁধা নিয়ম নেই। সাহিত্যের গ্লানি হলে এ ভূভারতে প্রতিভাশালী লেখক অবতীর্ণ হতে বাধ্য এ কথা শাস্ত্রেও লেখে না। সুতরাং আমাদের মত প্রতিভাহীন লোকদের পক্ষে আমরা যেটুকু জ্ঞান বিজ্ঞান সঞ্চয় করেছি তার ভাগ দেশের লোককে দেওয়াটা কর্ত্তব্য। এই কারণেই আমি আপনাকে "সবুজপত্রের" আসরে নামাতে চাই।

আমার এখানে আসা অবশ্য তেমন সহজ নয়। কেননা আমি বাসা বেঁধেছি—প্রথমতঃ সহরের বাইরে তারপরে একটেরে। বোধ হয় ঐ কারণে সাহিত্য সমাজেও আমি কতকটা একঘরে হয়ে রয়েছি। কি সমাজে কি সাহিত্যে নাগরিক হওয়াটা আমার ধাতে নেই। সে যাই হোক আপনার যদি সুবিধে হয় তাহলে কাল বেলা সাড়ে তিনটের সময় ল-কলেজে উপস্থিত হলে, আমি আপনাকে আমার সঙ্গে নিয়ে আসতে পারি। তাহলে এতটা পথ উজোন ঠেলে আসবার কষ্টটা আপনাকে পেতে হয় না।

ইতি—**শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী**

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জানুয়ারী—১৯৫৭

দশম বর্ষ : ১ম সংখ্যা
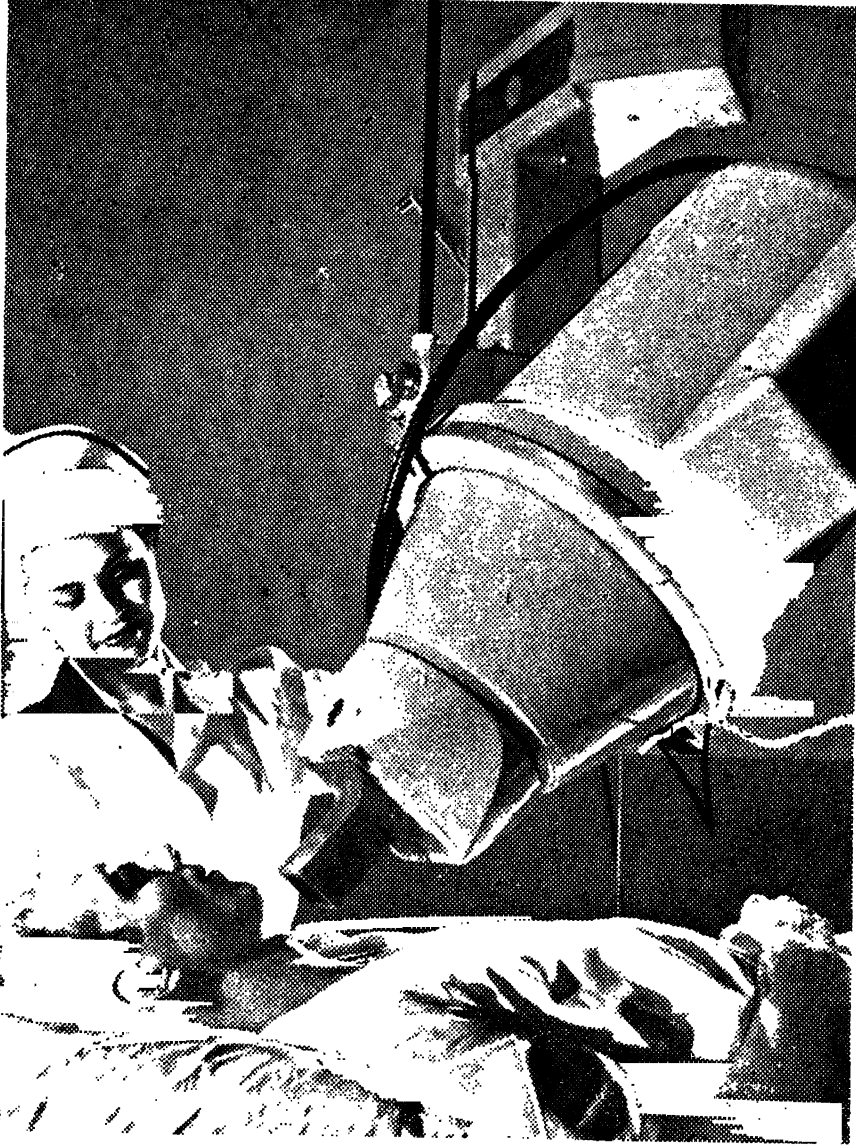
ওকরিজ হাসপাতালে কোবাল্ট থিরাপি ইউনিটের সাহায্যে একজন রোগীর এক্স-রে নেওয়া হচ্ছে। প্রায় কুড়ি লক্ষ ভোল্ট শক্তিবিশিষ্ট এক্স-রে যন্ত্রের কাজ এটির সাহায্যে সম্পন্ন হতে পারে।

জেনে রাখ

লোহার কাহিনী

অতি প্রাচীনকালের কথা, মানুষ তখন রান্না বা চাষ-আবাদ প্রভৃতি কিছুই জানতো না। জীবনধারণের জন্যে দিনের পর দিন তাকে নির্ভর করতে হতো শুধু গাছের ফলমূল আর জীবজন্তুর মাংসের উপর। গাছের ফলমূল না হয় খোঁজাখুজি করে এমনিতেই পাওয়া যেত ; কিন্তু প্রাণী শিকার করে মাংস সংগ্রহ করবার কাজটা বড় সহজ ছিল না। এর কারণ, তখনকার দিনে কোন রকম ধাতুর আবিষ্কার হয় নি ; মানুষ তখন কেবলমাত্র পাথরের অস্ত্রশস্ত্রই ব্যবহার করতো। এতে তো আর মানুষের সব প্রয়োজন মিটতো না ! সুতরাং আরও ভাল কিছু দিয়ে ভাল অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর জন্যে মানুষ গোড়া থেকেই সচেষ্ট ছিল। শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনের তাগিদে তারা পাথর থেকেই লোহার আবিষ্কার করে ফেললো। অবশ্য সেই সময় লোহা যে কি জিনিষ, তা তারা বুঝতো না বটে, তবে এটা যে একটা শক্ত ও খুব দরকারী ধাতু—সেটা তারা বুঝেছিল এবং তারপরে পাথরের বদলে লোহার ব্যবহারও তারা আরম্ভ করেছিল।

আমরা যে পরিমাণ লোহা ব্যবহার করে থাকি তার বেশীর ভাগই পৃথিবীর বুক থেকে সংগ্রহ করা হয়। মাটির নীচে স্তরে স্তরে সাজানো থাকে লোহার খনিজ। বৈজ্ঞানিকদের মত এই যে, ভূ-পৃষ্ঠের গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই লোহারও সৃষ্টি হয়েছিল। তবে একেবারে বিশুদ্ধ লোহা একমাত্র উল্কাপিণ্ড থেকেই পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই উল্কাপিণ্ডগুলি আকাশের বুক থেকে ছুটে এসে পৃথিবীতে পড়ে না বলেই পৃথিবীতে যৎসামান্য এই ধরণের লোহা দেখা যায়।

লোহা আবিষ্কারের পর থেকেই মানুষ লোহাকে নানারকম ভাবে ব্যবহার করবার চেষ্টা করে আসছিল। এশিয়া মহাদেশের আদিম অধিবাসীরা লোহার নানারকমের ব্যবহার শিখেছিল। এসিরীয় জাতি লোহার রথ তৈরী করতো। শুধু তাই নয় তারা তাদের ঘোড়ার সাজের মধ্যে লোহার তৈরী নানারকমের অলঙ্কারও বসাতো। প্রাচীন-কালের মানুষেরা লোহার সঙ্গে সঙ্গে ষ্টীলের ব্যবহারও শিখেছিল। ষ্টীল কি করে তৈরী করা হয় জানো ? লোহার সঙ্গে কিছু কার্বন মিশিয়ে ষ্টীল তৈরী করা হয়। তবে সেই সময়ে লোহা ও ষ্টীলের দাম খুব বেশী পড়তো। এর কারণ লোহার খনিজ থেকে লোহা পৃথক করে নিতে তখন যথেষ্ট সময় লাগতো, আর পরিশ্রমও হতো যথেষ্ট।

লোহার খনিজ আকর আগুনের উত্তাপে গালিয়ে লোহাকে খনিজ থেকে পৃথক করা হয়। প্রথম দিকে এই লোহার খনিজ গলানোর কাজ খুব সহজ পদ্ধতিতে করা হতো। খনিজকে আগুনে গালিয়ে নেওয়ার কাজে মানুষ ক্রমেই বুঝতে শিখলো যে, আগুনের উত্তাপ যতই বাড়ানো যাবে ততই বেশী পরিমাণ লোহা তৈরী করা যেতে পারে। এই

রকম চিন্তার ফলে সবাই পাহাড়ের উপরে অথবা যে জায়গায় বায়ুপ্রবাহের জোর বেশী—এমন জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে লোহা তৈরী করতে লাগলো। আগুনের মধ্যে দিয়ে জোরে বাতাস প্রবাহিত হওয়ার ফলে উত্তাপ ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে বিশেষ অসুবিধা ছিল। বাতাস তো আর সব সময়েই সমানভাবে প্রবাহিত হয় না। আবার আগুনের উত্তাপ বাড়াতে গেলে জোরালো বায়ুপ্রবাহেরও দরকার। কাজেই প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ কৃত্রিম উপায়ে জোরালো বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টির ব্যবস্থা করলো।

প্রথম দিকে কারিগরেরা একটা নলের ভিতর ফুঁ দিয়ে হাওয়া চালিয়ে আগুনের উত্তাপ বৃদ্ধি করতো। এখনো তোমরা দেখে থাকবে যে, আমাদের দেশের স্বর্ণকারেরা সোনা গালাবার সময় এই পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু লোহা গলাবার বেলায় এই পদ্ধতি বড়ই শ্রমসাধ্য ছিল। তাছাড়া কাজ শেষ করতে সময়ও লাগতো যথেষ্ট। তারপর আরও জোরালো বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টির জন্যে বিভিন্ন রকম যন্ত্র উদ্ভাবিত হলো; সেগুলির সাহায্যে আগুনের মধ্যে তীব্রবেগে বাতাস চালানোর কাজ বেশ ভালভাবেই চলতো। এই যন্ত্রগুলির কোন কোনটা হাতে বা পায়ের সাহায্যে চালাতে হতো। আবার কোনটা বা চালানো হতো জল-শক্তির সাহায্যে। এরপরে হতে থাকে লোহা-গলানো চুল্লীর ক্রমবিকাশ।

প্রাথমিক পর্যায়ের চুল্লীতে ভাল ভাবে লোহা গলানোর কাজ হতো না। এতে কয়েক পাউণ্ড লোহা তৈরী করতে গেলে বেশ কিছুদিন সময় লাগতো। ক্যাটালোনিয়ার স্পেনিশ লৌহকারেরা লোহা তৈরীর একরকম নতুন যন্ত্র তৈরী করেছিল। এর চুল্লীটাও ছিল নতুন ধরণের। মস্ত একটা যন্ত্রের সাহায্যে জোরালো বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি করে তা এই চুল্লীর ভিতরে চালনা করা হতো। এই ধরণের চুল্লী মধ্যযুগেই বেশী প্রচলিত ছিল।

লোহার চাহিদা যতই বেড়ে উঠতে লাগলো, লৌহকারেরা ততই বড় বড় চুল্লী তৈরী করবার জন্যে তৎপর হয়ে উঠলো। এর পরে অসুবিধা দেখা দিল জ্বালানী কাঠের অভাবে। দেশে যা কিছু গাছপালা আছে, লোহা উৎপাদন করতে তার সবটাই যদি পুড়িয়ে ছাই করে দেয়, তাহলে অন্যান্য কাঠের তৈরী জিনিষের প্রয়োজন মিটবে কি করে? এক একবার লোহা গলাবার সময় রাশি রাশি কাঠের দরকার হয়। সেকালে ইংল্যাণ্ডের লৌহকারেরা দেশের এত গাছ কেটে ফেলেছিল যে, সাধারণ লোকের বাধাদানের ফলে জ্বালানীর জন্যে গাছ কাটা নিষিদ্ধ করে তখনকার গভর্ণমেণ্ট একটা আইন জারী করেছিলেন। অবশ্য এর পরবর্তী স্তরে কয়লার আবিষ্কারের ফলে এই সব অসুবিধা একেবারেই দূরীভূত হয়েছিল।

রেলগাড়ী আবিষ্কারের পর থেকেই লোহা ও ষ্টীলের চাহিদা অত্যধিক রকমে বাড়তে থাকে। ক্রমে নানারকম শিল্পের ক্ষেত্রেও লোহা ও ষ্টীল অতীব প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃতি পেতে থাকে। বর্তমান যুগে লোহা না থাকলে মানুষের জীবনযাত্রা, সভ্যতা, সংস্কৃতি প্রভৃতি সবই একেবারে অচল হয়ে পড়বে।

কাজের সুবিধার জন্যে লোহা আবিষ্কারের গোড়া থেকেই বিভিন্ন লোকের প্রচেষ্টার ফলে লোহা গলানো চুল্লীর উন্নতিও হয়েছিল যথেষ্ট। আধুনিক কালে লোহার কারখানায় যে চুল্লী ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় বাত্যা-চুল্লী। মাটি খুঁড়ে লোহার খনিজকে বের করে নিয়ে আসা হয় কারখানায়। তারপর তার সঙ্গে কোক, লাইমষ্টোন প্রভৃতি মিশিয়ে বাত্যা-চুল্লীতে ঢালা হয়। চুল্লীর প্রচণ্ড উত্তাপে সেগুলি সব গলে একসঙ্গে মিশে যাওয়ার পর তরল লোহাকে আলাদা করে নেওয়া হয়। তারপর এই উত্তপ্ত তরল লোহাকে বিভিন্ন খণ্ডে ঢালাই করে নেওয়া হয়। এই খণ্ডাকার লোহাগুলিকে বলা হয় পিগ্ আয়রন।

বিভিন্ন ধরণের লোহার মধ্যে কার্বনের পরিমাণও বিভিন্ন হয়ে থাকে। তবে কার্বন সব রকম লোহাতেই কিছু না কিছু থাকে। কাষ্ট-আয়রনে কার্বনের পরিমাণ বেশী থাকায় এই লোহা ভগ্নপ্রবণ হয়ে থাকে। কিন্তু রট্-আয়রনে কার্বনের পরিমাণ খুব কম থাকায় তাকে ইচ্ছামত মোচড় দিয়ে যে কোন আকার দেওয়া যেতে পারে। অনেক বাড়ীর লোহার গেট, রেলিং প্রভৃতি যে এই লোহা দিয়েই তৈরী তা একটু লক্ষ্য করলেই তোমরা বুঝতে পারবে।

সব রকম লোহার মধ্যে ষ্টীলই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট। ষ্টীল খুব শক্ত ও নমনীয় হতে পারে। সাধারণ লোহার সঙ্গে কার্বন ও অন্যান্য কয়েক প্রকার পদার্থ মিশিয়ে ষ্টীল তৈরী করা হয়। ষ্টীলের ভালমন্দ নির্ভর করে এই পদার্থগুলির পরিমাণের উপর।

১৭৪০ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের এক ঘড়িনির্মাতা ষ্টীল তৈরীর একটি সহজ উপায় আবিষ্কার করেছিলেন। স্যার হেনরী বেসিমার নামক আর একজন ইংরেজ ভদ্রলোকও ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে পিগ্-আয়রন থেকে অতি সহজে ভাল ষ্টীল তৈরীর পদ্ধতি আবিষ্কার করেন তাঁরই নামানুসারে ষ্টীল তৈরীর এই চুল্লীর নাম দেওয়া হয়েছে বেসিমার কন্ভারটার। বেসিমারের পদ্ধতিতে জাহাজের জন্যে প্রয়োজনীয় ষ্টীলের পাত, মোটর গাড়ীর অংশ, রেল লাইন প্রভৃতি তৈরী হয়ে থাকে। কিন্তু অত্যুৎকৃষ্ট ষ্টীল তৈরী হয়ে থাকে ওপন্-হার্থ পদ্ধতিতে। লোহার কারখানায় আর একটি যন্ত্র আছে, যাকে বলা হয় রোলিং মিলস্। এই যন্ত্রের সাহায্যে উত্তপ্ত ষ্টীলকে বিভিন্ন আকারে রূপান্তরিত করা হয়।

শ্রীনীহাররঞ্জন ভট্টাচার্য

জানবার কথা

১। ম্যালেরিয়া রোগের কথা আমাদের দেশে অজানা নয়। বাংলা দেশের বহু অঞ্চল ম্যালেরিয়ার আক্রমণে প্রায় জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল। কেবলমাত্র আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ম্যালেরিয়ার আক্রমণের কথা শুনা যায়। সেজন্যেই

ম্যালেরিয়া রোগকে বিশ্বের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বলে

১নং চিত্র

গণ্য করা হয়। ১৯৫৫ সালে পৃথিবীর ১৩৫টি বিভিন্ন দেশে ২০০,০০০,০০০ লোক ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়; তন্মধ্যে ২,০০০,০০০ লোক মারা যায়।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯

বিশেষ সাধারণ অধিবেশন

ফেডারেশন হল সভাকক্ষ

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৫৬
সোমবার, অপরাহ্ণ ৪ ৩০ টা

পরিষদের সভ্যগণের এই সাধারণ অধিবেশনে মোট ৩২ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সভার প্রারম্ভে সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞাপিত কার্যসূচী অনুসারে পরিষদের একটি ন্যাসরক্ষক-মণ্ডলী গঠনের আবশ্যকতা সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দান করেন। পরিষদের রেজিষ্ট্রিকৃত নিয়মাবলীর ৩৫ (ক ও খ) নং বিধান অনুযায়ী ইহার যাবতীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করিবার জন্য অনধিক পাঁচ জন সভ্য লইয়া এই ন্যায়রক্ষক-মণ্ডলী গঠন করিতে হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় উপস্থিত সভ্যগণের নিকট উক্ত ন্যাসরক্ষক-মণ্ডলীর সভ্যপদের জন্য নাম প্রস্তাব করিবার আহ্বান জানান। শ্রীসুশীলকুমার আচার্য মহাশয় নিম্নলিখিত পাঁচ জন সভ্য লইয়া এই ন্যাসরক্ষক-মণ্ডলী গঠন করিবার প্রস্তাব পেশ করেনঃ— শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীনিখিলরঞ্জন সেন, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল ও শ্রীশ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়।

উপস্থিত সভ্যগণ সকলেই এই পাঁচ জন সভ্য লইয়া পরিষদের ন্যাসরক্ষক-মণ্ডলী গঠনে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় পরিষদের ন্যাসরক্ষক হিসাবে উক্ত পাঁচ জন সভ্য সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হইলেন বলিয়া ঘোষণা করেন। এই ন্যাসরক্ষকগণ পরিষদের নিয়মাবলী অনুসারে নির্ধারিত কার্যাদি পরিচালনা করিবেন।

অধিবেশনের কার্যসূচী অনুসারে ন্যাসরক্ষক-মণ্ডলীর সভ্য নির্বাচনের পরে সভাপতি মহাশয় উপস্থিত সভ্যগণকে পরিষদের কার্যাদি পরিচালনায় তাঁহাদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া সভার কার্য শেষ করেন।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দশম বর্ষ | ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭ | দ্বিতীয় সংখ্যা

ইউক্লিড ও জ্যামিতি

শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পাল

ইউক্লিড নামটি শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই জ্যামিতির কথা মনে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে প্রায় ২২০০ বছর ধরে ইউক্লিড ও জ্যামিতি—এই কথা দুটি সমান অর্থে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। জ্যামিতির কথা উঠলেই আমাদের মনে পড়ে ইউক্লিডের বইটির কথা, কিন্তু একমাত্র এই জ্যামিতি শাস্ত্র ছাড়া ইউক্লিডের সম্বন্ধে আর প্রায় কিছুই জানা যায় না। অনুমান করা হয়, তিনি খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন। ইউক্লিডের আবির্ভাবের পূর্বেই জ্যামিতি সম্পর্কীয় বহুবিধ তথ্য প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত ওই সমুদয় তথ্যের অন্তর্নিহিত মৌলিক ঐক্য সম্বন্ধে বিশেষ কোনও চিন্তা হয় নি। বিভিন্ন আকৃতি সম্বন্ধে ইউক্লিডের পূর্ববর্তী জ্যামিতিকগণ অনেক তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন। ইউক্লিড নিজে পূর্ববর্তীদের মত নতুন নতুন আকৃতি সম্বন্ধে গবেষণা না করে যাবতীয় পুরনো তথ্য পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তিনি বিভিন্ন ফলাফলগুলি এমনভাবে সংকলন করেন যে, যে কোনও প্রতিজ্ঞার প্রামাণ্য বিষয় তার পূর্ববর্তী প্রতিজ্ঞার সাহায্যে প্রমাণ করা যায়। এভাবে যাবতীয় তথ্য সন্নিবেশ করবার ফলে দেখা গেল, বহু জটিল প্রামাণ্য বিষয়ও অতি সরল কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। তিনি তাঁর প্রামাণ্য বিষয়বস্তুগুলিকে উপপাদ্য নামে অভিহিত করেন। এই উপপাদ্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে সম্বন্ধযুক্ত যে, যদি আমরা কতকগুলি সাধারণ বিষয়কে সত্য বলে স্বীকার করে নিই, তা হলেই ওই সব সত্যের ভিত্তিতে জ্যামিতি বিষয়ক যাবতীয় উপপাদ্য প্রমাণ করা যায়। সুতরাং যাবতীয় জ্যামিতিক তথ্যের প্রাণস্বরূপ হলো ওই সাধারণ সত্যগুলি। প্রকৃতপক্ষে ইউক্লিড মেনে নিলেন যে, বিভিন্ন আকৃতিগত জ্যামিতিক যে সব তথ্য আমরা অবগত আছি, তাদের অস্তিত্বের কারণই হচ্ছে ওই মৌলিক সত্যগুলির অস্তিত্ব। এজন্যে ইউক্লিডের জ্যামিতি গ্রন্থের সর্বাগ্রে এই সাধারণ সত্যগুলি দেওয়া হয়েছে। এগুলির তিনটি ভাগ—সংজ্ঞা, স্বীকার্য ও স্বতঃসিদ্ধান্ত। সর্বপ্রথমে তিনি বিভিন্ন মৌলিক আকৃতির সংজ্ঞা দিলেন। এভাবে বিন্দু, রেখা, তল, বৃত্ত প্রভৃতির ধারণা সম্ভব হলো। স্বীকার্যরূপে তিনি

এমন কতকগুলি জ্যামিতিক ধারণা গ্রহণ করলেন যেগুলির প্রমাণ দেওয়া যায় না, কিন্তু তাদের সত্যতা আমরা ব্যবহারিক জগতের অভিজ্ঞতা থেকে মোটামুটিভাবে যাচাই করে দেখতে পারি। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি একথা মেনে নিলেন যে, যে কোনও এক বিন্দু থেকে অপর এক বিন্দু পর্যন্ত একটি মাত্র সরলরেখা টানা যায়। স্বতঃসিদ্ধান্তরূপে ইউক্লিড কতকগুলি প্রচলিত নিত্য সত্যকে গ্রহণ করলেন। যেমন—যে কোনও বস্তু উহার অংশ-বিশেষ অপেক্ষা বৃহত্তর। সমান সমান বস্তুর সঙ্গে সমান সমান বস্তু যোগ করলে যোগফল সমান হবে—ইত্যাদি।

ইউক্লিডের সংকলিত যাবতীয় জ্যামিতিক তথ্য-সম্বলিত এই গ্রন্থটি পরবর্তীকালে বহু কৃতবিদ্য গাণিতিক কর্তৃক সম্পাদিত ও আলোচিত হয়েছে। তাঁরা সকলেই ইউক্লিডের গৃহীত স্বীকার্যগুলির যৌক্তিকতা বিচার করবার প্রয়াস পেয়েছেন। এই বিচারের ফলে একটি বিশেষ বিষয় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ইউক্লিডের সব স্বীকার্য-গুলিই ব্যবহারিক জগতের অভিজ্ঞতা থেকে যাচাই করা যায়, মাত্র একটি ছাড়া। এই স্বীকার্যটি হলো সমান্তরাল সরলরেখা সম্পর্কিত। ইউক্লিড ধরে নিয়েছেন যে, কোনও একটি বিন্দুর মধ্য দিয়ে একটি প্রদত্ত সরলরেখার সমান্তরাল মাত্র একটি সরলরেখা অঙ্কন করা যায়। এই স্বীকার্যের ভিত্তিতে তিনি সরলরেখা সম্পর্কে কতকগুলি প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করেছেন এবং ওই সব প্রতিজ্ঞার সাহায্যে ত্রিভুজ, আয়তক্ষেত্র প্রভৃতি সম্বন্ধেও বিবিধ উপপাদ্য প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং মূল স্বীকার্যটি যদি অযৌক্তিক হয়, তবে ওই সব প্রমাণও টিকে না। অথচ ইউক্লিড এই স্বীকার্যটিকে যত স্বাভাবিক মনে করেছেন, এটি মোটেই তত স্বাভাবিক নয়। একটু বিবেচনা করলেই সেটা বোঝা যাবে। লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, এই স্বীকার্যটিতে সরলরেখার অসীম অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। কারণ দুটি সরলরেখা সমান্তরাল—একথা বলার অর্থই হচ্ছে এই যে, উভয়দিকে যতদূর ইচ্ছা বাড়িয়ে গেলেও সরলরেখা দুটি কখনই একত্র মিলিত হবে না; অথচ আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎ সীমাবদ্ধ!

যে মুহূর্তে বোঝা গেল যে, সমান্তরাল রেখা সম্পর্কীয় ইউক্লিডের এই স্বীকার্যটি যাচাই করে দেখবার উপায় নেই, তখনই সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে এই প্রশ্ন জাগলো—তা হলে প্রকৃতপক্ষে ইউক্লিডের মনে এই স্বীকার্যটির কথা উদয় হওয়া সম্ভব হলো কেমন করে? তবে কি এটি তাঁর অন্যান্য স্বীকার্য ও স্বতঃসিদ্ধান্তের ফল? অর্থাৎ সমান্তরাল সরলরেখা সম্পর্কিত এই তথ্যটি কি ইউক্লিড অন্যান্য স্বীকার্য ও স্বতঃসিদ্ধান্তের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন? মানুষের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ইউক্লিড নিশ্চয়ই কোনও অজানা যুক্তির বলে এটিকে স্বীকার্য বলে ধরেছেন। নিশ্চয়ই এ স্বীকার্যটি তাঁর মনগড়া নয়।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহু মনীষী প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, কিভাবে ইউক্লিডের এই স্বীকার্যটি অন্যান্য স্বীকার্য ও স্বতঃসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলেও এরকম কোনও প্রমাণ দেওয়া সম্ভব হলো না। অথচ এটি যে নিছক ইউক্লিডের কল্পনার ফল মাত্র, এমন কোনও চিন্তাও মনে স্থান দেওয়া সম্ভব ছিল না। মানুষের ধারণা ছিল, যে ইউক্লিডের জ্যামিতি বস্তুজগতের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ এবং যে জ্যামিতির প্রায় যাবতীয় উপপাদ্য বস্তু-জগতের পক্ষে সত্য, সে জ্যামিতির প্রাণ যে স্বীকার্যগুলি—সেগুলিও বস্তুজগতের পক্ষে সত্য। অন্য কোনও স্বীকার্য ইউক্লিডের স্বীকার্যের স্থান পূরণ করতে পারে না। তাঁর এই স্বীকার্যের অন্তর্নিহিত যুক্তি যে আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ছে না, তার কারণ আমাদের অক্ষমতা।

স্বয়ং কাণ্ট ইউক্লিডীয় জ্যামিতি-সম্পর্কে

এরকম মন্তব্য করে গেছেন। সুতরাং অন্যের আর কি কথা!

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্তও মানুষ ইউক্লিডীয় সত্যের প্রতি এই অন্ধ মোহ কাটিয়ে উঠতে পারে নি। অবশেষে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে জ্যামিতি শাস্ত্রে এক কোপার্নিকাসের অভ্যুদয় হলো। তিনি ইউক্লিডের এই বিশেষ স্বীকার্যটি অস্বীকার করে তার স্থানে নতুন স্বীকার্য গ্রহণ করলেন এবং তার ভিত্তিতে নতুন এক জ্যামিতি গড়ে তোলেন, যার যৌক্তিকতা ইউক্লিডের জ্যামিতির চেয়ে বিন্দুমাত্র কম নয়। এতদিনে প্রমাণ হলো, ইউক্লিডীয় জ্যামিতিক সত্য ছাড়াও জ্যামিতিক সত্য আছে। মানুষের চিন্তার বন্ধন বহুদিন পরে ছাড়া পেল।

হলেন এবং আগেই বলা হয়েছে তাঁর এই উদ্যম সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছিল।

ইউক্লিডের স্বীকার্যটি যে তাঁর মনগড়া তা সামান্য একটু বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে। এই স্বীকার্যটিকে অনেকগুলি সমার্থক ভাষায় ব্যক্ত করা যায়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে তথাকথিত 'সমকোণীয় স্বীকার্য' (Postulate of rt. angle)। এই স্বীকার্যটি পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে ইউক্লিডের গৃহীত স্বীকার্য ছাড়া আরও দু-রকম সম্ভাবনা আছে, যাদের স্বীকৃতি আপাতদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক মনে হলেও গাণিতিক দিক থেকে বিচার করলে (এবং পরে প্রমাণিত হয়েছে, ব্যবহারিক দিক থেকেও) ইউক্লিডের স্বীকার্যেরই অনুরূপ স্বাভাবিক প্রমাণিত হবে।
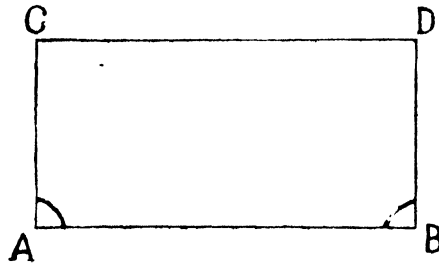
জ্যামিতি শাস্ত্রের এই কোপার্নিকাস হলেন রাশিয়ার লোবাচেব্‌স্কি। ইউক্লিডের বহুকথিত স্বীর্কার্যটি পরীক্ষা করবার পর অন্যান্য বহু জ্যামিতিকের ন্যায় তাঁর মনেও এই সন্দেহ জাগলো—হয়তো বা ইউক্লিডের এই স্বীকার্যটি তাঁর অন্য সব স্বীকার্য থেকে স্বতন্ত্র এবং প্রকৃতপক্ষে ইউক্লিডের মনগড়া। কিন্তু অন্যের যে সাহসের অভাব ছিল, লোবাচেব্‌স্কি তাতে বলীয়ান ছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের ধারণার সত্যতা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হলেন। যদি প্রকৃতপক্ষে তাঁর ধারণা সত্য হয় তবে সমান্তরাল সরলরেখা সম্পর্কে নতুন স্বীকার্যের ভিত্তিতে নতুন জ্যামিতি গড়ে তোলা সম্ভব হবে। লোবাচেব্‌স্কি এই নতুন জ্যামিতি গড়ে তোলবার কাজে ব্রতী

ABCD ক্ষেত্রটি পরীক্ষা করা যাক। এটি গড়ে উঠেছে চারটি সরলরেখার সমন্বয়ে, যার মধ্যে AB হচ্ছে ভূমি। AC ও BD দুটি সমান রেখাকে AB-র উপর লম্ব করে টানা হয়েছে। চিত্রটি পরীক্ষা করবার সময় সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে জিনিষটি মনে রাখতে হবে তা হচ্ছে এই—CAB ও DBA কোণ দুটি সমকোণ এবং AC=BD। ইউক্লিডের সমান্তরাল সরলরেখা সম্পর্কিত স্বীকার্যটি না মেনে নিয়েও প্রমাণ করা যায় যে, ACD ও BDC কোণ দুটি সমান। কিন্তু এটি না মেনে নিলে প্রমাণ করা যায় না যে, এরা প্রত্যেকে এক সমকোণের সমান। অপরপক্ষে এরা প্রত্যেকে এক সমকোণ—এটি মেনে নিয়ে প্রমাণ করা যায় যে,

AB ও CD সমান্তরাল। ইউক্লিড ধরে নিয়েছেন ACD ও BDC প্রত্যেকে এক সমকোণের সমান।

কিন্তু আমাদের মনে কি আর কোন সম্ভাবনার কথাই আসে না? ACD ও BDC এরা পরস্পরে সমান; কিন্তু সমকোণ না হয়ে সূক্ষ্মকোণ বা স্থূলকোণও তো হতে পারে! কেন একটি বিশেষ সম্ভাবনাকে অগ্রাধিকার দিলেন? অপর দুটি সম্ভাবনার ভিত্তিতেও তো জ্যামিতি সমান-ভাবেই সম্ভব!

সম্ভব যে লোবাচেব্স্কি তা-ই প্রমাণ করেছেন। (অবশ্য ঠিক এই সময়েই হাঙ্গেরীর বোলাইও স্বতন্ত্রভাবে একই জ্যামিতির ভিত্তি গড়ে তোলেন) তিনি সমকোণের পরিবর্তে সূক্ষ্মকোণীয় স্বীকার্য (Postulate of the acute angle) গ্রহণ করেন এবং এই স্বীকার্যের ভিত্তিতে প্রথম নন-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সূত্রপাত করেন। ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতে কোনও একটি বিন্দু দিয়ে আর একটি সরলরেখার সমান্তরাল একটি মাত্র সরলরেখা অঙ্কন করা যায়। লোবাচেব্স্কির জ্যামিতিতে একটি বিন্দু দিয়ে দুটি সরলরেখা অঙ্কন করা সম্ভব।

এরপর ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে জার্মেনীর রীমান স্থূলকোণীয় স্বীকার্যের (Postulate of the obtuse angle) ভিত্তিতে রীমানীয় জ্যামিতি গড়ে তোলেন। এই জ্যামিতিতে একটি বিন্দুর মধ্য দিয়ে অসংখ্য সমান্তরাল সরলরেখা অঙ্কন করা যায়।

এই নন-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি গঠনের পর স্বভাবতঃই মানুষের মনে এই প্রশ্নও জাগলো, এই সবের মধ্যে কোন্‌টি আমাদের বস্তু-জগতের পক্ষে প্রযোজ্য? এতদিন বিনা দ্বিধায় ইউক্লিডীয় জ্যামিতিকেই আমাদের বিশ্ব-বর্ণনার একমাত্র জ্যামিতিক অস্ত্র বলে ধরা হয়েছিল। এখন পরীক্ষা ও গবেষণার প্রয়োজন দেখা দিল। গাউস্ স্বয়ং এই পরীক্ষাকার্যে ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পরীক্ষায় চূড়ান্ত কোন ফল পাওয়া গেল না। তবে এ কথা প্রমাণিত হলো যে, আমাদের সসীম অভিজ্ঞতার জগতের পক্ষে ইউক্লিডীয় ও রীমানীয় জ্যামিতি প্রায় সমভাবেই প্রযোজ্য। অবশ্য পরবর্তীকালে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, সমষ্টিগতভাবে সমগ্র বিশ্ব নন-ইউক্লিডীয় রীমানীয়ান জ্যামিতির অধীন। যে ইউক্লিডীয় জ্যামিতিক সত্য দীর্ঘ ২২০০ বছর কাল একমাত্র গাণিতিক সত্য বলে অভিনন্দিত হয়ে আসছিল এবং যে সত্যের ভিত্তিতে মানুষ বিশ্ব-রহস্য সমাধানের প্রয়াস পাচ্ছিল তার অবিসং-বাদিত আসনই শুধু টললে না, বিশাল বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে তার জন্যে অতি সামান্য একটুকু স্থান নির্ধারিত হলো।

ইউক্লিডীয় জ্যামিতির এই যথার্থ স্থান নির্ধারণ করাই লোবাচেব্স্কি ও রীমানীয় জ্যামিতির এক-মাত্র কীর্তি নয়, জ্যামিতি শাস্ত্রের পঠন-পাঠনে যুগান্তর আনয়নের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তা-জগতকেও প্রভাবান্বিত করেছে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে লোবাচেব্স্কি কোপার্নিকাসের পর সর্বপ্রথম প্রচলিত সত্যের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহের সূত্রপাত করেন, তা পরবর্তী কালের চিন্তানায়কদের মনে কম সাহস সঞ্চার করে নি। তা ছাড়া রীমানীয় জ্যামিতি গঠনের সঙ্গে সঙ্গে আপেক্ষিকতা তত্ত্বের জ্যামিতিক প্রয়োজন মিটে রইলো। আপেক্ষিকতা তত্ত্বের যুগান্তকারী ধারণার একটির আবিষ্কর্তা রীমান। আইনষ্টাইন রীমানীয় জ্যামিতিক ধারণার সঙ্গে পরিচিত না থাকলে আপেক্ষিকতা তত্ত্বের গঠন হয়তো আরেকটুকু সময়সাপেক্ষ হতো। হয়তো একথা বলা অন্যায় হবে না যে, এই জ্যামিতিক চিন্তার দৈন্যের জন্যেই আইনষ্টাইনের পূর্ববর্তীদের পক্ষে আপেক্ষিকতা তত্ত্ব গঠন করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। বিশ্ব-জ্যামিতি যে রীমানীয় জ্যামিতি, এ তথ্য রীমানীয় জ্যামিতির অনুপস্থিতিতে কল্পনা করাও

সম্ভব হতো কিনা, সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

পরিশেষে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা অবশ্য কর্তব্য। জ্যামিতি শাস্ত্রে ইউক্লিডের অবদানের তুলনা হয় না; স্বতঃসিদ্ধান্ত ও স্বীকার্যের ভিত্তিতে তিনিই আধুনিক জ্যামিতির সূত্রপাত করেন। ইউক্লিডীয় জ্যামিতির গর্ব কিছুটা খর্ব হলেও ইউক্লিডের গৌরব সমানভাবেই অক্ষুণ্ণ রয়েছে আধুনিক জ্যামিতির গঠনের আদর্শ এবং একমাত্র আদর্শ ইউক্লিড। অধুনা নতুন নতুন যে সব জ্যামিতির উদ্ভব সম্ভব হয়েছে, তার জন্যেও বেশ খানিকটা কৃতিত্ব ইউক্লিডেরই প্রাপ্য। আজ পর্যন্ত ইউক্লিডই নিঃসংশয়ে জ্যামিতি-বিশারদদের আদর্শস্থল।
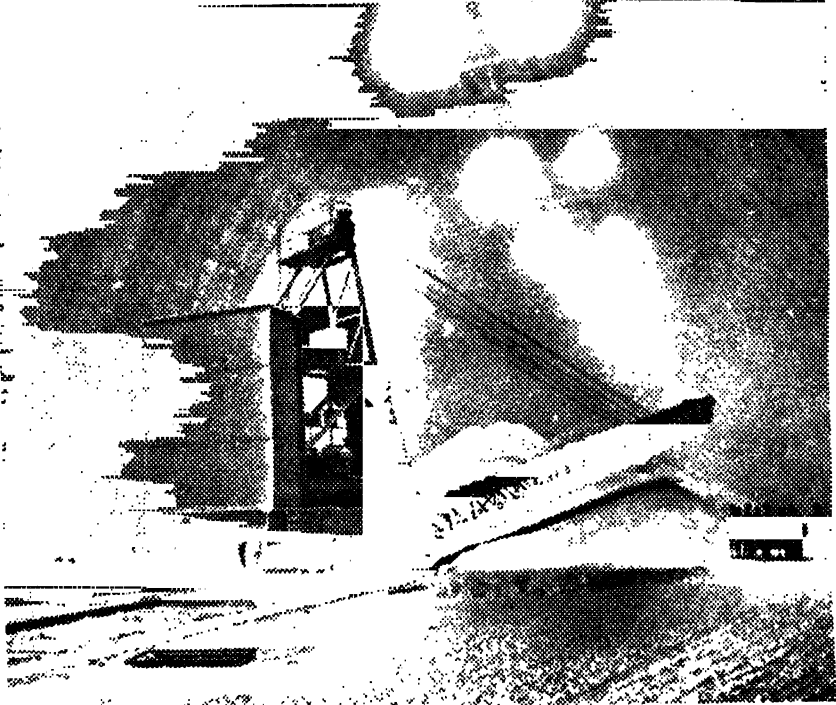
সিন্দ্রির সার উৎপাদন কারখানাটি ভারতে ভারী রাসায়নিক শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার একটি বড় রকমের পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করা যায়। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই বিরাট আকারের গুদামটি পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম। এতে ৯০ হাজার টন সার রাখা যায়।

অগুরু

শ্রীঅমরনাথ রায়

সুগন্ধির প্রতি মানুষের আসক্তি অতি প্রবল। তাই দেখা যায়, সৃষ্টির প্রথম অবস্থা থেকে আজ পর্যন্ত যুগ যুগ ধরে মানুষ তার বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করবার জন্যে সুগন্ধি ব্যবহার করে আসছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রায় সব দেশে সব সময়েই সুগন্ধির ব্যবহার ছিল এবং আজও আছে। সুগন্ধির প্রতি মানুষের এই যে স্বাভাবিক আসক্তি, তার কারণ আর কিছুই নয়–সুগন্ধিমাত্রেই মানুষের মন-প্রাণ আকৃষ্ট করে, আবিষ্ট করে এবং অন্তরকে উন্নত করে। কাজেই পূজাপার্বণ এবং প্রায় সব মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেই সুগন্ধির ব্যবহার দেখা যায়।

ভারতের বনজ সম্পদের মধ্যে অগুরু একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। অগুরু একটি উৎকৃষ্ট বনৌষধিও বটে। অগুরু গাছ থেকে প্রস্তুত সুগন্ধি জগদ্বিখ্যাত। অগুরুর সুগন্ধ, তার ভেষজ গুণ এবং বিভিন্ন অংশের ব্যবহার ইত্যাদি সব মিলে অগুরু একটি শ্রেষ্ঠ বনজ সম্পদে পরিণত হয়েছে। এই বনস্পতির সঙ্গে মানুষের পরিচয় যে কত-কালের তা সঠিক জানা যায় না। তবে সম্রাট আকবরের সভাসদ আবুল ফজল লিখিত আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। আরও কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

অগুরুর ইংরাজী নাম Eagle Wood এবং ল্যাটিন নাম Aquilaria agallocha। চিরসবুজ অগুরু গাছ সাধারণতঃ তিরিশ থেকে চল্লিশ ফুট পাতায় ঢাকা উঁচু হয়ে থাকে। এর ডালপালা এবং পাতা রেশমের মত চক্‌চকে। কাঠ সাধারণতঃ নরম, সুগন্ধযুক্ত এবং সাদা রঙের। অবশ্য বেশী পুরনো হলে কাঠের রং হয় কালো। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর অগুরু কাঠ কঠিন এবং কৃষ্ণ বর্ণের। কাঠের রস তিক্ত এবং কষায়। পেষণ করলে কাঠ চূর্ণ হয় এবং সুগন্ধ বেরোয়। আগুনে পোড়ালেও সুগন্ধে চার দিক ভরে যায়। এই প্রসঙ্গে জেনে রাখা ভাল যে, অগুরুর সুগন্ধ তার নিজস্ব সম্পদ নয়। এক রকম পরজীবী উদ্ভিদ, অর্থাৎ ছত্রাক অগুরু গাছের কাণ্ড এবং ডালপালায় বাসা বাঁধে। সেই পর-জীবী উদ্ভিদ অগুরু গাছ থেকে তাদের খাদ্য সংগ্রহ করে এবং তার বদলে অগুরু কাঠে তারা সুগন্ধ সৃষ্টি করে। অগুরুর সুগন্ধ তার কাঠের মধ্যেকার উদ্বায়ী তেলের জন্যে। আর এই উদ্বায়ী তেল সৃষ্টির মূলে আছে সেই পরজীবী ছত্রাক।

অগুরুর কাণ্ডের দু-পাশে পাতা জন্মায়। পাতা সাধারণতঃ দু-তিন ইঞ্চি লম্বা হয়ে থাকে। পাতার অগ্রভাগ সরু। পাতার মধ্যে অনেকগুলি সমান্ত-রাল শিরা থাকে। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে গাছে ফুল ধরে। সাদা রঙের ফুলগুলি দেখতে বড় সুন্দর। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে গাছে ফল ধরে। ফলগুলি সাধারণতঃ দেড় ইঞ্চি থেকে দু-ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। হিমালয় অঞ্চলে, ভুটান, সিলেট, ত্রিপুরা, আসাম, মণিপুর চট্টগ্রাম এবং সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে অগুরু গাছ জন্মে।

অগুরু থেকে সুগন্ধযুক্ত উদ্বায়ী তেল নিষ্কাশন করতে হলে প্রথমে অগুরু কাঠকে টুক্‌রা টুক্‌রা করে কেটে টুক্‌রাগুলিকে চূর্ণ করে নিতে হয়; ছোট ছোট টুক্‌রা করে রাখলেও ক্ষতি নেই। পরে একটা পাতন-যন্ত্রের মধ্যে কাঠচূর্ণ অথবা কাঠের টুক্‌রা-গুলিকে রেখে বাষ্প দিয়ে ফোটালে বাষ্পের সঙ্গে উদ্বায়ী তেল বেরিয়ে আসে। তারপর সেই বাষ্পকে ঠাণ্ডা করে জলে পরিবর্তিত করা হয়। সেই জলের

উপর উদ্বায়ী সুগন্ধি তেল ভেসে থাকে। ঐ তেলকে আস্তে আস্তে সাবধানে ঢেলে নিতে হয়। অগুরু থেকে শুধু যে সুগন্ধি তেল পাওয়া যায় তা নয়, নানারকম গন্ধদ্রব্যও তৈরী করা যায়।

উৎকৃষ্ট শ্রেণীর অগুরু কাঠ কৃষ্ণবর্ণ—একথা আগেই বলেছি। এই কাঠ 'আগর' নামে সুপরিচিত। বোম্বাই রাজ্যে আগর-এর গুঁড়া মিশিয়ে এক রকম ধূপ তৈরী করা হয়। ঐ সুগন্ধি ধূপ, আগরবাতি নামে খ্যাত। অগুরু কাঠের ধূনা পোড়ালে মোমের মত সহজেই গলে যায় এবং পোড়বার সময় সুগন্ধ বেরোয়। অগুরু কাঠ জলে সিদ্ধ করে সেই জল পরিস্রুত করলে অগুরু-আতর পাওয়া যায়। এই আতর অন্যান্য ভাল আতরের মতই গুণসম্পন্ন। শ্রীহট্টে এই আতর প্রচুর পরিমাণে তৈরী হয়। আবুল ফজল লিখিত আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এই আতরকে চুয়া নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই সুগন্ধি আতর খুবই মূল্যবান।

অগুরুর বল্কলের ভিতর দিকটা বেশ পাতলা। ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, পুরাকালে এই বল্কলের ভিতরের দিকটা পুঁথি লেখবার কাজে ব্যবহৃত হতো। সেই লেখা বহুকাল পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকতো। বইতে মলাট দেবার কাজেও সেই ছাল ব্যবহৃত হতো। আসামের রাজারা প্রাচীনকালে এই ছাল লেখবার কাজে ব্যবহার করতেন। আজও নাগা এবং আরও কয়েকটি পার্বত্য জাতীর লোকেরা অগুরুর ছাল থেকে দড়ি তৈরী করে থাকে। এই দড়ি কিন্তু তেমন টেঁকসই নয়। অগুরু কাঠের গুঁড়া যদি কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে রেখে দেওয়া যায় তাহলে পোকায় সহজে ঐ কাপড়ের কোন ক্ষতি করতে পারে না। অগুরুর কাঠ থেকে সুন্দর সুন্দর বাক্স এবং বেড়াবার ছড়ি তৈরী করা হয়। নক্সা কাটা সৌখীন বাক্সগুলি সাধারণতঃ অলঙ্কার প্রভৃতি রাখবার জন্যে ব্যবহৃত হয়।

অগুরুর ভেষজগুণও বড় কম নয়। অগুরু উষ্ণবীর্য, অত্যন্ত উত্তেজক এবং কটুতিক্ত রসযুক্ত। চর্মের হিতকারক ও পিত্তবর্ধক। অগুরু বায়ু ও কফ দূর করে, কান ও চোখের অনেক রোগ সারায়। লোহা বা মাটির পাত্রে দু-তোলা অগুরু-কাঠ নিয়ে আধ সের জলে সিদ্ধ করতে করতে জল শুকিয়ে গিয়ে যখন আধ পোয়া আন্দাজ দাঁড়ায় তখন নামিয়ে নিলে পাওয়া যায় ক্বাথ। সুশ্রুত এমনি ভাবেই অগুরুর ক্বাথ তৈরীর নির্দেশ দিয়ে গেছেন। অগুরুর ক্বাথ চিনি বা মধু সহযোগে খাওয়ালে হিক্কা দূর হয় এবং কিছুদিন নিয়মমত খেলে আমবাত সেরে যায়। অগুরুর গুঁড়া কিংবা ক্বাথ মধু সহযোগে খাওয়ালে কাশি দূর হয়। বেশী শ্লেষ্মা জমে যখন মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হয় তখন অগুরুর গুঁড়া ব্র্যাণ্ডি অথবা যে কোন সুরার সঙ্গে মিশিয়ে কপালে প্রলেপ দিলে যন্ত্রণা প্রশমিত হয়। ক্ষত-স্থানে অগুরুর গুঁড়া প্রয়োগ করলে ক্ষত তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। অগুরুর তেল কুষ্ঠ ও নানা-রকম চর্মরোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

স্থানভেদে অগুরু বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন গুজরাট, কর্ণাট ও তামিলে 'অগর', তৈলঙ্গে 'হরুগুহচেট্টু', মহারাষ্ট্রে 'শিশবাচে ঝাড়', বা 'কৃষ্ণা-গুরু', ফারসীতে 'কশবেববা' এবং আরবীতে 'উদ-গরকী' নামে পরিচিত। এর ডাক্তারী নাম Fragrant wood.

ভারতের বিশাল অরণ্যরাজির মধ্যে অগুরুর মত আরও কত যে বনস্পতি রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তাদের কতক আমাদের পরিচিত, আবার কতক অপরিচিত। উদ্ভিদতত্ত্ববিদেরা যদি আন্তরিকতার সঙ্গে অনুসন্ধান কার্য চালান তবে হয়তো ভবিষ্যতে অগুরুর মত আরও অনেক উপকারী বনস্পতির সন্ধান মিলবে।

লিথিয়াম

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়

মানুষ আজ পর্যন্ত বহু প্রকার মিশ্র এবং অবিমিশ্র ধাতু আবিষ্কার করেছে। এই সব ধাতুর মধ্যে কোনটি যেমন খুব ভারী, আবার কোনটি তেমনি খুব হাল্‌কা। এই হাল্‌কা ধাতুর একটি হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম। কিন্তু আজ যে ধাতুটির কথা বলবো তা অ্যালুমিনিয়ামের চেয়েও অনেক হাল্‌কা। যেমন ধরুন, এক কিউবিক ফুট অ্যালুমিনিয়ামের ওজন হচ্ছে ১৬৯ পাউণ্ড, আর যে ধাতুটির কথা বলবো তার এক কিউবিক ফুটের ওজন হচ্ছে মাত্র ৩৩ পাউণ্ড, অর্থাৎ পাঁচ গুণের চেয়ে বেশী হাল্‌কা।

এই হাল্‌কা ধাতুটির নাম হচ্ছে লিথিয়াম। এটি ক্ষার জাতীয় ধাতুর গোষ্ঠীভুক্ত। প্রথম এই ধাতুটি অন্য ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যেত। পৃথক মৌলিক পদার্থ হিসাবে ধাতুটিকে প্রথমে আবিষ্কার করেন আর্ফভেড্‌সন, ১৮১৭ সালে। বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই এই ধাতুটি ছড়িয়ে আছে, তবে খুব সামান্য পরিমাণে। অন্য খনিজ পদার্থ তরিতরকারী এবং জীবজন্তুর সঙ্গেও এই ধাতুটি জড়িয়ে রয়েছে বলে দেখা গেছে। ঝর্ণার জলে আর বৃক্ষাদির ভস্মে এর অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে বর্ণালী-বীক্ষণের দ্বারা পরীক্ষার ফলে।

লিথিয়াম কঠিন পদার্থের মধ্যে সবচেয়ে হাল্‌কা। শোলাও এর চেয়ে ভারী। ইচ্ছা করলেই একে জল বা তেলের উপর ভাসিয়ে রাখা যায়। অবশ্য তাতে কিছু বিপদ আছে। কারণ জলের উপর ভাসালেই লিথিয়াম থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎসারিত হতে থাকে এবং একটা বিস্ফোরণশীল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

লিথিয়াম সীসার চেয়ে নরম, কিন্তু সোডিয়াম আর পটাসিয়াম থেকে বেশী শক্ত। পদার্থটা রূপার মত সাদা। এই ধাতুটিকে গলাতে হলে দরকার হয় ১৮৬° সেন্টিগ্রেড উত্তাপ। জলে গুললে এ থেকে কষ্টিক সোডা এবং পটাস-এর মত তীব্র ক্ষারীয় দ্রবণ তৈরী হয়।

লিথিয়াম সবখানেই প্রায় পাওয়া যায়, একথা আগেই বলেছি। তা বলে মাটির মত এটি সহজ-লভ্য এবং দামের দিক থেকে খুব সুলভ, একথা মনে করলে ভুল হবে, বরং ঠিক তার উল্টা। এটা আদৌ সহজলভ্য নয়—দরও তাই খুব চড়া। এর কারণ হচ্ছে, সবখানে পাওয়া গেলেও কোনখানেই বেশী পরিমাণে লিথিয়াম পাওয়া যায় না। অনেক জিনিষের মধ্য এই ধাতুটি আছে সত্য, কিন্তু তার আনুপাতিক পরিমাণ নগণ্য। এ প্রসঙ্গে নাম করা যায় লিথিয়াম পিণ্ডের (Spodumen)। এই পিণ্ডের মধ্যেই সবচেয়ে বেশী পরিমাণ লিথিয়াম পাওয়া যায়। কিন্তু প্রায় ৪০ পাউণ্ড স্পডিউমিন পিণ্ড থেকে মাত্র ১ পাউণ্ড অপরিশোধিত লিথিয়াম পাওয়া যায়। সুতরাং লিথিয়াম সংগ্রহ করা যে খুবই ব্যয়সাধ্য তা সহজেই অনুমেয়।

তারপর অপরিশোধিত লিথিয়াম পরিশোধন করবার ব্যয়ও খুব বেশী। ফলে, লিথিয়ামের দর একটু চড়া। কিন্তু তা বলে এর ব্যবহারের দিক থেকে কোন অসুবিধা হয় না। কারণ যে যে কাজে লিথিয়াম লাগে, তার কোনটিতেই পরিমাণে বেশী লাগে না। সামান্য একটু হলেই কাজ চলে যায়। কিন্তু হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করতে নাকি লিথিয়াম লাগে একটু বেশী পরিমাণে।

পূর্বেই বলেছি লিথিয়াম আবিষ্কৃত হয় ১৮১৭

খৃষ্টাব্দে, কিন্তু ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এটা বিশেষ কোন কাজে লাগানো হয় নি। ওই বছরেই টমাস এডিসন প্রথম বৈদ্যুতিক ব্যাটারীতে লিথিয়াম ব্যবহার করতে সুরু করেন। আজও এই কাজে লিথিয়াম ব্যবহৃত হচ্ছে।

দ্বিতীয় মহাসমরের সময় লিথিয়াম বহু দরকারী সামরিক কাজে লেগেছে। এর মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে 'গিবসন গার্ল' রেডিও ট্র্যান্সমিটারের জন্যে এর ব্যবহার। তা ছাড়া, সাবমেরিনের বায়ু পরিশোধন, বিমানকে বরফ-মুক্ত করা, সিগ্ন্যালের জন্যে আলোর-শিখা তৈরী করা ইত্যাদি কাজে এর ব্যবহারের কথাও কম উল্লেখযোগ্য নয়।

লিথিয়াম কেবলমাত্র সামরিক কাজেই ব্যবহৃত হতে লাগলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তাই তার কোন প্রয়োজনীয়তা থাকবে না বলে অনেকের ধারণা হলো। কিন্তু কার্যতঃ তা হলো না, তার প্রয়োজনীয়তা বিন্দুমাত্র হ্রাস পেলো না। মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি লিথিয়ামকে একটি অত্যাবশ্যক ধাতুর পর্যায়ে উন্নীত করবার পথ প্রশস্ত করলো।

এবার কিন্তু কেবল সামরিক কাজে তার প্রয়োজনীয়তা সীমাবদ্ধ রইল না। এবার সর্ব-সাধারণের কাজে লাগবার পথ প্রশস্ত হলো। লিথি-য়াম নিয়ে যাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন তাঁরা দেখলেন, তামা বিশুদ্ধিকরণ আর ব্রোঞ্জ কাষ্টিং-এর পক্ষে লিথিয়াম হচ্ছে একটি আদর্শ ধাতু। এক চিম্‌টি লিথিয়ামের সাহায্যে অতি সহজেই তামাকে বিশুদ্ধ করা সম্ভব।

ইস্পাত নির্মাণেও লিথিয়ামের প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কৃত হলো। দেখা গেল, ইস্পাত যখন ১৬০০° ডিগ্রি ফাঃ-এ উত্তপ্ত করা হয়, তখন তা আবহমণ্ডল থেকে অক্সিজেন আকর্ষণ করে এবং তা থেকে ইস্পাতের উপর এমন একটা আবরণের সৃষ্টি হয় যা ইস্পাতের পক্ষে ক্ষতিকর। এই আবরণটি পরে বিনষ্ট করবার জন্যে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। ওই ইস্পাত সালফিউরিক অ্যাসিডে ডুবিয়ে রাখতে হয়। এই ব্যবস্থায় সময়ও লাগে বেশ। এই ব্যবস্থা গ্রহণের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় লিথিয়ামের সাহায্যে।

এয়ার-কন্‌ডিসনিং যন্ত্র নির্মাণে টেলিভিশন ছবির প্রয়োজনীয় নল তৈরীর জন্যে কৃত্রিম "ক" ভিটামিন ও বিশেষ শ্রেণীর ওষুধ প্রস্তুতের ব্যাপারে, তৈল শিল্পে লিথিয়াম এখন ব্যবহৃত হচ্ছে। তৈল শিল্পে এর ব্যবহার দিন দিনই বেড়ে যাচ্ছে।

ইউরেনিয়ামের চেয়ে লিথিয়ামের দাম কম বলে এবং তা বেশী পাওয়া যায় বলে হাই-ড্রোজেন বোমা তৈরীতে লিথিয়াম ব্যবহৃত হচ্ছে। তাছাড়া ইউরেনিয়ামের তুলনায় লিথিয়ামের শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় তিন গুণ বেশী।

চীনামাটির পাত্রাদি তৈরীর ব্যাপারে লিথিয়াম ব্যবহৃত হয় সবচেয়ে বেশী। লিথিয়ামের সহযোগিতায় ওই সব বাসনপত্র সুন্দর করা অধিকতর সহজ হয়, কিন্তু তার জন্যে বেশী অর্থ ব্যয় করতে হয় না। যা হোক, নানা ভাবেই লিথিয়ামের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাবে। এখনই এই ধাতুটির যা চাহিদা তার অর্ধেকও উৎপন্ন হয় না, তবে ভবিষ্যতে উৎপাদন বৃদ্ধির আশা আছে।

মৃৎশিল্পে ঢালাই-ছাঁচ

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু

মৃৎশিল্পে ঢালাইয়ের কাজে যে সব ছাঁচ ব্যবহার করা হইয়া থাকে তাহা প্লাস্টার দিয়া নির্মাণ করা হয়। কারণ প্লাস্টারের অধিক সরন্ধ্রতার জন্য ভিজা-মাটি হইতে সহজে জল টানিয়া লইতে পারে এবং গঠিত দ্রব্য অল্পকালেই শুকাইয়া যায়। এই কারণে প্রতি ছাঁচ হইতে দিনে ৩ বা ৪ বার ঢালাই করা যাইতে পারে। কাঠ বা ধাতুনির্মিত ছাঁচে এই রকমের সুবিধা নাই। পূর্বে পোড়া-মাটির ছাঁচ ব্যবহার করা হইত, কিন্তু তাহাও এখন চলে না। কারণ পোড়া-মাটির ছাঁচের সরন্ধ্রতা শতকরা ২০-২৫ ভাগ মাত্র; কিন্তু প্লাস্টারের ছাঁচের সরন্ধ্রতা ৩০ হইতে ৩৫ ভাগ পর্যন্ত করা যায়। পোড়া-মাটির ছাঁচ অপেক্ষা প্লাস্টারের ছাঁচ তৈয়ার করা অনেক সহজ; তবে পোড়া-মাটির ছাঁচ অধিক-কাল স্থায়ী হয়। প্লাস্টার জমিবার সময় তাহা যে সামান্য প্রসারিত হয় তাহার ফলে ছাঁচের ভিতর কোন নক্সা বা কারুকার্যের সূক্ষ্মতা সহজেই ধরা পড়ে, কিন্তু মাটির ছাঁচ পোড়াইলে উহার যে সঙ্কোচন হয় তাহার ফলে ছাঁচের ভিতর-কার কোন নক্সার সূক্ষ্মতা তত পাওয়া যায় না।

যে কোন দ্রব্যের ছাঁচ তৈয়ার করিতে হইলে প্রথমে ঐ দ্রব্যটির একটি মডেল বা প্রতিরূপ তৈয়ার করিতে হইবে। এই মডেল মাটি বা প্লাস্টার উভয় পদার্থ হইতেই তৈয়ার করা হয়। মানুষ বা জীবজন্তুর আকৃতির মডেল তৈয়ার করিতে সাধারণতঃ অতি নমনীয় মাটিই ব্যবহার করা হয়। অনেকে প্লাষ্টিসিন নামক এক প্রকার কৃত্রিম দ্রব্যও ব্যবহার করেন। ইহা তৈলাক্ত বলিয়া শুকায় না বা মাটির মত সঙ্কুচিত হয় না। কিন্তু প্লেট, পেয়ালা প্রভৃতি গোলাকৃতি ও সমপরিমিত দ্রব্যের মডেল প্লাস্টার দিয়াই তৈয়ার করা সহজ। কারণ প্লাস্টারের মডেল লেদ বা কুঁদ যন্ত্রে সহজেই পরিষ্কার ও সুগঠিত করা যায়। অসম পরিমিত কোন মডেল কুঁদে পরিষ্কার করা চলে না। যে কোন দ্রব্য, নক্সা বা ছবি হইতেই মডেল তৈয়ার করা যায়, কিন্তু এই কাজে বিশেষ অভিজ্ঞ ও পারদর্শী শিল্পীর প্রয়োজন।

মাটি দিয়া মডেল তৈয়ার করিতে হইলে মাটির সঙ্কোচন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। মডেল হইতে যে ছাঁচ তৈয়ার করা হয় তাহাদের আয়তন কিছু বড় রাখা দরকার; কারণ ছাঁচ হইতে যে সকল মৃৎ-দ্রব্য ঢালাই করা হয় তাহা পোড়াইবার পর বেশ সঙ্কুচিত হইয়া ছোট হইয়া যায়। সুতরাং সঠিক আয়তনের কোন দ্রব্য তৈয়ার করিতে হইলে ছাঁচটি মাটির পরবর্তী সঙ্কোচনের অনুপাতে বড় করা দরকার। মাটি বা মাটিমিশ্রিত মণ্ডের সঙ্কোচন মৃৎশিল্পের শ্রেণী অনুযায়ী বিভিন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যেক প্রকার মৃৎ-দ্রব্যের সংকোচন সঠিকভাবে পূর্ব হইতে জানা দরকার। মাটির সঙ্কোচন দুইবার হইতে দেখা যায়। প্রথমবারে ভিজামাটি শুকাইবার সময় এবং দ্বিতীয়বারে শুষ্ক মাটি পোড়াইবার কালে মাটির দ্রব্য সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। নানা শ্রেণীর মৃৎশিল্পে এই দুই প্রকার সঙ্কোচনের মোট পরিমাণ কিরূপ হইয়া থাকে তাহার আভাস দেওয়া হইল। টেরাকোটা ও কেয়াম্স দ্রব্যাদি শতকরা মোট ৮ হইতে ১০ ভাগ সঙ্কুচিত হইতে দেখা যায়। স্টোন-ওয়্যার বা কড়িমাটির দ্রব্য শতকরা ১০ হইতে ১৫ ভাগ, এবং পর্সেলিনের দ্রব্যাদি শতকরা ১৫ হইতে ২০ ভাগ সঙ্কুচিত হয়।

প্লাস্টারের ছাঁচ কিছুকাল ব্যবহার করিবার পর দেখা যায় যে, উহার ভিতর দিকের স্তর নষ্ট হইয়া যায়। ইহার কারণ, স্লিপ বা ঢালাই-মণ্ডে যে সকল ক্ষারীয় লবণ দেওয়া হয় তাহাদের সহিত জীপসাম কণার যে রাসায়নিক বিক্রিয়া হইতে থাকে তাহার ফলে ছাঁচের স্তরটি ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে কাজের অযোগ্য হইয়া পড়ে। নূতন ছাঁচ তৈয়ার করিতে আবার মডেলের দরকার হইয়া থাকে; কিন্তু মাটির মডেল প্রথমবার ছাঁচ তৈয়ার করিবার সময়ই ভাঙ্গিয়া নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া প্রথম ছাঁচটিকে সংরক্ষণ করা দরকার। এই প্রথম ছাঁচটিকে ব্লক ছাঁচ বা প্রাথমিক-ছাঁচ বলা হয়। এই প্রাথমিক ছাঁচ হইতে যে প্রথম ঢালাই করা হয় তাহাকে কেসিং বলা হইয়া থাকে। এই কেসিং ঠিক মডেলের নকল। ইহা প্লাস্টার দিয়া তৈয়ারী হয় বলিয়া ইহা হইতে যত ইচ্ছা ছাঁচ ঢালাই করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কেসিংটি যখন নষ্ট হইয়া যায় তখন সংরক্ষিত প্রাথমিক ছাঁচ হইতে আবার নূতন কেসিং তৈয়ার করা হইয়া থাকে। এই জন্যই প্রাথমিক ছাঁচটিকে যত্ন করিয়া রাখা দরকার।

ঢালাই, জলীপ্রথা বা চাপ প্রথায় মৃৎ-দ্রব্য গঠন করিতে যে সব প্লাস্টারের ছাঁচ ব্যবহার করা হয় তাহাদের মধ্যে কিছু তারতম্য থাকে। ঢালাইয়ের জন্য ছাঁচ অধিক সচ্ছিদ্র হওয়া দরকার। চাপ বা জলী প্রথার ছাঁচে এত ছিদ্রের দরকার নাই; কিন্তু ঐ সকল ছাঁচ বেশ কঠিন হওয়া চাই যাহাতে সহজে ভাঙ্গিয়া না যায়। ছাঁচে এই সকল গুণ আনিতে হইলে প্লাস্টারের সহিত জল মিশ্রিত করিবার সময় জলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। প্লাস্টারে জলের ভাগ বেশী হইলে ছাঁচ অধিক সচ্ছিদ্র ও নরম হইয়া থাকে এবং ইহা বেশী দিন ব্যবহার করা চলে না। সাধারণতঃ প্রতি ১০০ ভাগ জলের সাহত ১২৫ হইতে ১৬০ ভাগ প্লাস্টার মিশ্রিত করা হইয়া থাকে। প্রথমে একটি বৃহৎ পাত্রে পরিমাণ মত পরিষ্কার জল লইয়া উহাতে প্লাস্টার-চূর্ণ ধীরে ধীরে ছিটাইয়া দিতে হয় এবং প্রায় মিনিট খানেক পরে চূর্ণ জলে বেশ ভিজিয়া গেলে উহা আরও ২-৩ মিনিট ধরিয়া জলের সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া লইতে হয়। এই সময় প্লাস্টার অল্প গরম হইয়া যায় এবং ধীরে ধীরে গাঢ় হইতে থাকে। প্লাস্টার-গোলা গাঢ় হইতে সুরু করিলেই উহা কেসিংয়ে ঢালিয়া দেওয়া আবশ্যক; কারণ অল্পক্ষণ পরেই উহা তরল হইতে কঠিন হইয়া যায়। প্লাস্টার-চূর্ণ জলে মিশাইবার সময় এবং ঐ তরল মিশ্র ঢালিবার সময় যাহাতে বায়ুর বুদ্বুদ উহার ভিতর প্রবেশ করিতে না পারে, সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। কারণ ঐ সকল বুদ্বুদ ছাঁচের গায়ে আটকাইয়া গেলে ছাঁচ দুর্বল হইয়া যায় অথবা গঠিত দ্রব্যে ক্রটি দেখা দেয়।
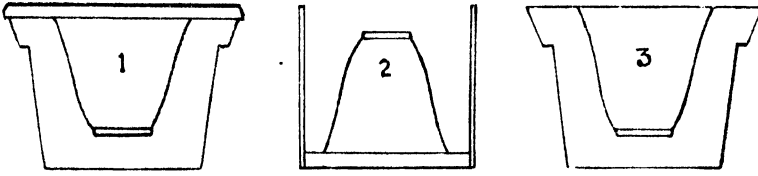
চিত্র। (১) প্রাথমিক ছাঁচ। (২) কেসিং। (৩) সাধারণ ছাঁচ।

প্লাস্টার-নির্মিত মডেল বা কেসিং হইতে ছাঁচ ঢালাই করিবার সময় যাহাতে উভয়ে জুড়িয়া না যায় সে জন্য মডেল বা কেসিং-এর গাত্রে ভাল করিয়া সাবান-জল লাগাইয়া লওয়া হয়। এই প্রথার নাম সাইজিং এবং ঐ বিশেষ সাবান-জলকে সাইজ বলা হইয়া থাকে। এই সাবান রেড়ীর তেল দিয়া তৈয়ার করা হয় এবং সাবান জল গাঢ় রসের মত করিয়া লওয়া হয়। মাটির তৈয়ারী মডেল হইতে

ছাঁচ তৈয়ার করিবার কালে উহাতে সাবান-জল লাগান, অর্থাৎ সাইজিং করা হয় না; কারণ মাটিতে সাবান-জল দিলে উহা প্লাস্টারের সহিত আরও আটকাইয়া যায়। প্রথমে প্লাস্টারের মডেলের উপর এই সাবান-জল বুরুশ দিয়া উত্তমরূপে লাগাইয়া লইয়া উহা জল দিয়া ধুইয়া ফেলা হয়। দ্বিতীয় বার সাবান-জল লাগাইয়া আবার ধুইয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু তৃতীয় বার সাইজ লাগাইবার পর আর ধুইয়া ফেলা হয় না। কেবল স্পঞ্জ দিয়া উহা ভাল করিয়া মুছিয়া দিতে হয়। এই প্রকার প্রক্রিয়ার ফলে মডেল বা কেসিং-এর উপরের স্তরের সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলি সাবান জলে ভরিয়া যায় এবং উহা তৈলাক্তের মত মসৃণ হইয়া পড়ে। ইহার ফলে ছাঁচ ঢালাই করিবার সময় নূতন প্লাস্টার মডেল বা কেসিং-এর সহিত আটকাইয়া যায় না, বরং ছাঁচটি শুকাইলে সহজেই খুলিয়া আসে। দ্বিতীয়বার ছাঁচ লইবার সময় অন্ততঃ একবার সাইজ লাগান দরকার হয়। জলী প্রথার জন্য ছাঁচ সাধারণতঃ এক বা দুই ভাগে থাকে। চাপ প্রথার ছাঁচ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়; কিন্তু খেলনা, মূর্তি প্রভৃতি অসম পরিমিত দ্রব্য ঢালাই করিবার জন্য যে সকল ছাঁচ তৈয়ার করা হয় তাহা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত না থাকিলে ঢালাই দ্রব্য ছাঁচ হইতে বাহির করা সম্ভব হয় না। এই বিষয়ে মডেল ও ছাঁচ প্রস্তুত-কারকদের বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। আজকাল বড় বড় দ্রব্য ঢালাইয়ের কাজে ছাঁচের ভিতর বায়ুর চাপ দেওয়া হয় অথবা ছাঁচ হইতে বায়ু নিষ্কাশন করা হইয়া থাকে, যাহার ফলে অল্প সময়ে এবং সহজে ভারী ভারী দ্রব্য ঢালাই করা যাইতে পারে। এই নূতন প্রথায় ঢালাই করিয়া দেখা গিয়াছে, সাধারণ ছাঁচে যাহা ঢালাই করিতে প্রায় ২০ ঘণ্টা সময় লাগিত, বায়ু-নিষ্কাশিত ছাঁচ হইতে তাহা মাত্র ২ ঘণ্টাতেই ঢালাই করা যায়। অবশ্য এই সকল ছাঁচ বিশেষ বিবেচনা করিয়া তৈয়ার করিতে হয়।

যে সকল প্লাস্টারের ছাঁচ সর্বদা ব্যবহার করিবার দরকার হয় না তাহাদের ভবিষ্যতে ব্যবহার করিবার জন্য গুদাম-ঘরে রাখিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। যদি ছাঁচগুলি ভালভাবে শুকাইয়া রাখা না হয় অথবা যদি গুদাম-ঘরটি স্যাঁতসেঁতে থাকে তবে কিছুকাল পরে দেখা যায়, ঐ ছাঁচের উপর সাদা পশমের মত একপ্রকার পদার্থের আবির্ভাব হইয়াছে। চল্‌তি কথায় ইহাকে নোনা-ধরা বলা হইয়া থাকে। এই নোনা-ধরা অবস্থায় ছাঁচগুলি বেশীদিন পড়িয়া থাকিলে ছাঁচ অপল্‌কা হইয়া যায়, অর্থাৎ অল্প আঘাতেই ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এই নোনা মূলতঃ সোডিয়াম সালফেট, যাহাকে গ্লোবার সল্ট বলা হইয়া থাকে। ইহার রাসায়নিক সঙ্কেত—$Na_2SO_4.10\ H_2O$। এই লবণ ছাঁচের ভিতর কোথা হইতে আসে তাহা অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, এই প্রকারের নোনা সাধারণতঃ ঢালাই-ছাঁচেই পাওয়া যায়, চাপ বা জলী প্রথার ছাঁচে তত পাওয়া যায় না। ঢালাইয়ের জন্য যে স্লিপ বা বিশেষ ঢালাই-মণ্ড তৈয়ার করা হয় তাহাতে সামান্য পরিমাণে সোডা-কার্বনেট ও সোডা-সিলিকেট দেওয়া হইয়া থাকে। ঢালাই করিবার কালে এই সব লবণের কিছু অংশ ছাঁচের রন্ধ্রে জমিতে থাকে। অন্যদিকে ছাঁচের প্লাস্টারও অল্প পরিমাণে জলে দ্রবীভূত হইতে থাকে। এই সব জলে দ্রবীভূত লবণের মধ্যে পারস্পরিক বিক্রিয়ার ফলেই নূতন গ্লোবার লবণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই প্রকারের রাসায়নিক বিক্রিয়ার সঙ্কেত নিম্নরূপ—

(i) $CaSO_4 + Na_2CO_3 - Na_2SO_4 + CaCO_3$.

(ii) $CaSO_4 + Na_2SiO_3 - Oa_2SO_4 + CaSiO_3$.
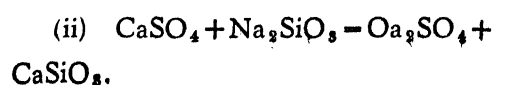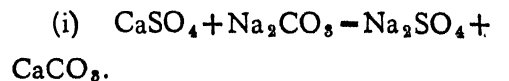
সোডিয়াম সালফেট প্রচুর জল লইয়া ধীরে ধীরে কেলাসিত হইতে থাকে এবং এই কেলাসনের সময় ছাঁচের রন্ধ্রে রন্ধ্রে চাপ দিবার ফলেই ছাঁচ দুর্বল হইয়া পড়ে ও সহজে ভাঙ্গিয়া যায়। ছাঁচ শুকাইবার সময় যে সব লবণ ছাঁচের বাহিরে চলিয়া আসে তাহাদের সরু সরু কেলাস আমরা ছাঁচের গায়ে সাদা পশমের মত জমিয়া থাকিতে দেখিতে পাই। মাটির মধ্যে কার্বনেট ও ফস্‌ফেট থাকিলে প্লাস্টারকে জলে অধিক পরিমাণে দ্রবীভূত হইতে সাহায্য করে। সেই জন্য অস্থি-পর্সেলিন নির্মাণের ছাঁচ শীঘ্র নষ্ট হইতে দেখা যায়। এই প্রকার অপচয়ের একমাত্র উপায় হইল—ছাঁচগুলি ব্যবহারের পর উত্তমরূপে শুকাইয়া এবং গাত্র পরিষ্কার করিয়া শুষ্কস্থানে রাখিবার ব্যবস্থা করা।

যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল ইলেট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর পরীক্ষাগারে নির্মিত সর্বাপেক্ষা বৃহৎ (মানুষের তৈরী হীরকের মধ্যে) হীরকের ছবি। এটি দৈর্ঘ্যে ১ ইঞ্চির $\frac{১}{১৬}$ (১'৬ মিলিমিটার) ভাগ। কৃত্রিম উপায়ে তৈরী এই হীরকটি খনি হইতে উত্তোলিত হীরকের মতই গুণসম্পন্ন।

ফটোগ্রাফির গোড়ার কথা

শ্রীমঞ্জুশ্রী দাস

সেই অজানা আদিম যুগ থেকেই মানুষ তার মনের ভাব ও কল্পনাকে রূপ দিতে প্রয়াস পেয়েছে চিত্রের মাধ্যমে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষও নানারকম রেখাচিত্র এঁকে মনের বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করতো। সে-সব এযুগে আমাদের কাছে দুর্বোধ্য; কিন্তু পৃথিবীর নানাস্থানের গিরিগাত্রে এরূপ চিত্র দেখা গেছে। প্রাচীনকালের বহু অসম চিত্রলিপির নিদর্শন সে যুগের প্রস্তরনির্মিত বিভিন্ন হাতিয়ার ও তৈজসপত্রের গায়ে অঙ্কিত রয়েছে। অজন্তা, ইলোরার গিরিপাত্রের সুষম চিত্ররাজি পরবর্তী যুগের উন্নত চিত্রকলার পরিচয়। মানুষের মনোভাব প্রকাশের জন্যে ভাষা-লিপি উদ্ভাবিত হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন চিত্রের সাহায্যেই বিভিন্ন মনোভাব অভিব্যক্ত হতে সুরু করে। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার অক্ষরলিপিগুলি মূলতঃ এক-প্রকার রেখাঙ্কিত চিত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। চীনা প্রভৃতি কোন কোন লিপি অদ্যাপি বহুলাংশে চিত্রধর্মী। জ্যোতিবিদ্যার বিভিন্ন রাশিচক্রে মেষ, বৃষ প্রভৃতি বিভিন্ন রাশি অতীত যুগ থেকেই চিত্রের সাহায্যে অঙ্কিত হয়ে আসছে।

প্রথম অবস্থায় এরূপ ভাবপ্রকাশের সহায়করূপে প্রয়োজনের তাগিদেই চিত্রের সৃষ্টি হয়েছিল সত্য, কিন্তু চিত্রের প্রতি মানুষের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। মানুষ কল্পনাকে চিত্রে রূপ দিয়েছে, বাস্তবের ছবি এঁকেছে। সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের মন স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয়। তাই মনোরম দৃশ্য বা প্রিয়জনের ছবি এঁকে সে তার স্মৃতিরক্ষার প্রয়াস পেয়েছে। চিত্রকলার এই হলো সর্বশেষ সার্থক পরিণতি। কিন্তু কোন দৃশ্য, বস্তু বা ব্যক্তির হুবহু প্রতিকৃতি অঙ্কন করা অতীব দুঃসাধ্য। সুনিপুণ চিত্রকরের পক্ষেও কোন কিছুর অবিকল চিত্র বা নিঁখুত প্রতিচ্ছবি আঁকা সম্ভব হয় না। বহুদিন ধরে মানুষ এর কোনও কৌশল আবিষ্কার করবার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা করেছে। অবশেষে আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের এই অক্ষমতা দূর করেছে—আবিষ্কৃত হয়েছে ফটোগ্রাফি, অর্থাৎ আলোকচিত্র গ্রহণের কৌশল।

আধুনিক আলোকচিত্র বা ফটোগ্রাফির ইতিহাস বেশী দিনের নয়, আজও দেড়শ' বছর হয় নি। ফটোগ্রাফির কৌশল মূলতঃ এমন কিছু জটিল নয়। কোন আলোক-স্পর্শকাতর পদার্থের আস্তরণের উপরে বিশেষ কৌশলে আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর ছায়াপাত করা হয়। ফলে ঐ ছায়ায় প্রতি-ফলিত আলোকরশ্মির তীব্রতার তারতম্যানুসারে ঐ স্পর্শকাতর পদার্থের উপরে বস্তুটার একটা আলো-ছায়ার অবিকল প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। পরে ঐ প্রতিচ্ছবিকে বিভিন্ন কৌশলে পরিস্ফুট ও স্থায়ী করা হয়। মোটামুটি এই হলো আধুনিক ফটোগ্রাফির মূল কথা। আলোকের প্রভাবেই এরূপ চিত্রের উদ্ভব—তাই বাংলায় এর নাম দেওয়া হয়েছে আলোক-চিত্র।

আলোকের প্রভাবে অনেক জিনিষেরই বর্ণ-বৈষম্য ঘটে—গাত্রচর্ম কটা হয়ে যায়, উদ্ভিদের সবুজ পাতা ঢেকে রাখলে সূর্যালোকের অভাবে সাদা হয়ে ওঠে। এরূপ নানা ব্যাপার বহুদিন থেকেই মানুষ লক্ষ্য করেছে। কোন গাছের একটা মসৃণ সবুজ পাতার উপরে একখানা পাত্‌লা কাচ কৌশলে এঁটে দেওয়া হলো। ঐ কাচের উপরে গাঢ় কালি দিয়ে মোটা করে কিছু লিখে দিয়ে কয়েকদিন পরে কাচখানা খুলে ফেললে দেখা যাবে,

পাতাটার উপরে ঐ লেখা সাদা হরপে ফুটে উঠেছে। এর কারণ হলো এই যে, আলোকরশ্মির পক্ষে কাচ স্বচ্ছ, কিন্তু কালি অস্বচ্ছ। কাজেই সূর্যরশ্মি কালির লেখার নীচের পত্রাংশে পৌঁছুতে পারে না; ফলে পাতাটার ঐ অংশে সূর্যালোকের অভাবে ক্লোরোফিল উৎপন্ন না হওয়ায় লেখার অনুরূপ সাদা দাগ পড়ে। আলোকের প্রভাবে এভাবে গাছের পাতার উপরে কোন লেখা বা ছবি ফুটিয়ে তোলাকেও এক রকম ফটোগ্রাফি বলা যেতে পারে। তবে এ একটা খেলা মাত্র; কিন্তু এর সঙ্গে প্রকৃত ফটোগ্রাফির কৌশলের যথেষ্ট মৌলিক সাদৃশ্য আছে।

যাহোক, স্থুল্‌জ নামক একজন বিজ্ঞানী লক্ষ্য করেন যে, সিলভার ক্লোরাইড, সিলভার ব্রোমাইড প্রভৃতি রৌপ্যঘটিত রাসায়নিক লবণগুলি আলোক-পাতে কালো হয়ে ওঠে। এর একটা চমৎকার পরীক্ষা হয় ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে। একখানা মসৃণ কাগজের উপরে সিলভার সল্টের দ্রবণ মাখিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হলো অন্ধকার ঘরে। কাগজখানার উপরে সিলভার সল্টের একটা সূক্ষ্ম আস্তরণ লেগে রইল। এক-খানা নক্সাকাটা কাগজ ঐ সল্ট মাখানো কাগজখানার উপরে চেপে দিয়ে সব সমেত দিনের আলোয় উন্মুক্ত স্থানে রাখা হলো। কিছুক্ষণ পরে নক্সাকাটা কাগজখানা সরিয়ে নিয়ে দেখা গেল, নীচের কাগজখানাতে ঐ নক্সার চিত্র পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। ওর অনাবৃত অংশ কালো হয়ে গেছে এবং নক্সার নীচের আবৃত অংশ সাদা রয়েছে। ফলে নক্সার অনুরূপ একটা সাদা ছবি পাওয়া গেল। কেবল কাগজের নক্সা কেন, যে কোন অস্বচ্ছ পদার্থের যে কোন আকারের প্রতিচ্ছবি এভাবে সিলভার সল্ট মাখানো কাগজের উপর ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হলো। কিন্তু এই প্রতিচ্ছবি স্থায়ী হলো না—অস্বচ্ছ পদার্থের আবরণটা সরিয়ে নিলেই আলোক সম্পাতে সবটা কালো হয়ে ছবি একাকার হয়ে মুছে যায়। এর কারণ—আবৃত অংশের অপরি-বর্তিত সিলভার সল্ট সঙ্গে সঙ্গে দ্রবীভূত করে ধুয়ে ফেলবার কোন কৌশল তখনও উদ্ভাবিত হয় নি।

এর অনেক আগে ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দ থেকেই লোকে আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিল। দেয়ালের ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে কোন বস্তুর প্রতিফলিত আলোকরশ্মি প্রবেশ করিয়ে সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরের মধ্যে তার ছায়াপাত করা যায়। অন্ধকারে ঐ বস্তুর একরকম আলো-ছায়ার প্রতিচ্ছবি পরিদৃষ্ট হয়। তারপর ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে এর একটা উন্নত ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়। একটা আবদ্ধ বাক্সের অভ্যন্তরে কাপড়ের পর্দা বা একখানা ঘষাকাচ খাড়াভাবে রেখে বিপরীত দিকের ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে কোন বস্তুর প্রতিচ্ছবি এনে ঐ পর্দা বা ঘষাকাচের উপরে ফেলা হয়। বাক্সটার ঐ ক্ষুদ্র ছিদ্রের মুখে একখানা লেন্স বসিয়ে আরও স্পষ্টতর প্রতিচ্ছবি অভ্যন্তরস্থ পর্দার উপরে ফেলা সম্ভব হলো। ক্ষুদ্র ছিদ্রমুখে লেন্স লাগানো এরূপ বাক্সের নাম দেওয়া হলো ক্যামেরা অব্‌স্কিউরা। এই যন্ত্রের সাহায্যে অভ্যন্তরস্থ পর্দার গায়ে যে কোন জিনিষের একটা সাময়িক প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত করা গেল। কিন্তু এর স্থায়িত্ব বিধানের কোন সম্ভাবনার কথা তখনও লোকের মনে ওঠে নি।

অবশেষে কয়েক শতাব্দী পরে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ফক্স ট্যালবট নামক নামক এক ভদ্রলোক এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকেন। তিনি ভাবলেন, ক্যামেরা অব্‌স্কিউরাতে পরিদৃষ্ট প্রতিচ্ছবি আলো-ছায়ার খেলা মাত্র। বস্তুটার বিভিন্ন অংশ থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মির তীব্রতার তারতম্যের ফলেই ঐ বস্তুর ছায়াছবি পর্দার গায়ে পড়ে। কাজেই ঐ আপতিত রশ্মির তীব্রতা ও নিষ্প্রভতার পারম্পর্যের ফলে উৎপন্ন আলো-ছায়ার প্রভাব যদি কৌশলে কাগজের উপরে মুদ্রিত রাখা যায় তবে অবশ্যই তার হুবহু স্থায়ী প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাবে। কয়েক বছর ধরে তিনি এর জন্যে নানাভাবে চেষ্টা

করেন। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর শেষে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ট্যালবট মোটামুটি সাফল্য লাভ করেন। সিলভার সল্ট আলোকের প্রভাবে কালো হয়ে যায়, বিজ্ঞানী সুল্‌জ্‌-এর আবিষ্কৃত এই তথ্যটি তিনি কাজে লাগালেন।

সিলভার নাইট্রেটের জলীয় দ্রবে ট্যালবট একখানা কাগজ ভিজিয়ে অন্ধকারে সাবধানে শুকিয়ে নিলেন। কাগজখানার উপরে ঐ সল্টের একটা পাত্‌লা আস্তরণ জমে রইল। এখন ক্যামেরা অব্‌স্কিউরার পর্দার জায়গায় তিনি এই কাগজখানা এঁটে নিয়ে তাঁর বাসগৃহের প্রতিচ্ছায়া ওর উপরে ফোকাস করে ফেললেন। কয়েক ঘণ্টা ধরে এরূপ ছায়াপাতের ফলে ঐ কাগজের উপরে বাড়ীটার একটা অস্পষ্ট ছবি উঠলো। বাড়ীটার প্রতিফলিত আলোকরশ্মির বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন তীব্রতা অনুযায়ী কাগজখানার সিলভার সল্টের আস্তরণ প্রভাবান্বিত হয়ে বিভিন্ন স্থান বিভিন্নরূপ কালো হয়ে গেল। কাগজখানার উপরে সাদা-কালোর এরূপ বিভিন্নতার ফলে বাড়ীটার একটা আলো-ছায়ার ছবি ফুটে উঠলো। পরে কাগজখানাকে সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রব, অর্থাৎ সাধারণ নুনের জলে ধুয়ে অপরিবর্তিত সিলভার সল্ট দূর করে ট্যালবট ছবিটাকে কিছুটা স্থায়ী করতে সক্ষম হলেন। এর ফলে আলোতে এনেও ছবিটাকে কিছুকাল অবিকৃত দেখা গেল। আলোকচিত্রের ইতিহাসে এই হলো প্রথম সার্থক উদ্যম।

ট্যালবটের এই প্রথম আলোকচিত্রের অপরিবর্তিত সিলভার নাইট্রেট নুনের জলে যথাযথভাবে অপসৃত হয় না। কাজেই ছবিটা সর্বত্র সমভাবে কালো হয়ে গিয়ে ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে যায়। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে এগিয়ে এলেন হার্সচেল নামক এক বিজ্ঞানী। ইনি কয়েক বছর আগে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে সোডিয়াম থায়োসালফেট নামক একটা রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার করেছিলেন। পদার্থটার বিশেষ গুণ হলো এই যে, এর জলীয় দ্রবে সিলভার সল্টগুলি সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হয়ে যায়। হার্সচেল এই রাসায়নিক পদার্থের জলীয় দ্রবে ট্যালবটের আলোকচিত্রের কাগজ ধুয়ে প্রমাণ করলেন, সোডিয়াম থায়োসালফেট অবিকৃত সিলভার সল্ট সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করে—অথচ আলোক সম্পাতে যেখানে যতটা সিলভার সল্ট কালো হয়ে ছবির উদ্ভব হয় তার কোন ক্ষতি করে না। এই রাসায়নিক পদার্থটা হাইপো নামে অদ্যাপি ফটোগ্রাফির ধৌতকরণ প্রক্রিয়ায় সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে।

ডগেরো নামক এক ব্যক্তি ইতিমধ্যে আর একটা কৌশল উদ্ভাবন করেন। তিনি আয়োডিন বাষ্পের প্রভাবে রৌপ্যপাতের উপরে সিলভার আয়োডাইডের একটা হরিদ্রাভ আস্তরণ তৈরী করেন। ক্যামেরার অভ্যন্তরে এই রৌপ্যপাতখানা বসিয়ে আলোকপাতের ফলে এর আস্তরণের গায়ে ঈপ্সিত বস্তুর একটা অস্পষ্ট ছায়াচিত্র পাওয়া গেল। আলোকের প্রভাবে সিলভার আয়োডাইড বিশ্লিষ্ট হয়ে প্লেটখানার গায়ে কালো দাগ ধরে বস্তুটার প্রতিচ্ছবি উঠলো। অবশ্য এর জন্যে ক্যামেরাতে আলোকপাত করতে হয়েছিল বহুক্ষণ। একদিন ডগেরোর একখানা প্লেট সহসা পারদ-বাষ্পের সংস্পর্শে আসায় দেখা গেল, আলোকের প্রভাবে প্লেটের গায়ে উদ্ভূত কালো রৌপ্যকণিকার যে অদৃশ্যপ্রায় বিবর্ণ আস্তরণ জমে ছবির সৃষ্টি হয়েছিল, সেই রৌপ্য কণিকাগুলি পারদ-বাষ্পের সঙ্গে মিলে পারদ-সঙ্কর (অ্যামালগাম) সৃষ্টি হয়েছে। ফলে, আলোকচিত্রের ছবিটা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। আলোকচিত্রের ছবি এভাবে পরিস্ফুট ও স্পষ্টতর করে তোলাকে ফটোগ্রাফির ভাষায় ডেভেলপিং বলে।

ফক্স ট্যালবট এর আর একটা প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন, অল্পক্ষণ আলোকপাতের ফলে

সিলভার আয়োডাইডের উপরে উদ্ভূত ধাতব রৌপ্যের যে অদৃশ্যপ্রায় কালো প্রতিচ্ছবি পড়ে, ট্যালবট তাকে সিলভার প্লেটিং প্রক্রিয়ার সাহায্যে ফুটিয়ে তুলতে, অর্থাৎ ডেভেলপ করতে সক্ষম হলেন। সিলভার নাইট্রেট ও গ্যালিক অ্যাসিডের দ্রবণে প্লেটটা ডুবালে ওর আলোকস্পৃষ্ট অংশের ধাতব রৌপ্যকণিকার গায়ে সিলভার নাইট্রেটের বিশ্লিষ্ট রৌপ্যকণিকা লেগে যায় এবং ছবিটা স্পষ্টতর হয়ে ফুটে উঠে। ট্যালবট আরো দেখালেন, আলোক সম্পাতে প্লেটের গায়ে ইপ্সিত বস্তুর যে উল্টা (নেগেটিভ) প্রতিচ্ছবি পড়ে তাকে আবার অনুরূপ প্লেটের উপরে মুদ্রিত করা যায়। এই পুনর্মুদ্রিত ছবিটাতে ইপ্সিত বস্তুর অবিকল সোজা (পজিটিভ) প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় এবং এর ফলে চিত্রের আলো-ছায়ার বর্ণ পারম্পর্যও যথাযথভাবে রক্ষিত হয়। আধুনিক ফটোগ্রাফি শিল্পের এই হলো সংক্ষিপ্ত জন্ম-ইতিহাস। এভাবে একদিকে যেমন আলোকচিত্রের রাসায়নিক কলা-কৌশল ধীরে ধীরে উন্নত হয়েছে, অপরদিকে তেমনিই ক্যামেরা যন্ত্রেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। আজকাল বিচিত্র রকমের ক্যামেরা দেখা যায়। বিভিন্ন শ্রেণীর ক্যামেরার আকার, গঠন এবং যান্ত্রিক ব্যবস্থা ইত্যাদিতে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। অতি ক্ষুদ্র হ্যাণ্ড ক্যামেরাও যেমন আছে, কয়েক টন ওজনের বিরাটাকার ক্যামেরাও তেমনই তৈরী হয়েছে। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সহজে নিখুঁত চিত্র গ্রহণের উপযোগী বিভিন্ন বিধি-ব্যবস্থার জন্যে ক্রমে ক্যামেরায় নানারকম যন্ত্রাংশ সংযোজিত হয়েছে। আইপিসে বিভিন্ন রকমের লেন্স, কত রকমের সাটার ও লেন্স-ষ্টপ, ফোকাসিং এবং এক্সপোজারের কত বিচিত্র ব্যবস্থা! ফোকাসিং-স্ক্রীন, এক্সপোজার-মিটার প্রভৃতি বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সংযোজিত হয়েছে বিভিন্ন অসুবিধা দূর করবার জন্যে। ক্যামেরার এসব যান্ত্রিক উন্নতি বহুদিন ধরে বহু লোকের ক্রমাগত চেষ্টায় সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ক্যামেরার মূল তথ্য সর্বত্রই এক—ক্যামেরার অভ্যন্তরের আলোক-নিরুদ্ধ প্রকোষ্ঠে রক্ষিত ফিল্ম বা প্লেটের উপরে ইপ্সিত বস্তুর প্রতিফলিত রশ্মি যথাযথভাবে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। সুতরাং ঐ ফিল্ম বা প্লেটের কার্যকারিতার উপরেই ফটোগ্রাফির প্রকৃত উন্নতি নির্ভর করে।

যাহোক, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ঔৎসুক্য ও আগ্রহ বশে যে শিল্পের গোড়া পত্তন করেছেন, তা ক্রমে এখন এক বিরাট শিল্পে পরিণত হয়েছে। দিনের পর দিন ফটোগ্রাফির অগ্রগতি ঘটেছে। তারপর আবিষ্কৃত হলো সেলুলয়েড, যার পাত্‌লা পাত বা ফিল্মের উপরে আলোক-স্পর্শকাতর রাসায়নিক পদার্থের সূক্ষ্ম আস্তরণ লাগানো হলো। এই ফিল্ম ব্যবহারের উপযোগী সহজ ও অল্প-মূল্যের ক্যামেরাও বাজারে বেরুলো।

সেলুলয়েড ফিল্ম আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে সিনেমা শিল্প ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো। পৃথিবীর কোন কোন দেশে সিনেমা শিল্প আজ এক বিরাট জাতীয় শিল্পে পরিণত হয়েছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এটা এখন সেই দেশের তৃতীয় বৃহত্তম শিল্প। ইংল্যাণ্ডে প্রতি সপ্তাহে কয়েক হাজার মাইল দীর্ঘ সিনেমা ফিল্ম প্রস্তুত হচ্ছে। আমাদের দেশেও সিনেমা শিল্পের দ্রুত উন্নতি ঘটছে।

মনোরম দৃশ্য বা প্রিয়জনের আলোক চিত্র তুলে মানুষ একদিকে যেমন আনন্দ লাভ করে, অপর দিকে তার স্মৃতিরক্ষারও ব্যবস্থা হয়। সিনেমার ছবি দেখে লোক চিত্তবিনোদন করে। এসব ছাড়াও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফটোগ্রাফির উপ-যোগিতা এখন বিশেষভাবে বর্ধিত হয়েছে। সিনেমা চিত্র এখন আর শুধু অভিনয়ের আনন্দ দানের মাধ্যমই নয়, এর সাহায্যে এখন লোকশিক্ষা ও সংবাদ পরিবেশনের কাজও বিশেষ কার্যকরী হয়ে উঠেছে। মানবকল্যাণের বহুক্ষেত্রে এখন বিভিন্ন রকমের ফটোগ্রাফি যুগান্তর এনেছে। এক

কথায় এটা বর্তমানে মানব-সভ্যতার একটা অপরিহার্য অঙ্গ। এক্স রে আলোকচিত্র চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অভূতপূর্ব উন্নতির সূচনা করেছে। এর সাহায্যে দেহাভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন গোলযোগ নিরূপণ করা সম্ভব হয়েছে; ফলে এ যুগে অনেক রোগের চিকিৎসাপ্রণালী হয়েছে সহজ ও নির্ভুল। বিভিন্ন শিল্পেও ফটোগ্রাফির প্রয়োজনীয়তা আজ সর্বত্র স্বীকৃত। বিশেষ ব্যবস্থায় ফটোগ্রাফির সাহায্যে এখন যন্ত্রনির্মাতা তার যন্ত্রের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ধরতে পারেন, কামানের গোলাগুলির ভিতরকার বিশেষ ত্রুটি-বিচ্যুতি এর সাহায্যে আজকাল নির্ণীত হয়। আবার ফটোগ্রাফির দৌলতে দেশ-বিদেশের শিল্পবাণিজ্য ও শিক্ষা-সভ্যতার চিত্রবার্তা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে; দেশে দেশে সৌহৃদ্য সৃষ্টি হচ্ছে—জনশিক্ষার পথ সুগম হয়েছে।

আজকাল পৃথিবীর সব দেশের সরকারই জাতীয় কৃষ্টি ও উন্নতি বিষয়ক আলোকচিত্র তুলে দেশ-বিদেশে প্রচার করে থাকেন। অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা বিভিন্ন দেশের নানারকম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছবি তুলে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এর ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি ও দেশের মধ্যে পারস্পরিক বুঝাপড়ার ভাব বর্ধিত হয়েছে এবং জাতিবিদ্বেষ ও রাজনৈতিক তিক্ততা হ্রাস করছে। এক কথায় ফটোগ্রাফি শিল্পের উপযোগিতা ও আবশ্যকতা এযুগে অসামান্য। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে ফটোগ্রাফি এখন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।
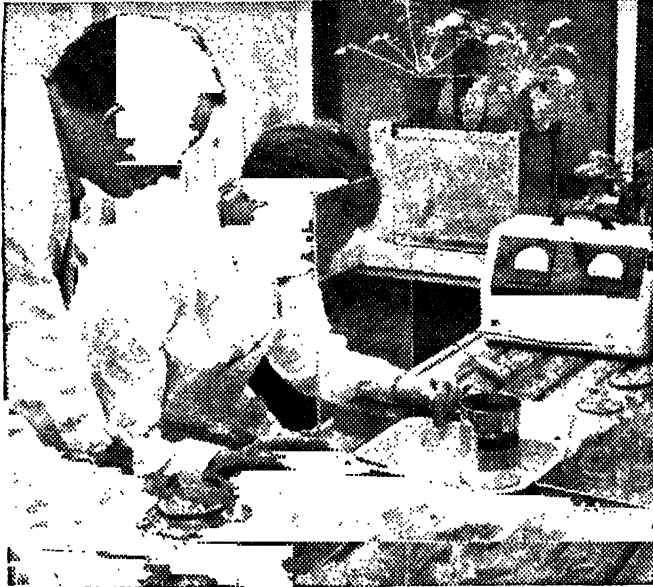
রোথামষ্টেড পরীক্ষাকেন্দ্রে একজন কৃষিবিজ্ঞানী তেজস্ক্রিয় রঞ্জকের সাহায্যে কীটের ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করছেন।

সাঁওতালদের নৃত্য প্রসঙ্গে

শ্রীপরমানন্দ প্রামাণিক

নৃত্যগীতে আসক্ত, আনন্দ ও মাধুর্যপূর্ণ সাঁওতালরা পশ্চিমবাংলার প্রায় প্রতি জেলাতেই বসবাস করছে। এদের বর্তমান আদি বাসস্থান বিহারের সাঁওতাল পরগণা। কিভাবে এবং কবে এরা বাংলাদেশে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেছে, সে সম্বন্ধে বলতে গেলে অনেক কিছু বলতে হয়। সে প্রসঙ্গ, এস্থলে আলোচ্য নয়। তবে বাংলা দেশে এদের ঘন বসতি দেখা যায় মেদিনীপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পশ্চিম দিনাজপুর ও বীরভূম জেলায়। এরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী, যদিও বর্তমানে অন্যান্য কাজকর্মে এদের নিযুক্ত দেখতে পাওয়া যায়। এদের সমগ্র সমাজ ১২টি গোত্র বা খুঁটে বিভক্ত। এক গোত্রের লোক সমগোত্রে বিবাহ করতে পারে না। প্রত্যেকটি গ্রাম নিজেদের নিযুক্ত কয়েকজন শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত হয়। সর্বোচ্চ শাসকের নাম মাঝি। সমাজচ্যুতি এদের সবচেয়ে বড় শাস্তি। এই শাস্তির নাম বিটলাহা এবং লোবির নামে যে শাসকগোষ্ঠী তৈরী হয় তাদেরই এই শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা থাকে। বছরে একদিন বার্ষিক শিকারের দিনে এই গোষ্ঠী তৈরী হয় এবং একজন সাধারণ সাঁওতাল অজানা শক্তির দ্বারা ডেহরী নিযুক্ত হয়। জন্ম, যৌবন, বিবাহ ও মৃত্যু—এই চারটি সময়ে চারটি অনুষ্ঠান তাদের জীবনের চারটি অধ্যায়ের পরিচায়ক। ধর্ম সম্বন্ধে তাদের ধারণা—জাহের এরা নামে গ্রাম্য দেবীই সবচেয়ে বেশী ক্ষমতাশালিনী। এ ছাড়া অবশ্য আরও অনেক দেবতা আছে। তবে সে সব বিষয় বাদ দিয়ে বর্তমান প্রসঙ্গে শুধু সাঁওতালদের নাচ-গানের বিষয়েই আলোচনা করবো।

বাহা পরব উপলক্ষ্যে নাচের দৃশ্য

সাঁওতালী "রসকা" কথার বাংলা অর্থ আনন্দ। নাচ শুধু আনন্দের উপকরণই নয়, দৈনন্দিন ক্রীড়া হিসাবেও সাঁওতাল জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। প্রত্যেক গ্রামেই নাচের জন্যে একটি স্থান নির্দিষ্ট থাকে; তার নাম আকড়া। যাবতীয় সামাজিক অনুষ্ঠানের সময় গ্রামের অবিবাহিতা যুবতীরা এই স্থানটিকে গোবর-জল দিয়ে পরিষ্কার করে থাকে। যখন কোন নাচ না হয় তখন স্থানটি যুবকদের আলাপ-আলোচনার কেন্দ্রস্থল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

নাচ বিভিন্ন ধরণের। কোন কোনটি বিশেষ কোনও উৎসবে এবং কোনও কোনটি সারা বছরই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এদের জীবনে প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানের সঙ্গেই নাচ ও গান যুক্ত হয়ে আছে; যেমন:—

(১) ডন—শিশুর জন্মের পরের অনুষ্ঠান। জাতির সম্বর্ধনা এবং বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানেই এই গান ও নাচ হয়ে থাকে। যদিও বিশেষ অনুষ্ঠানের বিশেষ বিশেষ নাচ ও গান আছে।

(২) বাপলা—বিবাহ উপলক্ষ্যে যে নাচ ও গান হয়।

(৩) ডোনগর—বার্ষিক শিকারের সময় এই নাচ ও গান হয়।

(৪) বাহা সোরেঙ্গ—'বাহা' (ফুল) উৎসবের সময় অনুষ্ঠিত হয়।

(৫) সোহরাই—সোহরাই, অর্থাৎ ফসলকর্তন উৎসবের নাচ-গান।

বাহা পরবের অপর একটি দৃশ্য

(৬) করম—করম উৎসবের নাচ-গান।

(৭) লাগরে—গরমকালে প্রায় প্রতি রাত্রিতেই গ্রামের যুবক-যুবতীরা মিলিতভাবে এই গান করে থাকে। এই গান অন্য কোন উপলক্ষ্যেও গীত হতে পারে।

১৯৫৬ সালে ১৭ই মার্চ আসানসোলের ৯ মাইল দূরবর্তী কাঁটাডাঙ্গা গ্রামে অল্প সময়ের জন্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে একটি সাঁওতাল গোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসবার সুযোগ ঘটেছিল। প্রতিযোগিতায় তাদের নাচগানও একটা অংশ করে নিয়েছিল।

৬টি গ্রামের প্রায় ২০০ শত আবালবৃদ্ধবনিতার সমাবেশে যে আনন্দানুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়, সেটি যথার্থই সুন্দর ও মনোরম হয়েছিল। অনুষ্ঠানে ৬টি গ্রামের ৬টি দল ৩টি বিভিন্ন ধরণের গানের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা করে। সাধারণতঃ ৬ জনে এক একটি দল গঠন করেছিল, আর তার সঙ্গে যুক্ত ছিল ১টি পুরুষ বংশীবাদক (তিরিও) ও ২টি মাদলবাদক (তুমদাক)। এ ছাড়া ২০।২৫ জনের দলও বিরল ছিল না।

প্রথমে "লাগরে" গান ও নাচ পরিবেশিত হয়। বড় বড় অনুষ্ঠানে বহু সম্মানিত ব্যক্তির উপস্থিতিতে এই গান পরিবেশন করাই তাদের সমাজের রীতি। অনেক সময় গানগুলি উপস্থিত মত তৈরী করা হয়। যেমন ঃ—

"রাজা রাজা সব রাজা জড়ো হলো,
মিটিং সহ ফটো নেওয়ার জন্যে।"

আমরা যখন ছবি তোলবার জন্যে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করছিলাম ও ব্যস্ত ছিলাম তখন বেলডাঙ্গা গ্রামের ২০ জনের গঠিত একটি দল সেই মুহূর্তটিকে স্মরণীয় করে উক্ত গানের মাধ্যমে। উদাহরণে সহজেই অনুমেয় যে, গানটির সৃষ্টি ঘটনাস্থল। ঠিক এমনই সহজ, সরলভাবে গোপালাবাদ থেকে ১৪ জনের দল পরিবেশন করে—

"বাবা যদি মরে ত দামোদর ঘাটে দরশন
আয়ো (ঠাকুরদা) যদি মরে ত তেলকুপি
নামাব।"

বিস্তীর্ণ ভূমির আর এক প্রান্তে তারাডাঙ্গার সাত জনের কণ্ঠ থেকে শোনা যাচ্ছিল—

"ছোট ভাই মাদল বাজায় পায়ের ধূলা
লাগিতে
পায়ের ধূলা দেখিয়া মায়ের মন লাগিল
কাঁদিতে।"

তারই পাশে কাঁটাডাঙ্গার ৬ জন গাইছিল—

"ধারা হারা ঘর বাবা আচির পাচির পিড়ে
ঘর বড় চিকন, মানুষ কত বড় লোক।"

অর্থ ঃ—কত বড় ঘর থেকে কত বড় লোক, কত কষ্ট করে আমাদের নাচ দেখতে এসেছে। গানের মাধ্যমে নিজেদের বিনীত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

পলাশবন গ্রাম থেকে এসেছিল ৬ জন। তারা গান করছিল—

"রাম লক্ষ্মণ মাদল বাজায়
সীতা সব নাচে
কৃষ্ণ ঠাকুর তাল যোগায়।"

হিন্দুদের মহাকাব্যের প্রভাবও যে তাদের মধ্যে রয়েছে তার উদাহরণ উপরের গানটি।

বেলডাঙ্গার ২০ জনের দল যে নতুন ধরণের গান পরিবেশন করে তার নাম সোহরাই।

"দিশম দিশম স্বাধীনন্দে ভাইরে ভাই।
দিশম দিশম যুগদ ভাইরে ফেরাওন।
সেতা সেতা এন্দ ভাইরে।
বেড়েত বেড়েত বেড়েত আপন ভাইরে ভাই।
হিংসা হালুম ভাইরে ভাই।
আলাং আলোঃ আবন ভাইরে ভাই
তাই নমরে বাবদ তেহানা।"

অর্থ ঃ—ভাই দেশ স্বাধীন হলো। দেশে দেশে যুগ বদলে গেল। সকাল হয়ে গেল। সবাই উঠরে ভাই, সবাই উঠে পড়। হিংসা যেন না থাকে। লেখাপড়া শিখবে। পিছনে আর পড়ে থেক না।

গানের অর্থ আধুনিক ভাবধারা সূচিত করে। এ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, নিজেদের পারিপাশ্বিকতায় উপযুক্তভাবে গড়ে তোলবার আলোড়ন এবং প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে এসে গেছে। আদিতে এই গান ও নাচের উদ্দেশ্য ছিল সোহরাই, অর্থাৎ ফসল কর্তন উৎসবের শুভ কামনা করা।

জনসুরিয়া গ্রামের ৬ জন যে গান গেয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে তার নাম করম বা রঙিয়া। বার্ষিক করম উৎসবের পর সাময়িকভাবে নির্মিত গ্রামের করম তলাতেই এই গান তারা গেয়ে থাকে; কিন্তু প্রতিযোগিতায় তারা

যে গান পরিবেশন করেছিল তার সঙ্গে আদি গানের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে।

"ওরে তাঁহা রেতা না না তারনা—
না নানা রে।
ওরে কোন দেশের আইলা হুড়ুড়ু
রসিকা লোক আইলা।
কোন দেশের বাজনবালা হুড়ুড়ু
রসিকা লোক আইলা।"

অর্থ :—ওরে ভাই দেখবি আয়, কোন্ অজানা দেশ থেকে হাসিখুসী বাজনাদার এসেছে।

উক্ত গানগুলিতে ছন্দপতন আছে বহু, কোনও এক পঙ্‌ক্তির সঙ্গে অপরটির যোগাযোগও কম, তথাপি প্রতিটি গানের একটি গূঢ় অন্তর্নিহিত ভাবধারা পাওয়া যায় এবং সমস্বরে গীত হওয়ায় মধুর ছন্দ ও সুর কর্ণকুহরে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে।

প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ প্রান্তরে অর্ধ বৃত্তাকারে হাত দিয়ে পরস্পরের কটিবদ্ধ হয়ে বিপরীতমুখী দুটি দলে মেয়ে ও পুরুষ বংশী-(তিরিও) ধ্বনি ও মাদলের (তামদাক) তালে তাল মিলিয়ে নৃত্য করছিল। মেয়েদের পরিধানে ছিল যন্ত্রে তৈরী ছিটের ব্লাউজ ও শাড়ী, আর পুরুষদের ধুতি হাঁটুর উপর পর্যন্ত তোলা। আবহমান কালের রীতি অনুযায়ী মেয়েদের শাড়ীর প্রান্তভাগ ছিল কটিদেশে জড়ানো। নাচের সময় বিভিন্ন অলঙ্কার নারীদেহের শোভাবর্ধনে সহায়তা করছিল এবং কিছু বাহুল্যও ছিল। অলঙ্কার অর্থে মাথায় ছিল পানকাঁটা; ঝাঁপাফুলো ও শিকলীফুলো; হাতে বালা, বাঁকি চুড়ী; গলায় হাঁসুলী ও ঘুন্‌সীমালা; কানে লবঙ্গ ডেউরী, ঝুমকা ইত্যাদি; আর পায়ে ছিল খাড়ুয়া ও বান্‌কী। রৌপ্য নির্মিত অলঙ্কার ছাড়াও প্রাকৃতিক সাজে সজ্জিত হতেও তারা ভোলে নি। তাই কবরীতে ছিল পুষ্পের সমারোহ। নিকষ কালো পাথরে তৈরী মূর্তির মত স্বাস্থ্য-সমুজ্জল যুবতীদেহ অকৃত্রিম প্রাকৃতিক সাজে সজ্জিত হয়ে নাচের সৌন্দর্য ও আভিজাত্য করেছিল দ্বিগুণিত। তারই সঙ্গে উপযুক্ত যোগাযোগ ঘটেছিল আদিবাসী সাঁওতাল যুবকদের। যুবতীদের তুলনায় যুবকদের সজ্জার বাহুল্য কম হলেও নগণ্য অথবা হেয় নয়। কপালের উপর লাল কাপড়ের বাঁধন ও মাথায় পালক গোঁজা যুবকেরা কোনও অংশেই কম আকর্ষণীয় ছিল না। কারও বা বাঁ-হাতের কব্জীতে ছিল তাবিজ। সত্যিই এই দৃশ্যে বার বার সঞ্জীবচন্দ্রের উপমা—বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে—মনে পড়ছিল।

কাঁটাডাঙ্গা ছাড়াও ঝাড়গ্রামের ডাকাই সোল গ্রামের বাহা উৎসবের নাচ ও গান দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল ৭ই এপ্রিল ১৯৫৬ সালে। ১০ জন বিবাহিতা ও অবিবাহিতা যুবতী এবং ৮ জন বিবাহিত ও অবিবাহিত যুবকের সঙ্গে পঞ্চাশোর্ধ্বের দুজন বৃদ্ধ মাদল (তামাক) ও বাঁশী (তিরিও) বাজিয়ে উৎসবটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। সেই দিনের গানের উদ্দেশ্য শুধু আনন্দ করাই নয়—তাদের পূজ্য দেবতার সন্তুষ্টি-বিধানও ছিল লক্ষ্য। যুবতীদের পোষাক ও অলঙ্কারের বাহুল্য ছিল না মোটেই, সাধারণ আটপৌড়ে শাড়ীর সঙ্গে কবরীতে ছিল ফুলের সমারোহ, আর যুবকদের ছিল সাধারণ কাপড় হাঁটুর উপর পর্যন্ত তোলা। খুব সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর সাজ-পোষাকের সাহায্যে যে সৌন্দর্যের পূর্ণরূপ দেওয়া সম্ভব, তারই পরিচয় পেলাম ডাকাই সোল গ্রামের যুবক-যুবতীদের মধ্যে। তাদে গানের কিছু নমুনা দেওয়া হলো—

(১) "মাগো সাই জোমসে নিয়া গোর কেরেই
কে মারাং কিয়া
জাহগাকে কুরোই তুলোই ও কান।"

(২) "ঘুরে ঘুরে সেঁগেল তিতিদ,
ঘুরে ঘুরে আলম রাগ।
মড়ে করেন ষাঁড়িগর শিমদ তুরুই কারণ
বায়দা মেয়ম।

ঘুরে ঘুরে সেঁগেল তিতিদ

ঘুরে ঘুরে আলম রাগ।"

(৩) "ঘুরে ঘুরে সে গেল তিতিদ

ঘুরে ঘুরে আলম রাগ

তোয়া তোয়া ছিতো লো

দাতে তেবে আলম রাগ।"

(ছিতোর কাছে আমরা আমাদের সব কিছু উৎসর্গ করছি। আমাদের আর পুনর্জন্ম হবে না।)

নিঃশঙ্কচিত্তে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আদিকাল থেকে আদিম পদ্ধতিতে যে আনন্দের উৎসটুকু তারা আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছিল তাকে নিজ নিজ পরিবেশে রক্ষা করাই হবে আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। দুঃখ, দুর্দশা, অভাব বিজড়িত জীবনে আদিম কাল থেকে তাদের এই আনন্দের উৎসটুকু আছে বলেই আজ পর্যন্ত কোনও ক্ষোভ না করে আনন্দের সঙ্গে সব কিছু ভাগ্যের উপর ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে তারা আজও বেঁচে আছে সহজ, সরল, আদিম পরিবেশে।

সুরুতে তাদের এই গান ও নাচের উদ্দেশ্য ছিল যাদুবিদ্যা। প্রকৃতির বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন গানের মাধ্যমে তারা প্রকৃতির নবরূপের নব সম্ভাবনার দিত পরিচয়। তাই শস্য উৎপাদন ও শস্য কর্তনের সময় বিভিন্ন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন গান ও নাচের ছিল ব্যবস্থা। যুগধারায় পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী করতে গিয়ে তাদের সেই আদিগানের ধারায় ঘটেছে অনেক পরিবর্তন। তার পরিচয় রয়ে গেছে সোহরাই ও করম গানে। গানের আদিতে এই গান গীত হয় সোহরাই ও করম উৎসবে। কিন্তু বর্তমানে সুরটুকু অপরিবর্তিত রেখে গানের কথার ঘটেছে প্রভূত পরিবর্তন এবং তাকে রূপায়িত করা হয়েছে অতি আধুনিক ভাবে। একথা মনে করা যেতে পারে যে, তাদের জীবনের ধারা পরিবর্তনের সঙ্গে গানের প্রকৃতিতে যে পরিবর্তন চলেছে, ভবিষ্যতের পক্ষে তা নানাদিক থেকে সম্ভাবনাপূর্ণ। আমাদের শুধু দৃষ্টি রাখতে হবে যে, জীবনের ধারা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিশ্চিন্ত অবসরের আনন্দটুকুর যেন অবলুপ্তি না ঘটে।

উদ্ভিদ-রোগের টক্সিন

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

মানুষ এবং পশুপাখীর দেহে যেমন নানাপ্রকার ব্যাক্টিরিয়া, প্রোটোজোয়া, মোল্ড প্রভৃতি আণুবীক্ষণিক জীব আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রোগ সৃষ্টি করে, উদ্ভিদও সেইরূপ বিভিন্ন জীবাণুঘটিত রোগে আক্রান্ত হয়। জীবাণুমাত্রেই কোন না কোন ব্যাধির বাহক নহে। আমাদের অন্ত্রের মধ্যে এমন অনেক জীবাণু আছে যাহাদের অবস্থিতি আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে কোনরূপ ক্ষতিকর নয়, বরং উহাদের অভাবেই আমাদের সুস্থতা ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা থাকে। যে সকল জীবাণু দেহের পক্ষে ক্ষতিকর কোন পদার্থ বা টক্সিন সৃষ্টি করে তাহারাই রোগ-জীবাণু। প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয় ক্ষেত্রেই জীবাণু-সৃষ্ট টক্সিনই রোগের মূল কারণ। তন্তু বা দেহের মধ্যে এই টক্সিনের ক্রিয়ার ফলেই রোগের সৃষ্টি হয়। এইরূপ বিভিন্ন রোগ-জীবাণু কর্তৃক সৃষ্ট টক্সিন-গুলির প্রকৃতি বিভিন্ন এবং দেহের মধ্যে ইহাদের বিভিন্ন রূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ফলে এক এক রকম জীবাণুঘটিত ব্যাধিতে এক এক রকম লক্ষণ প্রকাশ পায়।

আমাদের রোগ-নিদান শাস্ত্রে জীবাণুব্যাধি সংশ্লিষ্ট নানাপ্রকার টক্সিনের রাসায়নিক স্বরূপ এবং কি ভাবে উহাদের দ্বারা ব্যাধির উৎপত্তি হয়—এ সব সম্বন্ধে জ্ঞান যতখানি উন্নত হইয়াছে, উদ্ভিদের রোগ-নিদান শাস্ত্র সেই তুলনায় এখন পর্যন্ত যথেষ্ট অনগ্রসর বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ উদ্ভিদের রোগ-নিদানের ক্ষেত্রে এসব সম্বন্ধে তথ্যানুশীলন সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। যে সব স্থলে জীবাণু সংক্রমণে গুরুতরভাবে তন্তুর বিনাশ প্রাপ্তির লক্ষণ প্রকাশ পায়, সে সব উদ্ভিদ-রোগের রহস্য উদ্ঘাটনেই এখন পর্যন্ত গবেষণার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। কোন কোন জীবাণু সংক্রমণে তন্তুর বিনাশের পরিবর্তে ক্যান্সারের মত নূতন তন্তুর উদ্ভব ঘটিয়া স্বাভাবিক বৃদ্ধি বিপর্যস্ত হয়। জীব-তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এইরূপ রোগের রহস্য উদ্ঘাটনের যথেষ্ট গুরুত্ব থাকিলেও এখন পর্যন্ত এই সম্বন্ধে কোনরূপ সম্ভাবনা দেখা দেয় নাই।

উদাহরণ স্বরূপ ক্রাউন-গল বা আবের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেক প্রকার উদ্ভিদেই ব্যাক্টিরিয়াম টিউমিফেসিয়েন্স নামক একপ্রকার জীবাণুর সংক্রমণে কাণ্ডাংশ স্ফীত হইয়া এইরূপ আবের গঠন দ্বিবিধ পর্যায়ে সম্পাদিত হয়। প্রথমতঃ জীবাণুসৃষ্ট টক্সিনের প্রভাবে আক্রান্ত কোষগুলির অন্তর্যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এই ভাবে বিচ্ছিন্ন কোষগুলিই প্রাথমিক আবকোষ। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না এই কোষগুলিতে বৃদ্ধি উদ্দীপক পদার্থ বা হর্মোন যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ইহারা বিভাজন দ্বারা সংখ্যায় বাড়িয়া আবে পরিণত হইতে পারে না। এই কোষগুলির হর্মোন প্রাপ্তির ব্যাপারটিই সংক্রমণের দ্বিতীয় পর্যায়ে সংঘটিত হয়। জীবাণু হইতেই হর্মোন নিঃসৃত হইয়া কোষগুলিতে সরবরাহ হয়, এমন নহে, জীবাণুর প্রভাবে সংক্রামিত উদ্ভিদেই অধিক পরিমাণে হর্মোন উৎপাদিত হইয়া এই কোষগুলিতে সঞ্চালিত হয়।

কাজেই আব গঠনের ব্যাপারে অন্ততঃ দুই প্রকারের টক্সিন সংশ্লিষ্ট। একটির প্রভাবে স্বাভাবিক উদ্ভিদ-কোষই আবকোষে রূপান্তরিত হয় এবং অপরটির প্রভাবে উদ্ভিদের হর্মোন উৎপাদনের ক্ষমতা অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পায়, যাহার ফলে প্রাথমিক আবকোষগুলি বিভাজন

দ্বারা বৃদ্ধি পাইবার সুযোগ লাভ করে। যে পদার্থের প্রভাবে উদ্ভিদের স্বাভাবিক কোষ আব-কোষে পরিণত হয় তাহার স্বরূপ উদ্ঘাটনের গুরুত্ব অধিক বলিয়াই বিবেচিত হয়। কারণ এই পদার্থটির প্রকৃতি ক্যান্সার-কোষ উৎপাদক পদার্থেরই অনুরূপ। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই পদার্থটির স্বরূপ উদ্ঘাটনের কোন সম্ভাবনা দেখা দেয় নাই। উদ্ভিদ-কোষের এই রূপান্তরণ ব্যাপারটি এত দ্রুত সম্পন্ন হয় যে, রাসায়নিক পদার্থ স্বতন্ত্রীকরণের প্রচলিত ব্যবস্থাসমূহের দ্বারা উহাকে যথাযথভাবে অনুসরণ করিয়া পদার্থটির পরিচয় লাভ অসম্ভব বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে।

যে সব জীবাণুঘটিত ব্যাধিতে উদ্ভিদের তন্তুর বিনাশ সাধিত হয়, বিনাশের প্রকৃতি অনুযায়ী তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। ইহাদের এক শ্রেণীর বিনাশের প্রকৃতি স্থানীয়, অর্থাৎ সংক্রমণ-ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করিয়া অগ্রসর হয়। অপর শ্রেণীর ধ্বংসাত্মক শক্তি সংক্রামিত স্থান হইতে দূরে প্রকাশ পায়।

প্রথমোক্ত শ্রেণীর ব্যাধিগুলিতে জীবাণুসৃষ্ট টক্সিন সংক্রামিত স্থানের সংলগ্ন চারিপাশের তন্তুর মধ্যে শোষিত হইয়া উহাদের বিনাশ সাধন করে, অর্থাৎ সংক্রমণ-ক্ষেত্রেই টক্সিনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। আমাদের এক ত্বকের নানারূপ ব্যাধি ব্যতীত এইরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট সংক্রামক ব্যাধির সংখ্যা কমই আছে। যে কয়েকটি জানা আছে তন্মধ্যে ক্ষতস্থানে ক্লোষ্ট্রিডিয়াম হিষ্টোলিটিকাম নামক জীবাণুর সংক্রমণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সংক্রমণের ফলে ক্ষতস্থান সংলগ্ন তন্তুর পচন ক্রমশঃ ভিতরের দিকে অস্থি পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। পক্ষান্তরে উদ্ভিদে এইরূপ ব্যাধির সংখ্যা অগণিত। উদাহরণ স্বরূপ নানারূপ লিফ-স্পট ব্যাধির বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল ব্যাধিতে পত্রের বিভিন্ন অংশে সংক্রামিত স্থানের চারিপাশের তন্তুগুলি বিনষ্ট ও বিবর্ণ হইয়া পত্রময় চক্রাকার দাগের সৃষ্টি হয় এবং এই স্থানগুলি ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পাতার বিনাশ সাধন করে। নিম্নে প্রদত্ত তামাক ও আলুর যথাক্রমে ওয়াইল্ড ফায়ার ও আর্লি-ব্লাইট নামক দুইটি ব্যাধির বিবরণ হইতেই ইহাদের সংক্রমণের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে।

তামাকের এই ব্যাধিটি সিউডোমোনাস ট্যাবেকি নামক একপ্রকার ব্যাক্টিরিয়ার সংক্রমণে সৃষ্ট হয়। এই ব্যাধির সংক্রমণ দাবাগ্নির মত অতি দ্রুত শস্যক্ষেত্রে বিস্তৃত হইয়া পড়ে বলিয়াই ইহা ওয়াইল্ড ফায়ার নামে পরিচিত হইয়াছে। বর্ষাকালে ষ্টোমেটার ছিদ্রপথে উক্ত ব্যাক্টিরিয়ার সংক্রমণ ঘটে। প্রথমতঃ সংক্রামিত স্থানটি পাটকিলে বর্ণ ধারণ করে এবং উহার চতুর্দিকে প্রায় দুই সেন্টিমিটার ব্যাসযুক্ত একটি ফিকা রঙের চক্রের সৃষ্টি হয়। এই চক্রগুলির একমাত্র কেন্দ্র-স্থলেই ব্যাক্টিরিয়ার সন্ধান পাওয়া যায়। চতুর্দিকের বিবর্ণ স্থানগুলিতে কোন ব্যাক্টিরিয়া থাকে না। উক্ত ব্যাক্টিরিয়া হইতে সৃষ্ট ট্যাবোক্সিনিন নামক একটি পদার্থের ক্রিয়ায় চতুষ্পার্শ্বস্থ তন্তু-সমূহের পত্রহরিৎ বিনষ্ট হওয়ার ফলেই ঐ স্থানগুলি বিবর্ণ হয়।

ট্যাবোক্সিনিন একটি ডাইঅ্যামিনো-হাইড্রোক্সি প্রিমেলিক অ্যাসিড ($C_7H_{14}O_5N_2$)। রাসায়নিক গঠনের দিক হইতে ডিপ্থেরিয়া ও যক্ষ্মা-সংশ্লিষ্ট টক্সিনের সঙ্গে ইহার নিকট সম্বন্ধ বর্তমান। তামাকপাতার উপর ইহার বিষক্রিয়া তীব্রভাবে প্রকাশ পায়। দ্রাবণে ট্যাবোক্সিনিনের পরিমাণ দুই লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র বর্তমান থাকিলেও উহা প্রয়োগে তামাকপাতার উপর পূর্ববর্ণিত চক্রের সৃষ্টি হয়। অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, এল-মিথিওনিন নামক একটি যৌগিকের প্রয়োগে ইহার বিষক্রিয়া প্রশমিত হইতে পারে।

ট্যাবোক্সিনিন শুধু তামাকেই নয়, নানাপ্রকার উদ্ভিদের উপরই ইহার বিষক্রিয়া সৃষ্টি করিতে

পারে। তন্তুবিশেষের উপরও ইহার কোন পক্ষপাতিত্ব নাই; নানাপ্রকার উদ্ভিদ-তন্তুর উপরেই ইহার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির শক্তি বর্তমান। কোষের মধ্যে ইহার প্রতিক্রিয়ার ফলে সর্বক্ষেত্রেই একটি বিশেষ বিপাকের সূত্র অবরুদ্ধ হয়।

আর্লি-ব্লাইট আলুর গুরুতর ব্যাধি হইলেও ইহার আক্রমণ শুধু আলুতেই সীমাবদ্ধ নয়, তামাক প্রভৃতি সমজাতীয় অন্যান্য উদ্ভিদও এই রোগে আক্রান্ত হয়। এই রোগের সংক্রমণে পাতার উপর স্থানে স্থানে পাটকিলে বর্ণের চক্রাকার বা বাদামী দাগের সৃষ্টি হয়। এই স্থানগুলি ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া সমস্ত পাতাটিকে আবৃত করে। চারা অবস্থায়ই এই রোগের আক্রমণ ঘটে বলিয়া ইহার আর্লি-ব্লাইট নামকরণ হইয়াছে।

অল্টারনেরিয়া সোলানী নামক একটি ক্ষুদ্র জাতীয় ছত্রাকের সংক্রমণে এই ব্যাধির উৎপত্তি হয়। এই ছত্রাকের আক্রমণের বিরুদ্ধে উদ্ভিদ-তন্তুতে একরূপ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সৃষ্ট হইতে দেখা যায়। ছত্রাক-নিঃসৃত টক্সিনের বিস্তার রোধ করিতে আক্রান্ত স্থানটি ঘিরিয়া একটি কৃষ্ণবর্ণের অপ্রবেশ্য প্রাচীর উৎপন্ন হয়। অনুকূল অবস্থায় এই প্রতিবন্ধক প্রাচীর ভেদ করিয়াই ছত্রাক বিস্তার লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ-তন্তুর মধ্যেও পর পর চক্রাকারে আরও ঐরূপ প্রাচীর উৎপন্ন হইয়া পুনঃ পুনঃ ছত্রাকের বিস্তার রোধের চেষ্টা হইতে থাকে। মৃত পত্রের বিবর্ণ শুষ্ক স্থানগুলিতে পর পর রচিত এই প্রাচীরগুলির অস্তিত্ব স্পষ্টভাবে বর্তমান থাকে।

ওয়াইল্ড ফায়ারের তুলনায় আর্লি-ব্লাইট ব্যাধির প্রকৃতি অধিক জটিলতাপূর্ণ। কারণ ওয়াইল্ড ফায়ারের ক্ষেত্রে একটি মাত্র টক্সিন সংশ্লিষ্ট থাকায় উহার কার্যকারিতার স্বরূপ হইতেই ব্যাধির প্রকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ব্যাখ্যা সম্ভব। আর্লি-ব্লাইটের ক্ষেত্রে এইরূপ একাধিক টক্সিনের কার্যকারিতার সম্বন্ধ বর্তমান। অধিকন্তু এই ব্যাধিতে পরোপজীবী ছত্রাক ও আশ্রিত উদ্ভিদের মধ্যে একটা অদ্ভুত ঘাত-প্রতিঘাতের সম্বন্ধ বর্তমান থাকায় ইহাকে আরও দুর্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছে।

অল্টারনেরিয়া সোলানী হইতে কয়েকটি টক্সিন উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে এখন পর্যন্ত অল্টারনেরিক অ্যাসিড ও অল্টারনেরিন নামক দুইটি নাইট্রোজেন-মুক্ত যৌগিক পদার্থ স্বতন্ত্র করা সম্ভব হইয়াছে। উদ্ভিদ-তন্তুর উপর ইহাদের প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ যথাযথভাবে এখনও প্রকাশ পায় নাই। তবে যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে ট্যাবোক্সিনিন অপেক্ষা ইহাদের প্রতিক্রিয়ার প্রভাব অধিকতর ব্যাপক বলিয়াই মনে হয়। ট্যাবোক্সিনিন একটি বিশেষ বিপাকীয় সূত্রের উপরই আঘাত হানিতে সক্ষম, কিন্তু ইহাদের প্রভাবে বিভিন্ন বিপাকীয় ব্যবস্থাই বিপন্ন হইতে পারে। অল্টারনেরিক অ্যাসিড কোষের শোষণ শক্তির উপরও গুরুতর প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তবে টক্সিন হিসাবে ট্যাবোক্সিনিনের তুলনায় ইহাদের তীব্রতা কম, অর্থাৎ পরিমাণে অপেক্ষাকৃত অধিক হইলেই তবে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

উপরিউক্ত পত্র-ব্যাধি দুইটিতে যেমন সংক্রমণ ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে তন্তু বিনষ্ট হয়, জান্তব দেহে ক্লোষ্ট্রিডিয়াম হিষ্টোলিটিকাসের সংক্রমণের ফলেও যে তেমনই স্থানীয়ভাবে তন্তুর বিনাশ ঘটে, সেই সম্বন্ধে পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তবে সে ক্ষেত্রে বিনাশের কারণ অন্যরূপ—কোষজ পদার্থ দ্রবীভূত হইয়া বা পচনক্রিয়ার দ্বারা তন্তু বিনষ্ট হয়, কোষের বিপাকীয় ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টির ফলে নয়। উদ্ভিদের অনেক ছত্রাকঘটিত ব্যাধিতেও এইরূপ সংক্রামিত স্থানের তন্তুসমূহ পচনক্রিয়ার ফলে বিনষ্ট হয়। অনেক গাছেরই কাণ্ডাংশে গহ্বর রচিত হইতে দেখা যায়। সর্বক্ষেত্রেই কোন না কোন ছত্রাকের সংক্রমণ ফলেই এইরূপ ঘটে। স্থানীয়ভাবে পচনক্রিয়া ক্রমশঃ ভিতরের দিকে অগ্রসর হয় বলিয়া

গহ্বরগুলি ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে। ছত্রাক-দেহ-নিঃসৃত এন্‌জাইম বা টক্সিনের ক্রিয়ায়ই ঐ পচনক্রিয়া সংঘটিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই পচন-ক্রিয়ায় তন্তুবিশেষের উপর পক্ষপাতিত্বও দৃষ্ট হয়। ফলে সংক্রমণ স্থলে কোন বিশেষ তন্তু হয়তো পচন হইতে অব্যাহতি পায়, আর কতকগুলি হয়তো সহজে বিনষ্ট হয়।

যে সকল উদ্ভিদ-ব্যাধিতে সংক্রমণ ক্ষেত্রে ব্যাধির প্রকাশ ঘটে না, সংক্রামিত স্থান হইতে অনেক দূরে ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাদের প্রকৃতিকে টিটেনাস ব্যাধির সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। ক্ষতস্থানে টিটেনাস ব্যাক্টিরিয়ার সংক্রমণ ঘটে; কিন্তু ঐ ব্যাক্টিরিয়া কর্তৃক উৎপন্ন টক্সিনের কোন প্রতিক্রিয়া ক্ষতস্থানে প্রকাশ পায় না। স্নায়ুতন্তু বাহিত হইয়া ঐ টক্সিন মস্তিষ্কে উপনীত হয় এবং অঙ্গসঞ্চালন কেন্দ্রকে অবশ করে দেয়। এই সকল উদ্ভিদ-ব্যাধিতেও মূল বা কাণ্ডের অংশে ব্যাধির সংক্রমণ ঘটে এবং পত্র ও মুকুলে সেই ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায়। উদাহরণ স্বরূপ উদ্ভিদের উইল্ট ব্যাধির বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিভিন্ন প্রকার ছত্রাকের সংক্রমণে নানাজাতীয় উদ্ভিদ এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। মৃত্তিকা হইতে মূলে প্রথম সংক্রমণ ঘটে এবং সংক্রমণের পরে মূল এবং কাণ্ড আশ্রয় করিয়াই এইসব পরোপজীবী ছত্রাক বৃদ্ধি পায়। পরে হঠাৎ একদিন উদ্ভিদের পাতা ও মুকুলগুলি ঢলিয়া পড়ে এবং শুকাইতে আরম্ভ করে। ছত্রাক-নিঃসৃত টক্সিন ভাস্কুলার বা রসবাহী তন্তুর মধ্য দিয়া উধ্বর্গামী রসস্রোতের সঙ্গে উদ্ভিদের অগ্রভাগ ও পত্রাংশে উপনীত হয় এবং ঐ টক্সিনের প্রভাবে পাতা ও অগ্রভাগের অংশ রসহীন হইয়া গাছটিই সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। নানাবিধ ক্ষেত্রজ উদ্ভিদ হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ পর্যন্ত এইসব রোগে আক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট হয়।

এই জাতীয় রোগের প্রকৃতি সম্বন্ধে পূর্ণ পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে টোমেটোর উইল্ট রোগ লইয়া নানারূপ গবেষণা চলিয়াছে। ফিউজেরিয়াম লাইকোপার্সিকি নামক একটি ছত্রাকের সংক্রমণে টোমেটো গাছে এই রোগের সৃষ্টি হয়। মাটি হইতে প্রথম টোমেটো গাছের মূলে এই ছত্রাকের সংক্রমণ ঘটে এবং ছত্রাক বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমশঃ কাণ্ড পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। টক্সিনের প্রভাবে উদ্ভিদের জলীয় অংশের হ্রাস ঘটে, পাতা ও নমনীয় অগ্র-ভাগগুলি ঢলিয়া পড়ে এবং ভাস্কুলার তন্তু ও পত্রের তন্তুসমূহ পাটকিলে বর্ণ ধারণ করে।

ফিউজেরিয়াম লাইকোপার্সিকি হইতে এখন পর্যন্ত চারি প্রকার টক্সিন স্বতন্ত্র করা সম্ভব হইয়াছে; যথা—পেক্টেজ, ভ্যাসিনফুস্কেরিন, লাইকো-মেরাস্মিন ও ফিউজেরিক অ্যাসিড। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটির প্রভাবে ভাস্কুলার তন্তুগুলি বিবর্ণ ও বিশুষ্ক হইয়া যায়। অপর দুইটির প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় পত্র-তন্তুতে। এই টক্সিন চতুষ্টয় বিভিন্ন রাসায়নিক শ্রেণীভুক্ত হইলেও ইহাদের সবগুলিরই আণবিক ওজন টাইফয়েড প্রভৃতি ব্যাধিসংশ্লিষ্ট টক্সিন অপেক্ষা অনেক কম। যথা—ফিউজেরিক অ্যাসিডের আণবিক ওজন মাত্র ১৭৯, পক্ষান্তরে টাইফয়েড-ঘটিত টক্সিনের আণবিক ওজন ৭২০০০। উদ্ভিদ-ব্যাধি সংশ্লিষ্ট টক্সিনগুলি কোষ-প্রাচীরের অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে রস-প্রবাহের সঙ্গে কোষাভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হয়। টক্সিনের আণবিক ওজন খুব কম হইলেই উহা সহজে কোষের মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়। কাজেই টক্সিনের আণবিক ওজন যত কম, উদ্ভিদের পক্ষে উহা তত বেশী মারাত্মক।

আমাদের জীবাণুঘটিত ব্যাধিতে এক এক প্রকার জীবাণু এক একটি স্বতন্ত্র রকমের টক্সিন সৃষ্টি করিয়া থাকে। যেমন—টাইফয়েড রোগের টক্সিন টাইফয়েড জীবাণুরই বিশেষত্ব, অন্য কোন জীবাণু এই টক্সিন সৃষ্টি করিতে পারে না এবং এই টক্সিনের ক্রিয়ায় টাইফয়েড ব্যতীত অন্যরূপ ব্যাধিও সৃষ্টি হয় না। সেইরূপ টিটেনাস টক্সিন একমাত্র

উক্ত জীবাণুরই বিশেষত্ব। কিন্তু উদ্ভিদের ব্যাধির ক্ষেত্রে এই বিষয়ে বিশেষ ব্যতিক্রম দেখা যায়; যেমন—ফিউজেরিক অ্যাসিড। ইহা যে একমাত্র ফিউজেরিয়াম লাইকোপার্সিকি ছত্রাক হইতেই নিঃসৃত হইয়া থাকে, এমন নয়। ফিউজেরিয়াম হেটারোস্পোরাম, গিবারেল্লা ফিউজিকুরোই, ফিউজেরিয়াম ভ্যাসিনফেক্টাম, নেক্ট্রিয়া সিনাবেরিনা প্রভৃতি অন্যান্য ছত্রাকও এই টক্সিন সৃষ্টি করে এবং ইহা শুধু উইল্ট ব্যাধির সঙ্গেই যে সংশ্লিষ্ট, এমন নহে। ফিউজেরিয়াম হেটারোস্পোরামের সংক্রমণে পূর্ব-এশিয়ায় ধান, ভূট্টা ও ইক্ষুতে এক স্বতন্ত্র ধরণের ব্যাধির সৃষ্টি হয়। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে নানা জাতীয় উদ্ভিদ নেক্ট্রিনা সিনাবেরিনার সংক্রমণে রেডস্পট ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়।

রোগ সৃষ্টিতে ছত্রাকের গণ্ডী যত সীমাবদ্ধ, ছত্রাকঘটিত টক্সিনের গণ্ডী তত সীমাবদ্ধ নয়। কোন ছত্রাক হয়তো একমাত্র একটি নির্দিষ্ট জাতীয় উদ্ভিদেই রোগ সৃষ্টি করিতে পারে; কিন্তু ঐ ছত্রাক-সংশ্লিষ্ট টক্সিনের সাহায্যে অপর শ্রেণীর উদ্ভিদেও ঐ রোগ সৃষ্টি করা যায়। যথা—ফিউজেরিয়াম লাইকোপার্সিকি ছত্রাক আঙ্গুর গাছকে সংক্রামিত করিতে পারে না, কিন্তু তজ্জাত টক্সিন প্রয়োগে আঙ্গুর গাছেও টোমেটোর মতই উইল্ট রোগ সৃষ্টি করা যায়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, আঙ্গুর গাছে উক্ত রোগের যে প্রতিরোধ শক্তি বর্তমান তাহা শুধু ছত্রাকগত, টক্সিনগত নয়। আঙ্গুর গাছ উক্ত ছত্রাকের উপযুক্ত আশ্রয় নয় বলিয়াই উহা উক্ত ব্যাধি হইতে অব্যাহতি লাভ করে।

উইল্ট ব্যাধিগত টক্সিনগুলি আশ্রিত উদ্ভিদের সকল তন্তুর উপর সমান প্রতিক্রিয়াশীল নহে। বিশেষ নির্বাচিত তন্তুর উপরই উহাদের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ইহাদের অন্যতম লাইকোমেরাস্মিন কাণ্ড, পত্রবৃন্ত ও পত্রশিরা অতিক্রম করিয়া যায়, কিন্তু সেখানে কোন প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায় না। একমাত্র শিরার মধ্যবর্তী পত্রাংশের তন্তুতেই ইহার প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। আর একটি উইল্ট টক্সিন ভ্যাসিনফুস্কেরিনের প্রভাবে শুধু মাত্র ভাস্কুলার তন্তুগুলিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আবার একই তন্তু বিভিন্ন টক্সিনের নির্বাচন-স্থলও হইতে পারে। ভ্যাসিনফুস্কেরিনের প্রতিক্রিয়ায় যেমন ভাস্কুলার তন্তুগুলি পাটকিলে বর্ণ ধারণ করিয়া অসাড় হইয়া পড়ে, সেইরূপ পেক্টেজ এবং ডায়াপোথিন নামক অপর একটি ছত্রাক-নিঃসৃত টক্সিনের প্রতিক্রিয়ায়ও ঐ তন্তুতে একই-রূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। টক্সিনগুলি রাসায়নিক প্রকৃতিতে ভিন্নধর্মী; কাজেই উহাদের প্রতিক্রিয়ার স্বরূপও ভিন্ন প্রকৃতির হওয়াই স্বাভাবিক। অথচ এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, উদ্ভিদ-তন্তুর উপর এইরূপ বিভিন্ন পদার্থের ক্রিয়ার ফলেও একইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে।

উদ্ভিদের জলীয় অংশের হ্রাসপ্রাপ্তিই উইল্ট রোগের প্রধান উপসর্গ। এই রোগে উদ্ভিদের জলমোক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়া যে বিশুষ্কতা সংঘটিত হয় না, তাহা নানারূপ পরীক্ষায় প্রকাশ পাইয়াছে। কোষের অস্মোটিক প্রেসার হ্রাস ঘটিবার ফলেই কোষগুলি উপযুক্ত পরিমাণ জল শোষণের দ্বারা ইহাদের স্বাভাবিক স্ফীতি সংরক্ষণে অক্ষম হইয়া পড়ে। যে সকল পদার্থের দ্বারা কোষের অস্মোটিক প্রেসার সংরক্ষিত হয়, কোষ-প্রাচীর ও জৈবপঙ্কের মধ্যবর্তী পর্দা অপ্রবেশ্য হইয়া পড়িবার ফলে কোষের মধ্যে ঐ সকল পদার্থ প্রবেশে বাধা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু টক্সিনের ক্রিয়ায় কিভাবে উক্ত পর্দায় অপ্রবেশ্যতার সৃষ্টি হয় তাহা এখনও স্পষ্টভাবে জানা যায় নাই। বিশেষতঃ উইল্ট রোগের জলীয় অংশের হ্রাসপ্রাপ্তি প্রধান উপসর্গ হইলেও সমস্ত টক্সিনগুলিই যে ইহার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট, এমন নয়। ইহাদের কোন কোন টক্সিনের ক্রিয়ায় পত্রহরিতের বিনাশ প্রভৃতি অন্যান্য উপসর্গও এই রোগে এক সঙ্গেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিভিন্ন টক্সিনের

ক্রিয়ায় পারস্পরিক কোন সম্বন্ধ বর্তমান কিনা, এখন পর্যন্ত তাহাও জানা যায় নাই।

এখন পর্যন্ত এইভাবে খুব বেশী সংখ্যক উদ্ভিদ-ব্যাধি লইয়া কাজ হয় নাই। যে সকল ক্ষেত্রে কোন ব্যাধিতে একাধিক টক্সিনের কার্যকারিতার সম্বন্ধ বর্তমান থাকে, সে সকল ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের প্রকৃতির পরিচয় হইতেও অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাধি সম্বন্ধে পূর্ণ ব্যাখ্যা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। উইল্ট ব্যাধিসংশ্লিষ্ট টক্সিনগুলির কার্যকারিতার যতটুকু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেও এই ব্যাধির প্রকৃতি সম্বন্ধে পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া এখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। তবে এইভাবে উদ্ভিদের সংক্রামক ব্যাধিসংশ্লিষ্ট টক্সিনের প্রকৃতি অনুধাবনের ফলে উদ্ভিদ-ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রামের এক নূতন সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। জীবাণুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ না হইয়া উদ্ভিদদেহে জীবাণু-সৃষ্ট টক্সিনকে নিষ্ক্রিয় করিবার ব্যবস্থা সহজ হইতে পারে বলিয়া বিজ্ঞানীরা মনে করেন। অর্থাৎ টক্সিনকে নিষ্ক্রিয় করিতে সক্ষম, এইরূপ কোন পদার্থ উদ্ভিদে শোষিত হইবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে কোন রোগ-জীবাণুর সংক্রমণ সত্ত্বেও উদ্ভিদ উক্ত রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিবে।

বিজ্ঞান সংবাদ

মানসিক উত্তেজনা হইতে পাকস্থলীর ক্ষতের উৎপত্তি

পাকস্থলীতে ক্ষতের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার কারণ অনুমিত হইয়া থাকে; যেমন—বহুক্ষণ যাবৎ পাকস্থলী খাদ্যশূন্য অবস্থায় থাকা, ভুক্ত দ্রব্যের কোন কারণে পরিপাকের বিলম্ব, নিদ্রাল্পতা ইত্যাদি। কিন্তু মানসিক দুশ্চিন্তা বা উত্তেজনাও অনেক সময় পাকস্থলীতে ক্ষতের উৎপত্তির বিশেষ কারণ হইয়া দাঁড়ায় বলিয়া জানা গিয়াছে।

নেব্রাস্কা ইউনিভার্সিটিতে ডাঃ স্নরে ও ডাঃ উইল্জ এক পরীক্ষায় প্রমাণ পাইয়াছেন যে, মানসিক কারণেও পাকস্থলীতে ক্ষতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বিশেষ ধরণের বাক্সের মধ্যে কতকগুলি ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত ইঁদুর রাখা হয়। বাক্সটির এক কোণে খাদ্য ও জল থাকে; কিন্তু মাঝে একটি বৈদ্যুতিক বেষ্টনী থাকায় ইঁদুরগুলি খাদ্য ও পানীয়ের নিকট পৌঁছিতে পারে না। ঐ স্থানে যাইবার চেষ্টা করিলেই বৈদ্যুতিক আঘাত লাগিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়। আটচল্লিশ ঘণ্টা অন্তর বৈদ্যুতিক বেষ্টনীটি সরাইয়া লওয়া হয়; তখন উহারা খাদ্য ও পানীয় ব্যবহার করিতে পারে। ইঁদুরগুলিকে ত্রিশ দিন ঐ পরিবেশের মধ্যে রাখা হয়। অন্য একটি বাক্সে আর একদল ইঁদুরকেও ঐরূপ ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত করিয়া পরে খাইতে দেওয়া হয়; কিন্তু উহাদের জন্য কোন বৈদ্যুতিক আঘাতের ব্যবস্থা নাই। ত্রিশ দিন পরে শেষোক্ত ইঁদুরগুলির মধ্যে একটিরও পাকস্থলীর ক্ষতের কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। কিন্তু বৈদ্যুতিক আঘাতপ্রাপ্ত ইঁদুরগুলির সব কয়টিরই ক্ষত উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। আর একটি বাক্সে কয়েকটি ইঁদুর বৈদ্যুতিক আঘাত সত্ত্বেও ক্ষত হইতে মুক্ত থাকে। ইহাদের ক্ষত না হইবার কারণ এই যে, বিশদিন পরে বৈদ্যুতিক যন্ত্রটি বিকল হইয়া যাওয়ার ফলে উহারা চারদিন যাবৎ যদৃচ্ছা খাদ্য ও পানীয় পাইয়াছিল। মানসিক উত্তেজনার অবসান ঘটিবার ফলে উহাদের পাকস্থলীতে ক্ষত উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া অনুমিত

হইয়াছে। অনেকক্ষণ যাবৎ কেবলমাত্র ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত থাকিবার ফলে উহাদের ক্ষত উৎপন্ন হয় নাই।

পরীক্ষাগারে উৎপন্ন নূতন ধরণের খাদ্য

পরীক্ষাগারের মধ্যে অভিনব উপায়ে মানুষের ব্যবহারোপযোগী খাদ্য উৎপাদনের এক ব্যবস্থা করিয়া দুইদল বিজ্ঞানী উহার পেটেণ্ট লইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ক্লোরেলা নামক এককোষী জলজ উদ্ভিদ হইতে গবেষণাগারের মধ্যে খাদ্যোৎপাদনের কৌশল সম্বন্ধে এই পেটেণ্ট প্রদত্ত হইয়াছে। এই উদ্ভিদের সাহায্যে প্রোটিন, লিপিড এবং শর্করা জাতীয় খাদ্য ঘরের মধ্যে বসিয়াই উৎপাদন করা চলে।

উপায় দুইটির মধ্যে একটিতে এককোষী উদ্ভিদগুলিকে সার মিশ্রিত দ্রবণে রাখিয়া আলোকরশ্মি প্রয়োগ করা হয় এবং দ্রবণটির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড সরবরাহ করা হইতে থাকে। নাইট্রোজেন প্রভৃতি কতকগুলি অজৈব রাসায়নিকের জলীয় দ্রবণ সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ইহার সহিত অত্যল্প পরিমাণে প্রয়োজনীয় কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থও মিশ্রিত থাকে। পালো আল্টোরের মিঃ স্প্রোয়ার এবং মিঃ মিলনার এই ব্যবস্থার উদ্ভাবক।

দ্বিতীয় উপায়টিতে আষ্টিনের ডাঃ মায়ার্স ও ডাঃ ফিলিপ্স্ গবেষণাগারের মধ্যে উক্ত উদ্ভিদগুলির ব্যাপকভাবে চাষের ব্যবস্থা উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাঁহারা দেখেন যে, আধারগুলির আয়তন অনুযায়ী উদ্ভিদগুলির বৃদ্ধির তারতম্য ঘটে। এইরূপ সীমাবদ্ধ চাষের প্রণালীতে যাহাতে সর্বোৎকৃষ্ট ফল লাভ হইতে পারে, সেইরূপ একটি নূতন ব্যবস্থা তাঁহারা উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

স্বচ্ছ কাচের দ্বারা তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রতিরোধ

বিজ্ঞান-কর্মীদের তেজস্ক্রিয় রশ্মি হইতে রক্ষা করিবার জন্য পুরু সীসার পাত বা সিমেণ্ট কংক্রিট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রতিহত হয় বটে, কিন্তু ইহার প্রধান অসুবিধা এই যে, প্রকোষ্ঠের ভিতরের দ্রব্যাদি দেখা যায় না। সম্প্রতি বিশেষ ধরণের কাচ ব্যবহার করিয়া এই অসুবিধা দূর করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। পারমাণবিক চুল্লীর কাজে এই কাচের ব্যবহার বিশেষ উপযোগী হইবে। চুল্লীর মধ্যে কখন কোন্ বিষয় নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন বা কোন্ সময়ে নূতন ইন্ধন যোগাইতে হইবে তাহা চোখে দেখিয়া নির্ণয় করা যাইবে।

বিশেষ উপায়ে নির্মিত তিনখানি কাচের পাত পরস্পর সংলগ্ন করিয়া তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রতিরোধী এই স্বচ্ছ আবরণ প্রস্তুত করা হইয়াছে। তিনখানি কাচের মধ্যে যেখানি তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সম্মুখভাগে থাকে তাহা বেরিলিয়াম, লিথিয়াম ও বোরন অক্সাইড হইতে উৎপন্ন। ইহা অতিদ্রুতগতিসম্পন্ন নিউট্রন কণিকাগুলির গতিবেগ হ্রাস করে এবং অপেক্ষাকৃত মন্থরগতি নিউট্রন কণিকাগুলি উহা অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় না। দ্বিতীয় পাতখানি হইল একখানি উচ্চ গলনাঙ্কবিশিষ্ট কাচ। উহার উপরের দিকে যে কাচখানি থাকে তাহা হইল লেড-বোরো-সিলিকেট। বিটা ও গামা রশ্মিগুলি ইহার দ্বারা শোষিত হয়। নিউ কেন্‌সিংটনের মিঃ ফিটজেরাল্ড ও মিঃ ব্যাচ্‌ম্যান এই তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রতিরোধক কাচ উদ্ভাবন করিয়াছেন।

গ্যাস-টার্বাইনে চালিত নূতন ধরণের বাস

ইটালির এক খবরে জানা গিয়াছে যে, ভাইবার্টি মোটর কোম্পানীর অধ্যক্ষ ডাঃ ভাইবার্টি এক নূতন

ধরণের অতি দ্রুতগামী বাসের পরিকল্পনা করিয়াছেন। গ্যাস-টার্বাইন দ্বারা চালিত এই বাস ঘণ্টায় ১২৫ মাইল বেগে চলিতে পারিবে, অথচ আরোহীরা উহাতে কোন ঝাঁকুনি বা অস্বস্তি অনুভব করিবে না। পরিকল্পিত নক্সায় ইহার আকৃতির সহিত ডলফিন মাছের সৌসাদৃশ্য থাকায় বাসটির নাম দেওয়া হইয়াছে গোল্ডেন ডলফিন। তবে এইরূপ দ্রুতগামী যান চলিবার উপযোগী রাস্তার ব্যবস্থা হইলেই উক্ত প্রতিষ্ঠান ইহা বিক্রয়ের জন্য নির্মাণ করিবেন।

পরিকল্পিত গাড়ীটির কতকগুলি বিশেষত্ব উল্লেখযোগ্য। সম্পূর্ণ গাড়ীটি প্লাষ্টিকের দ্বারা নির্মিত হইবে এবং ছাদটি পোলারাইজ্‌ড্‌ কাচের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিবে। রৌদ্রের তেজ যতই প্রখর হউক না কেন, চারিদিকের দৃশ্য দেখিতে যাত্রীদের ভ্রূকুঞ্চিত করিতে হইবে না। গাড়ীতে আঠারো জন যাত্রী বসিবার জন্য স্বতন্ত্র আরামদায়ক চেয়ার থাকিবে। চেয়ারগুলির বিশেষত্ব হইল এই যে, সেগুলিকে যেদিকে ইচ্ছা ঘুরানো বা হেলানো যাইবে।

গাড়ীর সম্মুখভাগের মধ্যখানে চালকের বসিবার স্থান করা হইয়াছে এবং তাহার দুই পাশেই দরজা আছে। ইহাতে গাড়ীটি যে কোন দেশেই ব্যবহারের উপযোগী হইয়াছে। গাড়ীর খোলটি সম্পূর্ণ প্লাষ্টিকের দ্বারা নির্মিত হওয়ায় ইহা খুবই হাল্কা অথচ ধাতুনির্মিত গাড়ীর মতই মজবুত হইবে। পরিকল্পিত গাড়ীতে তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে এবং রেডিও-টেলিফোন ও টেলিভিশনের জন্যও যন্ত্রপাতি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এইরূপ দ্রুতগতিসম্পন্ন গাড়ীতে যাত্রীদের দেহে কোনরূপ ঝাঁকুনি যাহাতে না লাগে সেইজন্য চাকাগুলির সহিত গাড়ীর খোলটির সংযোজনের এক বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে এবং বিশেষ ধরণের টিউবশূন্য টায়ারেরও পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ফিয়াট কোম্পানী গোল্ডেন ডলফিনের গ্যাস-টার্বাইন ইঞ্জিন নির্মাণ করিতেছেন।

অ্যালকোহল-বাষ্প আলুর অঙ্কুরোদ্গমের প্রতিরোধক

সংরক্ষিত আলুর অঙ্কুরোদ্গম হইলে উহার স্বাদের পরিবর্তন ঘটে এবং উহার বাজার দরও কমিয়া যায়। আবার বীজ রোপণ করিবার অনেক পূর্বে অঙ্কুরগুলি বেশী বড় হইলে উহা চাষে ব্যবহারের পক্ষে অনুপযোগী হইয়া পড়ে।

অঙ্কুরোদ্গম শ্লথ করিবার জন্য কয়েক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের প্রচলন আছে।

সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, ইথাইল অ্যালকোহলের বাষ্প প্রয়োগে আলুর অঙ্কুরোদগম প্রতিহত হয়। ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীরা বলেন যে, অন্যান্য প্রতিরোধক রাসায়নিক পদার্থ অপেক্ষা ইথাইল অ্যালকোহল অধিকতর কার্যকরী। কারণ অঙ্কুরোদ্গমের লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পরেও ইহা প্রয়োগে ফল পাওয়া যায়।

মিঃ বার্টন ও মিঃ জিব্‌স্‌ আলুর উপর বহুপ্রকার অ্যালকোহল প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা করেন। তাঁহারা তিন জাতিয় আলুর উপর দশ প্রকার বিভিন্ন অ্যালকোহল বিভিন্ন মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া সবগুলিতেই সাফল্যজনক ফল পাইয়াছেন।

নবাবিষ্কৃত হার্মোনের কীটনাশক শক্তি

কীট হইতে নিষ্কাশিত নূতন একপ্রকার হর্মোন অব্যর্থ কীটনাশক হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে বলিয়া বিজ্ঞানীরা আশা করিতেছেন। প্রচলিত কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থ কোন অঞ্চলে উপর্যুপরি ব্যবহার করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহাতে ঐ অঞ্চলের কীটগুলি একপ্রকার প্রতিরোধ-ক্ষমতা অর্জন করে। তাহার ফলে ভবিষ্যতে ঐ কীটনাশক পদার্থ প্রয়োগে ঐ অঞ্চলের কীটগুলি আর

ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। বিজ্ঞানীরা বলেন, এই নূতন কীটনাশক হর্মোন প্রয়োগে কীটগুলি কোন মতেই প্রতিরোধ-ক্ষমতা অর্জন করিতে পারিবে না। হর্মোনটি কীটদেহের রূপান্তর গ্রহণে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে। শোঁয়াপোকা যেমন প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সমস্ত কীট জাতীর জীবন-কালের এক নির্দিষ্ট সময়ে রূপান্তর গ্রহণ প্রয়োজনীয়। সেক্রোপিয়া নামক রেশম কীটের উদর হইতে এই হর্মোন নিষ্কাশন করিয়া অন্যান্য কীটের উপর প্রয়োগ করিয়া বিজ্ঞানীরা দেখেন যে, ইহাতে অদ্ভুত আকার-বিশিষ্ট কীটের উৎপত্তি হয় এবং অচিরেই উহা নষ্ট হইয়া যায়।

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির ডাঃ উইলিয়াম্‌স্‌ গুটি অবস্থায় কীটদেহে এই হর্মোন প্রয়োগ করিয়া দেখেন যে, ইহাতে কীটের একাংশ বর্ধিত হয়, কিন্তু অপরাংশ গুটির অবস্থাতেই থাকিয়া যায় এবং শীঘ্রই উহা মরিয়া যায়।

মাছি, আর্শোলা এবং অন্যান্য পোকা প্রচলিত সব রকম কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসিয়া প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করিয়া থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা আশা করেন যে, কীটের দেহোৎপন্ন হর্মোনের সংস্পর্শে আসিয়া উহারা কিছুতেই প্রতিরোধ-ক্ষমতা অর্জন করিতে পারিবে না। ডাঃ উইলিয়াম্‌স্‌ বলেন যে, হর্মোনটির রাসায়নিক গঠন নির্ধারণ করিয়া কৃত্রিম উপায়ে ইহা প্রস্তুত করা সম্ভব হইলে ইহা সর্বাপেক্ষা কার্যকরী কীটঘ্ন অস্ত্র হইবে।

ইংল্যাণ্ডের কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির প্রাণিতত্ত্ব গবেষণাগারে ডাঃ উইলিয়াম্‌স্‌ এই সম্বন্ধে গবেষণা পরিচালনা করিতেছেন।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত
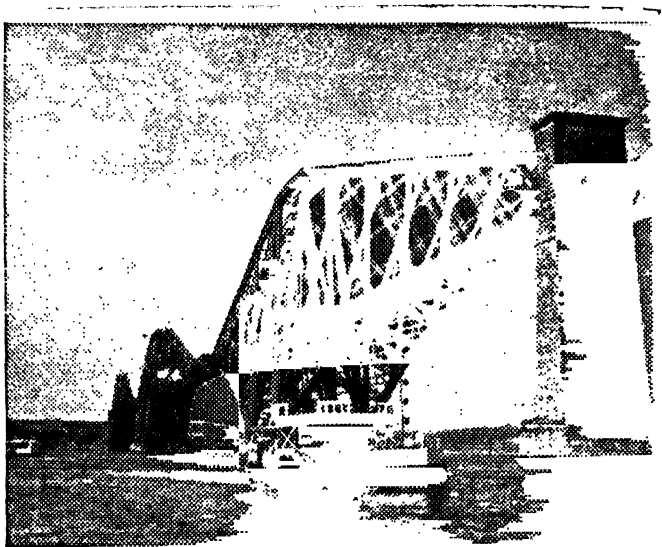
ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিস্ময়—বৃটেনের ফোর্থ ব্রিজ

তেজস্ক্রিয় পরিচিতি

শ্রীসলিল বসু

আজ থেকে একশ' বছর আগে। সেদিনের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিস্ময় ছিল নব আবিষ্কৃত বিদ্যুৎ-শক্তি। মাইকেল ফ্যারাডের বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তত্ত্ব ও তার সামান্য ব্যবহারিক বিকাশ সাধারণ মানুষকে বিস্ময়-বিমূঢ় করেছিল, আর নব্য বিজ্ঞানে এনেছিল আলোড়ন। বিজ্ঞানীরা অনেকেই তখন বিদ্যুৎ-শক্তি ও বিদ্যুৎপ্রবাহ নিয়ে গবেষণা সুরু করেন। বিভিন্ন চাপের গ্যাসের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনার চেষ্টা করতে গিয়ে আবিষ্কৃত হলো ক্যাথোড রশ্মি ও ইলেকট্রন নামে ঋণাত্মক মৌলিক বিদ্যুৎকণা। ১৮৮৬ সালে অধ্যাপক ক্রুক্স্ এই রশ্মির বিশেষত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করেন। দেখা গেল, কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থকে এই রশ্মিতে ধরলে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং বিশেষ একপ্রকার দীপ্তি বিকিরণ করতে থাকে। প্রক্রিয়াটির নাম দেওয়া হয়েছে ফস্‌ফোরেসেন্স, অর্থাৎ অনুপ্রভা। ক্যাথোড রশ্মি নিয়ে অধ্যাপক রঞ্জেন গবেষণা করতে গিয়ে সন্ধান পেলেন এক্স-রে নামে আর এক নতুন রশ্মির। এই নব আবিষ্কৃত রশ্মির সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, স্থূল বাধা ভেদ করবার ক্ষমতা। এ হলো ১৮৯৫ সালের ঘটনা।

এই ব্যাপারের ফলে বিজ্ঞানীদের অনেকের ধারণা হলো, স্বাভাবিক অনুপ্রভ পদার্থমাত্রেই বুঝি এক্স-রে'র উৎস। প্যারী মিউনিসিপ্যাল স্কুলের অধ্যাপক বেকারেল কতকগুলি জিনিষ নিয়ে নতুন অনুসন্ধান সুরু করেন। অনেকগুলি জিনিষ বেশ ভাল করে মুড়ে একটা ডেস্কের মধ্যে রেখে দিলেন। সেই ডেস্কে ছিল একটা ফটোগ্রাফিক প্লেট। দিন কয়েক পরে প্লেটখানা ডেভেলপ করবার সময় দেখলেন, যে কোন রকমেই হোক প্লেটটার উপর আলোকপাত হয়েছে। পরীক্ষা করে দেখা গেল, এই বিশেষ ঘটনাটা হয়েছে ইউরেনিয়াম মোড়ক থেকে। বেকারেল ভাবলেন, এটা বুঝি নিছক অনুপ্রভা! কিন্তু ইউরেনিয়ামকে দীর্ঘদিন অন্ধকারে রাখবার পরও যখন তার এই ধর্মটা পরিবর্তিত হলো না এবং সব ইউরেনিয়াম যৌগিক থেকেই যখন এই ব্যাপারটা ঘটতে দেখা গেল, তখন বিশেষভাবে অনুসন্ধান সুরু হয়ে গেল। দেখা গেল, ইউরেনিয়াম থেকে বিকিরিত এই অদৃশ্য রশ্মি কতকগুলি বিশেষ রাসায়নিক পদার্থকে অনুপ্রভ করে তোলে, আলোকচিত্রে প্লেটের উপর প্রভাব বিস্তার করে, আর গ্যাসকে আয়নিত, অর্থাৎ বিদ্যুৎবাহী করে। ১৮৯৬ সালে এই বিকিরণের নাম দেওয়া হলো তেজস্ক্রিয়া।

প্যারীর অধ্যাপক পিয়ের কুরী ও মাদাম কুরী দেখলেন যে, সাধারণ ইউরেনিয়ামের চেয়ে পিচব্লেণ্ডের মধ্যে তেজস্ক্রিয়া বেশী। তখন ধারণা ছিল, পিচব্লেণ্ড বুঝি শুধু ইউরেনিয়াম অক্সাইড। সন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল, এর মধ্যে আরও অনেকগুলি তেজস্ক্রিয় পদার্থের অস্তিত্ব র'য়েছে। কয়েক বছরের মধ্যে কুরী দম্পতি ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় রেডিয়াম, থোরিয়াম, পোলোনিয়াম, অ্যাক্টিনিয়াম প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া গেল।

তারপর বছর দশেক ধরে এই তেজস্ক্রিয় বিকিরণ সম্পর্কে অনেক কিছু গবেষণা চলতে থাকে। দেখা গেল, ক্যাথোড রশ্মি ও রঞ্জেন রশ্মির মত এই বিকিরণটা একটা মাত্র রশ্মির নয়, তিনটি বিভিন্ন রশ্মির। এই রশ্মিগুলিতে আল্‌ফা কণা, বিটা কণা ও গামা রশ্মি রয়েছে। প্রতিটি

রশ্মির ভেদশক্তি ও আয়নীকরণ শক্তি বিভিন্ন রকম।

আল্‌ফা কণার ভেদশক্তি সব চাইতে কম। বাতাসের মধ্যে মাত্র ৭ সেন্টিমিটার চলতে পারে; তাও আবার গতিপথে কোন শক্ত বাধা পড়লে গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। মানুষের গায়ের চামড়া ভেদ করে ভিতরে ঢোকবার ক্ষমতা এর নেই বটে, তবে কোন উন্মুক্ত স্থান দিয়ে শরীরের ভিতর ঢুকতে পারলে যথেষ্ট ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা আছে। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থকে অনুপ্রভ করে তোলবার কৃতিত্ব এই আল্‌ফা কণারই। গবেষণায় দেখা গেছে, এই কণাটি হলো হিলিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস।

বিটা কণার ভেদশক্তি কিছুটা বেশী, পাত্‌লা ধাতব পাত ভেদ করে চলতে পারে; তবে ৩ মিলিটারের বেশী মোটা পাত ভেদ করতে পারে না। মানুষের শরীরের চামড়া ভেদ করে সামান্যই ঢুকতে পারে আর তার ফলে আক্রান্ত স্থান পুড়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। আসলে এটা হলো ইলেকট্রন, ঋণাত্মক তড়িতের অবিভাজ্য মৌলিক কণিকা।

গামা রশ্মির ভেদশক্তিই হলো সব চাইতে বেশী। এই রশ্মি ৬ ইঞ্চি পুরু সীসার পাতও অনায়াসে ভেদ করে চলে যায়। তাই মানুষের শরীরের মধ্যে অনেকদূর পর্যন্ত এর অবাধ গতি। পরীক্ষায় দেখা গেছে, রশ্মিটি একেবারে পুরাপুরিই রঞ্জেন রশ্মির অনুরূপ, তবে এটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য শেষোক্ত রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চেয়ে বেশ কিছুটা কম। তা ছাড়া গামা রশ্মিটা প্রাকৃতিক রশ্মি, কিন্তু রঞ্জেন রশ্মি এ'ই পর্যায়ে পড়ে না।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি ও লয়

তেজস্ক্রিয় রশ্মিসমষ্টির উপর চুম্বকের প্রভাব ও বিদ্যুৎ-সচেতনতা নিয়েও অনুসন্ধান করা হয়েছে। আল্‌ফা কণার উপরে চুম্বকের প্রভাব বিটা কণার বিপরীত, অর্থাৎ দুটার বৈদ্যুতিক 'চার্জ'ও বিপরীত। তা ছাড়া বিটা কণার উপরে প্রভাবটা যে পরিমাণেও বেশী সেটা কণাটার বেশী ঠেকে যাওয়া থেকেই বোঝা যায়। আর এও প্রমাণিত হয়েছে যে, বিটা কণার আয়তনও আল্‌ফা কণার তুলনায় নগণ্য। গামা রশ্মি একেবারে সোজাসুজি বেরিয়ে যায়, অর্থাৎ এর কোন বৈদ্যুতিক চার্জ নেই।

এখন কথা হলো, কতকগুলি বিশেষ পদার্থের এই জাতীয় ব্যবহার দেখা যায় কেন? এটা নিয়ে আলোচনা করতে হলে পদার্থের অণু-পরমাণু সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদের কিছু জানা দরকার। এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন টমসন, রাদারফোর্ড, বোর প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা। পরমাণুর মধ্যস্থলে আছে নিউক্লিয়াস। সৌরমণ্ডলে যেমন সূর্যের চারদিকে গ্রহগুলি ঘুরে বেড়ায় ঠিক তেমনি এই নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘুরে বেড়ায় ইলেকট্রন। বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুতে এদের সংখ্যাও বিভিন্ন। পরমাণু ভরের সবটাই হচ্ছে এই নিউক্লিয়াসের। নিউক্লিয়াসের মধ্যে আছে দু-রকমের মৌলিক কণা—প্রোটন ও নিউট্রন। বিদ্যুৎ-সচেতনতায় প্রোটন ধনাত্মক এবং নিউট্রন নিরপেক্ষ। সাধারণ অবস্থায় নিউক্লিয়াসের ধনাত্মক বিদ্যুৎ ইলেকট্রনের ঋণাত্মক বিদ্যুতের সঙ্গে সমভাব রক্ষা করে, অর্থাৎ পদার্থটি হয় বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ। কোন বিশেষ মৌলিক পদার্থে অস্থায়ী জটিল সংগঠনের নিউ-ক্লিয়াস থাকবার ফলেই পদার্থটি থেকে যে জাতীয় ব্যবহার দেখা যায়, সেটাই হলো তেজস্ক্রিয়া।

এই জাতীয় পদার্থগুলির সব চেয়ে মজার ব্যাপার হলো, এর কোনটাই স্থায়ী নয়। যে কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ কিন্তু অবিরত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে অন্য একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থে। এই নবগঠিত পদার্থটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই পরিবর্তনটা থেমে যায় শেষ পর্যন্ত সীসাতে এসে, কেন না এটা তো আর তেজস্ক্রিয় পদার্থ নয়! প্রকৃত প্রস্তাবে রেডিয়াম তৈরী হয় ইউরেনিয়াম থেকে; অবশ্য ইউরেনিয়াম ও রেডিয়ামের মধ্যে অনেকগুলি তেজস্ক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি ও লয় হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি পদার্থের সৃষ্টি হয় সেটার ঠিক আগের পদার্থটির বিলোপের ফলে। এই নতুন পদার্থ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু একটা আল্‌ফা কণা বা বিটা কণা তৈরী হয়। এই জাতীয় ক্ষণস্থায়িত্বের জন্যে তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রকৃতি বোঝাতে অর্ধজীবন (Half life) নামে একটা সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয়। এই অর্ধজীবন বলতে বোঝায়, পদার্থটি সম্পূর্ণ পরিমাণে বিলুপ্ত হতে যে সময় লাগে তারই ঠিক অর্ধেক সময়। রেডিয়ামের অর্ধজীবন হলো প্রায় ১৬৯০ বছর।

যাবতীয় ভৌত প্রকৃতির যেমন পরিমাপের একক ও মান আছে তেমনি তেজস্ক্রিয়া পরিমাপেরও ব্যবস্থা আছে। ১ গ্রাম রেডিয়ামের তেজস্ক্রিয়ার পরিমাপটাকেই 'একক' ধরা হয়েছে ও এই পরিমাপের মানটাকে বলা হয় "কুরী"। পরিমাপের জন্যে উইলসন ক্লাউড চেম্বার, গাইগার-মূলার কাউণ্টার প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

এতক্ষণ প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়ার কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়ে তেজস্ক্রিয়-উৎপাদনেও সক্ষম হয়েছেন। ফ্রেডারিক জোলিও ও আইরিন কুরী একযোগে এই কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়া উৎপাদনে কৃতকার্য হন।

১৯৩২ সালে অধ্যাপক অ্যান্ডারসন আবিষ্কার করেন পজিট্রন, অর্থাৎ ধনাত্মক ইলেকট্রন। বিভিন্ন রকম পারমাণবিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে এই পজিট্রন। আইরিন ও ফ্রেডারিক জোলিও কুরী লক্ষ্য করেন যে, পোলোনিয়াম থেকে প্রাপ্ত আল্‌ফা কণা যদি অ্যালুমিনিয়ামের

উপর বর্ষণ করা হয় তাহলে ধাতুটার গা থেকে পজিট্রন বিকিরিত হতে থাকে। শুধু তাই নয়, একবার বিকিরণ সুরু হলে আল্‌ফা কণার উৎসটাকে সরিয়ে নিলেও বিকিরণ চলতে থাকে। প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরণ থেকে যে ঋণাত্মক ইলেকট্রন পাওয়া যায়, পজিট্রনের বিকিরণ কতকটা সেই জাতের। এথেকে এই সিদ্ধান্ত হলো যে, আল্‌ফা কণার সাহায্যে অ্যালুমিনিয়ামকে কৃত্রিম উপায়ে তেজস্ক্রিয় করে তোলা সম্ভব। জোলিও-কুরীর আবিষ্কারের কিছুদিনের মধ্যেই রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এন্‌রিকো ফের্মি নিউট্রনের সাহায্যে মৌলিক পদার্থের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে তেজস্ক্রিয়তা আনতে সক্ষম হন। এছাড়া আরও কতগুলি কণিকা বর্ষণ করেও কৃত্রিম উপায়ে তেজস্ক্রিয়তা উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। রসায়ন শাস্ত্রের ৯২টা মৌলিক পদার্থের মধ্যে প্রায় ৮৭টাকে কৃত্রিম উপায়ে তেজস্ক্রিয় করা গেছে। কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের ফলে চিকিৎসা-পদ্ধতিরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। তাছাড়া আধুনিক যুগে কৃত্রিম উপায়ে তেজস্ক্রিয়তা উৎপাদনের ফলেই মানুষ পারমাণবিক শক্তিকে আয়ত্তে আনতে পেরেছে।

সঞ্চয়ন

ক্যান্সার চিকিৎসায় পরিত্যক্ত পারমাণবিক পদার্থের ব্যবহার

কেসিয়াম নামক একপ্রকার পরিত্যক্ত পারমাণবিক পদার্থ ক্যান্সার-বিরোধী সংগ্রামে বৃটিশ চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের প্রভূত সহায়তা করিতেছে।

জনৈক মধ্যবয়স্ক ক্যান্সার-রোগীকে চাকা-ওয়ালা চেয়ারে করিয়া অপারেশন টেবিলে লইয়া আসা হইল। লোকটির কানের পাশে ক্যান্সার হইয়াছে। ডাক্তারেরা রোগীকে ধরিয়া এমনভাবে টেবিলে শোয়াইলেন যাহাতে তাহার মাথাটি সার্চলাইটের মত দেখিতে একটি যন্ত্রের ঠিক সম্মুখেই থাকে।

ঘরটি মামুলী অপারেশন থিয়েটারের মত নহে। সাটনের (সারে) রয়েল মার্সডেন হাসপাতালের রেডিও-থেরাপি বিভাগের এই ঘরটির দেয়াল দুই ফুট পুরু কংক্রীটের দ্বারা নির্মিত এবং বাহির হইতে রোগীকে পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য দেয়ালে পুরু কাচে ঢাকা একটি ক্ষুদ্র জানালা আছে।

ডাক্তারেরা ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। এক মিনিট পরে পাশের ঘরে জনৈক মহিলা রেডিও-গ্রাফার টেলিভিশনের পর্দায় রোগীর অবস্থান নিরীক্ষণ করিয়া অ্যাম্পলিফায়ারযোগে রোগীকে দুই-চার কথায় আশ্বস্ত করিবার পর একটি লাল বোতাম টিপিলেন।

এইভাবে সর্বপ্রথম সাধারণ হাসপাতালে ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় কেসিয়াম নামক একপ্রকার পরিত্যক্ত পারমাণবিক পদার্থ ব্যবহার করা হইয়াছিল।

বৃটেনের পরমাণু-বৈজ্ঞানিকেরা যে নূতন তেজস্ক্রিয় রশ্মি উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের নিকট নূতন আশার আলো বহন করিয়া আনিয়াছে।

ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় 'ডিপ-রে' ব্যবহার নূতন নয়। রঞ্জেন রশ্মি হইতে আরম্ভ করিয়া রেডিয়াম, কোবাল্ট প্রভৃতি পারমাণবিক

পদার্থের ব্যবহার অনেক দিন হইতেই করা হইতেছে।

কিন্তু সম্প্রতি উইণ্ডস্কেলের (কাম্বারল্যাণ্ড) বিজ্ঞানীরা পারমাণবিক চুল্লী হইতে কেসিয়াম নামক যে নূতন পরিত্যক্ত পদার্থটি উদ্ধার করিয়াছেন তাহা রেডিও-থেরাপির কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইবে বলিয়া মনে হয়।

সাটনের রেডিও-থেরাপি বিভাগে রক্ষিত কেসিয়ামটুকু হইতে যে পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাইতেছে তাহা হাজার গ্র্যাম রেডিয়াম হইতে নির্গত শক্তির সমান। সমগ্র গ্রেট-বৃটেনেও এই পরিমাণ রেডিয়াম নাই। কেসিয়ামের অধিকাংশ শক্তি ২০ হইতে ৩০ বৎসর পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

সাটনের হাসপাতালে যে সকল রেডিওগ্রাফার, পদার্থবিদ্ ও ডাক্তার কাজ করিতেছেন তাঁহাদের শরীরে বিন্দুমাত্রও ক্ষতিকর তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রবেশ করিতেছে কিনা তাহা নির্ণয় করিবার জন্য সকলেই একটি করিয়া ফিল্ম-ব্যাজ পরিধান করেন। প্রতি সপ্তাহে এই ফিল্মগুলি ডেভেলপ করিয়া পরীক্ষা করা হয়।

চিকিৎসাগারের বাতাস প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর পরিবর্তন করা হয় এবং রোগীর উপর ব্যবহারের সময় ছাড়া সামান্য পরিমাণ তেজস্ক্রিয় রশ্মিও যাহাতে বাহিরে নির্গত না হয় তাহার জন্য প্রতিনিয়ত পরীক্ষা চালানো হয়।

বর্তমানে সাটনের হাসপাতালে অধ্যাপক ডেভিড স্মিথার্স-এর তত্ত্বাবধানে কয়েকজন ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসা চালানো হইতেছে। রোগের গভীরতা ও তীব্রতা অনুযায়ী বিভিন্ন রোগীর দেহে কম-বেশী সময় ধরিয়া পাঁচ-ছয় বার কেসিয়াম রশ্মি প্রয়োগ করা হয়।

এখন বৃটেনের বহু হাসপাতাল কেসিয়াম চাহিয়া পাঠাইতেছে। এই সকল চাহিদা মিটাইবার জন্য পারমাণবিক শক্তি কর্তৃপক্ষ কেসিয়াম উৎপাদনের আরও বৃহৎ এবং উন্নত ধরণের একটি কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন।

কিন্তু ডাক্তারেরা বলিতেছেন যে, এই নূতন তেজস্ক্রিয় চিকিৎসার ফলাফল সঠিকভাবে নির্ণয় করিতে আরও কয়েক বৎসর সময় লাগিবে।

তবে ইহা অনস্বীকার্য যে, কেসিয়ামের ব্যবহার বিশ্বের ক্যান্সার-বিরোধী সংগ্রামে বৃটেনকে অন্যান্য সমস্ত দেশের পুরোভাগে লইয়া আসিয়াছে।

রোগীকে অসাড় করিয়া অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা

এডিনবরার একজন শল্য-চিকিৎসক সম্প্রতি হৃৎপিণ্ডের অস্ত্রোপচার সম্পর্কে নূতন এক পদ্ধতির কথা ঘোষণা করিয়াছেন। এই পদ্ধতিতে রোগীকে ২৮° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত শীতল করিয়া ফেলা হয় এবং হৃৎপিণ্ডের পাম্পিং ক্রিয়া বন্ধ রাখা যায় ৭ মিনিট পর্যন্ত। অ্যানেস্থেসিয়া সংক্রান্ত নূতন পদ্ধতিগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। শল্য-চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই নূতন অ্যানেস্থেটিক পদ্ধতিতে বৃটেনের কৃতিত্ব সম্বন্ধে ইয়র্কসায়ার পোষ্টে আর্নেষ্ট ষ্টট লিখিয়াছেন—

২৫ বৎসরের মধ্যে দুইটি যুদ্ধের ফলে শল্য-চিকিৎসায় এবং অ্যানেস্থেটিক পদ্ধতিতে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। দুই ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তন বিপ্লবাত্মক হয়। অ্যানেস্থেসিয়া সম্পর্কে এই পরিবর্তন যেন আরও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় হয়। এই ক্ষেত্রে নূতন পদ্ধতি শল্য-চিকিৎসকদের কঠিন ও জটিল অস্ত্রোপচারের সহায়ক হয়।

বৃটেনে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যে দুইটি নূতন ধরণের অ্যানেস্থেটিক ব্যবহৃত হইতেছে তাহাদের বলা হয় রেফ্রিজারেজশন (এই ব্যবস্থায়

রোগীকে 'শীতল" করিয়া ফেলা হয়) এবং হাই-পোটেনশন।

ইহার জন্য অতি মূল্যবান সরঞ্জাম এবং বিশেষ ভাবে সুশিক্ষিত অ্যানেস্থেটিষ্টের প্রয়োজন হয়। এই সম্পর্কে পূর্বের ইথার এবং মুখোস ব্যবহারের কথা স্মরণ করা যাইতে পারে।

রেফ্রিজারেশন এবং হাইপোটেনশন—এই দুই পদ্ধতিই সম্ভবতঃ অ্যানেস্থেসিয়া সংক্রান্ত সকল প্রকার নূতন পদ্ধতির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। রেফ্রিজা-রেশনে রোগীর শরীরে তাপ ক্রমশঃ ৮° হইতে ১০° সেন্টিগ্রেড কমাইয়া আনা হয়। ইহার উদ্দেশ্য হয় শরীরের যন্ত্রটিগুলিকে শিথিল করিয়া আনা এবং তাহার ফলে অক্সিজেনের চাহিদা হ্রাস করা।

শরীর যথেষ্ট শীতল হইলে হৃৎপিণ্ডের পাম্পিং-এর কাজ কয়েক মিনিটের জন্য বন্ধ রাখা সম্ভব। ইহার পর শল্য-চিকিৎসকের পক্ষে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ছুরি চালনা করা সম্ভব হয়; কারণ রক্ত পাম্পিংয়ের জন্য দৃষ্টি ব্যাহত হইবার আশঙ্কা আর থাকে না।

রেফ্রিজারেশন নূতন কিছু নয়। ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ভয়াবহ শীতের মধ্যে মস্কো হইতে পশ্চাদ-পসরণের সময় নেপোলিয়নের সেনাবাহিনীর একজন সার্জন প্রথম এই এই পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করেন। অঙ্গ ব্যবচ্ছেদের প্রয়োজন বোধে সার্জনের একটি নূতন চিন্তা মাথায় আসে। তিনি অঙ্গটিকে বরফে চাপা দিয়া সম্পূর্ণভাবে অসাড় করিয়া ফেলেন এবং এবং অস্ত্রোপচার সম্পূর্ণ করেন।

বর্তমান পদ্ধতি অবশ্য সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। ইহা যেন রোগীকে বরফ জলের মধ্যে রাখিয়া দেওয়ার মত, কিংবা বিশেষভাবে নির্মিত বরফের কম্বলে রোগীকে আচ্ছাদিত করিবার মত। লীড্সের জেনারেল ইনফার্মারী হাসপাতালে রেফ্রিজারেশন অ্যানেস্থেসিয়ার ব্যবহার কখনও কখনও হইতে দেখা যায়। দেশের বিখ্যাত শল্য-চিকিৎসকগণ অনেক সময় লীড্সে আসিয়া এই অস্ত্রোপচার প্রত্যক্ষ করেন। বৃটেনের আরও কয়েকটি হাসপাতালে এই ভাবে অস্ত্রোপচার হইয়া থাকে।

আর একটি নূতন পদ্ধতি হইল হাইপোটেনশন। ইহার অর্থ হইল, রোগীর রক্তের চাপ ইচ্ছামত কমাইয়া ফেলা। নানাভাবে তাহা করা সম্ভব; কিন্তু একটি বিশেষ পদ্ধতিই এই সম্পর্কে ব্যাপক-ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে এবং তাহাতে ভাল ফলও পাওয়া গিয়াছে। এই পদ্ধতিতে রোগীর রক্ত-প্রবাহে বিশেষ একপ্রকার ভেষজ সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া হয়।

এই ভাবে রক্তের চাপ শতকরা ৫০ ভাগ বা তাহার অধিক কমাইয়া ফেলা সম্ভব। কিন্তু এই সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে।

রেফ্রিজারেশন এবং হাইপোটেনশন—এই দুই ব্যবস্থারই ত্রুটি আছে এবং শেষোক্ত ব্যবস্থা কয়েক ধরণের অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। হাই-পোটেনশন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে রোগীর বয়স যাচাই করিয়া দেখা হয়। রক্তের চাপ অতিরিক্ত কম হইলে এই পদ্ধতিতে অস্ত্রোপচার নিরাপদ নয়।

অ্যানেস্থেসিয়ার সাধারণ ব্যবহার—শিথিল-কারক পদার্থ হিসাবে, কিউরেরার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

কিউরেরার প্রথম বর্ণনা পাওয়া যায় ১৮১২ সালে ইয়র্কশায়ারের অন্তর্গত ওয়াল্টন হলের চার্লস ওয়ার্টনের নিকট হইতে। তিনি দক্ষিণ আমেরিকার আমেজন অববাহিকায় অভিযান চালাইয়া আসিবার পর এই সম্বন্ধে তথ্য প্রকাশ করেন। ওয়ার্টন ইউরোপে কিউরেরার ভূমিকা প্রবর্তন করেন বটে, কিন্তু তাহা ক্লিনিক্যাল অ্যানেস্থেসিয়া হিসাবে প্রথম ব্যবহৃত হয় ক্যানাডায় ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে।

ইহার পর হইতেই ইহার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতে

থাকে এবং নিদ্রার জন্য ইনজেকশন দিবার পর শিথিলকারক পদার্থ হিসাবে উদর সংক্রান্ত অস্ত্রোপচারের সময়ও তাহা ব্যবহৃত হইতে থাকে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন যে, কিউরেরা ব্যবহারের ফলে রোগীকে অনেক সময় ঝুঁকি গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু ইহা যদি শিক্ষিত এবং দক্ষ অ্যানেস্থেটিষ্ট কর্তৃক ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে এই ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকে না।

অবশ্য গত ২০ বৎসর ধরিয়া অ্যানেস্থেটিষ্টরা পেনটোথ্যাল ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। বৃটেনে অস্ত্রোপচারের সময় শতকরা প্রায় ৮০ জনের ক্ষেত্রে তাহা ব্যবহৃত হইতেছে।

মিটারের উৎপত্তি

চতুর্দশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম হেনরি তাঁহার নাসিকার অগ্রভাগ হইতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পর্যন্ত দূরত্বকে দৈর্ঘ্যের একক (ইউনিট) বলিয়া স্থির করেন এবং উহার নাম দেন 'ইয়ার্ড' (এক গজ)। ইহার প্রায় একশত বৎসর পরে রাণী এলিজাবেথ এই আদেশ দেন যে, একটা নির্দিষ্ট রবিবার উপাসনাকারীগণ গির্জা হইতে বাহির হইয়া আসিলে তাহাদের ১৬ জন এমনভাবে এক লাইনে দাঁড়াইবেন যাহাতে এক জনের বামপদ সম্মুখে দণ্ডায়মান আর একজনের বামপদ স্পর্শ করে। এইভাবে যে দূরত্ব পাওয়া যাইবে তাহাই হইবে বৈধ রড্ এবং তাহার ষোল ভাগের একভাগ হইবে বৈধ ফুট।

পরিমাপের মান সকল সময়েই খুসীমত স্থির করা হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে দূরত্ব বুঝাইবার জন্য 'ক্রোশ' কথাটি ব্যবহার করা হইত। এক ক্রোশ অর্থে, জোরে ডাক দিলে যতটা দূর পর্যন্ত শুনা যায় ততটা। যোজন বলিতে বুঝাইত—ঘোড়াকে একবার গাড়ীতে বাঁধিয়া দেওয়ার পর তাহার বিশ্রামের জন্য সাজ না খুলিয়া দেওয়া পর্যন্ত যতটা দূরত্ব যাইতে পারে ততটা।

ইহাদের মধ্যে একটা বিস্ময়কর সামঞ্জস্য দেখা যায় যে, পরিমাপের মান স্থির করিবার ব্যাপারে সকল স্থানের লোকেই নিজেদের কোন না কোন অঙ্গ ইউনিট হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে। এইভাবে আমরা ফুট, কিউবিট (হাত) প্রভৃতি ইউনিট পাইয়াছি। সময় সময় শস্যও ব্যবহৃত হইত। সেইজন্য আমরা গ্রেণ ও ক্যারেট কথার ব্যবহার পাই। রোমানদের নির্ধারিত সংজ্ঞা হইতে জানা যায় যে, ইঞ্চি মানে তিনটি যবের দৈর্ঘ্যের সমষ্টি।

ফ্রান্সে মেট্রিক (দশমিক) পদ্ধতির উদ্ভব। সে সময় সে দেশের আবহাওয়া বিপ্লবের ভাবে পরিপূর্ণ ছিল। সেজন্য সে সময় সামন্ততান্ত্রিক প্রভাবমুক্ত দৈর্ঘ্য ও ওজনের ইউনিট প্রয়োজন হয়। ট্যালিব্যাণ্ডের নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী একটি পদ্ধতি উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হন। যাহাতে পরিবর্তনের কোন সুযোগ না থাকে, সেজন্য তাঁহারা প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিতে থাকেন এবং মাতা বসুন্ধরাকেই তাঁহাদের দৈর্ঘ্যের মান বলিয়া স্থির করেন। মিটার হইতেছে, পৃথিবীর পরিধির এক চতুর্থাংশের এক কোটি ভাগের এক ভাগ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত মাউটনের প্রস্তাবে মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। ১৭৯০ সালে ট্যালিব্র্যাণ্ড ওজন ও পরিমাপের একই রকম পদ্ধতির একটি পরিকল্পনা উপস্থিত করেন। মধ্য-রেখা (উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর মধ্য দিয়া কল্পিত বৃত্ত) স্থির করিবার পর একটি কমিশন পৃথিবী পরিমাপের জন্য বিশদ তথ্য স্থির করিতে আরম্ভ করেন। সমগ্র মধ্য রেখা মাপ করা অসম্ভব বিধায় ক্ষুদ্র অংশ (ডানকার্ক ও বার্সিলোনার

মধ্যবর্তী স্থানটুকু) মাপ করিবার সিদ্ধান্ত করা হয়।

এই জরিপ কাজের জন্য ডেলাম্বার ও মেকাইন নামক দুইজন ইঞ্জিনীয়ার নির্বাচন করা হয়। তখন বিপ্লব পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল। তাঁহাদের বিপ্লব-বিরোধী বলিয়া গ্রেপ্তার করা হয়। যাহা হউক, তাঁহারা ১৭৯৮ সালে তাঁহাদের কাজ শেষ করেন। কয়েকটি কমিটি মিলিয়া তাঁহাদের কাজের
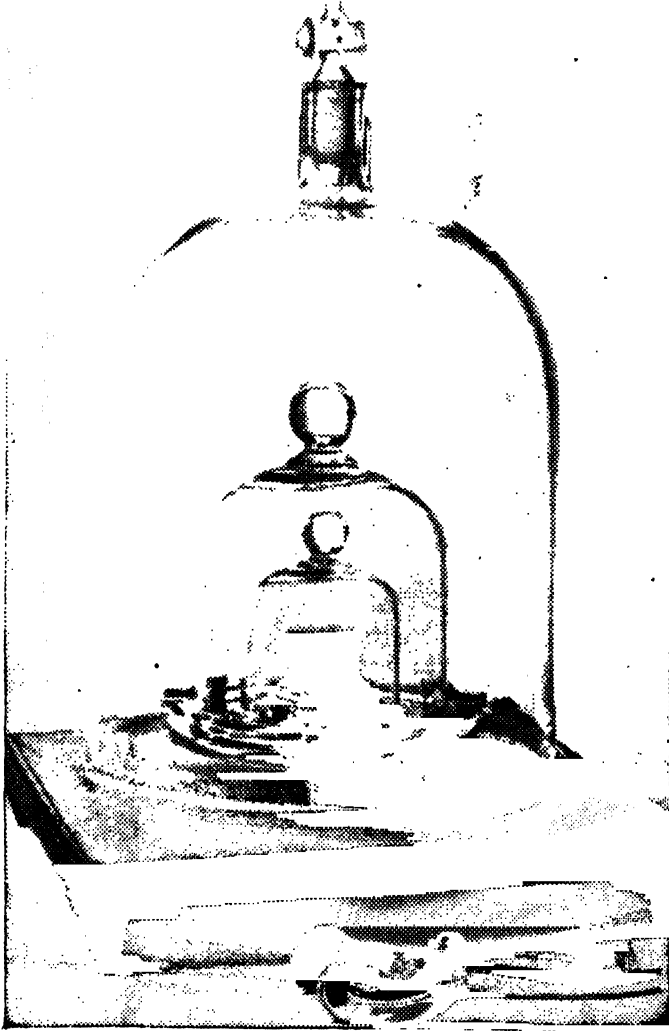
আন্তর্জাতিক কিলোগ্র্যাম

কিন্তু লাভোয়াসিয়ের ১ সি. সি. জলের ওজনের উপর ভিত্তি করিয়া একটি নির্দিষ্ট মান স্থির করিতে আরম্ভ করেন। তদন্ত কাজ বড় সহজ ছিল না। বৈজ্ঞানিকগণ রাজনৈতিক অসুবিধায় পতিত হন। ফলাফল বিবেচনা করেন। ১৭৯৯ সালে ২২শে জুন যথার্থ মিটার হিসাবে একটি প্ল্যাটিনাম মিটার অনুমোদন করা হয়।

ওজন ও পরিমাপের মান সংস্কারের জন্য যে

পরিকল্পনা করা হয় তাহাতে স্পষ্টভাবে বলা হয় যে, ওজন, আয়তন ও দৈর্ঘ্যের মানগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রাখিবার প্রয়োজন আছে। এক এক দিকে এক এক ডেসিমিটার (১০ সেন্টিমিটার)—এইরূপ এক ঘন পদার্থের মাপকে বলা হয় লিটার। এক ঘন ডেসিমিটার জলের ওজন ধরিয়া উহাকে ওজনের মান বলিয়া স্থির করা হয়—উহার নাম হয় কিলোগ্র্যাম।

কিলোগ্র্যাম হইতেছে একটি প্ল্যাটিনাম সিলিণ্ডার। উহার ব্যাস ও উচ্চতা সমান, অর্থাৎ ৩৯ মিলিমিটার। ইহাই ওজনের অন্তর্জাতিক মান। ওজন ও পরিমাপের আন্তর্জাতিক সংস্থার ভল্টের মধ্যে মিটার ও কিলোগ্র্যাম রাখা হইয়াছে।

হীরাকুদ বাঁধ

উড়িষ্যার হীরাকুদ বাঁধ পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু ইহার উদ্বোধন করিয়াছেন। এই বাঁধ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ কমিশনের চেয়ারম্যান লিখিয়াছেন—মহানদী কেবলমাত্র উড়িষ্যা নহে পরন্তু ভারত, তথা বিশ্বের বৃহত্তম নদীগুলির অন্যতম। ইহার দৈর্ঘ্য ৫৩৩ মাইল। প্রায় ৫১,০০০ হাজার বর্গমাইল জুড়িয়া মহানদীর অববাহিকা অঞ্চল। টেনেসি নদী অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে ইহা ২৫ শতাংশ অধিক।

গ্রীষ্মকালে পায়ে হাঁটিয়াই নদীটি পার হওয়া যায়। তখন ইহাতে মাত্র কয়েকশত কুসেক জল প্রবাহিত হয়। পার্শ্ববর্তী সহরগুলির প্রয়োজনের তুলনায় এই জলের পরিমাণ মোটেই পর্যাপ্ত নহে। বর্ষার সময় ইহা ভিন্নরূপ ধারণ করে। উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল নদীপথে তখন ১০ লক্ষ কুসেকের অধিক জল প্রবাহিত হয় এবং সেই জল দুই কূল ছাপাইয়া ধ্বংসলীলা আরম্ভ করে। এই প্রচণ্ড শক্তিকে জনহিতকর কোন কাজেই লাগানো হইত না। কিছু কিছু জল সেচকার্যে ব্যবহৃত হইলেও তাহা নগণ্য অংশ মাত্র।

স্মরণ থাকিতে পারে ১৮৬৫-৬৬ সালের দুর্ভিক্ষে কেবলমাত্র কটক সহরেই ১০ লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। জেলার ৪০ শতাংশ অধিবাসীরও মৃত্যু হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষের পরেই আসে ১৮৬৬ সালের মহাবন্যা। অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কাটাইয়া যাহা কিছু বাঁচিয়াছিল, বন্যা তাহা নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়।

১৮৬৮ সালের পর হইতে মহানদীর উর্বর বদ্বীপে ৩৯ বার বন্যা হইয়া গিয়াছে। ১৯১১ সাল হইতে ১৯৩৭ সালের মধ্যে ৯ বারের বন্যায় প্রত্যেকবার ২০ লক্ষ হইতে ৬৭ লক্ষ টাকার মত ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু টাকার অঙ্কে মানুষের জীবনের ক্ষতির হিসাব করা যায় না। জীবনের অনিশ্চয়তা মানুষের কর্মোদ্যমকে পঙ্গু করিয়া দিয়াছিল বলিয়া স্থানীয় জনসাধারণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের কোন চেষ্টাই করে নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে মহানদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু প্লাবন রোধ করিবার জন্য নদীর নিম্নভাগে কয়েকটি বাঁধ দেওয়া হয়। তাহার পর ১৯২৭ সাল, ১৯২৯ সাল এবং ১৯৪৫ সালে এই বিষয়ে নানারূপ প্রস্তাব হয় এবং আবার সেগুলি প্রত্যাখ্যানও করা হয়। তৎকালীন কেন্দ্রীয় জলপথ, জলসেচন ও নৌচালনা বিষয়ক কমিশন, বর্তমানে যাহাকে কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ কমিশন বলা হয়, এই কাজে হাত দেয়। অবশেষে ১৯৪৮ সালে মহানদীতে বাঁধ দিয়া জল ধরিয়া রাখিবার সিদ্ধান্ত করা

হয়। ইহাতে শুধু যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে তাহা নহে, ইহা হইতে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং জল সেচন ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে। কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ কমিশন মহানদীর উপরে হীরাকুদ, টিকারপাড়া এবং নারাজ বাঁধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত করে এবং এই উপত্যকার শীর্ষদেশে হীরাকুদ বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা সর্বাগ্রে মঞ্জুর করে।

হীরাকুদ পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম বাঁধ। ইহাতে কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত হইত। ইহার নির্মাণ-কার্য দ্রুত সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই সর্বাধুনিক নির্মাণ-পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।

হীরাকুদ বাঁধের জলাধারটি ২৮৮ বর্গমাইল এবং বন্যার সময় নিম্নাঞ্চলের বন্যার জল সমুদ্রে গিয়া না পড়া পর্যন্ত ইহাতে ৪২ লক্ষ ৭০ হাজার একর ফুট জল ধরিয়া রাখা সম্ভব হইবে। পূর্ববর্তী ৯টি বন্যার তথ্যাদি পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে
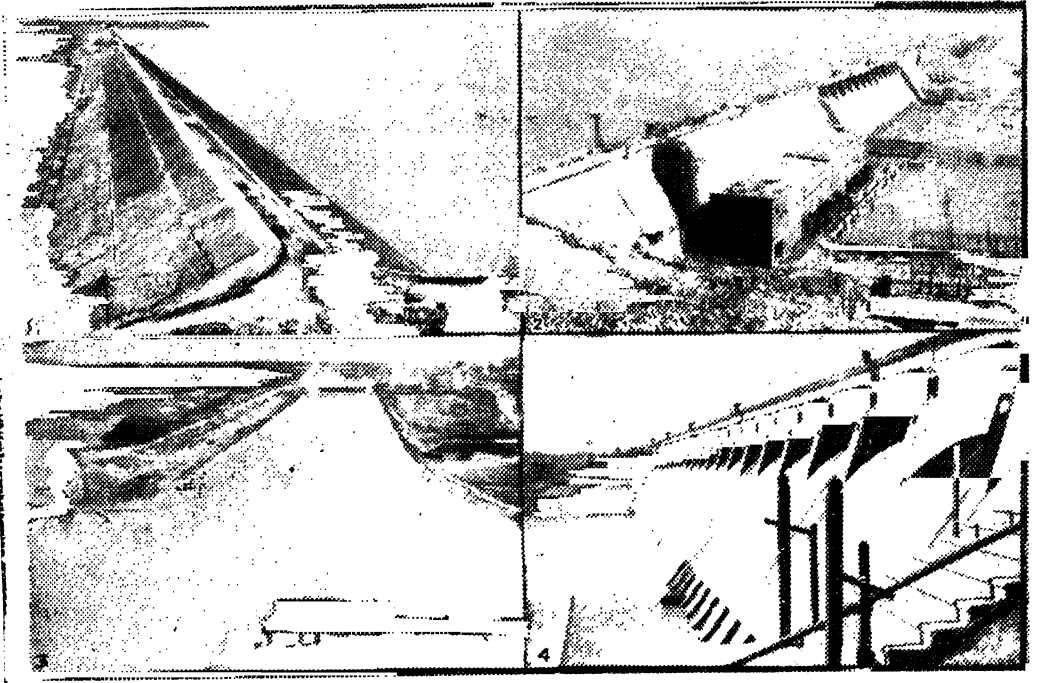
১। মাটির বাঁধ। ২। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। ৩। শেষের দিকে টানা খাল (টেল-রেস ক্যানেল)। ৪। বাঁ-দিকের স্লিপওয়ে।

তুঙ্গভদ্রার দ্বিগুণ এবং সেতুরের তিনগুণ বেশী জল ধরিয়া রাখা যাইবে। দামোদর উপত্যকার চারিটি বাঁধে জল ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতার দ্বিগুণ পরিমাণ এবং ভাখ্‌রা বাঁধটিতে যে পরিমাণ জল ধরিয়া রাখা সম্ভব, কেবলমাত্র হীরাকুদ বাঁধেই ঐ পরিমাণ জল ধরিয়া রাখা যাইবে। কৃষ্ণরাজসাগর এবং সেতুর বাঁধ নির্মাণে যে সময় লাগিয়াছে, সেই গতিতে কাজ চলিলে হীরাকুদ বাঁধটি নির্মাণ করিতে

যে, এই অঞ্চলে যে পরিমাণ বন্যার জল নামিয়া আসে তাহাতে হীরাকুদের জলাধারটি পুরাপুরি ভর্তি না করিয়াই এই বন্যা মোটামুটিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। বর্ষার সময়ে জলাধারের লেবেল হইবে আর. এ.—৫৯০। অনেকগুলি স্লুইস গেট নির্মাণ করা হইয়াছে। সেগুলির মধ্য দিয়া ৭ লক্ষ কুসেক জল প্রবাহিত হইতে পারিবে।

বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও হীরাকুদ বাঁধের জলাধারে

সঞ্চিত জল দ্বারা সম্বলপুর জেলার ৬ লক্ষ ৭২ হাজার একর জমিতে জলসেচন করা যাইবে। এখানে ১,৬৫,০০০ কিলোওয়াট জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন করিবার পরে মহানদীর বদ্বীপ অঞ্চলে ঐ জল সেচন কার্যে ব্যবহার করা যাইবে। পর্যাপ্ত পরিমাণ জল সরবরাহ দ্বারা খাল অঞ্চলের ৫ লক্ষ ৪১ হাজার একর জমি নূতন ব্যবস্থার অধীনে আনা যাইবে।

এখন বিচার করিয়া দেখা যাউক উড়িষ্যার অর্থনীতির উপর ইহাতে কিপ্রকার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইবে।

এই রাজ্যের সীমা ৫৯,০০০ বর্গ মাইল। লোক-সংখ্যা ইংল্যাণ্ডের লোকসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ। কিন্তু উভয় দেশের জীবনযাত্রার মান লক্ষ্য করিয়া বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হইবে। ইহার কারণ এই নয় যে, ইংল্যাণ্ড বা ওয়েল্‌সের তুলনায় এখানে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব রহিয়াছে। পক্ষান্তরে এখানে আছে প্রচুর বৃষ্টি-পাত, সূর্যালোক এবং উর্বর জমি। মহানদী, ব্রাহ্মণী এবং বৈতরণী দিয়া ১০ কোটি ৫০ লক্ষ একর-ফুট জল প্রবাহিত হয়। এখানে লোহা, কয়লা, ম্যাঙ্গানীজ, বক্‌সাইট, চুনাপাথর এবং ক্রোমাইট প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়। সংঘবদ্ধ চেষ্টায় এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন সম্ভব এবং তাহাই হইতেছে।

মহানদীতে এইরূপ জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাইতে পারে যাহা বাংলা, বিহার, মধ্যপ্রদেশের চাহিদা মিটাইতে সক্ষম হইবে। হীরাকুদ বাঁধটি সেই প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাইবার প্রথম প্রচেষ্টা। উড়িষ্যা রাজ্যে ইস্পাত এবং অ্যালুমিনিয়াম শিল্প গড়িয়া তোলা হইতেছে। জনগণ ইহার বিরাট সম্ভাবনা লক্ষ্য করিয়া আশান্বিত হইয়া গভীর বিশ্বাস ও অক্লান্ত কর্মোদ্যম সহকারে কাজে লাগিয়া গিয়াছেন।

কৃষিকার্যে তেজস্ক্রিয় পরমাণু

শ্রীশিবনারায়ণ চক্রবর্তী

মরণাস্ত্র সৃষ্টিতে পারমাণবিক শক্তির প্রথম প্রকাশ হলেও বর্তমানে চিকিৎসা, কৃষিকার্য, শিল্পোন্নতি, শক্তি উৎপাদন প্রভৃতিতেও এই শক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে আসছে। এসব ক্ষেত্রে ভঙ্গুর তেজস্ক্রিয় পরমাণুর দুটি ধর্মের প্রয়োগে বিগত দশ বছরের মধ্যেই অনেক পুরাতন ও জটিল সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান মিলেছে এবং বহু আশাপ্রদ সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

তেজস্ক্রিয় পরমাণুগুলি তাদের ভিতরের গঠন বৈশিষ্ট্যের জন্যে আপনা-আপনিই ভেঙ্গে পড়তে থাকে, আর তা থেকে অতি দ্রুতগতিতে বেরিয়ে আসে আল্‌ফা, বিটা ও বিদ্যুদ্বাহী অন্যান্য বস্তুকণা, গামারশ্মি ও অপরাপর তেজতরঙ্গ। এসব রশ্মির সকলেরই একটা বিশেষ ধর্ম এই যে, বাতাস বা অপর কোন গ্যাসের ভিতর দিয়ে চলবার সময় তারা এই গ্যাসকে বিদ্যুৎ-পরিবাহী করে তোলে। গাইগার কাউন্টার নামক যন্ত্রে তেজস্ক্রিয় পরমাণুর অস্তিত্ব ও গতিপথ ধরা পড়ে এবং এভাবে নানা জাতীয় অসংখ্য পরমাণুর মধ্যেও আমরা এদের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারি।

ফস্‌ফেট, পটাস, নাইট্রোজেন ইত্যাদি সার জমির ঠিক উপরে অথবা খানিকটা নীচে—কোন্ স্তরে কতটা পরিমাণ প্রয়োগ করলে গাছ তা সহজে পেতে পারে, জমিতে কোন্ কোন্ সার বেশী আছে এবং কোন্ কোন্ জিনিষের একান্ত অভাব, গাছের দেহের কোন্ জায়গায় কোন্ সার গিয়ে দাঁড়ায়—কৃষি-বিজ্ঞানের এসব পুরাতন প্রশ্নের উত্তর এখন মিলছে তেজস্ক্রিয় পরমাণুর কাছ থেকে। তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস মিশ্রিত ফস্‌ফেট সার জমিতে প্রয়োগ করে সেই জমিতে ফসল উৎপাদন এবং সেই ফসলের ভিতর তেজস্ক্রিয় এবং সাধারণ ফস্‌ফরাসের অনুপাত বের করে জমিতে স্বাভাবিক ফস্‌ফেটের পরিমাণ জানা গেছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, এতদিন চাষীরা জমিতে যে পরিমাণ ফস্‌ফেট দিয়ে আসছে তার মাত্র সিকি ভাগই সেজন্যে যথেষ্ট। শুধু ফস্‌ফেট নয়, জমিতে পটাস, নাইট্রোজেন, ম্যাগ্‌নেসিয়াম প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিষের পরিমাণও এই ভাবে বের করা হয়েছে। ইদানীং আমেরিকায় এই সব তথ্য থেকে মাটির উর্বরা শক্তির মানচিত্রও তৈরী করা হচ্ছে।

জমির বদলে পাতার উপর সার ছিটিয়ে দিয়ে গাছপালা ও ফসলের উন্নতির চেষ্টা কৃষি-বিজ্ঞানের অন্যতম আধুনিক অবদান। এতে দ্রবণীয় সার জলে গুলে ফসল ও গাছপালার উপর তাদের বাড়বার মরশুমে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে গাছ খুব তাড়াতাড়ি ওই সার আত্মসাৎ করে বেড়ে উঠে। এই ভাবে উপর দিক থেকে পাতা ও ফুল-ফলের ভিতর দিয়ে উদ্ভিদকে তার প্রয়োজনীয় সার পৌঁছে দেওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের এতদিন মতভেদ ছিল। কিন্তু তেজস্ক্রিয় পরমাণুঘটিত সারের ব্যবহার এই সমস্যার সমাধানে বিশেষ সাহায্য করেছে। আমেরিকার মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীন-হাউসের গাছপালার উপর এভাবে তেজস্ক্রিয় সার সৃষ্টি করে পরে অন্ধকার ঘরে ফটোগ্রাফীর কাগজের সাহায্যে ঐ সব তেজস্ক্রিয় পরমাণুর গতি-বিধি লক্ষ্য করা হয়েছে। দেখা গেছে, গাছের পাতা খুব তাড়াতাড়ি সার শুষে নেয় এবং ছিটিয়ে দেবার মাত্র কয়েক ঘণ্টার ভিতরেই তা পাতা থেকে শিকড় পর্যন্ত গাছের সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিটিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছ প্রায় ৮৫% সার আত্মসাৎ করে ফেলে, মাটিতে দিলে যে সময়ে মাত্র ১৫% পরিমাণ গাছে ঢুকতো। অবশ্য এ কথা মনে করলে ভুল হবে যে, শুধু পাতার ভিতর দিয়েই উদ্ভিদকে তার প্রয়োজনীয় সব সার পৌঁছে দেওয়া যায় এবং এই ব্যাপারে মাটি ও শিকড়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য নয়। উপর থেকে ছিটিয়ে গাছের নির্দিষ্ট অংশে মাত্র সার দেওয়া যায়, বাড়তি সার মাটির ভিতর দিয়েই সরবরাহ করতে হবে। আলু, তামাক, টোম্যাটো, ভুট্টা বা শশা জাতীয় গাছ এভাবে তাড়াতাড়ি পাতার ভিতর দিয়ে সার শুষে নিতে পারে। পরিশ্রম বাঁচাবার জন্যে অনেক সময় সারের সঙ্গে কীট-পতঙ্গ ও ছত্রাকনাশক রাসায়নিক পদার্থও মিশিয়ে দেওয়া হয়।

গাছের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, আগাছা ধ্বংস প্রভৃতি ব্যাপারে যে সব রাসায়নিক জিনিষ লাগে তাদের প্রয়োজনীয়তা ও কার্যপ্রণালী ইত্যাদিও তেজস্ক্রিয় পরমাণুর ব্যবহারে ধরা পড়েছে। শস্য নষ্টকারী পোকামাকড়ের গায়ে তেজস্ক্রিয় কোবাল্টের খুব সামান্য অংশ প্রবেশ করিয়ে তাদের মাটির ভিতর পুঁতে দিয়ে গাইগার কাউন্টারের সাহায্যে তাদের গতিবিধি ও কার্যপ্রণালী লক্ষ্য করা হয়েছে। একই উপায়ে আমেরিকার জর্জিয়াতে রোগ-বিস্তারকারী মাছি ও মৌমাছি প্রভৃতির গায়ে তেজস্ক্রিয় জিনিষের লেবেল এঁটে ছেড়ে দিয়ে ও বহুদূরে তাদের জালে আটকে জানা গেছে, এরা কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে।

পারমাণবিক শক্তির দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রয়োগ নির্ভর করছে জীবদেহ ও জীবকোষের উপর এর ক্রিয়ায়। অধিক পরিমাণ পারমাণবিক তেজ যে জীবনকে বিকৃত, এমন কি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে পারে, সে পরিচয় পাওয়া গেছে হিরোসিমা ও নাগাসাকির অভিজ্ঞতা থেকে। কিন্তু পরে দেখা গেছে, এই তেজ অল্প পরিমাণে ও নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় ব্যবহার করতে পারলে তার সাহায্যে উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের শত্রুগোষ্ঠীর বিনাশ সাধন করা সম্ভব। তাছাড়া mutation বা পরিব্যক্তি ঘটিয়ে উৎকৃষ্টতর উদ্ভিদ, প্রাণী এবং অধিকতর ফুল, ফল ইত্যাদি পাওয়া যেতে পারে।

বেশী পরিমাণ পারমাণবিক রশ্মি দিয়ে বিভিন্ন পোকামাকড়, ব্যাক্টিরিয়া, পরজীবী প্রভৃতির বন্ধ্যাত্ব বা মৃত্যু আজকাল হামেশাই ঘটানো হচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়—Screw-worm fly নামে একশ্রেণীর পতঙ্গ বহুদিন ধরে দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার সর্বত্র গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, শূকর প্রভৃতি জন্তুর দেহে কোন ক্ষত পেলে সেখানে ডিম পাড়তো, যার ফলে ক্রমে ঘা বেড়ে উঠতো এবং শেষ পর্যন্ত প্রাণীগুলি মারা পড়তো। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ওই পতঙ্গ আমেরিকার গৃহ-পালিত পশুর পক্ষে একটা ভীষণ অভিশাপের মত ছিল। কিন্তু তেজস্ক্রিয় কোবাল্টের রশ্মিতে এদের বহু ডিম নষ্ট করে ও গামা রশ্মি দিয়ে এদের পুরুষ-দের বন্ধ্যাত্ব ঘটিয়ে মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এই সর্বনাশা পতঙ্গকে প্রায় নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। তাই এই উপায়ে আরও নানাপ্রকার পতঙ্গ ধ্বংস করবার বিশেষ চেষ্টা চলছে। ভালভাবে রান্না না করা শূকরের মাংসের সঙ্গে সংক্রমিত হয়ে এক শ্রেণীর পরজীবী এতদিন মানুষের দেহে একটা ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক ও দুর্বলকারী রোগের সৃষ্টি করছিল। এখন দেখা যাচ্ছে, শূকরের মাংস রশ্মি দিয়ে জীবাণুশূন্য করে নিয়ে খেলে ঐ রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

এভাবে তেজস্ক্রিয় রশ্মি দিয়ে খাবার জিনিষ ও শস্য নষ্টকারী পোকামাকড় প্রভৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে, আলুর চারা বেরোবার 'চোখ' নষ্ট করে তা সংরক্ষণ করা যাচ্ছে এবং বিশেষ করে কাঁচা, অর্থাৎ তাড়াতাড়ি পচে বা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এ রকমের খাবার জিনিষ প্রয়োজনমত অবিকৃত রাখা সম্ভব হয়েছে। নানারকমের মাংস, মাছ,

ডিম, তরিতরকারী ও শাকসব্জী এই প্রণালীতে জীবাণুশূন্য করা হচ্ছে, যাতে সে সব জিনিষ ঠাণ্ডা কামরার বাইরেও না পচে ওঠে। দেখা গেছে, গোমাংসে রশ্মি প্রয়োগ করে স্বাভাবিক অবস্থার ৬।৭ গুণ বেশী সময় অবিকৃত রাখা যায়। যদিও এবিষয়ে আরও অনেক পরীক্ষা করবার ও জানবার আছে, তবু একথা সহজেই বুঝা যায় যে, তেজস্ক্রিয় রশ্মির ব্যবহারে অদূর ভবিষ্যতে খাদ্য-সংরক্ষণ খুবই সহজসাধ্য হবে।

পারমাণবিক শক্তির সবচেয়ে চমকপ্রদ পরিচয় মিলেছে তার জীবজগতের উৎকর্ষ সাধনের ক্ষমতায়। গাছপালা ও ফুল-ফলের পরিব্যক্তি ঘটাবার আশায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গামা রশ্মি, এক্স রশ্মি, তেজস্ক্রিয় কোবাল্টের রশ্মি ইত্যাদি ব্যবহার করা হচ্ছে, এবং তাতে আশ্চর্যজনক ফল পাওয়া গেছে। ক্যানাডার অ্যাল্‌বার্টা বিশ্ববিদ্যালয়ে গাছপালা ও ফল-ফুলের উপর ঐসব রশ্মি প্রয়োগে শক্ত খড়যুক্ত কয়েক প্রকার বার্লির উৎপাদন সম্ভব হয়েছে এবং গমের উপরও এখন এই পরীক্ষা চলছে। আমেরিকার ব্রুকহ্যাভেনে পরিব্যক্তি ঘটাবার আশায় প্রতিদিন হাজার হাজার চারাগাছ, সব্জী, গুল্ম, ফুল, ফল ইত্যাদির উপর সীসার আধার থেকে পরিমিত তেজস্ক্রিয় কোবাল্টের রশ্মি প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং সে সব পরীক্ষার ফল দেখে বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন। এভাবে সেখানে পাওয়া গেছে নানা রঙের আঙ্গুর, সুগন্ধি পীচ, বীজহীন ফল, স্বাভাবিক শীষযুক্ত অথচ খুব ছোট ভুট্টার চারা আর খুব মিষ্টি মেপ্‌ল্।

পৃথিবীর লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে অতি দ্রুতগতিতে, অথচ একথা স্বীকার করতেই হবে যে, কৃষি-বিজ্ঞানের যথেষ্ট অগ্রগতি সত্ত্বেও খাদ্য উৎপাদন সে তুলনায় বিশেষ বাড়ে নি। বর্তমানের এই সমস্যা ভবিষ্যতে জটিলতর রূপ ধারণ করবে, বিশেষতঃ এই জন্যে যে, বাসস্থান, যন্ত্রশিল্প, যানবাহন ইত্যাদির প্রয়োজনে চাষের জমির আয়তন ক্রমে আরও সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়বে। এর সমাধানের জন্যে মানুষ এতদিন রাসায়নিক সার, জলসেচ প্রভৃতি চেষ্টা ছাড়া প্রধানতঃ প্রকৃতির অনুগ্রহের উপরই নির্ভর করতো। কিন্তু আজ আর সে নিশ্চেষ্ট থাকতে পারছে না; বিজ্ঞানের নবতম অবদান পারমাণবিক শক্তি সে উদ্ভিদের উপর প্রয়োগ করতে সুরু করেছে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ফেব্রুয়ারী—১৯৫৭

দশম বর্ষ ঃ ২য় সংখ্যা

পিকচার-ফোন

এই পিকচার-ফোনের সাহায্যে দূরস্থিত ব্যক্তিদ্বয় পরস্পর পরস্পরকে চাক্ষুষ দেখতে পারে এবং কোন ব্যক্তির যদি চাক্ষুষ পরিচয় দিতে আপত্তি থাকে তাহলে টেলিফোন প্রেরক বা গ্রাহক, যন্ত্রের সঙ্গে যে সুইচ লাগানো থাকে তা বন্ধ করে দিলেই কাজ হবে। বেল টেলিফোন লেবরেটরীজের ডব্লু. ই. কক্ নিউ ইয়র্কে এই পিকচার-ফোনের কার্যকলাপ সর্বসাধারণের কাছে প্রদর্শন করছেন।

জেনে রাখ

টেলিফোন ব্যবস্থায় যুগান্তর

টেলিফোন আবিষ্কারের ফলে মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়েছে সত্য, কিন্তু মানুষের উদ্ভাবনী প্রতিভা এখানেই নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে নি। টেলিফোনের মাধ্যমে এতদিন শুধু বহু দূরবর্তী ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলাই সম্ভব ছিল। কিন্তু কথা বলবার সময়ে বহু দূরস্থিত দুই ব্যক্তি যে পরস্পরকে চাক্ষুষ দেখতে পারে, একথা এতকাল কল্পনামাত্রই ছিল। বিজ্ঞানীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সেই কল্পনাই এখন বাস্তবে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি নিউ ইয়র্কে বেল টেলিফোন লেবরেটরীজ এই নতুন টেলিফোন সর্বসাধারণের কাছে প্রদর্শন করেছেন। এই টেলিফোনের নাম দেওয়া হয়েছে পিকচার-ফোন। বেতারের পরবর্তী পর্যায় যেমন বেতারবীক্ষণ বা টেলিভিশন, টেলিফোনের পরবর্তী পর্যায় তেমনি পিকচার-ফোন।

প্রচলিত নিয়মিত টেলিফোন ব্যবস্থার মারফৎ টেলিফোনে আলাপরত ব্যক্তিদ্বয়ের পরস্পরের ছবি প্রেরণ করা এই সর্বপ্রথম বাস্তবে সম্ভব হলো। বেল লেবরেটরীজের বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে এই টেলিফোন নির্মাণ এখন সম্ভব হতে পারে।

পিকচার-ফোনে যে ছবি দেখা যাবে তার আয়তন-দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ১ ইঞ্চি থেকে আরম্ভ করে দৈর্ঘ্যে ৩ ইঞ্চি ও প্রস্থে ২ ইঞ্চি পর্যন্ত হবে। ছবিটি হবে সাদায়-কালোয়। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, বর্তমানে রঙ্গীন ছবি প্রতিফলিত করা অত্যন্ত কঠিন। পিকচার-ফোনের যন্ত্রটির আয়তন সহজে বহনযোগ্য একটি টাইপরাইটার যন্ত্রের সমান। তবে বিজ্ঞানীরা আশা করেন, ট্র্যানজিষ্টারস ব্যবহার করে এর আয়তন আরও ছোট করা সম্ভব হবে।

বেল লেবরেটরীজের যন্ত্র-বিজ্ঞানীদের মতে, সাধারণ টেলিফোনের একজোড়া তার ব্যবহার করে সাধারণ টেলিফোন ব্যবস্থার মারফৎ ছবি পাঠানোর ফলে টেলিফোন ব্যবস্থায় যুগান্তর সাধিত হবে। তাঁরা বলেন, এখন নিউ ইয়র্ক এবং ক্যালিফোর্ণিয়ার লস্ এঞ্জেল্‌সের মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে এর কাজ চলছে। টেলিভিশনের মত এই টেলিফোন ব্যবস্থাতেও প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র রয়েছে এবং এর সঙ্গে সুইচ লাগানো থাকে। কাজেই, যদি কোন ব্যক্তির সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলবার সময় চাক্ষুষ পরিচয় দিতে আপত্তি থাকে, তাহলে সুইচটি বন্ধ করে রাখলেই চলবে। এভাবে সুইচ বন্ধ করে রাখলে বাইরে থেকে যে কেউ টেলিফোনে ডাকুক না কেন, গ্রাহকের ছবি তিনি দেখতে পাবেন না।

টেলিভিশনের সঙ্গে এই পিকচার-ফোনের পার্থক্য আছে একটি বিষয়ে। টেলিভিশনে প্রতি সেকেণ্ডে ৩০টি ছবি প্রেরিত হয়। ফলে সচল বস্তু বা প্রাণীর গতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। কিন্তু পিকচার-ফোনে প্রতি দু-সেকেণ্ডে একটি ছবি প্রেরিত হয় এবং এইভাবে প্রেরিত পর পর অনেকগুলি ছবির সাহায্যে টেলিফোনে কথাবার্তা বলবার সময় আলাপকারীদের মুখের ভাব পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয়। টেলিফোনে প্রেরিত ছবিতে আলাপকারীদের মাথা ও কাঁধ পর্যন্ত দেখা যায়।

বেল লেবরেটরীজ মনে করেন যে, এই নবাবিষ্কৃত পদ্ধতির সাহায্যে ব্যবসায়ীদেরও বিশেষ সুবিধা হবে। কোন এক ব্যবসায়ী অপর ব্যবসায়ীর সঙ্গে টেলিফোনে ব্যবসায় সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা কালে প্রয়োজন হলে পণ্যের নমুনা, যন্ত্রপাতি, হিসাব বহি বা অন্য যে কোন জিনিষ টেলিফোন মারফৎই প্রদর্শন করতে পারবেন। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এরকম দ্রুততার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।

বেল লেবরেটরীজের যন্ত্র-বিজ্ঞানীরা বলেন, এই নতুন টেলিফোনের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বসানোর কাজ এখন এত সহজ হয়েছে যে, এগুলি এখন সাধারণের ব্যবহারের জন্যে বাজারে বিক্রয় করা সম্ভব হতে পারে ; তবে এগুলির মূল্য কি রকম পড়বে তা তাঁরা এখন বলতে পারেন না।

আবর্জনা-পরিষ্কারক প্রাণী

যে সব প্রাণী আবর্জনা, দূষিত পদার্থ, মৃত বা গলিত জান্তব দেহ উদরসাৎ করে—সাধারণতঃ তাদেরই আবর্জনা-পরিষ্কারক বা ঝাড়ুদার প্রাণী বলা হয়। জলে, স্থলে ও আকাশে বিচরণশীল অনেক প্রাণী আবর্জনা-পরিষ্কারকের পর্যায়ভুক্ত। এই সব প্রাণী এক হিসাবে জলবায়ুর বিশুদ্ধতা রক্ষা করে দেশের স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানে অনেক সাহায্য করে। এস্থলে কয়েক জাতীয় আবর্জনা পরিষ্কারক প্রাণীর কথা বলছি।

শকুন তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। শকুন সাধারণতঃ আকাশের অনেক উঁচুতে বিচরণ করে। এদের ডানার জোর খুব বেশী; সেজন্যে অনেকক্ষণ আকাশে উড়ে বেড়াতে পারে। শকুনের দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ—কোন স্থানে জীবজন্তুর মৃত দেহ পড়ে থাকলে এরা অনেক দূর থেকে তা দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে ডানা দুটি অর্ধসঙ্কুচিত করে তীরবেগে নীচে নেমে আসে। এদের মধ্যে একটা মজার ব্যাপার দেখা যায়—কোন শকুন যদি খাদ্যের সন্ধান পেয়ে নীচে আসে তাহলে আকাশে বিচরণশীল অন্যান্য শকুনেরাও তাকে অনুসরণ করে তৎক্ষণাৎ নীচে নেমে আসে। মৃতদেহটিকে কে কার আগে তাড়াতাড়ি উদরসাৎ করবে—তার জন্যে রীতিমত একটা

লড়াই লেগে যায়। দেখা গেছে যে, একটা বৃহদাকারের গরু বা মহিষের মৃতদেহকে প্রায় তিরিশটা শকুন একঘণ্টার মধ্যে উদরসাৎ করে ফেলে—হাড় কয়খানি ছাড়া আর প্রায় কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। গুরুভোজনের ফলে এদের ওড়বার, এমন কি দাঁড়াবার ক্ষমতা না থাকলেও মৃতপ্রাণীর মাংস ভক্ষণ করে, কিছুতেই ভোজন ত্যাগ করে না। আবার মৃত জীবজন্তুর অভাবে শকুনেরা একাদিক্রমে অনেকদিন উপবাসেও কাটাতে পারে। সাধারণতঃ এরা মৃত জীবজন্তুর দেহ ব্যতীত জীবন্ত প্রাণী ভক্ষণ করে না। কোন কারণ-বশতঃ এরা যদি অর্ধ-মৃত বা আহত জীবজন্তুকে আক্রমণ করে তবে তাদের আর পরিত্রাণ পাবার কোন উপায় থাকে না।

পৃথিবীতে নানা জাতের শকুন দেখা যায়। এদের আকৃতি খুবই কুৎসিৎ। কন্‌ডোর নামক শকুনেরা আকারে সর্বাপেক্ষা বড় এবং তাদের প্রসারিত ডানার মাপ প্রায় ছয় হাতেরও বেশী হয়। গ্রিফন নামক শকুনেরা কন্‌ডোর অপেক্ষা কিছুটা ছোট। ক্যারিয়ন ক্রো নামক কালো রঙের শকুনদের সাধারণতঃ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দেখা যায়। তুরস্কে শকুন জাতীয় পাখীদের জন-ক্রো নামে অভিহিত করা হয়। মিশরে শকুনদের বলা হয় ফ্যারাওজ-চিকেন এবং এরাই সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতির শকুন।

অনেক সময় শকুনদের ভোজনপর্বে দু-একটি গৃধ্রের উপস্থিতি দেখা যায়। এদের চেহারার সঙ্গে শকুনের চেহারার অনেকটা সাদৃশ্য আছে; তবে এদের মাথার রং লাল এবং মাথার দু-দিকে কানের মত দেখতে দুটি লাল বর্ণের পর্দা ঝুলে থাকে। কোন কোন অঞ্চলে এরা রাজ-শকুনি বা ব্রাহ্মণী-শকুন নামেও পরিচিত। এরাও মৃত জীবজন্তুর দেহ উদরসাৎ করে।

দক্ষিণ আমেরিকার ক্যারিয়ন-হক বা ক্যারাক্যারাস নামক এক জাতের পাখী দলবদ্ধভাবে মৃতদেহ ভক্ষণ করে থাকে। এরা কিন্তু বাগে পেলে জীবন্ত প্রাণীকেও দলবদ্ধভাবে নৃশংস আক্রমণ করে উদরসাৎ করতে ইতস্ততঃ করে না। সিম্যাঙ্গো নামক একজাতীয় পাখীরাও মৃতদেহ ভক্ষণ করেই জীবনধারণ করে। এরাও অনেক সময় জীবন্ত প্রাণীদের আক্রমণ করে উদরসাৎ করে। এরা কোন প্রাণীকে আক্রমণ করবার সময় পরস্পর পরস্পরকে যথেষ্ট সাহায্য করে। অনেক সময় দেখা গেছে—খরগোস প্রভৃতি প্রাণী আত্মরক্ষার্থে গর্তের ভিতর ঢুকলেও সিম্যাঙ্গো পাখী গর্তের মুখে শিকারের আশায় অবস্থান করে। হাড়গিলা, ম্যারাবু-ষ্টর্ক প্রভৃতি পাখীরা মৃতদেহের মাংস, বিশেষভাবে হাড়গোড় ভক্ষণ করে থাকে। কাক, গোদাচিল প্রভৃতি পাখীরা নির্বিচারে সর্বপ্রকার ভাল-মন্দ খাদ্য, দূষিত, গলিত পদার্থ প্রভৃতি উদরসাৎ করে থাকে। গাল নামক একজাতীয় সামুদ্রিক পাখীও মড়া মাছ ইত্যাদি খেয়ে জীবনধারণ করে।

শিয়াল, কুকুর, নেকড়ে বাঘ, হায়েনা, প্রভৃতি প্রাণীরা দূষিত, গলিত পদার্থ প্রভৃতি উদরসাৎ করে আবর্জনা পরিষ্কারে যথেষ্ট সাহায্য করে। শিয়ালেরা

সাধারণতঃ রাত্রিবেলায় লোকালয়ের চতুর্দিকে খাদ্যের সন্ধানে ঘোরে এবং মৃতদেহের সন্ধান পেলে তা উদরসাৎ করে। নেকড়ে বাঘ যে কোন মৃত জীবজন্তুর গলিত মাংস ভক্ষণ করে। হায়েনারা গলিত, দুর্গন্ধযুক্ত মাংসের সন্ধান পেলে তা পরমানন্দে ভোজন করে। এরা মৃত জীবজন্তুর হাড়গোড় পর্যন্ত বাদ দেয় না; এমন কি, অন্যান্য মাংসাশী প্রাণীর ভুক্তাবশিষ্ট হাড়গোড়ও উদরস্থ করে। কয়েক জাতের ভল্লুকও মৃত জীবজন্তুর দেহ উদরসাৎ করে থাকে। মেরু প্রদেশের ভল্লুকদের মৃত তিমির মাংস ভক্ষণ করতেও দেখা গেছে।

আর্মাডিলো নামক প্রাণীদের কিন্তু সর্বভুক্ বলা চলে। কারণ এরা জীবিত ও মৃত জীবজন্তু, ফলমূল প্রভৃতি উদরস্থ করে থাকে। এরা মৃত জীবজন্তুর দেহের নীচে গর্ত খুঁড়ে তলার দিক থেকে একটু একটু করে মাংস খেতে আরম্ভ করে। মাংস শেষ না হওয়া পর্যন্ত এরা প্রতি রাত্রিতে এসে এভাবে মাংস উদরস্থ করে থাকে। পেবা আর্মাডিলো আবার কিছু মাংস তাদের বাসস্থানে নিয়ে ভবিষ্যতের জন্যে মজুত করে রাখে। গৃহপালিত ও বন্য উভয় রকমের শূকরেরা নানাপ্রকার আবর্জনা, পচা মাছ-মাংস ইত্যাদি ভক্ষণ করে আবর্জনা পরিষ্কারে যথেষ্ট সহায়তা করে। ইঁদুর প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায় প্রাণীরাও দূষিত, গলিত ইত্যাদি পদার্থ উদরস্থ করে থাকে।

চাঁদা, চেলা, সিঙ্গি, চেতল প্রভৃতি মাছ খাদ্যোপযোগী দূষিত, গলিত পদার্থসমূহ উদরসাৎ করে জলের বিশুদ্ধতা রক্ষায় অনেকটা সহায়তা করে থাকে। চিংড়ি বা কাঁকড়া জাতীয় প্রাণীরা মড়া মাছ ও অন্যান্য গলিত পদার্থ ভক্ষণ করে থাকে। হ্যাগ-ফিশ নামক এক জাতীয় সামুদ্রিক মাছ মড়া মাছের শরীরের মধ্যে ঢুকে চামড়া ও শক্ত হাড়গুলি ব্যতীত সমুদয় অংশই খেয়ে ফেলে। সাধারণতঃ এই মাছগুলি এক ফুটের বেশী বড় হয় না। হাঙ্গরের তুলনায় এরা ক্ষুদ্র হলেও এদের আক্রমণে হাঙ্গরের আত্মরক্ষার কোন উপায় থাকে না। এরা হাঙ্গরের চোখ নাক বা কান্‌কোর ভিতর দিয়ে হাঙ্গরের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে চামড়া ও শক্ত হাড় ব্যতীত মাংস ইত্যাদি সমুদয় অংশই ভক্ষণ করে থাকে। এরা বড় মাছ ও খাদ্যোপযোগী যে কোন আবর্জনা, পচা মাছ-মাংস প্রভৃতি সাগ্রহে ভোজন করে থাকে। অনেক সময় কড্‌ মাছের পেটে আস্ত পাখী, চাবির গোছা, মোমবাতি ইত্যাদি অনেক রকম জিনিষ পাওয়া গেছে। উভচর গোসাপ, কচ্ছপ প্রভৃতি প্রাণীরাও দুর্গন্ধময় গলিত জীবজন্তুর দেহ উদরসাৎ করে আবর্জনা পরিষ্কারে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে।

আরসোলা, টিকটিকি প্রভৃতি প্রাণীর মৃতদেহ পচতে আরম্ভ করলে পিঁপড়েরা দলবদ্ধভাবে সেখানটা ঘিরে ধরে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেই জায়গা পরিষ্কার করে ফেলে। আফ্রিকায় ড্রাইভার অ্যান্ট নামক একজাতের মারাত্মক প্রকৃতির পিঁপড়ে দেখা যায়। এদের দংশন অত্যন্ত বিষাক্ত এবং স্বভাবও অত্যন্ত হিংস্র। এদের দল লম্বায় কখনও

কখনও প্রায় একমাইল পর্যন্ত হয়। এদের চলবার পথে জীবিত বা মৃত যে কোন প্রাণী থাকলেই এরা তাকে নিঃশেষ করে ফেলে। বড় জন্তু-জানোয়ার থেকে আরম্ভ করে মানুষ পর্যন্ত এদের ভয় করে। গুবরে পোকারাও ছোট ছোট মৃত প্রাণী, পচা মাছ-মাংস ও অন্যান্য আবর্জনা ইত্যাদি ভক্ষণ করে থাকে। এরা রাত্রিবেলায় খাদ্যান্বেষণে বহির্গত হয় এবং ইঁদুর, খরগোস প্রভৃতি প্রাণীদের মৃতদেহ দেখলেই তার চতুর্দিকে গর্ত খুঁড়তে আরম্ভ করে এবং নীচের মাটি সরে যাওয়ায় মৃতদেহটি নিজের ভারে নীচে নামে। মৃতদেহটা কিছুটা নীচে গেলেই উপরে মাটি চাপা দিয়ে ঢেকে দেয়। তারপর এরা ধীরেসুস্থে দিনের পর দিন মৃতদেহটাকে উদরসাৎ করতে থাকে। তোমরা অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে—অনেক সময় দুটা গুবরে পোকা একত্রে একটা গোবরের ডেলাকে গড়াতে গড়াতে গর্তের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে। এরূপ ডেলা গর্তের মধ্যে নিয়ে এরা তার মধ্যে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়েই এই গোবর খেতে আরম্ভ করে এবং ক্রমে ক্রমে গুবরে পোকার রূপ ধারণ করে। এছাড়াও আরও নানা জাতের ছোট বড় আবর্জনা-পরিষ্কারক প্রাণী আছে—যারা পূতিগন্ধময় দূষিত, গলিত পদার্থসমূহ উদরসাৎ করে নানাভাবে আর্বজনা পরিষ্কারে প্রভূত সাহায্য করে থাকে।

শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

জানবার কথা

১। পৃথিবী-পৃষ্ঠে দীর্ঘতম পর্বতের উচ্চতা ও সমুদ্রের গভীরতা থাকা সত্ত্বেও যদি পৃথিবীকে আট ইঞ্চি পরিমিত একটি গোলকে পরিণত করা যায়—তাহলে একটা

১নং চিত্র

বিস্ময়কর ব্যাপার দেখা যাবে; অর্থাৎ তখন পৃথিবী-পৃষ্ঠ ঠিক একটা বিলিয়ার্ড খেলার বলের মত মসৃণ দেখাবে।

২। হাতীর সম্বন্ধে তোমরা অনেক কাহিনী শুনে থাকবে। আচ্ছা, পূর্ণবয়স্ক

২নং চিত্র

হাতীর ওজন সম্বন্ধে তোমাদের কোন ধারণা আছে কি? শুনলে তোমরা বিস্মিত হবে—সাধারণতঃ একটা পূর্ণবয়স্ক হাতীর ওজন প্রায় ১০,০০০ পাউণ্ড।

৩। যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সৌন্দর্যবোধেরও পরিবর্তন ঘটেছে। ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক যুগে মহিলাদের শরীর মোটা হওয়াটা ছিল সৌন্দর্যহীনতার

৩নং চিত্র

লক্ষণ, আর ছিপ্‌ছিপে গড়নের মহিলারা সুন্দরী বলে গণ্য হতেন। কাজেই শরীর যাতে মোটা না হয়ে পড়ে, সেজন্যে মহিলারা একরকম লোহার পোষাক পরিধান করতেন, যাতে শরীরের সেই অংশ বৃদ্ধি পেতে না পারে।

৪। তোমরা মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে বিভিন্ন দেশের প্রচণ্ড ঝড়ের খবর পড়ে থাকবে। কিন্তু পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড ঝড়ের খবর জান কি? বিজ্ঞানীদের মতে—

৪নং চিত্র

১৯৩৪ সালে এপ্রিল মাসে আমেরিকায় প্রবাহিত ঝড়ই নাকি সবচেয়ে প্রচণ্ড হয়েছিল। সেই সময় বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২৩১ মাইল। বিজ্ঞানীরা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন পর্বতের শীর্ষে এই ঝড় সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করেন।

৫। আধুনিক জগতের সৈন্যবাহিনীতে এখন যে পদ্ধতিতে সঙ্কেত প্রেরণের রেওয়াজ আছে তা আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ানদের সঙ্কেত প্রেরণ-পদ্ধতি থেকেই গ্রহণ করা

৫নং চিত্র

হয়েছে। রেড-ইণ্ডিয়ানেরা হাত নেড়ে নিজেদের মধ্যে নানারকম সঙ্কেত আদান-প্রদান করতো।

৬। লেখবার কালির সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। মানুষ কবে প্রথম লেখবার কালি আবিষ্কার করেছিল, সে সম্বন্ধে তোমাদের কোন ধারণা আছে কি? লেখবার কালি আবিষ্কৃত হয়েছিল হাজার হাজার বছর পূর্বে। তখন অবশ্য আজকালের মত

৬নং চিত্র

নানারকমের কালির প্রচলন ছিল না। যতদূর জানা যায়—মিশরবাসীরা ৪০০০ হাজার বছর পূর্বেও খুব ভাল লেখবার কালি তৈরী করতে জানতো।

৭। যদি বলা হয় যে, বটগাছ একাই একটা ছোট বন সৃষ্টি করতে পারে—তাহলে তোমাদের অনেকেই হয়তো কথাটা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু কথাটা সত্যি।

৭নং চিত্র

যারা শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের বিখ্যাত বটগাছটি দেখেছ—তারা নিশ্চয়ই কথাটা বিশ্বাস করবে। বটগাছের শাখা থেকে শিকড় উৎপন্ন হয়ে মাটিতে প্রবেশ করে এবং

শিকড়টি কাণ্ডে পরিণত হয়ে যায়। এগুলিকে বটের ঝুড়ি বলা হয়। বটগাছ থেকে এ রকমভাবে বহু ঝুড়ি উৎপন্ন হয়ে ক্রমে ক্রমে অনেক স্থান অধিকার করে ছোট একটা বন সৃষ্টি করা মোটেই অসম্ভব নয়। ভারতবর্ষ হচ্ছে বটগাছের আদি জন্মস্থান।

৮। পৃথিবীর বৃহত্তম পরিবহন ব্যবস্থাগুলির মধ্যে একটি মাটির নীচে অবস্থিত এবং সেটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে গ্যাসপাইপ লাইন। এই গ্যাসপাইপ লাইনগুলি যুক্তরাষ্ট্রের
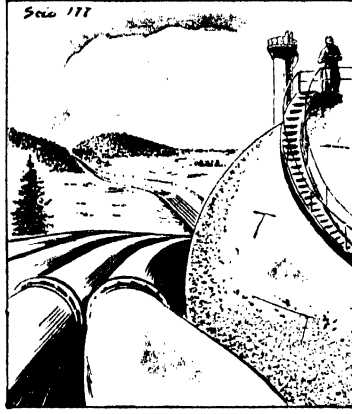
৮নং চিত্র

প্রায় প্রত্যেক অংশেই বিস্তৃত রয়েছে। এই ভূ-নিম্নস্থ পরিবহন ব্যবস্থার সমগ্র অংশের যোগফল ৪২০,০০০ মাইলের বেশী অথবা বিষুব রেখায় পৃথিবীর চতুর্দিকের দূরত্বের প্রায় ১৭ গুণ।

বিবিধ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসব

গত ২০শে জানুয়ারী ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে অনুষ্ঠিত জনসভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শত-বার্ষিকী উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সম্পন্ন করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

রাষ্ট্রপতি তাঁহার উদ্বোধন ভাষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে এই আশা ব্যক্ত করেন যে, শিক্ষার উন্নতিসাধনে এবং তাঁহাদের স্বপ্নের ভারত রূপায়ণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অধিকতর উল্লেখযোগ্য হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীযুক্তা পদ্মজা নাইডু রাষ্ট্রপতিকে অভিনন্দন জানাইয়া বক্তৃতা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত উপস্থিত ব্যক্তিগণকে সম্ভাষণ জানান।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে মনীষীদের সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি দান

২৩শে জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে দেশ-বিদেশের উনিশজন মনীষীকে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি প্রদান করা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে ভাষণদান প্রসঙ্গে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বলেন যে, দেশীয় ও বিদেশীয় বিদ্বানদের সম্মাননার এই অনুষ্ঠানের দ্বারা এই সত্যেরই প্রমাণ হইল যে, রাজনৈতিক মতবাদ পার্থক্য আনয়ন করে, আর বিদ্যাক্ষেত্রে সহযোগিতার দ্বারা পৃথিবী ঐক্যবদ্ধ হয়।

এই বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি পান—ডাঃ আর্নল্ড জোসেপ টয়েনবি (ডি-লিট) প্রখ্যাত ঐতিহাসিক; ডাঃ জে. রবার্ট ওপেনহাইমার (ডি.এস সি)—পারমাণবিক বিভাজন সম্পর্কে তাঁহার গবেষণা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী; আলেকজাণ্ডার নিকোলিভিচ নেসমানায়েভ (ডি. এস-সি)—বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি লেনিন পুরস্কার পান; ডাঃ টোসিও কিটাগাওয়া (ডি. এস-সি)—গণিত এবং সংখ্যাতত্ত্ব বিজ্ঞানে তাঁহার অবদান অনন্যসাধারণ; ডাঃ লয়েড ভিয়েল বার্কলার (ডি. এস-সি)—বিজ্ঞানের তথ্যাদি মানবকল্যাণে প্রয়োগ করিতে যে সকল বিজ্ঞানী ব্রতী হইয়াছেন ডাঃ বার্কলার তাঁহাদের অন্যতম; সার হ্যারল্ড স্পেন্সার জোন্স (ডি. এস-সি)—নক্ষত্র বিজ্ঞানে তাঁহার দান অসাধারণ।

পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বাগচী (ডি. লিট); পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী (ডি. লিট); শ্রীনন্দলাল বসু (ডি. লিট); শ্রীরাজশেখর বসু (ডি, লিট); জাকির হোসেন (ডি.লিট); শ্রীসুধীররঞ্জন দাস (এল.এল-ডি); শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত (এল. এল-ডি); অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু (ডি. এস-সি); শ্রীসি. ডি. দেশমুখ (ডি.এস-সি); ডাঃ কে. এস. কৃষ্ণন (ডি.এস-সি); শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ (ডি.এস-সি); ডাঃ আর্কট লক্ষণস্বামী মুদালিয়র (ডি.এস-সি); ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (ডি. এস-সি)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ও শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের আজীবন সদস্য। শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীরাজশেখর বসু বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য।

আগামী ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার ডাঃ এ. লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়ার ১৯৫৮-'৫৯ সালের জন্য ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সমিতির সাধারণ সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

আগামী ১৯৫৮ সালের ২রা জানুয়ারী হইতে ৮ই জানুয়ারী পর্যন্ত মাদ্রাজে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের যে ৪৫তম অধিবেশন হইবে, তাহাতে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের ডিরেক্টর জেনারেল অধ্যাপক এম. এস. থ্যাকার সভাপতিত্ব করিবেন। অধ্যাপক থ্যাকার বর্তমান বৎসরের ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে সমিতির সাধারণ সভাপতির কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৩টি বিভিন্ন শাখার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন :—গণিত—অধ্যাপক এস. এস. মাধব রাও (ব্যাঙ্গালোর) পরিসংখ্যান—ডাঃ কে. কিষেণ (লক্ষ্ণৌ); পদার্থবিদ্যা—শ্রীএস. এল. মালুরকার (বোম্বাই); রসায়ন—ডাঃ এস. ঘোষ (এলাহাবাদ); ভূতত্ত্ব ও ভূগোল—ডাঃ এস. ঝিনগ্রাম (লক্ষ্ণৌ); উদ্ভিদবিদ্যা—ডাঃ টি. এস. সদাশিবন (মাদ্রাজ); প্রাণিতত্ত্ব ও কীটতত্ত্ব—ডাঃ পি. ভট্টাচার্য (ইজ্জতনগর); নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব—ডাঃ সি. এম. কুরুলকার (বোম্বাই); ভেষজ ও পশুচিকিৎসা বিজ্ঞান—ডাঃ এ. কে. বসু (কলিকাতা); কৃষিবিজ্ঞান—ডাঃ পি. এন. ভাদুড়ী (কলিকাতা), শারীরবিদ্যা—ডাঃ এস. এন. রায় (ইজ্জতনগর); মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞান—ডাঃ এ. কে. পি. সিংহ (পাটনা); পূর্তবিদ্যা ও ধাতুবিদ্যা—অধ্যাপক সি. এস. ঘোষ (ব্যাঙ্গালোর)।

আন্তর্জাতিক যক্ষ্মা সম্মেলন

নয়াদিল্লীতে আন্তর্জাতিক যক্ষ্মা সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে অনগ্রসর দেশে যক্ষ্মারোগ এবং রোগ দূরীকরণের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা হয়। ভারত সরকারের যক্ষ্মা সম্পর্কিত উপদেষ্টা ডাঃ পি. ভি. বেঞ্জামিন অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

এই বিষয়ে প্রধান রিপোর্ট উপস্থাপিত করিয়া ডাঃ বেঞ্জামিন বলেন যে, কারিগরী দিক হইতে অগ্রসর দেশগুলিতে ৫০।৬০ বৎসর পূর্বে যক্ষ্মা-রোগের যেরূপ অবস্থা ছিল আজ বিশ্বের অনগ্রসর দেশসমূহেও রোগের তদ্রূপ অবস্থা। ঐসব দেশে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন এবং সঙ্গে সঙ্গে সহরাঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণই যক্ষ্মারোগ বৃদ্ধি পায়। অনগ্রসর দেশগুলি এইসব অবস্থার পুনরাবৃত্তি এবং সহরাঞ্চল ও দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হইতেছে। সুতরাং অনগ্রসর দেশসমূহে অদূর ভবিষ্যতে যক্ষ্মারোগ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

বর্তমানে যক্ষ্মারোগ অনুন্নত দেশসমূহে, বিশেষ করিয়া দূরপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকায় জনস্বাস্থ্যের পক্ষে প্রধান সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে।

অনুন্নত দেশে যক্ষ্মারোগের ফলে কত লোকের মৃত্যু হইয়া থাকে তৎসম্পর্কে প্রাপ্ত হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৫৩ সালে অনগ্রসর দেশসমূহে এক লক্ষ লোক পিছু ৩২ হইতে ৭৭৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং সেই তুলনায় উন্নত দেশসমূহে মৃত্যুর হার ছিল এক লক্ষ লোকপিছু ৯ হইতে ৬৩ জন। আফ্রিকার কোন কোন দেশের সাম্প্রতিক হিসাবে দেখা যায় যে, মৃত্যুর হার সেখানে কিছুটা হ্রাস পাইতেছে। তথাপি অনগ্রসর দেশে যক্ষ্মারোগের ফলে মৃত্যুর হার অগ্রসর দেশের মৃত্যুর হার অপেক্ষা অনেক বেশী। যক্ষ্মারোগের অন্যতম প্রধান কারণ শরীরে পুষ্টির অভাব। জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকভাবে যক্ষ্মা প্রতিরোধের ব্যবস্থাদিও অবলম্বন করিতে হইবে।

যক্ষ্মারোগের বিরুদ্ধে সর্বশেষ অস্ত্র আইসোনিয়াজিড

নয়াদিল্লীতে চতুর্দশ যক্ষ্মা সম্মেলনের প্রথম বৈজ্ঞানিক অধিবেশনে যক্ষ্মার বিরুদ্ধে সর্বশেষ অস্ত্র আইসোনিয়াজিড ব্যবহার সম্বন্ধে অর্থনৈতিক, চিকিৎসা সম্বন্ধীয় ও অন্যান্য সমস্যার আলোচনা হয়।

বিভিন্ন দেশের ১৬ জন সদস্যের সমবায়ে গঠিত একটি কমিটি এই আলোচনা করেন। ফ্রান্স, জার্মেনী, ইটালী, জাপান, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, স্পেন, সুইজারল্যাণ্ড, তুরস্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের প্রতিনিধিবৃন্দ এই কমিটির সদস্য। এই বিষয়ে অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরাও তাঁহাদের অভিমত ব্যক্ত করেন।

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ডাঃ গার্ডনার মিডলব্রুক এই বিষয় সংক্রান্ত প্রধান রিপোর্টটি পেশ করেন।

আইসোনিয়াজিড টিউবারকল ব্যাসিলাই-এর সমস্যাটি তিনটি দৃষ্টিকোণ হইতে বিবেচনা করা হয়।

কমিটির সদস্যেরা এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, শুধুমাত্র আইসোনিয়াজিড ব্যবহারের দ্বারাই জীবাণু-প্রতিরোধের ব্যাপারে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গিয়াছে। আইসোনিয়াজিড ও স্ট্রেপ্টোমাইসিন বা আইসোনিয়াজিড ও পি-এ-এসের মত দুই বা দুই-এর অধিক ঔষধ একত্র ব্যবহার করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, একমাত্র আইসোনিয়াজিড ব্যবহার করিয়া অধিকতর তাড়াতাড়ি সেইরূপ ফল লাভ করা যাইতে পারে।

সদস্যদের মতে, আইসোনিয়াজিড দ্বারা চিকিৎসার ফলে টিউবারকল ব্যাসিলাস সংক্রামক আকারে বৃদ্ধি পাইতে পারে না। তবে আইসোনিয়াজিড ব্যবহারের দ্বারা যে ফল পাওয়া যায় তাহা নির্দোষ কি না, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা একমত হইতে পারেন নাই।

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ডাঃ ওয়াল্স্ ম্যাকডারমট মনে করেন যে, আইসোনিয়াজিড ঔষধটি সস্তা অথচ উপকারী এবং ভারতের মত যে সমস্ত দেশে রোগীদের সংখ্যা অধিক, সেই সমস্ত দেশের পক্ষে ইহা একটি প্রয়োজনীয় ঔষধ। তিনি বলেন যে, একটি রোগীর জন্য বিভিন্ন ঔষধ বাবদ যে ব্যয় হয়, একমাত্র আইসোনিয়াজিড দ্বারা চিকিৎসায় সেই ব্যয়ে দশটি লোকের চিকিৎসা হইতে পারে।

তিনি পরামর্শ দেন যে, যে সমস্ত শিশু বা যুবকের দেহে যক্ষ্মারোগের জীবাণু পাওয়া গিয়াছে, রোগের বহির্লক্ষণ দেখা না গেলেও আইসোনিয়াজিড দ্বারাই তাহাদের চিকিৎসিত হওয়া উচিত।

ভারতের প্রতিনিধি বলেন যে, আইসোনিয়াজিড ব্যবহারের দ্বারা জীবাণু প্রতিরোধের যে ক্ষমতা পাওয়া যায়, তাহার সঠিক পরিমাণ নির্ণয় সম্ভব হয় নাই; তবে আইসোনিয়াজিড সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র জানা গিয়াছে যে, যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়্যাল ঔষধ সাম্প্রতিক কালে আবিষ্কৃত হইয়াছে, আইসোনিয়াজিড তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

বিভিন্ন লেবরেটরীতে ইঁদুর, বানর, গিনিপিগ প্রভৃতি প্রাণীর উপর এবং বিভিন্ন ক্লিনিকে এই সম্বন্ধে পরীক্ষা চালাইয়া কতিপয় জীবাণুতত্ত্ববিদ এবং চিকিৎসক এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, আইসোনিয়াজিড ব্যবহারের দ্বারা জীবাণু প্রতিরোধের ক্ষমতা পাওয়া গেলেও বিপদ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় না। তাঁহারা বলেন যে, সংক্রমণের বিপদ থাকিয়াই যায়।

চীনের ডাঃ উইউ বলেন যে, আইসোনিয়াজিড ব্যবহারের ফলাফল সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত যক্ষ্মা-জীবাণুনাশক অন্যান্য ঔষধের সহিত ইহার সম্মিলিত ব্যবহারই যুক্তিযুক্ত।

ভারতের ডাঃ এ. সি. উকিল বলেন যে, যদি দেখা যায় সস্তা আইসোনিয়াজিড ব্যয়বহুল পি-এ-এস বা স্ট্রেপ্টোমাইসিনের সহিত সম্মিলিতভাবে প্রয়োগ করিলে অধিকতর ফলদায়ক হইবে, তবে

অর্থনৈতিক বিচার-বিবেচনা না করিয়া তাহা সম্মিলিতভাবে প্রয়োগ করয়াই সঙ্গত।

ডিসেল ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা

ভারত সরকারে উৎপাদন মন্ত্রী শ্রীকে. সি. রেড্ডী সম্প্রতি বলেন যে, ভারতবর্ষে ডিসেল ইঞ্জিন নির্মাণের জন্য যে কারখানা স্থাপিত হইবে তাহা অন্ধ্র প্রদেশে স্থাপিত হইতে পারে। খুব সম্ভবতঃ উহা ভিজাগাপট্টমে স্থাপিত হইবে।

৪ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্পূর্ণরূপে সরকারী শিল্প প্রচেষ্টা হিসাবে এই কারখানা স্থাপিত হইবে। এই কারখানা প্রধানতঃ জাহাজের ইঞ্জিন নির্মাণের জন্য পরিকল্পিত হইলেও ইহাতে অন্যান্য ধরণের ইঞ্জিনও নির্মিত হইবে।

শ্রীযুক্ত রেড্ডী আরও বলেন যে, ভিজাগাপট্টমে ড্রাই-ডক নির্মাণের কাজও শীঘ্রই আরম্ভ করা হইবে এবং দুই বৎসরের মধ্যেই এই কাজ সম্পূর্ণ হইবে।

ভারতে ইউরেনিয়াম উৎপাদন বৃদ্ধি ও খনিজ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন

লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলেন যে, দেশে ইউরেনিয়ামের উৎপাদন বৃদ্ধি ও খনিজ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ভারত সরকার চূড়ান্তভাবে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন।

কাঁচামাল বিভাগটিকে ভারত সরকারের ভূতত্ত্ব সমীক্ষা বিভাগের অনুরূপ গঠন করিবার জন্য উক্ত বিভাগের কর্মচারীর সংখ্যা সম্প্রতি যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের পরমাণু-শক্তি বিভাগের কাজ ১৯৫৬ সালে কিরূপ চলিয়াছে—এই প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর লক্ষ্য রাখিয়া ভারত সরকার ইউরেনিয়াম উৎপাদনের ব্যাপারে স্বয়ং-স্বচ্ছল হইবার আশু প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন।

ট্রম্বেতে ক্যানাডা-ভারত পরমাণু-চুল্লী স্থাপনের কাজ বেশ অগ্রসর হইয়াছে। ক্যানাডার উদার সাহায্যে এই চুল্লীটি নির্মিত হইতেছে। এই চুল্লীটি নির্মিত হইলে ভারতের পক্ষে উচ্চ ইঞ্জিনীয়ারিংয়ে গবেষণা ও দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিবার সুবিধা হইবে।

ক্যানাডা চুল্লীর ব্যবহারের জন্য ২১ টন ভারী-জল যুক্তরাষ্ট্র হইতে ক্রয় করা হইয়াছে এবং আর ২০ টন ক্রয়ের জন্য আলোচনা চালান হইতেছে।

তেজস্ক্রিয় পদার্থকণা বিচ্ছুরণের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা হয় যে, পরমাণু শক্তি সংস্থার পর্যবেক্ষণ বিভাগ ধূলিকণা ও বৃষ্টির জলের তেজস্ক্রিয়তা নির্ধারণ করিতেছেন। নাগপুর, দিল্লী, বোম্বাই, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষার জন্য বোম্বাইয়ে প্রেরিত হইতেছে।

মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে গবেষণা করিবার জন্য উচ্চ পার্বত্য এলাকায় কেন্দ্র স্থাপনের জন্য যে সুপারিশ করা হইয়াছে, ভারত সরকার সেই সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন। গুলমার্গে আবহাওয়া সম্পর্কে এক পরীক্ষাগার খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন

ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এবং পারমাণবিক শক্তি বিভাগের সেক্রেটারী ডাঃ হোমি জে. ভাবা সম্প্রতি বলেন, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকাল শেষ হইবার পূর্বেই সম্ভবতঃ ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রথম পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ডাঃ ভাবা বলেন, ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদনেই পারমাণবিক শক্তির প্রথম প্রয়োগ হইবে। দ্বিতীয় প্রয়োগে সম্ভবতঃ জাহাজ পরিচালনের শক্তির উৎপাদন হইবে।

ডাঃ ভাবা বলেন বর্তমানে একমাত্র রাশিয়া এবং

বৃটেনেই বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র আছে। ভারতীয় কেন্দ্র বর্তমানে বিদেশী পদ্ধতিতে গঠিত হইবে, কিন্তু কিছু অংশ ভারতেও প্রস্তুত হইতে পারে।

খনিজ ইউরেনিয়াম হইতে ইউরেনিয়াম উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ঘাটশিলায় স্থাপন করা হইতেছে। যন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে। সম্ভবতঃ ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে ইহার কাজ আরম্ভ হইবে।

কুন্দ জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

নয়া দিল্লীতে ভারত এবং ক্যানাডা সরকারের মধ্যে কুন্দ পরিকল্পনা সাহায্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ক্যানাডা সরকার এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে ১০ কোটি টাকা সাহায্য করিবেন।

মাদ্রাজ রাজ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে যে সকল বিদ্যুৎ-উৎপাদন পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে তন্মধ্যে ৩৬ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ কুন্দ বিদ্যুৎ-উৎপাদন পরিকল্পনাটি সর্ববৃহৎ।

মাদ্রাজ রাজ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্যই এইরূপ একটি বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। উটকামণ্ড হইতে ২০ মাইল দূরবর্তী নীলগিরি পর্বতের উপরে স্থাপিত এই কেন্দ্রটি কুন্দ নদী এবং পার্শ্ববর্তী নদীগুলি হইতে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করিবে।

১৯৫৬ সালের জুন মাসে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এই কেন্দ্রটির ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৯৬০-'৬১ সালে, অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে এই কেন্দ্রটির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। কেন্দ্রটিতে পূর্ণ উৎপাদন সুরু হইলে প্রায় ১৮০,০০০ কিলোওয়াট জল-বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইবে। উৎপাদনের পরিমাণ পরবর্তীকালে বাড়াইয়া ২৪০,০০০ কিলোওয়াট করা যাইবে। এই কেন্দ্রে ১নং ও ২নং পাওয়ার হাউস থাকিবে। ১নং পাওয়ার হাউসের ২টি উৎপাদন ইউনিটের প্রত্যেকটিতে ২০,০০০ হাজার কিলোওয়াট করিয়া এবং ২নং পাওয়ার হাউসের ৪টি ইউনিটে ৩৫,০০০ কিলোওয়াট করিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাইবে।

কুন্দ বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ১১০,০০০ ভোল্টে ৩৫০ মাইল এবং ৬৬ হাজার ভোল্টে ১০০ মাইল পর্যন্ত প্রেরণ করা যাইবে।

ক্যানাডা সরকার এই পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ করিবার জন্য ১০ কোটি টাকা সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কলম্বো পরিকল্পনায় বিভিন্ন রাষ্ট্রকে কারিগরী সাহায্য দানের যে পরিকল্পনা রহিয়াছে ইহা তাহার অন্তর্ভুক্ত। ক্যানাডা সরকার গেট, স্ক্রিন, ভাল্‌ভ, পেনষ্টক, টারবাইন, জেনারেটার, স্লুইস গিয়ার এবং বিদ্যুৎ-উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত অন্যান্য নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিতেছেন।

আইনষ্টাইনের কোয়াণ্টাম থিওরীর পূর্ণাঙ্গ রূপদান

বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী ডাঃ সি. ভি. রামন ঘোষণা করেন যে, ব্যাঙ্গালোর গবেষণা মন্দিরে সাম্প্রতিক-কালে পরিচালিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে আইন-ষ্টাইনের আপেক্ষিক তাপ সংক্রান্ত কোয়াণ্টাম থিওরীর মূল সত্যকে একটি পূর্ণাঙ্গ থিওরীর রূপ দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। ইহার ফলে যতদূর সম্ভব নিম্নতম তাপমাত্রা (-২৭৩° সেণ্টিগ্রেড ডিগ্রী) হইতে আরম্ভ করিয়া উর্ধ্বে যে কোন তাপমাত্রা পর্যন্ত সর্বশ্রেণীর স্ফটিকের তাপগত বৈশিষ্ট্যের হেতু আজ খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে ডাঃ রামন তাঁহার এই নূতন আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন।

তিনি বলেন যে, স্ফটিকের আপেক্ষিক তাপ কোন পদার্থের তাপমাত্রা এক ডিগ্রী বাড়াইবার

জন্য যে পরিমাণ তাপ প্রয়োগ করিতে হয়) সম্পর্কে তাঁহার এই নূতন মতবাদ গবেষণাকালে সংগৃহীত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তথ্যের বিচারে জয়ী হইয়াছে।

ডাঃ রামন বলেন, স্বচ্ছ পদার্থ হইতে বিচ্ছুরিত আলোক স্পেক্ট্রোস্কোপের সাহায্যে বিশ্লেষণ করিতে গিয়া আমরা উক্ত পদার্থের, বিশেষ করিয়া উক্ত পদার্থটি যদি স্ফটিক হয়, তবে তাঁহার তাপ-স্পন্দনের বৈশিষ্ট্য অতি সহজেই প্রত্যক্ষভাবে জানিতে পারি। আপেক্ষিক তাপ সংক্রান্ত কোয়াণ্টাম থিওরী সম্পর্কে ঘোষণা করিতে গিয়া আইনষ্টাইন পরিষ্কারভাবেই বলিয়াছিলেন যে, স্ফটিকের তাপ ও আলোকের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে। আইনষ্টাইন সে প্রসঙ্গে হীরকের কথাও উল্লেখ করিয়াছিলেন। স্ফটিকের আপেক্ষিক তাপ সম্পর্কে আইনষ্টাইন অতি সাধারণভাবে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই আজ আপেক্ষিক তাপ সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ মতবাদের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই মতবাদ সর্বপ্রকার স্ফটিক সম্পর্কেই প্রযুক্ত হইতেছে। সম্পূর্ণভাবে আণবিক স্পন্দনের উপর নির্ভর করিয়া পরম শূন্য তাপমাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া উর্ধ্বে যে কোন তাপমাত্রা পর্যন্ত সর্বপ্রকার স্ফটিকের তাপগত শক্তি আজ নির্ধারণ করা সম্ভব হইতেছে।

প্রাচীন যুগের প্রসাধন দ্রব্য আবিষ্কার

এথেন্স—সম্প্রতি গ্রীসে যে সকল খনন কার্য চলিতেছে তাহার ফলে নারীদের ব্যবহৃত মাকড়ি এবং প্রসাধন দ্রব্যাদি মৃত্তিকাস্তর হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্ব ম্যাসিডোনিয়ার অন্তর্গত অ্যাম্ফিপোলিসে মদনদেবের মূর্তি খোদিত মাকড়ি, সিংহ খোদিত ব্রুচ, হার, ব্রেসলেট প্রভৃতি বহু সুন্দর গহনা পাওয়া গিয়াছে। এগুলি সবই খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই অঞ্চলে যে সকল প্রাচীন কবর আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে একটি নারীর কবর আছে। এই কবরের পার্শ্বে একটি সুন্দর কারুকার্য করা মৃৎপাত্রে সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় লাল রং পাওয়া গিয়াছে। এই রং সম্ভবতঃ প্রসাধন দ্রব্য হিসাবে তৎকালে ব্যবহৃত হইত।

অস্ত্রোপচারের সাহায্যে ৫জন বধিরের শ্রবণ-শক্তি লাভ

নিউ ইয়র্কের মাউণ্ট সিনাই হাসপাতালের কর্ণরোগের উপদেষ্টা শল্য-চিকিৎসক ডাঃ সামুয়েল রোজেন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কানে নূতন উপায়ে অস্ত্রোপচার করিয়া পাঁচজন বধিরের শ্রবণ-শক্তি ফিরাইয়া দিয়াছেন।

কলিকাতার সমস্ত হাসপাতাল এবং পাটনা, আসাম ও হায়দ্রাবাদের হাসপাতালসমূহের কর্ণ-নাসিকা-কণ্ঠ চিকিৎসকদের সমক্ষে স্নায়ুমণ্ডলী সমাবেশের পদ্ধতি দেখাইয়া ডাঃ রোজেন প্রত্যেকটি রোগীর উপর ২০ মিনিটব্যাপী অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন। অস্ত্রোপচারের পর তাহাদের সকলেই শ্রবণ-শক্তি ফিরিয়া পায়।

তিনি বলেন যে, কানের ভিতরকার ঝিল্লীটি ধীরে ধীরে চাঁচিয়া দেওয়াই হইল তাঁহার পদ্ধতি। তিনি বলেন যে, কানের মধ্যে এই পদ্ধতিতে অস্ত্রোপচার তেমন কঠিন নহে। এইভাবে অস্ত্রোপচার একবার যদি সফল না হয়, তবে আবার করা চলিতে পারে এবং অপরাপর চিকিৎসাতেও কোনরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না।

পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ

পৃথিবীর মনুষ্যনির্মিত উপগ্রহরূপে মহাশূন্যে স্পর্শকাতর যন্ত্রপাতি বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য ডেট্রয়েট-এ (মিচিগান) পাত্‌লা সোনার পাতে আবৃত দুইটি ম্যাগ্নেসিয়াম গোলক প্রস্তুত করা হইয়াছে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ১৯৫৮ সালের প্রথম ভাগে ১৫ হইতে ৩০টি কৃত্রিম চন্দ্র মহাশূন্যে পাঠাইবে ; তন্মধ্যে এই দুইটি প্রথম।

গোলক দুইটির আবরণ ·০৩ ইঞ্চি পুরু। উহাদের ম্যাগ্নেসিয়াম পাতের আবরণের উপর তামা, দস্তা, নিকেল, রূপা ও সর্বশেষে খাঁটি সোনার এক ইঞ্চির ৩০ হাজার ভাগের এক ভাগ পুরু পৃথক পৃথক পাত আছে।

গোলক দুইটি ওয়াশিংটনে পাঠাইবার জন্য ভারী কাঠের ক্রেটে রাখা হইয়াছে। তথায় ঐ দুইটিতে সংরক্ষক হিসাবে অ্যালুমিনিয়াম ও সিলিকন মনোক্সাইড লেপন করা হইবে এবং তথ্য সংগ্রাহক যন্ত্রসমূহ সন্নিবেশিত হইবে।

কৃত্রিম উপগ্রহগুলির দুই সপ্তাহ হইতে এক বৎসর মহাশূন্যে থাকিবার কথা।

পারমাণবিক বোমারু বিমানের মেরু পরিক্রমা

মার্কিন সামরিক বিমান কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন যে, মার্কিন বিমান বাহিনীর ৮ খানা বি-২ জেট বোমারু বিমান উত্তর মেরুর চতুর্দিকে ১৭ হাজার মাইল পরিক্রমায় কোথাও না থামিয়া কৃত্রিম পারমাণবিক বোমা বর্ষণ করিয়া আসিয়াছে। একখানা বিমান সাড়ে ৩২ ঘণ্টা পর্যন্ত আকাশে ছিল। বিমানসমূহ উড়ন্ত অবস্থাতেই কয়েকবার করিয়া জ্বালানী তৈল লইয়াছে। সামরিক গুপ্ত তথ্য হিসাবে সংবাদটি গোপন রাখা হইবে। বিমানসমূহের গতি ঘণ্টায় প্রায় ৭ শত মাইল পর্যন্ত উঠিয়াছিল।

পৃথিবীর যে কোন স্থানে পারমাণবিক বোমা বর্ষণের ক্ষমতা যে মার্কিন বিমান বাহিনীর রহিয়াছে, তাহা যাচাই করিয়া দেখাই এই পরীক্ষামূলক পরিক্রমার উদ্দেশ্য ছিল। মার্কিন বিমান বাহিনীর এই ধরণের ৫ শতাধিক বোমারু বিমান রহিয়াছে।

ঘণ্টায় ১২ শত মাইল

সাময়িক পত্র "অ্যাভিয়েশন উইক" সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন যে, জেট বিমানসমূহের ঊর্ধ্বাকাশে আরোহণ এবং দ্রুতগতি পরিক্রমার ক্ষেত্রে একখানা মার্কিন নৌ-বিভাগীয় জঙ্গী বিমান বে-সরকারী রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে। বিমানখানা ৭২ হাজার ফুটেরও উর্ধ্বে উঠিয়াছিল এবং ঘণ্টায় ১২২০ মাইলেরও বেশী গতিতে উড়িয়া গিয়াছিল।

পরলোকে লায়োনেল আর্নেষ্ট হাওয়ার্ড হুইটবি

বৃটিশ জীবাণুতত্ত্ববিদ ও রক্তবিশেষজ্ঞ স্যার লায়োনেল আর্নেষ্ট হাওয়ার্ড হুইটবি গত ২৪শে নভেম্বর (১৯৫৬) লণ্ডন হাসপাতালে মারা গিয়াছেন। তিনি সালফোনামাইড গ্রুপের বিস্ময়কর ঔষধ এম অ্যাণ্ড বি-কে ত্রুটিমুক্ত করিতে সাহায্য করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি বৃটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৫ সাল হইতে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের রিজিয়াস অধ্যাপকরূপে কাজ করিতেছিলেন।

আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ

সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীর আগ্নেয়গিরি-গুলির প্রচণ্ডতম দশটি অগ্ন্যুদ্গীরণের মধ্যে একটির বিষয়ে গবেষণা করিয়া এমন কতকগুলি তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহাতে নূতন অগ্ন্যুদ্গীরণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হইবে।

যে অগ্ন্যুদ্গীরণ সম্পর্কে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা তথ্যানুসন্ধান করেন, প্রচণ্ডতার দিক দিয়া সাধারণ একটি পারমাণবিক বোমার চেয়ে তাহা বহুগুণে সাংঘাতিক হইয়াছিল। নয় মাস আগে এই অগ্ন্যুদ্গীরণ হয়। ফলে সোভিয়েট প্রশান্ত-মহাসাগরের উপকূলবর্তী কামচাট্‌কায় বেন্‌জ্‌মিয়ানী আগ্নেয়গিরির শীর্ষ প্রায় নয়শত ফুট নামিয়া যায়। এই অগ্ন্যুৎপাতকালে ধোঁয়ার মেঘ প্রায় ২৫ মাইল উঁচুতে উঠিয়াছিল। লাভাস্রোত এত বেশী বরফ গলাইয়া দিয়াছিল যে, পঞ্চাশ মাইল দীর্ঘ একটি নদীরই সৃষ্টি হয়। এই নদীর মুখে যাহা

কিছু পড়ে সবই ধ্বংস হয়। যেখানে আগে বন-জঙ্গল ছিল, সেখানে গাছপালার চিহ্ন পর্যন্ত নাই, কেবল কাদায় ঢাকা বিরাট সমতল ভূমি চোখে পড়ে। কাহারও প্রাণহানি হয় নাই। বর্তমানে আগ্নেয়গিরিটি সুপ্তাবস্থায় আছে।

গর্ভস্থ শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ

মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসকমণ্ডলীর রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বেই গর্ভস্থ শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ করা যায় কিনা, নূতন একটি প্রণালীতে তাহা পরীক্ষা করিয়া শতকরা একশত ক্ষেত্রেই নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হইয়াছে।

তাহারা ৪৪টি প্রসূতিকে এই নূতন প্রণালীতে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বাণী মিলিয়া গিয়াছে। গর্ভস্থ শিশুকে আবৃত করিয়া যে ঝিল্লীত্বক থাকে তাহা হইতে নিঃসৃত একরকম জলীয় পদার্থের সহিত শিশুর পরিত্যক্ত দেহকোষ মিশ্রিত থাকে। এই প্রণালী অনুসারে প্রথমে সূচ ও সিরিঞ্জের সাহায্যে এই জলীয় পদার্থ সংগ্রহ করা হয় এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেহকোষগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়।

পরমাণু ডেপথ্ চার্জ

যুদ্ধের সময় নৌবহরের রণতরীগুলির সবচেয়ে বেশী বিপদ হইল শত্রুপক্ষের সাবমেরিণের আক্রমণ। শত্রুপক্ষের রণতরীর সঙ্গে সামনাসামনি লড়াই কিম্বা জঙ্গী ও বোমারু বিমানের আক্রমণ প্রতিরোধ করা অসম্ভব নয়, কারণ এগুলিকে চাক্ষুষ দেখা যায়। কিন্তু সাবমেরিন থাকে জলের নীচে, জলের উপর পেরিস্কোপ জাগাইয়া শত্রু-জাহাজ লক্ষ্য করিয়া টর্পেডো নিক্ষেপ করে। বিপদের আশঙ্কা দেখিলে জলের নীচে ডুবিয়া যায় এবং বিপদ যতক্ষণ না কাটে ততক্ষণ সমুদ্রের তলায় অপেক্ষা করে।

জলের নীচে লুক্কায়িত সাবমেরিন ধ্বংস করিবার জন্য নৌবাহিনী 'ডেপথ্ চার্জ' ব্যবহার করিয়া থাকে। এইগুলি পিপার আকারে বৃহৎ বোমা ছাড়া আর কিছু নয়। সাবমেরিন যে স্থানে লুকাইয়া আছে বলিয়া সন্দেহ করা হয়, সেই স্থান ঘিরিয়া ফেলিয়া জাহাজগুলি হইতে নির্দিষ্ট দূরত্বের ব্যবধানে ডেপথ্ চার্জের পিপাগুলি জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। পিপাগুলি জলের নীচে নির্দিষ্ট গভীরতায় যাহাতে বিস্ফোরিত হয়, সেই রকম ব্যবস্থা থাকে। জলের নীচে বিস্ফোরণ স্থানের কয়েক শত ফুটের মধ্যে সাবমেরিন থাকিলে তাহা ধ্বংস হইয়া যায়।

ডেপথ্ চার্জের ধ্বংস করবার শক্তি এই কয়েক শত ফুটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এইজন্য অনেক সময় সাবমেরিনগুলি দ্রুত পলায়ন করে কিম্বা সমুদ্রের অনেক নীচে নামিয়া গিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে। সম্প্রতি মার্কিন নৌবাহিনী এক নূতন ধরণের পারমাণবিক ডেপথ্ চার্জ উদ্ভাবন করিয়াছে, যাহা সাবমেরিন আক্রমণ প্রতিরোধের কৌশলে যুগান্তর আনিবে।

এই ডেপথ্ চার্জগুলিকে ক্ষুদে পরমাণু বোমা বলা যাইতে পারে। এর একটির নাম দেওয়া হইয়াছে লুলু। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে সমুদ্রের নীচে যে কোন গভীরতায় (পুরাতন ধরণের ডেপথ্ চার্জের চেয়ে আরও গভীর স্তরে) এইগুলির

বিস্ফোরণ ঘটান যাইতে পারিবে। এইগুলির বিস্ফোরণের চাপ বা শক্তি জলের নীচে গভীর স্তরে বিস্ফোরণ কেন্দ্র হইতে উপরে, নীচে এবং চারিপাশে কয়েক মাইল পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িবে। পুরাতন ধরণের ডেপথ্ চার্জ যেখানে মাত্র কয়েক শত ফুটের মধ্যে সাবমেরিন ধ্বংস করিতে পারিত, সেই স্থলে পারমাণবিক ডেপথ্ চার্জ কয়েক মাইলের মধ্যে সাবমেরিন ধ্বংস করিতে পারিবে।

মার্কিন নৌবহর লুলুর অনুরূপ আরও কয়েক প্রকার পারমাণবিক ডেপথ্ চার্জ উদ্ভাবন করিয়াছেন। সামরিক সতর্কতা ব্যবস্থা হিসাবে, এই মারণাস্ত্রের বিভিন্ন অংশ নির্মাণের ভার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর দেওয়া আছে। অংশগুলি একত্র করিয়া নাট-বোল্ট আঁটিয়া আসল মরণাস্ত্র তৈরী করা হয়।

রণক্ষেত্রে ব্যবহার্য ক্ষুদ্রতম রেডার

রণক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম রেডার-সেট উদ্ভাবন করিয়াছেন।

স্থলযুদ্ধে দুই পক্ষের সৈন্যবাহিনী যখন সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হয়, তখন কুয়াসা, মনুষ্যসৃষ্ট ধোঁয়ার আবরণ অথবা রাত্রির অন্ধকারের সুযোগ লইয়া শত্রুপক্ষের সেনা বা যান্ত্রিক বাহিনী নিজেদের অবস্থান বা সৈন্যসমাবেশের পরিবর্তন করিতে পারে, কিম্বা পশ্চাদপসরণও করিতে পারে। রণক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখা প্রয়োজন। রেডারের সাহায্যে অদৃশ্য শত্রুর গতিবিধির উপর নজর রাখা যাইবে।

নূতন রেডার যন্ত্রটি ছয় হাজার গজ ব্যাসার্ধ এলাকা জুড়িয়া কার্যকরী হইবে। অর্থাৎ রেডার যন্ত্র হইতে বৃত্তাকারে ছয় হাজার গজের মধ্যে অবস্থিত বস্তুর অবস্থান ধরা পড়িবে।

দানিয়ুব নদীর গতিপথ পরিবর্তন

হাঙ্গেরীর প্রাদেশিক সংবাদপত্রগুলিতে এই মর্মে একটি খবর বাহির হইয়াছে যে, সোভিয়েট ইঞ্জিনিয়ারগণ দানিয়ুব নদীকে মধ্য এশিয়ার ভিতর দিয়া প্রবাহিত করিবার বিরাট এক পরিকল্পনা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। দানিয়ুব ইউরোপের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী। এই পরিকল্পনা সফল হইলে সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চলের উষর এলাকাগুলির অধিবাসীদের পানীয় জলের অভাব ও সেচের অসুবিধা দূর হইবে।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দশম বর্ষ | মার্চ, ১৯৫৭ | তৃতীয় সংখ্যা

জাতিগত উৎকর্ষ

শ্রীদিলীপকুমার দাস

বহুকাল ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে জাতিগত উৎকর্ষ সম্বন্ধে বহুবিধ বিভ্রান্তিকর ধারণা প্রচলিত আছে। জাতিগত উৎকর্ষের দাবী জানিয়ে এক শ্রেণীর মানুষ আরেক শ্রেণীর মানুষের উপর নির্বিচারে অত্যাচার চালিয়েছে এবং এখনও চালাচ্ছে। জাতিগত উৎকর্ষের দাবীদারদের কৃত্রিম কৌলীন্যগর্বের পরিণতি যে কি হতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া যায় নাৎসী জার্মেনীতে ইহুদি বিতাড়নে, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আমেরিকাতে বর্ণবৈষম্যমূলক ব্যবস্থায় এবং আরও কয়েকটি দেশে অনুরূপ আচরণ প্রদর্শনে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিচারে দেখা যায় যে, জাতিগত উৎকর্ষ সম্বন্ধে কল্পিত প্রায় সকল সিদ্ধান্তই অবাস্তব এবং এমন কোনও তথ্য এখন পর্যন্ত জানা যায় নি যার উপর নির্ভর করে বলা যেতে পারে যে, কোনও জাতি বা মানবগোষ্ঠী অন্যান্য মানবগোষ্ঠীর তুলনায় সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ।

জাতিগত উৎকর্ষের দাবী জানাতে গেলেই জাতি কথাটির ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং প্রায় সর্বক্ষেত্রেই এরূপ অবস্থায় দেখা গেছে যে, জাতি কথাটির যে সংজ্ঞা দেওয়া হয় সেটা অবৈজ্ঞানিক ও অলীক। কখনও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে জাতি বলে পরিচয় দেওয়া হয়ে থাকে, কখনও কতকগুলি বিশেষ আকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয় আবার কখনও কখনও ভৌগোলিক অবস্থান ও ভাষার উপর ভিত্তি করেও জাতিগত পরিচয় নিরূপিত হয়ে থাকে। ফলে হিন্দু জাতি, আর্য জাতি, বাঙ্গালী জাতি, শ্বেতকায় জাতি প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের জাতির কথা আমরা শুনে থাকি। এভাবে জাতি কথাটিকে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে যে জাতিবিচার করা হয়ে থাকে তাতে অন্য কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ঐ ধরণের জাতিবিচার অসার্থক।

প্রথম মানুষ আবির্ভাবের পর পরিব্যক্তি, অভিযোজন, নির্বাচন, পরিমাণ এবং স্বাতন্ত্র্যের জটিল প্রক্রিয়ার ফলে পৃথিবীতে কয়েকটি পৃথক মানবগোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়েছে। এরূপে গঠিত কোনও মানবগোষ্ঠী যখন একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে অবস্থান করে এবং কতকগুলি

সাধারণ সহজাত গুণবিশিষ্ট হয় তখন সেই মানব-গোষ্ঠীকে বৈজ্ঞানিক বিচারানুযায়ী জাতি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এই হিসাবে পৃথিবীতে তিনটি প্রধান জাতি আছে—ককেশীয়, মঙ্গোলীয় ও নিগ্রো (মতভেদে প্রধান জাতির সংখ্যা পাঁচটি বলেও গণ্য করা হয়ে থাকে)। এই প্রধান জাতিগুলি আবার বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু কোনও জাতিই সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন জনসমষ্টি দ্বারা গঠিত নয়। প্রভিন্ন জনসমষ্টি দ্বারা গঠিত বলেই কোনও জাতিকে অমিশ্র বলা চলে না। প্রত্যেকটি জাতির জনসমষ্টির মধ্যে প্রভিন্নতা এত সুস্পষ্ট যে, ২।৩টির অধিক আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করে যদি জাতিবিচার করা হয় তাহলে সমগ্র মানবসমাজের এক বিরাট অংশই হয়তো কোনও জাতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না।

সব মানুষই 'হোমো স্যাপিয়েন্স' প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত এবং সব মানুষের মধ্যেই প্রজাতিগত আকৃতি-বৈশিষ্ট্যে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। কোনও এক সাধারণ সূত্র থেকে উদ্ভব—এরূপ ঘটবার কারণ হলেও মনে রাখতে হবে যে, বিভিন্ন 'জিন' উত্তরলব্ধ হওয়ার জন্যে এবং পৃথক পরিবেশে বাস করবার ফলে কোনও দুজন মানুষ সম্পূর্ণরূপে এক ধরণের হয় না এবং প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অল্পবিস্তর স্বাতন্ত্র্য থাকে। এজন্যে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পৃথিবীতে কখনও অভিন্ন জনসমষ্টি দ্বারা গঠিত কোনও অমিশ্র জাতি গড়ে ওঠে নি এবং ভবিষ্যতেও উঠবে না।

জৈবকারণসম্মত যে সব পার্থক্য বিভিন্ন মানুষের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় সেগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে মানুষের জাতির যে পরিচয় আমরা পাই তাতে কোনও মানবগোষ্ঠী অন্যান্য মানবগোষ্ঠীর তুলনায় বিশেষ কোনও স্বাতন্ত্র্য দাবী করতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কল্পিত জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের দাবী করে এবং ঐ দাবীর উপর ভিত্তি করে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা পৃথিবীর নানা জায়গায় অনেক সময় প্রবর্তিত হয়েছে। বর্তমান পৃথিবীর একটি অন্যতম সমস্যা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আমেরিকায় বর্ণবৈষম্যমূলক ব্যবস্থার কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে পড়ে।

জাতিগত উৎকর্ষের সঙ্গে রক্তের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা বহুকাল ধরে প্রচলিত আছে। অভিজাত রক্ত, আর্য রক্ত, ইহুদি রক্ত, মিশ্রিত রক্ত প্রভৃতি কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। এই প্রকার ধারণার পশ্চাতে রক্তের সঙ্গে বংশ-গতির সম্বন্ধের স্বীকৃতি আছে এবং এক সময় ছিল যখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা হতো যে, রক্তের মাধ্যমেই বংশগত গুণাবলী বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়ে থাকে। বর্তমানে আমরা মানবসমাজের যে রূপ প্রত্যক্ষ করছি সেটা যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর মধ্যে অসংখ্য সংমিশ্রণেরই পরিণতি, সে কথা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে পূর্বোক্ত ধারণার ভিত্তিতে এখনও অনেকে মনে করেন যে, তথা-কথিত 'উচ্চ' জাতির সঙ্গে তথাকথিত 'নিম্ন' জাতির বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হলে বিভিন্ন পর্যায়ের রক্তের সংমিশ্রণের ফলে জাতিগত উৎকর্ষের অবনতি ঘটবে। এমন কি, চিকিৎসা-ক্ষেত্রেও অনুরূপ অমূলক বিশ্বাসকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়ে থাকে। কিছুদিন পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় এরূপ স্থিরীকৃত হয়েছে যে, কোন অশ্বেতকায় ব্যক্তির রক্ত বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত কোনও শ্বেতকায় ব্যক্তির দেহে সঞ্চারিত করা চলবে না। শ্বেতকায় জাতির রক্তের কল্পিত মহিমাময় ভূমিকার উপর নির্ভর করে যে এই ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, সেকথা বলাই বাহুল্য।

লোহিত কণিকার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মানুষের রক্ত চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা—'এ', 'বি', 'ও' এবং 'এবি'। 'এ' শ্রেণীর রক্ত 'এ' এবং 'এবি' শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের দেহে সঞ্চারিত করা যায়। 'বি' শ্রেণীর রক্ত 'বি' এবং এবি শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের দেহে সঞ্চারণ করা সম্ভব। 'ও' এবং 'এবি' শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের যথাক্রমে বলা হয়ে থাকে সার্বদাতা এবং

সার্বগ্রহীতা। কারণ 'ও' শ্রেণীর রক্ত রক্তের সকল প্রকার শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের দেহে সঞ্চারণ করা যায় এবং 'এ বি' শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা সকল শ্রেণীর রক্তই তাঁদের শরীরে গ্রহণ করতে পারে। রক্ত সঞ্চারণ-কালে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, 'এ' শ্রেণীর রক্ত যদি কোনও 'বি' শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তির দেহে সঞ্চারিত করা হয় তাহলে 'এ' শ্রেণীর রক্তকোষগুলি জমে গিয়ে 'বি' শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তির রক্তবহা নালীগুলির মধ্যে রক্ত চলাচল বন্ধ করে দিতে পারে। রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়ার পরিণতি যে কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

বিভিন্ন শ্রেণীর রক্ত প্রায় প্রত্যেকটি মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন হারে ছড়িয়ে আছে। যেমন, 'এ' শ্রেণীর রক্ত শতকরা ৪১ জন মার্কিনী শ্বেতকায়ের মধ্যে, শতকরা ৩০.৩ জন মার্কিনী অশ্বেতকায়ের মধ্যে, শতকরা ৪১.৭ জন ইংরেজের মধ্যে, শতকরা ৪৩.৫ জন জার্মানের মধ্যে এবং শতকরা ৩০.৩ জন পিগ্‌মীর মধ্যে আছে। রক্ত-সঞ্চারণকালে তথা-কথিত জাতিবিচার মোটেই বিবেচ্য নয়। বরং এরূপ ক্ষেত্রে প্রথমেই পরীক্ষা করে জানতে হবে, রক্তদাতা এবং রক্তগ্রহীতার রক্ত কোন্ শ্রেণীভুক্ত এবং রক্তের শ্রেণী অনুযায়ী রক্ত-সঞ্চারণে কোনও বাধা না থাকলে শ্বেতকায়-অশ্বেতকায়, ইহুদি-খৃষ্টান, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে রক্ত-সঞ্চারণ করা সম্ভব। রক্তের সঙ্গে জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কোনও সম্পর্ক নেই এবং কয়েক ফোঁটা রক্ত পরীক্ষা করে জাতির পরিচয় নির্ণয় করাও সম্ভব নয়।

বংশগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে রক্তের সাযুজ্য এবং রক্তের মাধ্যমে বংশগত গুণাবলীর সঞ্চারণ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে, যখন আধুনিক জেনেটিক্স প্রায় সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিল তখন এই ধারণাই করা হতো যে, পিতামাতার প্রত্যেকের কাছ থেকে অর্ধেক হারে প্রাপ্ত রক্তের দ্বারা সন্তানের প্রকৃতি গড়ে ওঠে। এই সূত্র ধরেই আধুনিক সভ্যতা ও গণতন্ত্রের আত্যন্তিক আত্মশ্লাঘী আমেরিকায় এখনও হিসাব করা হয়ে থাকে, এক-ষোড়শ 'অশ্বেতকায়' রক্তবিশিষ্ট কোন ব্যক্তিদের নিগ্রো বলে আখ্যা দেওয়া হবে। এথেকে এরূপ মনে করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে, কেবল বর্ণ-বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা চালু রাখবার জন্যেই রক্তের সঙ্গে বংশগতির সম্পর্কশূন্যতার কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে একটি অতথ্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে।

বংশগত গুণাবলী রক্তের মাধ্যমে সঞ্চারিত হয় না, বংশগত গুণাবলীর সঞ্চরণ নির্ভর করে জননকোষের কোষকেন্দ্রে অবস্থিত জিনসমূহের উপর। প্রজননের ফলে রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে না, ভাবী সন্তানের বংশগতি পুং ও স্ত্রী জননকোষদ্বয়ের মিলনসম্ভূত কোষের জিনসমষ্টির মধ্যে নিহিত থাকে। রক্তের যে শ্রেণীবিভাগের কথা পূর্বে বলা হয়েছে, সেটাও জিন-এর দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে।

বর্ণসঙ্করদের মধ্যে মিশ্রিত রক্ত থাকে, এরূপ ধারণা চলতি কথা হিসেবে প্রচলিত থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এর কোনও সত্যতা নেই। রক্তের অলীক আভিজাত্যের উপর ভিত্তি করে বর্ণ-সঙ্করদের অপজাত বলে সন্দেহ করা হয়ে থাকলেও জাতি-মিশ্রণের ফলে যে আপজাত্য ঘটতে পারে, এরূপ কোনও বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নি। পৃথিবীতে মানুষ আবির্ভাবের পর থেকেই বর্ণসঙ্কর সৃষ্টির কাজ চলে আসছে এবং পৃথিবীর প্রত্যেকটি প্রধান জাতির মধ্যেও এই সঙ্করত্ব বিদ্যমান। অতীতে বা বর্তমানে যেখানে সভ্যতার উৎকর্ষ জাজ্বল্যমান হয়েছে সেখানকার ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, সেখানেও জাতি-মিশ্রণ ঘটেছে। বর্তমান পৃথিবীতে জাতি মিশ্রণের কাজ পূর্বের তুলনায় বেশী পরিমাণে হচ্ছে

এবং ভবিষ্যতে আরও বেশী হবে বলে অনুমান করা হয়ে থাকে।

বর্ণসঙ্করদের আপজাত্য প্রমাণ করতে যাঁরা উদ্যোগী হয়েছেন তাঁরা প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্ণসঙ্করদের সামাজিক জীবনে যে ভ্রমাত্মক অসঙ্গত আচরণ সহ্য করে বাস করতে হয়, সেকথা বিবেচনা করে দেখেন নি। অথচ একথা মোটেই অজানা নয় যে, প্রতিকূল পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে বৃদ্ধিলাভ করা মানুষ এবং অন্যান্য যে কোনও জীবের পক্ষেই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। পরিবেশজনিত প্রতিকূলতা বর্ণসঙ্করদের সুষ্ঠুভাবে বৃদ্ধিলাভে কতটা অন্তরায় হতে পারে, সেটা বিবেচনা না করে তাঁদের আপজাত্য প্রমাণ করবার প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক পন্থা। বর্ণসঙ্করদের দৈহিক বিকৃতি সম্বন্ধেও অনেক সময় নানারকম উক্তি করা হয়ে থাকে। কিন্তু স্বজাতির মধ্যে বিবাহের ফলে উদ্ভূত সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে দৈহিক বিকৃতি ঘটবার যতটা সম্ভাবনা থাকে, জাতি-মিশ্রণের ফলে বর্ণসঙ্করদের মধ্যে তার চেয়ে বেশী দৈহিক বিকৃতি ঘটবার অতিরিক্ত সম্ভাবনা আছে, এরূপ মনে করবার কোনও যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক কারণ নেই। সমগ্র মানবসমাজ একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। জাতিগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করলেও প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে সাদৃশ্যযুক্ত সমান সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকবার ফলে মানুষের ক্ষেত্রে সঙ্করত্ব কোনও অসাধারণ ব্যতিক্রম ঘটাবে না এবং সঙ্করত্বের ফলে কারও রক্ত কলুষিত হবে না। কোনও বিশেষ শ্রেণীর মানুষের রক্তের যখন কোনও আভিজাত্য নেই তখন উক্ত আভিজাত্যের উপর নির্ভরশীল কোনও জাতিগত উৎকর্ষ বা অপকর্ষও নেই।

জাতিগত উৎকর্ষের দাবী যাঁরা করেন তাঁরা জাতিগতভাবে বুদ্ধিবৃত্তিরও বিচার করে থাকেন। ফলে, আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার অভিমানে নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিকে শ্রেষ্ঠ এবং অশ্বেতকায়দের নিকৃষ্ট গণ্য করে অনেক শ্বেতকায় এখনও অহম্পূর্বিকা মনোভাব পোষণ করে থাকেন। সভ্যতার অগ্রগতির মাপকাঠি দিয়ে জাতিগতভাবে বুদ্ধিবৃত্তির বিচার করতে গেলে মতদ্বৈধ দেখা দেবে পৃথিবীর বিভিন্ন সময়ের সভ্যতার মান নিরূপণে। বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর ইতিহাসে যে সব সভ্যতার উন্নতি ও অবনতি ঘটেছে তাদের প্রত্যেকটিই ইতিহাসের এক একটি বিশেষ অধ্যায়ে তাৎপর্যপূর্ণ ও স্বকীয় মর্যাদাসম্পন্ন। কোনও একটি সভ্যতা সর্বকালের জন্যে কখনও কোনও স্থায়ী আসন অধিকার করে থাকতে পারে নি; কৃষ্টি ও সংস্কৃতির রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতারও পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন সময়ে সভ্যতার যে উত্থান-পতন পরিলক্ষিত হয়েছে তার জন্যে কোনও বিশেষ সময়ে কেবল একটি জাতি সব গৌরব বা অগৌরবের অধিকারী হতে পারে না। ঘটনাচক্রে শ্বেত-প্রভুত্বের সঙ্গে আধুনিক যান্ত্রিক যুগের একটা যোগাযোগ বর্তমান কালে লক্ষ্য করা গেলেও মানুষের গায়ের রং বা নাকের আকৃতির দ্বারা কখনও মানবসভ্যতার ইতিহাস প্রভাবান্বিত হয় নি। বৈজ্ঞানিক বিচারে বিভিন্ন জাতির শারীরিক গঠনের সঙ্গে সভ্যতার যোগাযোগের কোনও সূত্র এখনও খুঁজে পাওয়া যায় নি।

কোনও বিশেষ জাতির অন্তর্ভুক্ত হলেই বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে যে কেউ শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত হবে, এরূপ ধারণার সমর্থনে কোনও বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ পাওয়া যায় নি। প্রত্যেক জাতির বা মানবগোষ্ঠীর মধ্যেই যেমন অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি আছেন তেমনি বেশ কিছু সংখ্যক নির্বোধ ব্যক্তিও যে নেই তা নয়। ভাল-মন্দ, বুদ্ধিমান-নির্বোধ ইত্যাদি প্রায় সব রকমের মানুষই বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে আছে। কোনও একটি বিশেষ জাতি কখনও পৃথিবীর 'সবকিছু ভাল'র একচেটিয়া অধিকারী হতে পারে না।

মানুষের বুদ্ধি বা মানসিক সামর্থ্য পরিমাপের

জন্যে কতকগুলি পরীক্ষা প্রচলিত আছে। এই পরীক্ষার সাহায্যে কারও বুদ্ধি বা মানসিক সামর্থ্যের যে মান নির্ণয় করা হয় তাকে মনীষিতাঙ্ক বলে। মনীষিতাঙ্ক নিরূপণের যে সব পদ্ধতি প্রচলিত আছে সেগুলি সম্বন্ধে মতভেদ আছে এবং মনীষিতাঙ্কের দ্বারা বুদ্ধির মান নির্ণয় করা যায় না, এরূপ ধারণাও পোষণ করা হয়ে থাকে। যাহোক, মনীষিতাঙ্ক নিরূপণের প্রচলিত পদ্ধতির সাহায্যে যে সব পরীক্ষা আজ পর্যন্ত করা হয়েছে সেগুলির ভিত্তিতেই এখনও জাতি ও বুদ্ধিবৃত্তির সম্পর্ক নির্ণীত হয়ে থাকে।

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিবৃদ্ধি নির্ভর করে বংশগতি ও পরিবেশের উপর। বংশগতি ও পরিবেশ, এই দুটির কোন্‌টি বুদ্ধিবৃত্তির বিবৃদ্ধির উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করে, সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না। তবে একথা নিশ্চয় করে বলা চলে যে, বংশগতি ও পরিবেশ, উভয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। যেমন, কোনও গরুর যতই দুধ দেবার ক্ষমতা থাকুক না কেন তাকে যদি সুচারুরূপে প্রতিপালন না করা হয় তাহলে তার কাছ থেকে কখনই আশানুরূপ পরিমাণে দুধ পাওয়া যাবে না। যদি গরুর দুধ দেবার ক্ষমতাকে বংশগত গুণ এবং প্রতিপালনের ব্যবস্থাকে পরিবেশ বলে ধরা হয় তাহলে যে কোনও জীবের যে কোনও গুণের পরিবৃদ্ধিলাভের সঙ্গে বংশগতি ও পরিবেশের সম্বন্ধ সম্পর্কে ধারণা করা যাবে।

যদি কোনও দুটি গোষ্ঠীর মানুষের মনীষিতাঙ্ক তুলনামূলকভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয় তাহলে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে অসুবিধা দেখা দেবে সামাজিক ব্যবস্থা, শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতি পরিবেশজনিত অবস্থার পার্থক্য নিয়ে। কারণ পরিবেশজনিত অবস্থা যদি গোষ্ঠী দুটির সমান না হয় তাহলে মনীষিতাঙ্কে যে পার্থক্য দেখা যাবে, সেটা কেবল উত্তরলব্ধ মনীষার বৈষম্যের জন্যে বলে গণ্য করা যেতে পারে না।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদের বুদ্ধিবৃত্তি পরিমাপের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তখন দেখা গিয়েছিল যে, বুদ্ধির মানে উত্তর আমেরিকার অনেক নিগ্রো দক্ষিণ আমেরিকার শ্বেতকায় ও নিগ্রোদের তুলনায় উপরিস্থ। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উত্তর আমেরিকায় নিগ্রোদের স্বাভাবিক জীবনযাপনে বাধাবিপত্তির মাত্রা দক্ষিণ আমেরিকার তুলনা অপেক্ষাকৃত কম। এরূপ দেখা গেছে যে, দক্ষিণ আমেরিকায় টেনেসির গ্রামাঞ্চলে নিগ্রো ছেলেমেয়েদের গড় মনীষিতাঙ্ক ৫৮ অথচ লস্ এঞ্জেল্‌স্‌, ক্যালিফোর্ণিয়া মহানগরীতে নিগ্রো ছেলেমেয়েদের গড় মনীষিতাঙ্ক হয়েছে ১০৫। এ পর্যন্ত পরীক্ষিত অধিক মনীষাসম্পন্ন শিশুদের মধ্যে একটি নয় বছরের নিগ্রো বালিকার মনীষিতাঙ্ক ২০০ নির্ণীত হয়েছে। ঐ বয়সে এরূপ মনীষিতাঙ্ক খুব কমই দেখা যায়। এথেকে বোঝা যায় যে, নিগ্রোদের মনীষিতাঙ্ক শ্বেতকায়দের সমান হয় এবং অনেকক্ষেত্রে বেশীও হয়ে থাকে।

উক্ত উদাহরণগুলি এবং আরও কতকগুলি পরীক্ষালব্ধ ফলাফল থেকে জানা যায় নি যে, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিতে কোনও সহজাত জাতিগত বৈষম্য আছে। কোনও জাতির অন্তর্ভুক্তি বুদ্ধিবৃত্তির নির্ণায়ক না হলেও একথা উল্লেখযোগ্য যে, মনীষিতাঙ্কের সাহায্যে সহজাত বা বংশগত মনীষা সঠিকভাবে যাচাই করে দেখা সম্ভব নয়। পরিবেশজনিত পার্থক্য যদি বৃহদাকারের না হয় তাহলে মনীষিতাঙ্কের তারতম্যের বিস্তৃতি অস্বাভাবিকভাবে বেশী হতে সাধারণতঃ দেখা যায় না। শ্বেতকায়, অশ্বেতকায় অথবা অন্য কোনও মানবগোষ্ঠী যদি উন্নত ধরণের অর্থনীতিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে থাকে তাহলে ঐ গোষ্ঠীর গড় মনীষিতাঙ্ক উপরিস্থ হবে। বিপরীতক্রমে, যদি অর্থনীতিক ও শিক্ষাব্যবস্থা উন্নত ধরণের না হয় তাহলে গড় মনীষিতাঙ্ক অবশ্যই নিম্নস্থ হবে।

মানুষে মানুষে পার্থক্য আছে এবং সেই

পার্থক্যকে সর্বোপরি গণ্য করে জাতিগত উৎকর্ষের দাবী যথার্থভাবে করা চলতে পারে না। মানুষে মানুষে যে পার্থক্য আছে সেটা চিরকালই থাকবে এবং ঐ পার্থক্যের সুযোগ নিয়ে একজন অপর-জনকে হীন প্রতিপন্ন করতে পারে না। ইউনেস্কোর জাতিসম্পর্কিত একটি বিবৃতিতে (সেপ্টেম্বর, ১৯৫২) বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন মানবজাতির মধ্যে যে সব পার্থক্য দেখা যায় সেগুলির সাহায্যে কখনই অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত জাতিগত অসাম্যের মতবাদ সমর্থন করা যায় না এবং মানবীয় নীতিগত উদ্দেশ্যসমূহের জন্যে আমাদের জ্ঞাত সর্বপ্রকার পার্থক্যই উপেক্ষিত হতে পারে।

ইউনেস্কোর জাতিসম্পর্কিত আরেকটি বিবৃতিতে (১৮ই জুলাই, ১৯৫০) বলা হয়েছে যে, জৈব ও সামাজিক উভয় দিক থেকেই মানবজাতির একত্বই হচ্ছে প্রধান জিনিষ। এটা স্বীকার করা এবং তদনুযায়ী চলাই হচ্ছে আধুনিক মানুষের প্রথম কর্তব্য।

আমাদের জ্বালানী-সমস্যা

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

সভ্যতার প্রথম যুগে মানুষ যখন প্রথম আগুন জ্বালাতে শিখেছে তখন থেকেই জ্বালানী হিসাবে কাঠের ব্যবহার চলে আসছে। পল্লীঅঞ্চল বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ; কাজেই গ্রামবাসী মানুষকে আজও জ্বালানীর জন্যে একান্তভাবে কাঠের উপরই নির্ভর করতে হয়। যে সব দেশে শক্তি উৎপাদনের অন্যান্য উৎস নেই, শক্তি উৎপাদনের জন্যে তাদের প্রধানতঃ কাঠের উপর নির্ভর করতে হয়। সে সব দেশে কাঠ-কয়লার সাহায্যে মোটর গাড়ী, লরী প্রভৃতি চালাবার ব্যবস্থা চালু করবার জোর চেষ্টা চলছে। গত যুদ্ধের সময় আমাদের দেশে যখন পেট্রোলের খুব অভাব হয়েছিল তখন এরূপ অনেক মোটর গাড়ী কলকাতার রাস্তায় দেখা যেত।

জ্বালানী-কাঠ উৎপাদনের দিক দিয়ে সোভিয়েট রাশিয়ার স্থান সবার উপরে; তারপর ক্যানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, উত্তর রোডেসিয়া এবং নাই-জিরিয়ার বনজ সম্পদও মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। নীচের তালিকা থেকে বিভিন্ন দেশের বনভূমির বিস্তার সম্পর্কে একটা ধারণা করা যাবে।

১নং তালিকা।

বিভিন্ন দেশে বনভূমির বিস্তার

দেশ	বনভূমির বিস্তার
সোভিয়েট রাশিয়া	১৫০ কোটি একর
ক্যানাডা	৭৪ " "
যুক্তরাষ্ট্র	৬০ " "
ভারত	১৮ " "
উত্তর রোডেসিয়া	১১ " "
নাইজিরিয়া	১০ " "

কাঠে কার্বনের পরিমাণ শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ, আর জলের ভাগ খুবই বেশী—শতকরা ৬০ ভাগ পর্যন্ত হওয়া সম্ভব। এক পাউণ্ড কাঠ থেকে ৮,০০০ বি. টি. ইউ. (এক পাউণ্ড জলের উষ্ণতা ১° ফারেনহাইট বাড়াতে হলে যে পরিমাণ তাপশক্তির প্রয়োজন হয় তাই বৃটিশ তাপীয় একক, British Thermal unit—২৫২ ক্যালরি) তাপশক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু কাঠের দহনকালে ঐ জল বাষ্পীভূত হয় বলে প্রচুর তাপের অপচয় ঘটে। এজন্যে খুব শুকনো কাঠ পুড়িয়ে মাত্র ৮০০°-৯০০°

সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় পৌছানো যায়। কাজেই শিল্পে কাঠ ব্যবহারের বিশেষ সার্থকতা নেই।

সভ্যজগতের একটা প্রধান জ্বালানী হলো কয়লা। সভ্যতার অতি প্রাচীন যুগ থেকেই কয়লার ব্যবহার জানা ছিল। তবে তখনকার দিনে গৃহস্থালীর কাজে জ্বালানী হিসাবে এবং কামারের কাজেই প্রধানতঃ কয়লার ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল। সভ্যতার ইতিহাসে কয়লা একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে মাত্র সেদিন, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে। অতি অল্পদিনের মধ্যেই কয়লা যে জ্বালানী হিসাবে শীর্ষ স্থান অধিকার করলো তার প্রধান কারণ তিনটি—

(১) সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বনভূমি বিনাশের ফলে বনজ সম্পদের ক্রমাবনতি এবং সেজন্যে জ্বালানী-কাঠের অভাব;

(২) খনিজ থেকে লৌহ নিষ্কাশনে কাঠ-কয়লার পরিবর্তে খনিজ কয়লা ব্যবহারের প্রচলন;

(৩) ১৭৮২ সালে জেম্‌স্ ওয়াট কর্তৃক বাষ্পীয় এঞ্জিনের আবিষ্কার।

এর মধ্যে শেষোক্ত কারণ দুটিই কয়লার ব্যবহার প্রসারের জন্যে প্রধানতঃ দায়ী। লৌহ নিষ্কাশন সহজ হওয়ায় লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন অনেক বেড়ে যায় এবং অল্প দিনের মধ্যেই মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এগুলি সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করে। বাষ্পীয় এঞ্জিনের সাহায্যে ক্রমে কল-কারখানা, রেলগাড়ী, ষ্টীমার, জাহাজ প্রভৃতি চালাবার ব্যবস্থা হয়। সেই থেকে সুরু হলো যান্ত্রিক যুগ, আর কয়লা হলো সে সব যন্ত্রের সর্বপ্রধান জ্বালানী।

অর্থনীতিক দিক দিয়ে বিচার করলে তাপশক্তি উৎপাদনের জন্যে আজও কয়লাই শ্রেষ্ঠ উপাদান। এজন্যে শিল্প প্রয়োজনে আজও কয়লার চাহিদাই সবচেয়ে বেশী। এক পাউণ্ড কয়লা থেকে ১৩,০০০-১৪,০০০ বি. টি. ইউ. তাপশক্তি পাওয়া যায়, অর্থাৎ সমপরিমাণ কাঠের চেয়ে প্রায় ৫০০০ বি. টি. ইউ. বেশী। তাপ উৎপাদিকা শক্তি অনেক বেশী বলেই শিল্পে কাঠের চেয়ে কয়লার চাহিদা অনেক বেশী।

বাষ্পীয় এঞ্জিন চালাতে হলে কয়লা ও জল দরকার। কয়লার দহনের ফলে পাওয়া যায় তাপ এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস। এই তাপের সাহায্যে বয়লারের জল বাষ্পে পরিণত হয় এবং বাষ্পের শক্তি এঞ্জিনের চাকা ঘোরায়। বাষ্পীয় এঞ্জিনের সাহায্যে এভাবে রাসায়নিক শক্তি থেকে তাপশক্তি এবং তাথেকে যান্ত্রিক শক্তি পাওয়া যায়। এই শক্তির সাহায্যে ভারী জিনিষ তোলা, কল-কারখানা, রেলগাড়ী জাহাজ ইত্যাদি চালানো অথবা বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন সম্ভব হয়।

আবদ্ধ লোহার পাত্রে কয়লা নিয়ে তাতে উত্তাপ দিলে পাওয়া যায় কয়লা-গ্যাস, অ্যামোনিয়া, আল্‌কাতরা ইত্যাদি, আর পাত্রে যা পড়ে থাকে তার নাম কোক বা জ্বালানী কয়লা। কোক থেকে ধোঁয়া কম হয় বলে গৃহস্থালীর কাজে এবং কতকগুলি শিল্পে একে ব্যবহার করা হয়। বায়ুশূন্য অবস্থায় তাপ দিলে কাঠ থেকে কাঠ-কয়লার সৃষ্টি হয়। কোকের মত একেও বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহার করা চলে।

কঠিন পদার্থ বলে যন্ত্রে কয়লা সরবরাহ করা এবং তাথেকে তাপ উৎপাদন ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন সমস্যা। কয়লার উনুন ধরানোর তুলনায় কেরোসিনের স্টোভ অথবা গ্যাসের উনুন ধরানো যে অনেক সহজ এবং অল্প সময় সাপেক্ষ, একথা সবাই জানে। বাষ্পীয় এঞ্জিনে বয়লারের জল গরম করতেই প্রচুর তাপশক্তি ব্যয় হয় এবং অনেক সময় লাগে। কাজেই এঞ্জিন চালু রাখতে হলে তাকে কখনও ঠাণ্ডা হতে দিলে চলে না। কয়লা সরবরাহ করে বয়লার সব সময় গরম রাখতে হয়। এজন্যে এঞ্জিন যখন কোন কাজ করে না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, তখনও তাতে প্রচুর তাপশক্তির অপচয় ঘটে। কয়লার উনুন যখন প্রথম ধরানো হয় তখন তার আঁচ থাকে খুব বেশী,

কিন্তু কয়লা যত পোড়ে আঁচও তত ধীরে ধীরে কমতে থাকে। বয়লারের চুল্লীতেও কিছুক্ষণ পর পর কয়লা দেওয়া হয় বলে তাপমাত্রা ঠিক থাকে না, কখনও বেশী আবার কখনও কম হয়। কয়লার আর একটা অসুবিধা এই যে, এ অত্যন্ত কালো এবং নোংরা। তাছাড়া কয়লা ব্যবহারের ফলে প্রচুর ধোঁয়া বেরিয়ে শহর ও শিল্পাঞ্চলের আবহাওয়া দূষিত করে দেয়। এজন্যে শিল্পাঞ্চলে যক্ষ্মা-রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। কয়লা থেকে মোট যতটা তাপশক্তি উৎপাদিত হয় তার শতকরা ১০।১৫ ভাগ কার্যকরী হয়, বাকী অংশের কিছুটা ধোঁয়ার সঙ্গে বেরোয়, আর কিছুটা নষ্ট হয় বিকিরণ প্রক্রিয়ায়। কয়লা থেকে প্রচুর ছাই উৎপন্ন হয়; কাজেই ছাইয়ের সঙ্গেও কিছুটা তাপশক্তির অপচয় ঘটে। এসব কারণে আজকাল ধোঁয়াশূন্য জ্বালানীর দিকেই মানুষের ঝোঁক পড়েছে বেশী। কিন্তু সেগুলি উৎপাদন করতে হলেও চাই কয়লা। তাছাড়া এখনও কয়লাই সব চেয়ে সহজ-লভ্য ও সস্তা জ্বালানী। তাই এখনও কয়লা ছাড়া কোন বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানই চালু রাখা সম্ভব নয়।

কয়লা উৎপাদনের দিক দিয়ে সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য হলো যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জার্মেনী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কি পরিমাণ কয়লা উৎপাদন করা হয় তার একটা হিসাব পাওয়া যাবে নীচের তালিকা থেকে।

২নং তালিকা।

প্রধান কয়লাপ্রসূ দেশগুলিতে কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ

(লক্ষ মেট্রিক টন হিসাবে)

দেশ	১৯৪২	১৯৪৪	১৯৪৭	১৯৪৮
যুক্তরাষ্ট্র	৫৮৩৩	৬১৯৯	৬২৪০	৬৪১২
যুক্তরাজ্য	২০৮২	১৯৫৮	২০৩০	২১০৮
জার্মেনী (সার রাজ্যসহ)	৩১৩৮	১৮৬৬	১২১৪	......
রাশিয়া	......	......	১৭৫০	......
পোল্যাণ্ড	.....	......	৬০২	......
ফ্রান্স	৪২৫	২৫৭	৪৫৯	৪৩৯
চেকোশ্লোভাকিয়া	৩৭০	৩৯০	২৯৫	৩১৬
বেলজিয়াম	২৫১	১৩৫	২৪৪	২৬৭
নেদারল্যাণ্ডস্	১২৪	৮৪	১০৩	১১০
দক্ষিণ আফ্রিকা	২০৪	২৩০	২৩১	....
ক্যানাডা	১৬৭	১৫০	১২৬	১৬২
জাপান	৫৫২	৫০৮	২৮১	......
চীন	৪১২	৩৭০	২০০	.....

সমগ্র পৃথিবীর মজুত কয়লা সম্পর্কে একটা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৩ সালে। এতে অনুমান করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে সব রকম কয়লার মোট পরিমাণ হলো প্রায় ৭৪,০০০ কোটি মেট্রিক টন, অর্থাৎ বর্তমানে যে হারে কয়লা খরচ হচ্ছে তার প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার গুণ। মজুত কয়লার শতকরা ৫১.৮ ভাগ আছে যুক্তরাষ্ট্রে, ১৬.৭ ভাগ ক্যানাডায়, ১৩.৫ ভাগ চীনে, ৫.৭ ভাগ জার্মেনীতে, ২.৬ ভাগ গ্রেট বৃটেনে, ২.৩ ভাগ সাইবেরিয়ায় এবং ২.১২ ভাগ অষ্ট্রেলিয়ায়। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে কয়লার পরিমাণ খুবই কম। আর দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকায় কয়লা একরূপ নেই বললেই চলে।

ভারতের সম্ভাব্য মজুত কয়লা সম্পর্কে একটি আন্দাজ করেছিলেন ডাঃ ফক্স ১৯৩৪ সালে। এই হিসাব মত ভারতে গণ্ডোয়ানা যুগের কয়লার পরিমাণ প্রায় ২,০০০ কোটি টন। এ ছাড়া নিম্ন মানের কয়লা আছে আরও প্রায় ১,০০০ কোটি টন। এর মধ্যে কোক উৎপাদনের কয়লার পরিমাণ হলো প্রায় ২০০ কোটি টন। ভারতে প্রতি বছর কি পরিমাণ কয়লা উত্তোলন করা হয় তার একটা হিসাব পাওয়া যাবে নীচের তালিকা থেকে।

৩নং তালিকা।

ভারতে কয়লার উৎপাদন

সন	ওজন (টন)	মূল্য (টাকা)
১৯৪৭	৩,০১,৪৪,৫০৫	৪৩,৭৭,২০,২৪৫

১৯৪৮	৩,০১,২৪,১৭৫	৪৫,২০,৫৬,৪৭৪
১৯৪৯	৩,১৬,৯৫,৩৭৫	৪৭,৫৬,৩৬,৯২১
১৯৫০	৩,২৩,০৭,৬৮১	?

কয়লার পর এল পেট্রোলিয়ামের যুগ। পেট্রোলিয়াম-শিল্পের সূচনা হলো বলতে গেলে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে, যখন বিজ্ঞানী ড্রেক টিটুস্‌ভিলাতে সর্বপ্রথম তৈলকূপ খনন করেন। মাত্র সত্তর ফুট খুঁড়েই তেল পাওয়া গেল এবং দেখতে দেখতে টিটুস্‌ভিলা একটি বিখ্যাত তৈল-ক্ষেত্রে পরিণত হলো। খনিজ পেট্রোলিয়াম শোধন করে বিভিন্ন উপাদানগুলি বাজারে ছাড়বার পর সভ্যজগতে এসব জিনিষের খুব চাহিদা হলো। বিজ্ঞানীরা নানাদেশে পেট্রোলিয়ামের সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। অনেক তৈল-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো। এর ফলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই তৈল-শিল্প এত বেশী প্রসার লাভ করেছে যে, ১৯৪৮ সালে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই পেট্রোলিয়াম উত্তোলন করা হয়েছে ২০০ কোটি ব্যারেল, আর সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় ৩৫০ কোটি ব্যারেল।

খনিজ তেল থেকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় পেট্রোল, কেরোসিন, ডিজেল তেল ইত্যাদি পাওয়া যায়। পেট্রোলের সাহায্যে মোটর গাড়ী, এরোপ্লেন ইত্যাদির এঞ্জিন চালানো হয়। কেরোসিন ব্যবহার হয় তাপ এবং আলোক উৎপাদনের উদ্দেশ্যে। ডিজেল তেলের সাহায্যে নানারকম ডিজেল এঞ্জিন চালানো হয়। প্রতি পাউণ্ড জ্বালানী-তেল থেকে তাপশক্তি পাওয়া যায় ১৮,০০০-২০,০০০ বি. টি. ইউ.।

এসব তরল জ্বালানী ব্যবহারের কতকগুলি সুবিধা আছে। এদের তাপ উৎপাদিকা শক্তি বেশী। তাছাড়া এদের এঞ্জিনের কাছে সঞ্চয় করে রাখা যায় এবং নলের মুখ খুলে বা বন্ধ করে তেলের সরবরাহ ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এক্ষেত্রে উৎপন্ন তাপের অধিকাংশই কাজে লাগানো যায়। ধোঁয়া বা ছাই ইত্যাদি কোন অবাঞ্ছিত পদার্থ উৎপন্ন হয় না। তেল-চালিত এঞ্জিন যখন তখন ইচ্ছামত চালু করা যায় বলে গাড়ী যখন দাঁড়িয়ে থাকে তখন এঞ্জিন বন্ধ রাখা হয়। এসব কারণে তাপশক্তির বিশেষ অপচয় হয় না। তাই আজকাল কয়লার বদলে জ্বালানী-তেলের চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে। তবে জ্বালানী-তেলের ব্যবহারের সুবিধা যেমন বেশী, খরচাও তেমনি বেশী; কারণ কয়লার তুলনায় তেলের দাম অনেক বেশী। কাজেই ছোট-খাটো শিল্পে, যন্ত্র বা যানবাহনে তেলের বহুল ব্যবহার হলেও রেল গাড়ী, জাহাজ বা বড় বড় কারখানায় তেলের ব্যবহার লাভজনক হয় না। তাছাড়া যে সব দেশে পেট্রোলিয়াম যথেষ্ট নেই, তাদের অন্যান্য তৈলপ্রসূ দেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। এটাও কম অসুবিধা নয়।

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, হল্যাণ্ড এবং রাশিয়ার অন্তর্গত অঞ্চলসমূহেই পৃথিবীর প্রধান তৈলখনিগুলি অবস্থিত। এসব রাষ্ট্রের অধীনস্থ খনি থেকে ভবিষ্যতে কি পরিমাণ তেল পাওয়া সম্ভব তার একটা হিসাব প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে। নীচে সেই তালিকা দেওয়া হলো।

৪নং তালিকা

বিভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্গত খনিগুলিতে সম্ভাব্য মজুত পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ

তৈলপ্রসূ অঞ্চল	তেলের পরিমাণ (লক্ষ ব্যারেল হিসাবে)	সম্ভাব্য মজুতের কত অংশ (শতকরা হিসাবে)
(১) যুক্তরাষ্ট্রের অধীন—	৪,৩০,৯৫০	৬০·৪
(২) বৃটিশ ও ওলন্দাজ অধিকৃত—	১,৮৭,৩৫০	২৬·৩
(৩) রাশিয়ার অধীন—	৬০,০০০	৮·৪
(৪) অন্যান্য রাষ্ট্রের অধীন—	৩৪,৮২০	৪·৯
মোট	৭,১৩,২২০	১০০·০

যে সব দেশে খনিজ পেট্রোলিয়াম বেশী নেই, কিংবা প্রয়োজনের তুলনায় পেট্রোলিয়ামের সরবরাহ খুবই কম, তাদের উপায় কি? এই সমস্যা মেটাবার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা কয়লা থেকে জ্বালানী-তেল প্রস্তুতের দুটি উপায় উদ্ভাবন করেছেন। সর্বপ্রথম জার্মান বিজ্ঞানী বার্জিয়াস কয়লাকে হাইড্রোজেনায়িত করে কৃত্রিম জ্বালানী-তেল প্রস্তুত করেন। এর পর জার্মেনীতে ফিশার ও ট্রপ্‌স্‌ আর একটি প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করেন। এতে প্রথমে উত্তপ্ত কয়লা ও জলীয় বাষ্পের ক্রিয়ায় 'জল-গ্যাস' প্রস্তুত করা হয়। একে স্পর্শকের সহযোগিতায় হাইড্রোজেনায়িত করে পাওয়া যায় কৃত্রিম তেল। জার্মান বিজ্ঞানীদের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরাও কৃত্রিম জ্বালানী-তেল প্রস্তুতের চেষ্টায় মনোযোগী হয়েছেন। এ বিষয়ে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার অগ্রগতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতে পেট্রোলিয়ামের একান্ত অভাব। আসামের ডিগ্‌বয় এবং অন্যান্য খনিগুলি থেকে বছরে গড়ে প্রায় ১৫ লক্ষ ব্যারেল তেল পাওয়া যায়। সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদনের তুলনায় এই এই তেলের পরিমাণ একেবারেই নগণ্য। আমাদের দেশের যা প্রয়োজন তার শতকরা প্রায় সাতভাগ মাত্র পাওয়া যায় ডিগ্‌বয়ের খনি থেকে। প্রায় ৭৫ ভাগ আমদানী করা হয় ইরান থেকে, আর অবশিষ্ট অংশ আসে পৃথিবীর অন্যান্য তৈলপ্রসূ দেশ থেকে। ভারতে পেট্রোলিয়ামের অভাব থাকলেও এখানকার কয়লাসম্পদ মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। তাই এদেশের বিজ্ঞানীরা কয়লা থেকে কৃত্রিম তেল প্রস্তুতের সম্ভাব্য উপায়গুলি সব বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনা করে দেখছেন। এজন্যে বছরে তিন লক্ষ টন কৃত্রিম পেট্রোল উৎপাদনের উপযোগী একটি কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ভূগর্ভে পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে প্রচুর দাহ্য গ্যাস থাকে। তৈল-আহরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলি আগেকার দিনে এই মূল্যবান জ্বালানী সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। আজকাল সবরকম জ্বালানী সম্পর্কেই আমরা সচেতন হয়েছি; কাজেই প্রকৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত কোন সম্পদেরই অপচয় হতে দিতে রাজী নই। তাই মূল্যবান দাহ্য গ্যাস সদ্ব্যবহারের জন্যেও সর্ববিধ চেষ্টা চলছে।

তৈলক্ষেত্রের এঞ্জিন, বয়লার ইত্যাদি চালু রাখবার জন্যে কয়লা, পেট্রোল বা কয়লা-গ্যাসের বদলে এই গ্যাস জ্বালানো অধিকতর লাভজনক। তাছাড়া চাপ ও শৈত্যের প্রভাবে এই গ্যাসের খানিকটা অংশ তরল অবস্থায় পরিণত করা যায়। এর চলতি নাম 'মোটর স্পিরিট'। অত্যন্ত উদ্বায়ী বলে একে অপেক্ষাকৃত অনুদ্বায়ী তেলের সঙ্গে মিশিয়ে মোটরের জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই ভাবে দেশের জ্বালানী-সম্পদের পরিমাণ অনেকখানি বাড়ানো সম্ভব হয়েছে।

১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ক্লেটন অন্তর্ধূম পাতন প্রক্রিয়ায় কয়লা থেকে কয়লা-গ্যাস উৎপাদন করেন এবং আলো জ্বালাবার কাজে এই গ্যাসের ব্যবহার প্রচলন করেন বিজ্ঞানী মার্ডক ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে। সেই থেকে আলো জ্বালাবার কাজে, বুনসেন দীপ বা গ্যাসের চুল্লী জ্বালাবার কাজে এই গ্যাসের ব্যবহার চলে আসছে।

জ্বালানীর সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ এবং জ্বালানীর সদ্ব্যবহারের কথা বিবেচনা করলে বলতে হয় যে, দাহ্য গ্যাসই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্বালানী। তাছাড়া এতে ধোঁয়া হয় না একটুও। কিন্তু অন্যান্য জ্বালানীর তুলনায় এরই দাম সব চেয়ে বেশী। দাম বেশী হলেও দৈনন্দিন জীবনে কোক, কয়লা-গ্যাস প্রভৃতি ধোঁয়াশূন্য জ্বালানী ব্যবহারের দিকেই মানুষের ঝোঁক ক্রমশঃ বেশী হচ্ছে। তবে মোটর গাড়ী, এরোপ্লেন প্রভৃতি

চালাতে গ্যাস ব্যবহার করা সম্ভব নয়; তাই ঐ সব প্রয়োজনে আজও তেলই অপরিহার্য জ্বালানী। আমাদের পরিচিত জ্বালানীগুলির কোন্‌টি থেকে কি পরিমাণ তাপশক্তি পাওয়া সম্ভব তা নীচের তালিকা থেকে সহজেই বোঝা যাবে।

৫নং তালিকা

বিভিন্ন রকম জ্বালানী থেকে উৎপাদিত তাপশক্তির পরিমাপ

জ্বালানী	তাপশক্তির পরিমাপ
(ক) কঠিন :	
(১) কাঠ	৮,০০০ বি.টি.ইউ প্রতি পাউণ্ড থেকে
(২) কাঠ কয়লা বা কোক	১২,৫০০ „ „
(৩) কয়লা (অ্যান্‌থ্রাসাইট বা বিটুমিনাস)	১৩,০০০ থেকে ১৪,০০০ পর্যন্ত „ „
(খ) তরল :	
(৪) খনিজ তেল (পেট্রোল, কেরোসিন ইত্যাদি)	১৮,০০০ থেকে „ „ ২০,০০০ পর্যন্ত
(গ) গ্যাসীয় :	
(৫) প্রাকৃতিক দাহ্য-গ্যাস	১,০৭৫ বি.টি.ইউ প্রতি ঘনফুট থেকে
(৬) কয়লা-গ্যাস	৫৬৬ „ „
(৭) জল-গ্যাস	৩০০ „ „
(৮) প্রডিউসার গ্যাস	১৪২ „ „

লোহিত-তপ্ত কোক বা কাঠ-কয়লার ভিতর দিয়ে বাষ্প পরিচালনা করলে যে কার্বন মনোক্সাইড এবং হাইড্রোজেন গ্যাসের মিশ্রণ পাওয়া যায় তার নাম জল-গ্যাস। এই গ্যাসও জ্বালানী হিসাবে খুবই মূল্যবান।

শ্বেত-তপ্ত কোক বা কাঠ-কয়লার ভিতর দিয়ে পরিমাণমত বায়ু পরিচালনা করলে পাওয়া যায় প্রডিউসার গ্যাস। এর উৎপাদন অপেক্ষাকৃত সহজ। এই গ্যাস তৈরী করে বড় বড় আধারে সঞ্চয় করে রাখা যায় এবং নলের চাবি খুলে এর সরবরাহ ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এজন্যে অনেক গ্যাস-এঞ্জিনে এবং ধাতু-নিষ্কাশনশিল্পে এই গ্যাস বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধের সময় আমাদের দেশে এই গ্যাসের সাহায্যে মোটর-গাড়ী চালাবার পরিকল্পনা অনেকটা সফল হয়েছিল। তবে গাড়ীর মধ্যে এই গ্যাসের উৎপাদন এবং ব্যবহারের নানা অসুবিধা আছে। তাছাড়া এই গ্যাস ব্যবহারে এঞ্জিনের আয়ুও কমে যায়। এজন্যে যুদ্ধের শেষে পেট্রোলের সরবরাহ স্বাভাবিক হওয়া মাত্র এই পরিকল্পনা বাতিল হয়ে গেছে।

গত পঞ্চাশ বছরে শক্তি উৎপাদনে বিভিন্ন উৎসের ব্যবহারে কিরূপ তারতম্য হয়েছে তার একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে নীচের তালিকা থেকে।

৬নং তালিকা। শক্তি উৎপাদনে বিভিন্ন উৎসের স্থান—

(শতকরা হিসাবে)

সন	কয়লা	খনিজ তেল	প্রাকৃতিক দাহ্য গ্যাস	জ্বালানী কাঠ	জলপ্রবাহ থেকে আহরিত শক্তি
১৯১৩	৭৪.১	৪.৫	১.৫	১৭.৬	২.৪
১৯৩৫	৬০.৩	১৬.৫	৩.৮	১২.৮	৬.৬
১৯৪৮	৫৪.৮	২৪.৬	৭.৩	৭.২	৬.১

উপরের তালিকায় একটা জিনিষ সহজেই নজরে পড়বে যে, শক্তি উৎপাদনে আজও কয়লাই সবচেয়ে উঁচু আসন দখল করে আছে, যদিও কয়লার ব্যবহার ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ খনিজ তেল এবং প্রাকৃতিক দাহ্য গ্যাসের ব্যবহার এখন আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে।

কিন্তু হিসাবে দেখা যায় যে, পৃথিবীর পেট্রোলিয়াম সম্পদ অদূর ভবিষ্যতেই নিঃশেষিত হয়ে যাবে। তখন মানুষকে শক্তি-উৎপাদনের জন্যে আবার একান্তভাবে কয়লার উপরই নির্ভর করতে হবে। এই শিল্পের প্রয়োজনে কাঠের চাহিদা একরূপ নেই বললেই চলে। নানারূপ অসুবিধা থাকায় গৃহস্থালীর উনুনেও কাঠের ব্যবহার ক্রমশঃ কমে আসছে। তাছাড়া সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি দেশেই বনভূমির আয়তনও ক্রমশঃ কমে আসছে। কাজেই জ্বালানী হিসাবে কাঠের ব্যবহার যে আবার কোন দিন বাড়বে তা মনে হয় না।

প্রকৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত জ্বালানী-সম্পদগুলি ক্রমশঃ নিঃশেষিত হয়ে আসছে দেখে শঙ্কান্বিত বিজ্ঞানীরা শক্তির নতুন নতুন উৎসের সন্ধানে উঠে-পড়ে লেগেছেন। এর ফলে বর্তমান যুগে জল-প্রবাহ থেকে আহরিত শক্তি বিজ্ঞানীদের কাছে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। উপরের তালিকায় দেখা যাবে যে, এভাবে আহরিত শক্তির পরিমাণ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে এই জাতীয় শক্তি মানব-জীবনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে। স্বাধীনতার পর থেকে ভারত সরকারও এবিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠেছেন। বর্তমানে মোট ১৬০টি নদী-পরিকল্পনা ভারত সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এর কতকগুলি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং কতকগুলির কাজ আরম্ভ হয়েছে। কতকগুলির প্রাথমিক অনুসন্ধান কার্য সুরু হয়েছে; আর কতকগুলির রূপায়ণ করা আদৌ সম্ভব হবে কিনা তাই বিচার-বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে। এই সবগুলি পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ করতে হলে মোট ব্যয় হবে প্রায় ১,৯০০ কোটি টাকা। এর ফলে প্রায় ২৫০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হবে, আর জল-বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে প্রায় এক কোটি কিলোওয়াট। এবিষয়ে অন্যান্য দেশের তুলনায় তখন ভারতের স্থান হবে তৃতীয়, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়ার পরেই। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে জল-বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন ৬৫৭.৫ কোটি ইউনিট (১৯৫০-৫১) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১১০০ কোটি ইউনিট (১৯৫৫-৫৬) দাঁড়িয়েছে। ১৯৫৫-৫৬ সাল থেকে ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়িত হলে আশা করা যায় যে, জল-বিদ্যুৎ-শক্তির পরিমাণ ১১০০ কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২২০০ কোটি ইউনিটে দাঁড়াবে। ভারত সরকার যেসব নদী পরিকল্পনার কাজ হাতে নিয়েছেন তার মধ্যে ভাক্রা-নাঙ্গাল (পাঞ্জাব), দামোদর উপত্যকা (বিহার এবং পশ্চিম বাংলা) এবং হীরাকুদের (উড়িষ্যা) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে পরমাণু-শক্তির কথাও বিশেষভাবে আলোচনা করা দরকার। আমরা এখন পরমাণু-যুগে পদার্পণ করেছি। কাজেই অনুমান করা যায় যে, পরমাণু-শক্তিই ভবিষ্যতে প্রধান অবলম্বন হবে। এই শক্তি আহরণ করা এবং তার সদ্ব্যবহার করবার পরিকল্পনা আজও সম্পূর্ণ সফল হয় নি—এ কথা ঠিক, কিন্তু সবদেশের বিজ্ঞানীরা যেরূপ সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন তাতে মনে হয়, আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই আমরা পরমাণু-শক্তি আহরণ করবার কৌশল আয়ত্ত করে ফেলতে পারবো।

পরমাণু-শক্তির প্রধান উৎস হলো ইউরেনিয়াম, গ্র্যাফাইট প্রভৃতি খনিজ। দুঃখের বিষয় ভারতে ইউরেনিয়ামের খনিজ খুব বেশী নেই। সিংভুম ও রাজপুতনায় যে খনিজ আছে তা খুব ভাল জাতের নয়। এক টন খনিজ থেকে মাত্র এক সের ইউরেনিয়াম পাওয়া সম্ভব। তাছাড়া এই ইউরেনিয়াম নিষ্কাশনের খরচও যে খুব বেশী পড়বে তাতে সন্দেহ নেই। এ ছাড়া আরাবল্লী শৈলে, উত্তর বিহারে এবং নেলোর প্রভৃতি স্থানেও ইউরেনিয়াম খনিজের সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে সব মিলিয়ে লভ্য ইউরে-নিয়ামের পরিমাণ ১৪,০০০ টনের বেশী নয়।

পরমাণু শক্তির উৎস হিসাবে ইউরেনিয়ামের

পরেই থোরিয়ামের স্থান। এই প্রসঙ্গে ত্রিবাঙ্কুরের মোনাজাইট বালির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একশ' ভাগ মোনাজাইট থেকে পাওয়া যায় ০'৪ ভাগ ইউরেনিয়াম অক্সাইড, আর ১০ ভাগ থোরিয়াম অক্সাইড। বাস্তবিক এরচেয়ে সহজলভ্য তেজস্ক্রিয় ধাতুর খনিজ আমাদের দেশে আর নেই। মালাবার ও করমণ্ডল উপকূলের মোনাজাইট বালিতেও থোরিয়াম আছে। হিসাব করে দেখা গেছে, আমাদের দেশে প্রায় ২০ লক্ষ টন মোনাজাইট আছে। তাথেকে থোরিয়াম অক্সাইড পাওয়া যাবে প্রায় দেড় লক্ষ টন। এ ছাড়া হাজারিবাগ, মেবার, পশ্চিমঘাট ও মাদ্রাজের কোন কোন অঞ্চলের গ্র্যানিট পাথরের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থোরিয়াম আছে।

৭নং তালিকা

ভারতে ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের পরিমাণ

তেজস্ক্রিয় ধাতু	মোট পরিমাণ
ইউরেনিয়াম	১২,০০০—১৪,০০০ টন
থোরিয়াম	১৫০,০০০—১৮০,০০০ „

বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুসারে পৃথিবীর জ্বালানী-সম্পদগুলি সবই অদূর ভবিষ্যতে নিঃশেষিত হয়ে যাবে; কাজেই আগামী কয়েক শতাব্দী ধরে আমাদের একান্তভাবে পরমাণু-শক্তির উপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। ভারতে ইউরেনিয়াম বেশী না থাকলেও এখানকার থোরিয়াম সম্পদ মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। কাজেই ভবিষ্যতে পরমাণু-শক্তি সদ্ব্যবহারের কাজে ভারত কখনই পিছিয়ে থাকবে না।

নিম

শ্রীঅমরনাথ রায়

নিম একটা সর্বজন পরিচিত গাছ। গাছ বেশ বড় হয়। কাঁকরা কাটা পাতা। পাতা, ডাল ও ফলের রস তিক্ত স্বাদযুক্ত। পাকা ফলের রং হল্‌দে। ফলের মধ্যে থাকে কঠিন বীজ। উদ্ভিদ-বিদ্যায় নিমকে বলা হয় Melio Azadiracta। বিভিন্ন দেশে নিমকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যেমন—হিন্দীতে নিম, মহারাষ্ট্রে কড়ু নিম্ব ও লিম্ব, গুজরাটে লিংবড়ো, কর্ণাটে বেভ, তৈলঙ্গে বেয়া, টোয়চেট্টু ও তামিলে বেপুম্ মরম্।

নিমগাছের প্রায় সমস্ত অংশই কাজে লাগে। এর বিভিন্ন অংশের ভেষজগুণাবলীর কথা এক কথায় বলে শেষ করা যায় না।

নিম্বপত্রং স্মৃতং নেত্র্যং ক্রিমিপিত্তবিষপ্রণুৎ।
বাতলং কটুপাকঞ্চ সর্ব্বারোচককুষ্ঠনুৎ॥
নিম্বফলং রসে তিক্তং পাকে তু কটু ভেদনম।
স্নিগ্ধং লঘূষ্ণং কুষ্ঠঘ্নং গুল্মার্শঃক্রিমিমেহনুৎ॥

নিমতেলকে দামী ওষুধ বলে গণ্য করা হয়। নিমের বীজে শতকরা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ভাগ তেল থাকে। নিমের বীজ সিদ্ধ বা নিষ্পেষিত করে তেল নিষ্কাশন করা হয়। এই তেলের রং গাঢ় হলুদ। নিম তেল কটু ও তিক্ত স্বাদযুক্ত। অ্যালকোহলের সঙ্গে মিশিয়ে বার বার ঝাঁকিয়ে নিলে নিমতেলের দুর্গন্ধ ও তিক্ততা নষ্ট হয়। প্রাচীনকালে মাদ্রাজে প্রচুর পরিমাণে নিম-তেল তৈরী হতো এবং সেখান থেকে সেই তেল সিংহল প্রভৃতি দেশে চালান যেতো। গরীব লোকেরা ঐ তেলে প্রদীপ জ্বালাতো।

নিমতেল পচন নিবারণ করে। এর ক্রিমিনাশক

গুণও আছে। কুষ্ঠ রোগ নিবারণের জন্যে চাল-মুগরা তেলের সঙ্গে নিমতেলও ব্যবহার করা হয়। চর্মরোগ ও ক্ষতে নিমতেল ব্যবহার করা হয়। নিমতেল থেকে ভেষজ সাবান তৈরী হয়। নিম-তেল উকুন নষ্ট করে। আমবাত ও পামা রোগেও এই তেল আশু ফলপ্রদ। কুকুরের গায়ে খোস হলে অথবা পোকা লাগলে নিমতেল মাখিয়ে দিলে চমৎকার ফল পাওয়া যায়। বসন্ত রোগে ভোগবার পর রোগীর গায়ে নিমতেল মালিশ করলে বসন্তের দাগ খানিকটা মিলিয়ে যায়।

নিমের রসও একটি ভাল ওষুধ। কোন কোন নিমগাছ থেকে স্বাভাবিকভাবে একপ্রকার সাদা রস নির্গত হয়। এই রস বলকারক এবং রক্ত-পরিষ্কারক সব গাছ থেকেই আপনা আপনি রস নিঃসৃত হয় না; কাজেই কোন কোন গাছ থেকে রস নিষ্কাশন করতে হয়। নালা, ডোবা বা অন্য কোন জলাশয়ের কাছে যে সব নিমগাছ জন্মে—রস নিষ্কাশনের পক্ষে সেগুলিই উপযুক্ত। রস নিষ্কাশন করতে হলে প্রথমে মাটি খুঁড়ে মাঝারি ধরণের মোটা একটা শিকড় বের করতে হয়। ঐ শিকড়টিকে একেবারে কেটে অথবা নীচের দিকে অর্ধেকটা কেটে তার তলায় একটা পাত্র রাখতে হয়। ঐ পাত্রে ফোঁটা ফোঁটা করে রস সঞ্চিত হতে থাকে। এই রসও আপনা আপনি ক্ষরিত রসের মত গুণসম্পন্ন।

নিমপাতার গুণও কম নয়। নিমপাতা চোখের পক্ষে হিতকর, বায়ুবর্ধক ও কটুবিপাক। দাদ হলে নিমপাতা ব্যবহার করা হয়। নিমপাতার টাট্‌কা রস লবণের সঙ্গে মিশিয়ে ক্রিমিরোগে এবং মধুর সঙ্গে মিশিয়ে চর্মরোগ ও ন্যাবা রোগে ব্যবহার করা হয়। সমপরিমাণ নিমপাতা ও আমলকীর রস সিকি তোলা মাখনের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করলে ব্রণ, চুলকনা ও আমবাতে উপকার পাওয়া যায়। চর্মরোগে ও ক্ষতে নিমপাতা দিয়ে ক্ষতস্থান ধোওয়া, নিমপাতার পুলটিশ দেওয়া এবং নিমের মলম ব্যবহার প্রচলিত আছে। টাট্‌কা নিমপাতার রসেরও খানিকটা পচন-নিবারক গুণ আছে। তাই অনেক সময় সামান্য ক্ষত পরিষ্কার করতে হলে নিম-জল ব্যবহার করতে হয়। নিমপাতা বেটে স্তনে প্রলেপ দিলে দুগ্ধক্ষরণ বন্ধ হয়। নিমপাতা খাঁটি গাওয়া ঘিয়ে ভেজে সেই তেল ভাল মোমের সঙ্গে মিশিয়ে মলম তৈরী করা হয়। ঐ মলম ক্ষত রোগে খুব উপকারী। নিমপাতা ভাজা পিত্ত-নাশক। নিমের পাতা বইয়ের মধ্যে রাখলে বইয়ের পাতা পোকার উপদ্রব থেকে অনেকটা রক্ষা পেতে পারে। পোকার উপদ্রব থেকে বাঁচাবার জন্যে জামাকাপড়ের মধ্যেও নিমপাতা রাখা চলে। এসব ক্ষেত্রে নিমপাতা অনেকটা ন্যাপথ্যালিনের মত কাজ করে।

নিমফল তিক্তরস, কটুবিপাক, ভেদক, স্নিগ্ধ, লঘু, উষ্ণবীর্য এবং কুষ্ঠ, গুল্ম, অর্শ, ক্রিমি ও প্রমেহনাশক। তেল নিষ্কাশনের পর নিমবীজের যে অসার অংশটুকু পড়ে থাকে তাকে নিম-খইল বলে। নিম-খইল পতিত জমির পক্ষে একটা ভাল সার। নিমবীজকে জলের সঙ্গে বা অন্য কোন তরল পদার্থের সঙ্গে মেশালে যে জলীয় পদার্থ পাওয়া যায় তা নিমতেলের মতই গুণযুক্ত হয়।

সবিরাম জ্বরে নিমছাল খুব উপকারী। এই জ্বরে অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে নিমছালও ব্যবহার করা যায়। নিমছালে মার্গোসাইন নামে একটি ক্ষার জাতীয় পদার্থ আছে এবং সোডাও আছে। নিমছাল পুড়িয়ে যে ছাই পাওয়া যায় তা পামা রোগে খুব উপকার দেয়। মাথা ধরলে নিমছালের ক্বাথ ব্যবহার করা হয়। নিমের ছাল থেকে একরকম সুতা প্রস্তুত হয়। ঐ সুতা দিয়ে দড়ি-দড়াও প্রস্তুত হয়। নিমের সরু ডাল দিয়ে দাঁত মাজলে দাঁত পরিষ্কার হয় এবং দাঁতের গোড়াও শক্ত হয়।

নিমকাঠে কড়ি, বরগা ও অন্যান্য আসবাবপত্র তৈরী হয়; তাছাড়া দেবমূর্তিও তৈরী হয়। বাদ্যযন্ত্র, কৃষিযন্ত্র প্রভৃতিও তৈরী হয় নিমকাঠ থেকে।

নিমগাছ থেকে যে আঠা পাওয়া যায় তা স্নিগ্ধ ও বলকারক। প্রবাদ আছে যে, কোন কুষ্ঠরোগী যদি একাদিক্রমে বারো বছর নিমগাছের নীচে বাস করতে পারে তবে তার রোগ নাকি সম্পূর্ণ নিরাময় হতে পারে। আরও প্রবাদ আছে যে, নিমের ডাল দিয়ে বাতাস করলে গর্মি রোগ নাকি সেরে যায়। এই সব কারণে অনেকে বাড়ীর কাছে নিমগাছ রাখবার পক্ষপাতী।

অতিকায় সংখ্যা

শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পাল

সাধারণভাবে ব্যবহারিক জগতে আমাদের যে সব সংখ্যার সঙ্গে পরিচয় সে সব হাজার, লক্ষ, বড় জোর কোটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পৃথিবীর লোকসংখ্যা ২৫০ কোটি, আমাদের জাতীয় আয় বছরে ১০০০ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খরচ হবে আনুমানিক ৮০০ কোটি টাকা—এমনি সব বড় বড় সংখ্যার সঙ্গে আধুনিক-কালে আমাদের পরিচয় নেহাৎ অল্প নয়। কোটি কোটি, লক্ষ লক্ষ সংখ্যার কথা শুনতে আমরা মোটামুটি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কিন্তু আমাদের সাধারণ লোকের কাছে কি ঐ সব বড় বড় সংখ্যা-গুলির সত্যিই কোনও অর্থ আছে? না, আমরা কি কোনও সঠিক ধারণা করতে পারি তাদের পরিমাণ সম্বন্ধে? আমরা কয়েকটি, বড় জোর কয়েকশ' টাকার সঙ্গেই পরিচিত—লক্ষ কোটি টাকা এক সঙ্গে দেখতে কি রকম, সে শুধু কল্পনাই করতে পারি। লোকের বেলায়ও তাই। রাস্তাঘাটে এক সঙ্গে কত লোক আর আমাদের চোখে পড়ে? শুধু ময়দানে নেহরুর বক্তৃতায় যাঁরা যান, তাঁরা কখনও কখনও পাঁচ দশ লক্ষ লোকের একত্র সমাবেশ কি ব্যাপার, সে সম্বন্ধে একটু আন্দাজ পান। বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভের দৌলতে সেবার আমরা পঞ্চাশ লক্ষের সম্বন্ধেও মোটামুটি একটা ধারণা পেয়েছি।

কিন্তু সংখ্যা সম্বন্ধে এই-ই আমাদের প্রকৃত জ্ঞানের সীমা। এর উর্ধ্বে যে সব সংখ্যা আছে তাদের পরিচয় শুধু একের পিঠে কার কয়টি শূন্য, তাই দিয়ে। ব্যবহারিক জগতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করে এসব সংখ্যা সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা দেওয়া এবং আমাদের বৃহৎ বিশ্বে এসব অতিকায় সংখ্যার ভূমিকা কি, তার একটু সাধারণ আলোচনা করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কলকাতা থেকে দিল্লীর দূরত্ব আন্দাজ ৯০০ মাইল। ৯০০ মাইলে আছে ১৫৮৪০০০ (প্রায় ১৬ লক্ষ) গজ। যদি কেউ পায়ে হেঁটে দিল্লী যেতে চান তবে তাকে এই ১৬ লক্ষ বার মাটিতে পা ফেলে ১৬ লক্ষ বার মাটি থেকে পা তুলতে হবে। অথবা ধরা যাক, কেউ পেন্সিল দিয়ে কাগজে দশলক্ষ বার দাগ কাটতে চান। কাজটি আরম্ভ করবার আগে তার জন্যে আপনার কতটা সময় এবং কতটা কাগজ বরাদ্দ করতে হবে, তার একটা মোটামুটি হিসাব জেনে রাখুন। সেকেণ্ডে যদি অবিরাম একটি করে দাগও কেটে যেতে পারেন, তাহলেও আপনার সবশুদ্ধ সময় লাগবে ২৭৮ ঘণ্টা বা ১১ দিন ১৪ ঘণ্টা; অর্থাৎ ১১ দিন ১৪ ঘণ্টা দিনরাত সর্বক্ষণ কাজ করে আপনাকে দাগ কাটা শেষ করতে হবে। আর যদি দশটা-পাঁচটা করেন

তবে ৩৯ দিন ৫ ঘণ্টা। কাগজ কত লাগবে? 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র এক পৃষ্ঠায় হাজারটা দাগ ধরলেও লাগবে ১০০০ পৃষ্ঠা; তার মানে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র প্রায় পনেরটি সংখ্যা।

দশ-বিশ লাখ সম্বন্ধে ধারণাটা একটু পরিষ্কার হতে পারে এবার। যদি না হয় তবে আরেকটা ভাল উদাহরণ নিন। মাথার চুল খুব সরু একথা আমরা সবাই বলি এবং চুল কতটা সরু সে সম্বন্ধেও মোটামুটি একটা ধারণা প্রায় সকলেরই আছে। মনে করা যাক, মাথার একটি চুলকে দশলক্ষগুণ মোটা করে দেওয়া হলো। অবস্থাটা কি রকম হতে পারে, কল্পনা করতে পারেন? মাথার একটি চুলের ব্যাস তখন হবে ২৫০ ফুট। একটি চুলের পাশে ২৫০ ফুট মোটা একগাছা দড়ির কথা মনে করে একবার তুলনা করে নিলেই বুঝা যাবে, দশলক্ষ জিনিষটি কি!

অথব. ধরুন আপনি ৬ ফুট লম্বা। কেউ যদি যাদুমন্ত্রে আপনাকে দশলক্ষগুণ বাড়িয়ে দেয় তবে আপনার অবস্থাটা কি রকম হবে? আপনার উচ্চতা তখন হবে প্রায় ১১৫০ মাইল; অর্থাৎ আপনি যদি কলকাতায় আপনার বাড়ীতে মাথা রেখে টান হয়ে শুয়ে পড়েন, তবে আপনার চরণযুগল গিয়ে পড়বে বোম্বাই সহরের মাঝখানে।

এ তো গেল শুধু দশলক্ষ বা মিলিয়নের কথা। মিলিয়ন তো এখন তুচ্ছ। মিলিয়নের পরে আছে কোটি, বিলিয়ন, আরও কত কি!

মিলিয়ন: ১,০০০,০০০

বিলিয়ন: ১,০০০,০০০,০০০

এখন ভাবুন, আপনাকে এক বিলিয়ন গুণ বাড়িয়ে দিলে কি হবে? আপনার দেহটাকে দিয়ে তখন সারা দুনিয়াটাকে ৫০ বার পাকানো যাবে।

বিজ্ঞানে কিন্তু বিলিয়নও তুচ্ছ। বৈজ্ঞানিকেরা হামেসাই যে সংখ্যাটি ব্যবহার করেন, তার নাম ট্রিলিয়ন—বিলিয়নের চাইতেও হাজারগুণ বড়। মিলিয়নে আছে একের পিঠে ছয়টি শূন্য—এতে আছে বারটি।

জ্যোতির্বিদেরা অবশ্য এরও উর্ধ্বে। তাঁদের প্রয়োজন এর চাইতেও বড় সংখ্যার। তাই তাঁরা এভাবে বড় বড় সংখ্যাগুলির নামকরণ না করে যত বড় খুসী সংখ্যা তৈরী করবার সহজ এক নিয়ম করে নিলেন। তাঁরা প্রয়োজনমত শুধু একের পিঠে শূন্যের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে বড় সংখ্যা তৈরী করে নেন। আর তা লেখেনও ছোট্ট সুন্দর এক কায়দায়। ধরুন, লিখতে হবে ১,০০০,০০০,০০০,০০০। বার বার অতগুলো শূন্য লেখার হাঙ্গামা না করে তাঁরা ছোট্ট করে লেখেন: $১০^{১২}$। একের পিঠে যতটি শূন্য, সেই সংখ্যাটি দশের মাথার উপর বসিয়ে দেন। ১০-এর মাথার উপরকার এই সংখ্যাটিকে বলা হয় সূচক। সূচকের মান দেখেই সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাটির আয়তন সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। আজকাল অবশ্য শুধু জ্যোতির্বিদেরাই এ রীতিতে লেখেন না, সাধারণ ব্যাপারেও অনেকক্ষেত্রে এই সংক্ষিপ্ত রীতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে।

তা তো হলো; কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের জীবনে যে সব সংখ্যার সামান্যতম প্রয়োজনীয়তাও আমরা খুঁজে পাই না, সে সব সংখ্যা নিয়ে এত মাথা ঘামানো কেন? সমষ্টিগত জীবনে না হয় মানলাম লক্ষ, কোটির মানে আছে; কিন্তু তার উর্ধ্বে? দুনিয়ার কার কোন্ প্রয়োজনে একের পিঠে বিশ পঁচিশটা শূন্য বসাতে হবে?

প্রয়োজন অবশ্যই আছে। বাইবেলে লেখা আছে—ভগবান আব্রাহামকে কথা দিয়েছিলেন—পৃথিবীতে যত বালুকণা আছে, তার সন্তানসন্ততির সংখ্যাও তেমনি অগণিত হবে। গ্রীক গাণিতিক আর্কিমিডিস শুধু পৃথিবীর অগণিত বালুকণা নয়—সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত বালুকণা আছে তার সংখ্যা নির্ধারণের চেষ্টা করে যে ফল পেয়েছিলেন তা হচ্ছে:—

১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,
০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,
০০০,০০০ অর্থাৎ $১০^{৬৩}$। এই সংখ্যাটি পাওয়ার পর আর্কিমিডিস দেখলেন, এমন বিরাট সংখ্যারও প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে। তাই তিনি অজস্র বড় সংখ্যা তৈরী করে সেগুলিকে ক্রমানুযায়ী সাজিয়ে গেলেন। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, গ্রীকেরা আমাদের মত ১, ২, ৩ ইত্যাদি দিয়ে সংখ্যা লিখতেন না। তাদের বর্ণমালার এক একটি অক্ষরের এক একটি সংখ্যাত্মক মান ছিল। বড় বড় সংখ্যাগুলির এক একটা বিশিষ্ট নাম ছিল। দশ হাজারকে তারা বলতেন মিরায়াড।

এক থেকে আরম্ভ করে আর্কিমিডিস বিভিন্ন শ্রেণী ও পর্যায়ে সংখ্যাগুলিকে বিভক্ত করতে করতে অবশেষে যে সংখ্যাটিতে এসে থামলেন সেটি হচ্ছে :—

$$১০^{৮,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০}$$

আর্কিমিডিসের কল্পিত এসব বিরাট সংখ্যার কোনও অর্থ প্রকৃতপক্ষে আমাদের কাছে নেই। কিন্তু এসব সংখ্যার উপযোগিতা যে ভবিষ্যতে কোনও দিন আসবে না, এমন কথা কখনও বলা যায় না। মানুষের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বড় সংখ্যার প্রয়োজনও যে ভাবে বেড়ে চলেছে তাতে মনে হয় যে, অচিরেই হয়তো $১০^{৮,০০০,০০০}$ জাতীয় কোনও সংখ্যা নিয়ে যে, আমাদের কাজ করতে হবে, সৌরজগৎ এবং বহির্বিশ্বের আলোচনা প্রসঙ্গে একথা আরও স্পষ্ট হবে। আপাততঃ একটি ছোট্ট উদাহরণ (যদিও কাল্পনিক) আলোচনা করা যাক। এতেও আর্কিমিডিসের বৃহৎ সংখ্যার উপযোগিতা আমাদের কিছুটা হৃদয়ঙ্গম হবে।

তিনটি ৯ দিয়ে লেখা বৃহত্তম সংখ্যাটি কি? কেউ কেউ হয়তো বলবেন ৯৯৯। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ৯৯৯ হচ্ছে এই জাতীয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা। বৃহত্তম সংখ্যাটি হচ্ছে—

$$৯^{৯^৯}$$

অর্থাৎ ৯ কে ৯ দিয়ে $৯^৯$ বা ৯ × ৯ × ৯ × ⋯ × ৯ বার গুণ করলে যে ফল পাওয়া যাবে তাই। এখন

$$৯^৯ = ৩৮৭, ৪২০, ৪৮৯$$

$$\text{সুতরাং } ৯^{৯^৯} = ৯^{৩৮৭, ৪২০, ৪৮৯}$$

অর্থাৎ ৯ কে ৯ দিয়ে ৩৮৭, ৪২০, ৪৮৯ বা প্রায় ৪০০০ লক্ষ বার গুণ করতে হবে।

তা হলেই দেখা যাচ্ছে মাত্র তিনটি নয় দিয়েই কি বিরাট সংখ্যা লেখা যায়! অবশ্য আর্কিমিডিসের সংখ্যার তুলনায় এটি কিছুই নয়। তবুও আজ পর্যন্ত কেউ এই সংখ্যাটির মান নির্ণয় করতে পারেন নি। যদি কাগজের এক ফুট পরিমিত জায়গায় ২০০টি সংখ্যাও লেখা যায় তবে অঙ্কটি সম্পূর্ণ করতে ৩৫০ মাইল কাগজের দরকার হবে। যদি এর উত্তরটি কেউ জেনে লিখতে আরম্ভ করে এবং সেকেণ্ডে একটি করে সংখ্যা অবিরাম ২৪ ঘণ্টা লিখে যেতে থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত লিখতে তার লাগবে ১১ বছর ৮ মাস। এতে সবশুদ্ধ আছে ৩৬৯,৬৯৩,১০০টি সংখ্যা। এর সুরুতে আছে ৪২৮,১২৪,৭৭৩,১৭৫,৭৪৭,০৪৮,০৩৬,৯৮৭,১১৮ এবং শেষে আছে ৮৯। মাঝখানে কি তা আজ পর্যন্ত কেউ জানে না।

কাল্পনিক উদাহরণ ছেড়ে এবার আমাদের পৃথিবী এবং বাইরের গ্রহ-নক্ষত্র সমন্বিত বিশ্বের দিকে তাকানো যাক। আমাদের পৃথিবীর বয়স কত? পৃথিবী থেকে আকাশের ঐ সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্রের দূরত্ব কত? কোনও মানুষ ১০০ বছর বাঁচলে আমাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। মানুষের ইতিহাস খুঁজতেই আমরা পরিশ্রান্ত; অথচ এই ইতিহাস মাত্র ৬০০০ বছরের। ঐ বিশাল দূরত্ব আর নিরন্ধ্র অতীতের ধারণা আমরা কেমন

করে করবো? উপায় একমাত্র অতিকায় ঐ সব সংখ্যা।

আমরা জানি ৫০,০০০ বছর আগে পৃথিবী-পৃষ্ঠে মানুষের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু পৃথিবীর জন্ম হয় প্রায় ২×১০⁹ বছরেরও আগে, আর সূর্যের সৃষ্টি হয় ৫×১০⁹ বছর আগে। মাত্র ৫×১০⁸ বছর আগে পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে তরল থেকে কঠিন আকার ধারণ করে। তখন থেকে পৃথিবীতে প্রাণের সূত্রপাত হয়। এবার আমাদের জীবনের গড় আয়ু ৬০ কি ৭০ বছরের সঙ্গে ঐ সময়ের তুলনা করুন।

৫০ ফুট লম্বা একটি সরলরেখা দিয়ে যদি আমরা সূর্যের বয়স নির্দিষ্ট করি, তাহলে ঐ রেখার ২০ ফুট অংশমাত্র পৃথিবীর বয়স নির্ধারণ করবে। মনুষ্যজাতির বয়স যদি ১০০,০০০ বছরও ধরা যায়, তবুও ঐ রেখার মাত্র ·০১২ ইঞ্চি পরিমিত স্থান তার প্রাপ্য। আর একজন মানুষের ৭০ বছরের আয়ু নিরূপিত হবে ·০০০০১ ইঞ্চি স্থান দিয়ে।

এ তো গেল অনির্দিষ্ট সময়ের ক্ষুদ্র এক পর্যায়ের কথা। সূর্যের কত শত কোটি বছর আগে কত শত কোটি নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়েছে! আর তাদের দূরত্বও কি কম? চন্দ্র হচ্ছে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী—মাত্র ২৪০,০০০ মাইল দূরে। যদি প্লেনে চড়ে ঘণ্টায় ২০০ মাইল বেগে চন্দ্রে যেতে চাই তবে দরকার হবে ৫০ দিন অবিরাম চলা। আলো সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল যায়। চন্দ্র থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে লাগে ১¼ সেকেণ্ড। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ৯৩,০০০,০০০ মাইল। একই গতিতে সেখানে যেতে আমাদের লাগবে ৫৩ বছর; আলোর লাগে ৮½ মিনিট। নিকটতম নক্ষত্র থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে লাগে ৪·৩ বছর, অর্থাৎ পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব হচ্ছে ৩×১০¹³ মাইল।

বলতে গেলে এই নক্ষত্রটি আমাদের ঘরের কাছে। জ্যোতির্বিদেরা এখন এমন নক্ষত্রেরও সন্ধান জানেন যেখান থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে লাগে ৫০০ মিলিয়ন বছরেরও অধিক সময়। তার মানে, এই নক্ষত্রটির জন্ম হয়েছে আজ থেকে অন্ততঃ ৫০০ মিলিয়ন বছরেরও আগে। আর এর দূরত্ব হচ্ছে ১০²¹ মাইলেরও বেশী।

এবার একবার আমাদের বিশ্বের আয়তনটা আন্দাজ করে দেখুন। আমাদের সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্র একটি নক্ষত্রজগতের অন্তর্গত, যেটিকে আমরা বলি গ্যালাক্সি। এই গ্যালাক্সিতে সূর্যের চেয়ে ছোট-বড় লক্ষ লক্ষ তারা আছে। এই নক্ষত্র-জগৎটি দেখতে একটা চ্যাপ্টা ঘড়ির মত। এর ব্যাসার্ধ প্রায় ২০০,০০০ থেকে ৩০০,০০০ আলোক-বছর* এবং ঘনত্ব প্রায় ৫০,০০০ আলোক-বছর। আমাদের সৌরজগৎ এই নক্ষত্রজগতের কেন্দ্র থেকে ৪০,০০০ আলোক-বছর দূরে অবস্থিত এবং কেন্দ্রের চতুর্দিকে সেকেণ্ডে ২৭০ কিলোমিটার গতিতে ২৫০ মিলিয়ন আলোক-বছরে একবার পরিক্রমা করে।

সমগ্র বিশ্ব এমনি লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রজগৎ বা গ্যালাক্সি নিয়ে গঠিত। এক নক্ষত্রজগৎ থেকে আরেকটির গড় দূরত্ব প্রায় ৭০০,০০০ আলোক-বছর। পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরের নক্ষত্রজগতের দূরত্ব ১০০০ মিলিয়ন আলোক-বছর।

এ তো হলো আমাদের জানা অংশটুকুর বিস্তার। বিশ্বের কতটুকুই বা এখন পর্যন্ত আমাদের দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়েছে! ভবিষ্যতের জ্যোতির্বিদদের দূরবীক্ষণ যন্ত্র আমাদের বিশ্বের পরিধি যতই বিস্তৃততর করবে, আমাদের অতিকায় সংখ্যাও তেমনি বাড়িয়ে যেতে হবে—হয়তো আর্কিমিডিসের মতই অনির্দিষ্টভাবে।

---

* ১ আলোক-বছর = ১৮৬,০০০×৬০×৬০×২৪×৩৬৫ মাইল
= ৬,০০০,০০০,০০০,০০০ (আনুমানিক) মাইল
= ৬×১০¹² মাইল

রবার

শ্রীগোপেশ্বর সাহা

বিংশ শতাব্দীর শিল্পকেন্দ্রিক সভ্যতা যে সব উপাদান আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে, রবার তার মধ্যে অন্যতম—এ কথা বললে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হবে না। রবার এবং রবারজাত সবকিছুর ব্যবহার যদি বন্ধ করা হয় তবে যান্ত্রিক সভ্যতার উপর এক-খানি কালো যবনিকা নেমে আসবে, অন্ততঃ একশ' বছর আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে। আধুনিক সভ্যতার প্রধান বাহন বিদ্যুৎশক্তি—রবার না হলে চলে না। রবার ছাড়া যানবাহন থেমে যাবে, কলকারখানা অচল হবে। সংবাদ আদান-প্রদান বন্ধ হবে। খেলাধূলার সরঞ্জাম, রকমারি পাদুকা, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় হাজার রকমের তৈজসপত্র, সবকিছুতে রবারের আধিপত্য আজ সুবিদিত।

ঐতিহাসিকেরা বলেন—সভ্যজগৎ রবারের সন্ধান পেয়েছে আমেরিকা আবিষ্কারের পরে। দ্বিতীয়বার সাগরযাত্রার সময় কলাম্বাস নাকি গাছের রস থেকে তৈরী বল দিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের খেলতে দেখেছিলেন। ১৫২০ সালে সম্রাট মণ্টেজুমাও নাকি বল খেলার মাধ্যমে কর্টেজ ও তাঁর অনুচর-বর্গকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। কিন্তু দক্ষিণপূর্ব-এশিয়ার আদিবাসীদের রবারের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে আরও আগে। তারা জলনিরোধক পাত্র, মশাল এবং আরও দু'চারটা রবারজাত জিনিষের ব্যবহার জানতো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেকের মতে, ইউরোপের মানুষ রবারের সংবাদ জেনেছে আমেরিকার কাছ থেকে।

ইউরোপ ও এশিয়ায় রবার চাষের সূচনা করেন স্যার হেনরী উইকহ্যাম নামে এক ভদ্রলোক। বৈচিত্র্য-সন্ধানী এই মানুষটি ছিলেন আজন্ম শিকারী; দুর্গম গিরি-কান্তার তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকতো। এই বৈচিত্র্যের সন্ধানেই বাঁধাধরা জীবন পিছনে ফেলে একদিন তিনি পাড়ি জমালেন আমেরিকার দুর্গম অরণ্যে। বিপৎসঙ্কুল পথে মাত্র একজন সঙ্গী ও জনকয়েক স্থানীয় অধিবাসীর সহায়তায়ই তিনি রবার গাছের সন্ধান সুরু করেন। দুর্গম অরণ্যে অনাহারে-অর্ধাহারে, রোদে-তাপে, দুঃসহ মশার কামড় সহ্য করে অবশেষে একটি ব-দ্বীপের কাছে সন্ধান পেলেন রবার গাছের। অভীষ্ট সিদ্ধ হলো। অশেষ দুর্গতি ভোগ করে ১৮৭৬ সালে প্রায় ৭০,০০০ বীজ এনে তিনি রোপণ করেন লণ্ডনের কিউ গার্ডেনে। এখানে প্রায় ২৭০০ বীজ অঙ্কুরিত হয়। কিউ গার্ডেন থেকে প্রায় ২০০০ চারা এনে সিংহল ও মালয়ে রবার চাষের সূচনা হয়। এরপর অতি অল্প কালের মধ্যেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে রবার চাষের পরিমাণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে ছাড়িয়ে যায়। ভারতবর্ষে রবারের চাষ হয়—কূর্গ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ও আসামে।

রবার নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা সুরু হয়েছে ১৭৩৬ সাল থেকে। দুজন ফরাসী বিজ্ঞানী ইউরোপে রবার প্রচলনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অক্সিজেনের আবিষ্কারক ইংরেজ বিজ্ঞানী জোসেফ প্রিস্টলি একদিন লক্ষ্য করেন যে, রবারের ঘর্ষণে পেন্সিলের দাগ মুছে যায়। তাই তিনি এর নাম দিলেন রবার বা ঘর্ষণদ্রব্য। মাইকেল ফ্যারাডে রবারের রাসায়নিক সংযুতি নিয়ে মূল্যবান গবেষণা করেছেন। তাঁর মতে, রবারের রাসায়নিক সংযুতি হলো—$C_{10}H_{16}$; কিন্তু পরবর্তী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে রবারের রাসায়নিক সংযুতি —$(C_5H_8)x$। রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, রবার হলো কতকগুলি আইসোপ্রিন

অণুর সমষ্টি; অর্থাৎ রবার অণু ভাঙ্গলে পাওয়া যায় কতকগুলি আইসোপ্রিন অণু। এক একটি আইসোপ্রিন অণু আবার ৫টি অঙ্গার ও ৮টি হাইড্রোজেন পরমাণুর সমবায়ে গঠিত। আর x হলো আইসোপ্রিন অণুরসংখ্যা। রবারের আণবিক গুরুত্বের বিশেষ

রবার গাছের ছাল কেটে রস বের করবার ব্যবস্থা

কোন স্থিরতা নেই। তবে সাধারণতঃ ১০,০০০ থেকে ৪৩৫,০০০-এর মধ্যে আণবিক গুরুত্ব সীমাবদ্ধ থাকে।

আমেরিকার রবার ব্যবসায়ের সূচনা করেন স্যামুয়েল নীল। তিনি ১৭৯১ সালে তার্পিন ও রবারের দ্রবণে কাপড় ডুবিয়ে জলনিরোধক কাপড় তৈরীর প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করে সে পদ্ধতির পেটেণ্ট নেন। কিন্তু গরমের সময় কাপড়ের উপর রবারের আস্তরণ গলে গিয়ে আঠার মত চট্‌চটে হয়ে যেত আবার শীতকালে শক্ত হয়ে হতো ভঙ্গুর। কাজেই ব্যবসায়ের দিক থেকে এই পদ্ধতি সার্থক হয় নি।

১৮৩৯ সালে গুড ইয়ার নামে একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী রবার নিয়ে নানারকম পরীক্ষা করে দেখেন

যে, কাচা রবারের সঙ্গে গন্ধক মিশিয়ে অনুঘটকের উপস্থিতিতে প্রয়োজনীয় তাপ ও চাপের প্রভাবে যে রবার পাওয়া যায়, সেটা সাধারণ রবারের চেয়ে অনেক বেশী স্থিতিস্থাপক। রোমানদের অগ্নিদেবতা ভালক্যান-এর নামানুসারে এই পদ্ধতির নামকরণ হয়—ভালক্যানাইজেশন। ভালক্যানাইজ করা রবারকে ইচ্ছামত আকৃতি দেওয়া সম্ভব। এই পদ্ধতি রবার-শিল্পে নবযুগের সূচনা করেছে।

রবার গাছের বৈজ্ঞানিক নাম হেভিয়া ব্রেসিলেন্সিস। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রায় ১২ জাতের রবার গাছ দেখতে পাওয়া যায়। খেজুর বা তালগাছ কেটে যেমন রস পাওয়া যায় তেমনি রবার গাছ কেটে পাওয়া যায় রবারের রস (ল্যাটেক্স)। রসের সবটুকু অবশ্য রবার নয়। এর মধ্যে থাকে জল ও রবার-কণিকা, সামান্য পরিমাণ গঁদ বা আঠা, চিনি, রজন ও ধাতব দ্রব্য ইত্যাদি। এর মধ্যে জলের পরিমাণ থাকে শতকরা ৫০ থেকে ৫৬ ভাগ এবং রবার-কণিকা থাকে প্রায় ৩৬ ভাগ। রবার গাছের মূল, কাণ্ড, ফল, ফুল ও পাতায় একরকম কোষের মধ্যে এই রস সঞ্চিত থাকে। রসটা গাছের কোন প্রয়োজনে আসে কিনা, এ নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। বিজ্ঞানী পার্কিনের মতে, রবার গাছের খাদ্য হিসাবে সঞ্চিত রসের বিশেষ কোন মূল্য নেই; তবে গ্রীষ্মকালে রসের সঙ্গে মিশ্রিত জল গাছের প্রয়োজনে আসে।

কাণ্ড থেকে উপরের ছালটা ফেলে দিয়ে রস সংগ্রহ করা হয়। বিশেষভাবে তৈরী ছুরি দিয়ে অনেকটা ইংরেজী ভি-অক্ষরের মত করে গাছ কাটতে হয়। এ কাজে বিশেষ দক্ষতা না থাকলে গাছের যথেষ্ট ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কোন্ গাছ কতটা গভীর করে কাট্‌লে গাছের ক্ষতি না করেও প্রচুর রস পাওয়া যাবে, দক্ষ কর্মীরা সেটা বুঝতে পারেন। টাট্‌কা রস দেখতে অনেকটা সাদা বা হাল্কা হল্‌দে রঙের হয়। রসের উপর রবার-কণিকাগুলি ভাসতে থাকে। গাছের নীচে পাত্র রেখে রস সংগৃহীত হয়। ফোঁটা ফোঁটা করে রবারের রসে পাত্রটি যখন ভরে আসে তখন পাঠিয়ে দেওয়া হয় কারখানা ঘরে। কিন্তু কাঁচা রসটা তিন-চার ঘণ্টা পড়ে থাকলে জমাট বেঁধে যায় এবং সেটা দিয়ে তখন আর কোন কাজ চলে না। কাজেই কারখানায় পাঠাবার আগে অল্পপরিমাণ অ্যামোনিয়া বা কষ্টিকসোডা মিশিয়ে দেওয়া হয়। এবার কারখানা-ঘরে জল মিশিয়ে বেশ খানিকক্ষণ রেখে দিয়ে ১% অ্যাসিটিক অ্যাসিড মেশানো হয়। এর ফলে রসটা জমাট বেঁধে জলের উপর ভাসতে থাকে। অবশ্য অ্যাসিটিক অ্যাসিডের বদলে ফরমিক অ্যাসিড ট্যানিক অ্যাসিড বা মারকিউরিক ক্লোরাইড দিয়েও কাজ চলে। তারপর মিলিং মেসিনে দিয়ে জলটা সরিয়ে দিতে হয়। জমাটবাঁধা রবার থেকে পাত তৈরী হয় ক্রেপিং মেসিনের সাহায্যে। এই পাত ব্যবহৃত হয় বৈদ্যুতিক তারের জন্যে। রস থেকে রবার জমাবার রকমারি প্রক্রিয়া আছে। প্রক্রিয়া-বিশেষের উপর রবারের গুণাগুণ নির্ভর করে। রবারের সুতা, সার্জিক্যাল গ্লাভ্‌স্‌, স্পঞ্জ-রবার ইত্যাদি তৈরীর জন্যে জমাটবাঁধা রবার দিয়ে কাজ চলে না। সেক্ষেত্রে রবারের রসটাকে সরাসরি কাজে লাগাবারও পদ্ধতি আছে।

কোন কোন দেশে জমাটবাঁধা রবার থেকে জল সরিয়ে দেবার জন্যে মিলিং মেসিনের বদলে রোলার ব্যবহার করা হয়। রোলারের চাপে জলটা বেরিয়ে আসে, আর জমাট রবার থেকে তৈরী হয় রবারের পাত। পাতগুলিকে এবার সুতায় বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় অথবা তারের জালের উপর বিছিয়ে দিয়ে একটি প্রকোষ্ঠের ভিতরে রেখে শুকানো হয়। রোদ বা তাপে রবারের ক্ষতি হতে পারে; সেজন্যে অনেকে প্রকোষ্ঠের ভিতর ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড বা কলিচুন রেখে শুকাবার পক্ষপাতী। কেউ কেউ অবশ্য ১২০° ফাঃ পর্যন্ত তাপ দেওয়া যেতে পারে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

কাচা রবার দিয়ে কোন কাজ চলে না। কাজেই নানারকম রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে রবারকে ব্যবহারোপযোগী করা হয়। কোন্ জিনিষ কখন মেশানো হবে বা কতটা মেশানো হবে, সেটা নির্ভর করে রবারের ব্যবহারের উপর। যেমন, মোটর গাড়ীর টায়ারের জন্যে যে রবার দরকার, টিউব রঙের রবার পেতে হলে জিঙ্ক অক্সাইড ও টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড মেশাতে হয়। এমনিভাবে প্রয়োজনানুযায়ী রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী রবার পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু এসব তো গেল প্রাকৃতিক রবারের কথা।

এভাবে ছাল কেটেও রবার গাছ থেকে রস বের করা হয়

তৈরীতে সে রবার দিয়ে কাজ চলে না। টায়ারের রবার অনেক বেশী শক্ত ও ক্ষয়-প্রতিরোধক হওয়া চাই। এজন্যে রবারের সঙ্গে মেশানো হয় কার্বন ব্ল্যাক বা কৃষ্ণ অঙ্গার, চিনামাটি ইত্যাদি। রকমারি কাজে ব্যবহারের জন্যে রবারের সঙ্গে চুন, ফেঞ্চচক, গন্ধক, মোম ইত্যাদি মেশানো হয়। আবার সাদা

প্রাকৃতিক রবার সর্বত্র পাওয়া যায় না। রবার গাছের চাষ পৃথিবীর বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। কাজেই প্রাকৃতিক রবার যাদের নেই সে সব দেশকে প্রকৃতির এই দানের জন্যে নির্ভর করতে হয় অন্য দেশের উপর। তাছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রবারের দামও ছিল

অত্যন্ত বেশী। প্রকৃতিজাত রবারের অভাব মেটাবার জন্যে জার্মেনী, রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম রবার নিয়ে গবেষণা সুরু করেন। এর পর আসে প্রথম মহাযুদ্ধ। স্বভাবতঃই জার্মেনী তখন বঞ্চিত হলো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রবার থেকে। যুদ্ধের আশু প্রয়োজন মেটাতে জার্মান বিজ্ঞানীরা মিথাইল রবার নামে প্রায় ২৫০০ টন কৃত্রিম রবার তৈরী করেন। কিন্তু গুণের দিক থেকে মিথাইল রবার অনেক নিকৃষ্ট। কাজেই যুদ্ধশেষে এর উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধের সময় জার্মান বিজ্ঞানীরা সোডিয়াম ও বিউটাডাইনের সংমিশ্রণে বুনা নামে আরও একরকম কৃত্রিম রবার তৈরী করেন। সোডিয়াম ধাতুর সঙ্গে আইসোপ্রিন শুকাতে গিয়ে বুনার আবিষ্কার হয় আকস্মিকভাবে।

এদিকে নিত্যনতুন আবিষ্কারের ফলে বিভিন্ন শিল্পে রবারের চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলে। কাজেই প্রাকৃতিক রবার দিয়ে সমগ্র চাহিদা মেটানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই কৃত্রিম রবার তৈরীর জন্যে বিজ্ঞানীরা আবার উঠে-পড়ে লাগলেন। ১৯৩১ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানীরা অঙ্গার ও হাইড্রোজেন থেকে অ্যাসিটিলিন গ্যাস তৈরী করে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ক্লোরোপ্রিন-এ পরিবর্তিত করেন। এই ক্লোরোপ্রিন-এর অণুগুলিকে একত্রিত করে তৈরী হলো নিওপ্রিন নামক কৃত্রিম রবার। এদিকে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা তৈরী করেন সোভোপ্রিন, আর জাপানে তৈরী হলো হিটাকল নামে কৃত্রিম রবার। এমনিভাবে প্রাকৃতিক রবার ও কৃত্রিম রবার দুয়ে মিলে পৃথিবী জুড়ে সুরু হলো রবার শিল্পের জয়যাত্রা।

এবার ভারতীয় রবার-শিল্পের কথায় আসা যাক। পাশ্চাত্যের তুলনায় ভারতের রবার শিল্পকে আজও শিশুশিল্পের পর্যায়ভুক্ত করা চলে। ১৯২০ সালে এখানে প্রথম রবার কারখানা স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কল্যাণে ভারতবর্ষে রবার-শিল্প অনেকটা উন্নত হয়েছে। বর্তমানে ছোট, বড় ও মাঝারী সব মিলিয়ে প্রায় ৫৭টি কারখানায় রকমারি রবারের জিনিষপত্র তৈরী হচ্ছে। এই শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ প্রায় ১৩ কোটি টাকা এবং নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা প্রায় ১৮,০০০। ভারতীয় কারখানায় মোটর গাড়ীর টায়ার টিউব, এরোপ্লেনের টায়ার-টিউব, ট্রাক্টরের টায়ার-টিউব, সাইকেলের টায়ার-টিউব, রবারের জুতা, এবোনাইট, শল্য-চিকিৎসার জন্যে প্রয়োজনীয় রবারের সরঞ্জাম এবং ছোটখাটো আরও অনেক জিনিষ তৈরী হচ্ছে। বর্তমানে সিংহল, ব্রহ্ম, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে ভারতে তৈরী রবারের জিনিষপত্র রপ্তানী হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেও রবার-শিল্পে ভারতের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত; অর্থাৎ সে সময়ে রপ্তানী করতে হতো কাঁচা রবার, আর আমদানী হতো তৈরী জিনিষপত্র। শিল্প সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে আজকাল কিছু কিছু কাঁচা রবারও আমদানী করতে হচ্ছে। ভারতবর্ষ থেকে গত তিন বছরে গড়ে বার্ষিক প্রায় ১২৮ লক্ষ টাকা মূল্যের রবারের জিনিষপত্র রপ্তানী হয়েছে, আর আমদানী হয়েছে প্রায় ৫১·৭ লক্ষ টাকা মূল্যের জিনিষ। ভারত থেকে সাধারণতঃ সাইকেল ও মোটর সাইকেলের টায়ার-টিউব ইত্যাদি রপ্তানী হয়ে থাকে।

বর্তমানে আমাদের দেশে বার্ষিক কাঁচা রবার উৎপন্ন হয় ২৭,০০০ টন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রবারের চাহিদা বার্ষিক প্রায় ৪০,০০০ টন হবে বলে অনুমান করা হয়।

রবার-শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্যে ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ কোট্টায়াম থেকে চার মাইল পশ্চিমে পুথুপল্লী গ্রামে রবার গবেষণা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এই গবেষণাগারটি ১৫ একর জমির উপর নির্মিত হবে। এখানে কাজ আরম্ভ হলে ভারতীয় রবার-শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্যে আর বিদেশের উপর নির্ভর

করতে হবে না। রবার-শিল্প প্রসঙ্গে আর একটি কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করা দরকার। পৃথিবীর অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশে পরিত্যক্ত টায়ার-টিউব, রবারের পাদুকা, বর্ষাতি বা অন্যান্য জিনিষপত্র আবার কাচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পরিত্যক্ত রবারের সামগ্রী সংগ্রহ করে তাকে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করবার জন্যে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান-গুলি এখনও পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য আগ্রহ দেখায় নি।

সৌরতেজের পারমাণবিক উৎস

শ্রীঅমূল্যভূষণ গুপ্ত

সূর্য ও নক্ষত্ররাজি অবিরাম তাপ বিকিরণ করে চলেছে। এই তাপের উৎস-সন্ধানে বৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতবাদের অবতারণা করেছেন এবং আজ পারমাণবিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির ফলে সৌরতেজের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। অগণিত তারকার সমবায়ে যে ছায়াপথের সৃষ্টি, আমাদের সূর্য তাদেরই একজন। সূর্যের উপরিভাগের তাপমাত্রা ৬০০০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড; অভ্যন্তরের তাপমাত্রা অবিশ্বাস্যরূপে অধিক—অন্যূন দুই কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সৌর ধ্রুবক (Solar Constant) পরিমাপ করে বৈজ্ঞানিক ষ্টেফানের সূত্র প্রয়োগে সৌরপৃষ্ঠের তাপ-মাত্রা পরিমাপ করা চলে এবং পৃষ্ঠদেশের এই তাপমাত্রা ও সূর্যের বিভিন্ন গ্যাসের তাপ-পরিবহন ক্ষমতা থেকে অভ্যন্তরের তাপমাত্রাও জানা যায়।

১৯৩৯ সালে বৈজ্ঞানিক বেথে ও ওয়াইসকার সর্বপ্রথম সৌরশক্তির পারমাণবিক উৎসের কথা উত্থাপন করেন। তাঁদের মতে, সূর্যের অভ্যন্তরস্থ তাপমাত্রায় নিয়তই কেন্দ্রিনঘটিত বিভিন্ন পার-মাণবিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে, আর তার ফলেই উৎপন্ন হচ্ছে অপরিসীম শক্তি। অভ্যন্তরের তীব্র-তাপে সূর্যদেহের অপেক্ষাকৃত লঘু পরমাণুসমূহ অত্যধিক গতিশীল হয়ে যে পারমাণবিক প্রক্রিয়া চালু করে তা বস্তুতঃ দ্রুতসংঘাত ক্রিয়ায় সৃষ্ট নিউক্লিয়ার ফিউসন বা কেন্দ্রিন সংযোজন। এই সংযোজনের জন্যে প্রয়োজন—সংঘাতকারী কণিকা-গুলির অত্যন্ত তীব্র গতিশক্তি; নতুবা কণিকাগুলির পারস্পরিক বৈদ্যুতিক বিকর্ষণ কেন্দ্রিন সংযোজনে বাধা দেয়। সংযোজন প্রক্রিয়ায় অফুরন্ত শক্তির বিকাশ ঘটে এবং সেটা তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এভাবে বিকিরিত শক্তির পরিপূরণে বিকিরণ-জনিত শক্তিহ্রাস ঘটে না।

সূর্যে হাইড্রোজেনের পরিমাণ শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ। হাইড্রোজেনের এই পরিমাণ ও অভ্যন্তরের তাপমাত্রা প্রভৃতি থেকে বেথে দেখান যে, একটি 'কার্বন-নাইট্রোজেন বিবর্তন চক্র'ই সূর্যের অমিত শক্তির উৎস। এই চক্র-প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রিন বিবর্তনের ফলে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়। প্রক্রিয়াটিতে কার্বন বা নাইট্রোজেন অনুঘটক হিসাবে কাজ করে, অর্থাৎ প্রক্রিয়া-অন্তে এদের অপরিবর্তিত অবস্থায়ই পাওয়া যায়। প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে ক্ষেপক হিসাবে তাপশক্তিতে বেগবান প্রোটন কণিকা ব্যবহার করা হয়। হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রিন ও প্রোটন কণিকা অভিন্ন।

প্রথমে একটি প্রোটন কণিকা ১২ ভরবিশিষ্ট সাধারণ কার্বন (C^{12}) কেন্দ্রিনের সংঘাতে ১৩ ভরযুক্ত একটি লঘু নাইট্রোজেন আইসোটোপ (N^{13}) উৎপন্ন করে। N^{13} তেজস্ক্রিয়। তাই

একটি পজিট্রন বিকিরণ করে সেটা ১৩ ভরযুক্ত কার্বনের (C^{13}) একটি অচঞ্চল আইসোটোপে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তী প্রোটনের সংঘাতে C^{13} পরিণত হয় N^{14} বা সাধারণ নাইট্রোজেনে। পরে N^{14} আর একটি প্রোটন সংঘর্ষে চঞ্চল অক্সিজেন আইসোটোপ O^{15}-এর উৎপত্তি ঘটায়। O^{15} একটি পজিট্রন বিমুক্ত করে অচঞ্চল আইসোটোপ N^{15}-এর রূপ নেয়। সর্বশেষে N^{15} চতুর্থ প্রোটনের সংঘাতে ভেঙে গিয়ে একটি কার্বন (C^{12}) ও একটি হিলিয়াম (He^4) নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। নিম্নে সমীকরণরূপে শৃঙ্খল প্রক্রিয়াটি দেখানো হলো। তারকা চিহ্নগুলি তেজস্ক্রিয়তার দ্যোতক।

$C^{12}+H^1$ (প্রোটন) $\rightarrow {}^*N^{13}$ + গামারশ্মি
$^*N^{13} \rightarrow C^{13}$ + পজিট্রন
$C^{13}+H^1$ („) $\rightarrow N^{14}$ + গামারশ্মি
$N^{14}+H^1$ („) $\rightarrow {}^*O^{15}$ + গামারশ্মি
$^*O^{15} \rightarrow N^{15}$ + পজিট্রন
$N^{15}+H^1$ („) $\rightarrow C^{12}+He^4$
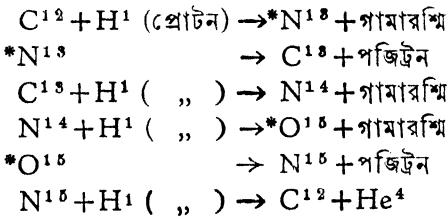
এতে দেখা যায়, প্রক্রিয়াগুলি একটি আবদ্ধশৃঙ্খল বা চক্রের সৃষ্টি করে। প্রতি ছয় ধাপ অন্তর যে স্থান থেকে সুরু হয় সেখানেই ফিরে আসে। চক্রটির আরম্ভ কার্য কার্বন (C^{12}) বা নাইট্রোজেন (N^{14}) যে কোন পরমাণুর দ্বারা সুরু হতে পারে। কার্বন দিয়ে সুরু হলে চক্রশেষে কার্বন, আর নাইট্রোজেন দিয়ে সুরু হলে চক্রশেষে নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয়। তাহলে শৃঙ্খল প্রক্রিয়াটির মোট ফল দাঁড়াচ্ছে, চারটি প্রোটনের সংযোজনে একটি হিলিয়াম কেন্দ্রিনের উৎপাদন। এই সংযোজন প্রক্রিয়ায় লক্ষ্যণীয় বস্তু এই যে, যে চারটি প্রোটন প্রক্রিয়াটিতে অংশগ্রহণ করে তাদের ভর, উৎপন্ন হিলিয়াম কেন্দ্রিনটির ভর অপেক্ষা বেশী। যে পরিমাণ ভর আপাতদৃষ্টিতে বিনষ্ট হলো তাই শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে সূর্যের অমিত তেজ উৎপন্ন করে। শৃঙ্খল প্রক্রিয়াটির সময়কাল বা পিরিয়ড মোটামুটি ৫০ লক্ষ বছর।

নিম্নে প্রতিটি হিলিয়াম পরমাণুর উৎপাদনে নির্গত তেজের হিসাব দেওয়া হলো।

চারটি প্রোটনের ভর = ৪ × ১.০০৮১৩
= ৪.০৩২৫২ (ভরের এককে)
হিলিয়াম কেন্দ্রিনের ভর = ৪.০০৩৮৬ („)
বিলীন ভরের পরিমাণ = ০.০২৮৬৬ („)

আইনষ্টাইনের ভর ও শক্তির সম্বন্ধগত আইন অনুসারে একক ভর বিলীন হলে ৯৩১ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি উৎপন্ন হয়। অতএব এক্ষেত্রে উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ = ৯৩১ × ০.০২৮৬৬ বা ২৬.৭ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট। সূর্যে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম রয়েছে তাতে আগামী ৩০ বিলিয়ন (১ বিলিয়ন = ১,০০০,০০০,০০০,০০০) বছর ধরেও সূর্য বর্তমান তাপমাত্রায় থাকতে পারবে। মনে করা যাক, পৃথিবী সৃষ্টির খুব বেশী পূর্বে সূর্যের জন্ম হয় নি। সুতরাং সূর্যের বয়স মোটামুটি পৃথিবীর বয়সের সমান, অর্থাৎ তিন থেকে চার বিলিয়ন বছর। অতএব সূর্য বর্তমানে বালকমাত্র এবং অনাগত বহু বিলিয়ন বছর ধরে বর্তমান তীব্রতাতেই বালকটি দ্যুতিমান থাকবে।

নক্ষত্র-বিবর্তনের সর্বাধুনিক মতানুসারে নক্ষত্র-দেহে কার্বন-নাইট্রোজেন চক্রটি নক্ষত্র সৃষ্টির বেশ কিছুদিন পরে সুরু হয়। মহাশূন্যের কোন এক বিন্দুতে বহুল পরিমাণে পদার্থের ঘনীভবনেই নক্ষত্রের উৎপত্তি। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে ওই পুঞ্জীভূত পদার্থে ক্রমশঃ সংকোচনের সৃষ্টি হয়। সংকোচনের ফলে তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটে এবং অভ্যন্তরস্থ তাপমাত্রা ২ লক্ষ ডিগ্রি সেন্টি-গ্রেডে ওঠে। এই তাপমাত্রা প্রোটন-প্রোটন সংঘাতে ভারী হাইড্রোজেন বা ডয়টেরন (D^2) সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট।

$H^1+H^1 = D^2$ + পজিট্রন
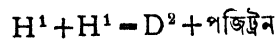
এরই পরে সুরু হয় দু'টি প্রোটন-সংঘাতে আল্‌ফা-কাণকা বা হিলিয়াম কেন্দ্রিনের উৎপাদন।

$$D^2 + H^1 = He^3$$

$$He^3 + H^1 = He^4 + \text{পজিট্রন}$$
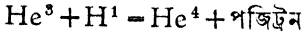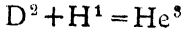
যে সব নক্ষত্র সূর্য অপেক্ষা ম্লান তাদের নাম রেড্ ডোয়ার্ফ বা লোহিত বামন। এসব নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্যের জন্যে প্রধানতঃ এই নিউক্লিয়ার প্রক্রিয়াগুলিই দায়ী।

প্রায় দশ লক্ষ বছর পরে সব ডয়টেরন ফুরিয়ে গেলে নক্ষত্রদেহে পুনরায় সংকোচন ঘটে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে পাঁচলক্ষ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছায়। এই অবস্থায় প্রোটনসমূহের তাপমাত্রাজনিত গতিবেগ যথেষ্ট হওয়ায় লিথিয়াম, বোরন, বেরিলিয়াম প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ভারী মৌলিক পদার্থের সঙ্গে সংঘাত ঘটতে পারে। এই সংঘাতের পরিণতি হিলিয়াম কেন্দ্রিনের উৎপাদন। এই সময় নক্ষত্রসমূহকে জায়াণ্ট স্টেজ বা দানবীয় পর্যায়ের নক্ষত্র বলা হয়। তথাকথিত রেড জায়াণ্ট বা লাল দানবের ঔজ্জ্বল্য এভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়। পূর্বোক্ত কেন্দ্রিনগুলিও ফুরিয়ে গেলে আবার সংকোচন স্থরু হয় এবং ফলে তাপমাত্রা ২ কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছায়। এরূপে পর্যায়ক্রমে সংকোচন ও কেন্দ্রিন সংঘাত প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা ২ কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছালে বিকিরণশীল নক্ষত্র-জীবনের শক্তির উৎস কার্বন-নাইট্রোজেন বিবর্তন চক্রটি সচল হয়। অবশেষে প্রোটন নিঃশেষিত হয়ে এলে নক্ষত্রদেহে অতি দ্রুত সংকোচন ঘটে এবং জীবনের পরিসমাপ্তি রেখাও দ্রুত এগিয়ে আসে। তথাকথিত হোয়াইট ডোয়ার্ফ বা শ্বেত বামন—নক্ষত্র জীবনের শেষ অধ্যায়ের তারকা।

শেষ সংকোচনকালীন নির্গত তেজরাশি শীঘ্রই থার্মোনিউক্লিয়ার শক্তি অপেক্ষা বেশী হয়ে পড়ে এবং কখন কখন বিপ্লবাত্মক বিস্ফোরণের সৃষ্টি হয়। এর প্রমাণ মিলে নোভা (নূতন তারকা) এবং সুপার নোভার অস্তিত্বে। অল্পবয়স্ক হলেও আমাদের সূর্যের আভ্যন্তরীণ তাপ প্রাপ্তবয়স্ক তারকার মতই এবং তাই সৌর-শক্তির সৃজনক্রিয়ায় প্রোটন-প্রোটন সংঘাত এবং কার্বন-বিবর্তন চক্র, উভয় প্রক্রিয়াই যুগপৎ ক্রিয়াশীল।

নিউক্লিয়ার প্রক্রিয়ায় সূর্যদেহের বিনাশেই যে সৌরতেজের উৎপত্তি, সে বিষয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আজ এক মত। এ কথাটিই বিখ্যাত বৃটিশ বিজ্ঞানী স্যার জেমস্ জিনস্ তাঁর "The Universe Around Us" গ্রন্থে অতি সুন্দরভাবে বলেছেন—যে শক্তি পৃথিবীতে জীবনের বিকাশকে সম্ভব করে তুলেছে, যে তাপ ও আলোক শক্তি পৃথিবীর দেহকে রাখছে গরম, আর আমাদের প্রাত্যহিক পোড়ানো কাঠকয়লায় সঞ্চিত যে সৌরালোক, তাদের উৎসের সন্ধানে দেখা যাবে, সূর্যের ভিতরের ইলেকট্রন আর প্রোটনের বিনাশেই এদের উৎপত্তি। সূর্য তার দেহকে ধ্বংস করছে যাতে আমরা বাঁচতে পারি, অথবা বলা উচিত, যার ফলে আমরা বেঁচে রয়েছি। সূর্য আর নক্ষত্রের ভিতরের পরমাণুগুলি যেন এক একটি শক্তিভরা টুন্‌কো বোতল, ভাঙ্গলেই ভিতরের শক্তি ছড়িয়ে পড়ে তাপ আর আলোক-রূপে সারা বিশ্বে। ৫০ বছর আগে বিজ্ঞানীরা কয়লাকে "বোতল ভর্তি সূর্যালোক" বলে অভিহিত করে আনন্দ পেতেন। তাঁরা বলেছেন, সূর্যরশ্মি যেন আদিম বন-জঙ্গলের বৃক্ষ-লতার উপর পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বোতল ভর্তি হয়ে যেত, আর লক্ষ লক্ষ বছর পরে আমাদের চুল্লীতে ব্যবহৃত হওয়ার জন্যে সঞ্চিত থাকত। আধুনিক কালের মতানুসারে কিন্তু এদের ভাবতে হবে, দু-দফায় ভর্তি-করা সূর্যালোকের বোতল। প্রথমবার বোতল ভর্তি স্থরু হয়েছিল লক্ষ লক্ষ বছর আগে যখন সূর্য, পৃথিবী কারুরই জন্ম হয় নি; কেবল প্রোটন আর ইলেকট্রনে সর্বপ্রথম শক্তি যোজনা হয়েছিল। নিতান্ত সাদা কথায় সূর্যকে

গাদা-করা ইলেকট্রন, প্রোটন বলে না ভেবে আমরা ভাবতে পারি, সূর্য যেন একটি শক্তি-ভরা বোতলের ভাণ্ডার-ঘর। এই ভাণ্ডার-ঘরের বোতলের সংখ্যা অগণিত। এর এক একটি বোতলে এত বেশী পরিমাণে শক্তি ভরা আছে যে, ৭।৮ বিলিয়ন বছর তাপ আর আলো বিকিরণ করেও অনাগত বহু বিলিয়ন বছর ধরে যথেষ্ট তাপ ও আলো বিকিরণের মত পর্যাপ্ত বোতল অবশিষ্ট থাকবে।

প্রাগৈতিহাসিক জীবের অবলুপ্তির কারণ

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

বিজ্ঞানীদের মতে প্রায় ২০০ কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে জীবের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। তাহার মধ্যে মাত্র বিগত ৫০।৬০ কোটি বৎসরের আংশিক ইতিহাস শিলাস্তরে প্রোথিত জীবাশ্ম হইতে জানা সম্ভব হইয়াছে। পৃথিবীর উপরিভাগ যে পলল-শিলায় আবৃত তাহা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। এই স্তরগুলি বিভিন্ন উপাদানে গঠিত। পৃথিবীর সর্বত্রই এই স্তরীভূত শিলার ক্রমিক বিন্যাস একই-রূপ। ইহাদের এক একটি স্তর এক একটি যুগের প্রতীক। এই সকল স্তরে প্রোথিত জীবাশ্ম হইতেই বিভিন্ন যুগে যে সকল অগণিত বিভিন্ন প্রকারের প্রাণী ও উদ্ভিদ এই পৃথিবীতে বর্তমান ছিল তাহাদের পরিচয় পাওয়া যায়। উহাদের মধ্যে কতকগুলি পরিবর্তিত বা অপরিবর্তিত অবস্থায় বর্তমান পৃথিবীতেও টিকিয়া আছে। আর কতক-গুলি বিলুপ্ত হইয়াছে। ডাইনোসোর, টেরো-ড্যাক্টিল, ইকৃথিওসোর, প্লেসিওসোর, টিটোনো-থেরেস প্রভৃতি বৃহৎ গোষ্ঠীভুক্ত সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী জীব এই সময়ের বিভিন্ন যুগে আবির্ভূত হইয়া এক সময়ে পৃথিবীতে বিচরণ করিয়াছে। আবার সেই অতীত যুগেরই কোন এক সময়ে তাহাদের শেষ বংশধর পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। জীবমাত্রেরই জন্মের পর একদিন মৃত্যু ঘটে, ইহা প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। কিন্তু পরপর পুরুষানু-ক্রমে বংশধরের মধ্যেই বংশের ধারা অব্যাহত থাকে। কাজেই কি কারণে এই সব জীবকুল একসময় পৃথিবীময় বিস্তার লাভ করিয়া আবার কালের গহ্বরে বিলীন হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

সাধারণতঃ পৃথিবীর সেই অতীত যুগে যে সকল নাটকীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে উল্লিখিত জীবকুল-সমূহের বিলুপ্তি উহারই অংশরূপে গণ্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রচণ্ড ভূকম্পন, আগ্নেয় বিস্ফোরণ, বিস্তীর্ণ স্থান জুড়িয়া ভূভাগের উৎক্ষেপণ অথবা সমুদ্রের ব্যাপ্তির ফলে ভূভাগে প্রচণ্ড প্লাবন ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুণ ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন ও চরম আবহাওয়ার সৃষ্টি জীবকুল ধ্বংসের কারণ হইয়া থাকে। পৃথিবীর অতীত যুগে এইরূপ যে সব ঘটনার নিদর্শন পাওয়া যায় তাহারই ফলে এই সব জীববংশের অবলুপ্তি ঘটিয়াছে, এই ধারণাই প্রচলিত। কিন্তু বর্তমানের তুলনায় অতীত যুগে যে এইরূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনা অধিক ছিল, অনেকে ইহা স্বীকার করেন না। ভূতাত্ত্বিকের গবেষণায় পৃথিবীর অতীত যুগে সংঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের যে সকল রোমাঞ্চকর ইতিহাস রচিত হইয়াছে, উহার কাল অতি বিস্তৃত। এই সকল দুর্যোগ হঠাৎ উদ্ভূত নয়। বহুদিন ধরিয়া নানা শক্তি ও অবস্থার ক্রমিক সমাবেশেই এইরূপ

এক একটি দুর্যোগের পটভূমিকা রচিত হয়। ভৌগলিক পরিবর্তনের পটভূমিকায় এই সব শক্তি সর্বকালে সমভাবেই সক্রিয় রহিয়াছে। কাজেই অতীতের তুলনায় বর্তমান পৃথিবী জীবনধারণের পক্ষে অধিক অনুকূল, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই।

মানুষের মৃত্যুর কারণ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়—জরা, ব্যাধি, মড়ক, যুদ্ধবিগ্রহ, দৈবদুর্ঘটনা ইত্যাদি কোন না কোন একটি উপলক্ষ্য করিয়াই মানুষের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। এই কারণগুলি শুধু মানুষের মৃত্যু সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নয়, প্রাণী-মাত্রেই এইরূপ কোন না কোন কারণে ভবলীলা সাঙ্গ করে। একমাত্র দৈবদুর্ঘটনার ক্ষেত্রটি মানুষের কার্যগতিকে কিছু প্রসারিত হইয়াছে। ভূমিকম্প, আগ্নেয় বিস্ফোরণ, প্লাবন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ব্যতীত রেল, জাহাজ, বিমান প্রভৃতি মানুষের স্বরচিত যন্ত্রের মাধ্যমেও অনেক অপঘাত মৃত্যু ঘটে। একমাত্র মানুষের উদ্ভাবিত এই যন্ত্রপাতির অধ্যায়টি বাদ দিলে মৃত্যুর অপর কারণগুলি শুধু বর্তমানকালের জীব নয়, অতীতকালের জীব সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য।

কিন্তু এইরূপ কোন কারণ হইতে ক্ষেত্রবিশেষে একযোগে হয়তো বহু প্রাণীর বিনাশ ঘটিতে পারে, কিন্তু তাহাতে পৃথিবী হইতে কোন জীববংশের একেবারে মুছিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না। প্রচণ্ড ভূকম্পন, আগ্নেয় বিস্ফোরণ বা প্লাবনে কোন অঞ্চল বিধ্বস্ত হইয়া সামগ্রিকভাবে তথাকার জীবসমূহের বিনাশ না ঘটিতে পারে এমন নয়, কিন্তু আমাদের প্রশ্ন অন্যরূপ। উদাহরণ স্বরূপ ইক্‌থিওসোর নামক সামুদ্রিক সরীসৃপের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। উহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলিবার শক্তি যথেষ্ট ছিল এবং এই কারণেই ইহারা পৃথিবীর সর্বস্থানের সমুদ্রেই বিস্তার লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এইভাবে প্রায় দশ কোটি বৎসর পৃথিবীতে কাটাইবার পর ক্রিটেসাস যুগের শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগকে নিঃশেষ হইতে দেখা যায়। তাহার পরে আর পৃথিবীর কোন স্থানে যে ইহাদের অস্তিত্ব ছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই সময়কার প্ল্যাসিওসোর ও মোসাসোর নামক অপর দুইটি সামুদ্রিক সরীসৃপ বংশের ইতিহাসও একইরূপ। ক্রিটেসাস যুগের অবসানের প্রাক্কালে এই দুইটি বংশেরও বিলুপ্তি ঘটে। জলের কোন গুরুতর রাসায়নিক পরিবর্তন ইহার কারণ হইয়া থাকিলে তাহার কোন ভূতাত্ত্বিক প্রমাণ বিদ্যমান নাই এবং সেই সময়কার মৎস্য-কুলও উহার প্রভাব হইতে নিশ্চয় মুক্ত রহিয়াছে। এইরূপ খেচর টেরোড্যাক্টিল লক্ষ লক্ষ বৎসর বাস করিবার পর ঐ সময়েই পৃথিবী হইতে নিঃশেষে অন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের বিলুপ্তির কারণ যাহাই হউক না কেন, তৎকালীন পক্ষিকুলের উপর তাহার কোন প্রভাব ঘটে নাই। এই সময় স্থলভাগেও ডাইনোসোর বংশের বিলুপ্তি ঘটিয়াছে। কিন্তু সমসাময়িক অনেক জীববংশের অস্তিত্ব অক্ষুন্ন রহিয়াছে। ইহা হইতে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা তাহার ফলে আবহাওয়ার কোন গুরুতর পরিবর্তন যে উক্ত প্রাণীদের বংশ বিলুপ্তির কারণ হইয়াছে, এইরূপ মতবাদ নির্বিচারে স্বীকার করিয়া লওয়া কঠিন।

বর্তমানের বিবিধ জীবতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ সব জীবের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থাসমূহের বিচার বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের অবলুপ্তির বাস্তব কারণ অনুমানের চেষ্টা হইয়াছে। বাহ্যিক অবস্থা বলিতে ভৌগলিক ও জীবতাত্ত্বিক—এই উভয় পারিপার্শ্বিককেই বুঝাইয়া থাকে। ভূতাত্ত্বিক ও আবহাওয়াজনিত অবস্থা ভৌগলিক পারিপার্শ্বিকেরই অন্তর্ভুক্ত। অন্য জীবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রোগ-জীবাণুর আক্রমণ, উদ্ভিজ্জ খাদ্যের প্রাচুর্য বা অভাব—এইগুলি জীবতাত্ত্বিক পারিপার্শ্বিকের অন্তর্গত। আভ্যন্তরীণ অবস্থার

মধ্যে জীবের আঙ্গিক গঠন ও শারীরতাত্ত্বিক প্রকৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বিশেষ বিচার্য বিষয়। দেহের নিদান সম্বন্ধীয় রক্ত, রস, গ্রন্থি প্রভৃতির অবস্থা এবং বংশানুক্রমিক বিষয়সমূহও বিচার্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

প্রথমতঃ জীবতাত্ত্বিক পরিবেশ সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাইতেছে। অন্য জীবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জীবাণু-ব্যাধির সংক্রমণ ও উদ্ভিজ্জ খাদ্যের অপ্রাচুর্য—ইহাদের কোন একটি কারণ হইতে জীববংশের অবলুপ্তি সম্ভব কিনা তাহাই দ্রষ্টব্য।

প্রাণিজগতে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্বাপর হয়তো সমানই আছে। এক প্রাণী অপর প্রাণীর ভক্ষ্য। সবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করে, দুর্বলকে হনন করে। দুর্বল আত্মরক্ষার জন্য সচেষ্ট থাকে। প্রাণিজগতে এইরূপ হানাহানি এখনও যেরূপ দেখা যায় পূর্বেও নিশ্চয়ই এইরূপ ছিল। কিন্তু ইহার ফলে বর্তমানের কোন প্রাণি-বংশের অবলুপ্তির সম্ভাবনা দেখা দেয় নাই। আফ্রিকার জঙ্গলে এইরূপ হানাহানি করিয়া নানা জাতীয় প্রাণী বাস করে। কিন্তু সেই প্রাকৃতিক পরিবেশে ইহার ফলে কোন প্রাণিবংশের ধ্বংস হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। ডাঃ আর্থার বলেন যে, মানুষের ইচ্ছাকৃত হননের ফলেই কোন প্রাণিবংশ নিঃশেষিত হইতে পারে, নচেৎ জীব-জগতের স্বাভাবিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সেইরূপ সম্ভাবনা নাই। বরং প্রাণিজগতের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে বিশেষ প্রয়োজনীয়, এইরূপ ইঙ্গিতই পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতামুক্ত অবস্থায় কয়েক প্রকারের প্রাণীর স্বতন্ত্রভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ঐরূপ অবস্থা তাহাদের জীবনের পক্ষে সুফলপ্রদ নহে। বিপদের আশঙ্কা হইতে মুক্ত থাকিবার ফলে তাহাদের মধ্যে যে নিষ্ক্রিয়তা প্রকাশ পায় তাহা প্রায় আত্মঅবহেলারই অনুরূপ এবং এই কারণে তাহাদের স্বাস্থ্যও সহজেই ভাঙ্গিয়া পড়ে।

জীবাণু সংক্রমণও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক অবস্থারই অন্যতম। এরূপ ক্ষেত্রে আণুবীক্ষণিক জীবের আক্রমণে অপর প্রাণী ব্যাধিগ্রস্ত বা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। জীবাণু-ঘটিত ব্যাধিতে বর্তমানের ন্যায় অতীত যুগের প্রাণীসমূহও যে আক্রান্ত হইয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আফ্রিকায় ট্রাই-পেনোসোম নামক একপ্রকার প্রোটোজোয়ার সংক্রমণে মানুষ, অশ্ব ও গো-মহিষাদির মধ্যে নিদ্রা-রোগের সৃষ্টি হয়। গ্লোসিনা নামক এক-প্রকার রক্তশোষক পতঙ্গ এই রোগ-বীজাণু বহন করে। জীবাশ্ম হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, টার্সিয়ারি যুগেও এই পতঙ্গ বর্তমান ছিল। ইহা হইতে, সেই যুগের প্রাণীবিশেষের মধ্যেও হয়তো নিদ্রা-রোগ বর্তমান ছিল, এইরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়। তবে জীবাশ্ম হইতে এই সকল রোগের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নয়; কারণ এই সকল রোগে অস্থি আক্রান্ত হয় না বা উহার উপর কোন চিহ্নও বর্তমান থাকে না। অষ্টিওমায়েলাইটিস, অষ্টিওআর্থ্রাইটিস প্রভৃতি যে সব ব্যাধিতে অস্থি আক্রান্ত হয়, ডাইনোসোরের জীবাশ্মের মধ্যেও তাহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ বর্তমান রহিয়াছে। তবে এই সকল রোগের বিস্তার ও প্রাবল্য যে বর্তমানের তুলনায় সেই যুগের প্রাণীর মধ্যে অধিক ঘটিয়াছিল, তাহার কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। কাজেই কোন সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার ঘটিয়া মড়কের ফলে কোন জীববংশ নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, এরূপ প্রমাণ করা কঠিন।

নিরামিষাশী প্রাণীর পক্ষে যথোপযুক্ত উদ্ভিজ্জ খাদ্যের সরবরাহ যে বিশেষ প্রয়োজন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফার্ণ গাছের অপ্রাচুর্য ঘটিবার ফলে কোষ্ঠবদ্ধতার ব্যাধিতে ডাইনোসোর বংশ নিঃশেষিত হইয়াছে—এরূপ মতবাদও আছে। কিন্তু এই গোষ্ঠীরই সৌরোপোডা, অনিথোপোডা প্রভৃতি শ্রেণীগুলি যে চিরহরিৎ বৃক্ষের পত্র আহারেও অভ্যস্ত হইয়াছিল, এরূপ প্রমাণ এখন পাওয়া

গিয়াছে। এমন কি, নেপেসার মতে, তাহারা রেজিন খাইয়া হজম করিতেও অভ্যস্ত হইয়াছিল। ক্রিটেসাস যুগের প্রারম্ভে, শরৎকালে পাতা ঝরিয়া পড়ে, এইরূপ উদ্ভিদের উদ্ভব ঘটে। যে সব প্রাণী ঐ সকল গাছের পাতা খাইতে অভ্যস্ত হয় তাহাদের হয়তো ঋতুবিশেষে কিছু পরিমাণে খাদ্যাভাব ঘটিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু ইহার ফলে যে জাতিগত-ভাবে কোন জীবের পক্ষে মারাত্মক কিছু হইয়াছে, এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কাজেই কোনরূপ জীবতাত্ত্বিক পরিবেশ সৃষ্টির ফলে কোন জীববংশের অবলুপ্তি ঘটিয়াছে, এরূপ প্রমাণ করা কঠিন।

এখন পৃথিবীর ভৌগলিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে জীববংশের অবলুপ্তির সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। ভূতাত্ত্বিক কারণে অতীত যুগে ভূপৃষ্ঠের নানারূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কোথাও বা বিস্তীর্ণ ভূভাগ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা বিচ্ছিন্ন ভূভাগের মধ্যে সংযোগ রচিত হইয়াছে, কোথাও আবার সমুদ্রতল উঁচু হইয়া স্থলভাগে পরিণত হইয়াছে। প্রাগমহাদেশীয় এইরূপ পরিবর্তনের ফলে আবহাওয়ারও গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং স্থানবিশেষে শীত, গ্রীষ্ম, আর্দ্রতা ও শুষ্কতার পরিমাণ প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইসব ভৌগলিক পরিবর্তন, বিশেষতঃ ক্রিটেসাস যুগের মধ্যবর্তী সময়ে যে বিরাট সামুদ্রিক প্লাবন ঘটিয়াছিল তাহার ফলেই জীববংশগুলির অবলুপ্তি ঘটিয়াছে, এই মতবাদের প্রাধান্যের কথাই পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই মতবাদের প্রধান অন্তরায় এই যে, কোন জীববংশ বিপর্যয়ের ফলে হঠাৎ অন্তর্হিত হইয়াছে, এরূপ প্রমাণ করা সম্ভব হয় নাই।

যদি ডাইনোসোর জাতীয় সরীসৃপকুলের কথাই ধরা যায় তবে এই বংশের বিভিন্ন শ্রেণীগুলি যে একই সময়ে অন্তর্হিত হইয়াছে, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই জাতীয় প্রধান শ্রেণীগুলি উক্ত ক্রিটেসাস যুগের প্লাবনের অনেক পূর্ব হইতেই পর পর দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে এক একটি করিয়া নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছিল। ইকৃথিওসোর ও প্ল্যাসিওসোর নামক সামুদ্রিক সরীসৃপ সম্বন্ধেও এইরূপ ধারণা ছিল যে, উহারাও এই সময়ে সমুদ্রের উপর মৎস্যকুলের অবাধ অধিকার দান করিয়া একই সঙ্গে অন্তর্হিত হয়। কিন্তু পরে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই উভয় বংশের বিলুপ্তির ব্যাপার সমসাময়িক নয়। প্ল্যাসিওসোর জাতীয় জীবের নানারূপ পরিবর্তিত সংস্করণ ক্রিটেসাস যুগের শেষ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। এই জাতীয় বৃহৎ মস্তকবিশিষ্ট দুইটি শ্রেণীর জীব যে ক্রিটেসাস যুগের শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বিচরণ করিত তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই সময়ের মৎস্যকুলের মধ্যেও অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। ইকথিওসোর ও প্ল্যাসিওসোরের অন্তর্ধানের পরে যে মৎস্যকুল বর্তমান ছিল তাহারা পূর্ববর্তী যুগের মৎস্য হইতে স্বতন্ত্র ধরণের।

এইসব তত্ত্বের আবিষ্কার হইতে স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে, শুধু ভৌগলিক কারণেই জীববংশের অবলুপ্তি ঘটে নাই। তবে ভৌগলিক কারণ হইতে ক্ষেত্রবিশেষে কোন জীববংশের অবলুপ্তির ব্যাপারটি ত্বরান্বিত হওয়া সম্ভব। ক্রিটেসাস যুগের প্লাবনের ফলে এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকার নিম্নভূমি-সমূহ সমুদ্রের কুক্ষিগত হইলে বিরাট দেহধারী সৌরোপোডাস ডাইনোসোর শ্রেণীর প্রাণীদের বিচরণ ক্ষেত্রের সঙ্কোচন ঘটে এবং এই কারণে তাহাদের অনেককেই হয়তো অকালে মৃত্যু বরণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু উক্ত সরীসৃপ শ্রেণীর প্রাধান্যের যুগ ইহার অনেক পূর্বেই শেষ হইয়া ইহারা যে ক্রমশঃ ক্ষয়ের পথে অগ্রসর হইতেছিল, সে বিষয়েও এখন আর কোন সন্দেহ নাই। তখন একমাত্র দক্ষিণ গোলার্ধের কোন কোন স্থানেই মাত্র ইহারা অবশিষ্ট ছিল। এইরূপ পরবর্তী যুগে আবার যখন সমুদ্র সরিয়া গিয়া ভূমি জাগিয়া উঠে,

তখন সেই অবস্থা মাংসাশী বর্মাবৃত ডাইনোসোর ও উভচর দ্বিপদ হ্যাড্রোসোরের পক্ষে মারাত্মক হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু এই জীবগুলিরও ক্রিটেসাস যুগের শেষভাগে উদ্ভব ঘটিয়া এই অবস্থার অনেক পূর্ব হইতেই প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। এই সময় ইহাদের খুব বৃহৎ শ্রেণীর কিছু অবশিষ্ট ছিল মাত্র। কাজেই উক্ত ভৌগলিক পরিবর্তন উহাদের স্বাভাবিক বিলুপ্তির গতিকে কিছু ত্বরান্বিত করিয়াছে মাত্র, ইহাই বলা চলে।

বিশেষতঃ উক্ত ভূমি-জাগরণের ব্যাপারটি হঠাৎ ঘটে নাই, বহুকাল ধরিয়া ধীরগতিতে সম্পন্ন হইয়াছে। কাজেই এইরূপ ধীরগতিতে সংঘটিত কোন পরিবর্তন হঠাৎ ব্যাপকভাবে কোন জীবের পক্ষে মারাত্মক হইতে পারে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্টই সন্দেহ রহিয়াছে। উক্ত অবস্থাসংশ্লিষ্ট তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার পরিবর্তন তাহাদের পক্ষে মারাত্মক হইয়াছিল, এরূপও মনে হয় না। বর্তমান যুগে কুমীরের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভৌগলিক কারণে ইহাদের আবাসস্থল সীমাবদ্ধ হইয়াছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভবও ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাদের বিলুপ্তি ঘটিবার কোন লক্ষণ এখনও দেখা যায় নাই। অধুনা রবভার্ড আবিষ্কার করিয়াছেন যে, শীতল-শোণিত প্রাণীর মস্তিষ্কেও তীক্ষ্ণ অনুভূতিশীল তাপকেন্দ্র বর্তমান আছে। কাজেই অতীত যুগের সরীসৃপকুল যে সম্পূর্ণ অসহায়ভাবে আবহাওয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, এরূপ মনে হয় না। তবে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রামের শক্তি জাতীয় তারুণ্যের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। কোন নবাগত তরুণ জাতির পক্ষে প্রতিকূল অবস্থাকে আত্মস্থ করা সহজ। প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সংগ্রামে আরও শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া উহার নানাভাবে বিকশিত হওয়ারই সম্ভাবনা থাকে। আবার জাতি বার্ধক্যের অবস্থায় উপনীত হইলে কোন প্রতিকূল অবস্থার সংঘাত তাহার পক্ষে সহ্য করা কঠিন হওয়াই স্বাভাবিক। ইহার ফলে তাহার আরও দুর্বল হইয়া পড়িবারই সম্ভাবনা থাকে।

বিলুপ্তির প্রাক্কালে কতকগুলি জীববংশের বিশেষ পরিবর্তন সম্বন্ধে উড্ওয়ার্ড প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি যে সব লক্ষণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের একটি হইল, জীবের অতিবৃদ্ধি। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বিশেষ করিয়া অতিকায় সৌরোপোডাস ডাইনোসোর ও টিটেনোথোরেসের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। টিটেনোথোরেসের আকার প্রথম যুগে ছোট ছিল। ইহার আকার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং প্রায় শেষ অবস্থায় ইহারা অতিকায় জীবে পরিণত হয়। অপর আর একটি লক্ষণ—পাখনার আকারে মেরুদণ্ডের বিস্তার। কয়েকটি শ্রেণীর ডাইনোসোর ও প্রথম যুগের কতকগুলি স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে ইহার প্রকাশ ঘটিয়াছিল। অকালে দন্তস্খলন, স্বল্পদন্ত বা সম্পূর্ণ দন্তবিহীন শ্রেণীর উদ্ভবকে তিনি আর একটি বিশেষ লক্ষণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অবলুপ্তির যুগে ডাইনোসোর, ইক্থিওসোর, টেরোড্যাকটিলের মধ্যে দন্তবিহীন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটিতে দেখা যায়। উড্ওয়ার্ড এই বিশেষ লক্ষণগুলিকে বার্ধক্য বা অবনতির নিদর্শনরূপেই প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহাদের মধ্যে দেহের অতিবৃদ্ধি ও মেরুদণ্ডের বিস্তার, পিটুইটারী গ্রন্থির অস্বাভাবিকতা হইতে সৃষ্ট হইতে পারে বলিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যে সকল আদিম সরীসৃপকুল ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে দেহের এইরূপ অতিবৃদ্ধি বা নিষ্প্রয়োজনীয় অস্থি-অংশের আধিক্য ঘটিয়াছে, সে সকল জীবের করোটির স্থানবিশেষের গহ্বরের আয়তন হইতেও উহাদের পিটুইটারী গ্রন্থির আকার যে বড় ছিল, ইহাই প্রমাণিত হয়। পিটুইটারীর সঙ্গে দেহের অন্যান্য হর্মোন-নিঃসারক

গ্রন্থিগুলির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। দেহের এই গ্রন্থিগুলির কার্যকারিতায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইলে নানাভাবেই শারীরিক সাম্য ব্যাহত হইতে পারে। তাহার ফলে শুধু অস্থির অতিবৃদ্ধিই নয়, অন্যান্য অনেক অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পাইতে পারে; এমন কি, প্রজনন ক্ষমতা পর্য্যন্ত হ্রাস বা লোপ পাইতে পারে। শারীরিক সাম্যের অভাবে এইরূপ নিষ্প্রয়োজনীয় অংশের আধিক্য দেহের বোঝাস্বরূপ হইয়া ঐ সকল জীবের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সংগ্রামে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়াই অনেকে মনে করেন।

মেরুদণ্ডী জীবের ইতিহাসে ডিভোনিয়ান, পারমোট্রায়াস এবং ক্রিটেসাস-ইয়োসিনকে প্রধান বিবর্তন যুগ বলা হইয়া থাকে। এই তিনটি যুগে একদিকে যেমন নানাপ্রকার মেরুদণ্ডী জীবের উদ্ভব ঘটিয়াছে, সেইরূপ আবার এই সময়েই অনেক জীববংশের অবলুপ্তিও ঘটিয়াছে। প্রকৃতি যেন আপন নিয়মে জীবনযুদ্ধে অবসন্ন শ্রেণীগুলিকে ছাটিয়া ফেলিয়া ক্রমাগত অধিকতর সক্ষম জীব দ্বারা উহাদের অভাব পূরণ করিয়া লইয়াছে। পৃথিবীতে জীবকুলের এই সৃষ্টি ও ধ্বংসের ব্যাপারটি হয়তো প্রধানতঃ উহাদের শারীরতাত্ত্বিক রহস্যের মধ্যেই নিবদ্ধ। আভ্যন্তরীণ কারণেই জীবকুল হীনশক্তি হইয়া পড়িয়াছে এবং তদবস্থায় পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিকও অতিমাত্রায় অসহনীয় হইয়াছে। কাজেই জীববংশের বিলুপ্তি যে স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটিয়াছে, এই মতবাদই এখন প্রসার লাভ করিতেছে।

আলোকের স্বরূপ

শ্রীহৃষীকেশ রায়

তাপ, আলোক, তড়িৎ প্রভৃতি সকল শক্তির উৎস সূর্য। সূর্য হইতেই আলোক-রশ্মি আসিয়া সকল পার্থিব পদার্থকে দৃশ্যমান করে এবং আমরা তাহাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি। দীপ্তিমান বিজলী বাতি, অগ্নিকণা প্রভৃতি পদার্থেরও দীপ্তির আদি উৎস সূর্য।

একই প্রকার গুরুত্ববিশিষ্ট স্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়া আলোকরশ্মির তরঙ্গায়িত গতিপথ স্বভাবতঃ সরল। কিন্তু এই গতিপথে অন্য একটি ভিন্ন গুরুত্ববিশিষ্ট স্বচ্ছ পদার্থ থাকিলে সেই দুই প্রকার গুরুত্ববিশিষ্ট পদার্থের সংযোগস্থলে আলোক-রশ্মি তাহার গতিপথ পরিবর্তিত করিয়া দ্বিতীয় পদার্থের মধ্যে আর পূর্বপথ অনুসরণ করে না, একটু বাঁকিয়া অন্য সরলরেখায় গমন করে। বায়ুর মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে আলোক-রশ্মি যখন পথিমধ্যে অধিক গুরুত্ববিশিষ্ট কাচ বা অন্য কোন স্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়া গমন করে, তখন প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে আলোকরশ্মি তাহার গতিপথ পরিবর্তন করে। আলোক-রশ্মির এইরূপ গতিপথ পরিবর্তনের নাম প্রতিসরণ। ভিন্ন গুরুত্ববিশিষ্ট স্বচ্ছ পদার্থের যে বিন্দুতে আলোকরশ্মি পতিত হয়, সেই বিন্দুকে আপাতন-বিন্দু এবং প্রবিষ্ট রশ্মিকে প্রতিসৃত রশ্মি বলে। কিন্তু এক মাধ্যম হইতে অপর মাধ্যমে আলোকরশ্মি লম্বভাবে পতিত হইলে আলোকের প্রতিসরণ হয় না। ঐ আপতন-বিন্দুতে পদার্থের উপর লম্ব অঙ্কিত করিলে দেখা যাইবে যে, আলোকরশ্মি লঘুতর মাধ্যম হইতে ঘনতর মাধ্যমে প্রবেশ করিলে প্রতিসৃত রশ্মি লম্বের দিকে

হেলিয়া যায় কিন্তু ইহার বিপরীত অবস্থায় উহা লম্ব হইতে দূরে সরিয়া যাইবে।

বেগুনী, গাঢ় নীল, নীল, সবুজ, হল্‌দে, নারঙ্গ (orange) এবং লাল এই সাতটি বর্ণের সমাবেশে সূর্য-রশ্মি গঠিত। সূর্যরশ্মির এই বর্ণ বৈচিত্র্য সর্বপ্রথম বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক স্যর আইজ্যাক নিউটন লক্ষ্য করেন। রামধনুতেও আমরা ঐ বর্ণের সমাবেশ দেখি। সূর্যরশ্মিকে ত্রিপার্শ্ব কাচের (Prism) মধ্য দিয়া যাইতে দিলে উহা উক্ত সাতটি বিভিন্ন বর্ণে ঐ ক্রম অনুযায়ী পৃথক হইয়া যায়। এই বর্ণচ্ছটাকে বর্ণালী বলে। ত্রিপার্শ্ব কাচের মধ্য দিয়া যে কোন উজ্জ্বল সাদা পদার্থকে দেখিলে পূর্বোক্ত সাতটি বর্ণ দেখা যায়। নিউটন পরীক্ষার দ্বারা দেখান যে আলোক-রশ্মিকে বিশ্লেষণ করা ব্যতীত ত্রিপার্শ্ব কাচের এই বর্ণ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিবার নিজস্ব কোন ক্ষমতা নাই। গুরু স্বচ্ছ পদার্থ অপেক্ষা লঘু স্বচ্ছ পদার্থের মধ্যে আলোকের গতিবেগ অধিক ; আবার গুরু স্বচ্ছ পদার্থের মধ্যে লাল আলোক-রশ্মির গতিবেগ বেগুনী আলোক-রশ্মির গতিবেগ অপেক্ষা বেশী। সেজন্য বেগুনী আলোক-রশ্মির মত লাল আলোক-রশ্মি তত বেশী বাঁকিয়া যায় না। ফলে, সাদা সূর্য-রশ্মি সাতটি বিভিন্ন বর্ণে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়।

মোটর গাড়ার গতিপথে যদি কোন ত্রিভুজাকৃতি কর্দমাক্ত স্থান এমনভাবে থাকে যে, গাড়ার সম্মুখের ডান চাকাটি প্রথমে কর্দমে পড়ে, তাহা হইলে অপর তিনটি চাকার বেগ অপেক্ষা ইহার বেগ মন্দীভূত হইবে। ইহার ফলে গাড়ীটি ডানদিকে বাঁকিয়া যাইবে। যখন চারিটি চাকাই কর্দমে পড়িবে তখন তাহাদের বেগ পূর্বাপেক্ষা কম হইলেও সমান হইবে এবং গাড়ীটি সোজা যাইবে। কিন্তু কর্দমাক্ত পথের প্রান্তে সামনের বাম চাকাটি প্রথমে পাকা রাস্তা স্পর্শ করিবে এবং তাহার গতিবেগ অপর তিনটি চাকা অপেক্ষা বর্ধিত হইবে। ফলে, গাড়ীটি আরও ডানদিকে ঘুরিয়া যাইবে। ত্রিপার্শ্ব কাচের মধ্যে প্রবেশ ও বহির্গমনকালীন আলোক-রশ্মিও ঠিক যেন এই অবস্থাই প্রাপ্ত হয়।

রঙীন অনচ্ছ (Opaque) পদার্থের ধর্ম এই যে, ইহার উপর সাদা আলোক-রশ্মি পতিত হইলে ইহা পূর্বোক্ত সাতটি বর্ণের মধ্যে এক বা একাধিক যে কয়টি বর্ণে ইহার বর্ণসজ্জা গঠিত, সেই বর্ণগুলিই প্রতিফলিত বা বিক্ষিপ্ত হয় এবং অবশিষ্টগুলি পদার্থটির দ্বারা শোষিত হয়। একটি লাল জবা-ফুলকে বর্ণালীর লাল রশ্মির মধ্যে রাখিলে উহা উজ্জ্বল লাল দেখাইবে ; কিন্তু ইহাকে লাল ব্যতীত অন্য যে কোন বর্ণের রশ্মির মধ্যে রাখিলে ইহা সেই বর্ণের রশ্মি শোষণ করে বলিয়া ইহাকে কালো দেখাইবে। লাল ব্যতীত অন্য যে কোন বর্ণের রঙীন কাচের মধ্য দিয়া লাল জবাফুলটি দেখিলে এই সত্য প্রমাণিত হয়। কোন পদার্থ বর্ণালীর সাতটি বর্ণকে শোষণ করিলে পদার্থটিকে কালো এবং সাতটি বর্ণকে বিক্ষিপ্ত করিলে পদার্থটিকে সাদা দেখায়। সেজন্য কালো কোন বর্ণ নয়।

বর্ণালীর এই সাতটি বর্ণের মধ্যে লাল, নীল ও হল্‌দে—এই বর্ণ তিনটি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মুখ্য বা আদি বর্ণ ; কারণ অন্য কোন বর্ণের সংমিশ্রণে এই বর্ণ তিনটি উৎপন্ন হয় না। কিন্তু ঐ বর্ণ তিনটির বিভিন্ন অনুপাতে সংমিশ্রণে বর্ণালীর অবশিষ্ট চারিটি বর্ণ এবং আর নানাপ্রকার বর্ণ সৃষ্টি করা যায়। দুই মুখ্য বর্ণের আনুপাতিক মিশ্রণে মিশ্র বর্ণের সৃষ্টি হয়। সমপরিমাণ হল্‌দে ও লাল রঙের মিশ্রণে নারঙ্গ, হল্‌দে ও নীলে সবুজ, লাল ও নীলে বেগুনী এবং তিনটি মুখ্য বর্ণের সংমিশ্রণে ধূসর প্রভৃতি গৌণ বর্ণের সৃষ্টি হয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহারা গৌণ বর্ণ হইলেও বর্ণালীতে ইহারা মুখ্য বর্ণ এবং ইহাদের মিশ্রণে বর্ণালীতে সাদা রঙের সৃষ্টি হয়।

প্রত্যেক পদার্থের যে নিজস্ব বর্ণ তাহার সহিত সূর্যালোকের সংবন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। আলোক এক-প্রকার শক্তি। কল্পিত ইথারের মধ্যে তরঙ্গ সৃষ্টি

করিয়া আলোকরশ্মি তাহার উৎস হইতে স্থানান্তরে গমন করে। এই তরঙ্গ আমাদের চক্ষুতে প্রবেশ করিলে আমরা আলোকিত পদার্থ দেখিতে পাই। আলোক রশ্মি ইথারে যে তরঙ্গ সৃষ্টি করে তাহাদের সকলের দৈর্ঘ্য সমান নয়। এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পার্থক্যই বিভিন্ন বর্ণের অনুভূতির সৃষ্টি করে। লাল বর্ণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দীর্ঘতম, বেগুনী বর্ণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ক্ষুদ্রতম। বেগুনী হইতে লোহিত পর্যন্ত বর্ণগুলি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ক্রম অনুসারে সজ্জিত। ইহা ব্যতীত অতি-বেগুনী (ultra-violet), অব-লোহিত (infra red) নামক যে দুইটি বর্ণ আছে তাহা বিজ্ঞান-জগতে সুপরিচিত হইলেও আমাদের দৃষ্টিশক্তির বহির্ভূত; কারণ আমাদের চক্ষু ইহাদের তরঙ্গগুলিকে ধরিতে অক্ষম।

একটি বৃত্তকে সমান বার ভাগে বিভক্ত করিয়া ১, ৫, ৯নং ঘর তিনটিতে যথাক্রমে লাল, নীল, হল্‌দে মুখ্য বর্ণ তিনটির সমাবেশ করা গেল। এক্ষণে সমপরিমাণ লাল ও নীলের মিশ্রণে বেগুনী, নীল ও হল্‌দের মিশ্রণে সবুজ এবং হল্‌দে ও লালের মিশ্রণে যে নারঙ্গ বর্ণ পাইলাম তাহাদের দ্বারা যথাক্রমে ৩, ৭, ১১নং ঘর পূরণ করা গেল। পুনরায় ১-৩, ৩-৫, ৫-৭, ৭-৯, ৯-১১, ১১-১নং ঘরের রং যথোপযুক্ত অনুপাতে মিশাইলে যে বিভিন্ন প্রকার হাল্‌কা বর্ণের সৃষ্টি হইবে, তাহাদের দ্বারা অবশিষ্ট ২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২নং ঘরগুলি যথাক্রমে পূরণ করিলে বারটি নয়নরঞ্জন বর্ণ পাওয়া যাইবে। এইরূপে বিভিন্ন অনুপাতে বিভিন্ন বর্ণ মিশাইয়া আরও নানাপ্রকার মিশ্র বর্ণ সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়াছে। এই বৃত্তের মধ্যে যে কোন দুইটি বিপরীত প্রান্তের বর্ণকে পরস্পরের পরিপূরক বর্ণ বলে। যেমন, লালের পরিপূরক বর্ণ সবুজ; কিন্তু এই সবুজ বর্ণ পাওয়া গিয়াছে অপর দুইটি মুখ্য বর্ণের সমপরিমাণ মিশ্রণে। যে কোন মুখ্য বর্ণের পরিপূরক অপর দুই মুখ্য বর্ণের মিশ্রণে পাওয়া যায়। আবার সময় সময় যে দুই বর্ণের মিশ্রণে শ্বেতবর্ণের সৃষ্টি হয় তাহাদিগকেও পরস্পরের পরিপূরক বলে; যেমন—সবুজ ও লাল, নারঙ্গ ও নীল, হল্‌দে ও ঘন নীল, বেগুনী ও নীলাভ হল্‌দে। বিভিন্ন কার্যে ব্যবহারের জন্য বর্ণবৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে এই পরিপূরক বর্ণের সহায়তা বিশেষ আবশ্যক। পরিপূরক বর্ণগুলি পরস্পরের বর্ণগৌরব বৃদ্ধি করে। কোন কার্যে তিনটি বর্ণ আবশ্যক হইলে ঐ বৃত্তের মধ্যবর্তী সমব্যবধানে তিনটি বর্ণ লইলে রঞ্জন কার্য নয়নলোভন হয়; কিন্তু মুখ্য বর্ণ তিনটি এরূপ ক্ষেত্রে অচল। আমরা ঘরে-বাহিরে সর্বদা যে স্বাভাবিক বা কৃত্রিম নানা বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ দেখিয়া মুগ্ধ হই তাহাও মূলতঃ বিশ্লিষ্ট সূর্য-রশ্মির বিকাশ মাত্র।

বিজ্ঞান সংবাদ

কৃত্রিম উপায়ে মানবদেহের গ্রন্থি উৎপাদন

দেহের কোন গ্রন্থি বা ক্ষুদ্র যন্ত্র রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িলে পরীক্ষাগারে ঐরূপ যন্ত্র উৎপাদন করিয়া দেহে সংযোজন করা চলিবে বলিয়া সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা আশা করিতেছেন।

বেথেস্ডার ন্যাশন্যাল ক্যান্সার ইন্‌ষ্টিটিউটের ডাঃ ইভান্স এক সভায় প্রকাশ করেন যে, মানব-দেহের টিস্যু কালচার পরীক্ষায় যে সমস্ত ফল পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে আশা করা যায়, অতঃপর দেহের কোন যন্ত্রের কর্মক্ষমতা নষ্ট হইলে তাহা বাদ দিয়া ঐ স্থানে পরীক্ষাগারে উৎপন্ন একটি কৃত্রিম যন্ত্র সংযোজন করিয়া উহার অভাব পূরণ করা সম্ভব হইবে। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী হইতে এমনও আশা করা যায় যে, উপযোগী কৃত্রিম যন্ত্র সংযোজন করিয়া বার্ধক্যেও তারুণ্য আনয়ন করা যাইতে পারে। এমন কি, রোগগ্রস্ত হৃৎপিণ্ড বাদ দিয়া তাহার স্থানে একটি কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডও সংযোগ করা সম্ভব।

দেহের কোন্ কোন্ গ্রন্থি বা তন্তু কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদন করা হইবে, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কিছু উল্লেখ না করিয়া ডাঃ ইভান্স বলেন যে, শল্য-চিকিৎসায় মেরামতি কাজের জন্য পরীক্ষাগারে ঐরূপ তন্তুর উৎপাদন একান্ত প্রয়োজন। টেষ্ট-টিউবের মধ্যে এইরূপ কার্যকরী তন্তু উৎপাদনের প্রচেষ্টার উপর তিনি বিশেষভাবে জোর দেন।

বর্তমানের উন্নত টিস্যু-কালচারের ব্যবস্থায় বিশেষ রকমের কোষ হইতে এই নূতন ধরণের দেহ-যন্ত্র পরীক্ষাগারে উৎপন্ন করা হইবে। আকারে স্বাভাবিক গ্রন্থি, পাকস্থলী বা কিড্‌নির মত দেখিতে না হইলেও কৃত্রিম যন্ত্রগুলির কর্মক্ষমতা ইহাদেরই অনুরূপ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। উন্নত উপায় অবলম্বন করিয়া পোলিয়ো-ভাইরাস কালচার করিয়া উহা হইতে টিকা উৎপাদন করা হইতেছে।

কৃত্রিম পরিবেশে দেহজাত কোষ কালচার করিবার ফলে ক্যান্সার কোষের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে। তিনি বলেন যে, দেহের সাধারণ কোষ এবং ক্যান্সার-উৎপাদক কোষের মধ্যে একপ্রকার প্রতিরোধী রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ক্যান্সার কোষগুলি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। টেষ্ট-টিউবের মধ্যে কালচার করিলে কোন্ কোন্ রাসায়নিক পদার্থ কোন্ প্রকার কোষের পুষ্টিসাধন করে তাহা নির্ণয় করা সম্ভব। কোষগুলি জীবিত থাকিয়া বৃদ্ধি পাইতে রাসায়নিক পদার্থের উপাদানের কিরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহাও পরিষ্কারভাবে জানা যায়। বর্তমানে প্রচলিত উপায়ে একখণ্ড তন্তু কালচার করিলে ক্যান্সার ও সাধারণ কোষের মৌলিক ক্রিয়াগুলির সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ হয় না। ইহার কারণ এই যে, একখণ্ড তন্তুর মধ্যে বহুপ্রকার কোষ বর্তমান থাকে। বিভিন্ন প্রকার কোষসমন্বিত তন্তুর সমষ্টিগত খাদ্যের চাহিদা ও ব্যবহার কখনই উহার একটি স্বতন্ত্র কোষের অনুরূপ হইতে পারে না।

বিভিন্ন কোষের খাদ্যের চাহিদা সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করা হইয়াছে। ৬৫ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তির ত্বকের কোষ সংগ্রহ করিয়া কালচার করা হইতেছে। প্রোটিন ব্যতীত কেবল কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে ঐ কোষগুলি চার মাস যাবৎ বর্ধিত হইয়া চলিয়াছে। একটি ইঁদুরের ত্বকের কোষও ঐ ভাবে দ্রুত বর্ধনশীল অবস্থায় ২১ মাস রাখা হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় কালচার মিডিয়ামে

একটি একটি করিয়া বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করিয়া কোষগুলির প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা যাইতে পারে।

গাইগার কাউন্টারের সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের কর্মক্ষমতা পরিমাপ

গাইগার কাউন্টারের সাহায্যে এক অভিনব ব্যবস্থায় হৃৎপিণ্ডের কর্মক্ষমতা ও দেহে রক্ত সঞ্চালনের গতি পরিমাপের একটি সহজ উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে।

আমেরিকান সোসাইটি অব ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজিষ্টের এক সভায় ডাঃ ওয়েবার প্রমুখ কতিপয় বিজ্ঞানী এই ব্যবস্থার কৌশল সম্বন্ধে এক বিবৃতি দেন। রক্তের প্লাজমার সহিত তেজস্ক্রিয় আয়োডিন মিশ্রিত করিয়া দেহের কোন স্থানে ইন্‌জেকসন করা হয় এবং হৃৎপিণ্ডের নিকটে একটি গাইগার কাউন্টার স্থাপন করিয়া তেজস্ক্রিয় আয়োডিন কতক্ষণ পরে হৃৎপিণ্ডে পৌঁছায় তাহা নির্ণয় করা হয়। উহা কতক্ষণ হৃৎপিণ্ডে অবস্থান করে এবং কতক্ষণ পরে ঐ স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যায় তাহাও নির্ণয় করা হইয়া থাকে। ইহা হইতে চিকিৎসক রোগীর হৃৎপিণ্ডের কর্মক্ষমতা পরিমাপ করেন।

বিজ্ঞানীরা বলেন, এই ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন করিয়া ফুস্‌ফুসের ক্যান্‌সার বা অন্য কোন বিকলতাও পর্যবেক্ষণ করা যাইতে পারে।

গো-দুগ্ধের ভিটামিন বি-১২

ইউ. এস. কৃষি বিভাগের বিজ্ঞানীরা প্রকাশ করেন, গো-দুগ্ধে যে রক্তাল্পতা নিবারক ভিটামিন বি-১২ থাকে তাহা গাভীর খাদ্যের তারতম্যের উপর নির্ভরশীল নহে। গাভী যে খাদ্যই গ্রহণ করুক না কেন, উহাতে যদি উপযুক্ত পরিমাণে কোবাল্ট থাকে তবে খাদ্য নির্বিশেষে দুগ্ধে ঐ ভিটামিন উৎপন্ন হইতে থাকিবে। খাদ্যে কোবাল্টের পরিমাণ ঠিক থাকিলে গরুর জাতিভেদেও ঐ ভিটামিন উৎপাদনের বিশেষ কোন তারতম্য ঘটে না। হোলষ্টিন এবং জার্সি উভয় জাতীয় গাভীর দুগ্ধে প্রায় একই পরিমাণ ভিটামিন বি-১২ থাকিতে দেখা যায়। ইহার কারণ এই যে, গাভীর পাকস্থলীর মধ্যে অবস্থিত জীবাণুগুলি ভিটামিন বি-১২ উৎপাদন করে। দুগ্ধকে প্যাষ্টুরাইজ করিলে বা রেফ্রিজারেটরের মধ্যে সংরক্ষণ করিলেও তিন দিনের ভিতরে এই ভিটামিন নষ্ট হয় না।

চিজ বা পনিরের মধ্যেও এই ভিটামিন দেখিতে পাওয়া যায়। যত প্রকার চিজ পরীক্ষা করা হয় তাহার মধ্যে সুইজারল্যাণ্ডের চিজেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভিটামিন বি-১২ পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা বলেন, সুইজারল্যাণ্ডের চিজের ভিটামিন বি-১২ সর্বাধিক হইবার কারণ এই যে, ঐ চিজ প্রস্তুতের সময় উহাতে প্রোপিওনিক ব্যাক্‌টিরিয়ার দ্বারা ভিটামিন বি-১২ সংশ্লেষিত হইয়া থাকে।

পুং-হর্মোনের সাহায্যে শল্য-চিকিৎসার রোগীদের পুষ্টিলাভ

শল্য-চিকিৎসার পরে অনেক ক্ষেত্রে কয়েকদিন যাবৎ রোগীদের সরাসরি কিছু খাইতে দেওয়া হয় না। এরূপ অবস্থায় অস্ত্রোপচারের পূর্বে রোগীদের দেহে পুং-হর্মোন ইনজেকসন করিয়া তাহাদের দেহের স্বাভাবিক অবস্থা সংরক্ষণে বিশেষ সুফল পাওয়া গিয়াছে।

কতকগুলি রোগীর পাকস্থলীর কিয়দংশ বাদ দেওয়া হয় এবং আর কতকগুলির গল-ব্লাডার বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া হয়। এই দুই দল রোগীকে অস্ত্রোপচারের পূর্বে ডেপো-নর্টেস্টোনেট নামক পুং-হর্মোন সমন্বিত ঔষধ ইনজেকসন করা হইয়াছিল। চিকিৎসার পরে উপযুক্ত পরিমাণে ক্যালরি ও প্রোটিন না পাইলেও তাহাদের দেহের ওজন হ্রাস পায় নাই বা দেহে প্রোটিনের অভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। অন্য এক ক্ষেত্রে অপর একটি

পুং-হর্মোন সমন্বিত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অনুরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে।

অন্ধের দৃষ্টি-সহায়ক ইলেকট্রনিক যন্ত্র

দৈনন্দিন সাধারণ কাজে অন্ধদের সাহায্যের জন্য এক অভিনব ইলেকট্রনিক যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। পঞ্চাশ জন অন্ধের দ্বারা শীঘ্রই এই যন্ত্রটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হইবে। যন্ত্রটি ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় শব্দ-তরঙ্গের মাধ্যমে অন্ধকে যে কোন আলোকিত দ্রব্যের অবস্থান জ্ঞাপন করে।

একটি বড় ফাউণ্টেন পেনের মত আকারের অন্ধের এই অভিনব চক্ষুর উপর পতিত আলোক-রশ্মির তীব্রতা অনুসারে অন্ধের কানে শব্দেরও তারতম্য ঘটে। জন্মান্ধ ডাঃ উইচার এই যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেন। ৪২ বৎসর বয়সে গত অক্টোবর মাসে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার জীবদ্দশাতেই এই যন্ত্রটি প্রথম নির্মাণ করা হয়। এখন ডান্ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েটস্ যন্ত্রটি নির্মাণের ভার লইয়াছেন।

জন্মান্ধ হইলেও ডাঃ উইচার কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির পি-এইচ. ডি উপাধি লাভ করিয়া বেল টেলিফোন লেবরেটরীর পদার্থ-বিদ্যা বিভাগে গবেষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

ক্লোরেলা সংযোগে রুটির পুষ্টিকারিতা বৃদ্ধি

অনেক পুষ্করিণীর জলে সবুজ সরের মত এক-প্রকার পদার্থ দেখা যায়। এইগুলি হইল এক-প্রকার এককোষী অ্যালগী। ঐরূপ একজাতীয় এককোষী উদ্ভিদ ক্লোরেলার আলোক-সংশ্লেষণ ক্রিয়া ত্বরান্বিত করিয়া মানুষের ব্যবহারোপযোগী পুষ্টিকর খাদ্য-উপাদান প্রস্তুত করিবার জন্য বিজ্ঞানীরা কিছুকাল যাবৎ গবেষণা করিতেছেন।

সম্প্রতি বেথেস্ডার ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব হেল্‌থের ডাঃ হ্যাণ্ডলি ও ডাঃ ইং-এর পরীক্ষা হইতে জানা গিয়াছে যে, ক্লোরেলার সাহায্যে রুটির পুষ্টিকারিতা যথেষ্ট বর্ধিত করা সম্ভব। তাঁহারা বলেন, দুইটি প্রোটিন গঠনকারী অ্যামিনো অ্যাসিড লাইসিন ও থ্রিয়োনাইন ক্লোরেলা হইতে সংগ্রহ করিয়া রুটিতে মিশ্রিত করিলে প্রোটিন খাদ্যের চাহিদা সস্তায় মিটিতে পারে। গবেষণাগারে ইঁদুরকে এইরূপ প্রোটিন-সমৃদ্ধ রুটি বা ময়দা খাওয়াইয়া দেখা গিয়াছে যে, ২১ দিনের মধ্যেই তাহাদের দেহের ওজন সাধারণ খাদ্যে পুষ্ট ইঁদুর অপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পায়।

উল্লিখিত দুইটি অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে লাইসিন মোটামুটি অল্প মূল্যে সংশ্লেষণ করিয়া উৎপাদন করা যায়। পরীক্ষামূলকভাবে লাইসিন-সমৃদ্ধ রুটি বাজারে সরবরাহ করা হইতেছে। কিন্তু থ্রিয়োনাইন হইল অধিক ব্যয়সাপেক্ষ। সেই জন্য বিজ্ঞানীরা দেখিতেছেন, সরাসরি ক্লোরেলা সংযুক্ত করিলে ইহা থ্রিয়োনাইনের পরিপূরক হয় কি না।

ইঁদুরের ক্ষেত্রে খাদ্যের উপযোগিতা এবং দৈহিক বৃদ্ধি উভয় দিক হইতেই বিচার করিয়া দেখা হইয়াছে; অর্থাৎ খাদ্যের পরিমাণের সহিত দৈহিক ওজন বৃদ্ধির অনুপাত পর্যবেক্ষণ করা হইয়াছে। পরীক্ষার ফল হইতেই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, ক্লোরেলা সংযোগে থ্রিয়োনাইনের কার্য ভালভাবেই সম্পন্ন হয়। ইহা সয়াবিনের প্রোটিন অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর এবং ডিম বা লিভারের প্রোটিনের সমকক্ষ।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

আপেক্ষিকতার অ, আ, ক, খ

শ্রীঅনাদিজীবন দাস

ও

শ্রীমতী ললিতা ভাদুড়ী

ফরাসী দেশের পারী নগরীতে একটা প্ল্যাটিনাম রড খুব সযত্নে সংরক্ষিত আছে। রডটা মূল্যবান প্ল্যাটিনাম ধাতু দিয়ে তৈরী বলেই যে তার এত কদর তা নয়, আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এই রডটার দৈর্ঘ্যই পৃথিবীতে দৈর্ঘ্যের মাপকাঠি হিসাবে সর্বজনগ্রাহ্য। মনে করা যাক, ঐ রডটার সঙ্গে আগাগোড়া মিলিয়ে আর একটা মিটার স্কেল তৈরী করা হলো। ধরা যাক, এমন একটা ঘড়ি তৈরী করা হলো যেটা হাজার বছরেও একচুল সময় এদিক-ওদিক করবে না। এরূপ অভ্রান্ত সময়রক্ষক ও দৈর্ঘ্যের মাপকাঠি - এই দুটি জিনিষ আপনার কোন বন্ধুর হাতে দিয়ে তাকে একটি রকেটে তুলে দিন।

রকেট আপনার বন্ধুকে নিয়ে আপনার কাছ থেকে প্রচণ্ড বেগে ছুটতে লাগলো। কতটা বেগে ছুটলে আপনার বন্ধুর মনোমত হবে? সেকেণ্ডে হাজার মিটার, লক্ষ মিটার তো আজকাল সবাই হামেশা ছুটছে! আপনার বন্ধু রকেটের গতি বাড়িয়ে প্রায় আলোর গতির (সেকেণ্ডে ৩ কোটি মিটার) সমান করে নিলেন এবং সঙ্গের স্কেলটা রকেটের দৈর্ঘ্য বরাবর রেখে ঘড়িটা হাতে নিয়ে বসে রইলেন।

এখন আপনার পক্ষে যদি সেই চলন্ত স্কেল ও ঘড়ি দেখা সম্ভব হতো তবে কি দেখতেন? দেখতেন ঘড়িটা ভয়ানক আস্তে চলেছে, আর লম্বা স্কেলটা এতটুকু হয়ে গেছে। কথাটা নিশ্চয় বিশ্বাস হচ্ছে না। আপনার ধারণা, কলকজা ঠিক থাকলে রকেট যতই জোরে চলুক না কেন, ঘড়িটা আস্তে চলবে কেন? আর স্কেলটাই বা ছোট হয়ে যাবে কেন? কিন্তু কথা হচ্ছে—চলার গতির সঙ্গে স্কেলের মাপ আর ঘড়ির ছন্দ বদলাবে না, এ বিশ্বাস আপনার কেমন করে হলো? আপনি কি নির্ভরযোগ্য কোন পরীক্ষা করে দেখেছেন?

আইনস্টাইন যখন ১৯০৫ সালে আপেক্ষিকতা-বাদের অবিশ্বাস্য কথাগুলি বলতে আরম্ভ করেন তখন পর্যন্ত অবশ্য প্রত্যক্ষ কোন পরীক্ষা হয় নি, যাতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, গতির ফলে দৈর্ঘ্য এবং সময় পরিবর্তিত হয়। তবে আর একটি পরীক্ষা হয়েছিল যার পরোক্ষ ফল দৈর্ঘ্য ও সময়ের উপর গিয়ে বর্তালো; আর শেষ পর্যন্ত দেশ ও কালের পূর্বতন ধারণার আমূল পরিবর্তন করে আপেক্ষিকতাবাদের জন্ম হলো। এই পরীক্ষাটি করেছিলেন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী মাইকেলসন (১৮৮০ সাল)।

ইয়ং, হিগিন্স্, ফ্রেনেল প্রভৃতির সময় থেকেই প্রমাণিত হয়েছে যে, আলো একরকম তরঙ্গ বিশেষ। তরঙ্গ বলতেই সাধারণের চোখের সামনে যে ছবি ফুটে ওঠে, তা হচ্ছে জলের উপরে ঢেউ ওঠবার দৃশ্য। জলের ঢেউ যেখান দিয়ে ছড়িয়ে যায় সেখানে দোলা লাগে। শব্দের তরঙ্গ বাতাসের মাধ্যমে যেখান দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে সেখানেও স্পন্দন উৎপন্ন হয়। এখন আলোর স্পন্দনের জন্যেও মাধ্যমের প্রয়োজন হলো। এই মাধ্যমই উনবিংশ শতাব্দীর ইথার। আলো শূন্যপথে নক্ষত্র থেকে আসে, আবার স্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়েও আসে।

তাই, কি পদার্থের অণু-পরমাণুর মধ্যে, কি বাইরের সমগ্র শূন্যে—সবখানেই এই ইথার পরিব্যাপ্ত। সূর্য তার গ্রহ-উপগ্রহগুলিকে ঘূরপাক খাওয়াতে খাওয়াতে মহাশূন্যে ইথারের মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে। নিশ্চয় আমাদের পৃথিবীরও এই ইথারের সমুদ্রে একটা গতি আছে। মাইকেলসনের উদ্দেশ্য ছিল, পৃথিবীর এই গতি নির্ণয় করা। পরীক্ষার শেষে মাইকেলসন, তথা সারা পৃথিবী স্তম্ভিত হলো। ইথারের সমুদ্রে পৃথিবীর কোনও গতি নেই! কক্ষপরিক্রমায় ভিন্ন গতিবিশিষ্ট অন্য কোনও গ্রহে এই পরীক্ষা করলেও নিশ্চয়ই দেখা যেত, সে গ্রহেরও ইথারের মধ্যে কোন গতি নেই। অর্থাৎ যে কেউ নিজেকে ইথারের সমুদ্রে সর্বদা স্থির ভাবতে পারেন। যাহোক, মাইকেলসনের পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে আর একটু গভীরভাবে অনুসন্ধান করে পরে এই ইথারকে বরবাদ করে দিলেও কোন ক্ষতি নেই।

ধরুন, দীঘির মাঝখানে একটা ঢিল ফেলা হয়েছে। ঢেউ বৃত্তকারে ছড়িয়ে পাড়ের দিকে সেকেণ্ডে c মিটার গতিতে এগিয়ে আসছে। আপনি ইতিমধ্যে ভেলায় চেপে জলের উপর দিয়ে সেকেণ্ডে v মিটার করে দীঘির মাঝের দিকে যাচ্ছেন। আপনার কাছে ঢেউগুলি নিশ্চয়ই সেকেণ্ডে c+v মিটার করে এগিয়ে আসছে। এবার মনে করা যাক, ঢিলটা একটা নক্ষত্র, ঢেউ-গুলি আলোর স্পন্দন, জলটা ইথার আর আপনার ভেলাটা হলো পৃথিবী। মাইকেলসনের পরীক্ষানুসারে ইথারের মধ্যে পৃথিবীর v শূন্য। অতএব আলোর ঢেউ পৃথিবীর দিকে সেকেণ্ডে c মিটার করেই আসবে। অন্য কথায়, পৃথিবী যে গতিতেই নক্ষত্রের দিকে এগিয়ে যাক না কেন, নক্ষত্রের বিকিরিত আলো c গতিতেই পৃথিবীতে এসে পৌছাবে। আলোর গতি, দর্শক বা উৎপত্তি-কেন্দ্রের গতি নিরপেক্ষ। এই বৈপ্লবিক সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পূর্বপ্রচলিত ধারণার সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটেছে। এই বিচারের ধারায় প্রথমে বদ্‌লালো দেশ ও কাল। কেমন করে—বলছি।

মনে করা যাক, মহাশূন্যে আপনি ও আপনার বন্ধু এবার দুটা আলাদা রকেটে চেপে দূর থেকে স্থির গতিতে পরস্পরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। আপনাদের পারস্পারিক গতি ধরুন, সেকেণ্ডে v মিটার করে। কিছুক্ষণের মধ্যে রকেট দুটা পাশ কাটিয়ে চলে গেল। এরপর থেকে আপনাদের চলে যাওয়ার পারস্পরিক গতি v অক্ষুণ্নই রইল। পাশ কাটাবার সময় সামান্য সংঘর্ষে আলোর উৎপত্তি হয়েছিল। এই সমস্ত ঘটনাটার আপনার বিবরণ কিন্তু হবে নিম্নরূপ :—

আমি আমার রকেট নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম (আমার গতি তুলনা করবার জন্যে আর তৃতীয় কিছু না থাকায়, নিজেকে মহাশূন্য স্থির ছাড়া কি ভাবতে পারি?)। এর মধ্যে বন্ধুটি রকেট নিয়ে এগিয়ে এসে ছোট্ট একটা ধাক্কা দিয়ে v গতিতেই সরে যাচ্ছে। এই সামান্য সংঘর্ষে রকেট থেকে আলো ঠিক্‌রে আমায় কেন্দ্র করে c গতিতে চারদিকে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ছে।

অবাক হলাম; কারণ ঘটনা সম্পর্কে আপনার বন্ধুর বিবৃতিও অবিকল এই রকম। তবে যে কোনও মুহূর্তে (ধরুন t), ছড়িয়ে-পড়া বৃত্তাকার আলোর কেন্দ্র কে?—আপনি, না আপনার দূরে সরে-যাওয়া বন্ধু? মহা সমস্যার কথা! যাহোক, আপনার দৃষ্টিকোণ থেকেই ঘটনাটার একটি ছক আঁকা যাক।

ধরুন, I বিন্দুতে আপনি আপনার রকেট সহ স্থির হয়ে আছেন; ওখানেই সংঘর্ষ ঘটেছিল। আপনার নিখুঁত ঘড়ি অনুসারে এই সময় থেকে t সেকেণ্ড আগে সংঘর্ষ ঘটেছিল। এখন আপনার বন্ধু v গতিতে t সময়ের মধ্যে v.t.

মিটার দূরে U বিন্দুতে। ছবির বৃত্তটি এই মুহূর্তের ছড়িয়ে-পড়া আলোর ঢেউ। U থেকে UP লম্ব টেনে IP যোগ করা গেল। আলো সেকেণ্ডে c মিটার করে কেন্দ্র থেকে সেকেণ্ডে ct মিটার দূরে যাবে। ∴ IP = ct. পীথাগোরাস উপপাদ্য অনুযায়ী আপনার কাছে—

$$PU^2 = IP^2 - IU^2$$
$$= (ct)^2 - (vt)^2$$
$$= t^2 (c^2 - v^2)$$
$$\therefore PU = t\sqrt{c^2 - v^2} \text{ মিটার।}$$

এখন আপনি হয়তো জিজ্ঞেস করবেন PU নিয়ে এত মাথা ঘামানো কেন? সেটা বোঝা অবশ্য খুবই সহজ। রকেটের গতির সঙ্গে
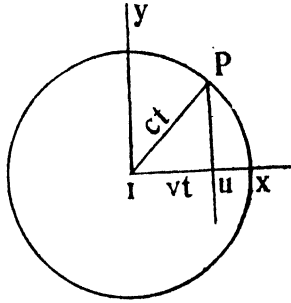
সমান্তরালে রাখলে আপনার দৃষ্টিতে বন্ধুর স্কেলটা লম্বায় বদলে যাবে কিনা, তা ঠিক করে না বলতে পারলেও এটা বোঝা কঠিন নয় যে, গতির আড়াআড়ি স্কেলটা রাখলে তার কোনও অদল-বদল হবে না। তাই আপনার স্কেলেই মাপুন বা বন্ধুর স্কেলেই মাপুন—

$$PU = t\sqrt{c^2 - v^2} \text{ মিটার।}$$

P বিন্দুর আলোর কণিকা (ফটোন) বন্ধুর কাছ থেকে আপনার সময় অনুযায়ী t সেকেণ্ডে PU বা $t\sqrt{c^2 - v^2}$ দূরে গেছে। আপনার দৃষ্টিতে বন্ধুর কাছ থেকে আলোর কণিকা $\frac{t\sqrt{c^2 - v^2}}{t} = \sqrt{c^2 - v^2}$ (c থেকে কম) গতিতে সরেছে। কিন্তু মাইকেলসনের পরীক্ষালব্ধ তথ্যের কথা স্মরণ করুন—কারও গতি v থাক বা না থাক, আলোর গতি সব সময়েই তার কাছে c। অতএব আলো যে বন্ধুর কাছ থেকে c গতিতে সরেছে সেটা নিশ্চিত। আবার এই সময়ের মধ্যে P বিন্দুর আলোর কণিকা আপনার বন্ধুর স্কেলের মাপ অনুযায়ী $= t\sqrt{c^2 - v^2}$ দূরত্ব গেছে তাও নিশ্চিত। সুতরাং বন্ধুর ঘড়িতেও যদি এর মধ্যে t সেকেণ্ড সময় যায় তবে প্রথম নিশ্চিত সত্যটি অবহেলিত হতে বাধ্য।

অতএব আমাদের এই বৈপ্লবিক সমাধান গ্রহণ করতে হবে যে, বন্ধুর ঘড়ি আস্তে চলবে, যাতে এই সময়ের মধ্যে আলোর কণিকা তুলনায় কম দূরে গেলেও বন্ধুর কাছে তার গতি c অক্ষুণ্ণ থাকে। আপনার দৃষ্টিতে গতিমান বন্ধুটির ঘড়ি যে আস্তে চলছে, তার মানে এই নয় যে, ঘড়ির যন্ত্রের অদল-বদল হবে; ব্যাপারটা আরও প্রাথমিক, সময়ই আস্তে চলবে। বন্ধুর শ্বাসপ্রশ্বাস মন্থর হবে, হৃদ্‌স্পন্দন ধীরে চলবে, কর্মচাঞ্চল্য কমে যাবে, আশেপাশের পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের ঘূর্ণন মন্থর হবে—ইত্যাদি। তবে সাধারণ গতিতে এই সব পরিবর্তন অতি সামান্য, যার জন্যে অনভ্যস্ত মনে প্রথম প্রথম ভাবতে অবাক লাগে।

v গতির জন্যে ঘড়ি কতটা আস্তে চলবে, হিসাব করা যাক। ধরা যাক, এই সময়ের মধ্যে চলন্ত ঘড়িতে t'_0 সেকেণ্ড গেছে। অতএব বন্ধুর কাছে c গতিবিশিষ্ট আলোর কণিকা P-এর পক্ষে

$$c = \frac{PU}{t'_0} = \frac{t\sqrt{c^2 - v^2}}{t'_0}$$

অথবা $t'_0 = \frac{t\sqrt{c^2 - v^2}}{c} = t\sqrt{1 - v^2/c^2}$ · (১)

অথবা, $t'_0 = \frac{t(1 - v^2/c^2)}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{t - vt.\ v/c_2}{\sqrt{1 - v^2/c_2}} =$

$$\frac{t - x_0 \frac{v}{c_2}}{\sqrt{1 - v^2/c_2}} \cdots\cdots\cdots (২)$$

যেখানে আপনার কাছ থেকে বন্ধুর দূরত্বকে x_0 ($= vt$) বলছি। (১নং) সমীকরণ থেকে সহজেই বোঝা যাবে যে, t'_0, t-এর চেয়ে ছোট, অথবা চলন্ত ঘড়ি স্থির ঘড়ির তুলনায় আস্তে চলবে। প্রায় আলোর গতিতে চললে ($v \rightarrow c$) আমরা দেখব ($t'_0 \rightarrow 0$)—অর্থাৎ কিনা ঘড়িটা থেমে আসবে। সময় বিলুপ্ত হবে।

এবার মনে করুন, v গতিতে চলন্ত বন্ধুটি গতির সমান্তরাল করে একটা রড সঙ্গে নিয়ে চলেছে। সারা রডটার আপনাকে পার হয়ে যেতে আপনার ঘড়িতে সময় লেগেছিল t সেকেণ্ড। কাজেই আপনার কাছে ওটার দৈর্ঘ্য হবে $L = vt$ মিটার। কিন্তু আপনার T সেকেণ্ড সময় গেলে চলন্ত বন্ধুর কাছে t'_0 ($= t\sqrt{1 - v^2/c^2}$) সেকেণ্ড যাবে। চলন্ত বন্ধুর বিচারে তার সঙ্গের রডটাকে v গতিতে আগাগোড়া পার করিয়ে নিয়ে আসতে সময় লাগল t'_0 সেকেণ্ড; তাই তার কাছে রডের দৈর্ঘ্য হবে $L' = vt'_0$

$$= vt\sqrt{1 - v^2/c^2}$$

$$= L\sqrt{1 - v^2/c^2} \cdots (৩)$$

অর্থাৎ গতির সঙ্গে সমান্তরাল দৈর্ঘ্যগুলি উপরের হিসাব মত ছোট হয়ে যাবে। প্রায় আলোর গতিতে চললে ($v \rightarrow c$), দৈর্ঘ্যগুলি ছোট হতে হতে ($L' \rightarrow 0$) প্রায় মিলিয়ে আসবে। দেশের (space) বিলুপ্তি ঘটবে।

এখন আলোর বৃত্তের দ্বিবিধ কেন্দ্রের সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে আপনার অভিমত হবে নিম্নরূপ—

আলো আমায় কেন্দ্র করে c গতিতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে—এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু ইতিমধ্যে চলন্ত বন্ধুর স্কেল ও ঘড়ির মাপ-জোক গতির সঙ্গে বদ্‌লে যাবে। এই পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য ও সময়ের বিচারে চলন্ত বন্ধুটিও নিজেকে আলোক বৃত্তের কেন্দ্রে অবস্থিত মনে করতে পারে। সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে আপনার বন্ধুর বিবৃতিও অবিকল এই!

আপেক্ষিকতাবাদ থেকে আরও জানা যায়, m_o ভরবিশিষ্ট বস্তু বেগের ফলে বেড়ে $\frac{m_o}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ হয়ে যায়। সবচেয়ে বিস্ময়কর আবিষ্কার—কোন স্থির বস্তুর অন্তর্নিহিত শক্তি $E_o = m_o c^2$। এই সমীকরণটির ফলস্বরূপ পারমাণবিক শক্তি পাওয়া গেছে। আপেক্ষিকতাবাদ যে সব প্রাচীন ভাব-ধারায় বিপ্লব ঘটিয়েছে, যেমন—দৈর্ঘ্য, সময়, ভর, গতির উপর নির্ভরশীল—সে সব পরিবর্তন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তেমন কোনও গভীর প্রভাব বিস্তার করে নি; কারণ এসব পরিবর্তন সাধারণ গতিতে অতি নগণ্য। কিন্তু আপেক্ষিকতাবাদের অন্যতম প্রধান আবিষ্কার যা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, জড়বস্তুতে প্রচণ্ড শক্তি অন্তর্নিহিত আছে তা সম্পূর্ণ যুগান্তকারী ব্যাপার। কারণ পূর্বতন ধারণায় জড়বস্তু ছিল শক্তির বিপরীত একটা কিছু। আপেক্ষিকতাবাদের প্রধানতম এই আবিষ্কারের ফলে ($E_o = m_o c^2$) পারমাণবিক শক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডারের গুপ্ত চাবিকাঠি মানুষের হাতে এসে গেছে।

ভারতের জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে দু-একটি কথা

শ্রীমানসকুমার চৌধুরী

ভারতের জাতিতত্ত্ব নিয়ে পুরনো ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে, স্যর হার্বার্ট রিজ্‌লের কথা। তবে রিজ্‌লের অনেক আগেই, অনেকে এখানে-ওখানে সাধারণভাবে নৃতাত্ত্বিক মাপজোক নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এবং নিয়েও ছিলেন। ব্যারন মেজোকোভেষ্ট ভন উজ-ফ্যালভি নামে একজন হাঙ্গারীয় নৃতত্ত্ববিদ্‌ ১৮৭৯ থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত কাশ্মীর এবং তার নিকটবর্তী স্থানসমূহে গবেষণা চালিয়েছিলেন। তারপরে আসেন ষ্টেন, ডনেলি প্রভৃতি নৃতাত্ত্বিকেরা। তাছাড়া ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ডেল্টন 'Descriptive Ethnology of Bengal' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। তাতেও এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু রিজ্‌লেই প্রথম ১৯০১ সালে সমগ্র ভারতের অধিবাসীদের জাতি হিসাবে ভাগ করতে চেয়েছিলেন এবং তাদের মোটামুটি ৭টি শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন। যদিও পরে রিজ্‌লের এই গবেষণার যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছে এবং সর্বশেষে তাঁর এই শ্রেণীবিভাগকে বাতিলও করে দেওয়া হয়েছে—তথাপি তাঁর এই প্রচেষ্টা ধন্যবাদার্হ; কারণ তাঁকেই এই বিষয়ে পথপ্রদর্শক বলা চলে।

রিজ্‌লের এই সর্বভারতীয় শ্রেণীবিভাগে বাংলা এবং উড়িষ্যার অধিবাসীদের, বিশেষভাবে বাঙ্গালীদের মঙ্গোলো-দ্রাভিড়িয়ান আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাঁর মতে, সাধারণতঃ এদের গায়ের রং কালো, মুখে গোঁফদাড়ির আধিক্য, মাথা সাধারণতঃ চওড়া এবং নাক সরু থেকে মোটা সব রকমেরই। কিন্তু তাঁর পরবর্তী বৈজ্ঞানিকেরা তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারেন নি।

পূর্বেই বলেছি যে, হার্বার্ট রিজ্‌লে বাংলা দেশের লোকদের মঙ্গোলো-দ্রাভিড়িয়ান বলে অভিহিত করেছেন এবং গুজরাট থেকে কুর্গের মধ্যবর্তী স্থানের লোকদের সাইথো-দ্রাভিড়িয়ান নামে অভিহিত করেছেন। তিনি তাদের সম্বন্ধে বলেছেন যে, তাদের মাথাও সাধারণতঃ চওড়া। বম্বে প্রেসিডেন্সির লোকদের এই চওড়া মাথার জন্যে রিজ্‌লে সাইথিয়ান এলিমেণ্টের উপর খুব বেশী জোর দিয়েছেন। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় আমরা দেখতে পাই যে, এই সাইথিয়ান আক্রমণকারীরা খুব অল্প সময়ের জন্যে বম্বে প্রেসিডেন্সিতে ছিল এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল লোকসংখ্যার উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং রিজ্‌লের মতের পিছনে এখানে খুব বেশী জোর পাওয়া যায় না। আবার তাঁর মতে, বাংলা দেশের লোকেরাও চওড়া মস্তক বিশিষ্ট। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি মঙ্গোলিয়ান এলিমেণ্টের উপর খুব বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু বাংলা দেশের লোকদের ভালভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, তারা সব জায়গায় সমান নয়। যেমন—চওড়া মাথা ও চওড়া নাক সাধারণতঃ দক্ষিণ-পূর্ব দিকেই দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সাধারণতঃ লম্বা মাথা ও চওড়া নাক দেখা যায়। আবার সিকিমের দিকে চওড়া মাথা ও লম্বা নাকই দেখতে পাওয়া যায়। তার উপরেও রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ বলেছেন যে, প্রধান মঙ্গোলিয়ান লক্ষণসমূহ, যেমন—সোজা চুল, হরিদ্রাভ গাত্রবর্ণ, অসমান্তরাল বা তির্যক চক্ষু, এপিক্যানথিক ফোল্ড, শরীরে লোমের অল্পতা ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণগুলি বাঙ্গালী-

দের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। সুতরাং রিজ্‌লের মতকে এ জায়গায় ঠিক মেনে নিতে পারা যায় না।

আবার ডাঃ ভাণ্ডারকার তাঁর 'Foreign element in Hindu Population' নামক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, কতকগুলি উপাধি আছে যা বাঙ্গালী এবং গুজরাটের নাগরব্রাহ্মণ, উভয়েই ব্যবহার করেন ; যেমন—দত্ত, বর্মন, মিত্র ইত্যাদি। আবার রিজ্‌লের তথ্যাদিই ভালভাবে আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, বাঙ্গালী এবং গুজরাটের নাগরব্রাহ্মণ, উভয়ের মধ্যেই শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ লোকের মাথা হচ্ছে চওড়া। সুতরাং মোটামুটি এটুকু আলোচনা করলেই বুঝতে পারা যায় যে, বাংলা এবং বম্বে প্রেসিডেন্সি, এই দুই দেশের লোকের মধ্যেই অনেক রকম সাদৃশ্য আছে। কিন্তু একথাও বুঝতে পারা যায় না যে, বম্বের লোকদের চওড়া মাথার জন্যে রিজ্‌লে কেন দায়ী করেছিলেন সাইথিয়ান আক্রমণকারীদের এবং বাঙ্গালীদের মধ্যে ঐ একই লক্ষণের জন্যে দায়ী করেছিলেন মঙ্গোলিয়ানদের। সুতরাং এমন একদল লোক খুঁজে বের করতে হবে, যাদের মাথা চওড়া এবং যারা ভারতের কাছাকাছি কোথাও বসবাস করতো। প্রকৃতপক্ষে সেই রকম একদল লোকের সন্ধান পেয়েছিলেন ব্যারন উজফ্যালভি এবং অরেল ষ্টেন নামক দুজন বৈজ্ঞানিক। এঁরা হোমো আলপাইনাস নামে পরিচিত এবং পামির উপত্যকা ও চৈনিক তুর্কিস্থানের তাকলামাকান মরুভূমিতে বসবাস করতো। সম্ভবতঃ এরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল। যখন তারা ভারতে আসে তখন উত্তর গাঙ্গেয় সমতলভূমির প্রায় সবটাই আর্যদের দ্বারা অধিকৃত ছিল। সুতরাং এরা দু-ভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং কতক বম্বের দিকে চলে যায়, আর বাকী সবাই বাংলায় চলে আসে।

রিজ্‌লের পরেও অনেকে সমগ্র ভারতের অধিবাসীদের জাতি হিসাবে ভাগ করতে চেয়েছিলেন এবং করেও ছিলেন। কিন্তু কেউই সুনিশ্চিত ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদানে সক্ষম হন নি। সেইসব বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে গিউফ্রিদা-রুগেরী, ইকষ্টেড, হ্যাডন প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

কিন্তু ১৯৩১ সালে ডাঃ বি. এস. গুহ পূর্বেকার যাবতীয় বিবরণগুলি পুনরালোচনা করেন এবং সমগ্র ভারতের অধিবাসীদের জাতি হিসাবে ভাগ করেন। তাঁর এই জাতি বিভাগ অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে। তিনি সমগ্র ভারতের অধিবাসীদের ৬টি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন নেগ্রিটো, প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড, মঙ্গোলয়েড, মেডিটারেনিয়ান, ওয়েষ্টার্ণ ব্রাকিসেফালস ও নর্ডিক। বাংলা এবং বম্বে এই দুই প্রদেশের অধিবাসীদের তিনি এই ওয়েষ্টার্ণ ব্রাকিসেফালস-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই ওয়েষ্টার্ণ ব্রাকিসেফালস বা আল্‌পো-ডিনারিককে আবার ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—(ক) আলপিনয়েড, (খ) ডিনারিক, (গ) আর্মেনয়েড। এই ওয়েষ্টার্ণ ব্রাকিসেফালস-এর অন্তর্ভুক্ত অধিবাসীরা ডাঃ গুহের মতে, পশ্চিমদিক থেকেই এসেছিল। অ্যালপিনয়েডদের সম্বন্ধে ডাঃ গুহ বলেছেন যে, এদের গায়ের রং মেডিটারেনিয়ানদের মত কৃষ্ণবর্ণ নয়—তাদের থেকে ঈষৎ পাত্‌লা, মাথা চওড়া ও পশ্চাদ্ভাগ গোলাকার, মুখ গোলাকার ও সুন্দর, সরু নাক, দেহের দৈর্ঘ্য মাঝারি। এই বিভাগের মধ্যে তিনি কাথিওয়ার, গুজরাট, বম্বে, বাংলা প্রভৃতি অঞ্চলের লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন ; অর্থাৎ বম্বে ও বাংলা—এই উভয় প্রদেশের লোকেরা একই বিভাগের অন্তর্গত।

পদার্থবিদ্যার প্রসার

শ্রীতাপসকুমার দাস

আদিম যুগে মানুষের দৈনন্দিন খাওয়াপরার সমস্যাই ছিল প্রধান। ধীরে ধীরে মানুষের অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি বাড়তে লাগলো। ক্রমশঃ মানুষের জিজ্ঞাসু মন চাইলো সৃষ্টির মূল তথ্য আবিষ্কার করতে, প্রকৃতির ঘটনার যুক্তিযুক্ত কারণ জানতে। সেই আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ এই চেষ্টাই করে আসছে বিজ্ঞানের নানা পথ ধরে। পদার্থবিদ্যা তাদেরই একটি। মানুষের চিন্তাধারার আজ যে এত প্রসার তা শুধু পূর্ববর্তীদের চিন্তা ও জ্ঞানকে ভিত্তি করেই। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার যেমন বিকাশ হয়, মানব-সভ্যতাও তেমন যুগ যুগ ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে ক্রমিক উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। মানুষের চিন্তাধারার বিকাশ ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নূতন তত্ত্ব পুরাতনকে কেন্দ্র করেই আর একটু সহজ, সরল ও সুষ্ঠুভাবে দেখা দিয়েছে।

পদার্থবিদ্যায় তত্ত্বানুসন্ধানের ক্ষেত্রে দেখা যায়, মূল প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে মানুষ প্রথম দৃষ্টি দিয়েছিল বহির্জগতে। গ্রহ-উপগ্রহের গতি থেকে কেপ্‌লার কতকগুলি নিয়ম আবিষ্কার করেন। তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠলো নিউটনীয় বলবিদ্যা। বলবিদ্যার যাথার্থ্যের কোন প্রশ্ন উঠলো না। দেখা গেল, কোন বস্তুর কোন মুহূর্তে অবস্থান ও গতির নিয়ম জানা থাকলে আর যে কোন মুহূর্তে তার অবস্থান বা গতি জানা সম্ভব। সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার জন্যে তাই সে দিন সম্ভাব্যতা বা অনিশ্চয়তার কোন প্রশ্ন উঠলো না। মানুষ আরও দেখলো, একটি বস্তু যে গতিতেই চলুক না কেন, তার ভর সব সময়েই সমান থাকে। চিন্তাধারা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অণু-পরমাণুর জগতেও চোখ ফেরালো। সেখানে কিন্তু তীব্রগতি-যুক্ত অসংখ্য মৌলিক ক্ষুদ্রকণা নিয়েই কারবার। তাদের একটি একটি করে বেছে বেছে পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই পদার্থবিদ্যায় দেখা দিল সম্ভাব্যতার প্রসারণ; হলো অনিশ্চয়তাবাদের আবির্ভাব। নূতন করা সমীকরণগুলি আগের মতই রইল, শুধু সম্ভাব্যতার জন্যে একটা নূতন উৎপাদক, অর্থাৎ ফ্যাক্টর এসে গেল। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, নিউটনের সময়ে মানুষ অজ্ঞাতসারেই সম্ভাব্যতা ১ (এক) ধরে পুরনো সমীকরণগুলি বের করেছে। নূতন সমীকরণগুলি তাই হলো আরও বেশী সাধারণ। নিউটনীয় বলবিদ্যার প্রসার প্রকৃতির একটা সুবিধাজনক দান; কেন না, অণু-পরমাণুর জগতের মত বহির্জগতও যদি সমান রকম নিয়মরহিত হতো তবে নিউটনের আমলেই যে সম্ভাব্যতাবাদের অনেকটা প্রসার হতো তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু পদার্থবিদ্যার এত সুগভীর প্রসার ঘটতো কি না সন্দেহ। বস্তুর ভর মাপবার সময়েও দেখা গেল—বস্তুর গতি যদি আলোর গতির সমতুল হয়, তবে তার ভরের তফাৎ দেখা দেয় $\left(m-\frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\right)$। মানুষ এর আগে যে সব বস্তু নিয়ে কাজ করেছে তাদের গতি আলোর গতির তুলনায় অনেক কম। তাই সংশোধন উৎপাদক $\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$ এত কম যে, মানুষ তার স্থূল যন্ত্র দিয়ে m ও m_0-এর ছোট্ট তফাৎ ধরতে পারে নি; নূতন যুগে নূতন অন্বেষণের ফলে

সংশোধন উৎপাদকটি ধরা পড়লো। তখন দেখা গেল, $m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$ টাই হচ্ছে সাধারণ সমীকরণ। বহির্জাগতিক বস্তুর পক্ষে $m = m_0$ নেওয়া যেতে পারে ; কারণ সেখানে v, c-এর চেয়ে অনেক ছোট। ফলে, $\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$ প্রায় ১-এর সমান। এই ভাবে দেখা যাচ্ছে, নূতন আবিষ্কার পুরাতনকে ভুল প্রমাণ করছে না, বরং তাকে আরও সহজ সরল রূপ দিচ্ছে।

পদার্থবিদ্যার প্রধান কথাই হলো পরীক্ষা। প্রকৃতির কোনও ঘটনাকে দেখে মানুষ প্রথমে তার একটা ব্যাখ্যা দেয়। তারপর নিজের যুক্তি দিয়ে দেখে, এই ব্যাখ্যা ঠিক হলে আর কি কি ঘটনা ঘটা সম্ভব। সেগুলিকে পরীক্ষা করে দেখাই হবে, সেই ব্যাখ্যাটি ঠিক, না ভুল তার প্রমাণ। গত শতাব্দীর শেষের দিকে পদার্থবিদ্যার দুটি পরীক্ষায় দেখা গেল যে, মানুষের আগের ধারণা এর ঠিক বিপরীতমুখী। তার একটির ফল হলো, আইনষ্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটি, আর একটি হলো কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা। এতদিন ধারণা ছিল, আলো সব সময়ে এক অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ রূপে প্রেরিত হয়। কিন্তু প্ল্যাঙ্ক বললেন, আলো প্রকৃতপক্ষে শক্তির কোয়াণ্টা বা বাণ্ডল্ হিসাবে অগ্রসর হয়; কিন্তু আমাদের সাধারণ যন্ত্র দিয়ে তা ধরা সম্ভব নয়। জ্ঞানের অন্বেষণে মানুষের সামনে এইভাবে দুটি প্রশস্ত পথ খুলে গেল।

আলোর প্রকৃত স্বরূপ যে কি, তা মানুষের মনকে চিরকাল নাড়া দিয়েছে। কেউ বলেছেন, কতকগুলি কণিকা নিয়েই আলো তৈরী, কেউ বা দেখিয়েছেন আলোর তরঙ্গ-সত্তা। আইনষ্টাইনের নূতন ফটোনতত্ত্ব এই দুটিকে নিয়েই। আজ আর কিন্তু আলোর কণিকা-সত্তা, কি তরঙ্গ-সত্তা—সে প্রশ্নই মূল নয়। আসলে আলোকের এমন এক সত্তা আছে যা ঐ দুটা সত্তাকে নিয়েই। তার ফলে আমাদের যন্ত্র অবস্থানুযায়ী আলোর দুটি সত্তাকেই পৃথকভাবে দেখায়।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের আর একটি বিকাশ হলো তরঙ্গ-বলবিদ্যা। আইনষ্টাইনের ফটোন তত্ত্বে তরঙ্গে পদার্থের ধর্ম আরোপ করা হয়েছে। ডি ব্রগ্‌লি যুক্তি দেখালেন যে, এর বিপরীতটাও সম্ভব, অর্থাৎ পদার্থেরও তরঙ্গ থাকতে পারে। আজ তরঙ্গ-বলবিদ্যা এতদুর অগ্রসর হয়েছে যে, সমগ্র মহাবিশ্বকে আজ তরঙ্গের তৈরী বলা যেতে পারে এবং পদার্থ শুধু তার মধ্যে কতকগুলি বিশেষ স্থানে ব্যাপৃত রয়েছে। বর্ণ্ পরে দেখালেন যে, এই তরঙ্গ সাধারণ তরঙ্গ নয়। এরূপ সম্ভাবনা তরঙ্গ (Probability wave) প্রকৃতির মধ্যে মানুষের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত ক্ষুদ্র গণ্ডীভুক্ত। কিন্তু গণিতের এমন অনেক জিনিষ আছে যা আমাদের ধারণার একেবারে বাইরে। মূল প্রশ্নগুলির জবাব খুঁজতে গিয়ে মানুষ আজ কল্পনার বাইরের সেই গণিতের আশ্রয় নিয়েছে। যেমন, তরঙ্গ-বলবিদ্যা বা আইনষ্টাইনের চতুর্মাত্রা বা ফোর ডায়মেনশন। মানুষ এগুলি থেকে সামগ্রী নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার রাজ্যে ফিরে এসে তার সমস্যার সমাধান করতে চায়।

যুগযুগান্তের অভিজ্ঞতা থেকে প্রকৃতির সরলতা সম্বন্ধে মানুষের এক দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেছে। বিভিন্ন বস্তুকে ভেঙ্গে দেখেছে, তারা বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থের তৈরী। বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থকে ভেঙ্গে দেখেছে, তারা আবার কতকগুলি মৌলিক-কণার সমবায়ে তৈরী। কতকগুলি মৌলিক কণিকা নিয়েই তৈরী এই মহাবিশ্ব। আইনষ্টাইন দেখিয়েছেন যে, পদার্থ ও শক্তি আলাদা কিছু নয়। একই সত্তার দ্বৈত রূপ। আলোর পদার্থ ও তরঙ্গ সত্তাকে এক করে দেওয়া গেছে। বিভিন্ন ধরণের ক্ষেত্রকে শ্রেণীবদ্ধ করে মানুষ দেখেছে যে, তাদের দুটি প্রধান প্রকৃতি—(১) মহাকর্ষ এবং (২) তড়িচ্চুম্বক। অভিজ্ঞতা থেকে জন্মানো বিশ্বাস নিয়ে মানুষ আজ দাবী করছে, এই দুটি ভিন্ন ক্ষেত্রকেও এক করে দেওয়া যাবে। তাই আজ গড়ে উঠতে চলেছে এক একীভূত বিশ্বচিত্র।

মনোবিদ্যা ও তার ব্যবহার

দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়

মনোবিদ্যা এবং দর্শনশাস্ত্র দুটিই কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। কিন্তু আধুনিক যুগে দেখা গেল যে, দর্শনশাস্ত্রের আওতায় যে মনোবিদ্যা গড়ে উঠেছে সে বিদ্যায় ঠিক প্রযোজন সাধিত হচ্ছে না। দর্শন ব্যক্তিবিশেষের চিন্তাশীলতার উৎকর্ষতা। দার্শনিক জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর আত্মমুখী Subjective অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করলেন যে, কোন এক বিশেষ পন্থা অবলম্বন করতে পারলে মানুষের মনের আকুতি অনেকখানি প্রশমিত হয়। কিন্তু ঐ পন্থা অবলম্বনের পিছনে যে মাত্রায় প্রস্তুতির প্রযোজন, তা হয়তো জ্ঞানী ব্যক্তি ছাড়া অন্য সকলের মধ্যে নেই ; কাজেই ঐ ব্যক্তি-বিশেষ ছাড়া আপামর সাধারণ মানুষের কাছে এই পন্থা অবাস্তব, কাজেই কার্যকরী নয়। অথচ সমষ্টিগতভাবে মানুষের কল্যাণের জন্যে তাদের মনের এই আকুতি কমাবার প্রয়োজন আছে। তখন কি পদ্ধতি অবলম্বন করলে সাধারণ্যে একটা গড়পরতা প্রস্তুতির মান লাভ করা যায় যাতে অন্ততঃ আদর্শের কিছুটা নিকটবর্তী হওয়া সম্ভব, সে বিষয়ে অনুসন্ধান চলে। এই প্রচেষ্টার ফলেই আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক মনোবিদ্যার উৎপত্তি হয়। তখন থেকেই পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ দ্বারা মনোবিদ্যার চর্চার সুরু হয়। মনোবিদ্যা স্বীকার করলো যে, মানুষকে বুঝতে হলে একমাত্র তার চেষ্টিত (Behaviour) দিয়েই তাকে বুঝতে হবে।

আপনাকে আমি চিমটি কাটলাম, আপনি উঃ শব্দটি উচ্চারণ করলেন। আমি কষ্ট পেলেই উঃ শব্দ উচ্চারণ করে আমার অনুভূতি প্রকাশ করি। আমার চেষ্টিত দিয়ে আপনার চেষ্টিত বিচার করলাম। বুঝলাম চিমটি কাটায় আপনার কষ্ট উপলব্ধি হয়েছে। এখানে আমার চিমটি কাটা আপনার কাছে উদ্দীপক এবং উঃ শব্দটি ঐ উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ারূপে আপনার চেষ্টিত উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটা সুসম্বদ্ধ যোগাযোগ আছে। উদ্দীপকের যে কোন রকম বৃদ্ধিই যে প্রতিক্রিয়ার রূপ বদল করবে, এমন কোন কথা নেই। এমনও হতে পারে যে, উদ্দীপকের মাত্রা যতক্ষণ পর্যন্ত না দ্বিগুণিত মাত্রায় যাচ্ছে ততক্ষণ হয়তো আপনার প্রতিক্রিয়ার রূপ বদ্‌লাচ্ছে না, সেটা আপনার চেষ্টিত দিয়ে আমি উপলব্ধি করছি। অথচ আমাদের সাধারণতঃ ধারণা যে, উদ্দীপকের মাত্রা যখন বৃদ্ধি করেছি তখন প্রতিক্রিয়ার নিশ্চয়ই রূপ বদ্‌লেছে। কিন্তু আগের প্রকল্প বা Hypothesis এ দেখলাম এবং পরীক্ষণ দিয়ে প্রমাণিত করলাম যে, বিশিষ্ট মাত্রায় উদ্দীপক বর্ধিত না হলে প্রতিক্রিয়ার রূপ বদ্‌লায় না। এই ভাবে নানা তথ্যের ভিতর দিয়ে মনোবিদ্যার জ্ঞান আজকাল বেড়ে চলেছে। চর্চা যত নূতন নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করছে, জ্ঞানও সেই রকম এগিয়ে চলেছে। মনোবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণার আর একটা গভীর এবং গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার—ব্যক্তিগত পার্থক্য। আমরা একজন আর একজন থেকে দেখতে যেমন অনেকখানি পৃথক; গুণের দিক থেকেও তাই। এই গুণ পার্থক্যের রূপ ও পরিমাপের চেষ্টা থেকে ব্যবহারিক মনোবিদ্যা গড়ে উঠেছে। সংখ্যাশাস্ত্র বা Statistics-এর প্রচুর সাহায্য ব্যবহারিক মনোবিদ্যাকে কার্যকরী করবার জন্যে নিতে হচ্ছে ; ব্যবহারিক মনোবিদ্যার ক্ষেত্র কতখানি প্রসারিত—এই প্রশ্নের জবাবে বলতে গেলে বোধ হয় এই বলাই ভাল যে, যেখানেই মানুষের প্রচেষ্টা সামাজিক

কল্যাণে নিয়োজিত হচ্ছে সেখানে ততখানি পর্যন্তই ব্যবহারিক মনোবিদ্যার প্রসার হচ্ছে। উদ্দেশ্য অনুসারে যে যে ক্ষেত্রে ব্যবহারিক মনোবিদ্যার প্রয়োগ হয়, সেই সেই ক্ষেত্রানুসারে ব্যবহারিক মনোবিদ্যাকে ভাগ করা সম্ভব। যেমন—শিক্ষার ক্ষেত্রে, যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে, মনোবিকারের ক্ষেত্রে অপরাধপ্রবণতা প্রভৃতির ক্ষেত্রে। আবার এই সকল বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট প্রয়োজনে মনোবিদ্যার নূতন নূতন বিশিষ্ট পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে।

এবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার বিশিষ্ট দান ও তার প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবো। মনোবিদ্যার সর্বপ্রথম ও প্রধান প্রয়োগ-ক্ষেত্র শিক্ষা। মানবমনের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়গুলি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকলে শিশুদের প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ। পূর্বে শিক্ষা-ব্যবস্থা এত ব্যাপক ছিল না, এজন্যে শিক্ষা দেবার অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলি এত প্রবলভাবে আমাদের সম্মুখে প্রকটিত হয় নি। সমাজতান্ত্রিক জীবনধারার ব্যবস্থায় শিক্ষা অপরিহার্য। প্রকৃত শিক্ষা ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে গণজীবন যাপন একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে। শিক্ষাকে সর্বতোমুখী ও সর্বজনগ্রাহ্য করতে হলে ব্যক্তির গ্রহণশক্তি সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। যাবতীয় প্রাণীদের মধ্যে মানব-শিশুর শৈশবকালে সর্বাপেক্ষা অধিক সেবা ও যত্নের প্রয়োজন হয়। এছাড়া পূর্ণ মানবতা লাভের জন্যে মানব-শিশুকে বহুদিন ধরে শিক্ষানবিশীও করতে হয়। কালোপযোগী পরিণতির জন্যে শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিদেরা নূতন নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন এবং এই সকল পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যবস্থার অঙ্গরূপে অধুনা প্রচলিত মন্তেসরী, কিণ্ডারগার্টেন প্রভৃতি প্রথার প্রবর্তন হয়েছে। স্মরণশক্তি ও অভ্যাস প্রভৃতি মানুষের নানাবিধ গুণাবলীর প্রকাশ ও পরিমাপ যা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন, সেই সব নির্ধারণের জন্যে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কাজ চলেছে। এর ফলেই পূর্ববর্ণিত পদ্ধতিগুলির উদ্ভব হয়েছে। এই সব শিক্ষাপদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হলো, শিশুর স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সংযুক্ত করা। আমাদের দেশে শিক্ষা দ্রুতভাবে বিস্তার লাভ করছে। মানবসমাজের ভবিষ্যৎ কল্যাণের কথা স্মরণ রেখে এমন বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা দরকার, যার ফলে আগামী মানবসমাজ পৃথিবীতে সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে পারে। মনোবিদ্যার সাহায্যে এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান সম্ভব। ব্যক্তির ভবিষ্যৎ জীবনে শিক্ষার প্রভাব এত প্রবল যে, সাধারণতঃ শিশুকালের শিক্ষা ও অভ্যাসই পরবর্তী জীবনের গতি প্রভাবান্বিত করে। আমাদের দেশ, কাল ও সংস্কৃতির উপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থা উদ্ভাবনের জন্যে নূতন নূতন পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের একান্ত প্রয়োজন। শিশুশিক্ষার ব্যাপারে অভিভাবকদের শিশুমনের রহস্য সম্বন্ধে খানিকটা অবহিত হওয়া দরকার। শিশুকে আদিম প্রকৃতি থেকে সামাজিক জীবনধারায় পরিবর্তিত করবার জন্যে বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। সমাজের এই বিষয়ে সব সময়ে সচেতন থাকা উচিত।

আমাদের এই নগরী শিল্পপ্রধান। অন্যান্য নগরী থেকে এর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে এবং সেজন্যে বিশিষ্ট সমস্যাও আছে। শিল্প মানুষের জীবনধারার উপর একটা প্রভাব বিস্তার করে। শিল্প-ক্ষেত্র এবং কলকারখানার ব্যবস্থা জীবনধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। যন্ত্রশিল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো বহুল উৎপাদন। অল্প খরচ ও বহুল উৎপাদন—এই দিকে যন্ত্রশিল্প ব্যবস্থার সব সময়ে জাগ্রত দৃষ্টি থাকে। কেন না, আজকাল যন্ত্রশিল্পের মাধ্যমেই জাতীয় সম্পদের সম্প্রসারণ সম্ভব। ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্যে কোনক্রমেই কাঁচামাল এবং মানুষের অপব্যয় হতে দেওয়া চলে না। যত উন্নততর যন্ত্র আবিষ্কৃত হবে, কাঁচামাল তত কম নষ্ট হবে। এসব উন্নততর যন্ত্র পরিচালনার জন্যে আমাদের

উপযুক্ত শিল্পবিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন। সকলেই সবকিছু ভালভাবে শিখতে পারে না এবং এক এক জনের এক এক দিকে বিশিষ্টতা থাকে। উপযুক্ত ব্যক্তি উপযুক্ত কাজে নিয়োজিত না হলে মনুষ্য-শক্তির যথেষ্ট অপব্যয় হয়। কাজেই নিয়োগের পূর্বে কে কোন্ কাজে উপযুক্ত বা কে কোন্ রকম শিল্পশিক্ষা নেবে তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের তাগিদে মনোবিদ্যায় বহু গবেষণার ফলে কার্যকরী নির্বাচন প্রণালী উদ্ভাবিত হয়েছে। ব্যক্তিগত পার্থক্য সুষ্ঠুভাবে পরিমাপ করতে না পারলে এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

মানুষের যতগুলি গুণাগুণ ধারণা করা যায় তার সবগুলিতেই ব্যক্তিগত পার্থক্য আছে। মানুষের মধ্যে এই গুণগুলি খুব কম থেকে খুব বেশী মাত্রায় ব্যাপক হয়ে আছে। বুদ্ধি বলতে মনোবিদ্যায় যা বোঝায় তা হচ্ছে এই যে, ব্যক্তিবিশেষ এমন ক্ষমতা-সম্পন্ন যে তার পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতা পরবর্তী সমস্যা সমাধানে এমন ভাবে প্রয়োগ করতে পারে, যাতে তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সে বেশ সাফল্যের সঙ্গেই মানিয়ে নিতে পারে। এই গুণ সহজাত; শিক্ষা বা সুযোগের উপর নির্ভর করে না। কৃষ্টিগত বা শিক্ষাগত ক্ষমতা প্রজ্ঞা, বুদ্ধি নয়। এই ধরণের নানা সহজাত গুণগুলি সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে বিস্তৃত বা প্রসারিত, অর্থাৎ অল্প সংখ্যক লোক হীন এবং অধিক গুণসম্পন্ন হয়। বেশীর ভাগ লোককেই গড়ের কাছাকাছি পাওয়া যায়। নানা কাজে নানা মাত্রার নানা গুণের প্রয়োজন। কাজ বিশেষের প্রয়োজনের জন্যে নানা গুণের তালিকা নির্ধারণ করা হয়। তদনুসারে নানা গুণের অভীক্ষা দ্বারা মানুষের গুণের মাত্রা পরিমাপ করে একটি তালিকা প্রস্তুত হয়। যে লোকের গুণসমূহ যে কার্য-তালিকার মাত্রানুরূপ, সে ব্যক্তিকে সেই কাজের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয় এবং তাকে সেই কাজে নিযুক্ত করা হয়।

যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে শুধু উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচনেই সব সমস্যার সমাধান হয় না। আরও নানা সমস্যা, যেমন—বৃত্তি ও দায়িত্ব অনুসারে কাজের একক মাত্রা নির্ধারিত হয় এবং এই মাত্রার উপর নির্ভর করে পারিশ্রমিকের মান ঠিক হয়। এই মূল্য পরিমাপের ব্যবস্থাকে Job evaluation বলে। এই মূল্য পরিমাপের ব্যবস্থার প্রতি শিল্পপতিদের যে দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে তার কারণ, কর্মানুসারে পারিশ্রমিক না পেলে কাজে উৎসাহ থাকে না, এই আমাদের সাধারণ ধারণা। কিন্তু প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে আমরা শিল্পকর্মীদের যে মনোভাব বিশ্লেষণ করে পেয়ে থাকি তাতে দেখতে পাই যে, কাজের উৎসাহের মূল সবটাই অর্থ উপার্জনের মাত্রার উপর নির্ভর করে না। নানা কারণের সংমিশ্রিত প্রভাবের উপর শিল্পকর্মীদের কাজের প্রতি উৎসাহের মাত্রা নির্ভর করে। বড় বড় কলকারখানা অনেক লোকের কাজের সংস্থান করে থাকে। কাজেই কারখানার পরিপ্রেক্ষিতে একটি নূতন সমাজ গড়ে ওঠে এবং তাদের নিজেদের মধ্যেই আদান-প্রদানের নূতনতর সমস্যার উদ্ভব হয়। এই নূতন সমাজ বৃহত্তর সমাজ থেকে অনেকটা বিভিন্ন। কারণ এখানে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন দুই দল শিল্পপতি ও শিল্পকর্মী পরস্পরের সংস্পর্শে আসে। দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতার জন্যে স্বার্থ প্রভৃতি নানা বিষয়ে এই দুই দলের বিভিন্নতা এত উগ্রভাবে দেখা দেয় যে, পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক মানবিক সম্বন্ধ ব্যাহত হয়। ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে,শিল্পপতিরা শিল্প-কর্মীদের শিল্পযন্ত্রের অংশ বলে মনে করতো। এই মনোভাবের প্রভাবে এখনও পর্যন্ত এই দুই দলের মধ্যে নানা প্রকার মতদ্বৈধের অবকাশ আছে। শিল্পযন্ত্রের অংশ, এই মনোভাবের নিদর্শন স্বরূপ বলা যায় যে, ইংরেজী ভাষায় শিল্পকর্মীদের Hands বলা হয়। এ থেকেই বোঝা যায় যে, শিল্পকর্মীদের পুরা মানুষ হিসাবে ধরা হতো না। এই অসামাজিক মনোভাব শিল্পক্ষেত্রে স্বাভাবিক মানবিক সম্বন্ধ

গড়ে ওঠবার অন্তরায়। কর্মপ্রবণতা বৃদ্ধির জন্যে স্বাভাবিক মানবিক সম্বন্ধ গড়ে ওঠবার যে একটা বিশেষ মূল্য আছে, আজ তা শিল্পক্ষেত্রে বেশ ভাল ভাবেই স্বীকৃত হয়েছে। মনোবিদ্যার প্রয়োগে কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করলে স্বাভাবিক মানবিকতার সম্বন্ধ গড়ে ওঠে এবং কর্মপ্রবণতার প্রেরণা আসে, সে বিষয়ে নানা গবেষণা হচ্ছে এবং এর ফলে শিল্পকে মূল উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে।

মানুষের কর্মক্ষেত্র তার জীবনের সঙ্গে ওত-প্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। কর্মক্ষেত্রে যদি কোন কারণে মানুষের আত্মবিকাশের প্রচেষ্টা ব্যাহত হয় তবে তার মনে প্রক্ষোভ সৃষ্টি হয়। এই প্রক্ষোভ অতিমাত্রায় উদ্বেলিত হলে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী বিকৃত হয়ে যায়। কালক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে অসন্তোষের মাত্রা বেড়ে যায়। এই মাত্রা বৃদ্ধির অনুসারে মানুষের মধ্যে অস্বাভাবিক প্রকৃতি প্রকাশ পায় এবং এ থেকে মানসিক ব্যাধির উৎপত্তি হয়। সমাজের পক্ষে এ অবস্থা এক ভীষণ অভিশাপ। বহুদিন পর্যন্ত এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য জানা ছিল না। পূর্বে এই বিশ্বাস ছিল যে, এই রকম অবস্থা আধিভৌতিক প্রভাবে সংঘটিত হয় এবং চিকিৎসার নামে ব্যাধিগ্রস্তের উপর নানা রকম অমানুষিক অত্যাচার চলতো। কিছুদিন হলো মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা ক্ষেত্রে মনোবিদেরা প্রচুর সাফল্য লাভ করেছেন। মানসিক ব্যাধির স্বরূপ যদিও এখন পর্যন্ত সম্যক জানা যায় নাই তবুও এর আরোগ্যের ক্ষেত্রে বহু পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে এবং হচ্ছে। এই চিকিৎসা ব্যাপারে সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের অবদান অতুলনীয়। ফ্রয়েডের উদ্ভাবিত প্রথা মানসিক ব্যাধির উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে বহু নূতন জ্ঞানের সন্ধান দিয়েছে। মানসিক ব্যাধির প্রকাশ বিভিন্ন প্রকারের। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা সাধারণের পক্ষে কল্যাণপ্রসূ না হয়ে বরং অনিষ্টের কারণ হয়। এই বিষয়ে সম্যক বুঝতে হলে যে পরিমাণ অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন তা সাধারণের কাছে আশা করা যায় না। তবে এ বিষয়ে এটুকু বলা যায় যে, সাধারণ সামাজিক ব্যবহার থেকে অধিক মাত্রায় অপেরণ ঘটলে ব্যক্তিকে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তার সুচিকিৎসার জন্যে মনস্তাত্ত্বিকের সাহায্য নেওয়া উচিত।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে মানসিক ব্যাধির একটা নিকট সম্বন্ধ আছে। যান্ত্রিক অগ্রগতির সঙ্গে আমাদের কৃষিপ্রধান সভ্যতা অপসারিত হয়ে সমাজ ব্যবস্থায় ক্রমশঃ যন্ত্রসভ্যতাকে স্থান দিচ্ছে। এই অগ্রগতির দ্রুত তালের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে না পারলে মানুষ তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না এবং মনোবিকারের সৃষ্টি হয়। এই অক্ষমতা অনেকটা নির্ভর করে কালোপযোগী শিক্ষার অভাবের উপর এবং কিছুটা যান্ত্রিক অগ্রগতির দ্রুত স্পন্দন বা Tempo-র উপর।

সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার অক্ষমতা সব সময়ই যে মানসিক বিকৃতি ঘটায় তা নয়, অনেক সময় মানুষকে অপরাধপ্রবণও করে তোলে। আজকাল অপরাধপ্রবণতা নিরোধকল্পে মনোবিদ্যার নানাবিধ ব্যবহার সুরু হয়েছে। মনোবিদ্যার আবিষ্কারের ফলে সমাজ একথা মেনে নিয়েছে যে, অপরাধপ্রবণতা ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশ পায় তার বিকৃত মনোভাবের জন্যে; যেটাকে ধরে নেওয়া হয় এক ব্যাধির অবস্থা। অপরাধের জন্যে অপরাধী যত না দায়ী, তার বিকাশের পথে শিক্ষার যে ব্যত্যয় ঘটেছে তা বেশী দায়ী। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, অপরাধ-প্রবণতার মূলে রয়েছে কৈশোরে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর। ঐ সময়েই অপরাধপ্রবণতার নানা লক্ষণ কিশোরের ব্যবহারে প্রকাশ পায়। কাজেই সমাজে অপরাধপ্রবণতা নিয়ন্ত্রণের জন্যে কিশোর অপরাধী-দের সুশিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক জীবনে অভ্যস্ত করা হয়।

এতক্ষণ যা বলেছি তা এইখানে শেষ করলে মনোবিদ্যার প্রয়োগ সম্বন্ধে মূল কথা বলা সম্পূর্ণ হয় না। বিবর্তনবাদ অনুসারে মানুষ জীবশ্রেষ্ঠ। কারণ মানুষ শুধু জৈব প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল নয়। সে অভিজ্ঞতাজনিত প্রজ্ঞা দিয়ে সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে বাঁচবার প্রয়াস পায়। এই প্রজ্ঞাই মানুষকে জানিয়েছে যে, সমষ্টিগত জীবনযাপন বা সমাজ-গঠন ব্যতিরেকে মানব প্রজাতি রক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই সংযম বা মমত্ববোধের মাধ্যমে মানুষ তার সভ্যতাকে গড়ে তুলেছে। সংযম ও মমত্ব-বোধের সঙ্গে সংজ্ঞা এবং তাদের প্রয়োগ-ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের মান বিজ্ঞানসম্মতভাবে জানা না থাকলে ভবিষ্যতকে সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই মনোবিদের একমাত্র লক্ষ্য, মানুষকে জানা এবং কি পন্থা অবলম্বন করলে মানুষ তার ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সমাজ-কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করবে।

সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ মানবের একত্ব উপলব্ধি করে ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের বলে গেছেন—

সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ
সমানমস্ত বো মনো যথা বঃ সু সহসামতি ॥

তোমাদের সঙ্কল্প সমান, তোমাদের হৃদয়সমূহ সমান ও তোমাদের অন্তঃকরণসমূহ সমান হোক। যাতে তোমাদের পরম ঐক্য হয় তাই হোক। কারণ ঋষিরা তাঁদের জীবনানুভূতিতে উপলব্ধি করেছিলেন—

আনন্দেব খল্বিমানি ভূতানি জায়তে

আনন্দ থেকে সমস্ত পৃথিবী ও সৃষ্টির উৎপত্তি হয়েছে।

বিজ্ঞানীর কাছে প্রশ্ন হচ্ছে, এই আনন্দ কি? এ আনন্দ হলো, বেঁচে থাকবার আনন্দ বা প্রাণের অব্যাহত প্রকাশের আনন্দ। এই আনন্দের কোন প্রকার ভেদ নেই। প্রকার ভেদ শুধু গ্রহণ পদ্ধতির রূপান্তরে। ব্যষ্টির আকুতি নিয়ন্ত্রণের দ্বারা সমষ্টির ঐক্যবোধের মাধ্যমে শুদ্ধ আনন্দ উপলব্ধি করা সম্ভব। সমাজের এই অবস্থা এলেই পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি বিরাজ করবে। কি পদ্ধতিতে এই সমানানুভূতি উদ্বুদ্ধ করে ঐক্যবোধ জাগিয়ে তোলা যাবে, সেটাই হলো মনোবিদ্যার প্রকৃষ্ট লক্ষ্য "সবার উপর মানুষ সত্য তার উপরে নাই" এই কবি-বাক্যে মনোবিদ্যা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। গবেষণা সেই দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।*

* জামসেদপুর চলন্তিকা সাহিত্য পরিষদের ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশনে বিজ্ঞান শাখার সভা-পতির ভাষণ।

সঞ্চয়ন

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের নিকটবর্তী ট্রম্বেতে ভারতের প্রথম পারমাণবিক চুল্লীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন-কার্য সম্পন্ন হওয়ায় নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরে উৎপন্ন তেজ-স্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহারের প্রতি নূতন করে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। বৃটেনের অ্যাটমিক এনার্জি অথরিটি এই চুল্লী নির্মাণে সাহায্যে করেছেন। বৃটেন বর্তমানে বিশ্বের সর্বপ্রধান আইসোটোপ রপ্তানী-কারক দেশ।

রেডিও-আইসোটোপ বলতে আমরা কি বুঝি এবং ভেষজ ও শ্রমশিল্প সংক্রান্ত গবেষণায় তার ভূমিকা কি—এই সম্বন্ধে হারওয়েল পারমাণবিক শক্তি গবেষণা কেন্দ্রের আইসোটোপ বিভাগের

শ্রমশিল্প সম্পর্কিত গবেষণা বিভাগের প্রধান জে. এল. প্যাটম্যান বলেছেন—

একই মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন অ্যাটম বা পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে বিভিন্ন সংখ্যক নিউট্রন থাকে। এর ফলে কোন এক পদার্থের পরমাণুগুলির রাসায়নিক গুণ এক হলেও তাদের ওজন ভিন্ন ভিন্ন রকমের। এইগুলিকেই আইসোটোপ বলা হয়।

রেডিও বা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ উৎপন্ন হয় কৃত্রিম উপায়ে, সাধারণতঃ নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরে সাধারণ কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলি অন্যান্য অনুরূপ পদার্থ থেকে ভিন্ন এই জন্য যে, এই সকল পদার্থ এক ধরণের না এক ধরণের রশ্মি বিকিরণ করে। এই সব রশ্মি অদৃশ্য, কিন্তু আমরা তাদের ধরতে পারি এবং পরিমাপ করতে পারি গাইগার কাউন্টারে এবং অন্যান্য উপায়ে। বিভিন্ন ধরণের রশ্মির বিভিন্ন ধরণের ভেদশক্তি থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়— আল্‌ফা কণাগুলি দুই বা তিন ইঞ্চি পর্যন্ত বায়ু ভেদ করতে পারে। বিটা কণাগুলি কয়েক ফুট বায়ুর স্তর ভেদ করতে পারে এবং কাগজ বা ধাতুর পাত্‌লা চাদরের মধ্য দিয়ে চলে যেতে পারে। গামা রশ্মি কয়েক ইঞ্চি মোটা ইস্পাতের চাদর ভেদ করতে পারে।

বিটা কণাগুলি ব্যবহৃত হয় সিগারেট পরিমাপের কাজে। পদার্থের স্থূলত্বের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করবার সময় রশ্মির বিটা কণাগুলির সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আসে; কারণ এই কণার মধ্যে কতকগুলি পথেই শেষ হয়ে যায়। পদার্থের পরিমাণ এই ভাবে পার হয়ে চলে-আসা রশ্মির সংখ্যা দিয়ে পরিমাপ করা সম্ভব। এমন একটি যন্ত্র তৈরী হয়েছে যার মধ্যে তেজস্ক্রিয় উৎস থেকে বিটা কণাগুলি সিগারেট প্রস্তুতকালে সিগারেটের মধ্য দিয়ে চলে যেতে পারে। আর একদিকে একটি ডিটেক্‌টর যন্ত্রের সাহায্যে বুঝা যায়, কতখানি দৃঢ়ভাবে তামাক সিগারেটে প্যাক করা হয়েছে।

এই নূতন ব্যবস্থা কেবল সিগারেট পরিমাপের মধ্যেই সীমায়িত নয়। বিটা কণা ব্যবহারকারী স্থূলত্ব পরিমাপক যন্ত্রগুলি কাগজ, প্লাষ্টিক এবং ধাতব পাত ইত্যাদির পরিমাপ এবং নিয়ন্ত্রণের কাজেও ব্যবহৃত হচ্ছে। গামা রশ্মি ব্যবহার করে দুই বা তিন ইঞ্চি পুরু ইস্পাতের পাতও এই ভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হয়। অন্যান্য তেজস্ক্রিয় স্থূলত্ব পরিমাপক যন্ত্র টিনপ্লেট, রঙের স্থূলত্ব কিংবা বাইরে থেকে টিউবের গাত্রের স্থূলত্ব পরিমাপ করতে পারে।

রশ্মি সন্ধানের কাজে ফটোগ্রাফির ফিল্মও ব্যবহৃত হতে পারে। এক্স-রে টিউব এবং ফটোগ্রাফিক ফিল্মের মধ্যে হাত রাখলে তা ছায়া ফেলতে বাধ্য; কারণ হাত কিছুটা রশ্মি গ্রহণ করে। হাতের অন্যান্য অংশের তুলনায় অস্থিগুলি এই রশ্মি বেশী পরিমাণে গ্রহণ করতে পারে। সেজন্যে ফিল্ম ডেভেলপ করলে হাতের অস্থির একটা ছায়াচিত্র বা রেডিওগ্রাফ পাওয়া যায়।

কিন্তু এক্স-রে ফিল্ম সুলভ এবং সহজ বহনযোগ্য হলেও এক্স-রে সেটগুলি তা নয়। গামা রশ্মি বিকিরণকারী কয়েক গ্র্যাম ওজনের অপেক্ষাকৃত সুলভ তেজস্ক্রিয় উৎস কতকটা মন্থর গতিতে হলেও এক্স-রে যন্ত্রের মতই কাজ করতে পারে। তেজস্ক্রিয় থুলিয়াম গামা রশ্মি বিকিরণ করে এবং এই রশ্মি যে কোন মেডিক্যাল এক্স-রে যন্ত্রের রশ্মির মতই ভেদকারী। এই উৎসটিকে নিরাপদে জ্যাকেটের পকেটে বহন করা যায়। এই ধরণের একটি উৎসের সাহায্যে প্যাটম্যানের কয়েকজন সহকর্মী এক মিনিটের কম সময়ের মধ্যে একজন মানুষের হাতের সুন্দর রেডিওগ্রাফ গ্রহণ করেছেন। হাসপাতাল থেকে দূরে কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটলে এই জিনিষটির ব্যবহারের মূল্য আরও বেশী করে বোঝা যায়।

আরও কয়েক ধরণের রেডিও-আইসোটোপ আছে যাদের গামা-রশ্মি অনেক বেশী ভেদ করবার ক্ষমতা রাখে। দৃষ্টান্তস্বরূপ রেডিও-কোবাল্টের কথা উল্লেখ করা যায়। রেডিও-কোবাল্ট

থেকে নির্গত রশ্মি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় ছয় ইঞ্চি পর্যন্ত পুরু ইস্পাত কাষ্টিংয়ের রেডিওগ্রাফি সম্পর্কে। এক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় উৎসটিকে যখন ব্যবহার করা হয় না তখন নিরাপদে রাখবার জন্যে একটা পুরু সীসার পাত্রে রাখতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এক্স-রে যন্ত্রের তুলনায় অনেক বেশী সুবিধাজনক; কারণ উৎসটি প্রয়োজনীয় হোল্ডারসহ লম্বায় এক ইঞ্চিরও কম এবং তা ব্যবহৃত হতে পারে যেখানে বিরাট এক্স-রে টিউবের ব্যবহার প্রায় অসম্ভব।

এ পর্যন্ত রশ্মির ভেদ-শক্তির কথাই বলা হয়েছে। রেডিও-আইসোটোপগুলি একই রাসায়নিক গুণ-সম্পন্ন, অথচ ভিন্ন ভিন্ন ওজনের পরমাণু হওয়ায় আমাদের হাতে তা এক শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে দেখা দিয়েছে। যদিও রেডিও-আইসোটোপগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অন্যান্য সাধারণ আইসোটোপের মতই আচরণ করে, তথাপি আমরা তাদের অস্তিত্ব বুঝতে পারি তাদের রশ্মি থেকে। এমন কি, কোন একটি পদার্থের রশ্মির বিচ্ছুরণ ক্ষমতা কতখানি তা বুঝে পদার্থের পরিমাণ পর্যন্ত পরিমাপ করতে পারা যায়—এই পরিমাপ যতই সামান্য হোক না কেন।

মেডিক্যাল গবেষণা বিভাগের কর্মীরা তেজস্ক্রিয় আয়োডিন ব্যবহার করছেন থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড বা গলগ্রন্থির আচরণ পরীক্ষার জন্যে। রোগীকে এক গ্লাস সামান্য একটু তেজস্ক্রিয় আয়োডিন মিশ্রিত জল পান করানো হয় (আয়োডিনের পরিমাণ এত সামান্য যে তাতে রোগীর কোন ক্ষতি হয় না)। তার পর রোগীর ঘাড়ের কাছে যে গাইগার কাউন্টার ধরা হয় তাতে রেকর্ড হতে থাকে, কি ভাবে গলগ্রন্থি তা গ্রহণ করেছে। গ্রন্থির আকারও এর তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যে পরিমাপ করা সম্ভব।

কয়েক ধরণের তেজস্ক্রিয় পদ্ধতিতে রোগ নির্ণয়ের কাজও হচ্ছে। রেডিও-আয়োডিন গলগ্রন্থির রোগ পরীক্ষা সম্পর্কে কয়েক বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তেজস্ক্রিয় লবণ হাত বা পায়ের রক্ত চলাচলের অবস্থা নির্ণয় সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়। এসব পরীক্ষা সম্পর্কে ব্যবহৃত তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ক্ষণজীবী। সেজন্যে পরীক্ষার পর তেজস্ক্রিয়তা সংক্রান্ত কোন দোষ শরীরের মধ্যে থাকতে পারে না।

কোন কোন রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে অনেক বেশী পরিমাণে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তা মানুষের ক্ষেত্রে নয়, কৃষির ক্ষেত্রে। কৃষির ক্ষেত্রে গাছপালা কি ভাবে সার গ্রহণ করছে তা বোঝবার জন্যে 'ট্রেসার' পদ্ধতিতে সারের বিশেষ একটি উপাদানকে তেজস্ক্রিয় করা হয় এবং রেকর্ড করা হয় কি ভাবে তা গাছের শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। সেই ভাবে কীটঘ্ন ভেষজগুলিকে তেজস্ক্রিয় করা হয় গাছপালা এবং পোকামাকড়ের উপর সেগুলির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবার জন্যে। পৃথিবীর কোন কোন অংশে পোকামাকড়ের এক দেশ থেকে অন্য দেশে গমনের বিষয়টি জনস্বাস্থ্যের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কেও তেজস্ক্রিয় ট্রেসার পদ্ধতি প্রয়োগ করে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে পারা যায়।

দ্রুত বিশ্লেষণের জন্যে রাসায়নিক শ্রমশিল্পগুলিতেও এই ট্রেসার পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে।

ব্যাপকতর ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হতে পারে। সমুদ্রের নীচে বালি কিংবা নদীর তলদেশে কাদার চলাচল পরীক্ষা সম্পর্কেও এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। ১৯৫৫ সালে টেম্স্ নদীর মুখে কাদার চলাচল পরীক্ষার জন্যে প্রায় দু-পাউণ্ড তেজস্ক্রিয় চূর্ণ কাচ ব্যবহার করা হয়েছিল। জল-বিদ্যুৎ গবেষণা-কেন্দ্র এবং লণ্ডন পোর্ট অথরিটির কর্মীদের সহায়তায় প্রায় ছমাস ধরে তার চলাচল নদীর ২০ মাইল পর্যন্ত স্থান জুড়ে অনুসরণ করা হয়েছিল। এই পরীক্ষার ফল এখন কাদা উত্তোলন সম্পর্কিত কাজের বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

পারমাণবিক শক্তির উপজাত পদার্থ হিসাবে তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিমাণ এখন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন প্রধান প্রধান তেজস্ক্রিয় উৎস থেকে প্রাপ্ত রশ্মির প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখতে পারা যাবে। এই কাজ এখনও গবেষণার পর্যায়ে রয়েছে, কিন্তু পরীক্ষার যে সব ফল ইতিমধ্যে হস্তগত হয়েছে তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। এই রশ্মি-বিকিরণের সাহায্যে ভেষজ এবং খাদ্যদ্রব্য শোধন করা যায় এবং দীর্ঘকাল ধরে রক্ষা করা যায়। এর সাহায্যে উত্তপ্ত না করেই রবার ভালক্যানাইজ করা এবং বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক ক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ যদি ঠিকমত সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা যায় তাহলে তা থেকে ভয়ের কোন কারণ থাকে না। এই সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এই সব নিয়ম মেনে চললে বিপদের সম্ভাবনা থাকে না।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মার্চ—১৯৫৭

দশম বর্ষ ঃ ৩য় সংখ্যা
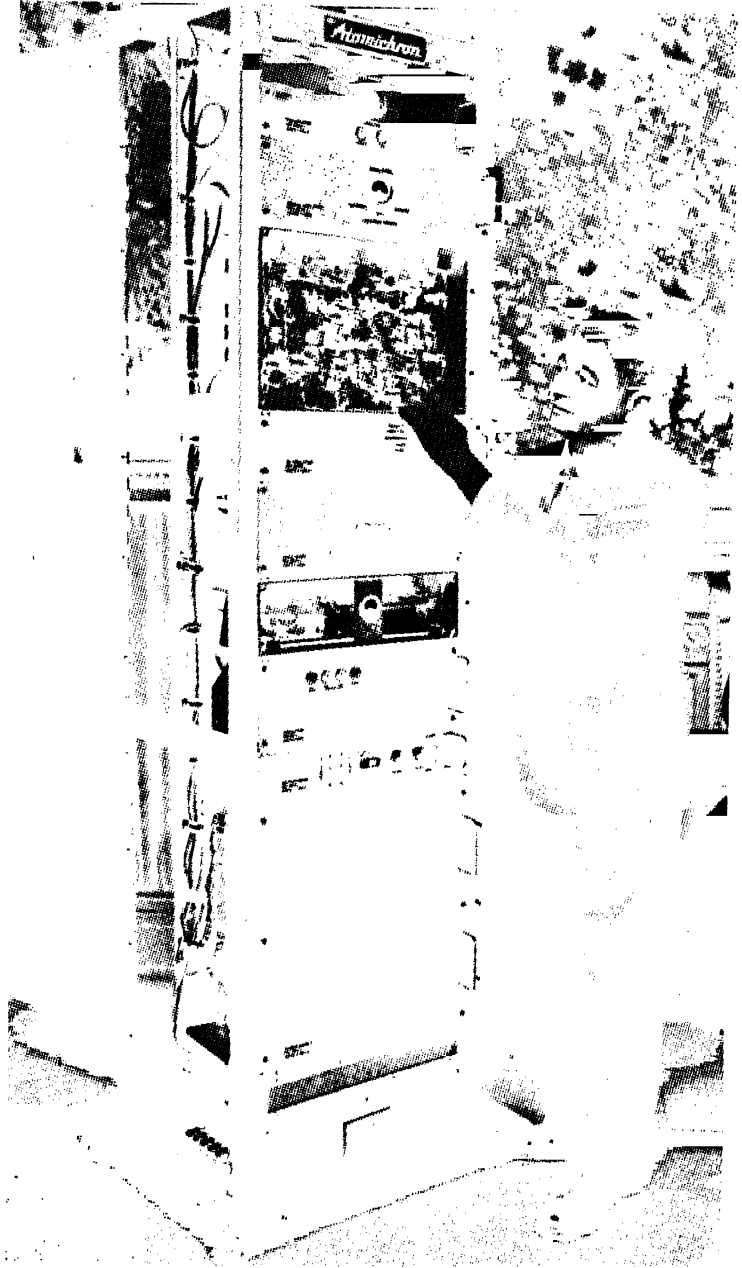
পারমাণবিক ঘড়ি—অ্যাটমিক্রন

ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজির অধ্যাপক

জ্যারল্ড আর. জ্যাকেরিয়াস অ্যাটমিক্রনের ক্যাবিনেটটি পরীক্ষা করছেন

জেনে রাখ

প্রাণীদের সন্তান-বাৎসল্য

প্রাণীদের সন্তান-বাৎসল্যের ঘটনা তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে। উন্নতস্তরের প্রাণী থেকে সুরু করে নিম্নস্তরের প্রাণীদের প্রায় প্রত্যেকেই সহজাত সংস্কারের বশে স্বীয় সন্তানের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল হয়ে থাকে। অনেক সময় এসব প্রাণীদের বিস্ময়কর সন্তান-বাৎসল্যের কথা শোনা যায়। এখানে বিভিন্ন জাতীয় কয়েকটি প্রাণীর সন্তান-বাৎসল্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিচ্ছি।

গরু, মহিষ প্রভৃতি প্রাণীদের বাচ্চা হওয়ার পর তাদের কাছে গেলে শিং নেড়ে তাড়া করে আসে, এটা সবাই লক্ষ্য করে থাকবে। এই সময় অতি শান্তস্বভাবের গরু, মহিষও অত্যন্ত উগ্র স্বভাবের পরিচয় দিয়ে থাকে। প্রায় সর্বদাই তারা বাচ্চাদের কাছে কাছে থাকে। বাচ্চারা কোনরূপ বিপদে পড়লে বুনো মহিষেরা ভীষণ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে-ওঠে। অনেক সময় এরা জলের মধ্যে অর্ধ নিমজ্জিত অবস্থায় থাকে। একবার এই অবস্থায় মহিষের একটি বাচ্চা কুমীরের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই ঘটনায় সব মহিষ উত্তেজিত হয়ে দলবদ্ধভাবে জল তোলপাড় করে আক্রমণকারীকে খুঁজে বের করে এবং শিং-এর আঘাতে তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে।

উট, গাধা প্রভৃতি প্রাণীদের মধ্যেও অসাধারণ সন্তান-বাৎসল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এরা পারতপক্ষে বাচ্চাকে চোখের আড়ালে যেতে দেয় না। যতই প্রহার করা হোক, বাচ্চা সঙ্গে না থাকলে গাধাকে এক পাও নড়ানো প্রায় অসম্ভব। গাধার পিঠে যত ভারী বোঝা চাপানো হোক না কেন, বাচ্চা সঙ্গে থাকলে এরা সানন্দে চালকের নির্দেশ অনুযায়ী চলতে থাকে। উটেরা বাচ্চা ছেড়ে একপাও অগ্রসর হয় না। কিন্তু বাচ্চাগুলি মায়ের সঙ্গে সমানতালে হেঁটে যেতে পারে না। সেজন্যে কোনস্থানে যাবার প্রয়োজন হলে বাচ্চাগুলিকে মায়ের পিঠে বা একপাশে দড়ির জালে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

বানরদের সন্তান-প্রীতি খুবই বিস্ময়কর। সন্তান জন্মাবার পর বানরেরা সর্বদাই সন্তানকে বুকে নিয়ে চলাফেরা করে। বানরদের মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায়—বানরীর সন্তান জন্মাবার পর দলের পুরুষ সর্দার সুযোগ পেলেই সন্তানকে হত্যা করে ফেলে। সেজন্যে বানরী সন্তানের বিপদের আশঙ্কায় সর্বদাই সতর্ক থাকে। সন্তান একটু বড় হলে বানরী তাকে নিরিবিলি জায়গায় খেলবার জন্যে ছেড়ে দেয়, কিন্তু সন্তানের দিকে সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি থাকে। বিপদের আশঙ্কা দেখা দিলেই তৎক্ষণাৎ সন্তানকে বুকে টেনে নিয়ে পলায়ন করে। অনেক সময় দেখা গেছে যে, সন্তানের মৃত্যু হলে

বানরী বিড়ালছানা চুরি করে নিয়ে এসে বুকে চেপে রাখে। কিন্তু এরূপ অবস্থায় বিড়ালছানা বেশীদিন বেঁচে থাকে না। মৃত্যুর পর বিড়ালছানাটির দেহ পচে না যাওয়া পর্যন্ত বানরী কিছুতেই দেহটাকে ত্যাগ করে না।

বাচ্চা জন্মাবার পর বিড়াল সর্বদাই অত্যন্ত সতর্ক থাকে। হুলো বিড়ালের বাচ্চার খোঁজ পেলেই খেয়ে ফেলে। এই কারণে এরা নিরাপদ স্থানে বাচ্চা প্রসব করে। এই সময় এদের স্বভাব খুব উগ্র হয়ে ওঠে। কেউ বাচ্চাদের কাছে যাবার চেষ্টা করলে থাবার সাহায্যে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। বাচ্চাদের নিরপত্তার জন্যে অনেক সময় এরা বাচ্চাগুলিকে অধিকতর নিরাপদ জায়গায় অপসারিত করে। এরা বাচ্চাগুলির ঘাড় কামড়ে ধরে ঝুলিয়ে একটি একটি করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়। এই ভাবে বাঘ, সিংহও সন্তান রক্ষার জন্যে ব্যবস্থা করে থাকে। কাঠবিড়ালী সন্তানের সুবিধার জন্যে বাসার অভ্যন্তরে নরম জিনিষ বিছিয়ে রাখে। বাচ্চাগুলির দেহ লোমহীন এবং অত্যন্ত কোমল থাকায় তারা এই ব্যবস্থা করে। সন্তানের বিপদাশঙ্কা দেখা দিলে এরাও বিড়ালের মত বাচ্চা স্থানান্তরিত করে।

খরগোসের মত নিরীহ প্রাণীও বাচ্চাদের রক্ষার জন্যে অত্যন্ত হিংস্রস্বভাবের পরিচয় দিয়ে থাকে। নকুলজাতীয় প্রাণীরা অনেক সময় এদের বাচ্চাদের আক্রমণ করে। কিন্তু অনেক সময় খরগোস অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আক্রমণ করে শত্রুকে তাড়িয়ে দেয়। ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি শান্তস্বভাবের প্রাণীরাও সন্তান রক্ষার জন্যে শত্রুকে আক্রমণ করতে ইতস্ততঃ করে না।

আক্রান্ত অবস্থায় পিঁপড়েরাও বাচ্চা ফেলে পলায়ন করে না। শত্রুর আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত হলেও এরা বাচ্চাকে আগলে রাখে। এমন কি, মরবার সময়েও এরা বাচ্চা মুখে করেই মরে। মাকড়সারাও সন্তান পূর্ণবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত তাদের প্রতি সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখে। কোন কোন জাতের মাকড়সা শত্রু কর্তৃক মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হলেও কিছুতেই সন্তানকে বিপদে ফেলে পলায়ন করে না। প্রাণ থাকা পর্যন্ত সন্তানের নিরাপত্তার জন্যে চেষ্টা করে। ঘরের দেয়ালে বা আনাচে-কানাচে একজাতীয় ধূসর বর্ণের মাকড়সাকে ডিম পাড়তে দেখা যায়। ডিম পাড়বার পর এরা সর্বদাই ডিমের পাহারায় নিযুক্ত থাকে। কাউকে ডিমের কাছে আসতে দেখলেই তার দৃষ্টি অন্যত্র আকৃষ্ট করবার জন্যে নিজে ছুটে পালায়। কিন্তু শত্রু যদি ডিম নষ্ট করতে উদ্যত হয় তবে এরা কিছুতেই ডিম ফেলে পলায়ন করে না। এর ফলে শত্রুর আক্রমণে এদের মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে থাকে। কোন কোন জাতের মাকড়সা তাদের বুক থেকে ডিম কেড়ে নিলে খাওয়া-দাওয়া পরিত্যাগ করে মড়ার মত পড়ে থাকে। অন্য কোন মাকড়সার ডিম এনে দিলে এরা পরম যত্নে তাকে পালন করে এবং পুনরায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সুরু করে। কানকোটারী পোকারাও সন্তানের নিরাপত্তার জন্যে বাসস্থানের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে।

কোন বিপদের আভাস পেলেই সন্তানেরা মায়ের বুকের নীচে এসে একত্রিত হয়। গর্তের মুখে অন্য কোন কীটপতঙ্গ এসে পড়লে এরা তৎক্ষণাৎ তাকে বিতাড়িত করে। কাঁকড়া-বিছা এবং কোন কোন জাতের জলচর কীট-পতঙ্গও সন্তান বড় না হওয়া পর্যন্ত তাদের পিঠে করে বিচরণ করে। পূর্ণবয়স্ক হওয়ার পর স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবার জন্যে সন্তানকে ছেড়ে দেয়।

অপোসাম নামক প্রাণীরা তাদের সন্তানদের পিঠে নিয়ে চলাফেরা করে, যতদিন না সন্তানরা পূর্ণবয়স্ক হয়। অপোসামের বাচ্চাগুলি মায়ের লেজের সঙ্গে নিজেদের লেজ জড়িয়ে মায়ের পিঠে বসে থাকে। এভাবে ৩।৪টি বাচ্চাকে পিঠে নিয়ে অপোসাম এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফিয়ে চলাফেরা করতে পারে।

পেঙ্গুইন জাতীয় কোন কোন পাখী নিজের ডিম অপহৃত হলে একটা বরফের ডেলাকেও ডিম মনে করে তা' দিয়ে থাকে। কোন কোন জাতের হাঁস নিজের ডিম অপহৃত হলে, ডিমের অনুরূপ কোন পদার্থ সেই স্থানে রেখে দিলে সেটাকেই ডিম মনে করে তা' দিয়ে থাকে।

কাক, চিল, ফিঙে প্রভৃতি পাখীরা সন্তানের নিরাপত্তার জন্যে বাসার উপর প্রখর দৃষ্টি রাখে। শত্রু বাসার নিকটবর্তী হলেই তাকে অত্যন্ত হিংস্রভাবে আক্রমণ করে; এমন কি, হত্যা পর্যন্ত করে থাকে। দোয়েল, বুলবুল, টুনটুনি পাখীরা সন্তানের নিরাপত্তার জন্যে এমন স্থান নির্বাচন করে যা সহজে শত্রুর চোখে পড়ে না। তৎসত্ত্বেও অবাঞ্ছিত কাউকে যদি বাসার চারধারে ঘোরাফেরা করতে দেখে তখন তারা শত্রুকে কৌশলে বিতাড়িত করবার জন্যে দূরবর্তী কোন স্থানে উড়ে গিয়ে একটানা ডাক সুরু করে দেয়। একটানা চীৎকার করে এরা যতই দূরে যেতে থাকে শত্রুও ততই এদের অনুসরণ করে বাসা থেকে অনেক দূরে সরে যায়।

মুরগী সাধারণতঃ বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়েই চলাফেরা করে এবং বাচ্চাদের নানারকম খাদ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। বিপদের আশঙ্কা দেখা দিলেই মুরগী ডানার নীচে বাচ্চাগুলিকে জড়ো করে। অনেক সময় মুরগীকে ভুলবশতঃ বা অন্য কোন কারণে হাঁসের ডিমে তা' দিতে দেখা যায়। তারপরে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার পর হংস-শাবক যখন বড় হয়ে স্বাভাবিক সংস্কারবশে জলে নামে তখন মুরগীকে জলাশয়ের চারধারে অসহায়-ভাবে ছুটাছুটি করতে দেখা যায়। এভাবে পালিত হংস-শাবকের প্রতি মুরগীর মাতৃ-স্নেহের কোন পার্থক্য দেখা যায় না।

পেঁচারাও সন্তানকে রক্ষা করবার জন্যে বৃক্ষ-কোটর থেকে সাপের মত হিস্‌হিস্‌ শব্দ করতে থাকে। এতেও যদি শত্রু পলায়ন না করে তবে তাকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে। রাজহাঁসেরা তাদের বাচ্চাদের সঙ্গে জলে বিচরণ করে এবং বিপদের আশঙ্কা দেখা দিলেই দু'টি ডানার সাহায্যে ভীষণভাবে জল তোলপাড় করতে থাকে। এই অবস্থায় শত্রু

আর অগ্রসর হয় না। পেলিকান পাখীরা ছোট ছোট নানাজাতের মাছ ধরে সন্তানের জন্যে ঠোঁটের নীচে থলির মধ্যে মজুত রাখে এবং বাসায় ফিরবার পর ঠোঁট দু'টিকে প্রসারিত করে দেয় এবং বাচ্চারা তখন একে একে নিজেদের ঠোঁটের সাহায্যে থলি থেকে ঐ সব মাছ উদরস্থ করে।

কাঙ্গারু স্বীয় দেহসংলগ্ন থলির মধ্যে বাচ্চা নিয়ে চলাফেরা করে। থলি থেকে বেরিয়ে বাচ্চারা এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করতে থাকে এবং বিপদের আভাস পেলেই মায়ের থলির মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কোন কোন জাতের ব্যাংও সন্তান বড় না হওয়া পর্যন্ত তাদের পিঠে করে চলাফেরা করে।

আমাদের দেশে শোল, চেতল, আড় প্রভৃতি মাছের মধ্যে যথেষ্ট সন্তান-প্রীতি দেখা যায়। বাচ্চা বড় না হওয়া পর্যন্ত শোলমাছ বাচ্চা সঙ্গে করে ঘুরে বেড়ায়। বাচ্চা কিছুটা স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত চেতল মাছের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই বাচ্চাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে। শত্রু এদের বাসস্থানের নিকটবর্তী হলেই চেতল মাছের আক্রমণে ভীষণভাবে আহত হয়। আড়মাছ জলের তলায় গর্ত খুঁড়ে ডিম পাড়ে এবং সর্বদাই বাসার পাহারায় নিযুক্ত থাকে। বাচ্চারা একটু বড় হলে আড়মাছ খাদ্যের সন্ধানে মাঝে মাঝে বাসা ছেড়ে স্থানান্তরে যায়। টিলাপিয়া মাছও বাচ্চাদের নিরাপত্তার জন্যে অত্যন্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকে।

শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

পারমাণবিক ঘড়ি—অ্যাটমিক্রন

পারমাণবিক শক্তিকে কল্যাণমূলক কাজে লাগাবার জন্যে বিজ্ঞানীরা আজকাল নানারকম গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। সম্প্রতি এসব গবেষণার অন্যতম ফলস্বরূপ তৈরী হয়েছে পারমাণবিক ঘড়ি। ঘড়িটি তৈরী হয়েছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এবং এর নাম দেওয়া হয়েছে—অ্যাটমিক্রন। এই ঘড়ির সাহায্যে নিখুঁতভাবে সময় নিরূপণ করা সম্ভব হবে। এই ঘড়িতে ৩০০ বছরের মধ্যে মাত্র ৫ সেকেণ্ড সময়ের এদিক-ওদিক হতে পারে। যাঁরা এই ঘড়ি তৈরী করেছেন তাঁরা আশা করেন যে, শেষ পর্যন্ত এই ঘড়িকে এমন নিখুঁত করে তৈরী করা সম্ভব হবে যে, ৩০,০০০ বছরেও মাত্র এক সেকেণ্ডের বেশী সময়ের নড়চড় হবে না।

তোমরা দেখেছ—বড় ঘড়িতে একটি পেণ্ডুলাম ডাইনে-বাঁয়ে অনবরত দোল খাচ্ছে। ঘড়ির ঠিকমত সময় রাখবার ব্যাপারটা পেণ্ডুলামের দোলনের উপরই নির্ভর করে। ছোট ঘড়িতে পেণ্ডুলাম থাকে না, খুব সরু স্প্রিং-সংলগ্ন ছোট একটা চাকা ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরে

পেণ্ডুলামের মত কাজ করে। এই চাকাটাকে বলা হয় ব্যালান্স হুইল। ব্যালান্স হুইল বা পেণ্ডুলামের দোলনে নানাকারণে সময়ের ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। সেই কারণেই একেবারে নিখুঁত সময় রাখা সম্ভব হয় না। অ্যাটমিক্রনে পেণ্ডুলাম বা ব্যালান্স হুইল কিছুই নেই, তার বদলে সিজিয়াম পরমাণুর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সিজিয়াম পরমাণু প্রতি সেকেণ্ডে ৯,১৯২ মিলিয়ন মেগাসাইকল্ বার স্পন্দিত হয় (১ মেগাসাইকল=দশলক্ষ সাইকল্)।

বায়ুশূন্য টিউবের মধ্যে সিজিয়াম পরমাণু স্থাপন করে টিউবটিকে রেডিও-ট্রান্সমিটার যন্ত্রের মত কাজে লাগান হয়। একটি বেতার-গ্রাহক যন্ত্রে ওই টিউব থেকে প্রেরিত সঙ্কেত ধরা হয়। এই বেতার-গ্রাহক যন্ত্রটিও সিজিয়াম পরমাণুর স্পন্দনের একই হারে স্পন্দিত হয়।

এই ঘড়ির ওজন ৫০০ পাউণ্ড এবং দাম ৫০,০০০ ডলার। এপর্যন্ত দশটি পারমাণবিক ঘড়ি নির্মিত হয়েছে এবং তা বিক্রীও হয়ে গেছে। এই ঘড়িগুলি প্রকৃতপ্রস্তাবে চিরকাল নিয়মিতভাবে চলবে। ম্যালডেনের (ম্যাসাচুসেট্স্) ন্যাশনাল কোম্পানী ইনকরপোটেডের বহু বছরের চেষ্টায় এই পারমাণবিক ঘড়ি উদ্ভাবিত হয়েছে। এর দরুণ উক্ত কোম্পানীর খরচ হয়েছে ১,০০০,০০০ ডলার। এই কোম্পানী বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের বিস্তার সম্পর্কিত গবেষণায় এবং সংবাদ গ্রাহক যন্ত্র নির্মাণে মৌলিক গবেষণা করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে ১৫ বছর পূর্ব নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আই. আই. রাবির আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর ভিত্তি করেই পারমাণবিক ঘড়ি নির্মিত হয়েছে। পরমাণুর কেন্দ্রের গঠন সম্পর্কে মৌলিক তথ্যাবলী আবিষ্কারের জন্যে অধ্যাপক রাবি ১৯৩৪ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

গবেষণার ফলে দেখা গেছে—প্রত্যেক পরমাণুই একটি সূক্ষ্ম বেতার-প্রেরক কেন্দ্রের মত। প্রত্যেক পরমাণুই একটি বিশেষ স্পন্দনের হারে সঙ্কেত প্রেরণ করে। অধ্যাপক রাবি এই পারমাণবিক সঙ্কেত ধরবার জন্যে কার্যকরী পন্থা আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। ১৯৪৫ সালের প্রথম ভাগে অধ্যাপক রাবি বলেন যে, পারমাণবিক স্পন্দনকে পেণ্ডুলামের মত কাজে লাগিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম সময় নিরূপক পারমাণবিক ঘড়ি নির্মাণ করা সম্ভব। ওয়াশিংটনস্থ যুক্তরাষ্ট্র ন্যাশনাল ব্যুরো অব ষ্ট্যাণ্ডার্ড পারমাণবিক ঘড়ির মডেলও নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত সূক্ষ্ম সময় নিরূপক পারমাণবিক ঘড়ি হচ্ছে—অ্যাটমিক্রন।

জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ, দূর-পাল্লার নৌ-চালনা, যোগাযোগ (বিশেষতঃ বেতার), জরীপ, মানচিত্র তৈরী প্রভৃতি ব্যাপারে এই পারমাণবিক ঘড়ি যথেষ্ট কাজে লাগবে। বিজ্ঞানীদের মতে, সূক্ষ্ম পরিমাপসহ পদার্থবিদ্যায় মৌলিক গবেষণা, আলোর গতিবেগের সূক্ষ্মতম হিসাব, আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের কয়েকটি মূল সূত্র সম্পর্কিত গবেষণায় পারমাণবিক ঘড়ি খুবই কার্যকরী হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের দূরপাল্লার বিমান-চালনার ক্ষেত্রে অ্যাটমিক্রন ব্যবহৃত হচ্ছে। দূর-পাল্লার বিমান-চালনার পদ্ধতিকে বলা হয় নাভারো। এর সাহায্যে ২০০০ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে অবস্থিত যে কোন সংখ্যক বিমানের দূরত্ব ও অন্যান্য সংবাদ ভূমিতে অবস্থিত বিমান-কেন্দ্রে ধরা যাবে। ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজীর পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ জ্যারল্ড আর. জ্যাকেরিয়াসের তত্ত্বাবধানে অ্যাটমিক্রন নির্মিত হয়েছে। অধ্যাপক জ্যাকেরিয়াস এককালে অধ্যাপক রাবির সহযোগী ছিলেন।

জানবার কথা

১। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মেরুদণ্ডের কোন অংশ শরীরের বাইরে বেরিয়ে থাকতে দেখা যায় না। কিন্তু মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে পশ্চিম আফ্রিকায় পোটো নামক একজাতের স্তন্যপায়ী প্রাণী আছে, যাদের শারীরিক গঠনে মেরুদণ্ডটির অদ্ভুত বৈচিত্র্য

১নং চিত্র

দেখা যায়। মেরুদণ্ডটির কিছুটা অংশ তাদের পিঠের উপরে শক্ত এবং ধারালো কাঁটার মত সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত থাকে। পোটো এই ধারালো কাঁটার সাহায্যে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে।

২। ক্যানাডার রাজহাঁস ঝাঁক বেঁধে আকাশে বিচরণ করবার সময় ইংরেজী V-

অক্ষরের আকারে সারিবদ্ধভাবে চলে। এর ফলে নাকি হাঁসের ঝাঁকে বাতাসের

২নং চিত্র

প্রতিরোধ কম অনুভূত হয়। আমাদের দেশেও এক জাতীয় হাঁসকে V-অক্ষরের মত সার বেঁধে উড়ে যেতে দেখা যায়।

৩। বহুরূপী নামক প্রাণীদের গায়ের রং যে কি, তা সঠিক বলা যায় না। কারণ এরা ইচ্ছামত গায়ের রং পরিবর্তন করতে পারে। এদের ঘাড় নেই বললেই চলে। মাথাটাকে দেখলে মনে হয় যেন দেহের সঙ্গে লেগে আছে। লেজটাকে এরা গাছের ডালে জড়িয়ে রাখে বা স্প্রিং-এর মত কুণ্ডলী পাকিয়ে রাখে। শিকারের আশায় এরা গাছের

৩নং চিত্র

ডালে বা অন্য কোন স্থানে এমন স্থিরভাবে বসে থাকে—দেখলে মনে হবে, প্রাণীটা যেন মাটির তৈরী। সাধারণতঃ বহুরূপীরা উত্তেজিত হলে তাদের গায়ের রং ধূসর দেখায়। লড়াইয়ে জয়ী হলে গায়ের রং হয় সবুজ এবং পরাজিত হলে ফ্যাকাশে হল্‌দে রং ধারণ করে।

৪। তোমাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ পর্বত কোনটি? তোমরা সবাই একবাক্যে বলবে—হিমালয় (এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউণ্ট
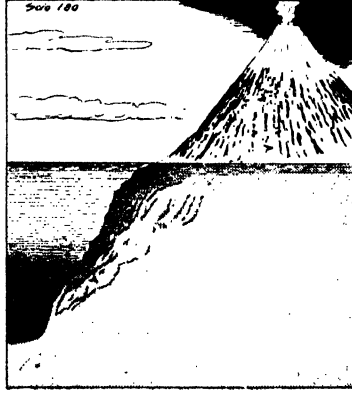
৪নং চিত্র

এভারেষ্টের সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা হলো ২৯,০২৮ ফুট)। কিন্তু জেনে রাখ—হাওয়াই-এর মউনাকেয়া নামক পর্বতের উচ্চতা হচ্ছে ৩০,৭৮৫ ফুট, এর মধ্যে ১৭,০০০ ফুট অবশ্য সমুদ্রের নীচে অবস্থিত।

৫। মাছ কি জল পান করে? প্রশ্নটা তোমাদের কাছে অদ্ভুত বলে মনে হতে পারে। কেন না, মাছ জলে বাস করে—তার জল পান করাটাই স্বাভাবিক ব্যাপার বলে অনেকে হয়তো ভাবতে পার। কিন্তু মিঠা জলে যে সব মাছ বাস করে তারা কখনও জল পান করে না। জল মুখে নিয়ে তারা কান্‌কোর ঝিল্লীর ভিতর দিয়ে বের

৫নং চিত্র

করে দেয়। সমুদ্রের জল সাধারণতঃ লবণাক্ত, সামুদ্রিক মাছ কিন্তু সমুদ্রের লবণাক্ত জল এই উপায়ে লবণশূন্য করে পান করে থাকে।

৬। উত্তর মহাসাগরের বরফের স্তূপগুলি সঞ্চরণশীল হওয়ার ফলে কোন

৬নং চিত্র

প্রাকৃতিক মানচিত্রেই উত্তর মেরুর সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। অবশ্য এই অসুবিধাও বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় দূরীভূত হবে বলে আশা করা যায়।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের নবম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস উদ্‌যাপন

২৩শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের নবম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বক্তৃতাগৃহে উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ও বিশ্বভারতীর উপাচার্য অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মাতৃভাষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও তথ্যাদি প্রচারের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অনুপস্থিতিতে শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য অধ্যাপক বসুর লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। অধ্যাপক বসু তাঁহার ভাষণে বলেন, আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর একান্ত অভাব। মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় ও লোকায়ত্ত করিতে পারিলে উহার নূতন প্রয়োগ ও সম্ভাবনা দেখা দিবে এবং দেশও উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। তিনি বলেন, দেশের লোক বিজ্ঞানের কথা জানিতে উৎসুক হইলে ধীরে ধীরে জনচিত্তে বৈজ্ঞানিক মনোভাব গড়িয়া উঠিবে।

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী বি, কে, গুহ এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। তিনি ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা হইতে বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁহার "বিদ্যার দৌড়" কতদূর ছিল, সেই সম্পর্কে একটি কৌতুককর ঘটনার কথা বলেন। তিনি যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তখন বিজ্ঞানের একজন ছাত্রের সঙ্গে তাঁহার তর্ক হয়। তাঁহার বক্তব্য ছিল যে, যে তারের মধ্য দিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি প্রবাহিত হয় সেই তারে ছিদ্র আছে।

উক্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বিচারপতি গুহ বলেন তাঁহার ছাত্রাবস্থায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ন্যায় সংস্থা ছিল না। তৎকালে কলা বিভাগের ছাত্রদের বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান একেবারে ছিল

না বলিলেই হয়। তাঁহার মতে, আমাদের দেশের মানুষের রক্তে বিজ্ঞানের দিকে মানসিক প্রবণতা নাই। সেইজন্য মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সহজ ও সরল ভাষায় জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হওয়া সমধিক প্রয়োজন। এই দিক দিয়া বিজ্ঞান পরিষদ যে কাজ করিতেছেন, তজ্জন্য পরিষদ প্রশংসার্হ।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রখ্যাত শিল্পপতি শ্রীনরসিংদাস আগরওয়ালা খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি, শিল্পোন্নয়ন প্রভৃতি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়া পরিষদের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানান এবং এই কর্মপ্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যথাসাধ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

পরিষদের কর্মসচিব শ্রীসর্বাণীসহায় গুহ সরকার পরিষদের কার্যকলাপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, এই সংস্থার পক্ষ হইতে গত নয় বৎসর যাবৎ বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ, জনপ্রিয় বিজ্ঞান গ্রন্থমালা প্রণয়ন, বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা, অবৈতনিক বিজ্ঞান পাঠাগার পরিচালনা প্রভৃতি কাজ পরিচালিত হইতেছে। তিনি স্বাধীন ভারতে নূতন পরিবেশে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিজ্ঞানী, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের এবং অন্যান্য সংস্থার নিকট হইতে অধিকতর অর্থানুকূল্যের আবেদন জানান।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যক্ষ ডাঃ ডি, এম, বসু বলেন, পরিষদের কার্য সুষ্ঠুভাবে চালাইবার জন্য অধিক সংখ্যক উৎসাহী কর্মীর প্রয়োজন।

উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক আহূত ১৯৫৬ সালের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফল ঘোষণা করেন। পুরস্কার প্রাপ্তদের নাম :—

১। শব্দহীন শব্দ (পদার্থ ও ভূ-বিজ্ঞান), শ্রীঅশোক দত্ত (যাদবপুর)

২। আইসোটোপ (রসায়ন ও ধাতুবিজ্ঞান), শ্রীপ্রদীপ রায়বর্মন (বিজ্ঞান কলেজ)

৩। আধুনিক গণিত (গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা), শ্রীসঞ্জয় লাহিড়ী (নারিকেলডাঙ্গা)

৪। অ্যালার্জী (শারীরতত্ত্ব ও চিকিৎসা বিজ্ঞান), শ্রীবিমল রায় (কালিঘাট)

৫। হে অতীত কথা কও (জীববিজ্ঞান ও জীবাণুতত্ত্ব), শ্রীকল্যাণ রায় (যাদবপুর)

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে এই বৎসর যোগ্য প্রবন্ধ না থাকায় কোন পুরস্কার প্রদত্ত হয় নাই। পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবন্ধগুলি * চিহ্ন দিয়া যথাসময়ে ক্রমশঃ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশ করা হইবে।

বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ হইতে ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল উপস্থিত ব্যক্তিগণকে ধন্যবাদ দেন।

বিবিধ

পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে উদ্ভূত ষ্ট্রন্‌সিয়াম

ষ্ট্রন্‌সিয়াম-৯০ হইতে ক্যান্‌সার রোগের উৎপত্তি হইতে পারে। পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে বাতাসে যে ষ্ট্রন্‌সিয়াম-৯০ ছড়াইয়া যায় তাহা মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক কি না তাহা লইয়া কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী গবেষণা করিতেছিলেন। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, যে পরিমাণ ষ্ট্রন্‌সিয়াম-৯০ মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর, পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে গড়ে প্রতি মানুষের দেহে তাহার দশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র পাওয়া গিয়াছে।

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে গবেষক-দল ১২টি কেন্দ্র হইতে সংগৃহীত ৫০০ মানুষের অস্থি লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে নবজাত শিশু হইতে ৬০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ ব্যক্তির অস্থিও ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও ক্যানাডা, ব্রেজিল, চিলি, কলাম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, ডেনমার্ক, ইংল্যাণ্ড, জার্মেনী, ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, সাইবেরিয়া এবং তাইওয়ান হইতে ঐ সকল অস্থি সংগৃহীত হইয়াছে।

পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে বহুল পরিমাণে ষ্ট্রন্‌সিয়াম-৯০ সৃষ্টি হইয়া থাকে। উহার ক্ষুদ্র কণাগুলি বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায়। উহার তেজস্ক্রিয়তা দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে। ক্যাল-সিয়ামের মত মানুষ ও পশুর অস্থির মধ্যে গিয়া উহা জমা হইয়া থাকে। বিস্ফোরণের পরে বায়ুমণ্ডল হইতে কি ভাবে উহা মানুষের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাহা মোটামুটি মানুষের জানা আছে।

করোনারি থ্রম্বোসিস প্রতিরোধের পদ্ধতি আবিষ্কার

ডাঃ রবার্ট গ্রোভার নামে ফিলাডেলফিয়ার জনৈক অস্ত্রচিকিৎসক নিউ অর্লিয়েন্সে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, সাধারণ একপ্রকার অস্ত্রোপচারের সাহায্যেই হয়তো করোনারি থ্রম্বোসিস প্রতিরোধ করা সম্ভব হইবে। এই সম্পর্কে পরীক্ষার ফল এত ভাল হইয়াছে যে, বিশ্বাস করাই শক্ত।

তিনি আরও বলেন—অস্ত্রোপচারটি সাধারণ হইলেও এখন পর্যন্ত উহা পরীক্ষার স্তরে আবদ্ধ রহিয়াছে এবং সুনির্দিষ্ট ফল পাওয়ার জন্য কমপক্ষে আরও দুই বৎসর ইহা লইয়া গবেষণা করিবার প্রয়োজন হইবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, এই করোনারি থ্রম্বোসিস নামক হৃদ্‌রোগেই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী লোকের মৃত্যু হয়।

রকেট-বাহিত কুকুর

রুশ বিজ্ঞানীরা রকেট-বাহিত কয়েকটি কুকুরকে ১১০ কিলোমিটার (৭০মাইল) উর্ধ্বাকাশে পাঠাইতে সক্ষম হইয়াছেন। উহারা নিরাপদে ভূতলে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং উহাদের কোন ক্ষতি হয় নাই। ভবিষ্যতে ব্যোমপথে ভ্রমণের অবস্থা নির্ণয়কল্পে এই পরীক্ষাকার্য চালান হয়।

রুশ ট্রেড ইউনিয়ন সংবাদপত্র 'ট্রুডে' উপরোক্ত তথ্য প্রচার করা হইয়াছে। উহাতে বলা হয় যে, রকেটের প্রান্তভাগে যুক্ত তাপ-নিয়ন্ত্রিত একটি আবদ্ধ কেবিনে কুকুরগুলিকে রাখা হয়। কিন্তু উর্ধ্বাকাশে রকেটচ্যুত কেবিনটি প্যারাশুটের সাহায্যে নীচে নামিয়া আসে। ইহাতে তিন ঘণ্টা সময় লাগে। ঐ সময় স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরায় কুকুর-গুলির শারীরিক অবস্থার আলোকচিত্র গৃহীত হয়। উহাতে তাহাদিগকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখা যায়।

প্যারাশুট হইতে ঝুলানো অক্সিজেন ভর্তি

বিশেষ পরিচ্ছদাবৃত কুকুরগুলিকে মাটিতে নামাইয়া দিয়াও ভিন্নভাবে পরীক্ষাকার্য চালান হয়।

নিখুঁত সময়রক্ষক ঘড়ি

ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ বৃটেনের একটি ঘড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানকে এক ধরণের ঘড়ির (মাষ্টার ক্লক) জন্য অর্ডার দিয়াছে। এরূপ নিখুঁত সময়রক্ষক ঘড়ি বিশ্বের আর কোন দেশের আর কোন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করিতে পারে নাই। এই ইলেকট্রনিক ঘড়িগুলি একশত বৎসরে এক সেকেণ্ডের অধিক স্লো-ফাষ্ট হয় না।

এই মাষ্টার ক্লক গ্রীনউইচ মীন টাইম নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার যন্ত্রগুলি এত সূক্ষ্ম যে, সাধারণভাবে বাক্সবন্দী করিয়া ইহা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পাঠানো যায় না। ঘড়ি নির্মাতাদের ইঞ্জিনিয়াররা ঘড়ি লইয়া বিশ্বের যে কোন দেশে গিয়া দিয়া আসেন। সম্প্রতি অটোয়াতে (ক্যানাডা) ছুইটি ঘড়ি পাঠানো হয়। ইঞ্জিনিয়ার একটি বিশেষভাবে নির্মিত শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত বাক্সের মধ্যে ঘড়ি ছুইটি লইয়া রয়েল ক্যানাডিয়ান বিমান বাহিনীর একটি বিমানে করিয়া উহা যথাস্থানে পৌছাইয়া দেন।

বৃটিশ ডাক বিভাগের ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারগণ বহু বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টার পর উক্ত ঘড়ি নির্মাণ করিতে সক্ষম হন।

আন্ত্রিক টিউমারের মধ্যে সন্তান

মুঙ্গের সদর হাসপাতালে সম্প্রতি একটি যুবতীর ৩০ পাউণ্ড ওজনের একটি আন্ত্রিক টিউমার সিজারিয়ান অপারেশন করিয়া একটি পূর্ণাকৃতির মৃত পুত্র সন্তান বাহির করা হয়।

মৃত সন্তানটিকে পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে রাখা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ভারতে প্রথম বিমানবাহী জাহাজ হারকিউলিস

কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে ভারতীয় নৌবাহিনী কর্তৃক বৃটিশ বিমানবাহী জাহাজ হারকিউলিস ক্রয়ের সংবাদ সত্য বলিয়া জানান হয়।

ভারতীয় নৌবাহিনীর ইহাই প্রথম বিমানবাহী জাহাজ। তিন-চার বৎসরের মধ্যেই জাহাজটি ভারতীয় নৌবাহিনীতে যোগদান করিবে।

একটি প্রেসনোটে প্রকাশ, হারকিউলিস (১৫,৭০০ টন) জাহাজটিকে বৃটেনে আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত করা হইতেছে।

এশিয়ার বৃহত্তম ক্রেন

টাটা আয়রন অ্যাণ্ড ষ্টিল কোম্পানী লিমিটেডের জামসেদপুর কারখানায় সবেমাত্র একটি ২৭৫ টন ইলেকট্রিক ওভারহেড ক্রেন চালু করা হইয়াছে। উহা এশিয়ায় বৃহত্তম ক্রেন বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। বৃটেনে নির্মিত এই ক্রেন ২৫০ টন গলিত ইস্পাতপূর্ণ হাতা উত্তোলন করিবে। পরে এই আকারের আর একটি ক্রেন বসান হইবে। জামসেদপুর কারখানার উৎপাদন দ্বিগুণ করিবার জন্য যে সম্প্রসারণকার্য চলিতেছে, উহার অংশ হিসাবে এই ছুইটি ক্রেন বসান হইতেছে।

পরলোকে অধ্যাপক বোটে

হাইডেলবার্গ, ৯ই ফেব্রুয়ারী—অধ্যাপক ওয়াল্টার বোটে ৬৬ বৎসর বয়সে মারা গিয়াছেন। ১৯৫৪ সালে ইনি পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। অধ্যাপক ওয়ালটার বোটে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্স এবং রেডিওলজি ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর ছিলেন।

অধ্যাপক বোটের আবিষ্কৃত পদ্ধতির সাহায্যেই মহাজাগতিক রশ্মির বিশ্লেষণ কার্য সম্ভবপর হয়।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দশম বর্ষ | এপ্রিল, ১৯৫৭ | চতুর্থ সংখ্যা

অ্যালার্জি*

শ্রীবিমল রায়

চোখ মেললেই নজরে পড়বে, আলাপ করলেই শোনা যাবে যে, এর বাড়ীতে কারও সর্দি-কাশি লেগেই আছে, ওর বাড়ীতে আমবাত-সন্ধিবাত কারও নিত্যসঙ্গী হয়ে রয়েছে, এখানে কারও অ্যাজ্‌মা বা হাঁপানী, ওখানে কারও এক্‌জিমা। কেউ ভোগে সারাটা বছর, কেউ ভোগে মাঝে মাঝে, কেউ অসুস্থ হয় কোনও বিশেষ সময়ে, কেউ বা আক্রান্ত হয় হঠাৎ। এতদিন এসব অসুস্থতাকে সাধারণ রোগের পর্যায়ে ফেলা হতো এবং সেই হিসাবেই চিকিৎসা চলতো। ধূলা-বালির সঙ্গে, উগ্র গন্ধের সঙ্গে এই রোগগুলির আক্রমণের একটা সহজ সম্পর্কও খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু এর বেশী গবেষণার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় নি। দুধ, চিংড়ি বা ডিম খেলে আমবাত হওয়া নজরে পড়েছে ঠিকই; কিন্তু এর সঙ্গে এক্‌জিমার প্রকৃতিগত মিল আছে কিনা, সেটুকু বোঝবার চেষ্টা হয় নি। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ডিপ্‌থেরিয়া সিরাম ব্যবহারকালে কয়েকটি দুর্ঘটনা বিজ্ঞানীদের গতানুগতিক চিন্তাধারাকে নতুন খাতে বইয়ে দিল, যুক্ত হলো বিশ্লেষণাত্মক বিচারধারা। তার ফলে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে জানা গেল যে, পূর্ববর্তী যে সব রোগের উল্লেখ করা হয়েছে তাদের উৎপত্তির কারণ হলো একরকম প্রোটিন জাতীয় পদার্থের সঙ্গে শরীরের প্রতিরোধ ক্রিয়ার বারংবার সংঘাত এবং তার ফলে কোনও জন্মগত কারণে ঐ পদার্থের সংস্পর্শে শরীরের রোগপ্রবণতা। ফন পির্‌কেট এই প্রবণতার নাম দেন অ্যালার্জি। ফন পির্‌কেট প্রমুখ বিজ্ঞানীদের গবেষণায় প্রোটিন জাতীয় পদার্থ বা ফরেন প্রোটিনের বিষক্রিয়ার কথা জানা গেলেও নানাধরণের দৈহিক পরিবর্তনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের প্রমাণ তখনও মেলে নি। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মেলৎশারের গবেষণার ফলে প্রথম জানা গেল যে, সিরাম বিষক্রিয়া ও হাঁপানী একই কারণের বিভিন্ন প্রকাশ।

এভাবে নানা সময়ের নানা প্রকৃতির গবেষণার সাহায্যে বিজ্ঞানীরা অ্যালার্জির প্রকৃতি ও কার্য-কারণ সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা করতে সক্ষম হন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই প্রমাণ পাওয়া গেল যে, ইনজেকশন, খাদ্য গ্রহণ অথবা আঘ্রাত বস্তুর প্রভাবে অ্যালার্জি হতে পারে।

প্রথমতঃ, যে কোনও ফরেন প্রোটিন শরীরে পুনঃপ্রবিষ্ট করালেই অ্যালার্জি হওয়া সম্ভব; তবে সিরাম ইনজেকশনের পুর্নব্যবহারে অসুস্থতা শরীরের স্বাভাবিক ধর্মের মধ্যে গণ্য। এই কারণেই অনেকে সিরাম-জনিত অসুস্থতাকে অ্যানাফিল্যাক্‌টিক শক বলেন এবং সাধারণ অ্যালার্জি থেকে একটু পৃথক করে দেখেন।

দ্বিতীয়তঃ, দুধ, ডিম, মাছ প্রভৃতি প্রোটিন জাতীয় খাদ্য গ্রহণের পরেও নানাজাতীয় অ্যালার্জি দেখা দিতে পারে। কিন্তু শর্করা প্রভৃতি অন্য খাদ্যের পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে অ্যালার্জির উদ্ভব হয় না।

তৃতীয়তঃ, বাতাসের সঙ্গে নানাপ্রকার জীবাণু, বীজকণা, শস্যকণা, ধূলিরেণু প্রভৃতি বারংবার নাসিকায় প্রবেশ করলেও নানাজাতীয় অ্যালার্জির সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া আরও দেখা গেল যে, সাধারণত:

(ক) শিশুদের দুধ খাওয়া থেকেই অ্যালার্জির সৃষ্টি হয়;

(খ) বাল্যকালে দুধ, চিংড়ি, ডিম প্রভৃতিই অ্যালার্জির কারণ হয়;

(গ) কৈশোরে, যৌবনে আঘ্রাত বস্তুর প্রভাবেই প্রথম রোগ দেখা দেয়;

(ঘ) প্রৌঢ়াবস্থায় জীবাণু সংক্রমণই অ্যালার্জির প্রাথমিক কারণ।

অর্থাৎ অ্যালার্জি হঠাৎ দেখা দিলে শিশু ও বালকের ক্ষেত্রে খাদ্যই প্রধানতঃ দায়ী; কিশোর ও যুবকের ব্যাপারে ধুলা-বালি প্রভৃতি যা নাকের মধ্যে দিয়ে ঢোকে, সেগুলিই অ্যালার্জির জন্যে দায়ী; আর প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের বেলায় জীবাণুর সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে।

অ্যালার্জি কত রকমের হতে পারে তারও একটা হিসাব করা সম্ভব হলো। দেখা গেল যে, শ্বাসযন্ত্র, চর্ম, পাকযন্ত্র, হাড় বা মাংস, স্নায়ু অথবা রক্তের সংশ্রবে অ্যালার্জি হতে পারে।

ফলে আমরা পাই অ্যাজমা বা হাঁপানী ও একধরণের সর্দি (Hay fever, Spasmodic rhinorrhoea), আমবাত (Urticaria, Angioneurotic œdema) এবং চুলকনা, এক্‌জিমা, লাল লাল চাকা বা ফোস্‌কা, শূলবেদনা, বমি, পেটের অসুখ, বাত, শিরঃশূল ও সিরাম-জনিত অসুস্থতা।

ছোটদের সাধারণতঃ অ্যাজ্‌মা, স্প্যাজমোডিক রাইনোরিয়া, প্যাপুলার আর্টিকেরিয়া, ইন্‌ফ্যান্টাইল এক্‌জিমা হয়। যুবকদের অ্যাজ্‌মা, এক্‌জিমা, রাইনোরিয়া, আর্টিকেরিয়া, এন্‌জিওনিউরটিক ইডিমা, প্রুরাইগো, ডার্‌মাটাইটিস হার্‌পেটিফর্মিস, মিগ্রেন এবং গ্যাস্‌ট্রো-ইন্‌টেস্‌টাইন্যাল অ্যালার্জি হতে দেখা যায়। আর বৃদ্ধেরা ভোগেন আর্‌থ্রাইটিস ও অ্যাজ্‌মায় কিংবা এরিথিমা মাল্‌টিফর্মিতে। সিরাম-সিক্‌নেস সবারই হতে পারে।

অবশ্য এটা মনে রাখা দরকার যে, আগে থেকে কে কি রোগে ভুগছে, সে হিসাব এর মধ্যে ধরা হয় নি। শুধু ওসব বয়সে কোন্ প্রকার অ্যালার্জি প্রথম আক্রমণ করতে পারে, সেই খবরটুকুই জানানো হয়েছে।

এসব রোগের সঙ্গে আবার খাদ্য প্রভৃতির নিবিড় সম্পর্ক আছে; যেমন—চুলকনা, আমবাত ইত্যাদির সঙ্গে খাদ্যের নিকট সম্বন্ধ। কিছু খাওয়ার ফলেই এই রোগগুলি দেখা দেয়। সর্দি ও হাঁপানীর সঙ্গে আঘ্রাত বস্তুর কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে। ধুলাবালি আঘ্রাণ করবার ফলেই এসব রোগের উৎপত্তি হয়। সন্ধিবাত, পেশীবাত জীবাণুর সংস্পর্শেই বৃদ্ধ বয়সে দেখা দেয়। মোটামুটি এই হলো বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের গবেষণালব্ধ ধারণা।

আধুনিক কালে এই ধারণার সামান্য পরিবর্তন ঘটেছে। এখন শুধু ফরেন প্রোটিন নয়, বিভিন্ন ওষুধেও অ্যালার্জি হওয়া সম্ভব বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। ধোঁয়ায়, ঝাঁজে হাঁপানী হওয়ার

সংবাদও অনেক পাওয়া যায়। কাজে কাজেই শরীরের বিশেষ প্রবণতাকেই এখন অ্যালার্জির আসল কারণ বলে মনে করা হয়। আধুনিক গবেষণায় আরও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, শ্বেতী, রক্তের চাপবৃদ্ধি, এমন কি টন্‌সিলাইটিসও অনেকক্ষেত্রে অ্যালার্জিরই বিভিন্ন রূপ। এদের মধ্যে শ্বেতী এবং রক্তচাপবৃদ্ধি যেমন ওষুধ খাওয়ার ফলে হয় তেমনি খাদ্যগ্রহণে এবং ত্বকে ওষুধ প্রয়োগেও হয়। এখানেও বিশেষ প্রবণতাই বেশী কাজ করে থাকে। এই প্রবণতা শিশু তার বাপ-মার কাছ থেকে পায়; তবে সে পাওয়া অনেক সময়ে পিতা-মাতার গুণ এবং দোষে সৃষ্ট, কোনও একজনের নিজস্ব ব্যাপার নয়। অতএব অ্যালার্জি বংশানুক্রমিক হওয়াও যেমন সম্ভব, ব্যক্তিগত হওয়াও তেমনি স্বাভাবিক। বাপ-মার নেই বলে ছেলে-মেয়ের হবে না, এমন কোন নিয়ম নেই; ব্যক্তিগতভাবে ছেলে-মেয়ে প্রবণতার অধিকারী হতে পারে। এই প্রবণতার জন্যেই বাইরের সামান্য প্রভাবে শরীরে বিষক্রিয়া হয়। অর্থাৎ হিষ্টামিন জাতীয় একরকম বিষের প্রকোপ হয়, যার জন্যে রক্তবাহী নালী তার আবরণের রোধক ক্ষমতা হারায়, অথচ পেশীর সংকোচন ক্ষমতা বেশী করে পায়। ফলে ত্বকে, ত্বকের নীচে, শরীরাভ্যন্তরের পাত্‌লা আবরণে, ফুস্‌ফুসের পেশীর মধ্যে (ব্রঙ্কিয়াল মাস্‌ল্‌-এ) জল জমে। শুধু তাই নয়, অ্যাড্রিন্যাল কর্টেক্সের স্বাভাবিক কাজকেও এ ব্যাহত করে, আর রক্তের মধ্যে ক্যালসিয়াম কমিয়ে দিয়ে প্রোটিনের অংশ অতিরিক্তভাবে বাড়িয়ে দেয়। শ্বেতী বা রক্তচাপবৃদ্ধি এই ভাবেই আসে। অবশ্য অ্যাড্রিন্যাল কর্টেক্সের বেশী বিকলতা হলে রক্তচাপ বৃদ্ধি না হয়ে কমতেও পারে। কাজেই সাধারণ ভাবে রোগটিকে রক্তচাপ বৈকল্য বলাই ভাল। যাহোক অ্যালার্জির যা কিছু লক্ষণ আমরা দেখতে পাই তাদের মূলে হলো হিষ্টামিন জাতীয় বিষ। নিঃশ্বাসের কষ্ট, চর্মরোগ, আমবাত ইত্যাদি হলো অ্যালার্জির লক্ষণ। এছাড়া শরীরের অভ্যন্তরেও কতকগুলি পরিবর্তন হয় যা আগে থেকে দেখলে বোঝা যায় যে, দেহে অ্যালার্জিক রিয়্যাক্‌শন হওয়ার সম্ভাবনা সব সময়েই রয়েছে। এই পরিবর্তনগুলি হলো:—

(১) পাকস্থলীর অ্যাসিড কমে যাওয়া।

(২) রক্তের চিনি ও ক্যালসিয়াম কমে যাওয়া;

(৩) রক্তে অ্যামিনো-অ্যাসিড বেড়ে যাওয়া;

(৪) রক্তে ইওসিনোফিল-এর সংখ্যা বেড়ে যাওয়া;

(৫) ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স উৎপাদনে বাধা পাওয়া;

(৬) অ্যাড্রিন্যালিন হর্মোনের স্বাভাবিক কাজে বাধা পাওয়া।

এই পরিবর্তনগুলি জানবার ফলে অ্যালার্জির চিকিৎসার ব্যাপারে অনেকটা সুবিধা হয়। রোগীকে কি কি খাদ্য দেওয়া উচিত, কি খাদ্য দেওয়া যাবে না, কোন্ ওষুধ অ্যাড্রিন্যালকে সাহায্য করবে, ইত্যাদি বিষয় বোঝা যায়। কিন্তু চিকিৎসা শুরু করবার আগে আরও কিছু জানবার দরকার আছে; যেমন—রোগটি সত্যিই অ্যালার্জি কি না, রোগের জন্যে কোন্ বস্তুটি দায়ী এবং রোগটি কবেকার।

(ক) হাঁপানী, একজিমা, আমবাত দেখলে হয়তো তাদের অ্যালার্জি বলে চিনতে ততটা কষ্ট নাও হতে পারে; কেন না, তাদের প্রকৃতি ও আক্রমণ-ধারায় একটা সুস্পষ্ট নিয়ম বা রীতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এমন কতকগুলি রোগ আছে যেগুলি অ্যালার্জি, কি সাধারণ রোগ তা বুঝতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। যেমন—চর্মরোগ, পেটের অসুখ, অ্যাপেণ্ডিসাইটিস, শ্বেতী, মাথাধরা, ব্লাড প্রেসারের পরিবর্তন। কাজেই অ্যালার্জি কিনা তা জানতে হলে সব ক্ষেত্রেই দুটি নিয়ম পালন করা দরকার—রোগের বৃত্তান্ত ভাল করে জানতে হবে এবং রক্ত পরীক্ষা করতে হবে। যদি দেখা যায় যে, কতকগুলি রোগ নির্দিষ্ট সময়ে, অবস্থায় বা

প্রাকৃতিক পরিবর্তনে প্রকট হয়, অথবা কোনও দ্রব্য খাওয়া, শোঁকা বা ব্যবহারের পর দেখা দেয়, অথচ ঐ অবস্থা বা ব্যবস্থাগুলি এড়িয়ে যেতে পারলে রোগ প্রকাশ পায় না; যদি রক্ত পরীক্ষায় ইওসিনোফিলের অনুপাত বেশী হয়, ক্যালসিয়ামের অনুপাত কমে যায় এবং অ্যামিনো-অ্যাসিড রক্তে বেশী পরিমাণে জমে, তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে, রোগগুলি অ্যালার্জিরই বহিঃপ্রকাশ বটে। এটুকু জানবার পর রোগের জন্যে দায়ী বস্তুটিকে খুঁজে বের করা প্রয়োজন। অনেক আগেই আমরা দেখেছি যে, শিশু, যুবক ইত্যাদি ভাবে ভাগ করলে এবং রোগটি কোন্ প্রকৃতির তা লক্ষ্য করলে দায়ী বস্তুটি খাদ্য, কি ওষুধ, কি ধূলিকণা, কি জীবাণু তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর পর এলিমিনেশন ডায়েট বা স্কিন টেস্ট প্রভৃতির সাহায্যে প্রকৃত দায়ী বস্তুটিকে জেনে নেওয়া সহজ হয়ে যায়। দায়ী বস্তু একক হতে পারে, বহুও হতে পারে। রোগটি কবেকার জানতে পারলে দায়ী বস্তুর সঙ্গে পরবর্তীকালে অন্য কিছুর সংমিশ্রণ ঘটেছে কিনা তা জানা যায়, আর রোগটি শরীরের অভ্যন্তরে কতটা পরিবর্তন ঘটিয়েছে, সেটাও আন্দাজ করা যায়। এভাবে রোগের ডায়াগ্নোসিস, অর্থাৎ স্বরূপ নির্ধারণ করা হয়ে গেলে চিকিৎসার প্রশ্ন ওঠে।

অন্য পাঁচটি রোগের মত অ্যালার্জি চিকিৎসারও মোটামুটি দুটি ব্যবস্থা—প্রতিষেধ ও আরোগ্য। মাতা বা পিতার দিক থেকে অ্যালার্জির কোনও ইতিহাস পাওয়া গেলে ভ্রূণ অবস্থায় ও নবজাতক অবস্থায় শিশুর প্রতিষেধ বা রোগ নিবারণের ব্যবস্থা করতে হবে, অর্থাৎ মাতাপিতাকে চিকিৎসা করতে হবে। অ্যান্টি-হিষ্টামিনিক ফরেন প্রোটিন ইনজেকশন, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম দিতে হবে এবং খাদ্যে প্রোটিন কমাতে হবে। ইওসিনোফিল খুব বেশী থাকলে আর্সেনিক ইনজেকশন দেওয়ার প্রয়োজন ঘটতে পারে। শিশু জন্মালে অ্যান্টিহিষ্টামিনিক ভিটামিন বি-কম্‌প্লেক্স ও ক্যালসিয়াম প্রয়োজন হবে। অল্প পরিমাণ আর্সেনিকও কোনও কোনও ক্ষেত্রে অপরিহার্য হতে পারে। কার কতটা দরকার সেটা অবশ্য নির্ভর করবে রক্ত পরীক্ষার উপর।

রোগ যাদের আছে বা হবে তাদের আরোগ্য করতে গেলে দুটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে—একটি পথ্যাপথ্য, অপরটি ওষুধ। পথ্যাপথ্যের মধ্যে কোন্ খাদ্য খাওয়া চলবে না, কোন্ ওষুধ বাদ দিতে হবে, কোন্ বস্তু শোঁকা চলবে না, বা কোন্ পরিবেশ পরিহার করতে হবে—সে সম্বন্ধে নির্দেশ থাকবে। ওষুধ ব্যবহার হবে—(প্রথম) রোগের তীব্র আক্রমণের বেগ সামলাবার জন্যে, (দ্বিতীয়) রোগের আনুষঙ্গিক লক্ষণ দূর করবার জন্যে; (তৃতীয়) রোগের বিশিষ্ট চিকিৎসার জন্যে। রোগ যদি তীব্র থাকে তাহলে অ্যাড্রিন্যালিন, এফিড্রিন, আইসোপ্রেনালিন প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। লক্ষণ অনুসারে অ্যামিনোফাইলিন, ফেনাজোন, ষ্ট্র্যামোনিয়াম প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়; এমন কি হাঁপানীর খারাপ অবস্থায় সময় সময় মরফিন দেওয়ারও প্রয়োজন ঘটে। আক্রমণের তীব্রতা কমে গেলে রোগপ্রবণতা দূর করবার চেষ্টা করা হয় তিনটি উপায়ে :—

(১) অ্যান্টিহিষ্টামিনিক একৃথ্, কর্টিসোন, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম ও আর্সেনিক ব্যবহার করে;

(২) ফরেন প্রোটিন ব্যবহার করে;

(৩) দায়ী বস্তু সূক্ষ্ম পরিমাণে ব্যবহার দ্বারা দেহকে সহনক্ষম করে নিয়ে। বস্তুটি সাধারণতঃ ইনজেকশন রূপেই ব্যবহৃত হয়।

রোগের প্রকৃতি আর প্রকোপের উপর ওষুধ নির্বাচন এবং একক বা যৌথ প্রয়োগ নির্ভর করবে। রোগের আনুষঙ্গিক লক্ষণগুলিকে দূরীভূত করবার জন্যে এই সঙ্গে চিকিৎসা করতে হবে। চর্মরোগের জন্যে ঠাণ্ডা লাগাবার ওষুধ, শ্বেতীর জন্যে বৌটি জাতীয় ওষুধ, আর রক্তচাপবৃদ্ধির জন্যে সর্পগন্ধা ব্যবহার করতে হবে।

সৌরপৃষ্ঠের রহস্য

শ্রীপরেশনাথ দত্ত

অতি প্রাচীনকালে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতি সূর্যকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এটা কিন্তু বিজ্ঞানের যুগ। আজ আমরা সূর্যকে তার দেবতার আসন হইতে নামাইয়া আনিয়াছি। বিজ্ঞানীরা তাহার নাড়ীর খবর পর্যন্ত বাহির করিতেছেন। লক্ষ লক্ষ আলোক-বৎসর দূরের নক্ষত্রেরও আভ্যন্তরীণ গঠন ও তাহার উপাদান আবিষ্কারের চেষ্টা হইতেছে। পৃথিবী হইতে যে সূর্যকে স্বর্ণবর্ণ একটি থালা বলিয়া মনে হয় তাহার গঠন-কৌশল আলোচনা করিলে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। এমন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, সূর্য তো আমাদের নিকট হইতে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত; সুতরাং তাহার নিকট হইতে খবর আদায় করা গেল কেমন করিয়া? সূর্যের নিকট হইতে খবর আদায় করা হইল সূর্যের বর্ণালী-বিশ্লেষণ করিয়া। সূর্যরশ্মিকে যখন ত্রিশির কাঁচের মধ্য দিয়া যাইতে দেওয়া হয় তখন তাহা রামধনুর ন্যায় সাতটি রঙে বিভক্ত হইয়া যায়। উত্তপ্ত অবস্থায় কঠিন বা তরল পদার্থের বর্ণালী বিশ্লেষণ করিলে লাল হইতে বেগুনী, এই সাতটি রঙই দেখা যায়। ইহাকে বলা হয় অবিচ্ছিন্ন বর্ণালী। কিন্তু উত্তপ্ত অবস্থায় কোন গ্যাসীয় পদার্থের বর্ণালী-বিশ্লেষণ করিলে কয়েকটি উজ্জ্বল রেখা দেখা যায়। এগুলি ঐ গ্যাসেরই নির্দিষ্ট রেখা। সূর্যও একটি গ্যাসীয় পদার্থ। কিন্তু তাহার বর্ণালী-বিশ্লেষণে বিভিন্ন স্থানে কালো রেখা দেখা যায়। এই কালো রেখাগুলির ব্যাখ্যা করেন কির্কফ। সূর্যের এই বর্ণালী-বিশ্লেষণ হইতেই তাহার সম্বন্ধে সকল খবর পাওয়া গিয়াছে।

সূর্যপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ছয় হাজার ডিগ্রি এবং কেন্দ্রের তাপমাত্রা দুই কোটি ডিগ্রি। সূর্যের পৃষ্ঠদেশ হইতে যত ভিতরে প্রবেশ করা যায়, উত্তাপের মাত্রা ততই বৃদ্ধি পায়। তাপমাত্রার হিসাবে সূর্যকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হয়। সূর্যকে দেখিলে মনে হয় একটি অস্বচ্ছ গোলক। সূর্য একটি গ্যাসীয় আবরণে বেষ্টিত গোলকই বটে। এই আবরণের একেবারে শীর্ষদেশ অতি স্বচ্ছ, কিন্তু নিম্নভাগ স্বল্প স্বচ্ছ। বিজ্ঞানীরা এই গ্যাসীয় আবরণকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন। সর্বাপেক্ষা নিম্ন অংশের নাম তাপমণ্ডল। এই অংশেই সমস্ত তাপ ও রশ্মির উৎপত্তি। ইহা স্বল্প স্বচ্ছ এবং বিভিন্ন পদার্থের পরমাণু ও ইলেকট্রনের দ্বারা পূর্ণ। সূর্যের অভ্যন্তর ভাগ হইতে যে তাপ বাহির হইয়া আসে তাহা এই স্থলের ইলেকট্রন গ্যাস দ্বারা প্রবলভাবে বিচ্ছুরিত হয়। তাই এই অংশের স্বচ্ছতা কম। তাপমণ্ডলের বর্ণালী উজ্জ্বল ও অবিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ ইহাতে লাল হইতে বেগুনী পর্যন্ত সবকয়টি আলোক-তরঙ্গই বর্তমান থাকে। সূর্যরশ্মি বর্ণ-বিশ্লেষণী যন্ত্রের মধ্য দিয়া যাইতে দিলে উহাতে অসংখ্য কালো রেখা দেখা যায়। এই কালো রেখাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে, সূর্যের বহিরাবরণে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, অক্সিজেন, লৌহ, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম ইত্যাদি পদার্থ গ্যাসীয় অবস্থায় রহিয়াছে। পৃথিবীতে প্রাপ্ত মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে ২৯টি বাদে অপর সবগুলিই সূর্যে বর্তমান। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, যে কয়টি পাওয়া যায় নাই সেগুলিও সূর্যে বর্তমান, তবে কোন কারণে তাহাদের অস্তিত্ব বর্তমানে অজ্ঞাত।

এই যে তাপমণ্ডলের কথা বলা হইল ইহার

উপরের অংশে প্রায় এক শত হইতে দুই শত মাইল গভীর অপেক্ষাকৃত শীতল একটি স্তর আছে। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, সূর্যের বর্ণালীর সমস্ত কালো রেখার উৎপত্তি স্থল এই স্তরটি। তাপমণ্ডলের উষ্ণ পদার্থ হইতে নির্গত রশ্মি যখন এই অপেক্ষাকৃত শীতল স্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয় তখন এই স্তরের শীতল পরমাণুগুলি ঐ রশ্মির কতকগুলি বিশেষ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ শোষণ করিয়া নেয়। ইহার পর যখন এই রশ্মির বর্ণালী বিশ্লেষণ করা হয় তখন উজ্জ্বল বর্ণালীর গায়ে ঐ শোষিত তরঙ্গের স্থানে কালো রেখার আবির্ভাব হয়। এই স্তরটির নাম বিশোষণ মণ্ডল।

এই বিশোষণ মণ্ডলের উপর আট-দশ হাজার মাইল গভীর একটি স্বচ্ছ গ্যাসীয় স্তর আছে। পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় এই অংশকে অত্যন্ত লাল বর্ণের দেখায়। তাই ইহার নাম বর্ণমণ্ডল। ইহা হাইড্রোজেন ও আয়নিত ক্যালসিয়াম পরমাণুর দ্বারা পূর্ণ। সাধারণ ক্যালসিয়াম পরমাণুতে থাকে ২০টি ইলেকট্রন। প্রচণ্ড তাপে ইহার মধ্য হইতে এক বা একাধিক ইলেকট্রন বাহির হইয়া যাইবার ফলে পরমাণুটি আয়নিত হইয়া যায়। সাত-আট হাজার মাইল উপরেও এই হাইড্রোজেন ও আয়নিত ক্যালসিয়াম পরমাণু পাওয়া যায়। সূর্যের এই বর্ণমণ্ডল হইতে মাঝে মাঝে উত্তপ্ত গ্যাস হঠাৎ বাহির হইয়া আসে। পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যদেহ হইতে গাঢ় লাল রঙের মেঘকে উর্ধ্ব আকাশে উঠিতে দেখা যায়। ইহাদের বলে সৌরস্ফীতি। ইহারা সূর্যের পরিধি অতিক্রম করিয়া ঘণ্টায় লক্ষ মাইল বেগে ছুটিতে থাকে। এই উত্তপ্ত গ্যাসের মধ্যে থাকে পরমাণু ও ইলেকট্রন। সূর্য হইতে ছাড়া পাইয়া প্রায় ৩০ ঘণ্টা পর আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। পৃথিবীর চুম্বকশক্তির প্রভাবে পড়িয়া ইহা উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর অভিমুখে ধাবিত হয়, তখন তাহার সহিত বায়ুমণ্ডলের অণু-পরমাণুর প্রবল সংঘর্ষ ঘটে। ফলে বাতাসের মধ্যে আগুন জলিয়া উঠে, আর সৃষ্টি হয় নানা রঙের আলো। এই আলোই মেরুজ্যোতি নামে খ্যাত। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে বসিয়া ফরাসী দেশীয় বিজ্ঞানী জ্যাঁসেঁ পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় এইরকম এক রক্তবর্ণ সৌরস্ফীতির বর্ণালী গ্রহণ করেন এবং প্রমাণ করেন যে, উহা জ্বলন্ত হাইড্রোজেন বাষ্পময়। পরে তিনি দিবাভাগেও সৌরস্ফীতির বর্ণালী গ্রহণের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। জ্যাঁসেঁ যখন ভারতবর্ষে বসিয়া এই আবিষ্কার করেন তখন ইংল্যাণ্ডে সাধারণ এক কর্মচারী জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা করিতেন। তাঁহার নাম লকিয়ার। তিনি বেশীদূর লেখাপড়া শিখেন নাই বটে, কিন্তু সময় করিয়া জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা করিতেন। তিনিও এই সময় রক্তশিখার বর্ণালী গ্রহণ করেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি এক মূল্যবান আবিষ্কার করেন। তিনি রক্তশিখার বর্ণালী পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, উহাতে সোডিয়ামের পীত রেখা দুইটির খুব কাছে আর একটি উজ্জ্বল পীতরেখা আছে। এই নূতন রেখাটি যখন কোন মৌলিক পদার্থের বর্ণালীর সহিত মিলিল না তখন লকিয়ার বুঝিতে পারিলেন যে, উহা একটি নূতন মৌলিক পদার্থের বর্ণালী। তিনি উহার নাম দিলেন হিলিয়াম।

বর্ণমণ্ডলের উপরে যে স্তরটি রহিয়াছে উহার নাম করোনা বা সৌরকিরিট। বিজ্ঞানী লিও পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় ছাড়াও দিবালোকে প্রথম করোনার বর্ণালী লইতে সক্ষম হন। পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় সূর্য সম্পূর্ণ আবৃত হইলেই তাহার পার্শ্ব হইতে চারিদিকে হঠাৎ একটা শ্বেতবর্ণের জ্যোতি নির্গত হয় এবং দৃশ্যটি অতি নয়নাভিরাম করিয়া তোলে। এই শ্বেতবর্ণ আলোই করোনার অস্তিত্বের পরিচয় দেয়। করোনার বর্ণালী উজ্জ্বল ও অবিচ্ছিন্ন, তবে এই অবিচ্ছিন্ন অংশের মধ্যে কয়েকটি অনুজ্জ্বল কালো রেখা রহিয়াছে। এইগুলি যে কোন্ পরমাণু হইতে উদ্ভূত তাহা বহুদিন পর্যন্ত

জানা যায় নাই। কেহ কেহ বলিতেন যে, উহারা একটি নূতন মৌলিক পরমাণু হইতে উদ্ভূত। তাঁহারা সেই পদার্থটির 'করোনিয়াম' নামকরণ পর্যন্ত করিয়াছিলেন। তবে বর্তমানে জানিতে পারা গিয়াছে যে, উহারা অতিমাত্রায় আয়নিত লৌহ ও নিকেল পরমাণু ছাড়া আর কিছুই নহে। এই পরমাণুগুলি করোনার নিম্নভাগে অবস্থিত। করোনার উপরাংশের বর্ণালী বিশ্লেষণ করিয়া জানিতে পারা গিয়াছে যে, উহা কোন বস্তুকণার দ্বারা গঠিত। অনেকে এই বস্তুকণাকে ইলেকট্রন বলিয়া মনে করেন। ইহা নিম্নাংশকে ঘিরিয়া আছে। নিম্নাংশ ঈষৎ হরিদ্রাভ এবং উপরাংশ অতি শুভ্র। তাপমণ্ডল হইতে আলোকরশ্মি বর্ণমণ্ডল অতিক্রম করিয়া এই স্থানের ঐ বস্তুকণার দ্বারা প্রবলভাবে বিচ্ছুরিত হয়। এই করোনা বিজ্ঞানীদের নিকট অতি বিস্ময়কর বস্তু। ইহার সম্বন্ধে এখনও বহু তথ্য অজ্ঞাত রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, সূর্যালোকের বর্ণরেখা ও করোনার সম্বন্ধে আমাদের দেশের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার অবদান অসামান্য। আধুনিক জ্যোতি-পদার্থবিজ্ঞান তাঁহার গবেষণা ব্যতিরেকে অগ্রসর হইতে পারিত না।

সৌরপৃষ্ঠের আলোকচিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোন সময়ে কয়েকটি কালো বিন্দু ও দাগ রহিয়াছে। এইগুলিকেই সৌরকলঙ্ক বলে। এইগুলি অবশ্য স্থায়ী নয়। দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের গতি পূর্বদিক হইতে পশ্চিমে। ইহা হইতে সূর্যের আবর্তনকাল স্থির করা হইয়াছে এবং সূর্যও যে পৃথিবীর মত পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে ঘোরে তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। সৌর-কলঙ্ক কালো হইবার কারণ—ইহারা পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে অপেক্ষাকৃত শীতল এবং শীতল বলিয়াই কম উজ্জ্বল; তাই পার্শ্ববর্তী উজ্জ্বল স্থান অপেক্ষা ইহাদের কালো বলিয়া মনে হয়। এক একটি কলঙ্ক এত বড় হয় যে, খালি চোখেও দেখা যায়। এই রকম বড় কলঙ্কের মধ্যস্থল খুব কালো দেখায় এবং বাহিরের অংশকে হাল্‌কা কালো দেখায়। ইহাদের বলা হয় যথাক্রমে আম্ব্রা ও পেনাম্ব্রা বা ঘনচ্ছায়া ও ঈষচ্ছায়া। ঘনচ্ছায়ার ব্যাস পাঁচ হইতে পঞ্চাশ হাজার মাইল পর্যন্ত হইতে দেখা যায়। এই সৌরকলঙ্কগুলিকে দেখা যায় সাধারণতঃ বিষুবরেখা হইতে ৩০° উত্তরে ও দক্ষিণে। ইহারা সৌরপৃষ্ঠে ৩/৪ মাসকাল থাকিয়া পরে অদৃশ্য হইয়া যায়। সৌরকলঙ্ক আবির্ভাবের সময় একটি স্থান সহসা খুব উজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং পরে কয়েকটি কালো বিন্দু দেখিতে পাওয়া যায়। কালে এই বিন্দুগুলি জমাট বাঁধিয়া যায় এবং দুইটি বড় কলঙ্ক দেখা দেয়। একটি অপরটি হইতে কয়েক ডিগ্রি পশ্চিমে থাকিয়া উভয়ে পূর্ব হইতে পশ্চিমে চলিতে থাকে। নির্দিষ্টকাল অতিক্রম করিবার পর অনুচরটি ভাঙ্গিয়া যায় এবং অদৃশ্য হয়; পরে অপরটিও নিস্তেজ হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। সৌরকলঙ্ক সম্বন্ধে এবং জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে এখনও বহু বিষয় বিজ্ঞানীদের অজ্ঞাত রহিয়াছে।

ভারতের পারমাণবিক খনিজ

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

সেকালের বিজ্ঞানীরা বললেন, পদার্থের হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। পদার্থের সৃষ্টি নেই, ধ্বংস নেই। পদার্থ এক রূপ থেকে অন্য রূপ নেয়। আরও বললেন, শক্তির হ্রাস নেই বৃদ্ধি নেই। শক্তিও এক রূপ থেকে অন্য রূপ নেয়। শক্তির রূপান্তর নিত্য দেখা যায়। তড়িৎ শক্তি আলো জ্বালায়, পাখা ঘোরায়। ষ্টিম এঞ্জিনের তাপশক্তি ট্রেনের গতি-শক্তি রূপে প্রকট হয়। রাসায়নিক শক্তি বোমা ফাটায়।

একালের বিজ্ঞানী বললেন—ভাল কথা, জানা গেল শক্তির সৃষ্টি নেই, বিনাশ নেই। পদার্থেরও হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। এক পদার্থ অন্য পদার্থে পরিবর্তিত হয়। এক শক্তি অন্য শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পদার্থকে শক্তিরূপে পরিবর্তিত করা যায় কি? আইনস্টাইন বললেন, হাঁ যায়। পদার্থকে শক্তির রূপে নিয়ে যাওয়া যায়। হিসাব করে বলে দিলেন, কতটুকু পরিমাণ পদার্থ রূপান্তরিত হলে কি প্রচণ্ড পরিমাণ শক্তি প্রকাশ পাবে।

সূর্যের প্রচণ্ড তাপ আর আলো প্রকাশ পায়, সূর্যমণ্ডলে থাকা হাইড্রোজেন বিবিধ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে হিলিয়ামের রূপ গ্রহণ করে বলে। এই পরিবর্তনে পদার্থের রূপান্তরে শক্তি প্রকাশিত হচ্ছে। সূর্যের তেজ এই শক্তি।

গতি, তাপ, আলো, তড়িৎ শক্তি আমাদের বিস্মিত করে। পদার্থের রূপান্তরে লব্ধ শক্তির কাছে এসব অতি তুচ্ছ। পদার্থের রূপান্তরিত শক্তি কাজে লাগানো হলো গত মহাযুদ্ধে, পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণে।

৬ই আগস্ট, ১৯৪৫ সালে হিরোসিমা সহরে সকাল ৮-১৫ মিনিটে পারমাণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। একটা বাড়ীর ৫৫০ গজ উপরে শূন্যে বিস্ফোরণ হয়। প্রকাশ পায় চোখ-অন্ধ-করা তীব্র আলোর ঝলক, কান-বধির-করা তীক্ষ্ণ শব্দ, শ্রাবণ মেঘের মত ঘন, দীপ্ত অরুণাভ পুঞ্জীভূত বাষ্প। আড়াই মাইলের ভিতর সবকিছু ধ্বংস হয়। সাড়ে সাত মাইল দূরে সব বাড়ীর কাচের শার্সি টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে যায়। অরুণাভ আগুনের গোলা শূন্য থেকে ঝরতে থাকে। হিরোসিমা শহরে দুই লক্ষ লোক মারা যায়।

এই রকম আর একটা বোমা পড়ে ৯ই অগাষ্ট, বেলা এগারটায়, নাগাসাকি সহরে। এটি মাটিতে এসে পড়ে। দুই মাইলের ভিতর কোন প্রাণী আর জীবিত থাকে নি। কোন বাড়ী আস্ত থাকে নি। ৭৪,০০০ লোক মারা যায়। পাঁচ মাইল দূরের একটা বাঁশঝাড় ছিঁড়ে কুটিকুটি হয়ে যায়। ধারণা হয়, পদার্থ শক্তির রূপে প্রকট হলে কি প্রচণ্ড ভয়াবহ সে শক্তির প্রকাশ!

এখন জাতির স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে তার সমৃদ্ধির জন্যে শিল্প এবং কৃষির উন্নতি যেমন দরকার, শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতাও তেমন দরকার। পারমাণবিক শক্তিতে যে জাতি শক্তিশালী সেই জাতিই যুদ্ধোত্তর কালের সবচেয়ে শক্তিশালী। অতএব পারমাণবিক শক্তি সংহত করা চাই। অন্য দেশ আক্রমণের জন্যে না হলেও স্বদেশকে রক্ষা করবার জন্যে চাই, একান্তভাবে চাই। পারমাণবিক শক্তির উৎস, তেজস্ক্রিয় খনিজের খোঁজ পড়লো। দেখা গেল, দক্ষিণ দেশের সমুদ্র-উপকূলে বালুকারাশির সঙ্গে পড়ে আছে মোনাজাইট!

ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় ধাতু ঘটিত খনিজ পারমাণবিক শক্তির উৎস। পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন করবার জন্যে ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম,

বেরিলিয়াম, লিথিয়াম, জারকোনিয়াম আর গ্র্যাফাইট চাই।

ইউরেনিয়াম—ইউরেনিয়াম খনিজের সন্ধান পঞ্চাশ বছর আগে এদেশে পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৪৯ সালে দুটি নতুন খনি আবিষ্কার করা গেছে। প্রায় ৬০ মাইল দীর্ঘ খনি দক্ষিণ বিহারে। আর মধ্য রাজপুতানার কতক কতক জায়গায়।

খুব ভাল জাতের না হলেও ইউরেনিয়াম খনিজ আছে সিংভূমে আর রাজপুতানায়। একশ' ভাগ খনিজে ০·১ ভাগ ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে। এক টন খনিজ থেকে সংগ্রহ করা গেছে মাত্র এক সের ইউরেনিয়াম। এভাবে স্বল্প পরিমাণ ইউরেনিয়াম নিষ্কাশন ব্যয়সাধ্য সন্দেহ নেই। তবে একমাত্র ভরসার বিষয় এই যে, ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকায় ইউরেনিয়াম নিষ্কাশনের খরচ আমাদের খরচের চেয়ে কম নয়। সম্প্রতি আরাবলী শৈলে ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে।

অভ্রখনির কাছাকাছি অঞ্চলে ইউরেনিয়াম খনিজ পাওয়া গেছে। এ ক্ষেত্রে ইউরেনিয়ামের পরিমাণও কিছু বেশী; তবে খনিজের পরিমাণ তেমন বেশী নয়। ইউরেনিয়াম খনিজ ছড়িয়ে আছে উত্তর বিহারে, নেলোরে ও মধ্য রাজপুতানায়।

ইউরেনিয়াম প্রসঙ্গে ত্রিবাঙ্কুরের মোনাজাইট বালির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ না করলে চলে না। সেখানে সাগরসৈকতে রাশি রাশি ইলমেনাইট বালি পড়ে আছে। এর একশ' ভাগে মিশে আছে দুই ভাগ মোনাজাইট। এর চেয়ে সহজলভ্য ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় ধাতুর আকর আমাদের দেশে আর নেই। একশ' ভাগ মোনাজাইট থেকে সংগ্রহ করা যায় ০·৪ ভাগ ইউরেনিয়াম অক্সাইড, আর দশভাগ থোরিয়াম অক্সাইড। এর মধ্যে ভাল জাতের দুষ্প্রাপ্য মোনাজাইট পাওয়া গেছে। এর নাম কেরালাইট। একশ' ভাগ কেরালাইটে প্রায় ছয় ভাগ ইউরেনিয়াম অক্সাইড ও তেত্রিশ ভাগ থোরিয়াম অক্সাইড আছে।

থোরিয়াম—পারমাণবিক শক্তির উৎস হিসাবে ইউরেনিয়ামের পরে থোরিয়ামের স্থান। ত্রিবাঙ্কুরের মোনাজাইট বালিতে থোরিয়ামের ভাগ বেশী। ব্রেজিল ও অন্যান্য দেশের খনিজলব্ধ থোরিয়ামের পরিমাণের চাইতে বেশী। হাজারিবাগ, মেবার, পশ্চিমঘাট আর মাদ্রাজ অঞ্চলে গ্র্যানিট পাথরের সঙ্গে থোরিয়াম মিশে আছে। মালাবার আর করমণ্ডল উপকূলের মোনাজাইট বালিতেও আছে।

সমুদ্র উপকূলের বিস্তৃত মোনাজাইট বালুকারাশি আজ আমাদের বড় সম্পদ। হিসাব করা হয়েছে, বিশলক্ষ টন মোনাজাইট আমাদের আছে। এথেকে দেড়লক্ষ টন থোরিয়াম অক্সাইড পাওয়া যেতে পারে।

বেরিলিয়াম—বেরিল খনিজ অনেকদিন আগে এদেশে আবিষ্কৃত হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে বেরিলের তত চাহিদা ছিল না। রাজপুতানা আর উত্তর বিহার অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে বেরিল পাওয়া যায়। আমাদের দেশের বেরিল খনিজে বেরিলিয়াম ধাতুর পরিমাণ বেশী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে বেরিল রপ্তানী হতো। ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা, রোডেশিয়া, মাডাগাস্কার ও আমেরিকায় বেরিল খনিজ আছে। এদেশের বেরিলের চাহিদা তাতে কমে নি।

লিথিয়াম—পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্যে লিথিয়াম কাজে লাগতে পারে। আমাদের দেশে লিথিয়াম ধাতুর খনিজ পাওয়া গেছে।

জারকোনিয়াম—জারকন খনিজ এদেশে মেলে। জারকোনিয়াম যৌগিক আজকাল ধাতুশিল্পে ব্যবহার হচ্ছে। পারমাণবিক ক্রিয়ার যন্ত্রপাতি তৈরী করতে ব্যবহার হচ্ছে। ত্রিবাঙ্কুরের ইলমেনাইটে জারকনিয়াম ও হাফনিয়াম আছে।

গ্র্যাফাইট—পারমাণবিক ক্রিয়ার যন্ত্রপাতিতে

বিশুদ্ধতম গ্র্যাফাইট ব্যবহার করতে হয়। বিশেষ করে বোরোন থাকলে সেই গ্র্যাফাইটে কাজ হয় না। খনিজ গ্র্যাফাইটের চাইতে পেট্রোলিয়াম থেকে তৈরী করা কৃত্রিম গ্র্যাফাইট বেশী উপযোগী। আমাদের দেশে পেট্রোলিয়াম শোধন কেন্দ্রে কৃত্রিম গ্র্যাফাইট তৈরী করা সম্ভব।

ভারতে লভ্য ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের পরিমাণ।

ইউরেনিয়াম—সহজলভ্য মোনাজাইট খনিজ থেকে। প্রায় ছয় থেকে সাত হাজার টন।

স্বল্প ব্যয়ে লভ্য সিংহভূম অঞ্চল থেকে। প্রায় তিন থেকে চার হাজার টন।

আরাবলী অঞ্চল থেকে। প্রায় তিন হাজার টন।

থোরিয়াম—মোনাজাইট খনিজ থেকে, প্রায় পনেরো থেকে আঠারো লক্ষ টন।

পারমাণবিক শক্তি প্রয়োগের পদ্ধতি উদ্ভাবিত হলো। ধ্বংসমূলক কাজে তার প্রথম ব্যবহার হলো। গঠনমূলক কাজেও তা ব্যবহার করা চলে। মানবজাতির কল্যাণে নিযুক্ত শক্তির উৎস হিসাবে যেমন কয়লা, পেট্রোল তড়িতের ব্যবহার হচ্ছে, সেভাবে প্রচণ্ড পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করা চলে না কি?

অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘোড়ায় টানা গাড়ীর জগৎ, উনবিংশ শতাব্দীর ষ্টিমে চলা রেলগাড়ীর জগৎ হলো। আর আজ বিংশ শতাব্দীতে পেট্রোল-চালিত বিমানের গতিতে জগৎ এগিয়ে চলেছে। দ্রুতগতিতে তড়িৎশক্তির প্রয়োগ পৃথিবীতে বেড়ে চলেছে। পঞ্চাশ বছর পরে হয়তো বছরে নয় লক্ষকোটি কিলোওয়াট-ঘণ্টা তড়িৎ উৎপাদনের প্রয়োজন হবে। এ শক্তি উৎপাদন করতে বছরে সাড়ে তিন লক্ষকোটি টন কয়লা দরকার হবে—আমাদের দেশে যা কয়লা মজুত আছে তার উনিশ ভাগের এক অংশ। এত জ্বালানী মজুত আমাদের তো নেই-ই, অন্য দেশেও নেই। এক হয়তো চীন ও আমেরিকা সামাল দিতে পারে।

তবে একটা উপায় আছে। ইউরেনিয়াম বড় শক্তির আধার। ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক শক্তি থেকে যদি তড়িৎ উৎপাদন করা হয় তাহলে হয়তো বিপুল পরিমাণ তড়িৎ উৎপাদন সম্ভব হতে পারে। সারা পৃথিবীতে পঞ্চাশ বছর পরে বর্ধিত হারে যে পরিমাণ তড়িৎ প্রয়োজন তা স্বল্প পরিমাণ ইউরেনিয়ামলব্ধ পারমাণবিক শক্তি থেকে পাওয়া যেতে পারে। দীর্ঘ শতাব্দী ধরে এভাবে তড়িৎ উৎপাদন করলে ইউরেনিয়াম খনিজ খুব বেশী ব্যয় হবে না। পশ্চিম ভূখণ্ডে প্রায় বিশলক্ষ টন ইউরে-নিয়ামের উৎস স্বরূপ খনিজ সঞ্চিত আছে। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, কালে দিনে পঞ্চাশ টাকায় এক পাউণ্ড ইউরেনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন করা যাবে। এমন কি, পঞ্চাশ না হয়ে দেড়শ' টাকাও যদি খরচ হয় তাহলেও সস্তায় ১৩০০ টন কয়লাজাত শক্তি মাত্র এক পাউণ্ড ইউরেনিয়াম থেকে পাওয়া যাবে।

ইউরেনিয়ামলব্ধ পারমাণবিক শক্তি

১০০০ কিলোওয়াট ঘণ্টার তড়িৎ-শক্তি
= ২৮০ পাউণ্ড কয়লাজাত শক্তি
= ১৮৬ পাউণ্ড পেট্রোলিয়ামজাত শক্তি
= মাত্র $\frac{১}{২৫}$ গ্র্যাম ইউরেনিয়ামলব্ধ শক্তি

মনে হয় পঁচিশ বছরের ভিতরে পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে এখনকার চাইতে সস্তায় তড়িৎ উৎপাদন প্রচলিত হবে। পেট্রোলিয়াম ও কয়লা উত্তোলনের খরচ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। পেট্রো-লিয়াম বা কয়লা থেকে তড়িৎ উৎপাদন ক্রমে ব্যয়-বহুল হয়ে উঠবে। শুধু তাই নয়, যে বর্ধিত হারে পেট্রোলিয়াম আর কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে তাতে অচিরে পৃথিবীর সঞ্চয় নিঃশেষিত হয়ে যাবার আশঙ্কা। ভারত কয়লাপ্রধান দেশ। বছরে প্রায় চার-কোটি টন কয়লা এদেশে খনন করা হয়। কয়লার ব্যবহার হয় রেলে, জাহাজে, ধাতু নিষ্কাশনের

চুল্লীতে, বড় বড় কারখানার বয়লারের এঞ্জিনে, কয়লা-গ্যাস তৈরীর জন্যে, ইটখোলায় আর বাড়ী বাড়ী উনানে। দেশে শিল্প প্রসারের সঙ্গে সমৃদ্ধি এলে সম্পন্ন গৃহস্থ বেশী পরিমাণে তড়িৎ ব্যবহার করবে। শিল্পে বেশী পরিমাণ কয়লার ব্যবহার হবে। কয়লা আরও বেশী পরিমাণে খনন করা হবে। তাহলেও এদেশে যে পরিমাণ কয়লা আজও সঞ্চিত আছে তা সহজে নিঃশেষিত হবে না। পারমাণবিক শক্তি কয়লার সংহত শক্তিকে হটিয়ে দিতে পারবে না। আমাদের দেশে কাঠ, ঘুঁটে, কয়লা, পেট্রোলিয়াম, কয়লা-গ্যাস, জলপ্রপাত, কয়লা বা তেলের শক্তিলব্ধ তড়িতের সঙ্গে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদিত শক্তি পাশাপাশি চলবে।

ইউরেনিয়াম এখনও পারমাণবিক শক্তির প্রধান উৎস। কালে হয়তো থোরিয়াম প্রাধান্য লাভ করবে। সে চেষ্টা চলছে। তা যদি হয় আমাদের তাতে সুবিধা। থোরিয়াম খনিজের পরিমাণ আমাদের কম নয়।

ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারে ব্যবহারোপযোগী বৃটিশ বিমান-চালকদের সর্বাধুনিক পোষাক। এই পোষাক নাইলন দ্বারা নির্মিত।

সিমেণ্টের কথা

শ্রীসুবিমল সিংহ রায়

প্রাচীনকালে মিশরবাসীরা জিপ্‌সাম পুড়িয়ে তার সঙ্গে বালি মিশিয়ে গাঁথুনির মশলা তৈরী করতো। গ্রীকরা কিন্তু জিপ্‌সাম ব্যবহার না করে তার বদলে চুন ব্যবহার করতো। তবে রোমানরাই সর্বপ্রথম এই ব্যাপারে অধিকতর উন্নতি লাভ করে। তাদের তৈরী মশলা কাঠিন্যের জন্যে বিখ্যাত। রোমানদের এই মশলা বিশ্লেষণে এটাই দেখা গেছে যে, তাদের উৎকর্ষতা নির্ভর করতো শুধুমাত্র মশলার জিনিষগুলিকে মেশানো এবং সর্বশেষে সেটাকে পেটানোর উপর। রোমানরা কিন্তু এটাও জানতো যে, চুন ও বালি ছাড়া মশলার মধ্যে কিছু পরিমাণে আগ্নেয়গিরিজাত প্রস্তরীভূত লাভা মেশালে আরও একটু উন্নত ধরণের মশলা পাওয়া যায়। এ রকমের মশলা যে ক্ষয়ের হাত থেকে অনায়সেই বাঁচতে পারে তার নিদর্শন পেতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না।

তবে আজকাল ওভাবে গাঁথুনির মশলা তৈরী করা হয় না। এখন মশলার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে সিমেণ্ট। সিমেণ্টের সঙ্গে বালি আর জল মিশিয়ে তবে মশলা তৈরী করা হয়। আজ-কাল বলতে শুধু বিংশ শতককেই বুঝাই নি, অষ্টাদশ শতকে ফিরে গেলেও এই সিমেণ্টের ব্যবহার দেখা যাবে। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে এডিষ্টোন নামক একটা লাইট-হাউস তৈরীর জন্যে স্মিটন হাইড্রলিক সিমেণ্ট ব্যবহার করেন। এ রকম সিমেণ্ট মাটি মিশ্রিত চুনাপাথর পুড়িয়ে তৈরী করা হয়। ভাইকাট ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কাদামাটি ও চুনাপাথরের মিশ্রণকে ভস্মীকরণের দ্বারা কৃত্রিম হাইড্রলিক সিমেণ্ট তৈরী করেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে অ্যাস্পডিন সিমেণ্ট তৈরীর অনুমতি পান। তাঁর প্রণালীতে চুনাপাথরকে গুঁড়া করে ভস্মীকৃত করবার পর কাদা-মাটির সঙ্গে মিশিয়ে জল দিয়ে ভাল করে গোলা হয়। সবটা যখন খানিকটা শুকিয়ে আসে তখন তাকে চুল্লীতে ভস্মীকৃত করা হয়। উৎপন্ন জিনিষটাকে ভেঙ্গে গুঁড়া করে ফেলা হয়। প্রথম প্রথম কাদামাটি ও চুনাপাথরের মিশ্রণকে কম উত্তাপে ভস্মীভূত করা হতো। কিন্তু জনষ্টন প্রথম লক্ষ্য করেন যে, বেশী উত্তাপে ভস্মীকরণ করলে অধিক শক্তিসম্পন্ন সিমেণ্ট পাওয়া সম্ভব।

আজকাল অনেক রকমের সিমেণ্ট বেরিয়েছে। তাদের প্রস্তুতপ্রণালী যেমন পৃথক, গুণেরও তেমনি তারতম্য আছে। তবে পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট নামে একপ্রকার সিমেণ্টের প্রচলনই খুব বেশী। ইংল্যাণ্ডের কাছে পোর্টল্যাণ্ড নামে একটি সহর আছে। সেই সহরে একরকম পাথর পাওয়া যায়; সেই পাথরকে বলা হয় পোর্টল্যাণ্ড ষ্টোন। আর এই সিমেণ্টকে বলা হয় পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট। এই ধরণের সিমেণ্ট জমাট বাঁধবার পর অনেকটা ঐ পাথরের মতই দেখায়।

পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট প্রস্তুতপ্রণালী

প্রথমে খড়ি (Calcium Carbonate) গুঁড়া করে চকমকি পাথর সরিয়ে ফেলা দরকার। ঐ খড়ি কাদামাটির সঙ্গে মিশিয়ে বড় বড় ট্যাঙ্কে আবার ভাল করে গুঁড়া করা হয়। ঐ সব ট্যাঙ্ক সূক্ষ্ম চালুনি দিয়ে ঘেরা থাকে। চালুনির মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র খুব ছোট ছোট কণাগুলিই বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে; কিন্তু অপেক্ষাকৃত বড় কণাগুলি ভিতরেই থেকে যায়। তারপর অতিরিক্ত পরিমাণে জল মেশানো হয়। তাতে যে তরল জিনিষটা পাওয়া যায় তাকে Slurry বলা হয়।

এই Slurry-তে শতকরা ৪০ থেকে ৪৩ ভাগ জল থাকে। তারপর সেটাকে পাম্প করে বড় বড় পাত্রে নেওয়া হয়। এখানে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনবোধে জিনিষগুলির অনুপাত ঠিক করে দেওয়া হয়। Slurry যখন ঠিকমত তৈরী হয় তখন সেটাকে পাম্পের সাহায্যে ঘূর্ণীয়মান একটা বিরাট চুল্লীর এক প্রান্তে তুলে দেওয়া হয়। এই চুল্লীগুলি ইস্পাত-নির্মিত এবং ভিতরটা ইট দিয়ে বাঁধানো থাকে। সাধারণতঃ চুল্লীগুলি ২০০ থেকে ২৫০ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে থাকে। তবে ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ চুল্লীও দেখা গেছে। এদের ব্যাস সাধারণতঃ ৭ থেকে ১১ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের নতি প্রায় ১ ফুটে ½ ইঞ্চি। চুল্লী-গুলিকে সাধারণতঃ মিনিটে একবার ঘোরানো হয়। ভিতর থেকেই এদের গরম করা হয়ে থাকে। গরম করবার জন্যে বিভিন্ন রকম জিনিষ ব্যবহার করা হয়। কোন কোন দেশে কয়লার গুঁড়া, কোথাও বায়বীয় জ্বালানী, কোথাও আবার পেট্রো-লিয়াম জাতীয় তেল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চুল্লীর মধ্য দিয়ে Slurry যাওয়ার সময় তার মধ্যে যে, অতিরিক্ত জল থাকে সেটা বাষ্পীভূত হয়। কাদা-মাটি থেকেও জল অপসৃত হতে খড়ির মিশ্রণ হয়। এই ভস্মীকরণের ব্যাপারে একটা বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া দরকার। সব সময়েই দেখতে হবে যেন প্রণালীটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয় অথচ Slurry কখনও গলছে না। ভস্মীকরণের পর যা পড়ে থাকে সেটা দেখতে অনেকটা ছোলার দানার মত। এই দানাগুলি কালো রঙের এবং তাদের গায়ে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। এগুলিকে প্রথমে ঘূর্ণীয়মান একপ্রকার যন্ত্রের সাহায্যে ঠাণ্ডা করবার পর খুব ভাল ভাবে গুঁড়া করা হয়। গুঁড়া করবার সময় সাধারণতঃ জিপ্‌সাম মেশানো হয়, অথবা জলীয় বাষ্প প্রবেশ করানো হয়। এরকম সিমেণ্টকে অধিক দিন কার্যোপযোগী রাখবার উদ্দেশ্যেই এরূপ করা হয়।

সমগ্র প্রণালীটির সংক্ষিপ্ত রূপ হলো :—

বিশেষ ধরণের সিমেণ্ট
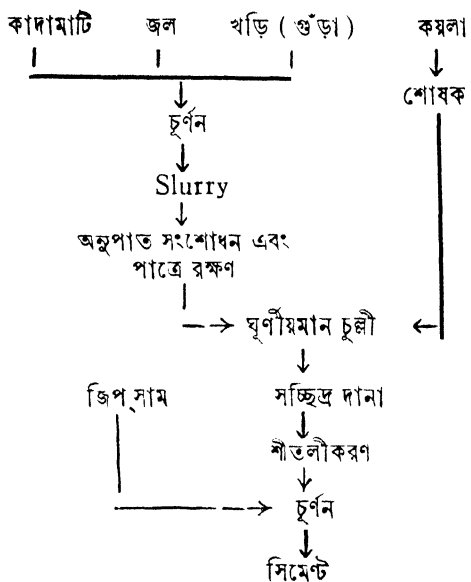
এই ধরণের প্রত্যেক সিমেণ্টেরই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে। যদিও ভারতবর্ষে আমরা স্থাপত্য শিল্পের জন্যে পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্টই ব্যবহার করে থাকি তবুও অন্যান্য প্রয়োজনে এই বিশেষ ধরণের সিমেণ্টের চাহিদা বাড়ছে। নিম্নোক্ত সিমেণ্টগুলি নিয়ে গবেষণা চলছে—

উত্তাপ প্রতিরোধক সিমেণ্ট

সাধারণ পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্টে জল মেশালে রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপই জমাটবাঁধা সিমেণ্টের উপর সূক্ষ্ম ফাটলের জন্যে দায়ী। পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গেছে যে, সিমেণ্টের সঙ্গে জল মেশালে প্রতি গ্রাম-এ ১০০ ক্যালোরি পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়। রুরকীর স্থাপত্য গবেষণাগারে এইরূপ সিমেণ্টের সম্পর্কে গবেষণা চলছে।

ব্লাস্ট ফারনেস্‌ সিমেণ্ট

টাটা নগরের ষ্টীল কারখানার আশেপাশে এত স্ল্যাগ বা ধাতুমল জমা হয়েছে যে, সেগুলি সরানো একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিকে বৈজ্ঞানিক-

দের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তাঁরা ধাতুমল ব্যবহার করবার একটা পথ আবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন। তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে, ৬০ ভাগ পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট আর ৪০ ভাগ ধাতুমল মেশালে তাপ-প্রতিরোধক সিমেণ্ট পাওয়া যায়।

রাসায়নিক প্রক্রিয়া-প্রতিরোধক সিমেণ্ট

অ্যাসিড মিশ্রিত জলে অথবা সালফেটযুক্ত মাটির সংস্পর্শে কংক্রিটের ক্ষয় খুব তাড়াতাড়ি হয়। পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্টের এই বিশেষ দোষ দূর করবার জন্যে বিভিন্ন গবেষণাগারে প্রভূত চেষ্টা করা হয়েছে।

জলই সিমেণ্টের সন্নিবেশন এবং জমাট বাঁধবার একটা অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ। সুতরাং গাঁথুনির মশলা তৈরী করবার জন্যে প্রচুর পরিমাণ জলের প্রয়োজন। দেখা গেছে যে, পানীয় জলই মশলা তৈরীর পক্ষে উপযুক্ত; কারণ সামুদ্রিক জলে সালফেটযুক্ত অনেক যৌগিক পদার্থ থাকে। কাজেই সেই জল কোন প্রকারেই মশলা তৈরীর ব্যাপারে ব্যবহার করা চলে না। যদি সমস্যার সমাধান সহজেই হয়ে যায় তাহলে সিমেণ্টের ব্যবহার যে আরও সুবিধাজনক এবং লাভজনক হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সম্প্রসারণশীল সিমেণ্ট

জল মেশাবার পর সাধারণ পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্টের আয়তন বেড়ে যায়; আবার অনার্দ্র হয়ে গেলে আয়তন কমে আসে। এতে কংক্রিটের গায়ে চুলের মত সরু সরু অসংখ্য ফাটল দেখা দেয়। সিমেণ্টের এই দোষ দূর করবার জন্যে বৈজ্ঞানিকেরা এক বিশেষ ধরণের সিমেণ্ট তৈরী করেছেন। জার্মেনী এবং আমেরিকায় এক ধরণের সিমেণ্ট তৈরী হয়েছে যার শুধু সম্প্রসারণই সম্ভব এবং তার Linear expansion হলো ২.৫%।

হাইড্রোফোবিক বা জলীয় বাষ্প বিকর্ষণক্ষম সিমেণ্ট

সাধারণ পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট গুদামজাত করে রাখা সুবিধাজনক নয়। কারণ সিমেণ্ট সহজেই আবহাওয়ার জলীয় বাষ্প শোষণ করে এবং সে জন্যেই কংক্রিটে তাড়াতাড়ি ফাটল ধরে। জলীয়-বাষ্প বিকর্ষণক্ষম সিমেণ্ট শুধু গুদামজাত করবার সময়েই জলীয় বাষ্প অথবা সাধারণ কথায় জল বিকর্ষণ করবে, কিন্তু জল ব্যবহারের সময় জলের সঙ্গে অনায়াসেই মিশবে।

সিমেণ্টের জমাটবাঁধা

অসংলগ্ন পাউডার সিমেণ্ট জলের সহযোগিতায় যে যে কারণে জমাট বাঁধে তার মধ্যে নিম্নোক্ত কয়টি কারণই প্রধান—

(ক) অতিসম্পৃক্ত মিশ্রণের মধ্যে যৌগিক পদার্থের কেলাসন।

(খ) অর্ধ কঠিন একপ্রকার জেলির উৎপাদন সিমেণ্টের জমাট বাঁধায় সাহায্য করে। এই জেলিই পরে শুকিয়ে গিয়ে শক্ত হয়ে যায়।

(গ) জলের মাধ্যমে দুই অথবা বহু জিনিষের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে কেলাসিত অথবা অন্য কোন কলয়ড্যাল পদার্থের সৃষ্টি সিমেণ্টকে জমাট-বাঁধতে সাহায্য করে।

তবে এসব কারণগুলি সম্বন্ধে মতানৈক্য আছে। তাই সিমেণ্টের জমাট বাঁধবার ব্যাপারটা এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার বিষয়ই হয়ে রয়েছে।

নদীর প্রকৃতি ও প্রবাহ

শ্রীসুরথনাথ সরকার

নদী প্রকৃতির এক অনুপম সৃষ্টি। ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির এই চিরচঞ্চলা দুহিতার জীবনে আসে অপরূপ বৈচিত্র্য। শীতের রুক্ষ, শীর্ণকায়া প্রবাহিণী বর্ষার সমাগমে অকস্মাৎ হয়ে ওঠে দুরন্ত, চপলা। তার কলকল উচ্ছ্বাস মানবহৃদয়ে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়েরই উদ্রেক করে।

স্মরণাতীত কাল থেকেই নদী হয়ে এসেছে জীবজগতের নিত্যসহচরী। সভ্যতার অরুণোদয়ের পূর্বে যখন যাযাবর মানুষ খাদ্য ও পানীয়ের সন্ধানে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়িয়েছে তখন থেকেই নদী দিয়েছে তাকে নীরব হাতছানি ও শান্তির পরম আশ্বাস। নদী থেকে মিলেছে তৃষ্ণার সুপেয় বারি, নদীর পললে গঠিত উর্বর ভূমিখণ্ডে জেগে উঠেছে শস্যশ্যামলিমার অপূর্ব সমারোহ। সেখানেই মানুষ প্রিয়জনের সঙ্গে বেঁধেছে নীড়, রচনা করেছে শান্তির সুখস্বপ্ন। আবার নদী-উপত্যকার বিরাট ঐশ্বর্যের প্রলোভনই মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে সংগ্রাম প্রবৃত্তি, রক্তরাঙা করে দিয়েছে নদীর জল। বস্তুতঃ মানবসমাজের উপর নদী ও নদী-গঠিত অঞ্চলের প্রভাব সুস্পষ্ট। নদী-উপত্যকাগুলিই যুগে যুগে হয়ে উঠেছে সভ্যতার মর্মকেন্দ্র। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল সিন্ধুনদের উপত্যকায়, চীনের সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল হোয়াং হো নদের তটভূমিতে, মিশরীয় সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল নীলনদের স্নেহচ্ছায়ায়। নদীমাতৃক দেশের গৌরব আজও সুপ্রতিষ্ঠিত। এ জন্যেই অনেক দেশের লোকেরা নদীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে এসেছে।

আগেকার সহজ, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায় নদী মানুষকে সাহায্য করেছে নানাভাবে। লোকে তখন যথেচ্ছ জলের ব্যবহার করেছে। বন্যা প্রভৃতি আকস্মিক দুর্বিপাককে দৈবঘটনা বলেই ব্যাখ্যা করে সান্ত্বনা পাবার প্রয়াস পেয়েছে। জলের ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাবার বিশেষ কোন প্রয়োজনই হয় নি তখন। কিন্তু সভ্যতার প্রসার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন জল প্রাপ্তির সমস্যা এবং জলের চাহিদা নানাভাবে বেড়ে যেতে লাগলো তখন মানুষের মনে আশঙ্কা জাগলো—তাই তো, ভবিষ্যতে স্বাদু জলের অভাব দেখা দিবে না তো? ফলে নদী সম্বন্ধে মানুষ হয়ে উঠলো সজাগ, নদীর সমস্যা অনুধাবনের প্রয়াস দেখা গেল সর্বত্র। এ ভাবেই নদীবিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে ক্রমে ক্রমে। বারিবিজ্ঞানের চর্চা আর্কিমিডিসের সময়েও কিছুটা হয়েছিল, তবে তার কোন প্রামাণ্য বিবরণী পাওয়া যায় না। মানুষের বারিপ্রবাহ বিষয়ক অভিজ্ঞতাসমূহ বৈজ্ঞানিক আকারে রূপায়িত হয়েছে মাত্র দুশো বছর ধরে। যদিও মূল ছিল একই, তবু দুটি মতবাদের সৃষ্টি হলো। একদল ঝুঁকে পড়লেন বিশুদ্ধ গণিতের উপর। তাঁদের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠলো তথাকথিত বিশুদ্ধ বারিপ্রবাহ বিজ্ঞান (Classical Hydrodynamics)। অপর দল বাস্তব ক্ষেত্রে এই সব আদর্শ তত্ত্বের অনুপযোগিতা লক্ষ্য করে জোর দিলেন পরীক্ষা-পদ্ধতির উপর এবং তাঁদের প্রচেষ্টায় সৃষ্টি হলো ঔদকবিদ্যা (Hydraulics)। উভয়ের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে বিস্তৃত বিজ্ঞান যার পরিধি ছড়িয়ে পড়েছে জলসেচ, জল সরবরাহ, জলশক্তি সংগ্রহ, নদী নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে।

এখানে আমরা নদীবিজ্ঞানের একটা বিশেষ অংশ—নদীর প্রবাহ বিষয়ক তত্ত্ব ও তথ্য নিয়ে

আলোচনা করবো। প্রথমেই মনে হতে পারে, নদীর প্রবাহ বিষয়ে তথ্যের আবার প্রয়োজন কি? জল সরবরাহ ও সেচ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে বাঁধ নির্মাণ, বন্যা নিবারক ব্যবস্থা অথবা নদীতে পূর্তকার্য সংক্রান্ত যে কোনও পরিকল্পনার জন্যেই নদীর প্রবাহ বিষয়ক তথ্য জানা দরকার। তার পরের প্রশ্নই হবে—নদীতে এত জল আসে কোথা থেকে, আর যায়ই বা কোথায়? এর উত্তরে সংক্ষেপে বলা যায়, নদীর সৃষ্টি এবং পুষ্টির মূলে থাকে বৃষ্টি ও পর্বতের উপরকার বরফগলা জল। অবশ্য সব রকম জলের উৎসই হলো সমুদ্র। সাগর থেকে বাষ্পরূপে জল উঠে আসে বায়ুমণ্ডলে। তাই আবার বৃষ্টিরূপে নেমে আসে নদীর অববাহিকা অঞ্চলে। বৃষ্টির জলের একটা অংশ বাষ্পীভবনের ফলে আবার ফিরে যায় বায়ুমণ্ডলে বাষ্পাকারে, বাকী অংশ মৃত্তিকার মধ্য দিয়ে ভৌমজলরূপে এবং মাটির উপর দিয়ে গড়িয়ে নদীতে নেমে আসে এবং ক্রমে সাগরে গিয়ে পৌঁছে। এভাবেই চলে চক্রাকারে এক নিরবচ্ছিন্ন ঘূর্ণনের পালা। এই তথ্যটুকু বুঝতেও কত না সময় কেটে গেছে! নদী বা ঝর্ণা চিরদিনই দার্শনিক ও ভাবুক মনকে দিয়েছে দোলা। এই জল কি ভাবে কোথা থেকে আসে, তার পরিমাণ কতটুকু—এ নিয়ে তুমুল বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালীর লিওনার্ডো ডা ভিঞ্চি এ বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করেন। কিন্তু সপ্তদশ শতকেও বৃষ্টি থেকে যে ঝর্ণার জল পাওয়া যেতে পারে না তা একরকম স্বতঃসিদ্ধই ছিল। তখনকার দিনে ভূস্তরকে মনে করা হতো অপ্রবেশ্য এবং লোকের ধারণা ছিল, বায়ুমণ্ডল থেকে এত জল পাওয়া একান্তই অসম্ভব। তাই ভৌমজলের উৎস খুঁজতে গিয়ে কত না নতুন ও উদ্ভট তত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছিল। সবাই ভেবেছেন, ভূগর্ভস্থ অফুরন্ত এক জলভাণ্ডারের কথা। যাহোক, ধীরে ধীরে বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকদের প্রচেষ্টায় বারিতত্ত্বের সঠিক রূপটি খাড়া হলো। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বিজ্ঞানী আঁতোয়া দ্য শেজি দেখালেন যে, নদীর জলের গতিবেগ উপরকার ঢালের সমানুপাতিক; অর্থাৎ $v = c\sqrt{rs}$। এখানে v = জলের গতিবেগ, r = ঔদক ব্যাসার্ধ, s = ঢাল c = সহগ বিশেষ। এই সূত্র বারিতত্ত্ববিদ্‌দের মনে নদীর প্রবাহ মাপবার কাজে বিশেষ অনুপ্রেরণা জোগালো। ক্রমে জলের গতিবেগ মাপবার অন্যান্য উপায় হলো এবং আধুনিক স্রোতমাপক যন্ত্রসমূহের সৃষ্টি হলো।

কি কি উপায়ে বৃষ্টির জল নদীতে এসে থাকে তা এবার দেখা যাক। নিম্নলিখিত ভাবে নদীতে বৃষ্টির জল এসে পড়ে—(ক) নদীর বুকে কিংবা উপনদীতে সরাসরি বর্ষণে, (খ) নদীর পয়ঃক্ষেত্রের উপর দিয়ে গড়িয়ে এবং (গ) মৃত্তিকার মধ্য দিয়ে চুঁয়ানো বা অন্তর্প্রবাহ দ্বারা। এদের মধ্যে উপর দিয়ে গড়িয়ে-আসা জলই যে নদীর জলস্ফীতির মুখ্য কারণ তাতে সন্দেহ নেই। বৃষ্টির যে জল মাটির ভিতরে প্রবেশ করে তা খুব ধীরে ধীরে নদীর দিকে এগিয়ে চলে। এই জলের গতিবেগ নির্ভর করে মৃত্তিকার অবস্থা ও জলশীর্ষের ক্রমাবনতির উপর। মৃত্তিকার প্রকৃতির পরেই নীচেকার শিলাস্তরের গঠনও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। মাটি আল্‌গা হলে এবং উপরে গাছপালার আচ্ছাদন থাকলে তাতে জল আট্‌কে থাকবার সুবিধা হয় এবং তাতে ভৌমজল প্রবাহও বৃদ্ধি পায়। জমির উপরকার ঢাল বেশী হলে গড়ানে জল খুব তাড়াতাড়ি নদীতে গিয়ে পৌঁছে। ভৌমজলপ্রবাহই নদীর প্রবাহের নিম্ন বা মন্দাবস্থায় নদীকে জল জোগায়। বর্ষণ যখন মন্থর হয়ে আসে এবং উপর দিয়ে গড়ানো জলের পরিমাণ কমে যায় তখন নদীকে বাঁচিয়ে রাখে এই অন্তঃসলিলা ফল্গুপ্রবাহ। খরার সময় স্থায়ী প্রবাহিণী নদীগুলি এভাবেই জল পেয়ে থাকে। যখন ভৌমজলের স্তর নদীর বুকের জলস্তর থেকে নীচে নেমে যায় তখন ভৌমপ্রবাহ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং বিপরীতমুখী প্রবাহও

নদী থেকে স্বরু হতে পারে। ভৌমপ্রবাহ দ্বারা জলশীর্ষের ঢাল খুব অল্পই প্রভাবিত হয়ে থাকে, গতিবেগেও পরিবর্তন ঘটে সামান্য; তাই ভৌম জলপ্রবাহের ক্ষেত্রে বিরাট তারতম্য বড় একটা দেখা যায় না। লোকচক্ষুর অন্তরালে এই প্রবাহ ঘটে বলে এ অনেকটা রহস্যাবৃত। এর পরিমাণ নির্ধারণ করবার জন্যে নানা উপায় অবলম্বিত হয়ে থাকে। নদীতে নেমে না আসা পর্যন্ত অবশ্য ভৌমপ্রবাহের পরিমাণ সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়। ভৌমজলে খনিজ পদার্থের আধিক্য থাকে; তবে তা অনেকটা স্বচ্ছ থাকে বলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কার্যে ব্যবহারের বিশেষ উপযোগী হয়ে থাকে। এ থেকে দেখা যাচ্ছে, বরফগলা জলের কথা বাদ দিলে বৃষ্টিপাতই হচ্ছে নদীপ্রবাহের মূল কারণ। প্রবাহ নির্ভর করে বারিপাতের ধরণ, অববাহিকার আঞ্চলিক প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের উপর। আঞ্চলিক প্রকৃতি অর্থে ভৌগলিক, অর্থাৎ স্থানীয় উচ্চতা, তাপমাত্রার বৈষম্য প্রভৃতি অবস্থা বুঝায় এবং বৈশিষ্ট্য বলতে অববাহিকার আকার ও প্রকার, ঢাল, জলবাহী নালাসমূহের বিন্যাস প্রভৃতি বুঝায়। বারিপাতের তীব্রতা, স্থিতিকাল, পরিসংখ্যান প্রভৃতিও এই প্রসঙ্গে বিবেচ্য। এদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এই স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তবে এখানে যে প্রশ্নটা সহজেই এসে পড়ে সেটা হচ্ছে—বৃষ্টিপাত আর নদী প্রবাহের সম্বন্ধ নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন? সরাসরি নদীর প্রবাহ মেপে নিলেই তো সব গোল চুকে যায়! তার উত্তর এই যে, নদী তো একখণ্ড জমি নয় যে, তাকে একবার জরীপ করে নিলেই কাজ শেষ হয়ে যাবে! অনবরতই নদীর প্রবাহে পরিবর্তন ঘটছে। নদীর প্রকৃতি বুঝতে হলে চাই দীর্ঘদিনের প্রবাহ বিষয়ক তথ্য। অথচ অধিকাংশ নদীর ক্ষেত্রেই তা পাওয়া যায় না। যে সব বিবরণ পাওয়া যায় তাও নানাদিক দিয়ে থাকে অসম্পূর্ণ। বিশেষতঃ আগেকার দিনে তথ্যসংগ্রহে বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী মোটেই অনুসৃত হতো না। নদীর তথ্য সংগ্রহ অনেকটা সহজসাধ্য। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই বারিপাত বিষয়ক দীর্ঘদিনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণও পাওয়া সম্ভব। বৃষ্টিপাত ও নদীর প্রবাহ-মাত্রার সম্বন্ধ যদি জানা থাকে তাহলে এরকম বিবরণ থেকে যে কোন লুপ্ত তথ্য উদ্ধার করা সহজ হয়ে থাকে। বন্যার বিষয়ে সতর্কতা জ্ঞাপনের জন্যেও এর প্রয়োজন রয়েছে। এজন্যেই আজকাল নদীর পয়ঃক্ষেত্রে (Catchment) অনেক বৃষ্টিমান যন্ত্র স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছে।

এবার নদীর ব্যবহারিক বৈচিত্র্যের কথায় আসা যাক। নদীর জীবনে প্রধানতঃ তিনটি কাজ দেখা যায়—(১) উর্ধ্ব বা পার্বত্য প্রবাহ, (২) মধ্য প্রবাহ ও (৩) নিম্ন প্রবাহ। উর্ধ্ব প্রবাহে ভেঙ্গে চলাই যেন তার ধর্ম। এই অংশে নদী হয়ে থাকে অপেক্ষাকৃত অগভীর এবং খাড়া ঢালযুক্ত। পলির পরিমাণ থাকে কম, তাই নদী হয় স্বচ্ছসলিলা। নদীর বুকে দেখা যায় বালি, কাঁকর ও উপলখণ্ড। কোথাও বা নদী অনেক উঁচু থেকে হঠাৎ নীচে লাফিয়ে পড়ে এবং সৃষ্টি করে জলপ্রপাত। নদীর মধ্যপ্রবাহে ঢাল যায় কমে এবং গতিবেগও হ্রাস পায়। উপর থেকে আনীত পলির সাহায্যে সমভূমি তৈরী হয়। এখানে জলে পলির পরিমাণ বেড়ে যায়, তাই সেখানটা ঘোলাটে হয়ে পড়ে। নদীবক্ষ বন্যার জল ধারণ করতে না পেরে মাঝে মাঝে কূল ছাপিয়ে ওঠে এবং লোকের সর্বনাশের কারণ হয়ে থাকে। বন্যার জল যখন কমে আসে তখন পলি থিতিয়ে গড়ে ওঠে নতুন ভূমিখণ্ড। এ ক্ষেত্রে ভাঙ্গাগড়া দুটা কাজই চলে পাশাপাশি। নিম্ন প্রবাহে স্রোতের বেগ হয়ে পড়ে খুবই মন্দীভূত। নদী নিঃশেষে ঢেলে দেয় পলি ও মৃত্তিকাভার, মোহনায় গড়ে তোলে বদ্বীপ। তবে সব মোহনায়ই বদ্বীপ তৈরী হয় না। কারণ জোয়ার-ভাঁটার আধিক্য, মোহনায় সমুদ্রের গভীরতা কিংবা নদীবাহিত পলির পরিমাণের তারতম্য বশতঃ

সব জায়গায়ই বদ্বীপ সৃষ্টির অনুকূল অবস্থা বর্তমান থাকে না।

প্রবাহের বৈচিত্র্য অনুসারে নদীগুলিকে মোটামুটিভাবে তিন শ্রেণীতে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে; যথা—(১) স্থায়ী প্রবাহিণী, (২) সবিরাম প্রবাহিণী ও (৩) জোয়ার-ভাটাযুক্ত নদী। প্রথমোক্ত নদীগুলিতে সারা বছর ধরেই জলপ্রবাহ অক্ষুন্ন থাকায় তারা সচল থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর নদীর বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা বর্ষার জল পেয়ে ফেঁপে ওঠে এবং খরার সময় জল না পেয়ে শুকিয়ে যায়। এই দু-রকম নদীর ক্ষেত্রেই প্রবাহ থাকে একমুখী, অর্থাৎ উঁচু পাহাড় থেকে নীচু সাগরের দিকে। জোয়ার-ভাটার নদীতে কিন্তু প্রবাহ ঘটে দু-দিকেই। জোয়ারের সময় সাগর থেকে সূর্য ও চন্দ্রের আকর্ষণে জল উপর দিকে উঠে আসে এবং ভাটার সময় নীচ দিকে সমুদ্রে আবার নেমে যায়। জোয়ারের স্থিতিকাল মোটামুটিভাবে সাড়ে চার ঘণ্টা এবং ভাটার সময়কাল প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টা হয়ে থাকে। তাই প্রত্যেক ক্ষেত্রে দিনে জোয়ার-ভাটা এসে থাকে দুবার।

নদীসমূহের বিভিন্ন সময়ের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করে কতকগুলি মজার তথ্য পাওয়া গেছে। নদীর বিস্তৃতি, গভীরতা, ঢাল এবং প্রবাহমাত্রার মধ্যে বিশেষ রকমের সম্বন্ধ দেখা যায়। প্রবাহমাত্রা বলতে, নদীর কোনও ছেদ আয়তনের মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে যে ঘনফুট পরিমাণ জল প্রবাহিত হয় তাই বুঝায়। প্রবাহমাত্রা ও পলির মধ্যে নির্দিষ্ট কোনও সম্বন্ধ না পাওয়া গেলেও দেখা যায় যে, নদীর প্রবাহমাত্রা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে পলির পরিমাণও বেড়ে যায়। বিভিন্ন সময়কার পলির মাত্রা ও প্রবাহমাত্রার তথ্য থেকে নদীবিশেষের পলির পরিমাণ মোটামুটিভাবে জানা সম্ভব। বিভিন্ন নদীর ক্ষেত্রে বারিমাত্রার যেমন বৈষম্য দেখা যায়, পলির ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিভিন্নতা বর্তমান থাকে। পলির পরিমাণেই যে শুধু তারতম্য থাকে তা নয়, ছোট বড় দানার আকারের মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। মৃত্তিকার কণিকাগুলির আকারভেদে কাদা, বালি, পলি, কাঁকর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়ে থাকে। ছোট কণিকাগুলি জলের সঙ্গে ভেসে চলে এবং অপেক্ষাকৃত বড় কণিকাগুলি নদীর খাতের গা বেয়ে গড়িয়ে কিংবা মাঝে মাঝে লাফিয়ে চলে। জলের গতিবেগ বাড়লে এরা অনেক সময় উপরেও উঠে আসে। দুটি নদীর তুলনা করলে দেখা যায় যে, তাদের ঢাল, প্রবাহমাত্রা প্রভৃতি প্রায় একই রকম হলেও উভয়ের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য থাকতে পারে। যেমন—একটি নদী আঁকাবাঁকা হলেও তার খাত সমতল, আর অপরটিতে এখানে ওখানে চড়া কিংবা গভীর খাদও হতে পারে। পলির কণিকার আকার ও পরিমাণের বিভিন্নতার দরুণ এই তারতম্য হয়ে থাকে। নদীতে পলি আসে কোথা থেকে? সাধারণতঃ পয়ঃক্ষেত্রের মৃত্তিকার ক্ষয়ই এর জন্যে দায়ী। মৃত্তিকা এবং শিলার উপর জল ও বায়ুর ক্রিয়া প্রভাবে কণিকাগুলি শিথিল ও বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে এবং জলের স্রোতে নদীতে নেমে আসে। প্রথমে তারা আকারে বেশ বড় থাকে। নদীপথে ঘর্ষণ ও অন্যান্য কারণে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ও গোলাকার হয়ে ওঠে। পয়ঃক্ষেত্র তৃণগুল্মবিহীন হলে মৃত্তিকার ক্ষয় বেশী হয়। নদীতে বাঁধ প্রভৃতি নির্মাণের পূর্বে এই পলির হিসাব খুবই প্রয়োজনীয়; যাতে জলাধারগুলি তাড়াতাড়ি ভরে গিয়ে অকেজো না হয়ে পড়ে। এই সঙ্গে পয়ঃক্ষেত্রের মৃত্তিকা সংরক্ষণের ব্যবস্থাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। নদীর পলির পরিমাণ জানবার জন্যে বিশেষ ধরণের যন্ত্রের সাহায্যে পলিযুক্ত জল তুলে নিয়ে তা থেকে পরিমাণ মাপা হয়। বিভিন্ন নদীর জলে দ্রবীভূত পদার্থের পরিমাণেও তারতম্য দেখা যায়। জলে খনিজ পদার্থের আবির্ভাব হয় শিলার দ্রবণ থেকে। কার্বনেটযুক্ত শিলা থেকে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়াম জলে এসে থাকে। আগ্নেয়শিলার

দ্রবণ খুব কম হয় বলে এরকম স্থানের নদীর জলে দ্রবীভূত পদার্থের পরিমাণ থাকে কম। জোয়ার-ভাটাযুক্ত নদীতে দ্রবীভূত পদার্থ থাকে খুব বেশী পরিমাণে। জল ব্যবহারকারীদের পক্ষে এই দ্রবীভূত পদার্থের পরিমাণ জানা বিশেষ দরকার। এভাবে নদী নিজেই স্বভাবতঃ কতকটা দূষিত হয়ে থাকে। তার উপর শহর ও শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলের দ্রব্যাবশেষ নদীতে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় জল আরও দূষিত হয়ে পড়ে। এর ফলে নদী মজে গিয়ে কালে তার অপমৃত্যু ঘটে।

প্রতিক্ষণেই নদীর প্রবাহের পরিবর্তন ঘটছে। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যে কোন দিনের জলস্তর অন্য কোনও দিনের জলস্তরের মাত্রাকে ঠিক ঠিক অনুসরণ করে না। বিভিন্ন দিনের প্রবাহের হ্রাস-বৃদ্ধিকে লৈখিক চিত্রে রূপায়িত করলে যে চিত্র পাওয়া যায় তাকে বলে বারিলেথ (Hydrograph) [১নং চিত্র দ্রষ্টব্য]। বিভিন্ন সময়ের প্রবাহমাত্রা থেকে যেমন বারিলৈখিক চিত্র পাওয়া যায়, তেমনি বিভিন্ন প্রবাহমাত্রা ও জলস্তরের মধ্যে সম্বন্ধবিশিষ্ট চিত্রও অঙ্কন করা যেতে পারে। [২নং চিত্র দ্রষ্টব্য]

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে যদি কোন স্থানে নদীর জলের উচ্চতার পরিমাপ নেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে, ক্রমাগত জলের উঠা-নামার ফলে আঁকাবাঁকা রেখার সৃষ্টি হয়েছে। কোনও নদীর বারিলৈখিক চিত্র যে কেবল বছরের বিভিন্ন ঋতুতে পরিবর্তিত হয় তা নয়, যে কোন বছরের প্রবাহের ঊর্ধ্বতম, নিম্নতম বা গড়মাত্রা অন্যান্য বছরের তুলনায় ভিন্ন হয়ে থাকে। কোন কোন সময় সেগুলি অনেক গুণ বেশী বা কম হয়ে পড়ে। তাই যে কোন ক্ষেত্রের জলসম্পদের বিষয় বিবেচনা করতে গেলেই কতকগুলি তথ্য জানবার প্রয়োজন হয়; যেমন—(ক) নদীর প্রবাহমাত্রা, (খ) বারিপাতের বিবরণ, (গ) পয়ঃক্ষেত্রের প্রাকৃতিক ও ভৌতাবস্থা, (ঘ) ভৌমজল, (ঙ) বাষ্পীভবনের পরিমাণ, (চ) জলের রাসায়নিক ধর্ম, (ছ) পলির পরিমাণ ইত্যাদি।

নদীর একটি বিশেষ স্বভাব হচ্ছে এই যে, সে
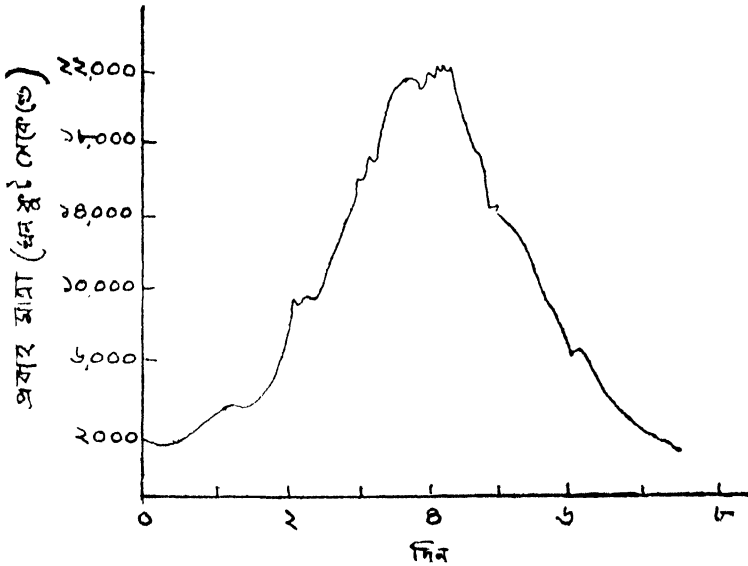
১নং চিত্র

নদীর প্রবাহমাত্রা পরিবর্তনের চিত্র।

কখনো সোজাসুজি চলতে চায় না, সব সময়েই আঁকাবাঁকা গতিপথ বেছে নেয়। নদীর এই সর্পিল আকৃতির মূলে আছে জলে অতিরিক্ত একটি পদার্থের অবস্থিতি, অর্থাৎ পলিমাটি। অবশ্য জল ও পলির মধ্যে বিশেষ কোন আকর্ষণ বা সম্বন্ধ নেই। যে যার আপন নিয়মে চলে। কিন্তু এই পলিই নির্দিষ্ট করে নদীর গতিপথ। এখানে পলি অর্থে বালি, কাদা প্রভৃতি সবই ধরতে হবে। বিশেষ পরীক্ষায় করে। আর যদি ঢাল কম হয়ে যায় তাহলে নদীগর্ভেই পলি জমা হতে থাকে। নদীর পাড় যদি উঁচু হয় এবং নদীতে আগত পলিভার যদি নদীর পলিবহন ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যায় তাহলে সেগুলি নদীর বুকেই সঞ্চিত হবে। তটভূমি নীচু হলে জল কূল ছাপিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং থিতানো পলিতে জমি উঁচু হওয়ার সুযোগ পায়। নদীতে পলি জমা হলে তার ছেদ আয়তন কমে
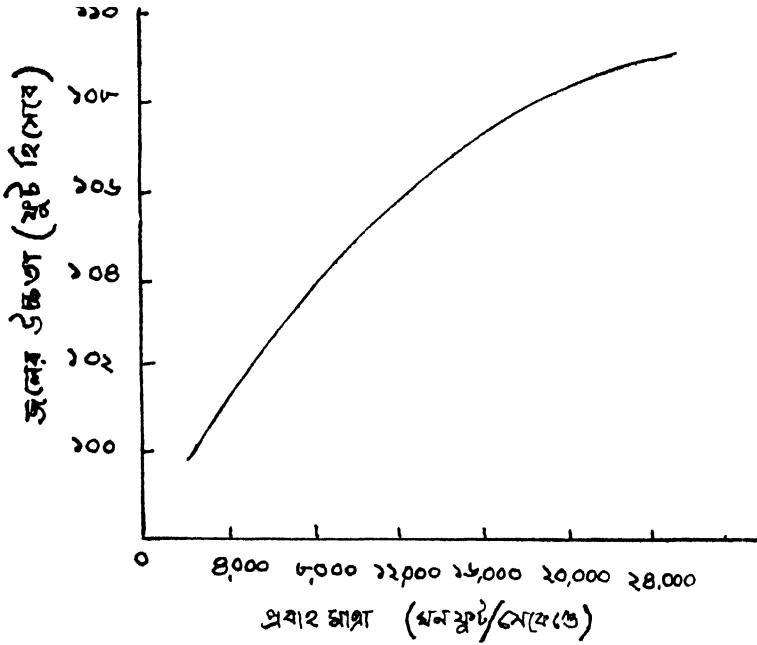
২নং চিত্র

প্রবাহ মাত্রার বিভিন্নতা অনুযায়ী জল মাত্রার চিত্র। এখানে জলের উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ধরা হয়েছে।

দেখা গেছে, কোন নির্দিষ্ট প্রবাহমাত্রা ও কণিকা-সমন্বিত পলির জন্যে যে কোন জলপথের ক্ষেত্রেই একটি মাত্র স্থায়ী প্রবাহনালা হতে পারে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট পলির আকার ও বারিপ্রবাহের জন্যে একটা নির্দিষ্ট ঢালযুক্ত স্থিতিশীল খাতের সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রবাহমাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই ঢালও পরিবর্তিত হয়ে যায়। এ রকম স্থিতিশীল কোন জলপথের ঢাল যদি কোনও কারণে বেড়ে যায় তাহলে তা খাতের ক্ষয়প্রবণতাই সূচিত যায় এবং খাতের পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে নদীকে নতুন করে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। এই সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়েই নদীকে আঁকাবাঁকা পথ বেছে নিতে হয়। নদীর বুকে গাছ-পাথর পড়ে' কিংবা বালি জমা হয়ে যদি কোন বাধার সৃষ্টি হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত জল সবেগে তীরে ধাক্কা দেয় এবং তা থেকেই বাঁক সৃষ্টির সূচনা হয়। বাঁক হলেই উদ্দামতা বাড়ে এবং তার ফলে খাত এবং তীর থেকে মাটি উঠে আসে। স্রোতের ধাক্কায় বাঁকের

বাইরের দিকের তীর আক্রান্ত হয়ে ধ্বসে পড়ে এবং সেই মাটি ভিতরের দিকে গিয়ে জমা হতে থাকে। চড়ার পাশ দিয়ে নদী এগিয়ে চলে। এভাবেই বাঁকের পর বাঁক তৈরী হতে থাকে। অনেক সময় প্রবাহের উর্ধ্বাবস্থায় নদী দুটি বাঁকের মধ্যবর্তী স্থান ভেঙ্গে সোজা পথ করে নেয়। প্রবাহমাত্রা বেশী হলে বাঁকের সন্নিহিত অংশের মাটির ক্ষয়ে সেটা গভীরতর হয় এবং দুটি বাঁকের মধ্যবর্তী অংশের খাত উঁচু হতে থাকে। প্রবাহমাত্রার পরবর্তী নিম্নাবস্থায় তার বিপরীত অবস্থাই ঘটে। বাঁকের মধ্যে তখন চড়া পড়ায় গভীরতা কমে যায় এবং অন্য জায়গার মাটি খানিকটা কেটে নিয়ে যায়। নৌ-চলাচলকারী নদীতে এ রকম চড়া খুবই বিপদের কারণ হয়ে থাকে।

নদীর প্রবাহ সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলা হলো তা খুবই সংক্ষিপ্ত সন্দেহ নেই, তবু এ থেকে বিষয়টি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যাবে। নদীর প্রবাহ অনেকগুলি জটিল বিষয়ের সমষ্টিগত ফলাফল। বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় এই বিষয়গুলির মধ্যে একটা সঙ্গতি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। অবশ্য এখনও আরও অনেক তথ্যাদি জানবার আছে
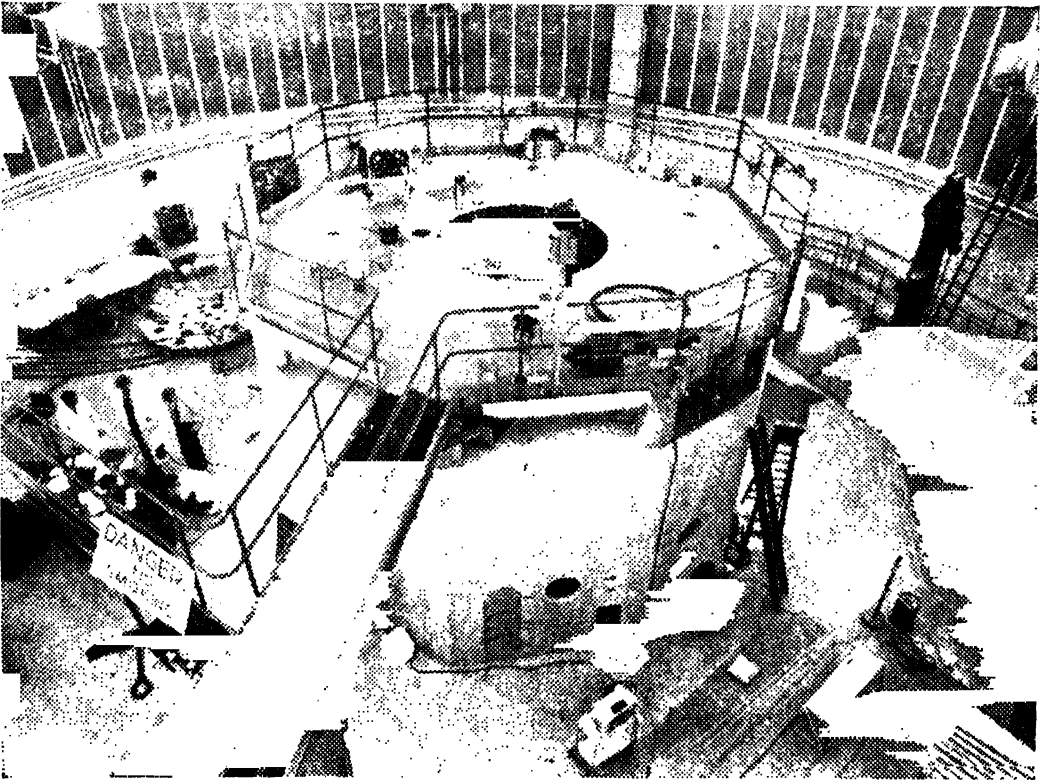
হারওয়েল পরমাণু-শক্তি গবেষণা কেন্দ্রে স্থাপিত বৃটেনের প্রথম বৃহদাকারের ভারী জল পরমাণু চুল্লী 'ডিডো'। নিউট্রনের গতি মন্থর করিবার জন্য এই চুল্লীতে ভারী জল ব্যবহৃত হয়।

নীহারিকাচ্ছন্ন বহুরূপ তারার বর্ণচ্ছত্র

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র

নীহারিকাচ্ছন্ন বহুরূপ তারার বর্ণচ্ছত্র বি, এ এবং এফ শ্রেণীর। ইহাদের বর্ণচ্ছত্রে একপ্রকার বিশেষ উজ্জ্বল রেখা দেখা যায়। তারার চতুর্দিকে যে বাষ্পীয় নীহারিকা ঘিরিয়া আছে তাহারই উত্তেজনা হইতে ঐ রেখাগুলির উৎপত্তি। কতিপয় শ্বেত বহুরূপ তারা আছে, যেমন—বি এন ওরিয়নিজ, ডব্লিউ ডব্লিউ ভালপেকিউলী, ওয়াই জেড্ সেফি এবং ভি এক্স ক্যাসিওপী—তাহাদের চতুর্দিকে নীহারিকার বিদ্যমানতা লক্ষ্য হয় না; কিন্তু তাহাদের হ্রাস-বৃদ্ধি নীহারিকাচ্ছন্ন তারার ন্যায়। তজ্জন্য ঐ তারাগুলিকে নীহারিকাচ্ছন্ন তারার পর্যায়ে রাখা হয়। ওয়াই জেড্ সেফি তারাটি অত্যন্ত দ্রুত চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিয়া থাকে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে অবিচ্ছিন্ন স্থুলতম জ্যোতি দ্বারা বাধা-প্রাপ্ত হয়। তাহার এই অবস্থা ঠিক যেন টি ওরিয়নিজ তারার ন্যায়।

আর আর টরি তারাটি দ্রুত এবং অব্যবস্থিত হ্রাস-বৃদ্ধির প্রকৃষ্ট নিদর্শন, কিন্তু এই শ্রেণীর তারা নিতান্ত বিরল। ইহারা মাত্র কয়েক স্থুলত্বে রূপান্তরিত হয়। এই বিশেষ তারাটি কয়েক দিনের মধ্যেই দুই বা তিন স্থুলত্বে অকস্মাৎ দ্রুত পরিবাতত হয়, আবার অন্য সময়ে পরিবর্তন যৎসামান্য ও মন্থর। আর ডব্লিউ অরিগী এত দ্রুত চাঞ্চল্য প্রদর্শন করে যে, কয়েকজন বহুরূপ তারা-পর্যবেক্ষক সমবেত উদ্যম ব্যতীত উহার জ্যোতিরেখার বক্রতা স্থির করিতে পারেন না। বস্তুতঃ উহার জ্যোতির দুই প্রকার চাঞ্চল্য দেখা যায়। একপ্রকার মাত্র কয়েক দিনের ও অন্য প্রকার কয়েক মাসের ব্যবধানে হইয়া থাকে।

আর আর টরি, আর ওয়াই ওরিয়নিজ এবং ইউ এক্স ওরিয়নিজ তারাত্রয়ের বর্ণচ্ছত্র জানা যায় নাই, কিন্তু আর ডব্লিউ অরিগী পীতবর্ণের। তাহার বর্ণচ্ছত্র 'জিও' শ্রেণীর জানা গিয়াছে। এই চারিটি তারাই পীতবর্ণের। ইহাদের জ্যোতির রূপান্তর প্রায় একই রূপ। এই জাতীয় আর দুইটি তারা—এস ওয়াই ক্যান্ক্রি এবং সি ও ওরিয়নিজ-এর রূপান্তরের বিস্তৃতি বেশী, কিন্তু তাহারা শ্বেত তারা। এই সংখ্যালঘু বহুরূপ তারাগুলি স্পষ্টই সমজাতীয় কি না তাহা বলা কঠিন। জেপশ্চকিনের মতে, আর আর টরি জাতীয় বহুরূপ তারাগুলি নীহারিকাচ্ছন্ন। ইউ ওয়াই অরিগী তারাটির বর্ণচ্ছত্র জি শ্রেণীর। এই তারাটি কালো রেণু মেঘের মধ্যে থাকিয়া ১৯ দিনে একবার রূপ পরিবর্তন করে, আবার অন্য সময়ে অনিয়মিত চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিয়া থাকে।

গামা ক্যাসিওপী তারাটি ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বহুরূপ নহে বলিয়া জানা ছিল। ইহার বর্ণচ্ছত্র প্রাচীন পদ্ধতির 'বিও' শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহাতে এক বিশেষ ধরণের উজ্জ্বল হাইড্রোজেন বাষ্পের রেখা দেখা যায়। প্রত্যেক রেখা ঠিক মাঝখানে শোষণ রেখা দ্বারা দ্বিধা বিভক্ত। এই শ্রেণীর বর্ণচ্ছত্র সাধারণ নহে। প্রায় চারি শতাধিক এই জাতীয় তারা বিদ্যমান আছে। ১৮৯০ হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গামা ক্যাসিওপীর ঔজ্জ্বল্য বিশেষরূপে ২.২৫ স্থুলত্বে অবিচলিত ছিল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে দেখা যায় যে, এই তারাটির জ্যোতি প্রায় অর্ধ স্থুলত্বে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইহার জ্যোতি আরও বৃদ্ধি পাইয়া ১.৬ স্থুলত্ব প্রাপ্ত হয়। এই স্থুলত্বে উপনীত হওয়ার পরেই তাহার জ্যোতি ধীর শান্ত গতিতে কমিতে থাকে

এবং নভেম্বর মাসে তাহার পূর্বতন জ্যোতি ২'২৫ স্থূলত্বে প্রত্যাবর্তন করে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সে তাহার পূর্বতন জ্যোতি ২'২৫ স্থূলত্বে পরিতৃপ্ত না হইয়া ক্রমে আরও কমিতে থাকে। অবশেষে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে তাহার ক্ষীণতম জ্যোতি ৩'০ স্থূলত্বে পরিণত হয়।

গামা ক্যাসিওপীর জ্যোতির হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত তাহার বর্ণচ্ছত্রেও পরিবর্তন দেখা যায়। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে বর্ণচ্ছত্রে কিছুমাত্র পরিবর্তন দেখা যায় নাই, কিন্তু ঐ বৎসর বসন্তকালে দ্বিতীয় উজ্জ্বল হাইড্রোজেন রেখাগুলির সংস্থিতির কতকটা পরিবর্তন দেখা যায়। ঐ সময়ে তাহার সহচর-দ্বয়ের অন্যতম তারাটি ক্রমাগত ক্ষীণ হইতে থাকে, অপরটি সেই অনুপাতে উজ্জ্বল হইতে থাকে; পরে এই অবস্থা উল্টাইয়া যায়। যে সহচরটি ক্ষীণ হইতেছিল সে ক্রমে উজ্জ্বল ও অপরটি ক্ষীণ হইতে থাকে। সম্ভবতঃ বর্ণচ্ছত্রের পরিবর্তন আরম্ভ হইলেই তাহাদের জ্যোতিরও পরিবর্তন আরম্ভ হয়। কিন্তু তাহারা বেশ স্পষ্ট নহে, অন্যদিকে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত তাহাদের আলোক-তরঙ্গের চাঞ্চল্যের কোন লিখিত বিবরণ না থাকায় এই তারাটি যে বহুরূপ, তাহা আমাদের জানা ছিল না। স্থূলতম জ্যোতির সময়ে বর্ণচ্ছত্রের শোষণ রেখাগুলি তীব্র দেখাইত, কিন্তু ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে যখন তাহার জ্যোতি হ্রাস পায় তখন ঐ সকল শোষণ রেখা ক্ষীণ হয় এবং উজ্জ্বল উদ্গত রেখাগুলি অপেক্ষাকৃত তীব্র হয়। মনে করিতে হইবে যে, নূতন তারার বর্ণচ্ছত্রেই এই প্রকার উজ্জ্বল ও কালো রেখাগুলির আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য গামা ক্যাসিওপীর বর্ণচ্ছত্র নূতন তারার বর্ণচ্ছত্রের অনুরূপ তাহা বলা চলে না।

গামা ক্যাসিওপীর রূপান্তর আবিষ্কারের কয়েক বৎসর পূর্বে মেরিল ও কুমারী বারওয়েল ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, যে সকল 'বি' শ্রেণীর তারার বর্ণচ্ছত্রে উজ্জ্বল রেখা দেখা যায় তাহারা বহুরূপ। ম্যাক্‌লাফ্‌লিন বুঝাইয়া দেন যে, এই সকল বর্ণচ্ছত্রীয় পরিবর্তনের একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, তাহা নির্দিষ্ট দিন অন্তর অন্তর ঘটিয়া থাকে। সম্ভবতঃ এক শতাব্দী বা ততোধিক কাল তাহারা প্রায় নিষ্ক্রিয় থাকে। এই নিষ্ক্রিয়তা ভঙ্গ করিয়া স্বল্পকালীয় তৎপরতা দেখা দেয়, তখন কয়েক বর্ষব্যাপী অর্ধকালচক্রীয় বর্ণচ্ছত্রের পরিবর্তন স্বীকার্য।

আর একদল তারা আছে যাহারা গামা ক্যাসীওপীর সদৃশ; ইহারা পি সিগনি জাতীয় বহুরূপ তারা। ইহাদের বর্ণচ্ছত্রে 'বি' শ্রেণীর বর্ণচ্ছত্রীয় তারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন পৃষ্ঠভূমিতে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ও আইওনাইজ্‌ড্‌ অক্সিজেনের কালো শোষণ ও উদ্গত উজ্জ্বল রেখা সকল দৃষ্ট হয়। উজ্জ্বল রেখাগুলি সর্বদাই কালো রেখার লালের দিকে থাকে। পি সিগ্‌নি নিজে বর্তমানে নগ্নচক্ষে দৃষ্ট পঞ্চম শ্রেণীর তারা। অতীতে এই তারাটি যে আচরণ প্রদর্শন করিয়াছে তাহা গামা ক্যাসিওপী হইতে বেশী ভিন্ন প্রকৃতির নহে। ১৭শ শতাব্দীতে এই তারাটি তুইবার তৃতীয় শ্রেণীর জ্যোতি প্রাপ্ত হয়। ইহাকে প্রায়ই নূতন তারাবৎ তারা বলা হইত। কিন্তু ইহার অতিকায় লক্ষণ হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, এই জাতীয় তারাগুলি নূতন তারার স্বাভাবিক ক্ষীণতম জ্যোতি হইতে গড়ে ১০.০০০ গুণ বেশী উজ্জ্বল। তজ্জন্য ইহাদিগকে খর্বকায় স্ফোটনশীল তারার পর্যায়ে স্থাপন করা সঙ্গত। ডজনখানেক এই জাতীয় তারায় ন্যায় বর্ণচ্ছত্রীয় তারার মধ্যে কয়েকটি মাত্র সুবিদিত বহুরূপ তারা।

মনে হয় যে, গামা ক্যাসিওপী ও পি সিগনি জাতীয় তারার হ্রাস-বৃদ্ধি, তাহাদের বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে যেখানে উজ্জ্বল রেখাগুলি উৎপন্ন হয়, সেই স্থানে যে পরিবর্তন ঘটে তাহারই জন্য হইয়া থাকে। কিন্তু শোষণ রেখাগুলির পরিদৃষ্ট পরিবর্তন ও তাহার সহিত কোন কোন তারার অধিকতর

আলোকের পরিবর্তন দেখিয়া অনুমান হয় যে, পূর্বোক্ত পরিবর্তন তাহাদের প্রকৃত পৃষ্ঠদেশ বা ফটোস্ফিয়ারের গভীরতর স্তরে সংঘটিত হয়। বলা যাইতে পারে যে, পি সিগ্‌নি তারার বর্ণচ্ছত্রে কালো ও উজ্জ্বল রেখাগুলির তীব্রতার পরিবর্তন নূতন তারার বর্ণচ্ছত্রের পরিবর্তনের সমতুল্য। ভুলিলে চলিবে না যে, ঠিক নূতন তারার ন্যায় এই তারাগুলি অত্যন্ত উষ্ণ এবং গর্ভদেশের সংগঠন সম্পূর্ণ পৃথক হইলেও তীব্র অতিবেগুনী কিরণ তাহার চতুষ্পার্শ্বের বায়ুমণ্ডলে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিতে পারে। কাজেই গামা ক্যাসিওপী ও পি সিগ্‌নি জাতীয় তারাগুলি যে নূতন তারার সহিত সম্বন্ধযুক্ত তাহা বলিবার সময় এখনও আসে নাই।

রো ক্যাসিওপী তারাটি পূর্বে বহুরূপ তারা বলিয়া গণ্য হইত না। রিভাইজড্ হারভার্ড ফটো-মেট্রিতে (H. A. 50) এই তারাটির অবস্থান বিষুবাংশে ২৩ ঘ ৪৯ মি ৪, ক্রান্ত্যংশে+৫৬° ৫৭′ ও স্থূলত্ব ৪·৮৫ উল্লেখ আছে। বহুরূপ তারার দ্বিতীয় ক্যাটালগে (H. A. 55, Part 1.) উল্লেখ আছে যে, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী হইতে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে গৃহীত ৬ খানি ফটোপ্লেটে উহার স্থূলত্বের যৎকিঞ্চিৎ হ্রাস-বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯০৩ হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ওয়েণ্ডেল ৩১শ রজনীতে ৫৯ বার উহাকে পর্যবেক্ষণ করিয়া বলেন যে, উহার জ্যোতি ০·৬৩ স্থূলত্ব পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। বর্ণচ্ছত্র সঙ্কীর্ণ কিন্তু স্পষ্ট। এই তারাটি গত ৪৪ বৎসর অনিয়মিত কালচক্রে পূর্বোক্ত যৎসামান্য হ্রাস-বৃদ্ধি প্রদর্শন করিয়াছে। অধুনা ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের অগাষ্ট মাস হইতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত ১·০ স্থূলত্বেরও বেশী গভীর সুস্পষ্ট ও সুডৌল ক্ষীণতম জ্যোতি প্রদর্শন করিয়াছে। এই ক্ষীণতম জ্যোতিতে পরিণতি তাহার জীবনেতিহাসে অদ্বিতীয় ঘটনা। কেবল তাহাই নহে, ক্ষীণতম জ্যোতিতে পতনকালে তাহার বর্ণচ্ছত্রেও বিশেষ পরিবর্তন দেখা গিয়াছে।

৯১৮ সংখ্যক হারভার্ড বুলেটিনে প্রকাশিত এস, জেপশ্চকিনের ফটোগ্রাফের পর্যবেক্ষণ হইতে ইহার ক্ষীণতম জ্যোতিতে অবনমনের ও তাহার তলদেশের ২য় অংশের অবস্থা সুন্দর জানিতে পারা যায়। ক্ষীণতম জ্যোতি হইতে উন্নয়ন কালে কোন ফটো লওয়া হয় নাই; তবে পি. পেরেনেগোর চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণের বিবরণ ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ৬৩ সংখ্যক অ্যাষ্ট্রোনোমিক্যাল সার্কুলারের ৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, অবনমন ও উন্নয়ন কালের ক্রমনিম্ন ও ক্রমোন্নত ঢালু একই প্রকার। প্রচুর পর্যবেক্ষণের অভাব এবং পর্যবেক্ষণ কঠিন হইলেও ক্ষীণতম অবস্থায় জ্যোতির স্পন্দন অল্প বলিয়াই মনে হয়। ক্ষীণতম জ্যোতির বর্ণ সম্বন্ধেও নিশ্চিত কিছুই বলা যায় না; তবে এই মাত্র মনে হয় যে, তখন তারাটি কতকটা লাল দেখায়।

তারাটি মোটের উপর ৬৬০ দিন ক্ষীণতম জ্যোতিতে থাকে। ইহার মধ্যে ৩২০ দিন অনেকটা স্থির ভাবাপন্নই থাকে। ১৬৫ দিনে ক্ষীণতম জ্যোতি হইতে স্থূলতম জ্যোতিতে উন্নীত ও ১৬৫ দিনে স্থূলতম জ্যোতি হইতে ক্ষীণতম জ্যোতিতে অবনমিত হয়। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর গ্রীনষ্টিন উহার ক্ষীণতম জ্যোতির বাহিরে বর্ণচ্ছত্রে যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখিয়াছিলেন তাহা জেপশ্চকিন কর্তৃক ০·২ স্থূলত্বে অবনমন কালের পর্যবেক্ষণের সহিত ঠিক মিলে।

এ. এইচ. জয়-এর অতি সাম্প্রতিক গবেষণায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এস, এস, সিগ্‌নি এবং এ ইউ আকোয়ারাই শ্রেণীর আরও কয়েকটি বহুরূপ তারা যৌথ-তারা-জগৎ, যদিও যুগল তারাদ্বয়ের পারস্পরিক দূরত্ব অতি কম, তথাপি দেখা গিয়াছে যে, তাহারা পরস্পরকে ভারকেন্দ্র অবলম্বন করিয়া প্রদক্ষিণ করে এবং মধ্যে মধ্যে নূতন তারার ন্যায়

স্বল্প বিস্ফুটিত হইয়া থাকে। ইতিপূর্বে ইহাদিগকে কেহই যুগল তারা বলিয়া সন্দেহ করেন নাই। লেখক ৩৫ বৎসরের উর্ধ্বকাল এস্ এস্ সিগ্নিকে পর্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। তিনি কোন দিনই উহাকে যুগল বলিয়া সন্দেহ করেন নাই। তবে মধ্যে মধ্যে তাহার খামখেয়ালির জন্য তাঁহাকে বিব্রত হইতে হইয়াছে এবং হারভার্ডের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ইহার সমাধান আনিতে হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা উহাকে যুগল বলিয়া সন্দেহ করেন নাই, কেবল স্বল্প বিস্ফোটনের কথাই বলিতেন। এই সকল কথা যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

ক্রোফোর্ড ও ক্রাষ্ট বলিতেছেন যে, এই সকল যুগল বহুরূপ তারা পারস্পরিক ভ্রমণজনিত আলোক অবরোধের ফলে জ্যোতির হ্রাস-বৃদ্ধি প্রদর্শন করে না, বিস্ফোটনজনিত তাহাদের বিম্বের হ্রাস-বৃদ্ধিই তাহাদের জ্যোতির হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ। এই শ্রেণীর যুগল তারার বড়টি প্রায় কমলা বর্ণের ও ছোটটি নীলবর্ণের হইয়া থাকে। লঘু বিস্ফোরণের ফলে বড় কমলা বর্ণের তারা হইতে যে বাষ্পরাশি উৎক্ষিপ্ত হয় তাহা অপেক্ষাকৃত ছোট নীল তারাটি আত্মসাৎ করিয়া লয়।
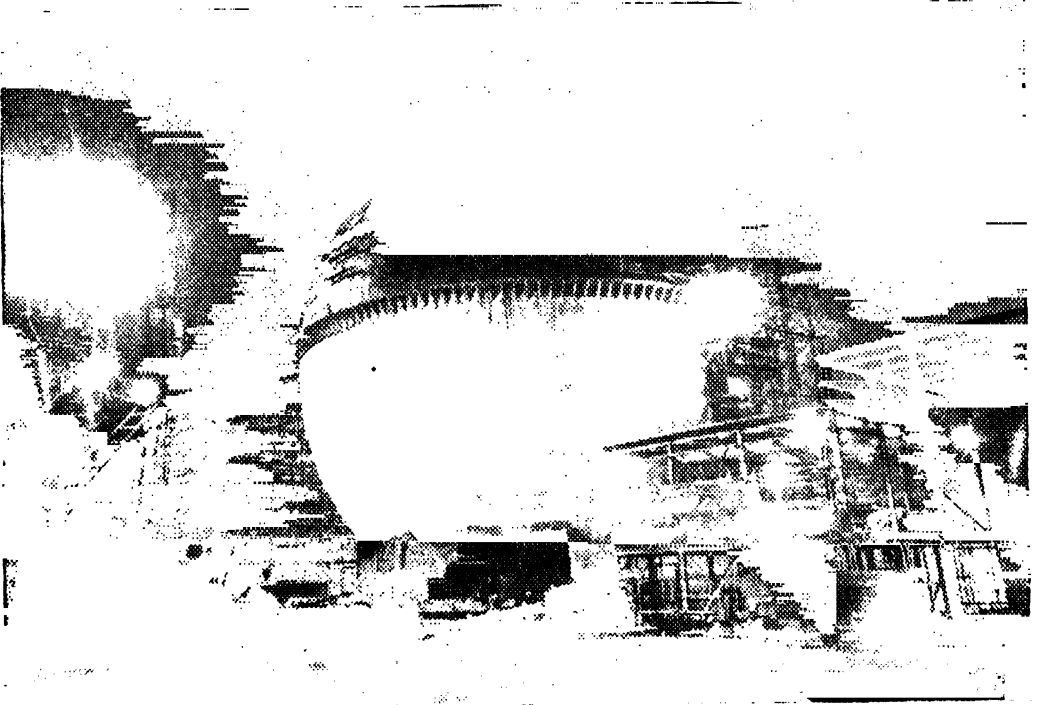
স্কটল্যাণ্ডের অন্তর্গত ডউনরেতে নির্মীয়মান সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ এই গোলকটির মধ্যে একটি ব্রিডার রিয়্যাক্টর, অর্থাৎ পরমাণু চুল্লী স্থাপিত হবে। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এটি দ্রুতগতিসম্পন্ন নিউট্রনের উপর নির্ভরশীল নয়।

অপরাধ ও অপরাধী

শ্রীসুকুমার বসু

অপরাধ মানুষের সামাজিক জীবনে একটি নৈমিত্তিক ঘটনা—এই বাস্তব অবস্থার উপর ভিত্তি করেই আধুনিক অপরাধ-বিজ্ঞানের সূচনা ও ক্রমবিস্তার হয়েছে। তাই অপরাধ-বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য—সমাজের শৃঙ্খলা কি ভাবে, কি নিয়মে মেনে চললে সবল ও আপদশূন্য মানব-সমাজ গড়ে উঠবে।

অপরাধ-বিজ্ঞানের মূলীভূত কারণের উপর নির্ভর করে' বিজ্ঞানীরা তিনটি ধারা নির্ণয় করেছেন। প্রথমতঃ, সামাজিক শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখবার উদ্দেশ্যে আইনকানুন প্রবর্তন; দ্বিতীয়তঃ, অপরাধমূলক ব্যবহারের কারণ নির্ণয় এবং তৃতীয়তঃ, অপরাধীর সংশোধনার্থে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিরূপণ। সুতরাং সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে নূতন আইন সৃষ্টি করা, পুরাতন আইনগুলিকে পরিবর্তিত করা, অপরাধ-মূলক ব্যবহারের উৎস সন্ধান ও অপরাধীর কার্য-কলাপ নিরোধের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন অপরাধ-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

অপরাধ-বিজ্ঞানীদের গবেষণার প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে, অপরাধীর কার্যকলাপ বা অপরাধমূলক ব্যবহার। অপরাধমূলক ব্যবহার বলতে কোন এক বিশেষ ধরণের ব্যবহার বুঝায় না। মানুষের সাধারণ ও সমাজ-অনুমোদিত ব্যবহারের একটা বিকৃতরূপ অপরাধীর ব্যবহারে দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ আমাদের ব্যবহারে যে সামাজিকতা বোধ পরিলক্ষিত হয়, অপরাধীর ব্যবহারে তার অবিদ্যমানতাই সুস্পষ্ট। কারণ, শৃঙ্খলাবদ্ধ সামাজিক রীতিনীতির অনুগামী যে কোন ব্যবহার যখন শৃঙ্খলাহীন ও নীতিবিরোধী হিসাবে পরিবেশিত হয়, তখনই আমরা সেই ব্যবহারকে অপরাধের পর্যায়ে ফেলে থাকি। সুতরাং সাধারণ ব্যবহার ও অপরাধমূলক ব্যবহারের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো—আচার-ব্যবহারের পরিবেশন-বিকৃতি কিংবা অপপ্রয়োগ। আমাদের ব্যবহারের সুষ্ঠু প্রকাশ বিকৃত অথবা অপপ্রযুক্ত হওয়ার জন্যে মনের কর্মপদ্ধতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে দায়ী। মনের কার্যকারিতার উপর পরিবেশ ও বংশধারার প্রভাব অনস্বীকার্য। সুতরাং উক্ত উভয় ক্ষেত্রেই যে সব কারণগুলির বিশেষ উপস্থিতি মানুষকে অপরাধীরূপে রূপায়িত করে, সেগুলির বিশ্লেষণ ও প্রতিরোধ কল্পনা অপরাধীর মানসচিত্র পর্য-বেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অপরাধ-বিজ্ঞানীদের সচেতন করে তুলেছিল। এই ভাবধারার জন্যে মূলতঃ ফ্রয়েডের অবচেতন বা নির্জ্ঞান মনের কর্মচঞ্চলতা সম্বন্ধীয় পরীক্ষিত সত্যের আবিষ্কার একান্তভাবে দায়ী।

মানুষ অপরাধী হিসাবে পরিগণিত হওয়ার পূর্বে তার জীবনে যে সব ঘটনা তার সেই অবস্থার জন্যে দায়ী, সেগুলির সমন্বয়ে একটি বিবরণী প্রস্তুত করা সম্ভব। অপরাধীর অতীত জীবনের ঘটনাবলী যে তাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে' সেই পথে প্ররোচিত করে—সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নেই। মানুষ তার পরিবেশের যে পরিস্থিতিতে সহজ স্বাভাবিক ব্যবহার প্রকাশ করতে অক্ষম হয়, তার সঙ্গে অতীত জীবনের কোন না কোন ঘটনার যোগসূত্র পাওয়া যায়। এক কথায় বলতে গেলে অপরাধ যে পরিস্থিতিতে সংঘটিত হয়, সেই পরিস্থিতি ও অপরাধী ব্যক্তির সম্পর্ক কোন অজ্ঞাত সূত্রে বাঁধা থাকে। সেজন্যে ঐ পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া মাত্রেই সেই বিশেষ

ব্যক্তিটি একই ধরণের দুষ্ট আচরণ প্রকাশ করে থাকে। অপরাধী ব্যক্তির মনে পোষিত কোন সমাজবিরোধী ক্রিয়া ঐ বিশেষ পরিস্থিতিতে এসে প্রকাশ পাওয়ার সুযোগ পায়; অর্থাৎ পরিস্থিতি অগ্নিশলাকার মত সঞ্চিত দাহ্যপদার্থের স্তূপে অগ্নিসংযোগ করে মাত্র। পরিস্থিতি অর্থে অনেক ক্ষেত্রে সুযোগ বুঝায়। অপরাধমূলক কার্যকলাপের প্রকাশ বহুলাংশে সুযোগের উপর নির্ভর করে। সুযোগ না পাওয়া অবধি কোন একটি প্রবল ইচ্ছা ঐ ব্যক্তির মনের মধ্যে পোষিত হয়, কিন্তু কার্যকরী হওয়ার সুযোগ পায় না। আবার কয়েকটি বিশেষ ধরণের পরিস্থিতি বা সুযোগ কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ; সুতরাং মানুষ সেই বিশেষ ক্ষেত্রের সংস্পর্শে না এলে ঐ ধরণের অপরাধ করবার সুযোগ পায় না। যেমন—যৌন-অপরাধ ও বিভিন্ন বৃত্তিমূলক অপরাধ।

অপরাধমূলক কার্যকলাপ কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যক্তির জীবনযাত্রাপ্রণালী, প্রতিবেশী বা সংসর্গের প্রভাব ও অন্যান্য অপরাধমূলক সুযোগ-সুবিধার উপর নির্ভর করে। শৈশব অবস্থায় জীবনধারণের উপযোগী অভ্যাসগুলি অপরাধমূলক হওয়ার ফলে সেগুলি কালে অভ্যাসে পরিণত হয়ে থাকে। এই পর্যায়ে অপরাধীর বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতি, প্রতিবেশীর আচরণ, বন্ধুবান্ধবের কার্যকলাপ, ন্যায়-অন্যায় বোধ, ছোটখাটো অন্যায় প্রশ্রয় পাওয়া ও অপরাধীর সংসর্গে আসবার সুযোগ পাওয়া প্রভৃতি বিশেষভাবে দায়ী। সুতরাং ব্যক্তিগত জীবনের উপর সমাজের প্রভাব, স্বীয় পরিবারের প্রভাব ও পরিবেশের প্রভাব পৃথক অথবা সমষ্টিগতভাবে মানুষকে অপরাধী করে তুলতে সাহায্য করে। সেজন্যে সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের বিপর্যয় মানুষকে দুষ্ট ব্যবহারে প্রবৃত্ত করে অথবা সমাজশৃঙ্খলাবিরোধী জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে তোলে।

সাধারণতঃ আইনবিরুদ্ধ কার্যগুলিকেই অপরাধ বলা হয়। আইনের গণ্ডীবদ্ধ কোন কার্যের মধ্যে কোন অপরাধ প্রচ্ছন্ন থাকলেও সেক্ষেত্রে সমাজ সাধারণতঃ প্রতিকূল হয়ে ওঠে না। প্রতিটি অপরাধমূলক কার্য সমপর্যায়ের নয়, অর্থাৎ সব অপরাধী সমাজের চোখে সমানভাবে দুষ্ট নয়। কোন কোন ব্যক্তি প্রায়ই এক ধরণের অপরাধ করে থাকে, আবার কেউ কেউ বিভিন্ন ধরণের অপরাধ করতেও নিরস্ত হয় না। ব্যক্তিবিভেদে অপরাধ একবার অথবা বহুবার সংঘটিত হয়ে থাকে। কোন কোন অপরাধীর কার্যকলাপের মধ্যে হিংস্র মনোভাবের পরিচয় বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। এই হিংস্র বা পশুভাবের প্রকারভেদ বা মাত্রাভেদও বিভিন্ন অপরাধীর কার্যে লক্ষণীয় বস্তু। অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর কোন কোন অপরাধী বিশেষভাবে অনুতপ্ত হয়, আবার কোন ক্ষেত্রে অনুশোচনার লেশমাত্র দেখা যায় না।

অপরাধ প্রবৃত্তি সহজাত নয়—এ বিষয়ে গবেষকগণ একমত। কারণ অপরাধপ্রবণতার ভিত্তি একটিমাত্র মনোবৃত্তির উপর স্থাপিত নয়। তবে মানুষের বিভিন্ন প্রবৃত্তি এবং শারীরিক বা মানসিক চরিত্রগুলির অনুশীলনীর উপর অপরাধমূলক ব্যবহারের প্রকাশ যে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল, একথা সকলেই স্বীকার করেন। অনুশীলন ক্ষমতা প্রয়োজনীয় শারীরিক এবং মানসিক সম্পদ অনেক ক্ষেত্রে পিতৃপিতামহ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত—এই সিদ্ধান্তের উপর কোন কোন গবেষক গুরুত্ব আরোপ করে' তার সাহায্যে অপরাধীর কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন। অবশ্য বহু ক্ষেত্রেই প্রমাণিত হয়েছে যে, অপরাধমূলক আবহাওয়া বা পারিবারিক রীতিনীতি পরিবারস্থ শিশুদের সম্পূর্ণভাবে প্রভাবান্বিত করবার ফলেই অপরাধপ্রবণ পরিবারের সৃষ্টি হয়ে থাকে। কারণ, শৈশব অবস্থাতেই সমাজের সঙ্গে, বাস্তব জীবনের সঙ্গে শিশুর পরিচয় যদি শৃঙ্খলার ভিত্তিতে গড়ে না ওঠে তাহলে ভবিষ্যৎ জীবন বিশৃঙ্খল হওয়াই স্বাভাবিক।

যেমন—খাবার ইচ্ছা শিশুর সহজাত, কিন্তু খাদ্যগ্রহণ ও খাদ্য সংগ্রহের পদ্ধতি শিক্ষাধীন। সুতরাং শিক্ষাপ্রণালীর উপর শিশুর খাদ্য-পরিচিতি নির্ভরশীল। এই পরিচিতির প্রাক্কালে পরিবারের প্রভাব যেমন অনস্বীকার্য তেমনি অপরাধমূলক ব্যবহার প্রকাশের জন্যে পরিবারের শিক্ষা-প্রভাবও অনস্বীকার্য।

অপরাধী সম্পর্কে গবেষণার প্রথম অবস্থায় বিজ্ঞানীরা অপরাধীদের শারীরিক ত্রুটির উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। অপরাধীদের অনেকের মধ্যেই শারীরিক ত্রুটিবিচ্যুতি বা আকৃতিগত বিকৃতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অনেকের মতে, দেহের শ্রীহীনতা অপরাধ সংঘটিত হওয়ার উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষতঃ যৌন অপরাধগুলির সঙ্গে দৈহিক দুষ্ট ভঙ্গীমার একটি সম্পর্কের কথা অনেকেই প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের যুক্তি অনুসারে সমাজে এই বিকৃত দেহভঙ্গীমা ঘৃণা ও ভীতির উদ্রেক করে বলে বিকৃতদেহী ব্যক্তি সাধারণভাবে যৌনতৃপ্তির সুযোগলাভে বঞ্চিত হয় ও অন্যায়ভাবে সুযোগ সৃষ্টি করে যৌন-পরিতৃপ্তির সময় অপরাধের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। বিচক্ষণ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে দুষ্ট ভঙ্গীমা কোন ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী নয় বরং ওগুলির উপর পরিবেশের প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে দায়ী।

নালীবিহীন গ্রন্থিরসের স্বাভাবিক ক্ষরণ না হওয়ার ফলে দেহের ও মনের অপরিণত অবস্থা বা অতিরিক্ত বৃদ্ধি স্বভাবতঃ যে সব মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, সেগুলি কয়েকটি ক্ষেত্রে বিপথে যাবার অনুগামী হয়ে দাঁড়ায়। বয়সোচিত সাধারণ বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার ফলে সমাজ বা পরিবারের পক্ষে এদের সমস্যা দুরূহ হয়ে ওঠে এবং প্রায় ক্ষেত্রেই এদের জীবন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে।

বিভিন্ন অপরাধের পক্ষে বয়সের বিভেদ অনুকূল। কারণ শক্তি, সামর্থ্য, চাতুর্য ও অন্যান্য কৌশল বয়স অনুযায়ী প্রয়োগ করা সম্ভব। তবে বয়স অনুযায়ী অপরাধের প্রকারভেদ নির্ণয় করা এখনও সম্ভব হয় নি এবং একথা সবাই স্বীকার করেন যে, অপরাধের প্রকারভেদের সঙ্গে বিভিন্ন বয়সের একটা সামঞ্জস্য আছে। ছোটখাটো চুরি কিশোর অপরাধীরাই বেশী করে। রাহাজানী, নারীহরণ, ধর্ষণ, ডাকাতি ও বিভিন্ন পেশাগত অপরাধ যুবক ও মধ্য-বয়সীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু বৃদ্ধবয়সে যৌন-অপরাধের দৃষ্টান্তও নিতান্ত কম নয়। কিশোর বয়স থেকে সুরু করে ৩০।৩৫ বছর পর্যন্ত যে সব অপরাধী একাধিক অপরাধ করে থাকে তাদের অপরাধী সমাজ "অপরাধী-প্রবীণ" বলে থাকে। সাধারণতঃ নারী অপরাধীর সংখ্যা কম। অবশ্য এর অন্যতম কারণ, সমাজে নারীর অনেক সুবিধা। বহুক্ষেত্রেই নারী অপরাধমূলক কার্যে সহায়তা করবার পর ধরা পড়ে না। পুরুষ ও নারী উভয়েরই বয়সের তারতম্যভেদে অপরাধের কোন নিশ্চিত প্রকারভেদ করা যায় না।

সাধারণতঃ দু'রকমের অপরাধী দেখা যায়। প্রথমতঃ অনেকে কোন অজ্ঞাত ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে অপরাধমূলক ব্যবহার প্রকাশ করে থাকে। দ্বিতীয়তঃ অনেকে অপরাধ করে জীবিকা অর্জনের জন্যে। এদের কাছে অপরাধ পেশা। এরা অপরাধকে গর্হিত মনে করে না, বরং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হিসাবে গর্ব অনুভব করে।

অপরাধী সমাজে অপরিচিতের প্রবেশাধিকার বিষয়ে ঐ সমাজের নেতৃস্থানীয়েরা বিশেষ সচেতন থাকে। বিশেষভাবে অনুসন্ধান না করে অথবা অন্য কোন অপরাধীর সমর্থন না পেলে অপরাধী সমাজে অপরিচিতের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ। সাধারণতঃ নেতৃস্থানীয় অপরাধীরা আশ্রয়হীন, সহায়হীন ও জড়বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের অপহরণ করে এনে নিজেদের সমাজের অধিবাসী হিসাবে গড়ে তোলে। অনেক ক্ষেত্রে কিশোরদের ভাবপ্রবণতার সুযোগ নিয়ে তাদের জীবনের অভাব-অভিযোগ-জনিত উত্তেজনা অপরাধমূলক ব্যবহারের মাধ্যমে

প্রশমিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়ে প্রবীণ অপরাধীরা নিজেদের সমাজে নবীন অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে থাকে।

কতকগুলি ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মনের অসুস্থতা বা বিকৃত মানসিক ক্রিয়াপদ্ধতি অপরাধপ্রবণতার মূল উৎস। উপরিউক্ত শ্রেণীভেদে এরা প্রথম পর্যায়ে পড়ে। এই শ্রেণীর অপরাধীর কাছে অপরাধের কারণ অজ্ঞাত থেকে যায়। অপরাধজনিত কার্যকলাপ থেকে এরা কিছুমাত্র আথিক লাভবান হয় না। মানসিক অসুস্থতা যেখানে অপরাধমূলক ব্যবহার প্রকাশ করায় সেখানে অসুস্থতার মূল কারণ অতৃপ্ত বাসনা। এই অতৃপ্ত বাসনার পরিতৃপ্তি সমাজবিরোধী হিসাবে বাস্তবক্ষেত্রে প্রত্যাহত হয়ে নির্জ্ঞান মনে সক্রিয় অবস্থায় অবস্থান করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এই অতৃপ্ত বাসনাগুলি আদিম প্রবৃত্তিসঞ্জাত। সুতরাং চেতন মনের বিচারবুদ্ধি সাময়িকভাবে ঐ অজ্ঞাত ও অপরিতৃপ্ত বাসনার কাছে পরাস্ত হওয়ার ফলে, ব্যক্তি নিজের অজ্ঞাতে অপরাধমূলক কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং অপরাধের মাধ্যমে নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছার সন্তুষ্টি সাধন করে। এই জন্যে কার্যের সম্পাদনাই হয় একমাত্র লক্ষ্য এবং কার্যের ফললাভ বিচারে এই শ্রেণীর অপরাধী সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। এই শ্রেণীর অপরাধীরা সাধারণতঃ জীবনধারণ বা জীবিকার্জনের উদ্দেশ্যে অপরাধ করে না।

মানসিক অসুস্থ ব্যক্তির অজ্ঞাত অসন্তুষ্টির প্রকাশ সম্পূর্ণ কাল্পনিক জগতে কেন্দ্রীভূত হয় অথবা বাস্তব জগতের কোন ঘটনার উপর আরোপিত হয়। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে অসুস্থ ব্যক্তি বাস্তব জগৎ থেকে স্বীয় কামনা সম্পূর্ণভাবে অপসারিত করে আত্মকেন্দ্রীক হয়, অর্থাৎ সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়ে যায়। কখনও এরা মনে করে যে, তাদের কার্যকলাপ কোন অলৌকিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। নিজেকে স্বীয় রাজ্যের অধীশ্বর জ্ঞানে সে অভীষ্ট সাধনের পথে সমস্ত বাধানিষেধ অগ্রাহ্য করে এবং ঐ ধরণের কার্যগুলিকে সে যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত মনে করে। তার কোন ইচ্ছার পরিপূরণ অথবা কোন কার্য বাহ্যজগতের নিয়ম লঙ্ঘন করছে কিনা, সে সম্বন্ধে সে মোটেই সচেতন নয়। নিজেকে কোন বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অথবা প্রভূত অর্থশালী বা বিরাট প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিজ্ঞানে সে নিজেকে কেন্দ্র করে নানারূপ ধারণা সৃষ্টি করে এবং তদনুযায়ী বিভিন্ন কার্যে লিপ্ত হয়। ব্যক্তির ভ্রান্ত ধারণায় শৃঙ্খলা বলতে যা বুঝায় সেটিকেই সে সমাজের শৃঙ্খলা ভাবে। কারণ সে জানে, সে নিজেই সমাজের দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা। দ্বিতীয়োক্ত ক্ষেত্রে অসুস্থ ব্যক্তি বাহ্যজগৎ এবং বাহ্যজগতে স্বীয় অবস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন থাকে। এই ধরণের অসুস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ তাদের নির্জ্ঞান মনের কোন অচরিতার্থ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা বা প্রকাশের প্রতীক চিহ্ন, অর্থাৎ তার দ্বারা অনুষ্ঠিত সমাজবিরোধী ব্যবহারের সমধর্মী অসামাজিক ইচ্ছা তার নির্জ্ঞান মনে বিরাজমান। নির্জ্ঞান মনের প্রতিটি ইচ্ছা আদিম প্রবৃত্তিমূলক এবং সক্রিয়। কাজেই সেগুলি প্রকাশ পাওয়ার জন্যে প্রতি মুহূর্তেই সচেষ্ট থাকে। এইগুলির নগ্ন প্রকাশ অসামাজিক ও শৃঙ্খলাহীন, তাই এরা বাধা পায় মনেরই বাধা দেবার শক্তির কাছে এবং এথেকেই সুরু হয় মানসিক দ্বন্দ্ব। মনের বাধা দেবার শক্তির কর্মপদ্ধতি চেতন মনের অগোচরে থাকে এবং যাদের বাধা দেয় তারাও চেতন মনের কাছে অজ্ঞাত। তাই মানসিক দ্বন্দ্বের প্রভাব চেতন মনের কার্যকলাপগুলিকে প্রভাবান্বিত করা সত্ত্বেও কোন্‌টি কি ভাবে করে এবং কেমনভাবে করে তা বুঝে ওঠা সম্ভব হয় না। এজন্যেই প্রতীক কার্যগুলি রহস্যাবৃত থেকে যায়। অপরাধী বুঝতে পারে না, কেন সে গর্হিত বা সমাজবিরোধী কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। অনেক ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর অপরাধীরা নিজেদের শাস্তি দেবার অথবা নিজেদের লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করবার অদম্য ও অজ্ঞাত ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে অপরাধ করে।

অনেক ক্ষেত্রে আবার ভয়ানক উত্তেজনাপূর্ণ কোন অসামাজিক কার্যের মাধ্যমে অপরাধী নিজের কোন অজ্ঞাত উত্তেজনার প্রশমন ঘটায়।

সাধারণতঃ মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিন্তাধারা অপরাধধর্মী, কিন্তু যতক্ষণ না ঐ ব্যক্তি সেগুলি কার্যে পরিণত করে ততক্ষণ অপরাধ সংঘটিত হয় না বা আইনের চোখে সে অপরাধী প্রতিপন্ন হয় না। মানসিক দ্বন্দ্বের পরিণাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানসিক অসুস্থতায় সীমাবদ্ধ থাকে বলেই সমাজে অপরাধীর সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে কম, অন্যথায় অপরাধীর সংখ্যা যে কি ভাবে বৃদ্ধি পেতো তা কল্পনাতীত। ষ্টকহোমের নোবেল ইনষ্টিটিউটে ডাঃ ষ্টীগ অ্যাকারফেল্ড মানসিক রোগীদের রক্ত পরীক্ষার যে নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন তার সাহায্যে অপরাধীর দেহের রক্ত পরীক্ষা করে মানসিক অসুস্থতাগ্রস্ত অপরাধী ও পেশাদার অপরাধীদের পৃথক করা সম্ভব। মানসিক অসুস্থতার সঙ্গে অপরাধের সম্পর্ক স্থির করবার জন্যেও ঐ গবেষণা-লব্ধ পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রদ।

কতকগুলি ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, কয়েকটি বিশেষ ধরণের ব্যক্তিত্ব অপরাধী হওয়ার পক্ষে অনুকূল। এই সব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক সমাজের সমস্যাবিশেষ। এরা অপরাধী অথবা আত্মকেন্দ্রীক শ্রেণীর মানসিক অসুস্থতায় জীবন অতিবাহিত করে। যারা অপরাধী হয়ে ওঠে তারা অবশ্য বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে যায় না; কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা কোন প্রবীণ অপরাধীর কাছে থেকে আজ্ঞাধীন ভৃত্যের মত জীবনযাপন করে। তাছাড়া অপরিণত মন বা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব অপরাধপ্রবণতার পক্ষে অনুকূল। মনের অপরিপূর্তি জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করে থাকে। জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে জীবনযুদ্ধে ও সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার তাৎপর্য বুঝে ওঠা সম্ভব হয় না। এজন্যে জীবনধারণের উপায় হিসাবে বাধা-নিষেধহীন আইনকানুন বর্জিত পরিবেশে অনুকূল জীবিকা-গুলিকে তারা উপযুক্ত মনে করে। সমাজ প্রবৃত্তির নগ্ন প্রকাশ অনুমোদন করে না। সমাজের রীতিনীতি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্যে যতটুকু বুদ্ধি-বিবেচনা ও বিচার শক্তির প্রয়োজন জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে তার প্রয়োগ সম্ভব নয়। অনুকরণই তাদের শিক্ষার একমাত্র উপায়। তারা যা কিছু দেখে সেগুলিই শেখবার চেষ্টা করে। জোর করে, ভয় দেখিয়ে বা লোভ দেখিয়ে এদের দিয়ে কোন কাজ করিয়ে নেওয়া খুবই সহজ। সুতরাং এ ক্ষেত্রেই তারা যে ধরণের পরিবার বা পরিবেশের প্রভাবে শিক্ষা পাবে, সেভাবেই তারা গড়ে উঠবে। জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হলেই যে অপরাধী হবে, একথা সর্বক্ষেত্রে সত্য নয়, তবে এই ধরণের ব্যক্তিত্ব অপরাধধর্মী ব্যবহার গ্রহণের পক্ষে অনুকূল।

অপরাধী জীবনের সুরু ও অপরাধীতে পরিণত হওয়ার জন্যে পরিবারের আবহাওয়া ও প্রতিবেশীর প্রভাব বহুলাংশে দায়ী। শিশুর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্যে উক্ত দুটি ক্ষেত্রই বিশেষ প্রভাবশালী। পিতামাতা অথবা অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের জীবন-ধারণ ও জীবিকার্জন প্রণালী, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সব কিছুই শিশু অনুকরণ করে। পরিবারের কলহপ্রিয়তা, অসৌজন্যতা, অনাদর, উত্তেজনা, কর্কশ ব্যবহার ইত্যাদি প্রত্যেকটি শিশু চরিত্রে নেতিমূলক পরিবর্তন আনয়ন করে। এগুলির প্রত্যেকটি উত্তর কালে সমাজ-শৃঙ্খলার প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করে থাকে। শিশুকাল থেকে পিতা, মাতা অথবা উভয়ের অনুপস্থিতি বা অভাববোধ অপরাধী চরিত্র সৃষ্টির বিশেষ সহায়ক। সংসারের দারিদ্র্য, অভিভাবকের বেকার অবস্থা, অকালে সংসারের চাপে যে কোন উপায়ে অর্থোপার্জনের চেষ্টা ইত্যাদির প্রত্যেকটি অপরাধপ্রবণতার সহায়ক। নারী অপরাধীদের প্রত্যেকের জীবনেই এই ধরণের ইতিহাস পাওয়া যায়। কতকগুলি পরিবারে অল্পসংখ্যক লোকের আয়ের উপর চতুর্গুণ লোক নির্ভরশীল। এই পরিবারগুলির মধ্যে ঔদাসীন্য

এবং নিস্পৃহ ভাব প্রতিক্ষেত্রেই বিদ্যমান। এই সব পরিবারে ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়মানুবর্তিতা আচার-ব্যবহার বা রীতিনীতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ায় কেউ আগ্রহশীল নন। শিষ্টাচারের অভাব বা সহানুভূতির অভাব এই সব পরিবারের মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই পরিবেশে শিশু ও কিশোর নানারূপ অপ্রিয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। এই ধরণের পরিবারের ছেলেমেয়েদের যৌনস্পৃহা, লোভ, স্বার্থপরতা, দুরভিসন্ধি ইত্যাদির প্রাবল্য দেখা যায় এবং এগুলির মূলকারণ যে শিক্ষার অভাব, সে বিষয়ে প্রত্যেকেই একমত। এই আবহাওয়ায় লালিতপালিত ছেলেমেয়েদের শেষ পরিণতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানসিক অসুস্থতা কিংবা অপরাধী জীবনযাপন।

অপরাধ যাদের পেশা তাদের অতীত জীবন অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে, তাদের জীবনে প্রতিবেশী ও পরিবেশের প্রভাব বিশেষভাবে দায়ী; কতকগুলি পরিবেশ-সৃষ্ট ঘটনা তাদের জীবনের গতিকে এই পথে পরিচালিত করেছে। জীবনের কোন আকস্মিক বিপর্যয় তাদের অস্তিত্বের স্বীকৃতি, আত্মসম্মান, মর্যাদা, আর্থিক স্বচ্ছলতা, সুখস্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি সব কিছুর সঙ্গে অপরাধমূলক ব্যবহার ও সমাজকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে দিয়েছিল। তার ফলেই এরা ধীরে ধীরে সাধারণ সমাজ থেকে সব কিছু ছিন্ন করে অপরাধী-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল। পারিবারিক বিপর্যয় বা সংসর্গদোষের ফলে যখন কোন ব্যক্তির অপরাধপ্রবণতা ভীষণভাবে বেড়ে ওঠে তখন ঐ ব্যক্তির পক্ষে অপরাধী-সমাজ একমাত্র আশ্রয়স্থল। সেখানে অপরাধীর অনাদর হয় না, বরং অপরাধীরা সম্মানের অধিকারী হয়ে থাকে। বিভিন্ন অপরাধী-সমাজ বিভিন্ন ধরণের অপরাধ, জীবিকা অর্জনের উপায় হিসাবে বেছে নেয়।

অপরাধী যে পর্যায়েরই হোক না কেন, সাধারণতঃ কোন রকম বিবেচনা না করেই তাদের উপর সমাজ স্বভাবতঃ বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে থাকে। অপরাধী উচিত শাস্তির নজীরে যা বিধান পায় তা অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ কার্যকরী হয় না। তা-ছাড়া সমাজে অপরাধীর উপর ভাল ব্যবহার ও সহানুভূতি কোন সময়েই দেখানো হয় না। অপ-রাধীর অনুশোচনা আসা সত্ত্বেও, ভাল হওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সমাজের অবহেলা ও হেয়দৃষ্টি তাদের ঐ পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সমাজের সহানুভূতি না পাওয়া ও সমাজচ্যুত হয়ে অপরাধী সংসর্গের আওতায় বাস করতে বাধ্য হওয়াই পেশাদার অপরাধীতে পরিণত হওয়ায় মূল কারণ। অধিকন্তু, অনেক ক্ষেত্রেই দৈহিক শাস্তির প্রয়োগ ছাড়া তাদের অন্য কোন সংশোধন-ব্যবস্থা বা চিকিৎসা করা হয় না। এজন্যে কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার পরেও মানসিক উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে অনেককে অপরাধ করতে দেখা যায়। অপরাধী শাস্তিভোগ করবার পর যাতে সমাজে প্রতিষ্ঠা পায় অথবা জীবনধারণের জন্যে তার উপযুক্ত জীবিকার সন্ধান পায়, সে বিষয়ে সরকার ও সমাজ উভয়ের ঔদাসীন্যের ফলেই অপরাধী, সমাজ এবং সরকারের উপর বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয় ও সমাজদ্রোহী কার্যের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে। পরোক্ষভাবে অপরাধী-সমাজের পুষ্টির জন্যে সরকার ও সমাজই দায়ী। কিশোর অপরাধীদের চিকিৎসা এবং সংশোধনের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকলে তারা অতি সহজেই পেশাদার অপরাধীতে পরিণত হয়।

সমাজের শান্তি, শৃঙ্খলা ইত্যাদি বজায় রাখবার জন্যে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়াই যদি সমাজের যুক্তি হয় তবে শাস্তিভোগ করবার সময় অপরাধীর সংশোধন ও তাকে সমাজের উপযোগী করে পুনর্গঠনই শাস্তির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। শাস্তি দেওয়ার ফলে যদি সমাজ তার অধিবাসীকে হারায় অথবা সমাজের উপর তার বিদ্বেষ বাড়িয়ে দেয় তাহলে অপরাধীকে শাস্তি দেবার কোন সামাজিক মূল্য থাকতে পারে না।

বর্তমানের অপরাধ-বিজ্ঞানীরা অপরাধের সংখ্যা হ্রাস করবার প্রচেষ্টায় অপরাধীর মানসিক চিকিৎসা এবং অপরাধীর সমাজে পুনর্বসতির উপায় নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়েছেন। দণ্ডভোগের প্রাক্কালে কারাগারের মধ্যে অপরাধীদের মানসিক উন্নয়ন ও অপরাধমূলক কার্য বর্জন করবার বিভিন্ন উপায়ও উদ্ভাবিত হয়েছে। অপরাধীর প্রতি প্রতিহিংসার মনোভাব দেখানো বর্তমানে অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। অপরাধীদের সমাজে পুনর্বসতির জন্যে পল্লীর অধিবাসী ও সরকারের পদস্থ কর্মচারীগণ বিশেষ তৎপর হয়ে উঠেছেন। এই চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে যেমন বিভিন্ন রোগ-প্রতিষেধকের আবিষ্কার অসুস্থদের স্বাস্থ্যলাভ ও পুনর্জীবন সম্ভব করে তুলেছে, অনুরূপভাবেই অপরাধ-বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীদের সুস্থ করা ও পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠছে। অপরাধ-বিজ্ঞানীরা অপরাধ ও অপরাধীকে আয়ত্তে আনবার এবং সুস্থ করবার চেষ্টায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। অদূর ভবিষ্যতে তাঁরা নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করবেন। মানবতার ভিত্তিতে অপরাধ-বিজ্ঞানীদের এই কর্মপ্রচেষ্টা জনসাধারণের মনে অপরাধ ও অপরাধী সম্বন্ধে পূর্বের ধারণার যথেষ্ট পরিবর্তন এনেছে। তাই নিশ্চিতভাবে আশা করা যায়, তাঁদের এই প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হবেই।
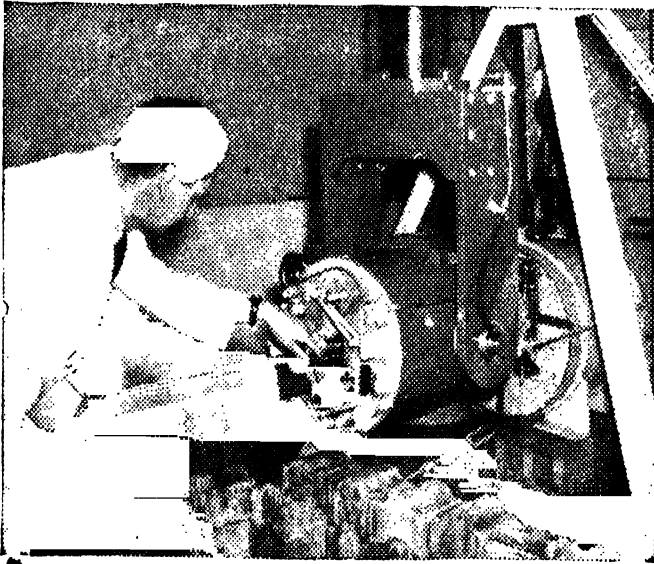
অ্যাটমিক পাইল হইতে সংগৃহীত পরিত্যক্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহ বর্তমানে বৃটেনে ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে।

পৃথিবীর সৃষ্টি ও বিবর্তন

শ্রীসুনীলকুমার বিশ্বাস

কত সুন্দর এই পৃথিবী! বিশাল পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় পাতায় গাঁথা আছে কত রহস্যময় কথা—কত সুন্দর সব কাহিনী।

সে আজ কোটি কোটি বছর আগেকার কথা—আমাদের এই সূর্য বেশ সুখে-শান্তিতেই তার সংসার চালাচ্ছিল। হঠাৎ এক অঘটন ঘটে গেল—বিরাট এক বস্তুপিণ্ডের প্রভাবের ফলে সূর্যের দেহে এক পরিবর্তন দেখা দিল। চন্দ্রের আকর্ষণে আমাদের এই পৃথিবীর দেহ যেভাবে ফুলতে থাকে, ঠিক সেই ভাবে ঐ বিরাট বস্তুপিণ্ডটির আকর্ষণের ফলে সূর্যের দেহ ফুলতে লাগলো। তার আকর্ষণ যতই বেড়ে চলতে থাকে সূর্যের দেহ থেকে ততই সেই স্ফীত অংশটি বেরিয়ে আসে এবং পরে এমন একটা অবস্থার উদ্ভব হলো যখন আকর্ষণের প্রভাব সহ্য করতে না পারায় সূর্যের দেহ থেকে খানিকটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে এল। কিন্তু কার্যকারণ সম্বন্ধ এমনই নিখুঁত যে, বিচ্ছিন্ন অংশটুকু আর সূর্যে ফিরে না গিয়ে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে সূর্যের চারপাশে ঘুরতে লাগলো। এর একটি হলো আমাদের এই পৃথিবী।

সূর্য থেকে বেরিয়ে আসবার ফলে এই পৃথিবী হারাতে সুরু করলো তার শক্তি (কারণ শক্তির মূল উৎসই হলো সূর্য) এবং বিরাট এক শূন্যের মধ্যে পড়ে সে হাবুডুবু খেতে লাগলো। ধীরে ধীরে তার তাপমাত্রা কমে এলো—পৃথিবী হারালো তার সেই উজ্জ্বলতা। বায়বীয় অবস্থা তরল অবস্থায় পরিবর্তিত হলো—পৃথিবী ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে লাগলো। ধীরে ধীরে ভারী পদার্থগুলি নীচে জমতে লাগলো, আর হাল্কা ধরণের সিলিকেট জাতীয় পদার্থগুলি উপরে ভাসতে লাগলো। যতই এই পৃথিবী ঠাণ্ডা হতে লাগলো ততই তার উপরিভাগ শক্ত হয়ে এলো। ধীরে ধীরে তার রূপ পরিবর্তিত হতে লাগলো। একদিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো বিরাট ঐ হিমালয়, আর একদিকে নন্দনকানন তার শোভা বাড়িয়ে তুললো। বিচিত্র জীব এই পৃথিবীতে আশ্রয় নিল, আর সর্বশেষে আশ্রয় নিল মানুষ, যারা আজ পৃথিবীর বুকের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে।

কিন্তু এই পৃথিবীর ইতিহাস বিরাট—বিচিত্র এর কাহিনী। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে, আজ থেকে প্রায় দু'শ কোটি বছর আগে পৃথিবীর বুকে কঠিন আবরণ পড়েছে। ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, পৃথিবী-পৃষ্ঠে অবস্থিত তেজষ্ক্রিয় পদার্থসমূহের কার্যপ্রণালী থেকেই উক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। পৃথিবী-পৃষ্ঠে ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম নামে দু'রকমের তেজষ্ক্রিয় পদার্থের অবস্থিতির কথা জানা গেছে। তেজষ্ক্রিয় পদার্থ বলতে এই বুঝায় যে, এসব পদার্থ থেকে আপনা থেকেই তেজ, অর্থাৎ শক্তি নির্গত হয়। এই শক্তির নির্গমন একটি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন এবং এর ফলে পদার্থসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থার শেষ পরিণতি হলো সীসায় পরিবর্তন, অর্থাৎ তেজষ্ক্রিয় পদার্থগুলি ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার পর সীসায় রূপান্তরিত হয়। অতএব পৃথিবী-পৃষ্ঠে অবস্থিত তেজষ্ক্রিয় পদার্থগুলির বর্তমান অবস্থা থেকে সেই নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে পিছিয়ে গেলে দেখা যায় যে, প্রায় দু'শ কোটি বছর (আনুমানিক) হলো পৃথিবীর আবরণ কঠিন হতে সুরু করেছে। ভূতত্ত্ববিদেরা বিভিন্ন উপত্যকা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে, দু'শ বছরের আগে

পৃথিবীতে কোন উপত্যকার সৃষ্টি হয় নি। ফিনল্যাণ্ডে একটি উপত্যকার সন্ধান পাওয়া গেছে যার বয়স আনুমানিক ১৮৫ কোটি বৎসর। এই হলো পৃথিবীর কঠিন অবস্থার বিবরণ। কিন্তু এর আগে পৃথিবীকে কোন অবস্থায় দেখা যায়?

সে হলো এক ভীষণ উত্তপ্ত অবস্থা। প্রচণ্ড তাপে পৃথিবীর দেহ তখন পুড়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর চতুর্দিক ঘিরে পরিব্যাপ্ত ছিল একটা ঘন বায়ুমণ্ডল। তাছাড়া জলীয় বাষ্প এবং বায়বীয় অবস্থায় অন্যান্য পদার্থসমূহের অস্তিত্বও সেখানে ছিল। কিন্তু এই উত্তপ্ত অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী ছিল না; কারণ পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় দ্রুত বিকিরণের ফলে পৃথিবী শীঘ্রই কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়।

ফরাসী বৈজ্ঞানিক বাফন-এর মতে, বিরাট এক ধূমকেতু জাতীয় পদার্থের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে সূর্য থেকে জন্ম নিয়েছিল আমাদের এই সৌর পরিবার। কিন্তু বাফন-এর এই মতবাদ সমর্থনযোগ্য নয়, কারণ তিনি ধূমকেতু বলতে যা বোঝেন তাতে ধূমকেতুর গঠনপ্রণালী অনুসারে এই ধরণের সংঘর্ষের কথা চিন্তা করা যায় না। ধূমকেতুর মধ্যে পদার্থের পরিমাণ খুবই কম। আমাদের পৃথিবীর তুলনায় সে অনেক ছোট। কাজেই সূর্যের সঙ্গে এই ধরণের একটি পদার্থের সংঘর্ষের ফলে সৌর পরিবার সৃষ্টি হওয়ার কথা মেনে নেওয়া খুবই শক্ত। হয়তো বাফন যা বলতে চেয়েছিলেন তা ধূমকেতু না হয়ে এমন কোন বস্তুপিণ্ড হবে, যার আয়তন ও শক্তি সূর্যের চেয়ে অনেক বেশী, আর এই সংঘর্ষের ফলেই সম্ভবতঃ নাক্ষত্রিক পদার্থসমূহের খানিকটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু একথাও ঠিক যে, সব পদার্থটাই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে সূর্যের চারদিকে ঘুরতে সক্ষম হয় নি—কিছুটা অংশ আন্তর্নাক্ষত্রিক এলাকার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।

বাফনের মৃত্যুর আট বছর পরে ফরাসী গণিতজ্ঞ লাপলাস নতুনভাবে পৃথিবীর জন্মবৃত্তান্ত শোনালেন। তিনি বললেন যে, কোনপ্রকার সংঘর্ষের ফলে এই সৌর পরিবারের সৃষ্টি হয় নি—এর সবটা আপনা থেকেই বিকশিত হয়েছে। শুনতে খুবই অদ্ভুত লাগে। কিন্তু তিনি এই মতবাদ প্রতিপন্ন করতে গিয়ে বলেছেন যে, ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে কনষ্টেলেশন ক্যাসিওপিয়ায় যে ধরণের বিস্ফোরণ ঘটেছিল, অনেকটা সেই রকমের একটা বিস্ফোরণের ফলে নক্ষত্রসমূহের কক্ষপথ থেকে বায়ুমণ্ডলের খানিকটা অংশ দূরে ছিটকে পড়ে। লাপলাস স্বীকার করেন না যে, সূর্যের সঙ্গে অন্য কোন এক বস্তুপিণ্ডের সংঘর্ষ ঘটেছিল। কাজেই ধরে নিতে হবে যে, সূর্য প্রথম থেকেই আবর্তন করছিল এবং তার এই ধর্ম, বিস্ফোরণের ফলে বায়ুমণ্ডলের বিচ্ছিন্ন অংশটুকুর মধ্যেও নিহিত ছিল। বিস্ফোরণের প্রথম শক্তিটুকু হারিয়ে এবং আন্তর্নাক্ষত্রিক এলাকায় তাপ বিকিরণের ফলে এই বিচ্ছিন্ন অংশটুকু ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হতে থাকে এবং ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়। বাফনের মতের বিরুদ্ধে গণিতজ্ঞ লাপলাসের প্রধান বক্তব্য হলো এই যে, সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর নাক্ষত্রিক পদার্থসমূহের অনেকাংশে দীর্ঘায়িত ডিম্বাকৃতি কক্ষে বিচরণ করা উচিত ছিল, কিন্তু আসলে তাদের পথ হলো বৃত্তাকার।

কোন পদার্থ যদি ঘুরতে ঘুরতে সঙ্কুচিত হয় তাহলে সেই পদার্থের কৌণিক গতি বৃদ্ধি পায়। লাপলাসের মতে, আমাদের সেই সূর্য যখন প্রথম থেকেই আবর্তন করছিল তখন ধরে নেওয়া যায় যে, সঙ্কোচনের ফলে তার কৌণিক গতিও বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব বহির্কেন্দ্রীয় শক্তির প্রকাশের ফলে বিস্তীর্ণ সৌরপথ থেকে খানিকটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। লাপলাস বলেছেন যে, এই বিচ্ছিন্ন অংশগুলি জমা হয়ে এক একটা গ্যাসীয় গোলকের সৃষ্টি করে' বৃত্তাকার পথে সূর্যের চারপাশে ঘুরতে থাকে। এই হলো লাপলাস বর্ণিত আমাদের সৌরজগৎ।

কিন্তু গণিতের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের কাছে লাপলাসের এই মতবাদ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারলো না। ঘূর্ণায়মান আদিম সূর্যের ক্রমিক সঙ্কোচনের ফলে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্যাসীয় বলয়ের কেন সৃষ্টি হলো—এর কোন সদুত্তর লাপলাসের এই সূত্রে নেই। তাঁর মতে এই গ্যাসীয় স্তর খুব ঘন, কিন্তু অনেকগুলি পাত্‌লা গ্যাসীয় স্তরের আবির্ভাব মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া এই প্রশ্ন সব সময়েই মনকে নাড়া দিতে থাকে যে, গ্যাসীয় বলয়গুলি কিভাবে একত্রিত হয়ে এক একটি গোলকের সৃষ্টি করলো?

সে আজ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের কথা। ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল শনিগ্রহের বলয় নিয়ে গবেষণা করবার পর এক তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেছেন যে, এই বলয়গুলি অস্থায়ী, কিন্তু তারা একত্রিত না হয়ে অনেকগুলি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়ে একটি বৃত্তাকার পথ পরিক্রমায় সমভাবে অংশগ্রহণ করে। তাঁর মতে, লাপলাস বৃহস্পতি গ্রহ সম্বন্ধে যে গ্যাসীয় বলয়ের সন্ধান পেয়েছিলেন তা পরবর্তী-কালে অনেকগুলি অংশে (প্রায় পঞ্চাশ) বিচ্ছিন্ন হয়ে বর্তমান বৃহস্পতি গ্রহের কক্ষপথে বিচরণ করবে এবং এই বিচ্ছিন্ন অংশগুলি কখনও একত্রিত হওয়ার সুযোগ পাবে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের মতে, লাপলাস বর্ণিত গ্যাসীয় বলয়গুলি অস্থায়ী এবং এরা একত্রে জড়ো না হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে একটি বৃত্তাকার পথে বিভক্ত হয়ে পড়বে।

এরপর এলেন ইংল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক জেমস্ জীনস্ এবং শিকাগোর টমাস চেম্বারলিন ও ফরেষ্ট মোলটন। এই বৈজ্ঞানিকগণ বাফন-এর সিদ্ধান্তকে সামনে রেখে বললেন যে, সূর্যের সঙ্গে কোনপ্রকার সংঘর্ষের ফলে পৃথিবীর সৃষ্টি হয় নি বটে, তবে আগন্তুক কোন একটি বস্তুপিণ্ডের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ফলে সূর্যে যে বিরাট ঢেউ-এর সৃষ্টি হয় তার ফলেই গ্রহসমূহের সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের মধ্যে পৃথিবী হলো একটি। এই আগন্তুক বস্তুপিণ্ডটি অনেকদূর দিয়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করবার সময় এই ধরণের ঘটনার সমাবেশ হয়। অতএব বাফনের সূত্রকে এই বলে মেনে নেওয়া হলো যে, আন্ত-র্নাক্ষত্রিক এলাকা থেকে কোন এক বৈদেশিকীর আবির্ভাবের ফলেই গ্রহ পরিবারের সৃষ্টি।

সূর্যে যে ধরণের ঢেউ-এর সৃষ্টি হয়েছিল তার উদাহরণ আমরা পৃথিবী-পৃষ্ঠে দেখতে পাই। সূর্য ও চন্দ্রের আকর্ষণের ফলে পৃথিবীর জলভাগের উপর যে পর্যায়ক্রমিক উত্থান-পতনের সমাবেশ ঘটে, তার ফলে পৃথিবীর কেন্দ্র অপেক্ষা পৃষ্ঠদেশ অধিকতর আকৃষ্ট হয় এবং পৃথিবী-পৃষ্ঠে এই আকর্ষণের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এর কারণ হলো এই যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি (যার ফলে এই ঢেউ এর সৃষ্টি হয়) দূরত্ব অনুসারে হ্রাস পায়। দূরত্ব যদি চারগুণ হয় তাহলে শক্তির পরিমাণ হবে দ্বিগুণ। অতএব পৃথিবী-পৃষ্ঠের যে অংশ এই আকর্ষণ শক্তির নিকটতম, সেই অংশে আকর্ষণ হবে প্রবলতম এবং ঠিক তার বিপরীত স্থানের আকর্ষণ হবে সবচেয়ে কম। এই আকর্ষণের তারতম্যের দরুণ আকর্ষিত বিকৃত বস্তুর একটা প্রসারণ ঘটে এবং প্রসারিত বস্তু ধীরে ধীরে দীর্ঘায়িত উপ-বৃত্তাকার ধারণ করে। ইংরেজিতে একে বলা হয় ইলংগেটেড ইলিপ্‌সয়েড।

প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর এই তরঙ্গবাদ সম্বন্ধে স্যার জেমস্ জীন্‌সের মত এমন নিখুঁত পরীক্ষাকার্য আর কেউ কখনও চালাতে সক্ষম হন নি। তিনিই প্রথম বলেন যে, আলোড়িত বস্তুর (এখানে আমাদের সূর্য) অভ্যন্তরস্থ পদার্থ-পরিমাণের বণ্টনের উপর এই ঢেউ-এর নিক্ষেপ প্রক্রিয়া নির্ভর করে। আমাদের সূর্যে সঙ্কোচনশীল গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায় এবং সূর্যের অভ্যন্তরে কেন্দ্রীয় ঘনত্ব বহির্ভাগের ঘনত্বের চেয়ে অনেক বেশী। সূর্যের গড়পড়তা ঘনত্বের প্রায় পঞ্চাশ ভাগ ঘনত্বই হলো এই কেন্দ্রের। জীন্‌সের মতে, সূর্যের উচ্চ ঘনীভবন

প্রক্রিয়াই এর পটপরিপর্তনের জন্যে দায়ী। আগন্তুক বস্তুপিণ্ডের প্রভাবে সূর্যের সম্মুখভাগে যে ঢেউ-এর দৃষ্টি হয় তার ফলে সেই অংশে কৌণিক স্ফীতি দেখা দেয়-এবং পরে এই অবস্থা থেকে গ্যাসীয় পদার্থ-সমূহ সূত্রাকারে আগন্তুক বস্তুপিণ্ডের দিকে ধাবিত হয়। জীন্‌স্ বলেন, এই গ্যাসীয় সূত্রটাই পরে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে যায়।

কিন্তু আগন্তুক বস্তুপিণ্ডটির প্রভাব কেবল সূর্যের উপরেই পরিলক্ষিত হবে অথচ সূর্যের কোন প্রভাব এর উপর আরোপিত হবে না—এই অবস্থাটা সোজাসুজি মেনে নেওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে এই বিদারণ ক্ষমতা নির্ভর করে দুটিরই বস্তু-পরিমাণের উপর এবং উভয়েই উভয়কে প্রভাবিত করে। কিন্তু যেহেতু কেবল সূর্যেরই আলোড়িত অংশ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল তখন ধরে নেওয়া যায় যে, আগন্তুক পদার্থটির বস্তু-পরিমাণ সূর্যাপেক্ষা অনেক বেশী; কারণ তা না হলে আগন্তুক বস্তুপিণ্ডের কিছুটা অংশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সংবাদ নিশ্চয়ই পাওয়া যেত। কিন্তু এই দুটি বস্তুর আপেক্ষিক গতি এত বেশী ছিল যে, সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন অংশগুলির আগন্তুক বস্তুর সঙ্গে আন্তর্নাক্ষত্রিক এলাকায় মিলিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। তবে উচ্চ গতিসম্পন্ন কয়েকটি অংশের এই সৌর পরিবার থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে চলে যাওয়া অসম্ভব নয়।

পৃথিবীর সৃষ্টি হলো বটে, কিন্তু এর অভ্যন্তর ভাগের অনেক কথাই আমাদের অজানা রইলো। আগেই বলা হয়েছে যে, সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর পৃথিবী ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠেছে, কারণ তার তাপমাত্রা হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগে এখনও অধিক তাপমাত্রার আভাস পাওয়া যায়।

পৃথিবী যখন প্রথম শীতল হতে সুরু করে তখন যে তাপমাত্রা বিদ্যমান ছিল তা হলো এখনকার তাপমাত্রার প্রায় ১০০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বেশী। কিন্তু ভূপৃষ্ঠ থেকে ভিতরের দিকে ৩০ কিলোমিটার দূরত্বে যে তাপমাত্রার আভাস পাওয়া যায় তা প্রায় তখনকার তাপমাত্রার ৮০০° কম। আবার ৪০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত স্থানের তাপমাত্রায় বিশেষ কোনরূপ পরিবর্তন দেখা যায় না; অর্থাৎ পৃথিবীর সেই অবস্থায় যে তাপমাত্রা ছিল তার আভাস এখনও সেখানে পাওয়া যায়। পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার অভ্যন্তরে প্রায় ১২০০°—১৮০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার আভাস পাওয়া গেছে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে যে গলিত লাভার বহির্গমন হয়, সেখানে এই ধরণের তাপমাত্রার কথা জানা যায়। অতএব পৃথিবীর প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার অভ্যন্তরে এখনও গলিত অবস্থা বিদ্যমান।

অনুসন্ধানের ফলে জান যায় যে, পৃথিবী কতক-গুলি স্তর নিয়ে গঠিত। ভারী পদার্থগুলি কেন্দ্রে অবস্থান করছে, আর অপেক্ষাকৃত হাল্কাধরণের পদার্থগুলি উপরে ভেসে রয়েছে। বৈজ্ঞানিকদের মতে, প্রধানতঃ তিনটি স্তর নিয়ে পৃথিবী গঠিত। প্রথমতঃ বাইরের স্তর হলো গ্র্যানিটের (জলের সঙ্গে তুলনা করলে এর গড়পড়তা ঘনত্ব দাঁড়ায় ২.৭)। প্রায় পঞ্চাশ থেকে একশ' কিলোমিটার অবধি এর বিস্তৃতি। এই গ্র্যানিট স্তরটি আবার হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত বেসাল্ট স্তরের উপর অবস্থান করে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে উত্থিত পদার্থসমূহের মধ্যে এই বেসাল্টের সন্ধান পাওয়া যায়। পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানের প্রায় অর্ধেকটা এই বেসাল্ট স্তর। এই স্তরটিকে অতিক্রম করে পাওয়া যায় গলিত লোহা ও অপরাপর ধাতুর সংমিশ্রণে গঠিত এক গলিত স্তর। এর ঘনত্ব খুবই বেশী। এই স্তরের অবস্থানের জন্যেই পৃথিবীর ঘনত্ব হচ্ছে ৫.৫-এর মত, অর্থাৎ উপরের স্তরের দ্বিগুণ পরিমাণ।

তাহলে পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথমভাগে দেখা যায় একটি গ্যাসীয় অবস্থা এবং পরের অধ্যায়ে গ্যাসীয় অবস্থার তরল অবস্থায় রূপায়ণ। তরল

অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার দরুণ বিভিন্ন অংশগুলি পরিচলন স্রোতের ফলে একস্থান থেকে অন্যস্থানে চালিত হয়। ঠিক এই সময়েই লোহার ন্যায় ভারী পদার্থগুলি কেন্দ্রে জমা হতে থাকে এবং বেসাল্ট ও গ্র্যানিটের ন্যায় হাল্কা ধরণের পদার্থগুলি উপরে ভেসে ওঠে। এই ভাবে এককেন্দ্রিক স্তরের আকারে (ইংরেজিতে একে বলা হয় কন্সেন্ট্রিক সেল) বর্তমান পৃথিবী রূপ পরিগ্রহ করে। এই পরিচলন স্রোতের যুগে পৃথিবী খুব দ্রুত ঠাণ্ডা হতে থাকে। কেন্দ্রোত্থিত উত্তপ্ত পদার্থগুলি পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে বিকিরণের ফলে ঠাণ্ডা হয় এবং পুনরায় কেন্দ্রে গিয়ে জমা হতে থাকে। এই ভাবে দ্রুত ঠাণ্ডা হওয়ার ফলে এই শিশু গ্রহটির ঘনত্ব বা ভিস্কোসিটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং পরিচলন স্রোত ধীরে ধীরে কমে আসে। পৃথিবী-পৃষ্ঠে যখন কঠিন আবরণ পড়তে সুরু করে তখন এই পরিচলন স্রোতটি একেবারেই কম; কারণ যে সব পদার্থ কেন্দ্র থেকে পৃথিবী-পৃষ্ঠে আসবার পর ঠাণ্ডা হয়ে যেত তাদের তাপমাত্রা পূরণ করবার ক্ষমতা এই স্রোত হারিয়ে ফেলবার ফলে পৃথিবী-পৃষ্ঠ কঠিনাকার ধারণ করেছে। পৃথিবী যতই শীতল হতে থাকে, কঠিন আবরণের গঠন ততই বৃদ্ধি পায়। জানা গেছে যে, পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে ৪০-৫০ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত এই কঠিন অবস্থা বিদ্যমান।

পৃথিবীর বিবর্তনের যুগে সূর্যের কিন্তু বিশেষ কোন পরিবর্তনই হয় নি। তবুও সব জিনিষেরই একটা পরিণতি বা শেষ আছে। সে হিসাবে সূর্যও একদিন তার রসদ ফুরিয়ে নিশ্চল হয়ে পড়বে। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নিশ্চল এবং নিস্তেজ হয়ে যাওয়ার আগে এমন একটা অবস্থার উদ্ভব হবে যখন সূর্যের ঔজ্জ্বল্য বর্তমানের চেয়ে প্রায় একশ' গুণ বেড়ে যাবে। কিন্তু পৃথিবীর অবস্থা তখন কি হবে? পৃথিবী-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা তখন জলের স্ফুটনাঙ্কে গিয়ে পৌঁছবে—সমুদ্রের জলরাশি বাষ্পীভূত হবে। জীবন বলতে পৃথিবীতে তখন আর কিছুই থাকবে না। কিন্তু সেজন্যে এখনই কারো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণ নেই।
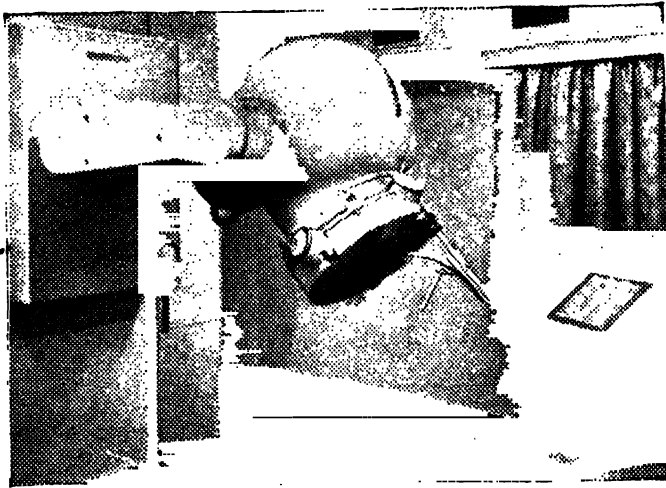
দূষিত রোগের চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট ব্যবহারের জন্য বৃটেনে নির্মিত টেলিথিরাপীর যান্ত্রিক ব্যবস্থা।

কয়লার জন্মকথা

শ্রীহিমাংশুকুমার গুহ

মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে কয়লার অবদান যে কতখানি তাহা আমরা এই কথা চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি যে, যখন হইতে মানুষ কয়লাকে বৃহৎ-শিল্পে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে প্রকৃত-পক্ষে তখন হইতেই শিল্পবিপ্লবের সুরু হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্তর্ধূর্ম পাতন-প্রক্রিয়ায় কয়লা হইতে প্রাপ্ত আলকাতরা হইতে উপজাত দ্রব্য হিসাবে যে কত প্রকারের ঔষধ, রাসায়নিক বস্তু এবং রঞ্জক পদার্থ পাওয়া যায় তাহা কাহারও অজানা নাই। আজ যদিও আমরা পারমাণবিক যুগের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছি, তথাপি আগামী বহু বৎসর পর্যন্ত মানুষের প্রয়োজনীয় শক্তির একটা বড় অংশ যে কয়লার দ্বারা পূরণ হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কয়লার উৎপত্তি যে উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতেই হইয়াছে তাহাতে আজ আর কোন সন্দেহ নাই। কয়লার স্তরে প্রাপ্ত প্রস্তরীভূত উদ্ভিদকাণ্ড* ও উদ্ভিদশাখা এবং পুরাতন যুগের গাছপালার নানা অংশের জীবাশ্ম প্রভৃতি এই কথার সত্যতা প্রমাণ করে। সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ হইল, অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট কয়লার মধ্যে উদ্ভিদের আভ্যন্তরীণ গঠন-প্রণালীর সুস্পষ্ট ছাপের অস্তিত্ব।

আধুনিক ভূতাত্ত্বিকদের মতে দুই রকম প্রণালীতে কয়লার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের একটি হইল In situ Theory এবং অপরটি Drift Theory। প্রথম মতবাদ অনুসারে আজ যেস্থানে আমরা কয়লার স্তর দেখিতেছি, সেস্থানেই বহুকাল-পূর্বে বিরাট জঙ্গলের অস্তিত্ব ছিল। পরে ঐ বনভূমি মাটির নীচে চাপা পড়িয়া যায় এবং তাহার উপরে বিভিন্ন প্রকার স্তরীভূত শিলা, যেমন—বেলেপাথর, শেল বা চুনাপাথর ইত্যাদির আবরণ পড়ে। উপরিস্থিত ভূস্তরের চাপে ক্রমশঃ ভূনিম্নে প্রোথিত হওয়ার ফলে তাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় ঐ সকল উদ্ভিজ্জ পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন হইতে থাকে। এই পরিবর্তনের ফলে উদ্ভিজ্জ পদার্থসমূহ পীট, লিগ্‌নাইট অবস্থা অতিক্রম করিয়া অবশেষে বিটুমিনাস বা পাথুরে কয়লায় পরিণত হইয়াছে। অবশ্য রাসায়নিক পরিবর্তনের ধারা এখানেই শেষ হয় না; অবস্থা অনুকূল হইলে বিটু-মিনাস অবস্থার পর কয়লা অ্যান্‌থ্রাসাইট অবস্থার মধ্য দিয়া সর্বশেষে গ্র্যাফাইটে (বিশুদ্ধ কার্বন) পরিণত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পীটকে ৬০০ অ্যাট্‌মোসফেরিক চাপে রাখিয়া একটি আবদ্ধ পাত্রে উত্তপ্ত করিলে কয়লার ন্যায় বস্তুতে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় মতবাদ অনুসারে, উদ্ভিজ্জ পদার্থসমূহ নিকটবর্তী বনভূমি বা দূরস্থান হইতে নদ-নদীদ্বারা পরিবাহিত হইয়া নদী-উপত্যকা, হ্রদ, জলাভূমি অথবা সমুদ্রোপকূলে সঞ্চিত হইবার পর রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে কয়লার সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রথমোক্ত মতবাদের স্বপক্ষে কতকগুলি যুক্তি প্রদর্শন করা যায়; যথা—

(১) এই প্রণালীতে সৃষ্ট কয়লাতে অজৈব পদার্থের শতকরা পরিমাণের স্বল্পতা ইহাই প্রমাণ

---

* উল্লেখযোগ্য যে, Dadoxylon জাতীয় বৃক্ষের এইরূপ একটি প্রস্তরীভূত উদ্ভিদকাণ্ডের জীবাশ্ম (fossil) রাণীগঞ্জ কয়লা খনিতে পাওয়া গিয়াছে। পাটনা মিউজিয়ামে এইরূপ একটি বৃহৎ বৃক্ষকাণ্ড সংরক্ষিত আছে।

করে যে, উদ্ভিজ্জ পদার্থসমূহ অধিকদূর স্থানান্তরিত হয় নাই। কেন না, বেশীদূর হইতে বাহিত হইয়া আসিলে কয়লার সহিত মিশ্রিত অবস্থায় অধিক পরিমাণ অজৈব পদার্থ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

(২) Under Clay বা Fire Clay—যাহাকে প্রাচীন মৃত্তিকা বলিয়া মনে করা হয় তাহার অধিকাংশই কয়লার স্তরের নীচে থাকে। এই জাতীয় মৃত্তিকার রাসায়নিক উপাদানে ক্ষার জাতীয় পদার্থ, ক্যালসিয়াম ও ও লৌহের সবিশেষ স্বল্পতায় মনে হয়, যে সকল উদ্ভিদ হইতে ঐস্থানে কয়লার জন্ম হইয়াছে সে সমস্ত উদ্ভিদাদির শিকড় উক্ত মৃত্তিকা হইতেই উল্লিখিত রাসায়নিক উপাদান শোষণ করিয়া আপন আপন অঙ্গ পুষ্ট করিয়াছিল। এমন কি, শিকড় মৃত্তিকার যে যে স্থান ভেদ করিয়াছিল তাহার চিহ্ন পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়।

(৩) কয়লা স্তরের বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান সেই সমস্ত স্থানেই সম্ভব, যে স্থানে সমপরিমাণ বিরাট বনভূমির অস্তিত্ব ছিল।

(৪) বৃক্ষাদির শাখাপ্রশাখাসমূহ যে অবস্থায় সজ্জিত রহিয়াছে দেখা যায়, সে অবস্থায় উহারা বাহিত হইয়া আসিয়াছে বলিয়া কল্পনা করা যায় না। আধুনিক যুগে বড় বড় পীট-স্তরগুলির সৃষ্টি একটি নির্দিষ্ট স্থানে হইয়াছে এবং উহারা অপেক্ষাকৃত বিশাল অঞ্চল জুড়িয়া আছে। ঐগুলি যদি কয়লায় রূপান্তরিত হয় তবে আকৃতি, প্রকৃতি ও বিশুদ্ধতার দিক দিয়া বহু কয়লা স্তরের সহিত তুলনীয়।

(৫) উদ্ভিদের ভগ্ন অংশসমূহ যদি উন্মুক্ত জলাশয়ের তলদেশে বহুল পরিমাণে সঞ্চিত হয় তবে সহজেই জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

বৃটেন, ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ কয়লা-স্তর পরিবাহিত উদ্ভিজ্জ পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট নহে, ইহাই আজ সর্বজন স্বীকৃত অভিমত। উপরন্তু বৃক্ষাদি যে স্থানে জন্মিয়া বর্ধিত হইয়াছিল সে স্থানেই কয়লায় রূপান্তরের বিভিন্ন ধারার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াছে। কয়লা স্তরগুলির বিরাট বিস্তৃতি, ফায়ার ক্লের সহিত অবস্থান, উহাদের সমতা, অজৈব পদার্থের স্বল্পতা এবং জলচর জীবের দেহাবশেষের বিরলতা ইত্যাদি Drift Theory-র বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কয়লা-স্তরগুলি নিম্নভূমিস্থিত বিশাল বনভূমিরই পরিবর্তিত রূপ। বর্তমান যুগে এইরূপ বহুবিস্তৃত জঙ্গলময় জলাভূমির অস্তিত্ব নাই; কিন্তু উদাহরণস্বরূপ ভার্জিনিয়ার Great Dismal Swamp যাহা অ্যামাজন নদীর বনাঞ্চলের ন্যায় বিস্তৃত এবং গঙ্গার বদ্বীপের মত একটি ছবি আমরা কল্পনা করিতে পারি। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, এক ফুট কয়লা-স্তরের জন্য অন্ততঃ ১৫ ফুট পীট সঞ্চিত হওয়া আবশ্যক অথবা ৪ ফুট সীমের জন্য ৫০ হইতে ৬০ ফুট পুরু জঙ্গলের স্তরে স্তরে সজ্জিত হওয়া প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের কয়লা-স্তরসমূহ সাধারণতঃ নদীবাহিত হইয়া হ্রদ বা কোন স্থির জলাশয় অথবা অনুকূল কোন স্থানে সঞ্চিত উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে সৃষ্ট। এই সমস্ত কয়লা-স্তরের সহিত বর্তমান পলিমাটির নদীবাহিত হওয়ার বহু প্রমাণ আছে। তাহা ছাড়া ইহার মধ্যে স্থলচর জীবের জীবাশ্মের অস্তিত্ব এই যুক্তি সপ্রমাণ করে। ভারতের কয়লায় অতিরিক্ত অজৈব পদার্থের অস্তিত্বও উহাদের Drift Theory অনুযায়ী উৎপত্তির কথা প্রমাণ করে।

কয়লার রাসায়নিক গুণাবলী যে শুধু, যে সকল গাছপালা হইতে উহার উৎপত্তি হইয়াছে তাহাদের উপাদানের উপরই নির্ভর করে তাহা নহে, ঐ সমস্ত উদ্ভিদাদি কি রকম পারিপার্শ্বিক অবস্থায় ভূগর্ভে সঞ্চিত হইয়াছিল তাহার উপরও নির্ভরশীল।

ষ্টোপ্‌স্‌ ও হুইলারের মতে যে সমস্ত উপায়ে কয়লা সৃজনকারী উদ্ভিদাবশেষসমূহ ভূগর্ভে সঞ্চিত হইয়াছে তাহার সারাংশ দেওয়া গেল—

(ক)

সমুদ্রগর্ভে

একস্থান হইতে স্থানান্তরে স্থলভাগের যে সমস্ত

পদার্থ বহুদূর বাহিত হইয়া মণিক ও প্রস্তরের সীমায় বা নাগালের বাহিরে জলমগ্ন হইয়া থিতাইয়া যায় তাহাদের শ্রেণীবিভাগ—

(১) বৃক্ষকাণ্ড, বৃক্ষশাখা ও বৃহৎ শাখা, যেগুলি বহুল পরিমাণে সঞ্চিত হওয়া সম্ভব।

(২) বহুপ্রকার উদ্ভিদের ভাসমান দ্বীপাবলী—ঘনসন্নিবিষ্ট হওয়াতে জড়ানো অবস্থায়—সাধারণতঃ স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ।

(২) সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে শ্যাওলাজাতীয় পদার্থ।

(খ)

লবণাক্ত জলে।

(১) স্থাবর পদার্থসমূহ, সমুদ্র উপকূলের নিকট বনাঞ্চলের পতিত পদার্থসমূহের দ্বারা, অথবা সুন্দরবনের মত ম্যাংগ্রোভ জাতীয় বৃক্ষের জলাজমিতে।

(২) আংশিক স্থানীয় ও আংশিকভাবে স্বল্প দূরবর্তী স্থান হইতে আনীত হইয়া জলাভূমিতে সঞ্চিত।

(৩) একই স্থানে নীচু জলাভূমিতে অথবা জলাভূমির উদ্ভিদাদি।

(৪) খ ১, ২, ৩ এবং ক ১ ও ২ যে কোন অনুপাতে মিশ্রিত অবস্থায়।

(গ)

(১) অচঞ্চল হ্রদে।

(ক) নিকটবর্তী বনভূমি হইতে আনীত উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষ হইতে।

(খ) বিশুদ্ধ প্ল্যাঙ্কটন জাতীয় অথবা হ্রদের আণুবীক্ষণিক জীবন হইতে।

(গ) বীজরেণু, ফুলরেণু এবং উচ্চশ্রেণীর বৃক্ষের অতিসূক্ষ্ম ধ্বংসাবশেষের (খ) এর সহিত মিশ্রিত অবস্থায়।

(ঘ) রীড জাতীয় বৃক্ষ একই স্থানে বর্ধিত ও সঞ্চিত হওয়ার ফলে,

(ঙ) ক, খ, গ ওতপ্রোতভাবে ও যে কোন অনুপাতে মিশ্রিত হইয়া স্তরবিন্যস্ত অথবা 'ঘ'-এর সহিত জলরেখার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্তরীভূত অবস্থায়।

(২) মোহনায়, নদীর বাঁকে ও বদ্বীপে—

(ক) বাহিত পদার্থ যাহা বহুদূর হইতে আনীত হইয়াছে; যেমন—নানাপ্রকার বৃক্ষাদি ও বৃক্ষশাখা।

(খ) পার্শ্ববর্তী স্থান হইতে আনীত উদ্ভিজ্জ পদার্থ ও তজ্জন্য কোমল পত্রাদি ইহার অন্তর্ভূক্ত (বৃক্ষাদির শাখাসমূহও বর্তমান)।

(গ) উদ্ভিদের ভাসমান দ্বীপাবলী।

(ঘ) জলাভূমিতে উদ্ভিদাদি একই স্থানে বর্ধিত ও সঞ্চিত।

(ঙ) ক, খ, গ ও ঘ সমস্ত প্রকারের মিশ্রিত অবস্থায়।

(৩) বিরাট অঞ্চল জুড়িয়া হ্রদগুলি ঝিলের মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্নভাবে থাকিয়া যে জলাভূমি গঠন করিয়াছে তাহাতে স্থাবর ও স্থানান্তরিত পরস্পর মিশ্রিত অবস্থায়।

(ঘ)

শুষ্কভূমিতে

(১) উচ্চ জলাশয়ে বহুপ্রকারের শ্যাওলা-জাতীয় উদ্ভিদ।

(২) মুরল্যাণ্ড পীট বনজ উদ্ভিদাদির একত্রে মিশ্রণ বা পরিবর্তীভাবে মিশ্রিত অবস্থা

(৩) Swamp peat—এইগুলি গ (৩) এর সহিত মিলিত অবস্থায়।

(৪) বনভূমির পাদদেশে সঞ্চয়।

কোন্ কোন্ জাতীয় উদ্ভিদ হইতে কয়লার জন্ম হয়, সে সম্বন্ধে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। কয়লার মধ্যে লেপিডোডেনড্রন, ক্যালামাইট্স্, সিজিল্যারিয়া ইত্যাদি প্রাচীন যুগের বৃক্ষাদির জীবাশ্ম বা fossil পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে গণ্ডোয়ানা যুগে সৃষ্ট কয়লার মধ্যে যে সমস্ত ফসিল পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে গ্লোসোপটেরিস জাতীয় বৃক্ষই প্রধান।

প্রধানতঃ ভূতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কয়লার সম্বন্ধে এই জ্ঞান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও একদেশদর্শী। পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে জীবতত্ত্বজ্ঞ, রাসায়নিক, জ্বালানী বিশেষজ্ঞদের সমবেত প্রচেষ্টা আবশ্যক। বিশেষতঃ বৃক্ষাদি সঞ্চিত হওয়ার পর কি কি রাসায়নিক পরিবর্তনের ধারায় পরিবর্তিত হইয়া বিটুমিনাস কয়লায় রূপান্তরিত হইয়াছে তাহা আলোচনা না করিলে এই বিষয়ের জ্ঞান একরূপ অসম্পূর্ণই থাকিয়া যায়। তাছাড়া কয়লা-স্তরের ভূতাত্ত্বিক কাল অনুসারে রাসায়নিক পরিবর্তনের পর্যায় এবং Hilt সূত্র অনুসারে (ইহা সর্বপ্রকারে সত্য নহে) পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে যত নিম্নে যাওয়া যায় ততই কয়লার 'rank' বৃদ্ধি পায়—এ সমস্ত বিষয়ও বিবেচ্য।

বনস্পতি ঘৃত

শ্রীমতী চিত্রা পালিত

ঘৃত বলতে আমরা দুগ্ধজাত জান্তব স্নেহ-পদার্থ ই বুঝি। প্রধানতঃ গরু ও মহিষের দুগ্ধের ফ্যাট বা স্নেহজাতীয় উপাদান কৌশলে পৃথক করে আমরা ঘৃত পাই। এক কথায়, পদার্থ টা ঘনীভূত জান্তব চবি বা তৈল ব্যতীত আর কিছুই নয়। আবহমান কাল থেকেই স্বাস্থ্য ও পুষ্টির পক্ষে ঘৃত মানুষের একটা অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ বলে স্বীকৃত। কিন্তু ইদানীং বিশুদ্ধ ঘৃত অতি দুর্লভ ও দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্যাদির অভাব হেতু অপুষ্ট গো-মহিষের দুগ্ধদানের ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে অনেক দেশেই, বিশেষতঃ ভারতে সম্প্রতি প্রয়োজনানুরূপ দুধের একান্ত অভাব ঘটেছে। বিগত মহাযুদ্ধের পর থেকে বিভিন্ন কারণে এদেশে তাই বিশুদ্ধ ঘৃতের অভাব চরমে উঠেছে এবং ধীরে ধীরে বনস্পতি ঘৃতে বাজার ছেয়ে গেছে। বিভিন্ন বনস্পতি ঘৃত বা ঘনীভূত উদ্ভিজ্জ তৈলের বিরাট শিল্প গড়ে উঠেছে। প্রকৃত ঘৃতপক্ক খাদ্য এখন প্রায় দুর্লভ; সব রকম ভোজ্যসামগ্রী আজ প্রায় সর্বত্রই দালদা জাতীয় উদ্ভিজ্জ ঘৃতে প্রস্তুত হচ্ছে। আমরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সকলেই এই বস্তু অল্প-বিস্তর খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করছি।

বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ ঘৃতের সঙ্গে এ যুগে পরিচয় নেই, এমন লোক বস্তুতঃ বিরল। কিন্তু বস্তুটা কি, এর প্রকৃত স্বরূপ ও উপকারিতা বা অপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা অনেকেরই পরিষ্কার নয়। প্রকৃত, অর্থাৎ জান্তব ঘৃতের সঙ্গে—কি স্বাদে, কি উপকারিতায় বনস্পতি ঘৃত সর্বাংশে সমকক্ষ নয়, একথা সত্য। কিন্তু পদার্থটা যে অপকারী বা অখাদ্য বলে অনেকের ধারণা তা কতটা যুক্তিযুক্ত, সে কথাই আমরা এ প্রবন্ধে আলোচনা করবো। পদার্থটা যখন আমাদের নিত্যব্যবহার্য খাদ্যের পর্যায়ে এসে পড়েছে এবং ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এটা উদরস্থ করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি, তখন এর রাসায়নিক স্বরূপ ও খাদ্যমূল্য সম্পর্কে জানা দরকার। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মুখেও শুনা যায়—দালদা ঘৃত স্বাস্থ্যের পক্ষে অতীব অনিষ্টকর; এর কোন খাদ্যমূল্য তো নেই-ই, বরং হজমের গোলযোগ ঘটায়। খাদ্যবস্তু সম্পর্কে এরূপ একটা আতঙ্কের ভাব থাকা উচিত নয়। যদি প্রকৃতপক্ষেই বনস্পতি ঘৃত স্বাস্থ্যহানি ঘটায় তাহলে দেশব্যাপী সকলের পক্ষেই এ বস্তু পরিত্যাজ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সরকার বা খাদ্য-বিজ্ঞানীরা তো একথা বলেন না! যাহোক, কোন পদার্থের স্বরূপ ও গুণাগুণ

বিচার করে তার সম্পর্কে একটা মৌলিক ধারণা থাকা সকলের পক্ষেই প্রয়োজন। প্রকৃত তথ্য না জেনে এ যুগে অপরিহার্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় এরূপ একটা পদার্থ সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করা বরং নানা কারণে অনিষ্টকর হতে পারে।

রাসায়নিক বিশ্লেষণে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, জান্তব চর্বি ও উদ্ভিজ্জ তৈল উভয়েই মূলতঃ এক জাতীয় পদার্থ—গ্লিসারিনের সঙ্গে ষ্টিয়ারিক, পামিটিক ও অলেইক নামক জৈব অ্যাসিডের রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ। ষ্টিয়ারিক অ্যাসিড ($C_{17}H_{35}.COOH$) ও পামিটিক অ্যাসিড ($C_{15}H_{31}.COOH$) হলো কঠিন পদার্থ। এরা গ্লিসারিনের সঙ্গে রাসায়নিক মিলনে কঠিন চর্বি বা ফ্যাট সৃষ্টি করে। এদের পারমাণবিক গঠনে কার্বন পরমাণুর সঙ্গে সর্বোচ্চ সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু সংবদ্ধ থাকে। তাই এদের সম্পৃক্ত অ্যাসিড বলা হয়। পক্ষান্তরে অলেইক অ্যাসিড ($C_{17}H_{33}.COOH$) হলো একটা অসম্পৃক্ত তরল পদার্থ এবং এর গ্লিসারিন যৌগিকও তাই তরল পদার্থ, তৈল পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। জান্তব ঘনীভূত চবি বা ফ্যাট এবং উদ্ভিজ্জ তৈলের রাসায়নিক গঠন তাহলে দেখা গেল একই জাতীয়, মূলগত বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। কেবল উদ্ভিজ্জ তৈলই নয়—তিমি, শুশুক প্রভৃতি মৎস্যজাতীয় জলজ প্রাণীর তৈলও মূলতঃ তরল গ্লিসারিন-অলিয়েট মাত্র। এক কথায় বলা যায়, বিভিন্ন জান্তব ও উদ্ভিজ্জ তৈল সবই অসম্পৃক্ত তরল অলেইক অ্যাসিড ও গ্লিসারিনের যৌগিক রূপ; আর জান্তব ঘনীভূত চবি বা ফ্যাট হলো সম্পৃক্ত কঠিন ষ্টিয়ারিক বা পামিটিক অ্যাসিডের গ্লিসারিন যৌগিক। এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ হলো হাইড্রোজেনের পরিমাণে। তৈলের রাসায়নিক গঠনে যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু সংবদ্ধ করে দেওয়া যায় তাহলে অসম্পৃক্ত তৈল সম্পৃক্ত হয়ে ঘনীভূত ফ্যাট-এ রূপান্তরিত হবে। এই যে তৈলে হাইড্রোজেন সংবদ্ধকরণ, তাকেই বলে 'হাইড্রোজেনেসন অব অয়েল'। এই হলো আমাদের দালদা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ ঘৃতের মূলগত প্রস্তুতপ্রণালী।

এই অভিনব প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হওয়ার পিছনে একটা প্রয়োজনগত পটভূমিকা আছে, যার উল্লেখ করা এখানে অবান্তর হবে না। আমরা জানি, বিভিন্ন চবি ও তৈল প্রধানতঃ দু-ভাবে ব্যবহৃত হয়;—প্রথমতঃ, দেহের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির পক্ষে প্রয়োজনীয় কার্বনঘটিত জৈব পদার্থ হিসাবে খাদ্যরূপে এবং দ্বিতীয়তঃ, সাবান শিল্পে।

খাদ্য হিসাবে দুধের ফ্যাট বা স্নেহ উপাদান অধিকাংশ দেশে প্রধানতঃ মাখনের আকারেই গৃহীত হয়ে থাকে। উত্তাপে মাখনের জলীয় অংশ দূরীভূত করে ঘৃত তৈরী হয়। পাশ্চাত্য দেশে ঘৃতের চেয়ে মাখনের ব্যবহারই বেশী। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ঐ সব দেশে খাঁটি মাখনের দুর্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতার ফলে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয় এবং এর একটা বিকল্প পদার্থ প্রস্তুত করবার প্রয়োজন তীব্র হয়ে ওঠে। এর ফলে ফরাসী দেশে কৃত্রিম মাখন বা মার্গারিন তৈরীর প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হয়। মাখনের পরিবর্তে এই মার্গারিন মাখন পাশ্চাত্য দেশসমূহে এখন প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে এই শিল্প বিভিন্ন দেশে বিরাট আকারে গড়ে ওঠে এবং মাখনের ন্যায় একটা প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তুর বিকল্প হিসাবে এই কৃত্রিম পদার্থটার চাহিদা বেড়ে যায়। স্বাস্থ্যের পক্ষে ঠিক মাখনের ন্যায় না হলেও অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন বলে গৃহীত হয়েছে এবং খাদ্য-বিজ্ঞানীদের মতে, মার্গারিন কোন রূপেই অহিতকর নয় বলে স্বীকৃত।

মার্গারিন তৈরীর প্রক্রিয়াটা এখন মোটামুটি-ভাবে আলোচনা করা যাক। প্রথমতঃ গরু, মহিষ, শূকর প্রভৃতির কঠিন চবি উত্তাপে গালিয়ে ছেঁকে পরিষ্কার করা হয়। তারপর তাতে সয়াবিন,

নারিকেল, তুলাবীজ প্রভৃতির উদ্ভিজ্জ তৈল ও কিছু দুধ মিশিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে মথিত করা হয়। দুধ মেশান হয় পদার্থটাকে মাখনের মত নরম ও রুচিকর গন্ধযুক্ত করবার জন্যে। দুধের সঙ্গে সংমিশ্রিত একপ্রকার হিতকর জীবাণুর প্রভাবে উৎপন্ন পদার্থে ক্রমে যথেষ্ট পরিমাণে ল্যাকৃটিক অ্যাসিড সৃষ্টি হয় এবং উপাদেয় হয়ে ওঠে। দেহের প্রয়োজনীয় তাপশক্তি উৎপাদনের পক্ষে এই মার্গারিন যদিও মাখনের মতই কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে, তথাপি এতে স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় সূক্ষ্ম খাদ্য-উপাদান স্বরূপ বিভিন্ন ভিটামিনের অভাব থাকে। এজন্যে টাট্‌কা মাছের তেল থেকে প্রাপ্ত বা কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষিত বিভিন্ন শ্রেণীর ভিটামিন যথোপযুক্ত পরিমাণে ঐ কৃত্রিম মাখন বা মার্গারিনে মিশ্রিত করা হয়। এভাবে প্রস্তুত এই মার্গারিন মাখন প্রকৃত মাখনের ন্যায় হিতকর খাদ্য হিসাবে পাশ্চাত্যের সর্বত্র বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে।

কৃত্রিম মার্গারিন মাখনের মুখ্য উপাদান হলো জান্তব চর্বি। সুতরাং এই শিল্পের বহুল প্রসারের ফলে আর একটা অসুবিধা দেখা দিল। সভ্যসমাজে সাবানের প্রয়োজন ও চাহিদাও প্রচুর। এই সাবান তৈরীর জন্যে জান্তব চর্বি একটা প্রয়োজনীয় উপাদান। মার্গারিন শিল্পের অত্যধিক প্রসারের ফলে জান্তব চর্বি দুর্মূল্য হয়ে ওঠে এবং সাবান শিল্প গুরুতরভাবে ব্যাহত হতে থাকে। এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে আবার গবেষণা সুরু হয়। সাবানে কোন খাদ্যোপযোগী তৈল ব্যবহার করা জাতীয় স্বার্থের অনুকূল নয়; আবার উৎকৃষ্ট সাবানে দুর্গন্ধযুক্ত অখাদ্য তৈল ব্যবহার করাও চলে না। এজন্যে যে কোন উদ্ভিজ্জ তৈলকে গন্ধহীন করে জান্তব চর্বির মত ঘনীভূত করবার একটা উপায় উদ্ভাবনের প্রয়োজন হলো। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, চর্বি ও তৈলের রাসায়নিক প্রভেদ মাত্র হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যায়। কাজেই রাসায়নিকের নিকট এই রূপান্তর সাধন তেমন কঠিন বলে প্রথমতঃ মনে হয় নি। তরল তৈল, অর্থাৎ গ্লিসারিন অলিয়েটের আণবিক গঠনে যদি কোন উপায়ে উপযুক্ত সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু সংবদ্ধ করা যায় তাহলে তা নিশ্চয় গ্লিসারিন ষ্টিয়ারেটে রূপান্তরিত হবে এবং তরল তেল জান্তব চর্বির মত ঘনীভূত হয়ে যাবে। রাসায়নিক হিসাবে যুক্তিটা অভ্রান্ত। সুতরাং নানাভাবে এর চেষ্টা চলতে লাগলো। অনেক রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে তেলের এরূপ আকাঙ্খিত রূপান্তর সাধন সম্ভব হলো সত্য, কিন্তু সে সব জটিল প্রক্রিয়া গবেষণাগারের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ রইলো—শিল্প হিসাবে অধিক পরিমাণে এরূপ কৃত্রিম গ্লিসারিন ষ্টিয়ারেট বা ঘনীভূত তৈল উৎপাদন করতে এই প্রক্রিয়া কার্যোপযোগী হলো না।

বহুদিন পরে বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে উদ্ভিজ্জ তৈলকে জান্তব চর্বি বা ফ্যাটের অনুরূপ ঘনীভূত করবার সহজ প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্যে ফরাসী বিজ্ঞানী পল স্যাবাটিয়ার ও ব্যাপ্‌টিষ্ট সেণ্ডারেন্স স্মরণীয় কীর্তি অর্জন করেছেন। প্রক্রিয়াটা একটা অনুঘটক বা ক্যাটালিষ্টের অভাবনীয় কার্যকারিতার ফলে সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন পরীক্ষার পরে সহসা দেখা গেল, ধাতব নিকেলের অতি সূক্ষ্ম কণিকাস্তরের সান্নিধ্যে যাবতীয় তৈল প্রয়োজনানুরূপ হাইড্রোজেন গ্যাস আত্মস্থ করে ঘনীভূত হয়ে ওঠে, অর্থাৎ তরল গ্লিসারিন অলিয়েট ঘনীভূত গ্লিসারিন ষ্টিয়ারেটে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই রূপান্তরে নিকেলের কিছুমাত্র বস্তুগত সংযোগ ঘটে না; কেবল মাত্র এর সান্নিধ্য বা সংস্পর্শেই তৈলের অণুর অভ্যন্তরস্থ পরমাণু বিন্যাসে হাইড্রোজেনের পরমাণু সংবদ্ধ হয়ে তৈলের রাসায়নিক রূপান্তর ক্রিয়া দ্রুত সংঘটিত হয়। তৈলে এভাবে হাইড্রোজেন সংবদ্ধকরণ প্রক্রিয়ায় তৈল যে কেবল ঘনীভূত হয় তাই নয়, পরন্তু বিভিন্ন তৈলের স্বাভাবিক গন্ধও সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়। এভাবে তুলাবীজ, তিসি, রেড়ি প্রভৃতির অখাদ্য ও দুর্গন্ধযুক্ত উদ্ভিজ্জ তৈল-

গুলি গন্ধহীন ও ঘনীভূত হয়ে যায়। এরূপ ঘনীভূত উদ্ভিজ্জ তৈল বা কৃত্রিম ফ্যাট রাসায়নিক হিসাবে জান্তব স্নেহ পদার্থের বিকল্প রূপ এবং দালদা জাতীয় উদ্ভিজ্জ ঘৃত নামে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

খাদ্য হিসাবে যে সব উদ্ভিজ্জ ঘৃত আমরা ব্যবহার করি তা অবশ্য নারিকেল, চিনাবাদাম, সয়াবিন প্রভৃতির বিভিন্ন খাদ্যোপযোগী তৈল ঘনীভূত করেই তৈরী হয়ে থাকে। কিন্তু অনেকে মনে করেন, ব্যবসায় ক্ষেত্রে এই সততা সর্বদা রক্ষিত হয় না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অল্পমূল্যের অখাদ্য তৈল ঘনীভূত করেই বিভিন্ন বনস্পতি ঘৃত প্রস্তুত হয় এবং তা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর। বিজ্ঞানের আলোকে এই যুক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা যাক। উদ্ভিজ্জ তৈল মাত্রেই রয়েছে গ্লিসারিন অলিয়েট নামক রাসানিক যৌগিক পদার্থ। হাইড্রোজেনেসন প্রক্রিয়ায় ঐ অলিয়েট রূপান্তরিত হয় ষ্টিয়ারেটে, যা জান্তব স্নেহ পদার্থে বর্তমান। উভয়েই আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। এরূপ মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে রাসায়নিক উপায়ে ইদানীং অনেক নতুন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং তা নানাভাবে মানুষের প্রয়োজন সিদ্ধ করছে। কোন বস্তু স্বভাবসৃষ্ট না হলেই আমরা তাকে কৃত্রিম বলি; কিন্তু মৌলিক পার্থক্য যদি না থাকে, রাসায়নিক বিশ্লেষণে সর্বাংশে একই উপাদানগত সাদৃশ্য যদি থাকে, তাহলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে কৃত্রিম ও স্বভাবজাত বস্তুর প্রভেদ থাকে না। তিসি, রেড়ি প্রভৃতির তৈলে বিভিন্ন উদ্বায়ী পদার্থের স্বাভাবিক সংমিশ্রণ হেতু বিজাতীয় গন্ধ ও স্বাদের সৃষ্টি হয় এবং এজন্যেই মানুষের অরুচিকর অখাদ্য বলে সেগুলি পরিত্যক্ত হয়ে থাকে। হাইড্রোজেনেসন প্রক্রিয়ায় এসব উদ্বায়ী পদার্থ বিদূরিত হয়ে উদ্ভিজ্জ তৈলের মূলগত স্বকীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। রাসায়নিক যুক্তিতে সব রকম উদ্ভিজ্জ তৈলের মৌলিক উপাদানগত গঠন তো একই।

ঘৃত, তৈল প্রভৃতি স্নেহ জাতীয় পদার্থের খাদ্যগুণ হলো তাদের তাপ উৎপাদন শক্তির উপর নির্ভরশীল। দেহে যথোপযুক্ত পরিমাণে তাপশক্তি উৎপাদনে ঘনীভূত উদ্ভিজ্জ ফ্যাটও সক্ষম। এর 'ক্যালোরিফিক ভ্যালু' বা খাদ্য হিসাবে তাপোৎপাদন শক্তি স্বাভাবিক তেল বা চর্বির চেয়ে তেমন কিছু কম নয় বলেই প্রমাণিত হয়েছে। তাহলে দেখা গেল, ঘনীভূত উদ্ভিজ্জ তৈল বা কৃত্রিম ফ্যাট রাসায়নিক হিসাবে জান্তব স্বাভাবিক ফ্যাটেরই অনুরূপ এবং এর তাপ উৎপাদনের ক্ষমতাও কম নয়। সুতরাং একে খাদ্য হিসাবে অনিষ্টকর মনে করবার বিশেষ কোন যুক্তি দেখা যায় না। তবে হাইড্রোজেনেসন প্রক্রিয়ার ফলেই হোক বা বিভিন্ন পরিশোধন ব্যবস্থার জন্যেই হোক, বনস্পতি ঘৃতে ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। দেহের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির পক্ষে বিভিন্ন খাদ্যপ্রাণের উপযোগিতা অসাধারণ। এজন্যে বিভিন্ন বনস্পতি ঘৃতে উপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োজনীয় ভিটামিনগুলি সংমিশ্রিত করা একান্ত আবশ্যক। আজকাল এ ব্যবস্থাও অবলম্বিত হচ্ছে। মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভিটামিন-এ ও ভিটামিন-ডি সমধিক প্রয়োজন এবং এ দুটা বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ ঘৃতে প্রয়োজনানুরূপ মিশ্রিত করা হয়ে থাকে। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বনস্পতি ঘৃতের আধারের গায়ে আজকাল বিভিন্ন ভিটামিন সংযোগের কথা ঘোষণা করা হয়। স্বভাবজাত বিভিন্ন খাদ্যবস্তুতে বিভিন্ন ভিটামিন অতি সামান্য পরিমাণে বর্তমান। জটিল জৈব ক্রিয়ার ফলে স্বাভাবিক উপায়ে এগুলি উৎপন্ন হয়। ভিটামিনগুলি মূলতঃ বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ, যা কৃত্রিম উপায়েও সংশ্লেষিত করা সম্ভব হয়েছে। স্বভাবজ বা সংশ্লেষিত যে কোন উপায়ে প্রাপ্ত ভিটামিন সংযোগেই পদার্থের খাদ্যমূল্য অব্যাহত থাকে।

উদ্ভিজ্জ ঘৃতের উপাদানগত গঠন ও গুণাগুণ সম্পর্কে মোটামুটিভাবে যতটা আলোচনা করা

হলো তাতে বস্তুটা যে খাদ্য হিসাবে বিশুদ্ধ জান্তব ঘৃতের তুল্য গুণান্বিত—এ কথা আমাদের প্রতিপাদ্য নয়। আমরা কেবল উদ্ভিজ্জ ঘৃতের রাসায়নিক স্বরূপ বিশ্লেষণ করে এর অপকারিতা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করতে চেষ্টা করেছি মাত্র। আমরা দেখেছি, এর মৌলিক গঠনে এমন কোন উপাদান নেই যা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুপযোগী—স্নেহ জাতীয় পদার্থের স্বাভাবিক ধর্ম হিসাবে দেহের তাপ উৎপাদনের ক্ষমতাও এর আছে—অরুচি বা অস্বাস্থ্যকর কোন স্বাদ বা গন্ধও নেই। কাজেই বিশুদ্ধ উদ্ভিজ্জ ঘৃতের অপকারিতা সম্বন্ধে অভিযোগ তেমন যুক্তিসহ নয়। যে কোন উদ্ভিজ্জ তৈল সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিশোধিত করে হাইড্রোজেনেসন প্রক্রিয়ায় ঘনীভূত করলে পূর্বোল্লিখিত যে উপাদানগত রূপান্তর ঘটে তা স্বাস্থ্যহানিকর হতে পারে না। তবে এতে ভিটামিন সংমিশ্রণ একান্ত আবশ্যক, সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে।

কোন কোন বিজ্ঞানীর মুখেও শুনা যায়, দালদা ঘৃতে ব্যবসায়ীরা অখাদ্য খনিজ তৈল, অর্থাৎ মিনারেল অয়েল মিশ্রিত করে এবং তার ফলে এর অনিষ্টকারিতা বেড়ে যায়। কথাটা কৌতুকাবহ সন্দেহ নেই। একথা সকলের জানা দরকার যে, কোন খনিজ তৈল হাইড্রোজেনেসন প্রক্রিয়ায় কখনও ঘনীভূত হয় না। কেবল মাত্র উদ্ভিজ্জ ও জান্তব তৈলগুলিরই গ্লিসারিন অলিয়েট হাইড্রোজেন পরমাণু আত্মস্থ করে গ্লিসারিন ষ্টিয়ারেটে রূপান্তরিত হয়ে ঘনীভূত আকার ধারণ করে। কোন খনিজ তৈল দালদা জাতীয় উদ্ভিজ্জ ঘৃতে মিশ্রিত করা বস্তুতঃ সম্ভবই নয়; কারণ তাতে এক দিকে যেমন তার ঘনত্ব ব্যাহত হয়, অপর পক্ষে মিশ্রিত পদার্থটা তাপসহ হয় না। খনিজ তৈলগুলি সবই প্রায় অল্প তাপেই প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। কাজেই যে উদ্ভিজ্জ ঘৃত রন্ধনকার্যে ও ভাজাভুজির কাজে ব্যবহৃত হয় তাতে খনিজ তৈল মিশ্রিত করা কখনও সম্ভব হতে পারে না; সুতরাং একথা অজ্ঞতার পরিচায়ক, সন্দেহ নেই।

উদ্ভিজ্জ ঘৃতের একটা দোষাবহ দিক আছে—অসাধু ব্যবসায়ীরা এই পদার্থ প্রকৃত ঘৃতে ভেজাল হিসাবে মিশিয়ে সহজেই ক্রেতাকে প্রতারিত করতে পারে। দৃশ্যতঃ উভয়ই প্রায় এক রকম; তবে উদ্ভিজ্জ ঘৃতের বর্ণ প্রায়ই সাদা বলে তাতে জান্তব ঘৃতের অনুরূপ বর্ণ ও গন্ধ মিশিয়ে দিলে প্রভেদ নিরূপণ করা কঠিন। উদ্ভিজ্জ ও জান্তব ঘৃতের গলনাঙ্কও মোটামুটি এক। এই ভেজাল নিবারণ করা সর্বপ্রযত্নে কর্তব্য। লোকে প্রকৃত জান্তব ঘৃত মনে করে উচ্চ মূল্য দিয়ে ঘনীভূত উদ্ভিজ্জ তৈল কিনে প্রতারিত হবে কেন? সরকার থেকে এই বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। কারখানায় উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিজ্জ ঘৃতে কোন নির্দোষ রঞ্জক পদার্থ মিশিয়ে একটা নির্দিষ্ট রং করে দেওয়া বাধ্যতামূলক করলে এ ভেজাল-সমস্যার সমাধান হতে পারে। এক সময়ে শুনা গিয়েছিল, সরকারী নির্দেশে সব রকম উদ্ভিজ্জ ঘৃত সবুজ রং করে বাজারে দেওয়া হবে; কিন্তু সে ব্যবস্থা এ যাবৎ কার্যকরী হয় নি। আবার শুনা যাচ্ছে, এই কৃত্রিম ঘৃতে অতি সামান্য পরিমাণ কুইনিন মিশিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে বিশেষজ্ঞগণ বিবেচনা করছেন। অতি সামান্য পরিমাণ কুইনিন মিশিয়ে দিলে তাতে জিনিষটার কোন তিক্ত স্বাদ বুঝা যাবে না; কিন্তু এরূপ উদ্ভিজ্জ ঘৃত প্রকৃত ঘৃতে ভেজাল দিলে রাসায়নিক বিশ্লেষণে সহজেই ধরা পড়বে। বিশেষজ্ঞগণের অভিমত যাই হোক, এই ব্যবস্থা ভেজাল নিবারণের প্রকৃষ্ট পন্থা হবে বলে মনে হয় না। ক্রেতা সাধারণের পক্ষে রাসায়নিক পরীক্ষা করে ঘৃত ক্রয় করা সম্ভব নয়; কিন্তু রঞ্জিত দালদা ঘৃত খাঁটি ঘৃতে মেশালে বর্ণবৈষম্যেই তা সকলের চোখে ধরা পড়বে।

যাহোক, ভেজালের কথা স্বতন্ত্র। বিশুদ্ধ উদ্ভিজ্জ ঘৃতের গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনাই

বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। খাদ্য হিসাবে উদ্ভিজ্জ ঘৃত স্বাস্থ্যহানিকর বা অপকারী নয়, একথা মনে করা যেতে পারে। এ জিনিষ খাদ্যহিসাবে প্রকৃত ঘৃতের তুল্য গুণান্বিত নয়, একথা অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু কৃত্রিম বলেই জিনিষটা অপকারী হবে, এমন মনে করা আমাদের মতে যুক্তিসঙ্গত নয়। এ যুগে যখন উদ্ভিজ্জ ঘৃত জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আমাদের ব্যবহার করতেই হবে তখন এর অপকারিতা সম্পর্কে একটা অহেতুক বিভীষিকা থাকা স্বাস্থ্যের পক্ষে বরং অনিষ্টকর হবে। পূর্বে আমরা মার্গারিন-এর বিষয় উল্লেখ করেছি। এ জিনিষটাও প্রকৃত মাখন নয়। দুগ্ধজাত মাখনের তুল্য গুণান্বিত বলেও পাশ্চাত্যের লোকেরা মনে করে না। বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তৈল ও জান্তব চর্বির সমন্বয়ে প্রস্তুত মাখনের মত একটা কৃত্রিম পদার্থ মাত্র। কিন্তু স্নেহজাতীয় পদার্থ হিসাবে তার খাদ্যমূল্য আছে বলে পাশ্চাত্য দেশে কেউ কৃত্রিম মার্গারিন মাখনকে অপকারী বলে মনে করে না—দ্বিধাহীনভাবে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা—অগ্রসর জাতির বৈশিষ্ট্য। আমাদের এই শুদ্ধাচারের দেশে জান্তব চবি দিয়ে তৈরী মার্গারিন ব্যবহারের কথাই ওঠে না। কিন্তু উদ্ভিজ্জ ঘৃতের রাসায়নিক গঠন ও খাদ্যমূল্য বিচার করে আমরা কি এই নির্দোষ খাদ্যবস্তুটা নিঃশঙ্কচিত্তে গ্রহণ করবার মত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করতে পারি না?

বর্ণালী-বিশ্লেষণ

শ্রীদেবেশ দত্ত

বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রসায়ন শাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। রসায়নের এই উন্নতিতে পদার্থ-বিজ্ঞানের দান অতুলনীয়। বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পদার্থ-বিজ্ঞানের বৈদ্যুতিক-বিশ্লেষণ পদ্ধতি যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি বর্ণালী বিশ্লেষণ পদ্ধতিও অপরিহার্য। রসায়নের গবেষণায় কি করে আলো ও তার বর্ণালীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ও স্বীকৃতি পেল, সেই বিষয়েই আলোচনা করবো।

আগুনের রং—এই বিষয়ে আলোচনার আগে আমাদের আগুনের রং সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আগুনের বিভিন্ন প্রকারের রং আছে—একথা আমাদের কাছে অবাস্তব মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এ তথ্য প্রচারিত হয়েছে বিখ্যাত বিজ্ঞানী বুনসেনের গবেষণার ফলে।

বর্তমান যুগে প্রত্যেক গবেষণাগারেই বুনসেন-দীপ ব্যবহৃত হয়। বুনসেন এই দীপ প্রস্তুত করেছিলেন। এই দীপের বিশেষত্ব এই যে, ইচ্ছামত একে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কোন প্রকার ধোঁয়া হয় না এই দীপে। প্রয়োজন মত এর শিখার দৈর্ঘ্য ও দাহিকা শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায়।

বুনসেন যখন এই দীপ নিয়ে কাজ করতেন তখন সেই দীপের শিখায় বিভিন্ন সময়ে বিচিত্র বর্ণসমাবেশ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সেই থেকেই তিনি আগুনের বিভিন্ন বর্ণসমাবেশের দিকে মনঃসংযোগ করেন। তিনি দেখতে পেলেন—সাধারণতঃ এই শিখার রং থাকে ঈষৎ নীলাভ; কিন্তু কাচের উপর ধরলেই এর রং হল্‌দে হয়ে যায়। দীপ তৈরী হয় সাধারণতঃ তামা দিয়ে। এই তামা যখন খুব গরম হয় তখন ঐ শিখার রং হয় সবুজ। কিন্তু কোন পটাসিয়াম যৌগ ঐ শিখায়

পোড়ালে সুন্দর লাইলাক শিখার সৃষ্টি করে। বুনসেন একটি প্ল্যাটিনাম তারের প্রান্তে বিভিন্ন জিনিষ নিয়ে দীপের অগ্নিশিখায় পুড়িয়ে সুষমামণ্ডিত অনেক বিচিত্র আলোর সৃষ্টি করেন। তিনি দেখতে পেলেন—ষ্ট্রনসিয়াম যৌগ সুন্দর লাল টকটকে রঙের সৃষ্টি করে, ক্যালসিয়াম শিখার রং হয় ইটের মত, বেরিয়ামের রং হয় সবুজ—ইত্যাদি।

বুনসেন জানতেন—বিজ্ঞানীরা বহুদিন থেকেই অগ্নিশিখার রং দেখে বিভিন্ন জিনিষের উপাদান নির্ণয়ের চেষ্টা করছেন, কিন্তু সফলকাম হন নি। কারণ তাঁরা যে অ্যালকোহল-দীপের শিখা নিয়ে পরীক্ষা করেছেন তারই নিজস্ব একটি রং আছে। কিন্তু বর্ণহীন বুনসেন দীপশিখায় এই অসুবিধা নেই। সব জিনিষের অগ্নিশিখাই তাদের নিজস্ব বৈচিত্র্য ও বর্ণবিভা নিয়ে তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠলো।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ যে কত কষ্টসাধ্য তা বুনসেনের অজানা ছিল না। এজন্যে একসঙ্গে কয়েক ঘণ্টা, এমন কি কয়েক দিনের প্রয়োজন হতো সেই সময়। বুনসেন ভাবলেন—কোন জিনিষের কণামাত্র দীপের শিখায় পুড়িয়ে তার বর্ণসমাবেশ দেখে যদি তার প্রকৃতি ও পরিচয় নির্ণয় সম্ভব হয় তাহলে রাসায়নিক বিশ্লেষণ কত সহজেই না হতে পারে! কাজটি কিন্তু ততটা সহজসাধ্য হলো না।

বুনসেন-দীপের শিখায় পৃথক পৃথক সব জিনিষের রং যেমন সুন্দর প্রতিভাত হয়েছিল, একাধিক মিশ্রিত পদার্থের অগ্নিশিখায় কিন্তু তাদের কোন পৃথক বিশিষ্ট বর্ণসত্তা দেখা গেল না। একাধিক জিনিষের বিভিন্ন রং মিশে পরস্পরের বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে দিল। কাজেই অগ্নিশিখার রং পদার্থের উপাদান নির্ণয়ে কোন সাহায্যই করলো না। বুনসেন অনেক প্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। নীল কাচের মধ্য দিয়ে তিনি বিভিন্ন জিনিষের অগ্নিশিখা পর্যবেক্ষণ করলেন। কাচের মধ্য দিয়ে তিনি পটাসিয়ামের লাইলাক ও লিথিয়ামের লাল রং দেখতে পেলেন; কিন্তু সোডিয়ামের হলুদ রং দেখা গেল না। বুনসেন এই সব পরীক্ষিত সত্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলেন না। কিন্তু মন তাঁর ভরে রইলো এই চিন্তায়।

একদিন তিনি বন্ধু কার্শফের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে সব ঘটনা তাঁকে খুলে বললেন। বুনসেনের কথা শুনে কার্শফও চিন্তামগ্ন হলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি যেন পথের নিশানা দেখতে পেলেন। কার্শফ ছিলেন পদার্থবিদ। তিনি এই সময় আলো ও তার বর্ণালী নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা করছিলেন। তাই তিনি বুনসেনকে বললেন—একজন পদার্থবিদ হিসাবে আমি বলতে পারি—যদি তুমি অগ্নিশিখার দিকে না তাকিয়ে তাদের বর্ণালী ভাল করে লক্ষ্য কর তাহলেই তুমি তোমার সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবে। বুনসেন বন্ধুর কথা শুনে খুবই উৎসাহিত হলেন। তারপর থেকেই দুই বন্ধু একসঙ্গে এই কাজে হাত দিলেন। দুজনের মিলিত গবেষণা এগিয়ে চললো।

বর্ণালী—এই বর্ণালী আবিষ্কার করেছেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন। সে প্রায় তিনশত বছর আগের ঘটনা। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের কেম্ব্রিজ সহরের শান্ত পরিবেশে নিউটন সূর্যরশ্মি নিয়ে এক অদ্ভুত খেলায় মেতে উঠেছিলেন। একটি অন্ধকার ঘরে জানালা-দরজা বন্ধ করে তার মধ্যে তিনি দিনের পর দিন কাটাতে আরম্ভ করেন। আলো-হাওয়ার সম্পর্কহীন এই ঘরটির মধ্যে অবিরাম ঘাম ঝরতো তাঁর শরীর থেকে; আর তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নির্বিকার চিত্তে তার মধ্যে আপন মনে কাজ করে যেতেন। তখন তাঁকে দেখলে মনে হতো—এইমাত্র যেন তিনি স্নান করে উঠেছেন। লোকে তো তাঁকে পাগল বলেই মনে করতেন।

তিনি ঘরের একটি জানালায় ছোট্ট একটি ছিদ্র করেছিলেন। ঐ ছিদ্র দিয়ে ছোট্ট একফালি সূর্যরশ্মি ঘরে প্রবেশ করতো; আর তিনি ঐ

রশ্মিটুকু নিয়ে বিভিন্ন উপায়ে তার পরীক্ষা করতেন। তিনি একটি ত্রিকোণ কাচ এই রশ্মির গতিপথে ধরতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সাদা সূর্যরশ্মি অদৃশ্য হয়ে ঘরের বিপরীত দিকের দেয়ালে বিভিন্ন রঙের কয়েকটি আলোর সৃষ্টি হতো (১নং চিত্র)। নিউটন অবাক হয়ে যেতেন। সূর্যের সাদা আলো কোথায় যায়—এই চিন্তায় তাঁর মন ভরে থাকতো।

বুঝতে পারি না বলেই সূর্যরশ্মি আমাদের কাছে সাদা মনে হয়। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি বললেন—আমরা জানি, একই মাধ্যমের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রঙের আলো বিভিন্ন গতিতে যায়। আবার ত্রিকোণ কাচের আলোর গতি বাঁকিয়ে দেবার ক্ষমতা আছে। কাজেই ঐ কাচের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় বিভিন্ন রঙের আলো বিভিন্ন পরিমাণে বেঁকে যায় এবং সেজন্যেই সূর্যরশ্মি বিশ্লিষ্ট হয়ে
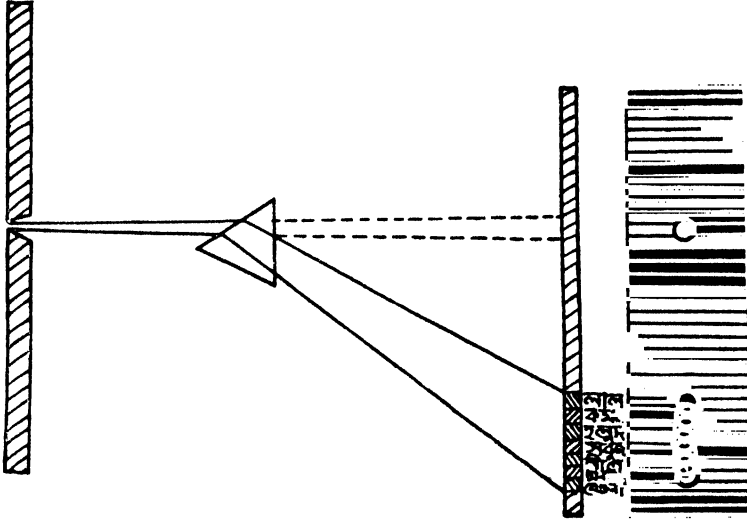
১ নং চিত্র

একদিন তিনি ত্রিকোণ কাচটি এক হাতে ধরে অন্য হাতটি ঐ বিভিন্ন রঙের আলোর উপর ধরলেন। হাতের আঙ্গুল ও চেটো লাল, হলুদ, সবুজ, নীল ও বেগুনী রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠলো। সাদা আলোর কোন চিহ্নই দেখা গেল না। তিনি বিভিন্ন ভাবে এই পরীক্ষা করলেন; কিন্তু প্রতিবার একই ফল দেখা গেল। তিনি বহুদিন এই বিষয়ে চিন্তা করে বুঝতে পারলেন—সূর্যরশ্মিকে বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত করবার ক্ষমতা ত্রিকোণ কাচের নেই। তাই তিনি সিদ্ধান্ত করলেন—সূর্যরশ্মি মোটেই সাদা নয়, সাতটি বিভিন্ন বর্ণের সমষ্টিমাত্র। আমরা খালি চোখে এদের পার্থক্য

পড়ে। তখনই আমরা ঐ বর্ণসমষ্টি দেখতে পাই। এই বর্ণচ্ছটার নামই বর্ণালী। এই বর্ণালীর সবার উপরের রংটি লাল, তারপর যথাক্রমে কমলা, হলুদ, নীল, ঘন নীল এবং সকলের শেষে বেগুনী। রামধনুতে আমরা যে সাতটি রং দেখতে পাই, সেগুলি এই সূর্যরশ্মির বর্ণালী ছাড়া আর কিছুই নয়। নিউটন আরও বললেন—সাদা রং কোন বিশেষ রং নয়। ঐ সাতটি রঙের সমন্বয়েই সাদা রঙের সৃষ্টি। লাল রঙের প্রতিসরণ* সবচেয়ে কম

* বায়ু, কাচ ও জল এগুলি সব স্বচ্ছ জিনিষ। আলো এদের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বেগে যায়। বায়ুর মধ্যে আলোর যে বেগ, জলের মধ্যে তা এক

এবং বেগুনীর সবচেয়ে বেশী। তাই আমরা এদের যথাক্রমে সকলের উপরে ও নীচে দেখতে পাই।

নিউটনের এই মতবাদ সকলের কাছেই প্রথমে অবাস্তব মনে হয়েছিল। যে সূর্যরশ্মিকে সবাই সাদা বলে জানে, নিউটন তাকে বললেন—সাতটি রঙের সমষ্টিমাত্র। তাই অনেকেই এই মতবাদে আস্থা স্থাপন করতে পারলেন না। তখন নিউটন একে একে অনেক পরীক্ষার পর তাঁর এই মতবাদ দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন। তিনি ত্রিকোণ কাচ দিয়ে সূর্যরশ্মিকে বিশ্লিষ্ট করেই ক্ষান্ত হলেন জোরে ঘুরিয়ে দিলেন যে, সেই ঘূর্ণায়মান কাষ্ঠখণ্ডের উপর সাতটি রঙের পরিবর্তে শুধু সাদা রং-ই সকলে দেখতে পেলেন।

সূর্যরশ্মির মত অন্যান্য কৃত্রিম আলোকরশ্মিও বিভিন্ন বর্ণের সংমিশ্রণ এবং এদেরও ত্রিকোণ কাচ দিয়ে সূর্যরশ্মির মত বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

ফ্রনহফার রেখা—১৮১৪ খৃষ্টাব্দে জার্মেনীর বিখ্যাত চক্ষু-বিশেষজ্ঞ ডাঃ ফ্রনহফার বিশেষ প্রয়োজনে বিভিন্ন আলোর বর্ণালী পরীক্ষা করছিলেন। এই পরীক্ষার সময় তিনি প্রত্যেক
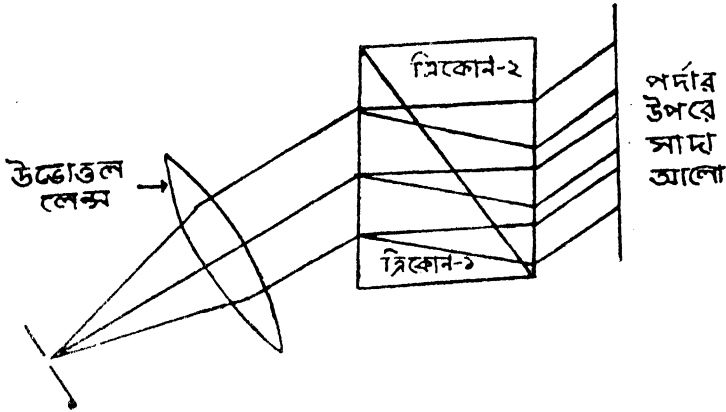
২নং চিত্র

না, আর একটি ত্রিকোণ কাচের সাহায্যে ঐ বিশ্লিষ্ট সাতটি রং একত্রিত করে সাদা রঙে পরিবর্তিত করলেন (২নং চিত্র)। খুব সাধারণ একটি পরীক্ষা দিয়ে তিনি সবাইকে তাঁর মতবাদ সহজভাবে বুঝিয়ে দিলেন। একটি গোল কাঠের চাকৃতিকে তিনি এই সাতটি রঙে রঞ্জিত করে এত

চতুর্থাংশ কমে যায় এবং কাচের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ। আলোর এই গতিবেগ স্বচ্ছবস্তুর গুরুত্ব অনুসারে কমে বা বাড়ে। তাই এক স্বচ্ছ পদার্থ থেকে অন্য স্বচ্ছ পদার্থে যাওয়ার সময় আলোর গতিপথ বেঁকে যায়। আলোর বেগ যত বেশী, গতিপথও তত বেশী পরিবর্তিত হয়। আলোর গতিপথের এই পরিবর্তনকেই প্রতিসরণ (Refraction) বলে।

আলোক রশ্মির মধ্যেই এক অদ্ভুত ঘটনা লক্ষ্য করেন।

নিউটনের মত ফ্রনহফারও একটি অন্ধকার ঘরে তাঁর পরীক্ষা করেছিলেন। তবে নিউটনের সঙ্গে তাঁর কাজের কিছু পার্থক্য ছিল। তিনি জানালা বা দরজার একটি পাল্লা খুলে দিয়ে ঘরের মধ্যে বেশ চওড়া এক ফালী সূর্যরশ্মি প্রবেশ করতে দিলেন। তারপর ঐ আলোর গতিপথে একটি ত্রিকোণ কাচ বসিয়ে টেলিস্কোপ দিয়ে ঐ আলোর বর্ণালী পরীক্ষা করেন। প্রথমে তিনি দরজার বাইরে প্রদীপ জেলে আগের মত তার বর্ণালী পরীক্ষা করেন এবং তার মধ্যে দরজার খোলা অংশের সমান প্রস্থবিশিষ্ট খুব উজ্জ্বল দুটি হলুদ রঙের রেখা দেখতে পান।

তারপর তিনি এরূপে একটি অ্যালকোহল-দীপের বর্ণালী পরীক্ষা করেন এবং এবারও ঐ হলুদ রঙের রেখা দুটি দেখতে পান। অবশেষে তিনি একটি মোমবাতির আলোর বর্ণালী পরীক্ষা করেন এবং আশ্চর্যের বিষয়, এবারেও ঐ হলুদ রেখা দুটির কোন স্থানান্তর বা রূপান্তর দেখা গেল না।

এবার সূর্যরশ্মির বর্ণালীর মধ্যে ফ্রনহফার ঐ হলুদ রেখা দুটির অনুসন্ধান করেন। কিন্তু তাঁর আশা সফল হলো না। ঐ হলুদ রেখার কোন চিহ্ন সেখানে দেখা গেল না। তার পরিবর্তে তিনি দেখতে পেলেন অনেকগুলি কালো রেখা ঐ সূর্য-রশ্মির বর্ণালীকে ছেদ করেছে। তিনি পাঁচশতেরও অনেক বেশী কালো রেখা ঐ সূর্যরশ্মির মধ্যে দেখতে পেলেন। এদের কতকগুলি খুব বেশী কালো, কতকগুলি কিছু কম কতকগুলি খুব স্পষ্ট, অবশিষ্ট-গুলি খুবই অস্পষ্ট। তিনি এ, বি, সি, ডি করে এদের নামকরণ করেন। তাঁর মনে হলো সূর্যরশ্মিতে বোধ হয় কোন রঙের অভাব আছে। তিনি প্রত্যেকটি রেখাই ভাল করে লক্ষ্য করলেন এবং দেখতে পেলেন—প্রদীপের আলোর বর্ণালীতে যেখানে হলুদ রেখা দুটি আছে—সূর্যরশ্মির বর্ণালীর ঠিক সেই স্থানটিতে রয়েছে দুটি ঘন কালো রেখা। দিনের বেলা সূর্যরশ্মি এবং রাত্রিবেলা প্রদীপের আলো নিয়ে বহুবার পরীক্ষার পরেও তিনি একই ঘটনা লক্ষ্য করেন।

এই সময় আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী বিভিন্ন প্রকারের আলোকরশ্মি নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তাঁরাও বিভিন্ন আলোর বর্ণালীতে ঐ হলুদ রেখা দুটি এবং আরও অনেক উজ্জ্বল রেখা দেখতে পেলেন। কিন্তু সূর্যরশ্মির বর্ণালীতে ঐ হলুদ রেখা দুটির চিহ্নমাত্রও দেখতে পেলেন না; বরং আরও অনেক নতুন কালো রেখার সন্ধান পেলেন। ফ্রনহফারের নাম অনুসারে তাঁরা ঐ রেখাগুলির নাম দিলেন—ফ্রনহফারের রেখা। কিন্তু সমস্যার সমাধান হলো না। তারপর এল বুনসেন-কার্শফের যুগ। তাঁরা দুই বন্ধুতে মিলে ঐ সব কালো রেখা এবং হলুদ রেখা দুটির অবস্থানের উপযুক্ত ব্যাখ্যা নির্দেশ করলেন।

বর্ণালী বিশ্লেষণ—বিভিন্ন বস্তুর আলোর বর্ণালী পরীক্ষার জন্যে বুনসেন ও কার্শফ প্রথমে একটি যন্ত্র তৈরী করেন। যন্ত্রটির নাম স্পেক্ট্রোস্কোপ। দুটি টেলিস্কোপ, একটি ত্রিকোণ কাচ ও একটি সাধারণ সিগারের বাক্স দিয়েই প্রথম স্পেক্ট্রোস্কোপ তৈরী হলো। কার্শফ ছিলেন পদার্থবিদ্। তাই স্পেক্ট্রোস্কোপ নির্মাণে তিনিই ব্রতী হলেন। তিনি একটি সিগারের বাক্সের দু-পাশে দুটি ছিদ্র করে সেখানে দুটি টেলিস্কোপ কোণাকুণিভাবে বসালেন। তারপর একটি ত্রিকোণ কাচ রাখলেন বাক্সটির মধ্যে টেলিস্কোপ দুটির পরস্পরের গতিপথের উপরে। বাক্সটির চারদিকে কালো কাগজ মুড়ে দিলেন। তাই আলো প্রবেশের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। তখন কার্শফ উক্ত টেলিস্কোপ দুটির একটির বাইরের দিকের ছোট একটি ছিদ্রের মধ্য দিয়ে আলোর প্রবেশাধিকার দিলেন। এই টেলিস্কোপ-টিকে কলিমিটার বলা হয়। কলিমিটারের মধ্য দিয়ে আলোক-রশ্মি ত্রিকোণ কাচের উপর পড়ে' বিশ্লিষ্ট হয়ে বর্ণালীর সৃষ্টি করলো। বুনসেন ও কার্শফ অপর টেলিস্কোপটির মধ্য দিয়ে ঐ বর্ণালীর দিকে তাঁদের সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

কার্শফ যখন স্পেক্ট্রোস্কোপ নির্মাণে ব্যস্ত ছিলেন তখন বুনসেন তাঁর পরীক্ষণীয় জিনিষগুলি নির্দোষভাবে তৈরী করে রাখেন। কাজেই যন্ত্রটির নির্মাণ-কার্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের আসল কাজ আরম্ভ হলো।

প্রথমে কার্শফ সূর্যরশ্মিকে আয়নার সাহায্যে তাঁর যন্ত্রের মধ্যে প্রতিফলিত করে বহুবর্ণবিশিষ্ট এক বর্ণালী দেখতে পান। বর্ণালীর মধ্যে কালো ফ্রনহফার রেখাগুলিও তাঁর দৃষ্টির অগোচর রইলো না। তারপর তিনি ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে তাঁর যন্ত্রের মধ্য দিয়ে বুনসেন-দীপের বর্ণালীর

দিকে তাকালেন। কিন্তু দীপের শিখা খুব উজ্জ্বল হওয়া সত্ত্বেও সেখানে কোন বর্ণালী দেখা গেল না। কিন্তু বুনসেন যখন বিভিন্ন জিনিষের কণামাত্র ঐ দীপশিখায় ধরতে লাগলেন তখনই হঠাৎ সব কিছুর দৃশ্যান্তর ঘটলো। তিনি প্রথমে একটি প্ল্যাটিনাম তারের প্রান্তে একবিন্দু খাবার লবণ নিয়ে ঐ দীপশিখায় ধরলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হলুদ রঙের সৃষ্টি হলো ঐ বর্ণালীর মধ্যে। কার্শফ স্পেক্ট্রোস্কোপের মধ্যে তাকিয়ে বললেন—কালো পর্দার উপরে পাশাপাশি দুটি হলুদ রেখা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সোডিয়ামের অন্যান্য যৌগিক পদার্থ থেকেও তাঁরা সেই একই স্থানে দুটি হলুদ রেখা দেখতে পেলেন। সব সমস্যাই যেন তাঁদের কাছে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। তাঁরা বুঝলেন—দীপশিখার স্পর্শমাত্রই সোডিয়াম-লবণ বিশ্লিষ্ট হয়ে সোডিয়ামটুকু একপ্রকার গরম বাষ্পের সৃষ্টি করে, যার ফলে ঐ হলুদ রেখা দুটির আবির্ভাব হয়।

বুনসেন প্ল্যাটিনাম তারটি ভাল করে ধুয়ে এবার একটু পটাসিয়াম যৌগ নিলেন। দীপশিখার স্পর্শ মাত্র সুন্দর লাইলাক রঙের সৃষ্টি হলো। কার্শফ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। বুনসেন অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন তাঁর এই নীরবতায়। তখন কার্শফ বললেন—কালো পর্দার উপর একটি লাল ও একটি বেগুনী রেখা এবং তাদের মাঝখানে অস্পষ্ট, কিন্তু প্রায় সম্পূর্ণ একটি বর্ণালী দেখা যাচ্ছে। এভাবে লিথিয়ামের সব যৌগিক পদার্থই উজ্জ্বল লাল ও একটু নিষ্প্রভ কমলা রঙের রেখার সৃষ্টি করলো। ষ্ট্রনসিয়ামের বর্ণালীতে একটি উজ্জ্বল নীল ও কতকগুলি ঘন লাল রেখা দেখা গেল।

এভাবে প্রায় সব মৌল এবং তাদের অনেক যৌগ নিয়ে তাঁরা পরীক্ষা করেন। প্রত্যেকের বেলাতেই দেখা গেল, তাদের বাষ্প বর্ণালীর কোন নির্দিষ্টস্থানে বিশিষ্ট রঙের উজ্জ্বল রেখার সৃষ্টি করে।

এই ঘটনা দেখে দুই বন্ধু বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে গেলেন। তারপর তাঁরা প্রত্যেক জিনিষের বর্ণালীর ছবি এঁকে তাদের তুলনা করেন। তারপর বিভিন্ন মৌল মিশিয়ে তাদের বর্ণালীর পরিবর্তন দেখবার বিষয় স্থির করলেন। স্পেক্ট্রোস্কোপের সাহায্যে কোন যৌগ থেকে মৌলের বিশ্লেষণ সম্ভব কিনা তা জানবার জন্যে উভয়েই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠলেন। তাই বুনসেন বিভিন্ন জিনিষের সংমিশ্রণ থেকে কণামাত্র প্ল্যাটিনাম তারে ছুঁইয়ে দীপশিখায় ধরলেন। শিখাটি সঙ্গে সঙ্গে হলুদ হয়ে গেল। তাঁরা বুঝলেন—সোডিয়ামের আলো অন্য সব জিনিষের আলো থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, খুব বেশী প্রখর ও উজ্জ্বল বলেই এরূপ হয়।

কার্শফ স্পেক্ট্রোস্কোপের মধ্য দিয়ে ঐ মিশ্রিত জিনিষের বর্ণালীর দিকে তাকালেন। মিশ্রিত জিনিষটি আগুনে চট্‌পট্ করে ফুটছে। বুনসেনের হাত কাঁপছে—আর কোন সাড়াশব্দ নেই সেখানে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কার্শফের চোখ দুটি আশা ও আশঙ্কায় চঞ্চল হয়ে উঠলো। মিশ্র পদার্থটির বর্ণালীতে বিভিন্ন রেখার উপস্থিতি দেখে একে একে কয়েকটি জিনিষের নাম মনে হলো তাঁর। তিনি বললেন—বুনসেন, তোমার এই জিনিষটি বোধহয় সোডিয়াম, পটাসিয়াম, লিথিয়াম ও ষ্ট্রনসিয়ামের মিশ্রণ ছাড়া আর কিছু নয়। কার্শফের কথা শুনে বুনসেন আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন—ঠিক, ঠিক বলেছ কার্শফ! তৎক্ষণাৎ প্ল্যাটিনাম তারটিকে দণ্ডে স্থাপন করে বুনসেন স্পেক্ট্রোস্কোপের মধ্য দিয়ে তাকালেন। প্রত্যেকটি জিনিষের বিশিষ্ট রঙের উজ্জ্বল রেখাগুলি বর্ণালীতে তাদের নির্দিষ্ট স্থানে দেখা গেল। বিরাট জনতার মধ্যে কণ্ঠস্বর শুনে যেমন মানুষ চেনা যায়, ঠিক তেমনি মিশ্রিত বা যৌগিক পদার্থের বর্ণালীতে বিশিষ্ট রঙের রেখা ও তাদের অবস্থান দেখে ঐ জিনিষের উপাদানগুলিরও পরিচয় পাওয়া সম্ভব হলো। ত্রিকোণ কাচে আলোক বিশ্লিষ্ট হওয়ার ফলে ঐ বিশিষ্ট রেখাগুলি বর্ণালীর মধ্যে তাদের নির্দিষ্ট স্থান দখল করে; কাজেই একটি অপরটির উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

বুনসেন ও কার্শফ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। রাসায়নিক বিশ্লেষণের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলো।

সঞ্চয়ন

নূতন দশমিক মুদ্রা

১লা এপ্রিল (১৯৫৭) হইতে ভারতে নূতন দশমিক মুদ্রার প্রবর্তন হইয়াছে। বর্তমানে প্রচলিত সিকি, আধুলি ও টাকা, দুই নিয়ম অনুযায়ীই চালু থাকিবে। নূতন মুদ্রা চালু হইবার পর বর্তমানের মুদ্রাগুলি তিন বৎসর পর্যন্ত চালু

থাকিবে। এই সময়ের মধ্যে ঐগুলি ধীরে ধীরে সরাইয়া লওয়া হইবে। সর্বপ্রথমে দুই আনা ও তাহার নিম্ন মূল্যের মুদ্রাগুলি সরাইয়া লওয়া হইবে এবং ১০ নয়া পয়সা বহুল পরিমাণে চালু করা হইবে।

নূতন মুদ্রার একদিকে সিংহমূর্তি সমেত অশোকস্তম্ভ খোদিত আছে এবং হিন্দীতে 'ভারত' ও ইংরাজীতে 'ইণ্ডিয়া' লেখা আছে। অপরদিকে মুদ্রাটির মূল্যমান ও কোন্ সালে ইহা তৈয়ারী হইয়াছে ইহা লেখা আছে। ৫০ ও ২৫ নয়া পয়সা খাঁটি দস্তায় তৈয়ারী। ১০,৫ ও ২ নয়া পয়সা তামা ও দস্তা সংমিশ্রণে তৈয়ারী। ১ নয়া পয়সা ব্রোঞ্জে তৈয়ারী। নূতন মুদ্রাগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ষ্টেট ব্যাঙ্কের অফিসসমূহ, ট্রেজারী ও সাব-ট্রেজারী হইতে দেওয়া হইবে। সমস্ত

মুদ্রাগুলিই একসঙ্গে চালু হইবে না। শুধুমাত্র ১, ২, ৫, ও ১০ নয়া পয়সা প্রথমে চালু করা হইবে। ২৫, ৫০ নয়া পয়সা ও নূতন টাকা পরে চালু করা হইবে। ১লা এপ্রিল হইতে সমস্ত সরকারী হিসাব টাকা ও নয়া পয়সায় হইবে। সমস্ত চালান ও বিল প্রভৃতি নূতন মুদ্রা অনুযায়ী লিখিতে হইবে। ২৫ টাকা ও ৫ নয়া পয়সা ২৫·০৫ টাকা লিখিতে হইবে। ২৫ টাকা ও ৫০ নয়া পয়সা ২৫·৫০ টাকা লিখিতে হইবে।

লোকে যাহাতে সহজে নয়া পয়সা ও বর্তমানে প্রচলিত মুদ্রার বিনিময় হার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিতে পারে সেই জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় রেডী-রেকনার তৈয়ার করিয়াছেন। যেখানে টাকার লেনদেন হয় সেখানেই রেডী-রেকনারগুলি পাওয়া যাইবে।

নিম্নে বিনিময় হারের একটি সরল চার্ট দেওয়া হইল :—

	পাই	নয়া পয়সা
১ পয়সা	═ ৩	২
২ পয়সা	═ ৬	৩
৩ পয়সা	═ ৯	৫

আনা পাই	নয়া পয়সা	আনা পাই	নয়া পয়সা
১ আনা	৬	৯ আনা	৫৬
২ আনা	১২	১০ আনা	৬২
৩ আনা	১৯	১১ আনা	৬৯
৪ আনা	২৫	১২ আনা	৭৫
৫ আনা	৩১	১৩ আনা	৮১
৬ আনা	৩৭	১৪ আনা	৮৭
৭ আনা	৪৪	১৫ আনা	৯৪
৮ আনা	৫০	১৬ আনা	১০০

১৯৫৫ সালে ভারতীয় মুদ্রা (সংশোধন) আইন অনুসারে বিনিময় হার নির্ধারিত হইয়াছে। তাহাতে বর্তমানের ১ পয়সা, ২ পয়সা, ১ আনা ও ২ আনার সমমূল্যের নয়া পয়সা ঠিক করা যায় নাই। ফলে তাহাদের বিনিময় করিতে গিয়া সামান্য লাভ বা লোকসান হইবে। যতদিন পুরাতন মুদ্রাগুলি চালু থাকিবে ততদিন এই সামান্য লাভ বা লোকসান ঘটিবে। কিন্তু নয়া পয়সা অধিক পরিমাণে চালু হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা লোপ পাইবে। এই লাভ বা লোকসানের হাত হইতে এড়াইতে হইলে জনসাধারণকে সিকি, আধুলি ইত্যাদি অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতে হইবে। ট্রেজারী প্রভৃতিকে সিকি, আধুলি প্রভৃতির বদলে সমমূল্যের নয়া পয়সা দিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

পৃথিবীতে ১৪০টি দেশে মুদ্রার প্রচলন আছে। উহার মধ্যে ১০৫টি দেশে দশমিক মুদ্রা চালু আছে। ভারতবর্ষ মুদ্রা সংস্কার করিয়া এই ১০৫টি দেশের অনুগামী হইল। ভারতবর্ষের শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন আগামী ১০ বা ১৫ বৎসরের মধ্যে হইবে। বর্তমানে প্রচলিত হিসাবের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি ও ওজন করিবার যন্ত্রসমূহ এখন না বদলাইলে পরে অনেক বেশী খরচ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া দশমিক মুদ্রা প্রচলন করিবার আরও একটি কারণ আছে। দশমিক মুদ্রা ঠিকমত কাজে লাগাইতে হইলে ওজনের মেট্রিক প্রথা চালু করিতে হইবে। ভারত সরকার আগামী ১৫ বৎসরের মধ্যে ইহা করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

চিত্রের প্রথম দুই সারিতে দশমিক মুদ্রা দেখান হইয়াছে। ডান দিকের মাঝামাঝি যে চারিটি নূতন মুদ্রা দেখান হইয়াছে সেগুলি ১লা এপ্রিল হইতে চালু হইয়াছে। বাঁ-দিকেরগুলি পরে চালু

হইবে। বাঁ-দিকের সর্বোচ্চ ভাগে প্রত্যেক মুদ্রার অপর দিকটি দেখান হইয়াছে। নীচের দিকে বিনিময় হার টেবিল দেখান হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীতে ২ পয়সা, ১ আনা, ২ আনার সমমূল্যের নয়া পয়সা দেখান হইয়াছে এবং ডান দিকে ৩ আনা সমমূল্যের নয়া পয়সা দেখান হইয়াছে।

পুস্তক পরিচয়

আবিষ্কারের কাহিনী—শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী। প্রাপ্তিস্থান—বিদ্যাভারতী; ৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট; কলিকাতা—৯। মূল্যের উল্লেখ নাই।

দেবীপ্রসাদবাবুর রচনা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পাঠকদের কাছে সুপরিচিত। জ্ঞান ও বিজ্ঞান এবং বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি রচনা এই পুস্তকটিতে স্থান পেয়েছে। বিজ্ঞান-জগতের যুগান্তকারী কয়েকটি আবিষ্কারের কথা তিনি গল্পের মত সহজ ও সরল ভাষায় লিখেছেন। পেনিসিলিন, ভিটামিন, ইনসুলিন, ইউরিয়া ষ্টিবামিন ইত্যাদি নাম আজকাল প্রায় সকলেই জানেন। এই সব আবিষ্কারের কথা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ও চিত্তা-কর্ষক। অল্পবয়স্কদের জন্যে লেখা এই বইখানা তাদের তো ভাল লাগবেই বড়দের কাছেও আদৃত হবে। বইটিতে কয়েকটি বিশ্রী ছাপার ভুল লক্ষ্য করলাম—আশা করি পরবর্তী সংস্করণ এই দোষ-মুক্ত হবে।

মানব জাতির উদ্ভব—মূল রুশ হইতে বাংলায় অনুবাদক—শ্রীঅর্ধেন্দু গোস্বামী; পৃঃ ১১৩; প্রকাশক, ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানীর পক্ষে শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ৬৪-এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মূল্য—এক টাকা ছয় আনা।

"সাধারণতঃ অতীত হইতে প্রাপ্ত অভ্যাস এবং ঐতিহ্যের নিকট সাহায্য পায় বলিয়া ধর্ম্মীয় কুসংস্কার ও বদ্ধ ধারণাগুলির জীবনীশক্তি প্রবল এবং অত্যন্ত বদ্ধমূল। জীর্ণ ও ক্ষতিকর ধারণা, প্রথা ও রীতিনীতির পোষণ করেন, এমন অনেক ধর্ম্মবিশ্বাসী লোক এখনও সোভিয়েত দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। বিষয়টি যে উপেক্ষণীয় নহে সে সম্পর্কে কম্যুনিষ্ট পার্টি বরাবরই দৃষ্টি রাখিয়াছেন। বিজ্ঞান বিরোধী ও ধর্ম্মীয় বিশ্বদৃষ্টির বিরুদ্ধে বিজ্ঞান ও বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টির সংগ্রামটি হইল—শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের জন্য, সমস্ত মানুষের প্রকৃত সুখী জীবন গড়িবার জন্য একটি প্রয়োজনীয় অবস্থা।" ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তে বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর সমর্থনকল্পে আলোচ্য পুস্তকখানিতে বিবর্তন-বাদের ভিত্তিতে জীব-জগতের ক্রমবিকাশ এবং বিশেষভাবে মানুষের অভিব্যক্তির ধারা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই বিষয়ে উৎসাহী পাঠকেরা বইখানি পড়িয়া উপকৃত হইবেন। অনেকস্থলেই যে সকল পরিভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার পরিবর্তে মূল শব্দের আক্ষরিক পরিবর্তন অধিকতর শ্রুতিমধুর ও সুখবোধ্য হইত।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

এপ্রিল,—১৯৫৭

দশম বর্ষ, ঃ ৪র্থ সংখ্যা

ইউরেনিয়ামের আলোকচিত্র নেওয়া হচ্ছে। এই ইউরেনিয়াম ইন্ধন হিসাবে পরমাণু-চুল্লীতে ব্যবহার করা হয়।

জেনে রাখ

বিমানের গতিপথ নির্ধারণের অভিনব ব্যবস্থা

চারদিকে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ বিস্তীর্ণ সমুদ্র, আর তারই মাঝখানে তিনটি বিরাট খুঁটির উপর ইস্পাতের একটি মঞ্চ। মঞ্চের উপরে বাস করে গুটিকতক মানুষ। তাদের কাজ—অপরিচিত বিমানের গতিবিধির উপর নজর রাখা।

যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব উপকূল থেকে ১১০ মাইল দূরে আটলান্টিক মহাসাগরে এই মঞ্চ বা টাওয়ারটি নির্মাণ করেছেন মার্কিন বিমানবাহিনী। সরকারীভাবে এটিকে বলা হয় জর্জেস ব্যাঙ্ক এয়ার ফোর্স স্টেশন। টাওয়ারের বাসিন্দারা সবাই বিমানবাহিনীর সৈন্য।
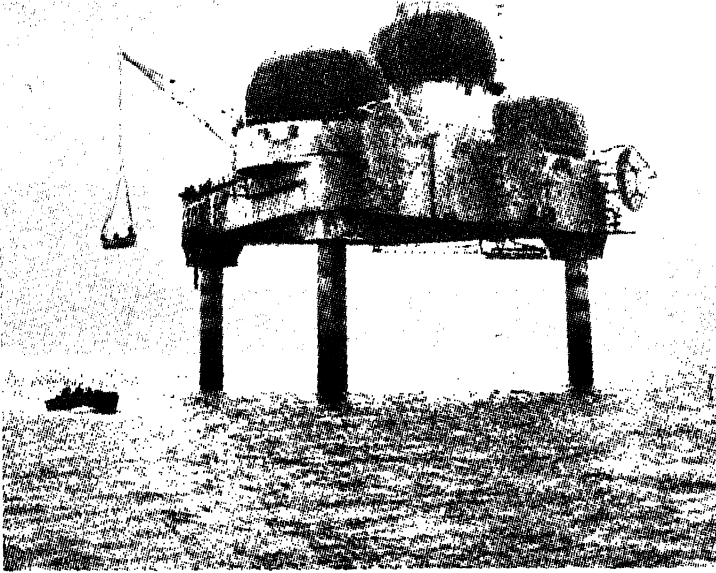
বিমানের গতিপথ নির্ধারণের জন্যে সমুদ্রের উপর নির্মিত মঞ্চ। এখানে বিভিন্ন রকম যন্ত্রপাতি সমেত ৬০ জন লোকের থাকবার ব্যবস্থা আছে।

এখানে তিনটি রেডার যন্ত্র আছে। ঐ যন্ত্রের সাহায্যেই অপরিচিত বিমানের গতিপথ জানা যায় এবং সমুদ্রের উপর দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দিকে অগ্রসরমান বিমানের সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে বেতারে প্রদান করে মূল ভূখণ্ডের ঘাঁটিকে সতর্ক করে দেওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্রে এই জাতীয়

রেডার টাওয়ার এই-ই প্রথম এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও নিরাপদ করবার জন্যে সমগ্র পূর্ব উপকূলব্যাপী এরূপ আরও অনেক টাওয়ার বসানো হবে।

গঠন-নৈপুণ্যের দিক থেকে টাওয়ারটির অভিনবত্ব আছে। সমুদ্রগর্ভে পোঁতা ইস্পাত ও কংক্রিটের তৈরী বিরাট বিরাট তিনখানি খুঁটি, আর তারই উপরে ত্রিভুজাকারে টাওয়ারটি নির্মিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এটির উচ্চতা ৮৭ ফুট এবং এক এক দিকের দৈর্ঘ্য প্রায় ২ শত ফুট।

টাওয়ারটি আগাগোড়া ইস্পাতের পাতে মোড়া, আর এতে আছে অসংখ্য যন্ত্রপাতি—রেডার যন্ত্র, বিদ্যুৎ সরবরাহের যন্ত্র, জল শোধনের যন্ত্র, সংবাদ আদান-প্রদানের যন্ত্র ইত্যাদি। আর আছে যাঁরা এখানকার বাসিন্দা তাদের থাকা, খাওয়া ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা।

সৈনিকেরা এই টাওয়ারে বসেই সিনেমা দেখতে পারেন, পিংপং খেলতে পারেন, আবার মূল ভূখণ্ডে অনুষ্ঠিত নাটকাদির অভিনয় বেতারবীক্ষণে দেখতে পারেন।
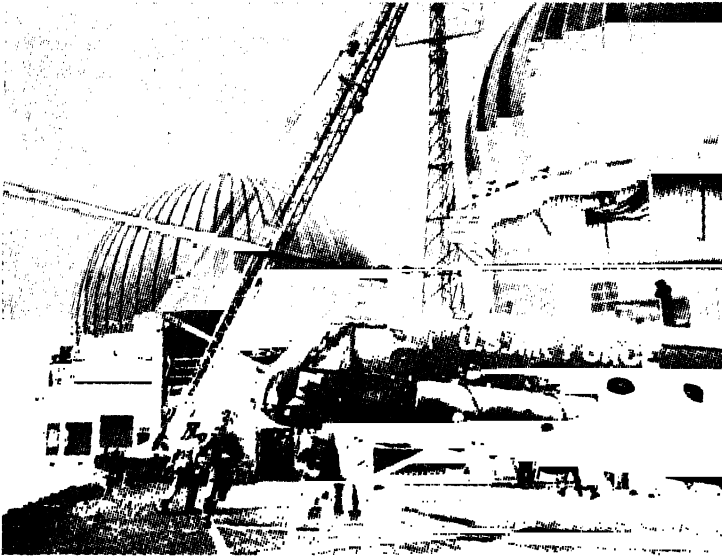
বিমানের গতিপথ নির্ধারণের জন্যে সমুদ্রের উপর নির্মিত মঞ্চে হেলিকপ্টার যোগে জিনিষপত্র সরবরাহ ও লোকজন যাতায়াতের ব্যবস্থা রয়েছে।

ধর্মাচরণের দিক থেকেও তাঁদের কোনরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। প্রতি মাসে মূল ভূখণ্ড থেকে হেলিকপ্টার যোগে এখানে একবার করে ধর্মযাজক আসেন এবং সমবেত প্রার্থনা পরিচালনা করে হেলিকপ্টার যোগেই বিদায় নেন। প্রার্থনা পরিচালনা ছাড়া তিনি ধর্মসম্পর্কিত পুস্তিকাদি বিতরণ করেন এবং উপদেশাবলী দান করেন।

কিন্তু চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও দিনকয়েকের মধ্যেই তাঁদের মন বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কেন না, ফেনিল উচ্ছ্বসিত জলরাশি ছাড়া নয়ন পরিতৃপ্তির আর কোন দৃশ্যই

যেমন চোখে পড়ে না, তেমনি কংক্রিটের খুঁটির গায়ে ভেঙ্গে-পড়া তরঙ্গের একটানা শব্দ ছাড়া বহির্বিশ্বের আর কোন শব্দই তাঁদের কানে পৌঁছায় না। তাই এই একঘেয়ে জীবন থেকে নিষ্কৃতি দেবার জন্যে পালা করে প্রতি ৩০ দিন অন্তর লোক বদল করা হয়। এখানকার লোকদের মূল ভূখণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং অন্য লোক এনে তাঁদের শূন্য স্থান পূরণ করা হয়। তবে কোন কোন সময় আবহাওয়া বিপর্যয়ের দরুণ টাওয়ারবাসীদের একটানা ৮০ দিন পর্যন্ত মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হয়।

টাওয়ারবাসীদের জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য, জ্বালানী এবং যাবতীয় ভারী ভারী দ্রব্যাদি আনা হয় জাহাজযোগে। টাওয়ারে বড় বড় ক্রেন আছে। ঐ ক্রেনের সাহায্যেই জাহাজ থেকে মালগুলি তোলা হয়। অন্যান্য হাল্কা ধরণের দ্রব্য ও চিঠিপত্রাদি সরবরাহ করা হয় হেলিকপ্টারযোগে।

টাওয়ারবাসীদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করা হয় এই টাওয়ার থেকেই। এখানে জল পরিশোধনের যে যন্ত্রটি আছে, সেটির সাহায্যে প্রতি ঘণ্টায় ১৬০ গ্যালন লোনা জল পানীয় জলে পরিণত করা যায়।

৬ জন অফিসারসহ মোট ৬০ জন লোক টাওয়ারে বাস করেন। ওঁরা প্রত্যেকেই যন্ত্রবিশারদ। দিবারাত্রি চব্বিশ ঘণ্টাই এঁদের আকাশের দিকে নজর রাখতে হয়। এখানকার বড় বড় তিনটি রেডার যন্ত্র যান্ত্রিক ব্যবস্থায় অনবরত ঘুরে আকাশে অজ্ঞাত বিমানের গতিবিধির সন্ধান করে। রেডার যন্ত্র তিনটি প্লাষ্টিকের তৈরী গম্বুজাকারের খোলের মধ্যে রক্ষিত। আবহাওয়ার হাত থেকে যন্ত্রগুলিকে রক্ষা করবার জন্যে এই ব্যবস্থা। রেডার যন্ত্রের আওতার মধ্যে অপরিচিত কোন বিমানের আবির্ভাব ঘটলেই যন্ত্রে তার আগমন বার্তা ধরা পড়ে এবং একটি স্বচ্ছ বোর্ডে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তার গতিপথ লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।

খাদ্যের কথা

বেঁচে থাকবার জন্যে আমাদের খাদ্য অপরিহার্য। কাজেই আমাদের খাদ্য কিরূপ হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলছি। আমাদের খাদ্যগুলি সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা— ১নং—প্রোটিন বা আমিষজাতীয় পদার্থ; ২নং—শর্করাজাতীয় পদার্থ; ৩নং—স্নেহজাতীয় পদার্থ; ৪নং—লবণজাতীয় পদার্থ এবং ৫নং—ভিটামিন।

আমাদের শরীরকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে এই পাঁচটি জিনিষ একান্ত প্রয়োজনীয়। তাছাড়া এর সঙ্গে জল তো আছেই। প্রোটিনজাতীয় খাদ্যের মধ্যে মাছ, মাংস, ডিম, ডাল, দুধ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এদেব কথা আমরা কিছু কিছু জানি। কিন্তু এদের

কাজ কি? একথা জানতে নিশ্চয়ই আমাদের ইচ্ছা হয়। এরা সাধারণতঃ আমাদের দেহের ক্ষয় নিবারণ ও দেহের বৃদ্ধি সাধন করে। দেহে মাংস হয় এবং শরীর সুস্থ ও সবল হয়। এর আর একটা কাজ, শরীরে তাপ উৎপাদন করা এবং এই তাপকে বলা হয় ক্যালোরি।

১ গ্র্যাম জলকে ১$^{\circ}$ সেন্টিগ্রেডে তুলতে যে তাপের প্রয়োজন হয়, তাকেই ক্যালোরি বলে। দেখা গেছে, ১ গ্র্যাম প্রোটিন থেকে আমরা ৪.৫ ক্যালোরি তাপ পেতে পারি। কাজেই এটা স্বাভাবিক, যে যত বেশী প্রোটিন খাবে, তার শরীরে তত বেশী তাপ উৎপন্ন হবে। কিন্তু প্রত্যেক জিনিষের একটা সীমা আছে। তার উর্ধ্বে গেলে শরীর খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা। তাই বৈজ্ঞানিকেরা এর একটা সীমা নির্ধারণ করেছেন। সাধারণতঃ আমাদের দেশের লোকের দৈনিক ৭০-৬৫ গ্র্যাম প্রোটিন পেলেই যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের দেশের লোক ক'জন ৭৫ গ্র্যাম বা ১॥ ছটাক প্রোটিন খেতে পায়? এই প্রশ্নের হিসাব দিতে গেলে বিপদে পড়ে যাব। ওদিকে না যাওয়াই ভাল। তবে এটুকু হলফ করে বলতে পারা যায় যে, শতকরা ৯৫ জন বা ততোধিক আমাদের দেশে প্রোটিন খাদ্য পায় না। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কি করে বেঁচে আছি?

বেঁচে থাকবার কারণও কিছুটা আছে। দুধ, ডিম, মাংস রোজ খাই বা না খাই, ভাত ও ডাল আর শাকসবজী আমরা কমবেশী খাই-ই। চালে শতকরা ৭ থেকে ৮ ভাগ প্রোটিন থাকে। ডালে ১৫ থেকে ২০ ভাগ। এখানে বলে রাখা ভাল, চালের প্রোটিন অতি সহজেই হজম করা যায়। শাকসব্জীতে অবশ্য বিশেষ কিছু থাকে না। আর থাকলেও তা সহজে হজম করা যায় না। এগুলি ঠিক আমরা ওজন করে খাই না। পেট কোন রকমে ভর্তি হলে সন্তুষ্ট হই। যাহোক, এই করেই আমরা কোন রকমে বেঁচে আছি। এ ছাড়াও নানারকম ফলের বীচিতে প্রোটিন থাকে। অনেক সময় শোনা যায় যে, গ্রাবের লোকেরা অভাবের সময় কাঁঠালের বীচি খেয়ে থাকে। কাঁঠালের বীচিতে বা চীনাবাদাম জাতীয় খাদ্যে প্রোটিন বেশী পরিমাণেই আছে। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এসব প্রোটিন হজম করা মুস্কিল; ঠেকায় না পড়লে অথবা সময়কালীন খাদ্য না হলে আমরা বড় একটা খাই না।

প্রোটিন ছেড়ে এবার শর্করাজাতীয় খাদ্য নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। শর্করাজাতীয় খাদ্যের মধ্যে ভাত, আলু, আটা, ময়দা প্রভৃতিই প্রধান। এদের কাজ দেহে শক্তি উৎপাদন করা। বাড়ীতে রান্না করতে গেলে যেমন কাঠ বা কয়লার প্রযোজন, আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশের কাজ করতেও এই শর্করার প্রয়োজন। এই শর্করাজাতীয় খাদ্যই আমাদের শরীরে কয়লা বা কাঠের কাজ করে। ১ গ্র্যাম শর্করা থেকে আমরা প্রায় ৫ ক্যালোরি তাপ পেতে পারি। এই শর্করাজাতীয় খাদ্যগুলি রূপান্তরিত হয়ে গ্লাইকোজেন নামক পদার্থে পরিণত হয়। আমাদের শরীরে এই

গ্লাইকোজেন যেন একটা ভাঁড়ারের মত; দরকার মত আমাদের রক্তে গ্লুকোজ সরবরাহ করে। ডাক্তারের কাছে গেলে দুর্বল রোগীদের সবল করবার জন্যে তাঁরা গ্লুকোজ খাওয়ার পরামর্শ দেন। এই গ্লুকোজ আমাদের শরীরে যাবতীয় কাজ করতে সাহায্য করে। শরীরের যন্ত্রগুলি দীর্ঘকাল রোগভোগের পর বা অন্য কোন কারণে যখন বিকল হয়ে যায়, তখন গ্লুকোজ শরীরের বিভিন্ন কাজগুলি খুব অল্প সময়েই সম্পন্ন করে।

আমাদের এই শর্করাজাতীয় খাদ্য কতখানি খাওয়া প্রয়োজন তা বলা দরকার। বিজ্ঞানীরা অবশ্য বলেন যে, সাধারণ মধ্যবয়স্ক লোকের পক্ষে দৈনিক ৪০০-৫০০ গ্র্যাম বা আধসের ভাত যথেষ্ট। বোধ করি আমাদের দেশে অন্য সবের কোন বালাই নেই; খাওয়ার ভিতর এই ভাতই আমরা খাই।

স্নেহ বা তৈলজাতীয় পদার্থের নাম আমরা কিছু কিছু জানি। তেল, ঘি, চর্বি ইত্যাদি সাধারণতঃ এই জাতীয় খাদ্যের ভিতর পড়ে। তৈলজাতীয় খাদ্য না খেলে শরীর মসৃণ বা শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা হয় না। আবার শরীরে বেশী চর্বি হওয়াও এক বিড়ম্বনা। আমরা সময় সময় মোটা লোক দেখি—হাঁটতে কি কষ্টই না হয়! ডাক্তারেরা এসব ক্ষেত্রে স্নেহজাতীয় খাদ্য, এমন কি ভাত খাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দেন। এর তাপ উৎপাদন করবার ক্ষমতা প্রোটিন বা শর্করাজাতীয় খাদ্যের প্রায় ২ গুণ। ১ গ্র্যাম স্নেহ-জাতীয় পদার্থ থেকে প্রায় ৯ ক্যালোরি তাপ পাওয়া যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, এই তৈলজাতীয় পদার্থ বাদ দেওয়ার পরও শরীর মোটা হয় ও চর্বি জমে। কেমন করে তা সম্ভব? দেখা গেছে, শর্করাজাতীয় খাদ্যই শরীরে চর্বি উৎপাদন করতে পারে। তবে সাধারণতঃ যে সব স্থূলকায় লোক দেখা যায়, মোটা হওয়াটা তাদের একটি রোগে দাঁড়িয়ে যায়। এই রোগকে Obesity Disease বলা হয়ে থাকে।

আমাদের মূল খাদ্যের মধ্যে এই প্রোটিন, শর্করা বা স্নেহজাতীয় খাদ্যই প্রধান। আজকাল বিজ্ঞানীরা এই তিন জাতীয় পদার্থের একটা পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। তাঁদের ভাষায় এই খাদ্যকে Balanced Diet বলা হয়। এর সাধারণ অর্থ করলে কি এই দাঁড়ায় যে, আমাদের খাদ্যদ্রব্যগুলি Balance বা মানদণ্ডে ওজন করে খেতে হবে? না, তা একেবারেই নয়। আমাদের শরীরের পুষ্টির জন্য খাদ্যের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। তার বেশী খেলে অতিরিক্ত অংশ নষ্ট হবে। আবার কম খেলে শরীর পুষ্ট হবে না। সেই কারণেই এই Balanced Diet-এর প্রয়োজন। তাতে আমাদের অপচয় কমবে। একেই তো গরীবের দেশ এটা, তার মধ্যে খাদ্যদ্রব্য যতটুকু সঞ্চয় করা যায় ততই ভাল।

খাদ্যের পরিমাণের পিছনে একটি মজার ব্যাপার আছে। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন যে, আমাদের মত দেশে সাধারণ পরিশ্রমী মানুষের দেহ থেকে প্রায় ৩০০০ ক্যালোরি তাপ বেরিয়ে যায়। এই পরিমাণ তাপ অবশ্যই বাইরে থেকে এনে দিতে হবে; আর তা না হলে আমরা বেসামাল হয়ে পড়বো। সেই দিক থেকে বিচার

করে খাদ্য-বিজ্ঞানীরা আমাদের প্রোটিন, শর্করা এবং তৈলজাতীয় খাদ্যের একটা পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন।

যেমন—প্রোটিন	—	১০০	গ্র্যাম
স্নেহজাতীয় বা তৈলজাতীয় খাদ্য	—	৮০-৯০	গ্র্যাম
শর্করা	—	৪০০-৫০০	গ্র্যাম

এসব খাদ্য থেকে প্রায় ৩০০০ ক্যালোরি তাপ পাওয়া যেতে পারে। এই ভাবে আমাদের শরীরে একটা সমতা রক্ষা হয়। মোটামুটি আমাদের তিনটি প্রধান খাদ্যের কথা শেষ হলো।

তবে এই সঙ্গে আমাদের রুচি বা হজমের জন্যে কিছু লবণজাতীয় বা ভিটামিন খাদ্যের প্রয়োজন। অবশ্য ভাত খেতে বসলে আমাদের লবণ কমবেশী রোজই খাওয়া হয়, এবং শাকসব্জী থেকে আমরা ভিটামিন ও লবণ বেশ পরিমাণে পাই। শীতকালে শাকসব্জী, মূলা কফি, আলু, বেগুন, বরবটি প্রভৃতি যথেষ্ট পাওয়া যায়। এগুলি ভিটামিন বা লবণজাতীয় খাদ্যের অভাব পূরণ করে। আর তাছাড়া আমাদের শরীরের দিক থেকে এগুলি বিশেষ উপকারী।

জলের কথা না বললে আমাদের খাদ্যের তালিকা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তবে জলের উপর কোন বাধাধরা নিয়ম নেই। যার যা খুসী সেই পরিমাণে খেতে পারে। কিন্তু জলকে খাদ্যের প্রধান অংশ ভেবে বেশী খেতে যাওয়া নিশ্চয়ই ভাল নয়।

শ্রীসন্তোষকুমার দাশগুপ্ত

জানবার কথা

১। আদিম কালের ঘোড়া আর আর আধুনিক ঘোড়ার মধ্যে আকারগত পার্থক্য

১নং চিত্র

অনেকখানি। সবচেয়ে বিশেষ পার্থক্য হচ্ছে তাদের পায়ে। এখনকার ঘোড়ার পায়ে খুর

আছে, কিন্তু কোন আঙ্গুল নেই, ঘোড়ার প্রাচীনতম পূর্বপুরুষদের পায়ে কিন্তু আঙ্গুল ছিল। ক্রমবিবর্তনের ধারায় এই আঙ্গুলিগুলি লুপ্ত হয়ে যায়, থাকে মধ্যম আঙ্গুলটি। এই আঙ্গুলটিই বর্তমানে খুরের আকার ধারণ করেছে। এর দু'পাশে লুপ্ত আঙ্গুলগুলির চিহ্ন এখনও বর্তমান।

২। বিজ্ঞানীরা মনে করেন ডিয়ারফ্লাই হচ্ছে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী প্রাণী। ডিয়ারফ্লাই একজাতের মাছি। এতকাল ধারণা ছিল, এরা নাকি ঘণ্টায় ৮১৮ মাইল বেগে উড়তে পারে। পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ডাঃ আই, ল্যাংম্যুর এই ধারণার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ৮১৮ মাইল বেগে ডিয়ারফ্লাই উড়তেই পারে না।
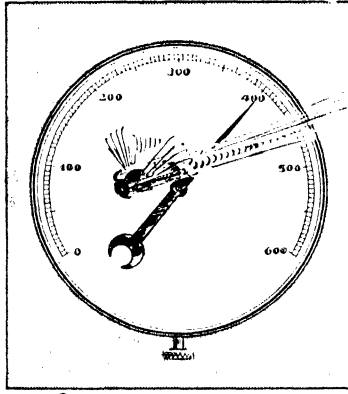
২নং চিত্র

কারণ, তাহলে বাতাসের প্রচণ্ড চাপে পিষ্ট হয়ে তার মৃত্যু অবধারিত। এবিষয়ে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের ফলে এখন জানা গেছে যে, ডিয়ারফ্লাই-এর গতিবেগ হচ্ছে ঘণ্টায় ৪০। মাইল। তাও কি কম?

৩নং চিত্র

৩। কেবল মানুষদেরই নয়, মাছেরও নাকি নির্দিষ্ট ভোজনশালা আছে। জীব-

তাত্ত্বিকেরা বলেন, বড় বড় মাছ নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে সেখানকার কুঁচো চিংড়ি ও অন্যান্য ক্ষুদ্রকায় মাছ এবং তাদের দেহসংলগ্ন পরজীবী কীটাণু উদরসাৎ করে ভোজনপর্ব সমাধা করে।

৪। সব ঝড়েই দেশের ক্ষতি হয়। ঝড়ের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন নামকরণ হয়ে থাকে, যেমন ইংরেজীতে হারিকেন, টর্নেডো এবং বাংলায় ঝড়, তুফান ইত্যাদি।

৪নং চিত্র

হারিকেন ঝড়ের বিস্তৃতি বেশী, দেশের অনেকখানি জায়গা জুড়ে চলে এর তাণ্ডব। টর্নেডো হলো ঘূর্ণীবাত্যা। ধ্বংসকারী ক্ষমতায় টর্নেডো হারিকেনকেও হার মানায়। সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ঝড় হলো এই টর্নেডো।

বিবিধ

ভারতীয় বিজ্ঞানীর সম্মান

গত ২১শে মার্চ ভারতীয় পারমাণবিক শক্তি বিভাগের ডাঃ ডি. এন. ওয়াদিয়া বিখ্যাত বৃটিশ বৈজ্ঞানিক সংস্থা রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হইয়াছেন।

ডাঃ ওয়াদিয়ার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও কৃতিত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কয়েকজন রয়েল সোসাইটির ফেলো কিছুকাল পূর্বে তাঁহার নাম সুপারিশ করেন এবং যথাকালে কাউন্সিল তাঁহার এবং অন্যান্য ফেলোশিপপ্রার্থী বৈজ্ঞানিকদের যোগ্যতা ও গুণাবলী তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করিয়া দেখেন। প্রতিবৎসর সারা বিশ্ব হইতে অনধিক মাত্র ২৫ জন বৈজ্ঞানিককে ফেলো নির্বাচিত করা হয়; সেই জন্য প্রার্থীদের নামের তালিকা হইতে বহু নাম বাদ দিতে হয়।

প্রার্থীদের নাম সুপারিশ ও নির্বাচনের নিয়ম-কানুন অতিশয় কঠোর এবং যাঁহারা নাম প্রস্তাব করেন ও সমর্থন করেন তাঁহাদের পরিচয় গোপন রাখা হয়।

গত ২১শে মার্চ সার সিরিল হিনসেলউডের সভাপতিত্বে রয়্যাল সোসাইটির যে অধিবেশন হয় তাহাতে কাউন্সিল প্রস্তাব করেন যে, হিমালয়ের ভূতাত্ত্বিক স্তর সম্পর্কে ডাঃ ওয়াদিয়া যে মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাকে রয়্যাল

সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত করা হউক। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বর্তমানে ডাঃ ওয়াদিয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের পারমাণবিক শক্তি বিভাগের ভূতাত্ত্বিক উপদেষ্টার পদে নিযুক্ত আছেন।

ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর

বিগত ১৩ই মার্চ আমেরিকার কলা ও বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর একটি সভায় ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখরকে রামফোর্ড পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। এই পুরস্কারের মধ্যে আছে স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক এবং এক হাজার ডলার অর্থ। অ্যাকাডেমীর অতি সম্মানজনক ও প্রাচীনতম পুরস্কারের মধ্যে ইহা

অন্যতম। অ্যাকাডেমীর প্রেসিডেণ্ট এবং ম্যাসাচুসেট্সের ইনষ্টিট্যুট অব টেক্নোলোজীর বিজ্ঞানের বিষয় ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ডীন জন ই. বার্চার্ড ডাঃ চন্দ্রশেখরের হস্তে স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক অর্পণ করেন এবং এক হাজার ডলার মূল্যের চেকটি দেন অ্যাকাডেমীর কোষাধ্যক্ষ টমাস বয়েলষ্টন অ্যাডামস।

রামফোর্ড কমিটির সকল সদস্যের সম্মতিক্রমে এই পুরস্কার ডাঃ চন্দ্রশেখরকে দেওয়া হয়। ইনি ১৯১০ সালে ভারতে জন্মগ্রহণ করেন এবং শিক্ষালাভ করেন মাদ্রাজ ও কেম্ব্রিজে। ১৯৩৩ সালে ডাঃ চন্দ্রশেখর ট্রিনিটি কলেজ হইতে থিওরেটিক্যাল ফিজিক্সে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন।

১৯২৪ সাল হইতে ১৯৪৮ সালের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁহার যে গবেষণামূলক প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার গুণাগুণ বিচার করিয়াই তাঁহাকে এই পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

রামফোর্ড কমিটির চেয়ারম্যান এবং ম্যাসাচুসেট্স্ ইনষ্টিট্যুট অব টেক্নোলোজীর পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক স্যাণ্ডবর্ণ ব্রাউন সভায় সমাগত অতিথিবৃন্দ এবং রামফোর্ড কমিটির সদস্যবৃন্দের নিকট ডাঃ চন্দ্রশেখরের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে বলেন যে, তাঁহার যে সকল প্রবন্ধের উপর এই পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে সেই সকল যেমনই অসাধারণ তেমনই অবিস্মরণীয়।

অধ্যাপক ব্রাউন তাঁহার বক্তৃতার প্রারম্ভেই ডাঃ চন্দ্রশেখরকে ১৯৪৬ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়েরকিজ মানমন্দিরে বিশিষ্ট অধ্যাপক বলিয়া যে সম্মান দেওয়া হইয়াছিল তাহার কথা উল্লেখ করেন। ডাঃ চন্দ্রশেখর বিগত ২১ বৎসর ধরিয়া শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত রহিয়াছেন।

অ্যাকাডেমীর প্রায় আড়াই শত সদস্য ও অতিথি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। গত দেড়শত বৎসরের মধ্যে আমেরিকার প্রায় সকল বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিককেই এই পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করা হইয়াছে।

কাউণ্ট রামফোর্ড প্রদত্ত অর্থ হইতে এই পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে। ইনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট জন অ্যাডাম্সের হস্তে এই অর্থ অর্পণ করেন। মিঃ অ্যাডাম্স্ আমেরিকার কলা ও বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীরও প্রেসিডেণ্ট ছিলেন।

কাউণ্ট রামফোর্ড ১৭৫৩ সালে ম্যাসাচুসেট্সে জন্মগ্রহণ করেন। আলো ও তাপ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁহার উল্লেখযোগ্য অবদান রহিয়াছে।

বিশ্বের বৃহত্তম তেজস্ক্রিয় খনি

ভারতের পারমাণবিক শক্তি বিভাগ উত্তর-পূর্ব ভারতের কোন একস্থানে সম্প্রতি যে পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন খনিজ আকরের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহাই সম্ভবতঃ বিশ্বের সর্ববৃহৎ তেজস্ক্রিয় খনিজের আকর। ইতিমধ্যেই এখানে যে সব অনুসন্ধান চালান হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, এই আকরে ৩ লক্ষ টন থোরিয়াম সহ ৩০ লক্ষ ৩০ হাজার টন খনিজ পদার্থ মজুত আছে। ইহা ছাড়াও এখানে ১০ হাজার টন ইউরেনিয়াম এবং ৮ কোটি টন ইলমেনাইট মজুত আছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। বিস্তৃত অনুসন্ধানের ফলে এই হিসাব দ্বিগুণিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ত্রিবাঙ্কুরের বিখ্যাত আকরটিকেই এতদিন বিশ্বের বৃহত্তম খনি বলিয়া গণ্য করা হইত; কিন্তু অতঃপর উত্তর-পূর্ব ভারতের এই নূতন খনিটিকেই বিশ্বের সর্ববৃহৎ তেজস্ক্রিয় খনি বলিয়া গণ্য করা হইবে।

মঙ্গল গ্রহে উদ্ভিজ্জ

মস্কোর একটি পত্রিকায় সম্প্রতি মঙ্গল গ্রহ পর্যবেক্ষণের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এই পর্যবেক্ষণের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মঙ্গল গ্রহে জীবনের কোনও অস্তিত্ব আছে কিনা, সে সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

সোভিয়েট বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর অন্যতম সদস্য জি টি থৎ আলমা আটা থেকে লিখেছেন যে, সেখানকার মানমন্দির থেকে মঙ্গলগ্রহের বিভিন্ন অংশের বহু ছবি নেওয়া হয়েছে। এই সকল পর্যবেক্ষণের ফলে তাঁরা যে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন তা এই যে, মঙ্গল গ্রহে উদ্ভিজ্জের অস্তিত্ব রয়েছে। তবে এই উদ্ভিজ্জের সঙ্গে পৃথিবীর উদ্ভিজ্জের সামঞ্জস্য নাও থাকতে পারে। মঙ্গল গ্রহের পরিবেশ প্রাণের অস্তিত্ব ও বিকাশের পক্ষে অনুকূল। মঙ্গল গ্রহে জল আছে। সেখানকার আবহাওয়ায় প্রধানতঃ নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও সামান্য পরিমাণ অক্সিজেন আছে। ক্রমাগত ছ'মাস ধরে মঙ্গল গ্রহের তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, সেখানে তাপ হিমাঙ্কের ১০° থেকে ১৫° ডিগ্রি পর্যন্ত উপরে থাকে। ফলতঃ এই গ্রহের আবহাওয়া জীবনধারণের পক্ষে অনুকূল।

ইউক্রাইনের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমী থেকে এন. বার্বাশভ লিখছেন, সোভিয়েট জ্যোতিবিজ্ঞানী যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাতে মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীর মত সেখানে সমুদ্র, মরু এবং তুষারধবল পর্বত আছে।

মঙ্গল গ্রহের পৃষ্ঠদেশ যে সমতল, সে বিষয়ে বিজ্ঞানীদের এখন আর কোন সন্দেহ নেই। আমাদের পৃথিবীতে যেমন উচ্চ পর্বতশ্রেণী বা গভীর খাদ রয়েছে, মঙ্গল গ্রহে সে রকম নেই।

সোভিয়েট ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা মঙ্গল গ্রহে ঘণ্টায় ২৫ থেকে ৩০ কিলোমিটার গতিতে মেঘ উড়ে যেতে দেখেছেন। এথেকে মঙ্গল গ্রহে বায়ুপ্রবাহের অস্তিত্বের আভাস পাওয়া যায়।

১৯৫৬ সালের ২৩শে আগষ্ট মারকভ মানমন্দির থেকে মঙ্গল গ্রহে যে টুক্‌রা টুক্‌রা হাল্কা রঙের বস্তু দেখা গেছে তা তুষার বা কুয়াসাজাত বলে অনুমান করা হয়েছে।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দশম বর্ষ | মে, ১৯৫৭ | পঞ্চম সংখ্যা

আধুনিক গণিত*

শ্রীসঞ্জয়কুমার লাহিড়ী

ঊনবিংশ শতকের প্রথম দশক থেকেই গণিতের রাজ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। নতুন চেতনায় পূর্বতন গাণিতিক ধারণাগুলির মূলে হয়েছে কুঠারাঘাত। পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহগুলি নিজ নিজ কক্ষপথে থেকে সূর্যকে পরিক্রমণ করছে—কোপারনিকাসের এই আবিষ্কার যেমন তৎকালীন জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনার নতুন ভিত্তি রচনা করেছে, তেমনি ঊনবিংশ শতকের গণিতবেত্তাদের গণিতালোচনাও গণিতের নতুন ভিত্তি স্থাপন করেছে। জ্যামিতি, পাটীগণিত, বীজগণিত কোনটাই আর বাদ রইলো না, সবগুলির আলোচনাই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আরম্ভ হলো। আগে গণিত ছিল কতকগুলি ছোট ছোট কুঠুরিতে ভাগ করা। তাছাড়া গণিতের গণ্ডীও ছিল তখন খুবই ছোট। মাত্র এক শতকের গণিতালোচনায় প্রমাণিত হলো যে, গণিতের শাখাগুলি একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য তো নয়ই, পরন্তু এমন ব্যাপক প্রতিজ্ঞা (Theorem) আছে যার সাহায্য নিলে দুটা বিভিন্ন শাখার গাণিতিক প্রতিজ্ঞার ব্যাখ্যা একবারেই দেওয়া যেতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্যাপকতর গাণিতিক ধারণাগুলি শুধু গণিতের বিভিন্ন শাখার মধ্যেই সম্পর্ক খুঁজে পেল না, ব্যবহারিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যেও সাদৃশ্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হলো। উদাহরণরূপ বলা যায়—আলো, শব্দ, বিদ্যুৎ প্রভৃতির আলোচনা করতে গিয়ে গণিতজ্ঞেরা দেখালেন যে, এক তরঙ্গবাদ (Wave theory) দিয়েই এই সবগুলির ব্যাখ্যা করা সম্ভব। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের গাণিতিক আলোচনার ফলে গণিতের গণ্ডী অবিশ্বাস্যভাবে বেড়ে গেছে। গণিতের ব্যবহার হয় না, চিন্তারাজ্যে এমন দিক এখন প্রায় নেই বললেই চলে।

সাধারণভাবে মনে হয় যে, গণিতের গণ্ডী এতটা বেড়ে যাওয়ার পেছনে এত বড় বড় গাণিতিক গণনা রয়েছে যার আঁচ একমাত্র গণিতে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া আর কারুর পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়; কিন্তু আলোচনা করলে দেখা যায় যে, আধুনিক গণিত প্রচলিত গণিত (Classical Mathematics) অপেক্ষা অনেক ক্ষেত্রেই অধিকতর সহজ। প্রচলিত

গণিতের ধারণাগুলিকে আরও ব্যাপক সাধারণ এক নিয়মের মধ্যে বেঁধে দেওয়াই আধুনিক গণিতের উদ্দেশ্য।

গণিতের বিকাশের গোড়ার দিকে পাটীগণিত ও জ্যামিতি—এই দুটি পরস্পর নিরপেক্ষ শাখারূপে গড়ে উঠেছিল। এভাবে কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর পাটীগণিতের প্রয়োজনের তাগিদে হলো বীজ-গণিতের সৃষ্টি। বেশ কয়েক শতক ধরে জ্যামিতি ও বীজগণিত একে অন্যের নিরপেক্ষই থেকে গেল। তবে এটা প্রমাণিত হয়েছিল যে, বীজগণিতের কতকগুলি সূত্রের প্রমাণ জ্যামিতির সাহায্যে দেওয়া সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ দেখানো যায় যে, $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$—এই সূত্রটির প্রমাণ যেমন বীজগণিতের সাহায্য নিয়ে করা যায় তেমনি আবার জ্যামিতির সাহায্যেও করা সম্ভব। ডেকার্টে প্রথম দেখালেন যে, বীজগণিত এতটা ব্যাপক যে, এর সাহায্য নিয়ে যে কোনও জ্যামিতিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। ডেকার্টেই বিশ্লেষণীয় জ্যামিতির স্রষ্টা।
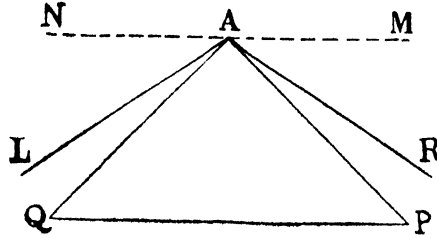
ইউক্লিডের জ্যামিতিতে কল্পিত সমান্তরাল সরল রেখা তাঁর পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরেই গণিতজ্ঞদের আলোচনার বস্তু হয়ে রইলো। ইউক্লিড কল্পনা করেছিলেন যে, যদি এক সমতলে একটি বিন্দু ও একটি সরল রেখা দেওয়া থাকে তবে প্রদত্ত বিন্দুটি দিয়ে সেই সমতলে একটিমাত্রই সরলরেখা টানা যাবে, যে সরল রেখাটি প্রদত্ত সরল রেখাটিকে আর ছেদ করবে না এবং প্রদত্ত রেখাটির সমান্তরাল সরল রেখা হবে। ইউক্লিড সমান্তরাল সরল রেখার এই সংজ্ঞাটিকে স্বীকার্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। কোন বিন্দু দিয়ে সেই সমতলে অবস্থিত কোন সরল রেখার সমান্তরাল একটি মাত্র রেখাই যে টানা যাবে, ইউক্লিড এটা প্রমাণ করতে ওপ্রয়াসী হন নি। ইউক্লিডের পরবর্তী কালে টলেমি (দ্বিতীয় শতাব্দী-এ. ডি.), প্রক্লুস্ (পঞ্চম শতাব্দী-এ. ডি.), নাসিরেদ্দিন (ত্রয়োদশ শতাব্দী-এ. ডি.), সাকেরী (১৭-১৮শ শতাব্দী) প্রভৃতি অনেক গণিতবেত্তাই এটাকে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কেউই এতে সফলকাম হতে পারেন নি।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বোয়াই (১৮০২-১৮৬০), লোবাচেব্স্কি (১৭৯৩-১৮৫৬), গাউস্ (১৭৭৭-১৮৫৫), রীম্যান (১৮২৬-১৮৬৬) প্রভৃতি মনীষিগণ দেখালেন যে, ইউক্লিডের সমান্তরাল সরল রেখার কল্পনা মেনে না নিলেও ইউক্লিডের জ্যামিতির মতই সঙ্গতিপূর্ণ জ্যামিতি রচনা করা সম্ভব। এখন যদি ইউক্লিডের কল্পিত সমান্তরাল সরল রেখার কল্পনা মেনে নেওয়া না হয় তবে অবস্থাটা কি দাঁড়ায়? একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, দুটা সম্ভাবনা সম্ভব। মনে করা যাক—A বিন্দু ও QP রেখা একই সমতলে অবস্থিত (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

১নং চিত্র

তবে সম্ভাবনা—

(১) A বিন্দু দিয়ে ঐ সমতলে এমন কোন রেখা আঁকা যাবে না, যে রেখা QP-কে কখনই ছেদ করবে না [অথবা finite distance-এ ছেদ করবে না]

(২) A বিন্দু দিয়ে একাধিক বা অসংখ্য

রেখা আঁকা যাবে, যে রেখাগুলি কখনই QP-কে ছেদ করবে না।

প্রথমতঃ দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি আলোচনা করে প্রায় একই সময়ে বোয়াই, লোবাচেব্স্কি ও গাউস্ প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক ভাবে দেখালেন যে, আমরা যদি ইউক্লিডীয় সমান্তরাল রেখার কল্পনার পরিবর্তে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিকে ধরে নিই যে, কোন বিন্দু দিয়ে একই সমতলে এমন একাধিক সরল রেখা আঁকা সম্ভব, যে রেখাগুলি সেই সমতলে অবস্থিত একটি নির্দিষ্ট রেখার সঙ্গে কখনই মিলিত হবে না, তবে এই কল্পনাকে আশ্রয় করেও আমরা ইউক্লিডীয় জ্যামিতির মতই সঙ্গতিপূর্ণ অপর এক জ্যামিতি গড়ে তুলতে পারি। বোয়াই, লোবাচেব্স্কি ও গাউস ইউক্লিডীয় কল্পনার বিরোধী কল্পনাকে আশ্রয় করে যে জ্যামিতি রচনা করলেন, তাই পরাবৃত্তিক জ্যামিতি (Hyperbolic geometry) নামে পরিচিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই হলো প্রথম নন্-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি।

পরাবৃত্তিক জ্যামিতির আবিষ্কারের পরে মাত্র কয়েক বছর কেটেছে। ১৮৫৪ সালের ১০ই জুন তারিখে মাত্র আটাশ বছরের এক তরুণ গোটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে গাউস প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের সম্মুখে তাঁর গবেষণার ফল প্রকাশ করলেন। তিনি প্রথম সম্ভাবনাটি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি ধরে নিলেন যে, কোন বিন্দু দিয়ে এমন কোন সরল রেখা আঁকা যাবে না, যে রেখা ঐ সমতলে অবস্থিত অপর একটি রেখাকে নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে ছেদ করবে না। তিনি তাঁর গবেষণা থেকে দেখালেন যে, যদিও উক্ত কল্পনা ইউক্লিডীয় কল্পনার বিরোধী, তবুও একে আশ্রয় করে সঙ্গতিপূর্ণ এক জ্যামিতি রচনা করা যেতে পারে। এই যুবকের নামই রীম্যান। রীম্যান যে নতুন জ্যামিতির প্রবর্তন করেন, সেই জ্যামিতি স্রষ্টার নামানুসারে রীম্যানীয় জ্যামিতি নামে পরিচিত। ১৮৫৪ সালের ১০ই জুন রীম্যান যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেই বক্তৃতাটিকেই গাউস তাঁর দীর্ঘজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা বলে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন।

রীম্যানের আবিষ্কৃত জ্যামিতি শুধু বিশুদ্ধ গণিতের রাজ্যেই বিপ্লব এনে স্থির রইলো না। রীম্যানীয় জ্যামিতি আবিষ্কারের পর থেকেই গাণিতিক পদার্থবিদ্যার আলোচনাতেও যুগান্তর দেখা দিল। ইউক্লিডীয় জ্যামিতি সমতলের জ্যামিতি। সুতরাং কেবলমাত্র সমতল সম্বন্ধীয় আলোচনাতেই ইউক্লিডীয় জ্যামিতি নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু ব্যবহারিক বিশ্বে সমতল খুব কম সময়েই পাওয়া যায়। এমন কি, যে পৃথিবীর উপরিভাগে আমাদের বাস, সেই পৃথিবীর উপরিভাগও সমতল নয়। সুতরাং ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সাহায্যে পৃথিবীর উপরিভাগ সম্বন্ধে যে সব তথ্য আহরণ করা হয়, সেগুলি নির্ভুল হতে পারে না। পরন্তু রীম্যানীয় জ্যামিতি শুধুমাত্র তলের জ্যামিতি। সে তল আঁকাবাঁকা বা উঁচুনীচু, যা-ই হোক না কেন, রীম্যানের জ্যামিতি তাতে প্রযোজ্য। এমন কি, যদি সেই তলকে মুচ্ড়ে ফেলা যায় তাতেও কিছু আসে-যায় না; কেবল লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তলটিকে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করা হয় নি। রীম্যানের জ্যামিতি যে কোন তলের উপরে প্রযোজ্য হওয়ায় পদার্থবিদ্যার গাণিতিক আলোচনায় এই জ্যামিতির ব্যবহার বহুলভাবে প্রচলিত হয়েছে। বিশেষতঃ ক্ষেত্রবাদ (Field theory) এবং তরঙ্গবাদ (Wave theory)-এর আলোচনা রীম্যানীয় জ্যামিতির সাহায্যে বেশ সুষ্ঠুভাবে করা যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আইনষ্টাইন যে বক্র দেশের (Curved Space) বিষয় আলোচনা করেন, তাতেও রীম্যানীয় জ্যামিতির সাহায্য নিতে হয়েছিল। আপেক্ষিকতাবাদের আলোচনাও রীম্যানীয় জ্যামিতির সাহায্যেই করা হয়েছে। অনেকেই মনে করেন যে, রীম্যানীয়

জ্যামিতির সাহায্য না পেলে আইনষ্টাইনের পক্ষেও বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আপেক্ষিকতাবাদের প্রবর্তন করা সম্ভব হতো না।

গাণিতিক রাজ্যের এই পরিবর্তন কেবল জ্যামিতির মধ্যেই সীমায়িত রইলো না। বীজ-গণিতের ধারণার মধ্যেও আমূল পরিবর্তন দেখা দিল। জ্যামিতির রাজ্যে যুগান্তর আনয়নের জন্যে যেমন বোয়াই, লোবাচেব্‌স্কি, গাউস ও রীম্যানের নাম করতে হয়েছিল তেমনি বীজগণিতের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী প্রবর্তনের জন্যে নাম করতে হয় জর্জ ক্যাণ্টরের (১৮৪৫-১৯১৮)। জর্জ ক্যাণ্টরের জীবনকাহিনী বড়ই বিষাদময়। তরুণ ক্যাণ্টর Set Theory যখন প্রথম প্রকাশ করেন, ক্রোনেকার (১৮২৩-১৮৯১) তখন বার্লিন বিশ্ববিত্থালয়ের অধ্যাপক। ক্রোনেকার ক্যাণ্টরের Infinite set theory-কে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করতে পারলেন না। তিনি তীব্র ভাষায় Infinite Set Theory-কে আক্রমণ করলেন। এটা বুঝতে দেরী হলো না যে, বার্লিন বিশ্ববিত্থালয়ের এক ছাদের নীচে ক্রোনেকার ও ক্যাণ্টর এই দু’জনেরই স্থান হতে পারে না। ক্রোনেকার তখন বার্লিন বিশ্ববিত্থালয়ের অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত। সুতরাং ক্যাণ্টর তাঁর আবাল্য ঈপ্সিত বার্লিন বিশ্ববিত্থালয়ের অধ্যাপক পদ লাভ করতে পারলেন না। ক্রোনেকারের তীব্র আক্রমণে বিপর্যস্ত ক্যাণ্টর দারিদ্র্যের পীড়নে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। চিকিৎসার জন্যে ক্যাণ্টরকে আশ্রয় নিতে হলো মানসিক চিকিৎসালয়ে।

ক্যাণ্টরের পূর্ব পর্যন্ত অনন্ত রাশির (infinity) আলোচনা করা প্রায় হতোই না। এমন কি, গাউসের মত গণিতজ্ঞও অনন্ত রাশির আলোচনাকে সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। Set Theory-র সাহায্য নিয়ে ক্যাণ্টরই প্রথম অনন্ত রাশির আলোচনা করেন। অনন্ত রাশির সাহায্য নিয়ে আমরা যে ফল পেয়ে থাকি সেগুলি সাধারণভাবেই আমাদের পাটীগণিতের ধারণায় অসম্ভব বলে মনে হয়। একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। AB ও A′B′ দুটা সরল রেখা আছে। যদি বলা যায় যে A′B′ অংশটিতে যতগুলি বিন্দু আছে, AB অংশটিতেও ততগুলিই বিন্দু আছে—তবে সবাই প্রায় একবাক্যে স্বীকার করে নেবে যে, লোকটার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে। কারণ সাধারণ ভাবেই দেখা যাচ্ছে যে, A′B′ অংশটি AB অংশ থেকে অনেকটা বড়। সুতরাং A′B′-এর উপর বিন্দু সংখ্যা, AB-এর উপরের বিন্দু সংখ্যা থেকে অনেক বেশী। কিন্তু আর একটু তলিয়ে দেখলে ব্যাপারটাকে অতটা ভ্রমাত্মক বলে মনে হবে না।

২নং চিত্র

মনে করা যাক, দুটা কৌটায় দু’রকম মার্বেল আছে—প্রথমটিতে সাদা রঙের আর দ্বিতীয়টিতে কালো রঙের। কাউকে যদি প্রশ্ন করা হয়, কোন্ রঙের মার্বেলের সংখ্যা বেশী? তবে সে তখনি

সাদা মার্বেল ও কালো মার্বেলের সংখ্যা গুণে বলে দেবে, কোন্ রঙের মার্বেলের সংখ্যা বেশী ; অথবা উভয়ের সংখ্যা সমান হলে তাও বলে দেবে। এখন যদি ছুটা কৌটার একটাতে ১৫টা সাদা মার্বেল ও অপরটাতে ১৩টা কালো রঙের মার্বেল থাকে এবং এমন একটি ছোট ছেলেকে খুঁজে আনা হয় যে মাত্র দশ পযন্ত গুণতে শিখেছে, তাহলে ছেলেটিকে মার্বেলের কৌটা ছুটার কাছে নিয়ে গেলে প্রথমে সে সাদা রঙের মার্বেলগুলি নিয়ে গুণতে আরম্ভ করবে। দশ পর্যন্ত গুণেও যখন দেখবে আরও মার্বেল রয়েছে, তখন সে হয়তো বিস্মিত হয়ে বলে উঠবে—অনেক মার্বেল! এর পরে কালো মার্বেলগুলি গুণতে স্বরু করে আগের বারের মতই যখন দেখবে যে, দশ পর্যন্ত গুণেও আরও মার্বেল কৌটাতে রয়ে গেছে তখন সে আবার বলবে, অনেক মার্বেল!

ছেলেটিকে বলা হলো যে, দেখ খোকা, তোমাকে ছুটা কৌটার মার্বেল দেওয়া হবে না ; কিন্তু যে কৌটাতে বেশী মার্বেল আছে সেই কৌটাটি মার্বেল সমেত তোমাকে দেওয়া হবে। তবে একটা সর্ত আছে—কোন্ কৌটায় মার্বেল বেশী আছে, সেটা তোমাকেই ঠিক করে নিতে হবে। যদি স্থির করে নিতে না পার তবে তুমি একটি মার্বেলও পাবে না। সর্তটি শুনে ছেলেটি ক্ষণিকের জন্যে দমে গেল। কিন্তু তারপরেই পরম উৎসাহে ডান হাতে একটি সাদা মার্বেল ও বাঁ-হাতে একটি কালো মার্বেল তুলে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখলো। বারংবার এরকম ভাবে দু-হাতে দু-রঙের মার্বেল তুলে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখতে লাগলো। বেশ কয়েকবার এমনভাবে সাজানোর পরে দেখতে পেল যে, কালো মার্বেলের কৌটাটি শূন্য হয়ে গেছে, কিন্তু তখনও ছুটা সাদা মার্বেল পড়ে রয়েছে। নিশ্চিন্ত মনে ছেলেটি সাদা মার্বেলগুলি কৌটায় ভরে তুলে নিল (৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

৩নং চিত্র

ছেলেটি খুবই বুদ্ধিমান। সেজন্যে সাদা ও কালো, দু'রকমের মার্বেলের সংখ্যাই তার কাছে 'অনেকগুলি' হওয়াতেও এই ছুটা 'অনেকের' মধ্যে কোন্টা বড় চিনে নিতে পারলো। বালকটি যে যুক্তি দিয়ে ছুটা 'অনেকের' মধ্যে তুলনামূলক বিচার করলো, ক্যাণ্টরও সেই একই রীতি অনুসরণ করে ছুটা অনন্ত রাশির তুলনামূলক বিচার করেন।

অনন্ত রাশি কাকে বলে? যে রাশিকে আমরা গুণে উঠতে পারি না, সেই রাশিকেই অনন্ত রাশি বলা হয়। যেমন একগাড়ী বালিতে কতগুলি বালি-কণা আছে আমরা গুণে উঠতে পারি না [এখানে আমাদের মত সাধারণ ধৈর্যবিশিষ্ট লোকদের কথা বলা হয়েছে। কারও যদি অসামান্য ধৈর্য থাকে তবে হয়তো তিনি বালিকণার সংখ্যা গুণে উঠতে পারেন। এমন ধৈর্যবিশিষ্ট লোকদের বাদ দিয়ে উক্তিটি করা হয়েছে]। সেজন্যেই আমরা বলি একগাড়ী বালিতে অনন্ত সংখ্যক বালিকণা রয়েছে।

আমাদের গণনা করবার যে শক্তি, সে শক্তির বাইরের রাশিকেই যদি অনন্ত রাশি বলা হয় তবে পূর্বোক্ত ছোট ছেলেটির কাছে [যে মাত্র দশ পর্যন্ত গুণতে পারে] তের এবং পনেরোও অনন্ত রাশি। ছেলেটি যেমন প্রত্যেকটি সাদা মার্বেলের সঙ্গে একটি মাত্র কালো মার্বেলের একক সম্পর্ক (one-one correspondence) স্থাপন করে বুঝতে পারলো যে, সাদা মার্বেলের সংখ্যা কালো মার্বেলের সংখ্যার চেয়ে বেশী, অর্থাৎ, ১৫, ১৩ থেকে বড়। ঠিক

অনুরূপ যুক্তির আশ্রয় নিয়েই ক্যাণ্টর দুটা অনন্ত রাশির তুলনামূলক বিচার করেন।

মনে করা যাক, দুটা পাত্রের একটাতে কিছু বালি ও অপরটাতে কিছু চিনির দানা আছে। আমাদের কাছে বালিকণা ও চিনির দানা উভয়ের সংখ্যাই অনন্ত। কিন্তু তবুও আমরা স্থির করতে পারি, (অন্ততঃ যুক্তির দিক দিয়ে) বালিকণার সংখ্যা বেশী, না চিনির দানার সংখ্যা বেশী। যদি প্রতিটি বালিকণার পাশে একটি করে চিনির দানা সাজিয়ে যাওয়া যায় তবে সাজাতে সাজাতে এমন একটা সময় আসবে যখন হয়—

(১) বালিকণা ফুরিয়ে যাবে, কিন্তু চিনির দানা তখনও থেকে যাবে; অথবা

(২) বালিকণা ফুরোবে না, চিনির দানা তখনও থেকে যাবে; অথবা
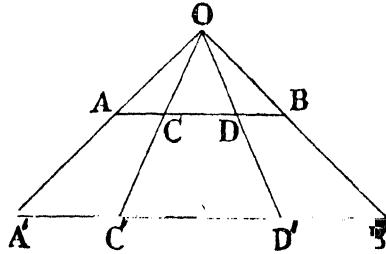
(৩) বালিকণা ও চিনির দানা একই সঙ্গে ফুরিয়ে যাবে।

এই তিনটি সম্ভাবনার মধ্যে প্রথম সম্ভাবনাটি পেলে আমরা বলবো যে, বালিকণার সংখ্যা চিনির দানার সংখ্যার চেয়ে কম; দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি পেলে বালিকণার সংখ্যা চিনির দানা থেকে বেশী এবং তৃতীয় সম্ভাবনাটিতে উভয়ের সংখ্যাই সমান।

এখন আমরা দ্বিতীয় চিত্রের প্রশ্নটি আলোচনা করবো। সেখানে বলা হয়েছে যে AB অংশটি যদিও A'B' অংশের চেয়ে অনেক ছোট তবুও A'B' অংশটিতে যতগুলি বিন্দু আছে AB অংশটিতেও ততগুলি বিন্দু আছে। মনে করা যাক AA' ও BB' পরস্পর O বিন্দুতে ছেদ করেছে। এখন A'B' অংশে যদি C' কোন বিন্দু হয় এবং OC' যুক্ত করা হয়, তবে OC' AB-কে নির্দিষ্ট এক C বিন্দুতে ছেদ করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, A'B'-এর উপরের যে কোনও C' বিন্দুর জন্যে আমরা AB-এর উপর একটি মাত্র নির্দিষ্ট C বিন্দু পাই; কারণ OC' AB-কে একমাত্র C-বিন্দুতেই ছেদ করে। এখন D' যদি A'B'-এর উপর অপর একটি বিন্দু হয়, তবে OD' AB-কে অপর এক D-বিন্দুতে ছেদ করবে। এটা সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, C' ও D' যদি A'B'-এর উপরে দুটা পৃথক বিন্দু হয় তবে C ও D অবশ্যই AB-এর উপরে দুটা পৃথক বিন্দুই হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উক্ত নিয়ম অনুসরণ করে A'B'-এর উপরের প্রতিটি বিন্দুর সঙ্গেই AB-এর উপরের এক একটি বিন্দুর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। অর্থাৎ A'B'-এর উপরের প্রত্যেকটি বিন্দুর সঙ্গে AB-এর উপরের বিন্দুগুলির একক সম্পর্ক স্থাপন করা অসম্ভব নয়। অতএব সাধারণ দৃষ্টিতে অবাস্তব মনে হলেও A'B' অংশের উপরে যতগুলি বিন্দু আছে, AB অংশটির উপরেও ততগুলি বিন্দু আছে (৪নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

৪নং চিত্র

পূর্ণ সংখ্যা অনন্ত বিস্তৃত। এর শেষ সংখ্যাটি খুঁজে পাওয়া যায় না। যত বড় সংখ্যারই উল্লেখ করা যাক না কেন, সহজেই তার চেয়েও বড় এক সংখ্যার নাম করা যায়। গণিতজ্ঞেরা প্রমাণ করেছেন যে, পূর্ণ সংখ্যার উচ্চতম সীমা যদি কোন নিয়মে বেঁধে দেওয়া যায়, তবে সেই পূর্ণ সংখ্যাগুলির

উপরে ভিত্তি করেও এক পাটীগণিতের সৃষ্টি করা যায়। এখন প্রশ্ন এই যে, পূর্ণ সংখ্যার উচ্চতম সীমা বেঁধে দেওয়া কি সম্ভব? আমরা জানি—কোন পূর্ণ সংখ্যাকে যদি ৮ দিয়ে ভাগ করা যায় তবে ভাগশেষ ০,১,২,৩,৪,৫,৬, ও ৭—এই আটটি রাশির মধ্যে একটি হবেই। এই আটটি রাশির বাইরের কোন রাশিকে ভাগশেষ রূপে পাওয়া যেতে পারেই না। অতএব দেখা গেল, আমরা যদি স্থির করে নিই যে, প্রত্যেক সংখ্যার জন্যে সেই সংখ্যাটিকে ৮ দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগশেষ থাকবে, সেই ভাগশেষটি নেব, অর্থাৎ ২২-এর জন্যে নেব ৬, ৩৭-এর জন্যে ৫, ৪৮-এর জন্যে ০, ইত্যাদি। তবে আমাদের সংখ্যার সংখ্যা মাত্র আটটিতে এসে পৌঁছবে। সুতরাং দেখা গেল যে, সংখ্যার উচ্চতম সীমা বেঁধে দেওয়া সম্ভব। এভাবে কোন নিয়মে বেঁধে দিয়ে যদি সংখ্যাগুলির সংখ্যা বেঁধে দেওয়া যায় তবে সেই নির্দিষ্ট সংখ্যাগুলিকে নিয়েও এক পাটীগণিতের সৃষ্টি করা যায়। যেমন, আমরা যদি স্থির করে নিই যে, প্রত্যেকটি সংখ্যার জন্যে সেই সংখ্যাটিকে ৮ দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগশেষ থাকে, সেই ভাগশেষটি নেব, তবে আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত কতকগুলি ফল পাওয়া যায়। যেমন—

৩২ + ৪৭ = ৭৯ = ৮ × ৯ + ৭ = ৭

৫৯ − ৩৩ = ২৬ = ৮ × ২ + ২ = ২

৯ × ৭ = ৬৩ = ৮ × ৭ + ৭ = ৭

১০২ ÷ ৬ = ১৭ = ৮ × ২ + ১ = ১ ইত্যাদি

গণিতের উদ্দেশ্য, এমন একটা সাধারণ নিয়ম সৃষ্টি করা যার, সাহায্য নিলে একাধিক সমস্যার সমাধান একই নিয়মের সাহায্য নিয়ে করা যায়। গণিতের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সংহতি স্থাপন করে বিভিন্ন সমস্যাগুলির সমাধান একবারে করতে পারলেই গণিতজ্ঞ নিজেকে সার্থক মনে করেন। সাধারণ নিয়মের আবিষ্কার করবার চেষ্টার ফলে গণিতের ব্যাপ্তিও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। জড়-বিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত মীমাংসাই গণিতের সূত্রের সাহায্যে হয়ে থাকে।

ভারতের খনিজ সম্পদ

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

১৮৩৫ সালে ইংল্যাণ্ডে খনিজ সংস্থান অনুসন্ধানের জন্যে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইংল্যাণ্ড স্থাপিত হয়। খনিজ শিল্পের সুবিধার জন্যে সর্বপ্রথম ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম দেশগুলি ও দক্ষিণ ওয়েল্‌সের দেশগুলির খনিজ সংস্থানের নক্সা তৈরী করা হয়। খনিজ উত্তোলন লাভজনক হবে কিনা, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়।

ইংল্যাণ্ডে খনিজ অনুসন্ধানের জন্যে যে সব উদ্যোগ প্রথম হয়েছিল সেই মত উত্তরকালে বৃটিশ অধিকৃত দেশগুলিতে খনিজ অনুসন্ধান সুরু হয়। ১৮৪২ সালে প্রথমে ক্যানাডায় খনিজের খোঁজ সুরু হয়। ১৮৫২ সালে ভিক্টোরিয়ায়, আর ১৮৫০ সালে ভারতবর্ষে। প্রথমে খনিজ সংস্থানের নক্সা তৈরী হয়। সঙ্গে সঙ্গে কয়লাখনির অবস্থান আবিষ্কারের উদ্যোগ হয়। ইতিমধ্যে ভূতত্ত্বের শিক্ষামূলক বিজ্ঞান বিষয়ক আর শিল্পমূলক সব শাখাগুলিতে বিশেষ কাজের সূচনা হয়। ১৯০৩ সালে খনিজ উত্তোলন ও কাঁচামাল রপ্তানীর কাজ বিশেষভাবে প্রসার লাভ করে। জিওলজিক্যাল সার্ভে খনিজের প্রকৃতি, অবস্থান, বাৎসরিক আহরণের

তালিকা প্রস্তুত করে। এতে খনিজশিল্প প্রসার এবং খনিজ উত্তোলনের লাইসেন্স লওয়ার সুবিধা হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে হ্যাডফিল্ড ম্যাঙ্গানিজ-ইস্পাত মিশ্রধাতু উদ্ভাবন করেন। ক্রমে ম্যাঙ্গানিজ-ইস্পাতের চাহিদা বাড়তে লাগলো। ম্যাঙ্গানিজ খনিজের চাহিদাও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গেল। এদেশে ম্যাঙ্গানিজ খনিজের খোঁজ পড়লো। দেখা গেল—বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ অঞ্চলে ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়।

বেরিলিয়াম মিশ্রিত তামা থেকে খুব ভাল স্প্রিং তৈরী হয়। যেমন বিজ্ঞানীর পরীক্ষাগারে তথ্যটি উদ্ঘাটিত হলো অমনি নব নিষ্কাশিত ধাতু বেরিলিয়াম আকরিকের খোঁজ পড়লো। সস্তায় বেরিলিয়াম ধাতু উৎপাদনের চেষ্টা চললো। রাজপুতানায় বেরিল খনিজের সন্ধান পাওয়া গেল। এইভাবে নিত্য নবতর খনিজের ব্যবহার উদ্ভাবিত হতে থাকে। এককালে যা রসায়নাগারের বিস্ময় বলে গণ্য হয় পরবর্তীকালে তা সাধারণ্যে প্রচারিত হয়। নতুন নতুন মিশ্রধাতু উদ্ভাবিত হলো। তাদের ব্যবহার প্রচলিত হলো। জিওলজিক্যাল সার্ভে প্রয়োজনীয় ধাতুর খনিজের সন্ধান দিতে লাগলো।

বর্তমানে খনিজসম্পদে ভারতের স্থান অন্য কোন দেশের চেয়ে হীন নয়। এখনকার দিনে কোন দেশই হয়তো খনিজসম্পদে অন্য কোন দেশের মুখাপেক্ষী নয়, এমন কথা বলতে পারে না। ভারতও সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। কোন কোন খনিজ এদেশে খুব বেশী পবিমাণে আছে। নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে অন্যদেশে অনেক খনিজ এখান থেকে রপ্তানী করা চলে। ভারতের সবচেয়ে বড় খনিজসম্পদ হলো—লৌহ আকরিক, টাইটেনিয়াম আকরিক, আর অভ্র।

ভারত রপ্তানী করতে পারে—ম্যাঙ্গানিজ আকরিক, বক্সাইট, ম্যাগ্নেসাইট, তাপরোধক খনিজ, শান ও পালিশের পাথর, ট্যাল্ক, বালি, জিপ্সাম, গ্র্যানিট, মোনাজাইট, বেরিল, কুরুবিন্দ ও সিমেন্টের উপাদান। ভারতের আজও আছে নিজ চাহিদা মেটাবার উপযুক্ত পরিমাণ কয়লা, অ্যালুমিনিয়াম আকরিক, সোনা, ক্রোমিয়াম আকরিক, বাড়ী তৈরীর পাথর, মার্বেল, স্লেট, মাটি, চুনাপাথর, ডলোমাইট, খনিজ রং, লবণ, ক্ষার, ফটকিরি, কাচ তৈরীর বালি, পাইরাইট, সোহাগা, ফেল্স্পার, সোরা, ফস্ফেট, গোমেদ, আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি, ব্যারাইট, রত্ন, দুষ্প্রাপ্য ধাতুর খনিজ।

ভারত অন্যদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে আছে কতকগুলি খুব দরকারী খনিজের জন্যে—তামার আকরিক, রূপা, নিকেল, পেট্রোলিয়াম, গন্ধক, সীসা, প্ল্যাটিনাম, দস্তা, টিন, পারদ, টাংষ্টিন, মলিবডিনাম, গ্র্যাফাইট, অ্যাসফাল্ট, পটাস, ফ্লুওরাইড।

আমাদের দেশে যে বিপুল পরিমাণ লৌহ আকরিক, অভ্র, ম্যাগ্নেসাইট, ম্যাঙ্গানিজ আকরিক, ইলমেনাইট, সিমেন্টের উপাদান, গ্র্যানিট ও মার্বেল আছে তাতে অনেকদিন রপ্তানী করা চলবে। লৌহ আকরিক পাথর অবস্থায় রপ্তানী না করে বরং লোহা ধাতু ও ইস্পাত তৈয়ী করে রপ্তানী করলে বেশী লাভবান হওয়া যায়। অভ্রের চাদরও প্রয়োজনমত মাপ করে কেটে পাঠানো ভাল। ইলমেনাইট থেকে টাইটেনিয়াম অক্সাইড তৈরী করে পাঠালে মন্দ নয়।

এখনও অনেক খনিজ আমরা সোজাসুজি রপ্তানী করে থাকি, যেহেতু আমাদের দেশে সে সব খনিজের কোন শিল্প তেমন গড়ে ওঠে নি। শুধু তাই নয়, এদেশ থেকে সস্তা দরে কাঁচামাল বিদেশে রপ্তানী হয়, তারপর তাথেকে তৈরী মাল আমাদের দেশেই চড়া দামে আমদানী হয়। সে হিসাবে অন্য দেশ থেকে আমাদের চাহিদামত তুল্য মূল্য খনিজ দ্রব্যাদি না পেলে আমাদের মূল্যবান খনিজ রপ্তানী করা উচিত নয়। আমাদের খনিজের পরিবর্তে আমরা যদি বিভিন্ন দেশ থেকে

দরকামত খনিজ দ্রব্যাদি পাই তো ভাল হয়। যেমন—

দেশ	খনিজ দ্রব্য
যুক্তরাজ্য	নিকেল, তামা, প্ল্যাটিনাম, অ্যাসবেস্‌টস, টিন (মালয় থেকে)
ফ্রান্স	পটাস, ফস্‌ফেট (মরক্কো থেকে)
বেলজিয়াম	তামা, হীরা (কঙ্গো), কোবাল্ট, ইউরেনিয়াম আকরিক
জার্মেনী	পটাস
আমেরিকা	পেট্রোলিয়াম খনিজ, ফ্লুওরাইট, গন্ধক, ফস্‌ফেট, দস্তা, তামা, রূপা, মলিবডিনাম, বিভিন্ন ইস্পাত (অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, ইলমেনাইটের পরিবর্তে)
জাপান	তামা, গন্ধক, ফ্লুওরাইট (কোরিয়া থেকে)
সিংহল	গ্র্যাফাইট (কয়লার পরিবর্তে)

আমাদের একান্ত অভাব প্ল্যাটিনাম ও রূপার; তামা, সীসা, দস্তা আর টিনের; নিকেল, মলিবডিনাম, টাংষ্টিনের; গন্ধক, গ্র্যাফাইট, ফ্লুওরস্পারের। সবগুলিই আমদানী করতে হয়। অন্য দেশের সঙ্গে খনিজ আদানপ্রদান করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই।

খনিজ ও শিল্প—আমাদের দেশে লভ্য খনিজ থেকে কাচ ও চিনামাটি শিল্প গড়া চলে। ক্যালসিয়াম কার্বাইড তৈরী হতে পারে। আমাদের খনিজ খাদ্য লবণ, চুনাপাথর, জিপ্‌সাম, বক্সাইট, ম্যাগ্‌নেসাইট, ক্রোমাইট, ফ্লুওরস্পার ইত্যাদি বেশ ভাল জাতের। আছেও আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে। এইগুলিকে কেন্দ্র করে ভাল শিল্প গড়ে উঠতে পারে। আজকাল ইলমেনাইট ও বেরিলের চাহিদা বেড়েছে। আমাদের দেশে এ সবের ভাণ্ডার মজুত আছে। তারপর আমাদের আছে কয়লা। কয়লা আর লোহা আমাদের বড় সম্পদ। আমাদের লৌহ আকরিক থেকে, আমাদের নিজদেশের খনি থেকে তোলা কয়লা দিয়ে লৌহ ধাতু নিষ্কাশনের সুবিধা হয়েছে। শুধু তাই নয় কয়লা থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা হয়েছে। কয়লা থেকে আলকাত্‌রা, আর আলকাত্‌রা থেকে বেঞ্জিন, টলুইন, ন্যাপথালিন, বিবিধ রঞ্জন দ্রব্য ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা সুরু হয়েছে।

গন্ধক আমাদের নেই বললেই চলে। পাইরাইট থেকে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরী করা যায়। বিহার, সিমলা, নীলগিরির পাইরাইট তেমন ভাল জাতের নয়; নির্ভর করা চলে না। রাজপুতানা, যোধপুর, বিকানিরের জিপ্‌সাম ভাল জাতের। তাথেকে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরীর ব্যবস্থা চালু হয়েছে। সালফিউরিক অ্যাসিড থেকে কৃত্রিম সার প্রস্তুত হয়েছে। কৃষি লাভবান হয়েছে। রঞ্জক ও ওষুধ প্রস্তুতেও দেশজাত সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হচ্ছে।

সৌরাষ্ট্র সমুদ্রের ধারে। সেখানে সমুদ্র উপকূলে লবণ তৈরীর ব্যবস্থা আছে। লবণজাত বিবিধ শিল্প গড়ে উঠেছে। এদেশে চুনাপাথরেরও অভাব নেই। সোডিয়াম কার্বনেট ও কষ্টিক সোডা তৈরী হচ্ছে। রাসায়নিক শিল্পের উন্নতি ক্রমশঃ হচ্ছে বলা যেতে পারে। ১৯৪৬ সালে ছিল ১৭৪টি কারখানা। ১৯৫১ সালে হয়েছে ২৬৪টি, আজ আরও বেড়ে চলেছে।

আমাদের পেট্রোলের বড় অভাব। আসাম অঞ্চলে পেট্রোলিয়ামের খনি আছে। বছর দুই আগে আসামে নাহারকাটিয়াতে পেট্রোলিয়ামের খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। পেট্রোল দেশের বড় সম্পদ। অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে বিপদ। যদি কোন দিন সরবরাহ বন্ধ হয়! গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপান আর জার্মেনীর ঠিক এই অসুবিধা হয়েছিল। তৃষ্ণার্তের মত জাপান ছুটে এসেছিল ইন্দোনেশিয়া আর বর্মা অধিকারে। আর জার্মানরা ছুটে গিয়েছিল ককেসাসে। আমাদের বাৎসরিক প্রয়োজনের অর্ধেক পরিমাণ পেট্রোলও আমাদের দেশে পেতে কষ্ট হয়। মধ্যপ্রাচ্য

থেকে, আমেরিকা থেকে আমরা পেট্রোল আমদানী করি। আজকালকার দিনে পেট্রোল অবশ্যই দরকার। ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পেট্রোলিয়াম খোঁজা সুরু হয়েছে।

যে কোন দেশে খনিজ শিল্পের প্রথম যুগে ভূপৃষ্ঠে বা ভূপৃষ্ঠের অল্প নীচে সঞ্চিত খনিজ উত্তোলন করা হয়। খনিজ পাথর কাঁচামাল হিসাবে অন্য দেশে রপ্তানী করা হয়। দেশে চাহিদা থাকলে কাজে লাগানো হয়। এতে খনিজ সম্পদের অনেক ক্ষতি হয়। অনায়াসলব্ধ খনিজের মধ্যে যেগুলি ভাল জাতের সেগুলি বেছে নিয়ে বেচে দেওয়া হয়। যেগুলি ওরই মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর সেগুলিকে পরিত্যাগ করা হয়।

তারপর ধীরে ধীরে খনিজ শিল্পের দ্বিতীয় যুগ এসে পড়ে। দেশে ধাতু নিষ্কাশন, রসায়ন শিল্প, যন্ত্রশিল্প, কলকারখানা গড়ে ওঠে। নিজ দেশেই খনিজের চাহিদা বেড়ে ওঠে। খনিজ শিল্প উন্নত হয়, দেশ সমৃদ্ধ হয়। আমরা এখন দ্বিতীয় যুগে উপনীত হয়েছি। আমরা কাঁচামাল, তৈরী মাল দুই-ই বেচতে সুরু করেছি।

খনিজ শিল্পের তৃতীয় যুগে যখন শিল্পের উন্নতির মধ্যাহ্ন এসে পড়ে তখন অন্য দেশ থেকে কাঁচামাল আমদানী করতে হয়। নিজ দেশের সুলভ খনিজ প্রায় নিঃশেষিত হতে থাকে। এর পরে কাঁচামালের জন্যে বিদেশের উপর নির্ভর করতে হয়। তাতে তৈরী মালের মূল্য বৃদ্ধি পায়, পড়তা বেশী পড়ে। অন্য দেশের সঙ্গে পণ্য উৎপাদন প্রতিযোগিতায় হটে যেতে হয়। জাতীয় সমৃদ্ধিতে ভাঁটা পড়ে। অবশ্য আমাদের দেশ এখনও এ অবস্থায় এসে পৌঁছায় নি। এ অবস্থা সুদূরবর্তী হলেও সাবধান হওয়া দরকার। তাই পাকা ব্যবসায়ী দেশ কখনও দেশের সব খনিজ যেমন তেমন ভাবে বিদেশে বেচে দিতে চায় না। তারা পূর্ণ উদ্যমে বিবিধ খনিজের অনুসন্ধান চালায়। প্রাপ্ত খনিজের নব নব ব্যবহার উদ্ভাবনের জন্যে গবেষণার ব্যবস্থা করে, খনিজ সংগ্রহের জন্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে। শুধু তাই নয়, ভাল জাতের খনিজ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর খনিজ পৃথক করে এবং সেগুলিকে অন্য কাজে লাগাবার উপায় উদ্ভাবন করে। উপজাত দ্রব্যাদিও ব্যবহার করে। সবদিকে লক্ষ্য রাখে যাতে বিন্দুমাত্র খনিজ ও উপজাত দ্রব্য নষ্ট না হয়। আমাদের দেশে মূল্যবান খনিজ আজও নষ্ট হয়। কয়লা থেকে অন্য দেশে বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে। অথচ আমাদের দেশের ভাল জাতের কয়লা কেবলমাত্র জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কয়লাতে জ্বালানীর কাজ অনায়াসে চলতে পারে। ১৯৪৭ সালের পর আমরা এ বিষয়ে সতর্ক হয়েছি।

বাজারে চাহিদা না থাকলে পণ্যাদি অনেক রকমে নষ্ট হয়। যোধপুরের মাক্রানায় ভাল জাতের মার্বেল পাথর পাওয়া যায়। সেখানে গ্রামবাসীরা কুটির নির্মাণের জন্যে সে সব পাথর ব্যবহার করে। ত্রিচিনপল্লীর চুনাপাথর বিখ্যাত; অথচ চালান দেবার সুব্যবস্থা না থাকায় গরু-ঘোড়ার জলপাত্র তৈরীর জন্যে সে পাথর ব্যবহার করা হয়। এসব বিষয়ে আমরা ধীরে ধীরে অবহিত হচ্ছি। ম্যাঙ্গানিজের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ম্যাঙ্গানিজ খনিগুলি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খনন করে আবার খনিজ সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়েছে। অভ্রের খনি যুদ্ধের সময় আবার ওলট-পালট করা হয়েছে বেরিল, ট্যাণ্টালাইট, সামারস্কাইট প্রভৃতি মূল্যবান খনিজের খোঁজে।

আজ চাহিদা নেই বলে কোন খনিজ সস্তায় ছেড়ে দেওয়া ভাল ব্যবসায়ীর পরিচয় নয়। চাহিদা সৃষ্টি করা দরকার। তার জন্যে গবেষণার দরকার। এককালে পেট্রোলিয়াম কেবল জ্বালানী তেল হিসাবে ব্যবহার করা হতো। গবেষণার ফলে আজ কত শত ব্যবহার সুরু হয়েছে! পেট্রোলিয়ামের উপজাত দ্রব্যাদির কত চাহিদা বেড়েছে! আজ পেট্রোলিয়াম জাতীয় সমৃদ্ধির বড় কষ্টিপাথর।

ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম ধাতুর ব্যবহার প্রচলিত হওয়ার পরে ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম খনিজের চাহিদা বেড়ে গেছে। চল্লিশ বছর আগে এসব খনিজ বিক্রয় করা যেত না। আর আজ খনন করে ওঠা যাচ্ছে না!

ত্রিবাঙ্কুর উপকূলে বালুকারাশির মধ্যে মিশে আছে মোনাজাইট। থোরিয়াম ধাতুর ব্যবহার হতে লাগল গ্যাসের আলোর ঠুলির প্রলেপ হিসাবে। মোনাজাইট থেকে থোরিয়াম নিষ্কাশন করা গেল। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে মোনাজাইট বালির কদর বাড়লো। তারপর বিজলী বাতির প্রচলন হলো। গ্যাস বাতির ব্যবহার কমে গেল। থোরিয়ামের ঠুলির চাহিদা কমলো। মোনাজাইট রপ্তানী প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। তখন খোঁজ পড়লো মোনাজাইটের অন্য ব্যবহারের। আবিষ্কার হলো ওর সঙ্গে মিশে থাকা আর একটি খনিজ ইলমেনাইটের। ইলমেনাইট থেকে টাইটেনিয়াম অক্সাইড নামক সাদা রং ব্যবহার স্বরু হলো। মোনাজাইটের কদর গেল। ইলমেনাইটের দাম বাড়লো। তারপর এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। পারমাণবিক শক্তির পরিচয় লোকে পেল। দেখা গেল, ঐ অবহেলিত মোনাজাইট বালিই পারমাণবিক শক্তির সংহত খনিজ। এতে আছে থোরিয়াম ও ইউরেনিয়াম। মোনাজাইটের সমাদর রাতারাতি বেড়ে গেল। দুই মহাযুদ্ধের মাঝে মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যে খনিজ শিল্পের কত উত্থান-পতন হয়ে গেল।

তড়িৎ-বিজ্ঞান প্রসারিত হলো। তড়িৎ-যন্ত্রে অভ্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পেল। অভ্রের জন্যে অন্য দেশকে ভারতের মুখ চেয়ে থাকতে হয়েছে। গবেষণার ফলে রসায়নাগারে তৈরী হয়েছে অভ্র জাতীয় তড়িৎ অপরিবাহী পদার্থ। আশঙ্কা হয় কালে বিদেশে ভারতীয় অভ্রের বাজার পড়ে যাবে। অভ্রের অন্য কোন ব্যবহার আমাদের খুঁজে বের করা দরকার।

ব্যবহারিক জীবনে পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগ হলে জালানী হিসাবে কয়লার হয়তো আর চাহিদা থাকবে না। তেমনই আর এক কাল আসবে যখন পারমাণবিক শক্তি আর প্রকট হবে না। হয়তো ইউরেনিয়াম পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যাবে।

রয়্যাল জেলি

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

এই অদ্ভুত পদার্থটি রাণী মৌমাছির খাদ্য। এই জন্যই ইহা রয়্যাল জেলি আখ্যা লাভ করিয়াছে। ফুলের রেণু ও মধু খাইয়া সাধারণ মৌমাছি জীবন-ধারণ করে। কিন্তু রাণীর জন্য ব্যবস্থা স্বতন্ত্র; সাধারণ মৌমাছির খাদ্য তাহাকে স্পর্শ করিতেও দেওয়া হয় না। শ্রমিক মৌমাছিরা মুখের গ্রন্থি-নিঃসৃত লালার দ্বারা রাণীর জন্য এই বিশেষ গুণ-সম্পন্ন পদার্থটি প্রস্তুত করিয়া থাকে। রাণীকে এক-মাত্র এই পদার্থটিই খাওয়ান হয়। এই পদার্থটির গুণাগুণ আলোচনার পূর্বে মৌমাছির জীবন সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

মৌমাছির দলে থাকে একটি রাণী মৌমাছি, কিছু পুং-মৌমাছি, আর বাদবাকী সবই শ্রমিক। শ্রমিকেরা স্ত্রী মৌমাছি হইলেও যৌন চেতনাহীন। চাক নির্মাণ হইতে আরম্ভ করিয়া দলের জন্য খাদ্য সংগ্রহ, রাণীর পরিচর্যা, ডিম ফুটিবার পর মক্ষিকা-শিশুর পরিচর্যা প্রভৃতি সমস্ত কাজই শ্রমিক মৌমাছিরা করে। পুরুষ মৌমাছিগুলি এইসব কাজে তাহাদিগকে কিছুমাত্র সাহায্য করে না, একমাত্র ডিম্বনিষেক ক্রিয়ার সঙ্গেই তাহাদের সম্বন্ধ বর্তমান। দলের মধ্যে একমাত্র রাণীই প্রজনন ক্ষমতাবিশিষ্ট। সে একাই ডিম পাড়িয়া দল বৃদ্ধি করে এবং ডিম পাড়িবার শক্তিও অসামান্য। প্রয়োজন হইলে রাণী মৌমাছি দিনে দেড় হইতে দুই হাজার ডিমও পাড়িয়া থাকে। অনেক সময় এই দৈনিক ডিমের পরিমাণ তাহার দেহের ওজনের সমানও হয়। রাণী মৌমাছি জীবনভর যত ডিম পাড়ে, সেগুলিকে নিষিক্ত করিবার জন্য তাহার একবার মাত্র যৌন-মিলনের প্রয়োজন হয়। পুং-কোষগুলি একটি বিশেষ আধারে দেহের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে এবং ডিম্ব নির্গমনের সময় উহার সংস্পর্শ লাভ করিয়া নিষিক্ত হয়।

রাণী বলিতে আমরা যেরূপ ধারণা পোষণ করি, রাণীর সঙ্গে দলের সম্বন্ধ সেরূপ নয়। দলের শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে রাণীর কোন সম্বন্ধ নাই। শ্রমিক মৌমাছিরাই তাহাদের কাজের নিয়ন্ত্রা। তাহারা যেন সংস্কারবশেই সমস্ত কাজ অতি শৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পন্ন করে, কোনরূপ ভুলভ্রান্তি হওয়ার উপায় নাই। কর্মক্ষম হইবার পর হইতেই শ্রমিক মৌমাছির কাজের ধারা স্থির হইয়া যায়। ইহার মধ্যে কোন আদেশের অপেক্ষা নাই; কার্যনিয়ন্ত্রণ অথবা যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য কোন শ্রমিক দলপতিরও প্রয়োজন হয় না। মৌমাছির দলে ডিক্টেটরবিহীন এক অদ্ভুত প্রোলিটারিয়েট সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। রাণী শুধু দলের মাতা। দলের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সর্বতোভাবে শ্রমিকদের উপরেই ন্যস্ত।

শ্রমিকদের কাজের অন্ত নাই। বর্তমানের বিবিধ পর্যবেক্ষণ হইতে জানা গিয়াছে যে, শ্রমিক মৌমাছিকে দিনে আট ঘণ্টার উপর কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়। এই শ্রমের অধিকাংশই খাদ্য আহরণ ও চাক নির্মাণে ব্যয়িত হয়। চাক নির্মাণে যে মোমের প্রয়োজন হয় তাহাও তাহাদের দেহ হইতে নিঃসৃত হয়। তাহাদের পেটের তলদেশের ভিতর প্রাচীরে মোম-নিঃসারক গ্রন্থি অবস্থিত। তরুণ শ্রমিকেরা যখন বিশ্রামাবস্থায় চাকের উপরে অবস্থান করে, তখন ঐ গ্রন্থি হইতে মোম নিঃসৃত হয় ও সূত্রাকারে ছিদ্র পথে বাহির হইয়া পেটের তলদেশে জমিতে থাকে। এই মোম হইতেই খাদ্য সংরক্ষণ ও ডিমের জন্য স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ নির্মিত হয়। অতিরিক্ত

অংশ ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য চাকের উপরিভাগে স্থানবিশেষে সঞ্চিত রাখা হয়। রাণী দেহের পশ্চাদ্ভাগ প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া একেবারে তলদেশে একটি করিয়া ডিম পাড়িয়া যায়। তিন দিন পরেই এই ডিম ফুটিয়া শূককীটে পরিণত হয়। তখন তাহাদের তদারক ও খাদ্য পরিবেশন শ্রমিক মক্ষিকারাই করে। প্রায় পাঁচ দিন শূককীটের অবস্থায় কাটাইবার পরে উহারা মূক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন শ্রমিক মক্ষিকারা মোমের আবরণ রচনা করিয়া প্রকোষ্ঠের মুখগুলি বন্ধ করিয়া দেয়। এরূপ বদ্ধ অবস্থায় প্রায় দশদিন অতিবাহিত হইবার পর মক্ষিকা পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া ঢাকনা ছিঁড়িয়া বাহির হয়। চাক নির্মাণ ও তদারক প্রভৃতি কাজে অধিকাংশ তরুণ মৌমাছিরাই নিযুক্ত থাকে।

প্রকোষ্ঠ নির্মাণের ব্যাপারটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাণী, পুং-মৌমাছি ও শ্রমিক সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন রকমের প্রকোষ্ঠ গঠিত হইয়া থাকে। রাণী মৌমাছির জন্য প্রকোষ্ঠটি স্বতন্ত্র স্থানে বড় করিয়া ও বিশেষ ধরণের নির্মিত হয়। পুং-মৌমাছির প্রকোষ্ঠগুলিও শ্রমিক মৌমাছির প্রকোষ্ঠ হইতে কিছু বড় হয় এবং উহাদের মুখগুলি অপেক্ষাকৃত বড় থাকে। অনিষিক্ত ডিম হইতে পুং-মৌমাছির সৃষ্টি হয়। রাণী ও শ্রমিক মৌমাছি উভয়েই নিষিক্ত ডিম হইতে উৎপন্ন হয়। রাণী ইচ্ছামত ডিম্ব নিষিক্ত করিয়া পু-মৌমাছি ও শ্রমিক সৃষ্টি করে—এই ধারণা পূর্বে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এখন জানা গিয়াছে যে, পুং-মৌমাছির জন্য রচিত প্রকোষ্ঠের মুখ বড় থাকিবার জন্যই ডিম্ব নির্গমনের সময় রাণীর পশ্চাৎভাগের বিশেষ স্থানে চাপের অভাবে ডিম্ব বীজাধারের সংস্পর্শে আসিতে পারে না এবং অনিষিক্ত থাকে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, পুং ও শ্রমিক মৌমাছি সৃষ্টির ব্যাপারটি শ্রমিক মক্ষিকার প্রকোষ্ঠ নির্মাণের ব্যবস্থার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। পরে দেখা যাইবে যে, রাণী মৌমাছির উৎপত্তির ব্যাপারটিও শ্রমিক মৌমাছির বিশেষ ব্যবস্থার ফলেই সম্ভব হয়। রাণীর বয়োবৃদ্ধি হইলে বা দল বড় হইয়া পড়িলে, দলের প্রয়োজনে নূতন রাণী সৃষ্টির প্রয়োজন হইয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে চাকে একাধিক রাণীও থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নূতন রাণী সৃষ্টি হওয়ার পরে পুরাতন রাণী অধিকাংশ মৌমাছি সহ চাক পরিত্যাগ করিয়া উড়িয়া যায়। মূক অবস্থা অবসানের পর রাণী মৌমাছির যখন প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইবার সময় হইয়া আসে তখন চাক হইতে বাঁশীর সুরের মত একরূপ শব্দ হইতে থাকে। প্রকোষ্ঠের আবরণ ছিন্ন করিয়া রাণীর বহিরাগমনের প্রয়াসেই এই শব্দের সৃষ্টি হয়। পুরাতন রাণী ঐ শব্দ অনুসরণ করিয়া তথায় ছুটিয়া যায় এবং নূতন রাণীকে প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইবার পূর্বেই হত্যা করিতে উদ্যত হয়। নূতন রাণীর প্রয়োজন বোধ না করিলে শ্রমিকেরা অন্তরায় হয় না, অন্যথায় বাধা দিয়া থাকে। তদবস্থায় পুরাতন রাণী চাক পরিত্যাগ করে এবং একদল মৌমাছি তাহার অনুগমন করে। বয়োবৃদ্ধির জন্য রাণী অকর্মণ্য হইয়া পাড়লে শ্রমিকদের হাতেই তাহাকে মরিতে হয়। প্রয়োজনাতিরিক্ত পুং-মক্ষিকাও শ্রমিকদের দ্বারাই নিধন প্রাপ্ত হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে, শ্রমিকেরাই দলের সর্বময় কর্তা ও নিয়ন্ত্রা। এমন কি রাণীকেও তাহাদের ইচ্ছামতই চলিতে হয়। রাণী সৃষ্টির ব্যাপারটিও যে শ্রমিকদের ইচ্ছানুযায়ীই ঘটিয়া থাকে, সে সম্বন্ধে বলা হইতেছে।

যে রয়্যাল জেলি রাণীর বিশেষ খাদ্যবস্তু, রাণী সৃষ্টিও হয় তাহারই প্রভাবে। ডিম ফুটিবার পরে ২½ দিন পর্যন্ত সমস্ত শূককীটকেই এই পদার্থটি পরিবেশন করা হয়। ২½ দিন বাদে একমাত্র রাণী প্রকোষ্ঠে অবস্থিত শূককীট ব্যতীত অন্য সকলের জন্য ব্যবস্থা হয় মধু আর ফুলের রেণুমিশ্রিত একটি পিণ্ড। এই পদার্থ আহার করিয়া যে তাহারা বাকী শূক অবস্থা অতিবাহিত করে এমন নয়,

মৌমাছি হওয়ার পরে জীবনভর তাহাদিগকে এই পদার্থ আহার করিয়াই বাঁচিতে হয়। কিন্তু রাণীর প্রকোষ্ঠের শূক কীটটির ব্যবস্থা অন্যরূপ। তাহার ক্ষেত্রে একমাত্র রয়্যাল জেলিই পরিবেশিত হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, শুধু এই পদার্থটির গুণেই একটি নিষিক্ত ডিম হইতে সৃষ্টি হয় রাণীর এবং এই পদার্থের অভাবে নিষিক্ত ডিম হইতেই সৃষ্টি হয় শ্রমিকের। কোন অবস্থায় রাণীর হঠাৎ মৃত্যু ঘটিলে এবং সেই সময় কোন রাণীর প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত না থাকিলে, শ্রমিকেরা ২½ হইতে ৩ দিন বয়স্ক যে কোন একটি সাধারণ শূক কীটের প্রকোষ্ঠটি বড় করিয়া উহাকে শুধু মাত্র রয়্যাল জেলি পরিবেশন করিতে থাকে এবং এই ভাবে উহা হইতে নূতন রাণী সৃষ্টি করে।

কি ভাবে একটি পদার্থের গুণে রাণী ও শ্রমিক মৌমাছির মধ্যে এইরূপ অভাবনীয় পার্থক্যের সৃষ্টি হয় তাহার স্পষ্ট উত্তর বিজ্ঞানীরা এখনও দিতে পারেন নাই। তবে কেহ কেহ এই পরিবর্তনের মূলে গ্রন্থি-সংশ্লিষ্ট কারণ রহিয়াছে বলিয়া মনে করেন।

রাণী ও শ্রমিক মৌমাছির মধ্যে পার্থক্য যে শুধু প্রজনন শক্তি সম্বন্ধীয়, এমন নয়। রাণী মৌমাছির দেহের আকার শ্রমিক মৌমাছি অপেক্ষা অনেক বড়—প্রায় দেড় গুণ। রাণী মৌমাছির পরমায়ুও শ্রমিক মৌমাছির তুলনায় অনেক দীর্ঘ। ৬।৭ সপ্তাহের মধ্যেই শ্রমিক মৌমাছির জীবন শেষ হয়, আর রাণী মৌমাছি বাঁচে সাধারণতঃ ৩ হইতে ৫ বৎসর। রাণী মৌমাছি ৯ বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকে, এরূপ দৃষ্টান্তও আছে। কোন পদার্থের গুণে জাতিগত স্বাভাবিক পরমায়ুর গণ্ডী এইভাবে বৃদ্ধি পাওয়া এক বিস্ময়কর ব্যাপার সন্দেহ নাই।

মানুষের স্বাভাবিক পরমায়ুর গণ্ডী সম অনুপাতে কোন ক্ষেত্রে এইরূপ বৃদ্ধি পাইলে তাহার পরিমাণ প্রায় ৩।৪ হাজার বৎসরে গিয়া ঠেকিবে। কোন মানুষ এইরূপ পরমায়ু লাভ করিলে আমরা নিশ্চয়ই তাহাকে অমর মনে করিতাম এবং কোন পদার্থের গুণে এইরূপ অমরত্ব অর্জিত হইলে তাহাকে আমরা নিঃসন্দেহে অমৃত বলিয়াই গ্রহণ করিতাম। মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া এইরূপ অমৃতেরই সন্ধান করিয়াছে। নিষ্ফল প্রচেষ্টায় হতাশ হইয়া মর্ত্যের অমৃতভাণ্ড স্বর্গের দেবতারা হরণ করিয়াছে, এইরূপ অপবাদ দিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। তাই সামান্য মৌমাছি এইরূপ অমৃতের অধিকারী জানিয়া তাহার পক্ষে বিস্মিত হওয়া স্বাভাবিক। তবে মর্ত্যলোকের সর্বময় প্রভু মানুষ, সমস্ত কিছুর উপরই যাহার একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত, সামান্য মক্ষিকাকে এইরূপ একটি সম্পদ নির্ঝঞ্ঝাটে ভোগ করিতে দিবে, এরূপ আশা করা যায় না। কাজেই মৌমাছির এই অমৃত মানুষের পক্ষেও অমৃত কিনা, বিজ্ঞানীদের উপর তাহা যাচাই করিয়া দেখিবার ভার পড়িয়াছে। মানুষের উপর ইহার গুণ পরীক্ষায় এখন পর্যন্ত যতটুকু প্রকাশ পাইয়াছে তাহা খুব আশাপ্রদই মনে হয়।

মানুষের ক্ষেত্রে ইহার কার্যকারিতা সম্বন্ধে গবেষণার ফলে এপর্যন্ত যে সব বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার বিচার করিলে দেখা যায় যে, ইহা প্রয়োগে মানুষের স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটে, মানসিক শ্রমের শক্তি বৃদ্ধি পায়, ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, অপরিপুষ্ট শিশু স্বাভাবিক স্বাস্থ্য লাভ করে, দীর্ঘকালের স্থায়ী অবসন্নতা দূর হয়, বার্ধক্যে দেহের গ্রন্থিসমূহ যৌবনোচিত শক্তি লাভ করে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য কীট, ইঁদুর ও শশক প্রভৃতি প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রয়োগের ফলে তাহাদের পরমায়ু বৃদ্ধি পাইয়াছে, এরূপ বিবৃতিও আছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই পদার্থটি রাণী মৌমাছির একমাত্র খাদ্য, কিন্তু এই সব পরীক্ষার ক্ষেত্রে ইহা ঔষধের মত অল্প পরিমাণেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কাজেই অতি অল্প মাত্রায় প্রয়োগের ফলেই যদি এইরূপ সুফল লাভ হইয়া থাকে তবে অধিক পরিমাণে

প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ইহার সম্ভাবনা কতদূর পৌছিতে পারে, কে জানে?

বর্তমানে আমেরিকার কয়েকটি বিশিষ্ট গবেষণাগারে অতি সতর্কতা সহকারে এই পদার্থটি লইয়া গবেষণা চলিয়াছে। পূর্বেকার বিবৃতিসমূহের মধ্যে কোনরূপ অতিশয়োক্তি আছে কিনা, পরীক্ষার দ্বারা তাহা যাচাই করিয়া দেখা হইতেছে। পদার্থটি অধিক পরিমাণে উৎপাদনের উপায় ও অবিকৃত অবস্থায় ইহাকে দীর্ঘকাল সংরক্ষণের জন্যও চেষ্টা চলিয়াছে। উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে চাকের মধ্যে অধিক সংখ্যক রাণী-প্রকোষ্ঠ সৃষ্টির এক অভিনব ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হইয়াছে।

পদার্থটি প্রত্যহই চাক হইতে সংগৃহীত হয়। ইহা একটি ঘন, ঝাঁঝালো হরিদ্রাভ পদার্থ ও নানা মূল্যবান প্রোটিনে পূর্ণ। আমাদের রক্ত, মাংস গঠনে প্রায় ৩০ প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড অংশ গ্রহণ করে। উহাদের ২০টি রয়্যাল জেলির মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। অধুনা জানা গিয়াছে যে, ইহার প্যান্টোথেনিক অ্যাসিডের পরিমাণ ফুলের রেণু অপেক্ষা ১৭ গুণ অধিক। এই তথ্যটি বিজ্ঞানীদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

যেমন রয়্যাল জেলি নাম, ইহার মূল্যও তেমনই রাজকীয়। আমাদের টাকার হিসাবে প্রতি পাউণ্ডের দাম প্রায় ৫০ হাজার টাকা। ইহার উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইলেও কোন অবস্থায়ই ইহার মূল্য দেড় হাজার হইতে দুই হাজার টাকার নীচে নামিবার সম্ভাবনা নাই। কাজেই অমৃত হইলেও আমাদের সাধারণের ভোগ্য নয়। একমাত্র বর্তমান যুগের ধনকুবেরেরাই এই অমৃতের অধিকারী।

মৌমাছির গুণগানে কবিরা চিরকালই পঞ্চমুখ। ইহারা মধু যোগাইয়া মানুষের রসনাকে তৃপ্ত করে। প্রাচীনকাল হইতেই মোম মানুষের একটি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। যে সব শস্যের পরাগসঙ্গম সম্পূর্ণরূপে কীটপতঙ্গের উপর নির্ভরশীল, সেই সব ক্ষেত্রে অনেকাংশেই মৌমাছির সাহায্যে মানুষের শস্য ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। এখন আবার মৌমাছির এই অভিনব পদার্থ হইতে যদি মানুষ জীবন, যৌবন অক্ষুন্ন রাখিবার শক্তি লাভ করে তবে ভাবীকালে হয়তো মৌমাছি স্বর্গের দূত রূপেই পরিকীর্তিত হইবে।

অঙ্গার

শ্রীহারাণচন্দ্র চক্রবর্তী

অঙ্গার শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতে, অর্থাৎ অঙ্গারকে যতই ধোয়া হোক না কেন, তার মলিনত্ব ঘুচবে না, সে কালোই থাকবে। অঙ্গার সাধারণতঃ কালো বটে, কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে কালো হয় না; যেমন—হীরক অঙ্গার দিয়ে গঠিত অথচ এর কোনও রং নেই। যাহোক, কয়লার যে কত গুণ ও উপকারিতা আছে, আলোচনা করলে তা বুঝতে পারা যায়।

পর্যায়সারণীর (Periodic table) চতুর্থ বিন্যাসে অবস্থিত অঙ্গার একটি অধাতব পদার্থ। বিশ্ববিখ্যাত রুশ বৈজ্ঞানিক মেণ্ডেলিফ ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম এই পর্যায়সারণী তৈরী করেন। পৃথিবীতে ৯২টি মৌলিক পদার্থ আছে। এখন কৃত্রিম উপায়ে আরও কতকগুলি মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করা গেছে। এই মৌলিক পদার্থগুলিকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কতকগুলি হলো অধাতব পদার্থ, আর বাকীগুলি হলো ধাতব পদার্থ; তবে ধাতব পদার্থের সংখ্যাই বেশী। আবার কয়েকটি পদার্থ আছে যাদের মধ্যে উভয়েরই গুণসমূহ বর্তমান। সেগুলিকে ধাতুকল্প (metalloid) বলে। পারমাণবিক সংখ্যা অনুযায়ী মৌলিক পদার্থগুলিকে পর্যায়সারণীতে সাজানো হয়েছে। মৌলিক পদার্থের কেন্দ্রীনের মোট ধনাত্মক তড়িৎশক্তিকে পারমাণবিক সংখ্যা বলে। অঙ্গারের পারমাণবিক সংখ্যা হলো ৬।

অঙ্গার দিয়ে গঠিত পদার্থের সংখ্যা ২০০,০০০-এরও বেশী হবে। নতুন নতুন যৌগিক পদার্থ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে সংখ্যাটি ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। দুই বা ততোধিক বিভিন্ন পদার্থ দিয়ে গঠিত পদার্থকে যৌগিক পদার্থ বলে। ধাতব এবং অধাতব পদার্থের মধ্যে একমাত্র অঙ্গার দিয়েই সবচেয়ে বেশী যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে রসায়ন শাস্ত্রের এক অংশকে বলা হয় জৈব রসায়ন। জৈব রাসায়নিক গবেষণার ফলে কৃত্রিম রং, রবার, ঔষধ, রাসায়নিক দ্রব্য, সুগন্ধি দ্রব্য, রঞ্জক ও বিস্ফোরক পদার্থ এবং আরও অনেক কিছু মূল্যবান দ্রব্যাদি প্রস্তুত হচ্ছে।

অঙ্গারকে ইংরেজীতে বলা হয় কার্বন। C হলো এর সাঙ্কেতিক চিহ্ন। এর পারমাণবিক ওজন ১২, অর্থাৎ হাইড্রোজেন (H) অপেক্ষা ১২ গুণ ভারী। হাইড্রোজেনের ওজনকে প্রায় ১ (সূক্ষ্মভাবে ১'০০৮) ধরা হয়। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় অঙ্গার নাইট্রোজেনের (N) ন্যায় নিষ্ক্রিয়; কিন্তু উচ্চতাপে খুব সক্রিয় হয়ে উঠে; বিভিন্ন ধাতুর সঙ্গে যুক্ত অক্সিজেনকে (O) বিতাড়িত করে। উচ্চতাপে অঙ্গার দিয়ে যে সব যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়, সেগুলি সাধারণতঃ স্থায়ী এবং অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে সহজে মিলিত হয় না বা তাদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার কাজ করে না। অনিবন্ধী (amorphous) অঙ্গার আবার আরও শক্তিশালী বিজারক দ্রব্য। সেজন্যে ধাতুনিষ্কাশনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, বিশেষতঃ লৌহ ও ইস্পাত নির্মাণে প্রচুর পরিমাণে অঙ্গার ব্যবহৃত হয়। হীরক ও গ্র্যাফাইটের মধ্যে অঙ্গার বিযুক্ত এবং বিশুদ্ধ অবস্থায় বর্তমান থাকে। কয়লাতেও কিছু পরিমাণ বিযুক্ত অঙ্গার থাকে বলে কয়লাকে কাল দেখায়। অন্যান্য পদার্থের মধ্যে, যেমন—কার্বন ডাইঅক্সাইড, পেট্রোলিয়াম, মার্স্ গ্যাস, চুনাপাথর, স্নেহ, আমিষ ও শর্করা জাতীয় পদার্থ (carbohydrates) প্রভৃতিতে যৌগিক অবস্থায় একে দেখতে পাওয়া যায়।

অঙ্গারের বিভিন্ন রূপ আছে। তাকে ছুটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। একটি হলো অনিবন্ধী, আর অপরটি হলো স্ফটিকাকার রূপ। নীচের তালিকা থেকে সেটা বুঝতে পারা যাবে।
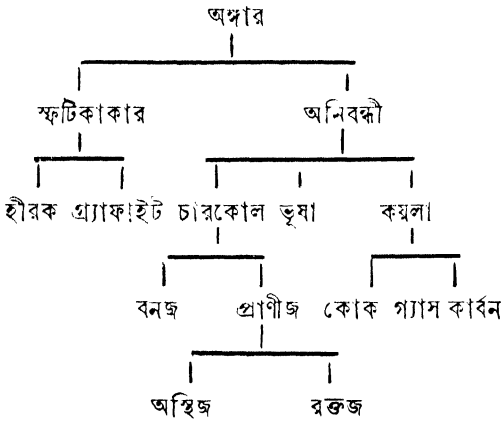
স্ফটিকাকার হীরক সম্বন্ধে এখন কিছু আলোচনা করছি। অনেক রকমের হীরক আছে। হীরক সাধারণতঃ ঈষৎ হলুদে রঙের হয়; তবে নীল, লাল, সবুজ এমন কি ধূসর বা কালো রঙের হীরকও দেখতে পাওয়া যায়। ধূসর এবং কালো রঙের হীরকগুলি কার্বোনেডো ও বোর্ট নামে পরিচিত। বিশুদ্ধ অবস্থায় হীরক কিন্তু বর্ণহীন। এর অনেক-গুলি গুণ আছে। হীরক হলো সবচেয়ে কঠিন পদার্থ; প্রায় সকল তরল পদার্থে অদ্রবণীয়, অক্সিজেন জারিত (oxidised) হয় না। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এর উপর অন্যান্য পদার্থের কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। এর আপেক্ষিক গুরুত্ব হলো ৩.৫। এর স্ফটিক হচ্ছে ষষ্ঠ বা অষ্ট পার্শ্বসমন্বিত ঘনক্ষেত্র। এর প্রতিসরাঙ্ক ২.৬, আর গতিপরিবর্তন কোণ (critical angle) ২৪°.২৫। প্রতিসরাঙ্ক অন্যান্য পদার্থ অপেক্ষা বেশী অথচ গতিপরিবর্তন কোণ কম হওয়াতে কোনও রশ্মি স্ফটিকের মধ্যে প্রবেশ করলে বারে বারে তার সম্পূর্ণ প্রতিফলন হয়, যার ফলে একে অত উজ্জ্বল দেখায়। বহু প্রাচীন কাল থেকে হীরক মূল্যবান রত্ন হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কাচ কাটবার জন্যেও এর প্রচলন আছে। শিলা-প্রস্তরাদি ছিদ্র করবার কাজে কার্বোনেডো ও বোর্ট লাগে। কাচ রঞ্জেনরশ্মিতে অস্বচ্ছ, হীরক কিন্তু স্বচ্ছ। এ থেকে হীরক আসল কি নকল তা বুঝতে পারা যায়। বাতাসে কিংবা অক্সিজেনে হীরক পোড়ালে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের উৎপত্তি হয়। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, হীরক অঙ্গার দিয়ে গঠিত।

অঙ্গারের আর একটি স্ফটিকাকার রূপ হলো গ্র্যাফাইট। এ হচ্ছে ধূসর রঙের নরম পদার্থ। এরও ঔজ্জ্বল্য আছে। এর আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.২। গ্র্যাফাইট কিন্তু তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহী। সেজন্যে তড়িদ্দ্বার, বৈদ্যুতিক চুল্লী, ব্যাটারী, মাই-ক্রোফোন প্রভৃতি তৈরীর কাজে লাগে। কাগজের উপর ঘষলে কাল দাগ দেখা যায় বলে পেন্সিল তৈরীতে এর ব্যবহার হয়। গ্র্যাফাইটের স্ফটিকের পরমাণুগুলি এমনভাবে সজ্জিত যে, বাইরে থেকে চাপ দিলে এরা পাতের আকার ধারণ করে। এই সুবিধার ফলে যন্ত্রপাতিতে, বিশেষতঃ বিমানের ইঞ্জিনে মসৃণ করবার কাজে লাগে। লোহাতে মরচে না ধরবার জন্যে গ্র্যাফাইটের আবরণ দেওয়া হয়। পারমাণবিক চুল্লীতে এখন এর ব্যবহার হচ্ছে; তার কারণ হলো এর নিউট্রন কণিকার গতি মন্দীভূত করবার ক্ষমতা আছে। পূর্বে একে কালো সীসা বা প্লাম্বেগো বলা হতো। সালফিউরিক অ্যাসিড ও পটাসিয়াম ডাইক্রোমেটের সঙ্গে উত্তপ্ত করলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের সৃষ্টি হয়।

এবারে অঙ্গারের অনিবন্ধী রূপের কথায় আসা যাক। অনিবন্ধী রূপের আবার অনেকগুলি শ্রেণী আছে। নীচে তাদের বিবরণ দেওয়া হলো।

(ক) উদ্ভিজ্জ পদার্থ থেকে সৃষ্ট কয়লা হলো অঙ্গারের এক অবিশুদ্ধ রূপ। উদ্ভিজ্জ পদার্থ থেকে কয়লার রূপান্তর কিন্তু বিভিন্ন ধাপে হয়ে থাকে। প্রথমে হলো পিট; এর মধ্যে অঙ্গারের পরিমাণ হচ্ছে শতকরা ৬০ ভাগ। তারপর লিগ-নাইট, ক্যালেল, বিটুমিনাস ও অ্যান্থ্রাসাইট।

এদের মধ্যে যথাক্রমে শতকরা ৬৭, ৮৩, ৮৮·৪ ও ৯৪ ভাগ অঙ্গার আছে।

অঙ্গার এবং হাইড্রোজেন উভয়েই দাহ্য পদার্থ। এই দুটি উপাদানই কয়লার মধ্যে বিদ্যমান। কয়লা পোড়ালে অঙ্গার অঙ্গারাম্লে পরিণত হয় এবং তাপের সৃষ্টি করে। এক গ্র্যাম অণু, অর্থাৎ ৪৪ গ্র্যাম অঙ্গারাম্ল উৎপন্ন হলে ৯৪,৩০০ ক্যালরী তাপের উৎপত্তি হয়।

$$C+2O \rightarrow CO_2+94,300 \text{ cals.}$$
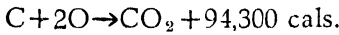
কয়লাকে অন্তর্ধূম পাতন করলে কোল গ্যাস নির্গত হয়। তাছাড়া আলকাত্‌রা, গ্যাসলিকার, গ্যাসকার্বন, কোক প্রভৃতি উপজাত দ্রব্য হিসাবে পাওয়া যায়। কোল গ্যাস কয়েকটি গ্যাসীয় পদার্থের সংমিশ্রণ। নগরীকে আলোকিত করবার জন্যে, রান্নার কাজ এবং গবেষণাগারে এর ব্যবহার আছে। গ্যাসলিকার থেকে অ্যামোনিয়া, আর অ্যামেনিয়া থেকে অ্যামোনিয়াম সালফেট তৈরী হয়। অ্যামোনিয়াম সালফেট সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গ্যাসকার্বন কঠিন পদার্থ হিসাবে পাওয়া যায়। এটি হলো বিশুদ্ধ অঙ্গারের আর একটি রূপ। তড়িদ্দ্বার, সেল, পাখা, ব্যাটারী প্রভৃতি তৈরীর কাজে লাগে। জ্বালানী ও ধাতু নিষ্কাশনের কাজে কোক দরকার। নিষ্কাশনের সময় সাধারণতঃ যে সব আকরিক ধাতু ব্যবহৃত হয় তাদের সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত থাকে। কোকের অঙ্গার ঐ অক্সি-জেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে অঙ্গারাম্ল তৈরী করে। আকরিক ধাতু কোক এবং অন্যান্য পদার্থের (flux) দ্বারা বিজারিত হয়ে বিশুদ্ধ অবস্থায় পরিণত হয়।

উত্তপ্ত কোকের উপর বাষ্প প্রবাহিত করলে বাষ্প বিয়োজিত হয়ে ওয়াটার গ্যাস সৃষ্টি করে। ওয়াটার গ্যাস হলো অঙ্গারাম্ল (কার্বন মনোক্সাইড এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড) ও হাইড্রোজেন গ্যাসীয় পদার্থের সংমিশ্রণ। ওয়াটার গ্যাস থেকে কৃত্রিম পেট্রোল তৈরীর চেষ্টা চলছে। হাইড্রোজেনকে পৃথক করে হাইড্রোজেনেসনের কাজে লাগানো হচ্ছে। জ্বালানী হিসাবেও এর প্রচলন আছে। উত্তপ্ত কোকের উপর নিয়ন্ত্রিত বাতাস সরবরাহ করলে প্রোডিউসার গ্যাসের উৎপত্তি হয়। এই গ্যাস বিজারক দ্রব্য এবং জ্বালানী হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

আলকাত্‌রা কোনও একটি যৌগিক পদার্থ নয়। এটি হচ্ছে নানাবিধ জৈব পদার্থের সংমিশ্রণ। এই কালো রঙের দুর্গন্ধযুক্ত চট্‌চটে পদার্থটিকে রত্নগর্ভা বললেও অত্যুক্তি হয় না। এথেকে যে কত মূল্যবান বস্তু তৈরী হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই; যার ফলে আলকাত্‌রা এখন জৈব রসায়নশাস্ত্রে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

আলকাত্‌রাকে অন্তর্ধূম পাতন করলে বহু মূল্যবান রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া যায়। এদের মধ্যে বেঞ্জিন, টলুইন, জাইলিন, ফেনল, ক্রেজল, ন্যাপ-থ্যালিন, অ্যানথ্র্যাসিন, কয়েক ধরণের ঘন তৈল ও পিচ উল্লেখযোগ্য।

(খ) সীমাবদ্ধ বাতাসের মধ্যে আলকাত্‌রা, টার্পেণ্টাইন, কেরোসিন তৈল, অ্যাসিটিলিন প্রভৃতি পোড়ালে ভুসা উৎপন্ন হয়। বৈদ্যুতিক উপায়েও অবশ্য সৃষ্টি করতে পারা যায়; যেমন—মোমবাতির অগ্নিশিখায় দুটি তড়িদ্দ্বার রেখে ১৫ ভোল্টের তড়িৎ চালালে ঋণ-তড়িদ্দ্বারে ভুসা সঞ্চিত হয়। মুদ্রণের কালি, কালো রং, জুতার কালি প্রভৃতি তৈরীর জন্যে ভুসার দরকার।

(গ) চারকোল কয়েক প্রকারের আছে। তার মধ্যে বনজ, প্রাণীজ এবং শর্করা জাতীয় চারকোল উল্লেখযোগ্য। কাঠ, কাঠের গুঁড়া, নারকেলের মালা, তুষ, জীব-জন্তুর হাড়, রক্ত, চিনি ইত্যাদিকে সীমাবদ্ধ বাতাসে বা ক্ষেত্রবিশেষে অন্তর্ধূম পাতন করে চারকোল পাওয়া যায়।

চারকোল যাবতীয় তরল পদার্থে অদ্রবণীয় এবং স্বাভাবিক তাপমাত্রায় কারও সঙ্গে মিলিত হয় না। আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৫ হলেও ছিদ্রগুলির মধ্যে বাতাস থাকে বলে জলে ভাসে। অক্সিজেন,

হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অ্যামোনিয়া, ইথিলিন, কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড প্রভৃতি গ্যাসীয় পদার্থকে চারকোল শোষণ করে। ধাতু নিষ্কাশনে, পরিস্রাবণে বারুদ তৈরীতে, জ্বালানী ও বীজঘ্ন হিসাবে এর ব্যবহার আছে। চিনি শোধন ও বর্ণহীন করবার জন্যে প্রাণীজ চারকোল ব্যবহৃত হয়। গ্যাস মুখোস প্রস্তুতে আরও সক্রিয় (activated) চারকোলের প্রয়োজন। কেমন করে সক্রিয় চারকোল তৈরী করা হয় সে সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা দরকার। বার্চ গাছের ছাল, করাতের গুঁড়া প্রভৃতি প্রথমে অন্তর্ধূম পাতন করা হয়। অন্তর্ধূম পাতন করবার পর অবশিষ্ট যে কালো পদার্থটি পাওয়া যায় তাকে প্রথমে কষ্টিক সোডা দ্রবণে ও পরে জলে ফোটাতে হয়। ঐ কালো পদার্থটিকে কেন্দ্রাপসারী শক্তির সাহায্যে পৃথক করবার পর বায়ুশূন্য পাত্রে উত্তপ্ত করে ঢাক্‌নাযুক্ত পাত্রের মধ্যে রাখতে হয়।

বিভিন্ন রূপের অঙ্গার, যথা—হীরক, গ্র্যাফাইট চারকোল প্রভৃতির বিশুদ্ধ অবস্থায় এক গ্র্যাম করে অক্সিজেনে পোড়ালে কার্বন ডাইঅক্সাইডের সৃষ্টি হয়। এই গ্যাসকে কষ্টিক পটাস দ্রবণে শোষণ করবার পর দেখা গেছে যে, ওজনের বৃদ্ধি (৩.৬৬ গ্র্যাম) সব ক্ষেত্রেই সমান। এথেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, একই ওজনের কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের উৎপত্তি হয়। বিভিন্ন রূপের মধ্যে একই মৌলিক পদার্থ অঙ্গার না থাকলে এ রকম হতো না।

অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অঙ্গার অসংখ্য জৈব এবং অজৈব যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো।

১। অঙ্গার ও অক্সিজেন—কার্বন মনোক্সাইড (CO), কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) এবং কার্বন সাব অক্সাইড (C_3O_2)

২। অঙ্গার ও হাইড্রোজেন—প্যারাফিন্‌স্‌, অলিফিন্‌স্‌, অ্যাসিটিলিন্‌স্‌ বেঞ্জিন, ও তার সমগোত্রীয় পদার্থসমূহ—টার্পিন্‌স্‌ ইত্যাদি।

৩। অঙ্গার ও নাইট্রোজেন—সায়ানোজেন [$(CN)_2$]

৪। অঙ্গার ও গন্ধক—কার্বন ডাইসালফাইড (CS_2)

৫। অঙ্গার ও ক্লোরিন—কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (CCl_4)

৬। অঙ্গার ও সিলিকন—সিলিকন মনোকার্বাইড (SiC). ও সিলিকন ডাইকার্বাইড (SiC_2)

৭। অঙ্গার ও ধাতু—মেটালিক কার্বাইড্‌স্‌, যেমন—ক্যালসিয়াম কার্বাইড (CaC_2)

৮। অঙ্গার, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন—কার্বনিক অ্যাসিড, অ্যালডিহাইড্‌স্‌, কিটোন্‌স্‌, অ্যালকোহল্‌স্‌, অ্যাসিড্‌স্‌, ইথার্‌স্‌, ইস্টার্‌স্‌ (অর্গ্যানিক), ফেনল্‌স্‌, ক্যাম্ফর্‌স্‌, কার্বোহাইড্রেট্‌স্‌ ইত্যাদি।

৯। অঙ্গার, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন—অ্যামিন্স, অ্যানিলিন্স প্রভৃতি।

১০। অঙ্গার, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন—অ্যামাইড্‌স্‌, নাইট্রোপ্যারাফিন্স, নাইট্রোবেঞ্জিন, অ্যামিনো অ্যাসিড্‌স্‌, ইউরিয়া, ইউরিথেন, ইউরাইড্‌স্‌ ইত্যাদি।

১১। অঙ্গার, হাইড্রোজেন ও গন্ধক—মার্ক্যাপ্ট্যান্স ও থায়োইথারস্‌।

১২। অঙ্গার, হাইড্রোজেন, গন্ধক ও অক্সিজেন—সালফোনিক অ্যাসিড্‌স্‌।

১৩। অঙ্গার, হাইড্রোজেন ও হ্যালাইড্‌স্‌ (Cl, Br, I)—ক্লোরোমিথেন, ক্লোরোফর্ম, আয়ডোফর্ম, মিথিলিন ব্রোমাইড, বেঞ্জাইল ক্লোরাইড প্রভৃতি।

১৪। অঙ্গার, অক্সিজেন ও ক্লোরিন—কার্বনিল ক্লোরাইড বা ফস্‌জিন ($COCl_2$)।

১৫। অঙ্গার, অক্সিজেন ও ধাতু—কার্বনেট্‌স্‌,

যেমন—ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$), সোডিয়াম কার্বনেট (Na_2CO_3), অ্যামোনিয়াম কার্বনেট [$(NH_4)_2CO_3$] ইত্যাদি।

১৬। অঙ্গার, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও ধাতু —বাইকার্বনেট্‌স্, যেমন—সোডিয়াম বাইকার্বনেট।

উপরে অঙ্গারের কতকগুলি যৌগিক পদার্থের উদারণ দেওয়া হয়েছে। তু-একটির উপকারিতা সম্বন্ধে এখন কিছু বলছি। কার্বন মনোক্সাইড দাহ্য ও বিষাক্ত গ্যাস বটে, কিন্তু বিজারক দ্রব্য হিসাবে এর ব্যবহার আছে। অনুঘটকের (যেমন—ZnO, Cr_2O_3) সাহায্যে উচ্চ তাপে ও চাপে কার্বন মনোক্সাইড এবং হাইড্রোজেন থেকে মিথাইল অ্যালকোহল (মিথেনল) তৈরী হয়। মিথেনল একটি উৎকৃষ্ট দ্রাবক। কার্বন ডাইঅক্সাইড ভারী গ্যাসীয় পদার্থ; বাতাসে কিছু পরিমাণে আছে। উদ্ভিদের পক্ষে প্রয়োজনীয়। চাপ প্রয়োগে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস জলে দ্রবীভূত করে সোডা-ওয়াটার প্রস্তুত হয়। এখন আবার কৃত্রিম বারিপাত সৃষ্টিতে কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইডের (CO_2) প্রয়োগ হচ্ছে।

প্যারাফিন্স হলো পরিপৃক্ত হাইড্রোকার্বন—যৌগিক পদার্থ। পেট্রোলিয়াম তৈল ঐ সব যৌগিক পদার্থের এক সংমিশ্রণ। পেট্রোলিয়াম তৈলের উপকারিতা সম্বন্ধে না বললেও চলে। বেঞ্জিন ও তার সমগোত্রীয় পদার্থসমূহকে অ্যারোমেটিক কম্পাউণ্ড্‌স্ বলে। এসব যৌগিক পদার্থ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে জৈব রসায়নশাস্ত্রে এক মূল্যবান অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়েছে। রঞ্জন, রঞ্জক, স্যাকারিন, অ্যাস্‌পিরিন, বেকেলাইট প্রভৃতি কত যে নতুন জিনিষ তৈরী করতে পারা যাচ্ছে, যার ফলে রাসায়নিক শিল্পে এবং গবেষণার ক্ষেত্রে এই অধ্যায় যুগান্তর এনেছে। ক্যালসিয়াম কার্বাইডে জল দিলে অ্যাসিটিলিন গ্যাস উৎপন্ন হয়—

$$CaC_2+2H_2O=C_2H_2+Ca(OH)_2$$
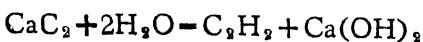
এই গ্যাস আলো জ্বালাবার কাজে লাগে। অপরিপৃক্ত যৌগিক পদার্থ বলে অ্যাসিটিলিন অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে অনেকগুলি যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করে। ধাতু জোড়া দেওয়া ও গলানোর জন্যে অক্সিঅ্যাসিটিলিন অগ্নিশিখা ব্যবহৃত হয়; কারণ এই অগ্নিশিখা ৩২০০° সেণ্টিগ্রেড তাপ সৃষ্টি করে। সিলিকন কার্বাইড (SiC) বা কার্বোর‍্যাণ্ডাম হীরকের মত কঠিন, যা ধাতব পদার্থের ধার তীক্ষ্ণ করবার কাজে লাগে। অ্যালকোহল বলতে সাধারণতঃ ইথাইল অ্যালকোহলই (C_2H_5OH) বোঝায়। সুগন্ধি দ্রব্য, ঔষধ, ক্লোরোফর্ম, ইথার, টিংচার অব আয়োডিন প্রভৃতি প্রস্তুতে অ্যালকোহলের প্রয়োজন। এই অ্যালকোহলের সঙ্গে মিথাইল অ্যালকোহল (CH_3OH), পিরিডিন (C_6H_5N), প্যারাফিন তৈল মিশিয়ে মেথিলেটেড স্পিরিট তৈরী হয়। মেথিলেটেড স্পিরিট বিষাক্ত। বার্নিশ তৈরীতে, দ্রাবক হিসাবে ও ষ্টোভ ইত্যাদি জ্বালাবার জন্যে এর ব্যবহার আছে। জৈব অম্ল সংখ্যায় অনেক। ইথাইল ইথার [$(C_2H_5)_2O$] চেতনা বিলোপকারী এবং বিশেষতঃ দ্রাবক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সুগন্ধি দ্রব্য তৈরীতে এষ্টার্স লাগে। ফেনল বা কার্বলিক অ্যাসিড (C_6H_5OH) থেকে ঔষধ, সুগন্ধি দ্রব্য, পিক্‌রিক অ্যাসিড, স্যালিসিলিক অ্যাসিড, ফেনাসেটিন, কৃত্রিম রঞ্জন, রঞ্জক, ফটোগ্রাফিক ডেভেলপার, বীজাণুনাশক সাবান প্রভৃতি তৈরী হয়। দ্রাক্ষা শর্করা (glucose, dextrose বা grape sugar), চিনি, শ্বেতসার, কাঠের আঁশ (cellulose) প্রভৃতি শর্করাজাতীয় পদার্থ (carbohydrates)। দ্রাক্ষা-শর্করা পাকা আঙ্গুরের মধ্যে থাকে বলে এই নামের উৎপত্তি হয়েছে। তাছাড়া ফুলের মধু ও সুমিষ্ট ফলেও পাওয়া যায়। চিনি (১), শ্বেতসার (২) প্রভৃতি শর্করাজাতীয় পদার্থগুলি আমাদের শরীরের মধ্যে গ্লুকোজে পরিণত হয়:

$$(১)\quad \underset{\text{cane sugar}}{C_{12}H_{22}O_{11}} + H_{2}O \rightarrow \underset{\text{glucose}}{\overset{+}{C_6H_{12}O_6}} + \underset{\text{fructose}}{\overset{-}{C_6H_{12}O_6}}$$

$$(২)\quad \underset{\text{starch}}{(C_6H_{10}O_5)x} \rightarrow \underset{\text{dextrin}}{(C_6H_{10}O_5)y} \xrightarrow{H_2O} \underset{\text{maltose}}{C_{12}H_{22}O_{11}} \xrightarrow{H_2O} \underset{\text{glucose}}{2C_6H_{12}O_6}$$

গ্লুকোজই আমাদের দেহে তাপ ও শক্তি যোগায়—

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6H_2O + 6CO_2 + 666 \text{ cals} ।$$
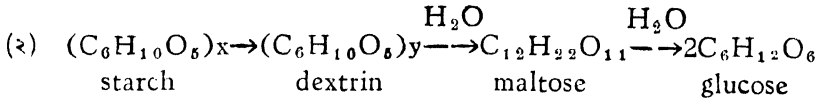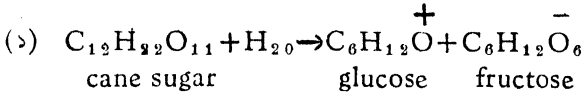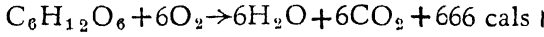
এর দ্রবণকে গাঁজিয়ে তুললে ইথাইল অ্যালকোহল পাওয়া যায়—

$$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2 ।$$
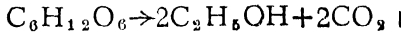
সকালে ঘুম থেকে উঠেই চিনির পরিচয় হয় চায়ের সঙ্গে। উদ্ভিদ জাতীয় পদার্থের কাঠামোটি হলো সেলুলোজ দিয়ে গঠিত। সেলুলোজের $(C_6H_{10}O_5)_n$ মধ্যে আছে অঙ্গার। এই অঙ্গারই কয়লার মধ্যে থাকে; কারণ কয়লার উৎপত্তি হলো উদ্ভিজ্জ পদার্থের রূপান্তর থেকে। গান-কটন, কাগজ প্রভৃতি তৈরীতে সেলুলোজের দরকার। অ্যানিলিনের সাহায্যে অগণিত মূল্যবান রঞ্জক দ্রব্য পাওয়া যায়। আমিষ জাতীয় পদার্থ আল্‌ফা-অ্যামিনো অ্যাসিড্‌স্‌ দিয়ে গঠিত। আমিষ জাতীয় পদার্থকে আর্দ্র-বিশ্লেষণ (hydrolysis) করে ২৪টি ঐ রকমের অম্লজাতীয় দ্রব্য পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে ছোটটি হলো গ্লাইসিন (glycine, glycocoll বা a-amino acetic acid)। এর রাসায়নিক সূত্র হচ্ছে, NH_2CH_2 COOH। ইউরিয়ার অন্য নাম কার্বামাইড $\left[CO<^{NH_2}_{NH_2}\right]$; খাদ্যের আমিষ ভাগ বিশ্লিষ্ট হয়ে ক্রমে এই নাইট্রোজেনবহুল পদার্থের সৃষ্টি হয়। দেহের অতিরিক্ত নাইট্রোজেন ইউরিয়ার আকারে মূত্রের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। চেতনাহারক ক্ষমতার জন্যে অস্ত্রচিকিৎসার সময়ে ক্লোরোফর্ম ($CHCl_3$) দিয়ে রোগীকে অনুভূতিবিহীন করা হয়। সোডা (Na_2CO_3, 10 H_2O) সবাইর কাছেই পরিচিত—সাবান, কাচ, কষ্টিক সোডা প্রভৃতি তৈরীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জিনিষপত্র ও যন্ত্রাদি পরিষ্কার করবার জন্যেও এর যথেষ্ট প্রচলন আছে। অ্যামোনিয়াম কার্বনেট [$(NH_4)_2CO_3$], স্মেলিং সল্ট তৈরীতে, ঔষধ হিসাবে ও রঞ্জন শিল্পে লাগে। ক্যালসিয়াম কার্বনেটের ($CaCO_3$) মার্বল্‌, চুনাপাথর, খড়ি প্রভৃতি নামে বহুল প্রচলন আছে। সোডিয়াম বাইকার্বনেট বা খাবার সোডা অম্লরোগে অনেকে খেয়ে থাকেন; ডাক্তারেরা ঔষধ হিসাবেও ব্যবহার করেন। সোডিয়াম বাইকার্বনেট ($NaHCO_3$) ও অ্যাসিড পটাসিয়াম টার্টারেট $\left[\begin{matrix} CH(OH)COOH \\ | \\ CH(OH)COOK \end{matrix}\right]$ দিয়ে বেকিং পাউডার প্রস্তুত হয়।

স্নেহ, শর্করা ও আমিষজাতীয় পদার্থগুলি আমাদের খাদ্যে থাকে। শাকসব্জি, ডাল, মাছ, মাংস প্রভৃতি থেকে আমরা আমিষ জাতীয় পদার্থ পাই। চর্ম, চুল, নখ, রক্ত, মাংসপেশী ইত্যাদি গঠনে এই জাতীয় পদার্থের বিশেষ প্রয়োজন। যাবতীয় জৈব যৌগিক পদার্থগুলির মধ্যে অঙ্গার রয়েছে।

মৌলিক পদার্থগুলি পরমাণুর সমবায়ে গঠিত। পরমাণুর গঠন প্রায় সৌরজগতের মত। সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলি যেমন নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরছে, পরমাণুতেও ঠিক সেরূপ কেন্দ্রীনের চারদিকে ইলেকট্রনগুলি গ্রহের মত উপবৃত্তাকারে ঘুরছে। কেন্দ্রীনে প্রোটন ও নিউট্রন থাকে। কিন্তু হাইড্রোজেনের পরমাণু একটি প্রোটন ও একটি

ইলেকট্রন দিয়ে তৈরী। অঙ্গারের পরমাণুতে ৬টি প্রোটন, ৬টি নিউট্রন ও ৬টি ইলেকট্রন আছে। প্রথম কক্ষপথে ২টি ইলেকট্রন ও দ্বিতীয় কক্ষপথে ৪টি ইলেকট্রন কেন্দ্রীনের চারদিকে ঘুরছে। বাইরের কক্ষপথে ৪টি ইলেকট্রন থাকবার জন্যে অঙ্গার চতুর্যোজী (quadrivalent)। এই গুণটি থাকবার ফলে অঙ্গার অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্থায়ী যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করে। সেজন্যে জৈব পদার্থগুলির বেশীর ভাগ স্থায়ী। ওরা সহজে আয়নিত হয় না।

এখন তেজস্ক্রিয় অঙ্গার (C^{14}) নিয়ে অনেক গবেষণার কাজ হচ্ছে। তেজস্ক্রিয় অঙ্গারের কেন্দ্রীনে আরও ২টি বেশী নিউট্রন আছে। এ হলো সাধারণ অঙ্গারের আইসোটোপ। বিশেষ অবস্থায় কোন কোন মৌলিক পদার্থের কতকগুলি পরমাণুর ভর ভিন্ন হয় অথচ পারমাণবিক সংখ্যা একই থাকে; এরূপ পরমাণুকে ঐ মৌলিক পদার্থের আইসোটোপ বলে। ভর বলতে বস্তুর পরিমাণকে বোঝায়। তেজস্ক্রিয় অঙ্গারের পারমাণবিক ওজন ১৪, আর নাইট্রোজেনের পারমাণবিক ওজনও ১৪। কিন্তু নাইট্রোজেনের কেন্দ্রীনে ৭টি প্রোটন ও ৭টি নিউট্রন আছে; আর প্রথম কক্ষে ২টি ও ২য় কক্ষে ৫টি ইলেকট্রন কেন্দ্রীনের চারদিকে ঘুরছে। এর পারমাণবিক সংখ্যা হলো ৭। নাইট্রোজেনের কেন্দ্রীনে নিউট্রন ঢুকিয়ে তেজস্ক্রিয় অঙ্গার তৈরী হচ্ছে।

উদ্ভিদ বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড আর মাটি থেকে জল গ্রহণ করে। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল (CO_2+H_2O) সৌরশক্তি এবং পত্র-হরিতের সাহায্যে ক্রমে শর্করায় ($C_6H_{12}O_6$) পরিণত হয়। উদ্ভিদের এই অঙ্গারাত্মকরণ (photosynthesis) প্রক্রিয়া কেমন করে সম্ভাবিত হয়, সেই রহস্য উদ্ঘাটন করবার জন্যে তেজস্ক্রিয় কার্বন ডাইঅক্সাইড ($C^{14}O_2$) ব্যবহৃত হচ্ছে।

তেজস্ক্রিয় অঙ্গারের আর একটা বিস্ময়কর প্রয়োগ হলো গবেষণাগারে প্রাগৈতিহাসিক বস্তুর বয়স নির্ধারণে (carbon dating)।

অঙ্গার সম্বন্ধে মোটামুটি যে আলোচনা করা হলো তাথেকে নিশ্চয়ই ধারণা করা যেতে পারে যে, এই মৌলিক পদার্থটি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কেমনভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে!
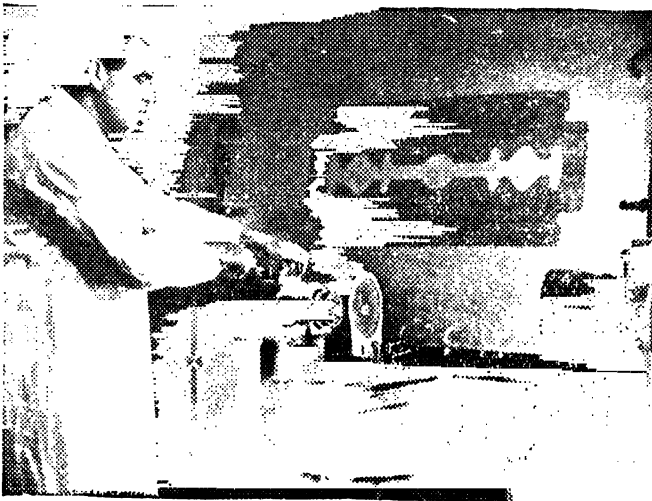
শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত দ্রব্যাদি পরীক্ষার নিমিত্ত বৃটেনে নির্মিত পৃথিবীর বৃহত্তম হরাইজণ্ট্যাল প্রোজেক্টর। এই প্রজেক্টরের সাহায্যে এখানে একটি ব্লেডকে ২০ গুণ বর্ধিত আকারে দেখানো হয়েছে।

বিজ্ঞান সংবাদ

যন্ত্রের সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের কার্য সম্পাদন

মানবদেহে শল্য-চিকিৎসার সময় হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হইবার পরেও এক অভিনব যন্ত্রের সাহায্যে বিশ মিনিট কাল রোগীর হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুসের কাজ অবাধে চালু রাখা সম্ভব বলিয়া জানা গিয়াছে। যন্ত্রটির কার্যকারিতা পরিদর্শন করিবার জন্য ইউরোপের অনেক দেশের বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি লণ্ডনের এক প্রসিদ্ধ হাসপাতালে সমবেত হইয়াছিলেন। স্বাভাবিক অবস্থায়, অর্থাৎ যন্ত্রটির সাহায্য ব্যতীত মানবদেহের হৃৎপিণ্ড চার মিনিটের অধিক সময় বন্ধ থাকিলে রোগীর মৃত্যু ঘটে।

এই ধরণের একপ্রকার যন্ত্র ইউ. এস-এর এক ডাক্তার সর্বপ্রথম উদ্ভাবন করেন। গাইস হাসপাতালের থোরাসিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা এই যন্ত্রের আরও উন্নতি সাধন করিয়া যন্ত্রটির জটিল ব্যবস্থা দূর করিয়া সরল অবস্থায় আনেন। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হইলেও এখন এই যন্ত্র যে কোন লোকের দ্বারা হাতে চালানো সম্ভব। অনেক বিজ্ঞানীর মত এই যে, হৃৎপিণ্ডের শল্য-চিকিৎসায় এখন বৃটেন ইউ. এস. এ. অপেক্ষা অধিকতর অগ্রসর।

শল্য-চিকিৎসার সময় প্রথমে অক্সিজেন-যন্ত্রের মাধ্যমে দেহের রক্ত সঞ্চালনের গতি নির্ধারিত করিয়া পরে হৃৎপিণ্ডটি থামাইয়া দেওয়া হয়। হৃৎপিণ্ডের গতি বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অক্সিজেন-যন্ত্র উহার সমস্ত কার্য করিতে থাকে। একটি পাম্প-যন্ত্র উহার ধাতব অঙ্গুলির সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের ভেনাস শিরা হইতে রক্ত টানিয়া লইয়া একটি নাতি-স্বচ্ছ নলের মধ্যে প্রবেশ করাইতে থাকে। ঐ নলের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণে অক্সিজেনও সরবরাহ হইতে থাকে। ইহার পর রক্তের ফেনা দূর করিয়া আর একটি পাম্পের সাহায্যে উহা সাবক্লেভিয়ান ধমনীর মধ্যে প্রবেশ করানো হয়।

এই কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড-ফুস্‌ফুস-যন্ত্রটি নির্মাণ করিতে প্রায় পাঁচ শত পাউণ্ড খরচ পড়ে বলিয়া জানা গিয়াছে।

পৃথিবীর আয়তন

ইউ. এস. সৈন্য বিভাগ হইতে নূতন করিয়া পৃথিবী পরিমাপ করিয়া জানা গিয়াছে যে, পূর্বের হিসাবে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ যাহা নির্ধারিত হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে ইহা তাহা অপেক্ষা ৪২০ ফুট ছোট। শতাধিক বর্ষব্যাপী পরিমাপ কার্য চালাইয়া বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। মানচিত্র বিভাগের মিঃ চোভিট্‌জ্ ও মিঃ ফিশ্চার বলেন যে, নূতন হিসাব মত পৃথিবীর ব্যাসার্ধ হইল ৬,৩৭৮,১৬০ মিটার বা ৩,৯৬৩,২৬ মাইল।

সাধারণ ব্যাপারে ৪২০ ফুটের পার্থক্যে কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না বটে, কিন্তু কৃত্রিম উপগ্রহ সংক্রান্ত ব্যাপারে উহার গতিবেগ এবং গতিপথ নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করিবার পক্ষে এই পার্থক্যের বেশ গুরুত্ব আছে। দূরপাল্লার কামান এবং নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণ যন্ত্রের কার্য নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে পৃথিবীর পরিমাপও নির্ভুল হওয়া প্রয়োজন।

পৃথিবী সম্বন্ধে নূতন তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মানচিত্র বিভাগের দ্বারা যে অভিযান চালানো হয় তাহারই ফলে এই তথ্যটি প্রকাশ হইয়া পড়ে। অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল, পৃথিবীর আয়তন ও আকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে জ্ঞানলাভ করা এবং পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধের পরস্পর ভৌগোলিক সম্বন্ধ নির্ণয় করা। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অভিযানটি

চালাইয়া তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে।

প্রায় একশত বৎসর পূর্বে উইল্‌হেল্‌ম্‌ স্ট্রুভ নামে একজন রুশ জ্যোতির্বিদ সর্বপ্রথম ভূপৃষ্ঠে একটি কাল্পনিক রেখার পরিমাপ করিয়া পৃথিবীর পরিধির হিসাব করেন। তখন হইতে ঐরূপ বৃত্তাংশের পরিমাপ হইতেই ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলের পরিমাপ হিসাব করা হইতে থাকে। নূতন ব্যবস্থায় বৃহত্তর বৃত্তাংশের ব্যবহার করিয়া পৃথিবীর ব্যাসার্ধের সংশোধিত পরিমাপ সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে।

গত দুই বৎসর যাবৎ মানচিত্র বিভাগের কর্মীরা দুইটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বৃত্তাংশের পরিমাপ হিসাব করিতেছেন। একটি হইল আমেরিকা মহাদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত—ক্যানাডার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে চিলির দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত, অপরটি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার উত্তর প্রান্ত হইতে আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত।

পূর্বে যে বৃত্তাংশ ব্যবহার করা হইত তাহা এখনকার বৃত্তাংশের অর্ধেক। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, দ্বিগুণ বৃত্তাংশ ব্যবহার করিলে হিসাবের নির্ভুলত্ব চার গুণ বৃদ্ধি পায়। পূর্বে কেবল উত্তর গোলার্ধের মধ্যেই বৃত্তাংশের পরিমাপ গ্রহণ করা হইয়াছিল। বর্তমানে বৃত্তাংশ দুইটি এই প্রথম দক্ষিণ গোলার্ধেও বিস্তৃত করা হইয়াছে।

বৃত্তাংশ দুইটি পরিমাপ করিতে বিজ্ঞানীরা বহু আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়াছেন এবং আদিম অধিবাসীদের কতকগুলি অঞ্চলেও প্রবেশ করিয়াছেন। ভূমধ্যসাগরের এক পার হইতে অপর পার পর্যন্ত কল্পিত রেখাটি রেডারের সাহায্যে পরিমাপ করা সম্ভব হইয়াছে। পূর্বের অভিযানগুলিতে ইহা সম্ভব হয় নাই। নূতন করিয়া হিসাব করিতে এবং পুরাতন হিসাব মিলাইতে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই অভিযানে মানচিত্র বিভাগের কর্মীরা বহু দুর্ভেদ্য অরণ্যের মধ্য দিয়া পায়ে হাঁটিয়া গিয়াছেন এবং বহু অপরিচিত ও অল্পপরিচিত অঞ্চল পরিক্রমণ করিয়াছেন। আফ্রিকায় সুদান অঞ্চলে শুষ্ক ঋতুতে প্রায়ই বৃহৎ তৃণাচ্ছাদিত অঞ্চলে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া থাকে। উহার ধূম এতই ঘন হয় যে, অনেক সময় এই কারণে অভিযান স্থগিত রাখিতে হয়। এই ধরণের জরিপকার্য কখনও কখনও অতিশয় বিরক্তিজনক হইয়া দাঁড়ায়। আফ্রিকার কয়েকটি আদিম অধিবাসীকে এই কার্যের প্রারম্ভ হইতেই নিয়োগ করা হয়। এক এক সময় তাহারা কেবলমাত্র একটানা বিরক্তিকর কাজের জন্য ধর্মঘট করিয়া বসে।

ইউরোপের অন্তর্গত কাল্পনিক রেখাটির ১৯৫১ সালে পরিমাপ কার্য সম্পন্ন করা হয়। তৃতীয় বৃত্তাংশটি স্কট্‌ল্যাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া আইসল্যাণ্ড ও গ্রীনল্যাণ্ডের ভিতর দিয়া ল্যাব্রাডরে শেষ হইয়াছে। ইহার মধ্যে গ্রীনল্যাণ্ডের তুষারাচ্ছাদিত অংশটির কার্য বাকী আছে। এই বৎসর গ্রীষ্মকালের মধ্যেই ইহার মাপজোক সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তৃতীয় বৃত্তাংশের মাপ সংগৃহীত হইলে পৃথিবীর আয়তন সম্বন্ধে আরও নির্ভুল হিসাব পাওয়া যাইবে বলিয়া বিজ্ঞানীরা আশা করেন।

সঠিকভাবে পৃথিবীর আয়তন পরিমাপ করিবার জন্য মানুষের আকাঙ্খা পুরাকাল হইতেই রহিয়াছে। খৃষ্টপূর্ব ২০০ অব্দে এরাটোস্থেনিস সর্বপ্রথম মিশরের অন্তর্গত ৫০০ মাইল বিস্তৃত একটি বৃত্তাংশের পরিমাপ হইতে পৃথিবীর আয়তন নির্ধারণের চেষ্টা করেন। মানচিত্র বিভাগের বর্তমান প্রচেষ্টায় পূর্ব-গোলার্ধে মিশরের উপরোক্ত অঞ্চলটি ঘটনাচক্রে তাঁহাদের নির্ধারিত বৃহত্তর বৃত্তাংশের মধ্যেই পড়িয়া গিয়াছে; অর্থাৎ এরাটোস্থেনিসের রেখাটি বর্তমানের বৃহত্তর রেখার একটি অংশের মধ্যে পড়িয়াছে।

বর্ধিত রক্তচাপের সংশ্লেষিত ঔষধ

রক্তের বর্ধিত চাপ এবং মস্তিষ্কের রোগে রেজার্পিন নামক ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রাওলফিয়া নামক গাছের শিকড় হইতে নিষ্কাশন করিয়া রেজার্পিন প্রস্তুত হয়। বর্ধিত রক্তের চাপ এবং কয়েক প্রকার মানসিক রোগের চিকিৎসায় রাওলফিয়া ও উহা হইতে নিষ্কাশিত রাসায়নিকের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

সম্প্রতি নিউ বার্নস্উইকের স্কুইব ইনষ্টিটিউটের এক বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা গিয়াছে যে, সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় রেজার্পিন প্রস্তুত করিবার এক সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই আবিষ্কারের ফলে রাওল-ফিয়ার শিকড়ের সরবরাহ বন্ধ হইলেও ইউনাইটেড স্টেট্সে রেজার্পিন ও উহার সমগোত্রীয় রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে।

ইনষ্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা কয়েক বৎসর যাবৎ রেজার্পিনের পর্যায়ভুক্ত রাসায়নিক পদার্থগুলির গঠনবৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহারা দেখেন যে, পরমাণু বিন্যাসের তারতম্যের ফলে রাসায়নিক পদার্থটির ৬৪টি বিভিন্ন প্রকারের গঠন হইতে পারে। উহাদের মধ্যে একটিকে স্বভাবোৎপন্ন হইতে দেখা যায় এবং সেইটিই কার্যকরী। রাসায়-নিক পদার্থটির মধ্যে একটি হাইড্রোজেনের পরমাণু প্রবেশ করানো বিশেষ কৌশলসাপেক্ষ। বিজ্ঞানীরা এই কৌশলটি আয়ত্ত করিয়াছেন। এই উপায় অবলম্বন করিয়া সাধারণ সহজলভ্য রাসায়নিক পদার্থ হইতে রেজার্পিন প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে।

বর্তমানে ইউনাইটেড স্টেট্সে তিন হইতে সাড়ে তিন কোটি ডলার মূল্যের রেজার্পিন জাতীয় ঔষধ বিক্রয় হইয়া থাকে।

মনুষ্য-নির্মিত কৃত্রিম চন্দ্র হইতে ভূ-পর্যবেক্ষণ

আমেরিকান রকেট সোসাইটির এক সভায় মিঃ বাউম্যান এক বিবৃতিতে বলেন যে, রকেটের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠের ১৪৭ মাইল উর্ধ্ব হইতে তোলা পৃথিবীর ফটোগ্রাফ পর্যবেক্ষণ করিলে মনে হয় যে, পৃথিবীতে মানুষের বসবাস নাই। কাজেই অন্যান্য গ্রহের বা এমন কি চন্দ্রের ফটোগ্রাফ দেখিয়া এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না যে, উহাতে কোন অধিবাসী বা সভ্যতার অস্তিত্ব নাই।

আগামী বৎসর বিশ ইঞ্চি ব্যাসের যে কৃত্রিম উপগ্রহটি ছাড়া হইবে তাহার মধ্যে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি সমেত বহুপ্রকার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র সন্নিবেশিত থাকিবে। বিজ্ঞানীরা আশা করেন যে, উচ্চাকাশে যে সকল উল্কা দ্রুতগতিতে ধাবিত হইতেছে, সেগুলি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যাইবে। উপ-গ্রহটির সহিত চারটি মাইক্রোফোন সংলগ্ন থাকায় ধাবমান উল্কার হিস্ হিস্ শব্দ উহার দ্বারা লিপিবদ্ধ হইবে। এই উপগ্রহের সাহায্যে মানুষ চিরকালের অজ্ঞাত স্থানের সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবে।

দশ টন ওজনের বাহাত্তর ফুট লম্বা একটি রকেটের সাহায্যে এই কৃত্রিম চন্দ্রকে উর্ধ্বাকাশে ছাড়া হইবে। ভবিষ্যতে মানুষ অন্য গ্রহে যাইবার জন্য যে চেষ্টা করিবে, সেই চেষ্টা মানুষের জীবনের নিরাপত্তার জন্য যেরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে এই কৃত্রিম উপগ্রহে সন্নিবেশিত যন্ত্রপাতির নির্দেশ হইতে সম্পূর্ণ ধারণা লাভ হইবে।

ইউনাইটেড স্টেট্সের পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ সৃজন বিভাগের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ইলিয়ট তাঁহার বিবৃতিতে বলেন যে, সঠিকভাবে আবহাওয়ার অবস্থা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই কৃত্রিম চন্দ্র বিশেষ কার্যকরী হইবে। ইহার ফলে প্রতি বৎসর বহু জীবনহানি ও বহু অর্থের অপচয় নিবারিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

তিনি আরও বলেন যে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যেই মানুষ যাত্রী বহনোপযোগী মহাশূন্যযানের

ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। তবে তাহা যাত্রীদের উৎসাহের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

উক্ত বিভাগের মিলিটারি ম্যানেজার বলেন, কৃত্রিম উপগ্রহটি শূন্যে একদিন, একমাস বা এক বৎসরও অবস্থান করিতে পারে। ২০০ হইতে ১৫০০ মাইল উপরে বাতাসের গুরুত্বের উপর উপগ্রহটির শূন্যে অবস্থানকাল নির্ভর করে। উপগ্রহটির গতি ক্রমশঃ কমিতে কমিতে এমন এক অবস্থায় আসিবে যখন উহা আর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অতিক্রম করিতে পারিবে না, তখন উহা ঘন বাতাসের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উল্কার ন্যায় উত্তাপে জ্বলিয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে। ডিম্বাকৃতি কক্ষপথে উপগ্রহটি পৃথিবীকে ১০০ মিনিটে একবার প্রদক্ষিণ করিতে করিতে এক সময়ে পৃথিবী হইতে দুইশত মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িবে এবং শক্তি ব্যয়িত হইয়া উহার গতি মন্থর হইয়া যাইবে।

বর্তমানে ইঞ্জিনিয়ারগণ ফ্লোরিডার প্যাট্রিক এয়ার ফোর্স বেস হইতে উপগ্রহটিকে ছাড়িবার জন্য সকল সরঞ্জাম প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত আছেন।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত
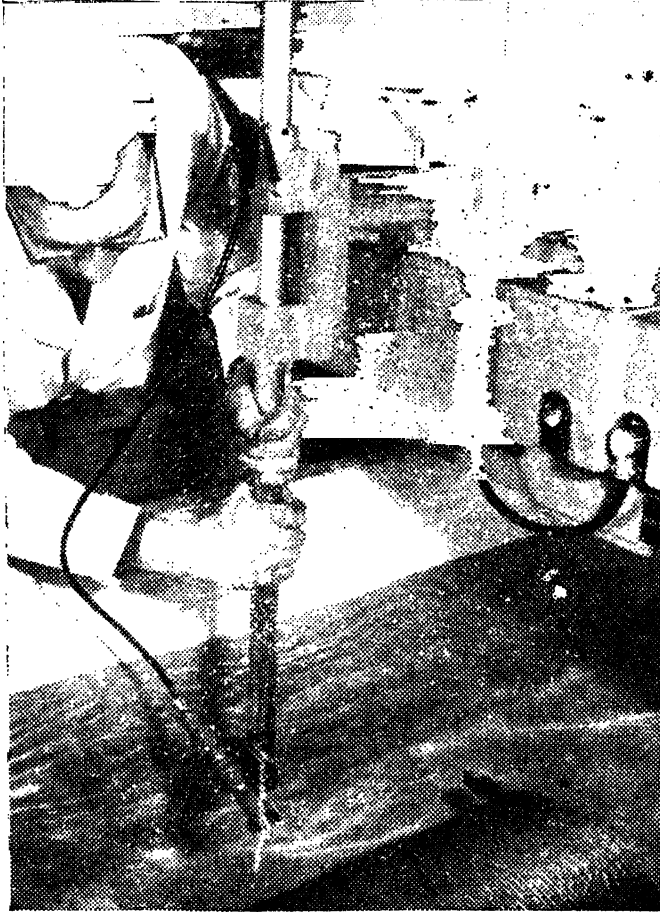
ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দ্রব্যাদি পরীক্ষার জন্য ইলেকট্রনিক্স্ ও মিকানিক্স্-এর সমন্বয়ে অভিনব অটোসনিক্স্ ব্যবস্থায় যন্ত্রাদির পরীক্ষা হচ্ছে।

ময়ূরাক্ষীর বাঁধ

শ্রীসুরথনাথ সরকার

শীর্ণ রেখার মতন দেখা যায় দূর থেকে, বুকে নেই কোথাও এক ফোঁটা জলের চিহ্ন। ধূ ধূ করছে চার পাশের দিগন্তবিস্তৃত মাঠ—রুক্ষ, ফসলহীন লাল মাটি চৈত্রের নিদাঘতপ্ত রৌদ্রে খাঁ খাঁ করে। এ হেন পরিবেশে নির্জীব একটি ধারা যে কখনও ভয়াল রুদ্ররূপিণী হয়ে উঠতে পারে তা সাধারণ মানুষের কল্পনারও অতীত হওয়াই স্বাভাবিক। তবে হ্যাঁ, যারা এর আশেপাশে বাস করে কিংবা যাদের কোনও কারণে এর হিংস্র লীলার সামনা-সামনি উপস্থিত হওয়ার দুর্ভাগ্য হয়েছে কেবল মাত্র তারাই বলতে পারবে, বাস্তবের রূঢ়তা কল্পনার চেয়েও কত বেশী ভয়ঙ্কর ও বেদনাদায়ক হতে পারে। বর্ষার ঝম্ ঝম্ বৃষ্টিধারার সঙ্গে প্লাবনের যে তাণ্ডব সুরু হয় এই বিস্তীর্ণ নদীর বুকে, লাল ঘোলা জলের যে লীলা চপলতা জেগে ওঠে স্বল্প কালের জন্যে, তার তুলনা বুঝি আর কোথাও মেলে না। দুখের এই অশ্রুনদী ময়ূরাক্ষী কত যে জনপদ করেছে উচ্ছন্ন, কত যে ভালবাসার নীড় দিয়েছে ভেঙ্গে, তার ইয়ত্তা নেই। তার নীরব সাক্ষী হয়ে আছে এখানে-সেখানে দাঁড়ানো ঐ তালগাছগুলি।

এ হেন পাগলা নদী কোন দিন যে মানুষের জীবনে কবিকল্পিত চিরকল্যাণময়ী রূপ নিয়ে উপস্থিত হতে পারে তা ধারণা করা কঠিন হলেও বিজ্ঞানের কৃপায় আজ তাই সম্ভব হতে পেরেছে। কয়েক বছরের মধ্যেই আলাদিনের যাদুপ্রদীপের মত এখানে একটা ভোজবাজি ঘটে গেছে। আজ নদীর দু'কূলে তাকালে দেখা যাবে, লাল মাটির বুকে জেগে আছে সোনালী ফসলের অপূর্ব সমারোহ, নবজীবনের অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য। খুব বেশী দিন নয়, সামান্য কয়েক বছর আগেও এই নদী যে একবার দেখে এসেছে তার পক্ষে ভাবতেও অবাক লাগবে যে, কেমন করে এই যুগান্তকারী পরিবর্তন সম্ভব হলো? যেখানে প্রচণ্ড হাড়কাঁপানো শীতের মধ্যেও দু'ফোঁটা জলের জন্যে মানুষকে গলদঘর্ম হতে হতো, আজ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে এক বিরাট সায়র—গৈরিক রাগে রঞ্জিত জলরাশি! কেমন করে এ সম্ভব হয়েছে, সে কাহিনী শুনতে হলে আরও একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে।

পশ্চিম বাংলা ও বিহারের মানচিত্রখানা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, একটা ছোট নদী ময়ূরাক্ষী নাম নিয়ে নেমে এসেছে সাঁওতাল পরগণার উঁচু জায়গা থেকে। ক্রমে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের অসমতল জমি অতিক্রম করে দেড়শো মাইল পথ পরিক্রমার পর এসে পড়েছে ভাগীরথীর বুকে। জানি না, ময়ূরাক্ষী নাম তার হলো কেমন করে? সে ইতিহাস পুরাকালের কোন্ অনাদৃত, ছেঁড়া পাতায় লুকিয়ে আছে, কে জানে? হয়তো নদীর আঁকাবাঁকা উচ্ছল গতিপথ কোন ভাবুকের মনে ময়ূরের নয়নরূপে প্রতিভাত হয়ে থাকবে, হয়তো অন্য কারণও কিছু থাকতে পারে! এই নদীতে এসে মিলিত হয়েছে দ্বারকা, ব্রাহ্মণী, বক্রেশ্বর ও কোপাই-এর প্রবাহ। তাদের বিশেষত্ব এই যে, সব কটি নদীই ময়ূরাক্ষীর প্রায় সমান্তরালভাবে নেমে এসেছে। এদের সাহায্যে যে পয়ঃক্ষেত্র (Catchment) রচিত হয়েছে তার পরিমাণ কিঞ্চিদধিক ১০০ বর্গমাইল। পাহাড়ে এই নদী—এখানে-সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ছোট-বড় পাহাড়ের সারি, তাদের মধ্য দিয়ে নদী এসেছে নেমে। পয়ঃক্ষেত্রে বৃষ্টিপাতের বার্ষিক গড় প্রায় ৬০ ইঞ্চি, অনাবৃষ্টির সময়ে তা প্রায় চল্লিশের

কাছাকাছি নেমে আসে। খরার সময় নদী প্রায় সব জায়গাতেই শুকিয়ে যায় এবং বর্ষাকালে স্বাভাবিক সময়ে নদীর প্রবাহমাত্রা হয়ে থাকে প্রায় অর্ধ লক্ষ ঘনফুট-সেকেণ্ড; অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে নদী পথে নেমে আসে পঞ্চাশ হাজার ঘনফুট পরিমাণ জল। আবার বর্ষার কোনও চপল ক্ষণে হঠাৎ যখন উদ্দাম সাঁওতালী নৃত্যে মেতে ওঠে তখন তা লক্ষের অঙ্ককেও ছাড়িয়ে যায়। সেই বিপুল প্রবাহে চারদিক ভেসে যায়। বিশাল প্লাবনে কে কোথায় হারিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, কে জানে?

অবশেষে বার বার দুঃখের দহনে দগ্ধ হয়ে মানুষ স্থির করলো, এ ভাবে প্রকৃতির কাছে হার মানলে আর চলবে না। এই দুরন্ত ও খামখেয়ালী নদীকে শাসন করতে হবে, বাঁধতে হবে কর্মশৃঙ্খলে। কিন্তু তার জন্যে কি চাই? চাই অনেক কিছু—চাই নদী বিষয়ে নানা তথ্য, চাই সুসংবদ্ধ কর্ম-প্রণালী, সর্বোপরি বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা ও দৃষ্টিভঙ্গী। নদীর অতীত ইতিহাস খুঁজে বের করতে হবে—কবে, কোথায় তার গতি প্রকৃতি কি রকম ছিল। কোথায় গতিপথে কোন্ পরিবর্তন ঘটেছে, নদীর জীবনে কতবার কি ধরণের বন্যা এসেছে এবং তার সর্বোচ্চ পরিমাণই বা কি? বিভিন্ন সময়ে নদী পথে যে পলি নেমে আসে তার পরিমাণ কত এবং ছোট বড় দানার অংশ কতটা—ইত্যাদি তথ্য যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে জানা দরকার। বাঁধ তুলতে হলে তাকে কতটা উঁচু করতে হবে, কতদিন তা কার্যকরী থাকবে এবং তার জন্যে কত টাকা খরচ হবে—ইত্যাদি হিসেবও ঠিক ঠিক করা চাই। মোট কথা, পরিকল্পনা যতটা সম্ভব নিখুঁত হওয়া উচিত; কারণ সামান্য ভুলত্রুটির জন্যে সব ব্যবস্থা অকেজো হয়ে গোটা টাকাটাই জলে যেতে পারে!

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম এবিষয়ে চিন্তা করা সুরু হয়। সরকারী লাল ফিতার বাঁধন পেরিয়ে কার্যকরী ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করতে ১৯৪৫ সাল এসে পড়ে। দেখতে দেখতে আরো কয়েকটি বছর কেটে গেল। অবশেষে পনেরো কোটি টাকা ব্যয়ে বাঁধ তৈরীর একটা পরিকল্পনা খাড়া হলো। নদীর সমগ্র গতিপথে অনুসন্ধান কার্য চালাতে হলো এবং উৎস থেকে চল্লিশ মাইল দূরে মশানজোড় নামক জায়গায় দুটা পাহাড়ের মাঝখানে একটা সঙ্কীর্ণ

স্থান পাওয়া গেল যা বাঁধ নির্মাণের পক্ষে বিশেষ প্রশস্ত বিবেচিত হলো। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে বাঁধ নির্মাণের কার্যে হাত দেওয়া হলো। এর আগেই সুরু করা হলো পরিকল্পনার আর একটা অঙ্গ। বাঁধ থেকে অনধিক কুড়ি মাইল দূরে সিউড়ীতে দেওয়া হলো হাজার ফুট দীর্ঘ এক ব্যারাজ। এদের সাহায্যে নদীবক্ষে যে জল ধরে রাখা হয়েছে তা প্রায় ছয় মাইল দীর্ঘ এক জলাশয় তৈরী করেছে। উদ্দেশ্য, এর সাহায্যে দুই পারের জমিতে প্রয়োজনের সময় জল দেওয়া। এজন্যে ব্যারাজের দুই পারে করা হয়েছে দুটি দীর্ঘ খাল। মশানজোড় বাঁধের দৈর্ঘ্য দুই হাজার ফুট এবং নদীর খাতে ভিত্তি থেকে উচ্চতা ১৩৬ ফুট। বিপুল শ্রম ও অর্থে ১৯৫৫ সালেই প্রায় সারা হয়ে গেছে এর নির্মাণকার্য। কংক্রীট নির্মিত এই বাঁধ তৈরীতে কি বিপুল কার্যদক্ষতার প্রয়োজন হয়েছে তা কেবলমাত্র কল্পনায় অনুধাবন করা সম্ভব নয়। বাঁধের জন্যে বড় বড় ইটের আকারে পাথর কেটে আনা হয়েছে দূর থেকে, যা উত্তম শিলার গুণবিশিষ্ট হওয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল। নদীগর্ভে গভীর খাত কেটে দৃঢ় শিলাস্তরের উপর থেকে সুরু করতে হয়েছে গাঁথুনি। ভূমি খনন, সিমেণ্টের ব্যবহার ও আনুসঙ্গিক কাজ এমনই সুশৃঙ্খলার সঙ্গে করে যেতে হয়েছে যে, তাতে ছন্দ পতন হলেই ব্যাঘাত সৃষ্টি হতো গুরুতর রকমের। কারণ প্রত্যেকটি কাজের একটির সঙ্গে আরেকটির সম্বন্ধ ছিল অতি ঘনিষ্ঠ। একটা সাধারণ হিসাব থেকেই এখানকার কাজের বহরটা বোঝা যেতে পারে। এখান থেকে যে মাটি কাটা হয়েছে তা দিয়ে পাঁচ মাইল দীর্ঘ, এক মাইল প্রশস্ত এবং মানুষ সমান গভীর কোন স্থান অনায়াসেই ভর্তি করা যেত। যে পরিমাণ কংক্রীট ব্যবহার করা হয়েছে তা দিয়ে কলকাতা থেকে দিল্লী পর্যন্ত দীর্ঘ ও বারো ফুট চওড়া একটা পাকা রাস্তা করা চলতো। নির্মাণ কার্যে হাত দেওয়ার আগে সব কিছুই যে কেবল অঙ্ক কষে হিসাব করে নিতে হয়েছে তা নয়, নদী-বিজ্ঞান গবেষণা ক্ষেত্রে অনুকৃতির সাহায্যে তাদের ভাবী ফলাফলকেও যাচাই করবার প্রয়োজন ছিল। যেমন—পরিবহন নালা দিয়ে কতটা জল ছেড়ে দেওয়া সম্ভব হবে এবং তার ফলে বাঁধের ভাটীতে কি অবস্থা ঘটবে—ইত্যাদি বিষয় জানতে হয়েছে। মোট কথা, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই এ রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছিল অনিবার্য। বাইরে থেকে মনে হবে, নীরেট পাষাণ প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে নদীর বুকে মাথা উঁচু করে। কিন্তু ভিতরে কারুকার্য ও কলকব্জা রয়েছে বিস্তর। এপার থেকে ওপার পর্যন্ত ভিতর দিয়ে চলে গেছে এক সরু গলি; তা দিয়ে বাঁধের ভিতরকার অবস্থা যে কোন সময় লক্ষ্য করা যায়। মাঝে মাঝে আছে ছোট ছোট অলিন্দ, সেখান দিয়ে আলোর ঝিলিক যেমন আসে, তেমনি হাওয়া এসে ছায়াছন্ন জনসমাগমবিহীন এই পাষাণ পুরীকে সজীব করে দিয়ে যায় ক্ষণিকের জন্যে। তাছাড়া এখানে-সেখানে রয়েছে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা। বড় বড় স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বসানো হয়েছে যাদের সাহায্যে অন্তর্নালা কিংবা পরিবহন নালার দরজাগুলিকে উঠানামা করানো যেতে পারে। বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা কোনও কারণে বিকল হয়ে পড়লে সেগুলিকে হাতে চালানোর বিকল্প ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। বাঁধ নির্মাণের ফলে যে সুবৃহৎ হ্রদ তৈরী হয়েছে তা প্রায় ২৭ বর্গমাইল জায়গা জুড়ে আছে এবং কুড়ি মাইল দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। গভীরতাও তার কম নয়—৮০ থেকে ১০০ ফুটের মধ্যে। মাঝে মাঝে কোথাও জেগে রয়েছে ছোট বড় পাহাড়ের চূড়া। আর দীর্ঘ হ্রদের দু'ধারে জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের সারি সৃষ্টি করেছে নয়নাভিরাম দৃশ্য। হ্রদের একপাশে নেই জনপ্রাণীর কোলাহল—যদিও মাঝে মাঝে বন্যজন্তুর আবির্ভাব মোটেই বিরল নয়। অপর পার্শ্ব কিন্তু অনেকটা কর্মচঞ্চল। এদিকের পাহাড়ের গা বেয়ে চলে গেছে একটা প্রশস্ত বাঁধানো পথ এবং শেষ হয়েছে আর একটা পাহাড়ের চূড়ায়। সেখানে

সরকারী বাংলো ও কর্মীদের ছোটবড় আবাস; তার নাম দেওয়া হয়েছে হিলটপ। প্রধান পথটি থেকে একটা রাস্তা করা হয়েছে। পাহাড় কেটে সেটি চলে গেছে ডুম্‌কার দিকে। কতকদূর অবধি তাকে দেখা যায়, একটা পাহাড়কে বেষ্টন করে এগিয়ে যেতে; তারপর কোথায় যেন গেছে হারিয়ে। আর একটা পাহাড়ের চূড়ায় রয়েছে ইয়ুথ হোষ্টেল। দূর থেকে দেখতে ভারি স্থন্দর।

জলাশয়ের বুকে তীর ঘেঁষে কিছুদূর অবধি বিছিয়ে রয়েছে সবুজ শেওলার মত এক আস্তরণ। গভীর হ্রদের জল কিন্তু গাঢ় গৈরিক বর্ণের। কিন্তু দেখতে অত লাল হলে হবে কি—হাত দিয়ে খানিকটা জল তুলে ধরুন কিংবা সাদা বোতলে রাখুন—দেখা যাবে, তা বেশ ফিকে হয়ে গেছে। বাঁধের উজানের এই অথৈ জল রয়েছে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, তার বুকে একটা ছোট মোটর লঞ্চ ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করছে। দূরে ছোটবড় ছু-একটা খেয়া নৌকা পাল তুলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাতায়াত করছে। বাঁধের উজানে এই দৃশ্য, আর ভাটির দিকে? সেখানে সামান্য জলের চিহ্নও সব সময়ে পাওয়া কঠিন। টারবাইনের সাহায্যে এখানে জল বিদ্যুৎ সংগ্রহের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তাকে চালানোর জন্যে জেট-এর আকারে বেরিয়ে আসে সামান্য জল মাত্র [আর্ট পেপারের চিত্র দ্রষ্টব্য]। ছুটা টার্বাইন রয়েছে একটা ঘরের মধ্যে। তা থেকে পাওয়া যাবে চ'র হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ। এই বিদ্যুৎ দিয়ে দূরবর্তী সহরগুলি যেমন আলোকিত করা চলবে, তেমনি শিল্পোন্নয়ন ক্ষেত্রেও খানিকটা সহায়তা হবে। ম্লান সন্ধ্যার অন্ধকারে এই বিদ্যুতালোকে যখন বাঁধের চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থান উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তখন সত্যি মনে হয়, নির্জনতার মাঝখানে এ যেন কোন্ স্বপ্নলোকের ইন্দ্রপুরী ঘুমিয়ে আছে মায়াচ্ছন্ন হয়ে। হয়তো অচিরেই সেখানে জেগে উঠবে কর্মশালার ডুন্দুভিনাদ। তখন এ স্বপ্ন যাবে ভেঙ্গে, বেরিয়ে আসবে কর্মমুখর কারাগার, আধুনিক সভ্যতার বাহন। বাঁধের এ ধারেই আছে সরু একটা খাল, নাম তার বিহার খাল। বর্তমান পরিকল্পনা রূপায়িত করতে গিয়ে প্রায় নব্বইটি গ্রামের হাজার পনেরো অধিবাসীকে বাস্তুহারা হতে হয়েছে। তাদের পুনর্বসতি ক্ষেত্রে জলসেচের জন্যেই করা হয়েছে এই ছোট খালটি। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান পরিকল্পনার রূপায়ণে ক্যানাডা সরকারের অর্থানুকূল্য থাকায় বাঁধের নাম দেওয়া হয়েছে ক্যানাডা বাঁধ।

বিগত ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ধ্বংসকারী প্লাবনে ক্যানাডা বাঁধের উপর এক ভীষণ পরীক্ষা হয়ে গেছে। বর্ষার প্লাবনের জল এখানে জমা হয়ে বাঁধের পরিকল্পিত মাত্রাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বাঁধের একুশটি পরিবহন নালা খুলে দেওয়া সত্ত্বেও বিপদ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। সর্বগ্রাসী বন্যায় প্রলয়ঙ্কর স্রোত বিপুল বেগে নেমে এসেছে পরিবহন পথে এবং প্রচণ্ডতার স্বাক্ষর রেখে গেছে বাঁধের ভাটিতে, এবড়ো-খেবড়ো বড় বড় পাথর বের করে। ভূগর্ভ থেকে হাঁ করে তারা চেয়ে আছে উর্ধ্বদিকে এবং বোধ করি মানুষের জন্যে একটা নীরব আশ্বাস-বাণীও বহন করছে, বাঁধের ভবিষ্যৎ স্থায়িত্ব সম্বন্ধে। প্রসঙ্গতঃ একথাও উল্লেখ করা যেতে পারে, ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা থেকে প্রায় ছয় লক্ষ একর জমিতে যে জলসেচের স্থবিধা হয়েছে তা থেকে কয়েক লক্ষ মণ ধান ও রবিশস্য পাওয়া সম্ভব হবে। পশ্চিম বাংলার "স্থজলা স্থফলা শস্যশ্যামলা" নামের সার্থকতা সম্পাদনে এই পরিকল্পনা যে সহায়ক হয়েছে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

সূর্যগ্রহণ

শ্রীহৃষীকেশ রায়

জনসাধারণের মনে এখনও এই ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে যে, রাহু সাময়িকভাবে সূর্যকে গ্রাস করিবার ফলে সূর্যের গ্রহণ সম্ভব হয় এবং সে সময়ে শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর প্রভৃতি বাদ্য বাজাইলে রাহু সূর্যকে মুক্তিদান করে। তখন চারিদিক পুনরায় সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হয়। প্রাচীনকালে চীনদেশেও এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা ছিল। কলাম্বাস তাঁহার আমেরিকা অভিযানে একটি সূর্যগ্রহণের সুযোগ গ্রহণ করিয়া আমেরিকার আদিম অধিবাসীগণের বিশ্বাসভাজন হইয়া আহার্য ও পানীয় সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রহণের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিয়া সেই অন্ধ বিশ্বাসের নিরসন করিয়াছে। গ্রহণ একটি আশ্চর্য নৈসর্গিক ঘটনা। গ্রহণের নির্দিষ্ট সময়, স্থিতিকাল, পৃথিবীর কোন্ কোন্ স্থান হইতে কি ভাবের গ্রহণ দেখা যাইবে—ইত্যাদি গ্রহণ সম্বন্ধীয় নানা বিষয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বহুদিন পূর্বেই নির্ণয় করিতে পারেন।

পৃথিবী সূর্যের এবং চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে উপবৃত্তাকার পথে পরিক্রমণ করে। সেইজন্য সূর্য হইতে তাহাদের আপেক্ষিক দূরত্বের অবিরত পরিবর্তন ঘটে। চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হওয়ায় চন্দ্র সাময়িকভাবে আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া যায়; কারণ পৃথিবীর মত চন্দ্রও অস্বচ্ছ ও নিষ্প্রভ এবং তাহার নিজস্ব কোন আলোক নাই - সূর্যের আলোকে আলোকিত হয়। কিন্তু চন্দ্র যখন সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে থাকিয়া সূর্যকে আমাদের দৃষ্টির আড়াল করে এবং চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীতে পড়ে, সে সময়ে সূর্যগ্রহণ হয়।

কথাটা একটু বুঝাইয়া বলা দরকার। আলোক-রশ্মি স্বচ্ছ সমসত্ত্ব মাধ্যমের মধ্য দিয়া সরলরেখায় গমন করে। চিত্রে চ আলোকের উৎস। ইহার সম্মুখে ক, খ, গ, ঘ কার্ডবোর্ডটি লম্বভাবে থাকায় আলোক-বাধাপ্রাপ্ত হয়; ফলে দেওয়ালের ক', খ', গ', ঘ' অংশে আলো যাইতে না পারায় ঐ অংশে ছায়ার সৃষ্টি হইয়া থাকে। (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। আলোকের উৎসের আয়তন ও অস্বচ্ছ পদার্থের আয়তনের উপর ছায়ার প্রকৃতি নির্ভর করে। উৎস আকারে বড় এবং অস্বচ্ছ পদার্থটি ছোট হইলে পর্দার এক অংশে একটি গাঢ় কালো ও তাহার পার্শ্বে অপর একটি ঈষৎ কালো ছায়া পড়ে। সম্পূর্ণ অন্ধকারময় ছায়াকে প্রচ্ছায়া (২নং চিত্রে খ-গ) এবং স্বল্প আলোকিত অংশকে (২নং চিত্রে ক-খ, গ-ঘ) উপচ্ছায়া বলে।

১নং চিত্র

পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে অমাবস্যার

দিন সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে চন্দ্র অবস্থান করে; সেইজন্য অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ হয়। প্রকৃতপক্ষে চন্দ্রের অন্তরালে সূর্য কিছুক্ষণের জন্য আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে যায়। সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের উপর যে কালো ছায়া দেখা যায় তাহা অস্বচ্ছ চন্দ্রেরই ছায়া।

পুরাণ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে এই বিন্দুদ্বয় যথাক্রমে রাহু ও কেতু নামে পরিচিত। সেইজন্য প্রতি অমাবস্যায় সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী এই পর্যায়ে প্রায় সমসূত্রে থাকিলেও ইহাদের পক্ষে প্রতি অমাবস্যায় এক সমতলে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু উহারা সমসূত্রে থাকিয়া একই সমতলে না থাকিলে সূর্যগ্রহণ হইতে
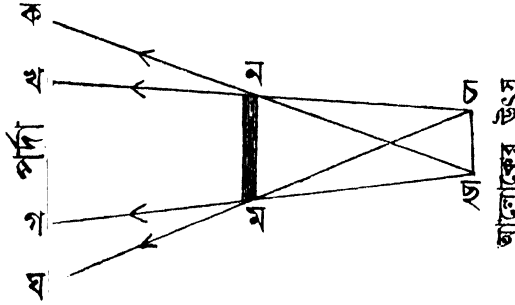
২নং চিত্র

অমাবস্যায় * সূর্যগ্রহণ হয়; কিন্তু প্রতি অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ হয় না। কারণ পৃথিবী ও চন্দ্রের কল্পিত উপবৃত্তাকার কক্ষপথ দুইটি একই সমতলে অবস্থিত নয়। হিপার্কাস আবিষ্কার করেন যে, এই কক্ষপথ দুইটি পরস্পরের মধ্যে ৫°৯′ কোণ করিয়া

পারে না। সেইজন্য প্রতি অমাবস্যার সূর্যগ্রহণ হওয়া সম্ভব নয়।

সূর্যের ব্যাস ৮,৬৪,০০০ মাইল, চন্দ্রের ব্যাস মাত্র ২,১৬০ মাইল। চন্দ্র ও সূর্য উভয়কেই আমরা পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে আপাতদৃষ্টিতে প্রায়
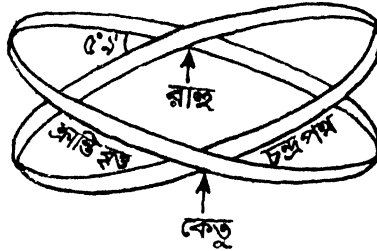
৩নং চিত্র

অবস্থিত হওয়ায় ইহারা পরস্পরকে দুইটি বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে (৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। হিন্দু

একই আকারের দেখি; কারণ, সূর্যের ব্যাস চন্দ্রের ব্যাসের ৪০০ গুণ হইলেও পৃথিবী হইতে সূর্যের দূরত্ব (সর্বাধিক ৯,৪৫,০০,০০০ মাইল, সর্বনিম্ন ৯,১৫,০০,০০০, মাইল) পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্বের (সর্বাধিক ২,৫৩,০০০ মাইল এবং সর্বনিম্ন ২,২২,০০০ মাইল) ৪০০ গুণ। সূর্য ও চন্দ্রের ব্যাস এবং পৃথিবী হইতে ইহাদের দূরত্বের

* পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে চন্দ্র আসিয়া পড়িলে সূর্যের আলোকে অর্ধাংশ আলোকিত চন্দ্রের অপর অর্ধাংশ সেদিন পৃথিবীর দিকে থাকায় আমরা চন্দ্রকে দেখিতে পাই না। এই দিনটিতেই অমাবস্যা তিথি হয়।

এই যে আকস্মিক যোগাযোগ ইহাতে সূর্য ও চন্দ্রকে আপাতদৃষ্টিতে সম-আয়তনের প্রতীয়মান হওয়ায় জ্যোতির্বিজ্ঞানে সূর্যগ্রহণের কারণ নির্ণয়ে সুবিধা হইয়াছে।

চন্দ্র পৃথিবীকে এবং চন্দ্র সহ পৃথিবী সূর্যকে উপবৃত্তাকার পথে পরিক্রমণ করায় পূর্বোক্ত দূরত্বের এবং বিভিন্ন সময়ে সূর্য ও চন্দ্রের আপাত আকারের যে হ্রাস-বৃদ্ধি দেখা যায়, তাহা এত কম যে, নগ্ন-চক্ষে তাহা স্থির করা সম্ভব নয়। উপবৃত্তাকার পথে ঘুরিতে ঘুরিতে চন্দ্র কখনও পৃথিবীর নিকটবর্তী হয়, কখনও দূরে সরিয়া যায়। পৃথিবীও ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে সূর্যের নিকটবর্তী হয়, কিন্তু জুন-জুলাই মাসে দূরে থাকে। আমাদের চক্ষুর সহিত সূর্য ও চন্দ্রের যে কৌণিক ব্যাস তাহা অনেক সময় একের কৌণিক ব্যাস অপরের কৌণিক ব্যাস অপেক্ষা অধিক; কখনও সমান, আবার কখনও বা কম হয়। কোনও অবস্থানে চন্দ্রের কৌণিক ব্যাস সূর্যের কৌণিক ব্যাস অপেক্ষা অধিক হইলে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হয়। কিন্তু চন্দ্রের কৌণিক ব্যাস সূর্যের কৌণিক ব্যাস অপেক্ষা কম হইয়া যদি সূর্য ও চন্দ্রের কেন্দ্র সমসূত্রে থাকে, তাহা হইলে বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ হয়। আবার চন্দ্রের বিশেষ অবস্থানে চন্দ্র যদি সূর্যকে আংশিক আবৃত করে তাহা হইলে খণ্ডগ্রাস সূর্যগ্রহণ হইবে। দেখা যাইতেছে যে, চন্দ্র ও সূর্যের বিভিন্ন অবস্থান অনুসারে সূর্যের পূর্ণগ্রাস, বলয়গ্রাস ও খণ্ডগ্রাস গ্রহণ হয়।

চক্ষুর সম্মুখে একটি পয়সা বা অনুরূপ কোন গোলাকার অস্বচ্ছ পদার্থ ধরিয়া সূর্যের দিকে তাকাইলে সূর্যকে আর দেখা যায় না; পয়সা বা ঐ পদার্থটিকে ক্রমে দূরে সরাইয়া লইলে সূর্যের মধ্যস্থল আবৃত হইবে। সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে চন্দ্র আসিয়া এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিলে প্রথম ক্ষেত্রে পূর্ণগ্রাস এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলয়গ্রাস সূর্য-গ্রহণ হয়।

পৃথিবী ও চন্দ্রের কক্ষ দুইটিকে রাহু ও কেতু পরস্পর যে দুইটি বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে তাহা স্থির বিন্দু নয়—ইহা বৎসরে প্রায় ১৯° ডিগ্রী করিয়া পশ্চাতে সরিয়া আসে। ফলে কিঞ্চিদধিক ১৮ সৌর বৎসর দশ বা এগার দিনে (উক্ত ১৮ বৎসরে চারিটি বা পাঁচটি অতিবর্ষ অনুসারে) এইরূপ পশ্চাদ্‌গতিতে ইহারা একটি সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ সম্পন্ন করে। সেইজন্য উক্ত বিন্দুদ্বয় দ্বারা বৎসর গণনা করিলে রাহু ও কেতু উক্ত পশ্চাদ্‌গতিতে পৃথিবীকে ধরিয়া ফেলায় দিনের সংখ্যা কমিয়া ৩৪৬·৬২ দিনে এক চান্দ্র বৎসর হয়; যদিও তিথি অনুসারে ২৯½ দিনে এক চান্দ্রমাস এবং প্রায় ৩৫৪ দিনে এক চান্দ্র বৎসর হয়। এইরূপ ১৯টি চান্দ্র বৎসর ৬৫৮৫·৭৫ দিনের সমান। এক সৌর বৎসর কিন্তু প্রায় ৩৬৫¼ দিনে। সূর্যও এক চান্দ্র মাসে, অর্থাৎ ২৯½ দিনে আপাতগতি প্রায় ৩০° অগ্রসর হয়। আবার ২২৩ চান্দ্রমাস, অর্থাৎ ৬৫৮৫·৩২ দিন পরে রাহু ও কেতুর অবস্থান অনুযায়ী সূর্য ও চন্দ্র পূর্বস্থানে ফিরিয়া আসিবে। রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় জ্যোতিবিদ্যার চর্চা করিয়া ব্যাবিলনীয়গণ এই তথ্য আবিষ্কার করিয়া সূর্যগ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। গ্রীকেরা তাঁহাদের নিকট হইতে এই গণনা পদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। পূর্বোক্ত কারণে ৬৫৮৫ দিন পরে পরে একই সময়ে একই প্রকারের সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ হইবে। কয়েক বৎসর গ্রহণের কাল গণনা করিয়া লইলে ভবিষ্যতে যে সকল গ্রহণ হইতে পারে তাহার নির্দিষ্ট দিন, সময় প্রভৃতি বহু পূর্বে নির্ণয় করা অসম্ভব নয়।

পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডের উপর পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ২৪ ঘণ্টায় একবার আবর্তন করে। পৃথিবীর এই আবর্তনগতির বেগ নিরক্ষরেখায় ঘণ্টায় ১০৪০ মাইল। পৃথিবীর এই আবর্তনগতি না থাকিলে সূর্যগ্রহণের সময় চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীপৃষ্ঠে ঘণ্টায় গড়ে ২১০০ মাইল বেগে দর্শককে অতিক্রম করিয়া যাইত, কিন্তু চন্দ্রও আপন পথে পশ্চিম

হইতে পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হওয়ায় গ্রহণের সময় চন্দ্র খ-মধ্যে থাকিলে নিরক্ষরেখায় চন্দ্রের ছায়া ঘণ্টায় প্রায় ১০৬০ মাইল বেগে অগ্রসর হয়। পৃথিবী-পৃষ্ঠে যত উত্তরে বা দক্ষিণে যাওয়া যায়, পৃথিবীর গতিবেগ ততই মন্দীভূত হয় বলিয়া মনে হয়। ফলে, ছায়ার উক্ত গতিবেগও বর্ধিত হয় এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তকালের গ্রহণ সময়ে চন্দ্রের ছায়া ঘণ্টায় ৪০০০ হইতে ৫০০০ মাইল বেগে অগ্রসর হয়। চন্দ্র যখন পৃথিবী হইতে নিকটতম এবং সূর্য দূরতম স্থানে থাকে, সেই সময় নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী স্থানে দীর্ঘতম সময়ের (৭½ মিনিট) জন্য পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা যায়। এইরূপ সূর্যগ্রহণ মানব ইতিহাসে প্রথম ২১৬৮ খৃষ্টাব্দে দেখা যাইবে। পূর্ণগ্রাস বা বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণের স্থিতিকাল (আরম্ভ হইতে মোক্ষ) কিঞ্চিদধিক ৪ ঘণ্টা।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ৩০ শে জুন আমেরিকা (ভোর ৫টা ৭মিঃ) হইতে ভারতবর্ষের যোধপুর (অস্তগামী সূর্য) পর্যন্ত ৩০০৭ মাইল দীর্ঘ ভূভাগে একটি পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা যায়। এই গ্রহণের সময় চন্দ্রের ছায়াটি ঘণ্টায় প্রায় ৩০০০ মাইল বেগে ধাবিত হয়। এই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের স্থিতিকাল প্রায় ৩ ঘণ্টা হইলেও ভারতে মাত্র ৩৫ সেকেণ্ড দেখা গিয়াছিল। ভারতবর্ষে ৫৬ বৎসর পরে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা গেল। যে সকল ঘটনা পরম্পরায় পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়, ১৮ বৎসর ১০ দিন বা ১১ দিন ব্যবধানে তাহার পুনরাবৃত্তি হয়। সেইজন্য ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে অনুরূপ একটি সূর্যগ্রহণ জাপানের উত্তরাংশে আরম্ভ হইয়া আটলান্টিক মহাসাগরে শেষ হইবে; কিন্তু ভারতবর্ষে ইহা অদৃশ্য থাকিবে। ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা যাইবে।

সূর্যগ্রহণের সময় চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীতে পশ্চিম দিক হইতে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়, কিন্তু পৃথিবীর মেরুরেখা বিভিন্ন অবস্থানে পরস্পর সমান্তরাল অবস্থায় থাকিয়া পৃথিবীর কক্ষপথের সহিত ৬৬½° কোণ করিয়া সূর্যকে পরিক্রমণ করায় গ্রহণের সময় পৃথিবীর অবস্থান অনুসারে এই ছায়া দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে উত্তর-পূবে অথবা উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সরিয়া যায়। সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবীর মধ্যে আপেক্ষিক দূরত্ব অনুসারে গ্রহণযুক্ত স্থানের পরিধি পৃথিবীপৃষ্ঠে একটি বিন্দু হইতে ১৯০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে।

কোনও এক বৎসরে পাঁচটির অধিক বা দুইটির কম সূর্যগ্রহণ দেখা যাইবে না। প্রতি ১৮ বৎসরে ৪৩টি সূর্যগ্রহণ হয়, তন্মধ্যে ১১-১২টি (শতকরা ২৮টি) পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। কোন একস্থানে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা গেলেও অন্যত্র আংশিক সূর্যগ্রহণ দেখা যাইতে পারে; আবার অপর স্থানে সূর্যের কোনরূপ গ্রহণই দেখা যাইবে না। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ বিরল, প্রায় ৩৬০ বৎসরের ব্যবধানে কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে পুনরায় পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা যাইতে পারে। বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণের সংখ্যা পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সংখ্যার প্রায় দেড়গুণ এবং পূর্ণগ্রাস অপেক্ষা ইহা আরও ৬০ মাইল অধিক স্থান ভূপৃষ্ঠের উপর আবৃত করিতে পারে। বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণের স্থিতিকালও ১২ মিনিটের অধিক হওয়া অসম্ভব নয়। উল্লেখযোগ্য যে, চন্দ্রগ্রহণের সংখ্যা কিন্তু আরও কম—চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সংখ্যার অনুপাত ২ : ৩।

সূর্যগ্রহণ নগ্নচক্ষে দেখা উচিত নয়; ধূম্রমলিন অল্পস্বচ্ছ কাচের মধ্য দিয়া দেখিলে অথবা হরিদ্রা-রঞ্জিত জলে গ্রহণকালীন সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখিলে চক্ষুর কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। দূরবীক্ষণ যন্ত্র বা দৃষ্টিশক্তির সাহায্যকারী অন্য কোন যন্ত্রের (অপেরা গ্লাস, বাইনোকিউলার প্রভৃতি) ব্যবস্থা না করিয়া সূর্যগ্রহণ দেখিবার চেষ্টা করা উচিত নয়। পূর্ণগ্রাসের প্রাক্কালে আকাশের রং ধীরে ধীরে বদলাইতে থাকে, পৃথিবী ক্রমে ক্রমে তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, জীবজন্তু ভীতত্রস্ত হইয়া আশ্রয়ের

সন্ধানে ব্যস্ত হয়। এই সময় স্বাভাবিক তাপমাত্রা হ্রাস পায়; এমন কি, কোন কোন স্থানে শিশির-বিন্দুও জমিতে দেখা যায় এবং জোরে বাতাস বহিতে থাকে। তিমিরাচ্ছন্ন আকাশে দিবাভাগেই তারকারাজি দেখা যায়। এই সময়ে চন্দ্র সূর্যকে সম্পূর্ণ আবৃত করিলেও সূর্যের পার্শ্বদেশ হইতে অপূর্ব শোভাময় এক শ্বেত জ্যোতি বাহির হয়। ইহাই ছটামণ্ডল বা সূর্যকিরীট*। অতি অল্পকাল স্থায়ী হইলেও পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ জ্যোতিবিদদের নিকট খুবই মূল্যবান; কারণ এই সময় সূর্যের গঠন-প্রণালী সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত তত্ত্বের সন্ধানে জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেন। সূর্যের পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের আলোক-রশ্মির বক্রগতির বৈশিষ্ট্যাদি পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার সেই সময়ে সুযোগ উপস্থিত হয়। আইনষ্টাইন সিদ্ধান্ত করেন যে, বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের আলোক-রশ্মি সূর্যের পার্শ্ব দিয়া আসিবার সময় সূর্যের প্রবল আকর্ষণ শক্তির প্রভাবে তাহার স্বাভাবিক পথ হইতে সূর্যের দিকে কিছু বাঁকিয়া যায়। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মে তারিখের সূর্যগ্রহণের সময় সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। বিশ্ব-রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টায় বৈজ্ঞানিকেরা এই কয়েক

সূর্য গ্রহণ পূর্ণ ও খণ্ড

৪নং চিত্র
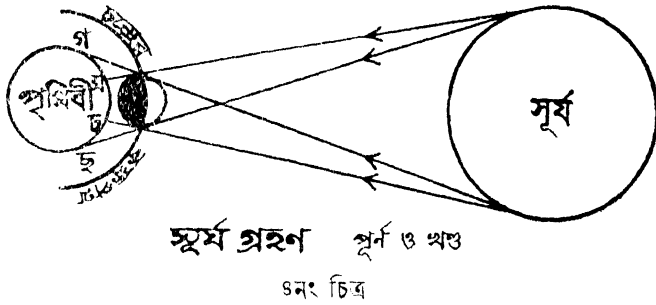
তাঁহারা ব্যাপৃত থাকেন। এই সময়ে সূর্যের বিভিন্ন মণ্ডল, সূর্য হইতে উৎপন্ন বেতার তরঙ্গ, আয়নমণ্ডল, চৌম্বকাকর্ষণ প্রভৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা বিবিধ পরীক্ষার দ্বারা আমাদের মিনিটের (সর্বাধিক সময় ৭½ মিনিট) পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন।

সূর্য অপেক্ষা পৃথিবীর আয়তন অনেক ছোট এবং পৃথিবী হইতে সূর্য বহুদূরে অবস্থিত। সেইজন্য পৃথিবীপৃষ্ঠে চন্দ্রের ছায়া এত ছোট হয় যে, পৃথিবীর অতি সামান্য অংশ চন্দ্রের প্রচ্ছায়ার মধ্যে (৪ নং চিত্রে খ-চ অংশ) অবস্থিত হয়। এই অংশ হইতে সূর্যকে দেখা যায় না; ফলে এই অংশ হইতে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা যায়। প্রচ্ছায়ার উভয় পার্শ্বের উপচ্ছায়ার (৪ নং চিত্রে গ-ঘ, চ-ছ অংশ) অংশ হইতে সূর্যের আংশিক বা খণ্ডগ্রাস গ্রহণ দেখা যাইবে। চন্দ্রের ছায়া ছোট হওয়ায় পৃথিবীর যে গোলার্ধে দিন, তাহার সকল স্থান হইতে সূর্য-গ্রহণ দেখা সম্ভব নয়।

পৃথিবী পরিক্রমণ কালে চন্দ্র পৃথিবী হইতে যদি এত দূরে সরিয়া যায় যে, উহার প্রচ্ছায়ার শঙ্কুটি ক

* ছটামণ্ডল—সূর্যের তিনটি বিভিন্ন মণ্ডল—(১) আলোক মণ্ডল, (২) বর্ণমণ্ডল, (৩) ছটামণ্ডল। পূর্ণ-গ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় ব্যতীত বর্ণমণ্ডল ও ছটা-মণ্ডল দেখা যায় না। সূর্যগ্রহণের সময় বর্ণমণ্ডলকে ঘিরিয়া যে তীব্র আলোকের ছটা উত্তপ্ত বাষ্প হইতে বাহির হয়, তাহাকে ছটামণ্ডল বলে। সূর্যের অপরূপ সৌন্দর্য এই ছটামণ্ডল হইতে উপভোগ করা যায়। এই সময় বৈজ্ঞানিকেরা সূর্যের যে অসংখ্য আলোকচিত্র গ্রহণ করেন, তাহা হইতে সৌরমণ্ডলের উপাদান, তাপমাত্রা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের অনেক তথ্য জানা যায়। ইহা ব্যতীত সৌরদেহের প্রান্ত হইতে গাঢ় লাল রঙের মেঘের মত একপ্রকার গ্যাসকুণ্ডলী নির্গত হয়। ইহাকে সৌরস্ফীতি বলে।

বিন্দুতে শেষ হইয়া ঐ প্রচ্ছায়ার উপচ্ছায়া পৃথিবীর ব-ভ অংশে (৫ নং চিত্র দ্রষ্টব্য) পৌছিলে ঐ অংশ হইতে বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা যাইবে। ইহাতে সূর্যের মাঝখানে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন বৃত্তাকার অংশ এবং উহার চতুর্দিক বলয়াকারে আলোকিত দেখা যাইবে। চ-ব এবং ছ-ব অংশ হইতে খণ্ডগ্রাস লক্ষিত হইবে।

আশ্চর্যের বিষয় জনসাধারণের মধ্যে গ্রহণ সম্বন্ধে বহু কুসংস্কার থাকিলেও অতি প্রাচীন কালেই হিন্দু জ্যোতির্বিদগণ কোনরূপ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণের দ্বারা গ্রহণের তথ্যসমূহ অবগত হইয়াছিলেন। এমন কি, বৈদিক যুগেও ধর্মানুষ্ঠানের ভিত্তিতে জ্যোতির্বিগ্যার চর্চা হইত। প্রাচীন যুগে (খৃষ্টীয় শতকের প্রারম্ভে) চৈনিক জ্যোতির্বিদগণও গ্রহণ গণনার গাণিতিক নিয়মাবলী অবগত ছিলেন। দুইশত তেইশ মাসে যে গ্রহণ-সমূহের পুনরাবর্তন হয়, ইহা ব্যাবিলনবাসী জ্যোতি-বিদগণের অজ্ঞাত ছিল না। হিন্দু, চৈনিক ও ব্যাবিলনীয় জ্যোতিবিজ্ঞানীদের পারস্পরিক প্রচেষ্টায় জ্যোতিবিজ্ঞানের সম্যক উন্নতি হয় এবং তাহাদের কর্মপ্রণালী অনুসরণ করিয়া পরে গ্রীকগণ এই শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। হিন্দুদের প্রাচীন শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানের গ্রন্থ হইল সূর্যসিদ্ধান্ত এবং শ্রেষ্ঠ জ্যোতিবিদ ছিলেন আর্যভট্ট। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগেও সেই ত্রুটিহীন গণনা পদ্ধতি অনুসারে পঞ্জিকা গণনা করা হয় এবং পঞ্জিকায় লিপিবদ্ধ গ্রহণসমূহ যথাসময়ে ও যথানির্দিষ্টভাবে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ
৫নং চিত্র
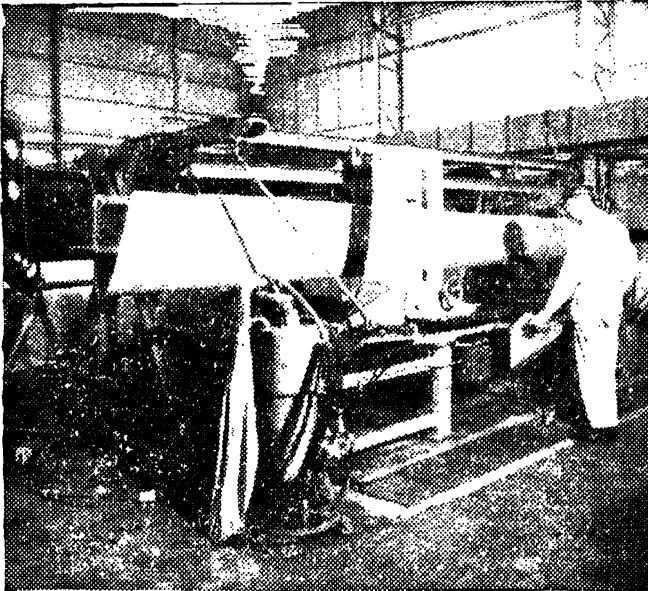
চলবার সময় ব্রিষ্টল ব্রিটেনিয়ার ডানা বা শরীরের উপর যাতে বরফ জমতে না পারে সেজন্যে স্প্রেম্যাট নামে একপ্রকার ইলেকট্রিক হিটার ব্যবহার করা হয়। ছবিতে হিটারের যান্ত্রিক ব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে।

আফিমের কথা

শ্রীঅমরনাথ রায়

আফিমের সঙ্গে ভারতবাসীর পরিচয় আজকের নয়—অতি প্রাচীন কালের। তবে আফিমের প্রচলন ভারতবর্ষে ঠিক কবে থেকে যে আরম্ভ হয় তা সঠিক জানা যায় না। আফিমের আদি বাসভূমি হলো এশিয়া মাইনর। এশিয়া মাইনর থেকে আরবেরাই প্রথমে চীন দেশে ও পরে ভারতে আফিম নিয়ে আসে। সম্ভবতঃ মুসলমানদের রাজত্বকালেই ভারতে আফিমের আমদানী সুরু হয়। বর্তমানে ভারতের প্রায় সর্বত্রই আফিম পাওয়া যায়—আফিমের চাষও হয়।

উদ্ভিদবিজ্ঞানে আফিমকে Papaver somniferum নামে অভিহিত করা হয়। আফিমের সংস্কৃত নাম অহিফেন। হিন্দী ও বাংলায় একে আফিম বলা হয়।

ভারতে সাধারণতঃ সাদা, লাল ও গোলাপী ফুল সমন্বিত তিন জাতের আফিম গাছ জন্মাতে দেখা যায়। উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যভারত এবং পূর্ব পাঞ্জাবের জলন্ধর ও হোসিয়ারপুর অঞ্চলে আফিমের চাষ হয়। বোম্বাই শহরে ও আফগানিস্থানে আফিম এত বেশী তৈরী হয় যে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এই আফিম চালান দেওয়া হয়। বেলে মাটিতেই আফিম গাছ ভাল জন্মে। তবে জমিতে ভাল জলসেচের ব্যবস্থা থাকা দরকার। জমিতে ২০-২৫ বার লাঙ্গল দিয়ে জলসেচ করতে হয়, তবেই আফিম চাষের উপযুক্ত জমি তৈরী হয়। নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে তৈরী জমিতে বীজ বোনা হয়। ১০-১২ দিনের মধ্যেই বীজ থেকে অঙ্কুর বেরোয়। বীজ বোনবার পর তিন মাস পর্যন্ত জমিতে জলসেচ করা দরকার। মার্চ মাসের শেষের দিকে গাছে ফুল ফোটে এবং ফুল ফোটবার পর সাধারণতঃ একপক্ষ কালের মধ্যেই ফল ধরে। এপ্রিল ও মে মাসের মধ্যেই আফিমের ফসল ওঠে। আফিমের ফুলগুলি বেশ বড় বড় এবং ফলগুলি সাদা। এই ফল দেখতে এক একটি গোলাকার পাত্রের মত। এই গোলাকার ফলের মাথায় থাকে একটি ঢাক্‌না। ফল পাকলে ঢাক্‌নাটি আপনা থেকেই ফেটে যায় এবং ভিতরকার পাকা বীজগুলি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই পাকা বীজগুলিই হলো পোস্ত, যা আমরা খেয়ে থাকি।

আফিম সংগ্রহ করবার জন্যে আফিমের কাঁচা ফলের গা একটি চৌফলা ছুরি দিয়ে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত বরাবর আঁচড়ে দেওয়া হয়। তখন ক্ষতস্থান থেকে সাদা রস বা আঠা বেরিয়ে ফলের গায়ে জমতে থাকে। আঁচড়াবার পরের দিন লোহার ছোট বেল্‌চা (শিপা) দিয়ে ফলের গা থেকে ঐ জমাট রস চেঁচে সংগ্রহ করা হয়। ঐ জমাট রসই হলো কাঁচা আফিম। কাঁচা আফিম রোদে শুকিয়ে নেবার পর চাষীরা সরকারী আফিম ক্রয়-কেন্দ্রে গিয়ে বিক্রী করে আসে। সরকারী নিয়ম অনুসারে আফিম চাষ করতে হলে ভারত সরকারের লাইসেন্স বা লিখিত অনুমতি দরকার। তাছাড়া চাষীরা উৎপন্ন কাঁচা আফিমও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিক্রী করতে বাধ্য থাকে। রাজ্য সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনানুরূপ আফিম পেয়ে থাকেন।

চাষীদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট মূল্যে কাঁচা আফিম কিনে কেন্দ্রীয় সরকার তা গাজীপুর ও নীমুচের সরকারী আফিম তৈরীর কারখানায় পাঠিয়ে দেয়। সেখানে কাঁচা আফিম শোধন করে আফিম তৈরী

হয়। কারখানায় দু'রকমের আফিম তৈরী হয়। একরকম আফিম বিদেশে রপ্তানী করবার উপযুক্ত —আর এক রকম (যাকে চল্‌তি ভাষায় আবকারী বলা হয়) শুধু দেশের মধ্যে ভেষজ বা অনুরূপ প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্যে তৈরী করা হয়। কারখানায় ইটের আকারে আফিম তৈরী হয় এবং এক একটি আফিমের ইটের ওজন আধ সের থেকে দশ সের পর্যন্ত হয়ে থাকে।

কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৬ সালে গাজীপুরের কারখানার সঙ্গে আফিমজাত উপক্ষার তৈরীর একটি কারখানা খুলেছেন। সেখানে সেই সময় থেকেই আফিমজাত ভেষজ তৈরী হচ্ছে। আফিম-জাত ভেষজের মধ্যে মরফিন, কোডেইন ও নারকোটিনই প্রধান। তাছাড়া সেখানে থেবাইন, পাপাভেরিন, কোটারনিন প্রভৃতি ভেষজও তৈরী করা হয়। ভারতীয় আফিমে মরফিনের ভাগ খুব বেশী বলে বিদেশের বাজারে এই আফিমের চাহিদা খুব বেশী।

আফিম প্রধানতঃ নেশার জিনিষ। মাত্রা রেখে আফিম খেলে বা আফিমের ধূমপান করলে প্রথমে মধুর আমেজ অনুভূত হয়—তারপর ঘুম পায়। নেশা হিসাবে আফিমের প্রভাব বড় মারাত্মক। অন্যান্য নেশার মত একবার ব্যবহার আরম্ভ করলে মানুষ এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন আফিমের নেশাখোর মানুষের মানসিক ও নৈতিক অবনতি ঘটিয়ে তাকে চরম বিপর্যয়ের পথে ঠেলে দেয়। আফিম খেলে মানুষের অনেক যন্ত্রণার লাঘব হয়—ঘুম পায়, আর স্নায়ুগুলি ক্রমশঃ অবসন্ন হয়ে পড়ে। অপারেশনের পর অনেক সময় মরফিয়া ইন্‌জেকসন দেওয়া হয়। এই মরফিয়া তৈরী হয় মরফিন নামক আফিমের একটি উপক্ষার থেকে। মরফিনের মত আফিমে প্রায় চব্বিশটা উপক্ষার আছে। আফিমের ভেষজগুণ এই উপক্ষার-গুলির জন্যেই।

আফিমের কতকগুলি রোগ-নিবারক ক্ষমতা আছে এবং এথেকে কতকগুলি প্রয়োজনীয় ওষুধও তৈরী হয়। কিন্তু নেশা হিসাবে এর ফল মারাত্মক। বেশী আফিম খেলে স্নায়বিক শৈথিল্য আসে এবং সারা শরীর বিষাক্ত হয়ে গিয়ে হৃদ্‌যন্ত্রের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এজন্যেই ভারত সরকার আফিমের উৎপাদন ও বিলিব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য হয়েছেন। সরকার অফিমের উপর উচ্চ হারে শুল্ক ধার্য করেছেন এবং আফিম বিক্রীর জন্যেও মোটা টাকা লাইসেন্স ফি আদায় করে থাকেন। ফলে ক্রেতাদের খুব বেশী দাম দিয়ে আফিম কিনতে হয়। আফিমের দাম বেশী করবার প্রধান উদ্দেশ্য হলো, লোকে যাতে সহজে এই মারত্মক নেশার বশীভূত হতে না পারে।

যাহোক ভারত সরকার যদি এই ভয়াবহ নেশার মূলোৎপাটনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং কেবল-মাত্র ওষুধ ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে আফিম ব্যব-হারের ব্যবস্থা করেন তবে দেশ ও দশের যথেষ্ট উপকার হয়।

ঘুম

শ্রীসুজিতকুমার মাইতি

দিনের আলো নিবে এলো, পৃথিবীর মুখ ঢেকে দিল কালো ওড়নায়। দিনের কর্মব্যস্ততা রাতের নিস্তব্ধতায় শেষ হলো। মানুষ চাইলো বিশ্রাম, চাইলো ঘুম। অবসাদভরা শরীরে চোখের পাতায় নেমে এলো আবেশভরা ঘুম। মানুষ চায় আহার, চায় পরিধানের বস্ত্র। মানুষের চাওয়া-পাওয়া অসীম। কিন্তু টাকা দিয়ে যাকে পাওয়া যায় না, এমন জিনিষও মানুষ চায়। সেই চাওয়া মানুষের একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু কি সেই পরম চাওয়া? সেই চাওয়া হলো প্রকৃতির আশীর্বাদ—নিশ্চিন্ত, আবেশভরা ঘুম।

কিন্তু কেন সে ঘুমাবে? কতক্ষণ ঘুমাবে? ঘুমের সময় তার শরীরের কি পরিবর্তন হয়? তার এত প্রিয় ঘুম কখনো কখনো কেন নষ্ট হয়ে যায়? কেন সে ঘুমাতে পারে না? এই প্রশ্নগুলির কি সমাধান নেই? আছে। বিজ্ঞান তার সমাধান করেছে। যদিও আরো প্রয়োজন আছে গবেষণার, তবু যে সমাধানে বৈজ্ঞানিকেরা এসে পৌচেছেন তাও উপেক্ষণীয় নয়।

প্রশ্নগুলির আলোচনা করতে গেলে প্রথমে বলতে হয়, আমরা কেন ঘুমাই। আমাদের দৈহিক পরিশ্রম চালনা করে আমাদের Sympathetic Nervous System, আর আমাদের শক্তি সঞ্চয় করে রাখে এবং হিসেব করে খরচ করে Parasympathetic Nervous System। আমাদের চোখের পাতায় ঘুম এনে দেয় এই প্যারাসিম-প্যাথেটিক নার্ভাস সিষ্টেম। দৈহিক পরিশ্রমের ফলে আমাদের যে শক্তি নষ্ট হয়, সেই শক্তি পুনরুদ্ধার করবার জন্যে ঘুমের প্রয়োজন। অধ্যাপক হেস্ ও জুরিখ এই মতবাদে বিশ্বাসী।

বৈজ্ঞানিক ডিমোল বলেন, ঘুমের সময় মস্তিষ্ক রক্ত থেকে ক্যালসিয়াম গ্রহণ করে। তিনি বিড়ালের Infundibulum এ ক্যালসিয়াম ইন্‌জেকসন দিয়ে দেখেছেন যে, বিড়াল ঘুমিয়ে পড়ে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ডিক্সিট বিড়ালের Cerebral ventricles-এ অ্যাসিটাইল-কোলিন ইন্‌জেকসন দিয়ে দেখালেন, বিড়ালের ঘুম পায়। জনডেক এবং বিয়ার মনে করেন, পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে রক্তে ব্রোমিনজাত হার্মোন ক্ষরণের ফলেই ঘুমের সৃষ্টি হয়।

অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে, Hypothalamus-এ জাগরণ-কেন্দ্র এবং নিদ্রাকেন্দ্র দুই-ই থাকে। নিদ্রাকেন্দ্রের অত্যধিক কার্যক্ষমতায় জাগরণ-কেন্দ্রের কার্যকরী ক্ষমতা কমে যায় এবং তারই ফলে চোখের পাতায় নেমে আসে ঘুম। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্যাব্‌লভ বলেন, মস্তিষ্কের সমগ্র স্থানে ও তার নীচের অংশেও আভ্যন্তরিক নিবৃত্তি বা অবসাদের বিস্তৃতির একীভূত প্রকাশের নামই ঘুম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অনেকগুলি কারণের জন্যেই ঘুমের সৃষ্টি। কিন্তু এগুলির মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত ঘুমের কারণ, সেকথা আজ বলা সহজ নয়।

মানুষের জাগ্রত অবস্থার সঙ্গে নিদ্রিত অবস্থার পার্থক্য অনেক। ঘুমের সময় আমাদের শরীরের রক্তের চাপ এবং হৃদ্‌স্পন্দন কমে যায়। ঘুমানোর সময় হৃদ্‌স্পন্দন মিনিটে ১৪.৮ বার কমে যায়। অনেকে মনে করেন, হৃদ্‌স্পন্দনের এই হ্রাস পাওয়ার ফলে cerebral anæmia হয় এবং ঘুমের সৃষ্টি হয়। কিন্তু গিব্‌স্ এবং লেনক্স পরীক্ষার দ্বারা দেখালেন যে, ঘুমের সঙ্গে মস্তিষ্কের রক্তসঞ্চালনের কোন সম্পর্ক নেই।

ঘুমানোর সময় শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজও কম হয়। স্বেদ-গ্রন্থি, অশ্রু-গ্রন্থি ও লালা-গ্রন্থির ক্ষরণ কম হয়। মাংসপেশী শিথিল হয়ে যায়। মাংস পেশীর এই শিথিলতার জন্যে ঘুমের সময় আমাদের শরীর দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পায়। ঘুমের সময় ঊর্ধ্বচাপের হ্রাস পাওয়ার জন্যেও শরীর দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পায়। অনেকের মতে, দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি আধ ইঞ্চি থেকে এক ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই বৃদ্ধি অবশ্য জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে আর থাকে না। ঘুমানোর সময় আমাদের শরীরের উত্তাপও কমে যায়। এজন্যে ঘুমানোর সময় ঠাণ্ডা লাগে এবং শরীরে আচ্ছাদনের প্রয়োজন হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কতক্ষণ ঘুমাবো বা কতক্ষণ ঘুমানো উচিত। বয়সের তারতম্যে ঘুমের মাত্রারও তারতম্য হয়। শিশুদের ঘুমের সময় বয়স্কদের ঘুমের সময় অপেক্ষা অনেক বেশী। সদ্যো-জাত শিশুর ১৮ থেকে ২২ ঘণ্টা ঘুমানো প্রয়োজন। ১ বছর থেকে ৩ বছরের শিশুর ১৫ থেকে ১৮ ঘণ্টা, ৪ বছর থেকে ৯ বছর পর্যন্ত ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা, ৯ বছর থেকে ২০ বছর পর্যন্ত ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা ঘুমানো প্রয়োজন। সুস্থ, সবল স্বাভাবিক মানুষের ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা ঘুমই যথেষ্ট। কিন্তু অসুস্থ শরীরে ঘুমের প্রয়োজন সুস্থ শরীর অপেক্ষা অনেক বেশী। বৃদ্ধ বয়সে ঘুমের পরিমাণ কমে যায়, কিন্তু ৫ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুমের প্রয়োজন।

যদিও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ঘুমের পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে, তবু অনেকেই অভ্যাসের ফলে ঘুমের পরিমাণ কমিয়ে আনতে পারে বা ইচ্ছামত ঘুমাতে পারে। নেপোলিয়ন প্রতিদিন ২ ঘণ্টা থেকে ৪ ঘণ্টা ঘুমাতেন। মহাত্মা গান্ধীও ইচ্ছামত ঘুমাতেন। মহাযুদ্ধের সময় সৈন্যগণ পথ চলবার সময় ঘুমাতো।

মানুষের ঘুম চাই; কিন্তু অনেকের চোখের পাতায় ঘুম আসে না কেন? ঘুমের অভাবে তাদের শরীর ও মন দুই-ই অসুস্থ হয়ে পড়ে। নিদ্রাহীনতার কারণ অনেক। আলো, গোলমাল, ব্যাথা, বদহজম উদ্বিগ্নতা, ভয় প্রভৃতির জন্যে আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত হয় প্রচুর। আলো যে আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত করে, তার পরিচয় পাই আমরা দিবা-নিদ্রায়। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখাও ঘুমের ব্যাঘাত করে। যাদের গাঢ় ঘুম তারা কখনো স্বপ্ন দেখে না; কিন্তু পাত্‌লা ঘুম যাদের, তাদের অবচেতন মনের সুপ্ত চিন্তাধারা ঘুমের সময় মনে পড়ে এবং ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। দুঃস্বপ্ন মানুষের ঘুমের কতখানি ব্যাঘাত করে, সে কথা বোধ হয় আর নতুন করে বলবার প্রয়োজন নেই।

মড়ার মতন পড়ে ঘুমায়—একথা অনেককেই বলতে শুনেছি। কিন্তু একথা কি সত্য? না। ঘুমের সময় মড়ার মতন পড়ে থাকা অসম্ভব। সুস্থ, সবল মানুষ ৮ ঘণ্টা ঘুমানোর মধ্যে ২০ থেকে ৪০ বার তার ভঙ্গিমা পরিবর্তন করে।

অনেকেই রাত করে ঘুমায়। কিন্তু শরীরের পক্ষে বেশী রাত করে ঘুমানো খারাপ। Early to bed and early to rise, make the man healthy, wealthy and wise.—এই প্রচলিত কথার অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সবাইকেই স্বীকার করতে হবে। তাকে মেনে চলাই সুস্থ, সবল শরীর গঠন করবার প্রকৃষ্ট উপায়।

আইনষ্টাইন ও আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সাধারণ সূত্র

শ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায়

১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয় আপেক্ষিকতা তত্ত্বের বিশেষ সূত্র, ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয় আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সাধারণ সূত্র। দু'য়ের মধ্যে দশ বছরের ব্যবধান। কিন্তু একজন বৈজ্ঞানিকের দশ বছরের অক্লান্ত তথ্যানুসন্ধান দু'শো বছরের চিন্তাজগতে বিপ্লব আনলো।

আপেক্ষিকতা তত্ত্বের বিশেষ সূত্রে আইনষ্টাইন দেখিয়েছিলেন, পরিবর্তনহীন গতিতে ধাবমান কাঠামোর পরম বা নিরপেক্ষ গতি বলে কিছু নেই, এর যা কিছু নির্দেশ করা যায় তা হচ্ছে অপর কোন পরিবর্তনহীন গতিতে ধাবমান কাঠামোর তুলনায় আপেক্ষিক গতি। কোন ট্রেন যদি ঝাঁকুনি না দিয়ে একটা নির্দিষ্ট গতিবেগে সরল রেখায় চলতে থাকে তাহলে তার ভিতরের যাত্রীরা বাইরের দিকে না তাকিয়ে কোন গাড়ীর ভিতরে সম্পাদিত কোন পরীক্ষার দ্বারাই প্রমাণ করতে পারে না যে, তাদের গাড়ী চলছে। গাড়ীটা যদি হঠাৎ বাঁক ফিরতে সুরু করে তাহলে যাত্রীদের শরীর একদিকে হেলে পড়ে। এর ফলেই তারা বুঝতে পারে যে, তাদের গাড়ী চলছে এবং বাঁক ফিরছে। এখন মনে করা যাক, আমাদের পৃথিবীটা একটা বিরাট রেলগাড়ী এবং আমরা তার যাত্রী। পৃথিবী যে ছুটছে তা আমরা টের পাই অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের দিকে চেয়ে। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, পৃথিবী স্থির আছে এবং অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রগুলিই ছুটছে! সে ক্ষেত্রেও আমরা এখন যা দেখছি ঠিক তাই দেখবো। বস্তুতঃ কেবল মাত্র আমাদের পৃথিবী ছাড়া বিশ্বজগৎ থেকে সব বস্তুই যদি অপসারিত করা হতো তাহলে আমরা কি বলতে পারতাম যে, আমাদের পৃথিবী চলছে, না স্থির আছে? কাজেকাজেই কোন কিছুর সঙ্গে তুলনা না করে কোন বস্তুর নিরপেক্ষ গতি খুঁজতে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না।

এখন ট্রেনটার মত পৃথিবী যদি হঠাৎ চক্রাকারে ঘুরতে সুরু করে তাহলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো, আমাদের পৃথিবী চলছে। অতএব দেখা যাচ্ছে, পরিবর্তনহীন বা সমবেগে ধাবমান কাঠামোর নিরপেক্ষ গতি বলে কিছু নেই বটে, কিন্তু নিয়ত পরিবর্তনশীল বা ত্বরান্বিত কাঠামোর ঐ জাতীয় কিছু একটা থাকা সম্ভব। আরো একটা সম্ভাবনার কথা মনে জাগে। সেটা এই যে, মহাশূন্যকে হয়তো এমন এক কাঠামো হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে যার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের সব কিছু বস্তুর নিরপেক্ষ অবস্থান বা গতিবেগ নির্ণয় করা সম্ভব।

আইনষ্টাইন ভেবেছিলেন যে, নিরপেক্ষ গতি বলে কিছু নেই এবং সব গতিই আপেক্ষিক; কিন্তু তাঁর কাছে এই ত্বরান্বিত গতি থেকে উদ্ভূত সমস্যা মহা অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়ালো। আপেক্ষিকতা তত্ত্বের বিশেষ সূত্রে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, পরিবর্তনহীন গতিতে ধাবমান সব কাঠামোতেই সব প্রাকৃতিক নিয়ম সমভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ আপনি ও আমি দুজনে যদি দুটা ভিন্ন কাঠামোয় ভ্রমণ করি (অবশ্য কাঠমো দুটা পরিবর্তনহীন গতিতে ধাবমান হওয়া চাই) তাহলে কোন পরীক্ষা করে আপনি যা ফল পাবেন আমিও ঠিক সেই ফলই পাব। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, আপনি আলোর যা গতিবেগ নির্ণয় করবেন, আমিও ঠিক সেই গতিবেগই নির্ণয় করবো। এবার আইনষ্টাইন আর একটু এগিয়ে গিয়ে

বললেন, কাঠামোগুলির গতিবেগ যদি নিয়ত পরিবর্তনশীল হয় তাহলেও প্রত্যেকটি কাঠামোতে সব প্রাকৃতিক নিয়ম সমভাবে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ আপনার এবং আমার কাঠামো যদি নিয়ত পরিবর্তনশীল গতিসম্পন্ন (ত্বরান্বিত) হয় তাহলেও আপনার এবং আমার নির্ণীত আলোর গতিবেগের পার্থক্য ঘটবে না। এক কথায় এই-ই হলো আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সাধারণ সূত্র।

আইষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র বলবিদ্যা (Mechanics) নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছিল নিউটনের তিনটি নিয়মের দ্বারা। নিউটনের তিনটি নিয়ম হলো—

(১) প্রত্যেক বস্তুই তার স্থিতি অথবা সরলরেখাকার পথে নির্দিষ্ট গতি বজায় রেখে চলে, যতক্ষণ পর্যন্ত বাইরের কোন বল তার উপর কাজ করে ঐ অবস্থার পরিবর্তন না ঘটায়।

(২) কোন বস্তুর উপর বাইরের কোন বল কাজ করলে ঐ বস্তু ত্বরান্বিত হয়। বস্তুর ভর, বল ও ত্বরণের মধ্যে সম্পর্ক এইভাবে দেখানো যেতে পারে—$P = mf$.

p-বল, m-ভর, f-ত্বরণ (acceleration).

(৩) প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।

প্রথম নিয়মকে বলা হয় জাড্যতার নিয়ম (Law of Inertia)। এই নিয়ম অনুসারে কোন একটি বলকে লাথি মারলে সে বল ছুটতেই থাকবে কোন কালে আর থামবে না। তবু আমরা দেখি, খানিকবাদেই বলটি থেমে যায়। কেন? এর কারণ প্রথম নিয়মের সঙ্গে যে সর্ত আরোপিত আছে, সে সর্ত পালিত হচ্ছে না। সে সর্ত হলো, বাইরের কোন বল ওই বলের উপর কাজ করবে না। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় বটে বলের উপর বাইরের কোন বল কাজ করছে না, কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে, বাইরের একাধিক বল ঐ বলের উপর কাজ করছে এবং তারা হলো বাতাসের ধাক্কা, ঘাসের ঘর্ষণ ইত্যাদি। এরা বলের গতি আস্তে আস্তে কমিয়ে আনে এবং শেষে বলটি একেবারেই থেমে যায়। প্রথম নিয়মের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো, চলন্ত ট্রেন থেকে নাববার পরিণতি। সবাই জানেন, চলন্ত ট্রেন থেকে আনাড়ীর মত নাবতে গেলে কি ঘটে। কিন্তু কেন ঘটে? নিউটনের প্রথম নিয়মে আছে, প্রত্যেক বস্তুই তার স্থিতি বা সরল রেখার মত পথে নির্দিষ্ট গতি বজায় রাখতে চায়। লোকটি যেই মাটিতে পা দিল অমনি তার পা মাটির সংস্পর্শে এসে গতিরুদ্ধ হয়ে গেল, কিন্তু তার দেহের ঊর্ধ্বাংশ নিউটনের প্রথম নিয়ম অনুসারে গাড়ীর বেগে সামনের দিকে ছুটতে চায়। এখন লোকটি পা-দুটাকেও যদি ওই গতিবেগ না দেয় তাহলে বাধ্য হয়েই তাকে ধরিত্রী চুম্বন করতে হবে।

দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে যে বস্তুর ভর বেশী তাকে একটি নির্দিষ্ট ত্বরণ দিতে বলও বেশী লাগবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, মালগাড়ীর ইঞ্জিনে প্যাসেঞ্জার গাড়ীর ইঞ্জিনের চাইতে বেশী কয়লা পোড়ে; তার কারণ মালগাড়ীকে প্যাসেঞ্জর গাড়ীর চাইতে বেশী মাল বহন করতে হয়।

তৃতীয় নিয়ম অনুসারে আপনি যদি দেয়ালকে ঠেলেন তবে দেয়ালও আপনাকে ঠেলবে, আপনি যত জোরে দেয়ালকে ঠেলবেন, দেয়ালও ঠিক তত জোরে আপনাকে ঠেলবে।

প্রাকৃতিক একটি মাত্র ঘটনার ক্ষেত্রে নিউটনের দ্বিতীয় নিয়মের আপাত ব্যতিক্রম দেখা যায়—সেটি হচ্ছে কোন বস্তুর ভূপৃষ্ঠে পতন। বস্তু যখন মাটিতে পড়ে তখন তার ভরের সঙ্গে ত্বরণের কোন সম্পর্ক থাকে না। গ্যালিলিওই (১৫৬৪—১৬৪২) সর্বপ্রথম এই বিষয়ের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর আগে পর্যন্ত ধারণা ছিল, একটি পাঁচসেরী বাটখারা আর একটি পয়সাকে

যদি এক সঙ্গে একই জায়গা থেকে ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে পাঁচসেরী বাটখারাটি আগে পড়বে, পয়সাটি পরে পড়বে। বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টটল (৩৮৪—৩৩২ খৃঃ পূঃ) এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। গ্যালিলিও বললেন—না, ছুটা একই সঙ্গে পড়বে, অবশ্য যদি বাতাসের প্রতিরোধ এড়ানো যায়। তিনি তাঁর মতবাদের সত্যতা প্রমাণ করবার জন্যে পিসার হেলানো টাওয়ার থেকে ছুটা সম-আকৃতির অসমভারের জিনিষ এক সঙ্গে ছেড়ে দিলেন। দেখা গেল, ছুটা একই সঙ্গে মাটিতে পড়লো। লোকে দেখলো তবু তারা বিশ্বাস করলো না, তাদের ধারণা এমনই বদ্ধমূল ছিল। তারা ভাবলো, গ্যালিলিও নিশ্চয়ই কোন যাদু জানেন। তাদের জন্যে গ্যালিলিওকে উত্তরকালে পিসা ত্যাগ করতে হয়।

এই অদ্ভুত ব্যাপার ব্যাখ্যা করবার জন্যে নিউটন এক নতুন নিয়মের সূত্র বের করলেন, যাকে বলা হয় মহাকর্ষের নিয়ম। এই নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক বস্তুই প্রত্যেক বস্তুকে আকর্ষণ করে এমন এক বলের দ্বারা যা বস্তুদ্বয়ের ভরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আকৃষ্ট বস্তুর ভর যত বেশী হবে তার উপর আকর্ষণও হবে তত বেশী—এমন ভাবে যাতে আকর্ষণকে আকৃষ্ট বস্তুর ভর দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল সব সময়েই এক রকম হবে। নিউটনের দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে—

$$\frac{\text{আকর্ষণ (এক প্রকারের বল)}}{\text{আকৃষ্ট বস্তুর ভর}} = \text{আকৃষ্ট বস্তুর ত্বরণ।}$$

অতএব আকৃষ্ট বস্তুর ত্বরণ সব সময়েই এক থাকে এবং তা বস্তুর ভরের উপর নির্ভরশীল নয়। পৃথিবী যে ত্বরণে প্রত্যেক বস্তুকে ত্বরান্বিত করে তা হচ্ছে সেকেণ্ডে ৩২ ফুট। অর্থাৎ কোন বস্তুকে (তা যে কোন ভরেরই হোক না কেন) বেশ খানিকটা উঁচু থেকে ছেড়ে দিলে প্রথম সেকেণ্ড পার হলে তার গতিবেগ দাঁড়াবে সেকেণ্ডে ৩২ ফুট, দ্বিতীয় সেকেণ্ড পার হলে সেকেণ্ডে ৬৪ ফুট, তৃতীয় সেকেণ্ড পার হলে সেকেণ্ডে ৯৬ ফুট—এই রকম।

এখন মনে রাখতে হবে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যে ভরের উল্লেখ করা হলো তা হচ্ছে মহাকর্ষীয় ভর। নিউটনের মহাকর্ষের নিয়ম থেকে এর সৃষ্টি, এর সঙ্গে জাড্য ভর বা নিউটনের দ্বিতীয় নিয়ম থেকে উদ্ভূত ভরের কোন সম্পর্ক নেই। জাড্য ভর হচ্ছে, বস্তুর গতিবেগকে ব্যাহত করবার ক্ষমতা এবং এটি একমাত্র ত্বরান্বিত কাঠামোরই বৈশিষ্ট্য। আইনষ্টাইন কতকগুলি বিচিত্র কল্পিত ঘটনার সন্নিবেশ করে দেখলেন যে, ত্বরান্বিত কাঠামো এবং মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের মধ্যে বাস্তবপক্ষে কোন পার্থক্য নেই। এথেকে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, মহাকর্ষীয় ভর এবং জাড্য ভর সমান।

আইনষ্টাইন বললেন—ধরা যাক, একটা লিফ্‌ট্‌ খুব উঁচু বাড়ীর উপর তলা থেকে নেমে আসবার সময় হঠাৎ ছিঁড়ে গেছে। ভিতরের আরোহীরা তাদের পরিণাম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এরকম অবস্থায় একজন আরোহী যদি হাত থেকে একটা বল ছেড়ে দেয় তবে সে কি দেখবে? সে দেখবে, বলটা শূন্যে আটকে রয়েছে। তার কারণ—সে, বল এবং লিফ্‌ট্‌ সবাই একই গতিতে নীচে নামছে। সে যদি শূন্যে লাফ দেয় তবে শূন্যেই আটকে থাকবে, লিফ্‌টের মেঝে আর পাবে না, যতক্ষণ না দুর্ঘটনা ঘটছে। হাতের বলটাকে সে যদি সোজা দেয়ালের দিকে ছুড়ে দেয় বলটা সোজা গিয়ে দেয়ালে ধাক্কা দেবে, যেন নিউটনের প্রথম নিয়ম মেনে চলছে। এই সব থেকে সে ধারণা করবে, সে এমন এক জায়গায় পৌঁছে গেছে যেখানে পৃথিবীর মহাকর্ষ কাজ করছে না।

অপর পক্ষে ধরা যাক, লিফটাকে সত্যি সত্যিই এমন এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে যেখানে মহাকর্ষ কাজ করছে না। সেখানে যদি লিফ্‌ট্‌টাকে সেকেণ্ডে ৩২ ফুট ত্বরণে উপর দিকে ওঠানো যায় তাহলে কিন্তু পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে। লিফ্‌টের আরোহী যদি হাত থেকে একটা বল ছেড়ে দেয় তবে সেটা সোজা গিয়ে মেঝেয়

পড়বে। সে যদি শূন্যে লাফ দেয় তাহলে আবার মেঝেয় ফিরে আসবে। হাতের বলটাকে সে যদি দেয়ালের দিকে ছুড়ে মারে তবে বলটা বেঁকে গিয়ে দেয়ালে লাগবে, যেমন দেয়ালের দিকে হোস পাইপের জল ছাড়লে হয়। এই সব দেখে সে ধারণা করবে, সে বুঝি ভূপৃষ্ঠেই অবস্থান করছে এবং মহাকর্ষ তার উপরে কাজ করছে। অথচ আসলে সে আছে এক ত্বরান্বিত কাঠামোয়। প্রথম পক্ষে সে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে থেকেও ভেবেছিল, বুঝি ত্বরান্বিত কাঠামোয় অবস্থান করছে। এই মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এবং ত্বরান্বিত কাঠামোর সমতুল্যতার নাম আইনষ্টাইন দিলেন সমতুল্যতার নিয়ম (Principle of Equivalence)। অবশ্য এই সমতুল্যতা তখনই সম্পূর্ণ হবে যখন মহাকর্ষীয় ভর এবং জাড্য ভর সমান হবে। আপেক্ষিকতা তত্ত্বের বিশেষ সূত্রে যেমন ভিত্তি হয়েছিল আলোকের গতিবেগের অপরিবর্তনীয়তা, তেমনি আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সাধারণ সূত্রের ভিত্তি হলো জাড্য এবং মহাকর্ষীয় ভরের সমতা।

ত্বরান্বিত গতি থেকে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল এতক্ষণে তা দূরীভূত হলো। উপরে আমরা দেখলাম, ত্বরান্বিত কাঠামোয় চলমান বস্তুকে আমরা মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে চলমান বস্তু বলে ধরে নিতে পারি। ত্বরান্বিত কাঠামোয় বস্তুর গতি বা দিক পরিবর্তনকে আমরা মহাকর্ষের হ্রাস বা বৃদ্ধি বলে কল্পনা করতে পারি। কাজেকাজেই ত্বরান্বিত কাঠামোর নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য, এককত্ব বা নিরপেক্ষতা রইলো না। অতএব আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ঠিকই রইলো যে, গতি—তা সে পরিবর্তনহীনই হোক আর ত্বরান্বিতই হোক একমাত্র নির্দিষ্ট কাঠামোয় বিচার করা সম্ভব। পরম বা নিরপেক্ষ গতি বলে কিছু নেই।

কিন্তু এতক্ষণ যে মহাকর্ষের কথা আমরা বললাম, সেই মহাকর্ষটা কি? নিউটনের ধারণা অনুযায়ী একে যদি কেবল একটা টানাটানির ব্যাপার বলেই গণ্য করা হয় তাহলে ধরে নিতে হয়, দুটা বস্তুর মধ্যে এই আকর্ষণ ক্রিয়াটা কোন সময় না নিয়েই সঞ্চারিত হয় অথচ তা কেমন করে সম্ভব? কেন না, আপেক্ষিকতা তত্ত্বের বিশেষ সূত্র থেকে আমরা জানি যে, কোন বাস্তব ক্রিয়াই আলোর গতিবেগের চাইতে বেশী গতিবেগে ধাবিত হতে পারে না। তা যদি হয় তাহলে এই আকর্ষণ ক্রিয়াটা এক বস্তু থেকে আর এক বস্তুতে সঞ্চারিত হতে খুব কম হলেও একটা একটা নির্দিষ্ট সময় নেয়। সে রকম ক্ষেত্রে কোন্ নিয়ম অনুসারে এই আকর্ষণ ক্রিয়া সঞ্চারিত হয়?

আইনষ্টাইন মহাকর্ষ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী ধারণাকে পাল্টে দিয়ে বললেন, ওটা একটা আকর্ষণই নয়। তাঁর মতে, আমরা যাকে মহাকর্ষ বলি সেটি হচ্ছে দেশের ধর্ম। প্রত্যেক বস্তুরই চলার পথ নির্ধারিত হয় দেশ-কাল নিরন্তরতার (Space-time Continuum) বক্রতা অনুযায়ী এবং দেশ-কাল নিরন্তরতার বক্রতা নিরূপিত হয় বস্তুনিচয়ের সংস্থান এবং তাদের বেগের দ্বারা। চুম্বক যেমন তার চারদিকে একটা চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে এবং ইতস্ততঃ ছড়ানো লোহাচুরকে একটা বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় সজ্জিত করে তেমনি দেশের ধর্মই হলো তার চারপাশে একটা মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র সৃষ্টি করা যা নিয়ন্ত্রণ করবে বস্তুর গতিপথকে। গাছ থেকে আম মাটিতে পড়ে, তার কারণ কোন আকর্ষণ নয়, পৃথিবীর উপস্থিতিতে দেশের যে বক্রতা ঘটে তার ফলেই আম উপরে না উঠে নীচে নেমে আসে। গ্রহগুলি যে উপবৃত্তাকার পথে সূর্যের চারধারে নিরন্তর ঘুরে চলেছে তার কারণও এই। দু'শো বছরের চিন্তাধারাকে নতুন পথে চালিত করলেন আইনষ্টাইন।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে বস্তুর চলার পথ কেন বক্র হয়ে যায়? জাড্যতার নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক বস্তুরই সরল রেখায় চলা উচিত। কিন্তু সরল রেখা বস্তুটা কি? এর কি সত্যই কোন অস্তিত্ব আছে?

ইউক্লিড সরল রেখার সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে— দুটি বিন্দুকে সংযোগকারী ক্ষুদ্রতম রেখাই হলো সরল রেখা। খাতার পাতায় দুটি বিন্দুকে সংযোগকারী ক্ষুদ্রতম রেখাই যে সরল রেখা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই খাতার কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান, কিন্তু ভূপৃষ্ঠে আঁকা কোন এক অতিকায় ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের চাইতে বেশী (১নং চিত্র)। কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে, ইউ-ক্লিডের জ্যামিতি দিয়ে বিশ্ব-নিরীক্ষা অসম্ভব।

১নং চিত্র
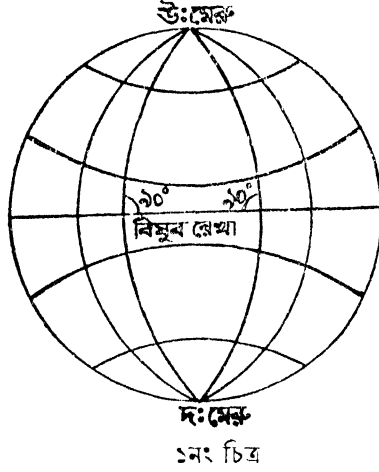
পাতাখানা যদি মাটির ওপর বিছিয়ে ক্রমাগত বড় করা যায় তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা আর তত সরল থাকবে না। ধরা যাক, বিন্দু দুটার একটা উত্তর মেরুতে আছে, আর একটা দক্ষিণ মেরুতে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে বস্তু যে বাঁকা পথ অনুসরণ করে তার কারণ এই ইউক্লিডের জ্যামিতির অসম্পূর্ণতা; দুটি বিন্দুর মধ্যে ক্ষুদ্রতম দূরত্ব তখন আর সরল রেখা থাকে না, হয় বক্ররেখা।
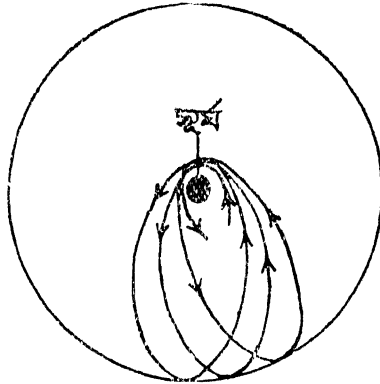
সূর্যের চারদিকে বুধের কক্ষপথের আবর্তন
২নং চিত্র

আছে। সেক্ষেত্রে বিন্দু দুটাকে সংযোগকারী ক্ষুদ্রতম রেখা আর সরল রেখা নয়; বক্র রেখা— পৃথিবীর মেরু-পরিধির অর্ধাংশ। (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। ইউক্লিডের জ্যামিতি অনুসারে ত্রিভুজের তিন

আইনষ্টাইন দেখালেন, যেখানে মহাকর্ষ তেমন শক্তিশালী নয় সেখানে তাঁর তত্ত্ব এবং নিউটনের তত্ত্ব একই ফল দেবে। কিন্তু যেখানে মহাকর্ষ খুব শক্তিশালী, যেমন—সূর্য অথবা অন্য কোন নক্ষত্রের

সান্নিধ্য, সেখানে তাঁর তত্ত্ব নিউটনের তত্ত্ব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ফল দেবে। এথেকে তিনি বহু দিনের একটা জটিল সমস্যার সমাধান করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য করে আসছিলেন যে, বুধের কক্ষপথ সূর্যের চারদিকে ধীরে আবর্তিত হচ্ছে (২নং চিত্র)। যে :ত আবর্তিত হচ্ছে তাতে সূর্যকে একবার ক্ষণ করতে সময় নেবে প্রায় ত্রিশ লক্ষ । বাইরের যে যে প্রভাবে এই বিচ্যুতি ন্তব তার সব কিছু ধরেও নিউটনের তত্ত্ব গ করে তাঁরা এর কোন কারণ নির্দেশ ত পারেন নি। আইনষ্টাইন বললেন, এক্ষেত্রে

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের আর এক সাফল্য দেখা গেল, আলোক-রশ্মির বক্রতা সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীতে। আমরা জানি, আলো এক প্রকারের শক্তি এবং আপেক্ষিকতা তত্ত্বের বিশেষ সূত্র অনুযায়ী শক্তিরও ভর আছে $\left(m=\frac{E}{C^2}\right)$। অতএব সূর্যের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের সান্নিধ্য দিয়ে আসবার সময় একেবারে সন্নিহিত নক্ষত্রদের আলোকরশ্মি বেঁকে যাবে, যার ফলে তাদের আমরা স্বাভাবিক অবস্থান থেকে খানিকটা বিচ্যুত অবস্থানে দেখতে পাব। (৩নং চিত্র)। আইনষ্টাইন অঙ্ক কষে দেখালেন—যে সব নক্ষত্রের আলো
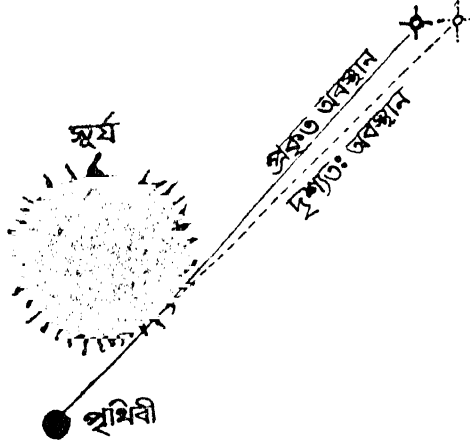
৩নং চিত্র

তাঁর তত্ত্ব কার্যকরী হবে, তার কারণ, বুধ সূর্যের নিকটতম প্রতিবেশী এবং বুধের উপর সূর্যের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের প্রভাব খুব বেশী। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করবার সময় বুধ যখন সূর্যের সব চাইতে কাছে এসে পড়ে তখন সূর্যের প্রবল মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এবং বুধের প্রচণ্ড গতিবেগের জন্যে বুধের গতিপথ সামান্য বেঁকে যায়, যার ফলে বুধ আর দ্বিতীয় বার তার পুরনো কক্ষপথে আবর্তিত হয় না। আইনষ্টাইন অঙ্ক কষে দেখালেন, সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে বুধের সময় লাগবে প্রায় ত্রিশ লক্ষ বছর, যা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের গণনার সঙ্গে মিলে গেল।

সূর্যের ঠিক পিঠ ছুঁয়ে আসবে তাদের বিচ্যুতি দাঁড়াবে ১·৭৫ সেকেণ্ডে কৌণিক পরিমাণ। এই ভবিষ্যদ্বাণী যাচাই করে দেখবার জন্যে সারা দুনিয়ায় বিপুল আগ্রহের সঞ্চার হলো। ১৯১৮ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ থেমে যেতেই এ সম্পর্কে একটা কমিটি গঠিত হলো। ঠিক হলো, ১৯১৯ সালে ২৯শে মে সূর্যের যে পূর্ণগ্রহণ হবে সেই দিনই ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা যাচাই হবে। পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দরকার তার কারণ, পূর্ণগ্রহণ ছাড়া দিনের বেলায় নক্ষত্র দেখা যাবে না। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিন্সেপ দ্বীপ থেকে এই সূর্যগ্রহণ দেখবার

বিশেষ সুবিধা তাই একদল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, লোকজন নিয়ে চলে গেলেন সেই দ্বীপে। আর এক দল রয়ে গেলেন লণ্ডনে। লণ্ডনে যে আলো আসছে তা আসছে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের অনেক দূর দিয়ে, কাজেকাজেই লণ্ডনে যে ফটো তোলা হবে তা নক্ষত্রের আসল অবস্থানই নির্দেশ করবে। এখন লণ্ডনে তোলা ছবির সঙ্গে প্রিন্সেস দ্বীপে তোলা ছবি মিলিয়ে দেখলেই বিচ্যুতি ধরা পড়বে। বহু প্রতীক্ষিত ২৯শে মে এসে পড়লো। দু-জায়গাতেই একাধিক ফটো তোলা হলো। সব চাইতে ভাল ফটো দুটো মিলিয়ে দেখা গেল, বিচ্যুতির পরিমাণ ১'৬৪ সেকেণ্ড কৌণিক পরিমাণ; যন্ত্রে এর চাইতে বেশী সূক্ষ্মতা আশা করা যায় না। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণিত হলো।

বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক আইনষ্টাইন। তাঁর আপেক্ষিকতা তত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার পর বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এখন আবার নানা নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে—বিশ্বজগৎ সসীম না অসীম? যদি সসীম হয় তাহলে কি স্ফীতিশীল, যা নীহারিকা-মণ্ডলীর ক্রমাগত দূরে সরে যাওয়া থেকে অনুমিত হয়? এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর আজও পাওয়া যায় নি।

দেখে মনে হয় যেন ভূগর্ভের বিরাট সুড়ঙ্গ। কিন্তু সুড়ঙ্গ নয়, নবনির্মিত ব্রিটেনিয়া নামে বিরাট এরোপ্লেনের অভ্যন্তর ভাগের দৃশ্য। এর দৈর্ঘ্য ১২৪ ফুট ৩ ইঞ্চি। এতে ৪টি করে টার্বো-প্রোপ ইঞ্জিন আছে। ১১০ যাত্রী সহ ঘণ্টায় এর গতি হবে ৪০০ মাইল।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ
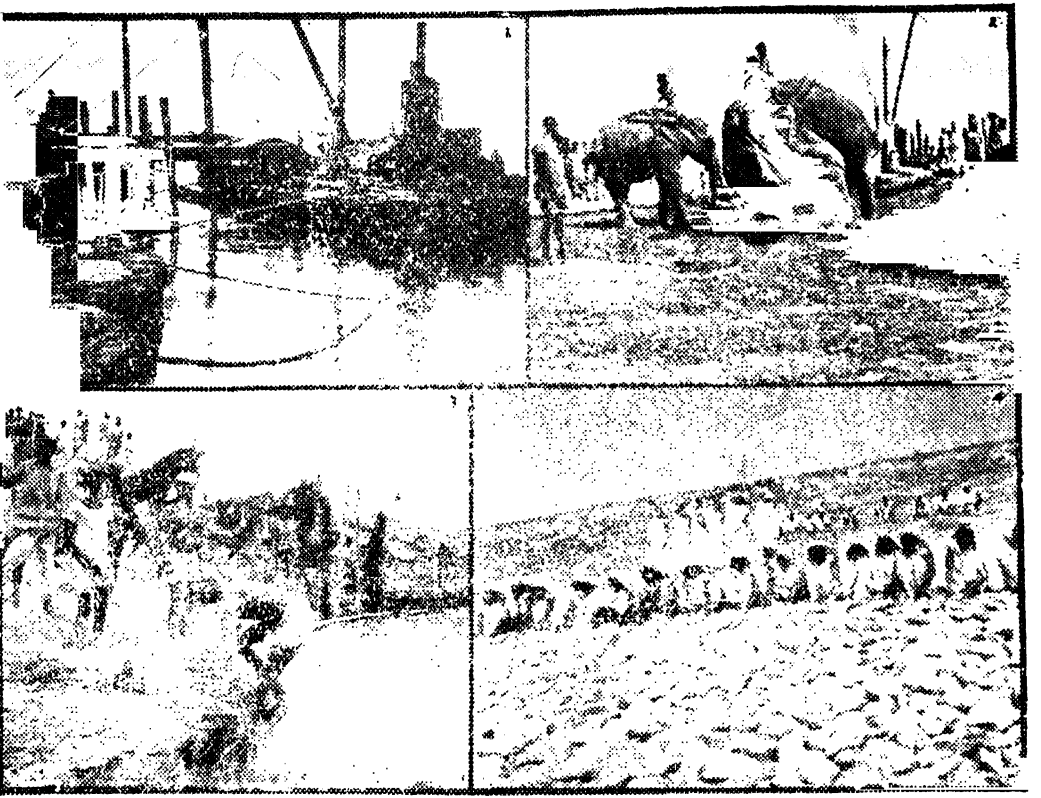
বছরের পর বছর হিমালয়ের তুষার-গলা জল আর বৃষ্টির জল নেমে এসে উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের নদ-নদীর দুকূল ছাপিয়ে মাইলের পর মাইল ভাসিয়ে দেয়। মানুষের গড়া ঘরবাড়ী ধ্বসে পড়ে, ফসল ভেসে যায়, অনেক ধনপ্রাণ বিনষ্ট হয়। একমাত্র ১৯৫৫ সালেই দেশের বিভিন্ন অংশে বন্যার ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার পরিমাণ হবে ১০৭ কোটি টাকা। বারংবার এই বিপুল ক্ষতির হাত থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

ইতিমধ্যে কয়েকটি রাজ্যে কাজও বেশ অগ্রসর হয়েছে। বিমান থেকে বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের আলোক-চিত্র গ্রহণের ব্যবস্থা হয়েছে। কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ কমিশনের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগে বন্যা সম্পর্কে গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাগুলির দ্রুত রূপায়ণে সুবিধা হয়েছে। দেশকে বন্যার কবল থেকে বাঁচাবার জন্য এই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অনুযায়ী যে সব কাজ হচ্ছে তার মধ্যে বাঁধ ও জলাধার নির্মাণ ও বন্যার জল দ্রুত বের করে দেওয়ার জন্য খাল কাটা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অবিলম্বে স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাগুলি সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে রচিত বহুমুখী পরিকল্পনা সমূহেরই অংশ। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণে মোট ১১৭ কোটি টাকা ব্যয় হবে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে—

১নং—বন্যা রোধের জন্য নদীর পাড় ঘেঁসে কাঠের গুঁড়ি বসানো হচ্ছে।

২নং—আসামে কাঠের গুঁড়ি বহনে হাতী লাগানো হয়.

৩নং—কর্মীরা বাঁশ ও খড় দিয়ে বাঁধ তৈরী করে কোশীর বন্যা প্রতিরোধ করছে।

৪নং—দিল্লীর কাছে মেয়ে শ্রমিকেরাও বন্যা প্রতিরোধের জন্যে কাজ করছে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মে—১৯৫৭

দশম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা
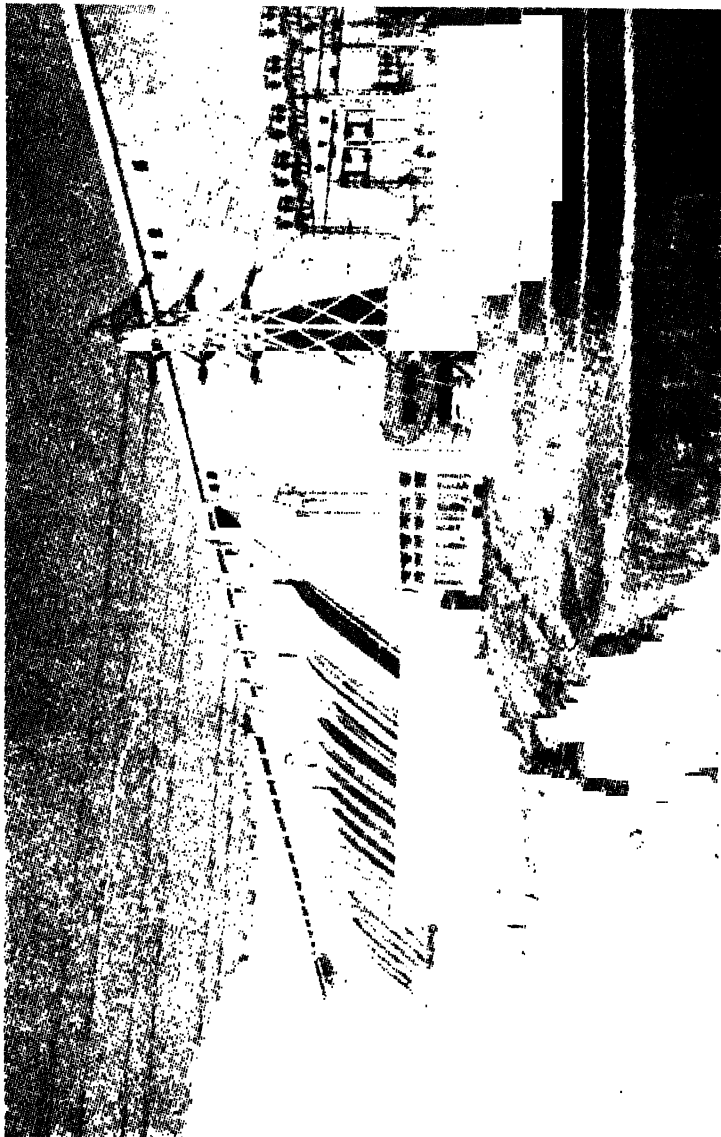
মশানজোড়ের ক্যানাডা বাঁধ এবং তৎ সংলগ্ন বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র।

('ময়ূরাক্ষীর বাঁধ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)

জেনে রাখ

প্রাণীদের লেজের কথা

প্রাণীতত্ত্বজ্ঞদের মতে, দৈহিক প্রয়োজন এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে ক্রমবিবর্তনের ধারায় প্রাণীদের দেহে লেজের আবির্ভাব ঘটেছে। জীবন-ধারণের জন্যে প্রাণীদের লেজের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রয়োজনীয়তা আছে। অবশ্য কয়েক জাতের প্রাণীর লেজ দৈহিক সৌন্দর্য বর্ধন ব্যতীত অন্য কাজে খুব কমই প্রয়োজন হয়। কয়েক জাতীয় প্রাণীর লেজের গঠনবৈচিত্র্য অত্যন্ত বিস্ময়কর। অধিকাংশ মেরুদণ্ডী প্রাণীরই লেজ আছে। এস্থলে বিভিন্ন জাতীয় কয়েকটি প্রাণীর লেজের বিষয় আলোচনা করছি।

মাছের লেজ তার জীবনধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। জলে সাঁতার কাটবার জন্যে লেজ একটি প্রধান অঙ্গ। মাছ অবশ্য লেজ ছাড়াও জলে ভেসে থাকতে পারে; কিন্তু ইচ্ছামত চলাচলে অসুবিধা হয়। আবার বৃহদাকৃতির সামুদ্রিক মাছ এই লেজের সাহায্যেই আত্মরক্ষা বা আক্রমণ করে। সানফিস্ নামক এক জাতের মাছ কেবলমাত্র পাখ্‌নার সাহায্যেই জলে সাঁতার কাটতে পারে। অনেক মাছের আবার লেজের গঠনবৈচিত্র্য দৈহিক সৌন্দর্য বর্ধন করে। এঞ্জেল মাছ এবং কয়েক জাতের জাপানী রঙীন মাছ লেজের বৈচিত্র্যের জন্যে সর্বত্র আদৃত।

আকাশে ইচ্ছামত বিচরণ করবার জন্যে পাখীর লেজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। লেজহীন পাখীর পক্ষে আকাশে ওড়া প্রায় অসম্ভব। আকাশে বিচরণক্ষম প্রত্যেক পাখীরই লেজ আছে। অবশ্য কয়েক জাতের লেজহীন ডুবুরী পাখী তাদের শরীরের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত দুটি পায়ের সাহায্যে জলে ডুবে সাঁতার কাটতে পারে। যে সব পাখীর আকাশে ওড়বার প্রয়োজন হয় না বা অল্প উড়তে সক্ষম তাদের লেজ কেবলমাত্র দৈহিক সৌন্দর্যের জন্যেই। এই জাতীয় পাখীদের লেজের বৈচিত্র্য মনোমুগ্ধকর। ময়ূর, মোরগ প্রভৃতি পাখীদের মধ্যে পুরুষদেরই লেজের বাহার দেখা যায়। সম্ভবতঃ স্ত্রী-পাখীদের চিত্তাকর্ষণের জন্যে প্রাকৃতিক নিয়মেই পুরুষ পাখীদের এই লেজের সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়ে থাকে। ময়ূর এবং বীণাপাখীর লেজ যেমন লম্বা তেমনই সুন্দর। দৈহিক আকৃতির তুলনায় এক জাতীয় জাপানী মোরগের লেজ অসম্ভব রকমের বড় হয়। আমাদের দেশের জংলী খঞ্জন, কাঠঠোক্‌রা, মেক্সিকো ও প্যারাগুয়ের মট্‌মট্ এবং অষ্ট্রেলিয়ার স্বর্গীয় পাখী লেজের সাহায্যে একাধিক কার্য সম্পন্ন করে থাকে। তারা প্রেমিকার মনোরঞ্জনের

জন্যে লেজ প্রসারিত করে অপূর্ব ভঙ্গীতে নৃত্য করে এবং আকাশে বিচরণ করবার সময়ও তাদের পক্ষে লেজের সাহায্য অপরিহার্য। গাছের গায়ে বসবার সময় কাঠঠোক্‌রা লেজের সাহায্যে শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে। স্ত্রী-পাখীর আনন্দ বর্ধন এবং আকাশে ওড়া—এই উভয় কাজেই পুরুষ মট্‌মট্‌ এবং স্বর্গীয় পাখীর লেজ সহায়তা করে।

সাপের সমস্ত শরীরটাই লেজের মত দেখতে এবং শরীরের কোন্‌ জায়গা থেকে যে লেজের উৎপত্তি হয়েছে তা ঠিক বুঝা যায় না। অষ্ট্রেলিয়া এবং পেপুয়া দ্বীপে সর্পজাতীয় একপ্রকার প্রাণী দেখা যায়। এদের লেজ লম্বায় সমগ্র শরীরের তুলনায় অসম্ভব রকমের বড়। জলে সন্তরণ ও স্থলে ভ্রমণ করবার জন্যে এদের পক্ষে এরূপ লম্বা লেজের যথেষ্ট প্রয়োজন। শিকার ধরবার জন্যে লেজই সাপের প্রধান হাতিয়ার। সাপ লেজের সাহায্যে শিকারকে নির্জীব করে উদরসাৎ করে। ছোট ছোট শিকারকে অবশ্য এরা লেজের সাহায্য না নিয়েই উদরসাৎ করে থাকে। আমেরিকার মারাত্মক প্রকৃতির বিষধর র‍্যাটেল সাপ লেজের সাহায্যে একপ্রকার অদ্ভুত শব্দ করে' শত্রুকে বিতাড়িত করে। এতেও শত্রু বিতাড়িত না হলে এরা তার দেহে বিষ প্রয়োগ করে। আফ্রিকায় প্যাঙ্গোলীন নামে একপ্রকার জানোয়ার দেখা যায়। এদের দেখতে ঠিক গোসাপের মত। এরা নিশাচর প্রাণী এবং দিনের বেলায় শাখা-প্রশাখাহীন গাছের খাড়া কাণ্ডের গায়ে পিছনের পা আঁকড়ে লেজের ঠেকা দিয়ে নিদ্রা যায়। এই সময়ে লেজই শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে। তাছাড়া লেজের সাহায্যে এরা আত্মরক্ষা ও আক্রমণ, দুই-ই করে থাকে। ইউরোপের কাঁচ সাপও শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার জন্যে হঠাৎ অদ্ভুত কৌশলে শরীর থেকে লেজটাকে বিচ্ছিন্ন করে মাটিতে ফেলে দেয়। বিচ্ছিন্ন লেজটা তখন নড়াচড়া করতে থাকে এবং শত্রুর দৃষ্টি লেজটার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই ফাঁকে এরা শত্রুর কবল থেকে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। পরে এদের শরীরে আবার নতুন লেজ গজায়। সাপের মত আকৃতি হলেও প্রকৃতপক্ষে এরা টিকটিকি জাতীয় প্রাণী। টিকটিকিও এভাবে লেজের সাহায্যে আত্মরক্ষা করে থাকে।

চীনদেশের প্যাঙ্গোলীনও গাছের ডালে ঘুমাবার সময় শক্তিশালী লেজের সাহায্যে গাছের ডাল জড়িয়ে রাখে। স্বেচ্ছায় লেজের বাঁধন না খুললে শত চেষ্টাতেও খোলা প্রায় অসম্ভব। বিভার নামক প্রাণীদের লেজ চ্যাপ্টা এবং লোমশূন্য। লেজটা দেখতে ঠিক দাঁড়ের মত। এই লেজের সাহায্যে বিভার জলে সাঁতার কেটে বেড়ায়। জীবন-ধারণের জন্যে বিভারের লেজ খুব প্রয়োজনীয়। পিপীলিকাভুক্‌ প্রাণীরা লেজের সাহায্যে নিজের শরীরে বাতাস করে শরীর ঠাণ্ডা রাখে।

টিকটিকি জাতীয় অতিকায় জন্তুদের লেজের ক্ষমতা প্রচণ্ড। এই জাতীয় প্রাগৈতিহাসিক জন্তুদের বিরাট লেজের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তাদের কাহিনী খুবই বিস্ময়কর।

আধুনিক কালের এই জাতীয় প্রাণীদের লেজের দাপটও তাদের তুলনায় কম নয়! পরস্পরের মধ্যে লড়াই বেঁধে গেলে এরা লেজের সাহায্যে বনজঙ্গল, জলাশয় তোলপাড় করে তোলে। গোসাপের মরণপণ লড়াইয়ের সময় এদের লেজের দাপট অনেকেই দেখে থাকবে। কুমীর তার লেজের প্রচণ্ড আঘাতে বড় বড় জন্তু-জানোয়ারকে ঘায়েল করে ফেলে; ক্ষুদ্রকায় টিকটিকিও লেজের সাহায্যে শত্রুর কবল থেকে আত্মরক্ষা করে থাকে।

দুম্বা নামক ভেড়ার লেজ খুবই অদ্ভুত। এদের লেজ দেখতে চ্যাপ্টা থলির মত। সমগ্র শরীরের তুলনায় লেজটা খুবই ভারী। এই ভারী লেজ নিয়ে যাতায়াতে অসুবিধা হলেও এই লেজ কিন্তু এদের জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য। আফ্রিকা হচ্ছে এদের আদি বাসভূমি। সেখানে কয়েক মাস মাত্র খাদ্য পাওয়া যায়। সেই সময় এরা প্রচুর পরিমাণে খাদ্য উদরসাৎ করে এবং অতিরিক্ত খাদ্য চর্বিরূপে লেজে সঞ্চিত রাখে। যখন খাদ্যাদি পাওয়া যায় না তখন এই সঞ্চিত চর্বিই দেহপুষ্টির জন্যে ব্যয়িত হয়। আফ্রিকায় একজাতের ইঁদুর দেখা যায়। এরাও অতিরিক্ত খাদ্য উদরসাৎ করে কিছুটা খাদ্য চর্বিরূপে লেজে জমা করে রাখে। শীতকালে বা অন্য কোন কারণে খাদ্যাভাব দেখা দিলে এই সঞ্চিত চর্বির দ্বারা এদের দেহের পুষ্টি সাধিত হয়।

সজারুর সর্বশরীর তীক্ষ্ণ কাঁটায় আবৃত। এই কাঁটাগুলিই এদের আত্মরক্ষার প্রধান হাতিয়ার। এদের লেজও কতকগুলি ভোঁতা ও ফাঁপা কাঁটার সমবায়ে গঠিত। শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে এদের গায়ের কাঁটাগুলি খাড়া হয়ে ওঠে এবং উত্তেজনাবশে সেগুলি ঝুমঝুমির মত বাজাতে থাকে। আক্রমণকারী, শিকারের এই ভীষণ মূর্তি দেখে আক্রমণে ইতস্ততঃ করে। এই ফাঁকে সজারু নিরাপদ স্থানে পালাবার চেষ্টা করে। দক্ষিণ আমেরিকার একজাতীয় সজারু এক গাছ থেকে অন্য গাছে যাবার সময় লেজের সাহায্য গ্রহণ করে থাকে।

দক্ষিণ আমেরিকার অপোসাম নামক একজাতীয় বিচিত্র প্রাণী লেজের সাহায্যে অনেক সময় গাছের ডালে ঝুলে থাকে এবং ঝুলন্ত অবস্থায় দোল খেতে খেতে একগাছ থেকে অন্য গাছে সহজেই যাতায়াত করতে পারে। অপোসামের বাচ্চাগুলি লেজের সাহায্যে মায়ের লেজ জড়িয়ে তার পিঠ আঁকড়ে বসে থাকে। কিংকাজো নামক প্রাণীরাও লেজের সাহায্যে গাছের ডালে অনায়াসে ঝুলে থাকতে পারে। এদের দেখতে একটি বড় বিড়ালের মত এবং সর্বশরীর নরম হরিদ্রাভ লোমে আবৃত। বহুরূপী শিকার ধরবার আশায় গাছের ডালে লেজ জড়িয়ে চুপচাপ বসে থাকে।

কাঙ্গারুর লেজ অত্যন্ত শক্তিশালী। বিশ্রাম করবার সময় এরা পিছনের পা এবং লেজের উপর শরীরের ভার রক্ষা করে। দৌড়াবার সময় এরা লেজের সাহায্য গ্রহণ

করে। মরুভূমির জারবোয়া নামক প্রাণীরাও বিশ্রাম গ্রহণের কালে এবং দৌড়াবার সময় লেজের সাহায্য গ্রহণ করে থাকে।

বানরের নিকটতম আত্মীয় লেমুর জাতীয় প্রাণীরা এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফিয়ে যাবার সময় সাধারণতঃ লেজের সাহায্যে শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে। কোন কোন জাতের লেমুরের লেজ আকারে ছোট; কিন্তু অধিকাংশ লেমুরের লেজই দীর্ঘাকৃতির। একজাতের লেমুরের লেজে পর পর সাদা-কালো গোলাকৃতির দাগ দেখা যায়। লেজের এই বাহারের জন্যে তাদের খুব সুন্দর দেখায়। দৌড়ঝাঁপ করবার সময় কাঠবিড়ালী লেজের সাহায্যে শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে।

ছাগল, হরিণ, খরগোস প্রভৃতি শান্ত প্রাণীরা সম্ভবতঃ বিপদের সঙ্কেত জ্ঞাপনের জন্যে লেজের ব্যবহার করে থাকে। বিপদাশঙ্কা দেখা দিলে লেজটি খাড়া করে এরা ভীষণ বেগে ছুটতে থাকে। একজনের খাড়া লেজ দেখা গেলেই অন্যগুলি আত্মরক্ষার জন্যে তৎপর হয়ে ওঠে। মশা-মাছি প্রভৃতির উপদ্রব থেকে বাঁচবার জন্যে গরু, মহিষ, ঘোড়া প্রভৃতি প্রাণীরা লেজের ব্যবহার করে থাকে। শত্রুর মুখামুখী হলে বিড়াল শরীরের লোম ফুলিয়ে এবং লেজ খাড়া করে আক্রমণাত্মক ভাব প্রকাশ করে। এই অবস্থায় এদের খুবই ভীষণ দেখায়। আনন্দ এবং লড়াইয়ের সময় এদের লেজের আন্দোলন ও আস্ফালন অনেকেই দেখে থাকবে! কুকুরের খাড়া লেজ সঙ্গীদের মনে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। লড়াইয়ের সময় পরাজিত হলে এদের লেজের অবনমন আত্মসমর্পণেরই ইঙ্গিত।

অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে চিংড়ি, কাঁকড়া-বিছা, রাজকাঁকড়া প্রভৃতি কয়েক জাতীয় প্রাণী ব্যতীত অধিকাংশ কীট-পতঙ্গেরই লেজ নেই। সাধারণ কাঁকড়ার লেজ আছে বটে, কিন্তু সেই লেজ বুকের খাঁজের মধ্যে লুকানো থাকে। কিন্তু শৈশবাবস্থায় কাঁকড়ার লেজ সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। লেজের সাহায্যেই এরা জলে সাঁতার কেটে বেড়ায়।

শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাচ

ছোট্ট একটুখানি কথা, দুটি মাত্র অক্ষরের সমন্বয়—কাচ। অথচ এই ক্ষুদ্র বস্তু এতটুকু সামান্য কাচের পিছনে যে কত বিচিত্র সংবাদ থাকতে পারে, হঠাৎ তা ধারণা করা যায় না। প্রথমেই ধরা যাক, কাচ আমাদের কত কাজে লাগে। এই ক্ষুদ্র কাচ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে যে কিরূপ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, সেকথা ভাবলে বিস্ময় জাগে।

সবাইর বাড়ীতেই শিশি-বোতলের প্রয়োজন আছে। অসুখবিসুখে ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ আনতে দুটা-একটা শিশি হাতের কাছে যে কোন মুহূর্তে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। তাছাড়া বাড়ীতে হেঁসেলে আছে কাচের জার, কাচের বৈয়ম, কাচের প্লেট-পেয়ালা। খাবার টেবিলে জল খাবার জন্যে আছে কাচের গ্লাস, জল দেবার জন্যে কাচের জাগ, বাড়ীতে ধূলা-ধোঁয়া-হাওয়া (কিন্তু আলো নয়) আটকাবার জন্যে কাচ। ঘরের ভিতরে কাচের ফুলদানী। কাচের আয়না, কাচের আলমারী, দেয়ালে কাচ দিয়ে বাঁধানো ছবি। লিখবার টেবিলে বড় এক খণ্ড মোটা কাচ। কাচের দোয়াত, কাচের কাগজ চাপা, পিন রাখবার কাচের ছোট বাটি, কাচের সিগারেটের ছাইদানী। হাতের ঘড়িতে কাচ, চশমায় কাচের লেন্স, পরিবারের গয়নায়, যদি তা খুব দামী না হয়—কাচ। বাড়ীর লণ্ঠনের চিমনীতে কাচ, ইলেকট্রিকের আলো হলে তার বাল্‌ব্‌ কাচের। যদি ঝাড়ের বাতি হয় তা হলে তো কথাই নেই, তার ঘরকন্নায় গেলাস বাটি থেকে আরম্ভ করে থালা পর্যন্ত কাচ। এছাড়া দরজার হাতল কাচের, মোটরের উইণ্ডস্ক্রীন কাচের।

বৈজ্ঞানিকের লেবরেটরীতে যদি যাও, দেখবে কাচে কাচময়। শিশি-বোতল, ওজনের নিক্তি, আতস কাচ, অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, তাপমান যন্ত্র, টেষ্ট-টিউব, ইউ-টিউব, রিটর্ট, কাচের নল, কাচের চামচ, কাচের হাতা, কাচের স্পিরিট ল্যাম্প, কাচের ফুট রুল,, কাচের সেটস্কোয়ার, কাচের টি-স্কোয়ার, গোল কাচ, চৌকোণা কাচ, লম্বা কাচ।

এমন যে কাচ, তা কি থেকে হয় এবং কেমন করে তৈরী হয়, এসব কথা তোমাদের জানতে ইচ্ছে করে না কি? অথচ কাচ তৈরীর পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ, আর তার মূল উপাদান হচ্ছে বালি। অত্যন্ত সাধারণ বালি যা যে কোন নদীর ধারেই পাওয়া যায়।

এক মুষ্টি বালিকণা হাতে নিয়ে দেখলে দেখা যাবে, তাথেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলো-কণা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সেই বালুকাসমষ্টি কোন একটা কালো জিনিষের উপরে রাখলে আরও ভাল দেখা যাবে। একটা আতস কাচ দিয়ে দেখলে দেখা যাবে, ঐ

বালিকণার অনেকগুলিই স্বচ্ছ। এইটেই হচ্ছে আসল কথা। প্রকৃতি তাদের তৈরী করেই রেখেছে ; প্রয়োজন শুধু এদের এক সঙ্গে মিলিয়ে জুড়ে নেবার। সেটা করতে হয় বালিকে গলিয়ে।

বালি গলানো কিন্তু সহজ ব্যাপার নয়! উনুনে যে তাপ সৃষ্টি হয় তার চাইতে বহুগুণ বেশী তাপের প্রয়োজন হয় বালি গলাতে। সে কাজ হয় কারখানার বড় বড় চুল্লীতে, যাকে বলে ফারনেস। তাও একঘণ্টায় দু'ঘণ্টায় নয়। ২৫-৩০ ঘণ্টা ধরে দিনরাত্রি সে চুল্লী সমানে জ্বলতে থাকে। তবুও তাকে সহজে গলাবার জন্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়, বালির সঙ্গে কাপড়-কাচা সোডা ও চুনাপাথর মিশিয়ে। সোডা ও চুনাপাথর যে শুধু বালিকে গলতেই সাহায্য করে তা নয়, সোডা কাচকে পরিষ্কার করে, চুনাপাথর দেয় শক্তি। তা নইলে কাচ যত সহজে ভাঙ্গে তার চাইতেও সহজে ভাঙ্গতো। বালির তারতম্যের উপর অবশ্য কাচের তারতম্য নির্ভর করে।

এমনি করে দিন-রাত্রি জ্বাল দেওয়ার পর স্বচ্ছ তরল কাচ তৈরী হয়। তারপর তাকে প্রয়োজনমত আকার দেওয়া হয়—কখনো আদি কারখানায়, কখনো অন্যখানে।

মানুষের প্রয়োজনের অনেক বস্তুর মতই কাচও একটি বস্তু যা কবে আবিষ্কৃত হয়েছিল, কে আবিষ্কার করেছিল—তার কোন সঠিক তথ্য জানা নেই। অতি প্রাচীন-কাল থেকেই মানুষ কাচের ব্যবহার করে আসছে। তফাৎ কেবল বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিক কারখানা ও তখনকার দিনের সাধারণ ঘরোয়া কারখানায়।

আর একটি বিষয়—সে হচ্ছে রঙীন কাচ। সাধারণভাবে রং মিশিয়ে কাচ রঙীন করা হয় বটে, কিন্তু আর একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া আছে, তাও এক বিস্ময়। গলানো কাচে জ্বাল দেবার সময় এক বা একাধিক ধাতু মিশিয়ে দিলে কাচের রং বদ্‌লে যায়। ধাতু গলে তার সঙ্গে মিশে যাওয়া চাই। রঙের পরিমাণও নির্ভর করে এই ধাতুর পরিমাণের উপর। যেমন সোনা ও তামা মেশালে রং হয় লাল, তামা ও কোবাল্ট মেশালে রং হয় নীল, ক্যাডমিয়াম আর ইউরেনিয়াম মেশালে হয় হল্‌দে এবং এই তিন রঙের পরিমাণ মত সংযোগে আর সব রংই বের করা যায়। এই ধাতুর মিলনে রং যে কেন হয়, সেটা বলতে পারবেন বৈজ্ঞানিকেরা।

শ্রীবিনায়ক সেন

জানবার কথা

১। পায়ের তলায় শক্ত মাটি নেই, রাস্তায় চলতে হলে চলতে হবে সাঁকো আর সেতুর উপর দিয়ে। আজব দেশের রূপকথা নয়, ইউরোপেরই কয়েকটি সহরের কথা বলছি। ১১৮টি ক্ষুদ্র দ্বীপ নিয়ে গঠিত হয়েছে ভেনিস সহর। এখানে ৩৭৮টি সেতু রাস্তা
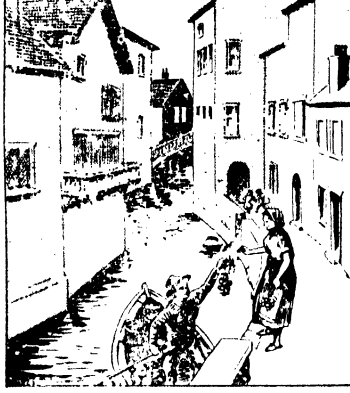
১নং চিত্র

হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ২০৭টি সেতু রয়েছে ঘেণ্ট সহরে। ঘেণ্ট হলো ২৬টি ক্ষুদ্র দ্বীপের সমষ্টি। আমষ্টারডাম সহর তৈরী হয়েছে ৯৬টি দ্বীপ নিয়ে আর এখানে রয়েছে ২৯০টি সেতু।

২। বাঁশীর ফুঁ-এর জোর কত, জান কি? বাঁশী বাজাতে বাতাসের যে গতিবেগ

২নং চিত্র

প্রয়োজন তা হলো ঘণ্টায় ৭৫ মাইলেরও কিছু বেশী। তবেই বোঝ, বাঁশীওয়ালার ফুঁ-এর জোর কত!

৩। দীর্ঘজীবী প্রাণীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে কচ্ছপ। কচ্ছপের স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল ৩৫০ বছর। দীর্ঘজীবীদের তালিকায় খরগোসের স্থান সর্বনিম্নে।
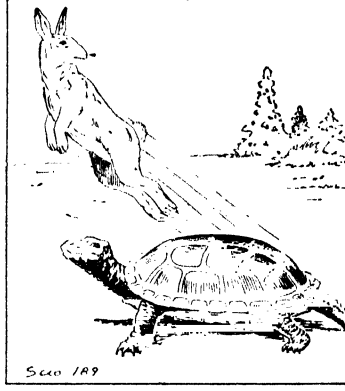
৩নং চিত্র

খরগোস বাঁচে মাত্র ৫ বছর। মধ্যবর্তী স্তরের প্রাণীদের আয়ুষ্কাল এইরূপ—কুমীর ৩০০ বছর, হাতী ও তিমি ১০০ বছর, উট ও সিংহ—৪০ বছর, ঘোড়া—৩০ বছর, গরু ও শূকর—২৫ বছর, কুকুর ও ছাগল—১৫ বছর, বিড়াল—১৩ বছর, ভেড়া—১২ বছর।

৪। মোটাসোটা মানুষকে সাধুভাষায় মেদবহুল বলা যেতে পারে। মেদ অর্থ হলো চর্বি। কিন্তু যতই মেদবহুল হোক না কেন, তার দেহের একটি অংশে মেদ বা

৪নং চিত্র

চর্বি কিন্তু মোটেই নেই। কোন্ অংশটি বলতে পার? চোখের পাতাই হলো সেই মেদবর্জিত অংশ।

৫। সাধারণতঃ ফলের মধ্যে কলা আমাদের খুব প্রিয় না হলেও—দেহপুষ্টির

৫নং চিত্র

জন্যে খাদ্যের যে সব গুণ থাকা প্রয়োজন—পাকা কলার মধ্যে তার প্রায় সব গুণই বর্তমান।
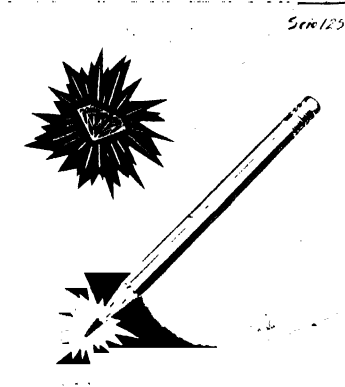
৬নং চিত্র

৬। পেন্সিলের সীস আর বহু মূল্যবান হীরক একই উপাদানে গঠিত।

৭। দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বার্লি হীরক খনিটি হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম

মনুষ্য-নির্মিত খনি। চতুর্দিকে এর পরিমাপ হচ্ছে এক মাইল এবং গভীরতা হচ্ছে

৭নং চিত্র

১৩৩৫ ফুট। ১৯১৪ সালে খনির কাজ বন্ধ হওয়ার পূর্বে এই খনি থেকে ৬৪০৪ পাউণ্ড পর্যন্ত হীরক উত্তোলিত হয়েছিল।

৮। মানুষের বিভিন্ন কাজে প্রাচীনকালে দড়ির ব্যবহার ছিল প্রায় অপরিহার্য। সেজন্যে মানুষের প্রাচীনতম কার্যকরী যন্ত্রসমূহের মধ্যে দড়িকে অন্যতম বলা যায়। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এবং নানাবিধ যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের ফলে প্রাচীন কালের মত
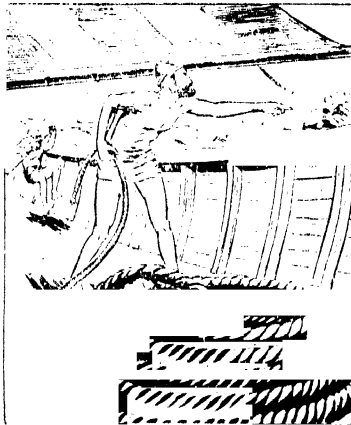
৮নং চিত্র

দড়ির বহুল ব্যবহার এখন আর নেই। আঁশ ও তারের পাকানো দড়ির সাহায্যে মানুষ সমুদ্রে অভিযান, নূতন জমির আবাদ, পর্বত আরোহণ, আকাশে উড়ন্ত যান চালনা প্রভৃতি কাজে সাফল্য লাভ করেছিল।

বিবিধ

শকাব্দের ভিত্তিতে নূতন বৎসর প্রবর্তন

৮ই চৈত্র, ১৩৬৩ (২২শে মার্চ, ১৯৫৭) সারা ভারতে শকাব্দ অনুযায়ী একই রকম দিনপঞ্জী চালু হইয়াছে।

এখন হইতে সরকারী গেজেট, প্রেসনোট ও আবহাওয়া অফিসের রিপোর্টে জর্জিয়ান বৎসরের পরিবর্তে শকাব্দ অনুযায়ী তারিখের উল্লেখ থাকিবে। শুক্রবার (৮ই চৈত্র, ১৩৬৩) হইল ১৮৭৯ শকাব্দের প্রথম মাসের প্রথম দিন, অর্থাৎ ১লা চৈত্র। নূতন পঞ্জী অনুযায়ী চৈত্র মাস হইতেই বৎসর আরম্ভ হইবে। পূর্বের মত ৩৬৫ দিনেই বৎসর আরম্ভ হইবে। চার বৎসর অন্তর ১দিন করিয়া বৎসরের দিন বৃদ্ধি পাইবে। প্রসিদ্ধ জ্যোতিবিদ বরাহ-মিহিরের সময় হইতেই শকাব্দের হিসাব অনুযায়ী জ্যোতিবিদেরা দিনপঞ্জী তৈয়ার করিতেন। অদ্যাবধিও ভারতীয় জ্যোতিবিদগণ শকাব্দ প্রথা অনুযায়ী দিন গণনা করিয়া পরে তাহাকে নিজ নিজ আঞ্চলিক প্রথাতে পরিবর্তিত করেন। ১২ মাস লইয়া বৎসর গঠিত হইবে। মহাবিষুব সংক্রান্তির পরের দিনই নূতন বৎসর আরম্ভ হইবে। নূতন বৎসরের দিনপঞ্জীর সহিত এইরূপে বর্তমান জর্জিয়ান দিনপঞ্জীর সহিত মিল রক্ষিত হইয়াছে।

ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের কৃতিত্ব

বৃটেনে জনৈক ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের গবেষণার ফলে টেট্রাম নামক একটি অতিশয় শক্তিশালী কীটঘ্ন ভেষজ আবিষ্কৃত হইয়াছে। লাল মাকড়সা নামক যে কীট তুলার গাছ, আপেল, পীয়ার ও অন্যান্য ফল সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করিয়া দেয়, টেট্রাম প্রয়োগে সেই কীট এবং অন্যান্য কয়েকপ্রকার ফলমূল ও শস্য বিনষ্টকারী কীট-পতঙ্গকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা সম্ভব হইবে।

১৯৩৭ সালে কতকগুলি প্রচলিত কীটঘ্ন ওষুধের অক্ষমতা পরিদৃষ্ট হয়। প্যারাথিয়ন প্রয়োগ করিয়া বিশেষ সুফল পাওয়া যায় না এবং ডি-ডি-টি প্রয়োগ করিয়া দেখা যায় যে, ফলমূলের উপর লাল মাকড়সার আক্রমণ না কমিয়া বৃদ্ধিই পাইতেছে। ইহা দেখিয়া ইম্পিরিয়্যাল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ স্থির করেন যে, তাঁহারা ইংল্যাণ্ডের অন্তর্গত জিলট হিলে অবস্থিত তাঁহাদের মৌলিক গবেষণা কেন্দ্রে অর্গানো-ফস্‌ফরাস জাতীয় রাসায়নিক পদার্থগুলি লইয়া ব্যাপকতর গবেষণা চালাইবেন এবং লাল মাকড়সা ধ্বংস করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন কোন একপ্রকার ভেষজ আবিষ্কারের চেষ্টা করিবেন।

১৯৪৯ সালে উক্ত গবেষণা কেন্দ্রের জনৈক ভারতীয় বৈজ্ঞানিক, ডাঃ আর. ঘোষ অর্গানো-ফস্‌ফরাস জাতীয় যৌগিক পদার্থসমূহ লইয়া গবেষণা সুরু করেন। তিনি দেখেন যে, কতকগুলি পদার্থ নানাজাতীয় কীট ধ্বংস করে বটে, কিন্তু তাহাদের প্রভাব বেশীক্ষণ থাকে না, আবার কতকগুলি পদার্থের প্রভাব বহুদিন থাকিলেও তাহাদের কীট ধ্বংস করিবার ক্ষমতা খুবই কম।

নানাবিধ পরীক্ষা ও গবেষণার পর তিনি ১৯৫২ সালে উপরিউক্ত উভয় জাতীয় পদার্থের গুণাবলীর একত্র সমাবেশ ঘটাইয়া একটি ভেষজ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন। দুই বৎসর ধরিয়া ঐ ভেষজটি লইয়া পরীক্ষা চালান হয় এবং তাহার পর আর একটি ফার্মকে উহার কার্যকারিতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য দেওয়া হয়। সেই ফার্মটি গত তিন বৎসর ধরিয়া ভেষজটি লইয়া ব্যাপক পরীক্ষা কার্য চালান এবং তাহার পর সম্প্রতি টেট্রাম নাম দিয়া উহা বাজারে উপস্থিত করা হয়।

ডাঃ ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. এস-সি লাভ করিবার পর ১৯৩৯ সালে বৃটেনে

গমন করেন এবং দুই বৎসর ম্যাঞ্চেস্টারে গবেষণা করিয়া তথা হইতে পি. এইচ-ডি ডিগ্রি লাভ করেন। অতঃপর তিনি কিছুকাল অক্সফোর্ডে থাকিয়া মর্ফিন সম্পর্কে গবেষণা করেন এবং ১৯৪৯ সালে ইম্পিরিয়্যাল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ-এ যোগদান করেন।

টেট্রাম অতিশয় শক্তিশালী ভেষজ। কয়েক ধরণের কীটের উপর ইহা স্প্রে করিয়া দিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বিনষ্ট হয়। হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, আর্জেনটিনা, উরুগুয়ে, চিলি, মেক্সিকো, ব্রেজিল, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান প্রভৃতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে টেট্রামের পরীক্ষা চালাইয়া যথেষ্ট সুফল লাভ করা গিয়াছে।

নূতন ধূমকেতু

প্যারিসের নিকটস্থ নিউডন মানমন্দির হইতে আরেন্ড রোলাণ্ড ধূমকেতু পরিদৃষ্ট হইয়াছে। মধ্য ফ্রান্সের ক্লারমণ্ট ফেরাল্ড হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, প্রায় একই সময়ে কয়েকজন লোক দূরবীক্ষণের সাহায্যে উহা দেখে, খালি চোখে ধূমকেতুটি একটি বিবর্ণ তারকার মত মনে হইতেছিল।

শিলং-এর আকাশে ধূমকেতু

২৬শে এপ্রিল সন্ধ্যাবেলা ৭টার সময় শিলং-এ একটি ধূমকেতু দৃষ্ট হয়। শত শত নরনারী পশ্চিম আকাশে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে। ধূমকেতুটি আকারে বেশ বড়; উহা প্রায় অর্ধেক আকাশে আলোক বিচ্ছুরিত করিতেছিল। প্রায় আধ ঘণ্টা যাবৎ উহা পরিদৃষ্ট হয়। তারপর মেঘে ঢাকা পড়িয়া যায়।

পারমাণবিক যুগে মৎস্য ভোজনের বিপদ

বৃটিশ মেডিক্যাল জার্ণালে জনৈক পত্র লেখক লিখিয়াছেন—সামুদ্রিক প্রাণীর দেহে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ষ্ট্রনসিয়াম-৯১ জমিতে থাকিলে মৎস্যভোজীদের বাস্তবিকই একটি বড় বিপদ দেখা দিবে।

যে সকল স্থানে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিবে, সেখানকার সমুদ্রস্রোতে স্বভাবতঃই ষ্ট্রনসিয়ামের আধিক্য ঘটিবে।

ষ্ট্রনসিয়াম-৯১-বিষদুষ্ট মৎস্য ভোজন বিপজ্জনক হইয়া উঠিবে।

ভারতে নিউজপ্রিণ্ট উৎপাদন

অন্ধ্র প্রদেশের নিজামাবাদ জেলায় অবস্থিত নিজাম কারখানার নিকটে শঙ্কর নগরে ভারতের সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ তৈয়ারীর দ্বিতীয় একটি কারখানা (নেপা কারখানার অনুরূপ) শীঘ্রই স্থাপিত হইবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ভারী শিল্পের মন্ত্রী শ্রীমানুভাই শাহ ১৪ই এপ্রিল কারখানার সম্ভাব্য স্থানটি পরিদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যেই সুরু করা হইয়াছে।

আলমোড়ায় সীসা ও রূপার সন্ধান

ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা উত্তরপ্রদেশের আলমোড়া জেলার খারাহী এলাকায় প্রায় দেড় মাইল দীর্ঘ একটি সীসার স্তর আবিষ্কার করিয়াছে। উক্ত সীসার স্তরটির বিস্তার প্রায় ২০০ হইতে ৫০০ গজ এবং উহাকে অনায়াসে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহার করা চলিবে। সীসার পিণ্ডের সহিত কিছু রূপারও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

বৃটিশ অধিকারের পূর্বে গড়োয়াল, কুমায়ুনে তামা ও সীসা গলাইবার শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সময় বিদেশী শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় না দাঁড়াইতে পারায় ঐ সকল শিল্প ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়া যায়।

কাংরা উপত্যকায় তৈলের সন্ধান

পাঞ্জাবের রাজ্যপাল শ্রী সি. পি. এন. সিং কাংরা উপত্যকার অন্তর্গত জ্বালামুখীতে প্রথম টেষ্ট ড্রিলের কার্যের উদ্বোধন করেন। এই উদ্যোগটি

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা অনুযায়ী ত্রিশ কোটি টাকা ব্যয়ে খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধান কার্যের অন্যতম প্রচেষ্টা।

রুমানিয়ার বিশেষজ্ঞগণের সহযোগিতায় এই অনুসন্ধানের ফলে খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যাইতে পারে।

এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্তৃক প্রেরিত একটি বাণীতে প্রকাশ যে, ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযান। খনিজ তেলের আবিষ্কার ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন আনিয়া দিতে পারে।

জল ও বায়ুরোধক বস্ত্র উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কার

যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি দপ্তর হইতে তাঁতে কাপড় বুনিবার নূতন একপ্রকার পদ্ধতি আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। এই পদ্ধতিতে জল ও বাতাস প্রতিরোধক একপ্রকার বস্ত্র উৎপাদন করা যাইবে।

কৃষি বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ এই আবিষ্কারকে তূলাচাষী এবং বস্ত্র উৎপাদকদের পক্ষে একটি পরম আশীর্বাদ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। কারণ ইহার ফলে সামগ্রিকভাবে বস্ত্র উৎপাদনের এক নূতন পথ খুলিয়া যাইবে।

এই নূতন পদ্ধতিতে উৎপাদিত বস্ত্র পরিধান করিয়া পরিধানকারী অতিবৃষ্টির মধ্যেও ভিজিবে না। ঠাসবুননির জন্যই এই কাপড় জল প্রতিরোধ করিতে পারে।

গত পাঁচ বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া শ্রমশিল্পের বিভিন্ন কাজে এই কাপড়ের উপযোগিতার বিষয় পরীক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। এই কাপড়ের তৈয়ারী একটি ত্রিপল দিয়া নিউ অর্লিন্সের একটি মাঠ ঢাকিয়া রাখা হয়। প্রবল বৃষ্টিতেও মাঠটি না ভিজিয়া শুষ্ক রহিয়াছিল।

কৃষি বিভাগ হইতে বলা হইয়াছে যে, বর্তমানে যে সব চালু তাঁত আছে, সেই সব তাঁতে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে না এবং ব্যয়ও বেশী পড়িবে না।

লাক্ষণিক মৃত্যুর অবস্থা হইতে জৈব পদার্থের পুনরুজ্জীবন

অধ্যাপক ভসেভোলোদ ইয়ান্‌কোভ্‌স্কির পরিচালনায় একদল ইউক্রেনীয় বৈজ্ঞানিক লাক্ষণিক মৃত্যুর (ক্লিনিক্যাল ডেথ) অবস্থায় উপনীত জৈব পদার্থকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলবার সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা করিতেছেন।

এই প্রসঙ্গে ইয়ান্‌কোভ্‌স্কি বলেন—অল্প কিছুকাল পূর্বেও মনে করা হইত যে, লাক্ষণিক মৃত্যুর কাল যদি চার হইতে ছয় মিনিটের বেশী দীর্ঘস্থায়ী না হয় তাহা হইলে একমাত্র সেই ক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবন সম্ভব। আমরা দেখিয়াছি যে, এই সময়ের সীমা আরও বেশী। কৃত্রিম রক্ত সঞ্চালনের পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া আমাদের বিজ্ঞানভবনের কর্মীরা একটি প্রাণীকে তাহার লাক্ষণিক মৃত্যুর পনেরো মিনিট পরেও পুনরুজ্জীবিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। মস্তিষ্কের সমস্ত ক্রিয়াই সম্পূর্ণভাবে ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইয়াছে। সম্প্রতি হাইপোথামির পদ্ধতি (যে জৈব পদার্থটিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে সেটির উপরে প্রথমে শৈত্য প্রয়োগ করা) প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহার ফলে, পরীক্ষাধীন কুকুরগুলির রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হইয়া যাইবার ৩৫ হইতে ৪০ মিনিট পরেও তাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে। একটি বিড়ালের উপরে পরীক্ষা চালাইয়া আরও উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া গিয়াছে। এক ঘণ্টাকাল মৃত্যুর অবস্থায় থাকিবার পর এই প্রাণীটিকে বাঁচাইয়া তোলা হয় এবং বিড়ালটি বেশ সুস্থ অবস্থায় আছে। জৈব পদার্থের পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে আরও পরীক্ষা চালাইবার জন্য আমাদের গবেষণা-

গার সম্প্রতি সোভিয়েটে নির্মিত কতকগুলি নূতন যন্ত্রপাতি পাইয়াছে।

আমাদের বিজ্ঞানভবনের তুলনামূলক শারীরবৃত্তের গবেষণাগারে অক্সিজেনের ঘাটতি সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানো হইতেছে। বিখ্যাত শারীরবৃত্ত-বিশেষজ্ঞ নিকোলাই সিরোটসিনের পরিচালনায় গবেষণাগারের কর্মীরা ককেশাসের অত্যুচ্চ স্থানে স্বল্প অক্সিজেনে জীবদেহের অবস্থান্তর সম্পর্কে সরেজমিনে পরীক্ষার কাজ চালাইতেছেন। তাঁহারা ইতিমধ্যেই পনেরোটি পর্বতারোহণের অভিযান চালাইয়াছেন।

পরমাণু-চুল্লীর সাহায্যে কর্কট রোগের চিকিৎসার নূতন পদ্ধতির সন্ধান

যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু-শক্তি কমিশনের অধীনস্থ জীব-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিভাগের কর্তা ডাঃ চার্লস এল. ডানহাম জানাইতেছেন যে, কেবল চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণা করিবার উদ্দেশ্যে একটি পরমাণু-চুল্লী যুক্তরাষ্ট্রেই সর্বপ্রথম প্রস্তুত করা হইতেছে।

সিনসিনাটির অ্যাকাডেমী অব মেডিসিনের শত-বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় ডাঃ ডানহাম বলেন যে, নিউইয়র্কের অন্তর্গত লংআই-ল্যাণ্ডের ব্রুকহ্যাভেন ন্যাশনাল লেবরেটরিতে ঐ পরমাণু-চুল্লীটি নির্মিত হইতেছে। পরমাণু-চুল্লীতে প্রস্তুত নিউট্রনের সাহায্যে ক্যান্সার বা কর্কট রোগের চিকিৎসা সম্পর্কিত গবেষণার কাজেই প্রধানতঃ ইহাকে ব্যবহার করা হইবে।

ব্রুকহ্যাভেন গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিকেরা কর্কট রোগ চিকিৎসার গবেষণা বেশ ভালভাবেই আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া ডাঃ ডানহাম মন্তব্য করেন। শরীরের মধ্যে অতি দুরধিগম্য প্রদেশে যে সব টিউমার জন্মায়, সেখানে রক্তের সহিত বোরন-১০ নামক তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ হইতে নিউট্রন প্রেরণ করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা কর্কট রোগের চিকিৎসার চেষ্টা করিতেছেন। নূতন পরমাণু-চুল্লী হইতে উৎপাদিত তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে বৈজ্ঞানিকেরা মস্তিষ্ক ও শরীরের অন্যান্য অংশের মধ্যে উৎপন্ন টিউমারের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়তো করিতে পারিবেন—ডাঃ ডানহাম এইরূপ আশা প্রকাশ করেন।

ডাঃ ডানহাম বলেন যে, তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে রক্তকণিকা সম্পর্কিত নানাপ্রকার ব্যাধির ও অস্বাভাবিক থাইরয়েড গ্রন্থির চিকিৎসার চেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, চিকিৎসা ও জীববিজ্ঞানের এবং কৃষি ও শ্রমশিল্পের নানা বিষয়ে গবেষণার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৬ সাল হইতে এই পর্যন্ত ৫ হাজার ২৫৮ কিস্তিতে পৃথিবীর ৫৪টি রাষ্ট্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ প্রেরণ করিয়াছে।

নূতন পরমাণু-কণার সন্ধান

ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ টেলারের নাম হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ারীর পরিকল্পনার সহিত জড়িত। তিনি সম্প্রতি নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় বলেন যে, তাঁহার সহকর্মীরা দুইটি নূতন পরমাণু-কণার অস্তিত্বের বিষয় অনুমান করিয়াছেন। অবশ্য ইহার পরীক্ষামূলক প্রমাণ কিছু তাঁহারা পান নাই। ডাঃ টেলার বলেন যে, এই পর্যন্ত যে সকল পরমাণু-কণা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের বৈশিষ্ট্য জটিল ধরণের। পরমাণু-পদার্থবিদ্যায় যে শক্তির সন্ধান পাওয়া যায় তাহা সহজ ধরণের। এই দুইটি পরমাণু-কণাই খুব স্বল্পস্থায়ী এবং বিদ্যুৎ শক্তির দিক হইতে নিরপেক্ষ।

তেজস্ক্রিয় ধূলিকণা সম্বন্ধে মার্কিন বিজ্ঞানীর অভিমত

যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণুশক্তি কমিশনের সদস্য এবং বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ডাঃ উইলার্ড এফ. লিবি সম্প্রতি

ঘোষণা করিয়াছেন যে, পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে যে তেজষ্ক্রিয় ধূলিকণা কোন কোন জায়গায় গিয়া মানুষ এবং জীবজন্তুর উপরে পড়ে তাহা হইতে খুব গুরুতর বিপদের আশঙ্কা নাই। বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ কালের মানুষের পক্ষেও ইহা হইতে আতঙ্কিত হইবার কারণ নাই—যদিও অনেকের মনে ইহার বিপরীত ধারণাই রহিয়াছে।

নিউ হ্যামশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ডাঃ লিবি ঐ অভিমত প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, গত পাঁচ বৎসর যাবৎ পারমাণবিক অস্ত্রাদি সম্পর্কে যে ভাবে ও যে হারে পরীক্ষা চালানো হইতেছে, সেই ভাবে পরীক্ষা চালাইয়া গেলে উপরে তেজষ্ক্রিয় পদার্থের অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি পাইবে না।

ডাঃ লিবি বলেন, পৃথিবীতে যদি পারমাণবিক সংগ্রাম বাঁধিয়া যায় তাহা হইলে কি গতি হইবে, এই বিষয়টিই আমাদের বিশেষভাবে চিন্তা করা মনুষ্যদেহের কর্তব্য। কারণ আসল বিপদের ভয় রহিয়াছে উহার মধ্যেই।

তিনি বলেন যে, পারমাণবিক অস্ত্রাদির পরীক্ষার ফলে যে তেজষ্ক্রিয় ধূলিকণা পতিত হয় তাহার বিপদ খুব ব্যাপক যাহাতে না হয়, সেই দিকে বিশেষভাবে নজর রাখা হইয়াছে এবং বিপদ খুব বেশীও হয় নাই। কিন্তু ঐ সব অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিলে আমাদের পক্ষে স্বাধীন থাকা অথবা সমূলে ধ্বংস না হইয়া বাঁচিয়া থাকা মুস্কিল হইয়া দাঁড়াইবে। স্বাধীন পৃথিবীকে এই দুইটি বিপদের মধ্যে একটির ঝুঁকি লইতে হইয়াছে।

হংকং-এ ৩ লক্ষ লোক ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত

হংকং-এ খুব আকস্মিকভাবে ব্যাপক ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং প্রায় ৩০০,০০০ লোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে।

একখানি চীনা সংবাদপত্রে বলা হয় যে, গাজর ও জলপাই একত্র জলে সিদ্ধ করিয়া খাইলে ইনফ্লুয়েঞ্জা নিশ্চয়ই সারিয়া যাইবে। ইহার পর গাজর এবং জলপাইয়ের দাম আটগুণ বাড়িয়া যায়।

স্থানীয় চীনা সংবাদপত্রগুলিতে বলা হয় যে, রুশ এবং আমেরিকানরা যে সমস্ত পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে তাহার ফলেই আবহাওয়ার অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া এই ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের সৃষ্টি হইয়াছে।

হিমালয়ে তুষার-মানব অভিযাত্রী-দলের অভিজ্ঞতা

নেপালে আমেরিকান তুষার-মানব অভিযাত্রী-দল হিমালয়ে ইয়েতি নামে অভিহিত মানুষের ন্যায় একপ্রকার জন্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। দলের নেতা মিঃ টম স্লিক সম্প্রতি সাংবাদিকদের নিকট বলিয়াছেন যে, তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আকারের তিন দফা পদচিহ্ন দেখিয়াছেন এবং তাহার ফটোগ্রাফ লইয়াছেন। তাঁহারা ইয়েতি সম্বন্ধে স্থানীয় অধিবাসী প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইয়েতি কর্তৃক একটি ইয়াক নিহত হওয়ার সংবাদও তাঁহারা শুনিয়াছেন।

মিঃ টম স্লিক তুষার-মানবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য এবং একটি তুষার-মানব ধরিবার উদ্দেশ্যে আগামী শরৎকালে একটি পূর্ণাঙ্গ অভিযাত্রী দল আনিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

মিঃ স্লিক এবং তাঁহার দুইজন সঙ্গী, অষ্ট্রেলিয়ান রিপোর্টার মিঃ পিটার বার্ণেশ ও ভারতীয় প্রাণিতত্ত্ববিদ অধ্যাপক বাস্কেটি সহ পূর্ব নেপালে ৩৪ দিন ব্যাপী ইয়েতির অনুসন্ধানের পর বিমানযোগে ফিরিয়াছেন। তিনি সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, তিনি ইয়েতির লোম এবং পদচিহ্নের ফটো আনিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, তাঁহারা তিন জনেই বিশ্বাস করেন যে, হিমালয়ে মানুষের ন্যায় কোন প্রকার জন্তু আছে।

ঘণ্টায় সাড়ে তিন হাজার মাইল গতিবিশিষ্ট অতিকায় ক্ষেপণাস্ত্র

বৃটেনের বহুল প্রচারিত রবিবাসরীয় সংবাদপত্র 'পিপল'-এ এই মর্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হাইড্রোজেন বোমাযুক্ত প্রথম দূরপাল্লার রকেট নির্মাণ করিয়াছে।

উক্ত সংবাদপত্রে বলা হইয়াছে যে, এই আবিষ্কারের দ্বারা যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতায় রাশিয়া অপেক্ষা পাঁচ বৎসর আগাইয়া গিয়াছে।

ঐ সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে, এই নূতন রকেট পারস্পরিক ধ্বংসের সম্ভাবনা এরূপ ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে যে, সমস্ত আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য চাপ অনিবার্য হইতে পারে।

পত্রিকায় আরও বলা হয়, রাশিয়া ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই কিছুকাল যাবৎ দূরপাল্লার রকেটের সহিত হাইড্রোজেন বোমা জুড়িয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু পরীক্ষামূলকভাবে নিক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্রসমূহ লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে না পারায় রাশিয়া তাহার চেষ্টা মন্দীভূত করে।

'রকেট হাইড্রোজেন বোমা' আবিষ্কারের সংবাদ যুগপৎ লণ্ডন ও মস্কোতে পৌঁছে। কিন্তু এই সংবাদে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়েন। রুশ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অতঃপর সর্বপ্রকার রকেটের উৎপাদন বন্ধ করা সম্পর্কে চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু আমেরিকা যে এই ধরণের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে, সেরূপ কোন সম্ভাবনা নাই।

ওয়ালপ দ্বীপে (ভার্জিনিয়া) পরীক্ষামূলকভাবে নির্মিত একটি অতিকায় ক্ষেপণাস্ত্র ত্রিশ মাইলেরও অধিক উর্ধ্বে ছুড়িয়া দিলে উহা ঘণ্টায় প্রায় ৩৫০০ মাইল বেগে ছুটিয়া যায়। দ্বি-মস্তক এই ক্ষেপণাস্ত্রটি ত্রিশ ফুটেরও বেশী দীর্ঘ ছিল। উহার ওজন ছিল ৫৫০০ পাউণ্ড। ঘাঁটি হইতে উহা এমন প্রচণ্ডবেগে ছুটিতে থাকে যে, দুই সেকেণ্ডের মধ্যে একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়। আশা করা গিয়াছিল যে, উহা আশী হাজার ফুট পর্যন্ত উঠিয়া উপকূল হইতে কুড়ি মাইল দূরে আটলাণ্টিক মহাসাগরে পতিত হইবে এবং উহার গতি হইবে শব্দের গতি অপেক্ষা পাঁচ গুণ বেশী। কিন্তু উহা এক লক্ষ দশ হাজার ফুট পর্যন্ত উঠিয়া রেডার যন্ত্রের সহিত সংযোগ হারাইয়া ফেলে। ক্ষেপণাস্ত্র প্রায় ৩৮ মাইল পর্যন্ত অগ্রসর হয়। যতটা আশা করা হইয়াছিল তদপেক্ষা দ্রুতগতিতে উহা উর্ধ্বে আরোহণ করে।

এই অস্ত্রটির নাম দেওয়া হইয়াছে 'দ্বি-মস্তক দানব'। মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্র পুনরায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করিলে উহাকে কতটা তাপ সহ্য করিতে হইবে, সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যই অস্ত্রটিকে আকাশে পাঠানো হইয়াছিল।

লণ্ঠন মাছ

নর্থ আইল্যাণ্ডের প্লেন্টি উপসাগরে টহলরত একখানা লঞ্চ একটা ১০ ইঞ্চি লম্বা লণ্ঠন-মাছ লইয়া অকল্যাণ্ডে ফিরিয়া আসিয়াছে। নিউজিল্যাণ্ডের সমুদ্র অঞ্চলে এই ধরণের মাছ এই প্রথম পাওয়া গেল।

ওয়েলিংটনের ডোমিনিয়ন মিউজিয়ামের মিঃ এম. জে. মোরল্যাণ্ড বলিয়াছেন যে, এই মাছের পুচ্ছ স্থায়ীভাবে আলোক দিয়া থাকে। তবে ইচ্ছা করিলে উহারা ঐ আলো নিবাইয়া দিতে পারে। এই মাছের দাঁত ছুঁচের মত ধারালো এবং উহার শরীরের দুই পাশ দিয়া লম্বালম্বি ভাবে আলোক নির্গত হইতে থাকে।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

᳭
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দশম বর্ষ | জুন, ১৯৫৭ | ষষ্ঠ সংখ্যা

আইসোটোপ*

শ্রীপ্রদীপ রায়বর্মণ

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা পরমাণুর মধ্যে এক নতুন রূপ দেখতে পেয়ে বিস্মিত হয়ে গেলেন। ১৯৪৫ সালের পরমাণু বোমার কলঙ্কময় ইতিহাসকে পৃথিবীর বুক থেকে হয়তো মুছে ফেলতে পারবে, পরমাণুর এই নতুন রূপ। বিজ্ঞান আর মনুষ্যত্বের কল্যাণ সাধনে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের প্রয়োগ বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন আবিষ্কারের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার।

অক্সিজেন পরমাণুর ১৬ ওজন ধরে কোনও পরমাণুর আপেক্ষিক ওজনকে তার পারমাণবিক ওজন বলা হয়। পরমাণুর কেন্দ্রস্থিত প্রোটনের সংখ্যাই উহার পারমাণবিক সংখ্যা। কোন মৌলিক পদার্থের একই রাসায়নিক গুণসম্পন্ন বিভিন্ন ওজনের পরমাণুকে পরস্পরের আইসোটোপ বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, একই কার্বন ১২ ও ১৩ ওজনের হয়; আবার ১৪ ওজনের কার্বন প্রকৃতিতে পাওয়া না গেলেও পরমাণু-চুল্লী থেকে নির্গত নিউট্রন দিয়ে ১৪ ওজনের নাইট্রোজেনকে ১৪ ওজনের কার্বনে রূপান্তরিত করা যায়। একে বলে তেজস্ক্রিয় কার্বন। এই তেজস্ক্রিয় কার্বন বীটা কণিকা বিকিরণ করে।

$$^{১৪}_{৭}(\text{নাইট্রোজেন}) + ^{১}_{০}(\text{নিউট্রন}) = ^{১৪}_{৬}(\text{কার্বন}) + ^{১}_{১}(\text{প্রোটন})$$

উপরের এবং নীচের সংখ্যা যথাক্রমে পারমাণবিক ওজন ও পারমাণবিক সংখ্যা।

কার্বন ছাড়া বহুসংখ্যক স্থায়ী ও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরীর জন্যে নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর ব্যবহৃত হয়। নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরের বিস্তৃত বর্ণনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবে এটুকু জানা দরকার যে, রিয়্যাক্টর থেকে যে সব নিউট্রন বেরোয়, বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের উপর তাদের প্রতিক্রিয়ায় সেই পদার্থের রূপান্তর ঘটে।

শিল্প ও কৃষিবিজ্ঞান, ভেষজবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞানের সমস্ত বিভাগেই আইসোটোপের প্রয়োগ বিজ্ঞানের এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। সমগ্র পৃথিবীর তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের প্রধান দুটি উৎস হলো ইউ. এস. অ্যাটমিক

এনার্জি কমিশনের ওকৃরিজ্ ন্যাশনাল লেবরেটরী এবং ব্রিটিশ অ্যাটমিক এনার্জি রিসার্চ এষ্টাব্লিস-মেণ্ট। মাত্র ছয় বছর আগে যে আইসোটোপ ছিল সরকারের লেবরেটরীতে সংগোপনে, আজ তা বিশ্বমানবের উন্নয়নকল্পে ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। আজ বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি গুপ্ত রহস্য উন্মোচনে কিংবা বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের একান্ত প্রয়োজন। বর্তমান এ প্রসঙ্গে আমরা সে সব প্রয়োগেরই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

শিল্পক্ষেত্রে আইসোটোপের প্রয়োগ—

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ থেকে বিকিরিত রশ্মির একটি প্রয়োজনীয় ব্যবহার হলো পাত্‌লা কাগজ, প্লাষ্টিক অথবা ধাতুর আস্তরণ প্রস্তুতে স্বতঃনিয়ন্ত্রণ। শিট অর্থাৎ পাতটি রোলার থেকে বেরিয়ে এসে একটি যন্ত্রের ভিতরে প্রবেশ করে। যন্ত্রটির মধ্যে পাতটির নীচে অতি অল্প পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকে এবং উপরে থাকে একটি গাইগার কাউণ্টার। রশ্মিগুলি পাতটি ভেদ করে গাইগার কাউণ্টারে ধরা পড়ে। যদি কোন কারণে পাতটি পাত্‌লা অথবা মোটা হয়ে যায় তবে কাউণ্টারে বিকিরিত রশ্মির পরিমাণ বাড়ে অথবা কমে; কারণ পাতটি কিছু রশ্মি শুষে নেয়। সুতরাং রোলার নিয়ন্ত্রণ করে যন্ত্রটির মধ্যে বিকিরিত রশ্মির একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রাখা যায়; ফলে পাতটির সর্বত্র সমান ঘনত্ব বজায় থাকে।

তাছাড়া আইসোটোপ থেকে বিকিরণের একটি প্রত্যক্ষ প্রয়োগ হলো লম্বা নলের ভিতর দিয়ে তেলের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করা। এরকমের একই নলপথে সাধারণতঃ একটির পর একটি করে বিভিন্ন প্রকারের তেল পাম্প করে নেওয়া হয়। অপারেটর-দের জানা প্রয়োজন, কখন এক রকমের তেলের প্রবাহ শেষ হলো এবং অন্য রকমের তেল প্রবেশ করলো। এটি জানবার জন্যে নলের ভিতর দিয়ে পাম্প করবার সময় দুটি বিভিন্ন প্রকারের তেলের মিশ্রণ-সীমায় খুব সামান্য পরিমাণ তেজস্ক্রিয় তেল মিশিয়ে দেওয়া হয়। গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার প্রায় একশ' মাইল দূর থেকেই কাউণ্টার যন্ত্রে সেই তেজস্ক্রিয় তেলের আগমন ধরা পড়ে, যাতে ভাল্‌ব্-গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে তেলের প্রবাহকে এক ট্যাঙ্ক থেকে অন্য ট্যাঙ্কে পাঠানো সম্ভব হয়।

গবেষণামূলক কাজে আইসোটোপের খুবই ব্যবহার হয়। ইংল্যাণ্ডের শেল পেট্রোলিয়াম কোম্পানী ইঞ্জিনের ঘর্ষণ এবং ক্ষয়ের পরিমাপ করবার জন্যে রেডিও-আইসোটোপের সাহায্য নিয়েছেন। যতক্ষণ না কিছু লোহা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপে পরিণত হয় একটি পিষ্টন গোলককে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করে, ততক্ষণ পর্যন্ত গোলকটিকে তখন একটি চলমান ইঞ্জিনে যুক্ত করা হয়। যদি কিছু ক্ষয় হয় তা তেলের সঙ্গে মিশে যায় এবং কাউণ্টারে সহজেই ধরা পড়ে। খুব অল্প পরিমাণ তেজস্ক্রিয় লোহাই এই কাজের পক্ষে যথেষ্ট। তেলের মধ্যে লোহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কষ্টকর বিশ্লেষণের চেয়ে এই উপায়টি অনেক সহজ এবং মিনিটখানেকের মধ্যেই হয়ে যায়।

ঘড়ির ডায়ালে ব্যবহৃত স্ফটিকময় উপাদানকে আলোকিত করবার জন্যে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ থেকে বিকিরিত রশ্মির ব্যবহার খুবই চমকপ্রদ। এ সব সস্তা আইসোটোপ বর্তমানে রেডিয়ামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে। আরেকটি প্রয়োগ হলো সাধারণ ফ্লোরেসেণ্ট টিউবে। কোন উজ্জ্বল উপা-দানের সঙ্গে আইসোটোপ মিশিয়ে দিলে সেগুলি টিউবের ভিতরের বায়ুর তড়িৎ-পরিবহন ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। সেজন্যে তা খুব তাড়াতাড়ি ও খুব কম ভোল্টেজে জ্বলতে পারে।

ভবিষ্যতে আইসোটোপের আরেকটি প্রধান প্রয়োগ হবে অর্ধস্থায়ী ক্ষুদ্র ক্ষমতাসম্পন্ন ইলেক্‌ট্রিক জেনারেটর তৈরীতে। বায়ুশূন্য টিউবের মধ্যে তড়িদ্দ্বারের উপর ছড়ানো ষ্ট্রনসিয়াম ধাতুর একটি আইসোটোপ ইলেকট্রন বিকিরণ করে নিজে

পজিটিভ বিদ্যুদ্বাহী হয়ে পড়ে। এই উপায়ে প্রায় ৩৬৫,০০০ ভোল্ট শক্তি পাওয়া যায়। এই ভাবে উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তিকে একটা ছোটখাটো মোটর (যাতে অন্য কোন শক্তির উৎসের প্রয়োজন হবে না) চালাতে ব্যবহার করবার জন্যে পরীক্ষামূলক গবেষণা এগিয়ে চলেছে।

অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রে বর্তমানে রঞ্জেন রশ্মির পরিবর্তে আইসোটোপ থেকে নির্গত ভেদকারী রশ্মি ধাতু-নির্মিত অংশের গঠন পরীক্ষা করবার জন্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। বড় বড় ট্যাঙ্কের মধ্যে তরল পদার্থের উচ্চতা মাপবার জন্যে আইসোটোপ ব্যবহৃত হয়। একটি ভাসমান পাত্রের মধ্যে কিছু আইসোটোপ থাকে এবং ট্যাঙ্কের দেয়াল ভেদ করে বিকিরিত রশ্মি নির্গত হয়। তাথেকে সহজেই ভাসমান পাত্রটির অবস্থান জানা যায়। এই উপায়ে আজকাল আবদ্ধ ট্যাঙ্কের মধ্যে গলিত ধাতুর উচ্চতা নির্ধারিত হয়। বর্তমানে সিগারেটকে নিকোটিনমুক্ত করবার কাজে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ প্রয়োগ করা হচ্ছে। রবার এবং ইলেকট্রিকের জিনিষপত্র তৈরী, কাচ শিল্প, ধাতু তৈরী, খাদ্য এবং ওষুধ তৈরী প্রভৃতি বহুবিধ শিল্পে রেডিও-আইসোটোপ যুগান্তর সৃষ্টি করেছে।

চিকিৎসা-ক্ষেত্রে আইসোটোপের প্রয়োগ—

আমরা এতক্ষণ যে সব তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি, সেগুলিই অতি ক্ষীণভাবে তেজস্ক্রিয়, কেবল মাত্র সূক্ষ্ম যন্ত্রে ধরা পড়ে। এরা কোন প্রাণীকে ধ্বংস করবার মত তেজস্ক্রিয় নয়। আবার খুব শক্তিশালী আইসোটোপও পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, কোবাল্ট ধাতুর ক্ষেত্রে রেডিয়াম অপেক্ষা সহস্রগুণ শক্তিসম্পন্ন একটি আইসোটোপ পাওয়া যেতে পারে। এরকম শক্তি আইসোটোপ থেকে বিকিরিত রশ্মিকে জীবাণু—এমন কি, তার চেয়ে বৃহত্তর প্রাণী ধ্বংস করতে ব্যবহার করা যায়। সাধারণতঃ বিশুদ্ধিকরণের জন্যে ওষুধকে তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট আইসোটোপের রশ্মির মধ্যে কয়েক সেকেণ্ড অথবা কয়েক মিনিটের জন্যে রাখা হয়। এর সুবিধা অনেক, কারণ অনেক ওষুধই তাপের প্রভাবে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। পেনিসিলিন বিশুদ্ধিকরণের এই একটি প্রকৃষ্ট উপায়।

ক্যান্সার রোগে রেডিয়াম থেকে নির্গত তন্তু-ধ্বংসকারী শক্তিশালী রশ্মির উপকারিতা প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে রেডিয়ামের পরিবর্তে সাধারণতঃ কোবাল্টের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের প্রয়োগ হচ্ছে। একটি ক্ষুদ্র কোবাল্ট ধাতুর সিলিণ্ডার রেডিয়ামের সমতুল্য গামারশ্মি বিকিরণ করে। এক আউন্সের কিছু বেশী ওজনের এরকম একটি কোবাল্ট খণ্ড ভারী ধাতুর ভিতরে আবদ্ধ থাকে। তাথেকে শক্তিশালী রশ্মি ক্ষুদ্র একটি বাতায়ন-পথে বেরিয়ে এসে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত স্থানে পড়ে।

তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস এবং তেজস্ক্রিয় স্বর্ণ, উভয়ই অন্যভাবে ক্যান্সাররোগের চিকিৎসার জন্যে ব্যবহৃত হয়। চামড়ার উপর ক্যান্সার হলে সাধারণ একটি ব্লটিং কাগজকে তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফেট-দ্রবণে ভিজিয়ে নেওয়া হয় এবং যখন তা শুকিয়ে যায় তখন টিউমারের আকার অনুসারে কেটে সেই স্থানে লাগানো হয়। তেজস্ক্রিয় কোবাল্টকে সূক্ষ্ম তারের আকারে অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূচের আকারে কেটেও ক্যান্সার রোগাক্রান্ত স্থানে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। আবার তেজস্ক্রিয় স্বর্ণকে গুঁড়া করে একটি ছোট বন্দুকের মত যন্ত্রের সাহায্যে ক্যান্সারের স্থানে বর্ষণ করা হয়। উভয় ক্ষেত্রেই যতক্ষণ পর্যন্ত ক্যান্সার ধ্বংস না হয় ততক্ষণ তারা ঐ স্থানে থাকে।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ রক্তস্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে ক্যান্সার তন্তুগুলি তা শুষে নেয়। সাধারণ তন্তু এবং ক্যান্সার-আক্রান্ত তন্তুর মধ্যে এই হলো একটি পার্থক্য। যে রোগে লোহিত কণিকার বৃদ্ধি হয়ে রক্তাধারগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত

করে, সে রোগ সহজেই তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস দিয়ে কমপক্ষে বছরখানেকের জন্যে আরোগ্য করা যায়; কারণ তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস তৎক্ষণাৎ লোহিত কণিকার বৃদ্ধি কমিয়ে দেয়। এ সব ছাড়া তেজস্ক্রিয় লোহা ও সোডিয়াম দিয়ে রক্ত চলাচলের ত্রুটির কারণ জানা যায়। তেজস্ক্রিয় আয়োডিন গলগণ্ড রোগ নিরাময়ে অব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

আয়োডিন খুব সহজেই থাইরয়েড গ্রন্থির মধ্যে শোষিত হয়। থাইরক্সিন নামক হর্মোন থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে তৈরী হয়। যে সব রোগীর থাইরয়েড গ্রন্থি খুবই সতেজ এবং অতিরিক্ত থাইরক্সিন নির্গত করে, পূর্বে তাদের থাইরয়েড গ্রন্থির কিছু অংশ অস্ত্র প্রয়োগ করে কেটে ফেলা হতো। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসায় অপারেশনের পরিবর্তে তেজস্ক্রিয় আয়োডিনের দ্রবণ চমকপ্রদ একটি ওষুধরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেই গ্রন্থির মধ্যে আয়োডিন শোষিত হয়ে থাকে এবং তাথেকে বিকিরিত রশ্মি অতিরিক্ত থাইরয়েড তন্তু ধ্বংস করে ফেলে।

আইসোটোপের প্রধান ব্যবহার রোগ আরোগ্যের জন্যে নয়, অনুসন্ধানমূলক কাজে—প্রাণীদেহের বহু অজানা তথ্য তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, তেজস্ক্রিয় লৌহ দেহে সঞ্চারিত করে দেখা গেছে—জীব-কোষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই ধাতু নষ্ট না হয়ে পুনর্ব্যবহৃত হয়। এই তথ্য পূর্বে জানা ছিল না। অনুসন্ধানমূলক কাজে যে সব আই-সোটোপ ব্যবহৃত হয় তারা সাধারণতঃ কম শক্তি-শালী এবং ক্ষতিকারক নয়। এ রকম রশ্মি বিকিরণ করে খুব সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে তাদের ধরা যায়। অনেক ক্ষেত্রে এমন আইসোটোপ ব্যবহৃত হয় যারা তেজস্ক্রিয় নয়; যেমন—ভারী জল। সে সব ক্ষেত্রে তাদের অস্তিত্ব নির্ধারণ করবার জন্যে অধিকতর জটিল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

শরীরের তন্তুসমূহ এক পরিবর্তনশীল অবস্থায় থাকে—'ট্রেসার' হিসাবে আইসোটোপ ব্যাবহারের ফলে এই তথ্যটি জানা যায়। ট্রেসার বলতে বুঝায় যা কিছু চিহ্নিত করে। আমরা সাধারণতঃ ভাবি যে, শরীরের উত্তাপ এবং ক্ষয়িত অংশ পূরণের জন্যে খাদ্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ঠিক তা নয়। যদি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মেদ থেকে কতকগুলি হাইড্রোজেন পরমাণু সরিয়ে দিয়ে সেস্থানে ভারী হাইড্রোজেন পরমাণু প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায় এবং সেই মেদ খাওয়ানো হয়, তবে দেখা যায়, নতুন মেদ মেদস্তরে জমা হয়, আর পুরাতন মেদ (যা পূর্বেই দেহে ছিল) জ্বলে গিয়ে উত্তাপের সৃষ্টি করে। সে রকম ভারী নাইট্রোজেন পরমাণুযুক্ত প্রোটিন (খাদ্যের আমিষ উপাদান) খাওয়ানোর ফলে দেখা যায়—তা দেহের তন্তু, পেশী এবং কোষ গঠনে ব্যবহৃত হয় এবং পুরাতন প্রোটিন অক্সিডাইজ্‌ড্‌ হয়ে দেহ থেকে বহির্গত হয়ে যায়। এভাবে দেহের প্রতিটি অংশ নতুন খাদ্যের দ্বারা পুনর্গঠিত হয়ে থাকে। কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসের মধ্যে প্রতিটি মানুষ অথবা জীবের দেহ সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠিত হয়। এমন কি, অস্থি-র পরিবর্তনও এভাবে হয়। কিন্তু একমাত্র লোহিত কণিকার মধ্যে যে লোহা রয়েছে তাকে সহজে খাদ্যে অবস্থিত নতুন লৌহ-পরমাণু দিয়ে সরানো যায় না। ট্রেসার আইসোটোপের সাহায্যেই এই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

কৃষিক্ষেত্রে আইসোটোপের প্রয়োগ—

বিজ্ঞানী এন. এস. হল্‌ তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাসের সাহায্যে কৃষি সম্পর্কে বিবিধ গবেষণা করেছেন। ফস্‌ফেট হলো উদ্ভিদের একটি প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং তা প্রায় সব সারের মধ্যেই রয়েছে। ফস্‌-ফরাসের স্বল্প তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরী করে সাধারণ ফস্‌ফেট সারের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। যেহেতু এর সামান্যতম অস্তিত্বও সূক্ষ্ম যন্ত্রে ধরা পড়ে সেহেতু উদ্ভিদদেহে অথবা মাটিতে ফস্‌ফরাসের

পরিবর্তন অতি সহজেই অনুধাবন করা যায়। এভাবে কৃষি সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য জানা গেছে। সুইডেনের বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, সারের মধ্যে যে ফস্‌ফেট আছে তা মাটিতে ছড়িয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ভিদের মূল তাকে গ্রহণ করে নেয়। আবার দেখা গেছে, চারাগাছ সার থেকে অধিকতর ফস্‌ফরাস আহরণ করে, কিন্তু বয়স্ক উদ্ভিদ তা মাটি থেকে আহরণ করে। কাজেই বয়স্ক উদ্ভিদে সার দেওয়ার কোন প্রয়োজন হয় না। ভুট্টা, বিট, তামাক এবং তুলা কেবলমাত্র বৃদ্ধির প্রথমবাবস্থায় সার থেকে ফস্‌ফেট গ্রহণ করে। সে সময়ের পরে সার দিলে কোন কাজ হয় না। অপর পক্ষে, বৃদ্ধির সম্পূর্ণ কাল ধরেই আলু প্রচুর পরিমাণে ফস্‌ফেট সার থেকে আহরণ করে। আর একটি বড় কথা হলো, কোন্ শস্যের পক্ষে কোন্ সার কার্যকরী হবে, তেজস্ক্রিয় ফস্‌করাস দিয়ে তা সহজেই বোঝা যায়। অল্পপরিমাণ তেজস্ক্রিয় তামা, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি ধাতু উদ্ভিদ-দেহে কিরূপ আচরণ করে তাও জানা সম্ভব হয়েছে।

কীট-পতঙ্গ যাতে উদ্ভিদের কোন ক্ষতি করতে না পারে সেজন্যে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার হয়। দেখা গেছে যে, কীটঘ্ন দ্রবণটি পাতার নীচের দিকে শোষিত হয় এবং এই শোষণ-কার্য শুধু দিনের বেলাতেই সম্ভব। প্রশস্ত পত্রযুক্ত গাছে কীটঘ্ন দ্রবণটি ছড়িয়ে দিলে দু-ঘণ্টার মধ্যেই তা সমস্ত উদ্ভিদদেহের সর্বত্র সঞ্চারিত হয়। কিন্তু সরু পত্রধারী ঘাসজাতীয় উদ্ভিদে স্প্রে করা হলে যেখানে যেখানে পড়ে সেখানেই থেকে যায়, দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে না।

কোবাল্ট ধাতুর একটি আইসোটোপ রেডিয়ামের চেয়ে সহস্রগুণ শক্তিসম্পন্ন রশ্মি বিকিরণ করে। এ রকম শক্তিশালী রশ্মিকে জীবাণু—এমন কি, তার চেয়ে বৃহত্তর প্রাণীদের ধ্বংস কার্যে ব্যবহার করা যায়। এই উপায়ে তাজা ফল অথবা সব্‌জি জীবাণুমুক্ত রাখা যায়। ফল অথবা সব্‌জি বেশী দিন তাজা থাকে না। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের বিকিরিত রশ্মির মধ্যে কিছুক্ষণ রেখে ভালভাবে প্যাকিং করলে তাদের সুগন্ধ নষ্ট হয় না এবং অনেক দিন পর্যন্ত ভাল থাকে। এভাবে বিশুদ্ধিকরণের একটি বড় সুবিধা এই যে, তাপমাত্রা হ্রাস বা বৃদ্ধি পায় না এবং সেজন্যেই ফলমূল অধিকৃত থাকে। কিন্তু এখনও আইসোটোপের সংখ্যা খুব কম, কাজেই এভাবে বিশুদ্ধিকরণের খরচ খুব বেশী পড়ে যায়। তবে অদূর ভবিষ্যতে যখন পরমাণু জ্বালানীশক্তি উৎপাদনের জন্যে ব্যবহৃত হবে তখন বাই-প্রোডাক্ট হিসাবে অনেক পরিমাণে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সৃষ্টি হবে।

উদ্ভিদ ও প্রাণী-বিজ্ঞানে আইসোটোপের প্রয়োগ—

মশাকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ দিয়ে চিহ্নিত করা যায়। মশার বাচ্চাগুলিকে তেজস্ক্রিয় ফস্‌-ফরাসের খুব পাতলা দ্রবণে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং তাতে তারা সারাজীবন তেজস্ক্রিয় থাকে এবং তাদের অবস্থিতি গাইগার কাউণ্টারে সহজেই ধরা যায়। এই উপায়ে মশার জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়; যেমন—কতদিন এরা বাঁচে, কতদূর উড়তে পারে, এরা কি খেয়ে বাঁচে ইত্যাদি। আশা করা যায়, এভাবে পাখীদের জীবন সম্বন্ধেও অনেক তথ্যই জানা যাবে।

তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস অনেকগুলি ইঁদুরকে খাইয়ে এবং মাঝে মাঝে তাদের হাড়ের ভস্মাবশেষের তেজস্ক্রিয়তা মেপে বিবিধ গবেষণা করেছেন বিজ্ঞানী হেভেসি। তিনি দেখিয়েছেন যে, কোন নির্দিষ্ট ফস্‌ফরাস পরমাণু হাড়ের মধ্যে মাত্র এক মাস থাকে যাতে প্রমাণ হয় যে, কোন জীবন্ত দেহের হাড় সর্বদা পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে একটি গতিশীল সমতা রক্ষা করে থাকে। তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস দিয়ে খাদ্যের ফস্‌ফরাস কতদিনে জীবের রক্তের ফস্‌-ফরাসে পরিণত হয়, সে সময়টি জানা যায়।

পাতার সবুজকণা ও সূর্যকিরণের সাহায্যে জল ও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের বিবিধ রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উদ্ভিদদেহে শর্করা প্রস্তুত হয়। আপাতদৃষ্টিতে এ একটি সহজ প্রক্রিয়া। জল ও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের অণু মিলিত হয়ে অক্সিজেন গ্যাস পরিত্যাগ করে এবং শর্করা, শ্বেতসার, সেলুলোজ এবং আরও অনেক রাসয়নিক দ্রব্যের সৃষ্টি করে। কিন্তু কেউ জানে না, কেমন করে গাছে এই প্রক্রিয়া সাধিত হয়। কার্বনের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে আজ এই সম্বন্ধে অনেক তথ্যই জানা গেছে এবং আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতেই উদ্ভিদদেহের এই প্রক্রিয়ার বিষয় জানা যাবে। মানুষ তখন নিজের ইচ্ছামত উদ্ভিদদেহে অধিক পরিমাণে শর্করা উৎপাদনে সক্ষম হবে।

প্রথমতঃ অল্পপরিমাণ তেজস্ক্রিয় কার্বনের আইসোটোপ মিশ্রিত সাধারণ কার্বন থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস তৈরী করা হয়। এভাবে উৎপন্ন গ্যাসকে ভারী কার্বন ডাইঅক্সাইড বলে। উদ্ভিদ সূর্যকিরণের সাহায্যে যেমন সাধারণ কার্বন থেকে খাদ্য প্রস্তুত করে, তেমন ভারী গ্যাস থেকেও করে। ফলে উদ্ভিদদেহে রাসায়নিক দ্রব্যাদির মধ্যে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বিরাজ করে এবং তার উপস্থিতি সূক্ষ্মযন্ত্রে ধরা যায়। যদি কতকগুলি গাছের সবুজ পাতা তেজস্ক্রিয় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের মধ্যে মিনিটখানেকের জন্যে রাখা যায় তবে পাতার মধ্যে তেজস্ক্রিয় কার্বন সংযুক্ত কমপক্ষে পঞ্চাশটি বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। সূর্যকিরণের মধ্যে মাত্র দু-সেকেণ্ডের জন্যে রেখে দেখা গেছে যে, তারই মধ্যে দু-তিনটি যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হয়েছে।

এই উপায়ে জানা গেছে যে, উদ্ভিদ প্রথম তৈরী করে ফস্‌ফোগ্লিসারিক অ্যাসিডের যৌগিক পদার্থ যা থেকে ফল, শস্য অথবা শর্করা প্রস্তুত হয়। আবার সূর্যকিরণে দু'মিনিট রেখে তেজস্ক্রিয় কার্বন দ্বারা পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রোটিন এবং মেদও এই নতুন কার্বন বহন করে। এ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হচ্ছে এবং কিছু দিনের মধ্যে সমস্ত তথ্য জানা যাবে।

বিভিন্ন উদ্ভিদ পরীক্ষা করে বর্তমানে জানা গেছে যে, প্রক্রিয়ার প্রথম অবস্থা সব উদ্ভিদেই এক রকম। কেবলমাত্র বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্যে (যেমন গন্ধ, রং ইত্যাদি) প্রক্রিয়ার পরবর্তী অবস্থায় বিভিন্ন উদ্ভিদ বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে। শৈবাল জাতীয় সবুজবর্ণের উদ্ভিদদেহে প্রক্রিয়ার প্রথম অবস্থায় শুধু শর্করা অথবা মেলিক অ্যাসিড প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। এর উপর নির্ভর করে পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, একই শৈবাল যাতে সাধারণতঃ ৫০% প্রোটিন থাকে, পরিবর্তনের দ্বারা প্রায় ৭৫% ফ্যাট প্রস্তুত করতে পারে। এভাবে মানুষ এবং জীবজন্তুর খাদ্য বৃদ্ধি করাও সম্ভব।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে আজ মানুষ বহু দিনের হারিয়ে-যাওয়া ঐতিহাসিক সময়ের হিসাব জানতে পেরেছে। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সময় জানবার এক আধুনিক মাপকাঠি। শত শত বছর আগেকার উদ্ভিদের বয়স, মানুষ অথবা জীবজন্তুর কঙ্কালের বয়স সম্বন্ধে বহুবিধ প্রশ্ন ছিল; আজ তার উত্তর দিচ্ছে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। বিগত ত্রিশ হাজার বছরের মধ্যে অনেক ঘটনার তারিখের নির্দেশ দিতে পারে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস আছে তার মধ্যে খুব কম হলেও নির্দিষ্ট পরিমাণ ভারী তেজস্ক্রিয় কার্বনের আইসোটোপ রয়েছে। কোন জীব অথবা উদ্ভিদের মৃত্যু ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে কার্বনের আদান-প্রদান বন্ধ হয়ে যায় এবং কালক্রমে তাদের অনেকেই ভূগর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। তখন থেকেই দেহস্থিত তেজস্ক্রিয় কার্বন, রশ্মি বিকিরণ করে ক্রমে ক্রমে নিষ্ক্রিয় হতে থাকে। কিন্তু সেই

প্রক্রিয়া খুবই ধীরে ধীরে চলতে থাকে। যে কোন পরিমাণ তেজস্ক্রিয় কার্বন তার অর্ধেক হয়ে যেতে সময় লাগে ৫,৫৬৮ বছর। আবার তারও অর্ধেক, অর্থাৎ মোট পরিমাণের এক চতুর্থাংশ হতে সময় লাগে আরও ৫,৫৬৮ বছর। ৩০ হাজার বছর পরে যা তেজস্ক্রিয় থাকে তা খুবই কম, কিন্তু অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রে ধরা পড়ে। অতএব ৩০ হাজার বছরের মধ্যে কার্বনের তেজস্ক্রিয়তা মাপা যায় এবং তাথেকে জানা সম্ভব—কত বছর আগে উদ্ভিদ অথবা জীবের মৃত্যু হয়েছিল। এই উপায়ে জানা যায়, কখন ভূগর্ভস্থিত কঙ্কালে জীবনের অস্তিত্ব ছিল।

পৃথিবীর বয়স সম্বন্ধে যত মতবাদ ছিল, মাত্র ৩০ বছর আগে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে তার সমাধান সম্ভব হয়েছে। ইউরেনিয়াম ধাতুর তেজস্ক্রিয়তা থেকে মাপাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য। ইউরেনিয়ামের অর্ধ-জীবনকাল হলো ৪০০ কোটি বছর। তাই আজও পৃথিবীতে ইউরেনিয়ামের অস্তিত্ব রয়েছে, যদিও তা অনবরত সীসায় পরিবর্তিত হচ্ছে। কত পরিমাণ ইউরেনিয়াম এবং তাথেকে উৎপন্ন সীসা বর্তমানে আছে তা মেপে এবং তাকে ইউরেনিয়ামের পরিবর্তন-গতির সঙ্গে তুলনা করে জানা গেছে যে, পৃথিবীর বয়স প্রায় তিন হাজার লক্ষ বছর।

মুছে-যাওয়া দিনকে জানবার আগ্রহ প্রায় প্রত্যেক মানুষেরই আছে। তাই বিজ্ঞানে আইসোটোপ এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। এমন কি, তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ দিয়ে বহু পুরনো বই কবে লেখা হয়েছিল, তাও বলা সম্ভব হচ্ছে। কলকাতার একদল পদার্থতত্ত্ববিদ্ তেজস্ক্রিয় কার্বনের এই হিসাবের পদ্ধতিতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও মহাভারতের কাল নির্ধারণে সচেষ্ট হয়েছেন। কয়েক মাস পূর্বে এই বৈজ্ঞানিকেরাই এই পদ্ধতিতে প্রাচীন পাটলিপুত্রের কাষ্ঠ-বেষ্টনীর বয়স খৃঃ পূর্ব ৪১০ থেকে খৃঃ পূঃ ১৬০ অব্দ বলে নির্ধারণ করেছেন। প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ যে স্থানে অবস্থিত ছিল, সে স্থানের ভূগর্ভস্থ প্রাচীন কাঠের ধ্বংসাবশেষের কিয়দংশ উল্লিখিত পদার্থতত্ত্ববিদ্‌দের অনুরোধক্রমে শীঘ্রই বিমানযোগে কলকাতায় পাঠানো হবে। এই কাঠকে মৌলিক কার্বনে পরিণত করবার উদ্দেশ্যে দহন ও পরিশোধনের জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে তাঁরা ইতিপূর্বেই এক যন্ত্র স্থাপন করেছেন। মার্কিন বিজ্ঞানী ডবলিউ. এফ. লিবির অনুসৃত পদ্ধতিতেই কলকাতার বিজ্ঞানীরা ইন্দ্রপ্রস্থে প্রাপ্ত কাষ্ঠাদি থেকে মহাভারতের যুগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা করেছেন। মহাভারতের যুগ নির্ণয়ের কাজ শেষ হলে তাঁরা প্রাচীন কৌশাম্বির বয়স নির্ধারণের কাজ আরম্ভ করবেন বলে জানা গেছে। একটি মজার কথা, পিল্টডাউন ম্যান নামে অভিহিত প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের মুখাস্থি নিয়ে বিশ্বের গবেষণাকারী পণ্ডিতমহল যত গবেষণা করেছিলেন, সম্প্রতি এই কার্বন আইসোটোপ পদ্ধতিতে তা ঝুটা মাল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ একটি বিশ্বস্ত ঘড়ি, সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে নির্ভুল সময় দিয়ে চলেছে। আইসোটোপ প্রয়োগের এখনও শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে নি, কিন্তু তবু তার খুব কমই আমরা এস্থলে আলোচনা করেছি। অনাগত ভবিষ্যতে পৃথিবীতে আইসোটোপ বাড়বে, পৃথিবীর ফসল বাড়বে, পৃথিবীর শিল্পের বৃদ্ধি হবে, আর হবে চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতি।

জিরকোনিয়াম

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়

জিরকোনিয়াম নামক ধূসর বর্ণের ধাতুটি আবিষ্কৃত হয় ১৭৮৯ সালে। ক্লাপ্রোথ নামে জনৈক জার্মান কেমিষ্ট প্রথম এর সন্ধান পান খনিজ গোমেদের সঙ্গে। তারপর আরও অনেক জায়গায়, বিশেষ করে ব্রেজিলে ১৯০৬ সালে এই ধাতুটির সন্ধান পাওয়া যায়। ব্রেজিলে ওকে বলা হতো ব্যাডেলাইট। এখানেও জিরকোনিয়াম আবিষ্কৃত হয় অন্য ধাতু কণিকার সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায়।

ক্লাপ্রোথ জিরকোনিয়ামকে অন্য ধাতু থেকে পৃথক করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অন্যান্য কয়েকজন কেমিষ্টও সে চেষ্টা করে বিফল মনোরথ হন। পরবর্তী কালে এই কাজে যিনি কিছুটা সাফল্য লাভ করেন তাঁর নাম হচ্ছে জে. জে. বারজেলিয়াস। ১৮২৪ সালে তিনি জিরকোনিয়াম পৃথক করতে সমর্থ হন। অন্য রসায়নের সাহায্যে অগ্নিতে উত্তপ্ত করে তিনি লোহার মত ধূসর বর্ণের একরকম চূর্ণ পান। তা-ই জিরকোনিয়াম, কিন্তু সেই জিরকোনিয়ামও ছিল অবিশুদ্ধ।

বারজেলিয়াসের অনেক পরে ১৯১৪ সালে লেলি এবং হ্যামব্রুগার নামে নেদারল্যাণ্ডের দু'জন কেমিষ্টও অন্য ধাতুর মিশ্রণ থেকে জিরকোনিয়াম পৃথক করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরাও বিশুদ্ধ জিরকোনিয়াম বের করতে পারেন নি। এই কাজে সম্পূর্ণ ভাবে সাফল্য লাভ করেন দু'জন ওলন্দাজ কেমিষ্ট। নাম তাঁদের ভন্ আর্কেল এবং ডি বোয়ের। তাঁরা নানাভাবে পরীক্ষার পর অবিমিশ্র জিরকোনিয়াম নিষ্কাশিত করেন ১৯২৫ সালে। তাঁরা যে প্রণালী অনুসরণ করে জিরকোনিয়াম বের করেন তাকে বলা হয় ভন্ আর্কেল বা আয়োডাইড রীতি। এই পদ্ধতিতে জিরকোনিয়াম নিষ্কাশন করতে অনেক সময় লাগে। তাছাড়া এই পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। তাই বাণিজ্যিক হারে উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রায় অচল। অথচ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই পদ্ধতিতেই জিরকোনিয়াম নিষ্কাশন করা হতো। কারণ তখন পর্যন্ত এই পদ্ধতি ছাড়া আর কোন পদ্ধতিই আবিষ্কৃত হয় নি। যাহোক, ১৯৪৭ সালে ডাঃ ডবলিউ. জে. ক্রোল নামে জনৈক কেমিষ্ট অন্য আর একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই পদ্ধতিটিকে বলা যায় টিটেনিয়াম-ম্যাগ্নেসিয়াম নিষ্কাশন পদ্ধতি।

প্রথম দিকে জিরকোনিয়ামকে একটি দুর্লভ মৌলিক পদার্থ বলে মনে করা হতো। কিন্তু পরে সে ধারণাটা পাল্টে যায়। কারণ, অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে, ক্রোমিয়ামের মতই এই ধাতুটি ভূপৃষ্ঠে প্রচুর পাওয়া যেতে পারে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, আমাদের বিশেষ পরিচিত তামা, সীসা, দস্তা এবং নিকেল প্রভৃতি ধাতুর চেয়েও জিরকোনিয়াম সহজলভ্য। পূর্বেই বলেছি, গোমেদ থেকে প্রধানতঃ জিরকোনিয়াম পাওয়া যায়। হাফনিয়াম নামক আর একটি ধাতুও এই জিরকোনিয়ামের সঙ্গে যুক্ত। যে ব্যাডেলাইটের কথা আগে উল্লেখ করেছি তা হচ্ছে জিরকোনিয়ামের অম্লজানজারিত একটি পদার্থ—গোমেদ-এর সঙ্গে তার সম্পর্ক খুবই কম।

গোমেদ দানা অবস্থায় যেমন খনিতে পাওয়া যায় তেমনি চূর্ণাবস্থায়ও পাওয়া যায়। সমুদ্রোপকূলের বালুকারাশিতে ঐ গোমেদ চূর্ণ পাওয়া যায়। এখানেই পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশী গোমেদ।

গোমেদ ছাড়া এই সমুদ্রোপকূলবর্তী বালুকারাশিতে পাওয়া যায় ইলমেনাইট, রুটাইল এবং মোনাজাইট। নদীর বুকে যে সব নুড়িপাথর পাওয়া যায় তাতে এবং সমুদ্রোপকূলবর্তী বালুকারাশিতেও ব্যাডেলাইটের সন্ধান পাওয়া গেছে।

বিশ্বের প্রায় পনেরোটি দেশে আকরিক জিরকোনিয়াম পাওয়া যায়। এর মধ্যে জিরকোনিয়াম উৎপাদক ছয়টি প্রধান দেশ হচ্ছে - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রেজিল, ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা এবং ভারত।

ভারতে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যের (অধুনা কেরল রাজ্য) বেলাভূমিতে বালুকারাশির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জিরকোনিয়াম আছে বলে জানা গেছে। জিরকোনিয়াম ছাড়া ঐ স্থানে আরও নানাপ্রকার ধাতুর সন্ধান পাওয়া গেছে যা পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে একান্ত আবশ্যক। ঐ সব ধাতুকে বিচ্ছিন্ন ও বিশুদ্ধ করবার জন্যে কেরালায় ও ভারতের কোন স্থানে যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ২০টি রাষ্ট্রে জিরকোনিয়াম পাওয়া যায়। সেখানে ইলমেনাইট, রুটাইল, মোনাজাইটের সঙ্গে জিরকন বালিকণার আকারে এবং সোনা-মোনাজাইট পাথরের নুড়ির গায়ে জিরকোনিয়াম পাওয়া যায়। অষ্ট্রেলিয়ায় সমুদ্রের উপকূলস্থিত বালিকণা থেকে, ব্রেজিলে ব্যাডেলাইট খনি থেকে এবং ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকায় উপকূলস্থিত বালুকারাশি থেকে জিরকোনিয়াম পাওয়া যায়।

উপরে যে কয়টি দেশের নাম করেছি তাছাড়া বেলজিয়ান কঙ্গো, ম্যাডাগাস্কার, দক্ষিণ রোডেসিয়া, স্পেন, থ্যাইল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, সিংহল এবং রাশিয়ায় জিরকন পাওয়া যায়।

সারা বিশ্বের গোমেদ ও জিরকোনিয়াম উৎপাদন ও সরবরাহ সংক্রান্ত সঠিক হিসাব জানবার উপায় নেই। ঐ দুটি ধাতুই পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে প্রয়োজনীয় বিধায় ঐ সব হিসাব স্বাভাবিক কারণেই গোপন রাখা হয়। তবু যতদূর জানা গেছে তাতে দেখা যায় যে, সারা বিশ্বে প্রচুর পরিমাণে জিরকোনিয়াম আকর সঞ্চিত আছে। দেশ হিসাবে এক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই ৫০ থেকে ১৫০ লক্ষ টন জিরকোনিয়াম আকর সঞ্চিত আছে। আগামী ১০০ বছরে যত জিরকোনিয়াম প্রয়োজন হবে, ঐ সঞ্চয় তার চেয়ে অনেক বেশী বলে অনেকে মনে করেন।

ভারতের সঞ্চয়ও কম নয়। এখানেও ৫০ লক্ষ টনের চেয়ে বেশী জিরকোনিয়াম আকর পাওয়া যাবে বলে বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন। ব্রেজিলে ১০ লক্ষ টন ব্যাডেলাইটের সঞ্চয় আছে বলে অনুমান করা হয়েছে। গোমেদ আর ব্যাডেলাইট খনি থেকে উত্তোলন করার চেয়ে ঐ দুটি ধাতুর পিণ্ড পরিবহন ও বিপণন অনেক বেশী ব্যয়সাধ্য বলে অনেক দূর স্থানে, যেখানে অনেক বেশী গোমেদ ও ব্যাডেলাইট পিণ্ড আছে, কাজ আরম্ভ করা হয় নি।

বর্তমানে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনেই প্রধানতঃ জিরকোনিয়াম ব্যবহৃত হয়। কারণ হচ্ছে, এর অদ্ভুত ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা। তাছাড়া চেইন রিয়্যাকশনের জন্যে যে নিউট্রন দরকার হয়, জিরকোনিয়াম তাকে শোষণ করে নেয় না।

জিরোকোনিয়াম ইস্পাতের মতই শক্ত, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী হাল্কা। এটি রাসায়নিক দিক থেকে নিষ্ক্রিয়। পদার্থটি উত্তম তাপপরিবাহী। এর গলনাঙ্ক খুবই উচ্চ (প্রায় ১,৫৩০° সেন্টিগ্রেড)। আপেক্ষিক গুরুত্বও খুব উচ্চ (প্রায় ৬.৪)। ধাতুটি উবে যায় না। কয়েক শ্রেণীর ধাতু, রাসায়নিক পদার্থ, কাচ ও ধাতুমলের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা এর আছে। এসব গুণের জন্যেই গোমেদ আর জিরকোনিয়াম অতিমাত্রায় ভাল রিফ্র্যাক্টরী বলে গণ্য হয়।

উপরে যে সব গুণের কথা বলা হলো তা আছে বলেই গোমেদ আর জিরকোনিয়াম বিশেষ কতক-

গুলি কাজে লাগে ; যেমন—চুল্লীর আস্তরণের জন্যে, জেট ইঞ্জিনের আস্তরণের জন্যে, ধাতু গলাবার উচ্চ তাপসহ পাত্রে, তাপমান যন্ত্রবিশেষের টিউবে এবং হাই ফ্রিকোয়েন্সি ইণ্ডাক্টরের অন্তরণের জন্যে। পিণ্ড থেকে ধাতু নিষ্কাশন ও তা পরিষ্করণের জন্যে জিরকোনিয়াম এবং তার খাদ ব্যবহার করা হয়। মৃৎশিল্পে জিরকোনিয়ামের যৌগিক পদার্থ ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া চিক্কণ প্রলেপণের উপাদান হিসাবেও জিরকোনিয়াম ব্যবহৃত হয়। কাচীয় পোর্সেলিন সংযুক্তিতে, পারকাসন ক্যাপে ও ফ্ল্যাস পাউডারে জিরকোনিয়াম ব্যবহার করা হয়। অ্যালুমিনিয়াম গলাবার যন্ত্রপাতির জন্যেও গোমেদ পিণ্ড বিশেষ করে প্রয়োজন হয় ; কারণ গলিত অ্যালুমিনিয়ামের দ্বারা তা ভিজে যায় না।

এছাড়া আরও অনেক কাজে জিরকোনিয়াম ব্যবহৃত হয়। পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের কাজে যে জিরকোনিয়াম প্রয়োজন, সে কথা আগেই বলেছি। তাছাড়া এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জিরকোনিয়ামের জন্যেই যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক ডুবোজাহাজ নটিলাস এবং সি-উলফ নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল। তবে নতুন ধরণের ইস্পাত এবং অ্যালুমিনিয়াম খাদ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে বৃটেন যে পারমাণবিক সাবমেরিন তৈরী করেছে তাতে হয়তো তারা জিরকোনিয়াম ব্যবহার করে নি
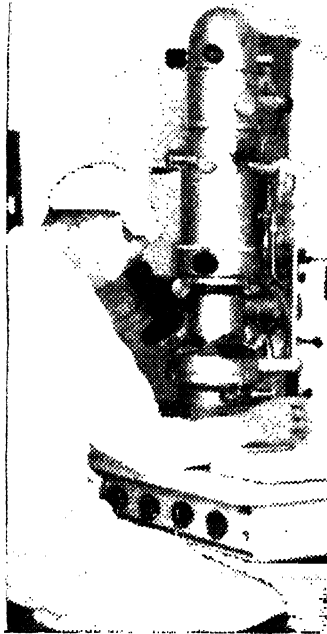
সেফিল্ডের ইস্পাত কারখানার গবেষণাগারে পদার্থের গঠন-প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্যে ১০০,০০০ গুণ পরিবর্ধনক্ষম এই ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপটি স্থাপিত হয়েছে।

বিকিরণে বিপত্তি

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

রাশিয়া ও আমেরিকা হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষা করতে লেগে গেছে। ইউরোপ ও এশিয়া খণ্ডের দেশগুলি শঙ্কিত হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। কেবল বোমার অপ্রমেয় ধ্বংসশক্তির কথা ভেবে নয়, যে দেশে বোমা পড়বে না, সে দেশও যে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তারই দুর্ভাবনায়। হিরোশিমা ও নাগাসাকি সহরের উপর পারমাণবিক বোমা পতনের ফল এবং পারমাণবিক শক্তির বিবিধ পরীক্ষালব্ধ ফল দেখেই মানুষের এই দুর্ভাবনা।

হিরোশিমা সহরের সাড়ে পাঁচশ' গজ উপরে বায়ুমণ্ডলে পারমাণবিক বোমা ফাটলো। তাতে সহরের পাঁচ মাইলের মধ্যে কোন কিছু আর আস্ত রইলো না। সাত মাইল দূর অবধি জিনিষ-পত্র ধ্বংস হলো। দু-লক্ষ লোক মারা গেল। দ্বিতীয় বোমাটি পড়লো নাগাসাকিতে। আট মাইলের মধ্যে কোন প্রাণী আর জীবিত রইলো না। ঘরবাড়ীর ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন পর্যন্ত থাকলো না। সাত মাইল উঁচু অবধি লেলিহান অগ্নিশিখা উঠলো। ইস্পাত-গলানো প্রচণ্ড তার উত্তাপ। মৃতের সংখ্যা পঁচাত্তর হাজারের উপর হলো।

হাইড্রোজেন বোমার ধ্বংস করবার ক্ষমতা আরও বেশী। হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর ১'০০৮; চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে একটি হিলিয়ামের পরমাণু সৃষ্টি করা গেল। তখন হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের প্রায় শতকরা ০'৮ ভাগ অংশ তিরোহিত হলো। বিজ্ঞান বলে, পদার্থের বিনাশ নেই। এক পদার্থ অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয়। এখানেও হাইড্রোজেনের অংশ বিনষ্ট হলো না। এখানে পদার্থ শক্তির রূপ নিল। হাইড্রোজেনের অংশ শক্তিতে রূপান্তরিত হলো। প্রচণ্ড এ শক্তির রূপ। পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণও পদার্থ থেকে শক্তি সৃষ্টির পরিচয়। সেখানে তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম পরমাণু থেকে জ্যোতিঃকণা বিকিরিত হয়। ইউরেনিয়াম পরমাণু অন্য পদার্থে পরিণত হয়। পদার্থ, শক্তির রূপে দেখা দেয়। এ শক্তির চাইতে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হওয়ার সময় উপজাত শক্তি আরও বেশী ধ্বংসকারী।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কৃত হয়। এরা মৌলিক পদার্থ। এদের বিশেষ ধর্ম এই যে, এদের পরমাণুগুলি আপনা আপনি ভেঙে গিয়ে নতুন মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করে। ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম প্রভৃতি এই জাতীয় পদার্থ। এদের পরমাণুর ভাঙন কেউ রোধ করতে পারে না এবং কমাতে বা বাড়াতেও পারে না। বিকিরিত জ্যোতিঃকণাগুলির স্বরূপ জানা গেল। তারা তিন রকমের—আল্‌ফা, বিটা আর গামা। আল্‌ফা কণার ভর হিলিয়াম পরমাণুর ভরের সমান। আল্‌ফা কণা দু-ভাগ পজিটিভ তড়িৎযুক্ত। এর গতি সেকেণ্ডে দশ হাজার মাইল। আল্‌ফা কণা পাত্‌লা অ্যালুমিনিয়াম চাদরের মধ্য দিয়ে যেতে পারে না। বিটা কণা একভাগ নেগেটিভ তড়িৎ-যুক্ত। এগুলি হাইড্রোজেন পরমাণুর চাইতে হাল্কা। ১৮৪৫টা বিটা কণার ভর একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের সমান। আল্‌ফা কণার মত এরও গতি সেকেণ্ডে দশ হাজার মাইল। বিটা কণা কিন্তু পাত্‌লা অ্যালুমিনিয়াম চাদরের ভিতর দিয়ে অনায়াসে চলে যেতে পারে। গামারশ্মি তড়িৎ-যুক্ত নয়। গামারশ্মি রঞ্জেনরশ্মির মত। রঞ্জেনরশ্মির চাইতে বেশী শক্তিশালী। গামারশ্মি দশ ইঞ্চি পুরু সীসার ভিতর দিয়ে অনায়াসে চলে যায়।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিবিধ ধর্মের কথা জানা গেল। তার সঙ্গে বিস্ময়কর নতুন কথা প্রকাশিত হলো। আদিকালের বিজ্ঞানী বলেছিলেন, পদার্থের বিনাশ নেই। এক পদার্থ থেকে অন্য পদার্থের সৃষ্টি হয়। বলেছিলেন, শক্তির বিনাশ নেই। এক শক্তি অন্য শক্তিরূপে প্রকট হয়। এ কালের বিজ্ঞানী বললেন, শুধু তাই নয়—পদার্থও শক্তিতে পরিণত হয়। সূর্যমণ্ডলে পদার্থ অহরহ শক্তিতে পরিণত হচ্ছে। হাইড্রোজেন, হিলিয়ামের রূপ নিচ্ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে হাইড্রোজেনের খানিক অংশ সূর্যের প্রচণ্ড শক্তিরূপে প্রকাশিত হচ্ছে। পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের সাহায্যে মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করা গেল। উদ্ভাবিত হলো পারমাণবিক বোমা। তার শক্তির দুরপনেয় পরিচয় পেল জাপানের অধিবাসীরা।

স্বাস্থ্যের পক্ষে এই বিকিরণ ক্ষতিকর। পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণে বিকিরণ সৃষ্টি হয়। প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি হয়। ঝড়ের বেগ সৃষ্টি হয়। ধরা যাক, একটা বিশ কিলোটন বোমা কলকাতা সহরের দু-হাজার ফুট উপরে বিস্ফোরিত হলো। কি হবে তখন? একমাত্র বিকিরণ লেগে ষোল হাজার লোক মরবে। আটচল্লিশ হাজার লোক তাপে পুড়ে মরবে। চল্লিশ হাজার ঝড়ের ধাক্কায় মরে যাবে। কেবল তাই নয়, কলকাতা থেকে ২২০ মাইল দূরেও লোক মরবে। দশ মাইল পরিধির ভিতর ঘড়বাড়ী, গাছপালা সব ধ্বংস হয়ে যাবে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ-মিশ্রিত ধুলা বায়ুমণ্ডলে ৮০,০০০ ফুট উঁচু অবধি ভেসে বেড়াবে। ২২০ মাইল লম্বা আর ২০ মাইল চওড়া জায়গা জুড়ে তেজস্ক্রিয় ধুলা রয়ে যাবে। তেজস্ক্রিয় পদার্থের আয়ুষ্কাল অবধি থাকবে। তেজস্ক্রিয় ষ্ট্রন্‌সিয়াম পরমাণুর আয়ুষ্কাল তিরিশ বছর। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন যে, সারা দেহে এক সময়ে ৬০০ রঞ্জেন বিকিরণ লাগলে মানুষ আর বাঁচে না। তার চেয়ে কম লাগলে অঙ্গহানি হয়। হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের এক ঘণ্টা পরে ২৫০ বর্গমাইল জুড়ে ৬২৫ রঞ্জেন বিকিরণ সব মানুষের দেহে লাগতে পারে। তাতে সবাই মরে যেতে পারে। ৬২৫ রঞ্জেন বিকিরণ লাগতে মাত্র পনেরো মিনিট সময় নেবে। উনিশ ইঞ্চি পুরু কংক্রিটের দেয়ালের পাশে আশ্রয় নিলে বিকিরণ কম লাগে; ২.৫ রঞ্জেনের বেশী লাগে না। তাতে প্রাণহানি হয় না।

বিকিরণে দেহকোষ আহত হয়। সুস্থ কোষ রুগ্ন হয়ে পড়ে। ক্যান্সার কোষ উৎপন্ন হয়। বিকিরণ স্বল্প পরিমাণে হলেও উপর্যুপরি লাগলে দেহকোষ ক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রথম প্রথম যে বিকিরণ লাগে তার পরিচয় তৎক্ষণাৎ পাওরা যায় না। অনেক সময় অনেক বছর পরে তার কুফল দেখা দেয়। বিকিরণ লাগাতে প্রাণীর প্রজননশক্তি কমে যেতে পারে। দেহে ক্ষত প্রকাশ পেতে পারে। ক্যান্সার হতে পারে। অকালে বার্ধক্য এসে যেতে পারে। রঞ্জেনরশ্মি বা বিকিরণ নিয়ে যেসব চিকিৎসক কাজ করেন, তাঁদের সন্তানাদি কম হয় বলে প্রকাশ। এক্ষেত্রে অবশ্য মতভেদ থাকতে পারে। ত্রিবাঙ্কুরে সমুদ্রোপকূলে তেজস্ক্রিয় পদার্থের আকর মোনাজাইট বালুকারাশি রয়েছে। তিরিশ বছর ধরে সেই বালুকারাশিতে বাস করলে, বালুকারাশি নিয়ে কাজ করলে প্রায় ৭০ রঞ্জেন বিকিরণ একজন মানুষের দেহে লাগা উচিত। সেখানে মৎস্যজীবীরা তো পুরুষানুক্রমে বালুকারাশির মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে! তাদের সন্তানাদির সংখ্যা তো কম দেখা যায় না!

বিকিরণ নিয়ে কাজ করবার ফলে অনেকেরই লিউকিমিয়া বা রক্তের ক্যান্সার হয়। রেডিয়াম আবিষ্কর্ত্রী ম্যাডাম ক্যুরী ও বিকিরণ নিয়ে গবেষণাকারিণী তাঁর কন্যা জোলিও-ক্যুরী, দু-জনই রক্তের ক্যান্সার রোগে মারা গেছেন। বিকিরণ নিয়ে চিকিৎসা করবার ফলে অনেক চিকিৎসকের লিউকিমিয়া হয়েছে বলে প্রকাশ। দীর্ঘদিন ধরে

সামান্য পরিমাণে স্বল্পক্ষণের জন্যে বিকিরণ লাগলেও তার সঞ্চিত কুফল অবশ্যই প্রকট হতে পারে। ডক্টর লরেন্স বলেছেন, হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণে লব্ধ বিকিরণ ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ বায়ুমণ্ডলে যতটুকু থাকে তাতে প্রাণীদের কোন ক্ষতি হতে পারে না। অতএব পৃথিবীর অধিবাসী নিশ্চিন্ত থাকুক। ডক্টর লরেন্স নিজে আমেরিকান। আমেরিকায় বিবিধ পরীক্ষালব্ধ ফলাফল কিন্তু অন্যরূপ। আমেরিকান চিকিৎসকেরা কিন্তু দেশবাসীকে এত বড় আশ্বাস দিতে পারছেন না।

পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা কোন উপায়ে রোধ করা যায় না। বিকিরণের কোন প্রতিষেধক এখনও জানা যায় নি। বিকিরণে আহত হলে তার কোন চিকিৎসা এখনও নেই। জাপানী চিকিৎসক মাসাও ৎসুজুকী সাত বছর আগে পারমাণবিক বোমার বিকিরণের ফলাফল সম্পর্কে যা বলেছেন, আজও তা সত্য। বিকিরণ থেকে রক্ষা পেতে হলে দেহে যাতে বিকিরণ না লাগে তার জন্যে সাবধান হতে হবে। বিকিরণে দেহকোষ আহত হলে দেহের নিজস্ব জীবনীশক্তির উপর সেরে ওঠবার ভার দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ই নেই। কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেরে ওঠবার আর কোন পথ নেই।

ডক্টর লরেন্স অভয় দিলেও মানুষ নিঃশঙ্ক হয় কি করে? অধ্যাপক জোলিও ক্যুরী যে, বলেছেন, বায়ুমণ্ডলে তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হবে। হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের ফলে উদ্ভূত তেজস্ক্রিয় ষ্ট্রন্‌সিয়াম-৯০-এর আয়ুষ্কাল তিরিশ বছর। তেজস্ক্রিয় ষ্ট্রন্‌সিয়াম বায়ুমণ্ডল থেকে ধূলা ও বৃষ্টিবাহিত হয়ে ক্রমে মাঠে ক্ষেতে এসে জমবে। গরু-মহিষে ঘাস খাবে। মানুষ সব্জী খাবে। অস্থিকোষে ষ্ট্রন্‌সিয়াম-৯০ ধীরে ধীরে সঞ্চিত হবে। অস্থি-র কোষ, মজ্জার কোষ রোগগ্রস্ত হয়ে অস্থি-র ক্যান্সার, রক্তের ক্যান্সার দেখা দেবে। ইংল্যাণ্ডের ওয়েল্‌সে মাঠঘাট তেজস্ক্রিয় ষ্ট্রন্‌সিয়াম সংক্রামিত হয়েছে। বৃটিশ সরকার মধ্যে মধ্যে গোদুগ্ধ ইত্যাদির তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা করবার ব্যবস্থা করেছেন। পররাষ্ট্র বিভাগের মিঃ লয়েড বলেছেন, হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণে এত ভয়ের কিছু নেই। এসব কেবল বিপক্ষ শক্তির ভিত্তিহীন ভয় দেখানো! তারা চায় না যে, ইংল্যাণ্ড পারমাণবিক শক্তিতে বলশালী হয়ে ওঠে। ক্যানবেরায় মিঃ কেসি বলেছেন, বৃটেন যেন লোকের কথা শুনে হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষা বন্ধ না করে। জেনেভাতে ভারতীয় চিকিৎসক লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়র সত্য কথাই বলেছেন যে, বিকিরণে বিপদের আশঙ্কা অবশ্যই আছে। তবে তার বহর কত, তা হয়তো সঠিক জানা নেই। তেজস্ক্রিয় পদার্থ দেহকোষে আশ্রয় নিলে সহজে দূরীভূত হয় না। এ তো পরীক্ষিত সত্য! হেগ থেকে অধ্যাপক বারলাগ পারমাণবিক বিস্ফোরণ সম্বন্ধে ওলন্দাজ সরকারকে অবহিত হতে বলেছেন। ঊর্ধ্বে নভোমণ্ডলে তেজস্ক্রিয় পদার্থের কণা সঞ্চিত হয়েছে। সেখান থেকে ধীরে ধীরে পৃথিবীতে ঝরে পড়ছে।

পারমাণবিক শক্তি কমিশন পারমাণবিক শক্তিকে তড়িৎশক্তিতে রূপায়িত করতে চান। তার জন্যে কলকারখানা, পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। বিকিরণ লেগে কর্মীদের স্বাস্থ্যহানি হতে পারে। সপ্তাহে ০·৩ রন্জেনের বেশী বিকিরণ লাগলে দুরারোগ্য রোগ সৃষ্টি হতে পারে। তাই কর্মীদের বিশেষ সতর্ক থাকতে হয়। বিকিরণ দেহে কোনক্রমে লাগতে দেওয়া হয় না। তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে কাজ করবার সময় রবারের দস্তানা পরা হয়। কলঙ্ক-না-পড়া ইস্পাতের পাত্রে, বিকিরণ শোষণ করতে পারে, এমন প্রলেপ মাখানো কাগজ বিছানো হয়। পরীক্ষাগারের মেঝেতে বা কাজ করবার টেবিলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ পড়লে তখনই মুছে নেওয়া হয়। কাজের সময় কর্মীরা সামনে সীসার পাত খাড়া করে রাখেন।

কারখানায় ধুলা ও ময়লা জল তেজস্ক্রিয় পদার্থে সংক্রামিত হয়। ঘরদরজা, টেবিলচেয়ার, দেয়াল, মেজে বিশেষ সাবধান হয়ে ধোয়ামোছা করতে হয়। ময়লা জল ও আবর্জনা নদীতে ফেলা বিপজ্জনক। জল তেজস্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তাতে নদীর মাছ তেজস্ক্রিয় হয়। মাছের দেহের ফস্‌ফরাস অংশ তেজস্ক্রিয় হয়। সেটা তেমন বিপজ্জনক নয়। তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাসের আয়ুষ্কাল মাত্র চৌদ্দ দিন। তাই মাছ ধরা, বাজারে আনা, বিক্রী হওয়া, কোটা-বাছা, রাঁধা-খাওয়ার মধ্যে চৌদ্দ দিন কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা। ততদিনে তেজস্ক্রিয়তা দূর হয়ে যায়। খরগোস, গিনিপিগ, ইঁদুর তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে পরীক্ষার কাজে লাগে। পরীক্ষার পর তাদের মৃতদেহে তেজস্ক্রিয় পদার্থ সংক্রামিত হয়। সেগুলি পুড়িয়ে ভস্ম মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। তেজস্ক্রিয় ময়লা জল ও আবর্জনা নদীতে ফেলা জনস্বাস্থ্যের হানিকর। তাই বড় বড় ট্যাঙ্কে করে সেই জল ভূগর্ভে পুঁতে ফেলা ভাল। কোন কোন পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা শতসহস্র বর্ষ অবধি বজায় থাকে। তাই মাটিতে পুঁতে ফেললেও বিপদ কাটে না। কোনক্রমে মাটি ভিজে গেলে তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে। সে মাটিতে ঘাস বা সব্‌জী জন্মালে তা তেজস্ক্রিয় পদার্থ সংক্রামিত হবে। গরুবাছুর, জীব-জন্তু সে তেজস্ক্রিয় ঘাস খেলে তাদের দেহকোষে তেজস্ক্রিয় পদার্থ আশ্রয় নেবে। তাদের দুধ বা মাংস খেলে মানুষের দেহে তেজস্ক্রিয় পদার্থ এসে পড়বে। জনস্বাস্থ্যেরও হানি হবে। বিশেষ করে শিশুরা আক্রান্ত হবে। হয়তো উত্তরকালে জননশক্তি হ্রাস পাবে; গর্ভধারণ শক্তি লোপ পাবে। আজকার চিকিৎসকেরা তাই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

কূটনীতিজ্ঞ পরীক্ষাগারের গবেষণালব্ধ ফলের সুযোগ নিচ্ছেন। ভুলে যাচ্ছেন, মারের তেমন সাবধান নেই! বিকিরণ তো তাঁদের সমীহ করবে না! প্রহারোদ্যত বজ্র সংবরণ করবার জন্যে দেবতারা স্তব করেছিলেন। আজ পারমাণবিক শক্তি সংবরণের জন্যে বিশ্বব্যাপী উপরোধ চলেছে।
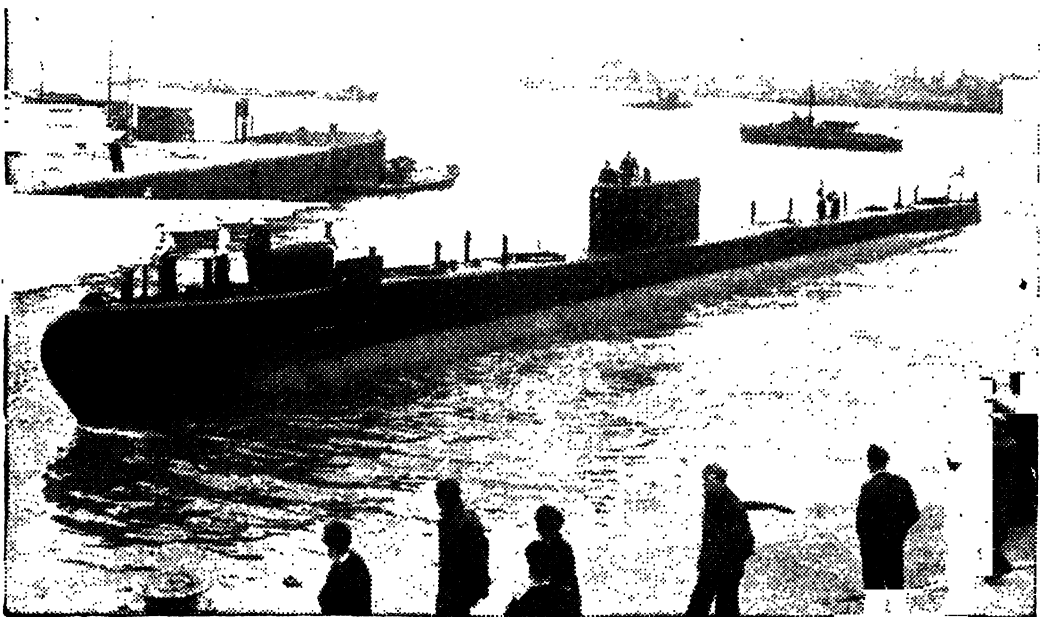
বৃটেনে নির্মিত দ্রুতগতিসম্পন্ন সাবমেরিন—এক্সপ্লোরার

মানুষ ও প্রকৃতি

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন মানুষ সর্বপ্রথম যা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিল তা হলো আকাশ ও পৃথিবী। অনন্ত রহস্যে ভরা এই বিশ্বপ্রকৃতি ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো মানুষের বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টির সামনে। মানুষ অবাক হয়ে দেখলো, রাত্রিশেষে পুবের আকাশ ক্রমশঃ লাল হয়ে ওঠে, আর প্রকৃতির বুক থেকে অন্ধকারের কালো আবরণ সরে যায়। একটু পরেই দেখা যায়, অপূর্ব বর্ণচ্ছটায় দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করে প্রকাণ্ড একটা থালার মত সূর্য দেখা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শান্ত সমাহিত পৃথিবীর বুকে জেগে ওঠে প্রাণের সাড়া; সমগ্র বনভুমি পাখীর কাকলীতে মুখরিত হয়ে ওঠে। অন্ধকারের মাঝে এই যে আলোর প্রকাশ, যা থেকে এক মুহূর্তে পৃথিবীর সব কিছুই সুন্দর, প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে তা দেখে মানুষের মনে অপূর্ব বিস্ময় জাগা, অপূর্ব পুলকের সঞ্চার হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই হিন্দু শাস্ত্রানুসারে সত্য, শিব ও সুন্দরের ধ্যানে মগ্ন হওয়ার এইটাই সবচেয়ে উপযুক্ত মুহূর্ত।

সূর্যই আমাদের জীবন ও কর্মের প্রেরণাদাতা। সূর্যের অফুরন্ত তেজশক্তিকে আশ্রয় করেই পৃথিবী হয়েছে শস্যশ্যামলা, ফুলে-ফলে ভরা, দিকে দিকে জেগে উঠেছে প্রাণের স্পন্দন। সূর্যরশ্মির সংস্পর্শে এসে পৃথিবী কলুষমুক্ত হয়, আমাদের দেহ-মন পবিত্র হয়। বাস্তবিক যুগ যুগ ধরে সূর্য আমাদের প্রভূত আলোক এবং তাপশক্তি দান করছে বলেই আমাদের প্রাণের স্পন্দন বজায় রয়েছে। সূর্যের অভাবে এই পৃথিবীর কি দশা হবে তা ভাবতেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এই শস্যশ্যামলা সুন্দর পৃথিবী অচিরেই অন্ধকার, তুহিনশীতল, জনপ্রাণীহীন মরুভূমিতে পরিণত হবে। প্রাচীন ঋষিগণ একথা সহজেই উপলব্ধি করেছিলেন; তাই তাঁরা সূর্যকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করতেন। তাঁদের মন্ত্র ছিল—"ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং; ধান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোস্মি দিবাকরং।" এছাড়া প্রত্যেকটি ব্রাহ্মণকে যে ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে হয় তাতে আছে—"ওঁ ভূর্ভব স্ব তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।" অর্থাৎ আমরা সেই সবিতার বরণীয় তেজঃ ধ্যান করি, যিনি আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করেন।

রাতের আকাশে যা সবচেয়ে সহজে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, সে হলো চাঁদ। সূর্য অস্তমিত হলে গোধূলির সোনা সরিয়ে জ্যোৎস্নার হীরা ঝরতে থাকে, লক্ষ কোটি তারার মুক্তা ফুটে ওঠে। নীলাম্বরীর আচল চুঁইয়ে আলো ঝরে ঝিরঝির। উঁচু পাহাড়ের চূড়া, নদ-নদী, বন-উপবন সব যেন এক কিরণ রেখায় ঝলমল করতে থাকে। চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় সমগ্র পৃথিবীর বরতনু যেন এক মোহময় মাদকতায় ভরে ওঠে।

বৈদিক ঋষিগণ ব্রহ্মের যে বিরাট রূপ বর্ণনা করেছেন, সূর্য ও চন্দ্রকে তাঁর দুটি চক্ষুরূপে কল্পনা করেছেন—"অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষি চন্দ্রসূর্যৌ"। এই পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু প্রকাশিত, তাই আমরা দেখতে পাই এই দুটি চক্ষুর সাহায্যে।

ঋগ্বেদে চন্দ্র সোমরূপে বর্ণিত হয়েছে।

সেখানে আছে—"সোম দীপ্তিমান; তাঁর জ্যোতি কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার নাশ করে। সোম সর্বদর্শী; সূর্য যেমন দিবা সকলকে রশ্মি দ্বারা পূর্ণ করেছে, সোম তেমনই দীপ্তি দ্বারা ছাবা পৃথিবী পূর্ণ করেন। নদী যেমন স্ফীত হয়, সোম তেমনই দেবগণের পানের নিমিত্ত স্ফীত হন। সোম পীযূষ, স্বর্গধামের শ্রেষ্ঠ পানীয়। পিতৃগণ সোম পান করেন। পৃথিবীর কেহ তোমায় পান করতে পায় না। হে দেব সোম! তোমাকে যে পান করা হয়, তাতে তোমার একেবারে ক্ষয় হয় না, আবার বৃদ্ধি হয়।" (আচার্য যোগেশ চন্দ্র বিদ্যানিধি প্রণীত "বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল" নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) বাস্তবিক চন্দ্র সম্পর্কে এর চেয়ে সুন্দর অথচ বাস্তব বর্ণনার কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

রহস্যময় এই প্রকৃতি! তাই একদিকে দেখতে পাই প্রখর রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিবা দ্বিপ্রহর, আর একদিকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় ভরা মোহময় রাত। এ দুয়ের মধ্যে কত প্রভেদ! একের চোখ ঝল্‌সানো রুদ্র রূপ, অন্যটির মনোমুগ্ধকর শান্ত, স্নিগ্ধ মূর্তি। চাঁদের রূপ গর্ব করবার মত, এটা ঠিক; কিন্তু এজন্যে সূর্যের দান কম নয়! সূর্য যদি তার অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে সব সময় প্রচুর সূর্যকিরণ বিলিয়ে না দিত তবে কোথায় থাকতো চাঁদের এমন রূপের গর্ব! অন্ধকার কালো আকাশে সে ঘুরে বেড়াতো ঠিকই, কিন্তু মর্ত্যের মানুষের কাছে তার এই সুন্দর, স্নিগ্ধ রূপ অপ্রকাশিত থেকে যেত চিরকালের মত। এজন্যে হিন্দুদের কাছে চাঁদের চেয়ে সূর্যই অধিকতর বরণীয়।

রাতের আকাশে শুধু কি চাঁদই আছে? দিনের আকাশে সূর্য ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু রাতের আকাশ অসংখ্য বৈচিত্র্যে ভরা। দিনের শেষে সূর্য অস্ত গেলে অন্ধকার কালো আকাশের গায়ে যেন অসংখ্য দীপ জ্বলে ওঠে। এদের মধ্যে আছে নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ, নীহারিকা এবং আরও কত কি! নক্ষত্রের আলো ম্লান, সর্বদাই যেন ঝিক্‌মিক্ করছে। এদের কোনটি সাদা, কোনটি নীল, কোনটি হলুদে, কোনটি লাল। এরা পরস্পরের তুলনায় স্থান পরিবর্তন করে বলে মনে হয় না। কিন্তু গ্রহগুলি স্থির থাকে না, নক্ষত্রের তুলনায় সরে সরে যায়। তাছাড়া গ্রহগুলি স্থিরভাবে উজ্জ্বল আলো দেয়, ঝিক্‌মিক্ করে না। বাস্তবিক ছায়াপথ, গ্রহ-উপগ্রহ এবং রূপময় নক্ষত্রমণ্ডল সব মিলিয়ে রাতের আকাশকে যে অপূর্ব মহিমায় মহিমান্বিত করে তোলে, তার কোন তুলনা নেই। রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে বিধাতার অপূর্ব রূপসৃষ্টি প্রত্যক্ষ করে মনে অভূতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হয়; মন চলে যায় প্রাত্যহিক তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে এক অনন্ত রহস্যলোকের পানে।

অসংখ্য তারকাখচিত রূপময় আকাশ স্মরণাতীতকাল থেকেই বিভিন্ন দেশের মানুষের মন বিস্ময়ে অভিভূত করেছে, তাদের কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছে। কিন্তু আমাদের দেশেই সম্ভবতঃ নক্ষত্র-চেনবার পালা সর্বপ্রথম সুরু হয়েছিল। আচার্য যোগেশচন্দ্র বলেছেন যে, আজ থেকে প্রায় ৫।৬ হাজার বছর আগে থেকেই যে এদেশে আকাশ পর্যবেক্ষণ করা হতো তার অনেক প্রমাণ আছে আমাদের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে ("আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। ভারতের মত মিশর, চীন প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও হয়তো প্রায় সেই সময় থেকেই আকাশ পর্যবেক্ষণের পালা সুরু হয়েছিল। অতি প্রাচীন ক্যাল্‌ডিয়ান জাতির জীবিকার প্রধান উপায় ছিল মেষপালন। তাদের খোলা মাঠে শুয়ে রাত জেগে ভেড়ার পাল পাহারা দিতে হতো; হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে এদের রক্ষা করতে হতো। রাতের বেলায় ঘাসের বিছানায় শুয়ে তারা হয়তো অবাক হয়ে দেখতো, অসংখ্য নক্ষত্রখচিত আকাশের রূপবৈচিত্র্য। কল্পনার

চোখে তারা দেখলো, আকাশের স্থানে স্থানে কতকগুলি নক্ষত্র মিলে যেন দলবেঁধে রয়েছে। এক একটি দলের বিভিন্ন নক্ষত্রকে কাল্পনিক রেখা দ্বারা যোগ করে পুরুষ, নারী ও নানাপ্রকার জীবজন্তুর আকার বলে কল্পনা করা হয়। কালক্রমে নক্ষত্র চেনবার এই প্রথা হয়তো অন্যান্য দেশের গুণী-জ্ঞানীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

নক্ষত্র শব্দের সাধারণ অর্থ তারা। এর বিশেষ অর্থ—এক বা একাধিক তারা সমন্বিত আকৃতি; আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে Constellation। আর এক অর্থ—চন্দ্রপথের দু-পার্শ্বে অবস্থিত ২৭টি বা ২৮টি নক্ষত্র; যেমন—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী ইত্যাদি। ঋষিগণ লক্ষ্য করেন যে, চন্দ্র এক এক রাত্রি এক এক নক্ষত্রে বাস করে এবং ২৭।২৮ দিন পরে, যে নক্ষত্র থেকে যাত্রা স্বরু করেছিল সেই নক্ষত্রে ফিরে আসে। ঋক্-সংহিতায় আছে—"অথো নক্ষত্রাণামেষামুপস্থে সোম আহিতঃ", অর্থাৎ নক্ষত্রদের মধ্যে সোমকে (চন্দ্র) স্থাপন করা হয়েছে।

পুরাণে আছে চাঁদের সঙ্গে অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী প্রভৃতি ২৭টি নক্ষত্রের বিয়ে হয়েছিল। তাই চাঁদ এক একটি নক্ষত্রের সঙ্গে এক একটি রাত্রি অতিবাহিত করেন। আজ সন্ধ্যার পর চাঁদকে এক নক্ষত্রের কাছে দেখা গেল, কাল সেই সময়ে তাকে আর একটি নক্ষত্রের কাছে দেখা যাবে। এইভাবে ২৭।২৮ রাত্রি পরে চাঁদকে আবার প্রথম নক্ষত্রের কাছে দেখা যাবে।

ঋষিগণ লক্ষ্য করেন, ২৭।২৮ দিনে চন্দ্র সব আকাশটা পরিক্রমণ করে' আবার পূর্বের জায়গায় ফিরে আসে। অতএব যতদূর সম্ভব সমান সমান দূরে অবস্থিত নক্ষত্রের সাহায্যে তাঁরা এই চন্দ্রপথ চিহ্নিত করেন। নক্ষত্রচক্রে ৩৬০°-কে ২৮ ভাগ করলে প্রত্যেকের পরিমাণ হয় প্রায় ১৩°। এখন ২৭টি নক্ষত্রের নাম পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ব্যবধান গড়ে প্রায় এই সংখ্যার কাছাকাছি হয়। পূর্বে ২৮টি নক্ষত্রের মধ্যে অভিজিৎকেও ধরা হতো। কালক্রমে অভিজিৎ এবং শ্রবণার মধ্যে ব্যবধান কমে যায় বলে তাকে পরিত্যাগ করা হয়। তাই এখন আমরা ২৭টি নক্ষত্রের বিষয়ই শুধু অবগত আছি।

চন্দ্রের এরূপ নক্ষত্র পরিক্রমা দেখেই পরে রাশিচক্রের কল্পনা করা হলো। এতে আছে মেষ, বৃষ, মিথুন প্রভৃতি বারোটি রাশি বা নক্ষত্রমণ্ডল। উক্ত নক্ষত্রের সওয়া দুটিতে মিলিয়ে হয় এক একটি রাশি। ঋষিরা লক্ষ্য করেন যে, আপাতদৃষ্টিতে সূর্য ক্রমে পশ্চিম থেকে পূবে সরে যায়। সেজন্যে সূর্য এক এক মাস এক এক রাশিতে অবস্থান করে এবং বারো মাসে বারোটি রাশি পরিক্রমণ করে' আবার মেষ রাশিতেই ফিরে আসে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্র অদৃশ্য হয়। তাহলে সূর্যের অবস্থান নির্ণয় করা হলো কেমন করে? ঋষিগণ এরও একটা চমৎকার উপায় আবিষ্কার করেন। পূর্ণচন্দ্র ও সূর্য পরস্পরের বিপরীত দিকে থাকে, অর্থাৎ তাদের মধ্যে ব্যবধান ১৮০°। যে নক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্র দেখা যাবে, তার পশ্চিমে চতুর্দশ নক্ষত্রে থাকবে সূর্য। যেমন—চন্দ্র রোহিণী নক্ষত্রে থাকলে সূর্য থাকবে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে, আবার চন্দ্র যদি থাকে ফল্গুনী নক্ষত্রে তবে সূর্য থাকবে ভাদ্র-পদায়।

ঋষিরা আরও দেখলেন, সূর্য প্রতিদিন পূব-দিকে এক জায়গায় উদিত হয় না। কখনও উত্তরে আবার কখনও দক্ষিণে সরে সরে যায়। এর নাম উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন।

পৃথিবীর অক্ষরেখা উত্তর ও দক্ষিণে বাড়িয়ে দিলে তা যে দুটি বিন্দুতে আকাশ স্পর্শ করে তাদের সুমেরু ও কুমেরু (Poles of the celestial equator) বলা হয়। দর্শকের স্থান থেকে যে ঊর্ধ্বরেখা কল্পনা করা যায় তা আকাশের যেখানে স্পর্শ করে তার নাম খ-মধ্য (Zenith) এবং খ-মধ্য ও দুই মেরু দিয়ে যে বৃত্ত রচনা করা যায়

তার নাম মধ্যরেখা (Meridian)। পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের সমান্তরালে আকাশ যে বৃত্ত রচনা করা যায় তার নাম বিষুববৃত্ত (Celestial equator)। সূর্যপথের নাম ক্রান্তিবৃত্ত (Ecliptic) এবং ক্রান্তিবৃত্তের মেরুর নাম কদম্ব (Poles of the ecliptic)। (প্রথম চিত্র দ্রষ্টব্য)।

বিষুববৃত্ত ও ক্রান্তিবৃত্ত তির্যকভাবে অবস্থিত; তাই তারা পরস্পরকে দুটো বিন্দুতে ছেদ করেছে। সেই দুটি ছেদ বিন্দুর নাম বিষুব বিন্দু (Equinox)। যেদিন সূর্য বিষুব বিন্দুতে উপস্থিত হয় সেদিন দিবা ও রাত্রি সমান হয়। সূর্য বসন্তকালে যে বিন্দুতে থাকে তার নাম বাসন্ত বিষুব (Vernal equinox) এবং শরৎকালে যে বিন্দুতে থাকে তার নাম শারদ বিষুব (Autumnal equinox)। আবার সূর্য যে দুই বিন্দুতে এসে উত্তর দিকে কিংবা দক্ষিণ দিকে যেতে আরম্ভ করে, সেই দুই বিন্দুকে বলা হয় অয়নাদি (অয়ন—গতি, আদি—আরম্ভ) বা অয়ন-বিন্দু (Solstice)। যে বিন্দুতে এসে সূর্য উত্তরাভিমুখ হয়, তার নাম উত্তরায়ণাদি (Winter solstice), আর যে বিন্দুতে এসে দক্ষিণাভিমুখ হয় তার নাম দক্ষিণায়নাদি (Summer solstice)।

আকাশের নক্ষত্রগুলি স্থির, কিন্তু বিষুববিন্দু স্থির নয়। সেটা ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে সরে যাচ্ছে। প্রায় ১২০০ বছরে একটা রাশি থেকে সরে অন্য রাশিতে বিষুবপাত ঘটে। আমাদের জ্যোতিষে একে বিষুব বিন্দুর চলন না বলে অয়ন-চলন বলা হয়েছে। ইংরেজীতে এর নাম Precision of the equinoxes। অয়ন-চলন আছে বলেই বৈদিক সভ্যতার কালনির্ণয় করা এবং পৌরাণিক কাহিনীগুলির সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

যেখানে ক্রান্তিবৃত্তের অর্ধেক বিষুববৃত্তের উত্তরে অবস্থিত, সেখানে বিষুবপাত হলে বলা হয় মহাবিষুব সংক্রান্তি। আমাদের শাস্ত্রে একে বলা হয়েছে উত্তরায়ণ দেবপক্ষ, অন্যটির নাম দক্ষিণায়ন পিতৃপক্ষ। আজ থেকে প্রায় ১,৫০০ বছর আগে ১লা বৈশাখ, অর্থাৎ সূর্য মেষরাশিতে এলে বিষুবপাত হতো। এজন্যে পঞ্জিকায় এখন যে পর্যায় প্রচলিত আছে তাতে মেষরাশি, অশ্বিনী নক্ষত্র এবং বৈশাখ মাসের নাম প্রথমে আছে। অয়ন-চলনের ফলে এখন আর তা হয় না। এখন মহাবিষুব সংক্রান্তি ঘটে ৭ই চৈত্র। আমাদের দেশে তাই এখন পঞ্জিকা সংস্কার করা হয়েছে এবং ৮ই চৈত্রকে ১লা চৈত্র ধরে সেদিন থেকেই বর্ষগণনার ব্যবস্থা প্রচলিত

প্রথম চিত্র

হয়েছে। এখন থেকে চৈত্র মাসই হবে বছরের প্রথম মাস। ঋগ্বেদের ঋষিরা প্রধানতঃ শক্তির উপাসনা করতেন। তাঁরা জগতে শক্তির অসংখ্য প্রকাশ দেখতে পান। যে বস্তুকে আশ্রয় করে শক্তির প্রকাশ, তাকে দিয়েই শক্তির নামকরণ হয়েছিল। তাই দেখা যায়, সূর্য এক হলেও তা কখনও বিষ্ণু, কখনও ইন্দ্র, কখনও দক্ষ, আবার কখনও ঋতুপতি আদিত্যরূপে পূজিত হতেন।

ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে, বর্ষচক্র চারটি ঋতুতে বিভক্ত। সেজন্যে আদিকালে চার আদিত্যের উত্তর গমন শেষ করে বর্ষা ঋতু আনেন তখন তাঁকে বলা হয় ইন্দ্র। আবার বিষুব বিন্দুতে এসে তিনি যখন দিবা ও রাত্রি সমান করেন তখন তাঁহাকে বলা হয় দক্ষ, অর্থাৎ নিপুণ।

পরলোকগত আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে বেদের দেবতাদের সম্বন্ধে যে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন তাতে তিনি দেখিয়েছেন যে, আকাশের প্রতিটি জ্যোতিষ্কই বেদে দেবতারূপে বর্ণিত হয়েছে। দেবতা শব্দের অর্থ দীপ্তিমান বা জ্যোতিষ্মান। আকাশে নক্ষত্র

২য় চিত্র

পিনাকপানি রুদ্র

দক্ষিণ কাঁধে মৃগশিরা; বামে—আর্দ্রা; ধনুর ঊর্ধ্বে—পুনর্বসু;
মধ্যে—প্রশ্বা; অধেঃ—লুব্ধক বা শ্বা।

উল্লেখ আছে। সেই সময় তিন মাসে এক ঋতু গণনা করা হতো। এই চার আদিত্য আবার একত্রে বিষ্ণু নাম পেয়েছিলেন। পরে যখন ছয় ঋতু গণনা করা হতো তখন ছয় আদিত্যের কল্পনা করা হয়েছিল। সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিনায়ন লক্ষ্য করে ঋষিরা হয়তো বুঝেছিলেন যে, বর্ষচক্র অতিক্রম করতে বিষ্ণুকে ত্রিপাদ অতিক্রম করতে হয় (চতুর্থ পাদে তিনি আবার স্বস্থানে ফিরে আসতেন)। তাই তাঁকে বলা হতো ত্রিবিক্রম। যখন তিনি সংখ্যাতীত; তাই বোধ হয় আমাদের দেবতাদের সংখ্যাও তেত্রিশ কোটি, অর্থাৎ যার কোন হিসাব করা সম্ভব নয়। ঋগ্বেদের দেবতা প্রত্যেকেই স্বর্গে থাকেন। কেউই অন্তরীক্ষ অথবা পৃথিবীতে থাকেন না। যাঁর দীপ্তি নেই, যিনি দিব্য লোকে থাকেন না তিনি দেবতা নন। নক্ষত্র হলো দেবতার অধিষ্ঠান ভূমি। কোন কোন নক্ষত্রের বেলায় তারার সন্নিবেশ দেখেই দেবতার রূপ কল্পিত হয়েছে।

ঋগ্বেদে বর্ণিত রুদ্রের কথা চিন্তা করা যাক। সেখানে তাঁর যে রূপ বর্ণিত হয়েছে তাতে আছে—"তিনি জটাধারী। তিনি সুনাসিক। তিনি ত্রিলোচন (কালপুরুষের মস্তকে তিনটি নক্ষত্র আছে), তিনি বীর, দৃঢ়াঙ্গ, উগ্র, দীপ্তিমান, হিরণ্যের ন্যায় উজ্জ্বল। তিনি তাম্রবর্ণ (আর্দ্রা তারার এই বর্ণ)। তিনি এক বাহুর দ্বারা গদা-ধারণ করেছেন (পরবর্তীকালে গ্রীষ্ম ঋতুতে তাঁর কর্ম প্রকাশিত হলে তিনি বজ্রবাহু হয়েছিলেন)। তিনি বাম বাহুর দ্বারা অস্ত্র (গদা কিম্বা বজ্র) এবং দক্ষিণ বাহুর দ্বারা জ্যাযুক্ত ধনু ধারণ করেছেন। এই ধনুঃ পিনাক।" বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে, কালপুরুষ নক্ষত্র দেখেই রুদ্রের এই রূপ কল্পিত হয়েছিল; আর এই মত সমর্থন করতে এখন কারো আপত্তির কারণ আছে বলে তো মনে হয় না! রুদ্রের মূর্তি উগ্র, ভয়ঙ্কর। রুদ্র শব্দ রুদ্ ধাতু (রোদনে) থেকে এসেছে। রোদয়তি (মনুষ্যান্) ইতি। মানুষ, গরু, ভেড়া প্রভৃতি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হতো; দৈবক্রমে সেই সময় রুদ্রেরও উদয় হতো। ঋষিগণ মনে করতেন, রুদ্র মড়কের কর্তা। তিনি প্রসন্ন থাকলে ভয় থাকবে না। তাঁর কাছে সুখকর ভেষজ আছে। তাই ঋষিগণ রুদ্রের কাছে আরোগ্য প্রার্থনা করতেন। রুদ্র যজ্ঞসাধক, তাঁর উদ্দেশ্যে যজ্ঞ হতো। তাঁকে স্তুতি ও হব্য অর্পণ করা হতো। ঋষিগণ দেবতাদের কাছে কাম্য অন্ন, ধন এবং অশ্ব ও গবাদি পশু প্রার্থনা করতেন। রুদ্রের কাছেও অন্ন ও সুখ প্রার্থনা করা হতো।

ঋষিগণ লক্ষ্য করলেন, উষার পূর্বে একটি নক্ষত্রের উদয় হলো। তখন বসন্তকাল। তাঁরা মনে করলেন, সেই নক্ষত্র বসন্ত ঋতুর কারণ। কার্যের অব্যবহিত পূর্বে ও তৎকালে যা নিয়ত দৃষ্ট হয়, তা সেই কার্যের কারণ। দেখা গেল, একটি বিশেষ নক্ষত্রের উদয়ের পর জ্বর ও সংক্রামক রোগ হয়। তাহলে সেই নক্ষত্রে নিশ্চয়ই কোন অদৃশ্য শক্তিমান পুরুষ অধিষ্ঠিত আছেন, যিনি এসব রোগের কারণ। তাঁর স্তুতি করলে, তিনি প্রসন্ন হয়ে রোগ নিবারণ করতে পারেন। এরূপ কার্য-কারণ সম্বন্ধের উপর নির্ভর করেই বেদের বিভিন্ন দেবতার রূপ এবং তাঁদের স্তুতি পরিকল্পিত হয়েছে। রুদ্র এক বিশেষ উদাহরণ।

প্রাচীন ঋষিরা কবি ছিলেন এবং তাঁরা উপমা-প্রয়োগেরও বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁরা একদিকে যেমন নক্ষত্রমণ্ডলগুলিকে মেষ, বৃষ প্রভৃতির আকারে কল্পনা করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি আবার আকাশের নক্ষত্র ও নক্ষত্রমণ্ডলগুলিকে কেন্দ্র করেই রচনা করেছিলেন কত বিচিত্র কাহিনী! বাস্তবিক কোন কোন ক্ষেত্রে কাছাকাছি অবস্থিত কয়েকটি নক্ষত্র যেন এসব কাহিনীর চিত্ররূপ চোখের সামনে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলে। এই প্রসঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানী জিন্‌স্ বলেছেন—

মনে হয় আকাশকে যেন ব্যবহার করা হয়েছে একটি স্থায়ী ছবির বইয়ের মত করে এবং তা যেন প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীর একটির পর একটিকে চিত্রে রূপায়িত করে রেখেছে।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এবং গ্রীক সাহিত্যে যে অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, তারই কয়েকটি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করছি। ছায়াপথের দু-পাশে অবস্থিত দুটি উজ্জ্বল নক্ষত্র ঋষিদের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ঋগ্বেদে এই দুটি নক্ষত্রকে যমের প্রহরী বলা হয়েছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও দুটি দিব্য শ্বার উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হলো শ্বা বা বৃহৎ কুক্কুর মণ্ডল, অন্যটি লঘু শ্বা বা ক্ষুদ্র কুক্কুর মণ্ডল। লোকমান্য তিলক এবং বিদ্যানিধির মহাশয়ের মতে, ছায়াপথই হলো সুরগঙ্গা, আকাশগঙ্গা বা বৈতরণী। দক্ষিণে দিগচক্রের কাছে সুরগঙ্গার মধ্যে আছে দিব্যনৌকা (Argo-navis) নক্ষত্রমণ্ডল। এর প্রথম প্রভার তারা অগস্ত্যকে সহজেই চেনা যায়। এই দিব্যনৌকায় বৈতরণী পার হয়ে পরলোকে যেতে হলে, অর্থাৎ

ছায়াপথ ধরে আকাশের দক্ষিণ সীমা থেকে উত্তর সীমায় যেতে হলে, প্রথমে শ্বা বা লুব্ধক এবং পরে প্রশ্বার সম্মুখীন হতে হয়। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, আকাশে প্রথমে শ্বা এবং তারপরে প্রশ্বার উদয় হয়। (৩য় চিত্র দ্রষ্টব্য)।

এবার ইন্দ্রের বৃত্রহত্যার গল্পটি আলোচনা করা যাক। বৃত্র নামে এক দানব ছিল। এর তিনি বৃষ্টির দেবতা, তাঁর জন্মকালে কখনও কখনও মেঘ ডাকতো। তিনি বজ্রহস্তে বৃষ্টিরোধকারী দানবকে হত্যা করে বারি মোচন করেন, আর দানবদের সঙ্গে যুদ্ধকালে বায়ু তাঁর সহায় হন। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে এসব লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং তার পরেই বর্ষা ঋতুর আবির্ভাব হয়। ইন্দ্র সূর্যকে পরাভূত করে তাঁর রথচক্র হরণ করেছিলেন;

৩য় চিত্র

ছায়াপথ ও বিভিন্ন নক্ষত্রমণ্ডল

একশতটি পুর বা দুর্গ ছিল। এর আকার ছিল বিরাট এক সাপের মত, কিন্তু তার হাত ও পা ছিল না। ইন্দ্র বজ্রদ্বারা বৃত্রকে হত্যা করে রুদ্ধ বারি মোচন করেন। এজন্যে ইন্দ্র বৃত্রহা নামে পরিচিত হন। বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে, সূর্যই ইন্দ্র। কিন্তু প্রতিদিনের সূর্য ইন্দ্র হতে পারে না। সুতরাং সে সময়ে সূর্য নিশ্চল হয়েছিলেন। এসব লক্ষণ দেখে বিদ্যানিধি মহাশয় বলেছেন, সূর্যের যে শক্তি দক্ষিণায়ন আরম্ভের দিনে বৃষ্টিদাতারূপে প্রকাশিত হন, তিনিই ইন্দ্র। বৃত্র বৃষ্টিরোধকারী সর্পের মত দীর্ঘদেহ ও হস্তপদহীন, দিব্যলোকে অবস্থিত, দৃশ্যমান কোন উজ্জ্বল পদার্থ। আকাশে

সর্পাকৃতি যে নক্ষত্রমণ্ডল আছে তাকেই বৃত্র বলে মনে করা যায়। ঋগ্বেদের বর্ণনা থেকে আরও বোঝা যায় যে, হস্তার পাঁচটি নক্ষত্রে বৃত্রের মস্তক এবং অশ্লেষা নক্ষত্রে তার পুচ্ছ আছে।

বৃত্রবধের অর্থ, বৃত্রের মস্তক থেকে পুচ্ছ পর্যন্ত সমগ্র দেহ সূর্যোদয়ের আগে অল্পক্ষণের জন্যে দৃষ্ট হয়েই উদীয়মান সূর্যের কিরণপ্রভায় অদৃশ্য হয়েছিল। বৃত্র বধকালে সূর্য ছিলেন চিত্রা নক্ষত্রে। ইন্দ্র দক্ষিণায়ন দিনে বৃত্রকে হত্যা করেন। এর অর্থ, তখন দক্ষিণায়ন দিন থেকেই বর্ষা আরম্ভ হয়। কিরণপ্রভায় বৃত্র অদৃশ্য হয়ে গেল। একেই বৃত্র-হত্যা বলা হয়েছে। ২৪শে মার্চ থেকে ৩রা জুলাই পর্যন্ত একশ' দিন; অর্থাৎ ইন্দ্র এক এক দিনে এক এক পুর হিসাবে বৃত্রের একশটি পুর ধ্বংস করে-ছিলেন। এজন্যে তাঁর আর এক নাম শতক্রতু (ক্রতু = বিক্রম)। জুলাই থেকে তিন মাস বৃত্রকে আকাশে দেখা যেত না, আর এই তিন মাস ধরে বৃষ্টি হতো। তাই ঋষিগণ কল্পনা করেছিলেন যে, বৃত্র বৃষ্টি রোধ করে রেখেছিল এবং ইন্দ্র বৃত্রহত্যা করেবারি মোচন করেন।
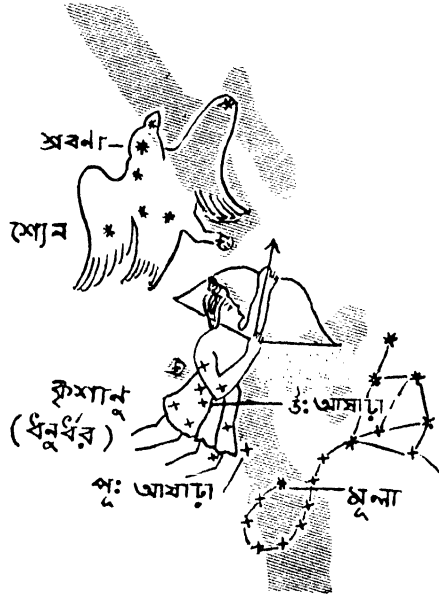
৪র্থ চিত্র

হিসাব করে দেখা গেছে, খৃঃ পূঃ ৬৩০০ অব্দে চিত্রা-নক্ষত্রে দক্ষিণায়ন হয়েছিল। সে বছর ২৪শে মার্চ সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা পরে পশ্চিম আকাশে বৃত্রের সমগ্র দেহটি দেখা গিয়েছিল। পরদিন ঐ বৃত্রের দেহের কিছু অংশ অস্ত ও অদৃশ্য হয়েছিল। এভাবে এক একদিন একটু একটু করে বৃত্রের সমগ্র দেহ অস্ত ও অদৃশ্য হয়েছিল। এরপর ৩রা জুলাই দেখা যায়, সূর্যোদয়ের একঘণ্টা আগে বৃত্রের মস্তক থেকে পুচ্ছ পর্যন্ত সমগ্র দেহ পূর্বাকাশে দৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই উদীয়মান সূর্যের

ঋগ্বেদের বৃত্র, গ্রীক পুরাণে হাইড্রা (সমুদ্র-সর্প) বলে পরিচিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে আছে যে, হারকিউলিস হাইড্রাকে বধ করেন। নক্ষত্র-পট পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, আকাশে অনেক দিন ধরে হাইড্রা ও হারকিউলিস নক্ষত্র-মণ্ডল দুটি একসঙ্গে দেখা যায়, কিন্তু পশ্চিম আকাশে হাইড্রা আগে অস্তমিত হয়। একেই হারকিউলিসের হাতে হাইড্রার মৃত্যু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের কালীয় নাগ দমনের যে কাহিনী আছে তার

সঙ্গেও এই ঘটনার বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। মনে হয়, একই ঘটনা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋষির কাছে বিভিন্ন রূপ নিয়েছিল।

ইন্দ্র ত্বষ্টা ও ত্রিশিরকেও বধ করেছিলেন। ত্বষ্টা চিত্রা নক্ষত্রের অধিপতি। ত্রিশির ত্বষ্টার পুত্র। তিনি ষট্‌চক্ষু এবং ত্রিশির। মনে হয়, চিত্রার দক্ষিণে অবস্থিত তিনটি নক্ষত্রই ত্রিশিরের তিনটি মস্তক। ইন্দ্র ত্বষ্টা বা ত্রিশিরকে বধ করেছিলেন। এর অর্থ, কোন এক সময় দক্ষিণায়ন আরম্ভের দিনে সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বে চিত্রা বা ত্রিশির উদিত হওয়া মাত্র উদীয়মান সূর্যের কিরণে অদৃশ্য হয়েছিল। সূর্য যখন দক্ষিণায়নাদি বিন্দুতে আসেন তখন ইন্দ্রের জন্ম হয়। হিসাব করে দেখা গেছে, খৃঃ পূঃ প্রায় ৭০০০ অব্দে চিত্রার উদয়কালে সূর্য (ইন্দ্র) বিশাখা নক্ষত্রে থাকতেন। তখন এইরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব।

ঋগ্বেদে শ্যেন পক্ষীদ্বারা সোম আহরণের একটি উপাখ্যান আছে। শ্যেনপক্ষী দ্যুলোক থেকে সোম আহরণ করে আনছিল। তাই দেখে কৃশাণু ধনুতে জ্যা-রোপণ পূর্বক শ্যেনের প্রতি শর নিক্ষেপ করেন। এর ফলে পক্ষীর একটি পাখা পড়ে গেল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে, দেবগণ গায়ত্রীকে সোম আনতে বলেন। তাই গায়ত্রী সোমরক্ষকগণকে ভয় দেখিয়ে দুই পা ও মুখ দিয়ে সোমকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেন। তখন কৃশাণু বাণ নিক্ষেপ করে তার নখ ছিঁড়ে দেন। সেই নখ শল্যক হয়।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে, এক সময় ইন্দ্র মূলা নক্ষত্রে নমুচি (বৃশ্চিক রাশির লেজে অবস্থিত) বধ করেছিলেন। সেদিন অমাবস্যা ছিল। এর একদিন বা দু'দিন পরে এক কলা চন্দ্র পূর্ব-আষাঢ়া নক্ষত্রে দেখা গিয়েছিল। কৃশাণু উত্তর-আষাঢ়া এবং শ্যেন পক্ষী শ্রবণা নক্ষত্রের অধিপতি। কৃশাণু ধনুর্ধর। তিনি ধনুর্বান দ্বারা শ্যেন পক্ষীর পাখা বা নখ ছিন্ন করেছিলেন। আকাশে ধনুরাশির উত্তরেই শ্যেন নক্ষত্রমণ্ডল অবস্থিত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শ্যেন পক্ষীর একটি পাখা এবং নখই শুধু ছায়াপথের মধ্যে পড়েছে। এই দুটি নক্ষত্রমণ্ডলকে লক্ষ্য করেই যে কবি

৫ম চিত্র

কল্পনা জাগ্রত হয়েছিল, সে বিষয়ে এখন আর কোন সন্দেহ নেই। (৪র্থ চিত্র দ্রষ্টব্য)।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতটি তারা সাতজন আর্য ঋষির নামে পরিচিত। এদের নাম—ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও মরীচি। পুলহ ও ক্রতুকে কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ করে সেই রেখাটি বাড়িয়ে দিলে যে উজ্জ্বল নক্ষত্রটির উপর দিয়ে যায় তারই নাম ধ্রুবতারা। বশিষ্ঠের খুব কাছে একটি ছোট্ট তারা দেখা যায়, এর নাম অরুন্ধতী। ইনি বশিষ্ঠের স্ত্রী। অন্য ছয়জন ঋষির প্রত্যেকেরই স্ত্রী ছিল। তাদের নাম—অনসূয়া, ক্ষমা, প্রীতি, শিবা ও লজ্জা। এই সাতজন মুনিপত্নীর মধ্যে শুধু অরুন্ধতী তার স্বামীর কাছে রয়েছেন, এর কারণ কি? এই সম্পর্কে একটি চমৎকার উপাখ্যান আছে।

অনেক দিন আগেকার কথা, অগ্নিদেব (বৃষ রাশির শৃঙ্গরূপে কল্পিত দ্বিতীয় প্রভার নক্ষত্রটির অধিপতি) একা একা আকাশে ঘুরে বেড়াতেন। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় তিনি এই সাতজন মুনিপত্নীকে দেখে মুগ্ধ হন। কিন্তু মুনিপত্নীরা তার আবেদন অগ্রাহ্য করেন। এতে অগ্নিদেবের খুব দুঃখ হলো। এর প্রতি-বিধানের জন্যে তিনি ঘোরতর তপস্যা সুরু করেন। এদিকে তপস্যারত অগ্নির তেজমণ্ডিত রূপ দেখে দক্ষের কন্যা স্বাহা মুগ্ধ হলেন। কিন্তু উপায় কি? কিন্তু অগ্নি তো আর কাউকে পেলে সন্তুষ্ট হবেন না! তাই তিনি ঋষিকে ভোলাবার উদ্দেশ্যে এক একদিন এক একজন মুনিপত্নীর রূপ ধারণ করে অগ্নির কাছে যেতে লাগলেন। এভাবে স্বাহা পর পর ছয়জন মুনিপত্নীর রূপ ধারণ করে অগ্নিকে ছলনা করলেন; কিন্তু তিনি বশিষ্ঠের স্ত্রীর অরুন্ধতীর রূপ ধারণ করতে সাহস পেলেন না।

সপ্তর্ষিদের মধ্যে একমাত্র বশিষ্ঠ বাদে বাকী ছয় জন ঋষি যখন তাঁদের স্ত্রীদের কলঙ্কের কাহিনী শুনলেন, তখন তাঁরা ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে তাঁদের আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দিলেন। এরাই আকাশে কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জে দল বেঁধে রয়েছেন। অরুন্ধতীর কোন ত্রুটি প্রকাশ পায় নি; তাই তিনি আজও স্বামীর পাশেই রয়েছেন। (৫ম চিত্র দ্রষ্টব্য)।

একই তারা সন্নিবেশ দেখে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাহিনী রচিত হয়েছিল, এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। বেদে অদিতির উল্লেখ আছে। অদিতিও দক্ষের কন্যা। একদা বাসন্ত বিষুব দিনে উষার পূর্বে কালপুরুষের উদয় হতো। ঋষি মনে করলেন, কালপুরুষই দিবা ও রাত্রি সমান করেছেন। কাজেই কালপুরুষ দক্ষ, অর্থাৎ নিপুণ। কালপুরুষের উদয়ের পরেই অদিতির উদয় হয়, অতএব অদিতি দক্ষের কন্যা। মনে হয়, সময়ান্তরে অদিতিই স্বাহা নামে পরিচিত হয়েছিল। বাস্তবিক, আকাশে সপ্তর্ষি, অদিতি, দক্ষ, অগ্নি, কৃত্তিকা প্রভৃতির অবস্থান লক্ষ্য করলে এই কাহিনীর সারমর্ম বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না।

এইবার গ্রীক পুরাণের কয়েকটি গল্প সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। হাজার হাজার বছর আগে দেবরাজ জুপিটার ওলিম্পাস পর্বতে থাকতেন। তাঁর স্ত্রী জুনো ছিলেন খুবই সুন্দরী। জুপিটার ছিলেন আমাদের ইন্দ্রের মত দেবতা। এরও প্রধান অস্ত্র ছিল বজ্র। পৃথিবীতে কেউ অন্যায় করলে জুপিটার পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে তার মাথার উপর বাজ ফেলতেন।

অনেক দিন আগে আর্কেডিয়ার রাজার একটি মেয়ে ছিল। তার নাম ক্যালিষ্টো। তখন পৃথিবীতে তার মত সুন্দরী আর কেউ ছিল না। তাই দেখে জুনোর খুব হিংসা হলো। যাতে ক্যালি-ষ্টোর রূপ নষ্ট হয়ে যায়, সেজন্যে জুনো সাধ্যমত চেষ্টা করতে লাগলেন। তাই দেখে জুপিটারের দয়া হলো। তিনি ক্যালিষ্টোকে একটি বড় ভালুকে রূপান্তরিত করে আকাশে স্থাপন করলেন। সেই থেকে রাজকন্যা ক্যালিষ্টো ঋক্ষরূপে (সপ্তর্ষি-

মণ্ডল) (Ursa major—Great Bear) আকাশে রয়েছেন। বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে, এই ঋক্ষ শব্দ থেকেই গ্রীক Arktos এবং তারপরে ল্যাটিন Ursa শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

ক্যালিষ্টোর একটি ছেলে ছিল, তার নাম আর্কাস। সে সব সময় বনেজঙ্গলে ঘুরে বাঘ, ভালুক, হরিণ প্রভৃতি শিকার করে বেড়াতো। তার মা যে ভালুকের আকৃতি নিয়ে আকাশে রয়েছে, একথা সে জানতো না। এক রাত্রে আকাশে এই ভালুকটিকে দেখে সে তাকে শিকার করবার উদ্দেশ্যে তীরধনুক হাতে নিল। তাই দেখে জুপিটারের মাথায় টনক নড়লো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আর্কাসকে একটি ছোট ভালুকে পরিণত করলেন এবং তাকেও আকাশে মায়ের কাছেই স্থাপন করলেন। একেই আমরা লঘু ঋক্ষ বা লঘু সপ্তর্ষিরূপে আকাশে দেখতে পাই। এই মণ্ডলের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রটিই ধ্রুবতারা বলে পরিচিত।

জুনো যখন ওলিম্পাস পর্বতে থাকতেন তখন ওরায়ন (কালপুরুষ) নামে একটি সাহসী ও বলবান শিকারী ছিল। সে দিন-রাত্রি হরিণ, বাঘ, ভালুক খরগোস প্রভৃতি শিকার করে বেড়াতো। জুনো ভাবলেন, এত সাহসী ও বলবান শিকারী থাকবে কেন? ওরায়নকে জব্দ করবার উদ্দেশ্যে তিনি একটা প্রকাণ্ড বৃশ্চিককে পাঠালেন। বৃশ্চিকের কামড় ওরায়ন সহ্য করতে পারলো না; বৃশ্চিকের বিষেই তার মৃত্যু হলো। আকাশের নক্সা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, যে সময়ে পশ্চিম আকাশে কালপুরুষ অবস্থান করে, সেই সময় পুব আকাশে বৃশ্চিক রাশির কিয়দংশ দেখা যায়। দিনের পর দিন কালপুরুষের কিছু কিছু অংশ অস্ত যেতে থাকে, আর বৃশ্চিক রাশির কিছু কিছু অংশ প্রকাশিত হতে থাকে। এভাবে যখন পুবদিকে বৃশ্চিক রাশি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, সেই সময় পশ্চিমদিকে কালপুরুষ অন্তর্হিত হয়। এটিই সম্ভবতঃ বৃশ্চিকের কামড়ে ওরায়নের মৃত্যু বলে বর্ণিত হয়েছে।

এরূপ আর একটা গল্প বলছি। অনেক দিন আগে পৃথিবীতে হারকিউলিস নামে এক বীর ছিলেন। তাঁর গায়ে এত জোর ছিল যে, তিনি অনায়াসে পৃথিবীকেও কাঁধের উপর ধারণ করতে পারতেন। হারকিউলিসের শক্তি ও সাহস দেখেও জুনোর ভীষণ হিংসা হলো। ওলিম্পাস পর্বতের গভীর জঙ্গলে একটা খুব বড় এবং অত্যন্ত বলশালী সিংহ ছিল। হারকিউলিসের উপর আদেশ হলো সেই সিংহটাকে শিকার করে আনতে হবে। হারকিউলিস তীর-ধনুক, গদা প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে সিংহ শিকারে বেরুলেন। সিংহের সঙ্গে হারকিউলিসের ভয়ঙ্কর লড়াই আরম্ভ হলো। হারকিউলিস যে তীর ছুড়লেন তা সিংহের গায়ে লেগে টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে গেল; গদার আঘাতেও সে কাতর হলো না। উপায়ান্তর না দেখে হারকিউলিস মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করলেন। শেষ পর্যন্ত সিংহ মরলো। আকাশে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, প্রথমে সিংহ রাশি, তারপর গদার আকারে বুয়েটিস মণ্ডল এবং তারপর হারকিউলিস মণ্ডলের উদয় হয়। এই নক্ষত্রমণ্ডলগুলি অনেক দিন ধরে আকাশে এক সঙ্গে দেখা যায়। শেষে একদিন সিংহ অস্ত এবং অদৃশ্য হয়ে যায়, কিন্তু তখনও আকাশে হারকিউলিসকে দেখা যায়। এজন্যে উপাখ্যানে বলা হয়েছে যে, হারকিউলিস মল্লযুদ্ধে সিংহকে হত্যা করেছেন। হিন্দু ও গ্রীক পুরাণে এইরূপ অনেক উপাখ্যান আছে, আর তাদের অনেকেরই চিত্ররূপ ফুটে রয়েছে আকাশের পটে।

বিদ্যানিধি মহাশয় একদিকে জ্যোতিবিজ্ঞান, অপরদিকে বেদ, পুরাণ এবং সামাজিক অনুষ্ঠান পদ্ধতিসমূহ মন্থন করে সংশয়াতীতরূপে প্রমাণ করেছেন যে, বেদ ও পুরাণের অসংখ্য দেবতা, তাদের স্তব বা কীর্তিকাহিনী, কোনটিই সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়, আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী এবং তাদের অবস্থানের সঙ্গে তাদের একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে এর অসংখ্য

প্রমাণ রয়েছে, কিন্তু নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বেদের মন্ত্র এবং পৌরাণিক কাহিনীগুলি বিচার না করলে এদের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এই রহস্য সমাধানের প্রধান চাবিকাঠি আমরা পেয়েছি বিদ্যানিধি মহাশয়ের কাছ থেকে। তিনি যে শুধু আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূত্র অনুসারে গণনা করে বৈদিক সভ্যতার কাল নির্ণয় করেছেন তা নয়, বিভিন্ন উপাখ্যানের সঙ্গে আকাশের সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর অবস্থান ও গতিবিধির সম্পর্ক নির্ণয় করে অসংখ্য তথ্য এবং প্রমাণাদিও উপস্থিত করেছেন। এগুলি একদিকে যেমন অকাট্য যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, অপর দিকে তেমনি প্রাচীন সাহিত্য ও সামাজিক অনুষ্ঠান পদ্ধতি সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করে আমাদের মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করে তোলে। আমরা বুঝতে পারি যে, প্রাচীন ঋষিরা প্রধানতঃ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁরা আকাশের অসংখ্য জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর সম্যক পরিচয় জানতেন, তাদের গতিবিধি সম্পর্কে নির্ভুল গণনা করতে পারতেন, আর আকাশের কোন বৈচিত্র্যই তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। বছরের পর বছর ধরে আকাশ পর্যবেক্ষণ করে তাঁরা যে জ্ঞানলাভ করেছিলেন তাই তাঁরা লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে। বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে প্রচ্ছন্ন-ভাবে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগুলি আমরা বিচার করে দেখতে পারি নি; তাই এদের সার-মর্মও আমরা এতকাল ঠিক উপলব্ধি করতে পারি নি। বিদ্যানিধি মহাশয়ের গবেষণার ফলে সভ্যতার ক্রমবিকাশের দিক দিয়ে ভারত আজ এক বিশেষ মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা যায়।

বৈদিক ঋষিরা যেমন সূর্য, চন্দ্র, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতার স্তব করতেন, তেমনি দ্যাবা-পৃথিবী, অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর স্তব ও প্রার্থনা করতেন। তাঁরা শস্যক্ষেত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতারও স্তব করতেন। বিশ্বসৃষ্টির পানে তাকিয়ে ঋষি বলেছেন—

'পৃথিবী, দ্যুলোক, জলসমূহ, সূর্য ও নক্ষত্রপূর্ণ বিশাল অন্তরীক্ষ আমাদের শ্রবণ করুন। মরুদ্‌গণ এবং নিশ্চল পর্বতগণ হব্য দ্বারা হৃষ্ট হয়ে আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন। আদিত্যগণের সঙ্গে অদিতি আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন, মরুদ্‌গণ আমাদের কল্যাণকর সুখ দান করুন।'

মানুষ ক্রমে উপলব্ধি করলো যে, তার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে, তার কৃষিকর্ম, তার রোগ-শোক ভালমন্দ সবকিছুর সঙ্গেই প্রকৃতির এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তারা গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ছয়টি ঋতুর অস্তিত্ব যেমন উপলব্ধি করলো তেমনি দেখলো, একটা নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে ঐ ঋতুগুলি আবার পর পর ফিরে আসে। কৌতূহলী মানুষের অনুসন্ধানের ফলে সূর্যের উত্তরায়ণের এবং দক্ষিণা-য়নের সঙ্গে ঋতুচক্রের আবর্তনের যোগসূত্র আবিষ্কৃত হলো। বোঝা গেল, সূর্যই ঋতু বিধান করছে। সূর্য প্রতিটি ঋতুর কর্তা, কাজেই তিনি ঋতুপতি আদিত্য। কৃষিকর্ম ছাড়া বেঁচে থাকা কঠিন। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। বর্ষা ঋতু কখন আসবে তা সঠিকভাবে না জানলে বীজ বপন ও শস্য উৎপাদন সম্ভব হয় না। আর সূর্যের অবস্থান না জানলে ঋতু পরিবর্তনের কথা ঠিকমত বলা যাবে কি করে? তাই নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে সূর্যের অবস্থান লক্ষ্য করে ক্রমশঃ বর্ষ গণনা, ঋতু গণনা এবং মাস গণনার সূত্রপাত হলো, আর বিভিন্ন ঋতু উৎসব ও সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তা স্মরণ করে রাখবার ব্যবস্থাও প্রচলিত হলো। ভারতবর্ষের মানুষ এইভাবে সভ্যতার পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল।

কিন্তু এইটুকু জেনেই মানুষের কৌতূহলের নিবৃত্তি হলো না। আকাশ ও পৃথিবীর অসংখ্য বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে প্রত্যেকটি চিন্তাশীল মানুষের মনে আরও নানাপ্রকার প্রশ্নের উদয় হতে

লাগলো। ঋতুচক্রের আবর্তন হচ্ছে—এর কারণ কি? অনাবৃষ্টি চলেছে—মানুষ, পশু-পাখী, বৃক্ষ-লতাদি তাপক্লিষ্ট হচ্ছে। বৃষ্টি হচ্ছে না কেন? আবার বৃষ্টি হচ্ছে তো হচ্ছেই—তার কোন বিরাম নেই, বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাতও হচ্ছে—এরই বা কারণ কি? গাছপালা সবুজ পত্র-পল্লবে ছেয়ে যায়, গাছে গাছে রং-বেরঙের ফুল ফোটে—দিনের পর দিন চন্দ্রের ক্ষয় হতে থাকে, কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পরে আবার পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়—এ সবের কারণ কি? এমনি শত শত জিজ্ঞাসা মানুষের মনকে অহরহ পীড়ন করতে লাগলো। এসব প্রশ্নের মীমাংসা করতে গিয়েই একদিন সুরু হলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা। মানুষ নিত্য নতুন জ্ঞান লাভ করতে লাগলো, কিন্তু তবুও তার জ্ঞানের পিপাসা মিটলো না। আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার তাই নতুন নতুন সম্পদে পূর্ণ হয়ে উঠতে লাগলো।

দেশ-বিদেশের জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ক্রমে বিজ্ঞানের অনেক শাখার সৃষ্টি হলো, এর ফলে তাদের পঠন-পাঠন এবং অনুশীলন আরও সহজ হলো। এই ভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, দর্শন শাস্ত্র প্রভৃতি ক্রমশঃ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্তু এতেও মানুষের সব সমস্যার সমাধান হয় নি। তারই সমাধান খুঁজতে গিয়ে মানুষ অবিরত এগিয়ে চলেছে সাধনার দুর্গম পথে। মানুষের কৌতূহলের যেমন শেষ নেই, তার এগিয়ে চলারও তেমনি বিরাম নেই। তাই আমাদের দেশের ঋষিদের শাশ্বত বাণী হলো—"চরৈবেতি, চরৈবেতি।" এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।
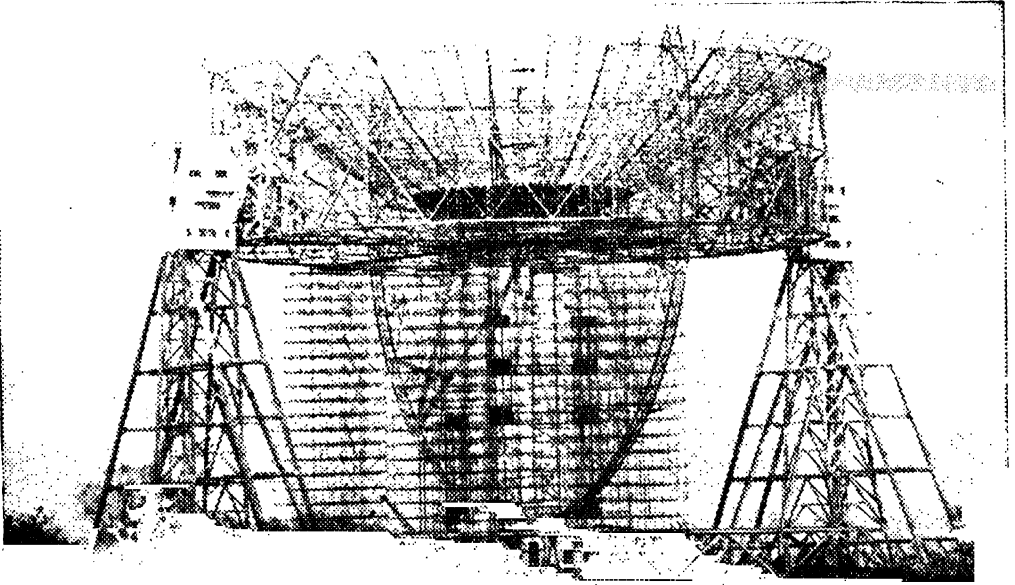
পৃথিবীর বৃহত্তম রেডিও-টেলিস্কোপ। ইংল্যাণ্ডের জড্রেল ব্যাঙ্কে পৃথিবীর বৃহত্তম রেডিও-টেলিস্কোপটির নির্মাণকার্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত যেসব রেডিও-টেলিস্কোপ তৈয়ারী হইয়াছে তাহাদের অপেক্ষা এইটি ১০ গুণ বেশী শক্তিশালী।

অ্যাসকরবিক অ্যাসিড

শ্রীবারিদবরণ ঘোষ

অ্যাসকরবিক অ্যাসিড বা ভিটামিন-সি জলে দ্রবণীয় ভিটামিন গোষ্ঠীর একটি অন্যতম উপাদান। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই ভিটামিনটি অনেক দিন থেকেই জনসাধারণের পরিচিতি লাভ করেছে। জাহাজের নাবিকদের মধ্যে স্কার্ভি রোগের প্রতিষেধক হিসাবে কাগজী লেবুর রস পানের প্রথা বহু দিন থেকেই প্রচলিত ছিল। ১৫২০ সালে অষ্ট্রিয়ান চিকিৎসক ক্র্যামার নির্দেশ করেন যে, স্কার্ভি রোগে লেবুর রস ব্যবহার করলে রোগ সেরে যায়। ১৭৯৫ সালে বৃটিশ নৌবাহিনীর জন্যে লেবুর আরক ব্যবহার করবার প্রথা সুরু করা হয়।

১৯২৪ সালে বৈজ্ঞানিক জিলভা এই ভিটামিনটি কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করেন এবং স্বাভাবিক ভিটামিন-সি থেকে তিনগুণ বেশী ঘনীভূত পদার্থ তৈরী করতে সক্ষম হন। ফিলম্যান্‌স্‌ ও হার্ক নামে দু'জন বিজ্ঞানী ১৯৩২ সালে লক্ষ্য করেন যে, স্কার্ভি নিবারণ করবার ক্ষমতা কতকগুলি স্বাভাবিক পদার্থ হেক্সইউরোনিক অ্যাসিডের সঙ্গে সাদৃশ্য সমন্বিত পদার্থের সহায়তায় সম্ভবপর। অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির অগভীর অংশ (Cortex) এবং বাঁধাকপি থেকে এই হেক্সইউরোনিক অ্যাসিডের মত পদার্থটি গাইরোগি ১৯২০ সালে স্বতন্ত্রীকরণে সক্ষম হন। এর কিছুদিন পরে কিং লেবুর রস থেকে কেলাসিত ভিটামিন-সি নিষ্কাশন করেন এবং প্রায়ই একই সময়ে গাইরোগি প্রকাশ করেন যে, হেক্সইউরোনিক অ্যাসিড স্কার্ভি প্রতিরোধে সক্ষম এবং ১৯৩৩ সালে এর নামকরণ করেন অ্যাসকরবিক অ্যাসিড।

ভিটামিন-সি বা অ্যাসকরবিক অ্যাসিড একটি সাদা কেলাসিত পদার্থ। এর স্বাদ অনেকটা কাগজী লেবুর মত। এটি জল ও অ্যালকোহলে দ্রবণীয় হলেও চর্বি জাতীয় জিনিষে দ্রবণীয় নয়। এই অ্যাসিডটি আজকাল কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। কৃত্রিম অ্যাসিডটি হচ্ছে আলফা-অ্যাসকরবিক অ্যাসিড। ভিটামিন-সি-এর সংক্ষেপিত রাসায়নিক গঠন হচ্ছে $C_6H_8O_6$।

সাধারণভাবে অ্যাসকরবিক অ্যাসিড জীবাণু, ঈষ্ট বা অন্যান্য ছত্রাকের শরীর বৃদ্ধির জন্যে দরকার করে না। তবে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে কয়েক শ্রেণীর জীবাণুর বৃদ্ধিসাধনে অ্যাসকরবিক অ্যাসিড সাহায্য করে থাকে। কতকগুলি পরাশ্রয়ী প্রোটোজোয়া এই অ্যাসিডটি নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে বলে জানা গেছে। উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে গিনিপিগ ও মানুষের পক্ষে এই ভিটামিনটি অপরিহার্য। কিন্তু ইঁদুর জাতীয় জন্তুর পক্ষে এই ভিটামিনটি না হলেও চলে।

ভিটামিন-সি-এর অভাবে স্কার্ভি রোগটি হয়। এই রোগে শারীরিক দুর্বলতা, গাঁটে ব্যাথা আর রক্তমোক্ষণের স্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আগে সুষম খাদ্যের অভাবে নাবিকদের মধ্যে রোগটির প্রকোপ ছিল সর্বাধিক। অম্লাত্মক ফল, যেমন—কমলালেবু, কাগজী লেবু, টোমাটো, বাঁধাকপি, ষ্ট্রবেরী, মূলা, লঙ্কা, কলা, আলু, দুধ, মাংস ও ডিম প্রভৃতি খাদ্যের মধ্যে কম-বেশী ভিটামিন-সি পাওয়া যায়।

ভিটামিন-সি-এর কয়েকটি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম হলো যে, এই ভিটামিনটি দেহের কোষসমূহের কার্যকারিতা বজায় রাখতে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করে। তাছাড়া সূক্ষ্ম রক্তবাহী

নালিকার অন্তরাবরণ যে সব কোষ দ্বারা গঠিত, তার ঐক্যসাধনের ক্ষমতা বজায় রাখে। ভিটামিন-সি মজ্জা থেকে লাল রক্তকণিকা গঠনেও অংশগ্রহণ করে থাকে। রোগ সংক্রমণের বিরুদ্ধে এর ক্ষমতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ভিটামিন-সি-এর সঙ্গে ভিটামিন-পি-এর সাদৃশ্যগত বৈশিষ্ট্যের জন্যে এই ভিটামিনটি রক্তমোক্ষণ হলে জমে যাওয়ার যে স্বাভাবিক ব্যবস্থা আছে, তাতেও অংশগ্রহণ করে থাকে।

প্রধানতঃ স্কাভি ছাড়া ভিটামিন-সি আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। সেগুলি হচ্ছে, পায়োরিয়া, দন্তক্ষয়, ক্ষুধামান্দ্য, রক্তাল্পতা ও আরও অনেক অপুষ্টিজনিত রোগ। এছাড়া অন্তঃস্বত্বা মায়েদের ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শরীর গঠনের জন্যে এই ভিটামিনটির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এছাড়াও পাকাশয়ের ক্ষত, অ্যালার্জি, রক্তমোক্ষণের রোগ, রক্তচাপ, আর্সেনিক ও সীসা জাতীয় ঔষধ দ্বারা সংঘটিত কুফল নিবারণে ভিটামিন-সি-এর ব্যবহার প্রচলিত আছে।

মানবদেহের পক্ষে ভিটামিন-সি-এর দৈনিক প্রয়োজন সাধারণতঃ ৫০ থেকে ৭৫ মিলিগ্র্যাম। কিন্তু এই ভিটামিনটির ঘাটতি হলে বা রোগ সংক্রমণ নিবারণে প্রয়োজন ঘটলে এর পরিমাণ ক্ষেত্রবিশেষে ১০০, ২০০ বা ৫০০ মিলিগ্র্যাম পর্যন্ত দৈনিক ব্যবহার করা হয়।
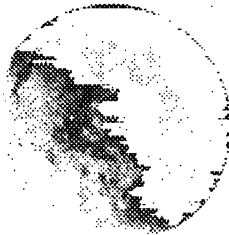
ছবিটি চন্দ্রের ফটোগ্রাফ। যখন চন্দ্রের ছবিটি তোলা হয় ঠিক সেই সময়ে ইউ. এস. বিমানবাহিনীর এফ-১০২এ জেটবিমানটি তার পরীক্ষামূলক উড্ডয়নকালে ক্যামেরার বরাবর আসিবার ফলে এই ছবিটি পাওয়া যায়। ছবিটি দেখিয়া মনে হয় যেন চন্দ্রের উপরদিকে জেট ফাইটারটি উড়িয়া যাইতেছে।

বিজ্ঞান সংবাদ

সোভিয়েট রাশিয়ায় বিজ্ঞানের অগ্রগতি

বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষায় পৃথিবীতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবার জন্য সোভিয়েট রাশিয়া বদ্ধপরিকর হইয়াছে বলিয়া এক খবরে প্রকাশ। সুপরিকল্পিত উপায় এবং কার্যসূচী অবলম্বনে সোভিয়েট বিজ্ঞানী ও রাজনীতিজ্ঞেরা ইউনাটেড-স্টেট্‌সের নিকট হইতে যে বিজ্ঞানের নেতৃত্ব ছিনাইয়া লইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন, সে সম্বন্ধে আর কাহারও সন্দেহ নাই। বর্তমানে সোভিয়েট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানী ও কারিগর তৈয়ারী হইতেছে। ইউনাইটেড স্টেট্‌সে বৎসরে যত ছাত্র বিজ্ঞানবিদ্ হইয়া বাহির হইতেছে, সোভিয়েট রাশিয়াতে তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ ছাত্র প্রতিবৎসর বাহির হইতেছে। তবে ইউনাইটেড স্টেট্‌সের ন্যায় রাশিয়াতেও এখনও উপযুক্ত সংখ্যক বিজ্ঞানকর্মীর অভাব রহিয়াছে।

সায়েন্স সার্ভিসের একজন সদস্য সোভিয়েট অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞাসা করেন যে, রাশিয়াতে বিজ্ঞানকর্মীর অভাব আছে কিনা। ইহার উত্তরে তিনি বলেন, সোভিয়েট ইউনিয়নে বিভিন্ন উৎপাদন বিভাগের উন্নয়ন এতই ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে যে, ইহার জন্য আমরা যতই বিজ্ঞানকর্মী তৈয়ার করি না কেন, তাহা কোন দিনই উদ্বৃত্ত হইবে না। বর্তমানে সোভিয়েট রাশিয়ায় তিনটি বিষয়কে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের প্রেসিডেন্টের উত্তর হইতে ঐ গুলির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

১। সোভিয়েট পরিকল্পনাগুলিকে সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করিয়া পৃথিবীর বিজ্ঞানক্ষেত্রের নেতৃত্ব ইউ. এস-এর নিকট হইতে ছিনাইয়া লইতে হইলে সোভিয়েট রাশিয়ার বিজ্ঞানকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

২। আমেরিকায় মোটর গাড়ী তৈয়ার করিবার মতই সোভিয়েট রাশিয়ায় বিজ্ঞানকর্মী উৎপাদন করা চলিতেছে।

৩। সোভিয়েট রাশিয়ায় বিজ্ঞানকর্মীদের রাজনীতিজ্ঞদিগের সমপর্যায়ে স্থান দেওয়া হইয়াছে। কৃষিপ্রধান দেশকে দ্রুত শিল্প ও বিজ্ঞানে উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে এই সকল পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে।

এই প্রচেষ্টায় শিক্ষাক্ষেত্রের ব্যবস্থার পরিবর্তন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যতালিকার মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ বিজ্ঞান। মাধ্যমিক স্কুলের পাঠ্যগুলি শতকরা ৪০ ভাগ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়। ছাত্রদের প্রথম হইতেই বিজ্ঞান অনুরাগী করায় ফলও হইয়াছে খুব সাফল্যজনক। ১৯৫৬ সালে রাশিয়ায় ৬৩০০০ ছাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে। ১৯৫২ সালে সেস্থলে মাত্র ৩০০০০ ছাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় পাশ করিয়াছিল। অনুরূপ সময়ে আমেরিকার কলেজ-গুলিতে মোট ৩০০০০ ও ২৩০০০ ছাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিয়াছে।

ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানকর্মী তৈয়ারী করিবার জন্য রাশিয়াতে পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম কারখানা প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ৩২-তলা অতিকায় মস্কো ইউনিভার্সিটি হইল সেই কারখানা। সেখানে কেবলমাত্র বিজ্ঞান শিক্ষাই দেওয়া হইয়া থাকে। ঐ ইউনিভার্সিটির মধ্যে ১৬৯৩টি গবেষণাগার, ২১টি বক্তৃতা গৃহ, ১৪১টি প্রবন্ধ পাঠের গৃহ, ৬০০০ বাসা-বাড়ী এবং ১২০০০০০ পুস্তকের একটি

গ্রন্থাগার রহিয়াছে। প্রায় ৯০০০ আণ্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্র ঐ ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞান ক্লাসে শিক্ষা লাভ করে। তাহাদের জন্য ২৩০০ শিক্ষক নিযুক্ত আছেন।

বর্তমানে ইউনাইটেড স্টেট্সে রাশিয়া অপেক্ষা অধিকসংখ্যক বিজ্ঞানী আছেন। ১৯৫৫ সালে সারা ইউনাইটেড স্টেট্সে বিভিন্ন বিজ্ঞানক্ষেত্রে নিয়োজিত ১৫৩৬০০০ গ্রাজুয়েট বর্তমান আছেন। রাশিয়াতে সেস্থলে অনুরূপ বিজ্ঞান শিক্ষাপ্রাপ্ত ১১৫৮০০০ কর্মী বর্তমান।

রাশিয়ায় বিজ্ঞান শিক্ষার এইরূপ ঘটা দেখিয়া আমাদের মনে কয়েকটি প্রশ্ন উঠা খুবই স্বাভাবিক—আমাদের দেশ শতকরা ৫০-এরও কম ছাত্র পরীক্ষায় পাশ করিয়া বিজ্ঞান গ্র্যাজুয়েট হইবার পর কেরাণীগিরি বা সাধারণ কোন ব্যবসায়ের সুযোগ পাইলে নিজেকে ধন্য মনে করে। কিন্তু অনেকেই এইরূপ সুযোগ না পাইয়া রাস্তায় রাস্তায় বা এম্প্লয়মেণ্ট বুরোতে ফ্যা ফ্যা করিয়া ঘুরিতে থাকে। আবার লব্ধপ্রতিষ্ঠ কর্তাদের বক্তৃতায়—তোমরা চাষ করিয়া ও পরিশ্রম করিয়া খাইতে থাক—এইরূপ উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হয়। ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানকর্মী তৈয়ারী করিবার ফলে রাশিয়াতেও এইরূপ ঘটে কি না—দেখিবার বিষয়।

কিন্তু মস্কোর সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, সোভিয়েট রাশিয়ায় বিজ্ঞানকর্মীদের বসাইয়া রাখিয়া বা অন্য কোন কাজে নিয়োগ করিয়া জাতীয় অর্থের অপচয় হইতে দেওয়া হয় না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা হইয়াছে যে, মস্কো ইউনিভার্সিটি হইতে কোন ছাত্র রসায়ন বিদ্যার গ্র্যাজুয়েট হইলে তাহাকে অন্ততপক্ষে তিন বৎসর রসায়ন সংক্রান্ত কোন কাজে নিযুক্ত থাকিতে বাধ্য করা হয়। তারপর সে ইচ্ছামত কাজে ভর্তি হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও দেখা গিয়াছে যে, রাশিয়ায় কোন ইঞ্জিনিয়ার বা কোন বিজ্ঞানী সারাজীবন তাহার শিক্ষাপ্রাপ্ত ক্ষেত্রেই কাজ করিয়া থাকে।

দিনমানের বিস্তৃতি উদ্ভিদের বৃদ্ধির নিয়ামক

দিনমানের বিস্তার বা সংকোচনের প্রভাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধির তারতম্য ঘটিয়া থাকে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইউ. এস. কৃষিবিভাগের বিজ্ঞানীরা এই তথ্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, বৃক্ষাদি যদৃচ্ছ রোপণ না করিয়া পৃথিবীর দ্রাঘিমা হিসাবে উপযুক্ত গাছ রোপণ করিলে অধিকতর সুফল পাওয়া যাইতে পারে।

সাধারণতঃ দিনমানের ব্যাপ্তি হ্রাস করিলে গাছের বৃদ্ধি স্থগিত হইয়া যায় এবং দিনমানের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করিলে দ্রুতগতিতে গাছ বৃদ্ধি হইতে থাকে। কৃষিবিভাগের বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন গাছকে অল্প ও দীর্ঘ পরিসর দিনের মধ্যে রাখিয়া উহাদের বৃদ্ধির পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করেন। আট ঘণ্টা স্বাভাবিক দিনের আলোককে অল্পপরিসর দিন বলিয়া ধরা হইয়াছে এবং আট ঘণ্টার পর আরও কয়েক ঘণ্টা কৃত্রিম আলোক প্রয়োগ করিয়া বিভিন্ন দীর্ঘপরিসর দিন সৃষ্টি করিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে।

পরীক্ষার ফলে প্রকাশ যে, কতকগুলি গাছ ১৬ ঘণ্টা দিনের আলোক পাইলে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই ধরণের গাছ হইল—আমেরিকান এল্ম্, রেড্ ম্যাপ্ল্, ক্যাটাল্পা, এথিয়ান হোয়াইট বার্থ, টিউলিপ পপ্লার ও ডগ উড্। হর্স চেষ্টনাট্, পাউশেনিয়া এবং সুইট গাম্ প্রভৃতি উদ্ভিদকে ১৬ ঘণ্টা দিনের আলোকে রাখিলে উহাদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

সাধারণতঃ অধিকাংশ গাছ আট-ঘণ্টা-দিনে চার সপ্তাহ থাকিলে উহাদের বৃদ্ধি থামিয়া যায়। তবে বিভিন্ন জাতি হিসাবে এই প্রভাবের বেশ তারতম্য ঘটে। টিউলিপ-পপ্লার আট-ঘণ্টা দিনে দশ দিন থাকিলেই বৃদ্ধি থামিয়া যায়। কিন্তু ঐ অবস্থায় এল্ম্ গাছের ১৪০ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি চলিতে থাকে।

মরুভুমিতে জল সংরক্ষণ

দারুণ গ্রীষ্মের সময় খাল, বিল ও পুকুরের জল দিনের পর দিন কমিয়া যাইতে থাকে। তাছাড়া অধিক দিন ধরিয়া গ্রীষ্ম চলিতে থাকিলে ছোটখাটো অনেক পুকুর একেবারেই শুকাইয়া যায়। সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে বাষ্পীভূত হইয়া এত জল দ্রুত আকাশে উঠিয়া যায়।

অষ্ট্রেলিয়ার মরুভূমি অঞ্চলে নভেম্বর হইতে মার্চ পর্যন্ত প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময়েও বাষ্পীভবন নিবারণ করিয়া জল সংরক্ষণ করিবার এক অভিনব ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া এক সংবাদে প্রকাশ। কমনওয়েল্‌থ্ সায়েণ্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল রিসার্চ সংস্থা এই অভিনব উপায়টি উদ্ভাবন করিয়াছেন।

জলাশয়গুলির জলের উপরিভাগে তিমি মাছের তেল হইতে নিষ্কাশিত সেটিল অ্যালকোহল ফেলিয়া একটি সূক্ষ্ম স্তর উৎপাদন করা হয়। ইহার ফলে জলের বাষ্প বাতাসে আসিতে পারে না, কিন্তু বাতাসের অক্সিজেন জলে প্রবেশ করিয়া জলকে পরিষ্কার রাখে।

সেটিল অ্যালকোহলের স্তরটি চোখে দেখা যায় না এবং উহার কোন স্বাদ নাই। প্রাণীদেহের পক্ষে ইহা মোটেই ক্ষতিকর নহে।

পরীক্ষাগারের পরিবেশে এই রাসায়নিক পদার্থটি জলের শতকরা ৮০ ভাগ বাষ্পীভবন নিবারণ করে বলিয়া দেখা গিয়াছে। গত দুই বৎসর ধরিয়া ড্যাম ও ছোটখাটো জলাশয়ে ইহা প্রয়োগ করিয়া শতকরা ২০ ও ৭০ ভাগ বাষ্পীভবন নিবারণ করে বলিয়া জানা গিয়াছে।

স্বাভাবিক অবস্থায় অষ্ট্রেলিয়ার ঐ সব মরু অঞ্চলে বৎসরে এত অধিক পরিমাণ জল গ্রীষ্মকালে বাষ্পীভবনে হ্রাস পায় যে, কোন কোন বৎসর বৃষ্টিপাতেও এত পরিমাণ জল সম্পূরণ হয় না।

পাকস্থলীর ক্ষত-নিরাময়কারী ঔষধ

নিউইয়র্কের এক খবরে প্রকাশ, পাকস্থলীর ক্ষত নিরাময়ের এক ফলপ্রদ নূতন ঔষধ বাহির হইয়াছে। এই ঔষধ ব্যবহার করিলে রোগীর পক্ষে তাহার পছন্দমত খাদ্য খাইতে কোন বাধা থাকে না। এক্সাল নামক এই ঔষধটি ডেনমার্ক, ইটালী ও ক্যানাডায় কিছুকাল যাবৎ ব্যবহৃত হইতেছে।

ঔষধটির প্রধান উপাদান হইল নুপ্রা নামক একটি জান্তব রাসায়নিক পদার্থ। বিশ বৎসর পূর্বে ভিটামিন-কে সংক্রান্ত গবেষণার সময় ইহা আবিষ্কৃত হয়। গরু, ভেড়া বা ছাগলের লিভার, মস্তিষ্ক ও অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি হইতে কোন কোন রাসায়নিক দ্রাবকের সাহায্যে ইহা নিষ্কাশন করা হইয়া থাকে।

কোপেনহেগেন ইউনিভার্সিটির ডাঃ জার্লোভ রোগীদের উপর দুই বৎসর যাবৎ এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া এক বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি বলেন, ৪৭ জন রোগীর মধ্যে ৩০ জনের উপর ঔষধটি বেশ সাফল্যজনকভাবে কাজ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে সকলেই নিজেদের পছন্দমত খাদ্য ব্যবহার করিয়া বেশ স্বচ্ছন্দে আছেন।

মেরিল্যাণ্ড মেডিক্যাল স্কুলের ডাঃ এবলিং বলেন যে, পাকস্থলীর মধ্যে অধিক পরিমাণে অ্যাসিড বর্তমান থাকা সত্ত্বেও ঔষধটি বেশ কার্যকরী হয়। ইহা ব্যবহারে ক্ষতের সমস্ত লক্ষণ দূরীভুত হইয়া যায়।

ক্ষতিগ্রস্ত আঙ্গুলে ষ্টেনলেস ষ্টীলের খিল সংযোজন

হাতের আঙ্গুলের হাড় ভাঙ্গিয়া বা মচ্‌কাইয়া গেলে অনেক সময় উহার নমনীয়তা চিরদিনের জন্য ব্যাহত হইয়া থাকে। ঐরূপ আঙ্গুলে ষ্টেন্‌লেস্ ষ্টীলের খিল বা কব্জা সংযোজন করিয়া উহাকে আবার স্বাভাবিকভাবে কার্যকরী করিবার এক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে।

ইউ. এস. এয়ার ফোর্সের এক হাসপাতালে

কর্নেল ব্র্যানন এই উপায়ে দশটি রোগীর আঙ্গুলের খিল সংস্কার করিয়া এক বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি বলেন, বড় বড় হাসপাতালে অনেক রোগীর আঙ্গুল এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে দেখা যায়। ইহাতে যাবজ্জীবন ঐ আঙ্গুল অপটু হইয়া থাকে। এই পর্যন্ত বহু প্রকার চিকিৎসা করিয়া ইহা সংশোধন করা সম্ভব হয় নাই।

সাধারণ কব্জার মত করিয়া সংযুক্ত এই কৃত্রিম খিলটি দুইটি অংশে নির্মিত। দুইটি অংশেরই এক দিকে একটি করিয়া সূচালো রড থাকে। ঐ রড দুটি দুইদিকে হাড়ের মধ্যে গাঁথিয়া দেওয়া হয়।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত
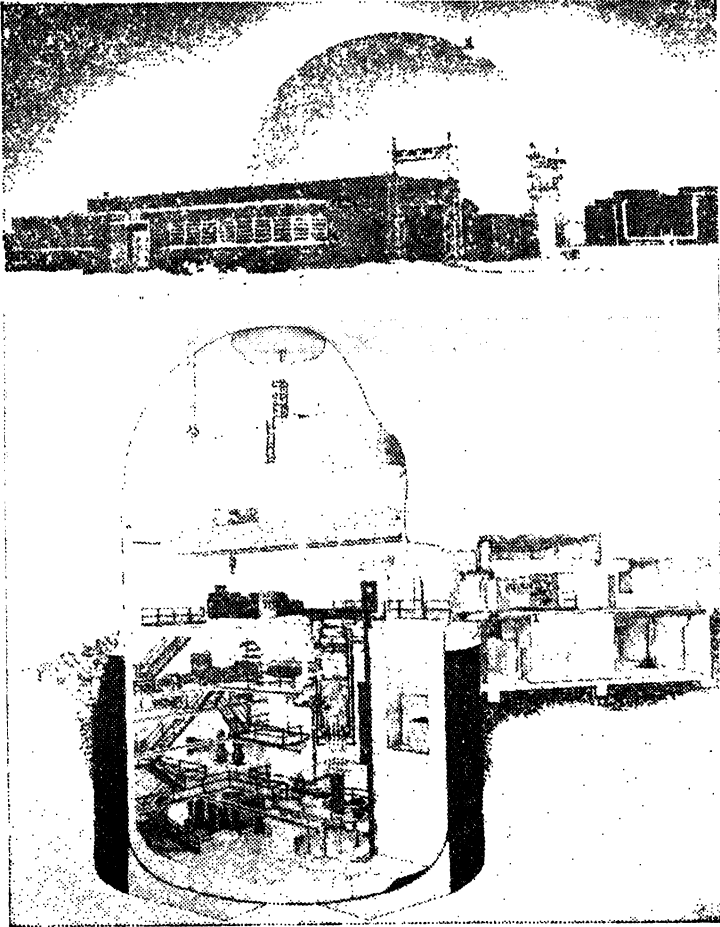
ইউ. এস. এ. ই. কমিশনের পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্য এক্সপেরিমেণ্টাল বয়েলিং ওয়াটার রিয়্যাক্টরের দৃশ্য। ইহা হইতে ২০,০০০ কিলোওয়াট তাপশক্তি এবং ৫০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যাইবে।

অতীতের জীবনধারা

শ্রীসত্যসাধন সরকার

পৃথিবীর অতীত জীবনধারার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অসংখ্য, অনমুমেয় প্রাণীসমূহ ধরিত্রীর গর্ভে একেবারে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কতক প্রাণী বর্তমানে লোপ পাইতে বসিয়াছে, আর কতকগুলি এখনও বেশ সজীব, সতেজ থাকিয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে বিচরণ করিতেছে। বিভিন্ন জাতীয় এই বিভিন্ন আকৃতির প্রাণীসমূহকে জীবনের ক্রমিক বিকাশ বলা যাইতে পারে। ভূপৃষ্ঠের প্রাচীন স্তরীভূত শিলারাশির গর্ভে জীবের যে অতীত অস্তিত্বের ধারাবাহিক বিচিত্র কাহিনী নিহিত আছে তাহা হইতে উহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। এই বিশাল পৃথিবী যেন এক বিরাট সমাধিক্ষেত্র; সেখানে উপলখণ্ড, শিলারাশি এক-একটি স্মৃতিফলকের মত অবস্থান করিতেছে, যাহাদের উপর অতীত জীব লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছে তাহাদের আত্মকাহিনী।

ভূপৃষ্ঠের এই বিশাল শিলাস্তরসমূহ ভূতত্ত্ববিদের পক্ষে এক বিশাল গ্রন্থস্বরূপ। ইহার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ধরিত্রী চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে তাহার আত্ম-কাহিনী, জগতের প্রাকৃতিক বিবর্তন, অতীত জীবের ধারাবাহিক ইতিহাস।

যখন আমরা চিন্তা করি যে, কোথা হইতে আমরা এই পৃথিবীতে আসিলাম, তখন আমাদের পূর্বপুরুষদের কথা স্মরণে আসে; তাঁহারা না জন্মাইলে আমাদের এখানে আসা সম্ভব হইত না। আবার আমাদের পূর্বপুরুষদের আগমন সম্ভব হইয়াছিল সেই আদি মানবজাতির জন্য, যাহারা জাভামনুষ্য, চীনমনুষ্য, নিয়েন্ডারথাল, হাইডেলবার্গ মানবজাতি ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছে। এইরূপে জীবনধারার অনুসন্ধান করিতে করিতে আমরা অবশেষে জীবনের উৎসে উপনীত হই, যেখান হইতে এই যাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল। উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও এই একই কথা। প্রাণী আর উদ্ভিদ, উভয়ে আকৃতি-প্রকৃতিতে বিভিন্ন মাত্র; কিন্তু তাহারা একই জীবনসূত্রে গ্রথিত।

সৃষ্টির সেই আদিযুগে, ভূতাত্ত্বিকেরা যাহাকে আর্কিয়ান যুগ বলিয়া অভিহিত করেন, ধরিত্রীর বুকে কোন প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল না, অর্থাৎ তখনকার জগৎ ছিল প্রাণহীন বা অজৈব। এইভাবে বহুকাল অতীত হইয়াছিল; তবে বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন যে, তখন জীবনের উন্মেষ হইতেছিল মাত্র। আর্কিয়ান যুগের পর আসে—প্রাক্-ক্যাম্ব্রিয়ান যুগ। এই প্রাক্-ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের জীবের অস্পষ্ট জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে ভারতবর্ষে, চীনে, উত্তর আমেরিকায় ও অষ্ট্রেলিয়ায়। তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই যুগে অতীতের প্রথম জীবনধারা অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পূর্বে, অর্থাৎ আর্কিয়ান যুগের শিলায় কোন জীবাশ্ম আজ পর্যন্তও বোধ হয় পরিলক্ষিত হয় নাই।

আর্কিয়ান যুগে এই পৃথিবী ছিল তখনকার আদি মহাসমুদ্র আর স্থলে পরিপূর্ণ। তাহাতে জীবনের, অর্থাৎ কোন প্রকার কীটাণুকীট বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উদ্ভিদের চিহ্নও ছিল না। চারিদিকে ছিল শুধু শিলারাশি। তাহার পর কোথা হইতে কে জানে, তাহার বক্ষে দেখা দিল এক জীবন যাহা পলে পলে বর্ধিত হইতে লাগিল এবং ক্রমশঃ তাহার নদ-নদী, সমুদ্র, গিরি, কান্তারে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বিজ্ঞান আজ অগ্রগতির উন্নত-শিখরে আরোহণ করিয়াছে। বিজ্ঞানের বলে আজ সৃষ্টি-ধ্বংসের অনেক উন্নত মারণাস্ত্র

আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহাতে নিমেষের মধ্যে প্রলয় সংঘটন করা যাইতে পারে। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পৃথিবীতে কি করিয়া জীবনের বিকাশ হইয়াছিল সেই আর্কিয়ান যুগে, বিজ্ঞান আজও সেই রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সক্ষম হয় নাই।

জীবনের বিকাশ হইয়াছিল জলে—সেই আদি মহাসমুদ্রে, আদি আর্কিয়ান যুগে। প্রথম জীবন ছিল অত্যন্ত সাদাসিধা ধরণের এবং তাহা ছিল এককোষী উদ্ভিদ। পরে ক্রমশঃ জল হইতে স্থলে সেই জীবন অগ্রসর হইতে থাকে। জীবনের বিকাশের পর তাহার বিভাগ ঘটে দুই শ্রেণীতে; যথা—উদ্ভিদ আর প্রাণী। প্রাণীর ক্ষেত্রে জীবন প্রথম বিকশিত হইয়া ছিল অ্যামিবা জাতীয় জীবে, আর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছিল অ্যালগি বা শেওলা জাতীয় জলজ উদ্ভিদে। অপেক্ষাকৃত উন্নত স্তরের প্রাণীদের মধ্যে প্রথম জন্মিয়াছিল অমেরুদণ্ডী জীবশ্রেণী; যেমন—ট্রাইলোবাইট্‌স্‌, ব্র্যাকিওপড, পুষ্করিণীর ঝিনুক, গুগ্‌লি, শামুক ইত্যাদি। মহাসমুদ্রের জলরাশি হইতে নবসৃষ্ট বিভিন্ন প্রাণী-সমূহ উঠিয়া ক্রমশঃ ছাইয়া ফেলিল ধরিত্রীর বিশাল বক্ষ। তাহার আকাশ, বাতাস, জল, স্থল—তাহার দুর্লঙ্ঘ্য গিরিশিখর হইতে গভীরতম সমুদ্র-তল পর্যন্ত কোথাও তাহার প্রসার লাভ করিতে অবশিষ্ট রহিল না। এই ধরিত্রীর জীবনের পরিপূর্ণ প্রভাত পঞ্চাশ কোটি বৎসর পূর্বের ঘটনা বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

জন্মের পর জীবন প্রধাবিত হইল চতুর্দিকে, বর্ধিত হইল বিভিন্ন আকারে, রঙে আর সৌন্দর্যে। একটি ক্ষুদ্র জীবন হইতে জন্মিল অগণিত, অননুমেয় প্রাণী ও উদ্ভিদরাজি। তাহার পর এইভাবে অতি-বাহিত হইল প্রায় কোটি বৎসর। তখন দেখা যায় জীবনের খাতায় এক নূতন অধ্যায়। এইবার জীবনের এক নূতন পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হইল; আবির্ভূত হইল ধরিত্রীর বুকে মেরুদণ্ডী প্রাণী। সে আজ আনুমানিক ৪০ কোটি বৎসর পূর্বের কথা। আর এই মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে পৃথিবীতে প্রথম দেখা দিল মৎস্য শ্রেণী। যে মৎস্য মানুষের একটা প্রিয় খাদ্য তাহারা আজিকার জীব নহে। প্রায় ৩১০ লক্ষ বৎসর পূর্বে তাহাদের জন্ম হইয়াছিল; মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে ইহারা প্রাচীনতম। মৎস্যের পর আসিল উভচর প্রাণী, তাহার পর আবির্ভূত হয় সরীসৃপ শ্রেণী। ইহার সঙ্গে হিন্দু-শাস্ত্রের—মৎস্যঃ কূর্মঃ বরাহশ্চ নৃসিংহশ্চাথ বামনঃ—ইত্যাদি কথাগুলির বিষয় চিন্তা করিলে শাস্ত্রকারদের মৌলিক চিন্তাধারার সহিত জীবনের ক্রমবিকাশের বর্তমান মতবাদের বেশ সাদৃশ্য দেখা যায়।

সরীসৃপের পর দেখা দিল স্তন্যপায়ী জীব। এই স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে মানবজাতিও পরিগণিত। সৃষ্টির ধারার হিসাবে মানবের আবির্ভাব সেদিনের ঘটনা মাত্র, অর্থাৎ আনুমানিক ১৫০ লক্ষ বৎসর পূর্বের কথা। ইহা হইল সৃষ্টিধারার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এখন এই অতীত জীবনধারার উপর নির্ভর করিয়া দুই-একটি কথা বলিতেছি।

এই জীবনধারার ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া আমরা স্বভাবতঃই জানিতে উৎসুক হই যে, ভারতবর্ষ এই জীবন ধারার কতটুকু লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। ভারতের প্রাক্-ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের জীবনেতিহাস সংক্ষেপে কিছুটা বলিতেছি। অতি অল্প দেশেই এই যুগের জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে; তাহার মধ্যে ভারত ব্যতীত, চীন, অস্ট্রেলিয়া ও উত্তর আমেরিকার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। সুতরাং এই কালের জীবাশ্ম অতীব দুর্লভ এবং বিশেষ গবেষণার বিষয়। এই সময়কার জীবাশ্ম লইয়া বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিশেষ মতদ্বৈধ আছে। এখানে একটু পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার যে, অতীত জীবের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় শিলায় সংরক্ষিত তাহাদের নিদর্শন হইতে। জীবের অস্থি, দাঁত, আবরণ, গাছের ছাল, গাছের পাতা এবং কদাচিৎ জীবের কোমল অংশের কর্দমের মধ্যে

ছাঁচের মত শিলীভূত পরিণামকে জীবাশ্ম বলা হইয়া থাকে। ইহারা সুস্পষ্টভাবে জীবের অস্তিত্বের পরিচয় দেয়। আমরা এই সব জীবাশ্ম হইতে জীবের জীবনেতিহাস বা তাহাদের জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারি।

প্রাক্-ক্যাম্ব্রিয়ানের পরবর্তী ক্যাম্ব্রিয়ান যুগ হইতে আজ পর্যন্ত যে পঞ্চাশ কোটি বৎসর অতিক্রম করিয়াছে তাহাতে জীবের একটা বেশ ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে। ক্যাম্ব্রিয়ান যুগে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত ভারতের সল্ট রেঞ্জ, স্পিটি ও কাশ্মীরের ক্যাম্ব্রিয়ান শিলায় বহুবিধ সামুদ্রিক জীবাশ্মের সমাবেশ দেখা যায়, যাহা ব্রহ্মদেশে ঐ যুগের শিলায় পাওয়া যায় নাই।

প্রাক্-ক্যাম্ব্রিয়ান যুগ বলিতে আমরা ভারতবর্ষে আর্কিয়ান, ধারওয়ারিয়ান, কুদাপা আর বিন্ধ্য, এই চারিটি যুগকে বুঝি। অবশ্য বিন্ধ্যযুগে ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে। আর্কিয়ান ও ধারওয়ারিয়ান যুগের শিলাগুলি বিশেষভাবে রূপান্তরিত, কিন্তু কুদাপা ও বিন্ধ্য যুগের প্রস্তরগুলি অরূপান্তরিত এবং সেইগুলি কোল, বেলেপাথর ইত্যাদি। আর্কিয়ান ও ধারওয়ারিয়ান যুগের শিলায় কোন জৈব বস্তুর অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন যে, প্রাক্-ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের শেষভাগে খুব সম্ভব ছোট ছোট ও সরল জীব ভূপৃষ্ঠে আবির্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল প্রাণীর শরীরে বিশেষ কোন শক্ত অংশ—যেমন, কঠিন অস্থি বা দাঁত না থাকায় তাহারা শিলাগাত্রে তাহাদের কোন চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারে নাই। ভারতবর্ষের রায়পুর, অনন্তপুর জিলা, রামপুরা, যোধপুর প্রভৃতি স্থানে এই যুগের শিলায় অস্পষ্ট জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষে রায়পুরের নিকববর্তী স্থানের চুনাপাথরে সামুদ্রিক উদ্ভিদের জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ভূবিদ্ ভ্রেডেন্‌বার্গ এইগুলি ক্রিপ্‌টোজুন বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ মধ্যভারতের গোয়ালিয়র শ্রেণীতেও এই ক্রিপ্‌টোজুনের দেহাবশেষ নিহিত আছে। সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতের অনন্তপুর জিলার অন্তর্গত কুদাপা চুনাপাথরে জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই প্রস্তর দেখিতে মৎস্যাণ্ডবৎ সূক্ষ্ম দানাবিশিষ্ট এবং কালো রঙের। মধ্যভারতের রামপুরার নিকটবর্তী স্থান হইতে যে সূক্ষ্ম কঠিন গোলাকার জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সেগুলির নমুনা দেশবিদেশে খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞদের নিকট সনাক্ত করিবার জন্য পাঠান হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এইগুলিকে যথার্থ জৈবচিহ্ন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু কেহ কেহ এইগুলিকে অজৈব কোন চিহ্ন-বৈচিত্র্য বলিয়াও ধারণা করিয়াছেন। এই হইল ভারতের কথা।

মৎস্যের পর যখন উভচর প্রাণীরা আবির্ভূত হইল তখন তাহাদের দেহ মাছের মতই ছিল; কেবল মাছের ডানাগুলির স্থলে বুকে হাঁটিবার জন্য বাহির হইয়াছে মাত্র ছোট ছোট চারটি পা। সরীসৃপের বেলায় পাগুলি আরও বড় এবং লেজটি হইল আরও বৃহদাকারের। কতকগুলি সরীসৃপ পক্ষীতে পরিণত হইল এবং আকাশে উড়িতে আরম্ভ করিল।

তাহার পর স্তন্যপায়ীদের বেলায় দেহটা দীর্ঘাকার শায়িত অবস্থা হইতে পরিবর্তিত হইল অনেকটা সোজা হইয়া দাঁড়াইবার ভঙ্গীতে, যেমন দেখা যায় বানর ইত্যাদি জাতির বেলায়। তাহার পর মানুষের বেলায় লেজটা লোপ পাইল আর দেহটা হইল লম্বমান। এই হইল জীবজগতের মোটামুটি বিবর্তন—মৎস্য হইতে উভচর, উভচর হইতে সরীসৃপ, সরীসৃপ হইতে পক্ষী, তাহার পর স্তন্যপায়ী, অবশেষে মনুষ্য।

ভূ-বিদ্যায় প্রাচীন প্রাণিতত্ত্বের অনুশীলনে ভূ-বিদ্ সর্বদাই দেখেন যে, এই পৃথিবীতে সবই নশ্বর—এই বিশাল পৃথিবী এক মহাসমাধি ক্ষেত্র! সৃষ্টির আদি হইতে আজ পর্যন্ত প্রায় ২০০ কোটি বৎসর

ধরিয়া কত প্রাণী আসিয়াছে, আবার তাহারা শেষ শয্যা লইয়াছে মাতা ধরিত্রীর বক্ষে। যুগে যুগে কত বিশাল আকৃতির প্রাণী এই পৃথিবীর বক্ষে সদর্পে বিচরণ করিয়াছে, তাহাদের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল দেখিলে আমাদের শিহরণ জাগে। কিন্তু তাহারা কোন দিন ভাবে নাই যে, তাহাদিগকে এই ধরিত্রীর বুকে তুচ্ছ, নগণ্য, অসহায়ভাবে ধূলিসাৎ হইতে হইবে! ইহাই হইল সৃষ্টির ধারা।

রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত নিখিল ব্রহ্ম বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৫ম অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধের সারাংশ।

জীবের পরমায়ুর গণ্ডী

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

জন্মের পর মুহূর্ত হইতে প্রাণী ও উদ্ভিদ নির্বিশেষে সকল জীবকেই ক্রমশঃ মৃত্যুর পথেই অগ্রসর হইতে হয়। তবে এই যাত্রায় বিভিন্ন জীবের গতিবেগ বিভিন্ন। কোন কোন ক্ষেত্রে জীবের স্বাভাবিক জীবদ্দশার স্থিতিকাল মাত্র ২।৪ দিন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে জীবনের স্থিতিকাল হাজার হাজার বৎসরও বিলম্বিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন জীব তাহাদের শ্রেণীগত জীবনের সীমার মধ্যেই বিকাশ পাইয়া থাকে। ঐ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার শক্তি তাহাদের নাই।

স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে মানুষই সর্বাপেক্ষা অধিক দিন বাঁচিতে সক্ষম। হস্তীর পরমায়ুর সীমা মানুষের অপেক্ষা অধিক, এইরূপ ধারণা আছে। তবে শত বৎসরের উপর কোন হস্তী বাঁচিয়াছে, এরূপ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। বম্বে-বার্মা ট্রেডিং কোম্পানীর রেকর্ড হইতে জানা গিয়াছে যে, তাহাদের ১৭০০০ হস্তীর মধ্যে মাত্র শতকরা ৯টি ৫৫ বৎসর অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং শতকরা মাত্র দুইটি ৬৫ বৎসরের উপর পরমায়ু লাভ করিয়াছে। কোন কোন দেশে মানুষের গড় আয়ুর পরিমাণই সত্তরের কাছাকাছি। শতোত্তর মানুষ সকল দেশেই ২।৪ জন মিলিবে। মানুষের পরমায়ুর সীমা ১২০ বৎসর ধার্য হইয়াছে। তবে ১৫০।১৬০ বৎসর পর্যন্তও মানুষ বাঁচিতে পারে, এরূপ নজিরও আছে। কোন কোন ভারতীয় সাধু-সন্ন্যাসী ইহা অপেক্ষাও অধিক পরমায়ু লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। অবশ্য মানুষের স্বাভাবিক পরমায়ুর সীমা নির্ধারণে ইহা ব্যতিক্রম বলিয়াই গণ্য হইতে পারে।

প্রাণিজগতে একমাত্র কচ্ছপই বোধ হয় মানুষের পরমায়ুর সীমা অতিক্রম করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কচ্ছপের সহজে মৃত্যু হয় না। জীবন আঁকড়াইয়া থাকিবার শক্তি কচ্ছপের মত আর কোন প্রাণীর নাই। কোন কোন শ্রেণীর কচ্ছপের পরমায়ুর সীমা ৩০০।৩৫০ বৎসর হইতে পারে বলিয়া জানা গিয়াছে। তবে এত দীর্ঘ পরমায়ু প্রাপ্তির কোন প্রামাণ্য রেকর্ড নাই। মরিসাস দ্বীপে একটি কচ্ছপের ১৫২ বৎসর বয়সে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটে। কচ্ছপের দীর্ঘায়ু প্রাপ্তির ইহাই বোধ হয় সর্বোচ্চ রেকর্ড। কুমীরের পরমায়ুর সীমাও কচ্ছপের কাছাকাছি বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। তবে ইহার প্রমাণোপযোগী নজীর কিছু নাই।

স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে পরমায়ুর দৈর্ঘ্যের পর্যায়ে মানুষ ও হস্তীর পরেই অশ্ব স্থান লাভ করিয়াছে। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বাঁচিতে দিলে অশ্ব ৫০ বৎসর পর্যন্ত পরমায়ু লাভ করিতে পারে। একটি অশ্ব ৬২

বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়াছে—এরূপ নজীরও আছে, তবে অশ্বের ক্ষেত্রে ইহাকে ব্যতিক্রম বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। গর্দভের পরমায়ুর সীমাও অশ্বেরই কাছাকাছি। ইহারা ৪৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত বাঁচিতে পারে।

পৃথিবীর বিভিন্ন পশুশালার রেকর্ড হইতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, হিপোপটেমাস—৪১, গণ্ডার—৪০, ভল্লুক—৩০ হইতে ৩৪, শিম্পাঞ্জি—২৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত বাঁচিতে পারে।

কুকুরের পরমায়ুর সীমা ২০ বৎসর। একটি কুকুর এই সীমা অতিক্রম করিয়া ৩৪ বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। তবে ২০ বৎসরের উর্ধ্বে কুকুর বাঁচিয়াছে, এরূপ রেকর্ড খুব কমই পাওয়া যায়। কুকুর অপেক্ষা বিড়াল বেশী দিন বাঁচিতে পারে। ২০-এর উর্ধ্বে পরমায়ু লাভ করিয়াছে, এরূপ বিড়ালের সংখ্যা অনেক। ২৭, ৩১ এমন কি ৩৯ বৎসর পর্যন্ত বিড়াল বাঁচিয়াছে, এরূপ রেকর্ডও আছে।

সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রাণী তিমি ; শিকারীদের হাত হইতে নিস্তার পাইলে ৩০ বৎসর বা তাহারও সামান্য কিছু বেশী দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে। নির্ভরযোগ্য সূত্র হইতে জানা গিয়াছে যে, তিমির পরমায়ুর সীমা ৩৭ বৎসর, অর্থাৎ এই বয়স পর্যন্তও কোন কোন তিমি বাঁচিয়া থাকিতে পারে, এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

বন্যজন্তু তাহাদের স্বাভাবিক আরণ্যক পরিবেশে যতদিন বাঁচিতে সক্ষম, পশুশালায় বন্দী অবস্থায় সাধারণতঃ তাহা অপেক্ষা অধিক পরমায়ু লাভ করিতে পারে। বন্যজীবনে বার্ধক্যের স্থান নাই। সংগ্রামবিমুখ অবস্থায় সেখানে জীবনধারণ সম্ভব নয়। কাজেই বার্ধক্যে হৃতশক্তি ও নখদন্তহীন হইয়া সেখানে বাঁচিয়া থাকিবারও উপায় নাই। এই কারণে বন্য অবস্থায় খুব কম প্রাণীই বার্ধক্যে উপনীত হইবার সৌভাগ্য লাভ করে। অপরদিকে পশুশালার বন্দীজীবনে ক্ষুধার তাড়নায় শিকার অন্বেষণের প্রয়োজনীয়তা নাই, অনায়াসলব্ধ প্রাচুর্যের মধ্যেই তাহারা বাস করে। নিয়ত শত্রু-ভয়ে সচকিত থাকিতে হয় না, নিরাপদ আশ্রয়েই তাহারা বাস করিতে অভ্যস্ত হয়। পশুশালায় আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনাও খুবই কম। কাজেই এইরূপ অবস্থায় বার্ধক্যের শেষ দিন পর্যন্ত প্রাণধারণ করিবার সুযোগ লাভ করিবার ফলে স্বভাবিক বন্যজীবন অপেক্ষা তাহাদের পরমায়ুর পরিমাণ দীর্ঘতর হইবে, ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই।

পশুশালায় শৃগাল ২৫ বৎসর পর্যন্তও বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু বন্য অবস্থায় ১৪।১৫ বৎসর তাহার পরমায়ুর সীমা। ঐ বয়সেই দন্তহীন হইয়া তাহার চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে, লোম ঝরিয়া যায়, দেহ হীনবল ও শীর্ণ হইয়া পড়ে। কাজেই প্রাকৃতিক পরিবেশে তাহার আর টিকিয়া থাকা সম্ভব হয় না। ঐ বয়সে ব্যাঘ্রও বন্য অবস্থায় অতি বৃদ্ধ হইয়া পড়ে। কোনও এক ক্ষেত্রে একটি ব্যাঘ্র ১৭ বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিল বলিয়া রেকর্ড আছে। ব্যাঘ্রের ক্ষেত্রে বন্য অবস্থায় ইহাকেই পরমায়ুর সীমা ধরা যাইতে পারে। কিন্তু বন্দী অবস্থায় ব্যাঘ্র ইহা অপেক্ষাও অধিক কাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে বলিয়া জানা গিয়াছে। সিংহের পরমায়ুর সীমা ব্যাঘ্রের অপেক্ষা অধিক। ৪০ বৎসর পর্যন্তও সিংহ বাঁচিতে পারে বলিয়া জানা গিয়াছে।

নকুল, কাঠবিড়ালী প্রভৃতি ছোট ছোট প্রাণী ৭।৮ বৎসরে যথেষ্ট বৃদ্ধ হইয়া পড়ে। ইহাদের পরমায়ুর সীমা ৮।১০ বৎসরের অধিক নয়।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যেসব প্রাণী আকারে ক্ষুদ্র এবং অত্যধিক প্রজনন-শক্তিসম্পন্ন, তাহাদের পরমায়ুর পরিমাণও কম। আর যেসব প্রাণী আকারে বড় ও লঘু প্রজনন-শক্তিসম্পন্ন তাহাদের পরমায়ুর পরিমাণও অধিক। তবে মোটামুটিভাবে ইহা সত্য হইলেও ইহার মধ্যে যে কোন ব্যতিক্রম নাই, এমন নয়। দৈহিক আকার ও প্রজনন শক্তির

সঙ্গে পরমায়ুর ব্যাপ্তির যে একটা নিকট সম্বন্ধ থাকিতে পারে, অনেক ক্ষেত্রেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাণিজগতের মধ্যে কীটপতঙ্গের পরমায়ুর পরিমাণ খুব কম। কীটবিশেষে পরমায়ুর পরিমাণ কোথাও বা কয়েক দিন, কোথাও কয়েক সপ্তাহ, কোথাও বা কয়েক মাস। অধিকাংশ কীটপতঙ্গের পরমায়ু এইরূপ হইলেও ইহার ব্যতিক্রমও আছে। রাণী-পিপীলিকা, রাণী-মক্ষিকা বাঁচে কয়েক বৎসর। টেপওয়ার্মও খুব দীর্ঘজীবী। এক ব্যক্তির পেটে একটি টেপওয়ার্ম ৩৫ বৎসরকাল জীবিত ছিল বলিয়া রেকর্ড আছে।

কীটপতঙ্গ আকারে যেমন ক্ষুদ্র তেমন ইহাদের প্রজনন ক্ষমতাও অধিক এবং প্রজনন ক্ষমতা লাভ করেও অতি কম বয়সে। কাজেই উহাদের অল্লায়ু হওয়াই স্বাভাবিক। জীবজগতে ব্যাক্টিরিয়া আকারে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ; উহার পরমায়ুর পরিমাণও অতি সামান্য। মাত্র বিশ মিনিট সময়ের মধ্যে একটি ব্যাক্টিরিয়া বিভক্ত হইয়া দুইটিতে পরিণত হয়।

পাখীর মধ্যে সোয়ান, ঈগল, তোতা, কাকাতুয়া প্রভৃতি খুব দীর্ঘজীবী। শকুনিও অনেক কাল বাঁচে বলিয়া কথিত আছে, তবে এই সম্বন্ধে প্রামাণ্য রেকর্ড কিছু নাই।

১৮৮৭ সালে ইংল্যাণ্ডে একটি মূক সোয়ান গুলিতে নিহত হয়। উহার পায়ে ১৭০ বৎসর পূর্বেকার একটি তারিখ খোদাই করা আংটি পরানো ছিল। উহা হইতে প্রমাণ হয় যে, পাখীটি অন্ততঃ ১৭০ বৎসর জীবিত ছিল। এইরূপ ১৮৪৫ সালে ফরাসী দেশে একটি ঈগল পাখী গুলিতে নিহত হয়। উহার গলায়ও একটি ধাতব কলার পরানো ছিল। উহাতে ল্যাটিন ভাষায় লিখিত তারিখ হইতে জানা যায় যে, উহার বয়স তখন ৯০ বৎসর হইয়াছে। খাঁচায় আবদ্ধ অবস্থায় তোতা পাখী ১০০ বৎসরের উপর বাঁচিয়াছে, এইরূপ অনেক নজীর আছে। এইরূপ একটি পাখী ১৪০ বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। কাকাতুয়াও অনেক কাল বাঁচে। ৯০ বৎসর পর্যন্ত কয়েকটি কাকাতুয়া বাঁচিয়াছে। একটি ১০৭ বৎসর পর্যন্ত বাঁচিবার রেকর্ডও আছে।

পঞ্চাশের উর্ধ্বে আর যেসব পাখী পরমায়ু লাভ করিতে পারে বলিয়া জানা গিয়াছে তন্মধ্যে এক প্রকারের দাঁড়কাক—৬৮, পেলিকান ও কনডোর —৫২, ঈগল আউল নামে এক জাতীয় পেঁচক— ৬৮, গোল্ডেন ঈগল—৫৬।

বনের পাখীর বয়স নিরূপণ করা কঠিন ব্যাপার। তবে তাহারা যে খুব বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বাঁচিবার সৌভাগ্য লাভ করে না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অধিকাংশ ছোট পাখীর ক্ষেত্রে পরমায়ুর সীমা ১০।১২ বৎসরের অধিক নয়। বড় পাখীর ক্ষেত্রেও ২০ বৎসরের উপর পরমায়ু লাভ করে, এরূপ পাখীর সংখ্যা খুবই বিরল। মুক্ত অবস্থা হইতে আবদ্ধ অবস্থায় পাখী অপেক্ষাকৃত অনেক দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে, এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। গৃহ-পালিত রাজহংস ৩০।৩৫ বৎসরও বাঁচিতে পারে। একটি ৪৪ বৎসর বাঁচিয়াছে, এরূপ রেকর্ডও আছে। অথচ ইহাদের বন্য সম্প্রদায়ের পরমায়ুর সীমা ইহার অর্ধেকও নয়।

মৎস্যকুলের মধ্যে অধিকাংশ ছোট জাতীয় মৎস্যের পরমায়ুর সীমা ১০।১২ বৎসর। বড় মাছও খুব কমই বিশ বৎসর অতিক্রম করে। আমাদের দেশে কোন কোন দীঘি-পুষ্করিণীতে ২৫।৩০ বৎসরের বা তাহা অপেক্ষাও পুরাতন রুই, কাতলা থাকে বলিয়া অনেকে বলেন। তবে ঐ সকল মাছের বয়স সম্বন্ধে প্রমাণসিদ্ধ নজীর কমই আছে। যেসব দীর্ঘজীবী মৎস্যের বয়স সম্বন্ধে রেকর্ড আছে। তাহাদের মধ্যে আমাদের সাধারণ পরিচিত কোন নাম পাওয়া যায় না ; যেমন, ক্যাটফিস—৬০, ইল —৫৫, মিরার কার্প—৪২, গোল্ড ফিস—৩০, প্লেইস —২৬ ইত্যাদি।

জীবজগতে উদ্ভিদের মধ্যেই অতি দীর্ঘ-জীবনের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাণি-জগতে কচ্ছপই সর্বাপেক্ষা অধিক বয়স পর্যন্ত বাঁচিতে পারে, তবে উহার পরমায়ুও বড় জোর ৩০০।৩৫০ বৎসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অপর দিকে ৫।৬ হাজার বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে, এমন গাছও উদ্ভিদকুলের মধ্যে আছে।

দীর্ঘজীবী উদ্ভিদ যেমন আছে, সেইরূপ স্বল্প-জীবী উদ্ভিদেরও অভাব নাই। ধান, গম প্রভৃতি শস্যের উদ্ভিদের পরমায়ুর সীমা ২ হইতে ৬ মাস। অধিকাংশ মৌসুমী ফুল গাছের ২।৩ মাসের মধ্যেই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। ইহা অপেক্ষাও অনেক কম সময়ের মধ্যে জীবন শেষ করে, এরূপ ক্ষুদ্র উদ্ভিদ অনেক আছে।

বড় গাছই দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে। আম, কাঁঠাল, তাল, খেজুর গাছ ৭০।৮০ বৎসর বা তাহারও অধিক কাল বাঁচিতে পারে। তেঁতুল, শাল, সেগুন প্রভৃতি অনেক গাছ শতোত্তর পরমায়ু লাভ করিতে পারে। বট গাছ হয়তো কয়েক শত বৎসর জীবনের জের টানিয়া চলিতে পারে। কিন্তু সহস্রের পর্যায়ে পড়ে, আমাদের দেশের এমন কোন গাছের ইতিহাস জানা নাই। একমাত্র রামপালের গজারি গাছ সম্বন্ধে কথিত আছে যে, উহা নাকি বল্লাল সেনের সময় হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত জীবিত ছিল। অবশ্য এক কিংবদন্তি ছাড়া উহার বয়স সম্বন্ধে কোন প্রামাণ্য নজীর নাই।

অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ডে ম্যাক্রোজেমিয়া নামক একটি মুক্তবীজ জাতীয় গাছ আছে। উচ্চতায় উহা মাত্র ২০ ফুট। উহার বয়স ১২০০০ বৎসর বলিয়া দাবী উঠিয়াছে। গাছটির প্রকৃত বয়স ঐরূপ হইলে উদ্ভিদকুলের মধ্যে উহাই যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। কিন্তু সমস্যার বিষয় এই যে, গাছটির বাস্তব বয়স নিরূপণের কোন উপায় নাই। এইরূপ অধুনা বিলুপ্ত ক্যানারী দ্বীপের কতকগুলি ড্রাগন গাছ সম্বন্ধেও কিংবদন্তী ছিল যে, উহারা ৬ হাজার বৎসরের পুরাতন। কিন্তু কাণ্ডের বর্ষস্তরের গণনা হইতে কখনও ইহার সত্যতা প্রমাণের চেষ্টা হয় নাই।

দক্ষিণ মেক্সিকোর সাটামেরিয়া গ্রামের গীর্জার প্রাঙ্গণে একটি বিরাট সাইপ্রেস গাছ আছে। উহার কাণ্ডের পরিধি—১৬৫ ফুট এবং গাছটি দৈর্ঘ্যে ১৫০ ফুট। উহার বয়স ৬ হাজার বৎসর বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ইহার সম-গোত্রীয় ক্যালিফোর্ণিয়ার সিকোয়া গাছের বয়সানু-পাতিক কাণ্ডের পরিধির সঙ্গে তুলনা করিয়া এই গাছটির বয়স নির্ধারিত হইয়াছে। কাজেই এই ক্ষেত্রে আনুমানিক হইলেও উহার বয়সের হিসাব নির্ভরযোগ্য বলিয়াই অনেকে মনে করেন।

ক্যালিফোর্ণিয়ায় পার্বত্যাঞ্চলে সিকোয়া গাছের একটি বিরাট বন আছে। এই বনের বিরাটকায় গাছগুলি উহাদের প্রাচীনত্বের জন্য বিখ্যাত। এই বনের সর্ববৃহৎ গাছটি জেনারেল সারম্যান নামে পরিচিত। উহা দৈর্ঘ্যে ২৭২ ফুট এবং উহার কাণ্ডের নিম্নাংশের পরিধি ১০১ ফুট। মস্তকাবস্থিত শাখা-প্রশাখা সমেত এই গাছটির ওজন ৬ হাজার টন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ইহার কাছাকাছি আকারের বিভিন্ন নামে পরিচিত আরও অনেক সিকোয়া গাছ এই বনে আছে। একটি গাছের কাণ্ডের বর্ষ-স্তর গণনা করিয়া উহার বয়স ৪ হাজার বৎসর নির্ধারিত হয়। এইভাবে প্রকৃত বয়স নির্ধারণের ব্যবস্থা হইতেই বয়সানুপাতে কাণ্ডের পরিধি কত হইতে পারে তাহা মোটামুটি-ভাবে স্থির করা সম্ভব হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, প্রায় ৪ হাজার বৎসর বয়স হইলেই তবে কাণ্ডের পরিধি কিছু কম-বেশী ১০০ ফুট হইতে পারে। দক্ষিণ মেক্সিকোর সাইপ্রেস গাছটির বয়স এই হিসাব হইতেই অন্যূন ৬ হাজার বলিয়া ধার্য হয়।

সিকোয়া গাছকে সর্বপ্রকার কীট ও উদ্ভিদ রোগ হইতে মুক্ত থাকিতে দেখা যায়। অগ্নি-প্রতিরোধক ক্ষমতাও ইহাদের যথেষ্ট আছে। গাছের ত্বক কয়েক ইঞ্চি হইতে আরম্ভ করিয়া দুই ফুট পর্যন্ত পুরু এবং অ্যাস্‌বেষ্টসের মতই অগ্নি-প্রতিরোধক। হাজার বৎসরের উপর বয়স হইলে দাবাগ্নি ইহাদের আর বিশেষ ক্ষতি করিতে সক্ষম হয় না। ইহার কম বয়স্ক গাছগুলির ত্বকের অংশ অপেক্ষাকৃত পাত্‌লা থাকায় অগ্নি-প্রতিরোধের ক্ষমতা কম থাকে। তবে এইরূপ ক্ষেত্রেও অগ্নি-বেষ্টিত অবস্থায় ত্বকের অংশ অপেক্ষা ভিতরের অংশই অধিক পরিমাণে বিনষ্ট হয়। ইহার ত্বকের শক্তিও এমন অদ্ভুত যে, ভিতরে কাষ্ঠাংশ বিনষ্ট হইয়া সামান্য মাত্র ত্বক অবশিষ্ট থাকিলেই গাছটি বাঁচিয়া থাকিতে পারে। বড় গাছগুলির বিদ্যুতাহত হইবার সম্ভাবনা অধিক থাকে। সব বড় গাছেই কোন না কোন সময়ে বিদ্যুতাগ্নিতে আহত হইবার চিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে।

সিকোয়ার আর এক সম্প্রদায় রেড উড নামে পরিচিত। ইহার বাস্তব নাম সিকোয়া সেমপার-ভিরেন্স বা চিরজীবী। এইগাছগুলি দৈর্ঘ্যে পূর্বোক্ত সিকোয়া অপেক্ষাও বড়। সর্ববৃহৎটির দৈর্ঘ্য ৩৬৪ ফুট। তবে কাণ্ডের পরিধি পূর্বোক্ত সিকোয়া অপেক্ষা অনেক কম। এই গাছগুলিও বেশ দীর্ঘ-জীবী। এই গাছ কাটিয়া ফেলিলে আবার গোড়া হইতে নূতন গাছের সৃষ্টি হয় এবং এই জন্যই সেমপারভিরেন্স নামকরণ হইয়াছে।

প্রাচীনত্বের উপর মানুষের স্বভাবতঃ একটা আকর্ষণ আছে। প্রাচীন মন্দির, মসজিদ, ইমারতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে অতীত যুগের সংস্পর্শানুভূতিতে আমাদের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হয়। কাজেই ৪।৫ হাজার বৎসরের পুরাতন এই জীবন্ত গাছগুলির পাশে গিয়া দাড়াইলে মানুষ যে এক অপূর্ব রোমাঞ্চকর অনুভূতি লাভ করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মহেঞ্জোদরো, হারাপ্পা, সিরিয়া, ব্যাবিলনের যুগের সঙ্গে মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—এই ভাবই তাহার মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক।

জীবন-চাঞ্চল্য প্রাণিজগতের বিশেষত্ব। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, জীবনের স্থায়িত্বে নিশ্চল উদ্ভিদ-জগতের কাছে প্রাণিজগৎকে বিশেষভাবেই নতি স্বীকার করিতে হইয়াছে।

সঞ্চয়ন

জীবাণুর সাহায্যে গন্ধক উৎপাদন

জীবাণুর সাহায্যে গন্ধক উৎপাদন সম্বন্ধে সিলভিয়া লেডারটন লিখিয়াছেন—

গন্ধক আধুনিক শ্রমশিল্পের এক অত্যাবশ্যক উপকরণ। এই কারণে যে সকল দেশ বড় বড় শ্রমশিল্প গড়িয়া তুলিতেছে তাহারা এই পদার্থটির উৎপাদন সম্পর্কে খুবই আগ্রহশীল। বৃটেন সম্পর্কে এই কথাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য; কারণ বৃটেনকে বাহির হইতেই তাহার প্রয়োজনের অধিকাংশ গন্ধক আমদানী করিতে হয়।

১৯৫০ সালে যুক্তরাষ্ট্র হঠাৎ গন্ধক রপ্তানী কমাইয়া দেওয়ার ফলে বৃটেনে উহার গুরুতর অভাব সৃষ্টি হয়। গন্ধকের অভাব যাহাতে শ্রম-শিল্পে সঙ্কটের সৃষ্টি না করিতে পারে তাহার জন্য বৃটেনের বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্প গবেষণা বিভাগের বৈজ্ঞানিকেরা জীবাণুর সাহায্যে গন্ধক উৎপাদনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। জীবাণুর সাহায্যে গন্ধক উৎপাদন কোন অবাস্তব পরিকল্পনা নয়; কারণ আইসোটোপ পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত

হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত টেক্সাস ও লুসিয়ানার বিপুল প্রাকৃতিক গন্ধক সম্পদ বহুদিন পূর্বে জীবাণুর কার্যকলাপের ফলেই গড়িয়া উঠিয়াছে।

বৃটিশ বৈজ্ঞানিকেরা বিশেষ বিশেষ ধরণের জীবাণুর সাহায্যে গন্ধকযুক্ত নর্দমার ময়লা হইতে গন্ধক উৎপাদনের যে প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে পুরাপুরিভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। আলোচ্য প্রক্রিয়ার সাহায্যে ছোট কারখানায় অল্প পরিমাণ গন্ধক উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে। এই বৎসরের শেষভাগে বৃহৎ কারখানায় প্রচুর পরিমাণ গন্ধক উৎপাদনের উদ্যোগ-আয়োজন করা হইতেছে। এই আয়োজনের সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত আশা পোষণ করিবার কারণ আছে। ইহা নিঃসন্দেহে খুবই কৃতিত্বের কথা, কারণ জীবাণুর সাহায্যে গন্ধকের মত ভারী রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন ইতিপূর্বে কখনও করা হয় নাই।

গন্ধক উৎপাদনের কাজে যে জীবাণুর সাহায্য লওয়া হইতেছে তাহারা সুপরিচিত। ইহাদের পারিবারিক নাম হইল ডিসালফোভাইব্রিও ডিসালফিউরিকান্স্। ইহারা বদ্ধ নোংরা জলে অতিদ্রুত বৃদ্ধিলাভ করে এবং তাহার ফলে হাইড্রোজেন সালফাইড নামক দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাসের সৃষ্টি হয়। এই জীবাণু ভূগর্ভস্থিত ধাতুর পাইপসমূহও ভীষণভাবে ক্ষয় করিয়া দেয়।

জীবাণুর সাহায্যে শ্রমশিল্পে ব্যাপক উৎপাদনের পথে দুইটি সমস্যা দেখা দেয়। প্রথমতঃ প্রচুর ও সুলভ কাঁচা মাল সংগ্রহ করিতে হয় এবং দ্বিতীয়তঃ প্রচুর জোরালো জীবাণুর সরবরাহ বজায় রাখিতে হয়, যাহারা যান্ত্রিক উৎপাদনের সহিত তাল রাখিয়া দ্রুত কাজ করিতে পারে। কাঁচামাল, অর্থাৎ সালফেট সংগ্রহ করা কিন্তু বিশেষ কঠিন হয় না। বৈজ্ঞানিকেরা দেখেন যে, জিপ্সাম অথবা প্রাকৃতিক অ্যানহাইড্রাইট অথবা সার উৎপাদনের পর পরিত্যক্ত সালফেট, এই সমস্তই গন্ধক উৎপাদনের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের উপযুক্ত।

গবেষণার ফলে আরও দেখা যায় যে, নর্দমার ময়লা জলকাদা বাকী প্রয়োজন বেশ ভালভাবে পূরণ করিতে পারে। নর্দমার ময়লায় জীবাণুরা খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধিলাভ করে এবং সালফেটকে সালফাইডে পরিণত করিতে পারে। এই সালফাইডকে আরও সহজ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে গন্ধকে পরিণত করা যায়। সবচেয়ে সুবিধা হইল এই যে, নর্দমার ময়লা সুলভে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

গবেষণাগারে পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে, যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে নর্দমার ময়লা হইতে মিথেন গ্যাস উৎপাদন করা হয়, সেই প্রক্রিয়ারই একটু অদল-বদল করিয়া তাহার সাহায্যে সালফেট মিশ্রিত ময়লা হইতে অতি সহজে সালফাইড উৎপাদন করা সম্ভব হয়।

প্রথমে লণ্ডনের অন্তর্গত বেকটনের সিউয়েজ কারখানা হইতে জীবাণু সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা চালানো হয়। টেডিংটনের গবেষণাগারে উক্ত পরীক্ষা চালাইয়া দেখা যায় যে, সেই জীবাণুগুলি অতি ধীরে ধীরে কাজ করিতেছে, যাহার ফলে শতকরা ছয় ভাগ জিপ্সাম মিশ্রিত নর্দমার ময়লা হইতে শতকরা এক ভাগ সালফাইড, অর্থাৎ গন্ধক উৎপাদন করিতে ছয় মাস সময় লাগে। কিন্তু যখন সালফাইড উৎপন্ন হইতেছে সেই সময় জীবাণুগুলিকে ঘন ঘন নূতন ময়লার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া টেডিংটনের বৈজ্ঞানিকেরা সালফাইডের উৎপাদন হার শতকরা ৪০ ভাগ বাড়াইতে সক্ষম হন। ইহার ফলে অবশেষে শতকরা একভাগ সালফাইড (গন্ধক) উৎপাদন করিতে মাত্র পাঁচ দিন সময় লাগে।

বেকটনের পরীক্ষামূলক কারখানায় বৈজ্ঞানিকেরা সহজেই এরূপ গ্যাস উৎপাদন করেন, যাহার মধ্যে থাকে শতকরা পাঁচ হইতে দশ ভাগ হাইড্রোজেন সালফাইড, শতকরা ৬০ হইতে ৬৫ ভাগ মিথেন, এবং শতকরা ৩০ ভাগ কার্বন ডাইঅক্সাইড। এই গ্যাস হইতে বিশুদ্ধ গন্ধক সংগ্রহ করা মোটেই কঠিন নয়। বর্তমানে ১০০,০০০ গ্যালন সালফেটযুক্ত ময়লা রাখিবার মত একটি বিরাট আধার ও

তদুপযোগী কলকারখানা স্থাপন করা হইতেছে। এই কারখানাটি চালু হইলে ময়লা হইতে প্রচুর পরিমাণ গন্ধক উৎপাদন করা সম্ভব হইবে।

বর্তমানে বিশ্বে গন্ধকের বা গন্ধক-আকরের অভাব নাই। কিন্তু বৃটেনে রসায়ন শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গন্ধকের ব্যবহার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫০ সালের মত ভবিষ্যতে পুনরায় যদি সঙ্কটের উদ্ভব হয় তাহা হইলে গন্ধকের জীবাণুরাই সেই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বৃটেনের বড় বড় সহরগুলির পরিত্যক্ত নর্দমার ময়লা হইতে অতি সহজে অন্ততঃপক্ষে ১০০,০০০ টন গন্ধক উৎপাদন করা সম্ভব হইবে। এই বিপুল পরিমাণ অতি প্রয়োজনীয় বস্তুটির উৎপাদন কার্যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিবে দৃষ্টির অগোচর অতি ক্ষুদ্র জীবাণুবাহিনী।

ডাঃ রোনাল্ড রসের জন্ম-শতবার্ষিকী

ম্যালেরিয়া নিবারণে ডাঃ রোনাল্ড রসের অবদান অবিস্মরণীয়। ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট আবিষ্কারের জন্যে ১৯০২ সালে তাঁকে নোবেল প্রাইজ দিয়ে সম্মানিত করা হয়। তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আর. এল. মেগ্রোন লিখেছেন—

১৮৫৭ সালের ১৩ই মে সার রোনাল্ড রস্ জন্মগ্রহণ করেন। ৮৮০ ও ১৮৯০ সালে তিনি ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসে একজন অখ্যাতনামা ডাক্তার ছিলেন। ১৮৯৭ সালে মশার পাকস্থলীর মধ্যে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটের (পরজীবী কীটাণু) অস্তিত্ব আবিষ্কার করে তিনি জগদ্বিখ্যাত হন। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের পিছনের ইতিহাস বহু দিনের কঠোর পরিশ্রম, অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অপরিসীম ধৈর্যের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। কাব্য রচনাতেও তাঁহার প্রভূত ক্ষমতা ছিল, কিন্তু বিজ্ঞানের সাধনায় আত্মনিয়োগ করবার ফলে তিনি ওই ক্ষমতার পুরাপুরি সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি।

ম্যালেরিয়া রোগের কারণ আবিষ্কার করে তিনি মানব ইতিহাসের এক ভয়ঙ্কর রোগের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে সংগ্রাম চালাবার পথ নির্দেশ করে দিয়েছেন, যে পথ অনুসরণ করে আমরা হয়তো অদূর ভবিষ্যতেই পৃথিবী থেকে এই রোগকে চিরতরে নির্মূল করতে পারবো।

সার রোনাল্ড ভারতে যে কবিতাগুলি লিখেছিলেন তার কয়েকটির মধ্যে রোগ প্রপীড়িত মানবের দুর্গতির প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি ও ডাক্তারের অসহায় মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। 'ভারতের জ্বর' নামক একটি কবিতায় তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন যে, যে অদৃশ্য, আপাত ক্ষুদ্র শক্তি কোটি কোটি মানুষকে হত্যা করছে, তার স্বরূপ তিনি যেন তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত করেন। কয়েক বছর ধরে তিনি ম্যালেরিয়া সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তারপর মশার সঙ্গে তার সম্পর্ক সম্বন্ধীয় মতবাদকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখবার সিদ্ধান্ত করেন। মশা যে শত শত বিভিন্ন জাতের হতে পারে, সেই সময় কারও তা জানা ছিল না।
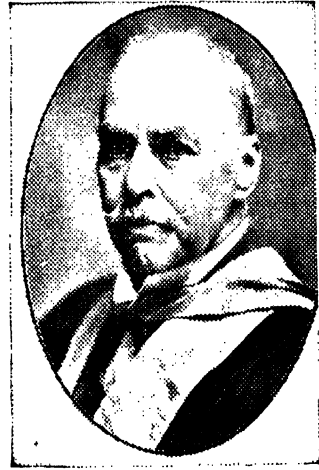
সার রোনাল্ড রস্

রস্ ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত অঞ্চলগুলিতে গিয়ে থাকবার চেষ্টা করতেন এবং আর্থিক অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতের মশা সংগ্রহের জন্যে অর্থব্যয় করতে কুণ্ঠিত হতেন না। তিনি ম্যালেরিয়া রোগীদের পয়সা ঘুষ দিয়ে তাদের মশার কামড় খাওয়াতেন, যাতে মশকেরা তাদের শরীরের দূষিত রক্ত শুষে খায়। সেই সব মশার রক্তে তিনি ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটের সন্ধান করতেন, যে প্যারাসাইট মানুষের রক্ত ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় নি।

চাকরি করবার সঙ্গে সঙ্গে দু'বছর কঠোর পরিশ্রম করবার পর তিনি নিজে ম্যালেরিয়ায়

আক্রান্ত হওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেন নি। এছাড়া কলেরা মহামারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোর সময় একবার তিনি কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর দ্বারদেশে উপনীত হয়েছিলেন।

১৮৯৭ সালে ২০শে আগষ্ট। যখন বারবার ব্যর্থ, ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে তিনি তাঁর চেষ্টা পরিত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছেন তখন এতদিন ধরে যা খুঁজছিলেন, তার সন্ধান পেলেন। সেদিন মাইক্রস্কোপে একটি অ্যানোফিলিস স্ত্রী মশার পাকস্থলীর দেয়ালের কোষের কালো দাগগুলি ভাল করে পরীক্ষা করে তিনি সেগুলিকে ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট বলে চিনতে পারেন।

চাকরি করা এবং অন্যান্য পথে অনুসন্ধান চালানো ছাড়াও রস্ ম্যালেরিয়ার কারণ আবিষ্কারের চেষ্টায় প্রায় এক হাজার মশার প্রায় প্রতিটি কোষের মধ্যে অণুবীক্ষণের সাহায্যে প্যারাসাইটের সন্ধান করেন। এক একটি মশাকে পরীক্ষা করতে অন্ততপক্ষে দু'ঘণ্টা সময় লাগে এবং অবশেষে কলাম্বাসের মত তিনি জ্ঞানের নতুন রাজ্যে এসে উপনীত হন। ১৮৯৮ সালে কলকাতায় পাখীদের ম্যালেরিয়া রোগ সম্পর্কে গবেষণা করবার পর তিনি প্যারাসাইটের জন্ম, জীবন ও কার্যকলাপের পূর্ণ পরিচয় প্রদান করেন। ১৮৯৯ সালে চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করবার পর তিনি ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিস থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

মশার প্রজনন ও বংশবিস্তার বন্ধ করতে পারলে ম্যালেরিয়া ও দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত পৃথিবীর এক বিরাট অংশের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে পারা যাবে, অন্যান্যদের এই কথা উপলব্ধি করানোর চেষ্টায় রস্ তাঁর অবশিষ্ট জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন। ১৯০২ সালে তাঁকে নোবেল প্রাইজ দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে তাঁকে প্রবল বিরোধিতারও সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর সুযোগ্য শিষ্য সার ম্যালকম ওয়াট্সনের তত্ত্বাবধানে মালয়ের কতকগুলি ম্যালেরিয়া বিধ্বস্ত অঞ্চল স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। সুয়েজ খালের কর্তৃপক্ষ তাঁর উপদেশ অনুযায়ী কাজ করে খাল অঞ্চলকে মশার উপদ্রব থেকে বহুলাংশে ম্যালেরিয়া-মুক্ত করতে সমর্থ হন।

মার্কিন চিকিৎসকগণ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মশার মধ্যে পীতজ্বরের কারণ আবিষ্কার করেন এবং হাভানা থেকে সেই ভয়ঙ্কর রোগ বিতাড়িত করতে সমর্থ হন। এর পর যুক্তরাষ্ট্রের মেডিক্যাল সার্ভিসের কর্মাধ্যক্ষ জেনারেল ডব্লিউ. সি. গর্গাসের উপর পানামা অঞ্চলের স্বাস্থ্যরক্ষার ভার অর্পণ করা হয় এবং তার ফলে পানামা খাল কাটা সম্ভব হয়। এর পূর্বে ম্যালেরিয়া ও পীতজ্বরের আক্রমণে ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ডি লেসেপ্স্ পানামা খাল কাটবার কাজ পরিত্যাগ করে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন।

১৯১৪ সালে গর্গাস রস্কে লেখেন—একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, আপনার আবিষ্কারের ফলেই আমরা খাল কাটতে সমর্থ হয়েছি।

ম্যালেরিয়া-বিরোধী সংগ্রামের সুদীর্ঘ কাহিনী চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে। আমরা শত্রুকে চিনি এবং জানি যে, বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্ট উক্ত সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করলে আমরা সংগ্রামে অবশ্যই জয়লাভ করবো।

বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা কেবল ম্যালেরিয়া রোগ নিবারণেরই চেষ্টা করছেন না, তারা পৃথিবী থেকে এই ভয়ঙ্কর রোগটিকে সমূলে উচ্ছেদ করবার পরিকল্পনা করেছেন। পৃথিবীর অনেক স্থানে ম্যালেরিয়াবাহী মশককুলকে সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত করে ম্যালেরিয়া রোগের উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়েছে।

মশকদের মধ্যে যাতে ডি.ডি.টি বা অন্যান্য কীটনাশক ঔষধের ক্ষমতা প্রতিরোধ করবার শক্তি না জন্মাতে পারে, ম্যালেরিয়া-বিশেষজ্ঞেরা তারও উপায় বের করেছেন। কোন জায়গা থেকে ম্যালেরিয়া রোগ দূর করবার পরেই সেখানে কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর ফলে মশকেরা ফিরে আসে, কিন্তু তাদের রোগ বিস্তারের ক্ষমতা অনেক কমে যায়। এরপর আবার ম্যালেরিয়া দেখা দিলে আবার ডি.ডি.টি দেওয়া হয় এবং তখন মশকদের তার ক্ষমতা প্রতিরোধের শক্তি থাকে না।

পৃথিবীতে এখনও প্রায় ২৫ কোটি লোক ম্যালেরিয়ায় ভোগে এবং এদের মধ্যে শিশুরাই বেশী কষ্ট পায়। সুতরাং এই সাংঘাতিক রোগটির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান চালিয়ে সাফল্য লাভ করবার প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি তা আর বলে বোঝাবার দরকার নেই।

১৯৫৭ সালের ১৩ই মে রোনাল্ড রসের জন্ম-শতবার্ষিক দিবস। মানবজাতির কল্যাণের জন্যে তিনি যে কাজ করেছেন, সেই কথা মনে রেখে সে দিনটি কৃতজ্ঞচিত্তে আমাদের প্রত্যেকেরই স্মরণ করা কর্তব্য।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুন—১৯৫৭

দশম বর্ষ ঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
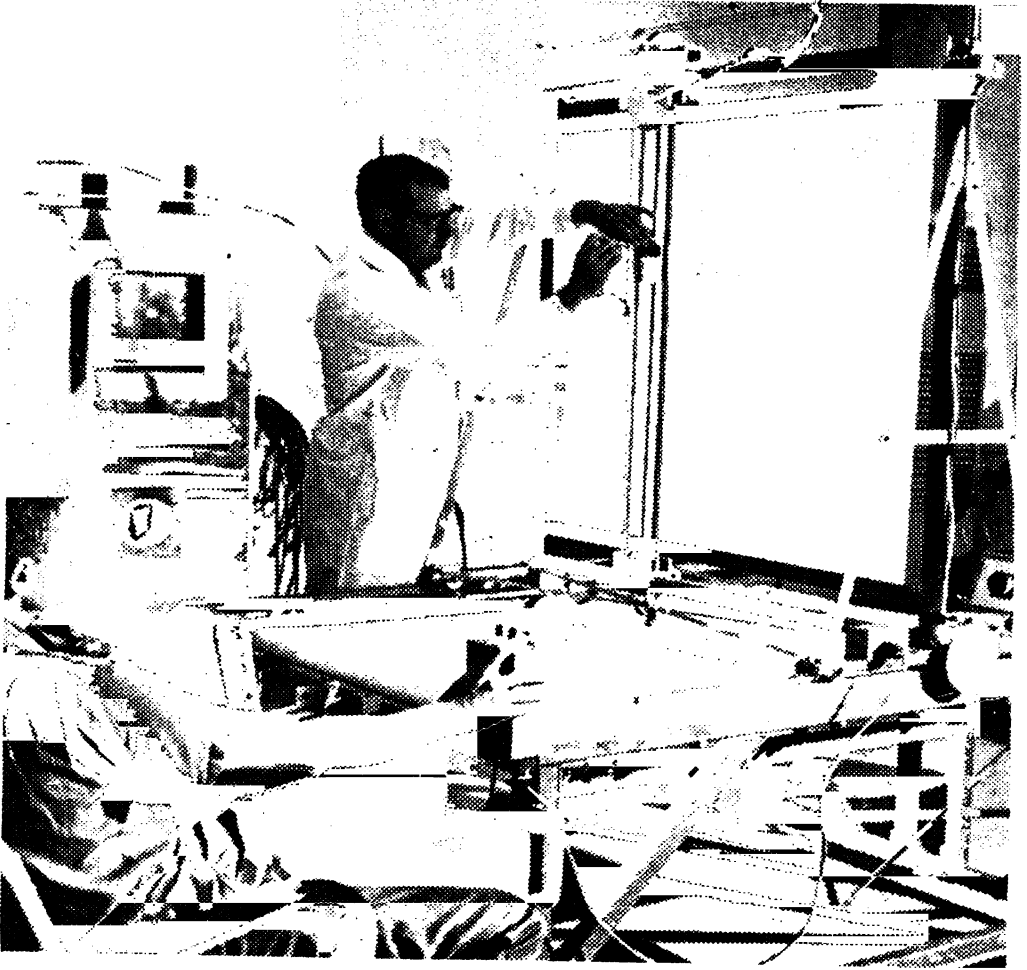
মানুষের ক্ষতি না হয় এমন ভাবে তেজস্ক্রিয় পদার্থ আকাশে ছড়িয়ে দেওয়ার উপায় সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন। তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিমাণ এবং তার গতি বিভিন্ন দূরত্ব থেকে এই ফটোগ্রামেটিক যন্ত্রের সাহায্যে নিরূপণ করা হয়ে থাকে।

জেনে রাখ

অশ্বের বিবর্তন

ঘোড়ার আজকের চেহারার সঙ্গে তার আদিপুরুষের চেহারায় মিলের চেয়ে অমিলই ছিল বেশী; অর্থাৎ প্রথম আবির্ভাবের পর অশ্বজাতি নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের রূপ পেয়েছে।

ঘোড়ার বিবর্তনের ইতিহাস প্রধানতঃ তার বিশেষ কয়েকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিবর্তনের ধারায় রূপ পেয়েছে। সেই প্রধান পরিবর্তনগুলি হচ্ছে, প্রথম অবস্থা থেকে আজ পর্যন্ত ঘোড়ার আকৃতি ক্রমশঃ বড় হয়েছে, গলা ও পাগুলি ক্রমশঃ লম্বা হয়েছে, পায়ের আঙ্গুল ক্রমশঃ সংখ্যায় একটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। দাঁতের গঠনও ক্রমশঃ জটিল হয়েছে। দাঁতগুলি ক্রমশঃ উঁচু ও লম্বা হয়েছে, যার ফলে ঘোড়ার চোয়াল গভীর ও লম্বাটে হয়ে গেছে (চিত্র দ্রষ্টব্য)।

আজ থেকে প্রায় ৬ কোটি বছর আগে যখন ঘোড়ার আদিপুরুষের আবির্ভাব হয় তখন আজকের ঘোড়ার সঙ্গে তার আকারগত বিশেষ কোন সাদৃশ্যই ছিল না। উচ্চতায় ছিল সে একটা কুকুরের মত, ঘাড়টি ছিল ছোট ও পিঠটি একটু বাঁকা। চারটি পা ছিল ঠিকই; তবে সামনের পা দুটা ছিল একটু ছোট, আর সামনের পায়ে ছিল ৪টি সুদৃশ্য আঙ্গুল। আর পিছনের পায়ে ছিল ৩টি, তার মধ্যে ছোট দুটি মাটিতে ঠেকতো না, পায়ের দুপাশে ঝুলে থাকতো। পুরা-প্রাণিতত্ত্ববিদেরা এর নাম দিয়েছেন ইয়োহিপ্পাস (প্রভাতী অশ্ব)। এর পরবর্তীকালে এদের চেহারা একটু বড় হলো। সামনের পায়ের তৃতীয় আঙ্গুলটি লম্বায় অন্য আঙ্গুলগুলিকে ছাড়িয়ে গেল, আর পিছনের পায়ে প্রথম ও শেষ আঙ্গুলের অবশিষ্টাংশও মিলিয়ে যেতে লাগলো।

এভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিবর্তনের মধ্যে ঘোড়ার বিবর্তন এগিয়ে চললো। পরবর্তীকালে এদের উচ্চতা দাঁড়ালো ১৪ ইঞ্চি। সামনের পায়ে তখনও ৪টি আঙ্গুলই রয়েছে; কিন্তু মাঝের আঙ্গুলটা অন্যগুলির চেয়ে বড় হয়ে যাচ্ছে। দাঁতের গঠনেরও তখন পরিবর্তন সুরু হয়ে গেছে—কষের দাঁতের আগের দাঁতগুলি গড়নে ক্রমশঃই কষের দাঁতের মত হতে সুরু করলো। দাঁতগুলি ক্রমশঃ উঁচু ও খুব বেশী খাঁজ কাটা হয়ে গেল (চিত্র দ্রষ্টব্য)। সামনের দাঁতগুলি হলো কোদালের মত পাত্‌লা।

দেখা যায়, এর পরে এদের উচ্চতা ১½-২ ফুট-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মাথাটা তখনও বেশ বড় (দেহের অনুপাতে); চোয়াল তখনও গভীর হয় নি। তবে মোটা মোটা বেঁটে

পাগুলি সরু হতে সুরু করেছে। দাঁতের গঠনও ক্রমশঃ জটিল হচ্ছে, তবে শক্ত জিনিষ চিবিয়ে খাবার মত দৃঢ়তা তখনও পায় নি। এদের বলা যেতে পারে আদি অশ্ব।

এদের পরবর্তী কালের ঘোড়ার আদিপুরুষেরা ৪৫০০ লক্ষ বছর ও তার পরে প্রাধান্য লাভ করেছিল। ক্রমশঃই এদের পায়ের পাশের দিকের আঙ্গুলগুলি ছোট হতে লাগলো; কারণ ও আঙ্গুলগুলি তো আর কাজে লাগতো না! তবে তিনটি আঙ্গুলই

লক্ষ বছর

ক খ গ ঘ

বর্তমান কাল

১০

১৫০

৩০০

৪৫০

৬০০

১. ২.
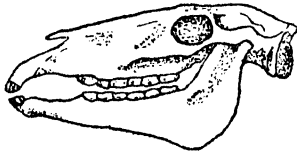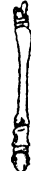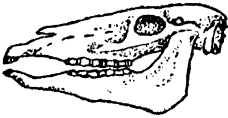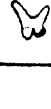
অশ্বের কয়েকটি অঙ্গের ক্রমবিবর্তনের ধারা। (ক) মাথার খুলি, (খ) সম্মুখের পা, (গ) পিছনের পা, (ঘ) দাঁত। (১) পাশ থেকে, (২) উপর থেকে দেখা।

মাটিতে ঠেকতো। এই সময় উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে অশ্বের আদিপুরুষের, যারা সমভূমি ছেড়ে বনে গিয়েছিল, পায়ের তিনটি আঙ্গুল ঐ রকমই রয়ে গেল। আর যারা সমভূমিতে চরে বেড়াতে লাগলো তাদের পায়ের পাশের আঙ্গুলগুলি আরও ছোট হতে লাগলো।

এইভাবে ৩০ লক্ষ বছর আগে ও তার কিছুকাল পর পর্যন্ত ঘোড়ার বিবর্তন

তার উচ্চতা, দাঁতের ও পায়ের গঠনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে রূপ পেতে লাগলো।

এই সময় তিনটি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধারায় অশ্বের বিবর্তনে অগ্রগতি ও পরিসমাপ্তি লাভ করে। এদের একটি গোষ্ঠী, যারা ইউরোপ ও এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে তারা আজ থেকে ১৫ লক্ষ বছর আগেকার যুগে বসবাস করেছিল। এদের সাধারণ উচ্চতা ছিল ৪০ ইঞ্চি। অন্য দল দক্ষিণ আমেরিকায় ১০ লক্ষ বছর আগে পর্যন্ত প্রাধান্য লাভ করে। এরা তখন কার্যতঃ একটি আঙ্গুলের উপরই চলাফেরা সুরু করে দিয়েছে। ঘোড়ার আপন দেশ উত্তর আমেরিকায় ১৫ লক্ষ বছর আগে ও তার পরবর্তী যুগে যারা বসবাস করেছিল—তাদের প্রকৃতপক্ষে এক আঙ্গুলে ঘোড়াই বলা চলে।

এরই পরের অবস্থায়, অর্থাৎ ১৫ লক্ষ বছরের পরবর্তী কালের মধ্যে ঘোড়ার আকৃতি অনেকটা আধুনিকতা প্রাপ্ত হলো। দাঁতগুলি উঁচু হয়ে উঠলো, চোয়াল হলো গভীর, পায়ের ছোট ক্ষুরওয়ালা মাঝের আঙ্গুলের পাশে অকেজো আঙ্গুল দুটি ছোট হয়ে ক্রমশঃ মিলিয়ে যেতে সুরু করলো—আর মাথার খুলিটাও আজকের ঘোড়ার মত হয়ে উঠলো। আর তারই পরে এলো আজকের আধুনিকতম ঘোড়া। তারই সগোত্র হয়ে দেখা দিল জেব্রা আর গাধাজাতীয় প্রাণীরা। আজও ঘোড়ার পায়ের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে তার পুরনো দিনের আঙ্গুলের চিহ্ন পাওয়া যাবে।

প্রধানতঃ উত্তর আমেরিকাতেই এই বিবর্তনের পালা অভিনীত হয়েছে। আমাদের হিমালয়ের কোলে সে সময়ের শিবালিক সংঘের প্রস্তর-স্তরে আজকের ঘোড়ার কোন কোন আদিপুরুষের প্রাচীন চিহ্ন আজও বর্তমান আছে অতীত যুগের সাক্ষ্য বহন করে।

শ্রীমিহির বসু

কচ্ছপ

তোমাদের মধ্যে যারা গ্রামে থাক, তারা হাটে-বাজারে কচ্ছপ বিক্রী হতে নিশ্চয়ই দেখেছ। নদী, পুকুর বা ডোবা থেকে, কিম্বা কখনো কখনো ঝোপ-ঝাড় থেকে লোকে ধরে নিয়ে এসেছে, এমনও দেখে থাকবে। নদীর ধারে বা ঝোপের ধারে দু-একটা কচ্ছপকে এমনি যেতে, কি সাঁতার কাটতেও দেখেছ হয়তো কেউ কেউ। যারা কলকাতায় থাকো তারাও চিড়িয়াখানা কিম্বা কলকাতার বাজারেও কচ্ছপ দেখেছ। অর্থাৎ এ জীবটির সঙ্গে বাংলা দেশের সব ছেলেমেয়েরই চাক্ষুষ পরিচয় আছে।

তোমরা জান, কচ্ছপের সমস্ত শরীরটা একটা হাড়ের মত খোলায় ঢাকা। বাইরে তার কেবল চারটি পা, লেজ ও মাথাটি, যা সে ভয় পেলে আত্মরক্ষা করতে প্রয়োজনমত

সেই খোলার দুর্গে টেনে নিতে পারে। কিন্তু কখনো কি তোমাদের মনে হয়েছে, কেন এই জীবটি ওই রকম ? পৃথিবীর সব জীবজন্তুরই শরীরের মাংস বাইরে আর হাড় ভিতরে, কিন্তু ওর বেলায়ই বা এমন অদ্ভুত উল্টা ব্যবস্থা কেন ? হাঁ, এই কেন-রও একটা কারণ আছে বই কি ; প্রকৃতির কিছুই অকারণ নয়—অন্ততঃ মানুষ তার চিন্তা এবং অনুসন্ধান দিয়ে সব জিনিযেরই একটা কারণ দাঁড় করিয়েছে। তবে কচ্ছপের এ ব্যাপার তত্ত্ব বিজ্ঞানের কথা—এখনকার মত তা বাদ দিয়ে রাখছি—কেবল এইটুকু বলতে পারি যে, ওটা হাড় নয়। ওটা শিং-এর উপাদানের মত একটা পদার্থে তৈরী ; যদিও শারীরতত্ত্বের হিসাবে হাড় থেকেই ওর আরম্ভ।

তোমরা জান, আমাদের সবারই কতকগুলি পাঁজরা আছে যাকে কখনো কখনো বা কেউ কেউ আমরা বলে থাকি, বুকের হাড়। সত্যি কথা বলতে কি, ওদের কেবল বুকের হাড় বলাটা ভুল ; কারণ, পাঁজরার আরম্ভ পিঠ থেকে, ওর গোড়া আমাদের মেরুদণ্ডে, আর সারা শরীরটি বেড় দিয়ে ঘুরে এসে শেষ হয়েছে বুকে একটি খাঁচার মত হয়ে। বুকের উপরে একখানি হাড়ের প্লেট আছে—কণ্ঠের হাড়ের কাছ থেকে আরম্ভ হয়ে পেটের উপর পর্যন্ত। নীচের চার-পাঁচখানি ছাড়া সব পাঁজরাগুলি এসে শেষ হয়েছে এই হাড়খানাতে। এই কথাটা যদি বুঝতে পার তাহলেই কচ্ছপের শরীরের ব্যবস্থাটা বুঝতে পারবে।

ওর পেটের অংশটা যদিও শিং-এর উপাদানের মত পদার্থে তৈরী, তবু তা তৈরী হয়েছে এই পাঁজরাগুলির একত্র সংযোজনে। আর পেটের অংশটা বুকের সেই ক্ষুদ্র প্লেটটুকু মাত্র, প্রয়োজনমত বেড়ে বড় হতে হয়েছে। এই হাড়ের বাক্সের মধ্যে ওর শরীর, হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস, অন্ত্র ইত্যাদি ; আর বাইরে পা, মাথা, লেজ যা সে প্রয়োজনমত টেনে নিতে পারে ঐ বাক্সের দুর্গে।

কচ্ছপের দাঁত নেই মুখটাও অন্য জন্তুজানোয়ারের মত চামড়া আর মাংসে তৈরী নয়, ওটা অনেকটা পাখীর ঠোঁটের মত। দু'ধার রীতিমত ধারালো, যা দিয়ে সে ঘাসপাতা বা বিবিধ জৈব পদার্থ কেটে খেতে পারে। তফাৎ কেবল—ওর ঠোঁটের ভিতরে খানিকটা মাংসের তালু আছে। পাখীর তা নেই, সেটা একেবারেই ফাঁকা। মেঠো কচ্ছপ উদ্ভিদ-ভোজী ; তবে জলের কচ্ছপ মাছ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ দুই-ই খায়।

কচ্ছপ পা দিয়ে হাঁটে বটে, কিন্তু শুধু পায়ের উপর ভর করে সম্পূর্ণ উঁচু হয়ে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারে না। চলবার সময় তার বুকের হাড় মাটি ছুঁয়ে থাকে, অর্থাৎ সে বুকের উপর ভর রেখে পা দিয়ে শরীর ঠেলে ঠেলে এগিয়ে চলে মাত্র। কচ্ছপের শরীরের সম্পূর্ণ ভার বইবার পক্ষে তার পা যথেষ্ট বলশালী নয়। সেজন্যেই কচ্ছপ চলে ধীরে ধীরে। তাই কচ্ছপের চলা 'ধীরে চলার' প্রবাদে দাঁড়িয়েছে। খরগোস আর কচ্ছপ সম্বন্ধে ঈশপের গল্প বোধ করি তোমরা সবাই জান। তবু এ কথাটাও কিন্তু সম্পূর্ণ

ঠিক নয়। প্রয়োজন হলে বুকের উপরে ভর রেখেও কচ্ছপ যথেষ্ট জোরে ছুটতে পারে। তবে তা খরগোসের মত অতটা অবশ্য নয় কোন রকমেই।

সারা পৃথিবীতে বহু জাতের কচ্ছপ আছে, তা কয়েকশ' রকমের হবে। বাংলা দেশে যদিও অনেক রকম কচ্ছপ আছে তবুও তার দুটি বিশেষ প্রকার-ভেদ হচ্ছে কেটো ও কাছিম। কেটো বলে সেটাকেই যার হাড়টা আগাগোড়াই শক্ত শিং-এর উপাদানের মত পদার্থে তৈরী। কিন্তু কাছিমের পিছন দিককার খানিকটা অংশ বেরিয়ে নরম চামড়া আর মাংসের মত হয়, ইংরাজীতে যাকে বলে কার্টিলেজ। কাছিম অনেকটা জলেরই জীব; কেটো জলেও থাকে, মাঠেও থাকে—সে হচ্ছে মেঠো জীব। তা হলেও থাকে সব সময়ই জলের কাছাকাছি; বৃহৎ জলা-মাঠ বা বিল তার স্বর্গ। বাংলা দেশের এই দু-জাতের ভিতরেই অনেক উপজাতি আছে। তাও কিছু কম রকমের নয়!

আকারেও কচ্ছপ খুব ছোট থেকে খুব বড় বড় হয়। এক-একটা জাত একপো-আধসের থেকে চার-পাঁচ মণ পর্যন্ত হয়ে থাকে। সুবৃহৎ কচ্ছপের ইংরেজী নাম Giant Tortoise; বাংলাতে ওকে বোঝাবার জন্যে কোন বিশেষ নামকরণ হয় নি, তবে বলা চলে অতিকায় কচ্ছপ। যদিও সত্যিকার অতিকায় কচ্ছপ পৃথিবীতে ছিল বহুকাল আগে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে। সে সব কচ্ছপের একটা খোলা দিয়েই মোটামুটি রকম একটা ঘরের চাল তৈরীর কাজ চলতে পারতো এবং সেই আদিম মানুষ যে তা করতো, মানবেতিহাস সন্ধানের ফলে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে অনেক। সে সব কচ্ছপ ওজনে কয়েকশ' টন হতো নিশ্চয়ই।

কলকাতার মিউজিয়ামে সেকালের কচ্ছপের একটা খোলা আছে। যদিও সেটা খুবই ছোট, তবু তার ভিতরে তোমাদের মত পাঁচ-সাত জনের বসবার জায়গা হতে পারে। সেটা আছে উত্তর দিকের দোতলার ঘরে, একেবারে দোরের কাছেই। তোমরা যারা কলকাতায় থাক, তারা সুযোগ করতে পারলে গিয়ে দেখে এসো।

বাংলা দেশে কত রকমের কচ্ছপ আছে সেটা খোঁজ করবার চেষ্টা করো। এ কাজ করতে প্রথম দরকার হয় অনুসন্ধিৎসা, তারপর সম্ভবতঃ সামান্য খরচ, আর কিছুটা সময়। কিন্তু লাভ হয় অমূল্য। জীবনে হয়তো একটা পথও পেয়ে যেতে পার। ভবিষ্যতে তুমিই যে প্রাণিবিজ্ঞানী হবে না, সে কথা কেউ বলতে পারে কি? আর তারও উপরে আছে আনন্দ, জ্ঞানের আনন্দ—যা-ই কেন না জীবনে কর তুমি।

শ্রীবিনায়ক সেন

জানবার কথা

১। ফুলের রং এবং গন্ধ বিভিন্ন কীট-পতঙ্গকে প্রলুব্ধ করে থাকে। এর ফলে কীট-পতঙ্গের দ্বারা উদ্ভিদের পরাগ-সংযোগ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ফুলের রংই

১নং চিত্র

মৌমাছিকে প্রথমে আকৃষ্ট করে। গন্ধ তাদের নিকট গৌণ বিষয়।

২। সাধারণভাবে শরীরের শক্তি প্রয়োগ করে পাথর ভাঙ্গা সম্ভব। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাথর ভাঙ্গা আরও সহজসাধ্য। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে,
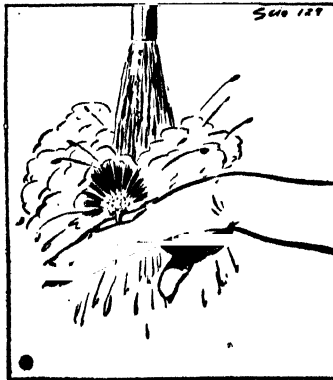
২নং চিত্র

হঠাৎ যদি উষ্ণতার পরিবর্তন ঘটানো যায় তাহলে ওপ্যাল (opal) একেবারে টুক্‌রা হয়ে পড়ে।

৩। ভাইরাসের আক্রমণেই সর্দি হয় এবং এর কোন সঠিক প্রতিষেধক বা চিকিৎসা-পদ্ধতি স্থির করা এখনও সম্ভব হয় নি। সর্দিতে আক্রান্ত হয় নি, এরকম লোক

৩নং চিত্র

বিরল বলা চলে। মজার কথা হচ্ছে, পৃথিবীর প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র মানুষ এবং মানবসদৃশ প্রাণী, অর্থাৎ গরিলা, শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি প্রাণী ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীদের নাকি সর্দিতে আক্রান্ত হতে দেখা যায় না।

৪। সূর্যের কতকগুলি অংশ কালো দেখায়—এগুলিকে সৌরকলঙ্ক বলা হয়। প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই রহস্যের সমাধান করবার চেষ্টা করেছিলেন। আধুনিক-কালের বিজ্ঞানীরাও উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যে সৌরকলঙ্ক সম্পর্কে গবেষণা করছেন—কিন্তু এখনও বিজ্ঞানীদের কাছে সৌরকলঙ্কের ব্যাপারটা রহস্যাবৃত। বিভিন্ন
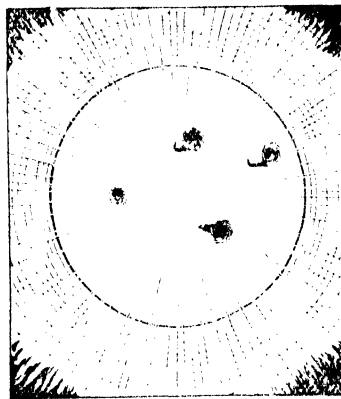
৪নং চিত্র

দেশের অধিবাসীদের বিশ্বাস—সৌরকলঙ্কের জন্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী, যুদ্ধ ও

অন্যান্য দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। ১৯৪৭ সালে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সৌরকলঙ্ক দেখা গিয়েছিল এবং তা পৃথিবীর চেয়ে ২৫ গুণ বড় ছিল।

৫। ৪,০০০ যাত্রীবাহী জাহাজ গ্রেট ইষ্টার্ণ ইংল্যাণ্ডে নির্মিত হয়েছিল (১৮৫৪—১৮৫৮)। বাষ্পীয় জলযানের ক্ষেত্রে গ্রেট ইষ্টার্ণের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু গ্রেট
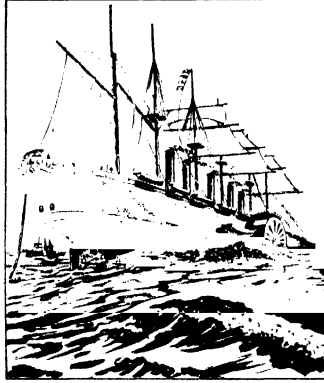
৫নং চিত্র

ইষ্টার্ণ বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে আটলাণ্টিক মহাসাগরে বার্তাবাহী তার স্থাপনে।

৬। পৃথিবীতে যত মালপত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চালান যায় তন্মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের গম চালান সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। মাল চালানের ক্ষেত্রে গম চালানের
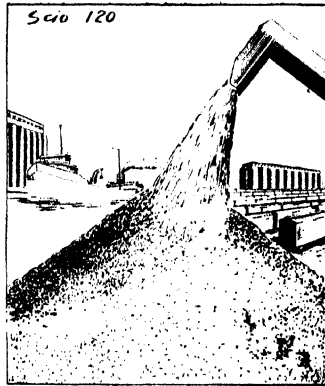
৬নং চিত্র

পরিমাণই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক। প্রতি গাড়ীতে ১৮০০ বুশেল করে ৭৫০,০০০ গাড়ী গম চালান হয়।

৭। খড়ের গাদায় সূচ খুঁজে বার করবার চেষ্টা অদ্ভুত বলে মনে হবে। কেন না,

কাজটা সম্পন্ন করা প্রায় অসম্ভব বলা চলে। কিন্তু পৃথিবীতে এরকম রেকর্ডও আছে যে,

৭নং চিত্র

খড়ের গাদা থেকে একটি স্থচ ৩ মিনিট ২৬ সেকেণ্ডের মধ্যে খুঁজে বার করা সম্ভব হয়েছিল।

৮। ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের নাম আজ আর তোমাদের অজানা নয়। এই বিশ্ব-বিখ্যাত ঔষধটি আবিষ্কার করেছিলেন ডাঃ সেলম্যান এ. ওয়াক্সম্যান। তিনি নিউজার্সির অন্তর্গত নিউব্রান্সউইকের রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজীর অধ্যাপক।
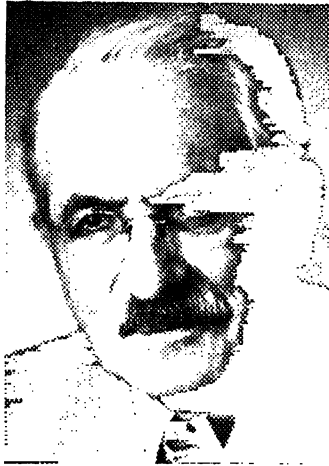
৮নং চিত্র

ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন সংক্রান্ত গবেষণার জন্যে তাঁকে ১৯৫২ সালে ভেষজ ও শারীরবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। ৬৪ বৎসর বয়স্ক ডাঃ ওয়াক্সম্যান ৪২ বৎসর পূর্বে রাশিয়ার ইউক্রাইন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বাস করবার জন্যে যান। কিয়েভ থেকে ৯০ মাইল দূরে প্রিলুকা নামক ছোট গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ডাঃ ওয়াক্সম্যান রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা লাভ করেন।

বিবিধ

ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের জীবাণুর সন্ধান

গত ফেব্রুয়ারী মাস হইতে সুদূর প্রাচ্যের বহু দেশে ব্যাপক আকারে ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিয়াছে। মার্কিন সামরিক বিভাগের ওয়াল্টার রীড রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকগণ দিবারাত্র কাজ করিয়া ঐ রোগের জীবাণুর সন্ধান পাইয়াছেন।

রীড ইনষ্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকগণ জানাইয়াছেন যে, বর্তমান গবেষণায় যে রোগজীবাণু ধরা পড়িয়াছে পূর্বাবিষ্কৃত ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের সমুদয় রোগজীবাণু, হইতে উহা পৃথক। উহার নাম দেওয়া হইয়াছে টাইপ-এ। উহা আবিষ্কারের জন্য বৈজ্ঞানিকদের নিরবচ্ছিন্নভাবে কিছু দিন ধরিয়া পরিশ্রম করিতে হইয়াছে।

যে ছয়টি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মার্কিন প্রতিষ্ঠান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের টীকা উৎপাদন করিয়া থাকে, ঐ রোগজীবাণু তাহাদের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। রীড ইনষ্টিটিউটে অবশ্য উহা লইয়া এখনও গবেষণা চলিবে।

গত ফেব্রুয়ারী মাস হইতে হংকং, তাইওয়ান, মালয়, কম্যুনিস্ট চীন ও ফিলিপাইনে ব্যাপক আকারে এই ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিয়াছে। উহাতে বহুলোক আক্রান্ত হইলেও উহার আক্রমণ খুব তীব্র হয় না বলিয়া জানা গিয়াছে।

নূতন ধরণের ভাইরাস

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষণা করিয়াছেন যে, গত দুই মাসে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় সংক্রামক ব্যাধির আকারে যে ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে একটি নূতন ধরণের ভাইরাস। এই ভাইরাসের নাম হইয়াছে 'টাইপ-এ'। সিঙ্গাপুর হইতে প্রাপ্ত নমুনায় এই ভাইরাস আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইনফ্লুয়েঞ্জার যে সকল প্রতি-ষেধক জানা আছে, তাহার কোনটিই এই পর্যন্ত এই রোগ ঠেকাইতে পারে নাই।

হংকং ও পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল হইতে প্রাপ্ত ভাইরাসের নমুনা লণ্ডনের বিশ্ব ইনফ্লুয়েঞ্জা কেন্দ্রে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা হইয়াছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হংকং, ফরমোজা, কাম্বোডিয়া, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, উত্তর বোর্ণিও ও ফিলিপাইন হইতে প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া মোটামুটি ইহাই বুঝিতে পারিয়াছে যে, এই নূতন ধরণের ভাইরাস মানবদেহে প্রবেশ করিলে নিদারুণ মাথা ব্যথা ও সর্বশরীরে বেদনা অনুভূত হয়। দুই-তিন দিন যাবৎ ১০১ হইতে ১০৩ ডিগ্রী (ফারেনহাইট) পর্যন্ত জ্বর থাকে এবং ইহার পর তিন-চার দিন একরকম শয্যাশায়ীই থাকিতে হয়।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দশম বর্ষ | জুলাই, ১৯৫৭ | সপ্তম সংখ্যা

শব্দহীন শব্দ*

শ্রীঅশোককুমার দত্ত

কবিতা লেখার বেদনায় সুখ আছে, বলেছেন ইংরেজ কবি ক্যসার। কথাটি প্রথমে বিরোধমূলক মনে হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য রচনার অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে তারা জানেন, ক্যুসারের উক্তি কতখানি গভীর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। অমানুষিক মানুষ, অনিয়মিত নিয়ম ইত্যাদি কথার মানে আমরা বুঝি, কিন্তু সাবানহীন সাবান, ঠাণ্ডা আগুন ইত্যাদি কথার যে কোন বস্তুগত অর্থ থাকতে পারে, এতদিন তা আমাদের কল্পনার বাইরে ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্রিয়াকলাপ আজ যেন মানুষের কল্পনাকেও ছাড়িয়ে গেছে! সাবানহীন সাবান হলো, সাধারণ সাবানের মত সোডিয়াম বা পটাসিয়াম সংযোগে তৈরী না হয়েও যে জিনিষ জলের সঙ্গে ফেনা কাটে এবং ময়লা দূর করবার ক্ষমতা রাখে; আর ঠাণ্ডা আগুন হলো, যে আগুনে কোন কিছু, এমন কি, দেশলাইয়ের কাঠিও জ্বলে উঠবে না। কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ফস্‌ফরাস বাষ্পের সংস্পর্শে এসে অন্ধকার স্থানে তাপহীন অগ্নিশিখার মত জ্বলতে দেখা যায়।

'শব্দহীন শব্দ' কথাটিরও তেমনি একটা অর্থ আছে। শব্দহীন শব্দ মানে, যে শব্দ আমরা শুনতে পাই না, অর্থাৎ যে শব্দ আমাদের শ্রবণানুভূতির বাইরে। দর্শনশক্তির মত আমাদের শ্রবণশক্তিরও একটা সীমা আছে। মনে পড়ে, একবার বিহারে কোন পাহাড়ে উঠে ভেবেছিলাম, চারদিককার উন্মুক্ত মাঠে কোন জীবজন্তু নেই। কিন্তু চোখে দূরবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়ে দেখেছিলাম, আমার ধারণাই ভুল—তৃণহীন মাঠে কয়েকটি গরু শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে। শুধু সীমাবদ্ধ দৃষ্টিশক্তির জন্যে খালি চোখে তাদের দেখতে পাই নি।

কিন্তু শুনতে পাই নি বলেই কোন শব্দকে শব্দহীন শব্দ বলা যায় না। বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে হলে জানতে হবে, শব্দ কি এবং কি উপায়ে শব্দের উৎপত্তি হয়ে থাকে। যে বোধ আমাদের কানে এসে মস্তিষ্কে কোন শব্দের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে, তা-ই হলো শব্দ। যা আমাদের মধ্যে এই শব্দবোধ জাগায় তা হলো এক ধরণের শক্তি; যেমন—তাপ, আলো, বিদ্যুৎ, শক্তির বিভিন্নরূপ মাত্র।

শব্দ কম্পনজাত; কোন জিনিষ না কাঁপলে তা

থেকে শব্দ বেরুতে পারে না। কেউ যখন তারের যন্ত্র বাজায়, তারটি তখন কাঁপতে থাকে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, দ্রুত কম্পনের ফলে তারটিকে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তারের কম্পন থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শব্দও থেমে যায়। বাতাসের পরিমিত কম্পনের ফলেও শব্দ হয়; কাজেই আমরা বাঁশীর সুর শুনতে পাই। কারণ কম্পনের ফলে শব্দের উৎপত্তি হয়ে তা স্থিরভাবে থাকে না। পুকুরে ঢিল ফেললে সেই আঘাত যেমন তরঙ্গাকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, শব্দও সেরূপ কম্পনের ফলে চারদিককার বাতাসে লম্বালম্বিভাবে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই বিশেষ আলোড়নকে আমরা শব্দ-তরঙ্গ বলে থাকি।

অনুরূপ আরেকটি তরঙ্গ আছে যাকে বলা হয় উচ্চ শব্দ-তরঙ্গ বা Supersonic waves। শব্দের উৎস যদি সেকেণ্ডে ২৫,০০০ বারের বেশী কাঁপতে থাকে তবে এই শ্রেণীর শব্দ-তরঙ্গ পাওয়া যায়। কারণ সেকেণ্ডে ২৫,০০০ বারের বেশী কম্পনধর্মী শব্দ-তরঙ্গ আমাদের মস্তিষ্কে শব্দানুভূতি জাগায় না। এজন্যেই খুব ছোট বাঁশীর বাজনা আমরা শুনতে পাই না। এসব বাঁশীর সাহায্যে বাতাসের মধ্যে যে কম্পন তোলা যায় তা ২৫,০০০ বারের অনেক বেশী। সুতরাং শব্দহীন শব্দ আসলে কোন উচ্চ বা নিম্ন শব্দ-তরঙ্গমালা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু নিমেষের মধ্যে ২৫,০০০ বারের বেশী কম্পন তোলা সহজ কাজ নয়। ঘণ্টা, কাঁসি বা
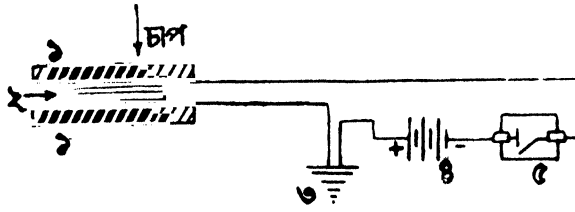
১ম চিত্র

পিজো বিদ্যুৎ

১, ১'—ধাতবপাত; ২—স্ফটিকখণ্ড; ৩—মৃত্তিকা; ৪—ব্যাটারী; ৫—বিদ্যুৎ পরিমাপক যন্ত্র।

শব্দের নিমিত্ত কম্পন—এই বিষয়ে সন্দেহ না থাকলেও যে কোন প্রকারের কম্পন আমাদের শব্দের অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে পারে না। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, কোন জিনিষের কম্পন যদি সেকেণ্ডে ১৬ বারের কম হয় তাহলে কোন শব্দ শুনতে পাওয়া মানুষের পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু শব্দ শোনা না গেলেও ঐ মৃদু কম্পনের ফলে বাতাসে যে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। না-শুনতে পাওয়া শব্দের দরুণ বাতাসের এই আলোড়নকে আমরা নিম্ন শব্দ-তরঙ্গ বলতে পারি। ইংরেজীতে বলা হয় Infrasonic waves।

ঢোল বাজিয়ে এই শ্রেণীর শব্দ-তরঙ্গ উৎপন্ন করা যায় না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা নিরাশ হওয়ার পাত্র নন। তাঁহাদের চেষ্টা একদিন সফল হলো। এই অসম্ভব কাজের সূত্রপাত করেন ক্যুরী পরিবারের দু-ভাই। ১৮৮০ সালে তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, কোন কোন অসম দানার (Asymmetric crystal) দু-পাশে চাপ দিলে অপর দু-পাশ থেকে বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হয় (১ম চিত্র)। চাপের পরিবর্তে টান পেলে বিদ্যুৎ-প্রবাহের গতি বিপরীতমুখী হয়ে থাকে। আবিষ্কর্তার নামানুসারে এভাবে উৎপন্ন বিদ্যুৎ-প্রবাহকে পিজো বিদ্যুৎ

বলা হয়। পরের বছর লিপম্যান অপর একটি বিষয় লক্ষ্য করেন। তিনি দেখলেন, পিজোর বিদ্যুৎ-ক্রিয়া বিপরীতভাবেও সত্য—অর্থাৎ স্ফটিক ইত্যাদি কোন দানার (চাপের প্রভাবে) আকৃতিগত পরিবর্তন যেমন বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন করে, তেমনি আবার বিদ্যুৎ প্রবাহের দ্বারাও স্ফটিকের আকৃতি-গত পরিবর্তন সাধন করা যায়। এই বিদ্যুৎ-প্রবাহ যদি পরিবর্তী হয়, অর্থাৎ বিদ্যুৎ-প্রবাহের গতি যদি ক্রমাগত দিক পরিবর্তন করে তাহলে স্ফটিকের আকৃতিরও সেই হারে পরিবর্তন ঘটবে, অর্থাৎ বিদ্যুৎ-প্রবাহের দিক বুঝে স্ফটিকখণ্ডটি ক্রমাগত দু-পাশে সঙ্কুচিত এবং অপর দু-পাশে প্রসারিত চিত্রে আমরা ল্যাঞ্জিভিন প্রবর্তিত শব্দ উৎপাদন প্রণালী বোঝাবার চেষ্টা করেছি (২য় চিত্র)। এ ছাড়া পার্সি, হার্টলি প্রভৃতির উদ্ভাবিত পদ্ধতিও আছে।

আসল কথা, কেবলমাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যেই বৈজ্ঞানিকেরা উচ্চ শব্দ-তরঙ্গ নিয়ে এত গবেষণা করেন নি। শব্দহীন শব্দের মধ্যে প্রয়োগ-গত বিপুল সাফল্যের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। শুধু ইঙ্গিত নয়, নানা ক্ষেত্রে ব্যবহারও সুরু হয়েছে।

তেলে আর জলে মিশ খাওয়ানও অসম্ভব নয় এই উচ্চ শব্দ-তরঙ্গমালার পক্ষে। উড্ এবং ল্যুমিস্ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, এরূপ তরঙ্গায়িত কোন
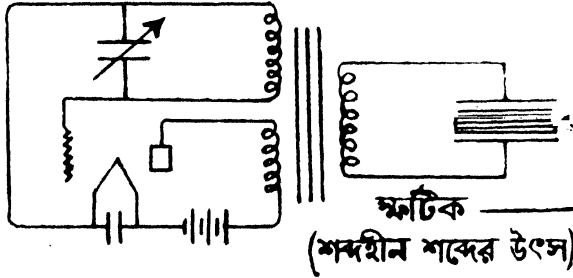
২য় চিত্র

বৈদ্যুতিক কম্পন যন্ত্র (Piezo Electric Oscillator)।
এই পদ্ধতিতে অতিদ্রুত কম্পনজাত শব্দ-তরঙ্গ উত্থিত হয়।

হতে থাকবে। স্ফটিকগাত্রের এই কম্পন সংলগ্ন বাতাস বা জলের মধ্যে লম্বালম্বিভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে, ঠিক যেমন সাধারণ শব্দ উৎপত্তির সময় যে ভাবে কম্পন বাতাসে ছড়িয়ে থাকে। শুধু এইটুকু তফাৎ যে, দ্রুত কম্পনের ফলে এই আলোড়ন বা শব্দ-তরঙ্গের কোন অনুভূতি আমাদের মস্তিষ্ক গ্রহণে সক্ষম হয় না।

কিন্তু যে শব্দ আমরা শুনতে পাই না তা নিয়ে আমাদের এত মাথা ব্যথা কেন? সত্যি তো কেউ যদি এই উচ্চ শব্দ-তরঙ্গে গান গেয়ে থাকেন, কোন মানুষই তা শুনতে পাবে না। তবু বহু বৈজ্ঞানিক বহু বছরের সাধনায় এই শব্দহীন শব্দ উৎপাদনের নানা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। তেলে অমিশ্রিত দুটি তরল পদার্থের একটি আধার ডুবিয়ে রাখলে পদার্থ দুটি স্থায়ীভাবে মিশ খেয়ে যায়। শব্দ-তরঙ্গজাত দ্রুত আলোড়নের ফলেই প্রধানতঃ অনুরূপ মিলনক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে উচ্চ শব্দ-তরঙ্গের এক বিশেষ প্রয়োগ আছে। গাঢ় কুয়াশার জন্যে শীতকালে সে সব দেশে সিগারেটের ধোঁয়া আকাশে বেশী দূর উঠতে পারে না। এই অস্বাস্থ্য-কর ধোঁয়ার বিষক্রিয়ায় কয়েক বছর আগেও লণ্ডনের প্রায় সহস্রাধিক লোকের প্রাণ বিনষ্ট হতো। কিন্তু উচ্চ শব্দ-তরঙ্গ তাহাদের এই বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। ধোঁয়া হলো আকাশে ভাসমান বস্তুকণিকা। উচ্চ শব্দ-তরঙ্গের প্রভাবে এই কণা-

গুলি পরস্পর একত্রিত হয়ে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার ধারণ করে; ফলে বাতাসে ভেসে থাকা তখন অসম্ভব হয়। অনুরূপ উপায়ে কুয়াশায় জাহাজ বা এরোপ্লেনের যাত্রাপথ পরিষ্কার রাখা যায়।

উচ্চ শব্দ-তরঙ্গের প্রভাবে জামা-কাপড় ধূলিকণা মুক্ত হয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু বস্তুতঃ এই বিষয়ে উৎসাহিত হওয়ার মত কিছু নেই। কারণ, সাবানের খরচ বাঁচলেও উচ্চ শব্দ-তরঙ্গে কাপড় পরিষ্কার করা নিঃসন্দেহে অল্প ব্যয়সাধ্য হবে না।

উচ্চ শব্দ-তরঙ্গের একটি প্রধান সুবিধা এই যে, আলোকরশ্মির মত এদের নির্দিষ্ট দিকে চালনা করা যায়। এই সুবিধার জন্যে উচ্চ শব্দ-তরঙ্গকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োগ করেন বৈজ্ঞানিক ল্যাঞ্জিভিন। সমুদ্রের নীচের দিকে এই তরঙ্গ চালনা করে এবং যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রতিফলিত শব্দহীন শব্দ সংগ্রহ করে তিনি জলের গভীরতা নির্ণয়ে সক্ষম হন। পরীক্ষার কাজে ল্যাঞ্জিভিন সেকেণ্ডে ৩৮,০০০ বার উত্থিত শব্দ-তরঙ্গ নির্বাচন করেছিলেন। এই শব্দ-তরঙ্গ জলে প্রায় সাড়ে তিন সেন্টিমিটার লম্বা তরঙ্গ সৃষ্টি করে। উচ্চ শব্দ-তরঙ্গ দিয়ে সাগরের গভীরতা অল্প সময়ের মধ্যে নির্ভুলভাবে নির্ণীত হয় বলে এই প্রক্রিয়ায় কোন জলমগ্ন পাহাড়, হিমশৈল ইত্যাদির অস্তিত্ব নিরূপণ করা বর্তমানে জাহাজের পক্ষে অনেক সহজসাধ্য হয়েছে। তাছাড়া যুদ্ধের সময় ডুবোজাহাজ থেকে শত্রুপক্ষের জাহাজের অবস্থান জানবার জন্যে এই শব্দ-তরঙ্গের ব্যবহার হয়েছে। অপরপক্ষে যুদ্ধজাহাজগুলিও ডুবোজাহাজের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে শব্দহীন শব্দের সাহায্য গ্রহণ করেছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে ডুবোজাহাজের অবস্থান জানবার জন্যেই সর্বপ্রথম উচ্চ শব্দ-তরঙ্গের ব্যবহার হয়েছিল। জার্মেনীর ডুবোজাহাজের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার টমসন, রাদারফোর্ড প্রমুখ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের নিয়ে এক বিশেষ গবেষণা সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন।

আর একটি বিষয়েও উচ্চ শব্দ-তরঙ্গের ব্যবহার সম্ভব। উচ্চ শব্দ-তরঙ্গের সাহায্যে সংবাদ আদান-প্রদানের কাজ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রেও ল্যাঞ্জিভিন পথপ্রদর্শক। তিনি দেখান যে, উচ্চ শব্দ-তরঙ্গের সাহায্যে জলের ভিতর দিয়ে সংবাদ সরবরাহ করা যায়। জাহাজ বা ডুবোজাহাজকে প্রয়োজনীয় তথ্য এবং নির্দেশ জানাবার কাজে প্রতি বন্দরে উচ্চ শব্দ-তরঙ্গের ব্যবহার চলতে পারে। এই শব্দ-তরঙ্গের উপযোগিতা আরেকটি কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সে কারণটি হলো, জলের মধ্য দিয়ে বেতার তরঙ্গ বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না।

জীবদেহের উপরেও এই শব্দ-তরঙ্গের ক্রিয়া আছে। ল্যাঞ্জিভিন, উড্ এবং লুসিমা লক্ষ্য করেন যে, ছোট ছোট প্রাণী—মাছ, ব্যাঙাচি প্রভৃতি এই শব্দ-তরঙ্গের প্রভাবে এসে চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়ে অথবা মারা যায়। আণুবীক্ষণিক এককোষী ঈষ্ট প্রজনন ক্ষমতা হারায়। ব্যাক্টেরিয়ার উপর এর ক্রিয়া বিভিন্ন। অনেক জীবাণু এই শব্দ-তরঙ্গে বিনষ্ট হয়ে যায়।

কিছুদিন হলো শব্দহীন শব্দ চিকিৎসা-জগতেও আসন বিস্তার করেছে। বাতের বেদনা অথবা ওই ধরণের বেদনা উপশমের জন্যে উচ্চ শব্দ-তরঙ্গের প্রয়োগ ক্রমশঃ চালু হচ্ছে। কিন্তু কি উপায়ে এই যন্ত্রণা নিরাময় হয়ে থাকে তা রহস্যাবৃত। এ সম্বন্ধে তিনটি মত আছে—প্রথম হচ্ছে, উচ্চ শব্দ-তরঙ্গ দেহকোষে মৃদু আলোড়ন এনে রক্তপ্রবাহের ক্রিয়া দ্রুততর করে এবং জৈবিক প্রক্রিয়াসমূহ অধিকতর সক্রিয় করে তোলে; দ্বিতীয়টি হচ্ছে, শব্দ-তরঙ্গ কিঞ্চিৎ তাপের সৃষ্টি করে পীড়িত স্থানের উপকার করে। তৃতীয় মতে, উচ্চ শব্দ-তরঙ্গের সাহায্যে জীবকোষে অনুকূল রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এর যে কোনটিই সত্য হোক না কেন, শব্দ-চিকিৎসার পদ্ধতি অত্যন্ত সরল। পিজো বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফলে

স্ফটিকখণ্ডের প্রায় ১০,০০,০০০ বার কম্পনজাত শব্দ-তরঙ্গ উৎপন্ন করা হয়। কোন কোন বৈজ্ঞানিক সেকেণ্ডে আট লক্ষ থেকে তিন কোটি শব্দ-তরঙ্গ উত্থিত স্ফটিক দিয়েও কাজ করেছেন। শব্দ-তরঙ্গের উৎসটি দেহের পীড়িত স্থানের ঠিক উপরে রাখা হয় অথবা দেহের খুব নিকটে রাখবার অসুবিধা হলে ব্যাথিত অংশটি জলে রেখে তার সংযোগে শব্দ তরঙ্গ চালনা করা হয়। কারণ ত্বক, মাংসপেশী, হাড় এবং রক্তের মধ্য দিয়ে যেতে পারলেও উচ্চ শব্দ-তরঙ্গ বাতাসের ভিতর দিয়ে চলাচল করতে পারে না। এজন্যে হাত, পা ইত্যাদি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জলের তলায় রেখে শব্দ-চিকিৎসা করবার রীতি।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রই এই শব্দ-চিকিৎসায় বিশেষ অগ্রণী। ডাঃ জন এলডেস ১৯৫০ সাল থেকেই এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করে আসছেন। উচ্চ শব্দ-তরঙ্গের সাহায্যে ডাঃ এলডেস স্বয়ং অন্যূন তিন হাজার রোগীর চিকিৎসা করেছেন। তন্মধ্যে আড়াই হাজারেরও বেশী ক্ষেত্রে উপকার পাওয়া গিয়েছে। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একজন ডাঃ উইলিয়ম বীয়েরম্যান শব্দ-চিকিৎসার পথিকৃৎ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল স্কুলে বিকল হস্তের উপর চিকিৎসায় সুফল পাওয়ার নজির আছে।

৫৩ বছর বয়স্কা ফ্লোরিডার এক মহিলার হাত বাতে এমন অচল হয়ে পড়েছিল যে, তিনি সামান্য একটি পেন্সিলও হাতে তুলে নিতে পারতেন না। শব্দ-চিকিৎসার ফলে তাঁর হাত আবার কার্যক্ষম হয়েছে।

৪৭ বছর বয়স্ক এক ভদ্রলোক আট বছর বাতে ভুগে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেন। কোন চিকিৎসাই তাঁকে ফল দেয় নি। কিন্তু শব্দ-তরঙ্গের প্রভাবে এখন তিনি সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে পারেন।

শোনা যায়—আমাশয় রোগে এই তরঙ্গের ব্যবহার চলতে পারে কি না, বর্তমানে সে পরীক্ষাও চলছে।

বাস্তবিকই, উচ্চ শব্দ-তরঙ্গ মানুষের সামনে এক মহৎ সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। একজন বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ্ মন্তব্য করেছেন যে, উচ্চ শব্দ-তরঙ্গ একদিন হয়তো রঞ্জেনরশ্মির পার্শ্বে চিকিৎসা-জগতে এক প্রধান ভূমিকা নিতে পারে।

মৃৎশিল্পে শুষ্ককরণ পদ্ধতি

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু

মৃত্তিকা-নির্মিত দ্রব্যাদির গঠনকার্যে নানা-প্রকারের ছাঁচ ব্যবহার করা হয়। যে সকল ছাঁচে একাধিক খণ্ড থাকে সে সকল ছাঁচে দ্রব্যাদি গঠন করিলে তাহাদের গায়ে ছাঁচের জোড়া অংশের দাগ পড়িয়া যায়। সুতরাং ঐ সকল দাগ যত্নসহকারে তুলিয়া দিয়া দ্রব্যটি পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। যে সকল দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশ একাধিক প্রথায় প্রস্তুত করা হয় সে সকল অংশকে মাটির তরল মণ্ড দিয়া যথাস্থানে যুক্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং বিসদৃশ স্থানগুলি ছোট ছোট লোহার পাত বা ছুরি দিয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়। এই কাজে কিছু অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার দরকার। দেখা গিয়াছে যে, এই প্রকার কাজে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরাই বেশী নিপুণ হইয়া থাকে।

দ্রব্যগুলিকে পরিষ্কার করিবার পর ধীরে ধীরে শুকাইয়া লইতে হয়। পোড়াইবার আগে দ্রব্য-গুলি যদি উত্তমরূপে শুষ্ক না হয় তবে পোড়াইবার কালে ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে এবং পরিশ্রম ও অর্থব্যয় ব্যর্থ হইয়া যায়। সুতরাং মৃত্তিকা-নির্মিত মূল্যবান দ্রব্যাদি গঠনের পর তাহা সম্যকরূপে শুকাইয়া লইবার জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া দরকার।

মাটি যত বেশী নমনীয় হয় তাহা তত বেশী জল শোষণ করিতে পারে এবং ঐ জল শুকাইতেও অধিক সময় লাগিয়া থাকে। যদি রৌদ্রে দিয়া অথবা আগুনের তাপে তাড়াতাড়ি জল শুকাইবার চেষ্টা করা যায় তবে মাটির দ্রব্যাদি ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। গঙ্গার পলিমাটি অপেক্ষা পুকুরের পাঁকমাটি অধিক নমনীয় এবং বেশী জল টানে। সেই জন্য পাঁকমাটির সহিত কিছু বালি বা ছাই মিশাইয়া না লইলে উহাতে ইট বা টালি প্রস্তুত করা সম্ভব হয় না। কারণ শুকাইবার কালে উহা ফাটিয়া যায়। ফাটিবার কারণ এই যে, ভিজা মাটি শুকাইবার সময় তাহা ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হইতে থাকে। মাটি যত বেশী নমনীয় হয় উহার সঙ্কোচনও তত বেশী হইয়া থাকে। দেখা গিয়াছে যে, নমনীয় মাটি শুকাইলে উহার সঙ্কোচন শতকরা ৬ হইতে ১০ ভাগ পর্যন্ত হইতে পারে। এই সঙ্কোচন যদি সবদিকে সমান হয় তবে মাটির দ্রব্যাদি ফাটিতে পারে না; কিন্তু অসমান হইলেই ফাটিবার সম্ভাবনা থাকে। অতি নমনীয় পাঁকমাটি হইতে তৈয়ারী একটি ইটকে রৌদ্রে দিলে রৌদ্রের তাপে উহার উপরিভাগ তাড়াতাড়ি শুকাইতে থাকে এবং উহার সঙ্কোচনও বেশী হয়। কিন্তু ভিতরের দিক অত তাড়াতাড়ি সঙ্কুচিত হইতে পারে না; কারণ পাঁকমাটির ভিতরের দিক হইতে জল সহজে বাহির হইতে পারে না। এই অসম সঙ্কোচনের ফলেই ইট ফাটিয়া যায়। কিন্তু যদি ইটটি রৌদ্রে না দিয়া ছায়াতে রাখা হয় তবে উহার বাহিরের অংশ ধীরে ধীরে শুকাইতে থাকে। সুতরাং ভিতরের অংশ হইতে জল বাহিরে আসিবার যথেষ্ট সময় পায় এবং ভিতর ও বাহিরের অংশের ধীর গতিতে সঙ্কোচনের ফলে ইট ফাটিবার সম্ভাবনা অনেক কম হইয়া থাকে। আবার যদি পাঁকমাটির সহিত বালি বা ছাই মিশাইয়া লওয়া হয় তবে উহার নমনীয়তা অনেক কমিয়া যায় এবং ঐ মিশ্রিত মাটি অনেক কম জল টানে; সুতরাং উহার সঙ্কোচনও কম হইয়া থাকে। বালুকা-মিশ্রিত মাটিতে তৈয়ারী ইট রৌদ্রে দিলেও উহা সহজে ফাটে না;

কারণ এই মিশ্রিত মাটি কিছু পরিমাণে সচ্ছিদ্র হওয়ায় উহার ভিতরের অংশ হইতে জল সহজেই বাহির হইয়া আসিতে পারে এবং রৌদ্রে দিলে না ফাটিয়া শুকাইয়া যায়।

ভিজামাটি শুকাইবার কালে যে সকল পরিবর্তন হয় তাহার বিষয় সম্যক বুঝিতে হইলে শুকাইবার কালকে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

প্রথম স্তরে মাটির উপরের ভাগ হইতে যত জল শুকাইতে থাকে, সেই পরিমাণ জল মাটির দ্রব্যের ভিতর হইতে আসিয়া পরিপূরণ করিয়া দেয়। এই পরিপূরক ক্ষমতা মাটির ভিতরকার কৈশিক আকর্ষণের উপরই নির্ভর করে। মাটিতে যত বেশী কোলয়েড কণা থাকে উহার কৈশিক আকর্ষণ তত কমিয়া যায়। অর্থাৎ অধিক নমনীয় মাটির কৈশিক আকর্ষণ অনেক কম বলিয়া উহার ভিতর হইতে জল সহজে বাহির দিকে আসিতে পারে না এবং ঐ প্রকার মাটিতে গঠিত দ্রব্যাদি সহজে শুকাইতে চায় না। ভিজা মাটি হইতে জল অপসারিত হইতে থাকিলে মাটির অতি ক্ষুদ্র কণাগুলি নিকটতর হইতে থাকে এবং ইহার ফলে মাটিতে সঙ্কোচন দেখা দেয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, মাটি শুকাইবার এই প্রথম স্তরে মাটি হইতে যত জল অপসারিত হয়, উহার সঙ্কোচনও প্রায় সেই পরিমাণে হইয়া থাকে। সুতরাং এই প্রথম স্তরের জলভাগকে "সঙ্কোচন জল" বলা যাইতে পারে। এই জলের পরিমাণ মাটির মধ্যস্থিত সমুদয় জলের প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ হইতে দেখা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মাটি শুকাইবার কালে সম্পূর্ণ সঙ্কোচনের প্রায় তিন-পঞ্চমাংশ এই প্রথম স্তরেই ফাটিয়া যায়, এবং এই সময়ে সঙ্কোচন যদি সুপরিমিত না হয় তবে মাটির দ্রব্য ফাটিয়া যাইবার অথবা বাঁকিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে।

মাটির দ্রব্যাদি শুকাইবার দ্বিতীয় স্তরে অবস্থা অন্যরূপ হইয়া যায়; কারণ মাটির সঙ্কোচনের ফলে উহার মধ্যস্থিত অতি সূক্ষ্ম কণাসমূহ এত নিকটস্থ হইয়া পড়ে যে, মাটির মধ্যস্থিত কৈশিক আকর্ষণ অনেক কমিয়া যায়। ইহার ফলে ভিতরের জল শীঘ্র বাহিরে আসিতে পারে না। এই কারণে দ্রব্যের বহির্ভাগ হইতে যত জল শুকাইয়া যাইতে থাকে, ভিতর হইতে তত জল পরিপূরণ করিতে পারে না। ইহার ফলে দ্রব্যের উপরিভাগে একটি পাতলা ও শুষ্ক স্তর পড়িতে দেখা যায়। ঐ শুষ্ক স্তরটির অধিক সঙ্কোচনের ফলে উহাতে সরু সরু ফাট আসিয়া থাকে। এই প্রকারের সরু ফাটকে ইংরেজিতে চেক্স্ বলা হয়। এই সকল চেক বেশী গভীর বা মোটা হইতে পারে না, কারণ শীঘ্রই উপরের এই স্তরটি শুকাইয়া সচ্ছিদ্র হইয়া পড়ে এবং ভিতর হইতে জল বাহিরে আসিতে সহায়তা করে। এই সময়ে মৃত্তিকা-নির্মিত দ্রব্যাদির উপরের স্তরের সঙ্কোচন কমিয়া গেলেও মধ্যভাগের সঙ্কোচন চলিতে থাকে। যদি এই সময়ে ভিতরের সঙ্কোচন বেশ ধীরে ধীরে হয় তবে দ্রব্যটি ফাটিবার সম্ভাবনা কম থাকে এবং উহা ক্রমশঃ জলশূন্য হইয়া সচ্ছিদ্র হইতে থাকে। মাটি শুকাইবার এই দ্বিতীয় ভাগে মাটি হইতে যত জল শুকাইয়া যায় তাহার পরিমাণ মাটির এই সময়ের সঙ্কোচন এবং সচ্ছিদ্রতার সমষ্টির মত হইতে দেখা যায়।

শুকাইবার তৃতীয় ভাগে মাটিতে আর সঙ্কোচন হয় না; কারণ উহার ক্ষুদ্র কণাগুলি আরও নিকট-তর হইতে পারে না, জল শুকাইবার ফলে মাটির ভিতরের ছিদ্রতাই বাড়িতে থাকে। সুতরাং এই সময়ে মাটির দ্রব্যকে উত্তপ্ত করিলেও উহা ফাটিবার সম্ভাবনা থাকে না। এই জন্য এই তৃতীয় স্তরে মাটির দ্রব্যাদি গরম হাওয়া দিয়া শুষ্ক করা যাইতে পারে।

উক্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইবে যে, মাটির দ্রব্য শুকাইবার প্রথম দুই স্তরেই উহা ফাটিবার বা বাঁকিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে এবং ইহার কারণ প্রধানতঃ দুইটি—প্রথমতঃ, মাটির ভিতরের কৈশিক আকর্ষণের অল্পতা এবং দ্বিতীয়তঃ, দ্রব্যের

উপরিভাগ হইতে জল শুকাইবার আধিক্য। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে অতি কোলয়েডযুক্ত মাটির সহিত যদি শতকরা একভাগ সাধারণ লবণ মিশাইয়া দেওয়া যায় তবে ঐ মাটির কৈশিক আকর্ষণ অনেক বাড়িয়া যায় এবং শুকাইবার কালে ঐ মাটি সহজে ফাটে না। আমাদের ইট বা টালি নির্মাতারা এই বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন; কারণ লবণযুক্ত মাটি পোড়াইবার কালে সহজে ঝামা হয় না। কিন্তু সাধারণ মাটিতে লবণ দিলে উহার কৈশিক আকর্ষণ শক্তি বাড়িতে দেখা যায় না, অর্থাৎ ঐ মাটি শুকাইবার ক্ষিপ্রতার বিশেষ উন্নতি হয় না। মাটিতে বেশী লবণ থাকিলে উহার গলনাঙ্ক কমিয়া যায়।

মাটি ফাটিয়া যাইবার দ্বিতীয় কারণ নিবারণ করিতে হইলে দ্রব্যগুলিকে প্রথমে ঠাণ্ডা বা রৌদ্র-হীন স্থানে রাখিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত ইহাও দেখা দরকার যে, দ্রব্যের উপর দিয়া যেন বেশী হাওয়া চলাচল না করে; কারণ রৌদ্রের উত্তাপ না থাকিলে হাওয়ার দ্রুত গতিতেও মাটির উপরি-ভাগের জল শীঘ্র শুষ্ক হইতে সহায়তা করে। কিন্তু উত্তাপ ও হাওয়া উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করিলে মাটি শুকাইতে অনেক বিলম্ব ঘটে এবং ইহাও দেখা গিয়াছে যে, মাটি শুকাইতে অত্যধিক দেরী হইলে উহার সঙ্কোচনও কিছু বাড়িয়া যায়। মাটির দ্রব্য যত পাত্‌লা হয় তত শীঘ্র শুকাইয়া যায়, কিন্তু ঠাস বা মোটা দ্রব্য ভালভাবে শুষ্ক হওয়া সময়-সাপেক্ষ। এই সময়ের অপচয় নিবারণের জন্য আজকাল এক নূতন প্রণালীতে মাটির দ্রব্য বেশ তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক করা হইয়া থাকে। এই নূতন প্রণালীর নাম আর্দ্রতা প্রণালী।

এই আর্দ্রতা প্রণালীর রহস্য এই যে, খোলা জায়গায় কোন দ্রব্য হইতে জল শুকাইবার গতি ও পরিমাণ প্রধানতঃ বায়ুমণ্ডলের তাপ ও আর্দ্রতার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। বায়ুমণ্ডলে বেশী জলীয় বাষ্প বিদ্যমান থাকিলে একই তাপে দ্রব্য হইতে কম জল শুকাইতে পারে এবং বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা সমান থাকিলে উহার উত্তাপের উপরই জল শুকাইবার গতি ও পরিমাণ প্রধানতঃ নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বর্ষাকালে বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা অনেক বেশী থাকে বলিয়া আমাদের শরীর হইতে যে ঘাম বাহির হয় তাহা গরমেও শীঘ্র শুকাইতে চায় না এবং ভিজা কাপড়-চোপড় শুকাইতে দেরী হইয়া থাকে। কিন্তু গরম কালে যখন বায়ুর আর্দ্রতা কম থাকে তখন একই তাপে ভিজা কাপড়চোপড় বা গায়ের ঘাম শীঘ্র শুকাইয়া যায়। আবার শীতকালে যখন বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা কম থাকে তখন তাপ অনেক কম থাকিলেও ভিজা কাপড় শুকাইতে বর্ষাকালের মত দেরী হয় না। এই তথ্য অনুসরণ করিয়া আর্দ্রতা-প্রণালীতে ভিজা মাটির দ্রব্যকে একটি বন্ধ ঘরে শুষ্ক করা হইয়া থাকে। প্রথমে এই বদ্ধ ঘরকে গরম জলীয় বাষ্প দিয়া উহার উত্তাপ ও আর্দ্রতা দুই-ই বাড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে মৃৎদ্রব্যাদির উপরিভাগ হইতে জল শুকাইতে পারে না, কিন্তু উত্তাপ বৃদ্ধি পাওয়ার দ্রব্যের ভিতরের দিক হইতে জল বাহিরে আসিয়া জমিতে থাকে, ঠিক বর্ষাকালে আমাদের শরীরে যেমন ঘাম জমে এবং শীঘ্র শুকাইতে চায় না। এইভাবে উত্তপ্ত হইলে মোটা ও ঠাস দ্রব্যগুলির অভ্যন্তর ভাগ পর্যন্ত সমভাবে উত্তপ্ত হইয়া উহাদের কৈশিক আকর্ষণ অনেক বাড়িয়া যায়। জলীয় বাষ্পের দ্বারা ঘরটিকে এক বিশেষ তাপমাত্রা পর্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া বাষ্প বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই বিশেষ তাপমাত্রা মাটির গুণ ও দ্রব্যের আকারের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ যে তাপে মাটির ভিতরকার কৈশিক আকর্ষণ বেশ ভালভাবে চলিতে থাকে তাহাই এই মাটির জন্য বিশেষ তাপমাত্রা। সব মাটির জন্য এই তাপমাত্রা সমান হয় না, আবার পাত্‌লা অথবা মোটা ও ঠাস দ্রব্যের জন্যও এই তাপমাত্রার তারতম্য করিতে হয়। জলীয় বাষ্প বন্ধ করিবার পর প্রকোষ্ঠের ভিতর গরম

হাওয়া চালাইয়া সেই নির্দিষ্ট তাপমাত্রা রক্ষা করা হইয়া থাকে। ইহার ফলে দ্রব্যের উপর হইতে জল শীঘ্র শুকাইয়া যাইতে থাকে এবং দ্রব্যের ভিতর হইতে ঐ জল শীঘ্র পরিপূরিত হইয়া থাকে। এই-ভাবে জলীয় বাষ্প ও গরম হাওয়ার সহযোগে অতি-শীঘ্র ঠাস ও স্থূল মাটির দ্রব্যকে শুকাইয়া ফেলা যায়। বন্ধ ঘরের চারিদিকের তাপ সমান থাকায় শুকাইবার সময় দ্রব্যের সঙ্কোচন সমপরিমিত হয় এবং ফাটিয়া বা বাঁকিয়া যাইবার সম্ভাবনা খুবই কম হইয়া থাকে। আজকাল এক সুপরিকল্পিত সুড়ঙ্গ পথে আর্দ্রতা-প্রণালীতে মূল্যবান মাটির দ্রব্যাদি সহজে ও ক্ষিপ্রতার সহিত শুষ্ক করা হইতেছে। দ্রব্যগুলি ট্রলির উপর সাজাইয়া সুড়ঙ্গের একদিকে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। ট্রলিগুলি সুড়ঙ্গের ভিতর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে এবং বেশ ভালভাবে শুকাইয়া গেলে সুড়ঙ্গের অপর দিক দিয়া বাহির হইয়া আসে।

পুরাতন ইট ও টালির গায়ে অনেক সময় সাদা ও ঈষৎ হল্‌দে রঙের গুঁড়া বা সুচের মত সরু পদার্থ জমিয়া থাকিতে দেখা যায়। ইহাকে সচরাচর নোনা-ধরা বলা হয়। এই নোনা অবিশুদ্ধ মাটির মধ্যস্থিত নানাপ্রকার প্রকার দ্রবণীয় লবণ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইট বা টালিকে যদি ভাল ভাবে পোড়ানো না হয় তবে তাহাদের মধ্যস্থিত দ্রবণীয় লবণসমূহ অবিকৃত অবস্থায় থাকিয়া যায় এবং ঐ ইট বা টালি জলে ভিজিলে অথবা বহুকাল স্যাঁতসেঁতে জায়গায় থাকিলে ঐ সকল লবণ জলের সহিত বাহিরে আসিয়া পড়ে এবং জল শুকাইয়া গেলে ইটের গায়ে জমা হয়। কিন্তু যদি ঐ লবণ সহজে বাহিরে আসিতে না পারে তবে তাহা ইটের মধ্যেই ধীরে ধীরে কেলাসিত হইতে থাকে। এই ধীর কেলাসনের চাপ এত বেশী হয় যে, পুরাতন ইট পচিয়া যায়, অর্থাৎ সহজেই ভাঙ্গিয়া বা গুঁড়াইয়া যায়। মাটির মধ্যস্থিত লবণ ক্ষারজাতীয় হইলে সহজেই বিয়োজিত হইয়া যায়, কিন্তু চুনজাতীয় লবণ সহজে বিয়োজিত হইতে চায় না। বিশেষ করিয়া সালফেট লবণ বিয়োজিত হইতে অনেক বেশী উত্তাপ লাগে। সুতরাং মাটির সহিত সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম সালফেট থাকিলে ঐ মাটিতে প্রস্তুত দ্রব্যে নোনা দেখা দিতে পারে। অবিশুদ্ধ মাটিতে এই সকল লবণ অল্প-বিস্তর থাকে। বিশুদ্ধ সাদা মাটিতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি ছাঁচে গঠনকালে প্লাস্টার হইতে অল্প পরিমাণ জিপসাম মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে দেখা যায়। এই সব সাদা মাটির দ্রব্য শুকাইবার সময় জিপসাম-দ্রব উপরে আসিয়া নোনার সৃষ্টি করে। সুতরাং সাদা মাটিতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি শুকাইবার পর ভাল ভাবে পরিষ্কার করিয়া লওয়া উচিত; নতুবা পোড়াইবার পর এই নোনা গলিয়া স্থায়ীভাবে দ্রব্যের গায়ে লাগিয়া যায় এবং যে সব স্থানে নোনা লাগে সেই সব জায়গায় গ্লেজ ধরিতে চায় না, অর্থাৎ গ্লেজে ত্রুটি থাকিয়া যায়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, পাত্রের কিনারা বা ধার এবং পুতুলের নাক, কান প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ স্থানেই নোনা বেশী ধরে এবং ভাল ভাবে পরিষ্কার করিয়া না লইলে ঐ সব স্থানে গ্লেজ ধরে না। ইহার কারণ, মৃৎদ্রব্যের সঙ্কীর্ণ স্থান হইতে জল বেশী শুকায় সুতরাং দ্রবণীয় লবণ ঐ সব স্থানেই বেশী জমা হইতে থাকে। জিপসাম বা সালফেটজাতীয় লবণ ছাড়া অন্য কোন কোন প্রকার লবণেও নানা রঙের নোনা আনিতে দেখা যায়। যেমন, লৌহ যৌগিকে বাদামী, ভ্যানাডিয়ামে সবুজ, টাইটেনিয়ামে হল্‌দে প্রভৃতি রঙের নোনা আনিতে পারে।

সালফেটজনিত নোনাই সচরাচর দেখা যায়। ইহা নিবারণ করিতে হইলে মাটির সহিত অল্প পরিমাণে বেরিয়াম কার্বনেট অথবা বেরিয়াম ক্লোরাইড মিশাইয়া লইতে হয়। এই দুটি লবণের সহিত সালফেটের প্রতিক্রিয়ার ফলে বেরিয়াম সালফেট উৎপন্ন হয় এবং এই নূতন লবণ জলে

অদ্রবণীয় বলিয়া মাটিতে নোনা লাগে না। ইহার রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্কেত নিম্নরূপ—

$$Na_2SO_4 + BaCl_2 = BaSO_4 + 2NaCl.$$

$$CaSO_4 + BaCO_3 = BaSO_4 + CaCO_3$$
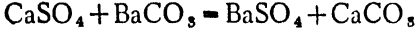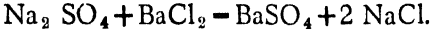
সোডিয়াম ক্লোরাইড ও ক্যালসিয়াম কার্বনেট অগ্নি-তাপে সহজেই বিয়োজিত হইয়া যায়; সুতরাং নোনা হইতে দেয় না।

খনিজ

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

জীব থেকে যা পাওয়া যায় তাকে বলা হয় জৈব পদার্থ। কাঠ, হাড়, তুলা, রেশম, পশম ইত্যাদি জৈব পদার্থ। মাটি, বালি, পাথর,, তামা, লোহা, সোনা, প্রভৃতি অজৈব পদার্থ; কারণ এগুলি জীব থেকে পাওয়া নয়। পাথুরে কয়লা, কেরোসিন, সৈন্ধব লবণ, সোনা প্রভৃতি খনি থেকে পাওয়া যায়। এরা সব অজৈব খনিজ পদার্থ। কাচ, চিনামাটির ইট অজৈব পদার্থ, কিন্তু খনিজ নয়। এগুলি কৃত্রিম উপায়ে তৈরী, প্রকৃতির তৈরী নয়।

পাথুরে কয়লার উৎস হলো অতি প্রাচীন যুগের গাছপালা। বহু শত বর্ষব্যাপী প্রাকৃতিক ক্রিয়ায় জৈব গাছপালা পাথুরে কয়লার রূপ নিয়েছে। একেও খনিজ বলা হয়। জলজ প্রাণীর কঙ্কাল থেকে সৃষ্টি হয়েছে খড়ি ও চুনাপাথর। এগুলিও খনিজ পদার্থ। জৈব পদার্থ হলেও কালের সঙ্গে যার রূপ একেবারে বদ্‌লে গেছে, তাকেও খনিজ বলা হয়। কেরোসিন পাওয়া যায় পেট্রোলিয়াম শোধন করলে। পেট্রোলিয়ামও খনিজ, যদিও এর উৎপত্তি জৈব পদার্থ থেকে। মাটি খুঁড়ে খনি থেকে না তুললে যে খনিজ হবে না, এমন কোন কথা নেই। ভূমির উপরেও অনেক খনিজ পাওয়া যায়। খাঁটি জলকেও খনিজ বলা হয়।

খনিজ ও সভ্যতা

খনিজ পদার্থ নানা রকমের। ভারতেও অনেক রকমের পাওয়া যায়। অনেকগুলি ব্যাপকভাবে আমাদের কাজে লাগে। লৌহ আকরিক থেকে লৌহধাতু পাওয়া যায়। লোহা থেকে তৈরী হয় নানা কাজের উপযোগী ইস্পাত। কয়লা খুঁড়ে তোলা হয়। তা থেকে পাওয়া যায় জ্বালানী কয়লা, কয়লা গ্যাস, আলকাত্‌রা। আবার আলকাত্‌রা থেকে বিবিধ রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়। পেট্রোলিয়াম থেকে কেরোসিন, পেট্রোল ও নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার পৃথক করা হয়। খনিজকে কেন্দ্র করে বহুবিধ শিল্প গড়ে উঠেছে। শিল্পের জন্যে দেশ সমৃদ্ধ হয়েছে। পেট্রোল না থাকলে বিমান চলতো না। বিমান না থাকলে অল্প সময়ে দেশদেশান্তরে যাওয়া সম্ভব হতো না। অ্যালুমিনিয়াম না থাকলে হাল্কা অথচ শক্ত ধাতুর প্রয়োজন মিটতো না। বিমানের ভাল আবরণ হতো না। রেল, মোটর, জাহাজ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, রেডিও সবই তো খনিজ ও শিল্পের জন্যে সম্ভব হয়েছে!

লোহা প্রভৃতি ধাতুর আকরিক খনিজ

ধাতু ও মিশ্র ধাতু ব্যবহার না করে আজকাল দিন চলে না। ঘরে ঘরে কাঁসা, পিতল, অ্যালুমিনিয়াম,

ম্যাগ্‌নেশিয়াম, নিষ্কলঙ্ক ইস্পাত প্রভৃতি মিশ্রধাতুর বাসনকোসনের ব্যবহার চলছে।

আকরিক থেকে বিশুদ্ধ ধাতু নিষ্কাশনের জন্যে জোরালো আগুন করা চাই। তার উপযুক্ত চুল্লী গড়া চাই, যাতে আগুনের আঁচে চুল্লী ঠিক থাকে। প্রচণ্ড তাপরোধক শক্তিশালী খনিজ পদার্থেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। তড়িৎ পরিচালনার জন্যে যেমন সুপরিবাহী তামার তার দরকার, তেমনই তড়িৎ প্রতিরোধ করবার জন্যে অপরিবাহী অভ্রের দরকার।

সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে খনিজের ব্যবহার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মানুষ প্রকৃতিকে জয় করেছে, প্রকৃতির কাছ থেকেই অস্ত্র নিয়ে। সভ্যতার আদিম যুগে শীতাতপ ও বর্ষা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে বড় বড় পাথরের চাঁই ব্যবহার করেছে। মারণাস্ত্র তৈরী করেছে পাথর ঘষে ঘষে ধারালো করে। গৈরিক প্রভৃতি রঞ্জক ব্যবহার করেছে অঙ্গ-প্রসাধনে। মাটি দিয়ে গড়েছে নিত্যব্যবহার্য থালা, বাটি, হাঁড়ি, কলসী প্রভৃতি পাত্রাদি। প্রকৃতিতে ধাতু ছড়িয়ে আছে। আদিম মানুষ তা কুড়িয়ে এনেছে। সোনার হল্‌দে রং, তামার লাল্‌চে রং, রূপার সাদা জৌলুস হয়তো আদিম মানুষকে সর্বপ্রথম আকৃষ্ট করেছিল।

তারপর হাজার হাজার বছর পরে সভ্যতা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে গেল। মানুষ লৌহ আকরিক থেকে লৌহধাতু নিষ্কাশন করতে শিখলো। লোহাকে বিভিন্ন কাজে লাগালো। স্মরণাতীত যুগে ভারতেই বোধ হয় সর্বপ্রথম লৌহ নিষ্কাশিত হয়েছিল। রাজ্য জয় করবার জন্যে, রক্ষা করবার জন্যে অস্ত্রাদির প্রয়োজন হলো। লোহা সবচেয়ে বেশী কাজে লাগলো। খৃষ্টের জন্মের হাজার বছর আগে লোহা বা ইস্পাতের তৈরী মারণাস্ত্র ব্যবহারের নৈপুণ্যের উপর রাজ্যবিস্তার নির্ভর করতো।

খনিজের চাহিদা

ষ্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতা উন্নত হলো। সে যুগেও খনিজের ব্যবহার ততটা প্রসার লাভ করে নি। তখন কেবল মাত্র লোহা, তামা, সীসা, দস্তা, টিন, সোনা, রূপা, পারা, খনিরত্ন হীরা-জহরৎ, গন্ধক, মাটি আর শিলা ব্যবহার হতো। অনেক ধাতুর কথা তখন জানা ছিল না। জানা থাকলেও, এত অল্প পরিমাণে সে সব ধাতু নিষ্কাশিত হতো যে, তাদের ব্যবহারের কথা ভাবা যেত না। অ্যালুমিনিয়াম ধাতু তখন বিজ্ঞানের বিস্ময় বলে বিবেচিত হতো। অথচ আজকাল কে না অ্যালুমিনিয়াম ধাতু ব্যবহার করে? প্রায় একশ' পঁচিশ বছর আগে তড়িতের সাহায্যে তাপমাত্রা পরিবর্ধক চুল্লী উদ্ভাবিত হলো। অ্যালুমিনিয়াম আকরিক থেকে বহুল পরিমাণে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন করা গেল। একশ' চল্লিশ বছর হলো ম্যাগ্‌নেশিয়াম ধাতু আবিষ্কৃত হয়েছে। অথচ এর ব্যবহার সুরু হয়েছে বলতে গেলে মাত্র ত্রিশ বছর আগে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর। টাইটেনিয়াম, বেরিলিয়াম প্রভৃতি নতুন আবিষ্কৃত ধাতুর ব্যবহার সবেমাত্র প্রচলিত হয়েছে।

প্রকৃতির সঞ্চিত পদার্থ আমরা খরচ করে চলেছি। খনিজের ভাণ্ডার ক্ষয় হয়ে চলেছে। এ ভাণ্ডার তো অক্ষয় নয়! একদিন না একদিন প্রকৃতির বিপুল সঞ্চয় নিঃশেষিত হয়ে যাবে। কয়লা তুলে চলেছি। লোহা নিষ্কাশন করে চলেছি। পেট্রোল তৈরী করে চলেছি। চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়ও বেড়ে চলেছে। যেদিন পৃথিবীতে লোহা থাকবে না, কয়লা থাকবে না, পেট্রোল থাকবে না – সেদিন? সেদিন কি সভ্যতার শেষ হবে? সেদিন কি আমাদের সভ্যতার উপর নবতর সভ্যতার উন্মেষ হবে? হয়তো সেদিন অনেক দূরে, লক্ষ কোটি বছর দূরে। তবু

একদিন তা আসবে। ক্রমেই সেদিন এগিয়ে আসছে।

পৃথিবীর কত সঞ্চয়ই তো বিনষ্ট হয়ে গেছে! কর্নিশের টিনের খনি শেষ হয়েছে, যা কয়েক শতাব্দী ধরে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ টিনের খনি ছিল। ফ্রাইবার্গের ধাতুর খনি সব প্রায় শেষ হতে চলেছে। মিচিগানের তামার খনি, মেক্সিকোর রূপার খনি ক্ষয় হয়ে গেছে। বলতে গেলে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পেট্রোলিয়াম খনি ছিল মেক্সিকোতে। তেল তোলা হলো ছ-শ' লক্ষ ব্যারেল। তারপর আর উঠলো না। অমৃতের বদলে উঠলো গরল। তেলের বদলে নোনা জল!

খনিজের অবস্থান

চল্‌তি কথায় শিলার অর্থ হলো পাথর। এখানে শিলার অর্থ কেবল পাথর নয় - পাথর, কয়লা, কাদা, বালি, পলিমাটি সবই শিলা। প্রকৃতির ক্রিয়ায় যে খনিজ পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে, পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, তা সবই শিলা।

শিলা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর—আগ্নেয়, পাললিক আর রূপান্তরিত শিলা। প্রাচীনকালে ভূগর্ভ থেকে আগ্নেয়শিলা গলিত তরল তপ্ত অবস্থায় ভূত্বকের ফাটল দিয়ে উৎসারিত হলো। তারপর ভূপৃষ্ঠে এসে ক্রমে শীতল হয়ে কঠিন হয়ে গেল। কোন কোন আগ্নেয়শিলা ভূত্বক ভেদ করে বাইরে ভূপৃষ্ঠে এসে পড়লো। আবার কোন কোনটা সম্পূর্ণরূপে বাইরে এল না, খানিক দূর উপরে উঠে শীতল হয়ে জমে রইলো। যেমন গ্র্যানিট, ব্যাসাল্ট প্রভৃতি আগ্নেয়শিলা।

চিনির রসের মত ঘন পদার্থ শীতল হয়ে জমতে গেলে দানা বাঁধে। ধীরে ধীরে শীতল হলে মিছরীর মত বড় বড় দানা পৃথক হয়ে আসে। আর তাড়াতাড়ি শীতল হয়ে গেলে চিনির দানার মত ছোট ছোট দানায় পৃথক হয়। আবার মোটেই দানা না বেঁধে কাচের মত একটা পুরু চাদর হয়ে জমে যায়। গলিত আগ্নেয়শিলাও এভাবে ছোট-বড় দানা বেঁধেছে। ছোট অর্থে অবশ্য চিনির কেলাসের মত অত ছোট নয়। আর বড় অর্থে মিছরীর কেলাসের মত নয়, তার চেয়ে অনেক বড়। যখন শিলা তরল অবস্থায় সোজা ভূপৃষ্ঠে এসে পড়ে তখন হঠাৎ শীতল হয়ে ছোট দানা হয়ে যায়। ভূপৃষ্ঠে আসবার আগে ভূগর্ভে ধীরে ধীরে শীতল হওয়াতে ভূগর্ভস্থ আগ্নেয়শিলার দানা প্রকাণ্ড বড় হয়।

আগ্নেয়শিলা খুব শক্ত, দৃঢ়সংবদ্ধ—ভাঙতে জোর লাগে। রাস্তা পাকা করবার জন্যে আগ্নেয়শিলার টুক্‌রা ব্যবহার করা হয়। ভারতের দক্ষিণ ভাগে বিস্তৃত মালভূমি উৎক্ষিপ্ত আগ্নেয়শিলায় গঠিত। বাংলাদেশে আসানসোলের কাছে কতক কতক জায়গায় আগ্নেয়শিলা মাটি ভেদ করে উঠেছে; আট-দশ মাইল লম্বা পাঁচিলের মত একটানা চলে গেছে।

আগ্নেয়শিলা স্তরের উপর স্তর ইট সাজানোর মত বিন্যস্ত থাকে না। স্তরবিন্যস্ত শিলার স্তরের ফাঁকে ফাঁকে শাবল ঢুকিয়ে চাড় দিলে চাঙড় ভেঙ্গে আসে। আগ্নেয়শিলা সেভাবে ভাঙা সহজ নয়। শাবল দিয়ে চাড় দিয়ে ভাঙ্গতে গেলে অসমানভাবে ভেঙ্গে যায়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শিলা পাললিক শিলা। নদীর স্রোতে চলা কাদামাটি, বালি ধীরে ধীরে থিতিয়ে পড়ে। থিতিয়ে পড়বার সময় নুড়ির মত মোটা ও ভারী জিনিষগুলি আগে পড়ে। হাল্কা ছোট জিনিষ আরও কিছু দূর ভেসে গিয়ে থিতিয়ে পড়ে। এভাবে ধীরে ধীরে মাটির পলি পড়ে। পলির স্তরের উপর স্তর পড়ে। স্মরণাতীত যুগে বৃষ্টি ও জলে বাহিত পাথরের কুচি, নুড়ি, বালি, মাটি ধীরে ধীরে সমুদ্র, নদী বা হ্রদের তলদেশে স্তরবিন্যাস করলো। ক্রমান্বয়ে উপরের স্তরের চাপে ও জলে দ্রবীভূত অ্যাসিডজাতীয় বিবিধ পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ায় নীচের স্তরগুলি জমাট বেঁধে শিলায়

পরিণত হলো। এভাবে বালির স্তর থেকে উৎপন্ন হলো বেলেপাথর। রাসায়নিক ক্রিয়ায় ছোট ছোট সামুদ্রিক প্রাণীর কঙ্কাল থেকে উৎপন্ন হলো চুনাপাথর। কর্দমের স্তর থেকে হলো শেল। পলি জমে জমে স্তর বেঁধে জন্মায় বলে বলা হয় পাললিক শিলা।

পাললিক শিলার স্তরের মধ্যে কখনও কখনও প্রাগৈতিহাসিক যুগের অধুনালুপ্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীর চিহ্ন পাওয়া যায়। এগুলিকে ফসিল বলা হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের সামুদ্রিক শামুকজাতীয় প্রাণীর ফসিল নুড়ির আকারে আজও পাওয়া যায়। এদের আমরা বলি শালগ্রাম শিলা। হিন্দুর ঘরে বিগ্রহরূপে এরা শোভা পায়। মিথিলায় গণ্ডকী নদীর তীরে শালগ্রাম বলে এক গ্রাম আছে। সেখানে পাওয়া যায় বলে এই শিলাকে শালগ্রাম শিলা বলে।

আগ্নেয়শিলায় ফসিল চাপা পড়ে থাকতে পারে না। তপ্ত গলিত অবস্থা থেকে যে শিলার উৎপত্তি, তার মধ্যে প্রাণী বা উদ্ভিদের চিহ্ন থাকবে কেমন করে? পাললিক শিলা আগ্নেয়শিলার মত অত শক্ত আর দৃঢ়সংবদ্ধ নয়। পাললিক শিলার স্তরের মধ্যে কোথাও কয়লার স্তর পাওয়া যায়। আগ্নেয়-শিলার কয়লার স্তর থাকে না। উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুরে পাললিক শিলা আছে। সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, বর্ধমান জেলায় পাললিক শিলা দেখা যায়। ফসিল বা প্রস্তরীভূত কঙ্কাল থেকে সেই প্রাণী বা উদ্ভিদবিশেষের আকৃতি অনুমান করা যায়। আকৃতি থেকে তার বয়স অনুমান করা যায়। তা-থেকে পলির স্তর কবে পড়েছিল আন্দাজ করা যায়।

নবজাত পৃথিবীতে কোন জীব ছিল না। জমি, পাহাড় কিছুই ছিল না। সদ্যোজাত পৃথিবী ছিল একটা দীপ্ত গ্যাসের পিণ্ড। যত দিন যেতে লাগলো, পৃথিবী ধীরে ধীরে শীতল হতে থাকলো। গ্যাসের পিণ্ড তরল পদার্থে পরিণত হলো। তার-পর আরও শীতল হয়ে তার উপরকার স্তর দুধে সর পড়বার মত ক্রমে পুরু ও শক্ত হতে লাগলো। অবশেষে এত শক্ত হলো যে, পৃথিবীর উপরে বেশ একটা কঠিন পুরু আস্তরণ গড়ে উঠলো। আস্তরণে মোচড় দিলে দুমড়ে যায়; আবার কোথাও ফেটে যায়। যত শীতল হলো উপরকার স্তর তত পুরু আর শক্ত হলো। ভূপৃষ্ঠ আর সমতল রইলো না; কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু হয়ে গেল। শক্ত স্তরের উপরি ভাগে যে সব তপ্ত জলীয় বাষ্প ছিল তা ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে তরল জলে পরিণত হলো। জল গড়িয়ে গিয়ে জমলো নীচু জায়গায়। জমা হলে মহাসাগর সৃষ্টি হলো। খুব উঁচু জায়গাগুলি পাহাড়-পর্বতরূপে গণ্য হলো। সূর্যকিরণের কারসাজিতে জলের বুকে জীব দেখা দিল। জল ছিল, তাই না হয় ভাসলো; কিন্তু সৃষ্টি হলো কি করে? একদিনে অকস্মাৎ হয় নি। হয়েছে বহু-যুগের আবর্তনে। কোন্ বিশিষ্ট রূপ ধরে জীব প্রথমে দেখা দিল, জীবের আদিম উৎপত্তি কি ভাবে হলো—এ সবের কোন স্থির সমাধান আজও হয় নি।

যে জীব যত উন্নত তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন তত জটিল। পতঙ্গের দেহের চাইতে মাছের দেহের গঠন অনেক জটিল, মাছের চেয়ে মানুষের আরও জটিল। জীবের ক্রমবিকাশ নানা অবস্থা পরম্পরার মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে ধীরে ধীরে হয়েছে। বিবর্তনের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রূপ ধরে স্মরণাতীত যুগের জীব বর্তমান রূপে উপনীত হয়েছে। আদিম অবস্থা থেকে অবস্থান্তরের বিভিন্ন রূপগুলি আজকের পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। এ সব অবস্থার অনেকগুলি রূপ প্রস্তরীভূত হয়ে ফসিলরূপে পাললিক শিলার স্তরের ভাঁজে ছিল। অনেকগুলির সন্ধান পাওয়া গেছে। শিলার নীচের দিকের স্তরে যে প্রাণী বা উদ্ভিদের ফসিল পাওয়া গেছে, উপরের দিকের স্তরে তাদের চেয়ে উন্নত প্রাণী বা উদ্ভিদের ফসিল দেখা গেছে। পাললিক

শিলার স্তর অনুসারে শিলা সৃষ্টির কাল নির্দেশ সম্ভব হয়েছে। সে যুগের পৃথিবীর জল-স্থলের সংস্থান কেমন ছিল, এমন কি, আবহাওয়া কিরূপ ছিল তাও অনুমান করা গেছে।

মানভূম, হাজারিবাগ, উড়িষ্যায় যে সব ফসিল পাওয়া গেছে তা থেকে অনুমান হয়, ঐসব অঞ্চল এককালে শীতপ্রধান ছিল—তুষারের নদী প্রবাহিত হতো। পরবর্তীকালে সে সব অঞ্চল উষ্ণ জলাভূমিতে পরিণত হয়েছিল; গভীর অরণ্যে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বিরাট বিরাট মহীরুহ ছিল সে সব অরণ্যে। সে সব জাতীয় মহীরুহ আজ লুপ্ত হয়ে গেছে। তারপর কালের বিবর্তনে সে সব অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হয়েছিল।

পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গধর হিমালয় পর্বতও পাললিক শিলায় গড়া। পর্বতমালার স্তরের ভাঁজে বিবিধ ফসিল পাওয়া গেছে। ফসিলের বয়স জানা গেছে। অনুমান করা হয়েছে, বয়োবৃদ্ধ পৃথিবীর তুলনায় হিমালয় অতি শিশু। সাগরতলে পলিস্তর বিন্যাসে হিমালয় সৃষ্টি হয়েছে। আদিযুগে পলিস্তরগুলি সমতলভাবে বিন্যস্ত ছিল। পরবর্তী যুগে উত্তর দিক থেকে চাপ পড়ায় ভাঁজ হয়ে স্তরগুলি শূন্যে উঠে গেছে। একটা জাবদা খাতা টেবিলে রেখে দুধার থেকে ঠেলা দিলে মাঝখানটা যেভাবে উপর দিকে উঠে আসে, সুবিশাল সাগরগর্ভে বিন্যস্ত স্তরগুলি এককালে সে ভাবেই উপরে উঠে এসে আজ হিমালয় পর্বতমালা নামে পরিচিত হয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণীর শিলা হলো রূপান্তরিত শিলা। কিসের রূপান্তর? ওই আগ্নেয় আর পাললিক শিলার রূপান্তর। ভূগর্ভে আছে প্রচণ্ড তাপ আর চাপ। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুচ্ছ্বাস আর উষ্ণ প্রস্রবণের উৎক্ষেপণ ভূগর্ভের ভিতরকার তাপ ও চাপের পরিচয় দেয়। সাংঘাতিক চাপ বা প্রচণ্ড তাপের জন্যে ভূগর্ভে শিলার রূপবিকার ঘটে। ভূপৃষ্ঠে যুগে যুগে বহুবার বহু আলোড়ন, বহু প্রাকৃতিক বিপ্লব ঘটে গেছে। পূর্বকালের শিলা উত্তরকালে এমন ভাবে রূপান্তরিত হয়েছে যে, পূর্বেকার রূপের কোন আভাসমাত্র অবশিষ্ট নেই। পূর্বতন শিলা বেঁকেচুরে, ভেঙ্গে, দুমড়ে, দলে-পিষে জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে গেছে। আদিমকালের চুনাপাথর এখন মার্বেল পাথরে পরিণত হয়েছে। বেলে-পাথর গলে পরে শক্ত হয়ে কাচের মত পাথরের রূপ নিয়েছে। শেল থেকে উৎপন্ন হয়েছে শ্লেট পাথর।

পৃথিবীতে এমন অনেক জায়গা আছে যাদের বড় প্রাকৃতিক বিপ্লব সহ্য করতে হয় নি। আমাদের দেশে দক্ষিণাপথ অঞ্চল আদিমকালে যে ভাবে সৃষ্টি হয়েছিল ঠিক তেমনি ভাবেই আছে. বড় একটা পরিবর্তন ঘটে নি। সৃষ্টি হয়ে পর্যন্ত স্থল আকারে আছে। কোন দিন এই বিস্তৃত মালভূমি সাগরতলে থাকে নি অথবা অন্যান্য স্থানের মত ওলটপালট খায় নি। তবে পরের যুগে ভূগর্ভ থেকে গলিত শিলা উৎসারিত হয়ে মালভূমির বুকে ছড়িয়ে পড়েছে।

সৃষ্টির প্রথম যুগের আদিম স্থলভাগের শিলা রূপান্তরিত শিলা। পাললিক শিলা অনেক স্থানে রূপান্তরিত শিলার উপরে স্তরে স্তরে জমা হয়েছে। বাংলা ও বিহারে পাললিক শিলা রূপান্তরিত শিলার উপর জমেছে। অনেক স্থানে অবশ্য রূপান্তরিত শিলা মাটি বা পাললিক শিলায় আবৃত হয় নি। গিরিধি, মধুপুর, ধানবাদ, বর্ধমান, মানভূম অঞ্চলে এইরূপ অনাবৃত রূপান্তরিত শিলা চোখে পড়ে।

পাহাড়ের বুক থেকে উৎপন্ন হয়ে নদী ঢালু পথে নীচে নামে। তার প্রবাহ-পথে নেমে আসে ক্ষয়ে-যাওয়া পাথরের নুড়ি, বালি, মাটি ইত্যাদি। জলের চলার পথে নুড়ি, বালি, মাটি থিতিয়ে পড়ে। বারিধৌত ভূমি কালক্রমে পলি পড়তে পড়তে উঁচু হয়ে ওঠে। ভারতের উত্তর অঞ্চলে আর্যাবর্তের সমতল ভূমি এই ভাবে গড়ে উঠেছে। হিমালয়ের শিলা ক্ষয় হয়েছে। ক্ষয়িষ্ণু শিলা থেকে সিন্ধু,

গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র নুড়ি, বালি, মাটি বয়ে এনেছে; আর্যাবর্তে পলিস্তর বিস্তৃত করে সমতলভূমি সৃষ্টি করেছে। গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্রের জলপ্রবাহ, উত্তর-পূর্ব ভারতে পলিমাটি ঢেলে পূর্ব সাগরের কতক অংশ কালক্রমে ভরাট করে ফেলেছে। ফলে বাংলা দেশের সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতের উত্তর অংশ যখন জলের তলায়, দক্ষিণ অংশ তখনও উচ্চভূমি। এই অঞ্চলের পাহাড়গুলি অতি প্রাচীন শিলাময় মালভূমির অংশ। হিমালয়ের চাইতে এসব অনেক প্রাচীন। হিমালয় থেকে ভিন্ন জাতীয়ও বটে। আর্যাবর্তে আগ্নেয়শিলা কম দেখা যায়; বেশীর ভাগই পাললিক ও রূপান্তরিত শিলা। দক্ষিণাপথের প্রায় দু-লক্ষ বর্গমাইল স্থান আগ্নেয়-শিলার দ্বারা অধিকৃত। দু-তিন হাজার ফুট গভীর দেশে নেমে গেছে। বার বার অগ্ন্যুচ্ছ্বাসের ফলে গলিত লাভা থেকে এর সৃষ্টি।

ভূপৃষ্ঠ থেকে নীচে প্রায় পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত বিবিধ শিলায় গঠিত। তার নীচে আছে অত্যুত্তপ্ত গলিত পদার্থ। ভূগর্ভে যত নীচে নামা যায়, তাপ ততই বাড়ে। সে তরল পদার্থ ভীষণ চাপে আছে। সর্বদা প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হচ্ছে। ভূপৃষ্ঠে কোন ফাঁক পেলে ঠেলে উপরে উঠে আসতে চায়। অগ্ন্যুচ্ছ্বাস তার ইঙ্গিত। ভূ-কেন্দ্র ও তার কাছাকাছি জায়গায় সবচেয়ে ভারী পদার্থ আছে। সম্ভবতঃ সে পদার্থ লোহা আর নিকেল ধাতুতে গড়া। আছে তপ্ত গলিত অবস্থায়। কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠের দিকে শিলার ভার ক্রমে কমে এসেছে। এদিকে সিলিকা, অ্যালুমিনা, ম্যাগনেশিয়াঘটিত স্বল্পভার শিলার পরিমাণ বেশী।

শিলার উৎপত্তি যে ভাবে ঘটে, খনিজের উৎপত্তিও সেভাবেই ঘটে। গলিত শিলা ভূগর্ভে ধীরে ধীরে শীতল হয়। তখন শিলার বিভিন্ন উপাদান সংযুক্ত হয়। ফলে বিভিন্ন খনিজের সৃষ্টি হয়। তরল শিলা যেমন শীতল হতে থাকে অমনি ধীরে ধীরে খনিজের কেলাস পৃথক হয়ে আসতে থাকে। সর্বাগ্রে যে খনিজগুলি কেলাসিত হয়, সেগুলি অনেক সময় তরল শিলার তলদেশে আশ্রয় নেয়। গলিত শিলা অন্তঃতাপ ও চাপের ফলে উপরে উঠে আসে। অন্যান্য খনিজও ধীরে ধীরে কেলাসিত হয়ে পৃথক হয়ে আসে। এভাবে গলিত শিলার অনেক উপাদান পৃথক হয়ে যায়। অবশিষ্ট গলিত শিলায় সিলিকা, তামা, সীসা, গন্ধক ও বিবিধ গ্যাস মিশে থাকে। তপ্ত গ্যাসে উর্ধ্বচাপে গলিত শিলা ক্রমে উপরের দিকে উঠে আসে। তারপর ফাটলের পথে গলিত শিলায় অবস্থিত খনিজ বেরিয়ে ভূপৃষ্ঠের কাছে আসে। এভাবে তামা, সীসা প্রভৃতি বিভিন্ন খনিজ ধাতু ভূপৃষ্ঠের অগভীর প্রদেশে সঞ্চিত হয়।

পাললিক ও আগ্নেয়শিলা ভূগর্ভের গভীর প্রদেশে থাকলে তাদের উপর খুব তাপ ও চাপ পড়ে। চাপের জন্যে পাললিক শিলাস্তরের ভিতরে গলিত শিলা প্রবেশ করে। সেই স্তরের ভিতরে পাললিক শিলার উপাদানের সঙ্গে গলিত খনিজের রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে। এভাবে নতুন খনিজের সৃষ্টি হয়। আগ্নেয়, পাললিক ও রূপান্তরিত শিলা ভূপৃষ্ঠের উপরে রোদ, জল, ঝড় খেয়ে ক্রমে ধূলা হয়ে যায়। শিলা ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে মাটি ও বালিতে পরিণত হয়। শিলার কোন কোন উপাদান বৃষ্টির জলে ধুয়ে যায়। বায়ুর অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি গ্যাসের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগের ফলে কোন কোন উপাদানের পরিবর্তন ঘটে। মাটির ভিতরে প্রবাহিত জলধারাও অনেক উপাদান ক্ষয় করে। সেই উপাদানগুলি বিভিন্ন খনিজ সৃষ্টি করে।

কয়লা, চুনাপাথর, বিভিন্ন প্রকারের মাটি পাললিক শিলাস্তরের ভিতরে থাকে। তামা, সীসা, সোনা, অভ্র প্রভৃতির খনিজ ভূগর্ভের গভীর প্রদেশ থেকে উঠে-আসা গলিত শিলা থেকে কেলাস রূপে পৃথক হয়। কায়ানাইট, সিলিম্যানাইট, গার্নেট, ট্যাল্ক প্রভৃতি গভীর প্রদেশে ধীরে ধীরে রূপান্ত-

রিত শিলারূপে সৃষ্টি হয়। ভূগর্ভে প্রবাহিত জলধারার সঙ্গে শিলার বিভিন্ন উপাদানের রাসায়নিক ক্রিয়ার জন্যে গেরিমাটি, এলামাটি আর বক্সাইট উৎপন্ন হয়।

খনিজ-সংস্থানের ধরণ থেকে খনিজ সৃষ্টি কি ভাবে হয়েছে তা অনুমান করা যায়। স্তরের মত বিন্যস্ত হলে বোঝা যায়, পাললিক শিলা থেকে সৃষ্টি। এই ভাবে কয়লা, স্তরের উপর স্তর জমে সৃষ্টি হয়েছে। চুনাপাথর, লৌহ-আকরিক, বেলেপাথর, মাটি একই ভাবে সৃষ্টি হয়েছে।

গলিত শিলা যখন ভূগর্ভে ধীরে ধীরে শীতল হতে থাকে তখন কোন কোন খনিজের কেলাস গলিত তরল অংশ থেকে পৃথক হয়ে আসে। কোন ফাটলের মধ্যে গলিত শিলা পথ খুঁজে নিলে সেখানে হয়তো কেলাস জমা হয়ে রইলো। এভাবে মূল গলিত শিলা বিন্যাসের খনিজ শিরারূপে সংস্থিত হয়। অনেকগুলি ধাতুর আকরিক এই রকম শিরার মধ্যে বিন্যস্ত হয়। অ্যাণ্টিমনি, ক্রোমাইট, তামা, সীসা, নিকেল, সোনা, রূপা, দস্তা, ফেল্ড্স্পার, অভ্র প্রভৃতি শিরায় থাকে।

ভূপৃষ্ঠের উপরে বা অল্প নীচে অবস্থিত অনেক খনিজ জলে ধুয়ে যায়। সিলিকা যেখান থেকে ধুয়ে যায় সেখানে অ্যালুমিনার পরিমাণ বেড়ে যায়। বায়ু ও জলপ্রবাহে পাললিক পদার্থ ধীরে ধীরে নদীসৈকতে জমা হয়। সেখানে নুড়ি, বালির প্রভৃতির সঙ্গে জমে উঠে সোনার ধূলা, টিন আকরিক, হীরক খণ্ড, টাংষ্টেন আকরিক ও প্ল্যাটিনাম ধাতু প্রভৃতি। এভাবে ত্রিবাঙ্কুর সাগরসৈকতে ইলমেনাইট, মোনাজাইট, জিরকন খনিজ জমা হয়েছে।

ভাত বনাম রুটী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী

অনেকেরই ধারণা, আমাদের খাদ্য ভাত পুষ্টিকর নয় বলিয়াই আমরা সবল এবং কষ্টসহিষ্ণু নই। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই পাশাপাশি অঞ্চলের লোকের সঙ্গে আমরা প্রতিযোগিতায় পেছিয়ে যেতে বাধ্য হই। অনেক শিক্ষিত লোকেরও এই ধারণা আছে যে, আটা ব্যবহারের জন্যেই উত্তর ভারতের লোকের স্বাস্থ্য ভাল হয়ে থাকে। অর্থাৎ তাঁদের মতে, চা'ল অপেক্ষা আটা সবরকমে উৎকৃষ্টতর খাদ্য।

বাঙ্গলায় প্রথম যখন বেরিবেরি বা শোথ রোগ দেখা দেয় তখন সবাই এই রোগের জন্যে চা'লকে দায়ী করেছিলেন। কলে-ছাঁটা পালিশ করা চা'লে খাদ্যপ্রাণ "খ" না থাকায় এই রোগে বাঙ্গালীকে ভুগতে হয়, এই কথা স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে প্রচারিত হয়। সে সময়ে চা'লের পরিবর্তে আটা ব্যবহারের কথা বলা হতো সভা করে, সমিতির মারফতে এবং সংবাদপত্রের সাহায্যে। পরে দেখা গেল, শেয়ালকাঁটার বীজ ভেজাল-দেওয়া সর্ষের তেল ব্যবহারেই এই শোথ রোগ হয়ে থাকে এবং সেজন্যেই সর্ষের তেল ব্যবহারকারী বাঙ্গালীরাই এই রোগে ভোগে। এখনও এই ভেজাল বন্ধ হয় নি।

চা'ল ও আটার পুষ্টিকারিতার বিষয় আলোচনা করলে দেখা যায় যে, চা'ল সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা ভুল—চা'ল গমের চেয়ে সবরকমে ভাল খাদ্য। আজকাল আমরা যেরকম করে

ভাত রেঁধে খাই তাতে জিনিষটা দেখতে সুন্দর হয় এবং এতেই আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। এই প্রণালীতে ভাত প্রস্তুতে চা'লের প্রায় তিন ভাগের একভাগ পুষ্টি কারিতা নষ্ট হয়ে যায়। চা'ল ও গম শ্বেতসার-প্রধান খাদ্য। মুখের লালার সাহায্যে দুটিরই হজম আরম্ভ হয়ে পাকস্থলী ও অন্ত্রে গিয়ে গ্লুকোজে পরিণত হয় এবং রক্তের সঙ্গে মিশে শরীরকে পুষ্ট করে। ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস ও লৌহ প্রভৃতি যেসব ধাতব পদার্থ আমাদের শরীর-গঠনে বিশেষ প্রয়োজনীয়, চা'ল ও আটায় তা প্রায় সমান ভাগেই আছে। ঐ সব উপাদান শস্যের খোসার নীচেই থাকে ; কাজেই চা'ল পালিশ করলে বা আটা থেকে খোসা বাদ দিলে সেগুলি তার সঙ্গেই বেরিয়ে যায়। শ্বেতসার ছাড়া অন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলিও খোলার নীচেই থাকে ; কাজেই সেগুলিও খোলার সঙ্গেই চলে যায়। আমরা শুধু মধ্যেকার শ্বেতসারটাই ব্যবহার করে থাকি।

চা'ল ও গম বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই—

উপাদান শতকরা

		শ্বেতসার	প্রোটিন	স্নেহজাতীয় পদার্থ	খাদ্যপ্রাণ ক	খাদ্যপ্রাণ খ
চাল						
ঢেঁকি ছাটা		৭৬	৯	১.৩	সামান্য	++
কলে সিদ্ধ	পালিশ করা	৭৮	৮	০.৫	০	০
	পালিশ না করা	৭৮	৮	০.৫	০	+
গম						
আটা		৭০	১৩	১.৭	সামান্য	++
ময়দা		৭৭	১০	১.৫	সামান্য	সামান্য

উপরের তালিকা থেকে দেখা যাবে যে, ঢেঁকি-ছাটা চা'লে আটা বা ময়দার চেয়ে শ্বেতসার বেশীই আছে। স্নেহজাতীয় পদার্থ চা'লের চেয়ে গমে বেশী। খাদ্যপ্রাণের অস্তিত্বও দুটিতেই প্রায় সমান। প্রোটিন জাতীয় উপাদান চা'লে শতকরা ৮ থেকে ৯ ভাগ এবং ময়দায় ১০ থেকে ১৩ ভাগ, অর্থাৎ গমে চা'লের চেয়ে প্রোটিন বেশী।

খাদ্য বিশ্লেষণে প্রাপ্ত উপাদানগুলির সবই শরীর সমানভাবে গ্রহণ করতে পারে না। অর্থাৎ সব খাদ্য উদরস্থ হলেও গ্রন্থিরসের দ্বারা পরিপাক হওয়া ও শরীরের পুষ্টিসাধন করবার ব্যাপারে তারতম্য দেখা যায়। প্রত্যেক প্রোটিনই শরীরস্থ রসগুলির দ্বারা বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত হয় এবং তাদের মধ্যে যেগুলি শরীর গ্রহণ করতে পারে, সেগুলির দ্বারা পুষ্টি সাধিত হয় ও অন্য অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি পরিত্যক্ত হয়। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ভুট্টার প্রোটিন আমরা অল্পই হজম করতে পারি, আর জিলাটিনের প্রোটিন মানুষ মোটেই হজম করতে পারে না।

এই হজম করবার তারতম্য বা Digestive Utilizations চা'ল ও গমের প্রোটিনের ক্ষেত্রে অনেক বেশী। আমরা চালের প্রোটিন হজম করতে পারি শতকরা ৮০ থেকে ৮৫ ভাগ, কিন্তু গমের প্রোটিন হজম হয় মাত্র ৬০ থেকে ৭০ ভাগ ; অর্থাৎ প্রায় শতকরা ২০ ভাগ কম। এ হিসাবে দেখতে গেলে চা'ল ও গমের শরীর পুষ্টির উপযুক্ত প্রোটিন আমরা উভয় ক্ষেত্রে সমান ভাগেই পেতে পারি, অর্থাৎ চা'ল ও গমের প্রোটিনে পরিমাণের তফাৎ থাকলেও পুষ্টিকারক হিসাবে আমাদের পক্ষে দুটাই সমান।

আর একটা কথা বিশেষ করে মনে রাখা দরকার যে, শ্বেতসার ব্যতিরেকে অন্য উপাদানগুলি থাকে খোসার নীচে। গমের ময়দাতে তো সেটা সম্পূর্ণই ফেলে দেওয়া হয়ে থাকে। তার অর্থ এই যে, ময়দাতে আমরা প্রোটিন, খাদ্যপ্রাণ ও ধাতব পদার্থগুলি মোটেই পাই না। আটাকেও যদি চেলে খোসা বাদ দিয়ে ব্যবহার করা হয় তাহলে উপরের উপাদেয় ও প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদানগুলির বেশীর ভাগই চলে যাবে। আমরা লুচি ও রুটীকে দেখতে সুন্দর ও সাদা দেখাবার জন্যেই এটা করে থাকি। চা'লের বেলায়ও তাই। সিদ্ধ চা'লে সব উপাদানগুলি খোসা থেকে চা'লে লেগে যায় এবং তুষের সঙ্গে সামান্য ফেলা যায়; কাজেই এই পুষ্টিকর সব উপাদানগুলিই আমরা পাই। কলে পালিশ করে উপরের ছালটা ফেলে দিয়ে ঐগুলিকে হারাই। সেটাও ভাতকে সুন্দর ও শুভ্র দেখাবার জন্যেই করা হয়ে থাকে। আমরা আবার চা'ল ভাল করে রগ্‌ড়ে ধুয়ে ভাত রাঁধি। এতে কতক উপরের খোসা ও চা'লের অঙ্কুর ফেলে দেওয়া হয়। তার পরেও ভাত আমরা খেয়ে থাকি ফেন ফেলে দিয়ে। ভারতবাসী, বিশেষতঃ বাঙালী ছাড়া অন্য কোনও ভাত ব্যবহারকারী জাতই ফেন ফেলে দেয় না। এই ফেনের সঙ্গে প্রায় সিকি অংশ পুষ্টি আমরা নষ্ট করে থাকি। মোট কথা, আমরা চা'ল রগ্‌ড়ে ধুয়ে ও ভাতের ফেন ফেলে এক তৃতীয়াংশ মূল্যবান পুষ্টিকর দ্রব্য নষ্ট করে দিই। আমরা দুর্বল—পরিশ্রমকাতরতা, উদ্যমের অভাব এ জন্যে দায়ী হতে পারে, কিন্তু চা'লে পুষ্টির অভাবের জন্যে যে নয়, সেটা নিশ্চয়ই।

আমাদের দেশে ব্যবহার করা দরকার ঢেঁকি-ছাটা চালের ভাত। চা'ল ভাল করে ধোয়া ও ফেন গালবার অভ্যাসটা ত্যাগ করতে হবে। একটু চেষ্টা করলেই ঝরঝরে ভাত ফেন না ফেলেও রাঁধা যায়, এটা সকলেই জানেন। চক্‌চকে পালিশ করা চা'ল দেখতে সুন্দর, সেই চা'লের ভাত ব্যবহার না করে পুষ্টিকর ঢেঁকিছাটা চা'লের ভাত খাওয়ার অভ্যাস প্রচলন করা দরকার—এ অভ্যাস সামান্য চেষ্টাতেই হতে পারে।

সরকার থেকে চা'লের কলগুলি তুলে দেবার ব্যবস্থা সর্বাগ্রে করা দরকার। চা'ল-কলওয়ালারা অন্যরূপে তাঁদের মূলধন ব্যবহার করতে পারেন। তাঁদের কলে ভাঙ্গা লক্ষ লক্ষ মণ চা'ল যদি গ্রামের ঢেঁকিতে ভাঙ্গা হয় তাতে গ্রামবাসীদের কিছু রোজগারের ব্যবস্থা হবে। আমাদের দেশের চাষী পরিবার বছরে ৮ মাস কাজ পায় না, আলস্যে কাটায়—তাদের কিছু অভাব ঘুচবে এই ঢেঁকি-ছাটা চা'ল তৈরী করে।

সরকার পক্ষ থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বায়ত্ত-শাসন, পল্লী-উন্নয়ন ও অন্য বিভাগগুলির, যাঁরা সাধারণের সঙ্গে মিশতে বাধ্য হন—তাঁদের দ্বারা এই জ্ঞান ছড়িয়ে দিন—যাতে আমরা আমাদের চা'লের সমস্ত পুষ্টিকর অংশটাই শরীরে গ্রহণ করতে পারি, চা'ল বেশী করে ধুয়ে রাঁধা ও ফেন ফেলে দেওয়ার অভ্যাসটা ত্যাগ করতে পারি। জাতীয় উন্নতির জন্যে এটা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

বাঙ্গালীর খাদ্য ভাত যে রুটির চেয়ে অনেক পুষ্টিকর ও সুপাচ্য, সেটা বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষিত সত্য। ভাত ব্যবহারকারী জাপানী, চীনা, নেপালী, স্বাস্থ্য ও সামর্থ্যে পৃথিবীর কোনও জাতের চেয়ে কম নয়। বাঙালীরাই বা কেন দুর্বল হবে—উৎসাহ বা পরিশ্রমে পিছিয়ে যাবে?

প্রথম যুগের পরমাণুবাদ

শ্রীসলিল বসু

সৃষ্টির আদিযুগে মানুষ যেদিন আগুন জ্বালতে শিখেছিল, সেই দিনই হয়েছিল বিজ্ঞানের সত্যিকারের সূচনা, মানুষের সভ্যতার গোড়া-পত্তন। তারপর সভ্যতার পথে আমরা এগিয়ে এসেছি অনেক দূর। গুহামানব প্রথম গুহা ছেড়ে এসেছিল পশুপালনের কাজে, সুরু হয়েছিল পশুচারণ যুগ। কিন্তু এই সীমার মধ্যে তাকে বেঁধে রাখা যায় নি বেশী দিন। নদী-প্রধান অঞ্চলে পলিমাটিতে তারা সুরু করলো শস্য-উৎপাদন, চায-আবাদের কাজ, সূচনা হলো নতুন যুগের, যাকে বলা যায় কৃযি যুগ। এই যুগেই সে প্রথম গড়ে তুললো তার সমাজ, বাঁধতে চাইলো নিরিবিলি ছোট্ট বাসস্থান; পান-ভোজনে, সাজপোযাকে এলো তার পরিবর্তন। শোক-প্রকাশের মূর্চ্ছনায় তারা সৃষ্টি করলো সুরের দোলা, আনন্দ প্রকাশের উত্তাল ছন্দে উঠলো নেচে। বিশ্বশিল্পীর গড়া প্রকৃতির অপরূপ খেলায় জাগলো তার অপূর্ব শিহরণ। উৎসুক আগ্রহে এদের মূল রহস্যকে সে চাইলো জানতে।

প্রথম যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানী দার্শনিকেরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন, কতকগুলি বিশেষ পদার্থ ও শক্তির সমন্বয়ে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে নিখিল বিশ্ব। ভারতের দার্শনিকেরা বলেছিলেন, পঞ্চভূতের সমবায়ে এই বিশ্ব গঠিত। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই হলো পঞ্চভূত। গ্রীক দার্শনিকেরা বলতেন, বিশ্বের মূল কথা চারটি পদার্থ, আর দুটি শক্তি; যথা—অগ্নি, বায়ু, বারি ও পৃথ্বী, আর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তি। প্রথম শক্তির কাজ—সৃষ্টি, আর দ্বিতীয় শক্তির কাজ—লয়। বেশীরভাগ দার্শনিকই এই জাতীয় সিদ্ধান্তে হয়তো সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছিলেন। যে কজন সান্ত্বনা পান নি, তাঁরা ব্যাপৃত ছিলেন আরও সূক্ষ্ম, আরও ক্ষুদ্রের সন্ধানে। অতীতের সেই বিস্মৃত লগ্নে, খৃষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতের তপোবনে মহর্ষি উলুক ব্যাখ্যা করলেন, পদার্থের অবিভাজ্য মৌলিক কণিকার—'নিত্যম পরিমণ্ডলম'। উলুকের মতে, দ্রব্য নয় প্রকার—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক, আত্মা ও মন। প্রত্যেক দ্রব্যই দুই প্রকার—নিত্য ও অনিত্য। পারমাণবিক অবস্থা ছাড়া আর সব অবস্থাতেই দ্রব্য অনিত্য। তাঁর মতে, পরমাণু অতিশয় ক্ষুদ্র ও সকল প্রকার উৎপত্তিশীল দ্রব্যের উৎপত্তির কারণ। প্রত্যেক উৎপত্তিশীল সাবয়ব দ্রব্যের বিভাগ করতে করতে যে ক্ষুদ্রতম অংশে পৌছান সম্ভব, যাহাকে আর ভাগ করা যায় না, সেই নিরাবয়ব অংশই পরমাণু নামে কথিত। কিন্তু পঞ্চভূতের সমর্থকেরা তখন এতই জোরালো যে, তাঁরা উলুকের মতবাদ মানতেই চাইলেন না। উলুকের পিতৃদত্ত নাম ছিল অবধি। ব্যঙ্গচ্ছলে নতুন নামকরণ হলো কণাদ, অর্থাৎ কণাভক্ষক। পরবর্তী যুগের পৃথিবী তাঁকে চিনেছিল, বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা মহষি কণাদ বলে। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন পুঁথিপত্রের কোন কোন অংশে যে পরমাণু-বাদের আভাস পাওয়া যায় তাতে মহর্ষি উলুকের প্রভাবই বিদ্যমান। অবশ্য গ্রীক বিজ্ঞানীরাও এ বিষয়ে খুব পিছিয়ে ছিলেন না। খৃষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দে জেনোফেন্‌স্ ও লিউকিপাস পদার্থের মূল অংশ সংক্রান্ত মতবাদ প্রচারের চেষ্টা করেন। আর ঠিক এরই পরে খৃষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দে ডেমোক্রিটাস প্রচার করেন তাঁর স্মরণীয় পরমাণু-মতবাদ। তিনিই এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশগুলির নাম দিলেন,

অ্যাটম, অর্থাৎ যা অবিভাজ্য, অখণ্ডনীয়। পদার্থের পারমাণবিক অবস্থার ঠিক পূর্ব অবস্থার, অর্থাৎ আণবিক অবস্থার পরিকল্পনা দেন গ্রীক দার্শনিক আস্ক্লেপিয়াডেস, খৃষ্টপূর্ব ১০০ অব্দে। এই বিষয়ে ৫৭ খৃষ্টপূর্বাব্দের দার্শনিক লুক্রেটিয়াসও খ্যাতি-সম্পন্ন।

আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিবৃত্তের সূচনায় পদার্থ-কণিকা, অর্থাৎ পরমাণু-মতবাদের অন্যতম সমর্থক ছিলেন নিউটন। অবশ্য নিউটনের আগে লেমেরি, হেলমোন্ট প্রমুখ বিজ্ঞানীরা কণিকার অবস্থিতি সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেন। পরমাণুর অবস্থিতির সিদ্ধান্তে নিউটন বাষ্প বিষয়ক বয়েল তত্ত্বের গাণিতিক বিশ্লেষণ করেন। পরমাণুবাদের ভিত্তিতে বাষ্পের তাপ সঞ্চারণ, প্রবহমান বাষ্পস্তরের ঘর্ষণজনিত শক্তি, বিভিন্ন অবস্থায় চাপ, তাপ ও আয়তন সংক্রান্ত হিসাব যখন ব্যবহারিক পরীক্ষায় পাওয়া ফলের সঙ্গে মিলে গেল তখন বিজ্ঞানীরা পরমাণু-মতবাদের সমর্থনে অন্যান্য পরীক্ষা আরম্ভ করেন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে জন ড্যালটন পরমাণু-মতবাদের একটা নতুন যুগের সূচনা করেন, রাসায়নিক বিক্রিয়ার পরমাণু ব্যাখ্যা করে। তিনি বললেন, (১) যে কোন পদার্থের, মৌলিক বা যৌগিক যাই হোক না কেন, মূল অংশ হলো অবিভাজ্য মৌলিক কণা, যার নাম অ্যাটম বা পরমাণু; (২) একই পদার্থের পরমাণুগুলির ওজন ও আচার-ব্যবহার একই প্রকারের; (৩) বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুর ওজন ও প্রকৃতি বিভিন্ন এবং (৪) পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয় পরমাণুর মধ্যেই। এই সময় রসায়ন-বিজ্ঞানীরা অনেকগুলি রাসায়নিক সামগ্রীকে বিশ্লেষণ করতে সমর্থ হন। এতদিন পর্যন্ত যৌগিক পদার্থ বলে পরিচিত অনেক জিনিষ-কেই বিভিন্ন মৌলিকে বিভক্ত করা গেল। পরমাণু তত্ত্বের পটভূমিকায় এই জাতীয় বিক্রিয়া ব্যাখ্যার সময় দেখা গেল যে, শুধুমাত্র পরমাণু-সিদ্ধান্তে এ ব্যাখ্যা সম্ভব হচ্ছে না। তখন বিজ্ঞানী অ্যাভো-গ্যাড্রো ড্যালটনের মতবাদের কিছু পরিবর্তন করেন। তিনি বললেন যে, সাধারণ অবস্থায় যৌগিক অথবা মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ হলে অণু বা মলিকিউল, প্রয়োজনমত যার বিভাজন সম্ভব। তবে পদার্থের অবিভাজ্য অংশ হলো পরমাণু, আর রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় বিক্রিয় পদার্থগুলি প্রথমে পরমাণুর রূপ ধারণ করে, আর বিক্রিয়া হয় এই পারমাণবিক অংশের মধ্যেই। অ্যাভোগ্যাড্রোর এই সিদ্ধান্তের সাহায্যে সেদিনের সমুদয় রাসায়নিক বিশ্লেষণের ব্যাখ্যা হয়েছিল এবং অন্যান্য অনেক গবেষণাও বিশেষ লাভবান হয়েছিল।

পরীক্ষা করে দেখা গেল, হাইড্রোজেন পরমাণু হলো সবচেয়ে হাল্কা, আর ইউরেনিয়াম সবচেয়ে ভারী। সাধারণভাবে এই দুটি পদার্থের মধ্যে আছে আরও ৯০টি পদার্থ, অর্থাৎ সর্বসমেত ৯২টি, যদিও সবগুলির তখনও আবিষ্কার হয় নি। অণু ও পরমাণু সিদ্ধান্তের পর বিজ্ঞানীদের চেষ্টা হলো, এই ৯২টি পদার্থের মধ্যে কোন সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী প্রাউট বললেন, যাবতীয় পদার্থের মূল হলো হাইড্রোজেন পরমাণু, আর অন্যান্য পদার্থগুলি শুধু এই হাইড্রোজেন পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। বহুর মধ্যে একের অনু-সন্ধান বিজ্ঞানীদের এই প্রথম। এতদিন এটা শুধু একচেটে ছিল দার্শনিকদের। কিন্তু বিজ্ঞান তখন যুক্তিবাদী হতে সুরু করে দিয়েছে; তাই বিনা পরীক্ষায় প্রাউটের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া চললো না। বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুর ওজনের মাধ্যমে পরীক্ষা আরম্ভ হলো। হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন হলো ১, আর তাই দিয়েই দেখা গেল কার্বন পরমাণুর ওজন ১২, অক্সিজেনের ১৬, অর্থাৎ এইগুলিকে যথাক্রমে হাইড্রোজেন পরমাণুর ১২টি ও ১৬টির সমষ্টি বলা চলে। কিন্তু ক্লোরিন পরমাণুর ওজন দেখা গেল ৩৫·৫, অর্থাৎ সাড়ে ৩৫টি হাইড্রোজেন পরমাণুর সমষ্টি। আধখানা

পরমাণু—সে আবার কেমন কথা? পরমাণু যে অবিভাজ্য, পরমাণু যে অখণ্ডনীয়! প্রাউটের মতবাদ চললো না, বাতিল হয়ে গেল।

প্রাউটের সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হলেও বিজ্ঞানীরা বহুর মধ্যে একের অনুসন্ধানে বিরত হলেন না। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ডয়বারাইনেয়ার লক্ষ্য করলেন, একই রকম রাসায়নিক গুণসম্পন্ন পদার্থের পারমাণবিক ওজনের মধ্যে এক রকম বিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে। ক্লোরিনের পরমাণুর ওজন ৩৫·৫, আর আয়োডিনের ১২৭। এই দুই যোগফলের মধ্য সংখ্যা হলো ৮১। বাস্তবিক পক্ষে দেখা গেল, সমগুণসম্পন্ন ব্রোমিনের পরমাণুর ওজন ৮০। আবার ক্যালসিয়ামের পরমাণুর ওজন ৪০, বেরিয়ামের ১৩৭; সমগুণসম্পন্ন ষ্ট্রন্‌সিয়ামের ৮৮, অর্থাৎ পূর্বোক্ত দু'টির যোগফলের মধ্য সংখ্যা। তখনকার মত এটার নাম হলো ত্রিযোজী সূত্র (Law of triads)। এই সূত্র সম্বন্ধে গ্ল্যাড্‌ষ্টোন, কুক, ডুমা, ক্যানিজারো প্রভৃতি অনেকে অনুসন্ধান চালান। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের কেমিক্যাল নিউজ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে বিজ্ঞানী নিউল্যাণ্ডস্ দেখান যে, মৌলিক পদার্থগুলিকে যদি তাদের পরমাণুর ওজনের ক্রমিক বৃদ্ধি অনুযায়ী সাজানো যায় তবে সঙ্গীতের স্বরগ্রামের মত প্রতি অষ্টম মৌলিকটির রাসায়নিক গুণ তার সাতটি সংখ্যার পূর্ববর্তী মৌলিকটির সমপর্যায়ে পড়ে। এই সূত্রটির নাম দেওয়া হলো অষ্টযোজী সূত্র (Law of octaves)। কিন্তু নিউল্যাণ্ডস্-এর এই সূত্রটি লণ্ডনের কেমিক্যাল সোসাইটির বৈঠকে খুব জোরালো সমর্থন পেলো না। এই সূত্রেরই কিছু রদবদল করে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিজ্ঞান দরবারে উপস্থিত করলেন রাশিয়ান বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিফ। মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ওজন ও রাসায়নিক-গুণ সংক্রান্ত গবেষণা করতে গিয়ে বিজ্ঞানী দেখলেন তাদের মধ্যে রয়েছে এক অপূর্ব সহযোগিতা। যদি বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ক্রমশঃ বেশী আনুপাতিক ওজনের পদার্থগুলি পর পর সাজানো যায়, তবে যে কোন উপাদান থেকে তার পরবর্তী অষ্টম উপাদানটি হয় প্রথম উপাদানের সমগোত্রীয়। সুতরাং একটি সারিতে ক্রমশঃ ভারী সাতটি মৌলিক উপাদান পর পর লিখে অষ্টমটি লেখা উচিত প্রথমটির নীচে, দ্বিতীয়টির নীচে নবমটি ইত্যাদি। দেখা গেল, মেণ্ডেলিফের তৈরী ছকে প্রথম কলমে লিথিয়াম, তার নীচে সোডিয়াম, তারও নীচে পটাসিয়াম প্রভৃতি; আর গোষ্ঠীর রাসায়নিক আচার-ব্যবহার প্রায় সবারই সমান। মেণ্ডেলিফের এই ছকের নাম 'পর্যায় সারণী'। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জার্মেনীর লোথারমায়ারও এই রকম একটা ছক তৈরী করেন। তবে মেণ্ডেলিফের ছকে সাজানোর সুবিধার জন্যে দু-একটা মৌলিকের ওজন প্রভৃতি সামান্য পরিবর্তন করেন, কিন্তু লোথারমায়ার তাতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু পরবর্তী কয়েক বছরের পরীক্ষা মেণ্ডেলিফের অনুকূলেই রায় দিল। মেণ্ডেলিফ তাঁর ছকে অনাবিষ্কৃত মৌলিক পদার্থের জন্যে স্থান শূন্য রেখেছিলেন এবং তাদের সম্ভাব্য গুণাগুণ সম্বন্ধেও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী গ্যালিয়াম, জার্মেনিয়াম ও স্ক্যাণ্ডিয়ামের আবিষ্কার সপ্রমাণ করে দিল। ড্যালটন তাঁর পরমাণু-মতবাদের প্রতিটি উপাদানের পরমাণু ভিন্ন বলেছিলেন; কিন্তু মেণ্ডেলিফ তার পরিসর অনেক কমিয়ে আনলেন।

ড্যালটনের মতবাদকে ভিত্তি করে পরমাণু প্রভৃতির রূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টায় যখন রসায়ন-বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত, সেই সময় মাইকেল ফ্যারাডে বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় গবেষণায় একটা নতুন যুগের সূচনা করেন। এই আবিষ্কারের পটভূমিকায় পদার্থ-বিদ্যা যে সব গবেষণা করতে লাগলেন, তার ফলাফল রাসায়ন-বিজ্ঞানীদের পরমাণু মতবাদের ভিত্তিকেও নাড়া দিল। আর তার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠলো বিংশ শতাব্দীর আধুনিক পরমাণু-মতবাদ। তবে গত শতাব্দীর শেষ অবধি বড় বড় বিজ্ঞানীদের ড্যালটন মতবাদের উপরই আস্থা ছিল বেশী। একটি ছাত্রের পরমাণুর ভাঙ্গনের সম্ভাবনা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন বলেছিলেন, পাগল! অ্যাটম ভাঙ্গা অসম্ভব। গ্রীক ভাষায় অ্যাটম মানেই যাকে ভাঙ্গা যায় না।

সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমি

শ্রীসুবিমল সিংহ রায়

ভারতের প্রাকৃতিক মানচিত্রের দিকে তাকালে যে জিনষটি সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটি হলো তার ভূমিবৃতি। তিনটি সম্পূর্ণ পৃথক অঞ্চলে এই বিরাট দেশটিকে ভাগ করা যায় এবং প্রত্যেকটি অঞ্চলের প্রতিটি সংস্থান সম্পূর্ণ নিজস্ব। প্রথমটি দক্ষিণের উপদ্বীপাংশ, দ্বিতীয়টি উত্তরের গিরিশ্রেণী, আর তৃতীয়টি মধ্যবর্তী সিন্ধু গাঙ্গেয় সমভূমি। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র আর সিন্ধুনদের অববাহিকা অঞ্চলটি ভারতের উত্তর আর দক্ষিণের দুই বিসদৃশ ভূমিবৃত্তির সংযোগ-ক্ষেত্র। ভূতাত্ত্বিকেরা মনে করেন যে, উপদ্বীপাংশের ভূমিখণ্ড, আর হিমালয় পর্বতশ্রেণীর মাঝামাঝি অঞ্চলে পাললিক শিলার অবক্ষেপণের উপযুক্ত একটি বিরাট অবনমিত স্থান ছিল এবং তাতেই বহুদিন ধরে পলল সঞ্চিত হয়ে বর্তমান আকারে পরিবর্তিত হয়েছে। সেই অবনমিত স্থানটিকে তাঁরা সিন্ধু-গাঙ্গেয় দ্রোণী বলে অভিহিত করেছেন।

এই দ্রোণীর বিস্তার বহুদূর পর্যন্ত। পূর্বে আসামের পশ্চিমাংশ থেকে বাংলার ভিতর দিয়ে বিহারের কিছুটা অংশ ছেড়ে হিমালয়ের পাদদেশ জুড়ে বিস্তৃত হয়ে গেছে সেই সুদূর সিন্ধুদেশ পর্যন্ত। আনুমানিক বিস্তৃতি ২৫০,০০০ বর্গমাইলের কাছাকাছি। বেধের পরিমাণ পূর্বে ৯০ মাইল থেকে পশ্চিমে ৩০০ মাইলের মধ্যে হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। দিল্লী আর বিহারের রাজমহল পাহাড়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলের গভীরতাই সবচেয়ে বেশী, কিন্তু একদিকে রাজপুতানা এবং অন্য দিকে বাংলা আর আসামে এসে অত্যন্ত অগভীর হয়ে গেছে। ধরাকৃতি পর্যবেক্ষণে গভীরতা সম্বন্ধেও কতকটা আন্দাজ করা গেছে। পর্যবেক্ষণের পর বিহারে এই দ্রোণীর গভীরতা ৬০০০ ফুট থেকে ১০,০০০ ফুট পর্যন্ত বলে অনুমান করা হয়েছে।

এই বিরাট দ্রোণীর সবটাই পুরু পললে ঢাকা। যদিও দ্রোণীর উৎপত্তি সম্পর্কে মতভেদ আছে তথাপি পললের উৎপত্তি সম্বন্ধে সবাই একমত। হিমালয় পর্বতশ্রেণীর শিলারাশি নৈসর্গিক কারণে ক্ষয়ে চলেছিল; অবশ্য আজও সে ক্ষয়ের কোন পরিবর্তন হয় নি। আর সেই ক্ষয়জাত শিলা পললরূপে নদীগুলির সাহায্যে নেমে এসে দ্রোণীর মধ্যে জমতে লাগলো ধীরে ধীরে, যুগ যুগ ধরে। ক্রমে ভরে গেল সেই বিরাট দ্রোণী স্তূপাকৃতি পললে। নদীগুলির কাজ আজও থামে নি। এখনও তারা বয়ে আনে বালি, পলি, কাদা আর নুড়ি—স্তরে স্তরে সাজিয়ে রেখে যায়, ঠিক যেমন করে বহুযুগ আগে হিমালয়ের নদীগুলি সাজিয়ে রেখেছিল। শুধুমাত্র হিমালয় থেকেই পলল আসে নি—দক্ষিণাঞ্চল থেকেও এসেছিল। সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমির যদি সুন্দর একটি ছেদ নেওয়া যায় তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে বিভিন্ন ধরণের পলল স্তর একটির পর একটি পর্যায়ক্রমে সাজানো রয়েছে। শুধু পললই নয়, সঙ্গে সঙ্গে কিছু পিটজাতীয় জৈববস্তুর সন্ধানও মিলবে। এখান কার পললকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—পুরনো আর নতুন। সাধারণতঃ পুরনো পললকে Bhangar আর নতুনটিকে Khadar বলা হয়। পুরনো পললগুলি কালো রঙের এবং এর মধ্যে নিকৃষ্ট ধরণের ক্যালসিয়াম কার্বনেটের একরকম পিণ্ড থাকে। সেগুলিকে বলা হয় কঙ্কর। প্লিষ্টোসিন যুগের (আনুমানিক ১,০০০,০০০ বছর আগের) এই পলল একটু উঁচু কতকগুলি সোপান তৈরী করেছে

বলে মনে হয় এবং এও অনুমান করা হয় যে, ঐ সোপানগুলির অবস্থান তখনকার প্লাবনাঙ্কের উপরে। অপরদিকে নতুন পললের রং পুরনোর মত ততটা গাঢ় নয়, অনেক হাল্কা। এই পললে ক্যালসিয়াম কার্বনেট জাতীয় পদার্থের অনুপাত অনেক কম। বালি, পিচ আর নুড়ি লেন্সের মত স্তরে নতুন পললের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। এই পলল ক্রমে ক্রমে অত্যাধুনিক অথবা ব-দ্বীপীয় পললের সঙ্গে মিশেছে। তাই এটাকে আপার প্লিষ্টোসিন থেকে আধুনিক যুগের বলা যেতে পারে, অর্থাৎ আনুমানিক ২৫,০০০ বছর পূর্বের।

ধরাকৃতি পর্যবেক্ষণ থেকে এই দ্রোণী সম্বন্ধে আরও কিছুটা জানা গেছে। জানা গেছে যে, পললের নীচে মুখ ঢাকা দিয়ে প্রসারিত হয়ে আছে একটা পাহাড়। দিল্লী আর আম্বালার নীচ দিয়ে গেছে সেটা। অনেকে মনে করেন যে, এই পাহাড়টা আরাবল্লীরই সম্প্রসারণ। উপর থেকে দেখে কিন্তু বোঝবারই উপায় নেই যে, হিমালয়ের সমান্তরাল একটা পাহাড় দিল্লী থেকে সল্ট রেঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত, আর তারই উপর দাঁড়িয়ে আছে কিরানা আর সাংলা পাহাড়।

এখানে স্বভাবতঃই একটা প্রশ্ন ওঠে—কিসের উপর ভর দিয়ে স্তরে স্তরে এত পলল দাঁড়িয়ে আছে? সন্ধান চাই পীঠশিলার। কিন্তু কোন কোন জায়গায় ২০০০ ফুট পর্যন্ত খুঁড়েও সেই শিলার সন্ধান পাওয়া যায় নি। তাই অগ্রসর হতে হয়েছে অন্য পথে। বাংলার গাঙ্গেয় ব-দ্বীপে অ্যারো-ম্যাগ্নেটিক জরিপ করে জানা গেছে যে, পীঠশিলা অন্ততঃ ১৭,০০০ ফুট থেকে ২০,০০০ ফুট নীচে অবস্থিত। ভূকম্প সম্পর্কিত পরীক্ষায় আরও উন্নত ধরণের ফল পাওয়া গেছে। ২৫০০ ফুটের স্তর থেকে এবং এর পরে ৯০০০ ফুটের মধ্যে আরও তিনটি স্তর থেকে ভূকম্পীয় প্রতিফলন পাওয়া গেছে। এথেকে অনুমান করা হয় যে, ২৫০০ ফুটের স্তরটি পললের পাদপীঠ, আর পরের তিনটি স্তরের নীচেরটি, অর্থাৎ ৯০০০ ফুটের স্তরটি ক্রিটেসাস (১২০,-০০০,০০০ বছর আগে) অথবা ইওসিন (৭০,০০০,০০০ বছর আগের) যুগের স্তরসমষ্টির উপরিভাগ। এই সব প্রতিফলনক্ষম স্তরগুলির নতি পূর্ব অথবা দক্ষিণ পূর্বে এবং সেটা অত্যন্ত সংযত। সম্ভবতঃ এই শিলার উপরিভাগ সম্পূর্ণরূপে সমতল নয়, জায়গায় জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে উঁচু আর নীচু। তবে যখন পেট্রোলিয়ামের খোঁজে এসব জায়গায় খননের কাজ আরম্ভ হবে, আশা করা যায় তখন পীঠশিলা সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।

দ্রোণীর উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই একটা ভুল ধারণাকে আগে মন থেকে দূর করতে হবে। সেটা হলো এই যে, শুধুমাত্র পললের ভারে যে চাপ সৃষ্টি হয়েছিল তাতেই ভূপৃষ্ঠ বসে গিয়ে দ্রোণীর সৃষ্টি করেছে। এরকম হওয়াটা যে একেবারেই অসম্ভব তা নয়, তবে সিন্ধু-গাঙ্গেয় দ্রোণীর বেলায় এটা অসম্ভব বলেই মনে হয়। কারণ, প্রথমতঃ—উত্তর এবং দক্ষিণাঞ্চলের তুলনায় পললের পৃষ্ঠদেশ অনেক নীচুতে। দ্বিতীয়তঃ—পূর্বোক্ত দুই অঞ্চলের শিলার তুলনায় এই পললের আপেক্ষিক গুরুত্বও অনেক কম। সুতরাং ভূপৃষ্ঠের উপর হিমালয় এবং উপদ্বীপাংশের শিলার চাপ ঐ হাল্কা পললের তুলনায় বেশী। তাই শুধুমাত্র পললের ভারেই দ্রোণীটি হতে পারে না। তবে দ্রোণী উৎপত্তির ব্যাপারে এই চাপ যে অনেকটা সাহায্য করে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মিঃ ফিসার দ্রোণীর উৎপত্তি সম্পর্কে নিম্নোক্ত মতবাদটি পেশ করেছেন। তিনি মনে করেন যে, যদি হিমালয় পর্বতশ্রেণীর শিলা ক্ষয়ের পর ক্ষয়জাত শিলারাশি তার পাদদেশে জমা হতে থাকে তাহলে ঐ অঞ্চলে ভূত্বকের ভারকেন্দ্র পাশের দিকে কিছুটা হেলে পড়বে। এখন যদি মেনে নেওয়া যায় যে, ভূত্বক ভাসমান অবস্থায় নিখুঁত ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে, তবে ভারকেন্দ্রের অনুরূপ স্থানচ্যুতির ফলে সে অঞ্চলে পূর্ববর্তী

ভারসাম্যের প্রকৃত অবস্থা থাকবে না। এটা খুবই স্বাভাবিক। সে ক্ষেত্রে ভারকেন্দ্র ও প্লবকেন্দ্র একই লম্বরেখায় থাকবে না। ফলে দ্বৈতবলের সৃষ্টি হবে। তারই একটির প্রভাবে পর্বতশ্রেণী ক্রমে ক্রমে উচ্চতায় বাড়তে থাকবে, আর অপরটির টানে পর্বত-পাদদেশ তালে তালে গভীরতর হতে থাকবে। এমনি চলবে শুধু সেই সময়টি পর্যন্ত যখন পর্বত-শ্রেণীর নীচে ভূত্বকের প্রবহীনতা, পাদদেশের নিম্নস্তরের প্রবতার মধ্যে একটা সাম্য উপস্থিত হয়।

অষ্ট্রীয়ান ভূতাত্ত্বিক এডোয়ার্ড সুয়েস এই মত পোষণ করেন যে, টেথিস* জলাধারে অবক্ষেপিত পাললিক শিলা যখন উত্তুঙ্গ হিমালয় গিরিশ্রেণীতে পরিবর্তিত হয় তখন তার সম্মুখভাগে যে বিরাট এক অবতল ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছিল, পললে পূর্ণ হয়ে সেটাই সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমিতে পরিণত হয়েছে। এই মতানুসরে উপদ্বীপীয় অঞ্চলকে নিশ্চল ভূমি-খণ্ড বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। তিব্বতের দিক থেকে যখন একটা দক্ষিণমুখী চাপ ঐ টেথিসের পললে হানা দিয়েছিল এবং হটিয়ে নিয়ে চলেছিল দক্ষিণদিকে তখন নিশ্চল উপদ্বীপের আচমকা বাধায় ফুলে উঠলো সেই স্তূপীকৃত পলল। হিমালয় গিরি-শ্রেণীর এই প্রথম উৎক্ষেপ। তারপর একটু একটু করে উচ্চতায় আর বিস্তারে বেড়ে চলেছিল হিমালয়। ক্রমে এগিয়ে এসেছিল ভারতের দিকে, আর তার সঙ্গে সেই বিরাট অবতল ক্ষেত্রও গুটি গুটি এসে দাঁড়িয়েছিল আজকের সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমির কাছে। এই অবতল ক্ষেত্রই সেই দ্রোণী—অন্ততঃ সুয়েস-এর মতে।

সিডনি বারার্ড কিন্তু বলেন অন্য কথা। তাঁর মতে, এই দ্রোণীটি আর কিছুই নয়, একটি সংস্র-উপত্যকা। দুটি সমান্তরাল সংস্রের মধ্যবর্তী অংশটি বসে গিয়ে যে খাতের সৃষ্টি করে, তাকেই বলা হয় সংস্র-উপত্যকা। সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমি আর হিমালয় পর্বতশ্রেণীর সংযোগস্থলে সমান্তরাল কতকগুলি বিলোম সংস্রের সন্ধান পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে পূর্বে বহুদূর পর্যন্ত পাওয়া গেছে। এই ধরণের সংস্রকে প্রধান সীমান্ত সংস্র বলা হয়। এই সংস্র উপত্যকায় অবক্ষেপণের ফলে তৈরী হয়েছে সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমি।

অতীত ইতিহাসের যে ক'টি পাতা ঘটনার অব্যহিত পরেই লুপ্ত হয়ে গেছে তার সন্ধান মূক শিলারাশি দিতে পারবে না—তাই থাকে মতানৈক্য। প্রকৃতির বিকৃত পাণ্ডুলিপি হাতড়ে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করা যায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়—সত্য-মিথ্যার বিচার চলে না সেখানে।

---

*টেথিস—অনেকের মতে ভারতের উপদ্বীপাঞ্চল আর লরেসিয়ার মধ্যে একটি অগভীর সাগর ছিল—তারই নাম টেথিস। তার বিস্তার ছিল স্পেনের একপ্রান্ত থেকে চীনের অপর প্রান্ত পর্যন্ত। ভূমধ্য সাগরকে এর অবশিষ্টাংশ বলে অনুমান করা হয়।

বেদনানাশক ঔষধ

শ্রীদুর্গাদাস

আজকের বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের জয়-যাত্রা বিভিন্ন দিকে এত দ্রুতগতিতে চলেছে যে, চিন্তাশীল লোকেরা তা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারেন না। সাধারণ লোক তো দূরের কথা, বিজ্ঞানীরাও এই বহুমুখী উন্নতির সঠিক খোঁজ রাখতে পারছেন না। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, যুদ্ধবিদ্যা ইত্যাদি সব দিকেই এই অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একটি মাত্র বিষয়ের সামান্য আলোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ও পরে শল্যবিদ্যায়, অ্যান্টিবায়োটিক ও কৃত্রিম ঔষধ আবিষ্কারে এবং যক্ষ্মা ও ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় যে সব যুগান্তকারী উন্নতি ঘটেছে, প্রবন্ধান্তরে সেসব বিষয় আলোচ্য।

অস্ত্রোপচারের সময়ে ও পরে রোগীর বেদনা উপশম করবার জন্যে যে সব ঔষধ বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাদের কথাই বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচনার করবো। এ কথা সকলেই মানবেন—রোগযন্ত্রণা, রোগী এবং চিকিৎসক দুজনেরই সব চেয়ে বেশী মনোযোগের বস্তু এবং বেদনা উপশম করাই সব চেয়ে জরুরী কাজ।

বেদনানাশক বস্তুর মধ্যে সর্বপ্রথমে আবিষ্কৃত হয় নাইট্রাস অক্সাইড বা লাফিং গ্যাস এবং তারপরে ঈথার নামক তরল অথচ সহজে উদ্বায়ী পদার্থ। ১৮৪৬ সালে অক্টোবর মাসে উইলিয়াম মর্টন ম্যাসাচুসেট্স্ হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের জন্যে সর্বপ্রথম ঈথার ব্যবহার করে শল্য-চিকিৎসায় যুগান্তর আনেন। তার আগে ডাক্তারদের তিন মিনিটের মধ্যেই সব রকম অস্ত্র প্রয়োগ শেষ করতে হতো। কারণ তার বেশী সময় রোগীকে শান্ত বা স্থির রাখা কঠিন হতো। ঈথার ইত্যাদি প্রয়োগের ফলে শুধু যে রোগীর ক্লেশ দূর হয় তা নয়, ডাক্তারও ধীরেসুস্থে তাঁর কাজ নির্দোষভাবে শেষ করবার অবসর পান। অস্ত্রোপচার ছাড়াও রোগ নির্ণয়ের জন্যে এবং রোগীকে আরাম দেওয়ার জন্যে এসব ঔষধের ব্যবহার ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। এদের কোন কোনটি অস্থির রোগীকে শান্ত করে; তাদের বলে sedative। কোন কোনটি তাকে ঘুম পাড়ায়; তাদের বলে hypnotic। কতকগুলি স্থানীয় বা সর্বাঙ্গীন বেদনা দূর করে; তাদের বলে analgesic। কতকগুলি রোগীর চেতনা দূর করে তার মনের অবচেতন অংশকে প্রকাশ করে; এদের বলে truth serum। আর কতকগুলি শরীরের বিশেষ স্থান বা সর্বস্থান অসাড় করে দেয়; এদের বলে anaesthetic। এই শেষেরগুলিই অস্ত্রোপচারের সময় ব্যবহৃত হয়। এমন ঔষধও আছে যা বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন ফল প্রদান করে।

অস্ত্রোপচারের আগে শরীরের অবস্থাটা এমন হওয়া চাই যে, সেই সময়ের জন্যে তা সাধারণ উত্তেজনা বা আঘাতে সাড়া না দেয়। এই অবস্থা থেকে শরীরের আবার পূর্বের সুস্থ অবস্থায় সহজে ফিরে আসা দরকার। ঘুমের সঙ্গে এই অবস্থার অনেকটা মিল আছে। আবার ঔষধটি মোটামুটি এমন নিরাপদ হওয়া দরকার যেন শরীরকে অসাড় করতে গিয়ে প্রাণসংশয় না হয়।

ঈথার আবিষ্কারের আগে, ১৭৭২ সালে যোসেফ প্রিষ্ট্‌লি নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস আবিষ্কার করেন। ১৭৯৯ সালে মাত্র ২০ বছর বয়সে হামফ্রি ডেভি নিজের শরীরে এর প্রয়োগ করে দেখান যে, বেদনা

নাশ করা ছাড়া এই গ্যাস নানারকম সুখকর স্বপ্নাবেশ ঘটায়। ১৮১৮ সালে মাইকেল ফ্যারাডে দেখান যে, ঈথারও একই রকমের কাজ করে থাকে। এই তথ্য প্রকাশিত হওয়ার পর কয়েক বছর পর্যন্ত নিজেদের শরীরে এরূপ সুখাবেশ ঘটানো ধনীদের মধ্যে একটা রেওয়াজ হয়ে ওঠে।

গত ১০০ বছরের মধ্যে অনেক রকম বেদনানাশক বস্তুর আবিষ্কার হলেও ঈথার ও নাইট্রাস অক্সাইডের আদর এখনও ক্ষুণ্ণ হয় নি। কারণ, বিশেষ করে ঈথার শরীরকে সম্পূর্ণরূপে অসাড় করে ফেলে এবং মাংসপেশীগুলিকে শিথিল বা আল্‌গা করে অস্ত্রপ্রয়োগ সহজসাধ্য করে। তাছাড়া এর সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন গ্যাস দিয়ে রোগীর ফুস্‌ফুস, হৃদ্‌যন্ত্র এবং মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখা যায়। এর ব্যবহার করতে হলে বিশেষজ্ঞের দরকার হয় না এবং প্রয়োগের কাল ও মাত্রা সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ঈথার এবং নাইট্রাস অক্সাইডের মত আরও কতকগুলি গ্যাস প্রশ্বাসের সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়। অন্য কতকগুলি বেদনানাশক সূচীপ্রয়োগে দেওয়া হয়। কতকগুলি খাওয়ালেই রোগী ঘুমিয়ে পড়ে। আর কতকগুলি শরীরের নির্দিষ্ট স্থানে সূচীপ্রয়োগে বা 'স্প্রে' করে দেওয়া হয়। এর মধ্যে ইথিলিন ও সাইক্লোপ্রোপেন গ্যাসের ক্রিয়া ঈথারের চেয়ে দ্রুত এবং শক্তিশালী। ডায়াবিটিস রোগীর জন্যে এদের ব্যবহার ঈথারের তুলনায় কিছু ভাল। তবে এগুলি বাতাসের সঙ্গে মিশে অগ্নিসংযোগে দারুণ বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে বলে খুবই সন্তর্পণে ব্যবহার করা দরকার। ডাইভিনাইল ঈথারও এই ভাবে দেওয়া হয়। এর ক্রিয়াও খুব দ্রুত ও প্রবল এবং মাংসপেশীকেও বেশ শিথিল করে। তবে হৃৎপিণ্ডের উপর শেষেরটির ক্রিয়া কিছু ক্ষতিকর।

স্থানীয় বেদনানাশক ঔষধের মধ্যে কোকেনের ব্যবহারই সর্বাগ্রে ঘটে। দক্ষিণ আমেরিকায় কোকা নামক একপ্রকার গুল্ম থেকে একে পাওয়া যায়। এর রাসায়নিক প্রকৃতি খুবই জটিল; দাম বেশী এবং বাতাস, আলো এবং তাপে সহজে নষ্ট হয় বলে এর প্রয়োগে নানা অসুবিধা আছে। এই কারণে রাসায়নিকগণ এর চেয়ে সরল কৃত্রিম ঔষধ তৈরীর জন্যে বিশেষ চেষ্টা সুরু করেন। এসব গবেষণার ফলে ১৯০৪ সালে নভোকেন এবং তার পূর্বে ও পরে এই পর্যায়ের অনেকগুলি কৃত্রিম ঔষধের আবিষ্কার হয়। রাসায়নিক প্রকৃতি, বিষক্রিয়া এবং প্রয়োগবৈচিত্র্যে এগুলি পরস্পর থেকে বিভিন্ন। তবে ৫০ বছর পরেও নভোকেনের আদর কমে নি। কারণ এর দাম সস্তা এবং আলো, বাতাস ও তাপে নষ্ট হয় না। এর ক্রিয়া দ্রুত এবং বিষক্রিয়া কম।

গত শতাব্দীর শেষে Spinal anaesthesia নামক বেদনানাশের একটি নতুন উপায় আবিষ্কৃত হয়। এতে মেরুরজ্জুর বাইরে মেরুনালীতে অবস্থিত মেরুরসের (cerebrospinal fluid) মধ্যে সূচীবিদ্ধ করে ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। তার ফলে সূবিদ্ধ স্থলের উপরে বা নীচে অবস্থিত মধ্য শরীরের বিস্তৃত অংশে বেদনালোপ ঘটে, অথচ রোগীর চেতনালুপ্ত হয় না, সে কথাবার্তাও বলতে পারে। আবার মস্তিষ্ক, হৃদ্‌যন্ত্র এবং ফুস্‌ফুসের ক্রিয়াও অব্যাহত থাকে।

১৯৩০-৪০ সালে ফরাসী শারীরতত্ত্ববিদ ক্লড বার্ণার্ড দক্ষিণ আমেরিকা থেকে প্রাপ্ত কিউরারে নামক অবসাদক বস্তুকে অস্ত্রচিকিৎসায় ব্যবহার করেন। পদার্থটা অতি সামান্য মাত্রায় মাংসপেশীকে বিশেষভাবে শিথিল করে; তবে মস্তিষ্ক এবং রক্তসঞ্চালনের কিছু ক্ষতি করে বলে এর ব্যবহার বিশেষজ্ঞের দ্বারাই হওয়া দরকার।

কোন ঔষধ প্রয়োগ না করে, শুধু সম্মোহন প্রক্রিয়ায় রোগীকে অসাড় এবং মাংসপেশীকে শিথিল করে অনেক ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার করা সম্ভব। এতে রোগীর নাড়ী বা শ্বাসযন্ত্রের কার্যে কোন

পরিবর্তন হয় না এবং চেতনা ফিরে আসবার পর রোগীর অবসাদ সহজেই দূরীভূত হয়। এই প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বর্তমানে বিস্তৃত পরীক্ষা চলছে।

শৈত্য উৎপাদক যন্ত্রে শরীরের অংশবিশেষ বা সর্বশরীর খুব ঠাণ্ডা করে বেদনা দূর করা আজকাল সহজ হয়েছে। এভাবে অনেক কঠিন অস্ত্রোপচারও করা সম্ভব হয়েছে। এতে সুবিধা এই যে, কোন ঔষধের বিষক্রিয়ায় মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস বা মূত্রযন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। অস্ত্রোপচারের পরে অবসাদও স্থায়ী হয় না। এই অবস্থায় বিভিন্ন তন্তুর অক্সিজেনের দরকার কম হয়। এই বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণা চলছে।

বেদনানাশক বস্তু কিভাবে শরীরের উপর কাজ করে তা নিয়ে অনেক গবেষণা ও আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন শারীরতাত্ত্বিকের এ বিষয়ে বিভিন্ন মত। সুইজারল্যাণ্ডের ওভারটন এবং জার্মেনীর মায়ার এই বিষয়ে প্রথমে যে মতবাদ প্রকাশ করেন, স্কচ্ ভেষজ-বিজ্ঞানী আর্থার কাস্‌নির মতে সেগুলি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বিভিন্ন বেদনানাশকের ভৌত এবং রাসায়নিক প্রকৃতি এত পৃথক যে, তারা যে একই ভাবে শরীরে কাজ করবে, একথা বলা যায় না।

শুধু অস্ত্রোপচারের সময়ে নয়, তার আগে থেকেই রোগীকে নানারকম ঔষধ নানাভাবে দেওয়ার প্রথা বহুকাল থেকে চলে আসছে। রোগীর দুশ্চিন্তা দূর করা, অস্ত্রোপচারের আগের রাতে তাকে স্বাভাবিকভাবে ঘুমুতে সাহায্য করা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে রোগীকে সূচীপ্রয়োগে মর্ফিন নামক ঘুমের ঔষধ দেওয়ার বিধি এখনও চলছে। তবে বেদনা বেশী না থাকলে এর বদলে বার্বিচুরেট পর্যায়ের ঘুমের ঔষধ দিলে রোগীর মানসিক অবস্থা শান্ত থাকে এবং অস্ত্রোপচারের পরে বমি বা শ্বাসযন্ত্রের অবসাদ ঘটে না। এর সঙ্গে সূচীপ্রয়োগে অ্যাট্রোপিন বা স্কোপোলেমিন নামক ঔষধ দিলে মুখে ও গলায় লালার পরিমাণ কম হয় বলে শ্বাসরোধের ভয় থাকে না।

অস্ত্রোপচারের সময় রোগীর ফুস্‌ফুস যাতে যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন গ্যাস পেতে পারে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস দূর করতে পারে, সেজন্যে নানা উপযুক্ত যন্ত্র ও ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছে। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হৃৎপিণ্ডের অস্ত্রোপচারের জন্যে সম্প্রতি কৃত্রিম হৃদ্‌যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছে যা আসল হৃদ্‌যন্ত্রের উপর নির্ভর না করে শরীরের বাইরে থেকে শিরা ও ধমনীতে রক্ত সঞ্চালন অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। আবার নতুন আবিষ্কৃত কৃত্রিম ফুস্‌ফুসের সাহায্যে রক্তে অক্সিজেন যোগান দেওয়াও আজকাল সহজ হয়েছে। এই যন্ত্র ব্যবহারে ফুস্‌ফুসের উপর অস্ত্রোপচারে ইতস্ততঃ করতে হয় না। এসব অদ্ভুত যন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এদের আবিষ্কারে হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুস্‌ফুসের উপর অস্ত্র প্রয়োগের বিপদ যে অনেকটা কেটে গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রিকেটস্‌-ব্যাধি

শ্রীসুজিতকুমার মাইতি

রিকেটস্‌ বলতে এক রকম রোগকে বুঝায়। কিন্তু রিকেটস্‌ রোগটি কি? এই রোগের কারণ কি? কেমন করে মানুষ নিষ্কৃতি পেতে পারে তার কবল থেকে? বিজ্ঞানীর অনুসন্ধানী মন দিনের পর দিন প্রশ্নগুলির সমাধানে ব্যাপৃত হয়ে রইলো। ধীরে ধীরে প্রায় সব প্রশ্নগুলিরই উত্তর পাওয়া গেল। মানুষ নিশ্চিন্ত হলো। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই নতুন রোগের বিষয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হলো। অ্যাংলোস্যাক্সন wrikken শব্দটি থেকে রিকেটস্‌ শব্দটির প্রচলন হয়েছিল চিকিৎসাশাস্ত্রে।

রিকেটস্‌ রোগ সাধারণতঃ শিশুদের মধ্যেই দেখা যায়। শৈশব অবস্থাতেই এর প্রকাশ, আর ধীরে ধীরে হয় তার বিকাশ। পাঁচ মাস থেকে নয় মাসের শৈশব অবস্থা থেকে এই রোগটির সূচনা হয়। হাড়গুলি নরম হয়ে যায় এবং তার ফলে একটু চাপ পড়লেই বেঁকে যায়। পা দুটি ধনুকের মত বেঁকে যায়। প্রধান কথা হলো, হাড়গুলির বৃদ্ধি ঠিকমত হতে পারে না বলেই এই রোগের সূচনা। শরীরের রং ফ্যাকাসে হয়ে যায় এবং শক্তি হারিয়ে ফেলে। শরীরের ওজনও হ্রাস পায়। খুব বেশী পরিমাণে ঘাম হয়, বিশেষ-ভাবে রাত্রে নিদ্রাকালে মাথায়। এর ফলে মাথার পিছনকার চুল উঠে যায়। প্রথম অবস্থায় লক্ষ্য না করলে এই রোগ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। মাথা ও পেট বড় হয়ে আসে, বুক ছোট হয়ে যায়, আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সরু হতে থাকে। পাঁজরার হাড় নরম থাকায় বাতাসের চাপ সহ্য করবার ক্ষমতা থাকে না এবং তার ফলেই বুক ছোট হয়ে যায়। পেটের ভিতর বায়ু সঞ্চিত হওয়ায় পেট বড় হতে থাকে। শিশু ক্রমশঃ কুঁজো হয়ে আসে। রিকেটস্‌ রোগগ্রস্ত শিশুরা হাঁটতে শেখে দেরীতে। কারণ হাড় দুর্বল থাকায় দাঁড়া-বার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। রিকেটস্‌ রোগগ্রস্ত শিশুদের ডায়ারিয়া এবং ফুস্‌ফুসের রোগও হতে পারে। এসব কারণে অনেক সময় শিশু মারা যায়। যদি এই রোগের হাত থেকে রক্ষা পায় তাহলে হাড়গুলি পুনরায় শক্ত হয়ে আসে, ভাল পরিপাক হয়, শরীর পুনরায় সুস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই বাঁকা পা, ছোট বুক, অসম নিতম্ব, আকৃতির খর্বতা ও অসম দাঁত প্রভৃতির আর কোনদিনও পরিবর্তন হয় না। শিশু তার দৈহিক সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলে।

কিন্তু কেন তার এই রোগ হয়? শৈশব অবস্থায় উপযুক্ত আহার না পাওয়ার জন্যেই তার এই রোগ। জন্মগ্রহণ করবার পর দুঃস্থ মা তার শিশুকে নিজের স্তন্যদুগ্ধ পান করাতে থাকেন। অনেক সময় দেখা যায়, এই স্তন্যদুগ্ধ শিশুর পক্ষে উপযুক্ত নয়। স্তন্যদুগ্ধ অত্যন্ত তরল থাকায় শিশু উপযুক্তভাবে তার প্রয়োজনীয় আহার পায় না। অনেকেই টিনের দুধ জলে মিশিয়ে শিশুকে খাওয়ান। কিন্তু শিশুর পক্ষে এই দুধ হজম করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

প্রচুর পরিমাণ সূর্যালোকের অভাবেও এই রোগটি বাসা বাঁধে শিশুর শরীরের নরম হাড়ে। ভিটামিন-ডি ($C_{27}H_{42}O$) শিশু যদি প্রচুর পরিমাণে না পায় তাহলেও এই রোগ দেখা দেয়। ভিটামিন-ডি এবং রিকেটস্‌ পরস্পর সম্বন্ধ-যুক্ত। সেজন্যে এই ভিটামিনকে Antirachitic বলা হয়। ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাসের প্রয়ো-

জনীয়তাও প্রচুর। রিকেটস্ রোগ হওয়ার সময় প্লাজমার ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাসের পরিমাণ হ্রাস পায়। ভিটামিন-এ ($C_{20}H_{29}OH$)-র অভাবেও রিকেটস্ রোগ হতে পারে।

রোগের কারণ যখন নিরূপিত হয়েছে, তখন তার প্রতিকারও আছে নিশ্চয়। শিশুকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ডি ও ভিটামিন-এ খাওয়ানোর প্রয়োজন। ভিটামিন-ডি টিস্থ-লিপায়েডস্-এর উপর প্রতিক্রিয়া করে এবং তার ফলে ফস্‌ফরিক অ্যাসিড বের হয়। রক্তে এর অভাবের দরুণ রিকেটস্ রোগের স্থচনা হয়। মলের সঙ্গে অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম বের হয়ে যাওয়াও বন্ধ করে দেয়। এক কথায় বলা যায়, ভিটামিন-ডি, ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফেট শোষণ বৃদ্ধি করে এবং সেজন্যে রক্তেও ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফেট-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

ভিটামিন-ডি প্রস্তুতে স্থর্যের আল্‌ট্রা-ভায়োলেট রশ্মির প্রয়োজনীতাও যথেষ্ট। আমাদের শরীরের ত্বকের আর্গোষ্টেরল ($C_{27}H_{42}O$) স্থর্যের আল্‌ট্রা-ভায়োলেট রশ্মির সহযোগিতায় ভিটামিন-ডি প্রস্তুত করে। এজন্যে স্থর্যের আলো আমাদের একান্ত প্রয়োজন। ছোট ছোট শিশুদের তেল মালিশ করে রোদে শুইয়ে রাখা খুবই দরকার। ভোরবেলা স্নান করানো উচিত এবং স্নানের জলে দু-এক চামচ লবণ মিশিয়ে দিলে ভাল হয়। মাছের তেল, বিশেষভাবে কড্‌লিভার অয়েল, মাখন, ডিম প্রভৃতি খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-ডি বিদ্যমান। স্তন্যপায়ীদের যকৃতে খুব বেশী পরিমাণ ভিটামিন-ডি পাওয়া যায়। রিকেটস্ রোগগ্রস্ত শিশুদের এসব খাদ্য খাওয়ানো একান্তই প্রয়োজন, বিশেষভাবে কড্‌লিভার অয়েল। ভাল খাবার এবং প্রচুর পরিমাণ আলো ও বাতাসপূর্ণ স্থানে শিশুদের অবাধ বিচরণই রিকেটস্ রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার একমাত্র উপায়।

আন্তর্জাতিক ভূপ্রাকৃতিক বছর

বিশ্বের ৫৬টি দেশের ৫ সহস্রাধিক বিজ্ঞানী ভূমণ্ডলের বহু অজ্ঞাত রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে ১৯৫৭ সালে ১লা জুলাই থেকে এক অভূতপূর্ব পরীক্ষাকার্যে নিযুক্ত থাকবেন। এই পরীক্ষাকার্য ১৮ মাস ধরে চলবে।

উত্তর মেরু থেকে স্থরু করে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত, সমুদ্রের স্থগভীর তলদেশ থেকে ভূপৃষ্ঠের শত শত মাইল উর্ধ্ব পর্যন্ত অজ্ঞাত রাজ্যে মানুষের বিপুল জ্ঞান ও উদ্ভাবনী শক্তি নিয়োজিত হবে, আমাদের এই পৃথিবীর বহু গোপন তথ্য আবিষ্কারে।

বিশ্বের রহস্য আবিষ্কারের এই পরিকল্পনাটি আন্তর্জাতিক ভূপ্রাকৃতিক বছর (International Geophysical Year) নামে অভিহিত হয়েছে। বিজ্ঞানের কতখানি উন্নতি হয়েছে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর মানুষের কতখানি নিয়ন্ত্রণাধিকার রয়েছে, এই পরীক্ষাকার্যে শুধু যে সেটুকুরই প্রমাণ পাওয়া যাবে তা নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার ব্যাপারেও অনেকখানি সহায়তা হবে।

আন্তর্জাতিক ভূপ্রাকৃতিক বছরের স্থচনা হয়েছিল ৭৫ বছর আগে ১৮৮২-'৮৩ সালে প্রথম মেরু বছরে। ৫০ বছর পরে ১৯৩২-৩৩ সালে ১২টি রাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা দ্বিতীয় মেরু বছর

পালনের আয়োজন করেন। সে সময় মনে করা হয়েছিল যে, প্রতি ৫০ বছর অন্তর একটি করে মেরু বছর উদ্‌যাপন করা হবে। যাহোক, বিগত ২০ বছরের মধ্যে বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির ফলে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে।

১৯৫০ সালের মধ্যে তিনটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। সত্বর আরও অধিক সংখ্যক মৌলিক তথ্যের প্রয়োজন অনুভূত হলো। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল এই তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করতে পারে এবং বিশ্বের সর্বত্র বিজ্ঞানীদের সংঘবদ্ধ প্রয়াসের ফলে এই তথ্য খুব সহজেই পাওয়া যাবে।

১৯৫০ সালের প্রথম দিকে একটি ক্ষুদ্র বিজ্ঞানী গোষ্ঠী ওয়াশিংটনে এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হয়ে প্রস্তাব করেন যে, তৃতীয় মেরু বছর অনুষ্ঠিত হোক দ্বিতীয় মেরু বছরের ২৫ বছর পর। এই বিজ্ঞানীরা বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরা মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে যে সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করেছেন, সেই সংগ্রহভাণ্ডার পরিপুষ্ট করবার জন্যে তাঁরা ১৯৮২ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন না।

পর্যালোচনার ফলে তাঁরা জানতে পেরেছেন যে, ১৯৫৭-'৫৮ সালের মধ্যে সৌররশ্মি বিকিরণের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হবে এবং এর ফলে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে ভূপ্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণে বিজ্ঞানীরা বহু সুযোগ লাভ করবেন। বিজ্ঞানীদের এই ক্ষুদ্র দলটির প্রস্তাব পরবর্তীকালে কতিপয় আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সংস্থার কাছে উত্থাপন করা হয় এবং প্রস্তাবটি প্রত্যেকের অকুণ্ঠ অনুমোদন লাভ করে।

১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক ইউনিয়ন সভার (International Council of Scientific Unions) কর্ম-পরিচালক বোর্ডের এক সভায় একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। পরে এই বিশেষ কমিটি তার ফরাসী নামেই পরিচিত হয়। এর ফরাসী নামটি হলো Comite Special de 1' Annee Geophysique Internationale। নতুন কার্যক্রমের জন্যে প্রাথমিক পরিকল্পনা রচনার ভার দেওয়া হয়েছিল এই কমিটির উপর। ভূপ্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সমগোত্রীয় অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চারটি আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক ইউনিয়ন এবং বিশ্ব আবহবিজ্ঞান সংস্থা থেকেই এই কমিটির সদস্যদের গ্রহণ করা হয়েছিল।

১৯৫২ সালে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক ইউনিয়নের সাধারণ পরিষদে ভূপ্রাকৃতিক বছরে পর্যবেক্ষণের পরিধি আরও সম্প্রসারণ করা হলো। স্থির হলো, শুধু যে উত্তর মেরু অঞ্চল নিয়েই পর্যবেক্ষণকার্য চলবে তা নয়, পরীক্ষার আওতায় আসবে সমগ্র পৃথিবী। আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সভা জাতীয় বিজ্ঞানী কমিটি স্থাপনের জন্যে সব দেশকে আমন্ত্রণ জানালেন। এই কমিটিগুলির কাজ হবে জাতীয় কর্মসূচী প্রণয়ন করা। তাদের স্ব স্ব দেশগুলি সামগ্রিক পরি-কল্পনারই অংশস্বরূপ এই কর্মসূচী কার্যকরী করবে। উল্লিখিত বিশেষ কমিটি এদের সকলের মধ্যে সংযোগ সাধন করবে।

১৯৫৪ সালে এবং পুনরায় ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালে যোগদানকারী দেশগুলির বিজ্ঞানীবৃন্দ কর্তৃক রচিত পরিকল্পনাগুলি বিশেষ কমিটি পর পর কতকগুলি বৈঠকে পরীক্ষা করে দেখেন এবং এই বৈঠকগুলির ফলস্বরূপ একটি বিশ্বব্যাপী পরিকল্পনা উদ্ভাবিত হয়। যোগদানকারী প্রত্যেকটি দেশ পরস্পর স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড অনুসারে আপন আপন অনুসন্ধানকার্য চালিয়ে যেতে সম্মত হয়েছে এবং এইভাবে প্রাপ্ত তথ্যাদি অন্যান্য সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে আদান-প্রদান করতে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই সম্মত হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়

সুরু হয়েছিল ১৯১৪ সালের ১লা ডিসেম্বর। ঐ সময় কুমেরুতে আর্টকা নামে একটি জাহাজ প্রেরণ করা হয়। উদ্দেশ্য হলো সমুদ্রে বরফের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং ভূপ্রাকৃতিক বছর উপলক্ষ্যে পরীক্ষাকার্যের জন্যে লিট্‌ল্ আমেরিকায় একটি কেন্দ্র স্থাপন করা।

এর পর থেকে আরও অনেক মার্কিন জাহাজ ও বিমান কুমেরু অভিমুখে যাত্রা করেছে এবং বিজ্ঞানীরা ভূপ্রাকৃতিক বছর উপলক্ষ্যে পর্যবেক্ষণ কার্যের জন্যে নানা যন্ত্রপাতি স্থাপন করেছেন। ১৯৫৬ সালের শরৎকালে (কুমেরুতে তখন বসন্ত) কুমেরু অঞ্চলে ভূপ্রাকৃতিক বছর উপলক্ষ্যে পর্যবেক্ষণ কার্যের জন্যে প্রায় ৫৬টি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এবং প্রায় ৬০০ লোক এখানে বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত রয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ভূপ্রাকৃতিক বছর উপলক্ষ্যে যে কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে প্রেরণ করবে, তার অবস্থিতি সম্পূর্ণ সঠিকরূপে নির্ধারণের জন্যে বিশেষভাবে পরিকল্পিত দূরবীক্ষণ-ক্যামেরা নির্মাণ করা হয়েছে। ১২টি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে এই ক্যামেরা স্থাপন করা হবে। তন্মধ্যে একটি স্থাপিত হবে ভারতে।
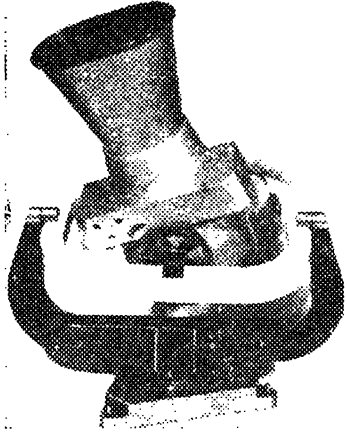
কৃত্রিম উপগ্রহ পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে টেলিস্কোপিক ক্যামেরা

বিজ্ঞানী ও কার্য পরিচালনার জন্যে অন্যান্য কর্মচারী-দের জাহাজযোগে কুমেরুতে প্রেরণ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে সাতটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে, ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালে সেগুলি পরি-চালনার জন্যেই এঁদের প্রেরণ করা হয়েছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন কুমেরুতে কার্যক্রম রচনা করতে ব্যস্ত তখন আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, চিলি, ফ্রান্স, জাপান, নিউজিল্যাণ্ড, নরওয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন, বৃটেন, সোভিয়েট রাশিয়াও কুমেরুতে পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনকল্পে তোড়জোড় সুরু করে দিয়েছে। এখন

মহাশূন্যে চালকবিহীন এই কৃত্রিম উপগ্রহের অবস্থিতি অনুযায়ী এই ক্যামেরাগুলিও দিক পরি-বর্তন করবে ও উপগ্রহের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখবে। মহাশূন্যে বিচরণকালে এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলির গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল।

ম্যাসাচুসেট্সের অন্তর্গত কেম্ব্রিজে স্মিথসোনিয়ান অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল অবজারভেটরীর ডিরেক্টর ডাঃ ফ্রেড এ. হুইপ্‌ল্ এই বিশেষ ক্যামেরাটির কথা ঘোষণা করেছেন।

১২টি কেন্দ্রে এই বিশেষ ক্যামেরাটি স্থাপন করা

হবে। ভারতের নৈনিতালে একটি কেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে। অপর কেন্দ্রগুলির নাম আরেকুইপা, পেরু, কুরডোবা, আর্জেন্টিনা, ব্লুমফনটাইন, দক্ষিণ আফ্রিকা, তেহেরান, ইরান, কাডিজ, স্পেন, নিউ-মেক্সিকো, হাওয়াই, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া ও নেদারল্যাণ্ডস্ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের একটি দ্বীপ।

কৃত্রিম উপগ্রহ পরিকল্পনায় এই বিশেষ ধরণের ক্যামেরার সাহায্যে উপগ্রহের গতিবিধি লিপিবদ্ধ করা বিজ্ঞানীদের কাজে যথেষ্ট সহায়ক হবে। অবশ্য এ কাজে দ্রুততর ইলেকট্রনিক পদ্ধতিও ব্যবহৃত হবে।

রেডার কর্তৃক সংগৃহীত ও ইলেকট্রনিক হিসাবযন্ত্রে বিশ্লেষিত তথ্যাবলী ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হবে। এই পদ্ধতিতে কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথ সম্পর্কে নির্ভুল ধারণা করা যাবে।

যাঁরা কৃত্রিম উপগ্রহ পর্যবেক্ষণ করবেন তাঁদের কাজের সময় কোন কোন পর্যায়ে যে অতি সূক্ষ্ম পরিমাপের প্রয়োজন হয়, এই ক্যামেরাগুলির সাহায্যেই তাঁরা তা পেতে পারেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তারকারাজির অবস্থিতি সঠিক জানেন বলেই তার ভিত্তিতে কৃত্রিম উপগ্রহগুলির অবস্থিতি সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যাবে।

এই আলোকচিত্রগুলির মারফৎ যে নির্ভুল পরিমাপ পাওয়া যাবে, তার জন্যে ভূপ্রাকৃতিক বিজ্ঞানীবৃন্দ বহু বছর যাবৎ গবেষণা করেছেন। কারণ এই পরিমাপের সাহায্যেই পৃথিবীর প্রকৃত আকার নিরূপণ করা সম্ভব হবে।

বহুদিন থেকেই আমরা জানি যে, পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলাকৃতি নয়। মেরুদ্বয়ের নিকট পৃথিবীর আকৃতি চ্যাপ্টা এবং এখানে-সেখানে এর উপরিভাগে কোথাও উঁচু, কোথাও বা নীচু। সাধারণ পরিমাপ যন্ত্রে এগুলি ধরা যায় না। কৃত্রিম উপগ্রহ সম্পর্কে যে আলোকচিত্র ও পরিমাপাদি গৃহীত হবে তাতে এই সকল ছোটখাটো তথ্যাদিও জানা যাবে।

মানুষ বর্তমানে তেল ও কয়লা হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া থাকে। পরমাণু শক্তি ভবিষ্যতে উহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে কিনা, এই বিষয়ে কমোডিটি রিসার্চ ব্যুরো একটি বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে, পরমাণু শক্তির অভ্যুদয়ের পরেও শক্তির উৎস হিসাবে তেল ও কয়লার গুরুত্ব বিশেষ হ্রাস পাইবে না। তেল ও কয়লার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে না দেখিয়া পরমাণু শক্তিকে উহাদের পরিপূরক হিসাবে দেখাই উচিত। বিশ্বে শক্তির চাহিদা যেমন বাড়িতেছে বিশ্বের সঞ্চিত জালানী তৈলের পরিমাণও সেইরূপ হ্রাস পাইতেছে। এমতাবস্থায় শক্তির উৎস হিসাবে পরমাণু শক্তির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক।

পৃথিবীর সঞ্চিত তেলের অর্ধেকেরও অধিক ইতিমধ্যে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে কয়লা ও অন্যান্য দ্রব্য হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তেল উৎপাদন করা প্রয়োজন হইয়াছে।

বিজ্ঞান সংবাদ

যক্ষ্মা-জীবাণুর অনুরূপ রহস্যজনক জীবাণু

আমেরিকার ন্যাশন্যাল টিউবারকিউলোসিস অ্যাসোসিয়েশনের মেডিক্যাল ডিরেক্টর ডাঃ ফিল্ডম্যান এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, যক্ষ্মা-জীবাণুর অনুরূপ একপ্রকার রহস্যজনক জীবাণু আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহারা যক্ষ্মা রোগ উৎপন্ন করে না এবং ইহাদের দেহে যে রাসায়নিক পদার্থ থাকে তাহা যক্ষ্মা-জীবাণু হইতে পৃথক।

থুথু ও শ্লেষ্মার মধ্যে এই জীবাণুর উপস্থিতি দেখিয়া রোগীদের যক্ষ্মার চিকিৎসা করা হইতে থাকে। অনেক বিষয়ে জীবাণুগুলি যক্ষ্মা-জীবাণুর অনুরূপ।

পরীক্ষাগারে জীবাণুগুলি কালচার করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহাদের কলোনীগুলির রং আসল যক্ষ্মা-জীবাণুর কলোনী অপেক্ষা গাঢ়। গিনিপিগের দেহে প্রয়োগ করিয়া এই জীবাণুর দ্বারা কোন রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায় নাই।

উইস্‌কন্‌সিন ইউনিভার্সিটির কতিপয় চিকিৎসক কয়েক শ্রেণীর এই রহস্যজনক জীবাণু লইয়া বহু পরীক্ষা করিয়া আসল যক্ষ্মা-জীবাণুর সহিত ইহার পার্থক্য নির্ধারণ করেন। নূতন আবিষ্কৃত জীবাণুর মধ্যে একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা আসল জীবাণুর মধ্যে পাওয়া যায় না। ঐ রাসায়নিক পদার্থটিকে তাঁহারা জি-কম্পাউণ্ড নাম দিয়াছেন।

আসল জীবাণুর সহিত ইহার পার্থক্য নির্ধারণের জন্য কোন সহজ উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা চলিতেছে। ইহাতে চিকিৎসার পক্ষে অনেক সুবিধা হইবে।

নূতন প্রজাতির প্রাণী সৃজন

জন্স হপ্‌কিন্স ইউনিভার্সিটির বায়োলজির অধ্যাপক ডাঃ গ্লাস বলেন যে, পরীক্ষাগারের মধ্যে যদৃচ্ছ নূতন প্রজাতির প্রাণী সৃজনের সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে। তিনি বলেন, বিজ্ঞানীরা বর্তমানে নূতন প্রজাতির উদ্ভিদ সৃষ্টি করিতেছেন। অনুরূপ উপায়ে নূতন প্রজাতির প্রাণীও সৃজন করা সম্ভব হইবে।

প্রকৃতির যে প্রাচীর কয়েক বৎসর পূর্বেও দুর্ভেদ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, বিজ্ঞানের আধুনিক অগ্রগতির ফলে আজ তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তেজস্ক্রিয় ও রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে উৎকৃষ্টতর বা নিকৃষ্টতর উভয় প্রকার পরিব্যক্তি ঘটানো যাইতে পারে।

ডাঃ গ্লাস বলেন যে, মানবজাতির উপরেও এই উপায়গুলি কার্যকরী হইতে পারে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে মানবজাতির উপর কোন পরিবর্তন আনয়ন করা সমীচীন কি না, সে সম্বন্ধে অনেক বিষয় বিবেচনা করিবার আছে।

ডাঃ গ্লাস তাঁহার বিবৃতিতে কার্পেচেস্কো নামক এক রুশ বিজ্ঞানীর এই সম্পর্কিত কাজের প্রশংসা করেন। কার্পেচেস্কো বাঁধাকপির সহিত মূলার সংযোগ ঘটাইয়া একপ্রকার বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন করেন। কিন্তু দেখা যায় যে, ঐ উদ্ভিদ প্রজনন শক্তি-বিহীন। পরে আরও পরীক্ষা চালাইয়া তিনি প্রজনন শক্তিবিশিষ্ট ঐ উদ্ভিদ উৎপাদন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ঐ উদ্ভিদের একটি নূতন নামও দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ডাঃ গ্লাস বলেন যে, ঐ নূতন প্রজাতির উদ্ভিদটি একেবারে নিকৃষ্ট ধরণের। অখাদ্য মূলার সহিত নিকৃষ্ট পর্যায়ের বাঁধাকপির শিকড়ের সমন্বয় করা হইয়াছে।

দূরবীক্ষণের শক্তি বৃদ্ধি

ওয়াশিংটনের কার্ণেগি ইনষ্টিটিউশনের এক বিবৃতিতে প্রকাশ, ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় দূরবীক্ষণের শক্তি বৃদ্ধি করিবার উপায় উদ্ভাবনের একটি পরীক্ষা অদূর ভবিষ্যতে করা হইবে।

সাধারণ দূরবীক্ষণে যে পরিমাণ আলোক কেন্দ্রীভূত হয়, এই ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় তাহার কার্যকারিতা প্রায় এক হাজার গুণ বর্ধিত হইবে। কয়েক মাসের মধ্যেই এই যন্ত্র জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিয়োজিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বিশ ইঞ্চি লেন্সযুক্ত সাধারণ দূরবীক্ষণের সহিত এই যন্ত্র ব্যবহার করিলে উহার কার্যকারিতা পালামোর অবজারভেটরির ২০০ ইঞ্চি দূরবীক্ষণের সমতুল্য হইবে। বড় দূরবীক্ষণের মতই বহু দূরে অবস্থিত জ্যোতিষ্কগুলিকে ইহার সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করা যাইবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আশা করেন যে, এই যন্ত্রের সহযোগে ২০ ইঞ্চি লেন্সযুক্ত দূরবীক্ষণের সাহায্যে ২৩ ম্যাগ্‌নিচুড অপেক্ষা ক্ষীণ তারকাও পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হইবে।

ওয়েষ্টিংহাউস রিসার্চ লেবোরেটরির কয়েকজন বিজ্ঞানী দূরবীক্ষণের শক্তিবর্ধক এই ইলেকট্রনিক যন্ত্রটি উদ্ভাবন করিয়াছেন।

চুল পাকিবার কারণ

কতকগুলি পরীক্ষায় সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, লাইসিন নামক একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে চুল পাকিবার রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে।

ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভারসিটির ডাঃ ক্র্যাজার ও মিঃ ভোরা তাঁহাদের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করেন যে, গবেষণাগারে পরীক্ষাধীন ইঁদুরের দেহ-বৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখিতে লাইসিন একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া পূর্বে জানা ছিল বটে, কিন্তু সম্প্রতি দেখা গিয়াছে যে, এই রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারে কালো ইঁদুরের সাদা হওয়া নিবারিত হয়। ইঁদুরকে অল্প লাইসিনযুক্ত খাদ্যের উপর রাখিবার ফলে উহাদের লোম ক্রমশঃ পাত্‌লা ও সাদা হইতে থাকে। উপযুক্ত পরিমাণ লাইসিন ব্যবহারে এই পরিবর্তন আসে না।

লাইসিনের কার্যকারিতা নির্ধারণে পূর্বের পরীক্ষাগুলিতে কেবল সাদা ইঁদুর ব্যবহৃত হইত। কাজেই চুলের রঙের উপর লাইসিনের প্রভাব সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই। খাদ্যে লাইসিনের পরিমাণ হ্রাস করিয়া তাঁহারা টার্কির পালকের রং-ও সাদা হইতে দেখিয়াছেন। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, প্রাণীদেহে মেলানিন নামক রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনে লাইসিন বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। মেলানিন ত্বক ও লোমের রং সংরক্ষক।

বিভিন্ন দেশের শাসকদের মধ্যে অপরাধীর সংখ্যা

নিউইয়র্কে আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব অ্যাডভান্সমেণ্ট অব সায়েন্সের এক সভায় প্রোঃ সোরকিন বলেন যে, আধুনিক এবং প্রাচীন, উভয় কালেই শাসকদের মধ্যেই অপরাধীর সংখ্যা খুব বেশী। চারজন শাসকের মধ্যে অন্ততঃ একজন বা তাহা অপেক্ষা বেশী খুনী বলিয়া দেখা যায়।

শাসকদের মধ্যে অপরাধী সম্বন্ধে গবেষণায় প্রোঃ সোরোকিন ইংরেজ, ফরাসী, রুশ, জার্মান, অষ্ট্রিয়ান এবং তুরস্কের রাজাদের এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টদের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদির হত্যা-অপরাধের মধ্যে পিতা, মাতা, ভ্রাতা ইত্যাদির হত্যাও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

তিনি বলেন, পারমাণবিক শক্তি আবিষ্কারের ফলে শাসকগোষ্ঠী এবং স্বার্থান্ধ দলের ক্ষমতা অপব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি পাইতেছে। আগামী দশ-পনেরো বা বিশ বৎসরের মধ্যেই যে অপরাধ-প্রবণ ব্যক্তিদের হাতে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র আসিয়া

পড়িবে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। বিভিন্ন দেশের শাসকেরা যে পারমাণবিক অস্ত্রের অপ-ব্যবহার করিয়া আন্তর্জাতিক বা গৃহযুদ্ধের সূচনা করিবে না, সে সম্বন্ধেও কোন নিশ্চয়তা নাই।

বর্তমানে শাসকবৃন্দই হইল সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক দল—এই বলিয়া প্রোঃ সোরোকিন সকলকে সাবধান করিয়া দেন।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের অনুবাদ

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি নিজ ভাষায় অনুবাদ করিবার ব্যবস্থা প্রায় সকল সভ্য দেশেই আছে। কিন্তু এক খবরে জানা গিয়াছে যে, এইরূপ অনুবাদের প্রচেষ্টা এবং ব্যবস্থায় রাশিয়া সকল দেশকে অতিক্রম করিয়াছে। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিক সংবাদ ও প্রবন্ধ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রুশ ভাষায় প্রকাশ করিবার ব্যাপক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মানুষের দ্বারা হাতে অনুবাদ করিবার ব্যবস্থা ছাড়া যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষামূলকভাবে অনুবাদ করা হইতেছে। ইহাতে ফল হইয়াছে এই যে, একজন রুশ বিজ্ঞানী সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল হইবার যে পরিমাণ সুযোগ পায়, অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরা সেরূপ পাইতে পারে না।

কেবল বিজ্ঞান সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য রাশিয়ায় প্রায় ১৮০০ অনুবাদক ও প্রকাশক স্থায়ীভাবে নিযুক্ত আছেন। ইহাদের সহিত ১৩০০০ ইঞ্জিনিয়ার এবং বিভিন্ন বিভাগের বিজ্ঞানীরাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অনুবাদ বা সারাংশ লিখিবার জন্য সাময়িকভাবে কাজ করিয়া থাকেন।

মস্কোর নিকটে অবস্থিত অল ইউনিয়ন ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড টেক্নোলজিক্যাল ইনফর্মেসন হইতে ঐ সকল অনুবাদ ও সারাংশ প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইউ. এস. এস. আর-এর অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের কর্তৃত্বাধীনে চালিত এই ইনষ্টিটিউট মাত্র তিন বৎসর পূর্বে স্থাপিত হয়।

ইনষ্টিটিউটের কর্মীদের প্রধান কাজ হইল, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি হইতে সারাংশ সংগ্রহ করিয়া রুশ ভাষায় সেগুলির অনুবাদ করা। এই সারাংশ-গুলি ১৩খানি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রতিষ্ঠানের কার্যের বিপুলতা সম্বন্ধে একটা আভাস দিবার জন্য সংবাদে বলা হইয়াছে যে, গত বৎসর ঐ ইনষ্টিটিউট হইতে ৪০০,০০০ বৈজ্ঞা-নিক প্রবন্ধের সারাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। ৮০টি বিভিন্ন দেশ হইতে ১০,০০০ সাময়িক পত্রিকা সংগ্রহ করিয়া ঐগুলি হইতে সারাংশ অনুবাদিত হইয়াছিল।

রাশিয়ার ঐ বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রিকাগুলির মধ্যে কতকগুলি হইল এক্সপ্রেস, অর্থাৎ শিল্প সংক্রান্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ কোনও দেশে প্রকাশিত হইবার দুই বা তিন সপ্তাহের মধ্যে ঐ পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সারাংশ অনুবাদ করাই ঐ প্রতিষ্ঠানের একমাত্র কাজ নহে। রাশিয়ার কোন বিজ্ঞানীর প্রয়োজন হইলে ঐ প্রতিষ্ঠান হইতে পৃথিবীর যে কোন দেশে, যে কোন ভাষায় প্রকাশিত সমগ্র প্রবন্ধটি রুশ ভাষায় অনুবাদ করিয়া দেওয়া হয়।

উক্ত প্রতিষ্ঠানের বৃহৎ প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে আর একটি হইল, অনুবাদক যন্ত্রের উদ্ভাবন। ডাঃ প্যালভ বলেন যে, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে সম্পূর্ণ ইংরেজী বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রুশ ভাষায় অনুবাদ করা সম্ভব হইয়াছে। ইউ. এস-এ যে ধরণের অনুবাদক যন্ত্র লইয়া পরীক্ষা চলিতেছে, রাশিয়ায় স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটি প্রায় তাহারই অনুরূপ। রাশিয়ার যন্ত্রটিতে ইলেকট্রনিক ব্যবস্থাই প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

ডাঃ প্যালভ বলেন যে, বর্তমান স্বয়ংক্রিয় অনু-বাদক যন্ত্রটি আশানুরূপ সন্তোষজনক হইয়াছে।

এখন চীনা, জাপানী ও জার্মান ভাষা হইতে রুশ ভাষায় অনুবাদ করিবার যন্ত্র নির্মাণের চেষ্টা চলিতেছে।

ঐ ইনষ্টিটিউটের প্রধান উদ্দেশ্য হইল, পৃথিবীর সকল দেশের বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও অগ্রগতি সম্বন্ধে রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের সর্বদা ওয়াকেফহাল রাখা।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

বেলাভূমির বালিকণা

শ্রীঅনিলকুমার মুখার্জী

পৃথিবীর তিন ভাগ জল এবং এক ভাগ স্থল—এমনই প্রকৃতি দেবীর অবিচার। এক ভাগ স্থল নিয়ে মানুষে মানুষে কাড়াকাড়ি, মারামারির অন্ত নেই। এই এক ভাগ স্থলের আবার বেশ খানিকটা জুড়ে রয়েছে শুধু বালিকণা। সাহারা, গোবী, কালাহারী—এমন কি, পশ্চিম ভারতের থর মরুভূমির বুকে মাইলের পর মাইল জুড়ে পড়ে রয়েছে বালিকণা, যেন অন্তহীন বালির সমুদ্র। এই বিরাট বালিচরের ইতিহাস খুঁজলে হয়তো দেখা যাবে, আজ যেখানে বালিকণার বিস্তীর্ণ প্রান্তর, লক্ষ বছর আগে সেখানে গভীর উত্তাল মহাসাগরের জল উন্মত্তের মত খেলে বেড়াতো। সাগর-মহাসাগর শুকিয়ে গেছে, কোন অগস্ত্যের পিপাসা মেটাতে; শুধু তার স্মৃতি পড়ে আছে বালিকণার বিভীষিকায়।

সমুদ্র মন্থন করে অমৃত উঠেছিল; তাইতো সাগর রত্নাকর। তার বুকে রয়েছে কত ঐশ্বর্য! তার কিছু ছড়িয়ে পড়ে সৈকতভূমির বালিকণায়, যে সৈকতভূমি পৃথিবীর এক ভাগ স্থলকে বেষ্টনীর মত ঘিরে রেখেছে। সব মাটিটুকু গ্রাস করবার জন্যে সাগর ক্ষুধার্তের মত ছুটে আসে, ভেঙ্গে আছড়ে পড়ে সৈকতরেখায়, শুধু বুঝি ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবার জন্যে। কিন্তু ফিরে গেলেও রত্নাকরকে রেখে যেতে হয় তার ঐশ্বর্যের কিছু অংশ বালুকা-বেলায়। বর্তমান প্রসঙ্গে সেই বেলাভূমির ঐশ্বর্যের বিষয়ই কিঞ্চিৎ আলোচনা করবো।

পর্তুগীজ নাবিকেরা জলপথ আবিষ্কার করে প্রথম যখন ভারতের সমুদ্রসৈকতে পা দিয়েছিল, তখন বিজ্ঞানের এতটা অগ্রগতি হয় নি। কোচিনের রাজা জামোরিনের সজ্জিত প্রাসাদের দিকেই বোধ হয় ভাস্কো-ডি-গামার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। নইলে বেলাভূমির বালুকারাশি দেখে ইউরেকা, ইউরেকা বলে নেচে উঠতো! ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের বালিকণার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে হাজার হাজার বছর ধরে সঞ্চিত যে রত্ন, বিংশশতাব্দীতে সেগুলি থোরিয়াম এবং রেয়ার আর্থ স্যাণ্ডস্ নামে পরিচিত। চল্‌তি কথায় বলা হয় বেলাভূমির ভারী বালিকণা। বিজ্ঞান সম্পর্কিত কাজের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ উপকরণ আজ উদ্ধার করা হচ্ছে এই বালুকারাশি থেকে। সেগুলি হচ্ছে মোনাজাইট, রুটাইল, ইলমেনাইট, জিরকন, সিলিমেনাইট এবং গার্নেট প্রভৃতি। বেলাভূমির বালিকণার এই বিভিন্ন উপকরণগুলি নানাভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে; তবে বোধহয় পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের ব্যাপার মোনাজাইটের মূল্যই বেশী।

খনিজ অনুসন্ধানকারীদের ধারণা, ভারতের এই মূল্যবান বালুকারাশির পরিমাণ অপরিমিত এবং প্রতি বছরই নতুন পরিমাণে বালুরাশির বিস্তৃতি

ঘটছে। বিভিন্ন উপকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করবার পূর্বে আমাদের দেশের এই বালুকা-সম্পদের বিস্তৃতি, বিষয় জানা দরকার। কেরালা রাজ্যের কুইলন থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত ১০০ মাইল দীর্ঘ উপকূলভূমি শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ববৃহৎ ভারী বালিকণার আকরভূমি এবং অনুসন্ধানকারীদের ধারণা, এই সম্পদ কখনও শেষ হওয়ার নয়। তাছাড়া স্বল্প পরিসর নিয়ে মালাবার, রামনাথপুরম, তাঞ্জোর, বিমৃলিপত্তম এবং গঞ্জাম উপকূলেও ভারী বালিকণা পাওয়া যায়। ভারতীয় খনি বিভাগের দিক থেকে অন্ধ্র উপকূলে ভারী বালিকণা উদ্ধারের প্রাথমিক অনুসন্ধানে সাফল্যের আশা দেখা গেছে। ইলমেনাইট মিশ্রিত বালিকণা বোম্বাই উপকূলেও পাওয়া গেছে। পুরানগড় থেকে মালগুন্দ এবং আরও কিছুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় ২৫ মাইল দীর্ঘ উপকূলে এবং সুরাট অঞ্চলের বুলসরে ভারী বালিকণার খোঁজ পাওয়া গেছে। ভারতের প্রায় ৫০০০ মাইল দীর্ঘ সৈকতভূমির পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান এখনও হয় নি এবং হয়তো ভবিষ্যতে নতুন কোনও অঞ্চলে ভারী বালিকণার খোঁজ পাওয়া যাবে।

ভারতে ভারী বালিকণার বিভিন্ন উপকরণগুলির উদ্ধারকার্য প্রধানতঃ কেরালা রাজ্যের কোইলথোটম, চাভারা এবং কুইলনের অন্তর্গত মানাভালাকুরিচি অঞ্চলে হচ্ছে। খনিগুলি রাজ্যসরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে মেসার্স হফকিন্‌স্ অ্যাণ্ড উইলিয়মাস (ট্র্যাভাঙ্কোর) লিমিটেড এবং মেসার্স এফ. এক্স. পারেরা অ্যাণ্ড সন্স (ট্রাঃ) লিঃ কোম্পানীগুলি উদ্ধারকার্য চালাচ্ছে। ভারত পৃথিবীর বৃহত্তম আকর ভূমি এবং উৎপাদনের মাত্রানুযায়ী আমাদের দেশ বিশ্বে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে। ভারতের বালিকণার উপকরণগুলির পরিমাণ নিম্নলিখিত রূপ :—

ইলমেনাইট	৬৫-৭৫%	
রুটাইল	৩–৪%	
জিরকন	৫–১০%	চাভারা অঞ্চলের
সিলিমেনাইট	৫–১০%	বালিকণার বিশ্লেষণ
কোয়ার্টজ্	৫–১০%	
মোনাজাইট	১–২%	

বিভিন্ন উপকরণগুলির রাসায়নিক পরীক্ষায় যে ফল পাওয়া গেছে তা নিম্নরূপ :—

রুটাইল	৯৫% TiO_2	টাইটেনিয়াম অক্সাইড
ইলমেনাইট	৫৯% TiO_2	" "
মোনাজাইট	৮% ThO_2	থোরিয়াম "
জিরকন	৬১% ZrO_2	জিরকনিয়াম "
সিলিমেনাইট	৬৩% Al_2O_3	অ্যালুমিনা

বিভিন্ন উপকরণগুলি পৃথক করাও সহজ ব্যাপার নয়। ভারী বালিকণাগুলি প্রথমে সূর্যোত্তাপে শুষ্ক করে ৩০ ঘর জালের মধ্য দিয়ে পার করা হয়। এতে চুনাপাথর এবং অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় জিনিষগুলি বাদ পড়ে যায়। তারপর বালিকণাগুলিকে খুব ভাল করে শুকিয়ে নিয়ে ওয়েদেরিল এবং অন্যান্য রকমের বৈদ্যুতিক চুম্বকের উপর ফেলা হয়। এর ফলে সামান্য চুম্বকীয় শক্তিতে ম্যাগ্‌নেটাইট পৃথক হয়ে যায়। তারপর যে উপকরণ পাওয়া যায়, তাতে ৯১–৯৮% বিশুদ্ধ ইলমেনাইট থাকে। এই ইলমেনাইট আবার গ্র্যাভিটি টেব্‌লের সাহায্যে গার্নেট কণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা যায়। প্রথম উপকরণ পাওয়ার পর অবশিষ্ট ভারী বালিকণাগুলি আরও শক্তিশালী বৈদ্যুতিক চুম্বকে ফেলে ৬০% বিশুদ্ধ মোনাজাইট পৃথক করা যায়। এই মোনাজাইটকে তারপর সিক্ত এবং শুষ্ক কন্‌সেন্ট্রেটিং টেব্‌ল এবং উচ্চশক্তিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক চুম্বকের সাহায্যে শুদ্ধ করবার পর শুষ্ক টেব্‌লিং দ্বারা ৯৮% বিশুদ্ধ মোনাজাইট উদ্ধার করা হয়। অবশিষ্ট বালিকণা থেকে ফ্লোটেসন এবং গ্র্যাভিটি কন্‌সেন্ট্রেসন দ্বারা প্রায় ৯৮% বিশুদ্ধ জিরকন এবং সিলিমেনাইট পাওয়া যায়। শেষ অংশে ফ্লোটেসন এবং বিদ্যুৎ কন্‌সেন্‌ট্রেসন দ্বারা ৯৪% বিশুদ্ধ রুটাইল উদ্ধার করা হয়।

এখানে বিভিন্ন উপকরণগুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হচ্ছে :—

মোনাজাইট

এই পদার্থ টা মিশ্রিত ধরণের ফস্‌ফেট এবং বেশীর ভাগ রেয়ার আর্থ অক্‌সাইড-এর মিনারেল। এই রেয়ার আর্থগুলির মধ্যে সিরিয়াম, ল্যানথেনাম, নিওডিমিয়াম, প্রসিডিমিয়াম, সামারিয়াম, ইউ-রোপীয়াম, ইট্রিয়াম, টারবিয়াম ইত্যাদিই প্রধান। এর সঙ্গে সাধারণতঃ ৪-১০% থোরিয়াম অক্সাইড (বিশেষ ক্ষেত্রে ৩৫% পর্যন্ত) এবং সিলিকা ১০% পর্যন্ত মিশ্রিত থাকে। থোরিয়ামের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়। কেরালায় কোন কোন কণা থেকে ৬·৫% U_3O_8 পাওয়া গেছে। ভারতীয় বালিকণা পৃথক করবার পর মোনাজাইটের বিশ্লেষণ নিম্নরূপ দাঁড়ায় :—

থোরিয়া (ThO_2)—৮·১%

সিরিয়া (Ce_2O_3)—৩০·৬%

ল্যানথেনাম অক্সাইড	—১৫·৭%	(La_2O_3)
প্রসিডিমিয়াম „	—২·৯%	(Pr_2O_3)
নিওডিমিয়াম „	—১০·৫%	(Nd_2O_3)
ইউরোপীয়াম, টারবিয়াম, গ্যাডোলিনিয়াম ইত্যাদি	০·৭%	
ইট্রিয়াম অক্সাইড	০·৪%	(Yt_2O_3)
অন্যান্য রেয়ার আর্থ	০·১%	
অ্যালুমিনা (Al_2O_3), লাইম (CaO), লোহা (Fe_2O_3)	১·০%	
ইউরেনিয়াম (U_3O_8)	০·৩%	
ফস্‌ফরাস (P_2O_5)	২৬·২%	
সিলিকা (SiO_2)	২·৪%	

কেন্দ্রিক শক্তি এবং অণুশক্তির গবেষণার জন্যে রেয়ার আর্থগুলি, বিশেষতঃ থোরিয়ামের (মোনা-জাইটের), তথা ভারতের বেলাভূমির ভারী বালি-কণাগুলির গুরুত্ব খুব বেশী। বিভিন্ন রেয়ার আর্থ এবং অন্যান্য উপকরণগুলির বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগের জন্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সেগুলিকে পৃথকীকরণের প্রয়োজন আছে। ট্রাভাঙ্কোর রাজ্যসরকার এই সূত্রে দুটি ফরাসী, কোম্পানী স্যা ব্যাঙ্কে মারকুএনে ডা ক্রেডিট এবং সোসাইতে স্যা প্রডুইট্‌স্ চিমিকেশ স্যা টেরেস রেয়ারেস-এর সঙ্গে চুক্তি করবার পর বছরে ১৫০০ টন মোনাজাইট শোধন করবার জন্যে ভারতে প্রথম রেয়ার আর্থ কারখানা ১৯৫০ সালে আলওয়ে সহরে স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এর উৎপাদন আরম্ভ হয় ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৫২ থেকে, যে দিন প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু এর উদ্‌ঘাটন করেন। এই কারাখানা থেকে মিক্সড আর্থ (সিরিয়াম ক্লোরাইড, কার্বনেট এবং হাইড্রক্সাইড) তৈরী হয়। এই উপকরণ বহু রকমের বাণিজ্যিক ব্যবহারে আসে। মিশ্‌চ্‌ মেটাল, নড্যুলার আয়রন পাইরোফোরিক অ্যালয়, লেন্স, আর্কল্যাম্প-কার্বন, ষ্টীল পলিসিং, চশমার কাচে রং লাগানো, চামড়া শোধন, বিউটি প্রিপারেশন ইত্যাদির কাজে এই উপকরণ যথেষ্ট ব্যবহার করা হয়। বাইপ্রোডাক্ট হিসাবে ট্রাইসোডিয়াম ফস্‌ফেট এখানে তৈরী হয়। এছাড়া রেয়ার আর্থগুলি পৃথকীকরণের সময় থোরিয়াম হাইড্রক্সাইড (থোরিয়াম কেক্) একটি প্রধান বাইপ্রডাক্ট হিসাবে পাওয়া যায়। এই থোরিয়াম বিশুদ্ধিকরণ ও ব্যবহারের জন্যে ট্রম্বে সহরে ভারতীয় পরমাণু-শক্তি বিভাগের থোরিয়াম কারখানায় পাঠানো হয়। এই থোরিয়াম কারখানা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫ সাল থেকে চালু হয়েছে। প্রতিদিন থোরিয়াম এবং ইউরেনিয়ামের চাহিদা বাড়তে থাকায় পরমাণু-শক্তি বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা ছয়গুণ বাড়ানো হয়েছে এবং ১৯৫৬ সালের প্রথম দিক থেকেই এই বর্ধিত হারে উৎপাদন হচ্ছে। এই কারখানা পৃথিবীর বৃহত্তম থোরিয়াম কারখানা-গুলির অন্যতম এবং ভারতীয় গ্যাস-ম্যান্টেল কারখানাগুলির সমগ্র চাহিদা মিটিয়েও দূর প্রাচ্য

এবং ইউরোপের বাজারে আমাদের থোরিয়াম রপ্তানী করা হয়। থোরিয়ামের সঙ্গে বাইপ্রোডাক্ট হিসাবে যে ইউরেনিয়াম ফ্লোরাইড পাওয়া যায়, তাথেকে ইউরেনিয়াম ধাতু উৎপাদনের জন্যে ভারত সরকার একটি ইউরেনিয়ামের কারখানা স্থাপন করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। দি ইণ্ডিয়ান রেয়ার আর্থস্ (প্রাইভেট) লিমিটেড গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরূপে এই কাজ হাতে নিয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে, ১৯৫৮ সাল থেকে ইউরেনিয়াম উৎপাদন আরম্ভ হয়ে যাবে।

থোরিয়ামের গুরুত্ব দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে; কারণ বৈজ্ঞানিকেরা এখন বিশ্বাস করেন যে, নিউট্রন রেডিয়েশনের স্লো বম্বার্ডমেণ্টের দ্বারা থোরিয়াম-২৩৩ তৈরী করা যায় এবং শেষে এথেকে ইউরেনিয়াম-২৩৩ পাওয়া যায়। নিউট্রন-থোরিয়াম থেকে যে মেসোথোরিয়াম (রেডিয়াম-২২৮) তৈরী হয়, বর্তমান যুগে তা ঘড়ির ডায়েলে এবং কাঁটায় লাগানো হয়।

ইলমেনাইট এবং রুটাইল

ইলমেনাইট থেকে পৃথিবীর বেশীর ভাগ টাই-টেনিয়াম অক্সাইডের (TiO_2) চাহিদা মেটানো হয়। ইলমেনাইটের রাসায়নিক নাম FeO. TiO_2 এবং সাধারণতঃ এর মধ্যে ৫২.৬% TiO_2 এবং ৩১.৬% টাইটেনিয়াম ধাতু আছে। রুটাইলের (TiO_2) মধ্যে ৬০% টাইটেনিয়াম ধাতু আছে। যদিও টাইটেনিয়াম পৃথিবীর বিভিন্ন প্রস্তরে যথেষ্ট পরিমাণে ছড়িয়ে আছে, তবু অর্থনীতিক এবং বাণিজ্যিক পরিমাণে খুব অল্প স্থানেই রয়েছে। ভারতের কেরালা উপকূল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ এবং বৃহত্তম আকরভূমি এবং উৎপাদনের বেশীর ভাগই এখান থেকে রপ্তানী করা হয়। ইলমেনাইট শোধন করবার জন্যে কেরালা গভর্ণমেণ্টের দি ট্র্যাভাঙ্কোর টাইটেনিয়াম প্রোডাক্টস্ কোম্পানী লিমিটেড-এর কারখানা ত্রিভেন্দ্রামে স্থাপিত হয়েছে।

ইলমেনাইট এবং রুটাইলের উপযোগিতা টাইটেনিয়ার জন্যে, যা সাদা রং তৈরীর একমাত্র প্রধান উপকরণ। ইলমেনাইট কালো রং হিসাবে অ্যাণ্টিকরোসিভ পেণ্ট রূপে সামান্য ব্যবহৃত হয়। ষ্টীল ওয়েল্ডিং এর ইলেকট্রোড হিসাবে রুটাইলের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে এবং ভারতের উৎপাদন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে এক-চেটিয়া স্থান করে নিয়েছে বললেই চলে। টাই-টেনিয়ামের অন্যান্য রাসায়নিক লবণগুলিও বিভিন্ন জিনিষে ব্যবহৃত হয়, যেমন—fabric bleaching, mordant in textile industry, water-proofing, cosmetics, smoke-screen, sky-writing, ceramics, lino & floor covering ইত্যাদি।

জিরকন

সাধারণতঃ এই ধারণা দেখা যায় যে, যে জির কনিয়াম (ধাতু) খুবই কম আছে পৃথিবীতে। কিন্তু দেখা গেছে, এর পরিমাণ পৃথিবীতে তামা এবং সীসা থেকে বেশী। জিরকনের ব্যবহার ইদানীং বাড়তে আরম্ভ করেছে। জিরকন এই ধাতুর সিলিকেট এবং প্রায় ৬৭.২% জিরকনিয়া এতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন রঙের জিরকন দেখা যায়, যেমন—নীল, সবুজ, লাল এবং বর্ণ-হীন; তবে সাধারণতঃ ব্রাউন রঙের জিরকনই বেশী দেখা যায়। স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার জিরকনের দানা মূল্যবান পাথর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অষ্ট্রেলিয়ার উপকূলের বালিকণায় বিশ্বের সবচেয়ে বেশী জিরকন পাওয়া যায়। ভারত উৎপাদন অনুযায়ী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে।

জিরকনিয়াম এবং এর কম্পাউণ্ডগুলি সাধারণতঃ ইনক্যাণ্ডেসেণ্ট বাতির ফিলামেণ্ট, ফ্ল্যাস লাইট-পাউডার এবং নার্নষ্ট্ বাতিতে ব্যবহৃত হয়। স্বচ্ছ জিরকন, গোমেদ-মণি হিসাবে অনেকেই অঙ্গুরীতে ব্যবহার করে থাকেন।

উপকূলভূমির বালিকণার অন্যান্য উপকরণগুলি গৌণ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কারণ বালিকণা অপেক্ষা প্রস্তর আকরে এই মিনারেল-গুলির (যেমন—সিলিমেনাইট, ম্যাগ্‌নেটাইট, গার্নেট ইত্যাদি) উৎপাদন বেশী হয়ে থাকে এবং সেভাবেই ব্যবহার করা সহজ হয়।

সুতরাং সাগরবেলার বালিকণা ভারতবর্ষের খনিজ সম্পদের একটা প্রধান অঙ্গ এবং আমাদের ডলার মুদ্রা আহরণের সহায়ক। নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান থেকে বুঝতে পারা যাবে, বালিকণা থেকে ভারতবর্ষ কত আয় করে থাকে।

উৎপাদন (মূল্য : হাজার টাকায়)
পরিমাণ : টন।

	১৯৫১		১৯৫২		১৯৫৩		১৯৫৪	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
ইলমেনাইট	২২৪,০৮৪	৪০,২৫	২২৪,৮৯৫	৩৭,৩০	২ ৬,২৫৯	৮৮,১৮	২৩৯,০১৩	৭৬,৬৫
রুটাইল	৪৫	৯	১৪৭	৬৯	১০৪	১৩	১০৪	৫২

	১৯৫৫		১৯১৬*	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
	২৫০,৭৭৪	১,৩১,৯০	৩৩৪,০০০	১,৭৮,১২
	১৪৯	১,০২	৫৪১	৪,৩৬

রপ্তানী (মূল্য : হাজার টাকায়)

	১৯৫৩		১৯১৪		১৯৫৫		১৯৫৬*	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
ইলমেনাইট (টন)	১৬৮,১১৬	৯৭,৬৯	১৮৫,১৫৩	১,০৮,৭৪	২৪৬,১৯৬	১,৫০,৪৬	২৮৩,২০১	১,৮৮,২১

* Figures are provisional

সঞ্চয়ন

বর্ধমানে খনিজ তৈলের সন্ধান

“কলকাতার ৭৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে বর্ধমান জেলা সহরটিতে গগনচুম্বী ইস্পাতের একটি টাওয়ার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এই টাওয়ারটিকে বলা হয় ডেরিক। ভূগর্ভের তৈল অনুসন্ধানের জন্যে এখানে এই সর্বপ্রথম যুক্তরাষ্ট্রের ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম ভারত সরকারের সহযোগিতায় পরীক্ষা-মূলকভাবে একটি তৈলকূপ খনন করছেন।

ডেরিকের গগনস্পর্শী উচ্চতা থেকে রোটারী রিগ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এই রোটারী রিগ মাটির নীচে বহুদূর পর্যন্ত ভারী পাইপ চালিয়ে দেয়। এই রিগের সাহায্যে নীচের মাটির অবস্থা নির্ণীত হয় এবং ভূগর্ভে তৈল আছে কিনা তাও জানতে পারা যায়।

পেট্রোলিয়ামের খোঁজে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকায় যুক্তভাবে অনুসন্ধান চালাবার জন্যে তিন বছর আগে ভারত সরকারের সঙ্গে ষ্ট্যান-

ভ্যাকের একটি চুক্তি হয়েছিল। সেই থেকেই এই মার্কিন তৈল কোম্পানীটির অনুসন্ধান কার্য চলছে এবং তারই ফলে এই তৈলকূপ খননকার্য আরম্ভ হয়েছে। পূর্বেকার একটি চুক্তি অনুসারে ভারত সরকার ও এই মার্কিন তৈল কোম্পানীটি প্রাথমিক অনুসন্ধান কার্য চালিয়েছিলেন। সেই সময়ে বিমান থেকে ম্যাগ্‌নেটোমিটারের সাহায্যে পর্যবেক্ষণও করা হয়েছিল। এই কাজে প্রয়োজনীয় অর্থের এক-চতুর্থাংশ দিয়েছিলেন ভারত সরকার এবং অবশিষ্টাংশ দিয়েছিলেন ষ্ট্যানভ্যাক।

বর্ধমানের নিকট পরীক্ষামূলকভাবে যে তৈল-কূপটি খনন করা হচ্ছে সম্ভবতঃ তা ১০,০০০ ফুট গভীর হবে। প্রথম তৈলকূপ খননের যুগ থেকে আজ আমরা কতদূর চলে এসেছি। সর্বপ্রথম যিনি খননকার্য পরিচালনা করেছিলেন, তিনি মাত্র ৬৯ ফুট গভীর কূপ খনন করেই তৈলযুগের সূচনা করেছিলেন।

বর্ধমানের নিকট যে রোটারী রিগটি স্থাপন করা হয়েছে, সেটি তৈলকূপ খননের একটি আধুনিক পদ্ধতি। ছুতোর মিস্ত্রীরা যেভাবে কাঠের মধ্যে ছিদ্র করে, ঠিক সেই ভাবেই এদিয়ে মাটির বুকে গর্ত খোঁড়া হয়। যে জায়গাটিতে ডেরিক স্থাপিত হয়েছে, ঠিক সেইখানে ডেরিকের তলদেশে একটি ইস্পাতের ভিতের (বেস) উপর স্থাপিত একটি ভারী ঘূর্ণায়মান যন্ত্রের সাহায্যে পাইপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাটির নীচে বসানো হয়। এই পাইপের নীচের প্রান্তে বিট বা কাটবার যন্ত্র লাগানো আছে।
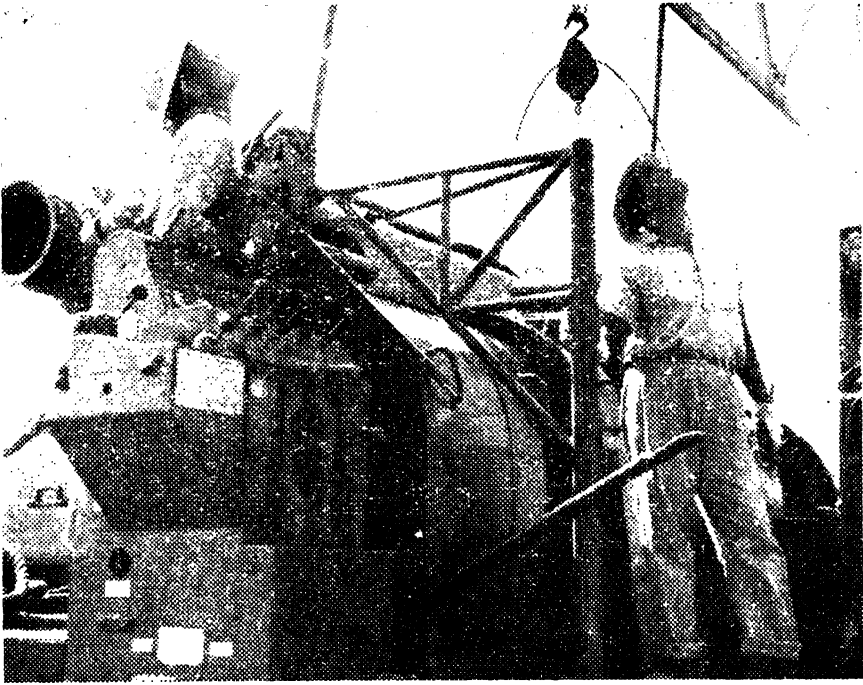
ডেরিকের সঙ্গে ভারী যন্ত্রপাতি ঝোলানোর কাজ হচ্ছে
এবং বাঁ-দিকে ড্রিলার দেখা যাচ্ছে।

এই কাজের জন্যে সর্বাধুনিক যন্ত্র এবং বিভিন্ন কাজে বিশেষজ্ঞ একদল দক্ষ যন্ত্রবিজ্ঞানী নিয়োগ

করা হয়েছে। এই যন্ত্রটি আট হাজার থেকে দশ হাজার ফুট পর্যন্ত গভীর কূপ খননের উপযোগী করে বিশেষভাবে নির্মিত হলেও প্রয়োজনমত অতিরিক্ত কিছু যন্ত্রপাতি লাগিয়ে নিয়ে কূপ খননের গভীরতা আরও বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। রোটারী রিগ-এর একটি সুবিধা এই যে, অল্প সময়ের মধ্যেই তার বিভিন্ন অংশ যেমন তাড়াতাড়ি জোড়া দেওয়া যায় তেমনি আবার খুলে ফেলাও যায়। খননের প্রয়োজনীয় যন্ত্র বিটের ধার ও কোণাগুলি এবং এর উপরিভাগ কাটবার জন্যে ক্রোমিয়াম, টাংষ্টেন ও ভ্যানাডিয়াম মিশ্রিত একপ্রকার কঠিন ইস্পাত ব্যবহৃত হয়। তৈলকূপ খননের রোটারী যন্ত্রে বহুপ্রকার বিট ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে ত্রিকোণাকার প্রস্তর কাটবার যন্ত্র অথবা রোলার বিট ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্রস্তরীভূত স্তর কাটবার জন্যেই সাধারণতঃ এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে, আর 'ফিস-টেল' বা মৎস্যপুচ্ছ ধরণের বিট ব্যবহৃত হয়, যেখানে নরম স্তর কাটবার প্রয়োজন হয়। তৃতীয় প্রকার বিটের নাম ডায়মণ্ড বিট। মাটির অভ্যন্তর ভাগ থেকে কিছু অংশ কেটে বের করে আনবার জন্যে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই যন্ত্রটি যখন মাটি কেটে মাটির ভিতরে প্রবেশ করতে থাকে তখন প্রস্তরের স্তর ভেদ করবার সময় ঐ স্তরের কিছুটা অংশ ডায়মণ্ড ড্রিলের কেন্দ্রস্থলে এসে জমা হয়। এইগুলি থেকেই তৈল বিশেষজ্ঞগণ প্রস্তরের স্তরের গঠন সম্পর্কে জানতে পারেন। বিশেষ করে, যে ধরণের প্রস্তর থেকে তৈলের অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা করতে পারা যায়, এগুলি সেই ধরণের কিনা তাও তাঁরা স্থির করতে পারেন।

তৈলকূপ খননের পাইপ মাটির নীচে বসে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার উপর ২৯ থেকে ৩১ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ আরও পাইপ জুড়ে দেওয়া হয়। পাইপে প্যাঁচের ব্যবস্থা থাকায় এর সঙ্গে অতিরিক্ত পাইপ লাগাবার বা খোলবার সুবিধা হয়।

রিগের কাজ হলো, খননের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি উপরে টেনে তোলা এবং নীচে নামিয়ে দেওয়া। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রটি। তৈল-বিজ্ঞানীরা বিশেষ বিশেষ কাজের জন্যে কিভাবে উপযুক্ত যন্ত্রের ব্যবহার করেন, এই যন্ত্রটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রায় ২০ টন ওজনের এই যন্ত্রটির সাহায্যে তৈলকূপ খননের কাজ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। একটি মাত্র লোকই এই যন্ত্রের সাহায্যে সব কাজ সম্পাদন করতে পারে।

৪০০ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট তিনটি ডিজেল ইউনিটের সাহায্যে যন্ত্রটি চালানো হয়। এই ডিজেল ইউনিটের প্রত্যেকটিতে আবার দুটি করে ইঞ্জিন থাকে। জরুরী অবস্থার জন্যে আরও দুটি ইঞ্জিন প্রস্তুত রাখা হয়।

তৈলকূপ খননকালে সাধারণতঃ মাড বা কর্দম নামে অভিহিত যে তরল পদার্থ ভিতর থেকে বাইরে আসে, তা মেশাবার ও মজুদ রাখবার জন্যে ব্যবহৃত বিশেষভাবে নির্মিত ট্যাঙ্ক উক্ত যন্ত্রের একটি অপরিহার্য অংশ। জল, বিশেষ ধরণের মাটি ও রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই কর্দম এতই জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ যে, এই তরল পদার্থের গুণাগুণের উপর সর্বদা লক্ষ্য রাখবার জন্যে ইঞ্জিনীয়ারদের ২৪ ঘণ্টা এখানে উপস্থিত থাকতে হয়। এই কর্দম পাম্পের সাহায্যে ড্রিল পাইপের মধ্য দিয়ে তৈল-কূপের মধ্যে চালিয়ে দেওয়া হয়। ফলে বিট ঠাণ্ডা ও পিচ্ছিল থাকে। অতঃপর এই তরল পদার্থকে ড্রিলের গর্তের মধ্য দিয়ে উপরে টেনে তোলা হয়। ড্রিল দ্বারা কর্তিত যে সকল পদার্থ এই তরল পদার্থের সঙ্গে ধুয়ে আসে, সেগুলি কর্দম থেকে পৃথক করে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়, খননকার্য কি ধরণের স্তরে পৌঁচেছে।

খনন যন্ত্র যতই মাটির গভীরে চলতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে কূপের অভ্যন্তরে চারপাশে ইস্পাতের পাইপ বসিয়ে দেওয়া হয়। এগুলিকে বলা হয় কেসিং। অপ্রয়োজনীয় জল যাতে কূপের মধ্যে প্রবেশ না করে সেজন্যেই এরূপ করা হয়। কূপের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত এইভাবে পাইপ বসিয়ে দেওয়া হয়। এই পাইপগুলির ব্যাস নীচের দিকে কম ও উপরের দিকে বেশী। ফলে এর আকৃতি হয় অনেকটা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মত। সর্বশেষে কেসিংকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করবার জন্যে কেসিং ও কূপের ধারগুলির ফাঁকের মধ্যে সিমেণ্ট পাম্প করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

রোটারী রিগ স্থাপন থেকে তৈলকূপ খনন পর্যন্ত প্রত্যেকটি পর্যায়ে বিভিন্ন কাজের জন্যে বিশেষ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক ও বহু মূল্যবান যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। এখানে কয়েকটি শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে; যথা—মালবহনকারী, যন্ত্রপাতি পরিচালক, রিগের কাজে দক্ষ ঝালাইকর, বৈদ্যুতিক কাজে বিশেষজ্ঞ, যন্ত্রবিজ্ঞানী, ডেরিক-এর কাজ জানা লোক, রোটারী যন্ত্র চালনায় সাহায্যকারী ও তৈলকূপ খননকারী। একটি তৈলকূপ নানা কাজে দক্ষতাসম্পন্ন বহু লোকের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। একটি ১০ হাজার ফুট গভীর তৈলকূপ খনন করবার জন্যে প্রায় ২ শত পাউণ্ড পর্যন্ত কটনওয়েষ্ট, ৫ টন করাতের গুঁড়া, ১৪,০০০ ফুট তৈলকূপ খননের পাইপ, ১০,০০০ ফুট কেসিং পাইপ এবং প্রায় ৫,০০০ বস্তা সিমেণ্ট প্রয়োজম হয়। এই গভীরতাবিশিষ্ট তৈলকূপ খনন করতে হলে শুধু খননকার্য বাবদই ৮০,০০০ থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয় হতে পারে। কিন্তু এই পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের পরও যে তৈল পাওয়া যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।
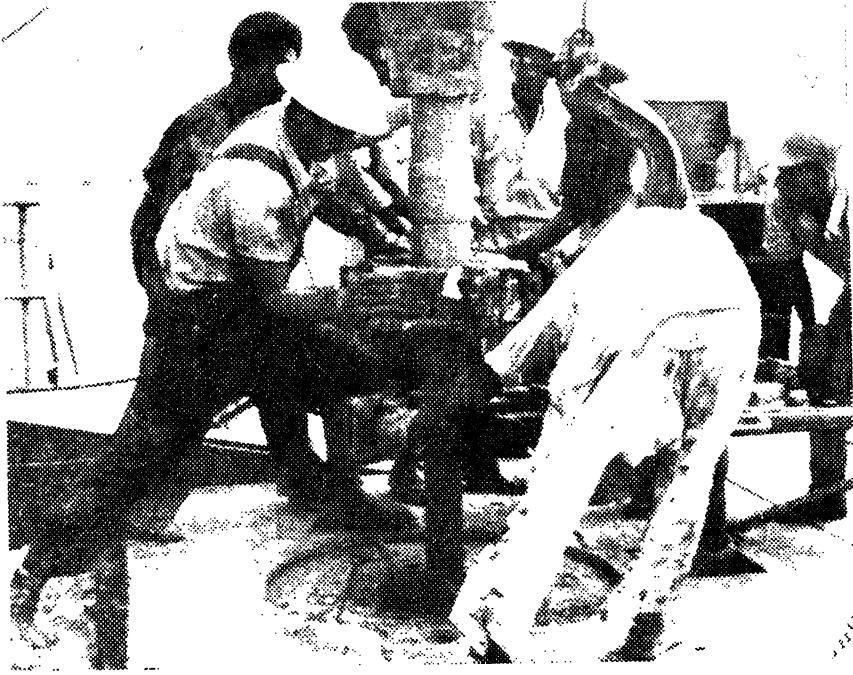
ভূগর্ভে তৈলের অনুসন্ধানে একটি পাইপের সঙ্গে আর একটি পাইপ যোগ করা হচ্ছে।

একদিক থেকে বলা যায়, তৈলকূপ খননের কাজ কতকটা বড় রকমের দৈহিক অস্ত্রোপচারের মত। একবার আরম্ভ করলে তা সম্পূর্ণ বা পরিত্যক্ত না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যেতেই হবে।”

হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত রোগীর আশাভরসা

প্র্যাক্‌টিসনার পত্রিকার (লণ্ডন) সম্পাদক ডাঃ টমসন লিখিয়াছেন, ৩০ বৎসর পূর্বে আমি যখন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম তখন হৃৎপিণ্ডের উপর অস্ত্রোপচার আমরা প্রায় অসম্ভব বলিয়াই জানিতাম। কোন দুর্ঘটনায় কিংবা যুদ্ধে আঘাতের ফলে হৃৎপিণ্ডে ক্ষত সৃষ্টি হইলে তাহা সারাইবার একটা চেষ্টা হইত মাত্র। ১৯২৫ সালে লণ্ডনের একটি হাসপাতালের জনৈক শল্যচিকিৎসক বাতজনিত হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত একজন রোগীর উপর সাফল্যের সহিত অস্ত্রোপচার করেন, অবশ্য ইহা অনেকটা বরাত জোরের ব্যাপার বলিয়াই ধরা যায়।

আজ কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে, এখন প্রতি বৎসর হাজার হাজার রোগীর হৃদ্‌পিণ্ডের উপর অস্ত্রোপচার হইতেছে। এইরূপ পরিবর্তনের কারণ কি? এমন কি অবস্থার সৃষ্টি হইল যাহার জন্য শল্যচিকিৎসকেরা এই ভাবে শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিয়াছেন?

প্রথমতঃ, এই সম্পর্কে উল্লেখ করিতে হয় সার আলেকজেণ্ডার ফ্লেমিং আবিষ্কৃত পেনিসিলিনের কথা। এই পেনিসিলিন এবং অন্যান্য অ্যাণ্টি-বায়োটিক্‌স্ যদি আবিষ্কৃত না হইত তাহা হইলে হৃৎপিণ্ডের উপর যে হারে আজ অস্ত্রোপচার হইতেছে তাহা সম্ভব হইত কি না সন্দেহের বিষয়; কারণ তাহাতে বিপদের ঝুঁকি অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যাইত।

দ্বিতীয়তঃ, অ্যানেস্থেটিক সম্পর্কে নূতন পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহার ফলে যেভাবে এই সব নূতন ধরণের অস্ত্রোপচার সম্ভব হইয়াছে তাহা পুরাতন পদ্ধতিতে কখনও সম্ভব হইত না।

তৃতীয়তঃ, হৃৎপিণ্ড কি ভাবে কাজ করে এবং কেন যথাযথভাবে কাজ করিতেছে না—এই সম্বন্ধে বর্তমানে অনেক কিছু জানা গিয়াছে। ইহা সম্ভব না হইলে শল্যচিকিৎসকের পক্ষে এই ভাবে রোগীর হৃৎপিণ্ডের উপর অস্ত্রোপচার করা কখনও সম্ভব হইত না।

কিন্তু এই কথা ঠিক যে হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচার সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা শল্যচিকিৎসকদের বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছে। এই ব্যবস্থা হইল, সাময়িকভাবে কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডের ব্যবহার।

ইহা হৃৎপিণ্ড-ফুস্‌ফুস যন্ত্র নামে বিশেষজ্ঞদের নিকট পরিচিত। এই যন্ত্রটি হৃৎপিণ্ডের কাজ করে এবং ২০ মিনিট পর্যন্ত রোগীর শরীরে অবাধে রক্তপ্রবাহ বজায় রাখিতে পারে। ইহাতে শল্য-চিকিৎসকগণ রোগীর হৃৎপিণ্ডের উপর প্রয়োজনমত অস্ত্রোপচার করিতে যথেষ্ট সময় পান।

ইহা বুঝা কঠিন নয় যে, হৃৎপিণ্ডের কাজ যখন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকে তখনই তাহার উপর অস্ত্রোপচার সহজ হয়। যে হৃৎপিণ্ড মিনিটে ৭০ হইতে ৮০ বার স্পন্দিত হয় তাহার উপর অস্ত্রোপচার কখনই সহজ হইতে পারে না। প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সময়েও অস্ত্রোপচার হইতে পারে। এই কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড আবিষ্কৃত হওয়ায় শল্যচিকিৎসকদের এই একটা সুবিধা হইয়াছে যে, কয়েক বৎসর পূর্বেও যে ধরণের অস্ত্রোপচারের বিষয় ধারণা করা যায় নাই তাহা এখন সহজসাধ্য হইয়াছে।

অনেক সময় শিশুদের অস্বাভাবিক হৃৎপিণ্ড লইয়া জন্মগ্রহণ করিতে দেখা যায়। ইহাদের বলা

হয় "ব্লু বেবিজ"। এই অস্বাভাবিকতার ফলে হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়া অবাধ রক্তপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি হইতে পারে কিংবা হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ ও বাম অংশের মধ্যে যে প্রাচীর রহিয়াছে তাহাতে ত্রুটি দেখা দিতে পারে।

যে সমস্ত হতভাগ্য শিশুর এই ধরণের অস্বাভাবিক হৃৎপিণ্ড থাকে তাহারা জন্মের পর অধিক দিন বাঁচিয়া থাকে না। এইরূপ অনুমান করা হয় যে, জীবিত ১,০০০ শিশুর মধ্যে একটির অন্ততঃ এই ধরণের অস্বাভাবিক হৃৎপিণ্ড থাকে।

এই ধরণের শিশুদের উপর আজকাল অস্ত্রোপচার হইতেছে এবং তাহাদের হৃৎপিণ্ড হইতে অস্বাভাবিকতার সমস্ত কারণ দূর করিয়া ফেলা হইতেছে। ইহার ফলে তাহারা স্বাভাবিক মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে পারিতেছে।

আর এক ধরণের রোগী আছে যাহারা বাতজনিত হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছে, তাহারাও শল্যচিকিৎসকদের সাহায্য পাইতেছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, মাইট্রাল স্টেনোসিসের ন্যায় বাতজনিত হৃদ্‌রোগের সেবায় শল্যচিকিৎসকেরা যথেষ্ট মূল্যবান কাজ করিতে পারিতেছেন। এক বৃটেনেই মাইট্রাল ষ্টেনোসিস রোগাক্রান্তের সংখ্যা অন্ততঃ ১০০,০০০ হইবে এবং ইহাদের মধ্যে ৮০,০০০ জন হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচারের ফলে উপকৃত হইতে যাইতেছে। এই একটি দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যায়, হৃদ্‌রোগের ক্ষেত্রে শল্যচিকিৎসা কিরূপ ফলপ্রদ হইয়াছে।

গত ১০ বৎসরে হৃৎপিণ্ড সংক্রান্ত শল্যচিকিৎসকগণ কর্তৃক এই বিস্ময়কর উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। পরবর্তী ১০ বৎসরে যে আরও উন্নতি হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পুরাতন হৃৎপিণ্ডের বদলে নূতন হৃৎপিণ্ড দান করা শল্যচিকিৎসকদের পক্ষে কখনও সম্ভব হইবে না; কিন্তু একথা ঠিক যে, যাহারা অসুস্থ হৃৎপিণ্ড লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে বা নানা কারণে যাহাদের হৃৎপিণ্ড রোগগ্রস্ত হইয়াছে তাহারা আজ শল্যচিকিৎসকদের সহায়তায় অধিকতর দীর্ঘ এবং সুস্থ জীবনযাপনের কথা চিন্তা করিতে পারিতেছে।

পুস্তক পরিচয়

বিশ্ব পরিচিতি—বিজ্ঞান শিক্ষা গ্রন্থমালা। অধ্যাপক স, ক, ফসেথ্‌মভিয়াস্কি। মস্কো, ১৯৫৫। সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল রুশ হইতে বাংলায় অনুবাদক শ্রীজয়ন্তকুমার। মূল্য এক টাকা। প্রকাশক, ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানী; ৬৪-এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩।

আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ জগতের স্বরূপ কি? কি ভাবে ইহা গঠিত? আকাশ, তারা—ইহারা কি? এই সকল প্রশ্ন এই পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়। অনুবাদ হিসাবে পুস্তিকাখানি সরল সুখপাঠ্য; অধিকাংশ স্থলে অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। ভাষা প্রাঞ্জল এবং ছাপা প্রায় নির্ভুল। প্রচ্ছদপট সুন্দর। মূল গ্রন্থকার জনপ্রিয় বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক রচনায় সিদ্ধহস্ত বলিয়া বোধ হয়। পরিভাষা অধিকাংশ স্থলেই সমীচীন।

বিভিন্ন যুগে বিশ্ব সম্বন্ধে মানুষের ধারণা নানা দেশের জ্যোতিবিদগণের সাহায্যে কি ভাবে বর্তমান অবস্থায় পৌঁচেছে মূল গ্রন্থকার সে বিষয়ে সযত্নে আলোকপাত করেছেন। তবে মধ্যে মধ্যে পুঁজিবাদ, শোষক শ্রেণী, সাম্রাজ্যবাদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে কটাক্ষ সাধারণ পাঠকের কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে।

মোটের উপর পুস্তিকাখানি তরুণ পাঠকদের উপকারে লাগবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীদুর্গাদাস

বিজ্ঞান বিচিত্রা—সম্প্রতি আমরা পাকিস্তান বিজ্ঞানোন্নয়ন সমিতির পূর্বাঞ্চলিক শাখার (ঢাকা) উদ্যোগে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত 'বিজ্ঞান বিচিত্রা' নামক একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রথম বৎসরের প্রথম সংখ্যা আলোচনার জন্য পাইয়াছি। (প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ ইন্নাছ আলী; অধ্যক্ষ, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; রমনা, ঢাকা)। প্রায় ১৬।১৭ বৎসর পূর্বে ঢাকা হইতে 'বিজ্ঞান পরিচয়' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর এই প্রথম 'বিজ্ঞান বিচিত্রা' আত্মপ্রকাশ করিল। পত্রিকাখানি শাহ্ ফজলুর রহমান ও আলী আজমের যুগ্মসম্পাদনায় প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হইবে। বর্তমান সংখ্যার প্রবন্ধগুলি সময়োপযোগী হইয়াছে। লেখকদের মধ্যে আছেন ডাঃ আবদুল হক, ডাঃ এ, আলীম, মোহম্মদ শামসুলহক, আবদুল লতিফ ভুইঞা, কাজী আখতার আহমদ, শাহ্ ফজলুর রহমান, মহম্মদ কোবাদ হোসেন, আবদুল্লাহ্ আল-মুতী প্রভৃতি। আমরা সহযোগীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুলাই—১৯৫৭

দশম বর্ষ ঃ ৭ম সংখ্যা
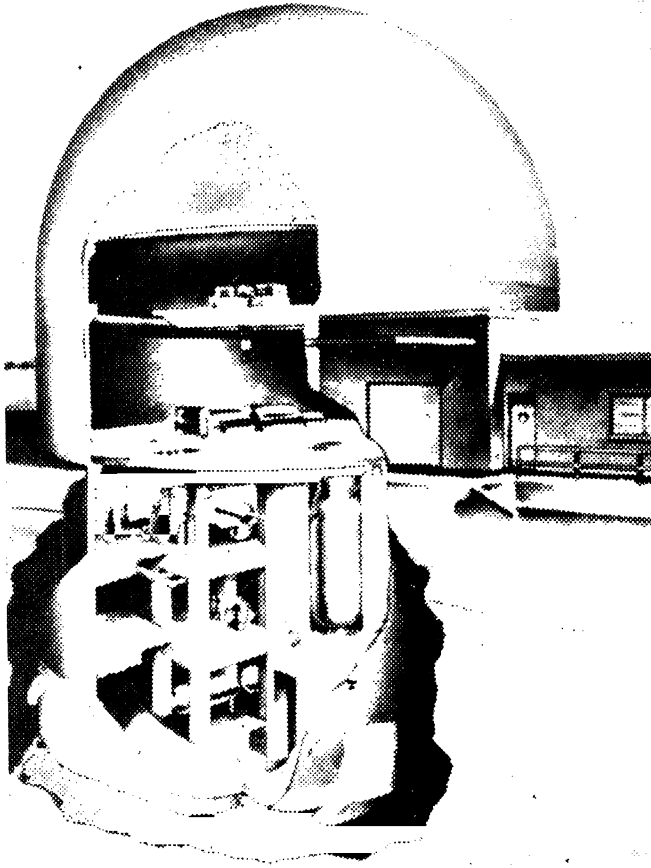
যুক্তরাষ্ট্রের আরগোন ন্যাশন্যাল লেবরেটরীর বিজ্ঞানীগণ
কর্তৃক পরিকল্পিত ও নির্মিত বয়েলিং
ওয়াটার রিয়্যাক্টর।

বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারিক প্রয়োগ

এই বিশ্ব যেমন কল্পনাতীত বিরাট, ইহার সৃজনকারী শক্তিও তেমনি অসীম। জীব, জড় ও শক্তি লইয়া অবিরাম এই অনন্ত শক্তিময়ী প্রকৃতির বিচিত্র লীলা চলিতেছে। বিশ্বকারখানায় নিয়ত ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়া জড় ও শক্তি রূপ হইতে রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে। ইহাদের এই রূপান্তর হইতে প্রকৃতির রাজ্যে অসংখ্য ঘটনা ঘটিয়া চলিতেছে। আমরা বিশ্বের বিশালতা ও বৈচিত্র্য দেখিয়া আনন্দ পাই ; আবার কখনও ঝড়-বৃষ্টি, বজ্র-বিদ্যুৎ, প্লাবন, সমুদ্রোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প প্রভৃতিতে প্রকৃতির রুদ্রলীলার পরিচয় পাইয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি। যখন মানুষের দৃষ্টি ছিল স্থূল তখন সে প্রকৃতির কোন রহস্যই ভেদ করিতে পারে নাই। কাজেই তখন প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশকে সে দৈব অথবা প্রকৃতির খেয়াল বলিয়া মনে করিত। কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতা যত বাড়িতে লাগিল, বুদ্ধিরও তত বিকাশ হইতে লাগিল। ইহারই ফলে সৃষ্টি হইল বিজ্ঞান।

পাথরে পাথরে বা কাঠে কাঠে ঘষিয়া যেদিন মানুষ আগুন জ্বালাইতে পারিয়াছিল, মনে হয়, সেইদিনেই হইয়াছিল মানব-ইতিহাসে বিজ্ঞানের সূচনা। তারপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার দ্বারা মানুষ ক্রমে ক্রমে প্রকৃতির লৌহযবনিকা ভেদ করিতে সক্ষম হইল, বিশ্বরহস্যের জটিল গ্রন্থি উন্মোচন করিতে শিখিল, প্রকৃতির ঘটনাবলীর মধ্যে পারস্পরিক শৃঙ্খলার সূত্র আবিষ্কার করিল। পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও গবেষণা করিয়া মানুষের জ্ঞান যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ, নিয়ন্ত্রিত ও যুক্তিসম্মত হয়, আর সেই জ্ঞানের সাহায্যে যখন দেখা যায় যে, প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি কার্যকারণ সম্বন্ধে গাঁথা এবং ঘটনা পরম্পরা এক সাধারণ নিয়মের অনুবর্তী, তখন সেই জ্ঞানকে বলা হয় বিজ্ঞান। যদিও বিজ্ঞান শব্দের অর্থ কোন বিষয় সম্বন্ধে বিশিষ্ট বা সঠিক জ্ঞান তবুও বিজ্ঞান বলিতে আমরা বুঝি, প্রকৃতি সম্বন্ধে তথ্যের অনুসন্ধান এবং আপাতবিচ্ছিন্ন অগণিত ঘটনার মধ্যে একটা সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার এবং তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন। বিজ্ঞান শব্দটি এই বিশিষ্ট অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই বিজ্ঞানের সাধনা হইতেছে, প্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয় এবং বিশ্বরহস্যের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান। বিজ্ঞান অনুশীলন করিয়া মানুষ যতই সত্যের সন্ধান পাইতেছে, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস হইতে তাহার মন ততই মুক্ত হইতেছে। বিজ্ঞান মানুষের অবাধ কল্পনাবিলাসকে সংযত করিয়া তাহাকে বাস্তবধর্মী করিয়া তুলিতেছে। প্রাকৃতিক জগতকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে বিজ্ঞান মানুষকে অপরিমেয়

শক্তি যোগাইতেছে এবং মানবসভ্যতা চরমোন্নতির পথে দ্রুত আগাইয়া যাইতেছে। আজ মানবসমাজে বিজ্ঞানই যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে—বিজ্ঞানের ইহাই তো হইল বৈশিষ্ট্য।

একদিন মানুষ ছিল প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নক মাত্র; সে ছিল প্রকৃতির অন্ধশক্তির কাছে নিতান্ত অসহায়। প্রকৃতির এই বিরুদ্ধ শক্তির উপর জয়ী হইবার জন্যই মননশীল ব্যক্তিরা প্রকৃতির নিভৃত অঞ্চল হইতে তথ্যাদি আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। এক বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কৃত তথ্য হইতে অপর বৈজ্ঞানিক পাইলেন আর এক নূতন তথ্যের সন্ধান। আবার কেউ বা করিলেন তাহার ব্যবহারিক প্রয়োগ। একদিন যাহা আপাত-অকিঞ্চিৎকর আবিষ্কার ছিল, পরবর্তী বৈজ্ঞানিক সেই তথ্যের সাহায্যে করিলেন বিস্ময়কর সৃষ্টি। এইভাবে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা আগুন, জল, বাতাস, বাষ্প, কয়লা, তেল, বিদ্যুৎ এবং পরমাণুর শক্তিকে কাজে লাগাইয়া মানুষ আজ অমিত শক্তির অধিকারী। অন্যান্য জীব অপেক্ষা প্রকৃতিদত্ত ইন্দ্রিয়ের শক্তি মানুষের কম হইলেও বিজ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কৃত সূত্রকে কাজে লাগাইয়া মানুষ তাহার ইন্দ্রিয়ের শক্তিকে বিপুলভাবে বর্ধিত করিয়াছে। তাই মানুষের স্থান আজ অন্যান্য জীব অপেক্ষা বহু ঊর্ধ্বে। বিজ্ঞানবলে প্রকৃতির উপকরণের যথেচ্ছ রূপান্তর ঘটাইয়াই মানুষ এখন এত সুখ-সুবিধা ও ঐশ্বর্যের অধিকারী।

পরমাণু যুগের দ্বারে দাঁড়াইয়া বিজ্ঞানের যে অপূর্ব কৃতিত্ব আজ প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার কোন্‌টা ছাড়িয়া কোন্‌টা লিখিব ভাবিয়া দিশাহারা হইতেছি। যে কাগজের উপর যে কালি ও কলম দিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতেছি সেও তো এই বিজ্ঞানের দান। সম্মুখের যে ঘড়িটি টিক্‌টিক্ করিয়া মুহূর্ত গণিয়া চলিতেছে সেও তো বিজ্ঞানকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ঐ যে অতি পরিচিত সেলাইয়ের কল, গ্রামোফোন ও রেডিও-যন্ত্র দেখিতেছি উহারাও তো বিজ্ঞানের আশ্চর্য সৃষ্টি। এমন কি, দরজা-জানলার চোখ-এড়াইয়া-যাওয়া স্ক্রুগুলি পর্যন্তও কি বিজ্ঞানের দান নহে? ইহারা অতি সাধারণ হইলেও সামান্য নহে। স্ক্রু, লিভার, ওয়েজ, পুলি, হুইল প্রভৃতি বহু পূর্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এইগুলি আমাদের কাছে অতি সাধারণ মনে হইলেও আজিকার বৃহৎ ও জটিল যন্ত্রসমূহের ইহারা অতি প্রয়োজনীয় উপাদান ও অপরিহার্য অঙ্গ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বিজ্ঞানের গতি ছিল ধীর ও মন্থর। এতদিন পর্যন্ত মানুষ পশুশক্তি এবং আগুন ও জল-বায়ুর শক্তিকে কাজে লাগাইয়া আসিতেছিল। এই সময় জেম্‌স্ ওয়াট বাষ্পের শক্তিকে কাজে লাগাইবার জন্য যে বাষ্পীয় ইঞ্জিন নির্মাণ করিলেন, তাহাই আনিল মানবসভ্যতায় যুগান্তর। এই সময় হইতেই বিজ্ঞানের অগ্রগতি হইল অতি দ্রুত। ইস্পাত প্রস্তুতের উপায়ও এই সময় উদ্ভাবিত হয়। এই দুই উদ্ভাবনের ফলে বহু কলকারখানায় কম সময়ে ও অল্পশ্রমে নানা প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপন্ন

হইতে লাগিল। পণ্যসম্ভার ও যাত্রী লইয়া স্থলে রেলগাড়ী ও জলে বাষ্পীয় পোত ছুটিল। মানুষে মানুষে মিলনের পথ সহজ হইল।

বাষ্পের পর আসিল বিদ্যুৎ। যে বিদ্যুৎ গগনপটে উদ্ভাসিত হইয়া মানুষের চোখ ধাঁধাইয়া দিত এবং বজ্ররূপে বুকে কাঁপন তুলিত, সেই বিদ্যুৎ মানুষের মুঠার মধ্যে ধরা দিয়া আজ্ঞাবহ ভৃত্যরূপে তাহার ঘরে ঘরে আলো জ্বালাইল, পাখা ঘুরাইল। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন যন্ত্রের সাহায্যে তামার তারবাহিত বিদ্যুৎ মুহূর্তমধ্যে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে সংবাদ বহন করিতে লাগিল। বিদ্যুৎশক্তির দ্বারাই চালিত হইল ট্রাম, ট্রেন ও বিবিধ কল-কারখানা। জড়-ধর্মহীন সর্বব্যাপী ইথারসমুদ্রে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের লীলা আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞানী আবিষ্কার করিলেন রেডিও ও টেলিভিশন যন্ত্র। এই উদ্ভাবন বাহির বিশ্বকে আজ আমাদের ঘরের মধ্যে আনিয়া দিয়াছে। পেট্রোল দ্বারা চালিত মোটর গাড়ীতে চড়িয়া আমরা অহরহ চলাফেরা করিতেছি। এরোপ্লেনে চড়িয়া মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় অতি দ্রুত অবলীলাক্রমে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতেছি। ফটোগ্রাফি, চলচ্চিত্র প্রভৃতি এখন এতই সুপরিচিত যে, পৃথিবী একদিন যে ইহাদের সাহায্য হইতে বঞ্চিত ছিল, তাহা যেন আমরা কল্পনাও করিতে পারি না।

বিজ্ঞানগুরু নিউটন মহাকর্ষের নিয়ম আবিষ্কার করিয়া সৌরজগতের জটিল রহস্য ভেদ করিয়াছিলেন। পরবর্তী বিজ্ঞানীরা প্রিজম্, বর্ণালীবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে দূর-দূরান্তে অবস্থিত জ্যোতিষ্কের আয়তন, উপাদান, আকৃতি, দূরত্ব ও গতিবেগ সম্বন্ধে এত তথ্য জানিতে পারিয়াছেন যে, আজ মানুষের গ্রহান্তরে যাইবারও সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

রসায়ন-বিজ্ঞানেরই বা কত কথা বলিব? নিত্যব্যবহার্য সাবান, জীবাণুনাশক ফিনাইল, ক্লোরিন, কীট-পতঙ্গনাশী ডি. ডি. টি, গ্যামাক্সিন, কৃত্রিম সার, প্লাষ্টিক, নানারকম গ্যাস, বহুবিধ যৌগিক পদার্থ, বিভিন্ন ঔষধের উৎপাদন রসায়নবিদ্ই তো আমাদের দিয়াছেন! রসায়ন-বিজ্ঞানী যেন ইন্দ্রজাল জানেন! বায়ুমণ্ডল হইতে তিনি উৎপন্ন করিয়াছেন প্রচুর নাইট্রোজেন, আলকাত্‌রার মত কালো জিনিষ হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন কত রকমের রং, কত সুগন্ধি দ্রব্য, কত ঔষধ!

পদার্থ ও রসায়ন-বিজ্ঞান চিকিৎসাশাস্ত্রকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করিয়া মানুষকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করিতেছে। রেডিয়াম এখন মারাত্মক ক্যান্সার রোগের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত। রঞ্জেনরশ্মি করিয়াছে শরীরের অদৃশ্য অংশকে পরিদৃশ্যমান। ক্লোরোফর্ম ও লিষ্টারের অ্যান্টিসেপ্টিক আবিষ্কারের ফলে কঠিন অস্ত্রোপচার আজ সহজসাধ্য। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে চক্ষুর অগোচর জীবাণুরাজ্যের সন্ধান পাইয়াছেন বৈজ্ঞানিক। জীবাণুতত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে নানারকম ভ্যাক্সিন ও সিরাম, মারাত্মক সংক্রামক রোগ দমন করিয়া মহামারী হইতে মানুষকে করিয়াছে পরিত্রাণ। পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, ক্লোরোমাইসেটিন ইত্যাদি আজ রোগদমনে চিকিৎসকের হাতে ব্রহ্মাস্ত্র।

মানবসভ্যতার বিকাশকে দ্রুততর করিয়াছে আর একটি আবিষ্কার। সেইটি হইল মুদ্রাযন্ত্র। ইহার সাহায্যে দ্রুত মুদ্রিত গ্রন্থরাজি সকলেরই সহজলভ্য হইয়াছে। এই যন্ত্রের চরমোৎকর্ষ হইয়াছে রোটারি মুদ্রাযন্ত্রে। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও টেলি-প্রিন্টার দ্বারা সংগৃহীত সমস্ত জগতের খবর বুকে করিয়া চিত্রসম্বলিত সংবাদপত্র এই যন্ত্রে ঘণ্টায় লক্ষ লক্ষ মুদ্রিত হইতেছে ও লোকের দুয়ারে দুয়ারে জ্ঞান বিতরণ করিতেছে।

কিন্তু প্রকৃতির রহস্য মন্থন করিয়া শুধু অমৃতই উঠে নাই, উঠিয়াছে তীব্র হলাহলও। ডেষ্ট্রয়ার, ক্রুজার, সাবমেরিন, টর্পেডো, ডেপ্‌থ্‌চার্জ, চুম্বকমাইন, বিষবাষ্প, হাউইজার, বিমানধ্বংসী কামান, অগ্নিবোমা, উড়ন্তবোমা এবং ভীষণ হইতে ভীষণতর পারমাণবিক বোমার গরলে মানবসভ্যতার সর্বাঙ্গে বিবর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

পরমাণু-বোমা মানবের ভাগ্যাকাশে কালান্তকরূপী কুগ্রহ। এই বিভীষিকা রূপ লইয়া দেখা দিল বিংশ শতকের পরমাশ্চর্য আবিষ্কার। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জড়-পরমাণু হইতে এই শক্তির উদ্ভব। অফুরন্ত ইহার শক্তি। নাগাসাকি ও হিরোসিমায় ইহার প্রলঙ্কর রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সৃজন ও কল্যাণে প্রযুক্ত হইলে এই অপরিমিত শক্তি একদিন আনিবে মানবসভ্যতার আর এক নবযুগ।

পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ভূবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, শারীরবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, খনিজবিদ্যা প্রভৃতি বহু শাখা-প্রশাখার বিস্তৃত বিজ্ঞান-মহীরুহের প্রতিটি শাখাই আজ ফলে ফুলে অপরূপ। প্রত্যেক শাখার আবিষ্কৃত তত্ত্ব ও তথ্যাদি অপর শাখার পুষ্টিসাধন করিয়া সভ্যতার অগ্রগতিতে সাহায্য করিতেছে। বিজ্ঞানের আজিকার এই অগ্রগতিতে পদার্থবিদ্যার দানই যে সর্বাধিক তাহা অনস্বীকার্য। কারণ পদার্থবিদ্যা জড়ের ধর্ম নির্ণয় তো করিতেছেই আবার আমাদিগকে অফুরন্ত শক্তির উৎসেরও সন্ধান দিতেছে। শব্দ, আলোক, বিদ্যুৎ, চুম্বক, ইথার, অণু-পরমাণু প্রভৃতির গতি ও প্রকৃতি নির্ণীত হইবার ফলে আমরা পাইয়াছি ফটোগ্রাফ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও, অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, এমন কি—মানুষের মস্তিষ্কের ন্যায় কার্যক্ষম ইলেক্‌ট্রনিক্‌স্ যন্ত্রাদি। আরও পাইয়াছি সবাক চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন। পারমাণবিক শক্তি আবিষ্কারের কথা বাদ দিলে টেলিভিশন একটি অতি আধুনিক পরমাশ্চর্য আবিষ্কার। রেডিও যন্ত্র আজ আমাদের ঘরে ঘরে। শূন্যপথে প্রেরিত কথাবার্তা ও গান ইহাতে আমরা শুনি। বেতারযন্ত্রে প্রেরিত স্থিরচিত্রও আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু টেলিভিশন যন্ত্রের দ্বারা তারের সাহায্য ব্যতীত দূর-দূরান্ত হইতে সবাক চলচ্চিত্রও দেখা সম্ভব হইয়াছে। এই টেলিভিশন সম্বন্ধেই কিছু বলিতেছি।

বেতারবার্তায় শব্দ-তরঙ্গকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে রূপান্তরিত করিয়া প্রেরণ করা হয়; তাহাই আমরা শুনি। কিন্তু শোনা ও দেখার মধ্যে পার্থক্য আছে। উচ্চ-নীচভেদে শব্দ আমরা পর পর শুনি, কিন্তু দৃশ্য বস্তু হইতে প্রতিফলিত আলোর সবটুকুই চোখে পড়িয়া দৃশ্যটিকে পরিস্ফুট করে। আমাদের চোখের উপর প্রতিভাত কোন দৃশ্য চোখের সম্মুখ

হইতে অপসারিত হইয়া যাইবার পর এক সেকেণ্ডের পঁচিশ ভাগের একভাগ সময় পর্যন্ত আমরা তাহা দেখিতে পাই। কেহ নড়াচড়া করিলে প্রতিমুহূর্তে তাহার অঙ্গসংস্থান বদলায়। কিন্তু আমরা তাহার প্রত্যেক মুহূর্তের চিত্রটি দেখি না। একটা অবস্থা মিলাইয়া যাইতে না যাইতে পরমুহূর্তের ঈষৎ পরিবর্তিত অবস্থার চিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। তাহাতেই আমরা তাহার নড়াচড়া দেখিতে পাই। প্রাণহীন ছবিকে জীবন্তের মত করিয়া তুলিবার মূলে রহিয়াছে চোখের এই ধাঁধা সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা।

চোখের ও কানের ধর্ম বিভিন্ন বলিয়া শব্দ ও চিত্র, বিশেষ করিয়া সক্রিয় চিত্র পাঠাইবার প্রণালীও বিভিন্ন। আমরা সাধারণতঃ ফটোতে ঘন, ফিকা প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের কালো ও সাদা রঙের সমাবেশে প্রতিকৃতির সুস্পষ্ট রূপ দেখিতে পাই। ফটোগ্রাফিক ফিল্মের উপর পদার্থ হইতে প্রতিফলিত আলোর হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে এই বর্ণপার্থক্য হয়। ধ্বনিত স্বর পর পর বিভিন্ন তরঙ্গ সৃষ্টি করে এবং বেতারে ইহা পর পর প্রেরিত হয়। কিন্তু প্রতিফলিত আলোর দ্বারা গঠিত চিত্র যদি একবারে সবটা পাঠাইতে পারা যায়, তাহা হইলে এককালে বিভিন্ন পরিমাণের আলোক বিদ্যুৎ-তরঙ্গে পরিণত হইয়া যে সংঘাত উৎপন্ন করিবে, তাহাতে গ্রাহকযন্ত্রে চিত্র লেপিয়া মুছিয়া বা ঝাপ্‌সা হইয়া যাইবে। তাই টেলিভিশন যন্ত্রে দৃশ্য হইতে প্রতিফলিত আলোর সবটুকুকেই একবারে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে পরিবর্তিত করিয়া প্রেরণ করা হয় না। শব্দের ন্যায় পর পর বিভিন্ন পরিমাপের তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া প্রেরণ করা হয়।

টেলিভিশন-ক্যামেরার লেন্সের মধ্য দিয়া দৃশ্যটি হইতে প্রতিফলিত আলো ক্যামেরার মধ্যস্থিত এমিট্রন যন্ত্রের সাহায্যে ইলেক্‌ট্রনরশ্মির প্রবাহ উৎপন্ন করে। এই প্রবাহকে অ্যাম্‌প্লিফায়ার যন্ত্রের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ঈথারসমুদ্রে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। গ্রাহক যন্ত্রের আকাশ-তারে পতিত হইয়া এই তরঙ্গ অ্যাম্‌প্লিফায়ারের মধ্য দিয়া ক্যাথোড রশ্মির টিউবে চালিত হয় এবং একটি আলোর ফুট্‌কি গ্রাহকযন্ত্রের পর্দায় অতি দ্রুত যাতায়াত করিয়া চলচ্চিত্রটি দৃশ্যমান করিয়া তোলে। বিদ্যুৎপ্রবাহের তারতম্য অনুযায়ী সাদা, কালো ও ধূসর রঙে ছবিটি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ছবির সঙ্গে বেতার যন্ত্রে শব্দ প্রেরণের নিয়মে শব্দও প্রেরিত হইতে থাকে এবং গ্রাহক যন্ত্রে তাহা ছবির সঙ্গে ধরা পড়ে। শব্দ ও আলোক-তরঙ্গ যাহাতে সংঘাত সৃষ্টি না করে, এমনভাবে উভয় তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের তারতম্য করা হয়। সাদা-কালো ছাড়া টেলিভিশনে রঙীন চলচ্চিত্রও দেখান সম্ভব হইয়াছে। এই অপূর্ব বিস্ময়কর যন্ত্রটির সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে নিপ্‌কো, বেয়ার্ড, ভ্লাডিমির, জোয়ারকিন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা।

বিজ্ঞানীদের যেমন চেষ্টার শেষ নাই, মানবসভ্যতা বিকাশে বিজ্ঞানের দানেরও

সীমা নাই। আজিকার মানুষের খাদ্য, পানীয়, পরিধেয়, বাসগৃহ, গৃহসজ্জা, স্বাস্থ্যরক্ষা, চলাফেরা, এমন কি, তাহার মনের গঠনও বিজ্ঞানের দ্বারা কোন না কোন রকমে প্রভাবান্বিত। মানুষের যে দৃষ্টি ছিল একদিন স্থূল, বিজ্ঞানবলে তাহা হইয়াছে আজ সূক্ষ্ম। তাই মানুষ বহু দুর্বোধ্যকে বুঝিয়াছে, অজানাকে জানিয়াছে, বহু অদৃশ্যকে দেখিয়াছে; তাহার নিকট অসীম হইয়াছে সসীম। তাহার আয়ত্ত শক্তির নিকট প্রকৃতি নতি স্বীকার করিয়াছে। বিশাল বিশ্ব এখন তাহার নিকট সঙ্কুচিত। সভ্যতার ক্রমোন্নতির ধাপে ধাপে উঠিয়া আজ আমরা বিজ্ঞানের সমৃদ্ধতর যুগে বাস করিতেছি। বিজ্ঞান আমাদের ঐশ্বর্য দিয়াছে, স্বাচ্ছন্দ্য দিয়াছে, আনন্দ দিয়াছে, সুখ দিয়াছে—কিন্তু শান্তি দিয়াছে কি? যে বিজ্ঞান এত দিয়াছে, মানুষের অশুভ স্বার্থবুদ্ধি ও লোভ তাহাকে মানবসভ্যতা বিনাশের জন্য নিয়োগ করিতে ছাড়ে নাই। বিশ্বরহস্যকে জানিবার জন্য আবিষ্কার হইতে আবিষ্কারের পথে বিজ্ঞান একদিন যাত্রা সুরু করিয়াছিল; গতি তাহার আজও অব্যাহত ও দ্রুত। মানুষের কল্যাণবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া তাহার জয়যাত্রা সার্থক হউক।

শ্রীঅমিতেন্দ্রনাথ সরকার

ডাঃ হিদেকি ইউকাওয়া

পৃথিবীর মধ্যে যে সব বিজ্ঞানী পরমাণুসংক্রান্ত গবেষণায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন—ডাঃ হিদেকি ইউকাওয়া তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ১৯৫৩ সাল থেকে কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা গবেষণাগারের কাজে নিযুক্ত আছেন।

পরমাণুসংক্রান্ত গবেষণায় তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব হচ্ছে—পরমাণুর অন্যতম উপাদান মেসোন বা মেসোট্রনের আবিষ্কার। এই পদার্থটি ওজনে ইলেকট্রন অপেক্ষা ভারী। ডাঃ ইউকাওয়াই এই অনাবিষ্কৃত উপাদানটির অস্তিত্ব সর্বপ্রথম আবিষ্কার করে বিশ্ববিখ্যাত হন। এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্যে তাঁকে ১৯৪৯ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, জাপানীদের মধ্যে ডাঃ ইউকাওয়াই সর্বপ্রথম পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৩৫ সাল পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন—এই তিনটি পারমাণবিক উপাদানের কথাই জানতেন। কিন্তু ১৯৩৫ সালে ডাঃ ইউকাওয়াই সর্বপ্রথম পরমাণুর আর একটি উপাদানের অস্তিত্বের আভাস দেন এবং সে সময়ে তিনি এই সম্পর্কে কতকগুলি ধারাবাহিক গাণিতিক প্রবন্ধও রচনা করেন। এই পারমাণবিক চতুর্থ

উপাদানটি বর্তমানে মেসোন বা মেসোট্রন নামে পরিচিত। আমেরিকা, বৃটেন প্রভৃতি দেশের বিজ্ঞানীরা ডাঃ ইউকাওয়ার এই আবিষ্কারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তারপরে তিনি পারমাণবিক শক্তিতত্ত্ব ও কোয়ান্টাম থিয়োরীর মূল সূত্র সম্পর্কে গবেষণা করতে থাকেন।

জাপানের রাজধানী টোকিও সহরে ১৯০৭ সালে হিদেকি ইউকাওয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক। তাঁর

ডাঃ হিদেকি ইউকাওয়া

অন্য তিন ভাইও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৯ সালে ইউকাওয়া পদার্থ-বিজ্ঞানে এম. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন এবং ১৯৩২ সালে তিনি কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে লেক্‌চারার হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। এই সময়ে তিনি ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। এর পরে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিদর্শন করেন এবং সেখানকার বিজ্ঞানীদের নিকট পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বক্তৃতা দেন।

১৯৩৯ সালে ডাঃ ইউকাওয়া কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে তিনি টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা করেন।

১৯৪৮ সালে ডাঃ ইউকাওয়া নিউজার্সির প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড্ ষ্টাডি নামক প্রতিষ্ঠানের ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে আমন্ত্রিত হন। ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তিনি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন।

প্রোগ্রেস অব থিয়োরেটিক্যাল ফিজিক্স নামক পত্রিকাটি তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পদার্থ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত বহু মূল্যবান প্রবন্ধাদি তিনি লিখেছেন। ১৯৪০ সালে জাপানী অ্যাকাডেমী তাঁকে ইম্পিরীয়াল প্রাইজ দিয়ে সম্মানিত করে এবং ১৯৪৩ সালে তিনি লাভ করেন অর্ডার অব ডেকোরেশান অব জাপান'। ডাঃ ইউকাওয়া জাপানী অ্যাকাডেমীর সদস্য ও আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটির একজন ফেলো। এছাড়াও তিনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন।

জানবার কথা

১। সূর্যের আলোর সাহায্যে কোন বস্তু আমাদের চোখে দৃশ্যমান হয়। এথেকে হয়তো মনে করা স্বাভাবিক যে, সূর্য থেকে বিকিরিত আলো প্রতিফলিত হয়ে সবটুকুই মানুষের চোখে ধরা পড়ে। আসলে কিন্তু তা নয়। বিজ্ঞানীদের মতে, সূর্যের
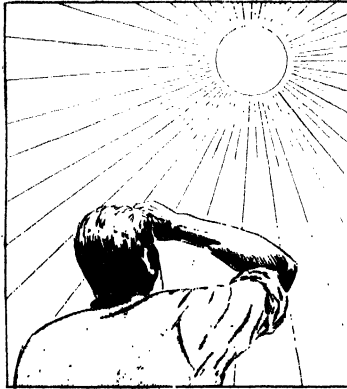
১নং চিত্র

আলোর কেবলমাত্র শতকরা ৩৮ ভাগ মানুষের চোখে ধরা পড়ে। আর একটা কথা, খুব বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট অবলোহিত আলোকরশ্মি বা ইনফ্রারেড-রে এবং খুব ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট অতিবেগুনী আলোকরশ্মি বা আলট্রাভায়োলেট-রে সূর্যালোকেরই অংশ। এরা কিন্তু মানুষের চোখে ধরা পড়ে না।

২। পিঁপড়ে আমাদের অত্যন্ত পরিচিত জীব। এদের বিচিত্র জীবনযাত্রাপ্রণালী তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো দেখে থাকবে। এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এরা সবাই সামাজিক শৃঙ্খলা মেনে চলে। লড়াই ও সাংসারিক কাজকর্মে এদের নৈপুণ্যের কথা সুবিদিত। তাছাড়া শারীরিক আয়তনের তুলনায় পিঁপড়েরা সাধারণতঃ খুব বেশী
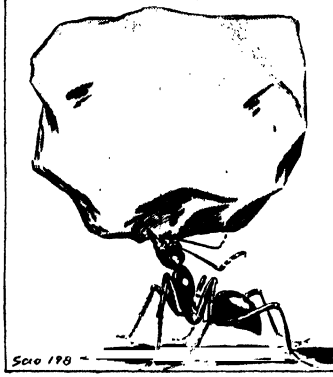
২নং চিত্র

শক্তিশালী হয়ে থাকে। কিন্তু হার্ভেষ্টার অ্যান্ট নামে একজাতীয় পিঁপড়ের দৈহিক ক্ষমতা খুবই বিস্ময়কর। এরা যে সব কাঁকর অনায়াসে উত্তোলন করে, তা এদের শরীরের চেয়ে প্রায় ৫২গুণ ওজনে বেশী। মানুষ যদি চার টন ভারোত্তলন করতে পারে তবে তা গড়পড়তায় পিঁপড়ের এই ভারোত্তলনের পরিমাণের সমান হবে।

৩। তোমরা মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে অস্বাভাবিক দীর্ঘাকার মানুষের কথা পড়ে থাকবে। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘতম ব্যক্তি যে কে, তা সঠিকভাবে জানা সম্ভব
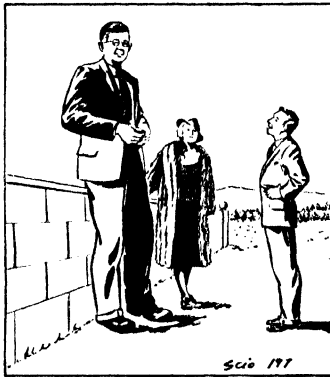
৩নং চিত্র

হয় নি। তবে যতদূর জানা গেছে—আমেরিকার অধিবাসী রবার্ট ওয়াডলোই নাকি দীর্ঘতম ব্যক্তি ছিলেন। এঁর উচ্চতা ছিল আট ফুট সাড়ে নয় ইঞ্চি। ইনি ১৯৪০ সালে মারা যান।

৪। ডেনমার্কের অধিবাসী বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নীল্‌স্ বোর ইউ. এস. ফোর্ড মোটর কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত 'পরমাণু শক্তির শান্তিকালীন প্রয়োগ' পুরস্কার পেয়েছেন। পরমাণুসংক্রান্ত গবেষণায় মূল্যবান অবদানের জন্যে তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

৪নং চিত্র

এই পুরস্কারের মূল্য ৭৫,০০০ ডলার। বর্তমানে নীল্‌স্ বোরের বয়স ৭১ বছর। তিনি ১৯২২ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বর্তমানে পরমাণুসংক্রান্ত গবেষণায় যে সব বৈজ্ঞানিক পৃথিবীতে শীর্ষস্থান লাভ করেছেন, তন্মধ্যে তিনি অন্যতম।

৫। প্রত্যেক জীবই তাদের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে কিছুক্ষণ বিশ্রামে কাটায়। শারীরিক ক্লান্তি দূর করবার জন্যে এই বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু পৃথিবীতে এমন

৫নং চিত্র

প্রাণীরও সন্ধান পাওয়া গেছে, যারা দিন-রাত্রি চব্বিশ ঘণ্টাই জীবনধারণের প্রয়োজনে কাজ করে থাকে; বিশ্রাম নেয় না মোটেই। আটলান্টিক মহাসাগরে ম্যাকারেল নামক একজাতীয় মাছ দেখা যায়। এরা চব্বিশ ঘণ্টাই সাঁতার কাটে। সাঁতার কাটা বন্ধ করলেই এরা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। এদের রক্তে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন

সরবরাহের জন্যে সর্বদাই এদের কান্‌কোতে তীব্রবেগে জল প্রবাহিত হওয়া প্রয়োজন। সেজন্যেই এরা বিশ্রাম না নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টাই সাঁতার কাটে।

৬। প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিরাপত্তার জন্যে আভ্যন্তরীণ বহু বিষয়ে গোপনীয়তা অবলম্বন করে থাকে। যেমন বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে, অনেক রাষ্ট্রই পরমাণু-বোমা, হাইড্রোজেন-বোমা প্রভৃতি অস্ত্রাদি সম্পর্কিত পরীক্ষার আসল ফলাফল ব্যক্ত করে না। খুব কড়া পাহারায় এসব অস্ত্রাদি রাখা হয়। এসব গুপ্ত সংবাদ কেউ যদি বাইরে ফাঁস করে দেয় তবে তাকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসাবে সাধারণতঃ প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। ইতিহাসে দেখা যায়, প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যেও সব রকম মানচিত্র সম্পর্কে খুব গোপনীয়তা

৬নং চিত্র

অবলম্বন করা হতো এবং মানচিত্রগুলিকে খুব কড়া পাহারায়ও রাখা হতো। যদি কেউ এই মানচিত্র চুরি বা নকল করার ব্যাপারে ধরা পড়তো তবে তাকে রাজদ্রোহী হিসাবে অভিযুক্ত করা হতো। তৎকালে রাস্তা, বন্দর ইত্যাদির সঠিক মানচিত্র খুব দুর্লভ ছিল। আজকাল সবাই মানচিত্রের সাহায্য নিয়ে নানা কাজ সম্পন্ন করছে।
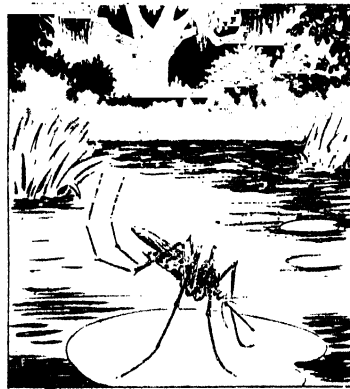
৭নং চিত্র

৭। ম্যালেরিয়ার জীবাণুবাহী মশকের আধিপত্য পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই আছে বলা

চলে। জলাভূমি বা স্যাঁৎসেঁতে অঞ্চল থেকে মরুভূমির উত্তপ্ত অঞ্চল পর্যন্ত সর্বত্রই এদের অভিযান চলে। বাংলাদেশে এদের দাপটের কথা আমাদের ভালভাবেই জানা আছে! স্ত্রী-মশকেরাই কেবল ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে। এরা সাধারণতঃ বিভিন্ন ফলও উদ্ভিদের রস পান করে। অবশ্য অন্যান্য জাতের মশকেরা এদের মত উদার প্রকৃতির নয়—তারা দংশনের পর রীতিমত রক্ত পান করে থাকে।

৮। নিশাচর প্রজাপতিকে মথ বলা হয়। এদের ডানা ভারী এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শোঁয়ায় আবৃত। মথেরা কোন জায়গায় বসবার সময় ডানা মেলে রাখে। মথের শোঁয়াপোকার গুটি থেকে রেশম, তসর, গরদ, মুগা, এণ্ডি, মটকা প্রভৃতি কাপড়ের

৮নং চিত্র

সূতা প্রস্তুত করা হয়। এদের বাচ্চাদের ভোজন ক্ষমতার কথা শুনলে বিস্মিত হতে হয়। মাত্র ছয়টা মথের বাচ্চা এক বছরের মধ্যে যে পরিমাণ খাদ্য খায় তার ওজন হচ্ছে একটা ঘোড়ার ওজনের সমান।

৯। আজকাল অনেক রকমের সূক্ষ্ম সময়-নিরূপক ঘড়ির কথা শোনা যায়। ঘড়ি তৈরীর ইতিহাসে এই সাফল্য লাভ করতে মানুষের সময় লেগেছে ৫,০০০
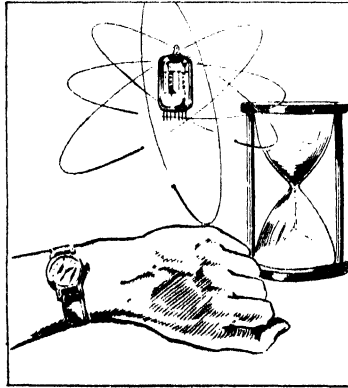
৯নং চিত্র

বছর। ৫,০০০ বছর আগে থেকেই সঠিকভাবে সময় নিরূপণ করবার জন্যে মানুষের চেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল।

বিবিধ

দক্ষিণ মেরুতে অভিযাত্রী দল

দক্ষিণ মেরুতে যে আমেরিকান অভিযাত্রীদল প্রেরণ করা হইয়াছে তাঁহারা দক্ষিণ মেরুর পর্বতমালা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবেন। ঐ পর্বতমালায় কোনদিন কোনও মানুষ পদার্পণ করিয়াছে কিনা সন্দেহ।

আন্তর্জাতিক ভূপ্রাকৃতিক বৎসর উপলক্ষ্যে দক্ষিণ মেরুতে এই অভিযান প্রেরণ করা হইয়াছে। তথায় বহু প্রকারের পর্যবেক্ষণ ও তথ্যানুসন্ধানের কাজ পরিচালিত হইতেছে। আগামী বৎসর শরৎ কালে বার্ড কেন্দ্র হইতে সেন্টিনেল পর্বতমালা পর্যন্ত একটি অভিযাত্রীদল প্রেরণ করা হইবে। উক্ত দলটি ট্র্যাক্টর যোগে গমন করিবেন এবং সেন্টিনেল পর্বতমালা পর্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিতে তাঁহাদের ১০০০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে। দক্ষিণ মেরু মহাদেশটি যে বরফের চাদরে ঢাকা থাকে সেটি কতখানি পুরু তাহা নির্ধারণ করাই প্রধানতঃ ঐ অভিযানের উদ্দেশ্য।

সেন্টিনেল পর্বতমালা ১৩,০০০ ফুট উচ্চ, কিন্তু উহার অতি সামান্য অংশই বরফের উপরে বাহির হইয়া থাকে। বার্ড কেন্দ্রটি ১০,০০০ ফুট গভীর বরফের উপর অবস্থিত, যদিও সমুদ্র হইতে উচ্চতা মাত্র ৩০০০ ফুট।

বার্ড কেন্দ্রে যে পাঁচ মাস আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করা হইয়াছে তাহাতে ঐ পাঁচ মাসে সর্বনিম্ন তাপ দাঁড়াইয়াছে শূন্য ডিগ্রীর নীচে ৬৮ ডিগ্রী (ফারেনহাইট)। ইহা ঘটে এপ্রিল মাসে। মে মাসে অকস্মাৎ তাপ খুব বৃদ্ধি পাইয়া শূন্য ডিগ্রীর উপরে ১৯॥ ডিগ্রী (ফারেনহাইট) পর্যন্ত উঠে। মে মাসেই দক্ষিণ মেরুতে পুরা শীতকাল।

কঠিন পশুরোগের ঔষধ আবিষ্কার

লণ্ডনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় যে, বৃটেনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা-কর্মীরা বহুদিনের অক্লান্ত গবেষণার ফলে গবাদি পশুর এক কঠিন রোগের ঔষধ আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

রোগটি হইল একপ্রকার সাংঘাতিক ধরণের ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া। গবাদি পশুর ফুস্‌ফুস ও শ্বাস-নালীর মধ্যে একপ্রকার পরজীবী কীটাণু বাস করে এবং বংশবৃদ্ধি করিয়া উক্ত রোগের সৃষ্টি করে। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় এই রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কেবল বৃটেনেই এই রোগের ফলে বৎসরে কম করিয়া ৩,০০০,০০০ পাউণ্ড ক্ষতি হয়।

সম্প্রতি ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজের বৈজ্ঞানিকেরা উক্ত রোগের একটি ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। চাষীরা এই ঔষধ রোগাক্রান্ত পশুকে খাওয়াইয়া দিতে পারে অথবা পশু-চিকিৎসকেরা ইঞ্জেকসন করিয়া দিতে পারেন। তিন সপ্তাহ ধরিয়া তিনটি ডোজ ঔষধ প্রয়োগ করিলেই পশুরা রোগমুক্ত হয়। মাঝে মাঝে ঔষধটি প্রয়োগ করিলে উহা প্রতিষেধকের কাজ করে।

ঔষধটি পরজীবী কীটাণুসমূহ ধ্বংস করে বটে, কিন্তু উহাদের আক্রমণে ফুস্‌ফুসের যে ক্ষতি হয় তাহা সারাইয়া তুলিতে পারে না। সুতরাং আই-সি-আই-এর জনৈক মুখপাত্র বলেন, রোগ ধরা পড়িবার পর যত তাড়াতাড়ি উহা প্রয়োগ করা যায় ততই ভাল।

সাধারণতঃ গরু, মহিষ ও শূকরেরা এই রোগে আক্রান্ত হয়। কিন্তু উহারা ছাড়াও কুকুর, বিড়াল,

হরিণ, উট, শিয়াল, বেজী প্রভৃতি গৃহপালিত ও অন্য প্রাণীসমূহের মধ্যেও এই রোগ দেখা যায়।

ফসল বিনষ্টকারী কীটপতঙ্গ

ফসল বিনষ্টকারী কীটপতঙ্গ ধ্বংস করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিমানের সাহায্য গ্রহণ করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে ফসল রক্ষার কাজে বিমানের সাহায্য গ্রহণ, ইহাই প্রথম।

প্রকাশ যে, পলাশী অঞ্চলে ৬০০০ একরব্যাপী ইক্ষুর ক্ষেত্রে 'ষ্টেম-বোরার' নামক একপ্রকার অনিষ্টকারী কীট ইক্ষুপাতা খাইয়া ও অন্য প্রকারে নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। ঐ কীট মারিবার জন্য বিমান হইতে কীটধ্বংসী পাউডার ইক্ষুর পাতার উপর ছড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। কেন্দ্রীয় ফসলরক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ঐ বিমানখানি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কয়েক দিনের জন্য দেওয়া হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষিমন্ত্রী ডাঃ আর আমেদ ঐ সম্পর্কে জানান যে, বিমান হইতে কীটবিধ্বংসী পাউডার ছড়াইয়া বিশেষ সুফল পাওয়া যাইতেছে। গত ২৭শে মে হইতে ঐ কাজ সুরু হইয়াছে এবং ৬০০০ একর জমিতে পাউডার ছড়াইবার কাজ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

মরু অঞ্চলের জলাশয়সমূহের বাষ্পীভবন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা

রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে কম খরচে জলের বাষ্পীভবন নিবারণ করা যায় কিনা, আমেরিকার কলোরেডোর র‍্যাটলস্নেক জলাশয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে বলিয়া আভ্যন্তরীণ বিভাগের সেক্রেটারী ফ্রেড ই, সীটেন জানাইয়াছেন। ইহাতে কৃতকার্য হইলে পৃথিবীর মরু ও মরু-প্রায় অঞ্চলের জলাশয়সমূহের জল রক্ষা করা সম্ভব হইবে।

এই বিষয়ে গত বৎসর ওক্লাহোমায় পরীক্ষা-কার্য সুরু হয় এবং উহাতে আভ্যন্তরীণ বিভাগের ব্যুরো অব রিক্লেমেশন কয়েকটি সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করেন।

গবেষণাগারে পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে, জলের উপরিভাগে হেক্স ডি ক্যানল নামে একপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য আস্তরণ হিসাবে প্রয়োগ করিলে সেই জলাশয়ের অন্ততঃ ৬৫ ভাগ বাষ্পীভবন নিবারণ করা যাইতে পারে। এই রাসায়নিক দ্রব্যে জলজ প্রাণী অথবা মানুষ, কাহারও কোন ক্ষতি হয় না। জলের ঢেউ, বায়ুপ্রবাহ এবং সূর্যালোক এই আস্তরণ অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ। এই সকল বিষয় এবং এই দ্রব্যটির প্রয়োগ সংক্রান্ত আনুসঙ্গিক সমস্যা সম্পর্কে বর্তমানে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।

নিভেলিতে লিগ্‌নাইট উত্তোলনের ব্যবস্থা

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু মাদ্রাজ রাজ্যের দক্ষিণ আর্কট জেলায় কুড্ডালোরের নিকটস্থ নিভেলিতে লিগ্‌নাইট (বাদামী রঙের কয়লা) কয়লার খনি হইতে লিগ্‌নাইট আহরণের উদ্বোধন করিয়া দক্ষিণ ভারতের শিল্প প্রতিষ্ঠার সূচনা করিয়াছেন। ইহা ৭৭ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়সাধ্য এক বিরাট পরিকল্পনার অংশ। পৃথিবীতে সারের বৃহত্তম কারখানা স্থাপনও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ভবিষ্যতে অন্ধ্র, কেরল, মহীশূর ও মাদ্রাজের ৯ কোটি ৫৮ লক্ষ লোক সমন্বিত ২৪৮১৩০ বর্গমাইল আয়তনের স্থান এই পরিকল্পনার আওতায় আসিবে। ১৯৪৩-৪৪ সালে ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষা কর্তৃক ঐ অঞ্চলে অনুসন্ধান কালে প্রথমে লিগ্‌-নাইটের সন্ধান পাওয়া যায়।

বর্তমানে দেশের শক্তির চাহিদা খুব বৃদ্ধি পাওয়ায় উহা উৎপাদনের জন্য বিকল্প ইন্ধনের চাহিদাও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেই জন্য ভারত সরকার লিগ্‌নাইট আহরণের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

নিভেলি ও উহার আশেপাশে দুই শত কোটি টন লিগ্‌নাইট আছে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রতি বৎসর ৩৫ লক্ষ টন লিগ্‌নাইট উত্তোলিত হইবে বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। এই হারে ব্যবহার করা হইলে নিভেলির লিগ্‌নাইটে ৫৭ বৎসর চলিবে।

কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, ঐ অঞ্চলের অন্যান্য খনির লিগ্‌নাইটের হিসাব করিয়া ব্যয় করিলে ৫৭ বৎসর অপেক্ষা আরও অনেক অধিক কাল চলিবে।

লিগ্‌নাইট ভূপৃষ্ঠের ১৮০ ফুট নীচে অবস্থিত, উহা আহরণ একটা জটিল সমস্যা হইয়াছে ; কারণ লিগ্‌নাইট স্তরের উপরে জলের চাপ নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারিলে লিগ্‌নাইট আহরণ অসম্ভব। পরীক্ষামূলকভাবে কূপ খনন করিয়া এবং উহার মধ্য দিয়া অবিরাম জল পাম্প করিয়া ভূগর্ভে জলের চাপ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হইয়াছে।

ন্যায্য ব্যয়ে জলের চাপ নিয়ন্ত্রণের সম্ভাব্যতা প্রতিপন্ন হইবার পর ভারত সরকার প্রতি বৎসর ৩৫ লক্ষ টন লিগ্‌নাইট উত্তোলনের জন্য বহুমুখী লিগ্‌নাইট পরিকল্পনা করিয়াছেন।

এই পরিকল্পনায় লিগ্‌নাইট ব্যবহারের দ্বারা বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনকে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হইয়াছে। তজ্জন্য দুই লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-উৎপাদন ক্ষমতা বিশিষ্ট এক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইবে। ইহার জন্য ১৯ কোটি ৬০ লক্ষ হইতে ২১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

সার উৎপাদনকে পরিকল্পনায় দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হইয়াছে। আপাততঃ স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, প্রতি বৎসর ২ লক্ষ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট, নাইট্রেট এবং ৪৬ হাজার টন ইউরিয়া উৎপাদিত হইবে। সার উৎপাদনের জন্য তিরিচিরাপল্লী জেলার শিমসাম ব্যবহৃত হইবে।

এতদ্ব্যতীত লিগ্‌নাইট হইতে ৩ লক্ষ ৮০ হাজার টন কার্বনাইজ্‌ড্‌ বুকেট, ৪৩ হাজার টন চারডাষ্ট, ৬৪০০ টন মোটর স্পিরিট, ৫১৩০০ টন আলকাত্‌রা ও ১০৩২ টন ফেনল প্রস্তুত হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রতিবৎসর খনি হইতে যে লিগ্‌নাইট উত্তোলিত হইবে তাহা বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যে রূপান্তরিত হইবে। কার্বনাইজ্‌ড্‌ বুকেট একপ্রকার ধূমহীন জ্বালানী। ইহা গৃহস্থদের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট ইন্ধন। এতদ্ব্যতীত ইহা শিল্পেও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

নিভেলি হইতে অতিরিক্ত শক্তি ও ইন্ধন পাওয়া গেলে ঐ অঞ্চলে আরো নূতন নূতন শিল্প স্থাপিত হইতে পারে ; যথা—সালেম লোহার কারখানায় ব্যবহারের জন্য কোক উৎপাদন, কৃত্রিম পেট্রোল উৎপাদন, ঔষধ ও কীটঘ্ন দ্রব্যাদি উৎপাদন প্রভৃতি।

এতদ্ব্যতীত প্লাষ্টিক, চিনা মাটির দ্রব্যাদি ও সিমেণ্ট উৎপাদনও পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

এই পরিকল্পনার জন্য সরকার ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের বিশেষ ধরণের সাজসরঞ্জামের অর্ডার দিয়াছেন। খনিতে ব্যবহার্য প্রচলিত যন্ত্রসমূহের অধিকাংশ নিভেলিতে পৌছিয়াছে। অবশিষ্ট ২।৩ মাসের মধ্যে পৌছিবে।

কর্মী ও কর্মচারীদের জন্য বাসগৃহ এবং অফিস-সমূহ নির্মিত হইতেছে। স্থপতির পরিকল্পনা অনুযায়ী সহর নির্মিত হইতেছে।

১৯৬১ সালে খনি হইতে পূর্ণমাত্রায় লিগ্‌নাইট উত্তোলিত হইবে। লিগ্‌নাইট পরিকল্পনার পরিচালনা ভার গ্রহণের জন্য সরকার একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী গঠন করিয়াছেন। উহার সমস্ত শেয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের।

নূতন যন্ত্রের সাহায্যে প্রতি সেকেণ্ডে ৭০০ অক্ষর মুদ্রণ

অ্যাকাউন্টিং মেসিন বোর্ডের ছিদ্রগুলি হইতে তথ্য প্রোসেসিং, রেকর্ডিং এবং মুদ্রণ সম্পর্কে

আর একটি অতি দ্রুত কার্যক্ষম যন্ত্র বৃটেনে উদ্ভাবিত হইয়াছে।

ইহা বহু সংখ্যক লোকের কাজ অপেক্ষাকৃত কম সময়ে একাই সম্পন্ন করিতে পারে। ইহা যেমন মিনিটে ৩০০ কার্ড লইয়া কাজ করিতে পারে তেমনি কার্ড হইতে ৫০,০০০-এর অধিক সংখ্যা গ্রহণ করিতে পারে, প্রয়োজনমত যোগ বা বিয়োগ করিবার জন্য। ইহার রেকর্ডিং ইউনিট এক লাইনে ১৪০টি পর্যন্ত অক্ষরের ৩০০ লাইন এক মিনিটে, অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ৭০০ অক্ষর পর্যন্ত মুদ্রণ করিতে পারে।

যন্ত্রটি তাহার নিজের হিসাব সদাসর্বদা পরীক্ষা করিয়া দেখে বলিয়া তাহার হিসাবে কোন ভুল থাকিতে পারে না।

ইহার দ্রুততা এবং নির্ভুল হিসাব প্রদানের ক্ষমতা এবং বহুমুখিতার জন্য ইহা বাণিজ্য সংস্থায় এবং শ্রমশিল্পের হিসাবপত্রের বিশ্লেষণ সম্পর্কে বিশেষ উপযোগী বলিয়া সকলে মনে করেন। যন্ত্রটি অক্ষর রচনা করে ষ্টাইলাস পদ্ধতিতে এবং ফুট্‌কির সাহায্যে তাহার এই অক্ষর রচনার গতি হইল প্রতি সেকেণ্ডে ৩০৫ ষ্ট্রোক।

ইহার বহুমুখীতার একটি নিদর্শন হইল এই যে, যন্ত্রটি ২৬টি বর্ণের ইউরোপীয় ভাষা সম্পর্কে যেমন ব্যবহৃত হইতে পারে তেমনই ২৯টি বর্ণের সুইডিশ ভাষা সম্পর্কেও ব্যবহৃত হইতে পারে।

বার্লিন ইলেকট্রিসিটি কোম্পানীর নামে একটি যন্ত্র ইতিমধ্যে রপ্তানী হইয়াছে। যন্ত্রটির উৎপাদন মূল্য হইল ২০,০০০ পাউণ্ড।

এক সেকেণ্ডে ৩৩,০০০ যোগ

বৃটেনের জাতীয় পদার্থ বিজ্ঞান গবেষণাগারে এরূপ একটি নূতন ইলেকট্রনিক ব্রেন নির্মাণ করা হইতেছে যাহার সাহায্যে মাত্র এক সেকেণ্ডের মধ্যে ৩৩,০০০ যোগ করা সম্ভব হইবে। যন্ত্রটির নাম এ-সি-ই, অর্থাৎ অটোমেটিক কম্পিউটিং ইঞ্জিন। চার বৎসর পূর্বে পরীক্ষামূলকভাবে যে এ সি-ই যন্ত্রটি নির্মিত হইয়াছিল তাহার অনুকরণেই বর্তমান যন্ত্রটি নির্মাণ করা হইতেছে।

এরূপ দ্রুতগতিসম্পন্ন ও বৃহৎ কমপিউটিং যন্ত্র সারা পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। নিউক্লিয়ার ফিজিক্স্ সম্পর্কে গবেষণা, বিমানের পাখার কম্পন সম্পর্কে অনুসন্ধান প্রভৃতি কাজের জন্য এই যন্ত্র ব্যবহার করা হইবে। নূতন বাজেটের ফলে সংশোধিত আয়কর তালিকাসমূহ প্রণয়নের কাজ এই যন্ত্রের সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে সুসম্পন্ন হইবে।

বর্তমান বৎসরের শেষ ভাগে নূতন যন্ত্রটি চালু হইবে। ইহার সাহায্যে এক সেকেণ্ডের মধ্যে গড়ে ২০,০০০ অঙ্ক করা যাইবে এবং এরূপ জটিল গাণিতিক সমস্যাসমূহের সমাধান করা যাইবে যাহা বর্তমানে কোন কম্পিউটারের সাহায্যেই করা সম্ভব হয় না। ইহার মধ্যে ৬,০০০ ভাল্‌ব, ১৫ মাইল তার এবং ১,৫০০,০০০ টুক্‌রা-তথ্য মজুদ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা আছে।

পীতবর্ণ বারিবিন্দু

সিঙ্গাপুরের উপকণ্ঠে পীতবর্ণের বৃষ্টিপাত হইয়াছে। খৃষ্টমাস দ্বীপে বৃটেনের হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ সঞ্জাত তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশিই এই পীতবর্ণ বারিবিন্দু সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিতেছেন।

হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের ফলে এক কোটি ডিগ্রি তাপ সৃষ্টি

বৃটিশ সরবরাহ মন্ত্রী মিঃ ওবরে জোনস সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, প্রশান্ত মহাসগরে বিস্ফোরিত হাইড্রোজেন বোমা সম্পর্কে সে সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য এই পর্যন্ত আমাদের হাতে পৌছিয়াছে, তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, দশ লক্ষ টন টি. এন. টি, বিস্ফোরণের সমপরিমাণ বিস্ফোরণ এই হাইড্রোজেন বোমায় ঘটিয়াছে।

বৃটিশ হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের বৈজ্ঞানিক কর্মাধ্যক্ষ মিঃ কুক ঘোষণা করেন যে, কিছুদিন পূর্বে হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ-কালে এক কোটি সেন্টিগ্রেড তাপ সৃষ্টি হইয়াছিল।

বিস্ফোরণকার্যে নিযুক্ত সামরিক কর্মাধ্যক্ষ ভাইস এয়ার মার্শাল উলিয়ম ও মিঃ কুক উভয়েই ঘোষণা করেন যে, বিস্ফোরণটি সর্বতো-ভাবেই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

বিস্ফোরণের এক ঘণ্টার মধ্যেই ছবি তোলা হইয়াছে এবং আণবিক মেঘের নমুনা সংগ্রহ করিয়া গবেষণার জন্য তৎক্ষণাৎ লণ্ডনে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ক্যানবেরা জেট বিমানসমূহ বিস্ফোরণ হইতে উদ্ভূত বাষ্পপুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে সকল বাষ্পের নমুনা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। এ সকল বাষ্প সম্পর্কে খৃষ্টমাস দ্বীপে প্রেরিত বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষাকার্য চালাইয়াছেন। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা চালানো হইবে ইংল্যাণ্ডের অল্ডারম্যাষ্টন গবেষণা কেন্দ্রে।

বৈজ্ঞানিকগণের অভিমত হইতেছে এই যে, ক্ষুদ্রাকারের আণবিক বোমার বিস্ফোরণের ফলে ব্যাঙের ছাতার ন্যায় যে বাষ্পপুঞ্জ আকাশের দিকে উঠিতে থাকে তাহা ট্রপোপজ নামে পরিচিত বায়ুস্তর পর্যন্ত উঠিতে পারে না। কিন্তু গত ৩১শে মে যে ধরণের বোমা ফাটানো হইয়াছে তাহা হইতে উদ্ভূত বাষ্পপুঞ্জ ট্রপোপজ ভেদ করিয়া ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারে আরোহণ করে এবং প্রায় এক লক্ষ ফুট ঊর্ধ্বে উঠিয়া উহা স্থিরভাবে অবস্থান করে।

মিঃ কুক বলেন, প্রথম হাইড্রোজেন বোমাটির তুলনায় সম্প্রতি বিস্ফোরিত হাইড্রোজেন বোমাটি যে কেবলমাত্র আকারেই বড় ছিল তাহা নহে, বিভিন্ন দিক হইতে উহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। ভ্যালিয়েণ্ট জেট বিমানখানা ৪০ হাজার ফুট ঊর্ধ্বে উড়ন্ত অবস্থায় বোমাটি নিক্ষেপ করে। মৃত্তিকা হইতে কয়েক হাজার ফুট ঊর্ধ্বে বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রসার

গত এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে জাপানে ইনফ্লুয়েঞ্জার যে মৃদু আক্রমণ দেখা দেয়, তাহা দুই মাসের মধ্যে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে।

জাহাজ চলাচলের পথ ধরিয়া এই রোগ জাপান হইতে হংকং, সিঙ্গাপুর, ম্যানিলা, জাকার্তা ও সায়গনে আবির্ভূত হয় এবং অতঃপর বন্দরসমূহ হইতে তড়িৎগতিতে দেশের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করে। চীন, মালয়, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীনে অভিযান চালাইয়া উহা অতঃপর ভারত-পাকিস্থান উপমহাদেশের দিকে অগ্রসর হইয়াছে।

সিংহলে এই রোগের প্রসার রোধকল্পে বিভিন্ন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। এপ্রিলের মাঝামাঝি হংকংয়ে ২৫ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে চার লক্ষই শয্যাশায়ী হয়। মে মাসের প্রথমদিকে সিঙ্গাপুরে ৫০ হাজার লোক আক্রান্ত হয় এবং তন্মধ্যে চারজন মারা যায়। মে মাসের শেষের দিক ফিলিপাইনে ৪১ জন মারা যায়, তন্মধ্যে ম্যানিলাতেই মারা যায় ৩১ জন। এপ্রিল শেষের দিক প্রাপ্ত ফিলিপাইনের হিসাবে দেখা যায় যে, সেখানে ৮৫ জন মারা গিয়াছে। কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জার পরে ব্রঙ্কাইটিস ও ব্রঙ্কো নিউমোনিয়ার আক্রমণে মারা গিয়াছে প্রায় ২ শত জন।

জাকার্তা হইতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সমগ্র ইন্দোনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে এই সংক্রামক রোগ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রোগটি সিঙ্গাপুর হইতে সুমাত্রায় প্রথম আবির্ভূত হয়।

কাম্বোডিয়ায় মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। রোগের প্রসার রোধকল্পে বিদ্যালয় ও সিনেমাগৃহগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় উপমহাদেশেও এই রোগ আক্রান্ত হইয়া কিছু লোক মারা গিয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। এখন অবশ্য এই রোগের আক্রমণ কিছুটা কমিয়াছে।

নেভাদায় পারমাণবিক বিস্ফোরণ

লস ভেগাস (নেভাদা) হইতে প্রায় ৮০ মাইল মাইল উত্তর-পশ্চিমে উক্কা-সমতলক্ষেত্রে একটি তিন শত ফুট মঞ্চের উপরে গত ২রা জুন প্রত্যুষে ৪টা ৪৫ মিনিটের সময় (স্থানীয় সময়) একটি ক্ষুদ্র পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ করা হয়। বার বার বিলম্ব করিবার পর পারমাণবিক শক্তি কমিশন এই বিস্ফোরণ ঘটান।

বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে যে সমস্ত বিস্ফোরণ ঘটানো হইতেছে তন্মধ্যে এই বিস্ফোরণ দ্বিতীয় স্থানীয়। বিস্ফোরণের অল্প কিছুক্ষণ পরে একটি ক্ষুদ্র গোলাকার মেঘ প্রায় দশ হাজার ফুট ঊর্ধ্বে ভুলিতে থাকে।

বিস্ফোরণের পর কয়েকখানি বিমান আকাশে উড়িতে থাকে। বিস্ফোরণের ঝাপ্টায় যে মেঘের সৃষ্টি হয়, কয়েকখানি বিমান সেই মেঘের ভিতর দিয়াও উড়িয়া যায়।

বিস্ফোরণের স্থান হইতে ৮ মাইল দূরে থাকিয়া সৈন্যবাহিনীর প্রায় ২৫০ জন লোক বিস্ফোরণ পর্যবেক্ষণ করেন।

পর্যবেক্ষকগণ অনুমান করেন যে, এই বিস্ফোরণের ফলে দুই হইতে পাঁচ কিলোটন শক্তি সঞ্জাত হয়। এক কিলোটন এক হাজার টন টি-এন-টির সমান।

কতকগুলি শূকরছানা, বানর এবং ইঁদুর এই পারমাণবিক অগ্নির সম্পূর্ণ শক্তি সহ্য করে। বিস্ফোরণের স্থল হইতে দূরে দূরে নানা স্থানে প্রায় দুইশত শূকরছানা রাখা হইয়াছিল। গামা এবং নিউট্রন রশ্মি বিকিরণের সংস্পর্শে আসিলে তাহার ফল কিরূপ হয় তাহা অবগত হইবার উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিকেরা এই সকল শূকরছানার দেহের ভিতরে মিটার সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন।

ভ্রম সংশোধন—জুন সংখ্যায় প্রকাশিত 'অতীতের জীবনধারা' প্রবন্ধের ৩৫৬ পৃষ্ঠায় 'কোল' শব্দের স্থলে 'শেল' হইবে।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস ৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দশম বর্ষ | অগাষ্ট, ১৯৫৭ | অষ্টম সংখ্যা

পদার্থ বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক পটভূমিকা

শ্রীসুহাসচন্দ্র মৌলিক

বিশ্ব কি ?

বিশ্ব হলো দেশ ও কালের ফ্রেমে আঁটা একটা ছবি—চেতনার দৃশ্যপটে যার সমস্ত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ সব কিছু সৃষ্টি হচ্ছে জড় ও শক্তির সংঘাতে।

দেশ হলো অনন্তে বিস্তীর্ণ একটা ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্র, যার মধ্যে জড় ও শক্তি আবদ্ধ রয়েছে; আর সময় যেন স্রোতের মত তার মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। সময়ের হলো অনন্ত-যাত্রা—অনির্দেশের রথে সে যেন হাত-পা ছড়িয়ে আলসে হয়ে বসে আছে, আর তার খেয়ালী সারথী তাকে যেমন খুসী টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তার ফেলে যাওয়া চলার পথে সমগ্র বিশ্ব যেন একটা অজ্ঞাত পরিণতির দিকে একভাবে এগিয়ে চলছে—অতীত থেকে বর্তমানে, বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে। ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে, পৃথিবীতে দিন রাত আসছে—এমনি কতকগুলি অন্তর্বর্তী ঘটনা দিয়ে তার পদক্ষেপকে বুঝতে হবে।

বিশ্বকে জানতে হবে ঘটনার মাধ্যমে। একটা ঘটনা যেন কাল-সমুদ্রের উপর একটা বুদ্বুদ, যার অনুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে চেতনার প্রচ্ছদপটে, তার প্রক্ষেপ থেকে। এমনি অগুণতি ঘটনারাশি মালার পুঁতির মত সারবন্দীভাবে সময়ের ঢেউয়ের তালে তালে এগিয়ে যাচ্ছে।

একটা শেকলের প্রত্যেকটি আংটি যেমন আলাদা আলাদা, কিন্তু প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের একটা সজ্জাভুক্ত ঘনসন্নিবিষ্ট সংযোগ থাকায় তারা যেমন একটানা প্রসার নিতে পারে, বিশ্বের যাবতীয় ঘটনাবলীও যেন সে রকম সার বেঁধে এগিয়ে চলছে। বিজ্ঞানী শুধু তাদের মধ্যে শৃঙ্খলাটুকু আবিষ্কার করে যাবে।

তাহলে বিশ্বের গঠন-উপাদান হিসাবে মূলতঃ তিনটি জিনিষকে ধরতে পারি—

(১) জড়, (২) শক্তি, (৩) চেতনা।

এদের সম্মিলিত বিশ্বজগৎ হলো প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে। অসংখ্য ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে তার এই খেলাটা নিঃশব্দে দিনরাতই চলছে।

বিশ্বে কোন জিনিষই স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে নেই, একটা ব্যস্ততা বা চাঞ্চল্য তাদের সব সময়েই ইতস্ততঃ টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তাদের এই চাঞ্চল্য তাদেরই একটা স্বকীয় ধর্ম হিসাবে

স্বীকার করে নেওয়া যায় না, এর পেছনে থাকা চাই একটা অন্তর্বিরোধিতা। হেগেলীয় দর্শনে একে বলা হয়েছে Dialectics।

জড় ও শক্তি দুটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হলেও আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বে অবশ্য এদের সার্বভৌমিক স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে নেওয়া হয় নি। বলা হয়েছে—অস্তিমরূপে এরা এক এবং একাত্ম। জড় যেন ঘনীভূত শক্তির অন্তর্মুখী প্রকাশ, অথবা শক্তি যেন বাষ্পীভূত জড়ের বহির্মুখী পরিচয় মাত্র। আর তাছাড়া এরা স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল অস্তিত্বও নয়, কেন না এরা একে অন্যের আশ্রয়ী। শক্তিহীন জড় বা জড়হীন শক্তি মানুষের কল্পনাতীত। কিন্তু পরস্পর আশ্রয়ী, একে অন্যের অঙ্গীভূত এই যে জড় ও শক্তি, এরা একে অন্যের প্রতি নিষ্ক্রিয় নয়। জড়ের সঙ্গে জড়ের, শক্তির সঙ্গে শক্তির, জড়ের সঙ্গে শক্তির অথবা শক্তির সঙ্গে জড়ের একটা ক্রিয়া হচ্ছে। বিশ্বজগৎময় যে ব্যস্ততা বা অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায় তা হলো জড় ও শক্তির অন্তর্বর্তী দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত ঘটনা।

এই রকম অন্তর্দ্বন্দ্বে পড়ে দিন দিন যারা রূপান্তরিত হচ্ছে তাদের নিয়ে তিনটি স্বতন্ত্র জগতের কথা ভাবা যায়।

(১) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ (Sensuous World)
(২) সূক্ষ্মতম জগৎ (Microscopic World)
(৩) বৃহত্তম জগৎ (Macroscopic World)

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা অনুভূতির খুব সামনে যারা রয়েছে তাদের জানা যায় সহজ বোধশক্তি দিয়ে। কিন্তু দৃষ্টিসীমার বাইরে, অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলে অথবা অত্যন্ত বৃহৎ কিন্তু বহুদূরে বলে অদৃশ্য যারা, সহজ বোধশক্তি দিয়ে তাদের জানা যায় না। সেখানে বোধশক্তির সীমাটা বাড়াতে হবে এবং বিজ্ঞান সে কাজে একটা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছে।

তাহলে প্রকৃতির ঘরকন্নার বাইরের মহলে রয়েছে জড় ও শক্তি, আর ভিতরের অন্দর মহলে রয়েছে জড় ও শক্তিসঞ্জাত ঘটনারাশি। বাইরের মহলের কতকটা রয়েছে বিজ্ঞানীদের হাতের মধ্যে, কিন্তু ভিতরের অন্দর মহলে প্রবেশের কাজটা মোটেই সহজসাধ্য নয়। যেন দ্বাররক্ষীর কড়া পাহারায় সৃষ্টির আদিম কাল থেকে সেদিক অত্যন্ত দুর্ভেদ্য। যার ভাষা জানা নেই, তার গতিবিধি যেমন বুঝতে হয় তার অঙ্গভঙ্গী দিয়ে, প্রকৃতির রাজ্যের বিভিন্ন কার্যক্রমের সন্ধান করতে হবে তেমনি কতকগুলি ইঙ্গিত থেকে। তাই একমাত্র সংজ্ঞাবাহী ঘটনা যা প্রকৃতির দুর্ভেদ্য অন্দর মহলের খোলা জানালা দিয়ে বাইরে আসবার সুযোগ পায়, বিজ্ঞানীর যা কিছু কৌতূহল সে সব তার কাছ থেকেই মিটিয়ে নিতে হবে।

ঘটনাময় বিশ্ব থেকে সহজ ইঙ্গিতগুলিকে বিধিবদ্ধ উপায়ে বেছে নিয়ে তাদের যদি পাশাপাশি সাজানো যায় তাহলে মনে হবে যে, প্রকৃতি কোন কাজেই কিছুমাত্র খেয়ালী নয়।

রূপান্তর হলো জড় ও শক্তির পারস্পরিক অন্তর্দ্বন্দ্বের একটা মস্ত বড় দিক। পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদের সঙ্গে সঙ্গে জড়বস্তু তার আদল বদ্‌লে নিতে পারে। শক্তিও তেমনি অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রূপে বিকাশ লাভ করতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ার ও লোথার-মায়ার সর্বপ্রথম দেখান যে, এমন কোন রূপান্তর অসম্ভব যেখানে জড় ও শক্তি তাদের নিজেদের অস্তিত্ব চিরদিনের মত হারাতে পারে। যার ফলে বিশ্বে মোট পরিমাণ জড় ও শক্তির কোন দিন উদ্বৃত্ত হবে না বা ঘাটতি পড়বে না। জড় ও শক্তির এই যে নিত্যতা, এ হলো বিশ্বপ্রকৃতির চিরন্তন সংস্কার।

মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রে গতির প্রশ্ন যেখানেই উঠেছে সেখানেই দেখা গেছে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবার সময় জড় বস্তু কখনও কোন ঘোরাপথে চলে না, সবচেয়ে কম দূরের সহজ

পথ ধরে সে এগিয়ে চলে। প্রকৃতি এদিক থেকে বেশ শ্রমবিমুখ। কাজ করতে চাই, কিন্তু কার্যক্রমে কোনরূপ অহেতুক অতিরিক্ততা থাকবে না। অতিরিক্ত কাজের ব্যাপারে এই কুণ্ঠা শুধু মাত্র জড় বস্তুর মাধ্যাকর্ষণ-ক্ষেত্রে গতিবিধির বেলায়ই নয়, আলোকের জ্যামিতিক ধর্মের ঋজুরেখ গতির ক্ষেত্রেও সত্য। প্রকৃতির এই আলস্যপরায়ণতাকে বলা হয়েছে বিশ্ব আলস্যের নিয়ম (Law of Cosmic Laziness)। এও প্রকৃতির একটি চিরন্তন সংস্কার।

এ ছাড়া নিউটনের আপেল ফল চিরদিনই মাটিতে পড়েছে—আজও পড়ছে, কোথাও এই ঘটনার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় নি। তাপে পদার্থের সম্প্রসারণ ঘটে, এটা একটা চিরাচরিত ঘটনা, কোথাও এর অন্যথা নেই। দিনের পর রাত, রাতের পর দিন, পূর্ণিমার পর অমাবস্যা, অমাবস্যার পর পূর্ণিমা, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, ধূমকেতুর আবির্ভাব—প্রকৃতির রাজ্যের এই সব কিছু ঘটনাই অভ্রান্ত; অবস্থা না বদ্‌লালে এরা চিরস্থায়ী নিয়মের অন্তর্ভুক্ত।

প্রকৃতির রাজ্যে ঘটনার এই যে গতানুগতিক অভিব্যক্তি এথেকেই সৃষ্টি হয়েছে প্রকৃতির একানুবর্তিতা (Law of Uniformity of Nature)।

কিন্তু ঘটনা কি স্বয়ম্ভূ? বৃন্তচ্যুত আপেল ফল কি এমনিই মাটিতে পড়ে? মানুষের এই অনুসন্ধিৎসা থেকে আবিষ্কৃত হলো হেতুবাদ বা কার্য-কারণবাদ। ঘটনা থাকলে তার একটা কারণও থাকতে হবে। বস্তু যেখানে গতিশীল, সেখানে গতির একটা কারণও থাকতে হবে। কারণ-মুক্ত ঘটনা আর অস্তিত্বহীন স্থায়িত্ব—এই দুটাই সমান অর্থহীন।

প্রকৃতির একানুবর্তিতা আর কার্যকারণবাদের যুগ্ম রূপ হলো—নৈশ্চিত্যবাদ (Law of determinism)। ধনুকের জ্যামুক্ত তীর আয়ত্তের বাইরে হলেও তার ভবিষ্যৎ সুনির্ধারিত। তীরের ওজন, জ্যা-র শক্তি, বায়ুর প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি জানা থাকলে তীরের আগামী অবস্থিতির ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে।

নৈশ্চিত্যবাদ হলো যন্ত্রের ধর্ম। বিশ্বজগৎ তাই যেন নিয়মের নিগড়ে বাঁধা একটা যন্ত্রের মত। এর প্রত্যেকটি কলকব্জার গতি সুনিদিষ্টভাবে চলছে; অণু-পরমাণুর গতি, জ্যোতিষ্কের গতি বা প্রাকৃতিক যে কোন কার্যকলাপ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। প্রাক্ বিংশ শতাব্দীর নিউটন-গ্যালিলিও বিজ্ঞান এইরূপ একটা যান্ত্রিক দর্শনের (Mechanistic Philosophy) উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

কিন্তু এর পরে একটা প্রশ্ন উঠলো ব্যষ্টি ও সমষ্টির সমাধান নিয়ে।

বিজ্ঞানের একটা মস্ত বড় আশ্রয় হলো, অরোহ ও অবরোহ পদ্ধতি (Inductive and Deductive Methods)। অর্থাৎ কোন কোন সময়ে কতকগুলি সহজ পূর্ব-সিদ্ধান্ত থেকে আর একটা নতুন বিশেষ সিদ্ধান্তে বা সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা যায়, অথবা সার্বভৌমিক পূর্ব-সিদ্ধান্ত থেকে আর একটা নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

যেমন—তাপে লৌহের সম্প্রসারণ ঘটে;
সূচ লৌহের তৈরী;
∴ তাপে সূচের সম্প্রসারণ ঘটবে।

অথবা—তাপে পদার্থ মাত্রেরই সম্প্রসারণ ঘটে;
সূচ লৌহ নামক পদার্থের তৈরী;
∴ তাপে সূচের সম্প্রসারণ ঘটবে।

অর্থাৎ সমষ্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে কোন নিয়ম, সমষ্টির বিশেষ কোন এককের বা ব্যষ্টির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অথবা ব্যষ্টির ক্ষেত্রে সত্য যে কোন তথ্য তার সমষ্টির ক্ষেত্রেও সত্য।

কিন্তু প্রকৃতিতে সমষ্টির ধর্ম অনুসন্ধান করে যে নিয়ম স্থির করা যায়, সমষ্টির প্রত্যেকটি ব্যষ্টির

ক্ষেত্রে সেইটেই প্রযোজ্য হবে কিনা, এই নিয়ে একটা সন্দেহ দেখা দিল। কেন না, ভারতবর্ষ গরীব দেশ, কিন্তু এর ৩৫ কোটি অধিবাসীর প্রত্যেককে পৃথক পৃথক ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দু-চারজন পরম সৌভাগ্যবান লক্ষপতি বা কোটিপতির সন্ধান পাওয়া যায় না কি ?

সন্দেহটা আসে গ্যাসীয় অণুর গতি-বিজ্ঞানের ম্যাক্সওয়েলের সূত্র থেকে। প্রত্যেক গ্যাসীয় অণুই সতত চঞ্চল এবং সংঘর্ষসঙ্কুল এদের গতি। এদের গতি-শক্তি ও চাঞ্চল্য নির্ভর করছে গ্যাসের চাপ ও তাপমাত্রার উপর এবং চাপ ও তাপমাত্রা পরস্পর নির্ভরশীল। যদি বহু গ্যাসীয় অণুর সৃষ্ট একটা আবদ্ধ সংস্থা কল্পনা করা যায় তাহলে ম্যাক্সওয়েলের সূত্র অনুযায়ী কতকগুলি অণু একটা বিশেষ গতি অবলম্বন করতে পারে, একথা বলা যায়; কিন্তু একটা বিশেষ অণুর সঠিক কি গতি হতে পারে, সেটা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না, শুধু তার সম্ভাব্য গতির একটা আভাস দেওয়া যায়।

সন্দেহটা আরও ঘনীভূত হয়েছিল কোন কোন পদার্থের তেজস্ক্রিয়তার ব্যাপারে। প্রকৃতিতে এমন কতকগুলি পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে (যেমন— রেডিয়াম, থোরিয়াম, অ্যাক্টেনিয়াম, ইউরেনিয়াম ইত্যাদি) যারা স্বভাবতঃই সব সময়ে তেজ বিকিরণ করে। এই বিকিরণ আল্‌ফা, বিটা, গামা —এই তিন রকম পৃথক ধারায় চলতে থাকে। তেজস্ক্রিয় পদার্থের এই বিকিরণ সম্বন্ধে এখনও নিঃসন্দিগ্ধভাবে কোন মতবাদ তৈরী করা সম্ভব হয় নি। তবে সন্দেহ করা হয় যে, পরমাণুর কেন্দ্রে প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে যে প্রচণ্ড কেন্দ্রীয় বল তাদের বেঁধে রাখে, একই ধন-তড়িদ্বাহী প্রোটনগুলির বিদ্যুৎসঞ্জাত বিকর্ষণ বল সেই বাঁধন ভেঙ্গে দিতে চায়। এরূপ দুটি পরস্পর বিরোধী বলের প্রভাবে কেন্দ্রে যে প্রচণ্ড আলোড়ন চলতে থাকে তাতে বিশেষ শ্রেণীর পরমাণুর ক্ষেত্রে তাদের কেন্দ্র স্থিতিশীলতা হারিয়ে ভেঙ্গে যেতে থাকে এবং তার ফলে কেন্দ্র থেকে সব সময় ঐরূপ তেজ বিকিরিত হয়।

এক টুক্‌রা রেডিয়ামের কোটি কোটি পরমাণু একই রকম, কেউই কারও তুলনায় আকৃতি ও প্রকৃতিতে আলাদা জাতের নয় এবং সবাই সমান ভঙ্গুর। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, সবাই সমান ভঙ্গুর হলেও কে যে কখন ভেঙ্গে গিয়ে তেজ বিকিরণ করবে, সেটা অনিশ্চিত। অনেকগুলি পরমাণুর সমষ্টি ধরে গড়পড়তা হিসাবে বলা যায়—মিনিটে কটা পরমাণুর কেন্দ্রে ভাঙ্গন ধরবে, কিন্তু বিশেষ কোন একটা পরমাণুর উপর লেবেল এঁটে বলা যায় না যে, কখন সেটা ভেঙ্গে যাবে—অবশ্য এককালে সেটাও যে ভাঙ্গবে, সেকথা সুনিশ্চিত।

অর্থাৎ তেজস্ক্রিয়তার ব্যাপারে প্রত্যেক পরমাণুই যেন ভাগ্যের কাছে দায়াবদ্ধ; কেন না, যে কোন পরমাণুর ক্ষেত্রেই তার ভাঙ্গবার সময়টা অজ্ঞাত। যেমন—প্রত্যেক আধুনিক সহরেই নানারূপ দুর্ঘটনায় কিছু লোক মারা পড়ে; কিন্তু সহরের কোন পথচারীরই জানা নেই, আকস্মিক মৃত্যু কাকে গ্রাস করতে পারে। এ ব্যাপারে পরমাণুর কেন্দ্র ও মানুষের জীবন সমানভাবে ভাগ্যের শরণার্থী।

সুতরাং যন্ত্র-জগতের মত একটা সুস্পষ্ট অতীতকে লক্ষ্য করে এসব ক্ষেত্রে অবস্থাটা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। তাই পরমাণুর মৌলিক উপাদানের গতিবিধি বা কার্যক্রমের উপর কোন যান্ত্রিক নিয়মও আরোপ করা যায় না। বিশ্বের সামগ্রিক রূপ কতকগুলি ফরমূলা বা সূত্রে প্রকাশ্য বটে, কিন্তু এর প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঘটনার ক্ষেত্রে ভাগ্যবাদ বা অজ্ঞাত-ভবিষ্যৎ ধর্ম সুস্পষ্ট; তাদের কোন সূত্রে গাঁথা যায় না।

ইলেকট্রনের গতিবিধির ব্যাপারেও ঠিক এমনি একটা অনিশ্চয়তার সন্ধান দিলেন জার্মান বিজ্ঞানী হাইসেনবার্গ। কোন একটা জিনিষ দৃশ্যমান হয়ে ওঠবার অর্থ—আলো সেই বস্তু থেকে

প্রতিফলিত হয়ে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ে বোধ-শক্তির সঞ্চার করছে; অর্থাৎ একটা জিনিষ দৃশ্যপটে উদ্ভাসিত হতে মুখ্য ঘটনা হবে, আলোকের সেই বস্তুর উপর প্রতিফলন। কিন্তু এমন কোন বস্তু যদি থাকে যার উপর আলোকের যথার্থ প্রতিফলন অসম্ভব, তাহলে সে রকম বস্তুর অস্তিত্ব থাকলেও তা দেখা যাবে না।

ইলেকট্রন জড় বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ। বিজ্ঞানীর কাছে ইলেকট্রনের সমগ্র পরিচয় নিবদ্ধ রয়েছে তার অবস্থান ও গতিবেগের উপর। যে কোন ইলেকট্রনকেই দৃশ্যপটে ফুটিয়ে তুলতে হলে ইলেকট্রনের তুলনায় ক্ষুদ্রতর কোন আলোক-তরঙ্গের প্রতিফলন প্রয়োজন। কিন্তু সাধারণ যে কোন দৃশ্য আলোকরশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যই ইলেকট্রনের তুলনায় অনেক বড়; এমন কি, সাধারণ শক্তিসম্পন্ন রঞ্জেন-রশ্মিও এ ক্ষেত্রে অচল। আরও শক্তিশালী বা ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মির প্রয়োজন। যদি ইলেকট্রনের উপর গামা-রশ্মির প্রতিফলন ঘটানো যায় তবে হয়তো বিশেষ কোন ধরণের অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ইলেকট্রনের যথার্থ অবস্থান ও গতি নির্ণয় করা যেতে পারে। কিন্তু রশ্মি-তড়িৎ ক্রিয়া থেকে জানা যায় যে, পরমাণুর ইলেকট্রনের সঙ্গে আলোকের জ্যোতিঃকণা বা ফটোনের প্রবল সংঘর্ষ হয়। সাধারণ দৃশ্যমান আলোকের ক্ষেত্রে রঞ্জেন-রশ্মি ব্যবহারেও সে সংঘর্ষ এতই প্রবল হয় যে, ইলেকট্রন কক্ষচ্যুত হয়ে পড়ে। পরীক্ষাক্ষেত্রে গামা-রশ্মি ব্যবহার করলে সে সংঘর্ষ এতই প্রচণ্ড হওয়া উচিত যে, ইলেকট্রনের অবস্থিতি জানবার পূর্বেই সে স্থানচ্যুত হয়ে পড়বে। কিন্তু এই স্থান-চ্যুতিও সঠিকভাবে মাপা যায় না; কেন না, ফটোন যে মাত্রায় ইলেকট্রনকে আঘাত করে সেটা অনিশ্চিত। সুতরাং কোন এক মুহূর্তে ইলেকট্রনের অবস্থান জানবার সময় তাকে অনিশ্চিতভাবে স্থানচ্যুত করা হয় বলে সেই মুহূর্তে তার ভরবেগও অজ্ঞাত থেকে যায়। আবার ভরবেগ নির্ণয়ের ভুল কমিয়ে আনতে আপতিত আলোকরশ্মির যদি শক্তি কমিয়ে আনা যায় তাহলে আবার অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সূক্ষ্মতা কমে আসতে থাকে, যার ফলে ইলেকট্রনের অবস্থিতি অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। সুতরাং এমন একটা আদর্শ পরীক্ষা-ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও একই সঙ্গে ইলেকট্রনের অবস্থান ও ভরবেগ বা গতিবেগ নির্ণয় করা অসম্ভব। গতিবেগ যদি জানা যায় নিশ্চিতভাবে, তার অবস্থান হয়ে পড়ে অনিশ্চিত, অথবা অবস্থান যদি জানা যায় নিশ্চিতভাবে তবে তার গতিবেগ হয়ে পড়ে অনিশ্চিত। তাই ইলেকট্রনের সমগ্র পরিচয় থেকে যাবে অজ্ঞাত ও অনির্ণেয়। কোয়াণ্টাম বলবিন্থায় একে বলা হয়েছে Uncertainty Principle, অর্থাৎ অনৈশ্চিত্য-বাদ।

তাছাড়া প্রতিফলন বা প্রতিসরণের ব্যাপারেও বিশেষ কোন একটা ফটোনের কার্যক্রমে অনিশ্চয়তা আছে। স্বচ্ছ পদার্থের উপর আলোকরশ্মি আপতিত হলে তার কিছু অংশ প্রতিফলিত হয় এবং কিছু অংশ প্রতিসৃত হয়। যদি আপতিত আলোকরশ্মিকে ফটোনের স্রোতধারা হিসাবে ভাবা যায় তবে যে কোন একটা ফটোন আপতন ব্যাপারে প্রতিফলিত হবে, না প্রতিসৃত হবে, সেটা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। বড় জোর তার প্রতিফলন বা প্রতিসরণ সম্বন্ধে একটা সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা যায়।

এ শুধু ইলেকট্রন বা ফটোনের ব্যাপারেই নয়, এদের সঙ্গে তুলনীয় যে কোন বস্তুকণিকার ক্ষেত্রেই এমন কোন পরীক্ষা-ব্যবস্থা অবলম্বন করা অসম্ভব যার সাহায্যে তাদের যথার্থ রূপ উন্মোচন করা যায়। পরীক্ষা-ব্যবস্থা যতই ত্রুটিহীন করা যাক না কেন, প্রকৃতির অন্তঃস্থলের ঘটনাবলী জানবার ব্যাপারে এমন একটা সীমানা স্থির করা আছে যার ওপারে যাওয়ার সাধ্য বিজ্ঞানীর কোন দিনই হবে না। একটা স্বাভাবিক ভ্রান্তি সব সময়েই তাকে দিগ্‌ভ্রষ্ট করবে, যাতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জগতের খবরাখবর কোন দিনই খুব নিশ্চয় করে পাওয়া

যাবে না—একটা দুরতিক্রম্য অনিশ্চয়তা তাকে বাধা দেবেই।

বহুকাল পূর্বে বিশ্ববিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইম্যানুয়েল কাণ্ট এ রকম একটা কথার ঈঙ্গিত দিয়ে ছিলেন।

মানুষের চিৎশক্তি বা চেতনা সব সময়েই একটা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে কার্যকরী থাকে। এর ফলে বিশ্ব-জগতের কোন একটা ঘটনা পরিক্রমায় তার যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হতে পারে তার একটা নির্দিষ্ট রূপ আছে। কেন না, তাঁর মতে ঘটনাময় জগতের পরিচয় দ্বিধাবিভক্ত। একটা দিক মানুষের নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা মনন শক্তির সামনে ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে ওঠে—সেটা হলো প্রতিভাস (Phenomena)। কিন্তু যে কোন জিনিষ সম্পর্কেই তার পরিচয়ের এমন একটা দিক থাকবে, যে দিক সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান কোন দিনই স্পষ্ট হতে পারে না—সেটা হলো প্রমা (Noumena)। কাণ্টীয় দর্শনের এই তথ্যকে বলা হয়েছে Critical Idealism।

অনিশ্চয়তাবাদের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্ বিংশ শতাব্দীর যন্ত্রীয় দর্শনের গোড়া দুর্বল হতে সুরু করলো; কারণ প্রকৃতির স্বরূপ জানবার কাজে একমাত্র পরীক্ষাই যথেষ্ট হতে পারে না।

যন্ত্রীয় দর্শনের যুগে বিজ্ঞানীরা সবাই ছিলেন প্রজ্ঞাবাদী (Rationalist) বা ভাববাদী—ডেকার্টে, স্পিনোজা, লাইব্‌নিজ এঁদের পরিপন্থী। তৎকালীন অন্যান্য ভাববাদী বার্ক, হিউম, লক্ প্রভৃতির মত তাঁরা অন্য মানুষের স্বাশ্রয়ী জ্ঞানে (a priori knowledge) বিশ্বাসী ছিলেন না। স্বাশ্রয়ী-জ্ঞানের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অনুভূতির একটা আপেক্ষিকতা থাকে যার ফলে স্বাশ্রয়ী জ্ঞানোদ্ভূত মানুষের অভিজ্ঞতার কোন সার্বভৌমিক রূপ থাকা সম্ভব হয় না। একমাত্র পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ থেকেই মানুষ কোন ঘটনা সম্পর্কে চরম বা যথার্থ সিদ্ধান্তে আসতে পারে। সেই কারণে বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়েরই একটা যান্ত্রিক মডেল গড়ে তুলতে হবে এবং যে সব তথ্যের কোন কঠিন পরীক্ষাভিত্তিক সত্যতা নেই তার কোন বাস্তব স্বীকৃতিও নেই, লর্ড কেলভিনের উক্তি অনুসারে বিজ্ঞান নিশ্চয়ই তাদের অস্বীকার করবে।

হয়তো পরীক্ষাই বিজ্ঞানীর একমাত্র অবলম্বন, কিন্তু এটাও সত্য যে, পরীক্ষার ব্যবস্থা সব সময়েই মানুষকে নিশ্চিত-জ্ঞান দান করতে পারে না। পরীক্ষায় নিয়োজিত নানা রূপ, উপমা, মডেল মানুষের মনে সংশয়েরও সৃষ্টি করতে পারে। কেন না, কোন যান্ত্রিক ব্যবস্থারই খুঁটিনাটি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কলকব্জা, কোন দিনই এমন নিখুঁতভাবে গড়া যাবে না যাতে প্রকৃতির অন্তঃস্থলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুকণার গতিবিধি নিখুঁতভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে।

অণু-পরমাণুর জগৎ বিশ্লেষণ করে বোঝা গেল যে, বিশ্ব-প্রকৃতিকে ঠিক একটা নিখুঁত যন্ত্র হিসাবে আর ভাবা চলে না। নিখুঁত যন্ত্রের ক্ষেত্রে তার অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী একটা নিরবচ্ছিন্ন ধারায় যুক্ত থাকে, ভবিষ্যৎ সেখানে অতীতেরই ঈঙ্গিত। পারমাণবিক জগতে অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যৎ যুক্ত আছে অসংলগ্ন ধারায়, যার ফাঁকে ফাঁকে সংশয়, অনিশ্চয়তা, দুর্বোধ্যতা বাসা বেঁধে আছে; অতীত সেখানে ভবিষ্যতের নিয়ন্ত্রা নয়। তবে ব্যষ্টিকে কেন্দ্র করে ঘটনার যে অনৈশ্চিত্য লক্ষ্য করা যায়, বহু ব্যষ্টির সম্মেলনে সৃষ্ট সমষ্টির ক্ষেত্রে সংখ্যাতত্ত্বের নিয়ম অনুসারে সমষ্টির পরিচয়ে ক্রমশঃ তার অনৈশ্চিত্য কমে আসতে থাকে। অবশ্য একটা প্রশ্ন ওঠে যে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে ঘটনাময় বিশ্বজগতের অন্তরালে কোনরূপ মুক্ত এষণার (Free will) প্রভাব থাকে কি না? অর্থাৎ জড় বস্তুকণা বা শক্তির বিভিন্ন অনৈশ্চিত্য তাদের কোনরূপ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রসূত কিনা?

কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির সংজ্ঞা পারমাণবিক জগতে কিছু জটিল; কেন না, সে ক্ষেত্রে শুধু মাত্র

ভবিষ্যৎই অস্পষ্ট নয়, বর্তমান অবস্থাটাও অনিশ্চিত। তাই যার বর্তমান অবস্থা অনিশ্চিত তার ভবিষ্যৎ অবস্থা স্বাধীন ইচ্ছাপ্রসূত কিনা, সেটা আর বিচার করা যায় কি করে! আইনষ্টাইন রহস্যচ্ছলে বলেছিলেন যে, চাঁদের যদি ইচ্ছাশক্তি বলে কিছু থাকতো তবে সৃষ্টির পর থেকে এতদিন পর্যন্ত নিরন্তর পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবার মধ্যে অল্প সময়ের জন্যে তার চিরপরিচিত কক্ষের বাইরে বিস্তৃত অচেনা জগৎটা অন্ততঃ এক বারের জন্যেও ঘুরে আসতো!

মাধ্যাকর্ষণ যদি জড়ের ইচ্ছাশক্তি প্রসূত হতো তাহলে বিজ্ঞানীরা প্রকৃতিতে তার সৃষ্টিপদ্ধতি লক্ষ্য করে চৌম্বক ক্ষেত্রের মত কৃত্রিম মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রও এতদিনে রচনা করতে সক্ষম হতেন।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অহর্নিশ একটা দ্বন্দ্ব চলছে। মানুষ যখন সভ্যতার আলোক পায় নি তখনও তাকে বহিঃপ্রকৃতির নানা উগ্র অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে অথবা তার ক্রমবর্ধমান নানা প্রয়োজনের তাগিদে অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছে। তখন থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ পরিচয় এবং সেই সময় থেকেই হয়েছে বিজ্ঞানের আবির্ভাব। বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো, বিশ্ব-প্রকৃতির ঘটনারাজ্য জরীপ করে তার অন্ততঃ একটা প্রণিধানযোগ্য মানচিত্র দাঁড় করানো। কিন্তু প্রকৃতি, মানুষ ও তার মাঝখানে এমন একটা অবরোধ ব্যবস্থা রেখে দিয়েছে, যা ভেদ করে প্রকৃতির স্বরূপ সহজভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। একদিকে মানুষের, তার ক্ষুরধার বুদ্ধি দিয়ে সেই কঠিন অবরোধ উন্মোচনের প্রচণ্ড প্রয়াস, আর অন্যদিকে আত্ম-পরিচয় সম্বন্ধে প্রকৃতির কঠোর অনমনীয়তা। জড় ও শক্তি—শুধু এই দুটি মাত্র ঘুঁটি সম্বল করে আড়াল থেকে বিশ্বের খেলার মাঠে সে এত সব বিচিত্র চাল ফেলছে যে, দিশাহারা মানুষ তারই আবর্তে দিনরাত পাক খাচ্ছে, যেন সব কিছুই তার জানবার উপায় নেই। কিন্তু বিজ্ঞানীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির সামনে বিশ্বজগৎ একটা "অনন্ত জিজ্ঞাসা"। প্রকৃতির ইট, কাঠ, পাথর, মাটি—কোথায়, কার গায়ে সেই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর উৎকীর্ণ আছে, সেই প্রত্নতত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটনে বিজ্ঞানী আত্মনিয়োগ করেছে। এই ভাবেই বিজ্ঞান ক্রমে ক্রমে এগিয়ে যাচ্ছে নতুন থেকে আরও নতুনত্বের দিকে, প্রগতির সোপানগুলি একের পর এক সে অতিক্রম করে যাচ্ছে। কত তত্ত্বের আবির্ভাব হয়েছে আবার পতনও ঘটেছে, ইতিহাসে তার স্বাক্ষর আছে।

এশিয়ান ফ্লু

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

গত ফেব্রুয়ারী মাসে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এক নূতন ধরণের ইনফ্লুয়েঞ্জা ব্যাধির সূচনা দেখা দেয়। মার্চ ও এপ্রিল মাসের মধ্যেই ইহা মালয়, শ্যাম, ফরমোসা, বার্মা প্রভৃতি দেশে ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়ে। এপ্রিল মাসের শেষভাগে কলিকাতায় এই রোগের প্রথম প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং দেখিতে দেখিতে সহরময় ছড়াইয়া পড়ে। সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা হইতে ইহার প্রকৃতি স্বতন্ত্র বলিয়া ইহা এশিয়ান ফ্লু নামে পরিচিত হইয়াছে। বিগত দুই মাস যাবৎ কলিকাতার পথেঘাটে, সংবাদপত্রে কেবল 'ফ্লু' আর 'ফ্লু'। এখন এই রোগ ভারতের প্রায় সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং পশ্চিম পাকিস্থানেও ধাওয়া করিয়াছে। অন্য দিকে চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশও এই রোগের প্রকোপ হইতে রক্ষা পায় নাই। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে কেবলমাত্র পূর্ব পাকিস্থান ও সিংহল এই রোগের প্রকোপ হইতে এখনও মুক্ত আছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জায় আমাদের দেশে প্রতি বৎসরই কিছু লোক আক্রান্ত হয়। সাধারণতঃ গ্রীষ্মের শেষে বৃষ্টি আরম্ভ হইলেই বিশেষ করিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জার জ্বর দেখা দেয়। এবার বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে মোটেই বৃষ্টি না হওয়াতে আষাঢ় মাস পর্যন্ত একটানা গরম চলিয়াছে এবং এই দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যেই ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রচণ্ডভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আমাদের দেশে ইনফ্লুয়েঞ্জা কোন কালেই গুরুতর ব্যাধি বলিয়া গণ্য হয় নাই। কিন্তু এবারের ইনফ্লুয়েঞ্জা মারাত্মক। এক কলিকাতাতেই এক শতের উপর লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং মৃতের সংখ্যা প্রতিদিনই ২।৪ জন করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। বার্মা, মালয় প্রভৃতিদেশে মৃতের সংখ্যা এখানকার অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জার এইরূপ তীব্র আক্রমণের সঙ্গে আমাদের ইতিপূর্বে পরিচয় না ঘটিলেও পৃথিবীর অন্যত্র ইহা আরও কয়েকবার মারাত্মকভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ১৯১৮-'১৯ সালের মধ্যে একটির পর একটি ঢেউয়ের মত পর পর তিনবার সমস্ত ইউরোপ ইনফ্লুয়েঞ্জার তীব্র আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধে যত লোকক্ষয় হইয়াছে এই ইনফ্লুয়েঞ্জায় মৃত্যুর সংখ্যা তাহা হইতে অনেক অধিক হইয়াছিল। এই সময় এক লণ্ডন সহরেই ইনফ্লুয়েঞ্জায় ১৮০০০ লোকের মৃত্যু হয়। ঐ সময় ইউরোপ হইতে পৃথিবীর অন্যত্র এই রোগ ছড়াইয়া পড়িলেও উহার তীব্রতা কম হইয়াছিল। উহার ঢেউ আমাদের দেশে পৌঁছিলেও মারাত্মক হয় নাই। তৎপূর্বে ১৮৯০ সালেও ইউরোপীয় দেশসমূহে আর একবার ইনফ্লুয়েঞ্জার এইরূপ মারাত্মক মূর্তি দেখা গিয়াছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জার উপসর্গের সঙ্গে মোটামুটিভাবে আমাদের অনেক কাল হইতেই পরিচয় আছে। কোমরে ও পিঠে বেদনা, মাথাধরা, দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি, কাশি ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। এবারের ইনফ্লুয়েঞ্জায় এইসব উপসর্গগুলিই খুব তীব্রভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ৩।৪ ডিগ্রীর উপর জ্বর উঠিয়া দেহে ও মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা অনুভূত হয়, দেহ অসার বোধ হয়। ৩।৪ দিনের জ্বরেই রোগী বিশেষভাবে দুর্বল হইয়া পড়ে এবং দুর্বলতা সারিতে অনেক সময় লাগে। ইউরোপীয় ইনফ্লুয়েঞ্জার ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, এই রোগের আক্রমণের ফলে নিউমোকক্কাস, ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস প্রভৃতি নানা জীবাণু

সহজে দেহে প্রসার লাভ করিতে পারে। ফলে, ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ কমিতে না কমিতেই অনেক লোক নিউমোনিয়া, উদরাময় প্রভৃতি নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। এবারের ইনফ্লুয়েঞ্জায় আমাদের দেশেও অনেকে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছে। ইউরোপে ইনফ্লুয়েঞ্জার পরে অনেকে নানারকম স্নায়বিক ব্যাধিতেও আক্রান্ত হইয়াছে এবং এইরূপ অবস্থায় কেহ কেহ জীবনে হতাশ হইয়া আত্মহত্যা পর্যন্ত করিয়াছে। ১৮৯০ সালের ইনফ্লুয়েঞ্জার পরে এক প্যারীতেই আত্মহত্যার সংখ্যা শতকরা ২৫টি বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং উহা ইনফ্লুয়েঞ্জারই বিষময় ফল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

হাম, বসন্তের মত ইনফ্লুয়েঞ্জাও ভাইরাসঘটিত ব্যাধি। ভাইরাস মাত্রেই নিউক্লোপ্রোটিন নামক একটি রাসায়নিক পদার্থের অণু ব্যতীত আর কিছু নয়। বিভিন্ন ভাইরাসের আণবিক গঠন স্বতন্ত্র। শুধুমাত্র একটি রাসায়নিক পদার্থের অণু হইলেও এই অণুগুলি জীবধর্মী। জীবের মতই ইহাদের বংশবৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা আছে এবং বংশানুক্রমিকভাবে স্বভাবের ধারাও বজায় রাখিতে পারে। তবে একমাত্র জীবকোষের আশ্রয়েই ইহারা বৃদ্ধি পাইতে পারে; জীবকোষের বাহিরে ইহারা সম্পূর্ণ জড়ধর্মী। সাধারণ জীবের মত ভাইরাসেরও বিবর্তন বা পরিব্যক্তির ফলে পরিবর্তন ঘটিয়া এক এক প্রকার ভাইরাসের মধ্যেই আবার বিভিন্ন ষ্ট্রেনের সৃষ্টি হয়। বর্তমান এশিয়ান ফ্লু-ও এইরূপ একটি নূতন ষ্ট্রেন হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে। এই ষ্ট্রেনটি টাইপ-এ আখ্যা লাভ করিয়াছে।

আবার জেনেভার একটি খবরে প্রকাশ যে, বর্তমান এশিয়ান ফ্লু-র ষ্ট্রেনটি ১৮৯০ সালের ইউরোপে মড়ক সৃষ্টিকারী ষ্ট্রেন হইতে অভিন্ন। ৭০ হইতে ৮৪ বৎসর বয়স্ক মানুষের রক্তে এশিয়ান ফ্লু-র প্রতিরোধক পদার্থের সন্ধান পাইয়াই সেখান হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে। এমনও হইতে পারে যে, পূর্বেকার সেই মারাত্মক ষ্ট্রেনটি সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, অর্থাৎ পরিবর্তনের ফলে উহার তীব্রতা নষ্ট হইয়া উহা একটি মৃদু ষ্ট্রেনে রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছিল। আবার এইরূপ কোন মৃদু ষ্ট্রেনই হয়তো পরিবর্তনের ফলে পূর্বেকার তীব্রতা ফিরিয়া পাইয়াছে।

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ডাঃ ষ্ট্যান্‌লীর মতে, রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিবার ফলেই ভাইরাসের ষ্ট্রেনগুলির বংশানুগত বিশেষত্ব নষ্ট হইয়া স্বতন্ত্র ষ্ট্রেনের সৃষ্টি হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বিষাক্ত ষ্ট্রেন হইতে মৃদু ষ্ট্রেন আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মৃদু ষ্ট্রেন হইতে উগ্র ষ্ট্রেনের উদ্ভব ঘটে। ইনফ্লুয়েঞ্জার ক্ষেত্রেও এই ভাবেই হয়তো এক এক সময় হঠাৎ এইরূপ মারাত্মক ষ্ট্রেনের আবির্ভাব ঘটে।

ষ্ট্যান্‌লী, ভাইরাসের বিভিন্ন ষ্ট্রেনের মধ্যে রাসায়নিক অসামঞ্জস্য অতি সামান্য হইলেও পরীক্ষার দ্বারা স্পষ্টভাবে ধরিতে সক্ষম হইয়াছেন। রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি দ্বারা ভাইরাসের রাসায়নিক গঠনের পরিবর্তন হইতে কি ভাবে নূতন ষ্ট্রেন সৃষ্টি করা যায়, তিনি এখন সেইরূপ গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। এইভাবে মৃদু ষ্ট্রেন সৃষ্টি সম্ভব হইলে ভ্যাক্‌সিন প্রস্তুতের ব্যাপারটি অনেক সহজ হইতে পারে। আবার নির্বিষ ষ্ট্রেনগুলি যথেষ্ট বিস্তারের সুযোগ পাইলে বিষাক্ত ষ্ট্রেনগুলি প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে বিদায় লইবে, এইরূপ ধারণাও আছে।

কেহ কেহ বর্তমানের মারাত্মক ইনফ্লুয়েঞ্জার আবির্ভাবকে আণবিক বিস্ফোরণের ফল বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে যখন জটিল দেহধারী জীবেরই পরিব্যক্তি ঘটিতে পারে তখন উহার প্রভাবে ভাইরাসের মত একটি অতি সরল জীব-কণিকার রাসায়নিক পরিবর্তন সাধিত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। জীবের বংশধারার বাহক জীন ও ক্রমোজোমের পরিবর্তনের ফলেই পরিব্যক্তি ঘটে। এই জীন,

ক্রমোজোম ও ভাইরাস উভয়ের রাসায়নিক উপাদানই একরূপ, অর্থাৎ উভয়েই নিউক্লিও-প্রোটিন হইতে উদ্ভূত। কাজেই তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে জীন, ক্রমোজোমের মত ভাইরাসের অণুগুলিরও পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকিতে পারে। তবে তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব ব্যতীত অন্যভাবেও যে এই অণুগুলির পরিবর্তন ঘটিতে পারে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের বসন্ত রোগের ভাইরাস গরুর দেহে সংক্রামিত হইলে উহার তীব্রতা হ্রাস পাইয়া একটি মৃদু ষ্ট্রেনে রূপান্তরিত হয়। কোন ষ্ট্রেন পর পর বহুবার একইভাবে কালচার করিয়া গেলেও উহার রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিতে পারে, এইরূপও দেখা গিয়াছে। এইরূপ নানাভাবেই যখন ভাইরাসের ষ্ট্রেন পরিবর্তিত হইতে পারে তখন ইনফ্লুয়েঞ্জার এই তীব্র ষ্ট্রেনটির হঠাৎ আবির্ভাবের জন্য আণবিক বিস্ফোরণজনিত তেজস্ক্রিয়াকে দায়ী করিবার সার্থকতা কতটুকু? অধিকন্তু ইতিপূর্বে আরও কয়েকবার ইনফ্লুয়েঞ্জা এইরূপ মারাত্মকভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং আণবিক বোমার জন্ম তখন হয় নাই—এই কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

সংক্রমণের পরে ভাইরাসের অণুগুলি জীবকোষের মধ্যে প্রবেশ করিলে উহারাই কোষের রাসায়নিক সক্রিয়তার নিয়ন্ত্রক হইয়া দাঁড়ায়। এই অণুগুলির প্রভাবে যে ভাবেই হউক কোষের রাসায়নিক অবস্থার এরূপ পরিবর্তন ঘটে যাহার ফলে কোষের মধ্যে আপনা হইতেই এই অণু সৃষ্টি হইতে থাকে। ভাইরাসের অণু এই ভাবেই সংখ্যায় বাড়িয়া বিস্তার লাভ করে।

ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটিলে জীবকোষের মধ্যে ভাইরাসকে ধ্বংস করিতে পারে, এইরূপ ঔষধ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। সালফা ও পেনিসিলিন জাতীয় ঔষধসমূহ জীবাণুঘটিত ব্যাধির ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে; কিন্তু ভাইরাসঘটিত রোগে এইসব প্রয়োগে তেমন কিছু ফল পাওয়া যায় না। বর্তমান ইনফ্লুয়েঞ্জায় সালফা ডায়াজিন, পেন্টিট সাল্‌ফ্‌ প্রভৃতি অনেক ঔষধই প্রয়োগ করা হইতেছে। এইসব ঔষধ প্রয়োগে হয়তো আনুসঙ্গিক উপসর্গের উপশম হয়, কিন্তু ইহাদের প্রতিক্রিয়ায় ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের অণুগুলির ধ্বংস সাধন বা বিস্তার রোধ করা সম্ভব হয় কিনা বলা শক্ত।

ইনফ্লুয়েঞ্জার সংক্রমণ রোধ করাও কঠিন ব্যাপার। নিঃশ্বাসের সঙ্গে ইনফ্লুয়েঞ্জার জীবাণুগুলি ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই শ্বাসনালীকে আশ্রয় করে। ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি, কাশি, থুথুর সঙ্গে জীবাণুগুলি বাতাসে ছড়াইয়া গিয়া সহজেই অপরের দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। এই জন্য জনবহুল স্থানে ইহারা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ছড়াইয়া পড়িবার সুযোগ পায়। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তদুপরি নানারূপ দ্রুতগামী যানবাহন ব্যবস্থার প্রসার ঘটিবার ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই এক দেশ হইতে অপর দেশে রোগ বিস্তার লাভ করিতে পারে। সংক্রমণের পরেই যে তৎক্ষণাৎ রোগ প্রকাশ পায়, এমন নহে। সংক্রামিত ব্যক্তি নিজের ও অপরের অজ্ঞাতেই রেল, জাহাজ, প্লেনে চড়িয়া একস্থান হইতে অপর স্থানে জীবাণু বহন করিতে পারে। ইনফ্লুয়েঞ্জার মত সহজ সংক্রামক ব্যাধিকে একস্থানে আটক রাখিবার মত কোন ব্যবস্থায়ই এখন পর্যন্ত কার্যকরী হয় নাই। বিশেষতঃ ভাইরাসের জীবাণু জীবকোষের বাহিরে বহুকাল নিষ্ক্রিয় থাকিয়াও আবার উপযুক্ত আশ্রয় পাইলে বিস্তার লাভ করিতে পারে।

ভাইরাসের আক্রমণ ঘটিলে রক্তের মধ্যে প্রতিরোধক পদার্থের সৃষ্টি হয়। রোগ নিরাময়ের পরে এই প্রতিরোধক পদার্থ রক্তে থাকিয়া যায় এবং উক্ত ভাইরাসের পুনরাক্রমণ ব্যাহত করে। হাম, বসন্ত প্রভৃতি অনেক রোগ একবার হইলে জীবনে আর ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার ভয় থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে আবার এই অর্জিত প্রতিরোধ শক্তি

ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যায় এবং তদবস্থায় আবার ঐ রোগের পুনরাক্রমণ ঘটিতে পারে। আক্রমণের তীব্রতার উপর অর্জিত প্রতিরোধ শক্তির পরিমাণ নির্ভর করে। আক্রমণ যত তীব্র হয় অর্জিত প্রতিরোধ শক্তিও তত দীর্ঘস্থায়ী হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, এই অর্জিত প্রতিরোধ শক্তি খুব দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ১৮৯০ সালে আক্রান্ত ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রতিরোধক পদার্থ ৭০।৮০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের রক্তে এখনও বর্তমান রহিয়াছে। তবে শুধু প্রত্যেক জাতীয় ভাইরাসেরই নয়, প্রত্যেক ষ্ট্রেনের প্রতিরোধক পদার্থও স্বতন্ত্র। এই কারণেই এই বারের ইনফ্লুয়েঞ্জা এত ব্যাপক হইয়াছে। পূর্বে যাহারা ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হইয়াছে তাহারাও এই নূতন ষ্ট্রেনের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পায় নাই।

ভাইরাস রোগের সংক্রমণ ঘটিলে আমাদের দেহে যেমন প্রতিরোধক পদার্থের সৃষ্টি হইয়া ভবিষ্যতে ঐ রোগের আক্রমণ হইতে আমাদিগকে অব্যাহতি দেয়, সেইরূপ আবার ভ্যাকৃসিন বা সিরাম সহযোগে বাহির হইতে প্রতিরোধক পদার্থ দেহের মধ্যে প্রবেশ করাইলেও রোগবিশেষের আক্রমণ হইতে মুক্ত থাকা যায়। অনেক রোগেই এখন প্রতিষেধক রূপে এইরূপ ভ্যাকৃসিন প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়াছে। অবশ্য এইভাবে অর্জিত প্রতিরোধ-শক্তি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। প্রতি বৎসর বসন্তের টীকা লওয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই আছে। ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রতিষেধকরূপেও ভ্যাকৃসিনের ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে বর্তমানে কন্নুর, কসৌলি, হপ্‌কিন্স ইনষ্টিটিউটে এশিয়ান ফ্লু-র ভ্যাকৃসিন প্রস্তুতের তোড়জোড় চলিয়াছে। শীঘ্রই ভ্যাকৃসিন পাওয়া যাইবে, এইরূপ ভরসাও পাওয়া গিয়াছে। তবে এই সব ক্ষেত্রে ভ্যাকৃসিন উৎপাদনের অসুবিধা এই যে, ষ্ট্রেনটির সামান্য পরিবর্তন হইলে ঐ ভ্যাকৃসিনে আর কোন কাজ হইবে না। ইনফ্লুয়েঞ্জার সকল ষ্ট্রেনের পক্ষে সমান প্রতিষেধক ভ্যাকৃসিন সৃষ্টির চেষ্টা অনেক কাল হইতেই চলিয়াছে, কিন্তু সেই চেষ্টা এখন পর্যন্তও ফলবতী হয় নাই।

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, জাপান হইতে আরও মারাত্মক রকমের আর একটি ইনফ্লুয়েঞ্জার ঢেউ আসিতেছে। আতঙ্কে স্কুল-কলেজে গ্রীষ্মাবকাশের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। প্রয়োজন হইলে রেঁস্তোরা, সিনেমা প্রভৃতি বন্ধ করিয়া দেওয়ার কথাও উঠিয়াছে। ১৯১৮-'১৯ সালের ইউরোপীয় ইনফ্লুয়েঞ্জার ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা গিয়াছে যে, প্রথম বারের তুলনায় পরবর্তী আক্রমণ তীব্রতর হইয়াছিল এবং পরবর্তী আক্রমণে মৃত্যুর হার প্রথম বারের তুলনায় অনেক অধিক হইয়াছিল। বর্তমান এশিয়ান ফ্লু-র ক্ষেত্রেও দ্বিতীয় আক্রমণ প্রথম বারের তুলনায় আরও গুরুতর হইতে পারে বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা আশঙ্কা করিতেছেন। তবে উক্ত ইউরোপীয় ইনফ্লুয়েঞ্জায় দেখা গিয়াছে যে, প্রথম বারে যাহারা আক্রান্ত হইয়াছে, পরবর্তী আক্রমণ হইতে তাহারা অধিকাংশই রক্ষা পাইয়াছে। এশিয়ান ফ্লু-র ক্ষেত্রেও যদি তাহাই হয় তবে যাহারা প্রথম বারের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে, দ্বিতীয় আক্রমণে তাহাদেরই হয়তো ভয় বেশী রহিয়াছে।

মহাদেশ ও মহাসাগরের উৎপত্তি

শ্রীসুবিমল সিংহরায়

সাগরতীরে গিয়ে নীল জলরাশির উচ্ছলতা দেখতে দেখতে যখন দৃষ্টি ফিরে এসে পড়ে তটভূমির গায়ে, যেখানে চলে সফেন সাদা জলের দুরন্ত মাতামাতি—মনটা তখন অন্য চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ে। মন পিছিয়ে পড়তে চায় বহুকাল আগের দিনগুলিতে। সামনের এই বিস্তীর্ণ সাগর আর স্থলভাগের বিবর্ণ ইতিহাসের ছেঁড়া পাতায় চোখ বুলিয়ে নিতে ইচ্ছা করে—তাদের সৃষ্টি-রহস্য জানবার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয় মন। এই আকাঙ্ক্ষা শাশ্বত, এই কৌতূহল চিরকালের। তবে বৈজ্ঞানিকেরা কৌতূহল আর আকাঙ্ক্ষা নিয়েই চুপ করে বসে থাকেন না। খুঁজে পেতে চান ব্যাখ্যা—বুনে চলেন যুক্তির জাল। মহাদেশ আর মহাসাগরের উৎপত্তি সম্পর্কেও এর ব্যতিক্রম হয় নি।

সোলাস খুব সোজা পথে এর সমাধান খুঁজে পেতে চাইলেন। তিনি বললেন যে, ভূপৃষ্ঠ যখন গলিত অবস্থায় ছিল তখন তার উপরে বায়ুমণ্ডলের অসম চাপের ফলে সৃষ্টি হলো সাগরের নীচু আর স্থলের উঁচু স্থান। চেম্বারলিন তাঁর বিখ্যাত Planetesimal মতবাদের সাহায্যে পৃথিবীর জন্ম ব্যাখ্যা করে বললেন যে, সূর্যপৃষ্ঠ থেকে বিচ্যুত ভগ্নাংশগুলি পৃথিবী তৈরী করবার সময় সব জায়গায় সমান ভাবে ছড়িয়ে পড়ে নি। যেখানে জমা হয়েছে বেশী সেখানে হয়েছে মহাদেশ, আর যেখানে হয়েছে অপেক্ষাকৃত অভাব সেখানকার নীচু জায়গায় উৎপন্ন হয়েছে সাগর। ল্যাপওয়ার্থ বললেন যে, প্রথমে গঠিত ভূপৃষ্ঠে কোন প্রকার চাপের ফলে ভাঁজের উৎপত্তি হয়। ঐ ভাঁজের উর্ধ্বভঙ্গ এবং অবতল-ভঙ্গ যথাক্রমে স্থলভাগ এবং সমুদ্রগর্ভের সৃষ্টি করে। লভ সাহেবও এই তথ্যটি পদার্থ-গাণিতিক দিক থেকে বিচার করে সমর্থন করেছেন।

ঊনবিংশ শতকে এ সম্বন্ধে আর একটি মতবাদ প্রচলিত ছিল। সেটি হলো জল ও স্থল সংস্থানের স্থায়িত্ব। এ মতের পৃষ্ঠপোষক জে. ডি. ডানা বলেন যে, স্থলভাগ সব সময় স্থলই ছিল, কখনো জলভাগের সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করে নি। বিগত শতকের মধ্যভাগে সার চার্লস লায়েল এবং আরও অনেক প্রকৃতি-তত্ত্ববিদ্ স্থল ও জলের অবস্থানের এই স্থায়িত্বকে মেনে নিয়েছিলেন।

কিন্তু পরবর্তী ভিক্টোরিয়ান যুগে এ মতবাদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা উপস্থিত করেন এডওয়ার্ড ফর্বেস। তিনি এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশের জীবজন্তু ও গাছপালার প্রতি বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখালেন যে, স্থল এবং জলের মধ্যে স্থান পরিবর্তন না হলে জীবের বিতরণকে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। তাই তিনি বললেন যে, সমুদ্র অথবা মহাদেশের বর্তমান অবস্থায় উপনীত হওয়ার আগে তাদের কতকগুলি বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে।

চার্লস ডারউইন এলেন তারপর। তিনি যুক্তি সহকারে ফর্বেস-এর মতবাদকে যুক্তিহীন বলে প্রমাণিত করেন। নিজস্ব মতবাদ, জীবের উৎপত্তি নিয়ে এগিয়ে এলেন তিনি, আর বললেন—এক জীব-গোষ্ঠীর সকল জীবই এক জন্মস্থান থেকে অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। এখানেই সংঘর্ষ বাঁধলো তাঁর আর ডানার মতবাদের মধ্যে। ডানা তো বলছেন, মহাদেশগুলি যেমন ছিল এখনও তেমনিই আছে। তবে এখনকার

বিচ্ছিন্ন দেশের মধ্যে অতীতে কোন যোগাযোগ না থাকলে ডারউইনের মতানুসারে জীবের স্থান পরিবর্তন সম্ভব হলো কেমন করে? নিজের মতকে যুক্তিহীন বলে মেনে নেবেন কেন ডারউইন? তাই বললেন যে, কালে যখন এ বিষয়ে আরও তথ্য সংগৃহীত হবে এবং আরও ব্যাপক পরীক্ষা চালানো সম্ভব হবে তখন হয়তো তাঁর ধারণাই সত্য বলে প্রমাণিত হবে এবং জীবজন্তুর স্থানান্তর গমন সংক্রান্ত প্রশ্নেরও মীমাংসা খুঁজে পাওয়া যাবে।

প্রফেসর চার্লস স্থচার্ট, ডানার মতবাদ মেনে নিলেন সত্য, কিন্তু তার একটু পরিবর্তন করে দিলেন। তিনি বললেন যে, সমুদ্র এবং স্থলভাগ ভূপৃষ্ঠের স্থায়ী সংস্থান সন্দেহ নেই বটে, তবে একথা বিশ্বাস করা ভুল হবে যে, এদের আকার চিরকালই আজকের মত ছিল। তিনি ডানার মতবাদ থেকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন এই বলে যে, অতীতে নিশ্চয়ই দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে সেতুর মত সঙ্কীর্ণ স্থলপথের যোগাযোগ ছিল। এর দ্বারা ডারউইন-এর মতবাদ এবং ভূপৃষ্ঠে জীবজন্তু ও গাছপালার বিতরণ ব্যাখ্যা করাও সম্ভব হলো। কিন্তু পরবর্তীকালে অনেকে এই মতবাদকেও মেনে নিতে চান নি।

যে কারণগুলি জল ও স্থল সংস্থানের স্থায়িত্বকে মেনে নিতে বৈজ্ঞানিকদের অনুপ্রাণিত করেছিল তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত দুটিই প্রধান—

১। বরমুদা ও বোর্ণিও প্রভৃতি কয়েকটি সামুদ্রিক দ্বীপ ছাড়া অন্য কোন দেশের পাললিক শিলায় গভীর সমুদ্রের সিন্ধুকর্দমের সন্ধান পাওয়া যায় নি। এই থেকে অনুমান করা হয়েছিল যে, সে সব স্থান কখনই সমুদ্রগর্ভে থাকতে পারে না।

২। যদি স্থলভাগ জলভাগের সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করে তাহলে সমুদ্রগর্ভের অপেক্ষাকৃত ভারী Sima (আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৯ থেকে ৩; কখন কখন ৩.৪ পর্যন্ত হয়ে থাকে) শিলার পরিবর্তে হাল্কা Sial শিলাকে (আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৭) নিমজ্জিত হতে হয়। এ ব্যাপারটা পদার্থ বিজ্ঞানের দিক দিয়ে অসম্ভব। যদিও দেশের কতকটা আংশিকভাবে নিমজ্জিত হতে পারে, কিন্তু সমগ্র দেশের পক্ষে এরকম হওয়াটা সম্ভব নয়।

ডব্লু. টি. ব্লেনফোর্ডই প্রথম পূর্ববর্তী স্থায়িত্ব-বাদের প্রতিবাদ করেন। তিনি বললেন, এখন যেখানে বড় বড় সমুদ্র দেখা যায় সেখানে হয়তো মহাদেশের এক অভঙ্গ বিস্তৃতি ছিল। তারপর কোন প্রাকৃতিক কারণে সে মহাদেশের কতকটা অংশ কয়েক হাজার ফ্যাদম নীচে নেমে গেলে সেখানে হলো সমুদ্র—দু' পাশে পড়ে রইল দুইটি বিচ্ছিন্ন দেশ। ব্লেনফোর্ড তাঁর সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে দক্ষিণের সমুদ্রগুলির সাহায্য নিয়েছিলেন। এই সমুদ্রগুলির বিস্তৃতি ও গভীরতা দুই-ই বেশী এবং এদের মধ্যে দ্বীপের সংখ্যাও কম। কিন্তু স্থায়িত্ববাদ সমর্থকদের পূর্বোক্ত দ্বিতীয় কারণটির পাল্টা আক্রমণে তাঁর মতবাদও প্রতিষ্ঠিত হলো না।

ভূপৃষ্ঠের জল ও স্থলভাগের বর্তমান অবস্থা বিচারে লেথিয়ান গ্রীন পৃথিবীর এক অভিনব রূপ কল্পনায় অনুপ্রাণিত হলেন। তিনি যে মতবাদ পেশ করলেন তার নাম হলো চতুস্তলক মতবাদ (Tetrahedral hypothesis)। তিনি পৃথিবীকে তার বর্তমান অবস্থায় একটি চতুস্তলক (Tetrahedron) বলে কল্পনা করেছেন। চতুস্তলক হলো দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধবিশিষ্ট একটি আকৃতি এবং এর চারটি সমান ত্রিভুজাকার পার্শ্ব আছে। পৃথিবীকে এই চতুস্তলকের সঙ্গে তুলনা করবার মূলে আছে কতকগুলি পর্যবেক্ষণ। সেগুলি হলো—১। পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগ আর দক্ষিণ গোলার্ধে জলভাগের আধিক্য; ২। দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া—এই তিনটি মহাদেশীয় স্থলভাগের দক্ষিণমুখী সম্প্রসারণ; ৩। জল এবং স্থলভাগের মধ্যে প্রতিপাদ (Antipodal) সম্পর্ক।

তারপর যখন দেখা গেল যে, পৃথিবীকে চতুস্তলক রূপে কল্পনা করলে এই সব পর্যবেক্ষণগুলিকে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়, তখনই মতবাদটি প্রচলিত হয়ে পড়লো এবং প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় করবার জন্যে এর স্বপক্ষে এল আরও ব্যাখ্যা। আমরা জানি যে, গোলকই সর্বাপেক্ষা অধিক আয়তনবিশিষ্ট প্রণালীসঙ্গত একটি আকৃতি, আর সেক্ষেত্রে চতুস্তলক হলো সর্বাপেক্ষা কম আয়তনের অধিকারী। এথেকে অনুমান করা হয়েছিল যে, পৃথিবী যখন শীতল হওয়ার সময় আয়তনে কমতে আরম্ভ করলো তখন গোলাকৃতি থেকে চতুস্তলকাকৃতিতে পরিবর্তিত হতে থাকে। যদি এটা মেনে নেওয়া হয় যে, শীতল হওয়ার ফলে পৃথিবী সঙ্কুচিত হয়েছে তাহলে সমুদ্রগর্ভ এবং স্থলভাগের উৎপত্তির কারণ দেখানো চলে। এই মতানুসারে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের সঙ্কোচনের ফলে ভূপৃষ্ঠের নীচে যে ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হয়েছিল, ভূত্বক স্বভাবতঃই তার মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে নেমে গিয়ে তৈরী করেছিল সমুদ্রগর্ভ। এমনি করে চতুস্তলকের চতুষ্পার্শ্বে সৃষ্টি হলো চারটি মহাসাগর—প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, আটলাণ্টিক মহাসাগর, আর্কটিক সাগর প্রভৃতি; আর চতুস্তলকের কোণ ও প্রান্তের উঁচু জায়গাগুলিতে দেখা দিল মহাদেশগুলি। (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

এত যুক্তি ও উদাহরণও কিন্তু এই বলিষ্ঠ মতবাদটিকে টিঁকিয়ে রাখতে পারলো না। প্রতিবাদ এল এর বিরুদ্ধে। বিপক্ষদলের বক্তব্য হলো এই যে, সমসত্ব ভূত্বকে আবৃত পৃথিবীর সঙ্কোচনে চতুস্তলক আকৃতির সৃষ্টি কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। এর কারণও তাঁরা দেখিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন যে, পৃথিবীর উপাদানে গঠিত কোন জিনিষকেই চতুস্তলক আকৃতিতে পরিবর্তিত করা সহজ নয় এই কারণে যে, চতুস্তলকের উঁচু কোণ এবং প্রান্তের ভার অত্যন্ত বেশী হবে এবং মাধ্যাকর্ষণের সাম্য রক্ষার জন্যে ঐ সব অঞ্চলগুলি নীচে নামতে আরম্ভ করবে। ক্রমে যখন সাম্যের প্রকৃত অবস্থা ফিরে আসবে তখনই থামবে এই অধোগমন। খুব ছোট একটি ভূ-গোলকে চতুস্তলক আকৃতি প্রদান করা যায় বটে, কিন্তু আমাদের পৃথিবীর মত বিশাল গোলকে তার কল্পনা করা সম্ভব নয়। তাই এখন আর এই মতবাদের প্রচলন নেই।
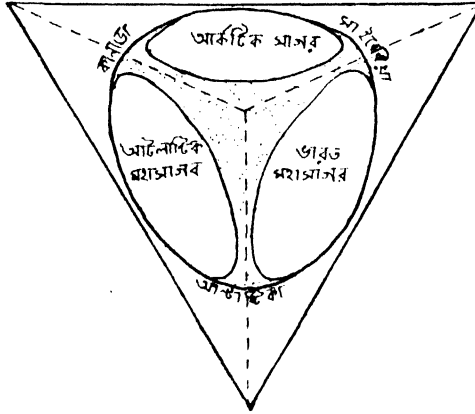
১নং চিত্র

চতুস্তলক মতবাদ অনুসারে জল ও স্থলের সংস্থান।

এবার একটু অন্য দিক দিয়ে বিষয়টাকে চিন্তা করা যাক। এখানে ভেবে নিতে হবে যে, যে কোন উপায়ে সৃষ্টি হয়েছিল স্থলভাগের—কেমন করে হয়েছিল সে প্রশ্ন এখানে নয়। অনেকের মতে, অতীতে আজকের বিচ্ছিন্ন স্থলভাগ একটি

বিস্তৃত ভূমিভাগে সংযুক্ত ছিল। নাম তার Pangaea। আর এই ভূখণ্ডের চার পাশে ছড়িয়ে ছিল এক অতিকায় সাগর। Panthalassa নামে খ্যাত সে অতীত সাগর। বর্তমানে সাগর দ্বারা বিচ্ছিন্ন মহাদেশগুলির পাললিক শিলায় জীবাশ্ম স্তরায়ণের মিল দেখে Pangaea-র অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া চলে। এই বিস্তৃত ভূমিভাগের অনুবহের দ্বারা সৃষ্টি হয় বর্তমানের মহাদেশগুলি, আর ঐ নবনির্মিত মহাদেশের আনাচেকানাচে স্থান করে নেয় Panthalassa-র জলরাশি—আজকের সাগর, মহাসাগর ইত্যাদি।

মহাদেশের অনুবহ মতবাদটির পথপ্রদর্শকদের নাম করতে গেলে সবার আগে বলতে হয় আলফ্রেড ওয়েজেনারের কথা। আটলান্টিক মহাসাগরের উভয় তীরে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার জীবাশ্ম, পাললিক শিলার স্তরায়ণ এবং গিরিশ্রেণীর ষ্ট্রাইকের অত্যাশ্চর্য মিল দেখে তিনি বললেন যে, এই দুটি দেশ এককালে একটি অবিচ্ছিন্ন মহাদেশের অংশ ছিল। তাঁর মতে নিরক্ষরেখা এবং পশ্চিমমুখী চাপের ফলে Pangaea-র অনুবহ সম্ভব হয়েছিল। এশিয়া মহাদেশ নিরক্ষরেখার দিকে আর আমেরিকা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হওয়ার দরুণ যথাক্রমে ভারত ও আটলান্টিক মহাসাগরের সৃষ্টি হয়।

তলদেশের আকৃতি পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উঠা-নামাকে এই মতবাদের সাহায্যে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায় এবং ব্রেনফোর্ডের যুক্তিও সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করা সম্ভব হয়। যদিও এই মতবাদের পক্ষে অকাট্য অনেক প্রাকৃতিক যুক্তি রয়েছে, তবু অনুবহের চাপ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। বৈজ্ঞানিকেরা অনেকগুলি কারণ নির্দেশ করেছেন।

পৃথিবীর শিলাগত সংস্থানের উপর ভর করে আরও একটি মতবাদ দাঁড়িয়ে আছে। আমরা জানি যে, ভূত্বকের উপরিভাগের শিলার (একে Sial বলা হয়; কারণ রাসায়নিক ভাবে Silica আর aluminium-এ এই শিলা গঠিত) আপেক্ষিক গুরুত্ব তার নীচের শিলাস্তরের (এর নাম Sima; কারণ Silica আর magnesia-ই এর প্রধান রাসায়নিক উপাদান) চাইতে অনেক কম। আপেক্ষিক গুরুত্বের এই তারতম্যের জন্যে গলিত পৃথিবীর জমাট বাঁধবার সময় হাল্কা Sial শিলা ভূত্বকের উপরিভাগে সর্বত্র সমানভাবে জমা হয়, আর তার নীচে থাকে Sima স্তর। এই জন্যেই এটা অনুমান করা খুবই স্বাভাবিক যে, ভূপৃষ্ঠের প্রত্যেক জায়গায় উপরে Sial, আর তার তলায় পাওয়া যাবে Sima। কিন্তু সমুদ্রগর্ভে তো শুধু Sima-ই পাওয়া যায়, উপরের Sial স্তরের সন্ধান তো মেলে না! সেখান থেকে ওটা তবে গেল কোথায়? এটা হয় পৃথিবীর অভ্যন্তরে কোথাও আত্মগোপন করেছে, আর নয় তো পৃথিবী বহির্ভূত কোন স্থানে উধাও হয়েছে।

পৃথিবী বহির্ভূত কোন স্থানের কথা বলতে চাঁদের কথাই মনে পড়ে সবার আগে। যদি ভূপৃষ্ঠ থেকে বিচ্যুত হয়ে মহাশূন্যেই পাড়ি দিয়ে থাকে এই Sial শিলা, তাহলে শুধুমাত্র চাঁদেই তার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। একথা সকলেই মেনে নেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসের খুব পুরনো এক অধ্যায়ে লেখা আছে চাঁদের জন্মকথা। যদি চাঁদের জন্মের আগেই ভূপৃষ্ঠের Sial আবরণ তৈরী হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে পৃথিবী থেকে চাঁদ যখন বেরিয়ে গেল তখন তার সঙ্গে Sial শিলার কিছুটা অংশ যে চলে যাবে তাতে আর সন্দেহ কি! ভূপৃষ্ঠ পর্যবেক্ষণের পর দেখা গেল যে, প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তৃত অঞ্চল থেকেই বেশীর ভাগ Sial আবরণ হারিয়ে গেছে। এথেকে অসমণ্ড ফিশার এই সিদ্ধান্ত উপনীত হলেন যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে চাঁদ Sial শিলার কিছুটা অংশ নিয়ে গিয়ে পিছনে ফেলে রেখে গেছে প্রশান্ত মহাসাগরের এই বিরাট খাত। আর সেই শূন্য স্থান পূরণ করতে চারপাশের দেশগুলি এল এগিয়ে। এই গতির ফলে সৃষ্টি

হলো আরও খাত—দেখা দিল অন্যান্য সাগরগুলি। যদিও মতবাদটি সেকালে খুবই আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল তথাপি কিন্তু টিকতে পারলো না। এই মতবাদ অনুসারে এটা মেনে নেওয়া হয়েছে যে, চাঁদের জন্মের সময় পৃথিবী নিশ্চয়ই গলিত অবস্থায় ছিল; তা না হলে ভূপৃষ্ঠ থেকে শিলার বিচ্যুতি সম্ভব হয় কেমন করে? আর তাই যদি হয়, তখন তো Sial আবরণের সৃষ্টি হতেই পারে না। তাই Sial শিলা নিয়ে চাঁদের বিচ্যুতি কখনই সম্ভব নয়।

আর যদি ঐ শিলাকে পৃথিবীরই কোথাও উঠা-নামা (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। এটা মনে করা যেতে পারে যে, পৃথিবীর সে অবস্থায় কোন জায়গায় হয়তো ঐরূপ স্রোতের সৃষ্টি হলো। সেটি সোজা উপরের দিকে উঠে গিয়ে অনুভূমিকভাবে ছড়িয়ে পড়লো এবং পরে নীচের দিকে নেমে গেল। যখন এই স্রোত খুব দ্রুত তালে উঠা-নামা করে তখন সেটা অনুভূমিকভাবে ছড়িয়ে পড়বার সময় ভূপৃষ্ঠের Sial আবরণকে একদিকে ঠেলে নিয়ে যেতে পারে। যেখানে দুটি নিম্নগামী পরিচলন স্রোত মিলিত হয় সেখানে জমা হয় sial শিলা আর
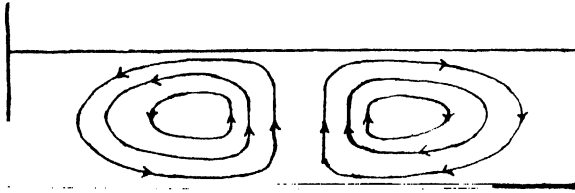
২নং চিত্র
উত্তপ্ত তরল পদার্থের পরিচলন স্রোত।

থাকতে হয় তাহলে ভূমিভাগের মধ্যেই তাকে খুঁজতে হবে। পৃথিবীর অতীত ইতিহাসে সমস্ত ভূপৃষ্ঠে যে শিলা ছড়িয়ে ছিল, সেটা কোন কারণে একটা অঞ্চলে জমা হলো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে, আর সৃষ্টি করলো দেশগুলির—এই অনুমানকে ব্যাখ্যা করবার জন্যে পরিচলন স্রোতের মতবাদের উদ্ভাবন করা হয়েছে। তরল পদার্থ যে প্রণালীতে ঠাণ্ডা হয়, সেই প্রণালীতেই ঠাণ্ডা হয়েছিল উত্তপ্ত পৃথিবীর তরল শিলারাশি। প্রণালীটি হলো পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি করে ভূমিভাগের। আবার যেখানে দুটি উর্ধ্বগামী স্রোতের মিলন হয় সেখান থেকে বিদূরিত হয় সে শিলা—সেখানেই সৃষ্টি হয় সাগরের। এত সব যুক্তিতর্ক সত্ত্বেও সঠিকভাবে জল ও স্থলভাগের উৎপত্তিকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নি, মতানৈক্যের অবকাশ রয়ে গেছে প্রচুর। মানুষের বৈজ্ঞানিক মন কিন্তু নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে না; প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটনে একদিন না একদিন সে সাফল্য লাভ করবেই।

জ্যামিতির অতীত ও বর্তমান

শ্রীনীরেন্দুকুমার হাজরা

তখন সমাজে সৃষ্টি হয়েছে পরিবার—বিভিন্ন গোষ্ঠী। মানুষ যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শিখেছে—আবিষ্কার করেছে কৃষির কাজ। স্থায়ীভাবে এই বসবাস আরম্ভ হয়েছিল নদী পরিবেষ্টিত দেশগুলিতে, বিশেষ করে মিশর, ব্যাবিলন, চীন ও ভারতবর্ষে। কৃষির কাজ আবিষ্কারের জন্যে মানুষ পেয়েছিল স্বাধীন চিন্তার প্রচুর সময়। তার সঙ্গে সমাজে দেখা দিয়েছিল ব্যক্তিগত মালিকানা। মানুষ নিজের সুখ-সম্পদ নিয়ে ব্যস্ত। মানুষ নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবার ফলে স্বাধীন চিন্তার সুযোগটুকু ছেড়ে দিয়েছে সমাজের বিশেষ একজনের উপর। পরে সেই ব্যক্তিই হয়েছে সমাজের একচ্ছত্র অধিপতি—পুরোহিত বা ধর্মযাজক। স্বাধীন চিন্তার ফলে পুরোহিত লাভ করেছে পাণ্ডিত্য। ভগবানের দোহাই দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আদায় করেছে প্রচুর সেলামী যা পরে ট্যাক্সে পরিণত হয়েছে। মানুষ নিজের বলে যা কিছু জেনেছে, তার পরিমাণ না জানলেই নয়। এই পরিমাণ নির্ধারণই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল জ্যামিতি বা রেখাগণিত আবিষ্কারে।

মিশর বা ব্যাবিলনে পুরোহিত বা ধর্মযাজকদের হাতে ছিল এই শিক্ষার চর্চা। সমস্ত বিজ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল নানাপ্রকার প্রাণহীন আলোচনার মধ্যে। সাধারণের মধ্যে জ্ঞানস্পৃহা বিশেষ সন্দেহের চোখে দেখা হতো; কারণ তা ছিল পুরোহিতদের আধিপত্যের অন্তরায়। বিজ্ঞানের অগ্রগতি চলেছিল অতি মন্থর গতিতে। সেই সময়ে গ্রীকদের তেমন কোন সামাজিক বাধা ছিল না; প্রচলিত নিয়ম বা সামাজিক সংস্কারকে ছেড়ে তাঁরা যুক্তিকেই স্থান দিয়েছিল সকলের উপরে। সুতরাং তাঁদের হাতে যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল তাতে সন্দেহ করবার কিছুই নেই।

প্রাচীন গ্রীক-বিজ্ঞানের ইতিহাসে যাঁদের কথা জানা যায় তাঁরা ছিলেন আইওনিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত থেল্‌স্। তিনি ছিলেন একজন পূর্তবিদ্—হেলিস নদীর বাঁধ তাঁরই কীর্তি। গণিতশাস্ত্রে, বিশেষ করে রেখাগণিত বা জ্যামিতি সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করেন। মিশরের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে তিনি সেই দেশের ব্যবহারিক জ্যামিতি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করেন। নতুন করে তিনি অনেক কিছু প্রমাণ করেন যা পরে ইউক্লিডের গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তাই আজও তিনি গণিতশাস্ত্রে, বিশেষ করে রেখাগণিতের প্রথম স্রষ্টা হিসাবে সম্মানিত হন।

থেল্‌সের পরে গ্রীক দেশে যে শিক্ষিত সম্প্রদায় গড়ে উঠে সেটি হচ্ছে পিথাগোরীয়ান সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছিল পিথাগোরাসকে কেন্দ্র করে। তিনি থেল্‌সের জ্যামিতিক সূত্র অনুসরণ করে গবেষণা আরম্ভ করেন এবং মিশর ও ব্যাবিলন পরিভ্রমণ করে ক্রোটন অঞ্চলে এক শিক্ষায়তন খোলেন। এই প্রতিষ্ঠান ছিল এক গুপ্ত সমিতি—বিশেষ এবং যাবতীয় গবেষণাই ঐ প্রতিষ্ঠানের নামে প্রকাশিত হতো। সেজন্যে আজ বলা যায় না, পিথাগোরাস ও তাঁর ছাত্রদের মধ্যে কার কৃতিত্ব কতটুকু? তবে একথা ঠিক, পিথাগোরাসের চরম সাফল্য হচ্ছে তাঁর জ্যামিতি। তাঁর জ্যামিতির প্রতিপাদ্য আজ আর কারও অজানা নেই।

আইওনিয়ান ও পিথাগোরীয়ান সম্প্রদায় ছাড়া গ্রীসে আরও কয়েকটি শিক্ষিত সম্প্রদায় দেখা যায়; যেমন—ইলিয়াটিক সম্প্রদায়, এথিনিয়ান সম্প্রদায়, আলেকজেনড্রিয়ান সম্প্রদায়। ইলিয়াটিক সম্প্রদায়ের বিশেষ কৃতিত্ব বীজগণিতে। তারপর এথিনিয়ান সম্প্রদায়ের সময়ে জ্যামিতিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখবার চেষ্টা হয়। আর সে চেষ্টা বেশ কিছুটা সাফল্যমণ্ডিতও হয়েছিল। এই সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে প্লেটো ছিলেন অনন্যসাধারণ। তিনি দার্শনিক সক্রেটিসের ছাত্র। তিনি জ্যামিতিক প্রমাণ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেন। তাছাড়া জ্যামিতিকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করবার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। এই সময়েই গ্রীসে অঙ্কশাস্ত্রের অনুশীলন প্রাধান্য লাভ করে। এর পরে আলেকজেনড্রিয়ান সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়। এই সম্প্রদায়ের সময় গ্রীক জাতি অন্যান্য জাতি অপেক্ষা গণিতে বিশেষ উন্নতি লাভ করেছিল আলেকজেনড্রিয়াতে। এখানেই তাঁদের চরম কীর্তি স্থাপন করে গেছেন —ইউক্লিড, আর্কিমিডিস, আর এপোলোনিয়াস।

আজও যে জ্যামিতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় —সেটা ইউক্লিডের জ্যামিতি। তাঁর জ্যামিতির প্রতিপত্তি সমানভাবে চলে আসছে। অনেকের ধারণা, ইউক্লিডের জ্যামিতির সবটাই তাঁর নিজের গবেষণার সৃষ্টি নয়। একথা ঠিক যে, তাঁর পূর্বেকার সব কিছু গবেষণা তিনি একত্র করেছিলেন এবং নিজেও যথেষ্ট নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন। যে প্রণালীতে জ্যামিতির প্রমাণগুলি আমরা পাই, সে প্রণালী ইউক্লিডের নিজস্ব। জ্যামিতির সংজ্ঞা এবং স্বতঃসিদ্ধগুলির জন্যে তিনি চিরস্মরণীয়। এছাড়া তিনি জ্যামিতির সাহায্যে আলোক-রশ্মির ধারা সম্বন্ধেও গবেষণা করেন।

আর্কিমিডিস ছিলেন ব্যবহারিক শাস্ত্রের পক্ষপাতী। তিনি জ্যামিতির সূক্ষ্ম প্রমাণগুলি নূতন ভাবে সমাধান করেন; তবে তাঁর জ্যামিতির গবেষণার বিষয় ছিল—বৃত্তের পরিধির সঙ্গে তার ব্যাসের সম্বন্ধ কি? তার সূক্ষ্ম হিসাব তিনি এক নতুন ভাবে দিয়ে গেছেন। কি ভাবে প্যারাবোলার যে কোন অংশের কালি কষা যেতে পারে, তার সমাধানও তিনি করেছেন। ক্যালকুলাস বাদ দিয়ে যে হিসাব সম্ভব তার অনেকাংশ সেই যুগেই তিনি শেষ করে গেছেন।

এপোলোনিয়াস্কে আলেকজেনড্রিয়ান সম্প্রদায়ের শেষ মনীষী বলা যেতে পারে। তাঁর কীর্তি হলো কোণিক্স্। তিনি এর সব প্রতিপাদ্যগুলি আবিষ্কার করেন। প্রায় চারশ' প্রমাণ তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। প্যারাবোলা, ইলিপস্ এবং হাইপারবোলা—এ সব নাম তাঁরই দেওয়া।

গ্রীসের সামাজিক জীবনে পরিবর্তন এলো; ধীরে ধীরে তার উন্নত শির অবনত হলো নানাপ্রকার রাজনৈতিক কার্যকারণে। গ্রীস অবরুদ্ধ হলো মুসলমানদের দ্বারা, পূর্বের স্বাধীন চিন্তায় পড়লো বাধা। শুধু তাই নয়, সকলের সমবেত চেষ্টায় আলেকজেনড্রিয়াতে যে পাঠাগার গড়ে উঠেছিল তা তখনকার মুসলমান সম্রাট খলিফ ওমরের আদেশে ধ্বংস হয়ে গেল। ফলে বহু পুরাতনের নতুন করে পুনরাবৃত্তি চললো প্রায় এক সহস্র বছর ধরে।

এই দীর্ঘ সময়ে শুধু ইউক্লিড, আর্কিমিডিসেরই পর্যালোচনা হয়েছে। তারপর যে নতুনত্ব দেখা দিয়েছে তা ডেকার্টের বিশ্লেষণী জ্যামিতিতে। ইউক্লিডকে যাচাই করতে গিয়ে এই নতুনত্বের সৃষ্টি হয়েছিল। ইউক্লিডের মতে, দুটি সমান্তরাল রেখা কখনও কোন এক নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলতে পারে না। ডেকার্টে বিশ্লেষণ করে দেখলেন যে, এই মত পৃথিবীর ক্ষেত্রেই সম্ভব, পৃথিবীর বাইরে কোনদিন সম্ভব নয়। পৃথিবীর বাইরে সুদূরে কোন এক নির্দিষ্ট বিন্দুতে তারা মিলিত হবে। ডেকার্টের যুগ পার হয়ে জ্যামিতির গতি শুরু হয়েছে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে—আপে-

ক্ষিকতাবাদের যুগে। এই যুগেই মানুষের দৃষ্টি প্রখর থেকে প্রখরতর হলো—সন্ধান পেলো চরমসত্যের।

আপেক্ষিকতাবাদ প্রমাণ করে দিল যে, চতুর্মাত্রিক বিশ্বকে ত্রিমাত্রিক রূপে অনুভব করবার মূলে রয়েছে মানুষের অক্ষমতা বা যুক্তিহীন বুদ্ধি। দেশ ও কালকে পৃথকভাবে দেখাই মানুষের রীতি। এই রীতির দাস হয়ে থাকলে চলবে না—সত্যকে স্থান দিতে হবে সকলের উপরে। দেশ-কালের যুক্ত পরিণতি বা চতুর্মাত্রিক কাঠামোর মধ্যে বিশ্ব-ইতিহাসের নতুন সংস্করণকে বোঝবার প্রয়াস পেতে হবে। আইনষ্টাইনের এই তত্ত্বকে সর্বপ্রথম রূপ দিয়েছিলেন রুশ বিজ্ঞানী মিন্‌কোভস্কি।

এবার আসা যাক সত্য যাচাইয়ের ব্যাপারে। সরল রেখার কল্পনা কতটুকু বাস্তব? আপাত-দৃষ্টিতে সরল রেখাকে বাস্তব বলেই মনে হতে পারে। দ্বিমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভূ-পৃষ্ঠকে সমতল বা সরল রৈখিক মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আজ সকলেই জানে যে, ভূপৃষ্ঠ সমতল নয়—গোলাকার। গোলাকার পৃথিবীর উপর বসে সরল রেখার কল্পনা করা বাতুলতা ছাড়া আর কি হতে পারে? গোটা পৃথিবীর পৃষ্ঠের উপর দিয়ে একটা সরল রেখা টানা কোন কালেই সম্ভব নয়। আর যে রেখা টানা হবে তা হবে গোলাকার। শুধু সে বক্রই নয়—তার প্রান্তদ্বয় মিলবে এসে এক বিন্দুতে। অথচ ইউক্লিড দ্বিধাহীন চিত্তে জানিয়েছিলেন যে, সরল রেখার প্রান্তদ্বয়ের সাক্ষাৎ ঘটবে না কোন কালে। সরল রেখার সংজ্ঞা কি? দুটি বিন্দুর মধ্যে ক্ষুদ্রতম দূরত্বকে পরিচিত করা হয় সরল রেখা হিসাবে। কিন্তু গোলাকার ভূপৃষ্ঠের উপর দুটি বিন্দুর সংযোজক রেখাগুলির মধ্যে সর্বাধিক ক্ষুদ্র যে রেখাটি পাওয়া যাবে, সেটিও হবে বাঁকা। সে জন্যে আজকের জ্যামিতিতে সরল রেখা বলে কিছুই নেই। যা আছে তার নাম দেওয়া হয়েছে জিওডেসিক। আজ সরল রেখার স্থান কোথায়ও নেই, এমন কি মহাশূন্যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানেও নয়। জিওডেসিক পূরণ করেছে সরল রেখার স্থান। আইনষ্টাইন এটা প্রমাণ করেছিলেন অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে।

ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতে ত্রিভুজ নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়—ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ। গোলাকার ভূপৃষ্ঠের উপর সরল রেখা নিয়ে ত্রিভুজ আঁকা কোন দিনই সম্ভব হবে না এবং ত্রিভুজের কোণগুলির সমষ্টি কখনও দুই সমকোণের সমান হবে না। একটু চিন্তা করলেই দেখা যায়—প্রত্যেক দ্রাঘিমা রেখা বৃহত্তম বৃত্ত, অর্থাৎ বিষুব রেখাকে স্পর্শ করে সমকোণে। অতএব দুটা দ্রাঘিমা রেখা নিয়ে যে ত্রিভুজ গড়ে উঠবে—তার কোণগুলির সমষ্টি কখনই দুই সমকোণের সমান হবে না বরং বেশীই হবে।

নব্য-জ্যামিতি অর্থাৎ আইনষ্টাইন-রীমানীয় জ্যামিতি এখানেই শেষ নয়। এসব প্রথম কল্পনা করেন জার্মান জ্যামিতি-বিশারদ রীমান। এই নব্য-জ্যামিতি সৃষ্টি হয়েছে রীমান ও আইনষ্টাইনের বাস্তবধর্মী কল্পনায়। সেজন্যে আজ নব্য-জ্যামিতিকে আইনষ্টাইন-রীমানীয় জ্যামিতি বলে অভিহিত করা হয়। এখন প্রশ্ন উঠে—তবে মিন্‌কোভস্কির জ্যামিতি বাস্তব-ধর্মী হলো না কেন? তিনি তো আইনষ্টাইনের চতুর্মাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই তাঁর জ্যামিতিকে দেখেছিলেন। তিনি আইনষ্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখেছিলেন বটে, কিন্তু অকৃতকার্য হয়েছিলেন—ইউক্লিডের কল্পিত সরল রেখাকে স্থান দিয়ে।

ত্রিমাত্রিক জ্যামিতিতে কোন কিছুর আয়তন পরিমাপের যে কল্পনা বা যুক্তি—সেখানে ছিল মানুষের অক্ষমতা। চতুর্মাত্রিক, অর্থাৎ দেশ-কালকে নিয়ে গঠিত যে জ্যামিতি তার কথা তখন ছিল মানুষের কল্পনার বাইরে। আজকের দিনে বাস্তবের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হলে নব্য-জ্যামিতি, অর্থাৎ চতুর্মাত্রিক জ্যামিতিকে স্থান দিতে হবে সকলের উপরে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, নব্য-জ্যামিতি সৃষ্টির আগে বিজ্ঞান কি আমাদের কিছুই দেয় নি? বিজ্ঞান অনেক কিছুই দিয়েছে ঠিক কথা, শুধু দেয় নি গূঢ় সত্যের সন্ধান—যা দিয়েছে বর্তমান জ্যামিতি। এটা আরও ভালভাবে বোঝা যাবে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর উক্তি থেকে—'নির্ণেয়বাদ মানুষকে নিষ্প্রাণ যন্ত্ররূপে কারণবাদের নিগড়ে আবদ্ধ করে ভাগ্যের শরণার্থী হতে বাধ্য করেছিল। নয়া কোয়াণ্টামবাদ সেই অসাধ্য আদর্শের স্থানে একটি প্রণিধানযোগ্য সত্যের সন্ধান দিয়েছে এবং অনেকখানি বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছে। নয়া কোয়াণ্টাম থিওরী প্রকৃতির লীলা অনুধাবনের পথ বিশেষভাবে এগিয়ে দিয়েছে। বিজ্ঞানের গতি চলমান। সময়োপযোগী যেটুকু সত্যের সন্ধান পেয়েছে—তার উপর ভিত্তি করে সে সম্মুখের দিকে এগিয়ে চলেছে।'
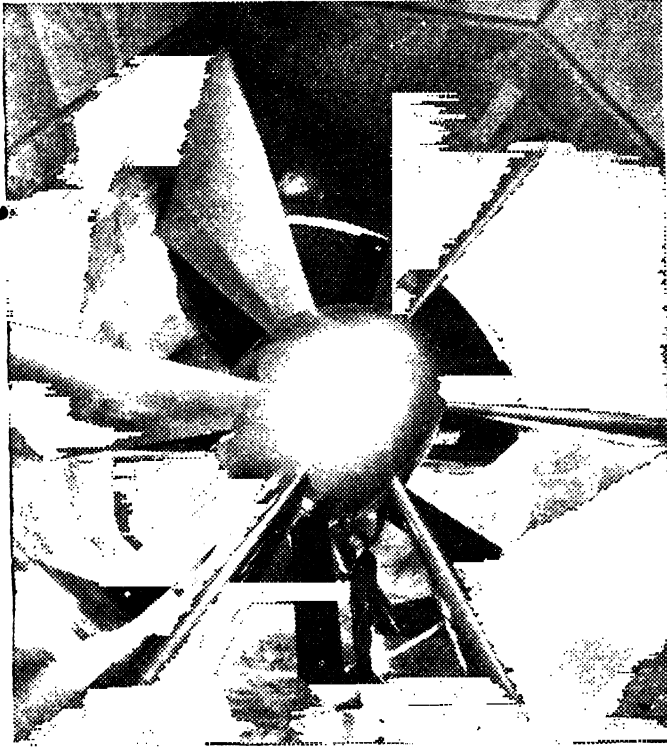
বৃষ্টল এয়ারক্র্যাফ্‌ট্‌ কোম্পানী কর্তৃক নির্মিত বৃহদাকৃতির উইণ্ড টানেল। মোট ১,৯৫০ অশ্বশক্তির দুইটি বৈদ্যুতিক মোটরের দ্বারা চালিত একটি পাখার সাহায্যে এই টানেলের মধ্য দিয়া বাতাস প্রবাহিত হয়। পাখাটির ব্যাস ২২ ফুট ১৪ ইঞ্চি।

ভারতবর্ষে বৈদেশিক জাতি

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

সিথিয়ান ও সিথিয়া নাম প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকদের নিকট পাওয়া গিয়াছে। খৃঃ পূঃ ৮ম শতাব্দীতে হেসিয়ড এই নাম প্রথম ব্যবহার করেন। তাঁহার পরে আরিষ্টিয়াস (খৃঃ পূঃ ৬৮৯) এই নাম ব্যবহার করিয়াছেন। ষ্ট্র্যাবো ও হেরোডোটাসের লেখায় এই দুই জন ঐতিহাসিকের উল্লেখ পাওয়া যায়। কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন যে, হোমারের (খৃঃ পূঃ ৮৫০) বিখ্যাত কাব্য ইলিয়ডে সিথিয়ান জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় (Illiad XIII.5)। হেরোডোটাস মীড সম্রাট সিয়াক্সজারেসের (খৃঃ পূঃ ৬৩৪-৫৯৪) সময় সিথিয়ানদের মিডিয়া আক্রমণের, সিথিয়ান-দের সহিত যুদ্ধে সাইরাসের নিহত হইবার (খৃঃ পূঃ ৫২৯) এবং খৃঃ পূঃ ৫১১ সালে দারিয়ুসের সিথিয়া আক্রমণের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন।

আলেকজাণ্ডারের এশিয়া অভিযানের বহু পূর্বে সিথিয়ান জাতির সহিত গ্রীক ঐতিহাসিকদের এই পরিচয় হইতে বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রসঙ্গে যে সকল সিথিয়ান জাতির উল্লেখ করা হয়—ভারতবর্ষের সহিত তাহাদের সম্পর্ক খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীর শেষার্ধে আরম্ভ হয়—গ্রীক ঐতিহাসিকদের পরিচিত সিথিয়ান জাতি তাহারা নহে। হেরোডোটাস দারিয়ুস কর্তৃক যে সিথিয়া আক্রমণের কথা বলিয়াছেন, সে সিথিয়া ইয়ুরোপে অবস্থিত। খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে গ্রীকগণ যখন কৃষ্ণ সমুদ্রের উত্তর অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে তখন তাহারা দেখিতে পায় যে, দক্ষিণ রুশিয়ার ষ্টেপ বা তৃণময় অঞ্চল এক যাযাবর জাতির অধি-কারে। এইজাতিকে গ্রীকগণ সিথিয়ান নাম দেয়। পশ্চিমে ষ্টেপ অঞ্চল অতিক্রম করিয়া ড্যানিউব নদী (রুমানিয়ায় ওয়ালেশিয়া) পর্যন্ত সিথিয়ানগণ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। নীষ্টার ও নীপার নদীর তীরে ও দক্ষিণ-পূর্ব পোদেলিয়ায় তাহাদের বিস্তৃত উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। আজোভ সমুদ্রের পূর্ব-উপকূলে সিথিয়ানদিগের যে গোষ্ঠী বাস করিত তাহার নাম ছিল রয়েল সিথিয়ান। ঐ গোষ্ঠীর রাজ্য ক্রিমিয়ার অভ্যন্তর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দারিয়ুস কর্তৃক সিথিয়া অভিযানের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে, বস্‌পোরাসের উপর সেতু বাঁধিয়া দারিয়ুস গ্রীসে উপস্থিত হন। তারপর উত্তর-পূর্ব মুখে অগ্রসর হইয়া ড্যানিউব অতিক্রম করেন। ডন নদীর কুল এবং সম্ভবতঃ ভলগা পর্যন্ত তিনি অগ্রসর হইয়াছিলেন।

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের এই সিথিয়ান জাতি সম্বন্ধে জানা যায় যে, তাহারা আপনাদিগকে সে অঞ্চলের আদিম অধিবাসী বলিয়া মনে করিত। নীপার নদী অঞ্চলে সিথিয়ান রাজাদের বহু প্রাচীন সমাধি স্তূপ (Kurgan) দেখিতে পাওয়া যায়। হেরোডোটাস দারিয়ুসের সিথিয়া আক্রমণের সময়কার (খৃঃ পূঃ ৫১১) সিথিয়ার রাজার নাম এবং তাঁহার পূর্ববর্তী পাঁচজন রাজার নাম দিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ মিলাইয়া কেহ কেহ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইউরোপে সিথিয়ান জাতির উপনিবেশ স্থাপন বহু প্রাচীন কালের ব্যাপার; যদিও সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, তাহারা খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীতে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। সারমাসিয়ান জাতির আক্রমণে বিপর্যস্ত হইয়া বহু সিথিয়ান ড্যানিউব অতিক্রম করিয়া দোব্রুজায় প্রবেশ করে। এই সারমাসিয়ান সিথিয়ান গোষ্ঠীর একটি শাখা ছিল। হেরো-

ডোটাসের সময়ে ইহারা ডন ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বাস করিত।

ম্যাসিডোনীয় ও পার্থিয়ান আমলের ইরানের মানচিত্রে গ্রীক ও রোমান ভৌগোলিকগণ কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বে, যাহা এখন তুর্কমানিস্থান, সেইখানে সিথিয়ার অবস্থান দেখাইয়াছেন। কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বভাগের সিথিয়ার নাম Scythia intra Imaum। Imaus বলিতে ঠিক কোন পর্বতশ্রেণী বুঝায়, সে সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় না। মোটামুটি মত এই যে—

'It (Imaus) is one of those terms which the ancient geographers appear to have used indefinitely for want of exact knowledge. In its most definite application it appears to mean the western part of the Himalayas',.

তারপর বলা হইয়াছে, 'It must either be understood to mean the Moussour or Altai mountains or some imaginary range which cannot be identified with any actually existing mountains. ইমাউস অর্থে আল্‌তাই পর্বতমালা ধরিলে সিথিয়ার এক অংশের মধ্যে পড়ে আরল-কাস্পিয়ান ও বলখাস নিম্নভূমি ও অপর অংশে, অর্থাৎ Scythia extra Imaum-এ পড়ে জুঙ্গেরিয়া ও মঙ্গোলিয়া হইতে চীনের প্রাচীর পর্যন্ত অঞ্চল। একটি অংশের দক্ষিণ সীমানা ইরান, জেরাকশান ও পামীর এবং অন্য অংশের দক্ষিণ সীমানা কারাকোরাম-কুয়েনলুন পর্বতশ্রেণী। মোটামুটি বলা যায় যে, পামীর ও পূর্ব তুর্কীস্থান লইয়া মধ্য এশিয়ার ২১ লক্ষ ৪৫ হাজার বর্গমাইলব্যাপী অঞ্চলের ইচ্ছামত যে কোন অংশকে সিথিয়া নাম দেওয়া হইত। ইয়ুরোপের প্রাচীন সিথিয়াকে ইহার সঙ্গে ধরিলে হাঙ্গেরী পর্যন্ত সিথিয়ার প্রসার বাড়িয়া যায়।

সিথিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত বিভিন্ন জাতি

হেরোডোটাসের আগের গ্রীক ঐতিহাসিকেরা শুধু দক্ষিণ-পূর্ব রুশিয়ার সিথিয়ান জাতির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। সারমাসিয়ানদের নিকট সিথিয়ানদের পরাজয় ও বিপর্যয়ের পরে গ্রীকগণ এশিয়ার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে সিথিয়ান নাম দিতে আরম্ভ করে। ক্রমে অপরিচিত ও দূরবর্তী জাতিমাত্রেই সিথিয়ান নামে অভিহিত হইতে থাকে। ('their name became a favourite designation of more remote and less known nations.')। রোম সাম্রাজ্যের আমলে সিথিয়া বলিতে উত্তর এশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল বুঝাইত। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী হইতে কাস্পিয়ান ও উরালের পূর্বের অঞ্চল হইতে যে সকল জাতি ইয়ুরোপ আক্রমণ করিয়াছিল তাহাদিগকে আর সিথিয়ান নামে অভিহিত হইতে দেখা যায় না, তাহাদের বিভিন্ন জাতির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদের নাম হুন, আবর, তাতার বা তুর্কি, বুলগার, উগ্রিয়ান বা ফিন, খাজার, মঙ্গোল ইত্যাদি। মঙ্গোল, তুর্ক বা ফিনো উগ্রিয়ান গোষ্ঠীর বিভিন্ন জাতিকে কেহ কেহ হুনিক বা সিথিয়ান গোষ্ঠী নামে অভিহিত করিয়াছেন। পরবর্তীকালে এই হুনিক বা সিথিয়ান নামটির পরিবর্তে ইহাদের পরিচয় দিবার জন্য তুরানী (তুর্কো-ইরানীয়ান), উরাল-আল্‌তাইক, আল্‌তাইক, ফিনো-উগ্রিয় ইত্যাদি নামের প্রচলন হইয়াছে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা মতে দক্ষিণ-পূর্ব ইয়ুরোপ অথবা পশ্চিমে ড্যানিউব হইতে পূর্বে ভল্‌গা ও উরল নদী পর্যন্ত অঞ্চল এবং কৃষ্ণ সাগর ও আজোভ সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল সিথিয়ান জাতির অধ্যুষিত এলাকা ছিল। এই ঐতিহাসিকেরা সিথিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত অনেকগুলি জাতির নাম

করিয়াছেন। রয়েল সিথিয়ান ও সারমাসিয়ান জাতির নাম উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। বুগ ও নীষ্টার নদীর তীরবর্তী অঞ্চল মিশ্র গ্রীক ও সিথিয়ান জাতির উপনিবেশ ছিল। নিম্ন ভল্‌গা অঞ্চলের Thyssagetae এবং ভল্‌গা ও উরলের মধ্যবর্তী অঞ্চলের Iryaoe জাতির নাম পাওয়া যায়। মীড ও আকামনীয় সাম্রাজ্যের আমলে ইয়ুরোপের বাহিরের অঞ্চলের (মধ্য এশিয়া বা তুর্কীস্থান) দুইটি সিথিয়ান জাতির বিশিষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। মিডিয়া আক্রমণকারী সিথিয়ান জাতিকে শক বলা হইয়াছে। শক নামটি কখনও সিথিয়ান গোষ্ঠীর একটি বিশিষ্ট শাখা, কখনও সাধারণভাবে সিথিয়ান গোষ্ঠীকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। কেহ কেহ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মিডিয়া আক্রমণকারী শক জাতি ককেশাসের দারিয়েল পাশ বা ককেশাস ও কাস্পিয়ানের মধ্যবর্তী দারবেণ্ড পাশ অতিক্রম করিয়া মিডিয়ায় অভিযান করিয়াছিল। এই মত অনুসারে শকদের বাসভূমি দক্ষিণ-পূর্ব রুশিয়ায় দাঁড়ায়। কোন কোন মতে, মাসাজেটের আক্রমণে বাসভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া শক জাতি আমু দরিয়া অতিক্রম করিয়া মিডিয়ায় প্রবেশ করিয়াছিল। মাসাজেট জাতির বাসভূমি ছিল সির দরিয়া ও আরল সাগরের উত্তরে এবং আরল ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে, অর্থাৎ উষ্ট উর্ট মালভূমি ও উহার উত্তরে। হেরোডোটাস সকল ট্রান্স কাস্পিয়ান যাযাবর জাতিকে এই নাম দিয়াছেন। উল্লিখিত থিসাজেট ও মাসাজেট-দিগের নাম ও বাসভূমির তুলনা করিয়া উভয়কে সম্পর্কিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। শকদের সম্বন্ধে ইহার পরে বলা হইবে।

ম্যাসিডোনীয়া ও ব্যাকৃট্রিয়ায় গ্রীক শাসনের আমলে মধ্য-এশিয়া সম্বন্ধে জ্ঞানের আরও প্রসার হইবার ফলে গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকেরা সিথিয়ান বলিয়া অভিহিত আরও কতকগুলি জাতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সময় হইতে সিথিয়া বলিতে কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চল বুঝাইতে আরম্ভ করে।

ব্যাকৃট্রিয়ায় ঘাঁটি স্থাপন করিয়া আলেকজাণ্ডার সগডিয়ানার মধ্য দিয়া সির দরিয়া ও তাহার উত্তর অঞ্চলের সিথিয়ানদের দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক নোলডেক ও গুট্‌স্‌মিডের মতে, এই অঞ্চলের সিথিয়ান ছিল তুরানী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং "here perhaps occurs the first mention in history of the Turkish race"। তুরানীদের দেশ আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্য ছিল মধ্য-এশিয়ার বাণিজ্যপথ সুরক্ষিত করা এবং ইরানের উত্তর সীমান্তে তুরানী যাযাবরদের আক্রমণ ও লুণ্ঠন বন্ধ করা।

প্রাচীন ইরানের মানচিত্রে কাস্পিয়ানের পূর্বে সিথিয়া, সিথিয়ার দক্ষিণে দাহী ও দাহীর পূর্বে ও সগডিয়ানার পাশমি কোরাসমিয়ার অবস্থান দেখান হইয়াছে। এই সমগ্র অঞ্চলের অধিবাসীর সাধারণ নাম দেওয়া হইয়াছে সিথিয়ান। সিথিয়ার অবস্থান হইতে উহার অধিবাসীদিগকে মাসাজেট বলিয়া অনুমান করা চলে। দাহীদিগের বাসভূমি হিরকানিয়া এবং মার্গাস, আমু ও সির দরিয়া নদীর তীরবর্তী অঞ্চল বলা হইয়াছে। কোরাস-মিয়ার অধিবাসীদিগকে শক বা মাসাজেটের শাখা বলা হয়। ইরানের পার্থিয়ানরা কোন কোন মতে, দাহীদিগের শাখা; আবার কোন কোন মতে, ইরানী ও সিথিয়ান সংমিশ্রণে উৎপন্ন জাতি।

সে যাহা হউক, ইরানের উত্তরের মরুময় অঞ্চলের মাসাজেট, শক, দাহী, কোরাসমি প্রভৃতি জাতিকে সাধারণভাবে সিথিয়ান নাম দেওয়া হইয়াছে। ইতিহাসের বর্ণনায় ইহারাই Nomads of the northern deserts, যাহারা পুনঃপুনঃ ইরান আক্রমণ করিয়াছে। ইহারা সকলেই তুর্কী গোষ্ঠীয় কিনা পরে দেখা যাইবে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আলেকজাণ্ডার ব্যাকৃট্রিয়া

আক্রমণ করিলে শক ও দাহী জাতি ব্যাকৃট্রিয়ার শাসনকর্তা বেত্থসকে সাহায্য করিয়াছিলেন। সগডিয়ানার শাসনকর্তা স্পিতামেনেস পরাজিত হইয়া মাসাজেটদের দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আকামেনীয় আমলের শেষের দিকে কোরাসমিয়ার প্রধান পশ্চিমে ককেশাসের পাদভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের উপর আধিপত্য করিতেন।

ব্যাকৃট্রিয়ায় গ্রীক শাসনের ঐতিহাসিকেরা কয়েকটি নূতন জাতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারাও সিথিয়ান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ব্যাকৃট্রিয়ার গ্রীক রাজা ডেমেট্রিয়াস তারিম অববাহিকার পথে চীনের সহিত বাণিজ্যপথ সুরক্ষিত করিবার জন্য পূর্ব তুর্কীস্থানে সৈন্যবাহিনী পাঠাইয়াছিলেন। এই অভিযানের ফলে যে সকল জাতির পরিচয় পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে ফৌনী, আত্তাকোরী, তোখারি জাতির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। প্লিনির মতে, আত্তাকারী হোয়াংহো নদীর উৎপত্তি স্থানের নিকটে, অর্থাৎ কানসুর উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে (কোকনরে) বাস করিত। ফৌনী জাতির বাসভূমি ছিল ইহার পশ্চিমে। তোখারি জাতির বাসভূমি ফৌনী জাতির বাসভূমির পশ্চিমে। অনুমান করা হইয়াছে যে, খোটান অঞ্চল ছিল তোখারি জাতির আদি বাসভূমি। ষ্ট্রাবোর মতে, কতকগুলি জাতি মিলিয়া ব্যাকৃট্রিয়া গ্রীকদের হাত হইতে কাড়িয়া লয়। এই সকল জাতির মধ্যে তিনি আসিয়াই, পাসিয়ানি, তোখারি ও শাকারৌকের নাম করিয়াছেন। ইহারা সকলেই শকদের দেশে বাস করিত। ইহাদের সঙ্গে সগডিয়ানার অধিবাসীরা যোগ দিয়াছিল। শকদের বাসভূমি সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই।

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, আরল-কাস্পিয়ান অঞ্চল হইতে সরিয়া লক্ষ্যস্থল ক্রমে বলখাস হ্রদ অঞ্চল, পূর্ব তুর্কীস্থান ও চীনের সীমানা পর্যন্ত আসিয়াছে। ডিমেট্রিয়াসের অভিযান খৃঃ পূঃ ১৭৭ সালের ব্যাপার এবং ব্যাকৃট্রিয়ার গ্রীক রাজত্ব ধ্বংস হয় অনুমান খৃঃ পূঃ ১৪০-১৩৮ সালের মধ্যে।

য়িয়ুচী (কুশান, তোখারি) শক, হিয়েঙ-নু

এইবার চীনদেশের ইতিহাসের বিবরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সিথিয়ান আক্রমণের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় চীনের ইতিহাসে। চৌ-বংশের সম্রাট মুহ্ ওয়াঙের রাজত্বকালে (খৃঃ পূঃ ৯৩৬) সিথিয়ান বা তাতারগণ চীনের সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলি আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিতে থাকে। ইহার পর খৃঃ পূঃ ৩য় শতকে হিয়েঙ-নু ও য়িয়ুচীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। চীন সম্রাট চে-হাং-তে (Thsin dynasty, খৃঃ পূঃ ২১০) হিয়েঙ-নুদের পরাজিত করিয়া মঙ্গোলিয়ার অভ্যন্তরে পলায়ন করিতে বাধ্য করেন। ইহাদের উপদ্রব বন্ধ করিবার জন্য তিনি চীনের প্রসিদ্ধ প্রাচীর নির্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। চীন আক্রমণে ব্যর্থ হইয়া হিয়েঙ-নু জাতি সেন-সে ও কানসুর মধ্যে যে য়িয়ুচী রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল তাহা আক্রমণ করে। পরাজিত ও দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া য়িয়ুচীগণ তুর্কীস্থান ও কাস্পিয়ানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে (ট্রান্স-অক্সিয়ানা) চলিয়া যায়। হান বংশের সম্রাট উ-তে হিয়েঙ-নুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে য়িয়ুচীদের সাহায্য পাইবার জন্য একজন দূতকে য়িয়ুচী রাজধানীতে পাঠান (খৃঃ পূঃ ১২৯)। এই রাজদূতের নাম চ্যাংকিয়েন।

চ্যাংকিয়েনের বিবরণ হইতে কতকগুলি জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। য়িয়ুচী জাতি সগডিয়ানায় খ্যাং-কিন সির দরিয়া অঞ্চলে ইয়েন-সাই কোরাসমিয়ায় বাস করিত। খ্যাং-কিনদের অধিকৃত অঞ্চলের (সির দরিয়ার উভয় তীর) পূর্বে ছিল হিয়েঙ-নুদের রাজ্য। তাহিয়া (ব্যাকৃট্রিয়া)

য়িয়ুচীদের অধিকারে ছিল। এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে, এই ইয়েন-সাই গ্রীক ঐতিহাসিকদের আওরসি। আওরসিদের পশ্চিমভাগ কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম হইতে ডন নদীর দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং পূর্বভাগ কাস্পিয়ান সমুদ্রের উত্তর কূল হইতে সির দরিয়ার দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আওরসিদের অন্য নাম আদারসি এবং ইহারাই উল্লিখিত সারমাসিয়ান জাতি। কাস্পিয়ান সাগর ও আজোভ সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চল এশিয়াটিক সারমাসিয়া। ইয়ুরোপীয় সারমাসিয়া বলিতে পোলাণ্ডের পূর্ব অংশ ও রুশিয়ার দক্ষিণ অংশ বুঝাইত। ককেশাসের প্রসিদ্ধ গিরিসঙ্কট দারিয়েল Sarmaticae Portoe নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তী চীনা ইতিহাসে ইয়েন-সাই জাতির নাম হইয়াছে আ-লান-না। ষ্ট্র্যাবোর বিবরণে ব্যাকৃট্রিয়ার গ্রীক রাজ্য যাহারা ধ্বংস করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে শকারৌক জাতি অন্যতম। ইহারা যে অঞ্চলে বাস করিত তাহার গ্রীক নাম মাজিয়ানা। একজন ঐতিহাসিক এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, চ্যাংকিয়েনের উল্লেখিত থ্যাং-কিন জাতি ও ষ্ট্র্যাবোর উল্লেখিত শকারৌক জাতি অভিন্ন। ষ্ট্র্যাবোর বর্ণিত আসিয়াই ও আসিয়ান এবং টলেমীর বর্ণিত জাতিয়াই, অধ্যাপক নোল্‌ড্‌কে-র মতে তোখারি জাতির বিভিন্ন নাম। এই তোখারি জাতির চীনা নাম য়িয়ুচী।

খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে (খৃঃ পূঃ ১৭৭) হিয়েঙ-নুদের প্রসঙ্গে য়িয়ুচী জাতির উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। তোখারি, আসিয়াই, আসিয়ানি, জাতিয়াই ছাড়া য়িয়ুচীদের আরও কতকগুলি নাম আছে; যথা—য়িয়ুত, য়িয়েত, ঘেত, কাওচাং, কাশান, কুশান ইত্যাদি। তা বা তোখারি বড় য়িয়ুচী নামে পরিচিত। তোখারি ভারতীয় ইতিহাসে তুখার, তুষার প্রভৃতি নামে পরিচিত। অনুমান করা হয় যে, তোখারি গোষ্ঠী বা জাতির নাম য়িয়ুচী দলের নাম। কাওচাং বা কাশান চীন ইতিহাসে হুই-খে-দের দক্ষিণ শাখা। তাহারা খৃষ্টের জন্মের পূর্বে তিয়েনশানের দক্ষিণ ও পূর্বে পামীর ও কুয়েন-লুন পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে বাস করিত। হুই-খে-দের সম্বন্ধে পরে বলা হইবে।

য়িয়ুচী জাতি সেন-সে হইতে বিতাড়িত হইয়া পশ্চিমে অগ্রসর হইবার সময় প্রথমে উস্থন ও পরে সে-জাতির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সেন-সে হইতে যাত্রা করিবার পর মরুভূমি পার হইয়া তিয়েনশানের উত্তরের পথে প্রসিদ্ধ জুঙ্গেরীয়ান গেট অতিক্রম করিয়া য়িয়ুচীরা বলখাস হ্রদ অঞ্চলে উস্থনদের (কিয়াঙ-কুয়ান) দেশে প্রবেশ করে। ইহারা ইলী নদীর অববাহিকায় বাস করিত। উস্থনদিগকে পরাজিত করিয়া য়িয়ুচীরা দক্ষিণে নামিয়া কাশগড়ের উত্তরে ও সির দরিয়ার উত্তর-পূর্বে ইসিককুল অঞ্চলে শকদের দেশে উপস্থিত হয়। উপরে বলা হইয়াছে যে, শকজাতি এই অঞ্চল হইতে বিতাড়িত হইয়া সম্ভবতঃ কাশগড়ের পথে পামীর অতিক্রম করিয়া কাবুলে উপস্থিত হয়। ইহার পরে দেখা যায়—উস্থন ও হিয়েঙ-নুদের মিলিত আক্রমণে য়িয়ুচী জাতি অধিকৃত অঞ্চল ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া তাহারা সগডিয়ানায় প্রবেশ করে। সগডিয়ানায় গ্রীক অধিকার লুপ্ত হয় (খৃঃ পূঃ ১৫৯)।

য়িয়ুচী শক্তির অভ্যুদয় হয় ট্রান্স-অক্সিয়ানা ও ব্যাকৃট্রিয়ায়। ক্রমে আফগনিস্থান ও উত্তর ভারত য়িয়ুচী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাহাদের একটি শাখা তারিখ অববাহিকার দক্ষিণ অঞ্চলে কুয়েন-লুন পর্বতের উত্তরের পাদভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করে। ইহারা ছোট য়িয়ুচী বা কিদারাইট। তাহা ছাড়া ভারতবর্ষের সীমান্ত হইতে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত অঞ্চলে স্থানে স্থানে য়িয়ুচী উপনিবেশ বর্তমান ছিল। খৃষ্টীয় ২য় ও ৩য় শতাব্দীতে য়িয়ুচী বৌদ্ধধর্ম প্রচারক চীনে ধর্ম প্রচারের জন্য যাইত, ইহা জানা যায়। হিয়েঙ-নুদের আক্রমণ হইতে

পশ্চিম জগতের সহিত সংযোগ ও বাণিজ্য পথ রক্ষা করিবার জন্য পূর্ব তুর্কীস্থানে যে সকল চীনা সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে য়িয়ুচী সৈন্য নিযুক্ত করা হইত। এই সকল সৈন্যকে সাধারণভাবে হু (হু-বার্বারিয়ান) বলা হইত।

ফরগণা, সগডিয়ানা ও ব্যাক্‌ট্রিয়া অধিকার করিবার প্রায় এক শতাব্দী পরে য়িয়ুচী প্রধান কিউ-সিউ-খিও (প্রথম কাডফাসিস) পাঁচটি পৃথক য়িয়ুচী রাজ্য ঐক্যবদ্ধ করিয়া কাশান বা কুশান সাম্রাজ্য স্থাপন করেন (খৃষ্টীয় ১৫ হইতে ৩০ সালের মধ্যে)। কুশান সাম্রাজ্যের শক্তি এত প্রবল হয় যে, কুশান নৃপতি ইরানের আরসিকিডান সম্রাটদের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন। রোমের সাহায্যে ৩য় তেরিদেতিস সিংহাসন অধিকার করিলে সম্রাট ফ্রাওতেস কুশান রাজ্যে পলায়ন করেন (খৃঃ পূঃ ২৭)। তাঁহার সাহায্যের জন্য এক বৃহৎ য়িয়ুচী বাহিনী পাথিয়া আক্রমণ করে। তেরিদেতিস পলায়ন করিয়া রোমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাবুল অধিকার করিবার পরে অনুমান খৃষ্টীয় ৪৫ সাল হইতে কুশান শক্তি উত্তর ভারতে অধিকার বিস্তার করিতে আরম্ভ করে।

উত্তর ভারতে য়িয়ুচী বা কুশান প্রভাবের কথা পরে বলা হইবে। ভারতবর্ষে কুশান শক্তি ধ্বংস হইবার পরে আফগানিস্থানে কুশান বংশীয়দের অধিকার বহুদিন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে হুয়েন স্যাঙ্‌ বাদাকশানে তু-লো-পো বা তোখারি রাজ্যের কথা বলিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, পূর্ব তুর্কীস্থানের নিয়া ও এণ্ডিয়ার নিকটে তু-লো-পো-দের পরিত্যক্ত বসতির চিহ্ন বর্তমান ছিল।

য়িয়ুচীদের দ্বিতীয় সংঘর্ষ হয় ছে (Sse, Se) জাতির সঙ্গে। ছে ছাড়া শকি বা শকাই নামেও ইহারা পরিচিত। ইহরাই টলেমী বর্ণিত ইন্দো-সিথিয়ান।

সিথিয়ান নামে পরিচিত যে তিনটি জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে দুইটি,—য়িয়ুচী, কুশান বা তোখারি জাতি ও শক জাতির কথা বলা হইয়াছে। এইবার হুন জাতির কথা বলা হইতেছে।

হিয়েঙ-নু ও হুন

পণ্ডিতগণের মতে, চীনা ইতিহাসের হিয়েঙ-নু, গ্রীক ও রোমান ইতিহাসের ফুয়োনি বা উত্তনি ও হুন্নি এবং ভারতীয় ইতিহাসের হুন এক জাতি। ইহাদের আরও কয়েকটি নাম আছে—হৈতাল, হেপথালাইট বা শ্বেতহুন।

কানসুর উত্তর পশ্চিমে হোয়াঙ-হো বা পীত নদীর উৎপত্তি স্থান কোকনরে য়িয়ুচী বিজেতা হিয়েঙ-নু জাতির বাস ছিল। এই অঞ্চল হইতে তাহারা চীনের সীমান্ত অঞ্চলগুলির উপর আক্রমণ চালাইত। খৃঃ পূঃ ১০ম শতাব্দীতে চৌ বংশের আমলে যে সিথিয়ান বা তাতার আক্রমণের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহার নায়ক সম্ভবতঃ এই হিয়েঙ-নু জাতি। চৌ রাজবংশ স্থাপনের সময়ে (খৃঃ পূঃ ১১০০ অব্দ) বা স্যাং বংশের শেষ আমলে এই জাতি মঙ্গোলিয়ায় রাজ্য স্থাপন করে। এই সময় হইতে চীনের সহিত তাহাদের বিরোধ। খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতে সিন ও হান বংশের আমলে তাহাদের উপদ্রব বৃদ্ধি পায়। ইহার পরে য়িয়ুচী জাতির সহিত সংঘর্ষের ফলে এবং চীন সাম্রাজ্য পূর্ব তুর্কীস্থানে প্রসার লাভ করিতে থাকিলে হিয়েঙ-নুদের তৎপরতার বিবরণ ক্রমে অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইতে লাগিল। এই তৎপরতার প্রভাব পরোক্ষভাবে ইরান, ভারতবর্ষ ও পূর্ব ইউরোপের ইতিহাসে লক্ষিত হয়।

চীনা ইতিহাসের এই হিয়েঙ-নু ও হুন জাতি যে অভিন্ন এ সম্বন্ধে De Guignes-এর মত (Histoire Ge´ne´rale des Huns, des Tures, des Mongols et des autres Tartares occidentalaux, 1756-58) প্রচলিত।

খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতে হিয়েঙ-নু জাতি চীনের প্রাচীর হইতে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে শত্রুর আক্রমণে এই সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং হিয়েঙ-নুদের একটি দল পশ্চিমদিকে পলায়ন করিয়া উরল নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে।

হুনদের ইতিহাস সম্বন্ধে একটু পরিষ্কার ধারণা করিতে হইলে প্রথমতঃ ভারতবর্ষ, ইরান ও পূর্ব ইউরোপে তাহাদের তৎপরতার কিছু বিবরণ দিতে হইবে। তৎপরে আরও কয়েকটি জাতির সহিত তাহাদের সম্পর্কের কথা বলিতে হইবে।

ভারতবর্ষে হুনদের তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায় খৃষ্টীয় ৪৫৫ হইতে ৫২৮ অব্দের মধ্যে, যখন বালাদিত্য ও যশোধর্মণের আক্রমণে মিহিরগুল পরাজিত ও বন্দী হন। মুক্ত হইয়া মিহিরগুল কাশ্মীর ও গান্ধারে রাজত্ব করিতে থাকেন। সুতরাং ভারতবর্ষে হুন প্রভাবের স্থিতিকাল ৫৪০ খৃষ্টাব্দে মিহিরগুলের মৃত্যুর সময় পর্যন্ত লইয়া যাওয়া যায়। মোটামুটি ৭০ হইতে ৮০ বৎসর কাল ভারতবর্ষের সীমানার মধ্যে হুনদিগের তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইরানের ইতিহাসে হুনদিগের তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায় খৃষ্টীয় ৪৮৪ হইতে ৫৬০ অব্দের মধ্যে; অর্থাৎ ইরানের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক ৮০ বৎসরের বেশী স্থায়ী হয় নাই। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে হুনরা ব্যাকৃট্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সাসানীয় সম্রাট ২য় এজ্দাদগার্দের এক পুত্র ফিরোজ হুনদের সাহায্যে সিংহাসন অধিকার করেন। সিংহাসন অধিকার করিবার পরে পুরস্কারের পরিমাণ লইয়া বিবাদ বাধিয়া যায়। লড়াইতে ফিরোজ নিহত হন। হুন বাহিনী ইরানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বিপর্যয় বাধাইয়া দেয়। কারেন বংশের জরমিহ্র হুনদিগের দাবী মিটাইয়া রাজ্যে শান্তি ফিরাইয়া আনেন। ইহার পর ফিরোজের পুত্র ১ম কবধ অসন্তুষ্ট সামন্ত ও পুরোহিত গোষ্ঠীর দ্বারা রাজ্যচ্যুত হইলে হুনদের সাহায্যে রাজ্য পুনরধিকার করেন (খৃষ্টীয় ৪৯৬)।

এই সাসানীয় সম্রাট ১ম কবধের সম্বন্ধে একটা কৌতুকজনক বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখনকার ভাষায় ইনি একজন সাম্যবাদী ছিলেন। মাজদাক নামে এক ব্যক্তি একটি নূতন মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন এবং কবধ তাঁহার উৎসাহদাতা ছিলেন। এই নূতন মত "demanded in the name of justice that he who had a superfluity of goods and wives should impart to those who had none". এই নূতন মত অনুসারে কাজও আরম্ভ হয়। অভিজাত সম্প্রদায় ও পুরোহিত গোষ্ঠীর সহিত বিবাদ আরম্ভ হয় এই নূতন মত লইয়া। রাজ্যচ্যুত হইয়া সম্ভবতঃ সাম্যবাদী সম্রাটের মতের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। কারণ তাঁহার অনুমতি অনুসারে তাঁহার পুত্র খস্রু (খস্রু অনোসর্বান, ৫৩১-৫৭১) মাজ্দাকের ক্রমবর্ধমান অনুচরমণ্ডলীকে একবারে উৎসাদিত করিয়া দেন।

খস্রু হুনদের হাত হইতে ব্যাকৃট্রিয়া কাড়িয়া লইয়াছিলেন (খৃষ্টীয় ৫৬০)। ব্যাকৃট্রিয়ার উত্তরে তাহাদের রাজ্য তুর্কীরা অধিকার করিয়াছিল। ইহার পরে ইরানের ইতিহাসে হুনদের তৎপরতার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

পূর্ব ইউরোপে হুনদের তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায় খৃষ্টীয় ৩৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে। ইহার পূর্বে তাহারা কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরের অঞ্চলে এবং ভল্গা ও ডন নদীর অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ৩৭২ খৃষ্টাব্দে বালামির নেতৃত্বে তাহারা পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে। ভিসিভিসিগথ, গথ ও বাইজানটাইন সম্রাটদিগের সঙ্গে তাহাদের ক্রমাগত সংঘর্ষ ঘটিতে থাকে। আটিলার প্রতাপে বাইজানটাইন সম্রাট হুন-প্রধানকে বার্ষিক

কর দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ৪৫২ খৃষ্টাব্দে আটিলার মৃত্যুর পর পূর্ব ইউরোপে হুন প্রভাব নষ্ট হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই প্রভাব ৮০ বৎসরের অধিক স্থায়ী হয় নাই।

ভারতবর্ষ, ইরান ও পূর্ব-ইউরোপ—এই তিন অঞ্চলেই হুন প্রভাব ৭০ হইতে ৮০ বৎসরের বেশী স্থায়ী হয় নাই। এই তথ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

আটিলার মৃত্যুর পরে হুনদের কয়েকটি দল সার্ভিয়া, মোলডেভিয়া ও ওয়ালেশিয়ায় বসবাস করিতে আরম্ভ করে। প্রধান দল উরল অঞ্চলে তাহাদের পূর্ব বাসভূমিতে ফিরিয়া যায়। বুলগারি নামে ইহারা এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করে ও শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করে। আবরদের হাতে এই রাজ্য ধ্বংস হয়। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি বুলগারি পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করে; এই সময়ে তাহারা খাজারদের সম্পর্কে আসে।

ভারতবর্ষ, ইরান ও পূর্ব ইউরোপে হুনদের কার্যকলাপের যে বিবরণ দেওয়া হইল তাহাতে দেখা যাইবে যে, De Guignes-এর বর্ণিত চীনের প্রাচীর হইতে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্য খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীর শেষভাগে ধ্বংস হইবার কাহিনী তাহার সহিত মিলে না। ভারতবর্ষ ও ইরানে খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে তাহাদের তৎপরতার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই জন্য সন্দেহ হয় যে, চীনা ইতিহাসের য়িয়ুচী বিজয়ী হিয়েঙ-নু ও ৫ম শতাব্দীর এই হুন এক জাতি নহে। এই বিষয়টি পরিষ্কার করিবার জন্য আরও কয়েকটি জাতির কথা বলিতে হইতেছে। এই জাতিগুলির নাম ছোট য়িয়ুচী বা কিদারাইট, য়ুয়ান-য়ুয়ান, তুকিউ। আবর ও খাজারদের কথাও সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইবে।

য়িয়ুচীরা কানসু হইতে বিতাড়িত হইয়া পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইবার সময়ে তাহাদের কয়েটি দল পূর্ব তুর্কীস্থানের দক্ষিণ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রথম দিক (কোন কোন মতে ৪র্থ শতাব্দীর ৩য় ভাগ) পর্যন্ত তাহারা এই অঞ্চলে থাকিয়া যায়। এই সময়ে য়ুয়ান-য়ুয়ান জাতি তাহাদের আক্রমণ করে। তাহারা পামীর অতিক্রম করিয়া কাবুল ও ব্যাকট্রিয়ায় প্রবেশ করে। য়ুয়ান-য়ুয়ান জাতির নাম হইতে অনুমান করা হইয়াছে, ইহারা মঙ্গোল গোষ্ঠীর লোক। ইহারা কিয়েনশান (আলতাই) পর্বতের দক্ষিণ অঞ্চলে বাস করিত। তুকিউ জাতিও তাহাদের অধীনে এই অঞ্চলে বাস করিত।

য়ুয়ান-য়ুয়ানগণ ব্যাকট্রিয়া হইতে ছোট য়িয়ুচী-দলের প্রধান কিদারকে (চীনা নাম কি-তো-লো) কাবুলে বিতাড়িত করে। কাবুল হইতে ইহাদের একটি দল গান্ধারে আসিয়া সেখানে ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। একটি মত অনুসারে শ্বেত হুন জাতি যখন ৫ম শতাব্দীর মধ্যভাগে অক্সাস অতিক্রম করে তখন তাহারা ব্যাকট্রিয়ায় য়ুয়ান-য়ুয়ানদিগকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পায়। অন্য একটি মত অনুসারে হুন সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া য়ুয়ান-য়ুয়ান জাতি অক্সাসের উত্তরে আপনাদিগের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাহাদের সাম্রাজ্যও হুন সাম্রাজ্য নামে পরিচিত।

তুকিউ জাতি

৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে (খৃষ্টীয় ৫৫২) য়ুয়ান-য়ুয়ানগিদকে পরাজিত করিয়া তুকিউ জাতি এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। Dr. Guigres-এর মতে এই তুকিউ জাতিই তুর্ক জাতি। তুকিউ সম্রাট থাকান বা ইলিখান নামে পরিচিত ছিলেন। থাকান সিজ্বিবু অক্সাসের পূর্ব ও উত্তরের অঞ্চল অধিকার করেন এবং সাসানীয় সম্রাট খস্রু ব্যাকট্রিয়া দখল করেন। অক্সাস নদী ইরান ও তুরানের সীমা নির্দেশক হইয়া দাঁড়ায়।

এই তুকিউ (চীনা নাম) জাতির উৎপত্তির ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, এই সম্বন্ধে

অনেক রকম মত প্রচলিত আছে। একটি মত অনুসারে তাহারা আসোনা হুনদের বা হিয়েঙ-মুদের একটি শাখা। অন্য মত অনুসারে তাহারা কারহুক (তুর্ক গোষ্ঠীয়)। তৃতীয় মত অনুসারে তাহারা হুই-খে, হোয়া-হো বা খোই-খু, প্রাচীন উইগুর জাতি, এই সকল নামে চীনা ইতিহাসে পরিচিত ছিল। একজন পণ্ডিত এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এই হুই-খে জাতির দুইটি শাখা ছিল। দক্ষিণ শাখা চীনের কাওচাংয়ে বাস করিত। ইহাদের অন্য নাম কাশান বা কুশান—কাওচাং হইতে আসিয়াছে। কাশান বা কুশান যে যিয়ুচী গোষ্ঠীর একটি নাম উপরে তাহা বলা হইয়াছে। তিয়েনশান পর্বতশ্রেণীর পূর্ব ও দক্ষিণ হইতে পামীর ও কুয়েন-লুন পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে তাহারা বাস করিত।

আবর জাতি যুয়ান-যুয়ানদের সহিত সম্পর্কিত বা তাহাদের একটি শাখা। কেহ কেহ বলেন যে, মধ্য এশিয়ায় যুয়ান-যুয়ান জাতি পূর্ব ইয়ুরোপে আবর নামে পরিচিত। পূর্ব ইয়ুরোপে আবর জাতির তৎপরতা প্রকাশ পাইয়াছিল খৃষ্টীয় ৬৯ শতাব্দীতে। আবরদের পশ্চাদানুসরণ করিয়া তুর্কী জাতি পূর্ব ইয়ুরোপে অগ্রসর হয়, ক্রিমিয়ান বসফোরাস অধিকার করে ও হেপথালাইট হুন জাতি তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া যায়।

কেহ কেহ খাজারদিগকে শ্বেত হুনদের সহিত সম্পর্কিত বলিয়াছেন। কেহ কেহ তাহাদিগকে উগ্রিয়ান বা তুর্কী গোষ্ঠীয় বলিয়া মনে করেন। কোন কোন মতে, তাহারা বর্তমান কালের জর্জিয়ার অধিবাসীদিগের পূর্ব পুরুষ। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে কাস্পিয়ান সাগর খাজার সাগর নামে পরিচিত ছিল। সে যাহা হউক, অতি প্রাচীনকাল হইতে খাজারগণ আর্মেনিয়া, ইরান ও বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত। পূর্ব ইয়ুরোপে হুন, আবর সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার পরে খাজারদিগের অভ্যুদয় ঘটে (খৃঃ ৬০০-৯৫০)। মধ্যযুগের ইরানের সাহিত্যে, বিশেষ করিয়া শাহনামায় উত্তরের সকল গোষ্ঠীর যাযাবর আক্রমণকারী জাতিকে নির্বিচারে খাজার নাম দেওয়া হইয়াছে।

উপরের বিবরণে শক, যিয়ুচী ও হুনদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় দেওয়া হয় নাই। এই সুদীর্ঘ বিবরণ দিবার উদ্দেশ্য, সিথিয়ান নামে অভিহিত জাতিগুলির সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পরিচয় দেওয়া। এই সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পরিচয় হইতে দেখা যাইতেছে যে, ইয়ুরোপের কার্পেথিয়ান পর্বতশ্রেণী হইতে উত্তর-পশ্চিম চীন ও মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত পশ্চিম হইতে পূর্বে এবং সাইবেরিয়ার দক্ষিণ হইতে এশিয়ার কেন্দ্রীয় পর্বতবলয়ের উত্তর পাদভূমি পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণের বিস্তৃত অঞ্চলে প্রাচীন যুগের ও খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত পরিচিত অধিবাসী জাতিগুলিকে সিথিয়ান নাম দেওয়া হইয়াছে। এই জাতিগুলি প্রধানতঃ তুর্ক-মঙ্গোল গোষ্ঠীর লোক। তারপর দেখা যাইতেছে, খৃঃ পূঃ ৯ম শতাব্দী হইতে ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত চীন, পূর্ব-ইয়ুরোপ, ইরান, ব্যাকট্রিয়া, আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে ইহাদের তৎপরতার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত সিথিয়ান নামে অভিহিত শক, যিয়ুচী ও হুনদিগের তৎপরতার কাল। ইহার পরে তাহাদের আর কোন উল্লেখ নাই; ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই—আফগানিস্থান, ইরাণ ও পূর্ব ইয়ুরোপের ইতিহাসেও নাই।

সিথিয়ান জাতির বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র

এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে আরও দেখা যাইতেছে যে, এই তিনটি জাতির বৃহত্তর কার্যক্ষেত্র ভারতবর্ষের বাহিরে। একটি জাতি আর একটি জাতির চাপে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরিতে ও বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়িতে বাধ্য

হয়; ভারতবর্ষের মধ্যে ইহাদের কেহই সরাসরি অভিযান করে নাই। এই তিনটি জাতির মধ্যে হুন জাতির অধিকাংশ দল পশ্চিমদিকে চলিয়া যায়। কাস্পিয়ানের উত্তর হইতে বলকান পর্যন্ত অঞ্চল তাহাদের এক শতাব্দীব্যাপী কর্মক্ষেত্র ছিল। আটিলার মৃত্যুর পর ছত্রভঙ্গ হইবার পরেও তাহারা কাস্পিয়ানের পূর্বে আর ফিরে নাই। য়িয়ুচীদের একটি অংশ ট্রান্স অক্সিয়ানা, ব্যাক্‌ট্রিয়া ও কাবুলে এক শতাব্দী কাটাইয়া ভারতবর্ষের উত্তর সীমানার মধ্যে প্রবেশ করে। শক জাতি সগডিয়ানা, ব্যাথট্রিয়া, কাবুল ও হেলমণ্ড উপত্যকায় ছড়াইয়া পড়ে। খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী (৫৪) পর্যন্ত ইরানের ইতিহাসের সঙ্গে তাহাদের যোগ রহিয়াছে। ইহাদের একটি দল ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল। এই তিনটি জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় প্রবন্ধান্তরে আলোচ্য।

এই বিষয় সম্পর্কে ১৯৫৬ সালের অক্টোবর সংখ্যার 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
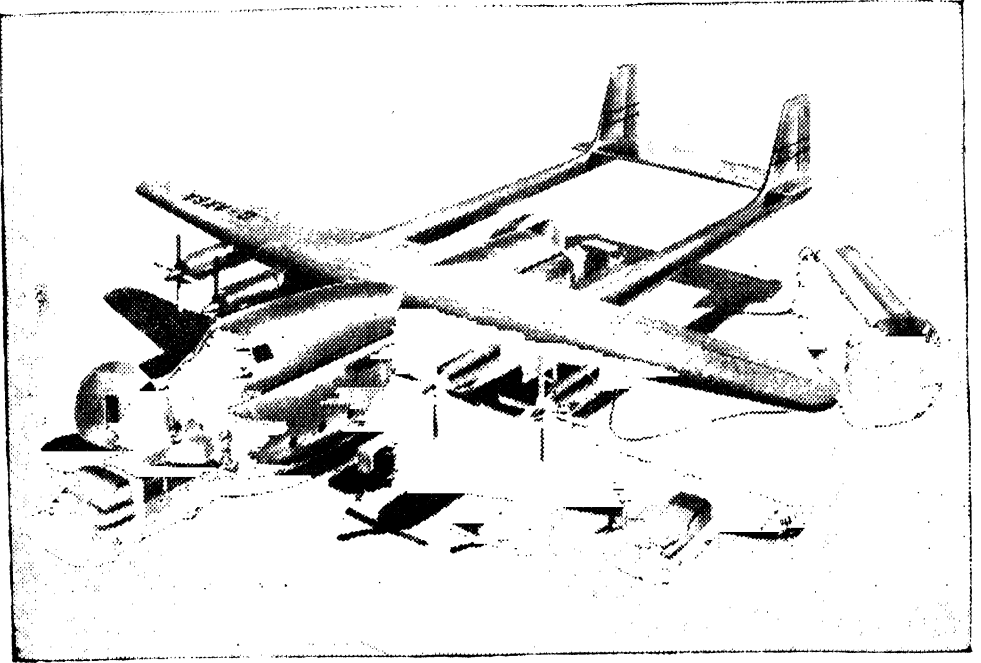
১৯০০ অশ্বশক্তির টার্বো-জেট চালিত যাত্রী ও মালবাহী অতিকায় বিমানের নমুনা।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কর্মজীবন

(১৮৮৯—১৯১৬)

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

১৮৮৭ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে ডক্টর উপাধি লাভ করবার পর আরো এক বছর সেখানে গবেষণা করে ছয় বছর পর প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৮৮ সালের অগাষ্ট মাসে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। হাতে এক পয়সাও ছিল না। জাহাজেই মালপত্র রেখে হেড পার্শারের কাছ থেকে আট টাকা ধার করে তিনি জাহাজ থেকে কলকাতার পথে নেমে পড়লেন। প্রথমেই বন্ধুদের কাছ থেকে ধুতি-চাদর ধার করে নিয়ে তিনি বিদেশী পোষাক ছেড়ে দিলেন এবং ২।১ দিন পরেই দেশের বাড়ীতে পিতা-মাতার কাছে চলে গেলেন। তাঁর পিতার তখন আর্থিক সঙ্গতি অনেকখানি হ্রাস পেয়েছিল।

ইংল্যাণ্ড ছাড়বার আগেই তখনকার দিনের বড় চাকুরী পাওয়ার পদ্ধতি অনুযায়ী তিনি ভারত গভর্ণমেণ্টের সেখানকার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও তদ্বির করেছিলেন। কিন্তু কোন চাকুরীর ব্যবস্থা করে আসতে পারেন নি; এনেছিলেন তখনকার বঙ্গদেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর অ্যালফ্রেট ক্রফ্‌ট সাহেবের কাছে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ টনী সাহেবের (তখন তিনি বিলাতে ছিলেন) এক চিঠি। চিঠির মূল বক্তব্য ছিল—ডাক্তার রায়কে নিযুক্ত করলে তিনি যে শিক্ষা বিভাগের অলঙ্কার স্বরূপ হবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু এই পত্রে কিছু কাজ হলো না। তিনি তাঁর বন্ধু ডাঃ অমূল্যচরণ বসুর বাড়ীতে থেকে চাকুরীর চেষ্টা করতে লাগলেন। কিছুদিন তিনি অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়ীতেও ছিলেন। চাকুরী নেই, লেবরেটরীর অভাবে গবেষণার কাজও বন্ধ; খুব কষ্টে তাঁর দিন কাটছিল। তিনি অধ্যক্ষ টনী সাহেবকে ধরলেন, প্রেসিডেন্সীর রসায়নের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক পেডলারকেও বললেন। লেঃ গভর্ণর স্যার ষ্টুয়ার্ট বেলীর সঙ্গে দেখা করতে দার্জিলিং গেলেন। এ দেশের কলেজগুলিতে রসায়নশাস্ত্রের আদর তখনও হয় নি। ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত হওয়ার আশা আর ছিল না। বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগে নিযুক্ত হওয়ার চেষ্টাও সফল হলো না। অবশেষে প্রায় এক বছর পর রসায়নের অধ্যাপনার জন্যে প্রেসিডেন্সী কলেজে একটি নূতন পদের সৃষ্টি হলো। প্রফুল্লচন্দ্র ২৫০৲ মাসিক বেতনে এই পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮৯ ১লা জুন, ২৮ বছর বয়সে কার্যে যোগদান করেন। এভাবে বাংলাদেশে, তথা সর্বভারতে রসায়নের চর্চা, গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়।

বলাবাহুল্য, এভাবে প্রাদেশিক সার্ভিসের Unclassified পদে নিযুক্ত হয়ে প্রফুল্লচন্দ্র তৃপ্ত হতে পারেন নি। তিনি তৎক্ষণাৎ দার্জিলিং গিয়ে ক্রফ্‌ট সাহেবকে বললেন যে, তাঁর প্রতি ভারতবাসী বলেই অবিচার করা হয়েছে। ক্রফ্‌ট ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আপনার জন্যে জীবনে অনেক পথ খোলা আছে, কেউ আপনাকে এই পদ গ্রহণ করবার জন্যে বাধ্য করছে না। এই তিক্ততা তিনি হজম করেছিলেন বটে, কিন্তু উত্তরকালে জগৎবাসীকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, বস্তুতঃই তাঁর রসায়নশাস্ত্রের জ্ঞান তাঁকে নানা সার্থক পথে নিয়ে যাওয়ার মত উচ্চাঙ্গের ছিল।

হেয়ার স্কুলে প্রথম ভর্তি হওয়ার পর যে ঘরে তিনি বসতেন সেই ঘরে তাঁর বিজ্ঞানের ক্লাশ হলো;

আর যেখানে তাঁর বেঞ্চটি ছিল সেখানেই তাঁর অধ্যাপকের চেয়ার পাতা হলো। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলি ক্লাশে চিত্তাকর্ষক না হলে ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাবে না বুঝে তিনি আগের অভিজ্ঞতার উপর আরও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করতে লাগলেন। ডিমনষ্ট্রেটর চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ীর সহ-যোগিতায় তিনি বৎসরাধিক এই ব্যাপারে ঘনঘন পরীক্ষা করে খুব দক্ষ হয়ে ওঠলেন। ছাত্রেরা তাঁর বক্তৃতা ও রাসায়নিক পরীক্ষায় এত আকৃষ্ট হতো যে, তারা তাঁদের বন্ধুদের অন্যান্য কলেজ থেকে আমন্ত্রণ করে আনতো। এভাবে অচিরেই তিনি কলকাতায় একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক হিসাবে পরিচিত হলেন।

ক্লাশ হয়ে গেলেও তাঁর ছুটি নেই। যতটা পারেন লেবেরটরীতে কাটান। নানাবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। বেড়াতে গেলেও বেশী দূরে যান না—কলেজ স্কোয়ারেই বেড়ান, কখনও বা গড়ের মাঠে। সঙ্গে থাকে ছাত্রদল। তারাই তাঁর বন্ধু, সাথী ও সম্বল। স্বজন-পরিজন তাঁকে আয়ত্তে রাখতে পারে নি—কেবল কাজ আর কাজ, যা ক্রমশঃ তাঁকে পারিবারিক বন্ধন থেকে মুক্ত করে জনসাধারণের একজন করে তুলেছিল। বিষয়ে বিরাগী, জ্ঞানান্বেষণে তপস্বী, আচার-ব্যবহারে শিশু, পোষাক-পরিচ্ছদে অতি সাধারণ এই অধ্যাপকের খ্যাতি ক্রমশঃ কলকাতার সুধী ও বিদগ্ধমণ্ডলীর মধ্যে আলোড়ন এনে দিল তিনি সকলের কাছেই সমাদৃত হতে লাগলেন।

তখনকার দিনের বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের তিনি শ্রদ্ধা আকর্ষণে সক্ষম হন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্য হওয়ার পর ব্রাহ্মবন্ধু-সভা ও সান্ধ্য সম্মিলনী গঠন করবার ভার তাঁর উপরে পড়ে। ঋষি রাজনারায়ণ বসু, অমৃত বাজারের শিশিরকুমার ঘোষ, অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, ডাঃ নীলরতন সরকার, সঞ্জীবনী সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, আলিপুর পশুশালাধ্যক্ষ রামব্রহ্ম সান্যাল, ডাঃ বিপিনবিহারী সরকার, ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর প্রভৃতি তাঁর গুণে মুগ্ধ ছিলেন। সকলেই তাঁর পরিপোষক হলেন।

বিজ্ঞান চর্চার প্রতি লোককে আকৃষ্ট করবার জন্যে তাঁর অনুসৃত এক পদ্ধতির বিষয় কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের কাছে শুনেছি। তখন কৃষ্ণবাবু সিটি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। সেখানে প্রফুল্লচন্দ্র শিশি করে কতকগুলি সুগন্ধি রাসায়নিক এনে ক্লাশে ক্লাশে দেখিয়ে ছাত্রদের বিজ্ঞান পড়তে উৎসাহিত করে বক্তৃতা করতেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁর অধ্যাপনা ও বিজ্ঞানের গবেষণা সম্বন্ধে তিনি তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন—

"আমি টেবিলের উপরে পোড়ান হাড়ের গুঁড়ার নমুনা রাখিতাম। যে উপকরণ হইতে ইহা প্রস্তুত তাহার সঙ্গে এখন আর কোন সম্বন্ধ নাই। গরু, ঘোড়া অথবা মানুষের কঙ্কাল হইতেও ইহার উৎপত্তি হইতে পারিত। হাড়ভস্ম রাসায়নিক হিসাবে বিশুদ্ধ মিশ্র পদার্থ, রাসায়নিকের নিকট ইহা ফসফেট অব ক্যালসিয়ম এবং চূর্ণ আকারে ইহা স্নায়বিক শক্তিবর্ধক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। আমি অনেক সময় খানিকটা হাড়ভস্ম আমার মুখে ফেলিয়া দিতাম এবং চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিতাম এবং ছাত্রদেরও তাহাই করিতে বলিতাম।

* * আমি অবসর সময়ে গবেষণা কার্য্য করিতে লাগিলাম। বর্তমান সভ্যতার একটা আনুসঙ্গিক ব্যাধি খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছিল। ঘি ও সরিষার তৈল, বাঙ্গালীর খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে এই দুইটাই বলিতে গেলে কেবল স্নেহ পদার্থ * * আমি এই শ্রেণীর খাদ্যদ্রব্য বিশেষভাবে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলাম। বিশ্বাসযোগ্য স্থান হইতে এই সব দ্রব্য সংগ্রহ করিলাম। * * এই কাজ হাতে লইয়া আমাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইল। আমি তিন বৎসর পর্য্যন্ত এই কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম এবং আমার গবেষণার ফলাফল জার্ণাল অব দি এসিয়াটিক

সোসাইটী অব বেঙ্গল নামক পত্রিকায় (১৮৯৪) প্রকাশিত হইয়াছিল।

পুরাতন একতলা গৃহে প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ন বিভাগ অবস্থিত ছিল। কিন্তু এখন এত কাজ বাড়িয়া গিয়াছিল যে, ঐ গৃহে আর স্থান সঙ্কুলান হইতেছিল না। ** একদিন আমি প্রিন্সিপাল টনীকে লেবরেটরীতে ডাকিয়া আনিলাম এবং চারিদিকে ঘুরিয়া বায়ুতে কয়েক মিনিট নিঃশ্বাস লইতে অনুরোধ করিলাম। ** তিনি দুই মিনিট লেবরেটরীতে থাকিয়া উত্তেজিতভাবে বাহির হইয়া গেলেন এবং শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরকে সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়া একখানি কড়া চিঠি লিখিলেন। ** পেড্‌লার সাহেবও বুঝিতে পারিলেন যে, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সহ একটি নূতন লেবরেটরী নির্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন। তিনি ক্রফট্‌কে সব কথা বুঝাইয়া স্বমতে আনিলেন এবং বাংলা গভর্ণমেণ্টের নিকটও নূতন লেবরেটরীর জন্য লিখিলেন। ** আমরা শীঘ্রই জানিতে পারিলাম যে, গভর্ণমেণ্ট নূতন লেবরেটরীর প্ল্যান মঞ্জুর করিয়াছেন। ** ১৮৯৪ সালে আমরা নূতন বিজ্ঞানাগারে প্রবেশ করিলাম।

*** শীঘ্রই ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে এই এই নূতন বিজ্ঞানাগার দেখিবার জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আসিতে লাগিলেন এবং এই ১৮৯৪ সাল হইতেই আমার রাসায়নিক গবেষণাকার্য্যে নূতন শক্তি ও উৎসাহ সঞ্চারিত হইল। আমি কতকগুলি দুর্লভ ভারতীয় ধাতু বিশ্লেষণ করিতেছিলাম—আশা ছিল যে, যদি দুই একটি নূতন পদার্থ আবিষ্কার করিতে পারি। ** এমন সময়ে আমার রাসায়নিক জীবনে এক অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটিল ** পারদের উপরে অ্যাসিডের ক্রিয়ার দ্বারা মার্কিউরাস নাইট্রেট প্রস্তুত করিতে গিয়া আমি নীচে একপ্রকার পীতবর্ণের দানা পড়িতে দেখিয়া কিয়ৎ পরিমাণে বিস্মিত হইলাম। প্রথম দৃষ্টিতে ইহা কোন বেসিক সল্ট বলিয়া মনে হইল। কিন্তু এরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা ঐ শ্রেণীর সল্টের উৎপত্তি সাধারণ অভিজ্ঞতার বিপরীত। যাহা হউক, প্রাথমিক পরীক্ষা দ্বারা ইহা মার্কিউরাস সল্ট এবং নাইট্রাইট উভয়ই প্রমাণিত হইল।

মার্কিউরাস নাইট্রাইট ও আনুসঙ্গিক বহু সংখ্যক পদার্থ এবং সাধারণভাবে মার্কিউরাস নাইট্রাইট সম্বন্ধে গবেষণার প্রকৃত (বিস্তৃত) বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন এখানে নাই ; কেন না তৎসম্বন্ধে শতাধিক নিবন্ধ রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধীয় সাময়িক পত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সময় অধ্যয়ন ও লেবরেটরীতে গবেষণা—এই দুইভাগে আমি আমার সময়কে বণ্টন করিয়া লইলাম। বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের জন্যও কতকটা সময় নির্দিষ্ট থাকিল। ** আমি বেশ জানিতাম, আমাদের কবিরাজগণ বহু ধাতব ঔষধ ব্যবহার করিতেন; উদয়চাঁদ দত্তের Materia Medica of the Hindus নামক গ্রন্থে ইহার বিবরণ আছে। এই গ্রন্থে যে সমস্ত মূল সংস্কৃত গ্রন্থের নাম করা হইয়াছে, আমি কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া তাহার কয়েকখানি পড়িলাম। প্রেসিডেন্সী কলেজের লাইব্রেরীতে প্রাপ্ত Berthelot's L'Alchimistes Grecs নামক গ্রন্থও পড়িলাম। ** প্রসিদ্ধ ফরাসী রাসায়নিক বার্থেলোর সঙ্গেই আমার পত্র ব্যবহার হইল। ** তিনি আমাকে যে উত্তর দেন তাহা তাঁহারই যোগ্য। ** এই পত্র আমার মনের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করিল— ** বার্থেলোর অনুরোধে আমি রসেন্দ্রসার সংগ্রহের ভূমিকার উপরে নির্ভর করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিলাম এবং তাঁহার নিকট উহা পাঠাইয়া দিলাম। ** বার্থেলো আমার প্রবন্ধ অভিনিবেশ সহকারে পড়িলেন এবং তাহা অবলম্বন করিয়া Journal des Savants পত্রে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিলেন। তিনি ঐ মুদ্রিত প্রবন্ধের এক কপি এবং সিরিয়া, আরব ও

মধ্যযুগের রসায়ন সম্বন্ধে তিনখণ্ডে সমাপ্ত তাঁহার বিরাট গ্রন্থও একখানি পাঠাইলেন। আমি সাগ্রহে ঐ গ্রন্থ পড়িলাম এবং সঙ্কল্প করিলাম যে, ঐ আদর্শে হিন্দু রসায়নের ইতিহাস আমাকে লিখিতেই হইবে। * * একদিন সন্ধ্যাকালে এসিয়াটিক সোসাইটির সভাগৃহে * * টেবিলের উপর একখানি Journal des Savants পড়িয়া রোমাঞ্চিত কলেবর হইলাম। আমি একজন রসায়ন শাস্ত্রের নবীন অধ্যাপক। * * অপর পক্ষে বার্থেলো একজন শীর্ষস্থানীয় রাসায়নিক এবং রসায়নশাস্ত্রের বিখ্যাত ইতিহাসকার। তিনি আমাকে Savant বা মনীষী বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। আমার মনে ধারণা হইল যে, কোন উচ্চতর সৃষ্টিকার্য্যের জন্য আমার জীবন বিধাতা কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

রসায়ন বিষয়ে হস্তলিখিত পুঁথির সন্ধানে আমি প্রবৃত্ত হইলাম। * * ভারতবর্ষের বড় বড় লাইব্রেরী-সমূহ এবং লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরীর কর্ম্মকর্তাদের নিকটও পুঁথির খোঁজ করিলাম। পণ্ডিত নবকান্ত কবিভূষণ প্রত্যহ ৪।৫ ঘণ্টা করিয়া এই কার্য্যে আমাকে সাহায্য করিতেন। তাঁহাকে আমি কাশীতে সংস্কৃত পুঁথির সন্ধানে পাঠাইলাম।"

১৯০২ সালে হিন্দু রসায়নের ইতিহাস প্রকাশিত হলে সর্বত্র প্রফুল্লচন্দ্র অভিনন্দিত হন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের Calcutta Journal of Medicine পত্রে (১৯০২, অক্টোবর), Knowledge & Nature পত্রে উচ্চ প্রশংসা প্রকাশিত হয়। বার্থেলো স্বয়ং Journal des Savant পত্রে (১৯০৩, জানুয়ারী) ১৫ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ সমালোচনা করেছিলেন।

হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসের প্রথমভাগ প্রণয়নে প্রফুল্লচন্দ্রকে এত কঠোর ও দীর্ঘকাল পরিশ্রম করতে হয়েছিল যে, তখনকার দিনের রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে অধ্যয়ন ও গবেষণা করতে তিনি সময় পান নি। এজন্যে দ্বিতীয়ভাগ রচনা কিছু-কালের জন্যে স্থগিত রেখে নব্যরসায়ন বিস্তার সঙ্গে পরিচয় স্থাপনের জন্যে ব্যস্ত হন। কিন্তু গবেষণার কাজ কখনও স্থগিত হয় নি। বৈজ্ঞানিক পত্রিকাসমূহে, বিশেষতঃ লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির পত্রে নাইট্রাইট সম্বন্ধে তাঁর বহু প্রবন্ধ এই সময়েই প্রকাশিত হয়েছিল।

পড়াশুনা করে নব্যরসায়ন সম্বন্ধে তাঁর যা জ্ঞান হলো তাতে তাঁর তৃপ্তি হয় নি; তাই তিনি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত কয়েকটি গবেষণাগার দেখবার ইচ্ছা করেন। প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসের অধ্যাপক হলেও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রসিদ্ধি লাভ করবার ফলে আইন শিথিল করে গভর্ণমেণ্ট তাঁকে রাহাখরচা দিয়ে বিলাতে পাঠান (অগাষ্ট, ১৯০৪), তাঁর প্রথম বিলাত যাত্রার ঠিক বাইশ বছর পর।

লণ্ডনে পৌছে দেখলেন, প্রত্যহ লেবরেটরীতে কিছু কাজ না করলে ভাল লাগে না। তাই তিনি ডেভি-ফ্যারাডে রিসার্চ লেবরেটরীতে কাজ করবার অনুমতি সংগ্রহ করে নিলেন। বড় বড় লেবরেটরী-গুলিতে ঘুরে ঘুরে নতুন নতুন কর্মপদ্ধতি দেখে বেড়াতেন। এমনি করে ডেওয়ার, স্যার উইলিয়াম র‍্যামজে, বন্ধু ও সহপাঠী জেম্‌স্ ওয়াকার প্রভৃতির লেবরেটরী দেখলেন এবং অনেক রসায়নবিদের কাছে পরিচিত ও সম্মানিত হয়ে জার্মেনীতে গেলেন। জার্মেনীতে অনেক লেবরেটরী দেখলেন এবং ভ্যাণ্ট-হফের সঙ্গে পরিচিত হলেন; এমিল ফিসারের সঙ্গেও যোগাযোগ ঘটলো। প্যারিসে পৌছে তিনি মঁসিয়ে সিলভ্যা লেভির সহযোগে বার্থেলোর সঙ্গে মিলিত হন। বার্থেলো তাঁকে বহু সমাদরে গ্রহণ করেন। কলকাতায় ফিরে এসে তিনি নতুন উৎসাহে কাজ সুরু করেন (১৯০৪); কিন্তু বিলাতের যুবক-বৃদ্ধ প্রত্যেকের যেমন কর্মোৎসাহ দেখে এসেছিলেন তাঁর তুলনায় বাঙ্গালীর দ্বিধাগ্রস্ত ভাব তাঁকে পীড়িত করে তুললো।

"এমন সময় একটা ব্যাপার ঘটিল যাহা ভাগবত ইচ্ছা বলিয়া বোধ হইল। অন্ততঃ তখনকার মত

ইহা জীবন্মৃত বাঙ্গালীর দেহে যেন নূতন প্রাণ সঞ্চার করিল। আমি লর্ড কার্জ্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গের কথাই বলিতেছি।

লর্ড কার্জ্জন সাম্রাজ্যবাদের দূতরূপে শঙ্কিত হৃদয়ে দেখিলেন বাংলা দেশে জাতীয়তার ভাব দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইতেছে। বাঙ্গালীর সাহিত্য ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিয়াছে এবং ভারতের সমগ্র ভাষার মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। * * ম্যাকিয়াভেলির দুষ্ট বুদ্ধি ও নিষ্ঠুর দূরদর্শিতার সঙ্গে তিনি বাংলা দেশকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। এমন ব্যবস্থা করিলেন যাহাতে উত্তর-পূর্ব ভাগে মুসলমান সংখ্যাধিক্য হয়। * * বাংলা-দেশের হৃদয়ে এমন এক শাণিত অস্ত্র সন্ধান করা হইল যাহার ফলে বাঙ্গালী জাতির সংহতি নষ্ট হয়, হিন্দু মুসলমানে চিরবিরোধ উপস্থিত হয় এবং বাংলার জাতীয়তা বোধ ধ্বংস হয়।

দেশব্যাপী তীব্র প্রতিবাদের প্লাবন বহিয়া গেল। * * সরকারী কর্মচারী হিসাবে প্রত্যক্ষ-ভাবে এই আন্দোলনে যোগ দিবার উপায় আমার ছিল না। * * এই আন্দোলন আমার হৃদয় স্পর্শ করিল। এই নবজাগরণের ফলে বিজ্ঞানের জন্যই বিজ্ঞান সাধনার আদর্শ জাতির সম্মুখে উপস্থিত হইল।"

এই সাধনায় তাঁর সঙ্গে যে সব ছাত্র যুক্ত হয়েছিলেন বা গবেষণায় লিপ্ত হয়েছিলেন, তাঁদের কথা প্রফুল্লচন্দ্র অত্যন্ত স্নেহ ও প্রশংসার সঙ্গে আত্মচরিতে উল্লেখ করেছেন—"আমার নিকট প্রথম গবেষণা বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন যতীন্দ্র নাথ সেন। তিনি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। মার্কিউরাস নাইট্রাইটের গবেষণায় তিনি আমার সহযোগিতা করেন। পরে তিনি পুষার কৃষি ইনষ্টিটিউটে প্রবেশ করেন এবং যথাসময়ে ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে স্থান লাভ করেন।

১৯০৫ সালে পঞ্চানন নিয়োগী আমার নিকট রিসার্চ স্কলার ছিলেন। তাঁহার কিছু পরে আসেন আমার সহকারী অধ্যাপক অতুল গঙ্গোপাধ্যায়। * * অতুলচন্দ্র ঘোষ নামে একজন যুবক রিসার্চ স্কলার রূপে আমার সহায়তা করিয়াছিলেন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বাংলার রাসায়নিক গবেষণার ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। ঐ বৎসরে কয়েকজন মেধাবী ছাত্র প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। তাঁহারা সকলেই পরে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মাণিকলাল দে, সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং পুলিনবিহারী সরকার আই. এস-সি ক্লাশে ভর্তি হন। রসিকলাল দত্ত এবং নীলরতন ধর বি. এস-সি উপাধির জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। মেঘনাদ সাহাও ঢাকা কলেজ হইতে আই. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই সময় ঘোষ, মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে বি. এস-সি ক্লাসে ভর্তি হইলেন। * * তাঁহাদের মধ্যে এমন প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছিল, যাহা সচরাচর দুর্লভ।** তাঁহাদের চরিত্রে এমনই একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, আমি তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইলাম।

১৯১০ সালে আমি একটি রত্ন লাভ করি। জীতেন্দ্রনাথ রক্ষিত সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হইতে বি. এস-সি পরীক্ষা দিয়া অকৃতকার্য্য হন। * * কয়েক খণ্ড পরিত্যক্ত কাচের নল হইতে তিনি এমন সব যন্ত্র তৈয়ারী করিতে পারিতেন, যাহা এতদিন জার্মানী বা ইংলণ্ডের কোন ফার্ম হইতে আনাইতে হইত। * * শীঘ্রই বুঝিতে পারিলাম তিনি একজন দুর্লভ গুণসম্পন্ন কর্মী। অ্যামাইল নাইট্রাইটের সংশ্লেষণ কার্য্যে তিনি আমার সহায়তা করিয়াছিলেন।"

নাইট্রাইট ও হাইপোনাইট্রাইট সম্বন্ধে তাঁর সহযোগে আর একজন ছাত্র, রাজেন্দ্রলাল দে (১৯১৩-১৯১৬) কতকগুলি মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি আকর্ষণ হেতু সিটি কলেজ থেকে এসে হেমেন্দ্রকুমার সেন ও

বিমানবিহারী দে তাঁর কাছেই রসায়নে এম-এ পড়তে আরম্ভ করেন। উল্লিখিত প্রত্যেকটি ছাত্র যে কেবল বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তা নয়, বিজ্ঞান-জগতে স্বাধীন গবেষণা ও আবিষ্কারের জন্যে যশস্বী হয়েছেন।

১৯১২ সালে লণ্ডনে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীকে এই কংগ্রেসে প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি ভারতের বিজ্ঞান গবেষণাকারী ও ছাত্রদের প্রতি আরও সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্যে এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। সেখানেই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের লিখিত (২৫শে জুন, ১৯১২) এক পত্র পান। তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি।

"আপনার স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত ২৪শে জানুয়ারী তারিখে সিনেটের সম্মুখে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকপদের প্রশ্ন উপস্থিত হয়, তখন আপনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞানের অধ্যাপকের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। * * আমরা একটি পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন-শাস্ত্রের—দুইটি অধ্যাপকের পদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। মিঃ পালিতের মহৎ দান এবং তাঁহার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজার্ভ ফণ্ড হইতে আরও আড়াই লক্ষ টাকা দিয়া আমরা এই সব ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছি। * * বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রসায়নাধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিবার জন্য আমি আপনাকে এখন মহানন্দে আহ্বান করিতেছি। * * আপনি ফিরিয়া আসিলেই আপনার সহায়তায় আমরা প্রস্তাবিত গবেষণাগারের পরিকল্পনা গঠন করিব এবং যত শীঘ্র সম্ভব উহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিব। আপনাকে সি. আই. ই উপাধি দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া আমি সুখী হইয়াছি; কিন্তু আমি মনে করি ইহা দশ বৎসর আগেই দেওয়া উচিত ছিল।"

দেশে ফিরে এসে প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজেই কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। তখন জে. সি. ঘোষ, জে. এন. মুখার্জি এবং মেঘনাদ সাহা উদীয়মান বৈজ্ঞানিক। বিদেশের বৈজ্ঞানিকেরা সেই সময় দত্ত ও ধরের গবেষণাসমূহের উল্লেখ করছিলেন। এসব দেখে পরবর্তীরা উৎসাহিত হতে লাগলেন। ঢাকা থেকে এসে প্রফুল্লচন্দ্র গুহ (১৯১১) প্রফুল্লচন্দ্রের শিক্ষাধীনে ছিলেন। তিনি উৎকৃষ্ট গবেষণা করে যথাসময়ে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন।

এরপর থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজ ছেড়ে বিজ্ঞান কলেজে রসায়নে পালিত অধ্যাপকপদে যাওয়া (১৯১৬) অবধি বিবরণ তাঁর ভাষাতেই সংক্ষেপে প্রদত্ত হচ্ছে।

"প্রেসিডেন্সী কলেজেই আমার কর্ম্মজীবনের প্রধান অংশ অতিবাহিত হইয়াছিল। এখন আমাকে সেই কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। * * কিন্তু কলেজ হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার পূর্বে ভূতপূর্ব প্রিন্সিপাল এইচ. আর. জেমসের যোগ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে আমি বিস্মৃত হইব না। * * গবেষণা-বৃত্তি স্থাপনের সঙ্গে মৌলিক গবেষণা কার্য্যের কিছু উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু এই উক্তিরও সীমা আছে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, দুই একজন ব্যতীত আমার ছাত্রদের মধ্যে যাঁহারা ইউরোপে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই বৃত্তিধারী ছিলেন না। * * রসিকলাল দত্ত, নীলরতন ধর, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সী কলেজে গবেষণা বৃত্তিধারী ছাত্র ছিলেন না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এম. এস-সি পাশ করিবার পরেও কলেজ লেবরোটরীতে তাঁহাদিগকে গবেষণা করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। প্রিন্সিপাল জেম্‌স্ অনেক সময় বলিতেন, এরূপ কৃতী ছাত্রেরা যে কলেজের সঙ্গে কিছুকালের জন্য সংশ্লিষ্ট থাকিবেন, ইহা কলেজের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা।

এই সময় প্রচারিত হইতে থাকিল যে, স্কুল অব কেমিষ্ট্রি, অর্থাৎ রাসায়নিক গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিতেছে। * * বিলাতের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পত্র 'নেচার' এই বিষয়টি স্বীকার করেন। উক্ত পত্রের ২৩শে মার্চ, ১৯১৬ তারিখের সংখ্যায় লিখিত হইয়াছিল—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের * * বিজ্ঞান বিভাগের ডীন যে বক্তৃতা করেন তাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। গত ২০ বৎসরে বাংলাদেশে রসায়ন সম্বন্ধে যে সব মৌলিক গবেষণা করা হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। * * অধ্যাপক রায়ের কার্য্য ও দৃষ্টান্তের ফলেই এই বিদ্বৎ-গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।"

১৯১৬ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ ছেড়ে নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করেন। সাধারণ নিয়মানুসারে তিনি আরও এক বছর ওখানে থাকতে পারতেন; কারণ তখনও তাঁর ৫৫ বছর পূর্ণ হয় নি।

প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার কালে তাঁর যে সব পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল তাদের নাম—প্রাণী-বিজ্ঞান, Chemical Research of the Presidency College. July, 1895-May, 1897, নব্য-রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি; বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার; History of Hindu Chemistry প্রভৃতি। পরবর্তীকালে তাঁর আরও বই ও প্রবন্ধাবলী মুদ্রিত হয়েছে। বস্তুতঃ তাঁর বিজ্ঞান কলেজের জীবন বিবিধ কর্ম-ধারায় প্রবাহিত হয়ে বাংলা দেশকে রামধনুর ন্যায় বিবিধ বর্ণচ্ছটায় সমুজ্জ্বল করে তুলেছিল। বাঙ্গালী ও ভারতবাসীকে তিনি কেবল বিজ্ঞান অনুশীলনেই প্রবুদ্ধ করেন নি, শিক্ষিত জনগণের মনে সর্ববিষয়ে জাতীয়তাবোধ উন্মেষের জন্যে দিকে দিকে কর্মের সূচনা করেছিলেন। বাঙ্গালী এই পরহিতব্রতী মানবদরদী, আত্মভোলা মনীষীর ডাকে সাগ্রহে সাড়া দিয়ে কৃতার্থ বোধ করতো।
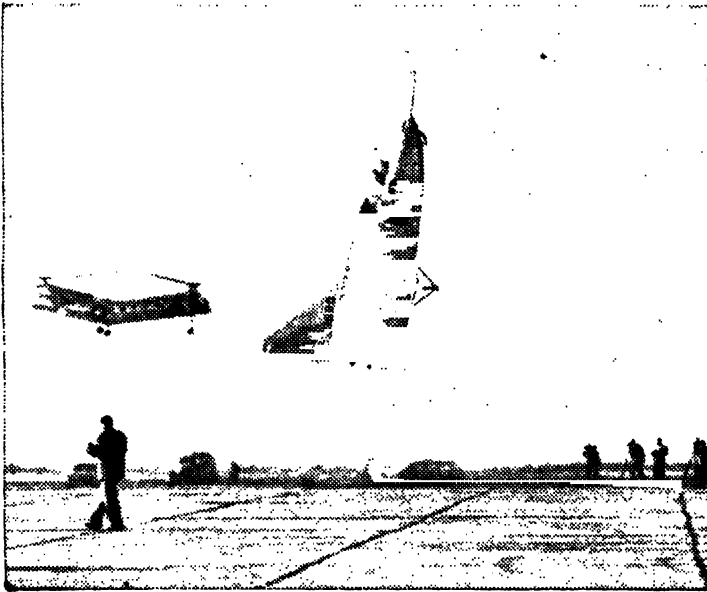
যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ধরণের বিমান-এক্স-১৩। এই বিমানগুলি একেবারে খাড়াভাবে ওঠা-নামা করতে পারে।

রাসায়নিক পরীক্ষায় ফিল্টার পেপার

শ্রীহারাণচন্দ্র চক্রবর্তী

সামান্য ফিল্টার পেপার! দেখে মনে হয় বটে সামান্য, কিন্তু গবেষণাগারে এর বিবিধ প্রয়োগ দেখলে এই ধারণা বদলে যাবে। রসায়নাগারে সাধারণতঃ পরিস্রাবণের জন্যে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর গবেষণার ফলে ফিল্টার পেপার আজ বিশ্লেষণাত্মক রসায়নে যুগান্তর এনেছে।

পরিস্রাবণের কাজ ছাড়া পেপার ক্রোম্যাটো-গ্রাফি, পেপার ইলেক্ট্রোফোরেসিস, ইলেক্ট্রো-ক্রোম্যাটোগ্রাফি প্রভৃতির ক্ষেত্রে ফিল্টার পেপার আজ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। বর্তমান প্রসঙ্গে এ বিষয়ে কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

পেপার ক্রোম্যাটোগ্রাফি

মার্টিন ও তার সহকর্মীরা ১৯৪৪ সালে পেপার ক্রোম্যাটোগ্রাফির পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। ১২।১৩ বছরের মধ্যেই রসায়নশাস্ত্র এবং জৈব বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

পেপার ক্রোম্যাটোগ্রাফির পদ্ধতিতে যে সব সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়, সেগুলি ব্যয়বহুল নয়। আবার পরীক্ষণীয় বস্তুর পরিমাণ খুব অল্প হলেও চলে। অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে এটি খুব সহজ ও সরল; অথচ এই পদ্ধতিতে মিশ্রিত বস্তুগুলিকে পরিষ্কারভাবে পৃথক করা যায়। এখন প্রায় সব দেশের গবেষকেরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে ভাল ফল লাভ করছেন। অ্যামিনো অ্যাসিড, শর্করা, অ্যামিন, ডাই, উপক্ষার, ষ্টেরল, ষ্টেরয়েড, নিউক্লিক অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড, ফসফট, ইষ্টার, আমিষ জাতীয় পদার্থ, ভিটামিন, ইন্‌অর্গ্যানিক ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন প্রভৃতি এবং আরও অনেক মিশ্র পদার্থ যা পৃথক করা কষ্ট-সাধ্য ও সময়সাপেক্ষ তা সহজে এবং সন্তোষজনক ভাবে পৃথক করা যায়। পেপার ক্রোম্যাটোগ্রাফি সম্বন্ধে এই পত্রিকায় (মার্চ, ১৯৫৫) বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

পেপার ইলেক্ট্রোফোরেসিস

বৈজ্ঞানিকেরা পেপার ক্রোম্যাটোগ্রাফিতে কাজ করেই ক্ষান্ত হলেন না, ফিল্টার পেপারে তড়িৎ প্রবাহ চালালে কি ফল পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে পরীক্ষা করতে লাগলেন। পরীক্ষায় তাঁরা সফল-কাম হলেন। বৃহৎ অণু বা যে সব পদার্থ জটিল অণু দিয়ে গঠিত (যেমন আমিষজাতীয় পদার্থ), সে সব পদার্থকে পেপার ক্রোম্যাটোগ্রাফি পদ্ধতির চেয়ে পেপার ইলেক্ট্রোফোরেসিস পদ্ধতিতে পরিষ্কারভাবে পৃথক করা সম্ভব হলো।

যে সব অণু বা পরমাণু তড়িৎ-শক্তি বহন করে তাদের যদি তড়িৎ-ক্ষেত্রে রাখা যায় তাহলে তারা তড়িৎ-শক্তি, ভর ও আকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন গতিতে চলতে থাকে। পেপার ইলেক্ট্রোফোরেসিস পদ্ধতিতে এই ব্যাপারটিকে কাজে লাগানো হয়েছে। বাফার দ্রবণে ফিল্টার পেপারের একটা ফালিকে ভিজিয়ে নিয়ে সেই ফালির দুই প্রান্তে দুটা তড়িৎপ্রান্ত লাগিয়ে ফালির উপর লম্বালম্বি ভাবে একটা তড়িৎ-ক্ষেত্র তৈরী করা হয়। এই ফালির উপর তখন ফোঁটার আকারে পরীক্ষণীয় বস্তুর মিশ্রণ প্রয়োগ করলে মিশ্রিত পদার্থগুলি ফালির ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জমা হতে থাকে।

এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন আমিষ জাতীয় পদার্থ, পিউরিন্‌স্‌, পিরিমিডিন্‌স্‌, নিউক্লিক অ্যাসিড, উপক্ষার, শর্করাজাতীয় পদার্থ, ফস্‌ফরাসঘটিত জৈব পদার্থ প্রভৃতিকে বিশ্লেষিত করা হয়েছে। অনেক ধাতব পরমাণুকেও এই পদ্ধতিতে বিশ্লেষিত করা গেছে। এই পদ্ধতিতে চিকিৎসকদের অনেক সুবিধা হয়েছে এবং তাঁদের গবেষণাগারেও এই পদ্ধতিতে নিয়মিতভাবে কাজ চলছে।

দ্রবণকে সমুচ্চতায় রাখা দরকার। ফিল্টার পেপারের সরু ফালি বা চওড়া ফালিকে, যে বাফার দ্রবণ নিয়ে কাজ করা হবে, সেই দ্রবণে ভিজিয়ে ফিল্টার পেপার দিয়ে শুকিয়ে নেওয়ার পর কাঁচের ষ্ট্যাণ্ডের উপর এমনভাবে সাজানো হয় যাতে উভয় প্রান্ত E ও E´ বাফার দ্রবণ পাত্রে ডুবে থাকে। তারপর বেলজারটিকে কাঠের চাকৃতির খাঁজে বসিয়ে খাঁজের চারদিকে গ্রীজ
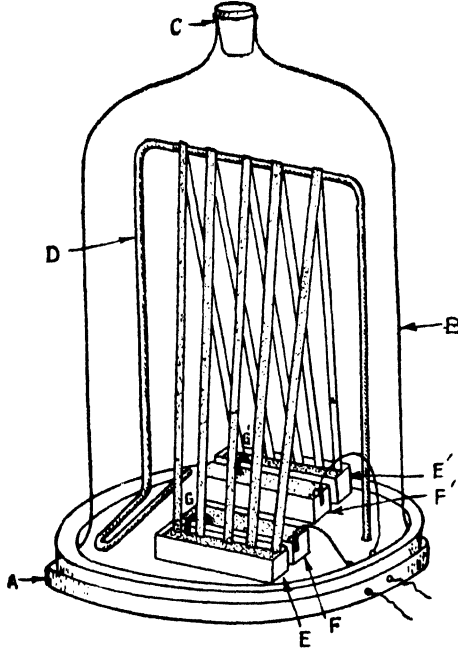
১নং চিত্র

উল্লম্ব গতির জন্যে এরূপ যন্ত্র পেপার ইলেক্ট্রোফোরেসিসে ব্যবহৃত হয়।

এই পদ্ধতিতে অনেক উপায়ে কাজ হয়ে থাকে। বিভিন্ন কাজের উপর সেটা নির্ভর করে। নিম্নে কয়েকটির বিবরণ দেওয়া হলো।

(ক) উল্লম্বগতি—(১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। A গোলাকার খাঁজকাটা কাঠের চাকৃতি, B বেলজার, C ছিপি, D কাঁচের ষ্ট্যাণ্ড, E, F, E´ ও F´ বাফার দ্রবণের পাত্র ও G´ সাইফন প্রভৃতি সরঞ্জামগুলি উল্লম্ব পদ্ধতিতে প্রয়োজন হয়।

সাইফনের সাহায্যে পাত্রগুলিতে বাফার দেওয়া হয়। বেলজারের ভিতরটা বাফার দ্রবণের বাষ্পে সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে। প্ল্যাটিনাম দিয়ে তৈরী তড়িৎপ্রান্ত দুটি কিন্তু F ও F´ পাত্রের মধ্যে থাকে। এর কারণ হলো যাতে ফালিগুলি তড়িৎ-প্রান্তের সংস্পর্শে না আসে। তড়িৎপ্রান্ত দুটিকে প্রধান সরবরাহের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। তড়িৎ-প্রবাহের পথে মিলিঅ্যাম্‌মিটার, ভেরিএবল রেজিষ্ট্যান্স, ভোল্টমিটার প্রভৃতি থাকে। তড়িৎ-প্রবাহ খুব কম যায় বলে মিলিঅ্যাম্‌মিটার লাগে।

খানিকক্ষণ তড়িৎ-প্রবাহ চালিয়ে ভোল্টেজ এবং তড়িৎ-প্রবাহ ঠিক করে বন্ধ করা হয়। বেলজারের ছিপিটি খুলে পরীক্ষণীয় বস্তুর মিশ্রণ মাইক্রো-পিপেট বা মাইক্রোসিরিঞ্জ দিয়ে ফালির শীর্ষে প্রয়োগ করে ছিপিটি বন্ধ করে দেওয়া উচিত, ৬।৭ ঘণ্টা বা আরও বেশীক্ষণ সময়। সেটা অবশ্য কাজের উপর নির্ভর করে। তড়িৎ-প্রবাহ যাওয়ার পর ফালিগুলিকে বের করে শুকিয়ে সূচক-দ্রবণ 'স্প্রে' করা হয়। ফালিগুলিকে শুষ্ক করবার পর কতকগুলি দাগ দেখতে পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে ভেজাবার আগে ফালিগুলিকে অতি-বেগুনী আলোয় রাখলে প্রতিপ্রভা বা শোষণ দেখা যায়।

(খ) অনুভূমিক পদ্ধতি—অনুভূমিক পদ্ধতিতে কি কি সরঞ্জাম লাগে ২নং চিত্রটি দেখলে তা বুঝতে পারা যাবে। A পার্সপেক্সের বাক্স, B কাঁচের ঢাকনা, C ও D ছিপি, G, H, J, J′, J″, G′ ও H′ বাফার দ্রবণের পাত্র, E F কাঁচের ইবোনাইটের ফ্রেম ; এর উপরে ফালিগুলি সাজানো যাবে। পূর্বের মত ক্রিয়াগুলি করবার পর ছিপি খুলে পরিক্ষণীয় বস্তুর মিশ্রণ ফালিগুলির মাঝখানে ফোঁটার আকারে দিয়ে ছিপি বন্ধ করে দেওয়া উচিত। কোন কোন যন্ত্রে ফিল্টার পেপারের ফালিকে একখানি কাঁচের পাতের উপর রেখে তার উপর আর একখানি কাঁচের পাত রাখা হয়। অনেকে কাজের সুবিধার জন্যে নিজের ইচ্ছামত যন্ত্র তৈরী করে নেয়।

(গ) ফিল্টার ডিস্ক ইলেক্ট্রোফোরেসিস—সারকুলার পেপার ক্রোম্যাটোগ্রাফির ন্যায় এই পদ্ধতিটি প্রবর্তিত হয়েছে। এক্ষেত্রে একেবারে বৃত্তাকার ফিল্টার পেপার ব্যবহৃত না হয়ে পরিধির কাছে ইংরাজী V অক্ষরের মত কাটা থাকে। ফিল্টার পেপারের কেন্দ্রের চারদিকে আর একটি ছোট বৃত্ত এঁকে মাঝখানে গর্ত করে বাফার দ্রবণে ভিজিয়ে, শুকিয়ে এবং ঐ গর্তে ফিল্টার পেপারের পল্‌তে ঢুকিয়ে দুটি পেট্রিডিসের মধ্যে রাখা হয়। ঐ দুটি পেট্রিডিসের ভিতরে বাফার দ্রবণ সমেত আরও একটি ছোট পেট্রিডিস থাকে। প্রথমোক্ত পেট্রিডিস দুটির উপরেরটি ঢাকনার কাজ করে। এর মাঝখানে একটি বড় গর্ত আছে। গর্তটি ছিপি দিয়ে বন্ধ থাকে। বাফার-অ্যাগার ভর্তি কাঁচনলের একটি প্রান্ত ছিপি ও পল্‌তের মধ্যে গিয়ে ছোট পেট্রিডিসের বাফার দ্রবণে ডোবে। অপরটি ধনাত্মক তড়িৎ-প্রান্তের পাত্রে থাকে। পেট্রিডিস দুটি একটি প্রকোষ্ঠ তৈরী করে, যার ফলে ভিতরে সম্পৃক্ত-করণের সুবিধা হয়। এই প্রকোষ্ঠটি আরও বড় একটি পেট্রিডিসের মধ্যে থাকে। এতে বাফার
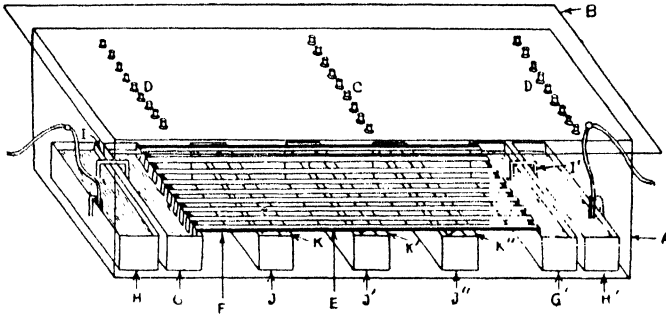
২নং চিত্র
পেপার ইলেক্ট্রোফোরেসিসে অনুভূমিক গতিতে কাজ করবার জন্য এ রকম যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

দ্রবণ ঢেলে এবং ফিল্টার পেপারের পরিধির কাছে কাটা V-গুলিকে বাফার দ্রবণে ডুবিয়ে দিতে হয়। বাফার-অ্যাগার ভর্তি অন্য কাঁচ নলের একটি প্রান্ত ঐ বাফার দ্রবণে, আর অপরটি ঋণাত্মক তড়িৎ-প্রান্তের পাত্রে রাখা উচিত। এখানে তড়িৎ-প্রবাহ কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে যায়। ঢাকনাটি খুলে ছোট বৃত্তের পরিধির উপরে অবস্থিত কয়েকটি বিন্দুতে মাইক্রোপিপেট দিয়ে পরীক্ষণীয় বস্তুর মিশ্রণ প্রয়োগ করে একটি বিন্দুতে প্রমাণ দ্রবণ ও সূচক দ্রবণ দেওয়া হয়। কয়েক ঘণ্টা তড়িৎ-প্রবাহ চলবার পর সূচক দ্রবণ পরিধির কাছে গেলে ফিল্টার পেপারটি বের করে শুকিয়ে সূচক দ্রবণে ভেজান বা ছড়ানো দরকার। তারপর পেপারটিকে শুকিয়ে নিলে বেশ সুন্দর উপবৃত্তের আকারে দাগ দেখতে পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিটি খুব সহজ ও সরল। এক সঙ্গে অনেকগুলিকে পৃথকীকরণের সুবিধা হয়।

এখন দেখা যাচ্ছে যে, ফিল্টার পেপারের উপর তড়িৎ-প্রবাহ চালালে পরীক্ষণীয় বস্তুগুলি দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কতকগুলি ধনাত্মক, আর অন্যগুলি ঋণাত্মক তড়িৎপ্রান্তের দিকে যায়। বাফার দ্রবণের pH এবং আয়নিক ষ্ট্রেংথের উপর এটা নির্ভর করে। পরীক্ষণীয় বস্তুগুলির আইসো-ইলেকট্রিক পয়েণ্টস দেখে বাফার দ্রবণের আনুমানিক pH নির্ধারণ করা হয়। বিভিন্ন কাজের জন্যে বিভিন্ন বাফার দ্রবণ, তার pH এবং আয়নিক ষ্ট্রেংথ ও বিভিন্ন ক্রমের ফিল্টার পেপার দরকার। একই রকমের মান পেতে হলে একই pH-এর বাফার দ্রবণ, ফিল্টার পেপার, তাপ, তড়িৎ-প্রবাহ এবং ভোল্টেজে কাজ করা উচিত। সূচক দ্রবণ ছড়াবার পর শুষ্ক ফালিগুলিকে ইলেকট্রোফোরে-গ্রাম বলে। ডেন্সিটোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে এই ইলেকট্রোফোরেগ্রামগুলির মাত্রা ভাগ করতে পারা যায়। পেপারের সাদা অংশকে শূন্য ধরে লেখ বা গ্রাফ আঁকা হয়। যেখানে দাগের ঘনত্ব বেশী সেখানে গ্রাফের শীর্ষদেশ পাওয়া যায়।

পেপার ইলেকট্রোফোরেসিস জোন-ইলেক-ট্রোফোরেসিসের মধ্যে পড়ে। জোন-ইলেক-ট্রোফোরেসিসে মণ্ডলের মত দাগের সৃষ্টি হয় বলে এরূপ নাম দেওয়া হয়েছে। পেপার আইয়োনো-ফোরেসিস কথাটিও ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ বলেন যে, ছোট ছোট অণু নিয়ে কাজ করাকে পেপার আইয়োনোফোরেসিস বলে। যাহোক, পেপার আইয়োনোফোরেসিস্ এবং পেপার ইলেকট্রোফোরেসিসের মধ্যে তেমন বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

সাম্প্রতিক কালে যেসব বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টায় পেপার ইলেকট্রোফোরেসিস যন্ত্রগুলির উন্নতি সাধিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে উইল্যাণ্ড, ফিসার, ডুরাম, তুর্বা, ইলেস্কেপ, ক্রেমার, টিসেলিয়াস, কুঙ্কেল, ম্যাকডোল্যাণ্ড প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই পদ্ধতিটি প্রবর্তিত হয়েছে ১৯৪৮ সাল থেকে। এত কম সময়ের মধ্যে এ বিষয়ে প্রায় আট শতাধিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

ইলেক্ট্রোক্রোম্যাটোগ্রাফি

কোন দ্রব্য ফিল্টার পেপারের উপরিতলে শোষিত হলে তড়িৎ-ক্ষেত্রে তার গতি মন্থর হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে ইলেক্ট্রোফোরেসিস এবং পেপার ক্রোম্যাটোগ্রাফির সাহায্য নিলে পৃথকীকরণের কাজে অনেক সুবিধা হয়। অ্যামিনো অ্যাসিড পৃথক করবার জন্যে হোগার্ড এবং ক্রোনার ১৯৪৮ সালে এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন। তাঁরা দেখেন যে, পেপার ক্রোম্যাটোগ্রাফির চেয়ে এই পন্থায় অম্লজাতীয় এবং ক্ষারজাতীয় অ্যামিনো অ্যাসিড-গুলির মধ্যে ভাল ভাবে ব্যবধান করতে পারা যায়।

ইলেক্ট্রোক্রোম্যাটোগ্রাফিতেও অনেক উপায়ে কাজ করা হয়। নীচে কয়েকটির বিষয় বলা হচ্ছে—

(ক) প্রথমে ইলেক্ট্রোফোরেসিসের কাজ,

তারপর তড়িৎ-প্রবাহের গতির সমকোণে পেপার ক্রোম্যাটোগ্রাফি করা।

(খ) এক সঙ্গে একদিকে দ্রাবক ও তড়িৎ-প্রবাহের গতি।

(গ) এক সঙ্গে দ্রাবকের গতির সমকোণে তড়িৎ-প্রবাহ।

এসব পন্থায় কাজ করতে হলে প্রথমে সুবিধা মত ফিল্টার পেপারকে বাফার দ্রবণে ভিজিয়ে শুষ্ক করে পরীক্ষণীয় বস্তুর দ্রবণ প্রয়োগ করা হয়। প্রয়োগ বিন্দুটি ফিল্টার পেপারের এক দিকের মাঝখানে থাকে। খ-এর ক্ষেত্রে তড়িৎ-প্রবাহ চালাবার জন্যে ফিল্টার পেপারের তলায় দু-দিকে কলয়ড্যাল গ্র্যাফাইটের প্রলেপ দেওয়া হয়। ষ্টেনলেস ষ্টীলের ট্রাফটি, যার মধ্যে ফিল্টার পেপারের অপর দিকটা থাকে, ঋণাত্মক তড়িৎপ্রান্তের কাজ করে। তড়িৎ-প্রবাহের গতি পরিবর্তন করলে প্রয়োগ বিন্দুর উপরে দু-দিকে গ্র্যাফাইটের প্রলেপ লাগে। ষ্টেনলেস ষ্টীলের ক্লিপগুলি তড়িৎপ্রান্ত দুটিকে প্রধান সরবরাহের সঙ্গে সংযুক্ত করে। গ-এর বেলায় ফিল্টার পেপারের দু-ধারে দু-দিকে গ্র্যাফাইটের প্রলেপ দিতে হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রে সমভাবে প্রলেপন করা উচিত। গ-পদ্ধতিটি দ্বিমাত্রিক পদ্ধতির মত। এই পদ্ধতিতে খুব কাছাকাছি Rf value-এর অ্যামিনো অ্যাসিড, যেমন—লিউসিন, আইসোলিউসিন, নরলিউসিন এবং ফিনাইল-অ্যালানিনকে পৃথক করতে পারা গেছে।

ইলেকট্রোক্রোম্যাটোগ্রাফির পদ্ধতিগুলির অনেক উন্নতি হয়েছে। বিশেষ প্রয়োগ-কৌশলের সাহায্যে অবিরাম পৃথকীকরণ এবং ত্রিমাত্রিক পন্থাতেও অনেকে কাজ করছেন।

বৃটেনে নির্মিত টেলিভিসন বাস। বাসটিতে টেলিভিসন প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে।

চিকিৎসায় সর্পগন্ধা

শ্রীদুর্গাদাস

বর্তমান যুগে যে দুটি অতি কঠিন রোগ সভ্য সমাজকে বিধ্বস্ত করছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে, রক্তের চাপবৃদ্ধি (High blood pressure) আর অন্যটি হচ্ছে হৃদ্‌যন্ত্রের ধমনীরোগ (Coronary thrombosis)। এই দুটি রোগেই পৃথিবীর বহু মনীষী, জননেতা ও বিজ্ঞানীর মৃত্যু সংবাদ আমরা প্রতিদিন খবরের কাগজে পড়ে স্তম্ভিত হই।

এই দুটি রোগের সঠিক কারণ এখনও জানা যায় নি, তবে এর চিকিৎসার জন্যে মানুষ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন বস্তু ব্যবহার করেছে। কিন্তু যে ভেষজটি ভারতে প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, ইউরোপ ও আমেরিকায় নানাপ্রকার গবেষণার ফলে তা-ই আজ সব দেশে আদৃত হয়ে উঠেছে।

ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি জার্মান ডাক্তার লেনার্ড রাউল্‌ফ ভেষজ উদ্ভিদের সন্ধানে প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন। তার কয়েক বছর পরে ফরাসী উদ্ভিদবিদ্ প্লুমিয়ার ভারতে সর্পগন্ধার সন্ধান পান এবং রাউল্‌ফের সম্মানার্থে তার নাম দেন Rauwolfia Serpentina। প্রায় ৩০০ বছর অবহেলার পর বিংশ শতাব্দীতে কয়েকজন ভারতীয় উদ্ভিদবিদ্ ও চিকিৎসক সর্পগন্ধার বিষয়ে নতুন গবেষণা আরম্ভ করেন। তারপর সুইজারল্যাণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা আরও নানাবিধ পরীক্ষায় এর গুণাগুণের বিষয় প্রমাণ করেন। ফলে, নতুন করে সর্পগন্ধার জয়যাত্রা সুরু হয় এবং চিকিৎসার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর আদর বাড়তে থাকে।

আগে এই ভেষজটি নানা রোগে ব্যবহৃত হলেও প্রধানতঃ মৃগী, সন্ন্যাস, অনিদ্রা ও স্নায়ু রোগেই এর প্রয়োগ ছিল বেশী।

১৯৩১ সালে দিল্লীতে ডাঃ সালিমুজ্জামান সিদ্দিকি ও ডাঃ রাফাৎ হোসেন সিদ্দিকি সর্পগন্ধার শিকড় থেকে পাঁচটি উপক্ষার (alkaloid) আবিষ্কার করেন। তার অল্প পরে কলকাতায় Tropical School-এর ডিরেক্টর ডাঃ রামনাথ চোপরার তত্ত্বাবধানে ডাঃ বসু ও ডাঃ সেন এ বিষয়ে আরও পরীক্ষা করেন। ১৯৪০ সালে একমাত্র ভারতেই ১০ লক্ষ রোগী রক্তের চাপের জন্যে এই ভেষজ ব্যবহার করে। তখন থেকেই মানসিক ও স্নায়বিক রোগে এর ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৪৯ সালে বোম্বাই-এর ডাঃ রুস্তমলাল উকিল রক্তের চাপে কাতর ১০০ জন রোগীর উপর পরীক্ষা করে দেখান যে, বার্বিটুরেট পর্যায়ের কৃত্রিম ওষুধের চেয়ে এই ভেষজটি অনেক ভাল। এই সংবাদ প্রকাশের পর বোষ্টনের ম্যাসাচুসেট্‌স্ হাসপাতালে ডাঃ উইলকিন্‌স্ এই বিষয়ে গবেষণা সুরু করেন। এই সময়েই দেরাদুনে সর্পগন্ধার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে এবং বোম্বাইয়ে এর গুণাগুণ পরীক্ষার জন্যে বিস্তৃত গবেষণা আরম্ভ হয়।

১৯৫০ সালে সুইজারল্যাণ্ডের একটি সুবৃহৎ ওষুধের কারখানায় (Ciba) ডাঃ এমিল সিট্‌লার কয়েকজন সহযোগীর সঙ্গে সর্পগন্ধার উপক্ষার গুলিকে পৃথক করবার জন্যে দুটি জটিল যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। Selective Chromatography এবং Counter current extraction—এই দুই প্রক্রিয়ার সাহায্যে তাঁরা এই কাজে বিশেষ সাফল্য লাভ করেন। সিট্‌লারের সহকর্মী ডাঃ মুলার সর্বপ্রথমে রিসার্পিন নামক উপক্ষার বিশোধিত অবস্থায় নিষ্কাশন করেন। সঙ্গে সঙ্গে আর এক সহকর্মী ডাঃ হিউগো দেখান যে, সর্পগন্ধার উপক্ষারের

মধ্যে এটিই সব চেয়ে শক্তিশালী। এই বৈজ্ঞানিক দল তখন রিসার্পিনের রাসায়নিক প্রকৃতি নিরূপণে আত্মনিয়োগ করেন। দেখা গেল—রিসার্পিনের আণবিক গঠন অতি জটিল। সঙ্গে সঙ্গে ইঁদুর, পায়রা ও রিসাস জাতীয় বানরের উপর এই ওষুধের পরীক্ষা সুরু হয়। রিসাস বানরের প্রকৃতি অতি ক্রূর এবং অস্থির। ওষুধ প্রয়োগে তারা সহজেই শান্ত হলো, অথচ তাদের ঘুমের পরিমাণ বৃদ্ধি বা চেতনা লোপ হলো না। ইঁদুরের রক্তের চাপ কৃত্রিম উপায়ে বাড়িয়ে এই ওষুধের সাহায্যে তা কমানো সম্ভব হলো। রিসার্পিনের একটি প্রধান গুণ এই যে, শরীরের কোন তন্তুর উপর এর বিষক্রিয়া নেই। ২০ মাসের শিশু ভুলক্রমে একবার ৮০০ মাত্রা পরিমাণ ওষুধ খেয়ে ফেলে। তিন দিন ঘুমন্ত অবস্থায় থাকবার পরে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে।

মস্তিষ্কের উপরের দিকে অবস্থিত প্রধান অংশে (cerebrum) এই ওষধ অবসাদ ঘটায় না। Hypothalamus নামক অপেক্ষাকৃত নীচের অংশে এর ক্রিয়ায় রক্তের উচ্চচাপ ধীরে ধীরে কমে আসে, রোগীর অস্থিরতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায় এবং হৃৎপিণ্ডের দ্রুতগতি মন্থর হয়ে আসে। অধিক মাত্রায় দিলে ঘুমের পরিমাণও বাড়ে। হাজার হাজার রোগীর উপর পরীক্ষায় এই গুণগুলি সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়েছে। রক্তের চাপ কমাবার জন্যে Nitrofuran, Chloropromazine, Hydralazine ইত্যাদি কৃত্রিম ওষুধ থাকলেও তাদের ব্যবহারে নানা অসুবিধা আছে; এমন কি, বিপদও হতে পারে। রিসার্পিনে কিন্তু তা ঘটে না। লক্ষ লক্ষ রোগীর উপর নির্বিঘ্নে প্রয়োগ করে ডাক্তারেরা এখন সন্তুষ্ট হয়েছেন। আমেরিকায় ৯০ লক্ষ মানসিক রোগীর চিকিৎসায় এর ফলে যুগান্তর ঘটেছে বলা যায়। রক্তের চাপ বৃদ্ধি ও স্নায়ুরোগ ছাড়াও অন্য অনেক ক্ষেত্রে এর ব্যবহার ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।

সবচেয়ে নতুন এবং আশার কথা এই যে, সম্প্রতি রিসার্পিন করোনারি থ্রম্বোসিস রোগেও ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। রক্তচাপের রোগে যেমন ধমনীগুলি শক্ত হয়ে যাওয়ায় স্থিতিস্থাপকতা কমে গিয়ে সেগুলি রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত ঘটায়, করোনারি রোগে হৃদ্‌যন্ত্রের নীচের ধমনীতেও সেই অবস্থা ঘটে। সেই সঙ্গে রক্তের কিছু অংশ জমাট বেঁধে ডেলার আকারে তার মধ্যে আটকে গিয়ে রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। এর ফলে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী—যাদের দিনরাত সর্বশরীরে রক্ত সঞ্চালন অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়—যথেষ্ট পরিমাণে পোষকবস্তু ও অক্সিজেন না পেয়ে অবসন্ন হয়ে পড়ে। এই রোগে হৃৎপিণ্ডের সামনে অবস্থিত বুকের পেশীতে দারুণ বেদনাবোধ হয়। সেই বেদনা বাম কাঁধ দিয়ে বাম হাত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে বেদনার বদলে বুকে ভার বোধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে রক্তের চাপ কমে এবং নাড়ীর গতি দ্রুত হয়। রক্তের চাপ কম হওয়ায় মূত্রগ্রন্থি ও মস্তিষ্কে নানা উপসর্গ দেখা দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ফুস্‌ফুসে জল জমে। Electrocardiograph যন্ত্রের সাহায্যে এই রোগকে অন্য রোগ থেকে তফাৎ করা সম্ভব। যাদের রক্তের চাপ বেশী তাদের মধ্যে এই রোগের প্রকোপ বেশী দেখা যায়।

এই রোগের চিকিৎসায় রোগীকে নড়াচড়া বন্ধ করে সম্পূর্ণ শান্ত রাখা দরকার। রোগ-প্রকাশের আগে থেকেই বুকে সামান্য বেদনা হলেও ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া দরকার। Angina pectoris নামক কষ্টদায়ক রোগ থেকে করোনারির আক্রমণ সুরু হতে পারে। আক্রমণ সুরু হলে অন্ততঃ দেড়মাস রোগীকে বিছানায় শুইয়ে রাখা একান্ত দরকার। বেদনাবোধের জন্যে মর্ফিন প্রয়োগ করা দরকার হতে পারে। রক্তের চাপ বাড়াবার জন্যে ডিজিট্যালিস বা অন্য কোন উত্তেজক ওষুধ দেওয়া একেবারেই উচিত নয়।

রক্তের সঞ্চালন বাড়াবার জন্যে Coramine adenosine দেওয়া যেতে পারে। রক্তের জমাট বাঁধা বন্ধ করবার জন্যে এখন অনেক ওষুধ পাওয়া যায়। সুইজারল্যাণ্ডের ডাঃ সুম্যান সম্প্রতি দেখিয়েছেন যে, এই রোগেও রিসার্পিন প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়। অল্প মাত্রায় এ নাড়ীর গতি ধীরে ধীরে কমিয়ে আনে।

আর একটি নতুন খবর এই যে, যুক্তরাষ্ট্রে নিউ ব্রান্‌স্‌উইক সহরে স্কুইব ইনষ্টিটিউটের কয়েক-দল বিজ্ঞানী সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় রিসাপিন প্রস্তুতে সক্ষম হয়েছেন। এই রকম জটিল রাসায়নিক সংশ্লেষণ অতি দুরূহ ব্যাপার। এখন এই বিজ্ঞানীরা আশা করেন যে, সহজলভ্য বস্তু থেকে একদিন এই মূল্যবান ওষুধ প্রস্তুত করা সম্ভব হবে। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই বছরে ৩ থেকে ৩½ কোটি ডলার মূল্যের রিসাপিন বিক্রয় হয়। সুতরাং এই প্রস্তুতি যে বিশেষ লাভজনক হবে তাতে সন্দেহ নেই। কৃত্রিম উপায়ে কারখানার কোন বস্তু তৈরী করবার মূল্য তখনই বোঝা যায়, যখন যুদ্ধ বা অন্য কোন কারণে বিদেশ থেকে কাঁচা মাল আমদানী বন্ধ হয়ে যায়, অথবা যখন কৃত্রিম ওষুধ স্বাভাবিক ওষুধের চেয়ে কম দামে তৈরী করা সম্ভব হয়। আবার আসল ওষুধের কাছাকাছি রাসায়নিক গঠনযুক্ত অথচ শক্তিশালী ওষুধ কম খরচে তৈরী হতে পারে। ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসায় এভাবে কুইনিনের বদলে ব্যবহার্য আরও শক্তি-শালী ওষুধ অনেকগুলি তৈরী হয়েছে।
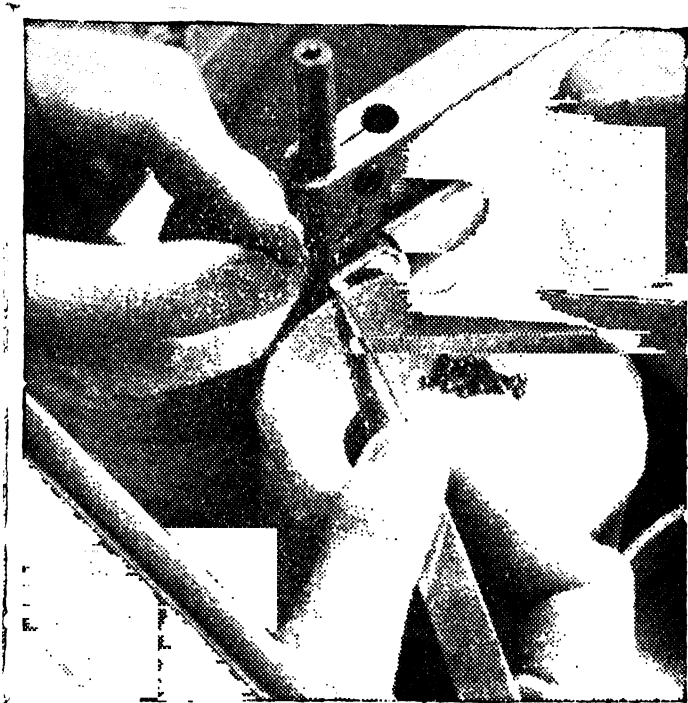
আজকাল রেডিও ভাল্‌ভের পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রেই ট্র্যানজিষ্টর ব্যবহার করা হচ্ছে। তাছাড়া মাইক্রোফোন ও কম্পিউটর প্রভৃতি যন্ত্রে ট্র্যানজিষ্টর ব্যবহৃত হয়। একটি বৃটিশ রেডিও যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানায় প্রচুর পরিমাণে জারমেনিয়াম ট্র্যানজিষ্টর তৈরীর ব্যবস্থা হয়েছে।

পরলোকে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র

গত ১২ই জুলাই শুক্রবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব পালিত অধ্যাপক ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র থ্রম্বোসিস রোগে সুখলাল কারনানী হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে ডাঃ মিত্রের ৭৫ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তাঁহার পত্নী পূর্বেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন।
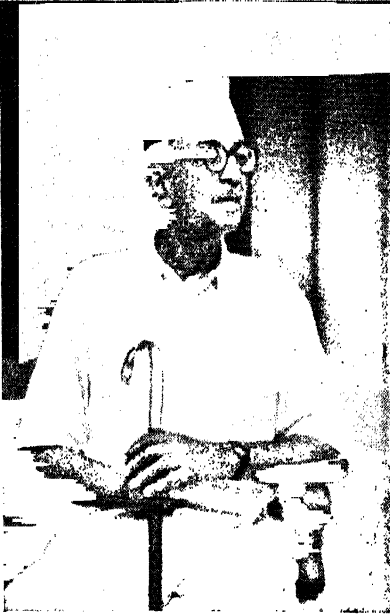
ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র

১৮৮২ সালে ডাঃ মিত্র বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে তিনি বি. এস-সি ও রসায়নশাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্র হিসাবে বরাবরই তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ১৯১২ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি. এইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করিয়া সায়েন্স কলেজে রসায়নশাস্ত্রের রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন এবং ১৯৩৬ সালে তিনি পালিত অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৪৬ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সিনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য হিসাবে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। সায়েন্স কলেজের সংগঠন কার্যে তাঁহার অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তিনি কেবল বিজ্ঞান সাধকই ছিলেন না, সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার অনুরাগ ছিল অপরিসীম। ইংরেজী ছাড়াও তিনি ইটালিয়ান, ফরাসী, জার্মান ও রুশ—এই চারিটি বিদেশী ভাষা জানিতেন। সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ এতই প্রবল ছিল যে, টলষ্টয়ের রচনাবলী মূল ভাষায় পড়িবার জন্য তিনি শেষ জীবনে রুশ ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সহিত ডাঃ মিত্র বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরিষদ প্রকাশিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার তিনিই ছিলেন প্রথম সম্পাদক। ১৯৪৮ হইতে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত তিনি 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের' সম্পাদনা করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার মৃত্যুতে বাংলার তথা সমগ্র দেশের বিজ্ঞান জগতের যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। আমরা পরলোকগত রসায়নাচার্যের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অগাষ্ট—১৯৫৭

দশম বর্ষ ঃ ৮ম সংখ্যা

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

জন্ম—২রা অগাষ্ট, ১৮৬১ মৃত্যু—১৬ই জুন, ১৯৪৪

বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

এখন আমরা যে যুগে বাস করিতেছি তাহাকে এককথায় 'বিজ্ঞানের যুগ' বলা যাইতে পারে। বর্তমান সভ্যতার মাপকাঠি বিজ্ঞান। যে দেশ বিজ্ঞানে যত উন্নত, সে দেশ তত সভ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। আমাদের জীবনের প্রত্যেক দিক আজ বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবান্বিত। আমরা যাহা দেখি, যাহা কিছু করি, তাহার সঙ্গে বিজ্ঞানের কিছু না কিছু সংযোগ আছেই। এই যে কলম দিয়া কাগজের উপর লিখিতেছি, সামনে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছে, দেয়ালে টিক্ টিক্ শব্দে ঘড়ি চলিতেছে—সর্বত্রই বিজ্ঞান। শয়নে, ভোজনে, বিলাসে—সর্বক্ষেত্রেই বিজ্ঞান আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের ব্যবস্থা করিতেছে।

জড়জগতে বিজ্ঞানের প্রভাব অপরিসীম। জীবজগতে, এমন কি মনোজগতেও বিজ্ঞান প্রবেশ করিয়াছে। জীবনের এমন ক্ষেত্র নাই যেখানে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা সূচিত হয় নাই। আজ জল, স্থল ও অন্তরীক্ষের সর্বত্রই মানুষের বিজয় অভিযান চলিয়াছে। সে সাগরের তলদেশ হইতে আহরণ করিয়াছে মুক্তা-মাণিক, সে ডানা মেলিয়া হিমাচল-শীর্ষের ঊর্ধ্বে উড়িয়াছে, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের গুপ্ত তথ্যও তাহার অজানা নাই। বিজ্ঞানের প্রভাবে বধির শুনিতে পাইতেছে, অন্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইতেছে, খঞ্জ হাঁটিতেছে, মৃত্যু-পথযাত্রী লাভ করিতেছে নূতন জীবন-রস। বিজ্ঞান আজ মানুষকে দিয়াছে সমগ্র ধরণীর আধিপত্য। শোকে সান্ত্বনা, ভোগে আনন্দ ও রোগে অভয়বাণী শুনাইতে বিজ্ঞান অগ্রণী হইয়াছে। আজ পৃথিবীর দূরতম অঞ্চল হইয়াছে এবেলা-ওবেলার পথ, মানুষ ঘরে বসিয়া শুনিতে পাইতেছে প্রবাসী বন্ধুর কণ্ঠস্বর ; এমন কি, তাহাকে চোখের সামনে দেখিতে পাওয়াও আজ আর অসম্ভব নয়। একদিন যাহা ছিল স্বপ্নের অগোচর, এখন তাহাই হইয়াছে অনায়াসলভ্য। বিজ্ঞানের কীর্তিকলাপের বিষয় চিন্তা করিলে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। যে সব দুর্বার প্রাকৃতিক শক্তি আমাদের পূর্বপুরুষের মনে ভয় জাগাইত, আজ সেই সব শক্তি যেন আমাদের খেলার সাথী। যাহা ছিল কবি-কল্পনারও অগম্য, তাহাই এখন আমাদের হাতের মুঠার মধ্যে আসিয়াছে। বিশ্বনিয়ন্তা যেন বিজ্ঞানরূপেই আমাদের অভয়বাণী শুনাইতে মাটির পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছেন। তাই বিজ্ঞানের নিকট শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে সকলেরই মস্তক অবনত হয়।

প্রকৃতির গোপন ভাণ্ডার হইতে বৈজ্ঞানিকেরা এক এক করিয়া এত সম্পদ আহরণ করিয়াছেন, পৃথিবীর নিকট হইতে তাঁহারা এত গোপন রহস্য জানিয়া লইয়াছেন যে, আজ মনে হয় বিশ্বপ্রকৃতি যেন বিজ্ঞানবিদ, তথা মানুষের একান্ত অনুগত। বৈজ্ঞানিকদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল—অজানাকে জানা, জড়কে নিঙ্‌ড়াইয়া তাহার মর্মকথাটি বাহির করা। সেইদিক দিয়া বিজ্ঞানীরা গৌরবের যতখানি উন্নত শিখরে আরোহণ করিয়াছেন, জ্ঞানের

অপর কোন বিভাগের সাধক তাহা কল্পনাও করিতে পারেন না। এইখানেই হইতেছে বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য।

বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ সুরু হইয়াছে সেই সুদূর অতীতে, যেদিন মানুষ প্রথম অগ্নি উৎপাদন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সেইদিন হইতে সুরু হইয়াছে সভ্যতার সোপানে মানুষের প্রথম পদক্ষেপ। তারপর ধাপে ধাপে মানুষের হাতে বিজ্ঞান যেভাবে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। বিজ্ঞানের এই দ্রুতগতি যদি অব্যাহত থাকে তবে আগামী একশত বৎসরে মানুষ যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা বুঝি বা কল্পনারও অতীত।

কৌতূহল মানুষের সহজাত সংস্কার। বিশ্বরহস্যের যেমন সীমা নাই, সেই সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল এবং তাহা নিবৃত্ত করিবার বাসনা ও সাধনারও তেমন সীমা নাই। এই কৌতূহল নিবৃত্তির বাসনা এবং আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে নূতন নূতন আবিষ্কারে। যে মানুষ একদা অরণ্যচারী হইয়া অসহায় অবস্থায় বন্য পশুর সহিত একত্রে বাস করিত, সে মানুষ যে বিজ্ঞান-সাধনার দ্বারা ঐশী শক্তি অর্জন করিবে, গ্রহে-গ্রহে পর্যন্ত বিচরণ করিবার পরিকল্পনা করিবে—এই কথা বোধ হয় স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টাও ভাবিতে পারেন নাই।

আজ বিজ্ঞানের প্রতিটি বিভাগ উন্নত হইয়াছে—নূতন নূতন সত্য আবিষ্কারের দ্বারা মানুষ ইহার প্রতিটি শাখাকে নিজের কার্যে নিয়োজিত করিয়াছে। তবে বিজ্ঞানের অন্যতম শাখা পদার্থবিদ্যাই আমাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। কারণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারগুলির অধিকাংশই পদার্থবিদ্যার অন্তর্গত। আবার উহাদের মধ্যে বিদ্যুৎ-শক্তির আবিষ্কারই শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কারণ বিদ্যুৎ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানব-সভ্যতার ক্ষেত্রে যেন নবযুগের অভ্যুত্থান হইয়াছে। তড়িৎশক্তির সাহায্যে মানুষের যে কত কল্যাণ সাধিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ঘরের আলো, পাখার বাতাস হইতে আরম্ভ করিয়া পরমাণু-বোমা পর্যন্ত সর্বত্রই ইহার বিচিত্র লীলা প্রকাশমান। আজ আর পাখার বাতাসে আমরা সন্তুষ্ট নই, ঘরকে 'এয়ার কণ্ডিশনড্' করিয়া প্রকৃতির দেওয়া শীত-গ্রীষ্মকে অর্থহীন করিয়া দিতেছি। বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে ট্রেন চলে, ট্রাম চলে, বড় বড় যন্ত্র চলে। যে কাজ পূর্বে সম্পাদন করিতে বহুলোক ও প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হইত, তাহা এখন চক্ষের নিমেষে সম্পন্ন হইতেছে। শুধু একটি সুইচ্ টিপিয়া দিলেই হইল। উচ্চে আরোহণের জন্য আজ আর সোপান-শ্রেণীর উপর নির্ভর করিতে হয় না—বৈদ্যুতিক উত্তোলন যন্ত্রই আমাদের সাহায্য করিতেছে। বৈদ্যুতিক চুল্লীর সাহায্যে নির্ঝঞ্ঝাটে রন্ধনকার্য সম্পন্ন হইতেছে। রঞ্জেন-রশ্মি আবিষ্কারের ফলে চিকিৎসকদের রোগনির্ণয়ে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, মাইক্রোফোন প্রভৃতির পশ্চাতেও আছে বিদ্যুতের কারসাজী।

বিদ্যুৎশক্তি জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সকল ব্যাপারেই মানুষের সেবা করিয়া আসিতেছে এবং ইহার দ্বারা যাহাতে মানবসমাজের আরও বহুবিধ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, এখনও বৈজ্ঞানিকেরা সেই গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন।

পদার্থবিদ্যার অন্যান্য বিভাগও বহু অসাধ্য সাধন করিয়া মানুষের সেবায় নিযুক্ত আছে। গ্যালিলিওর আবিষ্কৃত দোলক ঘড়ির সূত্র ধরিয়া বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার ঘড়ি নির্মিত হইতেছে। উহারা সময় নিরূপণের একমাত্র অবলম্বন। টরিসেলির উদ্ভাবিত ব্যারোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে এখন আবহাওয়ার প্রকৃতি, পর্বতাদির উচ্চতা প্রভৃতি অতি সহজেই নিরূপিত হইতেছে। থার্মোমিটারের প্রয়োজন কার না জানা আছে? জেম্‌স্ ওয়াটের ষ্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে আজ দানবীয় শক্তিসম্পন্ন রেল ইঞ্জিন সহস্র সহস্র যাত্রী ও লক্ষ লক্ষ টন মাল লইয়া ভূপৃষ্ঠ কম্পিত করিয়া ছুটিয়া চলিতেছে। স্থলপথে রেল ইঞ্জিনের সহিত সার্থক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে—পেট্রোল-চালিত মোটরগাড়ী, বাস, মোটরসাইকেল প্রভৃতি। মহাসাগরের প্রলয়ঙ্কর মূর্তি দেখিয়া আজ আর মানুষ ভীত নহে—জাহাজ এখন শুধু মহাসমুদ্রের বুকের উপর দিয়া সগর্বে বিচরণ করিতেছে না, প্রয়োজনমত তাহার মর্মস্থল বিদীর্ণ করিয়া কুম্ভীরের মত গোপনে চলাফেরা করিতেছে। উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ আর আমাদের যাত্রাপথের বাধা সৃষ্টি করে না—বিমান মানুষকে গগনচারী বিহঙ্গে পরিণত করিয়াছে। ছয় মাসের পথ ছয় দণ্ডে অতিক্রান্ত হইতেছে। দেশ-দেশান্তরের ব্যবধান আজ অবলুপ্ত। আজ সকলেই সকলের নিকট-প্রতিবেশী। ঘরের রেডিও যন্ত্রটির চাবী ঘুরাইলেই লণ্ডনের B. B. C. কিংবা আমেরিকার V. O. A. হইতে সুমধুর সঙ্গীত শুনিতে পাই। যানবাহনগুলি জগতের সহিত আমাদের দৈহিক সম্পর্ক ঘটাইয়াছে, আর রেডিও ঘটাইয়াছে মর্মের সম্পর্ক। ক্যামেরায় ফটো তুলিয়া ধরিয়া রাখিতেছি দেশ-বিদেশের স্মৃতি। গ্রামাফোনে শুনিতে পাই প্রিয় শিল্পীদের কণ্ঠস্বর। মুখর ছায়াছবি শুধু আমাদের আনন্দই দিতেছে না, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও দান করিতেছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা জানিতে পারি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবাণুর জীবন-রহস্য। দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া লক্ষ লক্ষ মাইল দূরের গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করি। বিভিন্ন প্রকার লেন্স চোখের দৃষ্টিক্ষীণতায় ব্যবহৃত হইতেছে। তারপর রেডার! এই আবিষ্কার শত্রুবিমানের গোপন অভিসার ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। তাহার অবস্থান, দিক, দূরত্ব, গতিবেগ সবই ধরা পড়িয়া যায় এই যন্ত্রটিতে। পদার্থ বিজ্ঞানের নিকট আধুনিক মানুষের ঋণ যে অপরিসীম তাহাতে সন্দেহ নাই। টেলিভিশনকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলিতে হয়। ইহার সাহায্যে রেডিওর মত শুধু কথাই শুনা যায় না, সঙ্গে সঙ্গে বক্তাকেও চোখের সামনে দেখা যায়। ইউরোপ বা আমেরিকার অধিবাসীরা গৃহে বসিয়াই অভিনয়, নৃত্য, ক্রীড়া-প্রদর্শনী প্রভৃতি উপভোগ করিয়া থাকেন।

বিজ্ঞানের অন্যতম শাখা রসায়নবিদ্যা। ইহা মানব সমাজে অনন্যসাধারণ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে—ইহার উপযোগিতা আজ অপরিসীম। বিভিন্ন প্রকার ধাতু, অধাতু, অম্ল, ক্ষার ও লবণের সাহায্যে ইহা যে অসাধ্যসাধন করিতেছে তাহা অতুলনীয়। পেনিসিলিন প্রভৃতি অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ এবং লৌহ ও গন্ধকঘটিত ঔষধসমূহ যে মানুষের প্রভূত উপকার সাধন করিতেছে তাহা আজ কাহারও অজানা নাই। নানাপ্রকার শিল্পেও রসায়ন-বিদ্যা অপরিহার্য; যেমন—রবার, চর্ম, কাগজ, কাচ, রঞ্জনশিল্প প্রভৃতি। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কয়লা হইতে বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে। কোল-গ্যাস, আলকাত্রা, বেঞ্জিন, তারপিন, প্যারাফিন, বিভিন্ন সুগন্ধি দ্রব্য ও রং সবই কয়লা হইতে পাওয়া যায়। পেট্রোল, চিনি প্রভৃতি শোধনে, উদ্ভিজ্জ তৈল, মোম, সাবান, সুগন্ধি প্রসাধন দ্রব্য প্রস্তুতে রসায়নবিদ্যা অপরিহার্য। অ্যামোনিয়াম সালফেট ও সিমেণ্টের ব্যবহার সম্বন্ধে অনেকেরই জানা আছে। সেখানেও আছেন রসায়নবিদ্। প্লাষ্টিক, অ্যাস্বেস্টস্, সেলুলয়েড, এনামেল, পোর্সেলিন কিংবা পটারীর কাজ ছোট-বড় সবারই প্রয়োজন। ইহার মূলে আছে রসায়নবিদ্যা। ক্লোরোফর্ম, ইথার, নাইট্রাস্ অক্সাইড আবিষ্কারের ফলে অস্ত্রচিকিৎসকদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। বিশুদ্ধ সুরা, বহু ঔষধ ও টনিক প্রস্তুতে অবশ্য প্রয়োজন। বিজ্ঞানীরা নানাপ্রকার গ্যাসকেও মানুষের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন। অক্সিজেন মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ রক্ষা করিতেছে। কার্বন ডাইঅক্সাইড অগ্নিনির্বাণে সহায়ক। অ্যাসিটিলিন গ্যাস ঝালাই কাজ ও আলোক উৎপাদনে ব্যবহৃত হইতেছে। বিভিন্ন ধাতু—যেমন লৌহ, তাম্র, রৌপ্য বা অ্যালুমিনিয়ামের তৈয়ারী দ্রব্যাদি আমরা নিত্যই ব্যবহার করিতেছি। বিশেষতঃ লৌহ—সামান্য আলপিন হইতে বিমান পর্যন্ত সর্বত্র ইহার অবাধ গতিবিধি। ঘড়িতে এবং ক্যান্সার রোগে রেডিয়াম ব্যবহৃত হইতেছে।

জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র ও বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের জন্ম, প্রকৃতি ও আবহাওয়ার ক্ষেত্রে তাহাদের প্রভাব আবিষ্কৃত হওয়ায় এমন অনেক রহস্যের সমাধান হইয়াছে যাহার ব্যবহারিক দিক হইতে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ভূ-বিদ্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মূল্যবান খনিজদ্রব্য আবিষ্কারই বৈজ্ঞানিকের কাজ। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম, তাম্র, অভ্র, কয়লা, পেট্রোল, কেরোসিন প্রভৃতি প্রকৃতির যত গোপন সম্পদ বিজ্ঞানীরা লুটিয়া লইতেছেন। উদ্ভিদ ও কৃষিবিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতির ফলে 'অধিক খাদ্য ফলাও' নীতি সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতেছে। জীববিজ্ঞানে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মানবের বিভিন্ন সাংঘাতিক ব্যাধি জীবাণু দ্বারা সংঘটিত হয়। এইসব জীবাণুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিয়া বিজ্ঞানীরা চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। শারীরবিজ্ঞানীরা মানবদেহের গঠন, তাহার বিভিন্ন যন্ত্র এবং তাহাদের কার্য সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া মানুষের যে কোন রোগ দূর করিতে সহায়তা করিতেছেন। মনোবিজ্ঞানে ইলিস,

ফ্রয়েড-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার দুরারোগ্য মনোব্যাধি দূরীকরণে বিশেষ সাহায্য করিতেছে।

বিজ্ঞান মানুষের যে অসামান্য উপকার করিতেছে তাহা অবিসংবাদিত সত্য হইলেও স্বার্থপর মানুষের হাতে পড়িয়া ইহার অপব্যবহারও কম হইতেছে না। মানুষের শুভ-বুদ্ধি জাগ্রত না হইলে ইহার প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই। বিজ্ঞান অবশ্য এইরূপ শুভবুদ্ধি জাগ্রত করিবার উপায় আবিষ্কার করিতে পারে নাই।

শ্রীকিশোরীমোহন অধিকারী

টাকার কথা

টাকা কি জিনিষ, তোমরা বেশ জান; কারণ—সভ্যযুগের এমন ছেলেমেয়ে নেই যে জন্মেই টাকা না দেখেছে। মনে কর তুমি দুপুর বেলা ঘরে বসে আছ, মা ঘুমুচ্ছেন, বাবা গেছেন আফিসে—এমন সময় রাস্তায় আইসক্রীমওয়ালা হেঁকে গেল। অমনি তুমি ছুটলে ঐ এক আনাটা নিয়ে যেটা বাবা আফিস যাবার সময় দিয়ে গেছেন তোমাকে। তুমি জান ঐ এক আনাটা দিলে আইসক্রীমওয়ালা তার একখণ্ড আইসক্রীম তোমাকে দেবে। তেমনি তুমি হয়তো একখানা বই কিনতে চাও; তখন আর ঐ একটি আনায় চলবে না। দিতে হবে অমনি ধারা আরও এগারোটি, অর্থাৎ বইটার দাম বারো আনা। তেমনি কিনতে চাও একটি ফুটবল; তোমাকে দিতে হবে পাঁচ টাকা। তার মানে, তুমি কিছু কিনতে চাইলেই তোমাকে দিতে হবে টাকা, অর্থাৎ টাকার কাজ হচ্ছে কেনা বা কিনতে পারা।

এই টাকাটা কি করে এল পৃথিবীতে, সেই কথাটাই বলবো আজ তোমাদের। কিন্তু টাকার কথা বলতে গেলে তোমাদের প্রথমে একটু বলে নিতে হবে, মানুষের কথা; অর্থাৎ আমাদের নিজেদের কথা। আজকে আমরা বলি, আমরা সভ্য মানুষ। আমরা গ্রাম-নগর-বন্দর-জনপদে বাস করি; পৃথিবীর সকলের সঙ্গে আমাদের একটা যোগ আছে। কিন্তু চিরদিনই আর কিছু এমনি ছিল না। আমাদের পূর্বপুরুষেরা—সে অনেক অনেক পুরুষ আগে—মানুষের আদিম প্র-প্রপিতামহ গুহামানবেরা থাকতো জঙ্গলে, পাহাড়ের গুহার গর্তে। আজ তোমরা যারা সহরে থাক, তোমাদের আশে-পাশে দেখছ চেয়ার, টেবিল, খাট, আলমারী, আয়না, কাগজ, কলম, ছুরি, সাইকেল মোটর-সাইকেল, মোটর, গ্রামোফোন, রেডিও, বাস, ট্রাম, ট্রেন, জাহাজ, এরোপ্লেন। দেখতে পাচ্ছ, এগুলো সব তোমাদের কাজে লাগে, তোমাদের বাবা ওঁদের—তোমাদের পাড়ার সবাইয়ের। তুমি জন্মাবার পর থেকেই দেখছ এই সব; কিন্তু কখনো ভেবে

দেখনি যে, এ সব জিনিষ চিরদিন ছিল না পৃথিবীতে। এর প্রত্যেকটিকেই গোড়াতে কেউ না কেউ তৈরী করেছে, কিম্বা কোন একটা জিনিষই তৈরী হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে অনেক লোকের চেষ্টায়।

কিন্তু জঙ্গলে ছিল যখন আমাদের পূর্বপুরুষ—সেই আদি মানবেরা, তাদের জিনিষ ছিল অতি অল্প; কিন্তু সেই অল্প জিনিষ নিয়েই তারা বিব্রত হয়ে উঠেছিল। সমাজের স্তরবিভাগ যখন আরম্ভ হয়েছে তখন তাদের কেউ হয়তো বনে কাঠ কাটতো, কেউ হয়তো ধান-গম-যব চাষ করতো, কেউ তৈরী করতো হাঁড়িকুড়ি, কেউ বা শিকার করতো বনের পশু, কেউ মাছ ধরতো, আবার কেউ পুষতো গরু-ছাগল-ভেড়া-শুয়োর মুরগী-হাঁস। এমনি ধারা তারা করতো গোটা কতক কাজ। একই লোকের সব কাজ করা সম্ভবও নয়, সুবিধাজনকও নয়; কিন্তু সব জিনিষের সকলেরই প্রয়োজন, অন্ততঃ অনেক জিনিষেরই। যেমন ধর, ভাত সবাইকেই খেতে হয়; কাজেই চা'ল সকলকারই দরকার। কিন্তু একটি মাত্র লোক ধান চাষ করছে, তখন আর সবাই করবে কি? ধান কিনবে তার কাছ থেকে। মনে কর, আমি হাঁড়ি-কুড়ি তৈরী করি, আমার ধান দরকার। গেলুম ধানওয়ালার কাছে চারটে হাঁড়ি নিয়ে। চারটে হাঁড়ির বদলে সে আমাকে দিল এক সের ধান। যে ছাগল পোষে, সেও একটা ছাগল দিয়ে ছ'সের ধান নিয়ে গেল ধানওয়ালার কাছ থেকে। যে বনের পশু শিকার করে তার মাল হচ্ছে হাড়, লোম, চামড়া আর মাংস। আমার একখানা চামড়া দরকার, আর তার দরকার হাঁড়ির—আমার কাছ থেকে একখানা চামড়া দিয়ে নিয়ে গেল দু'টো হাঁড়ি। এই ভাবে চলতো তাদের কাজ-কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য। একে বলে বিনিময় অর্থাৎ বদল, ইংরেজীতে বলে Barter। কিন্তু তাতেই সমস্যার সমাধান হয় নি। কেন না, আমি হাঁড়ি-ওয়ালা—চাই চা'ল, কিন্তু চা'লওয়ালা চায় একখানা কাস্তে। তাকে আমি হাঁড়ি দিতে গেলুম; সে ফিরিয়ে দিলে বললে, হাঁড়ির দরকার নেই আমার। আমি কি তাহলে ভাত খাব না, যতক্ষণ না তার হাঁড়ির দরকার হবে? তা নয়। আমি তার কাছ থেকে জেনে নিলুম, তার দরকার কাস্তের। কাজেই কাস্তেওয়ালার কাছে গিয়ে আমার হাঁড়ি দিয়ে নিয়ে এলুম কাস্তে, তারপর কাস্তে দিয়ে পেলুম চা'ল। কিন্তু তাতেও সমস্যা মিটলো না। এখন আমি যা দিতে পারি তা যদি অন্য লোকে না নেয়, আমাকে দু'চার দুয়ার ঘুরে তার প্রয়োজনমত জিনিষ জোগাড় করতে হবে। তার পরেও সমস্যা আছে—যে ছাগল দিল, সে তার সঙ্গে যে ছাগল নিল তার ঘাড়ে নতুন সমস্যা দিল তুলে। সে ছাগলটাকে বাঁচিয়ে রাখতে তাকে আবার দরকার খাওয়াবার, অর্থাৎ নতুন খরচা। তার উপরে ছাগল হারিয়ে যেতে পারে, মরে যেতে পারে—হরে-দরে লাভ হলো না কিছুই। তখন মানুষ দেখলো যে, কাস্তেটা লোহার—শক্ত জিনিষ, মরে না, সহজে নষ্ট হয় না, বাইরে চরাতে গিয়ে হারাবার ভয় নেই, রাখবার জন্যে বেশী জায়গা

জোড়ে না, তার চাহিদাও বেশী, প্রয়োজন হয় প্রায় সবারই—এমনি আরও অনেক সুবিধা। কাজেই মানুষ আরম্ভ করলো তার জিনিষ দিয়ে কুড়ুল, কোদাল, দা, খন্তা, ছুরি, কাস্তে নিতে। আর যখনই যা কিছু দরকার, বের করে দিত তার অস্ত্রশস্ত্রের মজুদ। কিন্তু তারও মুস্কিল আছে, সব দা-কুড়ুলই এক রকম নয়। কারুরটা পাকা লোহার, কারুরটা একটু কম পাকা, কেউ যন্ত্রী ভাল, কাজেই জিনিষ সুন্দর; তার উপরে আছে আকারের তফাৎ, আয়তনে ও ওজনের তফাৎ। তখন মানুষের মধ্যে যারা ছিল তখনকার দিনে বুদ্ধিমান তারা বসে ঠিক করলো—দাও নয়, কুড়ুলও নয়, একেবারে আনকোরা লোহা। একটা ওজন ঠিক করা হলো তার এক মাত্রা হচ্ছে এক টাকা, আধ মাত্রা আধ টাকা, তেমনি সিকি টাকা। চললো কিছু দিন এই রকম। তারপর দেখা গেল যে, লোহা মর্‌চে ধরে নষ্ট হয়, হাতে হাতে ক্ষয় হয় বেশী, তা ছাড়াও সে ধাতুর অধিকতর প্রয়োজন অন্য জায়গায়। তখন ঠিক করা হলো তামা, রূপা, সোনা।

ছাঁচে ঢেলে ছাপ মারা টাকার প্রচলন তখনও হয় নি; কাজেই যে কেউ নিজের টাকা নিজেই তৈরী করে নিতে পারতো। তাতে টাকার চেহারা তো এক রকম থাকতোই না, ওজনেরও তারতম্য ঘটতো প্রায়ই। যখন টাকা তৈরীর ভার নিল সর্দার, রাজা বা রাষ্ট্র, তখন ধীরে ধীরে টাকাতে ছাপ পড়লো ওজন ঠিক হলো, তা এল কলে তৈরী আধুনিক টাকাতে।

শ্রীবিনায়ক সেন

জানবার কথা

১। শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি মানবসদৃশ প্রাণীরা অনেক ক্ষেত্রেই সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে

১নং চিত্র

থাকে। রীতিমত শিক্ষা দিলে মানুষের অনেক কাজ এদের দিয়ে করানো যেতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে শিম্পাঞ্জীরাই সবচেয়ে চতুর। অভ্যাসের

ফলে মানুষের কোন কোন কাজ আয়ত্ত করতে সক্ষম হলেও এরা কিন্তু কথা বলতে পারে না। কথা বলবার জন্যে এদের অনেক রকম শিক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। মুখের যে অংশের সাহায্যে মানুষ কথা বলে, শিম্পাঞ্জীর মুখে সে সব অংশই আছে। কিন্তু অনেক গবেষণার পর বিশেষজ্ঞেরা মত প্রকাশ করেছেন যে, শিম্পাঞ্জীর মস্তিষ্কের যে অংশ কথা বলা নিয়ন্ত্রণ করে তা অপরিণত অবস্থায় থাকবার ফলেই এরা কথা বলতে পারে না।

২। অনেক বছর পূর্বেই পৃথিবীতে মুদ্রার প্রচলন হয়েছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের মুদ্রা প্রচলিত আছে এবং সেগুলি বিভিন্ন নামে পরিচিত। মুদ্রার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়—আড়াই হাজার বছর পূর্বেও তুরস্ক দেশে রৌপ্যনির্মিত মুদ্রা

২নং চিত্র

প্রচলিত ছিল এবং তাতে লিডিয়ার রাজাদের প্রতীকের ছাপ থাকতো। পৃথিবীর প্রাচীনতম যে সব মুদ্রা পাওয়া গেছে, সেগুলি তুরস্কের সার্ডিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল।

৩নং চিত্র

৩। প্রাণীজগতের সবাই কি সমানভাবে বিভিন্ন রঙের পার্থক্য বুঝতে পারে? এর

উত্তরে বিজ্ঞানীরা বলেন—মানুষ, রীসাস গোষ্ঠীর বানর এবং পায়রা লাল, হলুদে, সবুজ, নীল ও বেগুনি রঙের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। কুমীর, পেঁচা, বাছুড়, বিড়াল, কুকুর ও গিনিপিগের কোন বর্ণানুভূতি নেই। অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে মোরগ এবং মাছ নাকি একটা বা তুটা রং দেখতে পায়।

৪। মিষ্টতার স্বাদ অনুভব করবার ক্ষমতা আমাদের কি পরিমাণ আছে? খুব সামান্য পরিমাণ মিষ্টতার স্বাদ আমরা গ্রহণ করতে পারি কি? বিজ্ঞানীদের মতে—মানুষের মিষ্টতার স্বাদ অনুভব করবারও একটা সীমা আছে। তাঁরা বলেন যে, ২০০ ভাগ
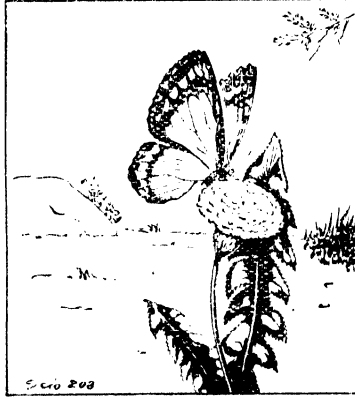
৪নং চিত্র

জলে এক ভাগ চিনি মিশ্রিত করলে মিষ্টতার স্বাদ আমরা গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু কোন কোন প্রজাপতির মিষ্টতা অনুভব করবার ক্ষমতার কথা শুনলে বিস্মিত হতে হয়। তারা ৩০০,০০০ ভাগ জলের মধ্যে ১ ভাগ চিনি থাকলেও মিষ্টতা অনুভব করতে পারে।

৫। অধিক দৈহিক ওজনের জন্যে ম্যাগেলান প্রণালীর চিলিয়ান মেষপালন ক্ষেত্রের

৫নং চিত্র

অনেক ভেড়া মারা যায়। দৈহিক ওজনের জন্যে মৃত্যু—কথাটা শুনে অনেকেই হয়তো বিস্মিত হবে। কিন্তু ব্যাপারটা সত্য; এদের শরীরের পুরু পশমই এদের মৃত্যুর কারণ।

বর্ষাকালে এদের পুরু পশম ভিজে খুব ভারী হয় এবং মাটিতে গড়াগড়ি দেবার পর এরা নিজের চেষ্টায় আর দাঁড়াতে পারে না। যদি এই অবস্থা থেকে এদের উদ্ধার না করা হয় তাহলে এদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

৬। চর্বণযোগ্য খাদ্যবস্তু সব প্রাণীই দাঁতের সাহায্যে চিবিয়ে খায়। কিন্তু এমন প্রাণীরও সন্ধান পাওয়া গেছে, যারা খাদ্যবস্তু পায়ের সাহায্যে চিবিয়ে খায়। এই প্রাণীগুলির দেহাকৃতি অশ্বক্ষুরের ন্যায় এবং দেখতেও অদ্ভুত। আদিমতম জীবের মধ্যে এরাও অন্যতম। কাঁকড়ার দেহাকৃতির সঙ্গে সাদৃশ্য থাকায় এদেরও এক জাতের কাঁকড়া

৬নং চিত্র

বলা হয়। আসলে এরা কাঁকড়া নয়, বরং এদের মাকড়সা এবং কাঁকড়াবিছার দূর-সম্পর্কিত আত্মীয় বলা যেতে পারে। এদের রক্তে তামার অস্তিত্ব আছে বলে উজ্জ্বল নীলাভ দেখায়। এদের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে—লিমিউলাস পলিফেমাস।

৭। আজকাল মানুষ নানা জাতের পাখী পুষে থাকে। প্রাচীন যুগের মানুষ সম্ভবতঃ প্রথমে মুরগী পুষতে আরম্ভ করেছিল। অনেক জাতের মুরগী দেখা

৭নং চিত্র

গেলেও বর্তমানে যে সব জাতের মুরগী দেখা যায় তাদের উৎপত্তি হয়েছে ভারতের লাল জঙ্গলী মুরগী থেকে।

বিবিধ

সৌর-বিস্ফোরণের তথ্য সংগ্রহ

সূর্যদেহের বিস্ফোরণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য গত ১লা জুলাই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সহ একটি রকেট সান নিকোলাস দ্বীপ (ক্যালিফোর্ণিয়া) হইতে উর্ধ্বাকাশে প্রেরণ করা হয়। আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থবিজ্ঞান বৎসরে মার্কিন নৌবহর এই প্রথম রকেট ব্যবহার করিল। রকেটটি উর্ধ্বাকাশে ৭৫ মাইল পর্যন্ত উঠিয়াছিল।

এই দ্বীপ হইতে এই ধরণের আরও ১৩টি রকেট ছাড়া হইবে। রকেটটির দৈর্ঘ্য ২০ ফুট; ওজন ১৫ শত পাউণ্ড। আকাশে ৭৫ মাইল পর্যন্ত উঠিয়া রকেটটি উক্ত দ্বীপ হইতে ২৫ মাইল দূরে সমুদ্রগর্ভে পতিত হয়।

উর্ধ্বের বায়ুস্তরে চৌম্বক ঝটিকার আকারে সূর্যদেহের যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের বার্তা পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সে সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান শেষ হইবার পূর্বেই গত ১লা জুলাই অপরাহ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণাগারসমূহ হইতে সূর্যদেহে আর একবার প্রচণ্ড আলোড়ন পরিদৃষ্ট হয়। সূর্য-দেহে এই বিস্ফোরণের ফলে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে নূতন আলোড়ন দেখা দিবে কি না, তাহা এখনও বুঝা যাইতেছে না।

চেকোশ্লোভাক বিজ্ঞান পরিষদের অয়নমণ্ডল গবেষণা-কেন্দ্র হইতে জানানো হইয়াছে যে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বস্তরে অভূতপূর্ব আলোড়ন দেখা দিয়াছে। ভূ-পদার্থবিজ্ঞান বর্ষের উদ্বোধন কালে অয়নমণ্ডলের কম্পন এবং উত্তর মেরুর আকাশে মেরুজ্যোতির আবির্ভাব প্রাগের গবেষণাগারে পরিষ্কারভাবে ধরা পড়িয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে তৈলের অনুসন্ধান

জানা গিয়াছে যে, ভারত-ষ্ট্যানভাক পেট্রোলিয়াম পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে তৈলের জন্য যে অনুসন্ধান কার্য চালান হয়, তাহাতে যে ফল পাওয়া গিয়াছে তাহা আশাজনক।

ঐ অনুসন্ধানের ভিত্তিতে সরকার এখন নিঃসন্দেহ হইয়াছেন যে, বর্ধমান অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে তৈল পাওয়া যাইবে।

এশীয় ফ্লু-র টিকা

লণ্ডনের খবরে প্রকাশ যে, মেলবোর্ণের ওয়াল্টার অ্যাণ্ড এলিজা হল ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর ও পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইনফ্লুয়েঞ্জা বিশেষজ্ঞ স্যার ম্যাকফারলেন বার্ণেট বলেন যে, বিভিন্ন দেশের বড় বড় ইনফ্লুয়েঞ্জা লেবরেটরীতে ইতিমধ্যেই এশীয় ফ্লু-র প্রতিরোধাত্মক নূতন টিকা প্রস্তুতের কাজ সুরু হইয়া গিয়াছে।

তিনি আরও বলেন যে, শীঘ্রই অষ্ট্রেলিয়ায় প্রচুর পরিমাণ টিকা প্রস্তুত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে; তবে সেই পরিমাণ রপ্তানীযোগ্য হইবে বলিয়া মনে হয় না।

আগামী শীতকালে বৃটেনে এই মহামারী দেখা দিবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

আর একটি খবরে প্রকাশ—এশিয়ায় যে ধরণের ইন্ফ্লুয়েঞ্জা আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে প্রয়োগের জন্য লণ্ডনের একটি হাসপাতালের গবেষণাগারে একপ্রকার টিকা তৈয়ারী হইয়াছে। প্যাডিংটনের সেণ্টমেরী হাসপাতালের রাইটফ্লেমিং ইনষ্টিটিউট অব মাইক্রোবায়োলজির অধ্যক্ষ মিঃ রবার্ট ক্রুইক স্যাঙ্ক বলিয়াছেন যে, এই টিকার কার্যকারিতা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে।

এশিয়ার বৃহত্তম ট্রান্সমিটিং কেন্দ্র

দমদম ক্যাণ্টনমেণ্টের সন্নিকটে গারুই-এ

এশিয়ার বৃহত্তম বেতার ট্রান্সমিটিং কেন্দ্র স্থাপিত হইতেছে। এই কেন্দ্র নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে এবং জুলাই মাসের মাঝামাঝি হইতে পুরাপুরিভাবে ইহার কাজ আরম্ভ হইবার কথা। তবে নভেম্বর মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে এই কেন্দ্রটির উদ্বোধন করা হইবে।

কেবলমাত্র ভারতীয় কর্মচারীরাই এই কেন্দ্রটি নির্মাণ করিতেছেন। গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে স্থাপিত এই কেন্দ্রটিকে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত করা হইবে। কেন্দ্রে যাইবার রাস্তাটির উন্নয়নের জন্য ২৫ হাজার টাকা ব্যয় করিতে হইবে। অসামরিক বিমান দপ্তর রাস্তাটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিবেন।

আমেদাবাদ জেলায় হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো সভ্যতার চিহ্ন আবিষ্কৃত

বোম্বাইয়ে আমেদাবাদ জেলার চোলকা তালুকস্থিত সরগভাল গ্রামের লোথালে খনন কার্যের ফলে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মৃৎপাত্র, শিলমোহর, মূর্তি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে হরপ্পা সভ্যতা ও তৎ-পরবর্তী তাম্র-পিত্তল যুগের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হইল।

১৯৫৫ সালে লোথালে একটি পুরাতন স্তূপ আবিষ্কৃত হয়। তখনই ইহা ঐতিহাসিক ও প্রত্ন-তাত্ত্বিকদের মধ্যে প্রবল উৎসাহের সৃষ্টি করে। কারণ হরপ্পা-সভ্যতা যে দক্ষিণে সুদূর কাম্বে উপসাগর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল, ইহাতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারী মাস হইতে কেন্দ্রীয় প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ এখানে খননকার্য পরিচালনা করিতেছেন। ভারত ইতিহাসের গবেষণাকার্যে স্থানটির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে বলিয়া আগামী মরশুমেও খননকার্য চালাইয়া যাওয়া হইবে।

খননকার্যের ফলে হরপ্পা-সভ্যতার স্মারক অস্ত্রশস্ত্র, অলঙ্কার, শিল্প দ্রব্য ও গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, লোথাল এককালে বেশ সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। এখানে প্রাপ্ত শীলমোহরে খোদিত একশৃঙ্গবিশিষ্ট ঘোড়া, ষাঁড়, ছাগল, হাতী ও মহিষের প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া ষাঁড়, কুকুর, গণ্ডার ও শূকর প্রভৃতির পোড়ামাটির মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিগুলি আশ্চর্য রকমের বাস্তবানুগ। ইহাতে মনে হয়, তখনকার লোকের জীবজন্তু সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ছিল।

গলার হারের সোনার গোল দানাগুলি আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র। খুব সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত এগুলি প্রস্তুত করা সম্ভব নহে। মৃৎপাত্রের উপরে অঙ্কিত চিত্রগুলি খুবই চিত্তাকর্ষক। ময়ুর, লতা, তাল গাছ ও বট পাতা প্রভৃতি হরপ্পা-শিল্পের অনুরূপ। সংক্ষেপে বলা যায়, লোথালের জনগণের অতুলনীয় শিল্প-প্রতিভা ছিল।

তাম্রনির্মিত নর্তকী ও কুকুরের মূর্তি দুইটি ঢালাই শিল্পের সুন্দর নিদর্শন। লোথালের লোকে কুঠার, সূচ, তামা ও বেত্রনির্মিত ক্ষুর, গজদন্ত, হাড়ের পিন, ধারালো পাথর ও পোড়া মাটির গুলি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিত। তাহারা ছিল ব্যবসায়ী জাত।

সিন্ধু উপত্যকার সহরগুলির সঙ্গে তাহারা ব্যবসায় করিত। হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোয় ওজনের যে মাপ পাওয়া গিয়াছিল, লোথালেও সেরূপ মাপ পাওয়া গিয়াছে।

খননকার্যের ফলে সহরের যে গঠনপ্রণালী প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে সেখানকার জনসাধারণ যে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে সচেতন ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। নগর পরিকল্পনার সুষ্ঠু অভিজ্ঞতাও তাহাদের ছিল। বাড়ীগুলি পর পর লাইন বরাবর অবস্থিত এবং পোড়া অথবা রোদে শুকানো ইট দ্বারা অধিকাংশ বাড়ীর মেঝে নির্মিত।

প্রত্যেক বাড়ীতে স্নানের জায়গা এবং নর্দমার ব্যবস্থা আছে। সহরের নর্দমাগুলির সহিত বাড়ীর নালাগুলি সংযুক্ত।

ভোগাবো ও সবরমতী নদীর জলে লোথাল মাঝে মাঝে প্লাবিত হইত। এই বন্যা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তথাকার জনগণ রোদে শুকানো ইট দিয়া উঁচু ভিৎ গাঁথিয়া তাহার উপরে গৃহ নির্মাণ করিত। দুইটি ভিতের মধ্যবর্তী স্থানে মাটি ফেলিয়া ভরাট করা হইত। লোথালে প্রায় সর্বত্রই একটির নীচে আর একটি করিয়া পর পর এইরূপ কতকগুলি ভিৎ খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছে। এক এক যুগের পর নূতম যুগের মানুষ আসিয়া নূতন করিয়া ঘর বাঁধিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। একটি স্তরে ১৫টি কাঁচা মাটির কঠিন ভিৎ ছিল। ইহার মধ্যে ১২টি অক্ষত অবস্থায় আছে। প্রতি দুইটি ভিতের মধ্যবর্তী পথের উত্তর দিক হইতে নর্দমা বাহির হইয়া গিয়াছে।

গত বৎসর ভিতের মধ্যবর্তী স্থান হইতে সিন্ধু অঞ্চলে প্রচলিত বর্ণমালা এবং জন্তু-জানোয়ারের প্রতিকৃতিযুক্ত ৭৫টি পোড়ামাটির শীলমোহর উদ্ধার করা হয়। এই বৎসরে পোড়া ইট দ্বারা নির্মিত কতকগুলি বাড়ী ও নর্দমা খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছে। এখানে চতুষ্কোণ ইটের গাঁথুনির মধ্যে পশুর কঙ্কাল ও পোড়ামাটির অলঙ্কার পাওয়া গিয়াছে। ইহার তাৎপর্য এখনও নির্ধারিত হয় নাই।

লোথালের মৃৎশিল্পের বিশেষ গুরুত্ব আছে। চিত্রিত বা সাদামাটা কালো ও লাল রঙের মৃৎপাত্র, সিন্ধু অঞ্চলের শীলমোহরের অনুরূপ শীলমোহর ও হরপ্পার মৃৎশিল্পের অনুরূপ মৃৎশিল্পের নিদর্শন দেখিয়া মনে হয়, মৃৎপাত্র পোড়াইবার বিশেষ কৌশল ইহাদের জানা ছিল। ইহা মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যের তাম্র-পিত্তল যুগের সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। কাজেই ইহার ফলে হরপ্পা-সভ্যতা ও খৃঃ পূর্ব এক হাজার বৎসরের প্রাচীন তাম্র-পিত্তল সভ্যতার মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হইল বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

মধ্য হিমালয়ের মাচাপুছারে শৃঙ্গে অরোহণ

উইলফ্রেড নয়েস ও ডেভিড কক্স নামে দুইজন ইংরেজ গত ২রা জুন মধ্য হিমালয়ের ২৩ হাজার ফুট উচ্চ মাচাপুছারে শৃঙ্গ আরোহণে সমর্থ হইয়াছেন।

পাঁচজন সদস্য লইয়া গঠিত এই বৃটিশ অভিযাত্রী দলের নেতা মেজর রবার্টস ১৮ই জুন নেপালের পররাষ্ট্র দপ্তরে এই বিঘ্নসঙ্কুল পর্বতশৃঙ্গ আরোহণের বিশ্বরেকর্ড প্রতিষ্ঠার সংবাদ জানাইয়াছেন। অবশ্য সেই সঙ্গে তিনি ইহাও জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা স্থানীয় জনগণকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যই উক্ত শৃঙ্গের শেষ দেড়শত ফুট আরোহণ করেন নাই। তাঁহারা স্থানীয় জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, পবিত্র মাচাপুছারে শৃঙ্গের উপর কেহই দণ্ডায়মান হইবে না।

এই দুরারোহ শৃঙ্গ আরোহণে সাফল্যের কোন বিস্তৃত বিবরণ এই পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

এই অভিযাত্রী দল ইতিপূর্বেই পোখরায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। এই অভিযাত্রী দলের অন্যতম আরোহী রোগার চোর্লে পীড়িত হইয়া পড়ায় তাঁহাকে দেশে পাঠাইতে হয় বলিয়া একজন কম আরোহী লইয়াই অভিযান চালাইতে হয় এবং পর্বতারোহণের পোষাক-পরিচ্ছদ বিলম্বে আসিয়া পৌঁছায় অভিযান আরম্ভ করিতেও বিলম্ব হয়।

অভিযাত্রী দলের নেতা স্থানীয় নেপালীদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, কেহই এই শৃঙ্গে পদক্ষেপ করিবে না। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, এই মাচাপুছারে শৃঙ্গ দেবতাদের পবিত্র আবাসস্থল। অন্যথায় নয়েস ও তাঁহাদের অভিযানের শেষ পর্যায়ে উক্ত শৃঙ্গে আরোহণ করিতেন।

কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানের ক্ষেত্রেও চার্লস ইভান্স

ঐরূপ করিয়াছিলেন। তিনি সিকিমের বৌদ্ধগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তিনি উক্ত শৃঙ্গে পদক্ষেপ করিবেন না। হিমালয়ের অধিবাসীদের বিশ্বাস এই যে, দেবনিবাস এই পর্বতের উপর কোনরূপ উপদ্রব করা হইলে তাহাদের দুঃখ-দুর্ভোগ সৃষ্টি হইবে।

পৃথিবী কি উষ্ণতর হইতেছে?

ওয়াশিংটনের এক খবরে প্রকাশ যে, মানুষ কর্তৃক বায়ুমণ্ডল দূষিত হওয়ার ফলে পৃথিবীর চারিদিকে উহার উষ্ণতা বৃদ্ধিকর এক আবরণ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না, আমেরিকান বিজ্ঞানীরা তাহা পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছে যে, বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া পৃথিবীর আবহাওয়া ক্রমশঃ উষ্ণতর হইতেছে—এই অভিমত পরীক্ষার জন্য আবহাওয়া বিশেষজ্ঞগণ উত্তর মহাসাগরে বায়ুর নমুনা গ্রহণ করিবেন।

সিগারেটের ধূমপায়ীর বিপদ

একজন ডাচ চিকিৎসক আমষ্টারডামে বলেন যে, ২৫ বৎসর বয়সে যাহারা সিগারেটের ধূমপান করিতে আরম্ভ করিবে তাহাদের প্রতি ১১ জনের মধ্যে একজন ৭৬ বৎসর বয়স হইবার পূর্বেই ফুস্‌ফুসের ক্যান্সার রোগে মারা যাইবে।

স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর অব মেডিসিন উপাধি গ্রহণ উপলক্ষ্যে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করিবার সময় মিঃ সি. ভ্যান প্রুসডিজ পূর্বোক্ত অভিমত প্রকাশ করিয়া বলেন যে, যাহারা ধূমপায়ী নহে তাহাদের ঐভাবে মারা যাইবার সম্ভাবনা ৪০ গুণ কম।

লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, বৃটেনের মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, গত ১০ বৎসরের অধিককালের মধ্যে বৃটেনে ফুস্‌ফুসের ক্যান্সার রোগে মৃত্যুসংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে এবং সিগারেটের ধূমপানই ইহার একমাত্র সম্ভাব্য কারণ।

কাউন্সিল আরও বলেন, যে সকল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে মনে হয় যে, বর্তমানে যে হারে লোক এই রোগে অক্রান্ত হইতেছে তাহাতে চিরকাল অত্যধিক ধূমপায়ী প্রত্যেক ৮ জনের মধ্যে একজন ফুস্‌ফুসের ক্যান্সার রোগে মারা যাইবে। যাহারা ধূমপান করে না তাহাদের প্রতি ৩০০ লোকের মধ্যে মাত্র একজন এই রোগে মারা যাইতে পারে।

ধূমপানের অনিষ্টকারিতা

পশ্চিম জার্মেনীর মেডিক্যাল ইনফরমেশন সার্ভিস রিপোর্ট দিয়াছেন যে, যাহারা ধূমপান করেন না তাহাদের অপেক্ষা অতিরিক্ত ধূমপায়ীদের হৃৎপিণ্ডের পীড়া ঘটিবার সম্ভাবনা ১২গুণ বেশী।

হৃৎপিণ্ডের ধমনীর স্থূলতাজনিত পীড়ায় (করোনারী স্ক্লেরোসিস) আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে শতকরা ৯৩.৩ জন ধূমপায়ী। অবশিষ্ট শতকরা ৬.৯৭ জন ধূমপানবর্জিত।

নিকোটিন রক্ত সঞ্চালন এবং নাড়ীর গতি বৃদ্ধি করে।

রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, শ্লেষ্মানালীর পীড়া ব্রঙ্কাইটিস, ফুস্‌ফুসের ক্যান্সার, উদর ও পাকস্থলীর প্রদাহ এবং মূত্রাশয়ের ক্যান্সারের সহিতও ধূম-পানের সম্পর্ক রহিয়াছে।

উত্তর মেরু অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র

একজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার উত্তর মেরু অঞ্চলে ভাসমান বরফ স্তূপের উপর দুইটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন।

এই বৈজ্ঞানিকটির নাম জন, সি, রীড এবং ইনি আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থবিজ্ঞান বৎসর পালন সম্পর্কিত

উত্তর মেরু অঞ্চলে মার্কিন কার্যসূচী পালনের চেয়ারম্যান। তিনি বৈজ্ঞানিকদের এক সভায় বলিয়াছেন যে, ভাসমান কেন্দ্র দুইটিতে মার্কিন বৈজ্ঞানিকেরা হিমবাহ সম্পর্কিত বিজ্ঞান, সমুদ্র বিজ্ঞান এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বিষয়ে গবেষণা করিবেন।

আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থবিজ্ঞান বৎসর পালন উপলক্ষ্যে সমুদ্র-বিজ্ঞান সম্পর্কে যে কার্যসূচী তৈয়ারী করা হইয়াছে, গর্ডন লীল সেই সম্পর্কে বলেন যে, গবেষণা পরিচালনা করা যায় এরূপ ৭০ খানারও অধিক জাহাজ এবং সমুদ্রের উপরিতল পরিমাপ সম্পর্কিত ২২৬টি কেন্দ্র হইতে যে গবেষণা করা হইবে, পৃথিবীর ৩৫টি রাষ্ট্র তাহাতে সহযোগিতা করিবে। এই সর্বপ্রথম পৃথিবীর সমুদ্র সম্পর্কে ব্যাপকভাবে প্রায় ১৮ মাস ধরিয়া গবেষণার কাজ চালানো হইবে।

মিঃ লীল বলিয়াছেন যে, সমুদ্র সম্পর্কে এমন কতকগুলি বৈজ্ঞানিক সমস্যা রহিয়াছে, যেগুলি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা এই বিষয়ে বিশেষ কিছু জানিতে পারেন নাই।

গ্রহ হইতে গ্রহান্তর যাত্রার মহড়া

মার্কিন বিমান বহরের তরফে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গ্রহ হইতে গ্রহান্তর যাত্রার কৃত্রিম মহড়াকালে ৫ জন করিয়া দশটি দলকে বিমান-যোগে শূন্যমার্গে প্রেরণ করা হইবে। এই জাতীয় ভ্রমণের ক্লেশ মানুষ কতটা সহ্য করিতে সমর্থ, তাহা দেখাই ইহার উদ্দেশ্য। প্রস্তাবিত দলগুলির লোক-জনকে একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে ঠাসাঠাসি করিয়া ৫ দিন রাখা হইবে। প্রকোষ্ঠটি আয়তনে একটি পরিবারের উপযোগী 'সেলুন কার' হইতে বড় নহে। তাঁহারা একটি ব্যোমচারী যানে আহার, শয়ন ও অবসরবিনোদন করিবেন। বিমানটি ভূমিত্যাগ করিবে না, উহা জর্জিয়ায় ম্যারিয়েটায় অবস্থিত লকহিড বিমান কারখানায় থাকিবে। মনস্তত্ত্ববিদ, জীববিদ্যাবিদ, ইঞ্জিনিয়ার ও একজন চিকিৎসক সহ ১০ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞের সাহায্যপুষ্ট বিমান কোম্পানীর বিজ্ঞানীরা পূর্বোক্ত দলের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবেন।

এভারেষ্ট ও তুষার-মানব

আমেরিকান পর্বতারোহী সমিতি যথারীতি পররাষ্ট্র দপ্তরের অনুমতি লইয়া আগামী বসন্তকালে এক অভিযানে একই সঙ্গে এভারেষ্ট আরোহণ ও তুষার-মানবের সন্ধানের সঙ্কল্প করিয়াছেন।

এক যাত্রায় দুই উদ্দেশ্য সাধনের অনুমতি নেপাল সরকার দিবেন কি না, সমিতি সে সম্বন্ধে খোঁজ করিলে নেপালের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নাকি জানাইয়াছেন যে, সমিতি পর্বতারোহণ ও ইয়েতি সন্ধান সম্পর্কে নেপাল সরকারের সর্ত পালন করিলে এবং এভারেষ্ট ও তুষার-মানবের জন্য পৃথক পৃথক দক্ষিণা দিতে রাজী থাকিলে নেপাল সরকার তাহাদের আবেদন বিবেচনা করিতে পারেন।

সমিতিকে তুষার-মানবের জন্য পাঁচ হাজার টাকা এবং এভারেষ্টের জন্য তিন হাজার টাকা দিতে হইবে। সমিতি নেপাল সরকারের সমুদয় সর্ত স্বীকার করিয়াছেন এবং আট হাজার টাকা দক্ষিণা দিতে সম্মত হইয়াছেন। সমিতিকে এখন অভিযাত্রী দলের সদস্যদের নাম ও তাঁহাদের পরিচয় জানাইতে হইবে। হিমালয়ে এই পর্যন্ত যত অভিযাত্রী দল গিয়াছে, সম্ভবতঃ তাহার মধ্যে ইহাই বৃহত্তম দল হইবে।

আমেরিকার দানবীর ও কোটিপতি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসু টম স্লিক, যিনি গত বসন্তকালে নেপালের অন্তর্গত পূর্ব হিমালয় পর্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন, তিনিও আগামী সেপ্টেম্বর মাসে তুষার-মানবের সন্ধানে একটি পূর্ণাঙ্গ অভিযানের জন্য নেপাল সরকারের সহিত কথাবার্তা চালাই-তেছেন। স্লিক তাঁহার দলে একজন অষ্ট্রেলিয়ানকে লইতে চাহেন। কিন্তু তাঁহার জন্য অষ্ট্রেলিয়ান সরকারের ছাড়পত্র লইতে বলা হইয়াছে। এই ছাড়পত্র না থাকিলে তাঁহাকে দলে যোগদান করিতে দেওয়া হইবে না। গত অভিযানের সময় তিনি অষ্ট্রেলিয়ান সরকারের ছাড়পত্র সংগ্রহ করিতে না পারায় নেপাল সরকার তাঁহাকে অভিযাত্রী দলের সঙ্গে যাইতে দিতে আপত্তি করিয়াছিলেন। পরে তিনি কোন প্রকারে অনুমতি আদায় করিয়া লন।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯

নবম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন

বিজ্ঞান কলেজ
পদার্থবিদ্যা বিভাগের কক্ষ

২০শে জুলাই, ৫৭
শনিবার, ৪-৩০ টা

কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী

পরিষদের এই নবম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে মোট চল্লিশজন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে অন্যতম সহঃ সভাপতি ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ যথোচিত আলোচনার পরে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভার নিয়মিত কার্যারম্ভের পূর্বে কর্মসচিব মহাশয়ের বিবরণীতে আলোচ্য বৎসরে পরিষদের সদস্য ডাঃ অমূল্যরতন চক্রবর্তী, জিতেন্দ্রমোহন সেন ও ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পরলোক গমনে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের অভিপ্রায় অনুসারে সভায় উপস্থিত সভ্যবৃন্দ এক মিনিট কাল নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া পরলোকগত সভ্যত্রয়ের লোকান্তরিত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন, এবং নিম্নলিখিত শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়:—

শোক প্রস্তাব

আমরা পরিষদের এই বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যগণ পরিষদের একান্ত শুভানুধ্যায়ী ও পৃষ্ঠপোষক ডাঃ অমূল্যরতন চক্রবর্তী, জিতেন্দ্রমোহন সেন ও ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পরলোক গমনে পরিষদের পক্ষ হইতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি। পরিষদের প্রতিষ্ঠা কাল হইতেই ইঁহারা পরিষদের সক্রিয় সভ্য ছিলেন এবং পরিষদের সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টায় নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। বিশেষতঃ ডাঃ মিত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাতৃগণের অন্যতম ছিলেন ও 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রথম কয়েক বছর সম্পাদনা কার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। পরিষদ ইঁহাদের ঋণ চিরদিন সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিবে। আমরা পরিষদের এই প্রবীণ সভ্যত্রয়ের লোকান্তরিত আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি এবং ইঁহাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

অতঃপর এই শোক প্রস্তাবের অনুলিপি পরলোকগত সভ্যগণের আত্মীয়বর্গের নিকট প্রেরণ করিবার জন্য কর্মসচিব মহাশয়কে অনুরোধ করা হয়।

বার্ষিক বিবরণী

অতঃপর পরিষদের কর্মসচিব শ্রীসর্বাণীসহায় গুহসরকার মহাশয় আলোচ্য ১৯৫৬-'৫৭ সালে পরিষদের বিভিন্ন কাজকর্ম, আর্থিক অবস্থা ও পরিকল্পনাদি সম্পর্কে বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। বিভিন্ন বিষয়ে পরিষদের অভাব অসুবিধা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি উপস্থিত সভ্যবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এই বিবরণী দান প্রসঙ্গে কর্মসচিব মহাশয় সভ্যগণের সর্বাঙ্গীন সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেন। যথোচিত আলোচনার পরে এই বার্ষিক বিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

হিসাব-বিবরণী ও ব্যয় বরাদ্দ

পরিষদের গত বার্ষিক অধিবেশনে নির্বাচিত

হিসাব-পরীক্ষক (অডিটর) শ্রী পি. কে. গুহঠাকুরতা, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট মহাশয়ের পরীক্ষিত আলোচ্য ১৯৫৬-'৫৭ সালের বিভিন্ন হিসাববিবরণী যথাসময়ে সভ্যগণের অবগতি ও বিবেচনার জন্য সকলের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীসুশীলকুমার আচার্য মহাশয়ের উপস্থাপিত উক্ত হিসাববিবরণী যথোচিত আলোচনার পরে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। কাজের সুবিধার জন্য পরিষদ ও 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার আয়-ব্যয় পরীক্ষান্তে পৃথক পৃথক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করা হইয়াছে বলিয়া হিসাব-পরীক্ষক মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

অতঃপর ১৯৫৭-'৫৮ সালের জন্য পরিষদ ও পত্রিকার বিভিন্ন আয়-ব্যয়ের আনুমানিক সম্ভাব্য বরাদ্দ-পত্র সভ্যগণের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করা হয়। কোষাধ্যক্ষ মহাশয় কর্তৃক রচিত ও নিয়মানুযায়ী ইতিপূর্বেই সাধারণ সভ্যগণের নিকট প্রেরিত এই বরাদ্দ-পত্রের কোন কোন স্থানে কয়েকজন সভ্য নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করিয়া কয়েকটি গঠনমূলক পরামর্শ দান করেন। কোষাধ্যক্ষ মহাশয় উক্ত সভ্যগণের অভিমত ও পরামর্শ বিবেচনা করিয়া দেখিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। অতঃপর পরিষদ ও পত্রিকার পৃথক পৃথক ব্যয়-বরাদ্দ-পত্র সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন লাভ করে।

কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতি গঠন

পরিষদের গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী সাধারণ সভ্যগণের প্রস্তাবিত নাম ও কার্যকরী সমিতির সুপারিশ এক সঙ্গে বিবেচনা করিয়া নিয়মানুগ সভ্যগণের নিম্নলিখিত নামগুলি পরিষদের পরবর্তী কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতির সদস্যপদে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করা হয়। অতঃপর উপস্থিত সভ্যগণের সর্বসম্মত অনুমোদনে উক্ত তালিকা অনুযায়ী নিম্নোক্ত সভ্যগণকে লইয়া ১৯৫৭-'৫৮ সালের জন্য পরিষদের কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়:—

কর্মাধ্যক্ষ মণ্ডলী

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু— সভাপতি
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য— সহঃ সভাপতি
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র— „ „
শ্রীসুহৃদচন্দ্র মিত্র— „ „
শ্রীনিখিলরঞ্জন সেন— „ „
শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল— „ „
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী— „ „
শ্রীসুশীলকুমার আচার্য—কোষাধ্যক্ষ
শ্রীসর্বাণীসহায় গুহসরকার—কর্মসচিব
শ্রীসুশীলকুমার মুখার্জি—সহযোগী কর্মসচিব
শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়— „ „

কার্যকরী সমিতি

১। শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত
২। শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা
৩। শ্রীমৃত্যুঞ্জয়কুমার মিত্র
৪। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
৫। শ্রীগৌরদাস মুখার্জী
৬। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়
৭। শ্রীমীনেন্দ্রনাথ বসু
৮। শ্রীপূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
৯। শ্রীনিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
১০। শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়
১১। শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন
১২। শ্রীপশুপতিনাথ চট্টোপাধ্যায়
১৩। শ্রীমদনমোহন চক্রবর্তী
১৪। শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু
১৫। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

উপরোক্ত সদস্যবৃন্দ উপস্থিত সভ্যগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হইলেন বলিয়া সভাপতি মহাশয় ঘোষণা করেন। এই নবনির্বাচিত কর্মাধ্যক্ষ

মণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতি অদ্য তারিখ হইতে নিয়মানুযায়ী পরিষদের পরিচালনা ভার গ্রহণ করিলেন।

সারস্বত সংঘ গঠন

সারস্বত সংঘের বর্তমান সংঘসচিব মহাশয় আলোচ্য বৎসরে সংঘের কাজকর্ম সম্পর্কে একটি বিবরণী দান করেন। অতঃপর পরিষদের গঠন-তন্ত্রের বিধান অনুসারে নূতন সারস্বত সংঘ গঠন প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে গত বৎসরের সারস্বত সংঘের সভ্যগণ এই বৎসরেও পুনর্নির্বাচিত হন এবং এই প্রস্তাব সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। নিয়মানুযায়ী এই নবগঠিত সারস্বত সংঘের পরবর্তী প্রথম সাধারণ অধিবেশনে সংঘনায়ক ও সংঘসচিব নির্বাচিত হইবেন এবং বিভিন্ন শাখা সংঘ পুনর্গঠিত করিয়া বিভিন্ন শাখার আহ্বায়ক নির্বাচিত হইবেন।

হিসাব-পরীক্ষক নির্বাচন

পরিষদের গত বৎসরের হিসাব-পরীক্ষক শ্রীপ্রশান্ত কুমার গুহঠাকুরতা, চাটার্ড অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট মহাশয় বর্তমান ১৯৫৭-'৫৮ সালের জন্য পুনরায় পরিষদের হিসাব-পরীক্ষক পদে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন। সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে ও শ্রীকানাইলাল সাহা মহাশয়ের অনুমোদনে এই নির্বাচন প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অনুমোদক-মণ্ডলী নির্বাচিত

পরিষদের নিয়মাবলীর বিধান অনুসারে বর্তমান সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত উপরোক্ত প্রস্তাবসমূহ অনুমোদন করিবার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া অনুমোদকমণ্ডলী সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন।

শ্রীমৃণালকান্তি দাশগুপ্ত, শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীসুশীলকুমার আচার্য।

উপরোক্ত পাঁচজন নির্বাচিত অনুমোদক এবং এই সভার সভাপতি ও পরিষদের কর্মসচিব মহাশয় উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহ অনুমোদন করিয়া স্বাক্ষর করিলে নিয়মানুযায়ী তাহা কার্যকরী বলিয়া গণ্য হইবে।

সভাপতির ভাষণ

এই অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে নির্বাচিত সভাপতি ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল মহাশয় পরিষদের বিভিন্ন কর্মতৎপরতার বিবরণ দিয়া একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট হইতে পরিষদের নিজস্ব গৃহ নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত জমি পাইবার সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি বিবৃতি দান করেন এবং এই বিষয়ে কর্পোরেশনের বর্তমান মেয়র অধ্যাপক শ্রীত্রিগুণা সেন মহাশয় যে আন্তরিক সহযোগিতার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর পরিষদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টায় উন্নতি ও অগ্রগতির উদ্দেশ্যে সভ্যগণের সর্বাঙ্গীন সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করিয়া ডাঃ পাল তাঁহার অভিভাষণ শেষ করেন।

অতঃপর উপস্থিত সভ্যগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া সভাপতি মহাশয় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল — সভাপতি

শ্রীসর্বাণীসহায় গুহসরকার — কর্মসচিব

অনুমোদকমণ্ডলীর স্বাক্ষর :—

১। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
২। মৃণালকুমার দাশগুপ্ত
৩। শ্রীসুশীলকুমার আচার্য
৪। শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৫। পরিমলকান্তি ঘোষ

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দশম বর্ষ | সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ | নবম সংখ্যা

প্রাচীন ভারতে প্রাণী-বিজ্ঞান

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

'পশু' শব্দ ইন্দো-ইয়ুরোপীয়; অর্থাৎ আর্য-ভাষাভাষীরা কোন এক অনির্দিষ্ট যুগে অজ্ঞাত স্থানে একত্র বাস করিত, সেই সময় হইতে 'পশু' শব্দ চলিত। জার্মান ভাষায় Vieh, প্রাচীন জার্মানে Fihu, গথিক ভাষায় Faihu, লাতিন ভাষায় Pecus, ইরানীয় ভাষায় Pasu ও বৈদিক ভাষায় 'পশু'। সংস্কৃতেও এই পশু শব্দ সুপরিচিত। আর্যেরা অনেক জন্তুই হয়তো দেখেন—কিন্তু সবগুলিকে বন্ধন করিয়া কাজে লাগাইতে পারেন নাই। তাঁহারা যেগুলিকে পশ্ বা পাশ দিয়া বাঁধিতে পারিয়াছিলেন তাহাদিগকেই 'পশু' বলিয়াছেন। পশ হইতে পাস্, ফাঁস প্রভৃতি শব্দ আসিয়াছে।

'পশু' শব্দ বৈদিক সাহিত্যে যজ্ঞীয় পশু বুঝাইত। তাহাদের সংখ্যা পাঁচটি—অশ্ব, গো, মেষ, ছাগ বা অজ ও মানব।

চারটি সম্বন্ধে বুঝা যায় যে, তাহাদের বাঁধিয়া কাজে লাগানো হইয়াছিল; কিন্তু মানবও এই তালিকাভুক্ত কেন? বোধহয় আদিম যুগে শত্রু-পক্ষীয় মানুষকে পশ্ বা বন্ধন করা হইত; দাসের ন্যায় ব্যবহৃত এবং সময়ে সময়ে দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞের পশুর ন্যায় হত্যা করা হইত।

ঋগ্বেদাদিতে পর্যন্ত পশুর উল্লেখ আছে। অথর্ববেদে সাতটি প্রাণীকে পশু বলা হইয়াছে। টীকাকার বলেন, উপরিউক্ত পাঁচটি জন্তু ব্যতীত গর্দভ ও উষ্ট্র লইয়া সপ্ত পশু। খর (গর্দভ) ও উষ্ট্র—মধ্য এশিয়ার ইরানীয় জ্ঞাতিদের সহিত বাস করিবার সময় বৈদিকেরা এই দুই পশুকে দেখেন, ইহার পূর্বে নয়; কারণ ইয়ুরোপীয় জ্ঞাতিদের মধ্যে এই শব্দ দুটি অজ্ঞাত।

বৌধায়ন মতে গ্রাম্য পশু সাতটি—অজ, অশ্ব, গো, মহিষ, বরাহ, হস্তী ও অশ্বতরী। আপস্তম্ভ মতে অনুরূপ—অজ, মেষ, গো, অশ্ব, গর্দভ, উষ্ট্র ও নর।

এই পশুকে বৈদিকেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন—উভয়দন্ত ও অনন্যোদন্ত। তাছাড়া আহার্য গ্রহণোপায় দ্বারা পশুকে হস্তাদানা ও মুখাদানারূপে শ্রেণীত করা হইয়াছিল। হস্তাদানার অর্থ, যাহারা হস্ত বা কর দিয়া আহার করে; যেমন—মনুষ্য, হস্তী ও মর্কট। মুখদানার অর্থ—যাহারা মুখ

দিয়া প্রত্যক্ষভাবে আহার করে ; যেমন—অশ্ব, গো, মেষ, অজাদি প্রাণী।

তাছাড়া পশুকে দ্বিপদ ও চতুষ্পদ শ্রেণীতেও বিভক্ত করা হইত। মানুষ দ্বিপদ—সে পশুদের মধ্যে প্রধান; সে-ই পশুদের মধ্যে 'একশত শরদ' জীবিত থাকে। বৈদিকেরা মনে করিতেন যে, মনুষ্য অন্যান্য পশুর ন্যায় বাক্‌শক্তিসম্পন্ন। পশুদের মনোভাব প্রকাশের উপায়কে বাচ্ বলিয়াছেন। পশুদের মধ্যে মনোভাব প্রকাশের শক্তি আছে, ইহা তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে উদ্ভিদ, পশু ও মনুষ্যের মধ্যে মনঃশক্তির পার্থক্য সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা হইয়াছে।

দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণী ছাড়া শ্বাপদ প্রাণীর কথা অথর্ববেদে পাওয়া যায়। শ্বাপদ শব্দের অর্থ হিংস্র জন্তু। শ্বা বা কুকুরের ন্যায় নখাদি-বিশিষ্ট প্রাণীকে শ্বাপদ বলে। শ্বন্ (শ্বা) মানুষের সর্বপ্রাচীন সঙ্গী। শ্বন্-এর ন্যায় নখ-পদযুক্ত আরণ্য প্রাণীকে শ্বাপদ বলা হইল। লাতিনে ক্যানিস, শ্বন্ শব্দের উচ্চারণভেদ মাত্র। শ্বাপদ শব্দের বিপরীত 'জগৎ' শব্দ। জগৎ বৈদিক সাহিত্যে গৃহপালিত পশু বুঝাইত। (Vedic Index I. 268)।

প্রাণিজগৎকে শ্রেণীত করিবার প্রথম প্রয়াস ঋগ্বেদের মধ্যেই দেখা যায়; যথা—বায়ব্য (যাহারা আকাশে বিচরণ করে), আরণ্য ও গ্রাম্য। বৈদিক সাহিত্যে প্রায় ৬০।৬৫টি পাখীর নাম পাওয়া যায়। কিন্তু সবগুলিকে সনাক্ত করা যায় নাই।

অথর্ববেদ হইতে পাঁচটি শ্রেণীর প্রাণী পাওয়া যায়; যথা—(১) মৃগ। মৃগ বলিতে হিংস্র জন্তু বুঝাইত। মৃগয়া বলিতে হরিণ শিকার বুঝাইত না। সে যুগে অরণ্যসমূহ হিংস্র শ্বাপদপূর্ণ ছিল। গ্রামবাসীদের পশুপাল প্রায়ই বিপন্ন হইত; সেইজন্য রাজারা মৃগয়ায় বাহির হইতেন। হিংস্র জন্তুর অভাবে হরিণ মারিয়া আনিতেন বলিয়া বোধ হয় কালে হরিণও মৃগ নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে। (২) সপক্ষ প্রাণী—হংস, সুপর্ণ (ঈগল জাতীয় পক্ষী), শকুন। এখানে পূর্বোল্লিখিত বায়ব্য ও সপক্ষ প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে; কারণ সকল সপক্ষ প্রাণী বায়ব্য নহে; যেমন—হংস। পরযুগের শ্রেণীকারেরা হংসকে জলেচর প্রাণীর অন্তর্গত করিয়াছেন। (৩) জলেচর—শিশুমার, অজগর (অজ বা ছাগ খাদক কুম্ভীর বা হাঙ্গর হইতে পারে)। (৪) মৎস্য—ঋগ্বেদের শেষের দিকে একবার মাত্র মৎস্য শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তবে অন্যান্য বৈদিক সাহিত্যে মৎস্য শব্দের ভূরি ভূরি ব্যবহার হইয়াছে। (৫) রজসা, অর্থাৎ পোকামাকড়। ইহাই পরে স্বেদজ বলিয়া শ্রেণীত হইয়াছে।

এই পর্যন্ত যে কয়প্রকার শ্রেণীকরণের চেষ্টার কথা আমরা বলিলাম, তাহা প্রাণীকুলের আহার, বিহার প্রভৃতি বাহ্যিক প্রভেদ দেখিয়া করা হইয়াছিল। কিন্তু উহাদের উৎপত্তি বা বীজের দিক হইতে বিচার করিয়া বর্গীকরণের প্রয়াসও প্রাচীনকালে দৃষ্ট হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদ প্রাচীন গ্রন্থ। উপনিষদকার প্রাণীকে তিনভাগে বিভক্ত করেন—(১) অণ্ডজ—অণ্ড বা ডিম হইতে যাহাদের জন্ম; (২) জীবজ, অর্থাৎ যে প্রাণী জীবন্ত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয় এবং (৩) উদ্ভিজ্জ। শঙ্করাচার্য এই উপনিষদের ভাষ্যকালে বলিয়াছেন যে, উদ্ভিজ্জ প্রাণী শাকসব্জি প্রভৃতি জৈব পদার্থ হইতে জন্মগ্রহণ করে। এই মত চরকেরও ছিল এবং শঙ্কর চরকের মত অনুসরণ করিয়াছেন। তবে শঙ্কর বলেন, স্বেদজ প্রাণীর মধ্যে কতকগুলি অণ্ড হইতে, কতকগুলি উদ্ভিদ হইতে জাত।

ঐতরেয় অরণ্যকে প্রাণিজগৎ চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত—অণ্ডজ, জারুজ বা জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ।

এই প্রাচীনকালের দ্রষ্টাদের মতে, উদ্ভিদাদি

হইতে প্রাণী হইতে পারে; কিন্তু বীজ ব্যতীত জীব সৃষ্ট হইতে পারে না। ইহা ছাড়া তাঁহারা বলিতেন, অজৈব পদার্থ হইতে কখনও জীবনের উন্মেষ হইতে পারে না। কিন্তু পতঞ্জলি (খৃঃ পূঃ ১৫০) পাণিনীর ব্যাকরণের মহাভাষ্যে বলিয়াছেন যে, কেবল মাত্র প্রাণী নহে, তৃণাদিও অজৈব পদার্থ হইতে সম্ভূত হইতে পারে। সেই যুগের বিশ্বাস মত তিনি বলিয়াছেন যে, দুর্বাদি তৃণ গো ও ছাগের লোম হইতে এবং বৃশ্চিক গোময়ে উৎপন্ন হয়। তবে পতঞ্জলি এই গুলিকে উৎপত্তির কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন নাই; তিনি কেবল মাত্র প্রকাশের নিমিত্ত বলিয়াছেন।

বৈদিক সাহিত্যাদির পর মহাভারতে আমরা প্রাণিজগতের বর্গীকরণ দেখিতে পাই। ছান্দোগ্য হইতে এখানে বর্গীকরণ আরও সূক্ষ্ম ও পর্যবেক্ষণ গভীর বলিয়া মনে হয়। তবে মহাভারতের যে যে অংশে এই সকল তথ্য ও তত্ত্ব পাওয়া যায়, তাহার রচনা কাল নির্দেশ করা কঠিন বলিয়া উহা চরকাদি আয়ুর্বিজ্ঞানীদের পূর্বের, কি পরের বিশ্লেষণ তাহা বলা যায় না।

মহাভারতকারের মতে, পৃথিবীতে স্থাবর ও জঙ্গম এই দ্বিবিধ জীব। তন্মধ্যে জঙ্গমই শ্রেষ্ঠ। জঙ্গম-যোনি তিন প্রকার—স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ (ভীষ্মপর্ব, ৪ অধ্যায়)। তবে শান্তিপর্বে (২৩১ অধ্যায়) প্রাণীগণ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম শ্রেণী-করণটি প্রাচীনতর বলিয়া মনে হয়।

মহাভারতে আছে—"জরায়ুজগণের মধ্যে মানুষ ও নানারূপধারী যজ্ঞসাধন পশু সর্বশ্রেষ্ঠ সেই পশু চতুর্দশ প্রকার। তন্মধ্যে সপ্ত আরণ্য (wild) ও সপ্ত গ্রাম্য (domesticated)। সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, হস্তী, ভল্লুক, বানর—এই সাতটি আরণ্য পশু। আর গো, ছাগ, মেষ, মনুষ্য, অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দভ—এই সাতটি গ্রাম্য পশু। এই ১৪বিধ গ্রাম্য ও আরণ্য পশু বেদে কথিত হইয়াছে। গ্রাম্য পশুর মধ্যে মনুষ্য এবং আরণ্য পশুর মধ্যে সিংহ শ্রেষ্ঠ। প্রাণী মাত্রেই পরস্পরের উপজীব্য এবং স্থাবর জীবদিগকে উদ্ভিজ্জ বলে।"

মহাভারতের এই বর্ণনা পাঠে মনে হয়, এই শ্রেণীবিভাগ প্রাচীন এবং লেখক বেদ ব্যতীত অন্য কোন শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে জানিতেন না।

মনুসংহিতায় মহাভারতের শান্তিপর্বের নির্দেশ অনুসৃত হইয়াছে। অমরসিংহের কোষগ্রন্থে মহাভারতকারের ভীষ্মপর্বোল্লিখিত বর্গীকরণ সমর্থিত। কোষকার আরণ্য পশুর মধ্যে সিংহকেই প্রথম স্থান দিয়াছেন। তাঁহার এই বর্গের নাম সিংহাদি বর্গ। মহাভারতকারও সিংহকে আরণ্য পশুর মধ্যে প্রধান বলিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই কোন এক বিজ্ঞানীর শ্রেণীকরণকেই অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। অমরসিংহ চরক-সুশ্রুতাদির ন্যায় অত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রাণিজগতের শ্রেণীকরণ না করিলেও প্রাণী সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান যে গভীর ও ব্যাপক ছিল, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ; কারণ তাঁহার তালিকায় বহু জাতীয় প্রাণীর উল্লেখ পাই।

প্রসস্তপাদ তাঁহার বৈশেষিক ভাষ্য গ্রন্থে প্রাণি-জগৎকে দুইটি বড় কোঠায় ভাগ করিয়াছেন; যথা—(১) অযোনিজ, অর্থাৎ যে সব প্রাণী যোনি-সংযোগ ব্যতীতই উৎপন্ন হয়; সেই সব অতি ক্ষুদ্রজন্তু। (২) যোনিজ, অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী-প্রাণীর সংযোগে যে প্রাণীর জন্ম হয়। যোনিজ প্রাণীকে প্রসস্তপাদ দুইটি বর্গে বিভক্ত করিয়াছেন—(ক) জরায়ুজ ও (খ) অণ্ডজ। মনুষ্য, চতুষ্পদ, আরণ্য ও গ্রাম্য পশু প্রভৃতি জরায়ুজ; পক্ষী, সরীসৃপ অণ্ডজ প্রাণী বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

উদয়নের মতে সরীসৃপ বলিতে মৎস্য, কীট, মাকড়সা প্রভৃতি বুঝায়। ক্ষুদ্র জন্তু বলিতে প্রসস্ত-পাদের মতে—(১) যাহাদের অস্থি নাই; (২) যাহাদের দন্ত নাই; (৩) যাহাদের হাজারটি এক মুঠার মধ্যে ধরিতে পারা যায়; (৪) যাহাদের সহজেই পিষিয়া

ফেলা যায়; (৫) নকুল (বেজি) পর্যন্ত সমস্ত প্রাণী।

ধর্ম সংহিতার মধ্যে হারীত সংহিতার মাংস অধ্যায়ে (২০-২২ অধ্যায়) আহার্য প্রাণীসমূহের একটি শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাই; যথা—(ক) চতুষ্পদ এই বর্গের মধ্যে এণ (হরিণ), চিত্রাঙ্গ, ছিক্কর, রোহিত, শূকর, শশক, শল্লকী, শল্যক, গোধা, মুষক। (খ) স্থলচর শ্রেণীর মধ্যে সমস্ত পক্ষী। (গ) জলচর শ্রেণীর মধ্যে জলচর পক্ষী, মকর, মৎস্য, কচ্ছপ, কুলীর (কাঁকড়া)। তবে হারীতের এই শ্রেণীবিভাগ অসম্পূর্ণ ও সেই যুগের আদর্শেও অবৈজ্ঞানিক।

কৌটিল্যের নামে অর্থশাস্ত্র কোন্ সময়ে সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা স্পষ্ট নয়; তবে তাহার মধ্যে প্রাচীনকালে প্রবাদগত ধারা রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। কৌটিল্যের গ্রন্থে আমরা বহু পশুপক্ষীর নাম পাই। রাজসরকার হইতে ইতর জন্তুদের রক্ষার নিমিত্ত বহু উপায় অবলম্বন করা হইত। স্থানে স্থানে 'অভয় বন' প্রতিষ্ঠিত ও রক্ষিত হইত। নিয়ম ছিল—এই সকল বনে আশ্রিত জন্তুদিগকে কেহ ধরিতে, পীড়ন করিতে বা হত্যা করিতে পারিত না। এই সকল বনে কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তাহার অর্থদণ্ড হইত। এই সকল বিধি কার্যে পরিণত করিবার জন্য সূনাধ্যক্ষ নামে রাজকর্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন।

যে সকল জন্তু এইরূপে আশ্রিত ও রক্ষিত হইত তাহাদের উল্লেখ নিম্নে করা হইল—

১। পক্ষী, মৃগ প্রভৃতি যে সকল প্রাণী রাজসরকারের রক্ষণাধীন বনে বাস করিত এবং সেই বনমধ্যস্থ সরোবরসমূহে যে সকল মৎস্য থাকিত।

২। যে সকল পক্ষী, মৎস্য, মৃগ এবং অন্যান্য প্রাণী জীবহিংসা করে না, অর্থাৎ অন্য জন্তুর প্রাণ সংহার করে না।

৩। বৎস, বৃষ এবং ধেনু বা দুগ্ধবতী গাভী।

৪। হস্তী, অশ্ব, মনুষ্য, বৃষ অথবা গর্দভের অনুরূপ সামুদ্রিক জন্তু। এই বচনটি হইতে বুঝা যায় যে, সমুদ্র এবং সামুদ্রিক জীবজন্তুর সহিত তখন লোকের কিছুটা পরিচয় হইয়াছিল।

৫। নদী, হ্রদ এবং কুল্যার মৎস্য।

৬। নিম্নলিখিত কতকগুলি শিকারের উপযুক্ত পাখী—সারস, ক্রৌঞ্চ, উৎক্রোশক, দাত্যূহ, হংস, চক্রবাক, জীবঞ্জীবক (ময়ূর জাতীয়), ভৃঙ্গরাজ, চকোর, মত্তকোকিল, ময়ূর, শুক ও মদনশারিক (ময়না)।

৭। যে সকল পশুপক্ষী মাঙ্গল্যসূচক বা পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত।

"যে সকল হিংস্র পশু, পক্ষী বা মৎস্য অপরাপর প্রাণীদিগকে হত্যা করিয়া খাইত (প্রসহ), তাহাদিগকে ধৃত করা বৈধ বলিয়া গণ্য হইত।" (প্রাচীন দণ্ডনীতি—নরেন্দ্রনাথ লাহা, পৃঃ ৩৮-৪১)।

অশোকের অনুশাসনে বহু জীবের নাম আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি হত্যা করা নিষেধ, কতকগুলি তাঁহার রন্ধনশালায় খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইত।

খৃঃ পূর্ব চতুর্থ শতক হইতে গ্রীক ও তৎপরে রোমান লেখকগণ ভারতীয় প্রাণী সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। মেগাস্থেনিসের লুপ্ত ভ্রমণ কাহিনীর খণ্ডিত রচনার মধ্যে ভারতের পশুসমূহের উল্লেখ আছে। বাংলাদেশের ব্যাঘ্র সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, ইহারা আয়তনে সিংহের দ্বিগুণ ও অতিশয় বলশালী। বহু জাতের বানরের কথা তিনি বলিয়াছেন—কাহারও লাঙ্গুল ২ হাত দীর্ঘ, কাহারও ৫ হাত। তাহাদের মুখ লাল এবং তাহারা দলবদ্ধভাবে বাস করে। গ্রীক লেখক এরিয়ান বলেন যে, তিনি শুনিয়াছিলেন কোন কোন রাজা উহাদের আহার্য দান করেন।

হস্তী সম্বন্ধে মেগাস্থেনিস ও অন্য বৈদেশিক লেখকেরা বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করিয়াছেন; কারণ এরূপ প্রাণী তাঁহারা কখনও দেখেন

নাই। এতদ্ব্যতীত বিশাল এক জাতের কুকুরের উল্লেখ পাওয়া যায়; তাহারা কামড়াইলে শীঘ্র ছাড়ে না। সিংহ ও বৃষকে ইহারা আক্রমণ করিত। পূর্ববঙ্গের সরাইলের কুকুরের সাহস ও হিংস্রতা সুপরিচিত।

কৃষ্ণসারকে গ্রীকরা হরিণের ন্যায় মস্তকবিশিষ্ট একশৃঙ্গ অশ্ব বলিয়াছেন। এরিয়ান 'কর্তোজান' নামে যে জন্তুর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা গণ্ডার মনে হয়। এছাড়া বন্য ছাগ, বন্য বৃষ, বন্য মেষের কথা পাই।

এই সকল পশু ব্যতীত তাঁহারা এক জাতীয় বৈদ্যুতিক মাছ, বহুবিধ সর্প ও সপক্ষ-বৃশ্চিক এবং অজগরের উল্লেখ করিয়াছেন। মেগাস্থেনিস বলিয়াছেন—অজগর সাপ এত প্রকাণ্ড যে, হরিণ ও বৃষ সম্পূর্ণ গ্রাস করিতে পারে। বোধ হয় সবই তাঁহার শোনা কথা - রাজদরবারের দূতাবাসে বসিয়া এই সব দেখা যায় না।

জলজ প্রাণীর মধ্যে মৎস্য ব্যতীত মুক্তাবহ শঙ্খ বা শুক্তি ও তাহার শিকার সম্বন্ধে তথ্য গ্রীক লেখকগণের গ্রন্থাদির মধ্যে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোদোতাস উত্তর-পশ্চিম ভারতের এক জাতীয় স্বর্ণবাহী পিপীলিকার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার অর্থ সুস্পষ্ট নহে। খনি হইতে শ্রমিকেরা যখন বাহির হয় তখন পিপীলিকার সারির ন্যায় দেখায়। সেই দৃশ্যটার কথাই অতি-রঞ্জিতভাবে পিপীলিকার স্বর্ণসন্ধান রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে কি?

মানুষের বুদ্ধি ও জ্ঞান যখন অপরিপক্ব তখন সে নানা প্রাকৃতিক ঘটনায় দৈব শক্তি আরোপ করিত। শাকুন-বিদ্যা (divination) পৃথিবীর বহু প্রাচীন জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। ইতালীর প্রাচীনতম অধিবাসী ইউট্রাস্কানরা পক্ষী ও প্রাণীর গতি, শব্দ, অন্ত্রাদির অবস্থান পর্যবেক্ষণ করিয়া শুভাশুভ নির্ণয় করিত। প্রাচীন চীনারা কচ্ছপ দগ্ধ করিয়া তাহার শুক্তির উপর চির্ (crack) দেখিয়া মঙ্গলামঙ্গল কল্পনা করিত। ভারতেও এই শাকুন-বিদ্যা লোকধর্মের অন্তর্গত। এখনও টিকটিকি বা যষ্টিপাতন সম্বন্ধে গ্রন্থ দেখা যায়। প্রাচীন ভারতে শাকুন-বিদ্যার যাবতীয় বিশ্বাসগুলি বরাহমিহির তাঁহার 'বৃহৎ সংহিতা' গ্রন্থে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। লোকে পক্ষী ও পশু সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করিত। বরাহমিহির প্রাণি-জগৎকে আটটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন; যথা—গ্রাম্য, আরণ্য, অম্বুচর, ভূচর, ব্যোমচর, দিবাচর, নিশাচর ও উভচর। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রাণি-সমূহের রব, গতি, দৃষ্টি ও উক্তি হইতে স্ত্রী, পুরুষ ও ক্লীব ভেদ করা যায়। বরাহমিহির প্রাচীন ঋষিগণের দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। (বৃহৎ সংহিতা, ৮৬ অধ্যায়, শ্লোক ৮-৯)

প্রাণিজগৎ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকভাবে অনুসন্ধান আরম্ভ হয় আয়ুর্বেদ চর্চা হইতে। ঔষধ ও পথ্যের সন্ধানে তাঁহারা আজ সর্বচরাচরকে জাঙ্গম (Animal), উদ্ভিদ (Plant) ও পার্থিব (Mineral) —এই তিনভাগে বিভক্ত করিয়া অনুসন্ধান ও গবেষণায় প্রবৃত্ত হন।

জাঙ্গম বা প্রাণিজগৎকে চরক ঋষি জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—এই চারি শ্রেণীতে ভাগ করেন। এই শ্রেণীকরণ প্রাচীন। সুশ্রুত সংহিতায় আছে "লোকজগৎ দ্বিবিধ; যথা—স্থাবর ও জঙ্গম। বৃক্ষাদি স্থাবর এবং মনুষ্যাদি জঙ্গম নামে অভিহিত।" জঙ্গম যা প্রাণীসমূহ চতুর্বিধ—(১) সংস্বেদজ, অর্থাৎ শৈত্য ও তাপ হইতে যাহাদের জন্ম হয়। সুশ্রুতের টীকাকার ডল্বন বলেন যে, এই শ্রেণীর নাম প্রথমে করা হইয়াছে, তাহার কারণ—সকল প্রকার প্রাণীর উৎপত্তির জন্য শৈত্য ও তাপের প্রয়োজন। (২) জরায়ুজ—জরায়ু হইতে যাহাদের জন্ম; (৩) অণ্ডজ, (৪) উদ্ভিজ্জ, অর্থাৎ যাহারা ভূমি উদ্ভেদ করিয়া জন্মায়।

সুশ্রুত জরায়ুজ প্রাণীকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; ইহার মধ্যে মনুষ্য প্রথম। দ্বিতীয়—

ব্যাল, অর্থাৎ যে সব পশু মাংস আহার করে; তৃতীয়—পশু, যাহারা শাকভোজী। পক্ষী, সর্প ও সরীসৃপ অণ্ডজ শ্রেণীর অন্তর্গত। কৃমি, কীট, পিপীলিকা প্রভৃতি প্রাণী স্বেদজ। মণ্ডুকাদি প্রাণী উদ্ভিজ্জ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যে সব প্রাণীর জন্ম-ইতিহাস সহজে চোখে পড়ে না, সেই সব প্রাণীকে উদ্ভিজ্জ প্রাণীর অন্তর্গত করা হইয়াছে। টীকাকার ডল্বন বলেন যে, এই শ্রেণীবিভাগ যথার্থ যোনি-সংকর (cross divisions), অর্থাৎ শ্রেণীত জীবসমূহের কোনটিই সম্পূর্ণরূপে জরায়ুজ বা অণ্ডজ নহে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলিয়াছেন যে, পক্ষীকুলের, অর্থাৎ যাহারা পক্ষবিশিষ্ট প্রাণী তাহাদের মধ্যে বাদুড় (জতুক) ও বলাকা (একপ্রকার হংস) জরায়ুজ। বলাকার মধ্যে কতকগুলি অণ্ডজ। সর্পের মধ্যে অহিপতাকা নামে একপ্রকার নির্বিষ সর্প জরায়ুজ। স্বেদজ প্রাণীর মধ্যে কতকগুলি পিপীলিকাজাতীয়, মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠে। এই স্বেদজরা পৃথিবী ও জীবদেহের শৈত্য ও তাপ হইতে উৎপন্ন হয়। এই শ্রেণীর মধ্যে কৃমি 'কোষ্ঠ-পুরীষাদিবষ্পসম্ভবাঃ' অর্থাৎ উদরস্থিত বিষ্ঠা হইতে উৎপন্ন। ইহা ছাড়া মৃতদেহ ও পচা দধিদুগ্ধো-দ্ভবও হয়।

চরক কৃমি জাতীয় প্রাণীর বিংশতি ভাগ করিয়াছেন; তন্মধ্যে যুক (উকুন) ও পিপীলিকা —এই দ্বিবিধ কৃমি বহির্মল। যুক কৃমি বহুপাদ বিশিষ্ট ও কেশাশ্রয়ী। পিপীলিকা অর্থাৎ লিখ্যা-কৃমি সূক্ষ্ম, বস্ত্রাশয়া (পিশু), কেশদ প্রভৃতি ছয় প্রকার কৃমি শোণিতজ; অন্ত্রাদ প্রভৃতি সাত প্রকার কৃমি কফজ; ককেরুক প্রভৃতি পাঁচ প্রকার কৃমি পুরীষজ। (সূত্রস্থান ১৯। দ্র. গরুড় পুরাণ, ১৭৯ অধ্যায়)।

বৈদিক সাহিত্যে, বিশেষভাবে অথর্ববেদে কৃমি ও কীট বহুবার উল্লিখিত আছে। কৃমি বিষাক্ত; পর্বতে, অরণ্যে, জলে, বৃক্ষে ও মানবদেহে বর্তমান থাকে। প্রাচীনেরা জানিতেন যে, কৃমি ও কীট মানুষের পীড়ার কারণ। অথর্ববেদে কীট সম্বন্ধে অনেকগুলি মন্ত্র আছে; কীট পর্যায়ে বহু নামও পাওয়া যায় (Ved. Ind. I, 180)।

কীট সম্বন্ধে ডল্বন বলেন যে, বৃশ্চিক ও ষড়বিন্দু প্রভৃতি প্রাণী স্বেদজ কীটের অন্তর্গত। ইহার মধ্যে বৃশ্চিক গোময়, সর্পবিষ্ঠা, গলিত কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হয়। গোময়াদি পরিবেশে এই সকল কীট জন্মাইতে পারে। কিন্তু জন্মাই-বার হেতু তাহারা নহে।

সুশ্রুত সংহিতাকার ছয় প্রকার পিপীলিকা, ছয় প্রকার মক্ষিকা, পাঁচ প্রকার মশক (ইহার মধ্যে এক একপ্রকার সামুদ্র ও পার্বত্য জাতীয়), ত্রিশ প্রকার বৃশ্চিক ও ষোল প্রকার মাকড়সার উল্লেখ করিয়াছেন। কীটসমূহের মধ্যে জোনাকী ও তৈলকীট নামে এক জাতীয় পোকাকে সুশ্রুত আলোকদাতা বলিয়াছেন।

কীট সম্বন্ধে সুশ্রুত টীকাকার ডল্বন পূর্বাচার্য লাড্যায়নের মত বহুবার উদ্ধৃত করিয়াছেন। লাড্যায়ন কীট সম্বন্ধে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া কীটসমূহকে নিম্নলিখিত চিহ্ন দ্বারা পৃথক করেন; যথা—(১) বিন্দুচিহ্ন বা গাত্রের বর্ণ, (২) পক্ষ, (৩) পাদাদি, (৪) মুখ, (৫) নখ, (৬) তীক্ষ্ণ লোম বা শুঁয়া, (৭) কণ্টক-লাঙ্গুল (লেজে কাঁটা), (৮) সংশ্লিষ্ট পক্ষরোম, (৯) শব্দ (স্বন), (১০) আকার (প্রমনণ), (১১) সংস্থান (দেহের গঠন), (১২) লিঙ্গ, যোনি আদি, (১৩) বিষ ও অন্যের দেহের উপর তাহার ক্রিয়া।

পিপীলিকা সম্বন্ধে ডল্বন বলেন যে, ইহারা ও তদ্‌জাতীয় প্রাণী স্বেদ হইতে জন্মলাভ করে, অণ্ড হইতে উৎপন্ন হয় ও মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠে। ডাঁশ ও মশা (দংশ মশকাদি) প্রায়শঃই স্বেদজ।

জলৌকা (জোঁক) কীটাদি শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে রক্তমোক্ষণার্থ ত্রিবিধ

উপায় কথিত আছে; তন্মধ্যে জলৌকার দ্বারা রক্তমোক্ষণ সচরাচর প্রচলিত ছিল। এই জন্য যাবতীয় জলৌকাবর্গকে ভিষকদের বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিতে হইয়াছিল। সুশ্রুতের মতে, জলৌকা ১২ প্রকার। ইহার মধ্যে ছয় প্রকার সবিষ; ছয়প্রকার নির্বিষ। এই নির্বিষ শ্রেণীর জলৌকা চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হইত। সুশ্রুত অতি বিস্তৃতভাবে জলৌকার আকৃতি ও প্রকৃতি বাসস্থানাদির বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্যান্য কীটের মধ্যে মক্ষিকা সম্বন্ধে আয়ুর্বেদকারগণ সবিশেষ তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কারণ মধু আয়ুর্বেদীয় ঔষধের একটি বিশেষ উপাদান। তজ্জন্য কোন্ মক্ষিকার কি প্রকার মধু তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান তাঁহাদের করিতে হয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে আট প্রকার মক্ষিকার উল্লেখ আছে; যথা—মক্ষিকা, ভ্রমর, ক্ষুদ্র মক্ষিকা, পুত্তিক, ছত্র, অর্ঘ, উদ্দলেক ও দাল। সুশ্রুত সংহিতা ও ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থে প্রত্যেকটি মক্ষিকার আকৃতি ও গুণ বর্ণিত হইয়াছে।

বৈদিক সাহিত্যে মক্ষিকার নাম আবঙ্গর। ইহা ছাড়া সর, ভৃঙ্গ, মক্ষ, মক্ষিকা, মধুকর প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। উপরিউক্ত স্বেদজ প্রাণী ব্যতীত বৈদিক সাহিত্যে ইন্দ্রগোপ (Cochineal insect), উপজিহ্বিকা (উপজীকা, উপদীকা), ঊর্ণনাভ, খদ্যোত, তৃণজলয়ূক, দংশ (ডাঁশ), পতঙ্গ, ভৃঙ্গ, মক্ষ, মক্ষিকা, মশক, সূচিকা প্রভৃতি কীটের নাম দৃষ্ট হয়।

স্বেদজ প্রাণীর পরে অণ্ডজ প্রাণীবর্গ। অণ্ডজ প্রাণীর অন্তর্গত সর্প সম্বন্ধে প্রাচীনগণ বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। ভারতে যতপ্রকার সর্প আছে, পৃথিবীর কুত্রাপি তাহা দৃষ্ট হয় না। তবে সর্প সম্বন্ধে আর্যঋষিরা যেসব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা বোধহয় ভারতের আদিবাসীদের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকিবে। পাশ্চাত্য সর্প-চিকিৎসা প্রবর্তিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত একমাত্র চিকিৎসা যাহা দেশমধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহা দেশজ। বাংলাদেশে মাল বৈদ্যগণই সর্প-চিকিৎসক বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

ঋগ্বেদে অহি শব্দ প্রায়ই দেখা যায়। সর্পের বিষ আছে, নকুল (বেজী) সর্পের শত্রু এবং সর্পের বিষ নকুলের দেহে বিষক্রিয়া করে না—প্রভৃতি বিষয় তাঁহারা জানিতেন। অবশ্য নকুল যে সর্পবিষে আহত হয় না, এই কথা সত্য নহে; আসলে নকুলের ক্ষিপ্রগতির জন্য সে সর্পকে হত্যা করিতে পারে।

বেদ ও অন্যান্য সংহিতায় বহু প্রকার সর্পের নাম পাওয়া যায়; কিন্তু বর্তমানে নাম দিয়া সেগুলি চিনিবার উপায় নাই। শতপথ ব্রাহ্মণের অধীতব্য বিষয়ের মধ্যে সর্পবিদ্যার উল্লেখ আছে। গোপথ ব্রাহ্মণে সর্পবেদ ও সাংখ্যায়ণ এবং অশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে বিষবিদ্যার কথা আছে।

আয়ুর্বেদে বিষপ্রয়োগ ও বিষ-চিকিৎসার জন্য সর্প জাতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিতে হইয়াছিল।

সুশ্রুত সংহিতায় সর্পের আলোচনা দেখা যায়। এই গ্রন্থের মধ্যে পাঁচটি বিভিন্ন শ্রেণীর সর্পের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে মাত্র এক জাতীয় সর্প নির্বিষ এবং চারি জাতীয় সর্প সবিষ। সবিষ সর্পের মধ্যে এক শ্রেণী সংকর এবং তিন শ্রেণী জাত-সাপ। এই তিন শ্রেণীর বিষাক্ত সর্পের বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে; যথা (১) দর্বিকর (কৃষ্ণসর্প, মহাকৃষ্ণ, পদ্ম, মহাপদ্ম ও শঙ্খপালী)। ইহারা ফণাবিশিষ্ট, দ্রুতগামী, দিবাচর। ফণায় রথচক্র, লাঙ্গল, ছত্র প্রভৃতি চিহ্ন আছে। (২) মণ্ডলী—ইহারা স্থুল, ধীরগতি, নিশাচর। ইহাদের দেহের উপর চক্র বা গোলাকার চিহ্ন। চরকের মতে ইহাদের ফণা নাই। (৩) রাজিমৎ—ইহাও ফণাহীন, নিশাচর। ইহাদের গাত্রে বিন্দু বিন্দু চিহ্ন থাকে এবং বহু বর্ণবিশিষ্ট হয়।

দর্বিকর শ্রেণীর মধ্যে ছাব্বিশ রকমের নাম আছে। ইহারা অল্প বয়সে ভীষণ বিষাক্ত। মণ্ডলী শ্রেণীর দুই প্রকার সাপ আছে। মধ্যবয়সে ইহারা মারাত্মক বিষাক্ত হয়। রগিমৎ শ্রেণীতে দশ রকম সাপের নাম প্রদত্ত হইয়াছে। ইহারা অধিক বয়সে মারাত্মক হয়।

নির্বিষ সর্পের বারো রকমের নাম পাওয়া যায়; ইহার মধ্যে অজগরের উল্লেখ আছে। বৈকট্য বা সংকর বর্ণের সাপ দশ প্রকারের। ইহার মধ্যে তিনটি শ্রেণী কতকগুলি বিষধর সর্পের সংযোগে উৎপন্ন। প্রাচীন ভিষকাচার্যগণ প্রত্যেকটি জাতির সর্পের বিষ ও বিষক্রিয়া পৃথকভাবে পর্যালোচনা করিয়াছিলেন। প্রত্যেকটির ক্রিয়া সুশ্রুত সংহিতায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

আয়ুর্বেদ গ্রন্থ ব্যতীত পুরাণাদিতেও সর্প সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ভবিষ্য পুরাণ হইতে জানা যায় যে, জ্যৈষ্ঠ মাসে নাগজাতি যোনিসংবদ্ধ হয়, বর্ষাকালে গর্ভধারণ করে এবং কার্তিক মাসে ২৪০টি পর্যন্ত অণ্ড প্রসব করে। এতগুলি অণ্ডের অধিকাংশই সর্পেরা আহার করিয়া ফেলে। অবশিষ্ট অণ্ডগুলি দুইমাস—অগ্নি পুরাণের মতে একমাস পরে ফাটিয়া যায় এবং সর্প বাহির হয়।

সোনালি রঙের অণ্ড হইতে পুরুষ সর্প, উহা হইতে কিঞ্চিৎ ফিকা ও একটু লম্বা ধরণের অণ্ড হইতে স্ত্রী-সর্প ও শিরিষ ফুলের রঙের অণ্ড হইতে উভয়লিঙ্গ সর্প নির্গত হয়। সাত দিনে সর্পের বর্ণ কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। এক পক্ষকাল বা বিশ দিনে সর্পের দন্ত উদ্গম ও তৃতীয় সপ্তাহে দন্তে বিষোদ্গম হয়। পঁচিশ দিনে এই বিষ মারাত্মক হয়। সাধারণতঃ ছয় মাসে সাপ খোলস (কঞ্চুক) পরিত্যাগ করে।

সর্পের গতি সম্বন্ধে প্রাচীনেরা বলিয়াছেন যে, মাটির উপর চলিবার সময় উহাদের পেটের নীচের চামড়া যথাক্রমে সঙ্কুচিত ও বিস্তৃত হয়; ইহার ফলে গতি উৎপন্ন হয়। ইহাদের শরীরে ২৪০টি সন্ধি আছে।

মানুষ, নকুল, ময়ূর, চকোর, বৃশ্চিক ও শূকর কর্তৃক সর্প নিহত হয়। এই সব শত্রু হইতে নিষ্কৃতি পাইলে সর্প ১২০ বৎসর পর্যন্তও বাঁচিতে পারে। নির্বিষ সর্পের আয়ু অপেক্ষাকৃত অল্প—সাধারণতঃ ৭৫ বৎসর হয়। অগ্নি পুরাণের মতে, সর্পের দন্তসংখ্যা ৩২; তন্মধ্যে ৪টি দন্ত বিষাক্ত।

উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ ও অণ্ডজ প্রাণী সম্বন্ধে সাধারণভাবে ও অহিকুল সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিলাম। ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ কার্য অপেক্ষাকৃত সরল।

চরক ও সুশ্রুতে বহু প্রকার প্রাণীর মাংসের দোষগুণ বিচার আছে। সেই মাংসের গুণাগুণ নির্ধারণের জন্য প্রাণিজগৎকে পর্যবেক্ষণ করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা মোটামুটিভাবে স্তন্যপায়ী ও পক্ষীদের আবাস, আহার, ব্যবহারাদির উপর লক্ষ্য করিয়া শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন।

প্রাণীসমূহের বাসভেদ করিয়া চরক ভূমিকে (১) জাঙ্গল বা পার্বত্য ও জঙ্গলপূর্ণ স্থান এবং (২) অনূপ বা জলাশয় ও তন্নিকটস্থ দেশ রূপে দেখিয়াছেন। বাগ্‌ভট্ট এই দুইটি ছাড়া সাধারণ বলিয়া একটি ভেদ স্বীকার করিয়াছেন।

চরককৃত সমগ্র মাংসবর্গের ৮টি ভাগ এইরূপ :—

১। প্রসহ—মাংসাশী বা নিরামিষাশী—স্থলচর পশু ও পক্ষী, যাহারা সহসাপূর্বক আহার করে, তাহাদিগকে প্রসহ বলে।

২। অনূপ—যে সকল প্রাণী জলাশয় বা নদীচরে বিচরণ করে; যথা—বরাহ, মহিষ, ন্যঙ্কু, হস্তী, গণ্ডার, গরু প্রভৃতি।

৩। ভূশয় বা বিলেশয়—ভেক, গোসাপ, সর্প, সজারু প্রভৃতি প্রাণী। যাহারা গর্তে বা বিলে বাস করে তাহারা বিলেশয়।

৪। বারিশয়—জলজ প্রাণী; যেমন—মৎস্যাদি।

৫। জলচর—যে সকল পক্ষী জলে বিচরণ

করে; যথা—হংস, সারস, কলহংস, বক, কারণ্ডক, প্লব, বলাকা, উৎক্রোশ, চক্রবাক, জলকাক, কোঁচবক ও রক্তশীর্ষ।

৬। জাঙ্গল—যে সকল প্রাণী জঙ্গলে বাস করে। প্রধানতঃ হরিণ জাতীয় পশু ইহার অন্তর্গত।

৭। বিষ্কির—যে সকল পক্ষী আহারকালে আহার্য বিকীর্ণ করিয়া ভক্ষণ করে। বাগ্‌ভট্ট ২৫টি পক্ষী এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করিয়াছেন।

৮। প্রতুদ—যে সকল পক্ষী চঞ্চুদ্বারা আহত করিয়া (ঠোকরাইয়া) আহার করে।

চরক বা আত্রেয় মত অনুসরণ করিয়া বাগ্‌ভট্ট তাঁহার 'অষ্টাঙ্গ হৃদয় সূত্র' গ্রন্থে মাংস বর্গীয় প্রাণীকে ৮টি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন; তবে তাঁহার ক্রম একটু পৃথক। যথা—(১) মৃগ (ইহাকে চরক জাঙ্গল বলিয়াছেন), (২) বিষ্কির, (৩) প্রতুদ, (৪) বিলেশয়, (৫) প্রসহ, (৬) মহামৃগ (চরক ইহাকে আনূপ বলিয়াছেন), (৭) জলচর, (৮) মৎস্য (চরক ইহাকে বারিশয় বলিয়াছেন)।

উক্ত অষ্টবিধ বর্গের মধ্যে প্রথম তিনটি—মৃগ, বিষ্কির ও প্রতুদ বর্গ—জাঙ্গল এবং শেষ তিনটি—মহামৃগ, জলচর ও মৎস্য—আনূপ এবং মধ্য দুইটি—বিলেশয় ও প্রসহ—উভচর নামে খ্যাত। (বাগ্‌ভট্ট, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)।

ছাগ ও মেষ—ইহারা গ্রামেও বিচরণ করে এবং জঙ্গলেও বিচরণ করে। এই ব্যামিশ্রচরত্ব-হেতু উৎপত্তি স্থান সম্বন্ধে নিশ্চয়ত্ব নাই। এই জন্য অষ্ট প্রকার মাংস হইতে ইহাদিগকে পৃথক করা হইয়াছে।

সুশ্রুত সূত্রস্থানে (৪৬ অধ্যায়) প্রাণীসমূহের ৬টি শ্রেণী করিয়াছেন; যথা—১। জলেশয়, ২। আনূপ, ৩। গ্রাম্য, ৪। ক্রব্যাদ (মৎস্যভোজী), ৫। একশফ (এক খুর, অর্থাৎ অখণ্ডিত খুরবিশিষ্ট প্রাণী), ৬। জাঙ্গল। এই সমস্ত বর্গকে পুনরায় স্থূলতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা—জাঙ্গল ও আনূপ; অর্থাৎ উচ্চ ভূমিজাত ও নিম্নভূমি বা জলবহুল স্থানে উদ্ভূত।

সুশ্রুত জাঙ্গল ও আনূপ প্রাণীসমূহকে যথাক্রমে আট ও পাঁচ ভাগে পুনরায় শ্রেণীত করিয়াছেন। জাঙ্গল বর্গে আছে—জঙ্ঘাল, বিষ্কির, প্রতুদ, গুহাশয়, প্রসহ, পর্ণমৃগ, বিলেশয় ও গ্রাম্য এবং আনূপ বর্গে আছে—কুলেচর, প্লব, কোশস্থ, পাদিন ও মৎস্য।

মৎস্য দ্বিবিধ—নাদেয় বা নদীজাত ও সামুদ্র বা সমুদ্রজাত। তিমি, তিমিঙ্গিল Sword fish ?), কুলিশ, পাকমৎস্য, নিরালক, নন্দিপরলক, মকর, গর্গর, চন্দ্রক, মহামীন ও রাজীব প্রভৃতি সমুদ্রজাত মৎস্য বলিয়া খ্যাত ছিল। নাদেয় ও সামুদ্রজাত মৎস্য ব্যতীত চুণ্টজাত, কূপজাত, বাপীজাত, সরোবরজাত, তড়াগজাত, গিরিপ্রস্রবণজাত মৎস্যের বিশিষ্টতার কথা সুশ্রুতে উল্লিখিত হইয়াছে।

পাদিন অর্থ পদবিশিষ্ট জলজন্তু। এই শ্রেণীর মধ্যে কুম্ভীর, কূর্ম, নক্র, গোধা, মকর, শঙ্কু, ঘণ্টিক ও শিশুমার পড়ে।

কোশস্থ প্রাণী বলিতে শঙ্খ (Conchifera), শঙ্খন, শুক্তি (Pearl mussels), শম্বুক, কর্কট প্রভৃতি প্রাণী বুঝায়। সুশ্রুত পক্ষীজাতিকে জাঙ্গল ও আনূপ উভয়ত্র বর্গীত করিয়াছেন। আনূপ পক্ষীকে প্লব বলে, অর্থাৎ জলে সাঁতার দিয়া বেড়ায়। এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে হংস, সারস, কারণ্ড, বক, ক্রৌঞ্চ, শরারিকা ইত্যাদি।

অষ্টবিধ জাঙ্গল প্রাণীর মধ্যে তিন শ্রেণীই পক্ষী। ইহারা স্থলচর ও ব্যোমচর। সুশ্রুতের বিষ্কির, প্রতুদ ও প্রসহবর্গ চরকেও আছে; তবে চরকের প্রসহবর্গে পশুও অন্তর্গত। কারণ যাহারা হঠাৎ ছিঁড়িয়া আহার করে তাহাদিগকে চরক এই সংজ্ঞার অন্তর্গত করিয়াছেন। সুশ্রুত কেবল ঐ স্বভাবযুক্ত পক্ষীকেই প্রসহবর্গের মধ্যে ধরিয়াছেন।

সুশ্রুত সংহিতায় অন্যত্র (সূত্রস্থান ৪৬) পক্ষীজাতিকে আহার্য বিচার করিয়া শ্রেণীত করা

হইয়াছে; যেমন—ফলাহারী, মাংসাশী, মৎস্যাশী, ও ধান্যভোজী।

আনূপবর্গে কতকগুলি কুলেচর প্রাণী, অর্থাৎ যাহারা জলাশয়ের নিকট বাস করে, যেমন—হস্তী, গবয়, মহিষ, রুরু, গণ্ডার, বরাহ, চমরী প্রভৃতি বৃহৎ চতুষ্পদ জন্তু অন্তর্গত করা হইয়াছে। সুশ্রুত আনূপ প্রাণী—পশু-পক্ষী অভেদে - দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যে সকল পশু ও পক্ষী গ্রাম ও জলাশয়ের অতি নিকটে বাস করে তাহারা মহাভিষ্যন্দী এবং যাহারা দূরে বাস করে তাহারা অল্পাভিষ্যন্দী নামে খ্যাত।

এখন অবশিষ্ট থাকিল পাঁচ শ্রেণীর জাঙ্গল প্রাণী। জাঙ্গল বর্গের বিলেশয়ের অন্তর্গত কতকগুলি প্রাণী ব্যতীত আর সমস্তই স্তন্যপায়ী জন্তু। জঙ্ঘাল বর্গে বন্য, তৃণভুক, দ্রুতগামী চতুষ্পদ প্রাণী—যেমন নানাজাতির হরিণ ও কৃষ্ণসার বুঝায়। পর্ণমৃগের অর্থ বানর, বৃক্ষমর্কটিকা (রূপী বানর), মদ্‌গু (মালুয়া সাপ ?), বৃক্ষমূষিক (গেছো ইঁদুর) প্রভৃতি প্রাণী। পর্ণমৃগের মধ্যে পুতিঘন নামে বৃক্ষ-বিড়াল হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ নির্গত হয়।

পূর্বে যেসব প্রাণী 'পশু' নামে পরিচিত ছিল, চরক-সুশ্রুত যুগে তাহারা গ্রাম্য প্রাণীর অন্তর্গত। ইহারা অশ্ব, অশ্বতর, গো, গর্দভ, উষ্ট্র, ছাগ, মেষ প্রভৃতি।

গুহাশয় প্রাণীরা মাংসভোজী বা ক্রব্যাদ। সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক, ঋক্ষ, তরক্ষু, দ্বীপি, বভ্রু, জম্বুক ও মার্জার প্রভৃতিকে এই শ্রেণীর অন্তর্গত করা হইয়াছে।

বিলেশয়, অর্থাৎ যে প্রাণী গর্তের মধ্যে বাস করে—জরায়ুজ ও অণ্ডজ এই দুই শ্রেণীর জীবকে এই বর্গের মধ্যে ধরা হয়। গোধা, শশ, ভুজঙ্গ, ইঁদুর, শল্লকী, সজারু নকুল প্রভৃতি বিলেশয় প্রাণী। আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে জ্ঞানাহরণ করিতে গিয়া ভিষকাচার্যগণ প্রাণী-জগৎকে শ্রেণীত করেন, প্রত্যেকটি বিষয়ের গুণাগুণ বিচার করেন। আর জৈনেরা অহিংসা প্রচার করিবার জন্য জীবজগৎ সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। জীবহিংসা পাপ—কিন্তু সেই জীব কাহারা—এই ছিল তাঁহাদের অনুসন্ধানের বিষয়। সেই গবেষণা হইতে আমরা একটি সুসংগত শ্রেণীকরণ পদ্ধতি পাই। উমাস্বতীকৃত তত্ত্বার্থাধিগম নামক জৈন গ্রন্থে এই বিশ্লেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। কোন্ প্রাণী কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় অধিক ব্যবহার করিতে সক্ষম, তাহারই বিচার করিয়া এই শ্রেণীকরণ হইয়াছে।

১। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে দুইটি ইন্দ্রিয়—যেমন স্পর্শ ও স্বাদ যাহাদের প্রবল, সেই প্রাণীগুলি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। যথা—

ক। অপাদিক (পদহীন কীট) Scolicids; খ। নুপুরক; গ। গণ্ডুপাদ (গাঁটযুক্ত পদ) Arthropoda; ঘ। শঙ্খ, শুক্তিকা, শম্বুক প্রভৃতি Crustaceans; ঙ। জলুকা (জোঁক)।

২। দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে তিনটি ইন্দ্রিয়—স্পর্শ, রস ও ঘ্রাণ যাহাদের প্রবল, সেই সকল প্রাণী বর্গীত হইয়াছে।

ক। পিপীলিকা (Ants, Formicides, Hymenoptera); খ। রোহিলিকা (লাল পিঁপড়ে); গ। উপচিকা, কুন্দু, তুবুরক (ছারপোকা, ডাঁশ প্রভৃতি Hemiptera); ঘ। ত্রপুসবীজ, কর্পাসাস্থিক (উকুন, পিযু প্রভৃতি Aptera, Amitabola); ঙ। শতপদী, উৎপতক; চ। তৃণপত্র (Plant lice); ছ। কাষ্ঠহারক (উই প্রভৃতি) Termites, Neuroptera, Hemimetabola)।

৩। তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে চারিটি ইন্দ্রিয়—স্পর্শ, রস, ঘ্রাণ ও দৃষ্টিশক্তি যাহাদের প্রবল, সেই সকল প্রাণী।

ক। ভ্রমর, বরত, শারঙ্গ (Bees, Wasps, Hornets); খ। মক্ষিকা, পুত্তিকা, দংশ, মশক (Flies, Gnats, Gadflies, Mosquitoes);

গ। বৃশ্চিক, নন্দ্যাবর্ত (Scorpions, Spiders); ঘ। কীট (Butterflies, Moths); ঙ। পতঙ্গ (Grasshopper, Locust)।

৪। চতুর্থ বা শেষ শ্রেণীর মধ্যে পঞ্চেন্দ্রিয়—স্পর্শ, রস, ঘ্রাণ, দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি যাহাদের মধ্যে আছে সেই সকল শ্রেণীত হইয়াছে। তবে এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সকল ইন্দ্রিয় সর্বজীবে সমান নহে; তজ্জন্য ইহা কয়েকটি বর্গে বিভক্ত করা হইয়াছে।

১। মৎস্য; ২। উরগ; ৩। ভূজগ। সাধারণ ভাষায় উরগ ও ভুজঙ্গ প্রতিশব্দবাচক; কিন্তু এখানে পৃথক করিবার হেতু আছে। যে সকল সর্প বক্ষ বা উরস দিয়া চলে এবং গোধা, টিকটিকি, গিরগিটি প্রভৃতি প্রাণী ভুজের সাহায্যে বিচরণ করে, উভয়েই সর্পজাতীয় প্রাণী; ৪। পক্ষী; ৫। চতুষ্পদ।

উমাস্বতীকৃত এই চারিটি শ্রেণীর মধ্যে প্রথম তিনটি শ্রেণীর অন্তর্গত প্রাণীসমূহ মেরুদণ্ডহীন; চারি বা পঞ্চেন্দ্রিয়যুক্ত প্রাণীসমূহ মেরুদণ্ডী।

এই শেষোক্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীসমূহকে উমাস্বতী তাহাদের জন্মপদ্ধতি দ্বারা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা—১। অণ্ডজ প্রাণী—সর্প, গোধা, কৃকলাস, গৃহগোলিকা, মৎস্য, কূর্ম, নক্র, শিশুমার, লোমপক্ষ পক্ষীকুল।

শিশুমার অণ্ডজ প্রাণী নহে, উহা জীবজ। এখানে ভুল করিয়া ইহাকে অণ্ডজ প্রাণীভুক্ত করা হইয়াছে। ভেকের উল্লেখ নাই। বোধহয় সুশ্রুতের ন্যায় মণ্ডুককে ইনি উদ্ভিজ্জ প্রাণী মনে করিয়াছিলেন। তবে চতুষ্পদী ও শতপদী সর্প-বর্গের পরেই সুশ্রুত ভেকের উল্লেখ করিয়াছেন।

২। জরায়ুজ—স্তন্যপায়ী প্রাণী যাহারা জরায়ু সমেত ভূমিষ্ঠ হয়। মনুষ্য, গবাদিপশু, সিংহাদি জন্তু সবই জরায়ুজ।

৩। পোতজ—মনুষ্য, গবাদিপশু ও সিংহাদি জন্তু ব্যতীত অন্যান্য জীবজ প্রাণী; যথা—শল্লক (সজারু), হস্তী, শ্বাবিৎ, লালন (poisonous mouse), শশ, শায়িকা (কাঠবিড়ালী), নকুল, মূষিক, চর্মপক্ষী, যেমন—জলুকা (বাদুড়), বলগুলি (Flying fox), ভারণ্ড (Fabulous bird), পক্ষিবিড়াল (উদ্‌বিড়াল?) প্রভৃতি প্রাণী পোতজ শ্রেণীর অন্তর্গত। 'পোতক' অর্থ শাবক। বর্তমান প্রাণী-বিজ্ঞানে Proboscidea, Rodentia, Insectivora, Chiroptera—এই চারি শ্রেণীর সহিত 'পোতজ' বিভাগের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

বিভিন্ন বস্তু ও বিষয় সম্বন্ধে বিচ্ছিন্ন জ্ঞানকে মানুষ আদিযুগ হইতে সুসংবদ্ধ করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। জাগতিক জাঙ্গম, উদ্ভিদ ও পার্থিব বিষয়কে মানুষ শ্রেণীত করিয়া পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছে। গ্রীসের পণ্ডিত শিরোমণি আরিস্তো-তল প্রথম জীব-জগতকে শ্রেণীত করেন। তাঁহার ৮টি শ্রেণী এইরূপ—

Mammals, Birds, Oviparous, Quadrupeds, Fishes, Molluscs, Crustaceans, Insects, Animals with shells। রোমান বিজ্ঞানী প্লীনি এই শ্রেণীকরণ অগ্রাহ্য করিয়া প্রাণী-জগতকে বায়ব্য, ভূচর ও জলচর এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন। তারপর হইতে এই পর্যন্ত বহু বিজ্ঞানী শ্রেণীকরণ করিয়াছেন। ভারতেও অনুরূপ চেষ্টা চলিয়াছিল। বৈদিক যুগ হইতে হিন্দু যুগের অবসানকালের মধ্যে বহু তত্ত্বজ্ঞানী, ভিষক, ধর্মাচার্য জগতের বিচিত্র প্রাণীর মধ্যে যোগাযোগ কোন্‌খানে তাহা আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমরা হিন্দুদের এই নির্গলিত জ্ঞানকে এখানে সুসংবদ্ধ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছি।

সমগ্র প্রাণী-জগৎ ক্ষুদ্র জন্তু ও তির্যক যোনি এই দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। ক্ষুদ্র জন্তুকে অযোনিজ ও যোনিজ এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ক্ষুদ্র জন্তুকুল মেরুদণ্ডহীন। কৃমি, জলুকা, কোশস্থ, পিপীলিকা, ভ্রমর-মক্ষিকাদি বর্গে ইহারা শ্রেণীত।

তির্যক যোনির মধ্যে অণ্ডজ ও জরায়ুজ, এই দুই ভাগ করা হইয়াছে। অণ্ডজ-এর মধ্যে মৎস্য, উরগ, ভুজগ—উপবর্গত্রয় নির্ণীত হইয়াছে। জরায়ুজ-এর মধ্যে পোতজ বা মৃগপক্ষী বা চর্মপক্ষ প্রাণী, বিলেশয়, পর্ণমৃগ, অক্রব্যাদ বা অহিংসক, ক্রব্যাদ বা হিংস্র প্রাণী এবং সর্বোপরে এবং সর্বশেষে মনুষ্য।

এই প্রবন্ধের উপকরণ সংস্কৃত গ্রন্থ ও তদীয় অনুবাদ, অভিধান, কোষগ্রন্থ; Benoy Kumar Sarkar—Positive Background of Hindu Sociology; Dr. Brojendra Nath Seal—Positive Sciences of the Hindus, ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা—প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। ১৯২৫।
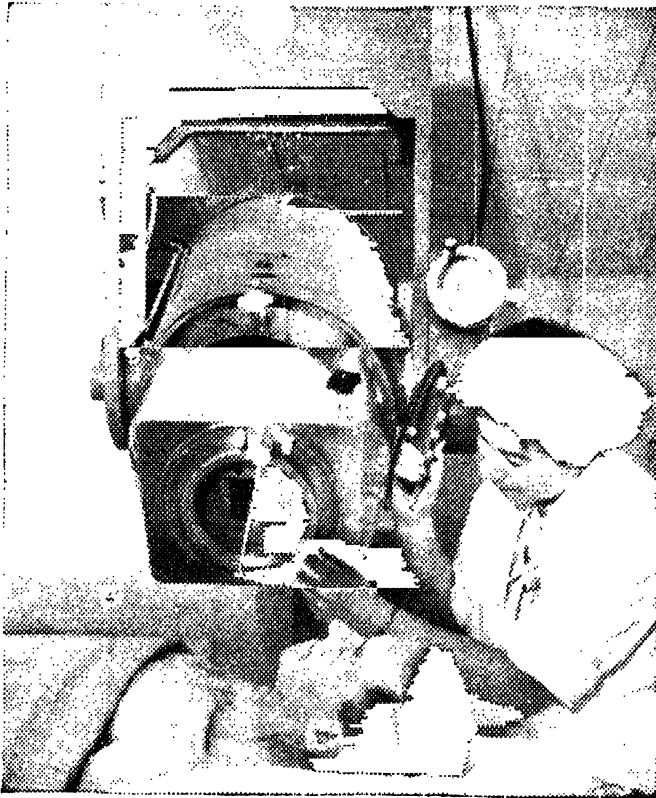
বৃটেনের রয়্যাল মার্সডেন হাসপাতালে পারমাণবিক পরিত্যক্ত পদার্থ সিজিয়ামের সাহায্যে কঠিন রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা করা হচ্ছে।

ভারতের ধাতব খনিজ সম্পদ

শ্রীমিহির বসু

খনিজ সম্পদে ভারত যথেষ্টই সমৃদ্ধ; আর ধাতব খনিজের ক্ষেত্রে ভারতের প্রাচুর্য অনেক ক্ষেত্রেই নিজের প্রয়োজনের বাইরেও অপরের চাহিদা মেটাতে পারে। তবে একথাও ঠিক যে, সমস্ত খনিজের চাহিদার অনুপাতে খনিজ উৎপাদনে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। আসলে আজকের দিনে এমন কোন দেশই নেই যাকে কোন না কোন খনিজের জন্যে অপরের উপর নির্ভর করে থাকতে হয় না। অমন যে শিল্পজগতের প্রাণকেন্দ্র আমেরিকা, তাকেও টিন ও নিকেল আকরিক অপর দেশ থেকে আমদানী করতে হয়। ভারতের যে দুটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ধাতুর আকরিকের প্রাচুর্য আমাদের দেশের চাহিদা মেটাবার পরেও বিদেশে রপ্তানী করা চলে তা হলো—লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ খনিজ। এছাড়াও ভারতের টাইটেনিয়াম আকরিক ও মোনাজাইট বিদেশে চালান যায়। বর্তমান চাহিদায় অ্যালুমিনিয়াম ও ক্রোমিয়াম আকরিকে ভারত মোটামুটি আত্মনির্ভরশীল। ভারতকে অপরের উপর নির্ভর করে থাকতে হয় যে সব খনিজের জন্যে, তার তালিকাও খুব ছোট নয়; যেমন—সীসা, দস্তা, টিন, রূপা, নিকেল ও তামার আকরিক। তবে আশা করা যায় যে, আরও জোরদার খনিজ অন্বেষণ, কোন কোন ক্ষেত্রে খনিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির নিয়োগ ও সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে খনির কাজ পরিচালনা করে ভারত তার ঘাটতি ধাতব খনিজের প্রয়োজন অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পারবে। এই উন্নয়ন ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষা ও ভারতীয় খনি সংস্থার কর্মতৎপরতার উপর নির্ভর করছে। শিল্পপতি ও খনি মালিকদের সহযোগিতাও এক্ষেত্রে একান্ত কাম্য।

আমাদের দেশে লৌহ আকরিক (প্রধানতঃ হেমাটাইট ও কিছু লৌহ চুম্বক) বিভিন্ন স্থানে স্তরীভূত হেমাটাইট-কোয়ার্ট্‌জ্ (পরিবর্তিত) শিলা অঞ্চলে পাওয়া যায়। বিহারের সিংভূমে, উড়িষ্যার কেওঞ্জর, বোনাই অঞ্চলে, মধ্যভারতের বাস্তার, দক্ষিণ ভারতেও বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে মহীশূরের বাবাবুদান পাহাড়ে আকরিক লৌহ উৎপন্ন হচ্ছে। তবে বিহার ও উড়িষ্যার খনিগুলি থেকেই আমাদের প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগ লৌহ আকরিক উৎপন্ন হয়ে থাকে। বিশেষ করে সিংভূমের নোয়ামুণ্ডি (লোহামুণ্ডি) লৌহ-খনি আমাদের গৌরবের স্থান; কারণ এটি এশিয়ার বৃহত্তম লৌহখনি। এই অঞ্চলের লৌহ আকরিকের সঠিক সঞ্চয় নির্ণয় করা হলে এটি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লৌহখনির গৌরব পেতে পারে। নোয়ামুণ্ডি ও তার কাছাকাছি গুয়া অঞ্চলে লৌহ আকরিকের যে বিপুল সম্পদে আমাদের দেশ সমৃদ্ধ, তার সঠিক সঞ্চয় নির্ণীত না হওয়া পর্যন্ত লৌহশিল্পে ভারতের পুর্ণমান যাচাই হবে না। যদিও আপাতদৃষ্টিতে বর্তমান খরচের হারে আমাদের লৌহ আকরিক সম্পদ হাজার বছরেও ফুরাবে না, কিন্তু খরচের হার ক্রমশঃ বাড়বে এবং অবস্থা অনুযায়ী রপ্তানী বাড়াতে হবে। সুতরাং সম্পদ বৃদ্ধিই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, আর রাজস্থানের লৌহ আকর আবিষ্কারের সম্ভাবনা সেই অগ্রগতিরই শুভ সূচনা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে আমাদের লৌহ আকরিকের উৎপাদন ১২৫ লক্ষ টনে পৌছানো উচিত। উৎপাদন বাড়াতে খনির কাজে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশে শ্রমিক শক্তির খরচ কম;

তাহলেও যন্ত্র ও মানবশক্তি একই সঙ্গে কাজে লাগানো উচিত। যদিও নোয়ামুণ্ডি লৌহ খনিতে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ চালাবার সূচনা হয়েছে, তবুও মনে হয় এই পদ্ধতি বাদাম পাহাড়, গুরু-মহিষানী, সুলাইপত ও অন্যান্য লৌহখনি অঞ্চলেও বিস্তৃত হওয়া দরকার। বাংলার রাণীগঞ্জ অঞ্চলের সিডেরাইটকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করলে হয়তো নিষ্ফল হবে না। এ ছাড়াও নিম্নশ্রেণীর আক-রিককে উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত করা, "ব্লু ডাষ্ট" প্রভৃতি আকরিকের আরও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারের জন্যে তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে। বিহার-উড়ি-ষ্যার লৌহ আকরিক জামসেদপুর ও বার্ণপুরের ইস্পাত কারখানার চুল্লীতে যোগান দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া রাউরকেলা ও ভিলাই-এর কাজ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে।

ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে ভারতের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। ম্যাঙ্গানিজ আকরিকের প্রধান অংশ উৎপন্ন হয় মধ্যভারতে। সেখানে ভাণ্ডারা, বালাঘাট, ছিন্দুয়ারা, নাগপুর, জব্বলপুর প্রভৃতি স্থানে এই আকরিক সম্পদ ছড়িয়ে রয়েছে। আরও আছে মাদ্রাজের সান্দুর ও ভিজাগাপট্টম, মহীশূরের চিতলদ্রুগ, সিমোগা, বোম্বাইয়ের পাঁচ-মহল, রতনগিরি প্রভৃতি স্থানে। উড়িষ্যার জামদা উপত্যকা ম্যাঙ্গানিজ আকরিকে সমৃদ্ধ। এছাড়া বিহার ও উড়িষ্যার লৌহখনি অঞ্চলে ম্যাঙ্গানিজ আকরিকের যে সব ছোট ছোট সম্পদ আছে সেগুলিকে আরও সুনজরে দেখা উচিত। লোহা ও ম্যাঙ্গানিজ একই স্থানে উৎপন্ন হলে তাতে সুবিধাই বেশী, যেমন হয়েছে উড়িষ্যার জোডায়। আমাদের প্রয়োজন মিটিয়েও এই ম্যাঙ্গানিজ বৃটেন, আমেরিকা ও জাপানে রপ্তানী হচ্ছে। তাহলেও আরও আকরিক সম্পদের অনুসন্ধানের যে প্রয়োজন আছে তা অস্বীকার করা যায় না। তবে এই সঙ্গে আকরিক সম্পদের সঠিক সঞ্চয় ও প্রকৃত মানও জানতে হবে। এসব কাজে আমাদের দেশে আরও ব্যাপকভাবে ড্রিলিং পদ্ধতি চালু হওয়া দরকার। যদিও ম্যাঙ্গানিজের ব্যবহার বহুবিধ তাহলেও আমাদের দেশে ম্যাঙ্গা-নিজযুক্ত ইস্পাত ও দু একটি রাসায়নিক দ্রব্য তৈরীর কাজ ছাড়া আর কোন কাজে লাগানো হয় না। এদিকে উন্নয়নের একটি বিরাট সম্ভাবনার পথ খোলা রয়েছে।

ক্রোমিয়ামের প্রধান আকরিক ক্রোমাইট। বিহারের সিংভূমে (প্রধানতঃ জজুহাটু অঞ্চলে), মহীশূরে, মাদ্রাজের সালেম ও উড়িষ্যার নোয়াসাহীতে ক্রোমাইট উৎপন্ন হচ্ছে। কঠিন ইস্পাত ও দু-একটি রাসায়নিক দ্রব্য তৈরীর কাজে লাগানো ছাড়া উৎপন্ন ক্রোমাইটের একটা বড় অংশ ভারতের বাইরে চলে যায়। এই খনিজ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে আরও জোর অনুসন্ধান ও ভারতের আল্ট্রাবেসিক আগ্নেয়শিলা অঞ্চলের বিশদ ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরীর প্রয়োজন রয়েছে।

রুটিল ও ইলমেনাইট, টাইটেনিয়ামের প্রধান আকরিক। এই দুটি, বিশেষ করে ইলমেনাইটের সন্ধান মিলেছে এদেশে। ত্রিবাঙ্কুরের সমুদ্রতটে নিন্দিকারাই থেকে লিপাবুম ও কন্যাকুমারিকা ঘিরে এই খনিজ দ্রব্য ছড়িয়ে আছে।

অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক বক্সাইট (বা অ্যালুমিনাস-লেটেরাইট) সম্পদে ভারত সমৃদ্ধ। মধ্যভারতের কাটনি, বালাঘাট, যশপুর প্রভৃতি স্থানে ভারতের বক্সাইট সম্পদ রয়েছে। এছাড়াও যে সব স্থানে বক্সাইটের সন্ধান পাওয়া গেছে তা হলো জম্মু-কাশ্মীরের চাকার, মধ্যভারতে বালাঘাট, জিলারা, রূপঝর, বম্বের রতনগিরি ও রাঁচির পক্নপৎ। ভারতে ৫০% অ্যালুমিনা যুক্ত বক্সাইটের সঞ্চয় ২.৫-৩ কোটি টন ও এর চেয়ে নিম্নশ্রেণীর বক্সা-ইটের সঞ্চয় ২৫ কোটি টন। এতদিন অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনে যারা অগ্রণী ছিলেন তারা হচ্ছেন অ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশন আর ইণ্ডিয়ান অ্যালু-মিনিয়াম কোম্পানী। ১৯৫৫-'৫৬ সালে ভারতে

৭½ হাজার টন অ্যালুমিনিয়াম উৎপন্ন হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে আমাদের অন্ততঃ ২৫ হাজার টনে পৌঁছুতে হবে। ভারতে অ্যালুমিনিয়াম শিল্পের একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে। এই অগ্রগতির পথে প্রধান অসুবিধা ছিল—সস্তা বিদ্যুৎশক্তির অভাব, তা ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি শক্তিশালী অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে উঠবে। অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন ছাড়াও ভারতের বক্সাইটকে বিভিন্ন রাসায়নিক ও তাপনিরোধক দ্রব্য তৈরী, জ্বালানী তেল শোধন ও উচ্চশ্রেণীর সিমেণ্ট তৈরীর কাজে লাগানো যেতে পারে। এসব শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্যে বক্সাইট উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, আর এজন্যে ভারতে ক্রিটেশাস যুগের শেষে যে বক্সাইট সৃষ্টির সময় এসেছিল তার প্রতি নজর রেখে অনুসন্ধানকার্য চালাতে হবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে বক্সাইট উৎপাদনে আমাদের লক্ষ্য প্রায় ১৭৫ লক্ষ টন।

আমাদের তাম্র উৎপাদন দেশের চাহিদার অনেক নীচে পড়ে রয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, সিংভূমে উৎপন্ন তামার প্রায় সবটাই মউভাণ্ডারের শোধনাগারে পিতলে রূপান্তরিত করা হয়। তাম্র আকরিকে আমাদের একমাত্র নির্ভরস্থল সিংভূমের তাম্রবন্ধনী। সুতরাং এ ছাড়াও প্রাচীনযুগের পরিত্যক্ত তাম্রখনি অঞ্চলগুলিতে ব্যাপক অনুসন্ধান চালাতে হবে। রাজস্থানের সিংহানা, ক্ষেত্রী প্রভৃতি স্থানে, মাদ্রাজ, মধ্যভারত, সিকিমের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাচীন খনিগুলির অবস্থা জানবার জন্যে ভূ-পদার্থিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান চালাবার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ভারতে ভূ-রাসায়নিক পদ্ধতি চালু হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এই সঙ্গে আমাদের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর আকরিককে আরও উন্নত করবার ও কাজে লাগাবার চেষ্টা করে যেতে হবে।

দস্তা ও সীসা সম্পদে ভারত ভারী দীন। প্রকৃতপক্ষে রাজস্থানের জাওয়ার খনিই এই আকরিকের একমাত্র উৎস। এখানে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে খনির ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হবে। এই অঞ্চলে প্রাচীন যুগে যে বিস্তৃত স্থান জুড়ে খনির কাজ চলেছিল, সেখানে যে আরও বিশদ ও ব্যাপক ভূতাত্ত্বিক তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা আছে, সেকথা মানতেই হবে। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে গ্যালেনার ছোটখাটো সম্পদগুলি কাজে লাগানো ও প্রাচীন খনি অঞ্চগুলিতে অনুসন্ধান চালাবার বিষয় ভেবে দেখতে হবে।

একথা অবশ্য ঠিক যে, বর্তমানে আমাদের জ্বালানী অনুসন্ধানের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেজন্যে ধাতব খনিজ উন্নয়নকে অবহেলিত রাখলে চলবে না। বর্তমান অবস্থা যা-ই হোক না কেন, একথা মানতেই হবে যে, প্রতিটি ধাতব খনিজের ক্ষেত্রে আরও অন্বেষণের প্রয়োজন আছে; তা না হলে খনিজ সম্পদে ভারতের সঠিক মান অনিশ্চিত থেকে যাবে। এই অনুসন্ধানকার্যের সাফল্য ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষা ও ভারতীয় খনি সংস্থার সুচারু কর্মপরিচালনা ও তৎপরতার উপরই অনেকখানি নির্ভর করছে। অনুসন্ধান কার্যে ভূ-রাসায়নিক পদ্ধতির প্রয়োগ ও আরও ব্যাপক ড্রিলিং পদ্ধতি চালু হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে খনি উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। বিভিন্ন খনিজ থেকে বিশেষ করে ম্যাঙ্গানিজ ও টাইটেনিয়াম খনিজ, ক্রোমাইট, বক্সাইট প্রভৃতি থেকে রাসায়নিক শিল্প গড়ে তোলবার আরও বিরাট সম্ভাবনা আছে। এসব কারণে উৎপাদন বৃদ্ধিই আমাদের একান্ত কাম্য। শিল্পপতি ও বৈজ্ঞানিকদের সহযোগিতায় আমরা অবশ্যই সহজে দ্বিতীয় পরিকল্পনার উৎপাদন লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবো।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস

শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত

গত কয়েকমাস ধরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে। ইতিপূর্বে ১৮৮৯-'৯১ সালে এবং ১৯১৮-'২১ সালে পৃথিবীতে অনুরূপ ব্যাপক ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দেয়। এছাড়া আধুনিক কালে সীমাবদ্ধভাবে কখনও কখনও দু-একটি দেশে ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিয়েছে।

প্রথমে মনে করা হয়েছিল যে, ইনফ্লুয়েঞ্জা একটি জীবাণু-সংক্রামিত রোগ, কিন্তু পরে দেখা গেছে যে, এটি একটি ভাইরাস-সংক্রামিত রোগ। রোগের ব্যাপক বিস্তৃতি ও ফিল্টার দিয়ে বেরিয়ে যায়, এমন ভাইরাস দ্বারা যে সব রোগ হয়, তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে ১৯১৮ সালের ব্যাপক মহামারীর সময় সন্দেহ করা হলো যে, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস-ঘটিত রোগ। এই সন্দেহ আরো দৃঢ়তর হলো, যখন দেখা গেল রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শ্লেষ্মা ফিল্টার করে গলায় বা নাসিকায় ইন্‌জেকশন করা হলে সুস্থ ব্যক্তিরও ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়। ১৯৩৩ সালে লণ্ডনের ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব মেডিক্যাল রিসার্চের কর্মীরা (স্মিথ, অ্যানড্রুস, লেইডু) রোগের প্রথম অবস্থায় রোগীর গলা-ধোয়া জল ফিল্টার করবার পর বেজীর নাসিকাতে প্রয়োগ করে দেখলেন, তাহা বেজীকে সংক্রামিত করেছে। জীবাণু সাধারণতঃ ফিল্টারের সূক্ষ্ম ছিদ্রের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করতে পারে না। কিন্তু ভাইরাস আকারে এত ক্ষুদ্র যে, সেগুলি সহজেই সূক্ষ্ম ফিল্টারের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করে যায়। অন্যান্য ভাইরাসের মত ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের বিশেষত্ব এই যে, উহারা জীবিত কোষের সংস্পর্শে এলে বংশবিস্তার ও রোগ-সংক্রমণ করে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস দেখতে গোলাকার। ভাইরাস কণাকে গরম বাতাসে শুষ্ক করলে সেগুলি সামান্য চ্যাপ্টা হয়ে যায়। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে দেখলে ভাইরাসের ব্যাস ১১০-১৩০ মিলিমিউ (১ মিলিমিউ=০'০০০০০০১ সেন্টিমিটার) বলে মনে হয়। কিন্তু ভাইরাস কণাকে শৈত্যে শুষ্ক (Freeze drying) করলে ততটা চ্যাপ্টা হয় না এবং ব্যাস কমবেশী ৮০ মিলিমিউর কাছাকাছি হয়। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ও গ্র্যাডোকল ফিলট্রেশনের দ্বারা নির্ণীত ব্যাসের তারতম্য হয়ঃ—

	গ্র্যাডোকল ফিলট্রেশন	ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ
A-জাতীয় ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস	৮০-১২০	৯০ ± ১১'৫ মিঃ মিউ
B-জাতীয় ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস	৯০-১৩০	১০৩ ± ৮ মিঃ মিউ

এরা প্রায় সমস্ত সূক্ষ্ম ফিল্টারের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করতে পারে।

দুই সপ্তাহ ঠাণ্ডায় জমানো হলেও ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস বেঁচে থাকে। ঠাণ্ডায় জমানোর পর শুষ্ক করে রেফ্রিজারেটারে রেখে দিলে ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত এদের শক্তি থাকে। ভাইরাস পারদ-ঘটিত যৌগের দ্বারা নির্জীব হয়, আবার থায়োগ্লাইকোলেট দ্বারা পুনর্জীবিত হয়। এরা ৫০°-৫৪° ডিগ্রী উত্তাপে নষ্ট হয়ে যায়। এদের ০'০৫% ফর্ম্যালীন দ্রবণে ১৮ ঘণ্টা রাখলে অথবা আলট্রাভায়োলেট আলোতে রাখলে নির্জীব হয়ে যায়। আয়োডিন, ভারী ধাতুর যৌগ, মার্কুরিওক্রোম দ্বারা বেশ ও সাস্‌ফা থায়াজোল, ফিনোল, গ্লুকোজ, সোডিয়াম থায়োসালফেট দ্বারা মৃদুভাবে নির্জীব হয়।

গ্রেটবৃটেনে মহামারীর সময় পৃথকীকৃত ভাইরাসকে A-জাতীয় ভাইরাস বলা হয়। অন্যান্য দেশে আরও এক জাতীয় ভাইরাস পৃথক করা হয়েছে যা A-জাতীয় ভাইরাস থেকে অ্যান্টিজেনিক-ক্রিয়াতে খুবই ভিন্ন। তাকে B-জাতীয় ভাইরাস বলা হয়। C-জাতীয় অন্য একটি ভাইরাসও আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাণীদেহে রোগ উৎপাদন করে না, এমন ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসও পাওয়া গেছে। তাদের Y-জাতীয় ভাইরাস বলে। A-জাতীয় ভাইরাস নাকি পুরনো ও বহুস্থানব্যাপী বিস্তৃত; B-জাতীয় ভাইরাস খুব সীমাবদ্ধ জায়গার সংক্রমণেই শুধু পাওয়া যায়। এবারকার মহামারীর ভাইরাস A-জাতীয়। পূর্বেও A ও B-জাতীয় ভাইরাস ছাড়া অন্য ভাইরাসের সাহায্যে সংক্রমণ হয়েছে বলে জানা গেছে। পরীক্ষাগারে ভাইরাসের সাহায্যে মানুষকে সংক্রমণের ক্ষেত্রে A-জাতীয় অপেক্ষা B-জাতীয় ভাইরাস দিয়ে ভাল ফল পাওয়া গেছে। কিন্তু বেজী ও ইঁদুরের ক্ষেত্রে B-জাতীয় ভাইরাস দিয়ে সংক্রমণ খুব কষ্টকর।

ভাইরাস কণাগুলি নিউক্লিওপ্রোটিন দিয়ে তৈরী; তবে নিউক্লিক অ্যাসিডের রকম ও পরিমাণ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ফল পাওয়া গেছে। এদের দেহে প্রায় সমপরিমাণ ডিসোক্সিরিবোনিউক্লিক অ্যাসিড ও রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড আছে। ম্যানোজ, গ্যালাকটোজ, গ্লোকসামিন ইউনিট দিয়ে তৈরী একরকম পলিস্যাকারাইডও পাওয়া গেছে। ভাইরাস যেসব জীবিত দেহ-কোষে বাস করে তাদের পলিস্যাকারাইডের সঙ্গে এই পলিস্যাকারাইডের এমন সাদৃশ্য আছে যার ফলে সন্দেহ হচ্ছে যে, ভাইরাসের উক্ত পলিস্যাকারাইড সম্ভবতঃ এর দেহের অঙ্গীভূত নয়। ভাইরাসের নিউক্লিওপ্রোটিনের প্রোটিন অংশের অ্যামিনো অ্যাসিড-গুলির সঙ্গেও আশ্রয়স্থল সেই জীব-কোষের অ্যামিনো অ্যাসিডের সাদৃশ্য আছে। এতে মনে হয় ভাইরাস কণা জীবদেহের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার (Metabolism) উপাদানগুলি নিয়েই বংশবিস্তার করে। A ও B-জাতীয় ভাইরাসের প্রোটিন অংশে নিম্নলিখিত প্রায় ১৭টি অ্যামিনো অ্যাসিড নিম্নোক্ত পরিমাণে পাওয়া গেছে—

অ্যালানীন ২·৫, ২·৬; আর্জিনীন ৫, ৪; অ্যাসপারটিক অ্যাসিড ৭·৫, ৭·৩; গ্লুটামিক অ্যাসিড ৭·৭, ৬·২, গ্লাইসিন ২·৫, ২·৯; হিষ্টিডীন ১·৪, ১·৫; আইসো-লিউসীন ৪·১, ৪·২; লিউসীন ৫·৩, ৫·৫; লাইসীন ৩·৬, ৪·৭; মিথিয়োনীন ২·৩, ২·১; ফিনাইল এলানীন ৩·৭, ৩·৪; প্রোলীন ২·৬, ২·৭; সেরিন ২·২, ২·২; থ্রিয়োনীন ৩·৭, ৪·০; ট্রিপ্টোফেন ১·১, ০·৭; টাইরোসীন ৩·১, ২·১; ভ্যালীন ৩·৪, ৩·২।

প্রত্যেকটি অ্যামিনো অ্যাসিডের পার্শ্ববর্তী সংখ্যা দুটি যথাক্রমে A-জাতীয় (PR ৪ ভাইরাস) ও B-জাতীয় (Lee ভাইরাস) ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের অ্যামিনো শতকরা অ্যাসিডের পরিমাণ।

সাধারণতঃ ভাইরাসের চাষ করা হয় জীবিত কোষে অথবা মুরগীর ডিমের মধ্যে। জে. জে. বাডিং ডিমের কোরিও-অ্যালান্টইক পর্দায় (ডিমের ভিতরে ভ্রূণকে আবৃত করে যে পর্দা থাকে) প্রথম ভাইরাসের চাষ করেন। ইনফ্লুয়েঞ্জা-ভাইরাস নিয়ে এই ব্যাপারে বিশেষ সাফল্য লাভ করেন মেলবোর্ণের এম. এফ, বার্ণেট। মুরগীর ডিমগুলি প্রায়ই ক্ষুদ্র জীবাণু-মুক্ত থাকে। ফলে ডিমের অভ্যন্তরভাগ ভাইরাস ও জীবাণু চাষের পক্ষে একটি আদর্শ পুষ্টিমাধ্যম ও আধারও বটে। সম্পৃক্ত ডিমগুলি সুবিধামত ৪ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে 'তা' দেওয়ার পর এই কাজে ব্যবহার করা হয়। কোন কোন ভাইরাসের জন্যে অল্পদিন 'তা'-দেওয়া ডিমের দরকার; আবার কোন কোন ভাইরাসের জন্যে বেশী দিনের 'তা'-দেওয়া ডিমের দরকার হয়। প্রথমে ডিমের বায়ুপ্রকোষ্ঠের

কাছাকাছি অংশের খোসার একটি ক্ষুদ্র অংশ এমন ভাবে তুলে নেওয়া হয়, যাতে খোসার নীচের পর্দাটি নষ্ট না হয়। তারপর এই পর্দায় সামান্য একটি ছিদ্র করলেই কোরিও-অ্যালান্টইক পর্দাটি পাওয়া যায়। সিরিঞ্জের সাহায্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা-ভাইরাস দ্রবণ ঐ পর্দায় প্রয়োগ করা হয়। খোসার ছিদ্রটি কভার-গ্লাস দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া দরকার। অন্যান্য ভাইরাস চাষের মত ইনফ্লুয়েঞ্জা-ভাইরাসের চাষের সময় লক্ষ্য রাখতে হয়, যাতে অন্য কোন ভাইরাস বা জীবাণু ডিমে প্রবেশ করতে না পারে। কয়েকদিন পর ওই অ্যালান্টইক পর্দার তরল পদার্থ ভাইরাস প্রাপ্তির একটি ভাল উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

ডিমের অ্যালান্টইক পর্দায় ইনফ্লুয়েঞ্জা-ভাইরাস চাষের সময় হার্ষ্ট, ম্যাকক্লিল্যাণ্ড ও হেয়ার পৃথক পৃথকভাবে লক্ষ্য করেন যে, যখন আকস্মিকভাবে ওই অ্যালান্টইক পর্দার দ্রবণ মুরগীর ভ্রূণের সংস্পর্শে আসে তখন ভাইরাস ভ্রূণের লোহিত রক্তকণিকাগুলিকে জমাট করে ফেলে। ইনফ্লুয়েঞ্জা-ভাইরাসের মানুষ, গিনিপিগ প্রভৃতি প্রাণীদের লোহিত কণিকা জমাট বাঁধবার এই বিশেষত্বের সাহায্য গ্রহণ করে ভাইরাস কণার পরিমাণ নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে।

ডিমের মধ্যে যখন A-জাতীয় ইনফ্লুয়েঞ্জা-ভাইরাস চাষ করা হয়, তখন তাদের জীবনের দুটি অবস্থা বা স্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রথম অবস্থা (O-অবস্থা) যখন পৃথক করে ডিমের কুসুমের মধ্যে চাষের জন্যে দেওয়া হয়, তখন ইনফ্লুয়েঞ্জা-ভাইরাস বংশবিস্তার করে খুব দ্রুতগতিতে; কিন্তু অ্যালান্টইক পর্দায় ততটা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় না। এই অবস্থায় ভাইরাসগুলি মুরগীর লোহিত কণিকা অপেক্ষা মানুষ, গিনিপিগ, কবুতর প্রভৃতির লোহিত কণিকাকে বেশী জমাট করে। দু-তিনবার ডিমের মধ্যে এভাবে চাষ করলে ইনফ্লুয়েঞ্জা-ভাইরাস O-অবস্থা থেকে D-অবস্থায় পরিবর্তিত হয়। O→D পরিবর্তনের মধ্যে অন্য একটি অস্থির মাধ্যমিক অবস্থা আছে বলে মনে করা হয়। অ্যালান্টইক পর্দায় চাষের সময় বংশবৃদ্ধি ও বিভিন্ন প্রাণীর রক্তকণিকার জমাট বাঁধাবার তারতম্যই প্রধানতঃ O এবং D-অবস্থার পার্থক্য। O-অবস্থা সংক্রমণশীল নয়, বরং পরবর্তী D-অবস্থার কাঠামো বলে মনে হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা-ভাইরাসের D-অবস্থা মুরগীর ভ্রূণের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। ইনজেকশন দেওয়ার জন্যে ব্যবহৃত ইনফ্লুয়েঞ্জা-ভাইরাস অনেক বার চাষের জন্যে স্বাভাবিক ভাইরাস থেকে এক পৃথক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। B-জাতীয় ভাইরাসে এই রকম সুস্পষ্ট O→D পরিবর্তন লক্ষ্যণীয় নয়।

যখন অ্যালান্টইক পর্দায় ইনফ্লুয়েঞ্জা-ভাইরাস চাষ করা হয় তখন দেখা যায় যে, অ্যামিনো অ্যাসিড মিথিয়োনীনের অনুরূপ মিথোক্সিন, ইথিয়োক্সিন, মিথিয়োনীন সালফোক্সিন তাদের বৃদ্ধি ব্যাহত করে। ভ্রূণের মধ্যে চাষ করবার সময় আল্‌ফা-অ্যামিনো সালফোনিক অ্যাসিডও অনুরূপ কাজ করে।

A ও B-জাতীয় ভাইরাসের বিশেষত্ব এই যে, এরা শ্বাসযন্ত্রের ঊর্ধ্ব ও নিম্ন অংশেই আক্রমণ বা সংক্রমণ সীমাবদ্ধ রাখে এবং সেখানেই মাত্র বংশবিস্তার করে। শ্বাসযন্ত্রের এপিথেলিয়াম কোষগুলিকে আক্রমণ করে ও বংশবৃদ্ধির ফলে এপিথেলিয়াম কোষগুলি নষ্ট হয়। ভাইরাসগুলি কোষের উপরে থেকে পার্শ্ববর্তী কোষগুলিকে আক্রমণ করে ও সংক্রমণ বিস্তৃত অংশে ছড়িয়ে পড়ে। সংক্রমণের বিস্তার শুধু এপিথেলিয়াম কোষের উপরিভাগে সীমাবদ্ধ থাকে। শ্বাসযন্ত্রের কোন কোন অংশ, যেমন ব্রঙ্কিউলার এপিথেলিয়াম কোষ, খুব সহজেই ভাইরাসের দ্বারা সংক্রামিত হয়। আক্রমণের ২৪ থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। নাসিকা বা

শ্বাসনালীতে সংক্রামিত বিনষ্ট কোষ থেকে ইনফ্লুয়েঞ্জা-ভাইরাস নাসিকা ও ফ্যারিংস্-এ আসে। সেখানে ভাইরাসগুলি লালার রসে সিক্ত হয় এবং হাঁচি ও কাশির সঙ্গে লালাসিক্ত ভাইরাস বাইরের বায়ুতে আসে। লালা ও জলীয় অংশ বায়ুতে বাষ্পীভূত হওয়ার পর ক্ষুদ্র ভাইরাস কণা প্রাণী বা মানুষের শ্বাসের সঙ্গে শ্বাসযন্ত্রে প্রবেশ করে' এপিথেলিয়াম কোষে কোথাও প্রথমে সংক্রামিত হয়; পরে পার্শ্ববর্তী অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

শ্বাসযন্ত্রের বিভিন্ন কোষে ইনফ্লুয়েঞ্জা-ভাইরাস যে শোষিত হয়, তার পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, ফুস্ফুসে ইনফ্লুয়েঞ্জা-ভাইরাস প্রবেশ করিয়ে দিলে ফুস্ফুসের কোষগুলি খুব দ্রুত ভাইরাস শোষণ করে এবং কিছু সময় পরে ভাইরাসগুলি আপনা থেকেই বিমুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসে। জীবিত বেজীতে পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, ভাইরাস-গুলি দ্রুত ফুসফুসের কোষে সংযুক্ত হয়। প্রথমে ভাইরাসগুলিকে সহজেই বিযুক্ত করা যায়, কিন্তু পরে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হয়ে থাকে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা-ভাইরাস যখন দেহকে আক্রমণ করে তখন ভাইরাসগুলি সংশ্লিষ্ট কোষে সংযুক্ত হয় এবং কোষগুলির কোন কোন উপাদান ভাই-রাসের দেহের কোন এনজাইমের দ্বারা বিনষ্ট হয়। লোহিতকণাকে ভাইরাস আক্রমণ করলে লোহিত কণিকার উপরিস্থ কোন কোন উপাদান নষ্ট হয় এবং লোহিত কণিকাগুলি জমাট বাঁধে। লোহিত কণিকা থেকে ভাইরাসগুলিকে বিযুক্ত করবার পর লক্ষ্য করা যায় যে, এই ভাইরাস কণিকাগুলি অন্য লোহিত কণিকাকে জমাট বাঁধাতে পারে, কিন্তু ভাইরাস বিযুক্ত লোহিতকণিকাগুলিকে অন্য ইনফ্লুয়েঞ্জা-ভাইরাস দ্বারা আর জমাট বাঁধানো যায় না। ভাইরাসের দেহে কোন এনজাইম আছে বলেই এমন হয়। বার্ণেট পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, ভাইরাস কণার উপরিভাগে মিউসিন্যাজ নামে একপ্রকার এনজাইম আছে। জীবকোষে সংক্রমণকালে এই এনজাইম কোষের উপরিভাগের রাসায়নিক উপাদান মিউসিনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়; ফলে জীব-কোষের মিউসিন উপাদান নষ্ট হয়ে যায়। ফ্রান্সিস্ (১৯৪৭) রক্তের সিরামে ভাইরাসের বৃদ্ধি ব্যাহত করে, এমন একটি পদার্থ বের করেন। পরে দেখা যায়, সেটি দ্রবণীয় মিউসিন এবং তার সঙ্গেই ভাইরাস সংযুক্ত হয়। একবার ইনফ্লুয়েঞ্জা-ভাইরাসের দ্বারা আক্রান্ত হলে কোষের মিউসিন উপাদান নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তী ভাইরাস আক্রমণের সময় কোষগুলি ওই মিউসিন উপাদান-মুক্ত থাকে না বলে পরবর্তী সংক্রমণের সম্ভাবনা কমে যায়।

ইনফ্লুয়েঞ্জা-ভাইরাসগুলির খুব সহজেই পরিব্যক্তি বা গুণগত পরিবর্তন (Mutation) হয়। তার ফলে কখনও কখনও এদের রোগ উৎপাদনকারী ক্ষমতা কমে যায়, কখনও আবার রোগ-উৎপাদনের ক্ষমতা এতই বেড়ে যায় যে, অতি অল্প সময়ে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীরূপে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সাম্প্রতিক পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণজাত বিকিরণের ফলে সম্ভবতঃ ভাইরাস কণার পরিবর্তন হয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন জৈবরসায়ন-বিদ্ ডাঃ পিরি।

অন্যান্য ভাইরাস রোগের মত ইনফ্লুয়েঞ্জা-আক্রান্ত দেহের রক্তে অ্যান্টিবডি তৈরী হয়। এই অ্যান্টিবডির অবস্থিতি হেতু পরবর্তীকালে এই জাতীয় ভাইরাসের আক্রমণ থেকে কিছুটা প্রতিষেধক পাওয়া যায়। এই অ্যান্টিবডিগুলি আক্রমণকারী ভাইরাসের সংস্পর্শে এসে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়; ফলে ভাই-রাসগুলি অকর্মণ্য হয়ে পড়ে, তারা আর জীব-কোষকে আক্রমণ করতে পারে না। এভাবে ভাইরাস সংযুক্তির দ্বারা আক্রমণ প্রতিরোধী অ্যান্টিবডির পরিমাণ কমে যায়, কিন্তুভাইরাস আক্রমণ বেশী হলে এভাবে অ্যান্টিবডি আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে না। অ্যান্টিবডির সঙ্গে ভাইরাসের সংযুক্তি যদি দৃঢ় নাও হয়, তথাপি ভাইরাসের কোষের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ অনেকটা

নষ্ট হয়। এর ফলে কিছুটা প্রতিষেধক পাওয়া যায়।

ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে প্রতিষেধক হিসাবে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। ডিমের অ্যালান্টইক পর্দায় সতর্কতার সঙ্গে ভাইরাস চাষ করে মৃত ভাইরাস দেহের ত্বকের নীচে ইনজেকশন করা হয়। ফলে দেহের রক্তে অ্যান্টিবডির পরিমাণ খুব বৃদ্ধি পায়। দেহে যতখানি ভাইরাস প্রবেশ করানো হয় তদনুপাতে অ্যান্টিবডির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। দেহে বেশী পরিমাণ ভাইরাস প্রবেশ করিয়েদিলে সর্বোচ্চ পরিমাণ অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করা সম্ভব।

অর্ধমৃত ভাইরাস নাসিকা-পথে দেহে প্রবেশ করিয়ে বেশ ভাল ফল পাওয়া গেছে। A এবং B-জাতীয় উভয় ভাইরাসই এরূপভাবে প্রবেশ করানো সম্ভব। এতেও অ্যান্টিবডির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। যাদের বহুদিন ইনফ্লুয়েঞ্জা হয় নি তাদের অর্ধমৃত ভাইরাসের (নাসিকা-পথে) প্রতিষেধক খুব ফলপ্রদ। রোগাক্রমণের ফলে দেহে যে স্বাভাবিক প্রতিষেধক ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়, উপরোক্ত পদ্ধতিতেও তেমনি প্রতিষেধক পাওয়া যায়। যারা বহুকাল ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয় নি তাদের ক্ষেত্রে ত্বকে ভাইরাস ইনজেকশন ও নাসিকা-পথে অর্ধমৃত ভাইরাস প্রবিষ্ট করানো—এই উভয় পদ্ধতি একসঙ্গে ব্যবহারে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ইনফ্লুয়েঞ্জা তদারক কমিশন ১৯৪৪ সালে A ও B-ভাইরাসযুক্ত একটি খুব ফলপ্রদ টীকা বের করেছেন, যার ফলে সেনা-বিভাগে রোগের প্রকোপ কমে গেছে। মৃদু কিন্তু বহুবিস্তৃত মহামারী প্রাদুর্ভাবের পূর্বে সেনাদলে টীকা দেওয়া হয়েছিল বলেই হয়তো খুব আশাপ্রদ ফল পাওয়া গিয়েছিল। বহুদেশব্যাপী ব্যাপক মহামারীর সময় এই রকম ব্যবস্থায় তেমন লাভ নাও হতে পারে। হর্সফ্যাল (১৯৪০-'৪১) A-জাতীয় ভাইরাস ও ডিস্টেম্পার ভাইরাস-X ব্যবহার করে যে টীকা বের করেন তা অন্যান্য টীকা অপেক্ষা শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে টীকার প্রতিষেধক সময়ের তারতম্য হয়। প্রায় দু-মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত প্রতিষেধক কার্যকরী হয়। যে জাতীয় ভাইরাস দিয়ে দেহে টীকা দেওয়া হয়, শুধু সেই জাতীয় ভাইরাসের বিরুদ্ধেই প্রতিষেধক অবস্থা দেহে সৃষ্টি হয়। যেহেতু টীকাতে সাধারণতঃ এক বা দুই জাতীয় ইনফ্লুয়েঞ্জা-ভাইরাস ব্যবহৃত হয় সেহেতু এরূপ টীকার দ্বারা সমস্ত রকম ইনফ্লুয়েঞ্জা-ভাইরাসের আক্রমণ প্রতিরোধ সম্ভব নয়। এবারকার মহামারীর কারণ A-জাতীয় ভাইরাস। অষ্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের কোন কোন দেশে এশিয়া থেকে A-জাতীয় ভাইরাস সংগ্রহ করে প্রতিষেধক টীকা তৈরী হয়েছে। ভারতে ভাইরাস রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে ও সিমলায় এ জাতীয় টীকা তৈরী হচ্ছে বলে সংবাদ বেরিয়েছে। ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণের পর রোগীর রক্তে অ্যান্টিবডি তৈরী হয়। সেই অ্যান্টিবডিযুক্ত রক্ত অন্য সুস্থ দেহে প্রবেশ করিয়ে দিলে প্রতিষেধক ব্যবস্থা সৃষ্টি হয় বলে কলকাতার আর. জি. কর কলেজের জনৈক অধ্যাপক লক্ষ্য করেছেন।

ভাইরাস সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধারণা এখনও খুব সুস্পষ্ট নয়। এশিয়ায় ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাবের পর বিশ্ব-স্বাস্থ্যসংস্থা (WHO), বিভিন্ন দেশের চিকিৎসা ও রাসায়নিক পরীক্ষাগারগুলিতে এ নিয়ে দ্রুত কাজ আরম্ভ হয়েছে। আশা করা যায়, এসব কাজের ফলে আরও অনেক কিছু জানা যাবে।

মৃত্তিকা-নির্মিত দ্রব্যাদি পোড়াইবার পদ্ধতি

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু

মৃত্তিকা-নির্মিত দ্রব্যাদি শুকাইবার পর উহাকে কঠিন ও স্থায়ী করিবার জন্য পোড়ান হইয়া থাকে। সাধারণ টেরাকোটা বা পোড়া-মাটির দ্রব্যাদি একবার মাত্র পোড়ান হয় এবং উহার উত্তাপ ৮০০° হইতে ৯০০° সেন্টিগ্রেডের বেশী হয় না। কিন্তু গ্লেজ দেওয়া দ্রব্যাদিকে দুইবার পোড়ান দরকার হয়। দ্রব্যের তারতম্য অনুসারে প্রথমবারে ৮০০°—৯০০° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে পোড়ান হয়। এই প্রথমবারের পোড়ানকে ইংরেজিতে বিস্কিট-পোড়ান বলা হয় এবং ইহার আসল উদ্দেশ্য মাটির দ্রব্যকে শক্ত করিয়া লওয়া, যাহাতে ঐগুলি গ্লেজের তরল ঘোলাতে ডুবাইবার সময় নষ্ট না হইতে পারে। আমরা এই প্রথমবারের পোড়ানকে সেঁকা বা মৃদু-পোড়ন বলিতে পারি। এই মৃদু পোড়নের ফলে মৃৎদ্রব্যাদি শক্ত হইয়া যায় বটে, কিন্তু বেশ সরন্ধ্র অবস্থায় থাকে। ইট, টালী প্রভৃতি পোড়া-মাটির দ্রব্যাদি এই সেঁকা অবস্থাতেই ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

ফেয়ান্স, স্টোন-অয়ার, পোর্সেলিন প্রভৃতি দ্রব্য সেঁকিবার পর উহাদের উপর একটি বিশেষ প্রলেপ লাগাইয়া দেওয়া হয় এবং এই প্রলেপসহ দ্রব্যগুলিকে দ্বিতীয়বার পোড়ান হইলে সেগুলির গাত্রে একটি পাত্‌লা ও সুচিক্কণ কাচীয় স্তর লাগিয়া যায়। এই কাচীয় পাত্‌লা স্তরকেই গ্লেজ বলা হয়। এই প্রলেপটি চূর্ণ অবস্থায় জলের সহিত মিশাইয়া লাগাইতে হয় বলিয়া দ্রব্যগুলিকে আবার শুকাইয়া লওয়া দরকার। তবে এই ভিজা প্রলেপ শুকাইতে বেশী দেরী হয় না বা কোন আশঙ্কা থাকে না; রোদ বা গরম হাওয়ায় শুকান হইয়া থাকে। প্রলেপ লাগাইয়া দ্বিতীয়বার পোড়ানকে গ্লেজ-পোড়ন বা প্রলেপ-পোড়ন বলা হয়। পোড়াইবার তাপ দ্রব্যভেদে বিভিন্ন হইয়া থাকে; যেমন—ফেয়ান্সের গ্লেজ-পোড়নের তাপ ১০০° হইতে ১১৫০° সে. হয়। ষ্টোন অয়ারের গ্লেজ পোড়ান হয় ১১০০° হইতে ১২৫০° সে. তাপে এবং পোর্সেলিন গ্লেজ পোড়ানর তাপ ১৩০০° হইতে ১৫০০° সে. পর্যন্ত হইয়া থাকে।

যে সকল গ্লেজকরা দ্রব্যের উপর চিত্রাঙ্কন করা হয় তাহাদের তৃতীয়বার পোড়ান দরকার হয়। এই পোড়ানর ফলে অঙ্কিত চিত্রগুলির রং গলিয়া যায় এবং ঘষিলেও আর উঠিয়া যায় না। এই তৃতীয়বার পোড়ানর তাপ ৭০০° হইতে ৯০০° সে-এর মধ্যেই দরকার হয়। এই পোড়ানর ইংরেজি নাম এনামেল-পোড়ন। আমরা ইহাকে চিত্রণ-পোড়ন বলিতে পারি।

মৃৎদ্রব্যাদি পোড়াইবার জন্য যে বিশেষ প্রকারের ভাটি ব্যবহার করা হইয়া থাকে তাহাদের কিল্‌ন্ বলা হয়। এই সকল ভাটি নানা প্রকারের হইয়া থাকে এবং গঠন পদ্ধতির উপরই উহাদের কার্য-কারিতা নির্ভর করে। কিন্তু যে কোনও পদ্ধতিতেই গঠিত হউক না কেন, এই সকল কিল্‌নের তিনটি প্রধান অংশ থাকিবে।

ইহাদের বৃহত্তম অংশটি একটি গোল বা চতুষ্কোণ ঘর বা প্রকোষ্ঠ, যাহাকে ইংরেজীতে চেম্বার বলা হয়। এই প্রকোষ্ঠের ভিতরেই পোড়াইবার দ্রব্যগুলি সাজাইয়া রাখিতে হয়। যদি ঐ দ্রব্যগুলি খোলা অবস্থায় প্রকোষ্ঠের ভিতরে সাজাইয়া রাখা যায় তবে আগুনের ধোঁয়া লাগিয়া গ্লেজ নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে এবং দ্রব্যগুলিও পরস্পর জুড়িয়া যাইতে পারে। সুতরাং দ্রব্যগুলি প্রথমে

ছোট ছোট তাপসহ বাক্সে সাজাইয়া সেই বাক্সগুলিকে প্রকোষ্ঠের ভিতরে স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখা হয়। এই বিশেষ প্রকারের তাপ-সহনশীল বাক্সকে স্যাগার বলা হয়। প্রকোষ্ঠটি পূর্ণ হইয়া গেলে উহার প্রবেশ পথটি বাহির হইতে ফায়ার ব্রিক দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

কিল্‌নের দ্বিতীয় অংশের নাম অগ্নিকুণ্ড। প্রকোষ্ঠের আয়তনের অনুপাতে তিন হইতে এগারটি অগ্নিকুণ্ড প্রকোষ্ঠের চারিদিক ফিরিয়া নির্মিত হইয়া থাকে। বাহির হইতে এই সকল অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্বালাইলে উহার উত্তাপ ও শিখা সহজেই প্রকোষ্ঠের ভিতর প্রবেশ করিয়া স্যাগারগুলির চারিপার্শ্বে প্রবাহিত হয় এবং ধীরে ধীরে সেগুলিকে উত্তপ্ত করিয়া তোলে। অবশিষ্ট গরম গ্যাস ও ধূম চিম্‌নি দিয়া বাহির হইয়া যায়। প্রকোষ্ঠের ভিতর যত বেশী উত্তাপের দরকার হয় অগ্নিকুণ্ডের সংখ্যা তত বেশী রাখা হয়, যাহাতে অল্প সময়ে অধিক পরিমাণ কয়লা জ্বালাইয়া উত্তাপ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। কয়লার অভাবে কাঠ বা তৈল দিয়াও অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্বালান যাইতে পারে।

কিল্‌ন্ বা ভাটির তৃতীয় অংশের নাম চিম্‌নি বা ধূমনল। ইহা সাধারণতঃ প্রকোষ্ঠের বাহিরে পৃথকভাবে গ্রথিত করা হয় এবং মাটির নীচে সুড়ঙ্গ বা নালী দিয়া ইহাকে প্রকোষ্ঠের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। এই চিম্‌নির প্রধান কার্য প্রকোষ্ঠের ভিতর হইতে ধূম ও অপ্রয়োজনীয় গ্যাস আকর্ষণ করিয়া বাহির করিয়া দেওয়া; কারণ কয়লার ধোঁয়া ও অপ্রয়োজনীয় গ্যাসসমূহ বেশীক্ষণ প্রকোষ্ঠের ভিতর থাকা বাঞ্ছনীয় নহে।

মৃৎদ্রব্যাদির আকার ও প্রকার ভেদে ভাটি জ্বালাইবার সময় বিভিন্ন হয়। সাধারণতঃ পোর্সেলিন পোড়াইতে সময় কম লাগে। মোটা বা ঠাস দ্রব্য পোড়াইতে সময় বেশী লাগে। ফেয়ান্স দ্রব্য আরও ধীরে পোড়াইতে হয়। পোড়ান শেষ হইলে ভাটিকে খুব ধীরে ঠাণ্ডা করিতে হয়, নতুবা ভাটির মধ্যস্থিত দ্রব্য ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। ভাটি ঠাণ্ডা হইলে তাহার দুয়ার হইতে অগ্নি-ইষ্টক খুলিয়া ফেলা হয় এবং প্রকোষ্ঠের ভিতর হইতে স্যাগারগুলি বাহির করিয়া লওয়া হয়। বাহিরের হাওয়ায় স্যাগারগুলি বেশ ভালভাবে ঠাণ্ডা হইয়া গেলে দ্রব্যগুলিকে বাছাই করিতে হইবে। কারণ সর্বপ্রকার সাবধানতা ও যত্ন লওয়া সত্ত্বেও দ্রব্যগুলির কিছু ভাগ ফাটিয়া যায় অথবা অন্য প্রকারে নষ্ট হইয়া যাইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ পোড়াইবার কালে শতকরা ১০ হইতে ২০ ভাগ পর্যন্ত নষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে। এই সকল সাময়িক ভাটি প্রতিবার উত্তপ্ত ও ঠাণ্ডা করিতে তাপের অনেক তারতম্য হয় বলিয়া মাটির দ্রব্য ফাটিয়া যাইবার বেশী সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং তাপেরও অনেক অপচয় হয়। এই সব অপচয় নিবারণের জন্য নূতন প্রকারের অবিরাম-গতি ভাটির পরিকল্পনা করা হইয়াছে, যাহার ভিতর তাপের বেশী তারতম্য হয় না এবং দ্রব্যাদি ঠাণ্ডা করিবার সময় তাপের অপচয় হয় না। এই অবিরাম-গতি ভাটিতে পোড়াইলে নষ্ট দ্রব্যের সংখ্যা অনেক কমিয়া যায় এবং দ্রব্যের গুণও অনেক বৃদ্ধি পায়।

এই অবিরাম-গতি ভাটি দুই প্রকার—(১) প্রকোষ্ঠ ভাটি ও (২) সুড়ঙ্গ ভাটি। প্রথম প্রকারের ভাটি ইট, অগ্নি-ইট প্রভৃতি ভারি ও ঠাস দ্রব্যের জন্য প্রসিদ্ধ এবং দ্বিতীয় প্রকারের ভাটি হাল্‌কা ধরণের উচ্চ শ্রেণীর দ্রব্যের জন্যই ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

গ্লেজকরা দ্রব্যাদির উপর চিত্রাঙ্কন করিয়া তৃতীয়বার পোড়াইবার সময় এক বিশেষ প্রকারের ভাটি ব্যবহার করা হয়, যাহার নাম মাফল বা বদ্ধ-ভাটি। ইহার বিশেষত্ব এই যে, বাহিরের অগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্গত ধূম ও গ্যাস ইহার প্রকোষ্ঠের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং সাক্ষাৎভাবে অগ্নির সংস্পর্শে না রাখিয়া চিত্রিত দ্রব্যকে উত্তপ্ত

করা যায়। অগ্নির ধূম ও গ্যাস রঙের সংস্পর্শে আসিলে রং নষ্ট হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

মাফল ভাটিতে একটি মাত্র প্রকোষ্ঠ থাকে। এই প্রকোষ্ঠের দেয়াল যে সব ইট বা টালী দিয়া তৈয়ার করা হয় তাহা উচ্চতাপ সহনশীল অগ্নিমাটি ও তাপ-পরিবাহী খনিজের মিশ্রণে তৈয়ার করা হইয়া থাকে। সুতরাং বাহির হইতে অগ্নির তাপ প্রকোষ্ঠের দেয়াল ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ করে এবং বদ্ধ প্রকোষ্ঠের ভিতরের দ্রব্যকে উত্তপ্ত করিয়া দেয়। সাধারণতঃ এই প্রকোষ্ঠের ভিতরে ৭০০°—৯০০° সে. পর্যন্ত তাপ আনা হয় এবং উত্তাপের কাজ শেষ হইলে ভাটিকে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করিয়া প্রকোষ্ঠের দ্বার খুলিয়া ফেলা হয়। এই প্রকার ভাটিতে তাপ বেশ ধীরে উঠান ও নামান যায় বলিয়া ইহার মধ্যস্থিত দ্রব্য সহজে ফাটে না। মৃৎশিল্প ব্যতীত আরও নানাপ্রকার কার্যে এই প্রকার মাফল ভাটি ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

মৃৎদ্রব্য পোড়াইবার কালে উহাদের ভিতর কি প্রকারের রাসায়নিক ও অন্যবিধ পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে তাহার কিছু বিবরণ দেওয়া হইল।

অবিশুদ্ধ মাটিতে প্রস্তুত টেরাকোটা দ্রব্যাদি ভাটিতে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হইলে দেখা যায় যে, উহাদের ওজন ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। এই ঘাটতির প্রধানতঃ তিনটি কারণ দেওয়া হয়। প্রথমতঃ ভাটির তাপ ২০০°-৩০০° সে. পর্যন্ত উঠিলে মাটির জৈব অবিশুদ্ধ পদার্থসমূহ জলিয়া উড়িয়া যায় এবং এই অবিশুদ্ধ পদার্থের পরিমাণ মত ওজন কমিয়া যায়। এই সময়ে ভাটির ভিতর প্রচুর হাওয়া প্রবাহিত করা দরকার; কারণ বায়ুর অক্সিজেন ব্যতিরেকে জৈব পদার্থ জলিয়া যাইতে পারে না। জৈব পদার্থ জলিয়া না গেলে উহা অঙ্গারে পরিণত হইয়া যায় এবং দ্রব্যের ভিতর কালো দাগ আনে। ইহার ইংরেজি নাম ব্ল্যাক কোর। অধিক তাপে এই অঙ্গার জলিবার সময় যে গ্যাস উৎপন্ন হয় তাহা দ্রব্যকে ফাঁপাইয়া বা ফুলাইয়া দেয়। এই প্রকারের কালো দাগযুক্ত ফাঁপা ইট বা টালীকেই আমরা ঝামা বলিয়া থাকি। মাটি একবার ঝামা হইয়া গেলে উহার আর সংস্কার হয় না।

ভাটির তাপ যখন ৫০০° সে. উপরে উঠে তখন দ্বিতীয় বার ঘাট্‌তি দেখা যায়। এই সময়ে মাটির কণার কেলাসন জল বিয়োজিত হইয়া উড়িয়া যাইতে সুরু করে এবং প্রায় ৮০০° সে. পর্যন্ত এই ঘাট্‌তি চলিতে থাকে। বিশুদ্ধ সাদা মাটিতে এই কেলাসন জলের পরিমাণ শতকরা ১১-১৩ ভাগ হইতে দেখা যায়; কিন্তু অবিশুদ্ধ মাটিতে কেলাসন জল এত বেশী হয় না।

ভাটির তাপ যখন প্রায় ৯০০° সে. পর্যন্ত উঠিয়া যায় তখন তৃতীয়বার সামান্য ঘাট্‌তি হইয়া থাকে। এই সময় মাটির অজৈব অবিশুদ্ধ পদার্থসমূহ বিয়োজিত হয়। যেমন অ্যালকালী, চুন ও লৌহের কার্বনেট বা সালফাইড প্রভৃতি বিয়োজিত হইয়া অক্সাইডে পরিণত হইয়া যায়। এই প্রকারে নানাবিধ পদার্থ জলিয়া যাইবার বা বিয়োজিত হইবার ফলে পোড়ামাটি বেশ সরন্ধ্র এবং দৃঢ় হইয়া পড়ে। অবিশুদ্ধ মাটিতে যে সব লৌহ যৌগিক থাকে তাহা এই সময়ে বিয়োজিত হইয়া লৌহ অক্সাইডে পরিণত হয়। এই লৌহ অক্সাইডের রং লাল বলিয়া পোড়া ইট বা টালীর রং লালচে হইয়া থাকে। যে মাটিতে লৌহ যৌগিক থাকে না তাহা পোড়াইলে সাদা হইবে। এই প্রকার শক্ত ও সরন্ধ্র অবস্থাকেই বিস্কিট-পোড়ন বা মৃদু-পোড়ন বলা হয়। ইট, টালী ও গৃহস্থালীর হাড়ি-কলসি প্রভৃতি টেরাকোটা দ্রব্যাদি এই অবস্থাতেই ভাটি হইতে বাহির করিয়া লওয়া হয়। সাধারণ গৌণ মাটিতে যে সব অবিশুদ্ধি থাকে তাহা অল্প তাপেই বালি অথবা সিলিকার সহিত যুক্ত হইয়া সিলিকেটে পরিণত হয়। এই ক্ষার-চুন-সিলিকেট প্রায় ৯০০° সে. তাপেই গলিয়া তরল হইয়া যায় এবং অবিশুদ্ধ পোড়ামাটিকে বেশ দৃঢ় করিয়া দেয়।

কিন্তু সাদা মাটিতে প্রস্তুত দ্রব্য এত অল্প তাপে তেমন দৃঢ় হইতে পারে না; কারণ বিশুদ্ধ সাদা মাটিতে ক্ষার বা চুনজাতীয় অবিশুদ্ধি অনেক কম পরিমাণে থাকে। সুতরাং সাদা মাটিতে প্রস্তুত ফেয়ান্স দ্রব্যাদি সুদৃঢ় করিতে আরও তাপের দরকার হইয়া থাকে।

সাদা মাটিতে প্রস্তুত দ্রব্যকে ভাটির ভিতর ১১০০° সে-এর কিছু উপরে উত্তপ্ত করিলে মাটির সহিত যে ফেলস্পার মিশ্রিত করা হইয়া থাকে তাহা গলিতে আরম্ভ করে এবং তাপ প্রায় ১২০০° সে. হইলে উহা গলিয়া তরল হইয়া যায়। এই গলিত তরল পদার্থ মাটির অ্যালুমিনা ও সিলিকার কণাকে বেষ্টন করিয়া ফেলে। ইহার ফলে মাটির দ্রব্যগুলি বেশ শক্ত হইয়া যায় এবং উহাদের রন্ধ্রতাও অনেক কমিয়া যায়। ফেয়ান্স জাতীয় সাদা মাটির দ্রব্যাদি এই অবস্থায় ভাটি হইতে বাহির করিয়া লওয়া হয়। সুতরাং এই প্রকারের মৃৎদ্রব্য বেশ শক্ত হইলেও উহাতে কিছু রন্ধ্র থাকিয়া যায়। সাধারণতঃ ফেয়ান্সের রন্ধ্রতা শতকরা ৬-৯ ভাগ, টালীর ১০-১৫ ভাগ এবং ইটের ১২-১৮ ভাগ হইতে দেখা যায়।

ভাটির তাপ ১২৫০° সে. পর্যন্ত উঠিলে গলিত ফেলস্পার আরও তরল হইয়া সচ্ছিদ্র দ্রব্যের প্রতি-রন্ধ্রে প্রবেশ করে এবং দ্রব্যের রন্ধ্রতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিয়া উহাকে আরও দৃঢ় করিয়া দেয়। ষ্টোন-ওয়ার বা কড়িমাটির দ্রব্যাদি এই কঠিন অবস্থায় ভাটি হইতে বাহির করা হয় বলিয়াই ইহাদের নাম ষ্টোন-ওয়ার দেওয়া হইয়াছে, যাহার অর্থ পাথরের মত কঠিন সামগ্রী। ভাল ষ্টোন-ওয়ারের রন্ধ্রতা শতকরা একভাগের বেশী হওয়া উচিত নহে; তবে সাধারণ ২-৩ ভাগ পর্যন্ত হইতে দেখা যায়।

পোর্সেলিন মণ্ডে তৈয়ারী দ্রব্যকে যখন ভাটিতে ১৩০০° সে-এর উপরে উত্তপ্ত করা হয় তখন মণ্ডস্থ ফেলস্পার ও অন্যান্য গলনশীল খনিজ সকল গলিয়া এক তরল পদার্থে পরিণত হয়। এই অতি উত্তপ্ত তরল খনিজ পদার্থ সিলিকা ও অ্যালুমিনার কণাসমূহকে ধীরে ধীরে দ্রবীভূত করিতে থাকে এবং উহাদের রন্ধ্রতা একেবারেই নষ্ট করিয়া দেয়। ইহার ফলে সাধারণ পোর্সেলিন কাচীয় এবং ঈষৎ অনচ্ছ হইয়া যায়; যেমন অনচ্ছ ও সচ্ছিদ্র ব্লটিং কাগজ তৈলসিক্ত করিলে উহা ঈষৎ স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হয় এবং উহার রন্ধ্রতাও বন্ধ হইয়া যায়। কাচীয় পোর্সেলিন ও অস্থি পোর্সেলিনের দ্রব্যাদি এই অবস্থায় ভাটি হইতে বাহির করিয়া লওয়া হয়; কারণ তাপ আরও অধিক হইলে এই প্রকারের দ্রব্য বিকৃত হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

নানা ধরণের কঠিন পোর্সেলিনের মণ্ড হইতে তৈয়ারী দ্রব্যাদি পোড়াইতে অনেক অধিক তাপ লাগে। অবস্থাভেদে তাপের পরিমাণ ১৪০০°-১৬০০° সে. পর্যন্ত দরকার হইতে পারে। ভাটির তাপ যত বেশী বাড়িতে থাকে, গলিত ফেলস্পার ও অন্যান্য গলিত খনিজ তত বেশী সিলিকা ও অ্যালুমিনার কণা দ্রবীভূত করিতে থাকে। অবশেষে ঐ গলিত তরল খনিজ সম্পৃক্ত হইয়া যায়; অর্থাৎ আর অধিক দ্রবীভূত করিবার ক্ষমতা থাকে না। যদি এই অবস্থায় ভাটিকে ধীরে ধীরে শীতল করা যায় তবে ঐ সকল দ্রবীভূত সিলিকা ও অ্যালুমিনার কণা কেলাসিত হইয়া এক নূতন যৌগিকরূপে বাহির হইয়া পড়ে; যেমন ঘন রস শীতল করিলে মিছরির দানা বাহির হইয়া থাকে। এই নূতন যৌগিকের নাম মুলাইট এবং ইহার রাসায়নিক সংকেত $3 Al_2O_3.2 SiO_2$। এই মুলাইটের কেলাস বা দানা সূচের মত সরু ও লম্বা আকারের হয়।

কঠিন পোর্সেলিন দ্রব্যে এই মুলাইট কেলাসের সংখ্যা যত বেশী হয় উহার কাঠিন্য, তাপবাহীতা এবং তড়িৎরোধক ক্ষমতাও তত অধিক হইতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, উচ্চ তড়িৎরোধক পোর্সেলিনে এই মুলাইটের পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগ হয় এবং রসায়নাগারে

ব্যবহৃত পোর্সেলিন পাত্রে শতকরা ৩৫ ভাগ হওয়া বাঞ্ছনীয়। মোটর গাড়ীতে যে স্পার্কিং প্লাগ ব্যবহার করা হয় তাহার পোর্সেলিনের অংশের জন্য শতকরা ৩৫-৪০ ভাগ মুলাইটবিশিষ্ট বিশেষ পোর্সেলিন প্রস্তুত করিতে হয়।

পোড়াইবার পর মৃৎদ্রব্যে নানাপ্রকারের ত্রুটি দেখা যায় এবং প্রতি ভাটি হইতেই কিছু সংখ্যক ত্রুটিপূর্ণ দ্রব্য পাওয়া যায়। এই সকল ত্রুটি নিবারণ করিতে হইলে তাহার কারণ ও প্রতিকার কিছু জানা দরকার। ভাটিতে মৃৎদ্রব্য ফাটিয়া যাওয়া অথবা বাঁকিয়া যাওয়াই সাধারণ ও প্রধান ত্রুটি। ভাটি উত্তপ্ত করিবার কালে অথবা শীতল করিবার সময় বেশী তাড়াতাড়ি করিলে অথবা ভাটির ভিতর হঠাৎ অধিক ঠাণ্ডা হাওয়া প্রবেশ করিলে মৃৎদ্রব্য ফাটিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মাটি বা মাটির মিশ্রণ যত তাপ সহ্য করিতে পারে তাহার অধিক তাপ দিলে মৃৎদ্রব্য বিকৃত হইয়া যায়। কাঁচা মাটির দ্রব্য শুকাইবার সময় সঠিক যত্ন না লইলে অনেক সময় সামান্য বাঁকিয়া যায় যাহা সহজে দৃষ্টি-গোচর হয় না, কিন্তু পোড়াইবার পর বেশ বুঝিতে পারা যায়। স্যাগারে সমতলভাবে না সাজাইলে শুষ্ক দ্রব্যগুলি বাঁকিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ইহা ছাড়া আরও নানা কারণে মৃৎদ্রব্য বাঁকিয়া যাইতে পারে।

সেণ্ট বারথোলোমিউ হাসপাতালে অনুষ্ঠিত একটি অস্ত্রোপচারের দৃশ্য এক মাইল দূরে অবস্থিত লণ্ডনের রয়েল কলেজ অব সার্জেনের গ্রেট হলে রঙীন টেলিভিসনের সাহায্যে প্রদর্শিত হয়। ছবিতে সেণ্ট বারথোলোমিউ হাসপাতালের অপারেশন টেবিলে রঙীন টেলিভিশন ক্যামেরার ব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে।

বিশ্ব-রহস্যে তড়িৎ

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

আদিম মানব মেঘের বিজলীচমক ও বজ্রপাতের ধ্বংসলীলায় বিভ্রান্ত হতো; ভাবতো দেবতার রোষবহ্নি! প্রকৃতির এই প্রচণ্ড ক্রিয়া যুগযুগান্তর ধরে মানুষ দেখে এসেছে, আর ভয়ে, বিস্ময়ে বিহ্বল হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি—তার কোন জ্ঞান মানুষের ছিল না, এই সেদিন অবধি! মাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে বেঞ্জামিন ফ্রাংক্লিন তাঁর সেই বিখ্যাত 'ঘুড়ির পরীক্ষায়' প্রমাণ করেন—এটা তড়িতের ক্রিয়া। মেঘে সঞ্চারিত তড়িৎ-স্ফুরণের ফলে পৃথিবীতে এই ধ্বংসলীলা ঘটে, তারই আলোকচ্ছটা, তারই গর্জন। বস্তুতঃ এ সেই একই তড়িৎশক্তি, যা আমরা পৃথিবীতেও সৃষ্টি করতে পারি রেশমী কাপড় দিয়ে কাচদণ্ড ঘষে বা অন্যান্য উপায়ে। প্রভেদ মাত্র তীব্রতায়। সে কালের মনুষ্য-সৃষ্ট তড়িৎ ছিল নগণ্য, অস্তিত্ব মাত্র লক্ষিত হতো। গুহাবাসী আদিম মানবও সহসা হয়তো তার চামড়ার পোষাকে অ্যাম্বার[১]-নির্মিত অলঙ্কারের ঘর্ষণে অজ্ঞাতে তড়িৎ সৃষ্টি করতো। খৃষ্টের জন্মের প্রায় ছ'শ বছর আগে গ্রীক পণ্ডিত থেল্‌স্‌ চামড়ার ঘর্ষণে অ্যাম্বারের এই তড়িৎ-ধর্ম প্রথম লক্ষ্য করেন। মানুষের জ্ঞানের ইতিহাসে তড়িতের এই হলো প্রথম আবির্ভাব। অ্যাম্বারের গ্রীক প্রতিশব্দ 'ইলেক্‌ট্রন' থেকে পদার্থের এরূপ ধর্ম বা শক্তিকে ইলেকট্রিসিটি বলা হয়—আমরা বাংলায় বলি তড়িৎ বা বিদ্যুৎ।

পৃথিবীতে এক সময় মানুষ ছিল না। তারপর মানুষ এল, সেও লক্ষ লক্ষ বছর আগে। ক্রমে সে বিভিন্ন জ্ঞান লাভ করেছে—চাষ আবাদ শিখেছে, কাপড় বুনেছে, আগুন জ্বেলেছে ও তার তাপ ও আলোক ব্যবহার করতেও সুরু করেছে বহু কাল; কিন্তু তড়িতের স্বরূপ জেনেছে ও তার ব্যবহার শিখেছে মাত্র এই সেদিন। এর কারণ আছে। তড়িৎ মানুষের প্রত্যক্ষ ধরাছোঁয়ার বাইরে একটা অদৃশ্য শক্তি মাত্র—এর কোন বস্তুসত্তা নেই। কোন পদার্থে তড়িৎ সঞ্চার হলে তার ওজন কিছুমাত্র বাড়ে না, দৃশ্যতঃ কোন পরিবর্তনও লক্ষিত হয় না। সোজাসুজি তড়িতের পরিচয় লাভ করবার মত কোন ইন্দ্রিয় মানুষের নেই; অবশ্য উচ্চ বিভবসম্পন্ন তড়িতের মারাত্মক স্পর্শাঘাতের কথা স্বতন্ত্র। তড়িতের বিভিন্ন প্রকাশমাত্র মানুষ জানতে পারে—বিশেষ ব্যবস্থায় তড়িৎ শক্তির রূপান্তরে অপরাপর শক্তির উদ্ভব হয়—আলো জ্বালে, তাপ দেয়, শব্দ সৃষ্টি করে, যন্ত্রাদি চালায়। তাপ, আলোক, শব্দ প্রভৃতিও শক্তি বটে; কিন্তু এগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—আমরা অনুভব করি, দেখি এবং শুনি। তড়িতের প্রত্যক্ষ পরিচয়ে বাধা থাকলেও ইদানীং আমরা এর বিভিন্ন কার্যকরী শক্তি ও রূপান্তরের নিবিড় পরিচয় পেয়েছি। আজ তড়িতের মত এমন অনুগত ও শক্তিমান সেবক মানুষের আর নেই।

আজ যদি কোন রিপ্‌-ভ্যান্‌-উইঙ্কল মাত্র শ'দেড়েক বছর ঘুমিয়ে জেগে উঠতো তাহলে সে তার পুরনো পৃথিবীকে চিনতেই পারতো না। মানব-সভ্যতা এই স্বল্পকালে অতি দ্রুত এগিয়ে গেছে—তড়িতের বিভিন্ন ব্যবহারিক প্রয়োগে পৃথিবীর চেহারা একেবারে বদলে গেছে। নানা-

---

১—প্রাচীন কালের রজন জাতীয় এক প্রকার হলদে উদ্ভিজ্জ পদার্থ; কঠিন শিলীভূত অবস্থায় পাওয়া যায়।

ভাবে, নানা বস্তুতে মানুষ বহু পূর্বেই তড়িৎ সৃষ্টি করেছে, কিন্তু ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে মাইকেল ফ্যারাডের ডায়নামো যন্ত্র আবিষ্কারের পর থেকে সুরু হয়েছে তড়িতের প্রকৃত জয়যাত্রা। আজ বৈদ্যুতিক আলোকে পৃথিবী প্লাবিত—পাখা ঘুরছে, ট্রাম ছুটছে, কলকারখানার ইঞ্জিন চলছে। রেডিও, টেলিভিসন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডার, এক্স-রে প্রভৃতি বর্তমান সভ্যতার অজস্র উপকরণ —সবই তড়িতের খেলা। তড়িৎ যেন জড়জগতের মূলীভূত শক্তি—এক অদৃশ্য যাদুকর! উপনিষদে আছে—ব্রহ্ম নিরাকার, কিন্তু বিশ্বের সর্বত্র সর্ব জীবে, সর্ব বস্তুতে বিরাজমান। উপনিষদকার ব্রহ্ম বলতে হয়তো কোন শক্তির কল্পনা করেছেন। তড়িৎকে এমনই একটা শক্তি বলা যায়। সারা বিশ্বময়-জলে-স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্বত্র তড়িৎ রয়েছে ঘুমন্ত; জানতে হবে, জাগাতে হবে। মানুষ আজ জেনেছে, সর্ব বস্তুর পারমাণবিক গঠনে তড়িতের ক্রিয়া—মূলতঃ তড়িৎকণিকার সমবায়েই পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ গঠিত। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে—বিভিন্ন পদার্থের পরমাণু বস্তুতঃ সবই এক, পার্থক্য মাত্র তাদের ইলেক্ট্রন, প্রোটন প্রভৃতি তড়িৎ-কণিকার সংখ্যায় ও বিন্যাসে। অতএব জগতের সৃষ্টিরহস্যের মূলে যে তড়িতেরই ক্রিয়া, এ কথা আজ আর অত্যুক্তি নয়।

জগতের সর্বত্র যেন তড়িতেরই খেলা—বস্তুর সংগঠনে তড়িৎ, বায়ুমণ্ডলে তড়িৎ, এমন কি প্রাণীদেহেও তড়িতের ক্রিয়া চলছে! এক কথায় তড়িৎময় এই ত্রিভুবন। কথাটার তাৎপর্য একে একে বিচার করে দেখা যাক :—

নৈসর্গিক তড়িতের প্রকৃষ্ট প্রকাশ হলো মেঘের বিদ্যুৎচমক ও বজ্রপাত। মেঘলা রাতের বিজলী-চমকে চোখে ধাঁধা লাগে, খানিক পরেই হয় বজ্রপাত। বিপরীত তড়িৎধর্মী মেঘপুঞ্জের পরস্পরের সান্নিধ্যে বিদ্যুৎস্ফুরণে আচম্কা এই আলোকের প্রকাশ। ঊর্ধ্বাকাশে মেঘপুঞ্জের মধ্যে মৃদু তড়িৎ-স্ফুরণ কিন্তু অহরহই ঘটছে, আর তার প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের গ্যাসীয় বস্তু তড়িতাবিষ্ট হচ্ছে। ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৭০ মাইল উর্ধ্বে রয়েছে তড়িতাবিষ্ট কণিকার স্তর; একে বলে আয়নোস্ফিয়ার। এর নিম্নস্থ ‘কেনেলিহিভিসাইড’ স্তরে উপরিস্থ আয়নোস্ফিয়ারের তড়িৎ প্রভাবেই রেডিও-তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে। এজন্যেই রেডিও-তরঙ্গ সোজা মহাশূন্যে চলে যেতে পারে না, ভূপৃষ্ঠ ধরে দূর-দূরান্তরে গিয়ে পৌছায়। আবার ভূপৃষ্ঠের প্রায় ২৫ মাইল উর্ধ্বের বায়ুস্তরে সূর্যালোকের আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি তত্রত্য অক্সিজেনকে ওজোন গ্যাসে-রূপান্তরিত করে। এই রূপান্তরের বিক্রিয়ায়ও তড়িৎকণিকা উদ্ভূত হয়।

নৈসর্গিক তড়িতের আর একটা বিশেষ প্রকাশ হলো মেরুপ্রভা। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের আকাশে যে বৈচিত্র্যময় আলোকচ্ছটা দেখা যায় তাও তড়িতের প্রভাবেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। উত্তর মেরুদেশের এই জ্যোতিপ্রভাকে বলে অরোরা বোরিয়ালিস, আর দক্ষিণ মেরুর এই আলোকচ্ছটাকে বলে অরোরা অষ্ট্রেলিস। দক্ষিণ মেরুর নিকটে লোকবসতি নেই; কাজেই খুব কমই লোকচক্ষুর গোচরীভূত হয়। উত্তর মেরুর সন্নিকটস্থ দেশসমূহে এই মেরুজ্যোতি অতি মনোরম দেখায়; তত্রত্য আকাশে বিভিন্ন আকার ও বিভিন্ন বর্ণের উজ্জ্বল প্রভা প্রতিভাত হয়। এই মেরুপ্রভা মূলতঃ বায়ুমণ্ডলীয় তড়িতের প্রভাবেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। ভৌগোলিক কারণে মেরু অঞ্চলের আকাশে স্বভাবতঃই বায়ুর চাপ থাকে কম। সেই হাল্কা বায়ুর মাধ্যমে আয়নায়িত বায়ুকণিকার তড়িৎ প্রভাবে এরূপ বর্ণাভার সৃষ্টি হয়। এ যেন অনেকটা আধুনিক রঙীন নিয়ন-আলোর মত—অল্প চাপের নিয়ন গ্যাসের মধ্যে তড়িৎ চলাচলের ফলে এই রঙীন আলোক যেভাবে সৃষ্টি হয়, মেরু-জ্যোতিও প্রধানতঃ তদনুরূপ।

নৈসর্গিক তড়িতের বিশেষ প্রকাশ বিজলী

চমকে ও মেরুপ্রভায় যে কোন দর্শকই দেখতে পায়; কিন্তু অহরহ এমন সূক্ষ্মভাবে সারা বিশ্বে নভোমণ্ডলীয় তড়িৎবিকিরণ ঘটছে যা সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতেই মাত্র ধরা পড়ে। সম্প্রতি এই তড়িৎ বিচ্ছুরণের সন্ধান পাওয়া গেছে, যাকে মহাজাগতিক রশ্মি বা 'কস্‌মিক রে' বলা হয়। মহাশূন্য থেকে অতি সূক্ষ্ম তড়িৎকণিকা তরঙ্গাকারে ভূপৃষ্ঠে প্রতিনিয়ত বর্ষিত হচ্ছে। কোথায় এর উৎপত্তি তা দুর্জ্ঞেয়। অনন্ত দীর্ঘপথ অতিক্রম করার ফলে এর প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি কণিকার পরস্পর সংঘর্ষে মেসন নামক এক নূতন কণিকার উদ্ভব হয় এবং তাই পৃথিবীতে পৌছায়—এইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কস্‌মিক রশ্মিতে প্রধানতঃ মেসন কণিকারই সন্ধান পাওয়া যায়।

অতএব দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন নৈসর্গিক কারণে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে নানাভাবে তড়িতের ক্রিয়া চলছে অনন্তকাল ধরে। বিশেষতঃ কস্‌মিক রশ্মির বৈদ্যুতিক প্রভাব বায়ুমণ্ডলের সর্বত্র বিরাজমান। এই নবাবিষ্কৃত রশ্মির অতি সূক্ষ্ম মৌলিক কণিকা-প্রবাহ অনন্তকাল ধরে পৃথিবীতে আসছে। কস্‌মিক রশ্মির এরূপ প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা চলছে। কারো কারো মতে, মহাশূন্যের এই সূক্ষ্ম তড়িৎ-কণিকাই বিশ্বসৃষ্টির মূল বস্তু এবং গ্রহ-নক্ষত্রাদিও এরই প্রভাবে সৃষ্ট। যাহোক, সৃষ্টি-রহস্যের সমাধান না হলেও জৈব ও অজৈব বিভিন্ন সত্তায় তড়িতের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। জীবদেহে তড়িতের প্রভাব কিরূপ দেখা যাক—

কেবল বায়ুমণ্ডলেই যে তড়িতের ক্রিয়া চলছে এমন নয়, জীবমাত্রেরই দৈহিক ক্রিয়ায় অল্পাধিক পরিমাণে তড়িতের উদ্ভব হয়ে থাকে। জীবের দেহ অসংখ্য আণুবীক্ষণিক জৈবকোষের সমবায়ে গঠিত; প্রত্যেকটি কোষই জীবন্ত। জীবের জীবন বা প্রাণ যে কি বস্তু তা অদ্যাপি নিরূপিত হয় নি; তথাপি এ কথা বলা যেতে পারে যে, দেহের সংগঠক অসংখ্য জীবকোষের পারস্পরিক ক্রিয়ার সমষ্টিগত জৈবশক্তিতেই প্রাণের বিকাশ। জীবের প্রাণশক্তির মুখ্য পরিচয় হলো হৃৎস্পন্দন। প্রত্যেকটি হৃৎস্পন্দনে অতি মৃদু তড়িৎ-প্রবাহের উদ্ভব হয়ে থাকে। দেহাভ্যন্তরে উদ্ভূত এই তড়িতের প্রবাহই কার্ডিয়োগ্রাফ যন্ত্রে আলোকচিত্রের পদ্ধতিতে রেখাপাত করে। এই রেখাচিত্রকে বলে কার্ডিয়ো-গ্রাম। স্পন্দনের ধারা অনুযায়ী উদ্ভূত তড়িৎ প্রবাহের বৈষম্য ঐ রেখায় বক্রতা প্রকাশ পায়। এ থেকে প্রমাণিত হয়, জীবমাত্রেরই দেহে অতি মৃদু তড়িৎ-প্রবাহ প্রতিনিয়ত পরিচালিত হচ্ছে।

আবার জীবদেহের মাংসপেশীর সঙ্কোচন-প্রসারণেও মৃদু তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। বস্তুতঃ কোন কর্মসম্পাদনের প্রেরণা এলেই পেশীর সংগঠক অগণিত কোষে মৃদু তড়িৎ-স্পন্দন ঘটে এবং তারই প্রভাবে পেশীর স্নায়বিক সংকোচন-প্রসারণে কর্মশক্তি উপজাত হয়। কোন পেশী বিকল বা অসাড় হয়ে গেলে উপযুক্ত স্থানে সহসা মৃদু তড়িৎ-স্পন্দন দিলে তৎক্ষণাৎ পেশী সংকুচিত হয় এবং পরমুহূর্তে তার স্বাভাবিক প্রসারণ ঘটে। এভাবে ক্রমশঃ অসাড় পেশী পুনরায় কর্মক্ষম হয়ে ওঠে। এরূপ তড়িৎ-চিকিৎসায় মাংসপেশীর তড়িৎ প্রভাবেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। জীব-বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মস্তিষ্কই দেহযন্ত্রের প্রধান নিয়ামক—মস্তিষ্ক থেকেই ইচ্ছা ও অনুভূতি স্নায়ুপথে সারাদেহে মুহূর্তে সাড়া জাগায়। এই ক্রিয়া বৈদ্যুতিক তারবার্তারই অনুরূপ। বস্তুতঃ জৈবতড়িতের প্রভাবেই এরূপ সম্ভব হয়। মস্তিষ্কই সেই তড়িৎ শক্তির কেন্দ্র এবং সর্বাঙ্গের স্নায়ুজাল যেন টেলিগ্রাফের তার। যাহোক, মস্তিষ্কের এই তড়িৎ-স্পন্দনের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায় আধুনিক এন্‌সেফালোগ্রাফীতে। স্নায়ুর মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়ে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে যে তড়িৎ-স্পন্দন ঘটে, তারই অনুরূপ সাড়া যান্ত্রিক ব্যবস্থায় রেখাকারে প্রতিফলিত হয়। এই এন্‌সেফালো-

গ্রামের রেখার বিভিন্নতা লক্ষ্য করে মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্নায়ুকেন্দ্রের কার্যকারিতা বুঝা যায়।

এরূপ বৈদ্যুতিক ক্রিয়া যে সব জীবের দেহেই চলছে তাতে সন্দেহ নেই—পরিমাণে কম বা বেশী হতে পারে মাত্র। সাধারণতঃ জীবদেহে উদ্ভূত তড়িৎ-প্রবাহ এত মৃদু যে, প্রত্যক্ষভাবে তার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে এমন অনেক জীবের সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের দেহে তীব্র তড়িৎশক্তির অস্তিত্ব লক্ষিত হয়ে থাকে। এমন অনেক মাছ আছে যাদের স্পর্শে তীব্র তড়িতাঘাত অনুভূত হয়। দক্ষিণ আমেরিকায় কোন কোন নদীতে একপ্রকার বাণ মাছ আছে। সেগুলি 'ইলেকট্রিক ইল' বা জিম্‌নোটাস নামে পরিচিত। এগুলি সাধারণতঃ ৩-৪ ফুট লম্বা হয়। এদের দেহোৎপন্ন তড়িৎ এমন তীব্র যে, স্পর্শ মাত্রেই অপরাপর মাছ তড়িতাহত হয়ে প্রাণত্যাগ করে। মানুষের মৃত্যু না ঘটলেও অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে। এই মাছ ওদেশের অধিবাসীদের বিশেষ প্রিয় খাদ্য। কৌশলে তারা এই মাছ ধরে। নদীতে তারা দলে দলে ঘোড়া ছেড়ে দেয়, আর সেই ঘোড়ার দেহের স্পর্শে জিম্‌নোটাসের দেহের তড়িৎ ক্রমে নিঃশেষিত হয়ে গেলে তাদের ধরা হয়।

ফ্যারাডে এই মাছ নিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন, এদের দেহোৎপন্ন তড়িৎ ও বাইরের সাধারণ তড়িতের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। জীবদেহোৎপন্ন তড়িৎ, নৈসর্গিক তড়িৎ এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন তড়িৎ সবই এক। কেবল জিম্‌নোটাস নয়, 'ইলেকট্রিক-রে' বা টর্পেডো নামে আর এক রকম মাছের মধ্যেও তড়িৎ-শক্তির প্রাবল্য দেখা যায়। যাহোক, এদের দেহাভ্যন্তরে ব্যাটারীর প্লেটের মত এক বিশেষ ধরণের মাংসপেশীর সমাবেশ দৃষ্ট হয়। এই পেশীর অদ্ভুত কার্যকারিতায় তড়িৎ উদ্ভূত হয়ে সজীব অ্যাকুমুলেটরের মত তড়িৎ কোষে সঞ্চিত হয়ে থাকে।

অতএব দেখা গেল, বিভিন্ন কৌশলে মানুষ যে তড়িৎ উৎপাদন করে বাতি জ্বালাচ্ছে, কল চালাচ্ছে এবং অজস্র প্রয়োজনে লাগাচ্ছে—সেই একই তড়িৎ বিভিন্ন নৈসর্গিক উপায়ে বায়ুমণ্ডলে উৎ-পাদিত হচ্ছে; আবার সেই তড়িৎই স্বাভাবিক জৈবপ্রক্রিয়ায় জীবদেহেও সৃষ্টি হচ্ছে। জল যেমন সমুদ্রের হোক, নদীনালা বা সরোবরের হোক অথবা বৃষ্টিপাতের হোক—সবই জল, প্রভেদ মাত্র তার গতি ও পরিমাণে, তড়িৎও সেরূপ—কোথাও স্থির-তড়িৎ, কোথাও প্রবাহ তড়িৎ, কোথাও মারাত্মক রকমের তীব্র, কোথাও এত মৃদু যে, যন্ত্র সাহায্য ব্যতীত লক্ষিত হয় না। তবে একথা আজ নিশ্চিত বলা যায়, বিশ্বের সবত্রই তড়িতের খেলা চলছে—যাবতীয় সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মূলেই তড়িতের ক্রিয়া। কঠিন, তরল বা বায়বীয় যে কোন অবস্থায়ই হোক, জগতের প্রত্যেকটি বস্তুর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকারও মৌলিক উপাদান হলো তড়িৎ, আধুনিক বিজ্ঞান এ কথা আজ প্রমাণ করেছে। কথাটা কি, একবার দেখা যাক :—

আধুনিক বিজ্ঞানে নানারূপ সূক্ষ্ম ও জটিল পরীক্ষায় পদার্থের পরমাণু-সংগঠনে বিভিন্ন তড়িৎ-কণিকার ক্রিয়া সর্বাংশে সমর্থিত হয়েছে। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ইলেকট্রন কণিকার সংখ্যা বিভিন্ন। পরমাণুর নিউক্লিয়াস গঠিত হয় ধনতড়িৎযুক্ত কয়েকটি প্রোটন কণিকা ও তড়িৎ-বিহীন কয়েকটি নিউট্রন কণিকার সমবায়ে। যে কোন পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ নিউক্লিয়াসের প্রোটন সংখ্যা প্রদক্ষিণকারী ইলেকট্রন সংখ্যার সমান—উভয়ের তড়িৎশক্তিও সমান; কিন্তু একে অন্যের বিপরীতধর্মী। কাজেই সামগ্রিকভাবে পরমাণু, তথা পদার্থ স্বভাবতঃই তড়িৎশূন্য। সমশক্তি সম্পন্ন বিপরীতধর্মী তড়িৎকণিকায় গঠিত বলেই কোন পরমাণু, তথা পদার্থে তড়িতের অস্তিত্ব লক্ষিত হয় না। এই সমতাপ্রাপ্ত ও সুপ্ত তড়িৎকেই বিভিন্ন কৌশলে জাগ্রত করে তড়িৎশক্তি উৎপাদিত

হচ্ছে। যাহোক, পরমাণুর গঠনসম্বন্ধীয় গবেষণায় একথা আজ প্রমাণিত হয়েছে যে, ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি তড়িৎকণিকাই জাগতিক পদার্থের মূল উপাদান। এক দুর্জ্ঞেয় প্রাকৃতিক বিধানে তড়িৎশক্তি পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি রচিত হয়েছে।

পদার্থের পরমাণু বিভাজনে যে প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হয় তার উৎস এই তড়িৎশক্তি, যা নিউক্লিয়াসে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। বিশেষ ব্যবস্থায় সামান্য একটু পদার্থের অগণিত পরমাণুর নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তড়িৎশক্তি তাপ, আলোক প্রভৃতি সর্বশক্তির আধার—পারমাণবিক তড়িৎশক্তি এই সব শক্তির আকারেই বিমুক্ত হয়। বিজ্ঞানের মতে পদার্থ ও শক্তি মূলতঃ এক—পদার্থের বিলুপ্তিতে শক্তির উদ্ভব এবং শক্তির অন্তর্ধানে পদার্থের উৎপত্তি হয়ে থাকে।

যাহোক, এসব জটিল তথ্যের আলোচনা না করেও একথা বলা চলে, দৃশ্য বা অদৃশ্য জাগতিক সকল পদার্থের সৃষ্টিরহস্যের মূলেই তড়িৎ—বিশ্বের সর্বত্র, সর্বাবস্থায়, সকল বস্তুতে তড়িতের ক্রিয়া বর্তমান।
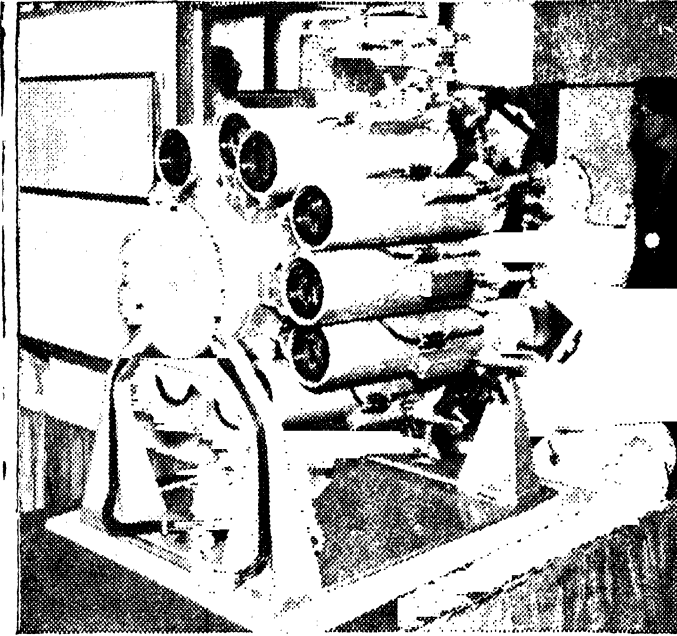
পারমাণবিক গবেষণা কার্যে ব্যবহৃত ক্যামেরা। এই ক্যামেরার সাহায্যে খুব অল্প সময়ে এবং অতি দ্রুত গতিতে আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়।

উদ্ভিদের শরৎকালীন পত্র বিমোচন

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

পাতা উদ্ভিদের অতি প্রয়োজনীয় অংশ হইলেও এককভাবে ইহার জীবন দীর্ঘ নয়। গাছ একদিকে নূতন পাতা সৃষ্টি করিয়া তাহার ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করে, অপরদিকে পুরাতন পাতাগুলি বিবর্ণ হইয়া একে একে ঝরিয়া পড়ে। অনেক গাছেই আবার পত্রের সৃজন ও বিমোচনের ব্যাপারে ঋতুর প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই জন্যই শরৎ বর্ণনায় কবি বলিয়াছেন—

'আমলকি বন কাঁপে—যেন তার
বুক করে দুরু দুরু,
পেয়েছে খবর, পাতা খসানোর
সময় হয়েছে সুরু।'

শুধু আমলকি নয়, শরৎকালে অনেক গাছেরই পাতা ঝরিবার ধুম পড়িয়া যায়। আমলকি, শিমুল, পলাশ প্রভৃতি গাছগুলি নিঃশেষে সমস্ত পাতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া শূন্য ডালপালা লইয়া শীতের আগমন প্রতীক্ষা করে। আম, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছগুলি সম্পূর্ণ নেড়া না হইলেও এই সময় অধিকাংশ পত্র বিসর্জন দিয়া তাহারাও শ্রীহীন হইয়া পড়ে। বসন্তের দক্ষিণ হাওয়ার পরশে যে নবপত্রের কুঁড়ি গাছে গাছে প্রাণের সাড়া জাগাইয়াছে, বর্ষার জলধারায় সিক্ত হইয়া যাহারা সবুজ সমারোহের সৃষ্টি করিয়াছে, শরতের সমাগমে তাহারাই হলুদ বা রক্তিম বর্ণ ধারণ করে এবং দলে দলে গাছের বুক খালি করিয়া ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করে।

পাতা শুধু গাছের শোভা নয়, ইহারা গাছের প্রাণস্বরূপ। পাতার মধ্যেই রচিত হয় গাছের পুষ্টিকর খাদ্য। এই খাদ্য সঞ্চালিত হইয়াই গাছের সর্বাংশের গঠন ও বৃদ্ধি সম্পাদিত হয় এবং গাছ তাহার জীবনধারণের শক্তি লাভ করে। পত্রের হরিৎ পদার্থ সৌরশক্তি আহরণের ক্ষমতা ধারণ করে এবং এই সৌরশক্তির সহায়তায়ই গাছ বায়ু হইতে শোষিত কার্বন ডাইঅক্সাইডকে শর্করায় পরিণত করে। এই শর্করার বিশ্লিষ্ট অংশের সহযোগে প্রোটিন, ফ্যাট ও অন্যান্য নানাপ্রকার জৈব যৌগিক সৃষ্টি হইয়া উদ্ভিদদেহের পুষ্টি সাধিত হয়। পত্রশোষিত সৌরতেজ হইতে উদ্ভিদ জীবনধারণের উপযোগী সর্বপ্রকার শক্তির সরবরাহ লাভ করে। শক্তি ও পুষ্টির উৎস হইলেও জীবনের প্রয়োজনেই আবার উদ্ভিদকে অবস্থাবিশেষে তাহার এই প্রয়োজনীয় অংশকে বিসর্জন দিতে হয়।

খাদ্য ও শক্তির সরবরাহ ব্যতীত উদ্ভিদের শ্বাসক্রিয়া ও জলমোক্ষণেও পত্রই প্রধান অবলম্বন। পত্রের অগণিত রন্ধ্রপথে বায়ু প্রবেশ করিলে তাহার অক্সিজেন উদ্ভিদরসে দ্রবীভূত হইয়া আমাদের দেহে রক্তবাহিত অক্সিজেনের মতই উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পরিচালিত হয় এবং উহার স্বভাবসিদ্ধ দহনক্রিয়া সম্পাদন করে। উদ্ভিদ মৃত্তিকা হইতে যে জল শোষণ করে তাহার অধিকাংশই পত্রের রন্ধ্রপথে বাষ্পাকারে নির্গত হইয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে পত্র হইতে এই জলমোক্ষণের ব্যাপারটি অপচয় রূপে গণ্য হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে জলমোক্ষণ জলশোষণ ক্রিয়ার মতই উদ্ভিদ-জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। উদ্ভিদের খনিজ খাদ্যের উপাদানসমূহ জলের সঙ্গেই মৃত্তিকা হইতে উদ্ভিদ দেহে শোষিত হয়। এইসব পদার্থের যথোপযুক্ত সরবরাহ লাভের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত অধিক পরিমাণে জল উদ্ভিদকে শোষণ করিতে হয়। অতিরিক্ত জল বাহির হইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা

আছে বলিয়াই উদ্ভিদ মৃত্তিকা হইতে তাহার দেহ গঠনের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করিতে পারে।

উদ্ভিদের জলশোষণ ও জলমোক্ষণ ব্যাপার দুইটি অনেক পরিমাণে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। মৃত্তিকার জলীয় অংশ কমিয়া গেলে শোষণের পরিমাণও স্বভাবতঃই হ্রাস পায়। তাপের পরিমাণ হ্রাস পাইলে অনেক গাছের কোষের সক্রিয়তা কমিয়া যায়; মূলের শোষণ শক্তিরও হ্রাস ঘটে। বায়ুর আর্দ্রতার পরিমাণ কমিয়া গেলে উদ্ভিদের জলমোক্ষণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই কারণগুলি উদ্ভিদের শরৎকালীন পত্র বিমোচনের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত। শরৎকাল হইতেই মৃত্তিকা শুষ্ক হইতে থাকে, তাপের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পায় ও বায়ুর আর্দ্রতা কমিতে থাকে। শীতকালে এই অবস্থাগুলি চরমে পৌঁছায়। শোষণ-ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলমোক্ষণের পথ বন্ধ না করিতে পারিলে গাছের জীবন বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে। গাছ পাতা বাড়াইয়া এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পায়। প্রতিকূল অবস্থায় শোষণ ও মোক্ষণের মধ্যে একটা সমতা বিধান করিয়া মূল ও কাণ্ডকে কোন প্রকারে সঞ্জীবিত রাখিবার ব্যবস্থা করে। কাজেই শরৎকালীন পত্র বিমোচনকে উদ্ভিদের প্রতিকূল অবস্থায় আত্মরক্ষার প্রস্তুতি বলা যাইতে পারে।

পত্রফলক বৃন্ত বা বোঁটার সাহায্যে কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকে। কাণ্ডের রসবাহী নালীসমূহ বৃন্তের কেন্দ্রস্থল দিয়া শিরা-উপশিরায় পত্রফলকের সর্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে। ঐ শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়া কাণ্ড হইতে পত্রের সর্বাংশে রস সঞ্চালিত হয়। পত্রফলকে প্যালিসেড ও স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা নামক দুই প্রকারের তন্তু থাকে। প্যালিসেড কোষগুলি লম্বাটে এবং অধিকাংশ পত্রহরিৎ ইহাদের মধ্যেই অবস্থিত। এই কোষগুলি পাতার উপরিভাগে সারি সারি সজ্জিত থাকে। কোষগুলির প্রাচীর খুবই পাতলা। ইহাদের উপরে অবস্থিত পাতার দৃঢ় বহিরাবরণ বায়ুর প্রত্যক্ষ সংঘাত হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করে। এই প্যালিসেড কোষগুলিই গাছের খাদ্য প্রস্তুতের প্রধান কারখানা। এইসব পত্রকোষকে সক্রিয় রাখিতে নিয়ত প্রচুর জলের সরবরাহ প্রয়োজন। কোষান্তর্বর্তী ফাঁক হইতে কোষগুলি জলের সরবরাহ লাভ করে। শিরা-উপশিরাগুলি কোষান্তর্বর্তী ফাঁকের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া নিয়ত জলের যোগান দিয়া চলে। আবার এইসব কোষে যে খাদ্য গঠিত হয় তাহাও কোষান্তর্বর্তী ফাঁক হইতেই শিরা-উপশিরার পথে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পরিচালিত হয়। কোষান্তর্বর্তী ফাঁকগুলি পাতার নীচের দিকের ষ্টোমেটা নামক বিশেষ ছিদ্রপথের সঙ্গেও সংযুক্ত। ঐ ছিদ্রপথেই বহির্জগতের সঙ্গে উদ্ভিদের গ্যাসীয় আদান-প্রদান ঘটে। উদ্ভিদদেহ হইতে জলও বাষ্পাকারে এই ছিদ্রপথ দিয়াই বাহির হইয়া যায়। শরৎকালের শুষ্ক আবহাওয়ায় যখন উদ্ভিদে জলের অনটন ঘটিতে আরম্ভ করে তখন আত্মরক্ষার উপায় স্বরূপ জল-নিকাশের পথগুলি রুদ্ধ করাই তাহার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। পত্র বিমোচনের দ্বারা গাছের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

শুধু যে কাণ্ডের জল সংরক্ষণের জন্যই উদ্ভিদের পত্র বিমোচন প্রয়োজন হয় এমন নহে। পাতা পুরাতন হইয়া পড়িলে উহার গঠনমূলক কর্মশক্তি হ্রাস পায়। উদ্ভিদের পক্ষে ঐ অকর্মণ্য পত্রের ভার বহন অনাবশ্যক। কাজেই পুরাতন পত্রগুলি ক্রমে ক্রমে ঝরিয়া পড়ে এবং নূতন পাতা বাহির হইয়া তাহাদের কর্মভার গ্রহণ করে। চিরহরিৎ উদ্ভিদের পাতার পরমায়ুও এক বৎসরের অধিক নহে। এইসব গাছেরও পুরাতন পত্রগুলি ক্রমে ক্রমে বিদায় গ্রহণ করে; তবে কোন বিশেষ ঋতুতে গাছ শূন্য করিয়া একযোগে ঝরিয়া পড়ে না।

উদ্ভিদ-পত্র পুরাতন হইয়া পড়িলে তাহার ক্লোরোফিল বা হরিৎ পদার্থের পরিমাণও হ্রাস

পাইতে থাকে এবং উহা ক্রমশঃ লাল বা হলুদ রঙে পরিবর্তিত হয়। পত্রের মধ্যে ক্লোরোফিল ব্যতীত ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিল, অ্যান্থোসায়ানিন নামক অন্যান্য রঞ্জক পদার্থও থাকে। পাতার সতেজ অবস্থায় যখন ক্লোরোফিলের পরিমাণ অধিক থাকে তখন এইসব রঞ্জক পদার্থ আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না, পাতাটিকে গাঢ় সবুজ বর্ণের দেখায়। পুরাতন পত্রে ক্লোরোফিলের পরিমাণ হ্রাস পাইতে থাকিলে অন্য রঞ্জক পদার্থের প্রভাব পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। উদ্ভিদের প্রকারভেদের উপর পত্রের অপর রঞ্জক পদার্থগুলির পরিমাণ নির্ভর করে এবং উহাদের পরিমাণ অনুযায়ী পুরাতন বিভিন্ন বর্ণ লাভ করে। ক্যারোটিনের পরিমাণ অধিক থাকিলে পাতাগুলি হয় হলুদ বর্ণের, আর অ্যান্থোসায়ানিনের পরিমাণ অধিক থাকিলে পাতাগুলি হয় লাল। এই উভয় রঞ্জক পদার্থের বিভিন্নরূপ সংমিশ্রণগত বর্ণচ্ছটাও প্রকারভেদে বিভিন্ন গাছের পাকা পাতায় প্রকাশ পাইয়া থাকে। যে সব গাছে শরৎকালে পাতা ঝরিয়া পড়ে, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রভাবে উহাদের পাতাগুলিতেও এই সময় একযোগে ক্লোরোফিলের পরিমাণ দ্রুত হ্রাস পাইয়া এইরূপ বর্ণচ্ছটা প্রকাশ পায় এবং ইহার ফলে ঐ সব গাছের বন এক নূতন শোভায় মণ্ডিত হইয়া ওঠে।

বৃন্তসমেত পাতাগুলি কাণ্ডের সংযোগস্থল হইতে এমন সহজে খসিয়া আসে, মনে হয় যেন পড়িবার জন্য উহারা অতি আলগাভাবেই বৃক্ষদেহ সংলগ্ন হইয়া অবস্থান করিতেছিল। এতদিন যাহারা ঝড়-বাদলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে আজ বাতাসের মৃদু আন্দোলনেই তাহারা কাণ্ড হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতে থাকে। পাতার এই সহজ স্খলনের প্রস্তুতি অনেক পূর্ব হইতেই আরম্ভ হয়। পত্র বিস্তারের দ্বারাই গাছ তাহার পুষ্টি ও জীবনধারণের শক্তি লাভ করে; আবার পত্রের পূর্ণ গঠন সমাপ্ত হইবার পূর্বেই পাতা অকেজো হইয়া পড়িলে যাহাতে সহজে বর্জিত হইতে পারে, গাছ সেই ব্যবস্থাও করিয়া রাখে। এই কার্য সম্পাদনে বৃন্তের নীচের দিকে, কাণ্ডের সংযোগস্থলের সন্নিকটে সৃষ্টি হয় এক প্রকারের দুর্বল প্রাচীরবিশিষ্ট ক্ষুদ্র কোষের। এই কোষের স্তর বৃন্তের পরিধি হইতে আড়ভাবে ক্রমশঃ কেন্দ্রাবস্থিত রসনালীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই স্তরের ক্রমবিস্তারের ফলেই উহার উভয় দিকের বন্ধনে বিচ্ছেদ রচিত হয়। এই বিচ্ছেদ-স্তর রসনালীকে বিভক্ত করিতে না পারিলেও চতুর্দিক হইতে ইহার চাপে রসনালী প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসে। ইহার ফলে পত্রের রস সরবরাহ হ্রাস পাইতে থাকে। ক্রমশঃ এই স্তরের গভীরতা বৃদ্ধি পাইয়া উহার উভয় দিকের তন্তুর মধ্যে পূর্ণ বিচ্ছেদ আনয়ন করে। অতঃপর এই বিচ্ছেদ-স্তরের কোষের প্রাচীরে ভাঙ্গন আরম্ভ হইয়া কোষগুলি পরস্পর হইতে অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। ইহার ফলে ঐ স্থানটি অতি সহজ-ভঙ্গুর হইয়া থাকে এবং বায়ুর মৃদু আন্দোলনের বেগ সহ্য করিবার শক্তিও থাকে না; এমন কি, এই অবস্থায় পাতার আপন ভারই উহার পতনের পক্ষে যথেষ্ট হয়।

বিচ্ছেদ-স্তর পূর্ণ গঠনের পূর্বে কোন কারণে পাতা ঝরিয়া বা শুকাইয়া গেলে ঐ পাতা গাছে লাগিয়াই থাকে, সহজে পড়ে না। এই বিশেষ কোষের স্তর শুধু পাতার বোঁটায় নয়, ফলের বোঁটায়ও সৃষ্টি হইয়া থাকে। কোন কারণে এই স্তরের গঠন দ্রুত হইলে অকালে ফল ঝরিয়া পড়ে। কোন কোন গাছের কুঁড়িও ঝরিয়া পড়ে; সে স্থলেও এই বিশেষ কোষের স্তর রচিত হইতে দেখা যায়।

ফলের অকাল পতন নিবারণে অক্সিন প্রয়োগের ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। অক্সিন প্রয়োগে বিচ্ছেদ-স্তরের গঠন বাধাপ্রাপ্ত বা বিলম্বিত হওয়ায় ফলের অকাল-পতন নিবারিত হয় বলিয়া জানা গিয়াছে।

জল সিঞ্চনেও বিচ্ছেদ-স্তরের গঠন বিলম্বিত হইতে পারে। শরৎকালে অধিক বৃষ্টিপাত হইলে পত্র বিমোচন বিলম্বে আরম্ভ হয়। এইরূপ শরৎকালে কৃত্রিম আলোর সাহায্যে দিবাভাগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে বিচ্ছেদ-স্তরের গঠন বাধাপ্রাপ্ত হয় ও বিলম্বে পত্র বিমোচন ঘটে। দিবাভাগের হ্রস্বতাও শরৎ-কালের পত্র বিমোচনের একটি কারণ।

পত্রকে বিচ্ছিন্ন করিবার ব্যবস্থা করিয়াই উদ্ভিদ ক্ষান্ত হয় না। ক্ষতস্থানের তন্তু যাহাতে উন্মুক্ত না থাকে সেই জন্য বিচ্ছেদ-স্তরের নীচেই সোলাকোষ দ্বারা গঠিত একপ্রকার সংরক্ষক স্তরের সৃষ্টি করে। পত্রস্খলনের পর এই সংরক্ষক স্তরটি ক্ষতস্থানকে আবৃত রাখিয়া ঐ স্থান হইতে জলের অপচয় নিবারণ করে এবং ঐ স্থানকে রোগসংক্রমণ হইতে মুক্ত রাখে। বিচ্ছিন্ন রসনালীর মুখে একপ্রকার বিশেষ কোষের সৃষ্টি হইয়া রস নির্গমের পথ রুদ্ধ করে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, পত্রস্খলনের পরে ক্ষতস্থানটিকে বেশ আঁটিয়া বন্ধ করিবার ব্যবস্থাটিও উদ্ভিদ খুব নিখুঁতভাবেই সম্পন্ন করিয়া থাকে।

শরৎকালে পাতা ঝরিবার পূর্বে পত্রাবস্থিত অজৈব উপাদানের অধিকাংশই কাণ্ডাংশে সঞ্চালিত হইয়া যায়। নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস, পটাসিয়াম, ম্যাগ্‌নেশিয়াম, লৌহ ইত্যাদি—উদ্ভিদের গঠন ক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট এই অতীব প্রয়োজনীয় উপাদান-সমূহের কোন কোনটি পত্রাবস্থিত পরিমাণের শতকরা ৯০ ভাগ পর্যন্তও কাণ্ডাংশে সঞ্চালিত হইতে পারে বলিয়া জানা গিয়াছে। পত্রের গঠন-মূলক কার্যের জন্য এই সকল পদার্থগুলি কাণ্ড হইতেই সরবরাহ হয়। বিদায়ের পূর্বে পাতাগুলি যেন তাহাদের সঞ্চয় মূল ভাণ্ডারে জমা দিয়া শেষ কর্তব্য সম্পাদন করে; অথবা গাছগুলিই যেন পত্র বিমোচনের সময় হইলে উহাদিগকে অন্তঃসার-শূন্য করিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকে।
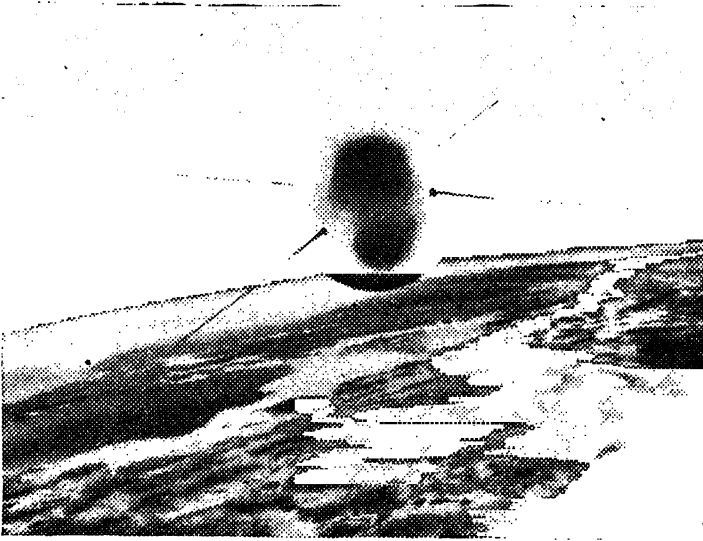
দক্ষিণ-পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর মেক্সিকোর ফটোর উপর অঙ্কিত পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহের কল্পনাচিত্র। ২০০ থেকে ১৫০০ মাইল ঊর্ধ্বে এরূপ কৃত্রিম উপগ্রহ ঘণ্টায় ১৮,০০০ থেকে ১৯,০০০ মাইল বেগে পরিভ্রমণ করবে এবং বেতার সঙ্কেতের দ্বারা উচ্চ আবহমণ্ডলের সংবাদ পৃথিবীতে প্রেরিত হবে।

ব্রণ

শ্রীদীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়

প্রকৃতির নিয়ম এমনই যে, যে বয়সে মসৃণ কমনীয় ত্বকের প্রাধান্যই জীবনের অন্যতম সম্পদ বলে তরুণ-তরুণীরা মনে করেন, সেই বয়সেই তাদের ত্বকের উপরে দেখা দেয় ছোট ছোট ব্রণ। এই সব ব্রণ অবশ্য বেশীর ভাগ সময়েই বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমে যায়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই মুখের উপরে দাগ রেখে যায়। এ দাগ যে শুধু ছেলেমেয়েদের মুখের উপরেই থাকে তা নয়, তাদের মনের ভিতরেও হীনমন্যতার আভাস রেখে যায়। এর ফলে তারা ক্রমে ক্রমে অসামাজিক হয়ে পড়ে। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে খুব কম লোকই এই ব্রণের হাত থেকে রেহাই পায়। তবুও অনেকেরই ব্রণ ওঠবার কারণ সম্বন্ধে একটা হীন ধারণা আছে।

এতদিন আমাদের ধারণা ছিল যে, ব্রণ যেমন আপনা থেকেই ওঠে তেমনি আপনা থেকেই মিলিয়ে যায়, কোন ওষুধেই সারে না। বৈজ্ঞানিক-দের, বিশেষ করে কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির একদল কর্মীর চেষ্টায় প্রমাণিত হয়েছে যে, আপনা থেকে মিলিয়ে যাবার আগে ব্রণ সারানো যায় এবং বিশ্রী ক্ষতের হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়।

ব্রণ কেন হয় তা জানতে হলে আমাদের ত্বকের গঠন সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা থাকা দরকার। ত্বকের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য স্বেদগ্রন্থি। এদের কাজ হচ্ছে, ঘামের আকারে শরীর থেকে লবণ ও জল বের করে দেওয়া। এছাড়া আরও এক রকমের গ্রন্থি রয়েছে ত্বকের মধ্যে। এদের বলে সিবেসাস গ্রন্থি। এই গ্রন্থিগুলি সাধারণতঃ লোমকূপের আশেপাশে থাকে। এসব গ্রন্থি থেকে যে রস নির্গত হয় তাকে বলে সিবাম। এই সিবামে প্রধানতঃ চর্বি ও মোমজাতীয় পদার্থ থাকে। এসব গ্রন্থির বহির্মুখ কোনও কারণে বন্ধ হয়ে গেলে ব্রণ দেখা দেয়।

এখন দেখা যাক, একটা বিশেষ বয়সে ব্রণ বেরোয় কেন? কৈশোর এবং যৌবনের সন্ধি-ক্ষণে আমাদের শরীরের মধ্যে হর্মোন বা উত্তেজক রসের জন্যে অনেক পরিবর্তন আসে। এই সময় রক্তে ইস্ট্রোজেন অপেক্ষা এণ্ড্রোজেনের পরিমাণ আনুপাতিক হারে অনেক বেশী থাকলে ব্রণ হয়। এণ্ড্রোজেন পুং উত্তেজক রস হলেও মেয়েদের ডিম্বাশয়ে কিয়ৎপরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং ইস্ট্রোজেন প্রধানতঃ নারীদেহের রস হলেও পুরুষের অণ্ডকোষে অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এণ্ড্রোজেনের প্রভাবে লোমকূপের চারপাশের সিবেসাস গ্রন্থির উৎপন্ন রস বেড়ে যায় এবং দেখা গেছে যে, মুখের গ্রন্থিগুলিকেই এণ্ড্রোজেন বেশী প্রভাবান্বিত করে। এসব গ্রন্থিজাত স্নেহ ও মোমজাতীয় পদার্থ তকের উপরকার ময়লার সঙ্গে মিশে লোমকূপ বন্ধ করে দেয় এবং এর ফলে গ্রন্থিরস আর বেরুতে পারে না। এসব ময়লা জায়গায় জীবাণু সংক্রমণ হতে খুব বেশী দেরী হয় না এবং একবার সংক্রমণ হলে অবশ্য ক্ষতচিহ্নের হাত থেকে রেহাই পাওয়া দুষ্কর।

উত্তেজক রসের অসংগতা ব্রণের প্রধান ও প্রত্যক্ষ কারণ হলেও অনেকগুলি গৌণ কারণের উপর ব্রণের কম বা বেশী ওঠা নির্ভর করে। সাবান কম মাখা, বেশী প্রসাধন করা, শ্বেতসার ও চর্বি জাতীয় খাদ্য, বিশেষ করে খুব বেশী চকোলেট খাওয়া এবং বাজে চিন্তা করা—এসবই ব্রণ বেরোতে সাহায্য করে।

ব্রণ সারাতে হলে প্রথমেই যত্ন নিতে হবে যাতে ব্রণ খোঁটা না হয়। এছাড়া পূর্বোল্লিখিত পরোক্ষ কারণগুলির দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। ব্রণ উঠলে দিনের মধ্যে তিন-চারবার সাবান দিয়ে মুখ ধোয়া দরকার। ঘুমাবার আগে মুখে সাবান দিয়ে একটা মলমও লাগানো যেতে পারে। এতে থাকবে পাঁচ গ্রেন রেসরসিনল, ১০ গ্রেন স্যালিসিলিক অ্যাসিড এবং এক আউন্স ভেসেলীন। এই মলমটা পরপর তিন দিন লাগানোর পর একদিন বিশ্রাম দিতে হবে। এভাবে ৬ দফা লাগাতে হবে। এতে যদি না কমে তবে এর চিকিৎসা নিজেদের হাতে না রেখে কোনও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই ভাল।

এখন দেখা যাক, আধুনিক বিজ্ঞানের হাতে ব্রণের আর কি কি চিকিৎসা আছে। এদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে—আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি ও রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে চিকিৎসা। আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মির দ্বারা চিকিৎসার ফলের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে এখনও সন্দেহ আছে; তবে রঞ্জেন রশ্মি-চিকিৎসার সফলতা সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। রঞ্জেন রশ্মির চিকিৎসায় ত্বকের কোষগুলির কার্যক্ষমতা বন্ধ হয়ে যায় এবং সিবামও উৎপন্ন হতে পারে না। তবে অভিজ্ঞ লোক দিয়ে এই চিকিৎসা না করালে মুখ কালো হয়ে যেতে পারে।

স্ত্রী-হর্মোন ইষ্ট্রোজেন দিয়ে চিকিৎসার ফলেও ব্রণ কমে যায়। আগেই বলা হয়েছে যে, এণ্ড্রোজেন আধিক্যের ফলে ব্রণ হয়। শরীরে যদি ইষ্ট্রোজেন ইনজেকশন দেওয়া যায় তবে হর্মোন সমতা আবার ফিরে আসে। তবে এই চিকিৎসা করবার সময় কতকগুলি বিষয়ের দিকে খুবই নজর দেওয়া দরকার। মেয়েদের মাসিকের সময় এই চিকিৎসা বন্ধ রাখা দরকার; আর ছেলেদের বেলায় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এই ইনজেকশনের ফলে তাদের দেহে নারীত্বের কোন বিকাশ হচ্ছে কি না।

এত রকম চিকিৎসা-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পরেও দেখা গেল যে, অনেকেরই ব্রণ সম্পূর্ণভাবে সারছে না। তাদের বেলায় জীবাণু সংক্রমণ হয়েছে বুঝতে হবে। আমাদের ত্বকের উপরে অনেক জীবাণু আছে। সাধারণ অবস্থায় এরা আমাদের কোন ক্ষতি করে না; কিন্তু ব্রণ উৎপত্তির ফলে ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস শ্রেণীর জীবাণুরা লোম-কূপের মধ্যে আটকে যায় এবং তখন তাদের অনিষ্টকারী রূপ দেখা দেয়। এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসা হয় অ্যান্টিবায়োটিক্স্ দিয়ে; যেমন—টেট্রাসাইক্লিন, ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন, ক্লোরোমাইসিটিন ইত্যাদি। যদি ত্বকের উপরে একটি বিশেষ জায়গায় একটার পর একটা ব্রণ ওঠে তবে সেখানে পেনিসিলিন ইনজেকশনে অনেক ক্ষেত্রেই সুফল পাওয়া যায়।

আধুনিক বিজ্ঞানের শেষ অস্ত্র হচ্ছে ত্বক স্থানান্তরকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা চিকিৎসা। এতে মুখের উপরে আর কোনও ক্ষত থাকে না। এই হলো ত্বকের সৌন্দর্য ও মসৃণতা রক্ষায় সফলতার অন্যতম সহায়ক।

মহাশূন্যে অভিযান

শ্রীকরুণাময় দাশ

অদূর ভবিষ্যতে একদিন হয়তো অন্ধকার আকাশের দিকচক্রবালে তাকিয়ে দেখতে পাব—একটি ছোট আলোকিত গোলক আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে বিপুল বেগে ছুটে চলেছে। স্তব্ধ-বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখবো—মহাশূন্য অভিযানে মানুষের প্রথম পদক্ষেপ। মানুষের এই মহাশূন্য অভিযানের প্রচেষ্টা আণবিক বিস্ফোরণের মত চাঞ্চল্যকর না হতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই প্রচেষ্টা মানুষের অগ্রগতির সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

মানুষের তৈরী এই কৃত্রিম উপগ্রহ মানুষের মহাশূন্যে অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহে অভিযানের জন্যে প্রয়োজনীয় নানা তথ্য এনে দেবে। আমরা সেই দিনটির জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকবো—যেদিন মানুষের চাঁদে যাবার কল্পনা ছেলেভুলানো ছড়া থেকে সত্যে পরিণত হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই অনুষ্ঠানে অগ্রণী হয়েছে। অবশ্য অন্যান্য দেশও চুপচাপ বসে নেই। সোভিয়েটও এই অনুষ্ঠানে হাত দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে যে, ১৯৫৮ সালের মধ্যেই তারা অন্ততঃ দশটি নকল উপগ্রহ মহাশূন্যে নিক্ষেপ করবে। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খরচ হবে প্রায় ১০ কোটি ডলার।

এই নকল উপগ্রহের আকার, আয়তন, কোন্ শক্তি দ্বারা চালিত হবে এবং কোন্ কোন্ যন্ত্র এতে সন্নিবিষ্ট হবে, সেসব এখনও সঠিক বলা যায় না। এ নিয়ে এখন নানারকম গবেষণা চলছে। বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনীয়ার ও বিশেষজ্ঞেরা এ নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। অতীতের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং নানা গবেষণা থেকে তাঁরা মোটামুটি একটা ধারণা করতে সক্ষম হয়েছেন। এর আগেও কয়েকবার তাঁরা শূন্যপথে প্রায় ২৪২ মাইল উচ্চতায় নানা যন্ত্র সন্নিবিষ্ট রকেট পাঠাতে সক্ষম হয়েছেন এবং বৈদ্যুতিক ও বেতার যন্ত্রের সাহায্যে মহাশূন্যের নানা প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

সম্ভবতঃ এই নকল উপগ্রহ রকেটের সাহায্যে আকাশপথে যাত্রা করবে। শক্তির খরচ কমাবার জন্যে এবং গতিবেগ বাড়াবার জন্যে একটি তিন পর্যায়ের রকেট ব্যবহার করা হবে। রকেট-চালিত এই কৃত্রিম উপগ্রহ শূন্যে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর রকেটগুলি মাটিতে নেমে আসবে। নকল উপগ্রহের আয়তন নির্ভর করবে তৃতীয় পর্যায়ের রকেটের (যে রকেটের সাহায্যে গোলকটি একটি সঠিক কক্ষপথে নিক্ষিপ্ত হবে) অগ্রভাগের ব্যাসের উপর। তবে হয়তো এর ব্যাস ২০ ইঞ্চির মত হতে পারে। এর চেয়ে ছোট হলে এতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সন্নিবিষ্ট করা সম্ভব হবে না। দূরবীক্ষণ ও রেডার যন্ত্র ছাড়া গোলকটি দেখা যাবে না।

এই নকল উপগ্রহের আকৃতি গোলাকার হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, এটাই বিজ্ঞানসম্মত বলে বিজ্ঞানীদের অভিমত। আর একটি বিশেষ কারণ এই যে, গোলকটি যে ভাবে যে দিকেই ঘুরুক না কেন, গতির দিকে তার আকৃতি সব সময় একই থাকবে এবং এর ফলে বিজ্ঞানীরা গোলকটির উপর বায়ুর প্রতিক্রিয়া সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারবেন। এর ফলাফল হয়তো ভবিষ্যতে বিমান ও শূন্য পরিভ্রমণকারী যানের আকারে এক বিবর্তন এনে দেবে। বিভিন্ন যন্ত্র-সন্নিবিষ্ট (যার ওজন হবে প্রায় ১০½ পাউণ্ড) এই গোলকটিকে হাল্‌কা করবার

জন্যে এর বাইরের আবরণ অ্যালুমিনিয়াম অথবা প্লাষ্টিক দিয়ে তৈরী করা হবে। সব নিয়ে ওজন হবে প্রায় ৩০ পাউণ্ড। গোলকটির ওজনের উপর অনেক কিছুই নির্ভর করবে। তার কারণ, একে নিক্ষেপ করতে হবে আকাশে ৩০০ মাইলের উর্ধ্বে এবং যখন এই গোলকটি পৃথিবী পরিক্রমা করতে থাকবে, তখন তার গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ১৮০০০ মাইলের কাছাকাছি। হিসেব করে দেখা গেছে, মাত্র এক পাউণ্ড ওজন বেশী হলে অন্ততঃ ৩০০ পাউণ্ড জ্বালানী বেশী খরচ হবে। তাই ওজন যাতে বেশী না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করবার জন্যে কৃত্রিম গোলকটির ভিতরে অনেকগুলি যন্ত্র সন্নিবিষ্ট করা হবে। গোলকটিকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় (কারণ, নির্দিষ্ট সময় শূন্যে অবস্থানের পর, যা দু-সপ্তাহ থেকে এক বছর কাল অনুমান করা হয়েছে) গোলকটি আকাশপথে নামবার সময় বায়ুস্তরের সঙ্গে সংঘর্ষে উল্কাপিণ্ডের মত জ্বলে নিঃশেষিত হয়ে যাবে। সংগৃহীত বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি স্বয়ংক্রিয় বেতার যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হবে। এসব বৈদ্যুতিক যন্ত্রের জন্যে যে তড়িৎ-শক্তির প্রয়োজন হবে, তা একটি বিশেষ ব্যাটারী থেকে পাওয়া যাবে। ব্যাটারীতে যে শক্তি সঞ্চিত হবে তা ১৫ দিনের জন্যে যথেষ্ট হবে বলে আশা করা যায়।

যদিও এই যন্ত্রের কাজ চলবে মাত্র দিন পনেরোর জন্যে; তবুও নকল উপগ্রহটি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে আনুমানিক এক বছর ধরে। তখন বৈজ্ঞানিকেরা মহাকাশে এর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করবেন—দূরবীক্ষণ ও রেডার যন্ত্রের সাহায্যে। এতে হয়তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি পাওয়া যেতে পারে।

সম্প্রতি আমেরিকার জনসাধারণকে এই পরিকল্পনার একটা মোটামুটি ধারণা দেবার জন্যে একটি চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই পরিকল্পনার উদ্যোক্তা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-গবেষণা বিভাগ। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে জ্যোতিবিদ ও বৈজ্ঞানিকেরা এর গতিবিধি দূরবীক্ষণ ও অন্যান্য যন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ্য করবেন। তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে পরমাণু মণ্ডল, রঞ্জেন রশ্মি, অতিবেগুনী রশ্মি, মহাজাগতিক রশ্মি এবং আমাদের বায়ুস্তরের পরপারের ক্ষুদ্র উল্কাপিণ্ড (Micrometeorites) সম্বন্ধে এমন বহু অজানা তথ্য সংগ্রহ করা যাবে, যা হয়তো আমাদের মহাশূন্যে পাড়ি দেওয়ার পথ নির্দেশ করে দেবে।

মানুষ চিরদিন কল্পনাবিলাসী। শুধু তাই নয়, সে স্বভাবতঃ অতৃপ্ত। ইচ্ছার প্রেরণায় বৈচিত্র্যই তার কাম্য। চিরদিনের আশা, মানুষ অদম্য অপরাজেয় হবে। তাই প্রকৃতির বিরুদ্ধে তার এই সদর্প যুদ্ধ ঘোষণা।

বিজ্ঞান সংবাদ

রাশিয়ায় সৌরশক্তি সংগ্রহের কেন্দ্র নির্মাণ

মস্কোর ক্রজিনাভস্কি পাওয়ার ইনষ্টিটিউটের এক খবরে প্রকাশ, সূর্যরশ্মি হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া ব্যাপকভাবে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী অতিকায় যন্ত্র শীঘ্রই রাশিয়ার আর্মেনিয়া অঞ্চলে স্থাপন করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে শত শত আয়না এবং নানাপ্রকার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের নির্মাণকার্য চলিতেছে।

তুরস্কের সীমান্তের অনতিদূরে অবস্থিত আরারাট পর্বতের নিকটবর্তী সমতল ভূমিতে সৌরশক্তি সংগ্রহকারী এই অতিকায় যন্ত্রটি স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বহুদিক হইতে বিচার করিয়া এই স্থানটি উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। আরারাটের সমতলভূমি মরুভূমির পর্যায়ে পড়ে। এখানে সেচের সাহায্যে কৃষিকার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। সারা বৎসর ঐ অঞ্চলে ২৬০০ ঘণ্টা সূর্যরশ্মি পতিত হয়। সূর্যরশ্মির পক্ষে এরূপ অনুকূল স্থান রাশিয়াতে আর নাই। এখানে প্রতি বর্গগজে বৎসরে বিশ লক্ষ ক্যালোরি সূর্যতাপ পতিত হয়।

আরারাট পর্বতের নিকটবর্তী আজারবাইজানের অন্তর্গত বাকু অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে তৈল পাওয়া যায়। অদূরে জর্জিয়াতে কয়লার খনি রহিয়াছে। ককেসাস অঞ্চলের দ্রুতগামী স্রোতস্বতী হইতে প্রভূত পরিমাণে তাপশক্তিও উৎপন্ন হইয়া থাকে। পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন করিবার সুযোগও এখানে আছে। এতগুলি শক্তি-উৎস থাকা সত্ত্বেও সূর্যরশ্মি হইতে শক্তি উৎপাদনের প্রচেষ্টায় রাশিয়ানরা পরাঙ্মুখ নহে। ইহার কারণ তাঁহারা বলেন যে, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন অপেক্ষা ইহাতে খরচ অনেক কম। রাশিয়ায় যে সমস্ত অঞ্চল কয়লা, তৈল ও জল-শক্তির উৎপাদন ক্ষেত্র হইতে বহুদূরে অবস্থিত, সেই সকল স্থানে এই ব্যবস্থা প্রচলন করিবার পথপ্রদর্শক হিসাবে এই পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হইয়াছে।

আরারাট অঞ্চলে ১২৪ একর ভূমির উপর এই সূর্যশক্তি কেন্দ্রটি স্থাপিত হইবে। এই ষ্টেশনটির দৃশ্যও হইবে বিচিত্র। অন্যান্য শক্তি-উৎপাদন ক্ষেত্রের ন্যায় এখানে গগনস্পর্শী চিমনীর শ্রেণী থাকিবে না বা জল-শক্তি উৎপাদন ক্ষেত্রের ন্যায় অতিকায় বাঁধও থাকিবে না।

সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ইহার যে নক্সা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়—প্রায় আধমাইল ব্যাসবিশিষ্ট একটি বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে ১৩১ ফুট উচ্চ একটি বুরুজ রহিয়াছে। বুরুজের উপরিভাগে একটি ঘূর্ণায়মান ষ্টীম বয়েলার স্থাপিত আছে। সূর্যের উত্তাপের দ্বারা ঐ জল ফুটিয়া উঠিলে উহা হইতে প্রতি ইঞ্চিতে প্রায় ৪৪০ পাউণ্ড চাপের বাষ্প উৎপন্ন হইবে। ঐ বাষ্প পাইপের মধ্য দিয়া ১২০০ কিলোওয়াট টার্বাইনের ভিতর প্রবেশ করানো হইবে।

তেইশটি রেল লাইন বৃত্তাকারে বুরুজটির চারিদিকে বসান আছে। ঐ লাইনগুলির উপর দিয়া তেইশখানি ট্রেন স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় বুরুজটির চারিদিকে বৃত্তাকারে ঘুরিতে থাকিবে। ট্রেনগুলির উপর মোট ১২৯৩ খানি আয়না এমনভাবে বসানো আছে যে, উহা হইতে সকল অবস্থাতেই সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া বুরুজের উপরে অবস্থিত ঘূর্ণায়মান জলের ট্যাঙ্কের উপর পড়িতে থাকিবে। এই সকল প্রক্রিয়া সূর্যরশ্মির উত্তাপের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই চলিতে থাকিবে।

বৃত্তাকারে স্থাপিত লৌহবস্তুগুলির চারিদিকে ঘনসন্নিবিষ্ট করিয়া বৃক্ষ রোপণ করা হইবে। ইহাতে ধূলি অনেকাংশে নিবারিত হইবে; কাজেই আয়নাগুলির কলুষিত হইবার সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে। আয়নাগুলির মোট আয়তন হইল ২৪০০০ বর্গফুট। এই ষ্টেশনের উত্তাপোৎপন্ন ব্যাটারীটি হইল ২৫০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন। সমগ্র ষ্টেশনটি হইতে বৎসরে ২,৫০০,০০০ কিলোওয়াট আওয়ার শক্তি পাওয়া যাইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা আর্মেনিয়া অঞ্চলে সূর্যরশ্মির প্রখরতা বেশী বটে, কিন্তু কেবলমাত্র ঐ কারণেই স্থানটি যে সৌর-শক্তি উৎপাদনের কেন্দ্র হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছে তাহা নহে। সূর্যরশ্মি হইতে সংহত উত্তাপকে সরাসরি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিবার পক্ষেও ঐ স্থানটি বিশেষ উপযোগী। স্থানীয় একটি লাভ-জনক কাজে সূর্যশক্তি নিয়োগ করিবার প্রয়োজনও ঐ অঞ্চলে রহিয়াছে। আর্মেনিয়ার একাংশ জলা-ভূমি এবং অপরাংশ জলের অভাবে শুষ্ক। সূর্য-রশ্মির উত্তাপে চালিত পাম্পের সাহায্যে জলা-ভূমির জল শোষণ করিয়া শুষ্ক অঞ্চলে প্রেরিত হইতে থাকিবে। ইহার ফলে দুইটি অঞ্চলেই কৃষিকার্যের উন্নয়নে বিশেষ সুবিধা হইবে এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের মোট আবাদী জমির আয়তন বৃদ্ধি পাইবে। টার্বাইনের উদ্বৃত্ত বাষ্পের সাহায্যে বরফ প্রস্তুত করা হইবে। ঐ অঞ্চলে বরফেরও বিশেষ চাহিদা রহিয়াছে।

পরিকল্পনাকারী বিজ্ঞানীরা বলেন যে, কেবল মাত্র দিনের বেলাতেই সূর্যশক্তি কেন্দ্রটি কার্যকরী হইবে। রাত্রিতে বা মেঘলা দিনে ইহার কাজ স্থগিত থাকিবে। তবে মেঘলা আকাশ বা বৃষ্টিপাত ঐ অঞ্চলে খুবই কম।

মেঘলা বা বৃষ্টির দিনে সৌরতেজের অল্পতায় এবং রাত্রিকালে উহার সম্পূর্ণ অভাবেও যাহাতে ষ্টেশনের কাজ বন্ধ না থাকে তাহার জন্য অতি সহজ এক পরিকল্পনা সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা প্রকাশ করিয়াছেন। অতিকায় থার্মোস বোতলের ন্যায় উত্তাপ সংরক্ষক বহুসংখ্যক বিশেষ ধরণের পাত্র মাটির নীচে সংস্থাপিত হইবে। দিনমানে সূর্যের উত্তাপ ব্যাহত হইলে রাত্রিকালে পাত্রের সংরক্ষিত উত্তপ্ত জলের সাহায্যে ষ্টেশনের কাজ চালু রাখা হইবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সৌরতেজ সংহত করিয়া ব্যবহার করিবার কাজে প্রথম উল্লেখযোগ্য সাফল্যের সংবাদ সোভিয়েট রাশিয়া হইতে প্রকাশিত হয়। কৃজিনাভস্কি ইনষ্টিটিউটের ডাঃ মোলেরো প্রমুখ কতিপয় বিজ্ঞানী সৌরতেজ সংহত করিয়া উহার সাহায্যে লৌহ দ্রবীভূত করিতে সক্ষম হন। পরে ঐ ইনষ্টিটিউটের বিজ্ঞানকর্মীরা আরও পরীক্ষা চালাইয়া যাইতে থাকেন। বর্তমানে তাঁহারা বলেন যে, কেবলমাত্র পরীক্ষাক্ষেত্রে নহে, সরাসরি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সৌর-তেজ সংহত করিয়া ব্যবহার করিবার কৌশল তাঁহারা এমনভাবেই আয়ত্ত করিয়াছেন যে, আমেরিকান বা অন্যান্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা এখনও তত দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তবে জানা গিয়াছে, এই কাজে যে প্যারাবোলিক-সিলিনড্রিক্যাল আয়না সোভিয়েট রাশিয়ায় ব্যবহৃত হইতেছে তাহা প্রথম আমেরিকায় স্মিথসোনিয়ান ইনষ্টিটিউটের ডাঃ সি. জি. অ্যাবট্ উদ্ভাবন করেন।

সম্প্রতি রাশিয়া হইতে আরও প্রকাশিত হইয়াছে যে, তাঁহারা অচিরেই বিশেষ কৌশলে টার্বাইন বা ষ্টীম ইঞ্জিনের সাহায্য না লইয়া সৌর-তেজ হইতে সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপাদন করিবার উপযোগী একটি কেন্দ্র নির্মাণ করিতে সক্ষম হইবেন। তাঁহারা বলেন, এখন পর্যন্ত অন্যান্য দেশে যে সব সৌরশক্তি-চালিত বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলির কার্যকারিতা ২ হইতে ৩ ওয়াট পর্যন্ত। ইহার কারণ এই যে, থার্মো-এলিমেন্টগুলি

অতিশয় ক্ষীণ। কিন্তু সোভিয়েট দেশে প্রস্তুত সৌর-বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্রগুলির কোনটি ৪০ ওয়াটের কম নহে।

কৃজিনাভস্কি ইনষ্টিটিটের অপর একটি প্রচেষ্টা হইল সৌর-চুল্লী নির্মাণ করা। শুনা যায় যে, ১৯৫১ সালে সর্বপ্রথম যে নমুনা চুল্লী নির্মিত হয় তাহা ৪-৫ জনের খাদ্য রন্ধন করিবার উপযোগী এবং উহা সহজে বহন করা যায়। রাষ্ট্রীয় অপ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটে নির্মিত সৌর-চুল্লীর নাম দেওয়া হইয়াছে 'সান কিচেন স্থটকেশ'। রান্নার পর উহাকে মুড়িয়া ফেলিলে একটি স্থটকেশের মতই দেখিতে হয় এবং উহা একজনে হাতে করিয়া বহন করিবার উপযোগী। রাশিয়ার সৌরশক্তি বিজ্ঞানীরা মধ্য-এশিয়ায় অভিযানের সময় ঐ ধরণের চুল্লী লইয়া যান এবং প্রয়োজনমত উহার সাহায্যে চা ও খাদ্য প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

ইনষ্টিউটের একজন কর্মী তাঁহার মস্কোস্থিত একটি কক্ষে ঐ ধরণের একটি যন্ত্র বরফ প্রস্তুতের কাজে ব্যবহার করিয়াছিলেন। ঐ যন্ত্রটি ৫০০ ওয়াট শক্তিসম্পন্ন ছিল। কর্মীটি নাকি মাত্র ১২০ ওয়াট ব্যবহার করিবার পর বাকীটুকু অ্যাকুমুলেটরের মধ্যে রাখিয়া দিতেন। রাত্রে এবং মেঘলা দিনে ঐ অ্যাকুমুলেটর হইতে বরফ উৎপাদনের শক্তি সরবরাহ হইত। যন্ত্রটির মধ্যে সোডিয়াম ধাতু প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। সে যাহাই হউক, সোভিয়েট রাশিয়ায় এই পর্যন্ত ব্যাপকভাবে সৌর-চুল্লী নির্মিত হইবার কথা শুনা যায় নাই।

উৎসাহী রাশিয়ানেরা বৈদেশিক উদাহরণ দিয়া দেশের লোকের কাছে বলিয়া থাকেন—ভারতবর্ষে এবং ইউনাইটেড ষ্টেট্সে অনেক দিন পূর্বেই সৌর-শক্তি সংগ্রহের কেন্দ্র নির্মিত হইয়াছে এবং জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে সৌর-চুল্লী ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, রাশিয়াতে এখনও ঐরূপ সৌর-চুল্লী নির্মাণ করিবার কোন উদ্যম দেখা যাইতেছে না।

ইহার কারণ হইল এই যে, সোভিয়েট নীতি অনুযায়ী কোন বৃহৎ পরিকল্পনা রূপায়িত করিবার জন্য ছোট কাজ স্থগিত রাখা হয়। বুনিয়াদি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি গঠন করিবার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থ অগ্রাহ্য করা হইয়া থাকে। এই নীতির সহিত ভারতবর্ষের নীতির অনেকটা মিল রহিয়াছে।

অনেকেই ছোটখাটো সৌর-চুল্লী নির্মাণের চেষ্টা স্থগিত রাখিয়া আরারাটের মরু অঞ্চলে রাশিয়ানদের দ্বারা নির্মিত সর্বপ্রথম অতিকায় সৌর পাওয়ার হাউস দেখিবার অপেক্ষায় আছেন।

মস্তিষ্কে রেডিও যন্ত্র সংযোগে আজ্ঞাবাহী কলের মানুষ নির্মাণ

সিকাগোর ন্যাশন্যাল ইলেকট্রনিক কনফারেন্সের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, মস্তিষ্কের ভিতরে সূক্ষ্ম রেডিও গ্রাহক যন্ত্র সন্নিবেশিত করিয়া মানুষকে চিন্তাশূন্য স্বাধীন কলের মানুষে রূপান্তরিত করা সম্ভব। এইরূপ প্রক্রিয়াকে বায়োকণ্ট্রোল বলা হয়। এই ব্যবস্থায় কোন একটি অঞ্চলের অধিবাসীকে আজ্ঞাবাহী দাসে পরিণত করা যাইতে পারে। কারণ উহারা কেহই আর স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে পারিবে না।

মিঃ শাফার নামক মিলফোর্ডের একজন ইঞ্জিনিয়ার ঐ সভায় বলেন, বায়োকণ্ট্রোল সম্বন্ধে বহু গবেষণা চলিতেছে। এই ব্যবস্থায় মানবদেহের কেন্দ্রীয় স্নায়ুর মধ্যে কতকগুলি বৈদ্যুতিক সংকেত অনুপ্রবেশ করাইয়া দিবার ফলে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন, চিন্তা এবং মনের আবেগের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি সমস্তই কলের মত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

মিঃ শাফারের মতে, কোন বিজেতা জাতি শল্যচিকিৎসক নিয়োগ করিয়া বিজিত জাতির প্রত্যেক শিশুর (জন্মের কয়েক মাস পরেই) মস্তিষ্কের বিশেষ অংশে কয়েকটি তার প্রোথিত করিয়া দিবে এবং ঐ তারের বাহিরের দিকের

প্রান্তগুলি মাথার ত্বকের নীচে সন্নিবেশিত একটি সকেটের সহিত সংযুক্ত থাকিবে। কয়েক বৎসর পরে ঐ সকেটটিতে একটি ক্ষুদ্রকায় রেডিও গ্রাহক যন্ত্র সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। তখন হইতে ঐ শিশুটি বায়োইলেকট্রিক সংকেতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকিবে।

বায়োকণ্ট্রোল সম্বন্ধে মিঃ শাফার প্রকাশ করেন যে, ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানীরা করোটিতে ছিদ্র করিয়া উহার মধ্য দিয়া মস্তিষ্কের ভিতর ইলেকট্রোড প্রবেশ করাইয়া মস্তিষ্কের রোগীদের রোগ পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। দেখা গিয়াছে, ইহাতে রোগী কোনরূপ কষ্ট অনুভব করে না এবং কয়েক মাস যাবৎ ইলেকট্রোডগুলি প্রোথিত থাকিলেও মস্তিষ্কের তন্তুগুলির কোন ক্ষতি হয় না।

জন্তুদের উপর পরীক্ষায় আরও অধিক দূর অগ্রসর হওয়া গিয়াছে। ইঁদুরের মস্তিষ্কে ইলেকট্রোড সন্নিবেশিত করিয়া কতকগুলি বিষয়ে উহাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হইয়াছে; যেমন—যেখানে ভীত হইবার কোন কারণ নাই বৈদ্যুতিক সংকেতের দ্বারা উাহারা সেখানে ভীত হইয়া পড়ে। আবার ক্ষুধার সময়ে খাদ্যদ্রব্যের নিকটে না যাইয়া বায়োকণ্ট্রোলের ফলে কেবল আঘাত পাইবার জন্য বৈদ্যুতিক তারের উপর পড়িয়া শক খাইতে থাকে।

চৌম্বক রেফ্রিজারেটর

কেম্ব্রিজের এক গবেষণাগারে নূতন ধরণের এক রেফ্রিজারেটর উদ্ভাবিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। নিম্নতাপ উৎপাদনে ইহা প্রচলিত সমস্ত রেফ্রিজারেটরকে অতিক্রম করিয়াছে। বিজ্ঞানীরা সর্বনিম্ন তাপের যে সীমা নির্ধারণ করিয়াছেন (-২৭৩°C), এই রেফ্রিজারেটরে প্রায় উহার নিকটবর্তী নিম্নতাপ উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পৃথিবীর আবহাওয়ার বাহিরে মহাশূন্যের তাপ অপেক্ষা নিম্নতর তাপ এই রেফ্রিজারেটরের অভ্যন্তরে ঘটান যাইতে পারে।

উদ্ভাবক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি বলেন যে, প্রচলিত সাধারণ রেফ্রিজারেটরের কৌশলের সহিত এই নূতন রেফ্রিজারেটরের মূলগত কোন সামঞ্জস্য নাই। ইহা ম্যাগনেটিক কুলিংয়ের সাইক্লিক প্রিন্সিপলের উপর নির্ভর করিয়া উদ্ভাবিত হইয়াছে। ওহিয়ো স্টেট ইউনিভার্সিটির ডাঃ ড্যাণ্ট ও ডাঃ হির এই কৌশলটি প্রথম আবিষ্কার করেন।

এই অভূতপূর্ব শৈত্য উৎপাদনের জন্য রেফ্রিজারেটরের ভিতরে কোন গতিশীল যন্ত্র বা কোন প্রবহমান তরল পদার্থ সন্নিবেশিত হয় নাই। এইগুলির পরিবর্তে ইহার ভিতরে তিন ইঞ্চি লম্বা একটি প্লাষ্টিকের পাত্রে একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ আবদ্ধ আছে। বাহিরের চুম্বকশক্তির সাহায্যে ইহার তাপ হ্রাস পাইতে থাকে।

কোন কোন পদার্থ চুম্বকধর্ম প্রাপ্ত হইলে উহা উত্তপ্ত হইয়া উঠে, আবার চৌম্বকত্ব অপসৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহা শীতল হইতে থাকে। পদার্থের এই মৌলিক ধর্ম সম্বন্ধে কয়েক বৎসর যাবৎ বিজ্ঞানীরা গবেষণা করিতেছেন। এইরূপ অভূতপূর্ব নিম্নতাপ উৎপাদন ও রক্ষণে ইহাই সর্বপ্রথম সাফল্যজনক যন্ত্র।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

বিবর্তনের ইতিহাসে জীবাশ্ম*

শ্রীকল্যাণকুমার রায়

বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে, দু'শো কোটি বছরেরও পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে এই পৃথিবী। সৃষ্টির পর বহুকাল এই পৃথিবী ছিল প্রাণীদের বাসের প্রতিকূল; ভিন্ন ভিন্ন স্তরের জীবাশ্মের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেছেন যে, প্রায় পৌনে দু'শো কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের আবির্ভাব ঘটে।

পৃথিবীর স্তরে স্তরে প্রাপ্ত জীবাশ্মের ধারাবাহিকতার সংকলন দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরের বয়সকাল এবং সমকালীন প্রাণী-জগতের প্রাণপ্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

কালপরিক্রমায় জীবের জীবনে—আকৃতি ও প্রকৃতিতে যে রূপান্তর ঘটেছে, সেই অভিব্যক্তির ইতিহাসের প্রধান সাক্ষী হচ্ছে ভূপঞ্জরে প্রাপ্ত বিভিন্ন যুগের জীবাশ্ম। প্রাপ্ত জীবাশ্মের বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য এবং তৎকালীন ভূস্তরের শ্রেণীভেদে পৃথিবীর ইতিহাসকে নানা যুগ, মহাযুগে বিভক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

প্রাণীর যখন প্রথম আবির্ভাব হয়, সে যুগকে বলা হয়েছে এয়োজোয়িক মহাযুগ। তারপর আসে আর্কিয়োজোয়িক মহাযুগ—এক বা দ্বিকোষী প্রাথমিক প্রাণীর আবির্ভাব কাল। এরও পরে কঠিন আবরণহীন প্রাণীর আবির্ভাব কাল—প্রোটারোজোয়িক মহাযুগ। জীবন-প্রবাহের প্রায় একশ' পঁচিশ কোটি বছর জুড়ে রয়েছে এই তিন মহাযুগ—যে সময়ে স্বল্পকোষী শৈবালজাতীয় প্রাণীদের কঠিন আবরণ না থাকায় তাদের দেহাংশ ভালভাবে অশ্মীভূত হতে পারে নি। শিলাপৃষ্ঠে তাদের অবস্থান ও বিচরণের কিছু কিছু অস্পষ্ট চিহ্নাদি পাওয়া গেছে মাত্র। তাই এই তিন মহাযুগকে একত্রে বলা হয়েছে—ক্রিপ্টোজোয়িক মহাযুগ।

পরবর্তী পঞ্চাশ কোটি বছরের ইতিহাস বেশ স্পষ্ট—ভূস্তরে প্রাপ্ত জীবাশ্ম থেকে ক্রমপরিণতির সুস্পষ্ট ইতিহাস পাওয়া যায়। তাই এ কালকে-বলা হয়েছে, প্রকাশ্য প্রাণীর মহাযুগ বা ফ্যানারোজোয়িক এরা। এই প্রকাশ্য প্রাণীর যুগকে প্রাপ্ত জীবাশ্মের বিভিন্নতা ও অভিব্যক্তি অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

পেলিওজোয়িক মহাযুগের স্থায়িত্ব প্রায় ত্রিশ কোটি বছর। ত্রিশ কোটি বছরের প্রাণীর অভিব্যক্তির নিদর্শন—এই মহাযুগের স্তরে প্রাপ্ত জীবাশ্ম। এই মহাযুগের মুখ্য প্রাণীরা অমেরুদণ্ডী। ত্রিশ কোটি বছরের শেষ তৃতীয়াংশে মৎস্য, ভেক ও বিছা জাতীয় উভচর এবং ক্ষুদ্র সরীসৃপ জাতীয় মেরুদণ্ডী প্রাণীর আবির্ভাব এবং মৎস্য ও উভচরের বিশেষ প্রাচুর্য দেখা যায়।

এই মহাযুগের মধ্যভাগে বনস্পতির (অপুষ্পক বৃক্ষের) ও শেষভাগে ডাঙায় ঘন বনের প্রাচুর্যের প্রমাণও যথেষ্ট পাওয়া যায়। এই যুগের উদ্ভিদেই পৃথিবীর কয়লার স্তরসমূহের বেশীর ভাগ গঠিত।

উপরোক্ত মহাযুগের পরবর্তী প্রায় দ্বাদশ কোটি বর্ষব্যাপী সময়—মেসোজোয়িক মহাযুগ। এই মহাযুগের প্রথম দিকে পেলিওজোয়িক মহাযুগের বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর বিলোপ ঘটে। অনবলুপ্ত ও নবাবির্ভূত জাতিসমূহের মধ্যে একটা দ্রুত পরিবর্তন দেখা যায়। বহু জাতি, প্রজাতি এমন কি, কয়েকটি বর্গ চিরতরে বিলুপ্ত হয়।

স্তরসমূহের মধ্যে অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে —কোন কোন জাতের প্রাণী কোন একটা বিশেষ কালের স্তর থেকে পাওয়া যাচ্ছে পরবর্তী কোন একটা বিশেষ কালের স্তর পর্যন্ত। এই জাতীয় প্রাণীর জীবাশ্ম স্তরসমূহের কাল নির্দেশক। এই প্রাণীসমূহের জীবনকাল যত সংক্ষিপ্ত, বিস্তৃতি যত বেশী, নির্দেশক হিসাবে তাদের মূল্যও তত বেশী।

অমেরুদণ্ডী সেফালোপড্ (অর্থাৎ যে সব প্রাণীর পা মাথার মধ্যে দোমড়ানো) শ্রেণীর মধ্যে পরিবর্তন বিশেষ লক্ষ্যণীয়। এই শ্রেণীর বিভিন্ন বর্গ, গোত্র ও জাতির জীবনকাল খুবই কম। এজন্যে মহাযুগের স্তরসমূহকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ করা সম্ভব হয়েছে এদের জীবাশ্মের সাহায্যে।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে ডাইনোসর জাতীয় অতিকায় জন্তুদের আবির্ভাব ও প্রাচুর্ভাব এবং অবশেষে বিলোপ—এই মহাযুগকে বিশেষভাবে নির্দেশ করছে। সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীদের প্রাচুর্ভাবের স্মারক জীবাশ্মও সমসাময়িক স্তরে প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে রয়েছে।

উপরিউক্ত মহাযুগের শেষ সময়ে অথবা এর পরবর্তী মহাযুগের প্রথমে স্তন্যপায়ী জন্তু ও সপুষ্পক উদ্ভিদের আবির্ভাব হয়। আজ থেকে মাত্র আট কোটি বছর পূর্ব পর্যন্ত এর পরিধি। এই মহাযুগে বিশেষ করে মেরুদণ্ডী প্রাণী-জগতে যে রূপান্তর ও বিবর্তন এসেছে তা যেমনই দ্রুত, তেমনি জটিল ও চিত্তাকর্ষক।

এই মহাযুগের প্রথম দিকে, ইয়োসিন প্রযুগে পাওয়া অশ্বের জীবাশ্মের সামনের পায়ে আছে চারটি পদাগ্র, পিছনের পায়ে আছে তিনটি। এদের উচ্চতা ছিল বিড়ালের মত। অভিব্যক্তির ফলে প্রায় তিন কোটি বছর পরে অলিগসিন প্রযুগে এদের সামনের পায়ের একটা পদাগ্র, অর্থাৎ অঙ্গুলি লোপ পায় এবং অপরগুলির সংখ্যা থাকে ঠিক; কিন্তু উচ্চতা হয় মেষের মত। আরও প্রায় দেড় কোটি বছর পরে মাইওসিন প্রযুগে প্রতি পায়ের তিনটি পদাগ্রের পাশের দুটি বেশ ছোট হয়ে যায়—উচ্চতা যায় আরও কিছু বেড়ে। প্রায় দু'কোটি বছর পরে প্লায়োসিন প্রযুগে ক্ষুদ্র পদাগ্র দু'টি হয় ক্ষুদ্রতর —উচ্চতাও বাড়ে অনেকটা। তারপর প্লিষ্টোসিন প্রযুগে ক্ষুদ্র পদাগ্র দু টি লোপ পায়—আর বর্ধিত অবয়ব এসে দাঁড়ায় বর্তমান অশ্বে। শুধু পদাগ্র এবং উচ্চতার দিক থেকেই নয়- দাঁত, চোয়াল প্রভৃতি অঙ্গের ক্রমপরিবর্তন হয়েছে এমনিভাবেই; শুধু অশ্বেই নয়—মেরুদণ্ডী বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীদের মধ্যেও। ঠিক এমনি ক্রমবিবর্তনের ফলেই আজকের মানুষ নিয়েছে জন্ম।

প্রায় আট কোটি বছর আগে লেমুরের অস্তিত্বের স্বাক্ষর পাওয়া যায়। প্রায় তিন কোটি বছর পরে অভিব্যক্তির ক্রমপর্যায়ে বানরজাতীয় জীব দেখা যায়। ক্রমশঃ এথেকে এসেছে গিবন, ওরাংওটাং, শিম্পাঞ্জী, গরিলা এবং সব শেষে মানুষ। কাল এবং পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে মানুষের ভিতরেও রয়েছে বিভিন্ন জাতিভেদ। আজকের জগৎ গড়ে উঠেছে এমনি ভাবেই—অতীত ধারাকে বহন করে।

শুধু মেরুদণ্ডী প্রাণীই নয়—অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের শ্রেণীসমূহেও ক্রমবিবর্তন বিশেষ লক্ষ্যণীয়। ফোরামিনিফেরা, গ্যাষ্ট্রোপোডা, ল্যামেলিব্রাঙ্কিয়াটা প্রভৃতি শ্রেণীসমূহের জাতি ও প্রজাতিদের জীবাশ্ম থেকে তা পরিষ্কার বুঝা যায়।

উদ্ভিদের দৈহিক গঠনেও ক্রমশঃ জটিলতা এসেছে। পুরাকালের উদ্ভিদাদি পেয়েছে লোপ—আধুনিক কালের উদ্ভিদ এসেছে ক্রমশঃ।

বিভিন্ন স্তরের জীবাশ্ম পর্যবেক্ষণে পৃথিবীর ইতিহাসের নতুন নতুন দিক উদ্ঘাটিত হয়েছে মানুষের সামনে। বিভিন্ন স্তরের জীবাশ্ম থেকেই ডারুইন প্রাণী-জগতের ক্রমবিবর্তন প্রতিপাদন করেছেন। হাক্সলি, আর্নস্ট হেকেল এবং আধুনিক

যুগের উত্তরসূরীরা পূর্বাচার্যদের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্বে উইলিয়াম স্মিথ সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে, ভূপৃষ্ঠের কোন নির্দিষ্ট স্তরে যে সব জীবাশ্ম দেখা যায়—অন্যান্য স্থানের সমকালীন ও সম অবস্থায় গঠিত স্তরেও সাধারণতঃ সেরূপ জীবাশ্মসমূহ দেখা যাবে। পৃথিবীর স্তর-বিন্যাসে এর দান অপরিসীম। এই আবিষ্কার এক সুদূরপ্রসারী ফল নিয়ে মানুষের সামনে দেখা দেয় এবং অধুনা বিচ্ছিন্ন বহুস্থানের অতীত যোগাযোগের বিষয় নির্দেশ করে।

বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন আবহাওয়া ও আবেষ্টনীর মধ্যে থাকতে অভ্যস্থ। এই আবহাওয়ার ক্রম-পরিবর্তনের সঙ্গে প্রাণীরা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করে, বাঁচতে চায় প্রতিকূলতার মধ্যেও —এই হলো জীবনযুদ্ধ। সফলকাম প্রাণীরা এক কাল অতিক্রম করে পরবর্তী কালেও বেঁচে থাকে—এ হচ্ছে যোগ্যতমের উদ্বর্তন। কিন্তু অক্ষমেরা লুপ্ত হয়ে যায়। পারিপার্শ্বিকের দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেও কতকগুলি বর্গ-গোত্রাদি লোপ পেয়ে যায়—দু'একটি জাতি বা প্রজাতি কোনও কারণে কালাতিক্রম করতে পারে। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীদের মধ্যে শ্রেণী বা গোত্র বিশেষের অবলুপ্তি ও কতকাংশের কালাতিক্রমকে বলা হয় প্রাকৃতিক নির্বাচন। মেসো-জোয়িক মহাযুগের শেষপাদে এটি বিশেষ লক্ষ্যণীয়। সে সময়ে সেফালোপড শ্রেণীর বেশীর ভাগ প্রাণী বিশেষতঃ তাদের নটিলয়েড এবং অ্যামোনয়েড বর্গদ্বয় প্রায় লোপ পায়। নটিলয়েড বর্গের কেবলমাত্র নটিলাস জাতি এখনও সমুদ্রে পাওয়া যায়।

ভূস্তরে স্থলচর প্রাণীদের জীবাশ্ম ঠিক পর্যায়-ক্রমে পাওয়া দুর্লভ; কেন না, ডাঙায় স্তর গঠন তেমন পূর্ণ ও বিশাল নয়—যেমন সমুদ্রে বা হ্রদে সম্ভব। তাই সমুদ্র, হ্রদ এবং জলাভূমির স্তর ও জীবাশ্মের পর্যায়ক্রম অনেকটা ভাল ভাবে জানা গেছে। তীর সন্নিহিত সমুদ্রে দ্রুত ও বহুল পরিমাণ স্তর গঠনের ফলে প্রাণীরা এখানে অধিক সংখ্যায় স্তরীভূত হয়। এক একটি জাতি ও প্রজাতির স্থায়িত্ব তাই কম। যেহেতু গভীর সমুদ্রের প্রাণী ধীরে স্তর গঠনের ফলে কম সংখ্যায় স্তরীভূত হয়, সেজন্যে তাদের জাতি, প্রজাতিদের স্থায়িত্বকাল বেশী। কিন্তু উপকূলবর্তী সমুদ্রের তল অবধি আলোকরশ্মি প্রবেশ করতে পারে বলে এই অঞ্চলের প্রাণীরা তলনিবাসী এবং তাদের প্রজাতিদের অধিক বিস্তৃতি অসম্ভব। অপরপক্ষে গভীর সমুদ্রের তলদেশে আলোক প্রবেশ করতে না পারায় সেই অঞ্চলের প্রাণীরা সন্তরণশীল। ফলে বিস্তৃতি তাদের পৃথিবীব্যাপী মহাসমুদ্রে। স্তরবিন্যাসে ও সমসাময়িকতা নির্ণয়ে এ যথেষ্ট সহায়ক।

শুধু জীবজগতের অভিব্যক্তিই নয়—অতীত পৃথিবীর ভৌগোলিক বিবরণও আজ জীবাশ্মের সাহায্যে জানা সম্ভব হয়েছে। যেমন—কোন এক কালের ভূস্তরে পাওয়া গেল—ট্রাইলোবাইট, ব্র্যাকিওপড, সেফালোপড প্রভৃতি প্রাণীর জীবাশ্ম, যা থেকে এ সিদ্ধান্তই করা সম্ভব যে, ঐ কালে স্তর যখন গঠিত হয় তখন তা সমুদ্রতলে ছিল। আবার যদি কোথাও দেখি গ্যাস্ট্রোপড ও ল্যামেলিব্র্যাঙ্কের আধিক্য তখন এ কথা বলা ভুল হবে না যে, সে স্তর ঐ সময়ে অগভীর সমুদ্রতলে, নদী বা হ্রদের মোহনায় গঠিত। কোনও স্তরে প্রচুর প্রবাল জীবাশ্মের প্রাপ্তি সূচিত করে যে, ঐ স্তর অগভীর (৩০০ হাতের অনধিক) সমুদ্রতলের উষ্ণ (৬৮° ফা:) অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। আবার শৈবাল ও ফার্ণ জাতীয় জীবাশ্মের প্রাচুর্যে জলাভূমির অস্তিত্ব এবং ভূচর প্রাণীর আধিক্য বা জীবাশ্মের অভাব থেকে স্তরটি গঠনকালে সমুদ্রতলে ছিল, না স্থলভাগে ছিল, তা সিদ্ধান্ত করা যায়।

হিমালয় যে পেলিওজোয়িক মেসোজোয়িক এবং

কেনোজোয়িক মহাযুগের মধ্যকাল অবধি সমুদ্রতলে ছিল তার প্রমাণ দেয় হিমালয়ের বিভিন্ন স্তরে প্রাপ্ত জীবাশ্মসমূহ। দক্ষিণ ইউরোপ, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া, আফগানিস্থান, হিমালয় ও ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন স্তরে প্রাপ্ত জীবাশ্মের সাদৃশ্য থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, অতীতে এসব অঞ্চল এক বিস্তৃত সাগরগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। এই সাগর ঐ সব অঞ্চল দিয়ে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্ত রেখেছিল। বিশেষতঃ উদ্ভিদ জীবাশ্মের স্পষ্ট বৈসাদৃশ্য, এই সাগরের উত্তর ও দক্ষিণে যে দুটি বিরাট ভূভাগ ছিল তার নির্দেশ দেয়। বিজ্ঞানীরা উত্তর ভূভাগের নাম দিয়েছেন আঙ্গারাল্যাণ্ড, দক্ষিণ ভূভাগের নাম দিয়েছেন গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড এবং এদের মধ্যবর্তী সাগরের নাম টেথিস সাগর। অনেক বিজ্ঞানী বর্তমানে এই মত পোষণ করেন যে, এই গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড একত্র সুসংবদ্ধ দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব ও দক্ষিণাংশ, কুমেরু মহাদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও মাডাগাস্কারীয় অঞ্চল, ভারতের দাক্ষিণাত্য ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ দ্বারা গঠিত ছিল। এসব মহাদেশে প্রাপ্ত জীবাশ্মের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য তার প্রমাণ দেয়। পেলিওজোয়িক মহাযুগের শেষ ভাগে প্রাপ্ত গ্লোসোপ্টেরিস জাতীয় বৃক্ষপত্রের জীবাশ্ম এসব দেশে সমকালে পাওয়া যায়। কিন্তু আঙ্গারাল্যাণ্ডে এ সময়ে ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদের প্রাচুর্য ছিল যা গণ্ডোয়ানা ভূভাগে পাওয়া যায় নি। এসব দেশগুলি যে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, জীবাশ্মের ক্রমশঃ পার্থক্য থেকে তা অনুমান করা যায়। ভারত মহাসাগরের বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি এ ভাবেই হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। মহাদেশগুলির বিচ্ছিন্ন হওয়ার তথ্য আবিষ্কার করেন জার্মান বৈজ্ঞানিক ওয়েজেনার এবং বিভিন্ন যুগ ও মহাযুগে মহাদেশগুলির অবস্থান কিরূপ ছিল তার কতকগুলি সম্ভাব্য মানচিত্রও তিনি অঙ্কন করেন। তাঁর প্রণীত "The Origin of Continents and Oceans" নামক গ্রন্থে এগুলি এবং আরও অনেক তথ্য-প্রমাণের বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রখ্যাত ভূতাত্ত্বিক এ. এল. ড্য টয়েট তাঁর সমর্থনে একটি প্রামাণ্য পুস্তক রচনা করেন (Our Wandering Continents), যাতে ওয়েজেনারের মতবাদের সমর্থনে বহু প্রমাণের উল্লেখ আছে। জীবতত্ত্ববিদেরাও আধুনিক প্রাণীসমূহের পরীক্ষার দ্বারা এই সিদ্ধান্তেই পৌঁচেছেন যে, মধ্য-আফ্রিকা, মাডাগাস্কার ও ভারতবর্ষের নিম্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীসমূহের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান। এরা যে অতীতে একই ভূভাগে বসবাসকারী প্রাণীদের উত্তরপুরুষ, এরূপ অনুমানের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি ও প্রমাণ রয়েছে।

এ ভাবে বিভিন্ন যুগে জল ও স্থলভাগের অবস্থান এবং ক্রমে তাদের স্থান পরিবর্তন জীবাশ্মের সাহায্যে জানা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন বৃহত্তর স্থলভাগের মধ্যে স্থলসংযোগ, বিভিন্ন বৃহত্তর জলভাগের মধ্যে জলসংযোগ এবং স্থলপ্রাচীরের সাহায্যে জলভাগকে পৃথক করবার খবরও তারাই যোগাচ্ছে।

পেলিওজোয়িক মহাযুগের শেষ ভাগকে নিম্ন-গণ্ডোয়ানা যুগও বলা হয়। সে সময়ে কাশ্মীরের উপর দিয়ে গণ্ডোয়ানা ও আঙ্গারাল্যাণ্ডের মধ্যে যে স্থলসংযোগ ছিল, সেই স্থানে প্রাপ্ত উদ্ভিদ-জীবাশ্মের দ্বারা জেলেস্কি তাঁর সিদ্ধান্ত করেন। আঙ্গারাল্যাণ্ডের রুশীয় উদ্ভিদের সঙ্গে এবং গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের গ্লোসোপ্টেরিস জাতীয় উদ্ভিদের সংস্পর্শে উভয়ের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত সঙ্কর বৃক্ষের জীবাশ্ম এর প্রমাণ দেয়।

দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ভারতের দাক্ষিণাত্যে প্রাপ্ত সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর জীবাশ্ম থেকে অধ্যাপক ভন হিউয়েন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মেসোজোয়িক বা উচ্চ গণ্ডোয়ানা যুগে এসব ভূভাগের মধ্যে অবশ্যই স্থলসংযোগ ছিল।

কেনোজোয়িক মহাযুগের প্রথমপাদে উত্তর আমেরিকায় অশ্বের আবির্ভাব এবং আফ্রিকায় হস্তী

জাতীয় প্রাণীর (Proboscideans) আবির্ভাব এবং মধ্যভাগে অশ্বের ইউরোপ ও এশিয়া—তৎপরে আফ্রিকায় বিস্তার এবং হস্তীর এশিয়া, ইউরোপ ও তৎপরে উত্তর আমেরিকায় প্রসার এই কথাই প্রমাণ করে যে, কেনোজোয়িক মহাযুগের মধ্যভাগে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের মধ্যে এবং সম্ভবতঃ বেরিং প্রণালীর নিকট দিয়ে এশিয়া ও ইউরোপের সঙ্গে উত্তর আমেরিকার ঘনিষ্ঠ স্থলসংযোগের সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষ লক্ষ্যণীয় যে, টেথিস সাগর এ সময়ে নিশ্চয়ই যথেষ্ট সঙ্কুচিত হয়েছিল যাতে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে ঘনিষ্ঠ স্থলসংযোগ স্থাপিত হয়।

পেলিওজোয়িক মহাযুগের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রাপ্ত জীবাশ্ম থেকে দেখা যায় যে, হিমালয়ে প্রাপ্ত জীবাশ্মের সঙ্গে ব্রহ্মদেশে প্রাপ্ত জীবাশ্মের যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য আছে। সেই সময়ে কোনও স্থলভাগ যে উভয় জলভাগকে বিযুক্ত রেখেছিল তা অনুমান করা যায় এবং মনে হয়, এই মহাযুগের মধ্যভাগে এই বিভাজক সম্ভবতঃ বিনষ্ট হয়ে যায়, যার ফলে উভয় অঞ্চলের প্রাণীরা উভয়াঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে ঐ স্থানসমূহে প্রাপ্ত জীবাশ্মের সাদৃশ্য থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

তাছাড়া অতীত পৃথিবীর জলবায়ু সম্বন্ধেও জীবাশ্ম যথেষ্ট আলোকপাত করে। বিভিন্ন জলবায়ুতে বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ বেঁচে থাকে; জলবায়ুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই স্থলচর প্রাণী এবং উদ্ভিদসমূহেও পরিবর্তন দেখা যায় এবং কতক জাতি লোপ পায়।

আমেরিকায় কেনোজোয়িক মহাযুগে অশ্বের ক্রমবিবর্তনের কথা কিছু বলা হয়েছে। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, গতিশীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপরই এর প্রভাব বেশী এবং গতি দ্রুততর হওয়াই এই পরিবর্তনের লক্ষ্য। এথেকে বৈজ্ঞানিকদের অনুমান এই যে, আমেরিকায় কেনোজোয়িক মহাযুগের প্রথমদিকে জলাভূমি প্রচুর ছিল এবং এক পদাগ্রবিশিষ্ট পায়ে চলাফেরা করা সেখানে মোটেই সম্ভব ছিল না। কিন্তু আবহাওয়া শুষ্ক থেকে শুষ্কতর হওয়ায় অশ্বের একস্থান থেকে স্থানান্তরে খাদ্যের সন্ধানে যাবার প্রয়োজন হয় এবং ক্রমশঃ তাদের পরিবর্তন আসে।

নিম্ন গণ্ডোয়ানা যুগের প্রথম দিকে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডে ঠাণ্ডা আবহাওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়, অপরিবর্তিত ফেল্‌স্‌পার-গঠিত শিলার বৈশিষ্ট্য থেকে। কেন না, শীতল এবং শুষ্ক কালো না হলে হিমবাহবাহিত নুড়িসমূহ পাওয়া যেত না এবং ফেল্‌স্‌পার নামক খনিজ পদার্থ চীনামাটিতে পরিণত হতো। এরপর যে বহু উদ্ভিদের জন্ম হয়েছিল তা বোঝা যায়, প্রচুর কয়লা এবং উদ্ভিদ-জীবাশ্ম থেকে। কয়লার উৎপত্তির জন্যে চাই প্রচুর উদ্ভিদ আর জলাভূমি এবং প্রচুর উদ্ভিদের জন্যে চাই আর্দ্রোষ্ণ জলবায়ু। এই সময়ে তা নিশ্চয়ই ছিল, নতুবা ভূস্তরে এত কয়লা পাওয়া যেত না। এরপর আবার এক শুষ্ক জলবায়ুর কাল আসে, যখন বৃক্ষাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মায় নি। তারপরও এককালে পুনর্বার পাওয়া যায় কয়লা। এভাবে জলবায়ুর পরিবর্তন চলে। বিশ্লেষণে এভাবে অতীত জলবায়ুর বিষয় জানা যায়, আর তার গতি নির্দেশ করে জীবাশ্ম।

স্থলভাগের সাময়িক উত্থান ও অবনমনের ইতিহাসও জীবাশ্ম রাখে অমর করে। দাক্ষিণাত্যের ভূমি প্রাচীনতম কঠিন শিলায় গঠিত এবং পেলিওজোয়িক মহাযুগের পূর্ব থেকেই ভূপৃষ্ঠে রয়েছে। কিন্তু কেনোজোয়িক মহাযুগের প্রায় ৪।৫ কোটি বছর পূর্বে মেসোজোয়িক মহাযুগে মাদ্রাজ, পণ্ডিচেরী, আরিয়ালুর ও ত্রিচিনোপলীর সমুদ্রোপকূলভাগ অবনমনের ফলে সমুদ্র এগিয়ে আসে; তাই এ সময়ের উপকূলবর্তী সামুদ্রিক প্রাণীর প্রচুর জীবাশ্ম এখানে স্তরে স্তরে ছড়িয়ে রয়েছে। ৪।৫ কোটি বছর এরূপ থাকবার পর ঐ উপকূলভাগ আবার ভূপৃষ্ঠে জেগে ওঠে, সমুদ্রোপকূল পিছিয়ে যায়।

ফলে সেখানে মেসোজোয়িক মহাযুগের অবসান কালের প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া যায়; কিন্তু তৎপরবর্তী যুগের জীবাশ্ম পাওয়া যায় নি। উপকূলভাগের উত্থান ও অবনমন সম্বন্ধে তাই উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

জীবাশ্মের অবস্থান দেখে আজ তাই বোঝা সম্ভব, অতীতে কোন্ সময়ে পৃথিবীর চেহারা ছিল কেমন। কোথায় নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের ছিল প্রাদুর্ভাব—যা থেকে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়েছে খনিজ তেল। কোন্ যুগে এবং কোথায় ছিল বিশাল বৃক্ষসমূহের প্রাচুর্য যা থেকে নানা প্রক্রিয়ায় বৃক্ষ রূপান্তরিত হয়েছে কয়লায়। কোন্ অঞ্চলে এবং কোন্ যুগে ছিল প্রবালের বহু বিস্তৃতি, যা থেকে গঠিত হয়েছে বহু চুনাপাথরের স্তর—সিমেণ্ট, চুন ইত্যাদির উৎপাদন হয় যা থেকে। এমনি ভাবে আধুনিক যুগের সভ্য মানুষের অর্থনীতির উপরেও পরোক্ষে প্রভাব বিস্তার করেছে জীবাশ্ম।

পৃথিবীর গহ্বরের অন্ধকার ভেদ করেছে মানুষ, সংগ্রহ করেছে অমূল্য তথ্য, চিন্তা করেছে তথ্যের পিছনে লুকানো তত্ত্বের। পুরনো দিনের তথ্যের উপর সংগৃহীত হচ্ছে নতুন তথ্য—নতুন তত্ত্ব রূপ নিচ্ছে তার উপর। অজানাকে ক্রমাগত জয় করে চলেছে মানুষ, কিন্তু অজ্ঞানের ঘনঘটা অনেকটা কেটে গেলেও অন্ধকার একেবারে কাটে নি। আপাতবিরোধী তথ্যের সংগ্রহে স্থানে স্থানে প্রকাশমান তত্ত্বের উপর সংশয়ের মেঘ দেখা দিয়েছে। ভবিষ্যতের বিজ্ঞানী ও অনুসন্ধিৎসু মনের উপর এসে পড়েছে তাই আরও তথ্য সংগ্রহের আহ্বান আর সংশয়মুক্তির স্বাভাবিক দায়িত্ব।

জীবাশ্মলিপির পাঠোদ্ধার তাই আজ সভ্য পৃথিবীর মহাসম্পদ।
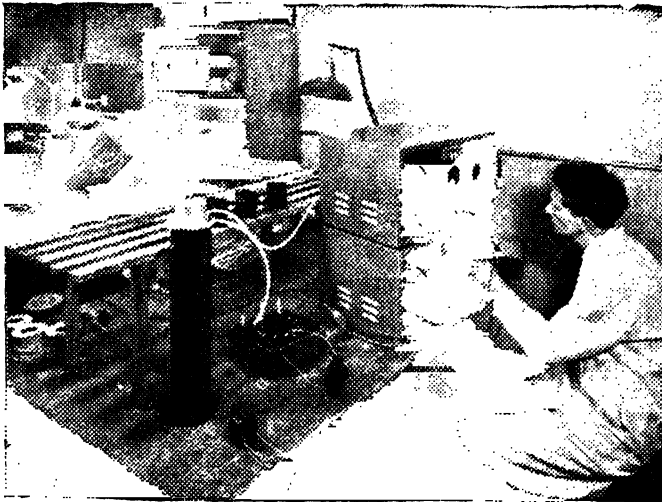
হাই ভোল্টেজের বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জামের ইনস্যুলেশনের কার্যকারিতা সুক্ষ্মভাবে পরিমাপ করবার যন্ত্র। ৩০ বছরের গবেষণার পর বৃটেনের বৈদ্যুতিক গবেষণা সমিতি এই যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেছেন।

সঞ্চয়ন

পৃথিবী কি প্রকৃতই গোলাকার ?

উইস্‌কন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জি, পি, উলার্ড সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্ন করেছিলেন—ইঞ্জিনীয়ার ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা তাঁদের বাঁধাধরা কতকগুলি হিসাবের জন্যে পৃথিবীর সাতটি বিভিন্ন আকার স্বীকার করে নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন, একথা সাংবাদিকেরা জানেন কিনা ?

অধ্যাপক উলার্ড ব্যাখ্যা করে বলেন, পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে তথ্যের অনিশ্চয়তা ও অসঙ্গতির জন্যে অথবা আরও পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে তথ্যের অভাবের জন্যেই এরূপ বিভিন্ন আকারের কথা স্বীকার করে নিয়ে তাঁরা গবেষণার কাজে অগ্রসর হয়েছেন।

পৃথিবীর প্রকৃত আকৃতি কিরূপ, আজ পর্যন্তও তা সঠিক জানা যায় নি। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির পরিমাপ কি, সে সম্পর্কে এখনও যথেষ্ট তথ্য না পাওয়াতেই পৃথিবীর যথার্থ আকৃতি নিরূপণ করা সম্ভব হয় নি।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তির পরিমাপ ও পৃথিবীর প্রকৃত আকার—এই দুটি বিষয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থবিজ্ঞান বছর উপলক্ষ্যে ৬০টিরও অধিক সংখ্যক দেশের বিজ্ঞানীরা এই দুটি বিষয় নিয়ে গবেষণা করবেন। ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বছর উপলক্ষ্যে গবেষণা সুরু হয়েছে ১৯৫৭ সালের ১লা জুলাই এবং ১৯৫৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তা চলবে।

মানচিত্র প্রস্তুত করা, নৌচালন বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের আরও নানা শাখায় গবেষণার জন্যে পৃথিবীর আকার সম্পর্কে আরও নির্ভুল তথ্য জানা একান্ত প্রয়োজন। অতি দ্রুতিগতিসম্পন্ন বিমান নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রয়োজন আরও অনেক বেড়ে গেছে।

বর্তমানে অধিকাংশ দেশের মানচিত্র প্রস্তুত করবার কাজে যে সব পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে, তার ফলাফলের মধ্যে পূর্ণ সঙ্গতির অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সাধারণভাবে, ভূগোলবেত্তা ও মানচিত্র প্রস্তুত-কারকগণ পরিচিত স্থানগুলিতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির পরিমাপ অবগত হতে চান। গণিতজ্ঞদের পক্ষে তখন পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে এসব স্থানের দূরত্ব নির্ধারণ করা সহজসাধ্য হবে। এভাবে সব দূরত্ব-গুলি জানা গেলে মানচিত্র প্রস্তুতকারকেরা কোন অঞ্চলের অবস্থান নির্ভুলভাবে নির্দেশ করতে পারবেন।

আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক উলার্ড বলেন যে, আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থবিজ্ঞান বছরে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির পরিমাপের পরিকল্পনা দ্বারা বিজ্ঞানীরা এই সর্বপ্রথম বিশ্বব্যাপী তথ্য আদান-প্রদানের সুযোগ পেয়েছেন।

বিভিন্ন স্থানে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে আরও ব্যাপক তথ্য অবগত হওয়ার পর তার ভিত্তিতে যে গবেষণা করা হবে, তার ফলে পৃথিবীর প্রকৃত আকৃতি নির্ধারণে অনেকখানি সহায়তা হবে।

যথেষ্ট সংখ্যক মাধ্যাকর্ষণ পরিমাপ সংগ্রহ করা এমন একটা গুরুতর কাজ যা আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বছরের মত আন্তর্জাতিক সহযোগিতাপূর্ণ প্রয়াস ব্যতীত সম্পাদন করা সহজ নয়।

অধ্যাপক উলার্ড বলেন, পৃথিবীর প্রকৃত আকার নিরূপণে বিজ্ঞানীদের সহায়তা করা ব্যতীতও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির পরিমাপ দ্বারা ভূত্বক সম্পর্কে ও পাহাড়-পর্বত কি ভাবে সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। পৃথিবীর উপরিভাগের উৎক্ষেপ ও অবক্ষেপ সম্পর্কে তথ্যাদিও জানা যাবে।

অধ্যাপক উলার্ডের মতে, এই সকল তথ্যের সঙ্গে পেট্রোলিয়াম সঞ্চয় ও খনিজ পদার্থ সংগ্রহের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে।

আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থবিজ্ঞান বছরে যে ১৩টি বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা কার্যকরী করা হচ্ছে, মাধ্যা-কর্ষণ শক্তির পরিমাপ তাদের মধ্যে অন্যতম। অন্যান্য

পরিকল্পনাগুলির দ্বারা আবহবিদ্যা, মেরুজ্যোতি ও সূর্যাস্তের পর পশ্চিমাকাশে রক্তিমাভা, আয়নমণ্ডলীয় পদার্থবিজ্ঞান, সৌর-ক্রিয়া, মহাজাগতিক রশ্মি, ঊর্ধ্বতন আবহমণ্ডল, দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশ নির্ধারণ, হিমবাহ, সমুদ্রবিজ্ঞান ও ভূমিকম্পবিজ্ঞান সম্পর্কে নতুন তথ্যাদি অবগত হওয়া যাবে।

পুস্তক পরিচয়

চক্ষু ও সূর্য্য—অনুবাদক—শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানী। ৬৪-এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩; পৃঃ ১৫১; মূল্য—এক টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

পুস্তকখানি বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক সের্গেই ইভানোভিচ ভাভিলভের রচনাবলীর ইংরেজী সংস্করণ হইতে চোখ ও সূর্য সংক্রান্ত অংশের বাংলা অনুবাদ। আলোক, সূর্য ও চোখের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝাইবার জন্য আলোক-বিজ্ঞানের বিবিধ তত্ত্ব, সূর্যে তেজোৎপত্তির রহস্য, দর্শনেন্দ্রিয়ের বিবর্তন, কোয়ান্টামবাদ, পরমাণুতত্ত্ব, তেজস্ক্রিয়তা প্রভৃতি তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের অনেক জটিল বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। মূলের বর্ণনা-রীতি অনুসরণের ফলেই হউক, কি আক্ষরিক অনুবাদের জন্যই হউক, স্থানে স্থানে বর্ণনার প্রাঞ্জলতা ব্যাহত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বাংলা সংখ্যা-লিখন প্রণালী অনুসরণে অসুবিধার কারণ না থাকিলেও (অন্ততঃ আলোচ্য ক্ষেত্রে) বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যে ইংরেজী সংখ্যা ব্যবহৃত হইয়াছে অথচ পৃষ্ঠা-সংখ্যা ও চিত্রনির্দেশক সংখ্যাগুলি বাংলায় দেওয়া হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য বুঝা গেল না। মোটের উপর এই কথা বলা যায়, পুস্তকখানি পড়িয়া এই সকল বিষয়ে অনুরাগী পাঠকমাত্রেই বিশেষ উপকৃত হইবেন।

খাদ্য-কথা—(তৃতীয় সংস্করণ) শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু। প্রকাশক—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; ২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৬; পৃঃ ৯৪; মূল্য—দেড় টাকা।

পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩২৮ সালে। তাহার পর এই দীর্ঘকালের মধ্যে খাদ্যতত্ত্ব ও পুষ্টি সম্বন্ধে অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। নূতন সংস্করণে কিছু কিছু সংযোজন ও পরিবর্তন করা হইয়াছে। আমাদের জীবনধারণ, দেহের বলবৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য উপযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন। সেই খাদ্যবস্তুর গুণাগুণ এবং শরীরের উপর তাহাদের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে জনসাধারণের কিয়দংশ কতকটা অবহিত থাকিলেও অনেকেই অনেক ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। পুস্তিকাখানিতে দেহপুষ্টি, স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন খাদ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে অল্পকথায় প্রায় সকল বিষয়ে যেভাবে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা খাদ্য সম্বন্ধে অনেকেরই ভ্রান্ত ধারণা নিরসনে সহায়ক হইবে। এতদ্ব্যতীত শরীর গঠনের জন্য প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন প্রভৃতি পদার্থ আমাদের আহার্য বস্তুর কোন্‌টিতে কি পরিমাণে আছে তাহার একটি দীর্ঘ তালিকা সন্নিবিষ্ট হওয়ায় সাধারণ পাঠকের নিকট পুস্তকখানির মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিশ্ব ও পরমাণু—ভ. মেজেনৎসেভ; (প্রথম খণ্ড—বিশ্ব)। অনুবাদক—শ্রীসত্যব্রত বসু; প্রকাশক—ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানী, ৬৪-এ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩; মূল্য—এক টাকা বাষট্টি নয়া পয়সা।

সুদূর অতীতে প্রয়োজনের তাগিদে আকাশের জ্যোতিষ্কসমূহের পর্যবেক্ষণ হইতে জ্যোতির্বিদ্যার গোড়াপত্তন হইয়াছিল। সেই হইতে আজ পর্যন্ত সৌরপরিবারের গ্রহ-উপগ্রহ এবং বহির্বিশ্বের নীহারিকা, নক্ষত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান যেভাবে অগ্রসর হইয়াছে, পুস্তকখানিতে মোটামুটি-ভাবে তাহার মনোজ্ঞ ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে এবং প্রসঙ্গতঃ ধূমকেতু, উল্কা, আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ, মহাজাগতিক রশ্মি, আকাশের বেতার তরঙ্গ, জীবন্ত বিশ্ব, গ্রহ-উপগ্রহাদির অতীত ও ভবিষ্যৎ, শক্তি ও শক্তির রূপান্তর প্রভৃতি বহু বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। সাধারণ সর্বশ্রেণীর পাঠকেরাই বইখানি পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবেন এবং বিশ্বরহস্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে উৎসুক পাঠকদের কৌতূহল অনেকাংশে পরিতৃপ্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সেপ্টেম্বর—১৯৫৭

দশম বর্ষ : ৯ম সংখ্যা

বিরাটাকৃতির থালার ন্যায় ২৫ফুট ব্যাসবিশিষ্ট এই যন্ত্রটির নাম রেডিও টেলিস্কোপ। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই যন্ত্রটি সূর্যের দিকে মুখ করে থাকবে। সূর্যের মধ্যে যে রেডিও এনার্জি উৎপন্ন হচ্ছে তা এই যন্ত্রে ধরা পড়বে। তা ছাড়া সূর্য সম্বন্ধে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদিও এই যন্ত্রের সাহায্যে জানা সম্ভব হবে। এই গবেষণার ফলে পৃথিবী এবং আবহাওয়ার উপর সূর্যের প্রভাব সম্পর্কিত বিবিধ তথ্যাদি জানা যাবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন। আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক বর্ষ উপলক্ষ্যে গবেষণার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রে এই রেডিও টেলিস্কোপ ব্যবহৃত হবে।

জলের ফোঁটায় জীবন্ত প্রাণী

পুকুরের এক ফোঁটা জলের মধ্যে যে এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রাণী ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে, সে কথা কি আগে জানতো কেউ? আমরা যাদের কথা ভাবতেই পারি না, সেই অতিক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক জীবন্ত প্রাণীরাও যে ওদেরই জন্যে তৈরী কোন সংগ্রহশালায় থাকতে পারে, একথা কল্পনা করাও পূর্বেকার লোকেদের কাছে অসম্ভব ছিল। আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরেই পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম এই অতিক্ষুদ্র প্রাণীগুলিকে স্থায়ীভাবে কোন সংগ্রহশালায় রাখবার বন্দোবস্ত করা হয়।

ডাঃ জর্জ রোমার্ট নামে জার্মেনীর মিউনিকের এক ভূতপূর্ব অধিবাসী এই আণুবীক্ষণিক প্রাণীসমূহের বাসস্থানের নির্মাতা। তিনি এই নবনির্মিত বাসস্থানের নাম দিয়েছিলেন মাইক্রোভাইভারিয়াম। মাইক্রোভাইভারিয়াম হচ্ছে এমন একটা কুঠুরি যেটা দেখতে অনেকটা ঘোড়ার খুরের মত। কুঠুরির দেয়ালগুলিতে তিন ফুট ব্যাস পরিমিত গোলাকৃতি পর্দা ঝোলানো থাকে—অনেকটা জাহাজের ভেনটিলেটরের মত। নীচের অংশ দিয়ে মাইক্রোভাইভারিয়ামের মধ্যে আলো প্রবেশ করে।

বিশেষ ধরণের চশমা দিয়ে ঐ পর্দাগুলির উপরে আণুবীক্ষণিক প্রাণীগুলির ছবি দেখতে পাওয়া যায়। বিচিত্র আকৃতির এবং অদ্ভুত প্রকৃতির জীবন্ত প্রাণীরা ক্রমাগত ছুটাছুটি করে বেড়ায়। চটিজুতার মত আকৃতিবিশিষ্ট ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীরা, যাদের ইংরেজীতে বলে স্লিপার অ্যানিমলকিউল, ওলটপালট খায়, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে এবং তাদের খাদ্যোপযোগী জীবাণুর সন্ধান করে। ডাঃ রোমার্টের সংগ্রহশালায় শুধুমাত্র এরাই নয়, ঝিনুকাকৃতি প্রোটোজোয়াও আছে। এগুলি জলের মধ্যে শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদের উপর তরতর করে উঠে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই রকম ছোট ছোট প্রাণী—কোনটা সরু ফলার মত দেখতে, কোনটা বা হাঁসের মত দেখতে—বৃত্তাকারে ক্রমাগত ঘুরতে থাকে।

আরও এক প্রকারের প্রাণী আছে, যেগুলি দেখতে বন্দুকের নলের মত এবং তারা সর্বদা মার্বেলের মত গড়াগড়ি দিয়ে চলাফেরা করে। উক্ত প্রাণীগুলিকে বলা হয় ডিডিনিয়া। জলের মধ্যে জীবন্ত প্যারামিসিয়াদের সঙ্গে জীবন্ত ডিডিনিয়া মিশিয়ে দিয়ে দেখা গেছে যে, মিশ্রণের ফলে ডিডিনিয়াদের ছুটাছুটি মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়। এ যেন সেই যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগের নিস্তব্ধতা। পরক্ষণেই যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। নলাকৃতি ডিডিনিয়ার দল এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্যারামিসিয়াদের ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। নিরীহ মেষপালের মধ্যে বাঘের মত এরাও যুদ্ধরত প্যারামিসিয়াগুলিকে বর্শার মত শুঁড় দিয়ে আক্রমণ করে এবং নিজেদের দেহাভ্যন্তরস্থ বিষ দিয়ে সেগুলিকে হত্যা করে ফেলে। এই নলাকৃতি ডিডিনিয়াগুলির চেহারা খুবই অদ্ভুত মনে হয়। দেহের মাঝখানে ছোট

একটা খাঁজ আছে। কোমর অনেকটা বোলতার মত। দেখলে মনে হয়, যেন কোন অস্ত্র দিয়ে প্রাণীটাকে প্রায় ছ'ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

মজার ব্যাপার এই যে, হিংস্র ডিডিনিয়াদেরও শত্রু আছে। তারা হচ্ছে জমকালো সবুজে-নীল রঙের ট্রাম্পেটার। এরা কোন জলজ গুল্মের উপর বসে থাকে আর সর্বদা হাঁ করে থাকে শিকারের অপেক্ষায়। এদের লম্বা সুতার মত শুঁড় (filament) উপরের দিকে বাঁকান থাকে। ঐ শুঁড় দিয়ে ডিডিনিয়াগুলিকে ধরে গিলে ফেলে। ট্রাম্পেটারের দেহ বেশ স্বচ্ছ। এত স্বচ্ছ যে, শিকার যখন তার দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে তখন বাইরে থেকে বেশ দেখা যায়। অসহায় শিকার একটা অন্তিম কামড় দিয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তার পরেই পরিপাকক্রিয়া আরম্ভ হয়। এমনিভাবে শিকার উদরস্থ করে খুসী মনে ট্রাম্পেটারের দল অন্যত্র প্রস্থান করে। প্রাণীতত্ত্ববিদেরা অনেক রকমের ট্রাম্পেটারের বর্ণনা দিয়েছেন। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এই সব ট্রাম্পেটারের হৃৎপিণ্ড ঘড়ির ব্যালান্স হুইলের মত নিয়মিতভাবে চলতে থাকে। এদের দেহ এত স্বচ্ছ যে, গর্ভাশয়ের অভ্যন্তরস্থ ভ্রূণগুলিকেও পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। জলের আর এক রকমের অদৃশ্যপ্রায় প্রাণীকে বলে হাইড্রা। হাইড্রার বিশেষত্ব এই যে, এদের মাথার দিকে অক্টোপাশের মত কতকগুলি শুঁড় আছে। এগুলির সাহায্যে হাইড্রা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ কীট ধরে উদরস্থ করে।

আণুবীক্ষণিক জগতের এই বিচিত্র প্রাণীদের একত্র করে একটা নাটকের সৃষ্টি করবার জন্যে ডাঃ রোমার্ট প্রায় পনেরো বছর গবেষণা চালিয়ে গেছেন।

পুকুরের এক ফোঁটা জল দেখতে বেশ পরিষ্কার। কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে দিলেই দেখতে পাওয়া যাবে, অসংখ্য জীবন্ত প্রাণী ঐ জলের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক বিন্দু জলের মধ্যে অনেক জীবন্ত উদ্ভিজ্জ পদার্থ এবং ঝাঁকে ঝাঁকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবন্ত প্রাণী দেখতে পাওয়া যাবে।

কাচের শ্লাইডে এক ফোঁটা জল দেওয়া হয় এবং বিশেষ ধরণের অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আয়নার সাহায্যে মাইক্রোভাইভারিয়ামের পর্দার উপর প্রতিফলিত করলেই এই বিচিত্র আকৃতির প্রাণীদের ছায়া পড়ে। সাধারণ ব্যবহৃত আলোর সংস্পর্শে এলে এরা মারা যায় বলে বাষ্প ঘনীভূত করবার স্বচ্ছ কাচের নলের মধ্যে কোন তরল পদার্থ রেখে সেই তরল পদার্থের মধ্য দিয়ে আলো প্রবেশ করানো হয়। উক্ত আধার থেকে বহিরাগত আলোর শক্তিশালী রশ্মি বিনষ্ট হয়ে যায় এবং ঐ আলো পর্দার উপর ফেলা হয়। এসব করবার জন্যে বিশেষভাবে তৈরী জটিল যন্ত্রপাতির আবশ্যক। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ যন্ত্রটির কৌশল এত সুন্দর যে, একসঙ্গে দশ-বারো ফোঁটা জল দিলেও প্রত্যেকটি ফোঁটায় মধ্যে যে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাণী-জগৎ আছে তার পূর্ণাঙ্গ ছবি একই সঙ্গে বিভিন্ন পর্দার উপরে প্রতিফলিত হতে পারে।

ডাঃ রোমার্ট পাতনক্রিয়ার সাহায্যে জল বিশুদ্ধ করে নিয়ে। সেই জলের মধ্যে শ্যাওলা জাতীয় জীবন্ত উদ্ভিদ ছেড়ে দিতেন। বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন তাপমাত্রার দিকে। কারণ বেশী বা কম—তাপের কোন রকম তারতম্যেই এই প্রাণীরা জীবনধারণ করতে পারে না। সুতরাং এদের উপযোগী তাপমাত্রার সৃষ্টি করা হতো কৃত্রিম উপায়ে। এমনি ভাবে উপযুক্ত বাসস্থান এবং খাদ্যের বন্দোবস্ত করে এই ক্ষুদ্র প্রাণীকুলকে ছেড়ে দেওয়া হতো। লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে, এরাও সাধারণ প্রাণীদের মত খাবার পর একটু অলস এবং শ্লথগতি হয়ে পড়ে এবং অনাহারে থাকলে জীবনীশক্তি হ্রাস পায়।

কৃত্রিম উপায়ে উপযুক্ত বাসস্থান তৈরী করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে প্রাণীসমেত শ্লাইড একটার পর একটা বসানো হয় এবং মাইক্রোভাইভারিয়ামের পর্দার উপরে পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য প্রাণীদের জীবননাট্যের চিত্র একের পর এক প্রতিফলিত হতে থাকে। দেখে অবাক হতে হয় যে, এই অতিসূক্ষ্ম প্রাণীরাও জীবনধারণের জন্যে কত অদ্ভুত কৌশল আয়ত্ত করে নিয়েছে।

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

কাচ-শিল্প

ইতিপূর্বে তোমরা জেনেছ যে, কাচ তৈরী হয় স্বচ্ছ বালি গলিয়ে এবং সে বালি গলাতে রাসয়নিক প্রক্রিয়া আর আগুনের সাহায্য নিতে হয়। আরও জেনেছ যে, আগেকার দিনের কাচ তৈরী হতো ঘরোয়া কারখানায়, আর বর্তমান কালে হয় বৈজ্ঞানিক কারখানায়। তারপর দরকার—সেই কাচকে মানুষের প্রয়োজন মত আকার দেওয়া।

বর্তমান কালের যে ব্যবসাদারী বৈজ্ঞানিক কারখানা তা সব সময়েই হয় বিরাট। সেখানে বিরাট জায়গা, বিরাট বাড়ীঘর, বিরাট কলকব্জা-যন্ত্রপাতি। সেখানে টাকা খাটে অনেক, লোকও খাটে অনেক। মানুষ তার কাজকে সহজ করবার জন্যে উদ্ভাবন করেছে কলের, আর দিনের পর দিন তার কলকে করে চলেছে উন্নততর, অর্থাৎ সভ্যতার মইটার সিঁড়ি দিন দিন উপর দিকে কেবল জুড়েই চলেছে। তবু সে মই যতই এগিয়ে চলুক, আর তার উপরের সিঁড়ি যতই বিরাট আর ব্যাপক হতে থাকুক, গোড়ার দিকের সিঁড়িগুলি তেমনি অটুট রয়েছে; কারণ, চিরন্তন বর্তমান দাঁড়িয়ে রয়েছে তার অতীতের ভিত্তির উপরে। তাই দেখতে পাওয়া যায়, ঘরোয়া কারখানা আজও চলে এবং যন্ত্রে যে কাজ হয়, সে কাজও হয় অতীতের পদ্ধতিকে মূল করেই।

কাচের কাজে গোড়ার দিকে চারটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। হস্তশিল্পে

যেমন, যন্ত্র-শিল্পেও তেমনি। তা হচ্ছে—(ক) ফুঁ দিয়ে ফোলানো; (খ) বেলন; (গ) চাপা; (ঘ) টানা।

হস্তশিল্পের কাজ যারা করে তারা নিতান্তই কারিগর, তাদের মাইনে করা ছ-একজন মানুষ থাকলেও প্রায়ই হয় তারা আত্মীয়-স্বজন নিয়ে এক-একটি পরিবার। সাধারণ-ভাবে এই ঘরোয়া কারখানাকে অভিহিত করা হয় দোকান বলে। এই ধরণের দোকান পৃথিবীর সর্বত্রই আছে। ভারতবর্ষে কলকাতা-দিল্লী-বম্বের মত সহরে তো আছেই, সভ্যতার কেন্দ্রস্থল বিলেতের লণ্ডন, আমেরিকার নিউ ইয়র্কেও তারা আছে। এরা কাচের কাঁচামালটা তৈরী করে না, কাচ জিনিষটাকে এরা আকার দেয় মাত্র। এদের কাছে গোড়ার কাঁচামাল সরবরাহ করে রাস্তার উট্‌কো লোক। তোমরা দেখে থাকবে—কলকাতার রাস্তায় কতকগুলি লোক বড় বড় চটের থলে নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায় এখানে-সেখানে, ডাষ্টবিনে, রাস্তায় কি খুঁজে খুঁজে চলে। এদের ভিতরে নানারকম লোক আছে, যাদের কাজ ফেলে-দেওয়া নানারকম জিনিষ কুড়িয়ে বেড়ানো। এই দলের একটা অংশ খুঁজে বেড়ায় ভাঙ্গা শিশি-বোতল, আয়না, ছবি-বাঁধানো কাচের টুক্‌রা—এই সব। গৃহস্থের ঘর থেকে জড়ো করা ভাঙ্গা অকেজো কাচও এরা কিনে নিয়ে যায়। তারপর চারদিক থেকে গিয়ে তারা তাদের সংগৃহীত এই মাল বেচে দেয় ঐ কাচের জিনিষ তৈরীর দোকানে। কাচের জিনিষের কারবারীর গুদামঝাড়া ভাঙ্গাচুরা কাচও এই দোকানওলারা কিনে আনে।

দোকানে সাধারণতঃ কাজ করে জন পাঁচ-সাতেক লোক। একজন থাকেন ওস্তাদ। তিনিই ফুঁ-দিয়ে ফোলাবার কাজটা করেন। একজন সব সময়েই উনুন থেকে গলানো নরম কাচটা নলের মাথায় তুলে দিতে থাকে। আর একজন থাকে মাঝখানে। তার কাজ একজনের হাত থেকে কাচসমেত ঐ নলটা আর একজনের হাতে পৌঁছে দেওয়া। এটুকু কাজের জন্যে অবশ্য একজন লোকের দরকার হতো না, তবু তারও একটু কাজ আছে যে জন্যে তাকেও দরকার। আর ছ'জন থাকে—যাদের কাজ হলো লাঠি থেকে জিনিষটা কেটে বের করে নেওয়া, ছোটখাটো পালিশ দেওয়া, দরকার হলে হাতল বা কোন আল্পনা লাগানো এবং সব জিনিষগুলি এক জায়গায় নিয়ে সাজিয়ে রাখা। এ ছাড়াও হয়তো ছ-একটা ছেলে-ছোকড়াও থাকে, যাদের কাজ ফাই-ফরমাস খাটা, এটা সেটা এগিয়ে দেওয়া, অর্থাৎ তারা তৈরী হচ্ছে ভবিষ্যতের কারিগর। এরা সাধারণতঃ হয় বাড়ীরই ছেলেপুলে।

নিদেনপক্ষে দুটা উনুন দরকার হয় এ কাজে। একটাতে কাচটা সর্বদাই গলানো হতে থাকে, আর একটা থাকে জিনিষটা তৈরী হওয়ার সময় মাঝে মাঝে আবার গরম করে নেবার জন্যে। কারণ ওটার ঠিকভাবে আকার দিতে গলিত কাচটার উত্তাপ সর্বদাই একটা বিশেষ মানে রাখা দরকার। দোকানের আসবাব বলতে ঐ দুটি

উনুন ছাড়া থাকে গোটাকত লোহার পাত, গোটা দু'চার পাথর, বড় বড় ছুরি, টিন কাটবার কাঁচির মত কাঁচি, চিম্‌টে, প্রয়োজনমত ছাঁচ আর অনেকগুলি ৪-৫ ফুট লম্বা লোহার নল এবং লোহার ডাণ্ডা। কাচের কাজ করতে সব সময়েই গরম করতে হয় বলে লোহার ডাণ্ডা বা নলগুলিও ধীরে ধীরে গরম হয়ে উঠতে থাকে। সেজন্যে ওদের ধরবার জায়গায় দেওয়া থাকে কাঠের একটা আবরণ। তা সত্ত্বেও নলগুলিকে ঠাণ্ডা হওয়ার অবকাশ দিতে মাঝে মাঝে পাল্‌টে নিতে হয়।

তোমরা সবাই হয়তো নলের মুখে সাবানের ফেনা লাগিয়ে বাতাসে বুদ্বুদ ছেড়েছ। অন্ততঃ কাউকে না কাউকে ছাড়তে দেখেছো তো নিশ্চয়ই। ফুঁ-দিয়ে ফুলিয়ে কাচের জিনিষ তৈরীর ব্যাপারটাও তেমনি। প্রথম লোক একটা লোহার নলের মাথায় এক খাবল গলানো কাচ আটকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছিঁড়ে তুলে দেয় দ্বিতীয় লোকের হাতে। দ্বিতীয় লোক সেটাকে কোন লোহার পাত বা পাথরের উপরে অল্প চাপ দিয়ে ঠিক করে দেয়। তৃতীয় ব্যক্তি, অর্থাৎ ওস্তাদ সেটাকে একটা খাপের ভিতর পুরে ফুঁ-দিয়ে ফুলিয়ে দেন। তাতে সেটা ঠিক খাপের ভিতরকার আকার পায়। এই খাপ থাকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত, যাতে ফোলানো হয়ে গেলে এক এক অংশ করে খুলে নেওয়া চলে। তারপর অন্য কারিগরেরা ওস্তাদের হাত থেকে নিয়ে খাপ খুলে নলের মুখ থেকে জিনিষটা কেটে বের করে নেয়। তখন তাদের কাজ হচ্ছে, প্রয়োজনমত শেষবার একটু পালিশ করে দেওয়া।

এরা সবাই যার যার নিজের কাজে সুনিপুণ। কাজ চলে ঝট্‌পট্‌। যে লোক নলের মুখে কাচ নেয়, সে এক খাবলে বারবার ঠিক একই মাপের কাচ তুলে দিতে পারে, যে টিপে টিপে ঠিক করে দেয়, সেও জানে ঠিক কতটা করবার দরকার। যিনি ফুঁ দেন তারও কতটা করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে, সেটা সম্পূর্ণ জানা। এরা এমনভাবে জিনিষ তৈরী করতে পারে যে, একই রকম জিনিষে নিতান্ত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি দিয়ে মাপা ছাড়া খালি চোখে তফাৎ ধরা প্রায় অসম্ভব। অনেক দিন ধরে কাজ করে অমন ওস্তাদ বনে' যায়। যদিও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে, তবু ওরা সবাই সব কাজ মোটামুটি রকম ভালই জানে, যাতে অসুখে বা কোন কারণে কারুর অনুপস্থিতিতে দোকান বন্ধ করতে না হয়।

বেলবার প্রয়োজন হয় সাদা সমতল ছবি বাঁধাবার কাচের মত কাচ তৈরী করতে। সেটা হয় সাধারণ লুচি বেলবার মত। কাঁচা কাচ গলিয়ে প্রথমে শিশি-র মত ফুঁ-দিয়ে ফুলিয়ে নিতে হয়। তার পর তার একদিক কাঁচি দিয়ে কেটে নিয়ে দরকার-মত লোহার পাতের উপর লোহার বেলুনী দিয়ে বেলে দেওয়া দরকার। যারা বেলবার কাজ করে তারা ভারী ওস্তাদ। চট্‌পট্‌ কাজ করে যায় অথচ কাচের সূক্ষ্মতার এতটুকুও তারতম্য হয় না। এই কাচকে ইংরেজীতে বলে প্লেট-গ্লাস। বাজারে বিক্রী করবার মত

বেশী মাত্রায় প্লেট গ্লাস ঘরোয়া কারখানায় আজকাল বড় একটা হয় না; সে কাজটা করে যন্ত্রপাতিওয়ালা বড় বড় কারবারীরা। দোকান শুধু তাদের নিজেদের প্রয়োজনমত সামান্য যেটুকু দরকার সেইটুকুই করে নেয়।

শিশি-বোতল তৈরীর কাজ সব সময়ই ফুঁ-দিয়ে করা হয়, কিন্তু এমন অনেক কাজ আছে যা তাতে হয় না। যেমন বাটি তৈরী করতে দরকার হয় ছাঁচ। দু'টি বাটির মত ছাঁচ, একটি আর একটির চাইতে ছোট। কাচের প্লেট তৈরী করে বড় ছাঁচের উপরে রেখে ছোট ছাঁচটি দিয়ে চেপে দিতে হয়; তারপর ধারগুলি কেটে পালিশ করে দিলেই হলো। দুটি ছাঁচেই প্রয়োজনমত নক্সা বা কোন রকম লেখা রাখা চলতে পারে। চাপের সঙ্গে সঙ্গে সে জিনিষের গায়ে তার ছাপও উঠে যায়।

চিনির মিঠাইওয়ালাকে তার মিঠাই তৈরী করিতে দেখেছ কি কখনো? চিনিটা জলে গুলে গরম করে কাদার মত করে নিয়ে টেনে টেনে নানারকম জিনিষ তৈরী করে। কাচের টানার কাজটাও ঐ রকম। গলা কাচ দুদিক ধরে টেনে দিলে মাঝখানটা লম্বা হয়ে যায়। অবশ্য ধরবার কাজটা করতে হয় যন্ত্র দিয়ে, হাতে অত গরম ধরা সম্ভব নয়। এর নানারকম প্রয়োজন আছে, তবে তার বিশেষ প্রয়োজন হয় কুজা, জাগ, কেরোসিনের ডিবা ইত্যাদির হাতল লাগাতে। আসল জিনিষ তৈরী হয়ে গেলে কাচের লম্বা টানা দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নানাপ্রকার নক্সা কাটাও চলে এবং ঐ কারিগরেরা তা করেও থাকে সময় সময়।

এসব ঘরোয়া কারখানায় সাধারণতঃ তৈরী হয় মোটামুটি কয়েকটি জিনিষ—শিশি, বোতল, বাটি, গ্লাস, বৈয়ম, কুজা, কেরোসিনের বাতির ডিবা, লণ্ঠনের চিম্‌নী ইত্যাদি। এই কারিগরেরা প্রায়ই শিক্ষিত নয়, আর শিল্পী বা বৈজ্ঞানিক তো নয়ই; তাই তাদের কাজ বড় একটা প্রগতির পথে চলে না। দিনের পর দিন তারা একই কায়দায়, একই বস্তু তৈরী করে থাকে।

প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে কলকাতার কলেজ ষ্ট্রীট থেকে হ্যারিসন রোড ধরে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর দিকে যেতে বাঁ-ধারে কতকগুলি ঐ রকম কাচের দোকান ছিল। তোমরা যারা কলকাতায় থাক, ইচ্ছে হলে দেখবার চেষ্টা করতে পার—যদি তারা এখনও সেখানে থেকে থাকে। না হলেও কলকাতার এখানে-সেখানে নানা জায়গাতে তারা আছেই; চোখ খুলে চললে চোখে পড়বেই একদিন না একদিন। দেখতে পেলে একটু দাঁড়িয়ে দেখে নিও, মজা পাবে অনেক, একটা নতুন জিনিষও বুঝতে পারবে সোজাসুজি।

এই হলো কাচের কাজের গোড়ার কথা। দোকানে যে কাজ হয় হাতে, কার-খানায় তা হয় যন্ত্রে—এই তফাৎ। কিন্তু তাহলেও বিজ্ঞান আর যন্ত্র মিলে এর অসাধারণ উন্নতি করেছে। তাতে এমন সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজ হয় যা না শুনলে বা না দেখলে কল্পনা

করাও অসম্ভব। কাচও যে কত রকমে তৈরী হচ্ছে তার আর শেষ নেই। অভঙ্গুর কাচ তো বহুদিন তৈরী হয়েছে, নমনীয় কাচেরও চেষ্টা হচ্ছে। কাচের সুতা তৈরী করে কাচের কাপড়ের সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে। ভবিষ্যতে এ কাচ যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা কেউ বলতে পারে না; কারণ বিজ্ঞানীদের জয়যাত্রা কোথাও গিয়ে থামে না। তোমরা যারা আজকের কিশোর, মনে রেখো এ অগ্রগতিতে তোমাদেরও অংশ আছে। তার আরম্ভ এখন থেকেই এবং সম্ভবতঃ তার একটা মস্ত বড় ধাপ পাবে কলেজের কেমেষ্ট্রীর ক্লাসে।

শ্রীবিনায়ক সেন

জানবার কথা

১। মাছ জলের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় খাদ্যবস্তুর সন্ধানে এবং খাদ্যবস্তু দেখলেই তা উদরস্থ করে। শিকারী মাছেরাও চোখের সাহায্যে শিকারের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে এবং সুযোগ পেলেই শিকারকে আক্রমণ করে। অবশ্য এসব কথা কারোর অজানা নেই। কিন্তু ক্যাটফিস নামক মাছের বেলায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। এরা প্রায়ই

১নং চিত্র

খুব ঘোলা জলে বাস করে। কিন্তু ঘোলা জলে কিছুই চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। তবে কি এরা না খেয়ে থাকে? মোটেই না। এদের মুখের কাছে যে লম্বা শোঁয়া থাকে তার সাহায্যেই এরা খাদ্যবস্তুর সন্ধান পায়।

২। আধুনিক কালের উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতিসমন্বিত টাকশাল পূর্বে ছিল না। তবুও মানুষ তখন টাকা তৈরী করতো। টাকা তৈরীর বর্তমান অবস্থায় পৌঁছুতে মানুষের বহু সময় লেগেছিল। আজকাল ধাতু দিয়েই টাকা তৈরী হয় এবং নোট ছাপা

হয় কাগজে। মানুষ টাকার জন্যে সব বস্তু ব্যবহার করতো—তন্মধ্যে নুনের চাক্তি,

২নং চিত্র

জীবজন্তুর দাঁত, মিষ্টি আলু, বিরাট মালবাহী গাড়ীর চাকার মত বড় বড় পাথর, কাগজের টুক্‌রা, ধাতব খণ্ডও উল্লেখযোগ্য।

৩। আকাশ নীল দেখায়—একথা সবাই জানে। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, পৃথিবীর সবজায়গা থেকে আকাশ সমান নীলবর্ণের দেখা যায় না। পৃথিবীর অন্যান্য

৩নং চিত্র

অংশের তুলনায় গ্রীষ্মমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির উপর আকাশের বর্ণ বেশ গাঢ় নীল দেখায়। আকাশের উপরে সামান্য কয়েক মাইল পর্যন্ত এই নীলাভ বর্ণ দেখা যায়। কিন্তু ১৩ মাইল উচ্চতায় আকাশকে প্রায় কালো বর্ণের বলেই মনে হয়।

৪। যদিও আমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত—এই শব্দ দুটি সব সময়েই ব্যবহার করে থাকি, তথাপি আসলে কিন্তু সূর্যের উদয়ও নেই, অস্তও নেই। পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলেই মনে

হয়, সূর্যই যেন প্রকৃতপক্ষে দিকচক্রবালের উপরে ক্রমশঃ উদয় হচ্ছে এবং আবার ধীরে

৪নং চিত্র

ধীরে অস্তাচলে গমন করছে।

৫। বরফাচ্ছন্ন মেরু অঞ্চলের কথা অনেকেই শুনে থাকবে। এই অঞ্চলের যেখানেই তাকানো যাক, সর্বত্র কেবল বরফই দেখা যায়। সেখানে সে সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের চাঁই দেখা যায়—তা আমাদের ধারণাতীত। কেন না, আমরা তো

৫নং চিত্র

শুধুমাত্র কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত বরফ দেখতেই অভ্যস্ত। উত্তর মেরুর সন্নিহিত গ্রীণ-ল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে প্রায় এক মাইল পুরু বরফের চাঁই দেখা যায়। আবার দক্ষিণ মেরুর নিকট প্রায় দুই মাইল পুরু বরফের চাঁই-ও দেখতে পাওয়া যায়।

৬। আজকাল ঘোড়ার যে দৈহিক আয়তন দেখা যায়, চিরদিনই যে এদের এরূপ আয়তন ছিল—একথা মনে করা ভুল। এদের পূর্বপুরুষদের দেহায়তনের কথা শুনলে বিস্মিত হতে হয়। ক্রমবিবর্তনের ধারায় ঘোড়ার দেহায়তনে এই পরিবর্তন ঘটেছে। এক সময়ে এদের পূর্বপুরুষদের দেহের আয়তন ছিল একটি সাধারণ একটা বিড়ালের মত

এবং এক জাতীয় ড্র্যাগনফ্লাই বা ফড়িং কখনও কখনও দু-ফুটেরও বেশী বড় হতো

৬নং চিত্র

তাহলেই বুঝে দেখ, ঘোড়া এবং ফড়িং-এর কি রকম দৈহিক পরিবর্তন ঘটেছে !

৭। চন্দ্র বড় না পৃথিবী বড়? নিঃসন্দেহে পৃথিবীই বড়। কেন না, চন্দ্র হচ্ছে পৃথিবীর উপগ্রহ। পৃথিবীর আয়তনের তুলনায় চন্দ্রের আয়তন হচ্ছে ১/৪৯ ভাগ। এ থেকেই বোঝা যায়—চন্দ্রের তুলনায় পৃথিবী কত বড়! বিজ্ঞানীদের মতে, চন্দ্রেও পৃথিবীর মত
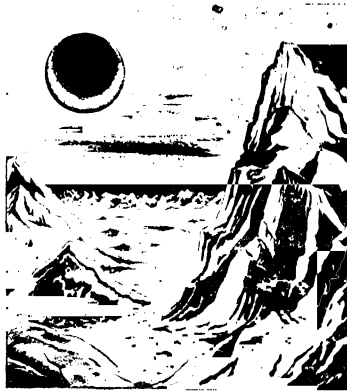
৭নং চিত্র

পাহাড়-পর্বত আছে। পৃথিবীর পাঁচটি গিরিশৃঙ্গ ব্যতীত আর সবগুলির তুলনায় চন্দ্রের গিরিশৃঙ্গগুলি বৃহত্তর। চন্দ্রের ডুয়ারফেল পর্বতটির উচ্চতা হচ্ছে ২৬,৬৯১ ফুট।

৮। আমরা জানি—সোনা হলো খনিজ পদার্থ। কিন্তু যাবতীয় সমুদ্রের জলেই সোনা আছে বলে জানা গেছে। তবে সমুদ্রের জল থেকে এই সোনা উদ্ধার করা সহজ ব্যাপার নয়। সেজন্যে সমুদ্র-জলের সোনাকে কাজে লাগানো সম্ভব হয় নি। বিজ্ঞানীদের হিসাব মতে, প্রতি টন সমুদ্র-জলে প্রায় পাঁচ সেন্ট মূল্যের সোনা পাওয়া

যেতে পারে। জল থেকে এই সোনা নিষ্কাশনের জন্যে অন্ততঃ একবার ব্যাপক চেষ্টা

৮নং চিত্র

হয়েছিল—কিন্তু তা লাভজনক হয় নি এবং এখনও সমুদ্র-জল থেকে সোনা নিষ্কাশনের চেষ্টা করা লোকসানের ব্যাপার বলেই মনে করা হয়।

৯। পৃথিবীতে প্রত্যেক দিনে যেসব শিশু জন্মগ্রহণ করে তাদের সংখ্যা নির্ণয় করা খুব কঠিন ব্যাপার। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হিসাব প্রকাশ করেন। ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের বর্ষপঞ্জীর হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, প্রতি মিনিটে পৃথিবীতে ৮৩ জন এবং প্রতি ঘণ্টায় প্রায় পাঁচ হাজারের
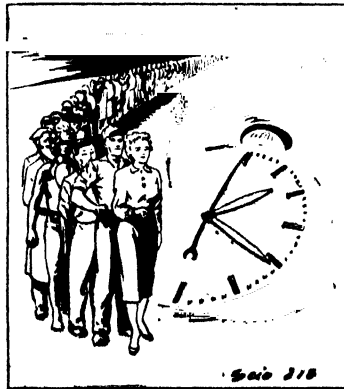
৯নং চিত্র

মত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদি এই হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে বর্তমান শতাব্দীর শেষে পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাবে। হিসাব করে দেখা হয়েছে, বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা হচ্ছে ২,৭৭৭,০০০,০০০।

১০। কর্ণহীন জীবদের মধ্যে উইচ্চিংড়ি, ঝিঁঝিঁপোকা তাদের পায়ের সন্ধি-
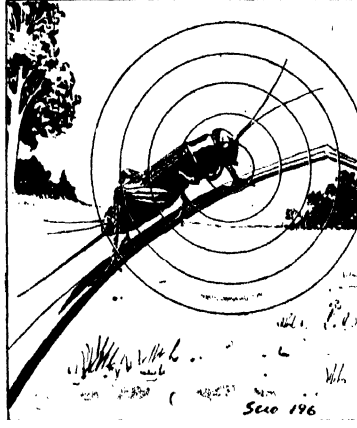
১০নং চিত্র

স্থল, অর্থাৎ হাঁটুর সাহায্যে শুনে থাকে। আর কোন জীব হাঁটুর সাহায্যে শোনে কিনা তা অবশ্য জানা যায় নি।

১১। আমরা জানি, কুকুরের ঘ্রাণশক্তি খুব তীব্র। কিন্তু নিম্নস্তরের প্রাণীদের মধ্যে প্রজাপতির ঘ্রাণশক্তিও কম নয়। এক মাইল দূর থেকেও ঘ্রাণের সাহায্যে এরা তাদের
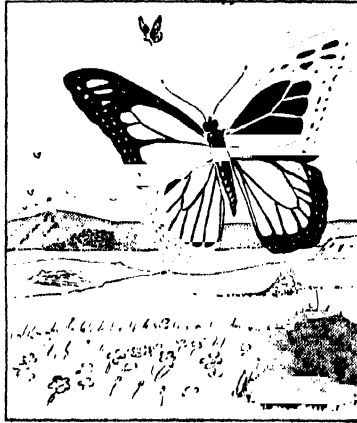
১১নং চিত্র

সঙ্গী বা সঙ্গিনীর অবস্থান নির্ণয় করতে পারে। এদের ঘ্রাণশক্তি যে কত তীব্র তা এথেকেই বোঝা যায়।

বিবিধ

পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে প্রাণ সৃষ্টি

সোভিয়েট বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সদস্য আলেকজাণ্ডার ওপারিন গত ১৬ই অগাষ্ট এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন দেশ হইতে আগত বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাকার্য চালাইলে পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে প্রাণ সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন।

গত ১৯শে অগাষ্ট মস্কোয় প্রাণের উৎস সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক সম্মেলন আরম্ভ হয়। আলেকজাণ্ডার ওপারিন বলেন যে, এই সম্মেলনে এই দিক দিয়া কাজ কিছুটা অগ্রসর হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন। জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, বৃটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মেনী প্রভৃতি চল্লিশটি দেশ হইতে বিজ্ঞানীরা পাঁচ দিনব্যাপী এই সম্মেলনে যোগ দেন।

এই সম্বন্ধে এই সম্মেলনেই প্রথম সামগ্রিক আলোচনা হয়। ইহার পূর্বে যে সকল সম্মেলন হইয়া গিয়াছে, সেগুলিতে কেবল এই সমস্যার পৃথক পৃথক দিকগুলি সম্বন্ধে পরীক্ষাকার্য চালানো হইয়াছে।

ওপারিন বলেন যে, সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের কাজে, বিশেষতঃ বস্তুর রূপান্তরীকরণের পথে নানা প্রতিবন্ধকতা আসিয়াছে বটে, কিন্তু প্রাণীদেহে যেরূপ পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, তাঁহারা সেইরূপ পরিবর্তন ঘটাইবার কাজে সাফল্য লাভ করিতেছেন।

হিমাচলে খনিজ তৈল

সম্প্রতি লোকসভায় খনি ও জ্বালানী সচিব শ্রীকে. ডি. মালব্য শ্রীপদম দেবের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন হিমাচল প্রদেশের মণ্ডি এলাকায় খনিজ তৈলের সন্ধান পাইয়াছে এবং এখানে তেল চুয়াইয়া পড়িতেও দেখা গিয়াছে।

গত মরশুমে এখানে নিয়মিতভাবে তৈলের সন্ধানকার্য চালানো হইয়াছিল এবং আগামী অক্টোবর মাস হইতে পুনরায় সন্ধানকার্য সুরু করা হইবে। অবশ্য এখন তৈল-খনি আবিষ্কার সম্পর্কে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না।

হিমাচল প্রদেশে প্রচুর সৈন্ধব লবণ রহিয়াছে এবং আরও অনেক খনিজ দ্রব্যাদি রহিয়াছে। অবশ্য অর্থ নৈতিক দিক হইতে এই সব খনিজ দ্রব্য আহরণে সুবিধা হইবে না।

অন্ধ্রে খনিজ দ্রব্যের সন্ধান

খনি ও জ্বালানী সচিব শ্রীকে. ডি. মালব্য ৩০শে অগাষ্ট লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, অন্ধ্রে খনিজ লৌহ ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্যাদি আহরণের জন্য অন্ধ্র প্রদেশ সরকার একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন।

শ্রীবেঙ্কট সুব্বার এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমালব্য বলেন যে, ভারতীয় ভূতত্ত্ব-সমীক্ষা অন্ধ্রে খনিজ দ্রব্য, ভূগর্ভস্থ জল সম্পর্কে তদন্ত করিয়া এক মানচিত্র প্রস্তুত করিতেছেন। অনন্তপুর, বেলারী, কুড্ডাপ্পা, কর্ণুল, চিত্তুর, বিশাখাপত্তন, গোদাবরী, কৃষ্ণা, নেলোর ও গুন্টুর জেলায় তথ্য সংগ্রহের কার্য সমাপ্ত হইয়াছে। গুন্টুর, কৃষ্ণা ও কর্ণুলে লোহা, পাথর, কৃষ্ণায় ক্রোমাইট, শ্রীকাকুলাম ও বিশাখাপত্তনে ম্যাঙ্গানিজ, নেলোর এবং কর্ণুল জেলার গরিমনিপেন্তা ও শ্রীকাকুলামে তাম্র, গুন্টুর, কুড্ডাপ্পা, কৃষ্ণা, পূর্ব গোদাবরী ও বিশাখাপত্তনে চুনাপাথর প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

ফুটবলের মত টোম্যাটো

বেল্টসভিল, মেরিল্যাণ্ড – এখানে এমন একপ্রকার রাসায়নিক সার আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা ব্যবহারের ফলে ১২ ফুট দীর্ঘ কপি এবং ফুটবলের আকারের

টোম্যাটো জন্মানো সম্ভব হইয়াছে। এই রাসায়নিক দ্রব্যযোগে শুধু ফসলের আকারই বৃদ্ধি পায় না, উহা তাড়াতাড়িও জন্মায়।

ফরমোসার ধানক্ষেতগুলিতে একপ্রকার ব্যাঙের ছাতা জাতীয় দ্রব্য জন্মায়। তাহা হইতেই এই সার তৈয়ারী করা হইয়াছে। এই ক্ষেতগুলিতে যে ধানগাছ জন্মিয়াছিল তাহা এরূপ দ্রুতগতিতে অস্বাভাবিক আকারে বৃদ্ধি পাইতে থাকে যে, উহার ডগাগুলি নুইয়া জলের মধ্যে পড়িয়া নষ্ট হইতে থাকে। ইহা দেখিয়াই উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা এই ব্যাঙের ছাতার গুণ সম্পর্কে সচেতন হন এবং এই সম্পর্কে গবেষণা সুরু করেন।

অফুরন্ত পারমাণবিক শক্তির উৎস সন্ধান

যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয় এবং কারখানাসংলগ্ন গবেষণাগারসমূহে পারমাণবিক বিভাজন কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে, তাহার পন্থা উদ্ভাবন করিবার জন্য বিজ্ঞানীরা উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাঁহাদের এই চেষ্টা সফল হইলে শক্তি উৎপাদন সম্পর্কে কোন সমস্যা থাকিবে না, অফুরন্ত শক্তির উৎস আবিষ্কৃত হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের যে দ্বাবিংশতিতম ষান্মাসিক রিপোর্ট কংগ্রেসে উপস্থাপিত করা হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, তাহারা নিয়ন্ত্রিত উপায়ে পারমাণবিক বিভাজন ঘটাইয়া তাপ ও শক্তি উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন এবং ইহার জন্য বিপুলভাবে চেষ্টা করা হইতেছে। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, লস্ আলামসের সরকারী গবেষণাগার এবং নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার জন্য বিশেষভাবে গবেষণা করা হইতেছে। এই প্রসঙ্গেই রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, এমন একটি বিশেষ প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য এই সকল চেষ্টা করা হইতেছে যে, পারমাণবিক বিভাজন নিয়ন্ত্রিত হইবার ফলে নিয়ন্ত্রিতভাবে শক্তি উৎসারিত হইবে। এই শক্তিকে আবার বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের কাজে লাগানো যাইবে।

ইহা ব্যতীত থার্মোনিউক্লিয়ার ফিউশন ঘটাইবারও চেষ্টা হইতেছে। পারমাণবিক বিভাজন ঘটাইবার তুলনায় ইহা অনেক বেশী কঠিন। বিভাজন প্রক্রিয়ায় ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর মত কোন ভারী পরমাণুর কেন্দ্রীয় পদার্থকে প্রায় সমান দুই-ভাগে ভাগ করিয়া ফেলা হয়। ইহার মধ্যে কিছু কিছু নিউট্রনও থাকে। কিন্তু ফিউশন বা সংযোজন প্রক্রিয়ায় দুইটি হাল্কা পরমাণুকে, যেমন—দুইটি হাইড্রোজেনের আইসোটোপকে সংযোজন করা হয়। এই দুইটি একত্রিত হইয়া ইহাদের তুলনায় ভারী একটি নিউক্লিয়াস (কেন্দ্রীয় পদার্থ) সৃষ্টি করিয়া থাকে।

এই নিয়ন্ত্রিত উপায়ে থার্মোনিউক্লিয়ার প্রতিক্রিয়া ঘটাইবার পথে যে সকল বাধা আছে তাহা হইল—

১। সংযোজন ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য পরমাণুর মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত হওয়া প্রয়োজন। ইহার জন্য দরকার প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টির।

২। তারপর বিভাজন ক্রিয়ায় যেমন পৌনঃপুনিক পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া চলিতেই থাকে, সংযোজন ক্রিয়ায়ও সেইরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টির পন্থা উদ্ভাবন করিতে হইবে। তাপমাত্রা যাহাতে একই অবস্থায় রাখা যায়, ক্ষয় না পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কমিশন ইহাতে বলিয়াছেন যে, এই ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন; তবে এখনও ইহা গবেষণার পর্যায়েই রহিয়াছে।

এই রিপোর্টে এই প্রসঙ্গে আরও বলা হইয়াছে যে, সংযোজন ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া পরিমিত শক্তি উৎপাদন পদ্ধতিতে হাইড্রোজেন, ডয়টেরিয়াম, ট্রিটিয়াম এবং হিলিয়ামের দুইটি আইসোটোপকে কাজে লাগানো হইবে। সমুদ্রের জলে যথেষ্ট ডয়টেরিয়াম আছে। তাহা হইতে ভবিষ্যতে লক্ষ লক্ষ বৎসর সমগ্র মানবজাতি শক্তি উৎপাদন করিতে পারিবে।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দশম বর্ষ | অক্টোবর, ১৯৫৭ | দশম সংখ্যা

মায়াবী তীরের সন্ধানে

শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল

"জীবনের মূলে রয়েছে দহনকার্য। স্বপ্ন মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ সঞ্জাত এবং মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ সাধারণ দহনকার্য ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বপ্ন হচ্ছে মস্তিষ্কের একপ্রকার জ্যোতিবিকিরণ।" কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্রদের জীবন স্বপ্ন বিষয়ক একটি রচনা লেখবার আদেশ করায় জনৈক ছাত্র উপরের কথাগুলি লিপিবদ্ধ করে। এর পুরস্কার স্বরূপ তাকে যে খুব খারাপ নম্বর পেতে হয়েছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। অদ্ভুত প্রকৃতির এই ছাত্রটি নাম পল আরলিখ; জাতিতে ইহুদী। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে জার্মেনীর সাইলিসিয়া প্রদেশে তাঁর জন্ম হয়।

পল আরলিখ একজন প্রসিদ্ধ জীবাণু-শিকারী। চেহারাতে আধুনিকতার ছাপ ছিল খুবই প্রকট, কিন্তু তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে প্রবাহিত হতো মধ্যযুগীয় একটা আমেজ। মায়াবী তীর নিক্ষেপ করে জীবাণু ধ্বংস করতে হবে—এ কথাটি প্রায়ই তাঁর মুখে শোনা যেত। এই উক্তি তাঁকে সকলের কাছে হাস্যাস্পদ করে তুলেছিল। ক্ষ্যাপা ডাক্তারের কার্টুন এঁকে শত্রুপক্ষের লোকেরা তাঁকে উপহাস করতো। অবশেষে পল আরলিখ কিন্তু সত্যই এক সুপ্রভাতে মায়াবী তীর তৈরী করে ফেললেন। মারাত্মক বিষ আর্সেনিক থেকে তিনি এমন এক ওষুধ আবিষ্কার করেন যার প্রভাবে অগণিত মানুষের জীবন সিফিলিস রোগের প্রকোপ থেকে রক্ষা পেয়েছে। এই ওষুধ আবিষ্কারের জন্যে পল আরলিখের কত পরিশ্রম, কত উদ্যম ও কত অর্থ ব্যয়িত হয়েছিল তার কাহিনী খুবই বিস্ময়কর।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনান্তে পল পর পর কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজে পাঠ গ্রহণ করেন। ব্রেসল, ষ্ট্রাসবার্গ, ফ্রাইবার্গ এবং লাইপজিগ কলেজের অধ্যাপকদের অভিমত ছিল এই যে, পল আরলিখ সাধারণ ছেলেদের মত নয়; সে খারাপ ছেলেদের দলে। যেসব দীর্ঘ নামের তালিকা ডাক্তারী ছাত্রদের মুখস্থ করতে হতো, তিনি সে সব মুখস্থ করতে সব সময়েই বিরত থাকতেন। পল ছিলেন বিদ্রোহী—মুখ্যতঃ লুই পাস্তুর এবং রবার্ট ককের পরিচালিত বিদ্রোহের মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি। অধ্যাপকেরা শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করে দেহের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে

পরিচিত হওয়ার নির্দেশ দিলে, পল সেই দেহের বিশেষ কোন একটি অঙ্গচ্ছেদ করে তাকে আরও সূক্ষ্মতর অংশে ব্যবচ্ছেদ করতেন এবং সেসব সূক্ষ্মতর অংশের মধ্যে নানাপ্রকার রং দিয়ে রঞ্জিত করে দেখতেন। কেন যে তিনি রং দিয়ে রঞ্জিত করতে পছন্দ করতেন, সে বিষয়ে তাঁর নিজেরই কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পলের এক আনন্দের ব্যাপার ছিল, এসব উজ্জ্বল রঙের শিশির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা।

পল বিশ্বাস করতেন, রুগ্ন ব্যক্তিকে নিরাময় করবার সঙ্গে সঙ্গে জীবাণুরও প্রাণসংহার করা সম্ভব। রোগীদের যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে চিন্তামগ্ন হয়ে তিনি এমন তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকতেন যে, মনে হতো যেন সে দৃষ্টি ত্বক ভেদ করে শরীরের অভ্যন্তরে দেখবার জন্যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মত অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে উঠতো। সেই অণুবীক্ষণের মাধ্যমে তিনি যেন সুস্পষ্টভাবে নিরীক্ষণ করতে পারতেন, জীবন্ত কোষের দল নেচে নেচে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেহের মধ্যে। এসব কোষ রাসায়নিক জটিল ফর্মুলার রূপ নিয়ে তাঁর চোখের সম্মুখে মূর্ত হয়ে উঠতো। জীবন্ত কোষ এবং শৃঙ্খলিত কার্বন পরমাণুর দ্বারা রচিত বলয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য তাঁর কাছে ছিল না। রঙের অণু এবং জীবন্ত কোষের অণুর মধ্যে তিনি বিশেষ কিছু স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করতে পারতেন না। পল যে যুগে এসব কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করতেন, সেই যুগে ঐরূপ কল্পনা করা একটি বিপ্লবাত্মক ঘটনা। পল এভাবে কল্পনার সাহায্যে নিজের মনোমত জীবনের রাসায়নিক ব্যাখ্যা খাড়া করে তোলেন। অকস্মাৎ তিনি একটি ঘোষণা প্রচার করেন—জীবন্ত প্রাণীকে আমি রঞ্জিত করবো। রং এবং জীবন্ত কোষের রাসায়নিক গঠন তো একই! জীবন্ত প্রাণীকে রঞ্জিত করতে পারলে তাদের সম্পর্কে অনেক তথ্যই জানতে পারা যাবে। একথা মনে হওয়ামাত্র তিনি তাঁর প্রিয় রং মেথিলিন ব্লু সামান্য পরিমাণে একটি খরগোসের কানের মধ্যে ঢেলে দিলেন। পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গেল, রক্ত-স্রোতের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে চলেছে নীল রং। কিন্তু বিস্মিত হয়ে দেখলেন, কেন জানি সেই রং স্নায়ুতন্ত্রের প্রত্যন্ত দেশে এসে স্থির হয়ে গেল এবং শুধুমাত্র সেই অংশটুকুকেই রঞ্জিত করে দিল। এ তো ভারি অদ্ভুত ব্যাপার! বিজ্ঞানের সব তত্ত্ব-কথা তিনি বিস্মৃত হলেন। তাঁর এক অদ্ভুত ধারণার উদয় হলো—হয়তো বা মেথিলিন ব্লু বেদনা হরণ করতে পারবে। যেমনি ভাবা অমনি তিনি সেই মেথিলিন ব্লু কয়েকজন যন্ত্রণাকাতর রোগীকে ইন্‌জেকশন করে দিলেন। কেউ কেউ কিছু আরাম পেল বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নানাপ্রকার উপসর্গের সৃষ্টি হলো। পলের কল্পনা শূন্যে মিলিয়ে গেল। তা যাক—কিন্তু এই ঘটনা থেকে পল খুঁজে পেলেন তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার সূত্র। দেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অংশকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র স্নায়ুতন্ত্রকে রঞ্জিত করতে পারে—মেথিলিন ব্লু'র এই বৈশিষ্ট্য দেখে তিনি এক অদ্ভুত ধারণার বশবর্তী হয়ে উঠলেন। পলের মনে হলো—প্রাণীদেহের শত শত তন্তুকে ছেড়ে শুধুমাত্র বিশেষ একটি তন্তুকে রঞ্জিত করতে পারে এই রং; সুতরাং এমন কোন রং পাওয়া যেতে পারে যার সাহায্যে মানুষের দেহের কোন তন্তুকে বিন্দুমাত্র রঞ্জিত না করেও শুধুমাত্র যে জীবাণু সেই দেহকে আক্রমণ করেছে, তাকেই রঞ্জিত করতে পারা যাবে এবং অবশেষে তার বিনাশ ঘটানও অসম্ভব হবে না। সুদীর্ঘ পনেরো বছরের অক্লান্ত চেষ্টার পর সেই স্বপ্নকে তিনি বাস্তবে পরিণত করতে সাফল্য লাভ করেছিলেন।

ইমিউনিটি ও বিষের প্রভাব জীবনের সঙ্গে কেমন ভাবে আত্মিক সূত্রে আবদ্ধ আছে, সে বিষয়ে পল কিছুদিন রবার্ট ককের অধীনে গবেষণা করেন এবং তার কিছুদিন পরে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে পল আরলিখ বার্লিনের নিকট Royal Prussian

Institute for Serum Testing নামক প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু ইমিউনিটি ও সিরাম সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর কার্যাবলী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কর্মকেন্দ্র সরিয়ে আনেন ফ্রাঙ্কফুর্ট অন মেন নামক শহরে। ফ্রাঙ্কফুর্ট বার্লিনের কর্মকোলাহল থেকে বেশ দূরে নিরিবিলি পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত। তাছাড়া ফ্রাঙ্কফুর্ট তখন বড় বড় রসায়ন-বিজ্ঞানীদের পরিচালনায় নানাপ্রকার রং প্রস্তুতের জন্যে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। পলের তখন রঙের প্রতি তীব্র আকর্ষণ। বহু বিত্তশালী ইহুদী তখন ফ্রাঙ্কফুর্টে ছিলেন এবং তাঁদের জনকল্যাণ স্পৃহা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। G আদ্যাক্ষরযুক্ত চারটি জার্মান শব্দের আবেদন পলের নিকট খুবই তীব্র ছিল; যেমন—Geld বা অর্থ, Geduld বা ধৈর্য, Geschick বা কৌশল এবং Gluck বা ভাগ্য—এই চারটি বিষয়ের সম্মিলন মায়াবী তীর আবিষ্কারের জন্যে একান্তভাবে প্রয়োজনীয় বলে পলের ধারণা জন্মেছিল। এই সবগুলি বিষয়ের সাক্ষাৎ ফ্রাঙ্কফুর্টে ঘটতে পারবে বলেই পল ফ্রাঙ্কফুর্টে তাঁর কর্মকেন্দ্র সরিয়ে আনেন।

পলের সম্পর্কে একটি বিচিত্র ব্যাপার এই যে, তাঁর যাবতীয় চিন্তার খোরাক অতি অল্পই তিনি প্রকৃতির রাজ্য থেকে সংগ্রহ করতেন। বই-এর মাধ্যমে তাঁর যতকিছু জ্ঞান ও চিন্তার সন্ধান তিনি পেতেন। পৃথিবীর যে কোন ভাষায় প্রকাশিত রসায়ন বিজ্ঞান সংক্রান্ত অধিকাংশ পত্রিকার তিনি গ্রাহক ছিলেন! এই সব ভাষার অনেকগুলির সঙ্গেই তাঁর কোন পরিচয় ছিল না। তবুও তিনি এই সব বৈজ্ঞানিক পুঁথির মধ্যে ডুবে থাকতেন। তাঁর গবেষণাগারের প্রতিটি আনাচে-কানাচে ছিল বই-এর স্তূপ এবং কোন দর্শক এলে তাঁর পক্ষে বই-এর উপর ছাড়া বসবার আর কোন জায়গা থাকতো না। এসব বই এবং তার সঙ্গে অফুরন্ত সিগারের ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর বহু অর্থ নিঃশেষে উবে যেত।

মায়াবী তীর আবিষ্কারের জন্যে পল যে গবেষণা সুরু করেন তারই প্রাক্কালে, ১৯০১ সালে তিনি একদিন অ্যালফন্‌সে ল্যাভেরান নামে একজন জীবাণু-শিকারীর গবেষণার বিবরণ পাঠ করছিলেন। ল্যাভেরান ট্রাইপ্যানোসোম জীবাণু নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। এই ট্রাইপ্যানোসোম জীবাণুর আক্রমণে ঘোড়ার পশ্চাদ্দেশে মল-ডি-ক্যাডিরাস নামে একপ্রকার রোগ দেখা দেয়। ল্যাভেরান সেই ট্রাইপ্যানোসোম জীবাণু ইঁদুরের দেহে ইনজেক্ট করে দেখেন যে, এই জীবাণুর আক্রমণে প্রত্যেকটি ইঁদুর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ট্রাইপ্যানোসোম জীবাণু-আক্রান্ত ইঁদুরের দেহে ল্যাভেরান আর্সেনিক বিষ ইনজেক্ট করে দেখলেন, কিছু কিছু ইঁদুরের সামান্য উপকার হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ল্যাভেরান এই পর্যন্তই লক্ষ্য করেছিলেন মাত্র।

ল্যাভেরানের কাজের এই বিবরণ পড়বার সঙ্গে সঙ্গে পলের মন আলোড়িত হয়ে উঠলো। এই তো পরীক্ষার উপযুক্ত একটা জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেছে! ট্রাইপ্যানোসোম জীবাণু অপেক্ষাকৃত বৃহদাকৃতির এবং সাধারণ মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে সহজেই লক্ষ্য করা যায়। ইঁদুরের দেহে এদের খুব সহজেই বংশবৃদ্ধি ঘটে। কাজেই ট্রাইপ্যানোসোম জীবাণুর সাহায্যে মায়াবী তীর সন্ধানের কাজ সুরু করা যেতে পারে।

১৯০২ সাল থেকে সুরু হলো পলের মায়াবী তীর সন্ধানের কাজ। বিভিন্ন রঙের শিশিতে লেবরেটরীর তাকগুলি ভরে উঠতে লাগলো। সিগা নামে জনৈক জাপানী ডাক্তার পলের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এলেন। মল-ডি-ক্যাডিরাস উৎপাদনকারী ট্রাইপ্যানোসোম জীবাণু একটি মৃত গিনিপিগের দেহের মধ্যে প্যারিসের পাস্তুর ইনষ্টিটিউট থেকে আনা হলো। একটি ইঁদুরের

দেহে এই বীজাণু ইনজেক্ট করে দেওয়া হলো। একের পর এক করে পাঁচ শত বিভিন্ন রং প্রয়োগ করে পরীক্ষাকার্য চালিয়ে যেতে লাগলেন তাঁরা দুজনে—পল ও সিগা। পল নানারকম ফন্দিফিকির বের করেন এবং সিগা সেগুলিকে প্রয়োগ করে তাদের ফলাফল পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। ইঁদুরগুলি কোন রঙের প্রভাবে নীলবর্ণ, কোনটির প্রভাবে বা হলুদবর্ণ ধারণ করে থাকে, আর ওদিকে ট্রাইপ্যানোসোম জীবাণুগুলি সেসব ইঁদুরের রক্তস্রোতে উল্লাসে নৃত্য করতে থাকে। শতকরা একটি ইঁদুরও বাঁচে না, একের পর এক মৃত্যুবরণ করে।

ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা এসে পলের মন চিন্তাক্লিষ্ট করে তোলে। এমন সময় একদিন (১৯০৩ সালে) তিনি লক্ষ্য করলেন, বেঞ্জোপারপিউরিন নামে একটি রং ইঁদুরের রক্তে সুচারুরূপে ছড়িয়ে পড়ে না। অমনি পলের চিন্তাস্রোত এক বিচিত্র খাতে প্রবাহিত হলো। তিনি সিগাকে উদ্দেশ করে বললেন—দেখ, যদি সামান্য একটু পরিবর্তন করে, অর্থাৎ একটি সালফো-গ্রুপ বেঞ্জোপারপিউরিন অণুর মধ্যে সংযোগ করে দেওয়া যায় তবে হয়তো সামান্য পরিবর্তিত রঙটা ইঁদুরের রক্তে ভালভাবে মিশে গিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

পল নিজে বড় একটা জটিল যন্ত্রপাতির ধার ধারতেন না; শুধু মাত্র টেষ্ট টিউবের মধ্যে এটা ওটা রং ঢেলে সামান্য সামান্য কাজকর্ম করতেন। কিন্তু তাঁর রাসায়নিক জ্ঞানের অপ্রতুলতা ছিল না। তিনি অভিজ্ঞ এক রসায়ন-বিজ্ঞানীকে তাঁর মতলব বুঝিয়ে দিলেন এবং সেই বিজ্ঞানীর অধ্যবসায়ের ফলে তৈরী হয়ে এল সামান্য পরিবর্তিত বেঞ্জোপারপিউরিন রং।

দুটা হৃষ্টপুষ্ট ইঁদুরের দেহে সিগা ট্রাইপ্যানোসোম জীবাণু ইনজেক্ট করে দিলেন। একদিন যায়, দুদিনও শেষ হতে চলে—ইঁদুরের চোখগুলি ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসে এবং আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকায় দেহের প্রতিটি লোম খাড়া হয়ে ওঠে। আর একটি দিনের মধ্যেই তাদের ইহলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে। এই অবস্থায় এদেরই একটি ইঁদুরের দেহে সিগা সামান্য পরিবর্তিত বেঞ্জোপারপিউরিন রং ইনজেক্ট করে দিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ইঁদুরটি লাল হয়ে উঠলো; আধবোজা চোখের তারা পর্যন্ত গভীর লাল বর্ণ ধারণ করলো রঙের আভায়। পলের জীবনে সে একটি স্মরণীয় দিন, ভাগ্যদেবতা বুঝি প্রসন্নদৃষ্টিতে চেয়েছেন! ট্রাইপ্যানোসোম জীবাণুর দল সেই ইঁদুরের রক্তস্রোত থেকে চিরতরে বিদায় নিতে সুরু করেছে। সামান্য পরিবর্তিত বেঞ্জোপারপিউরিন—এই লাল রঙের মায়াবী তীরের আঘাতে শেষ জীবাণুটি পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করলো। ইঁদুরটির চোখের পাতা ধীরে ধীরে খুলে গেল; খাঁচার মধ্যে তার দেহটা নড়েচড়ে উঠলো এবং করুণ দৃষ্টি তুলে চারদিকে তাকাতে লাগলো। এই ইঁদুরটিই সর্বপ্রথম ট্রাইপ্যানোসোম জীবাণুর আক্রমণ ব্যর্থ করে দিল। ট্রাইপ্যান রেড নামক এই রঙের সাহায্যে তিনি সেই ইঁদুটির জীবনদান করতে সক্ষম হলেন। পল তো এমনিতেই অসম্ভব রকম আশাবাদী ছিলেন, এবারে এই সাফল্যে তিনি আরও বলীয়ান হয়ে উঠলেন। কিন্তু এই সাফল্য যেন গভীর তিমিরের মধ্যে ক্ষণিকের বিদ্যুৎঝলকের মত দেখা দিয়ে আবার শূন্যে মিলিয়ে গেল। অসীম অধ্যবসায় সহকারে সিগা ইঁদুরের দেহে ট্রাইপ্যান রেড ইনজেক্ট করতে সুরু করে দিলেন। ফলে, কোন কোন ইঁদুর একটু সুস্থ হয়ে উঠলো, আবার কোন কোনটির ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ ষাট দিন পরে হঠাৎ নানা রকম উপসর্গ দেখা দিতে লাগলো—কারো লেজ হয়তো বা খুলে গেল। সিগা পলকে ডেকে এনে দেখালেন, সেই ইঁদুরের রক্তে ট্রাইপ্যানোসোম জীবাণুর দল অবদমিত, কিন্তু একেবারে মৃত নয়। ট্রাইপ্যানোসোম জীবাণুগুলির সহনশীলতা অদ্ভুত।

রঞ্জক পদার্থের সাহায্যে আক্রমণ চলবার সময় এদের মধ্যে কতকগুলি শক্তিশালী জীবাণু হয়তো রঙের অণুগুলিকে জড়িয়ে ফেলে কিংবা রঙের অণুগুলি থেকে দূরে সরে গিয়ে উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকে। সুযোগ উপস্থিত হলেই তারা হাজারে হাজারে বংশবিস্তার করতে সুরু করে। এভাবে পলের সামান্য সাফল্যের পশ্চাতে হতাশার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। ইঁদুরের দেহে যে ট্রাইপ্যানোসোম জীবাণু ট্রাইপ্যান রেডের আক্রমণে কাবু হয়ে পড়ে, সেই ট্রাইপ্যানোসোম জীবাণু যখন বাসা বাঁধে গিনিপিগ, কুকুর প্রভৃতির দেহে, সেখানে ট্রাইপ্যানোসোম জীবাণু আদৌ ট্রাইপ্যান রেডের সংস্পর্শে আসে না। ফলে, পলের মত ধৈর্যশীল ব্যক্তির পক্ষেও এই বিফলতার তাড়না সহ্য করা ভয়ানক পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। যাহোক, এসব পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পলের ধারণা হলো যে, আপাতদৃষ্টিতে কোন অকেজো রঙের অণুর মধ্যে সামান্য একটু পরিবর্তন করতে পারলে সেই অণুটিকে রোগ উপশমকারী ওষুধে পরিণত করা যেতে পারে। এই বিশ্বাসই আবার পলকে নতুন কর্মস্রোতের মধ্যে ঠেলে দিল।

এই সময়ের মধ্যে ফ্রাঙ্কফুর্টে পলের খ্যাতি দিন দিনই বেড়ে উঠতে লাগলো। ১৯০৬ সালে পলের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো। জর্জ স্পাইয়ার নামক এক ধনীব্যক্তির বিধবা পত্নী মিসেস স্পাইয়ার তাঁর স্বামীর স্মৃতিরক্ষার্থে জর্জ স্পাইয়ার হাউস্ নামে একটি গবেষণাগার স্থাপনের সঙ্কল্প করে পলকে প্রচুর অর্থ দান করেন। জর্জ স্পাইয়ারের বিধবা পত্নীর সাহায্য না পেলে হয়তো পল তাঁর মায়াবী তীরের সন্ধান কখনও পেতেন কিনা সন্দেহ। এই অর্থে পল এক বিরাট গবেষণাগার গড়ে তোলেন এবং অভিজ্ঞ রাসায়নিক নিযুক্ত করেন এবং তাঁদের দিয়ে নানারকম রং প্রস্তুত করিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে যেতে লাগলেন পূর্বের মত। কিন্তু নিয়মিতভাবে প্রত্যেকটি রঙের পরীক্ষা সত্বেও সাফল্যের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। রসায়ন-বিজ্ঞানীরা আড়ালে তাঁকে নির্বোধ বলে উপহাস করতে লাগলেন।

পল একদিন লাইব্রেরীতে বসে একখানি রাসায়নিক পত্রিকা পড়ছিলেন। হঠাৎ অদ্ভুত একটা ওষুধের নাম তাঁর চোখে পড়লো—অ্যাটক্সিল শব্দটির অর্থ 'বিষ নয়'। বিষ নয়—এই অ্যাটক্সিল ঘুমরোগের আক্রমণ থেকে অনেক ইঁদুরকে রক্ষা করেছে এবং যাদের মধ্যে ঘুমরোগের জীবাণু নেই, সেসব ইঁদুরকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু অ্যাটক্সিলের সাহায্যে ঘুমরোগের আক্রমণ সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় নি। কেন না, ঘুমরোগের আক্রমণ থেকে মুক্ত হলেও সেসব ইঁদুর অল্পদিনের মধ্যেই প্রায় অন্ধ অথবা অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যেতে সুরু করে অ্যাটক্সিলের প্রভাবে। অ্যাটক্সিলের মধ্যে বেঞ্জিন নামক একটি জৈবপদার্থ ও আর্সেনিক রাসায়নিকভাবে সংযুক্ত আছে। এই বিবরণটি পাঠ করবার সঙ্গে সঙ্গে পলের খেয়াল হলো—আটক্সিলকে সামান্য একটু পরিবর্তন করতে হবে। যদিও তিনি জানতেন যে, রসায়ন-বিজ্ঞানীরা বলেছেন, অ্যাটক্সিলকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস না করে কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়। পল লেবরেটরীতে বসে ভাবতে লাগলেন, কিভাবে অ্যাটক্সিলের এই সামান্য পরিবর্তনটুকু ঘটানো যায়। পলের লেবরেটরীটি অদ্ভুত রকমের। কারণ, এখানে না ছিল একটা বিকার, না ছিল একটা রেটর্ট, না ছিল একটা থার্মোমিটার। অনেক সময় রঙের শিশিগুলির লেবেল পর্যন্ত থাকতো না। কিন্তু পলের স্মৃতিশক্তি এমনই প্রখর ছিল যে, প্রতিটি শিশির মধ্যে যে রং থাকতো তার প্রত্যেকটিকেই তিনি নির্ভুলভাবে সনাক্ত করতে পারতেন। এসব রঙের শিশির মধ্যে একটি মাত্র বুনসেন বার্ণারের জ্বলন্ত শিখা লেবরেটরীর দর্শকদের অভ্যর্থনা জানাতো। কিন্তু এই লেবরেটরীতে বসেই একদিন তিনি বলে

উঠলেন—অ্যাটক্সিলকে আমি পরিবর্তিত করতে পারবো এবং ভগবানই জানেন, কত শত যৌগিক পদার্থই যে তা থেকে তৈরী হবে! আত্মহারা হয়ে তিনি ছুটে গেলেন তাঁর প্রধান রসায়নিক বার্থহাইমের ঘরে এবং তাঁকে বললেন—অ্যাটক্সিলের পরিবর্তন সম্ভব। আমরা এই অ্যাটক্সিল থেকেই কয়েক শত, এমন কি, আর্সেনিকের কয়েক সহস্র নতুন যৌগিক প্রস্তুত করতে পারবো। পল চিৎকার করে এমনি সব কত কথা বললেন বার্থহাইমকে এবং ভূরি ভূরি সব অদ্ভুত প্রক্রিয়ার বিষয় উল্লেখ করলেন।

দীর্ঘ দুটি বছর ধরে পল ও তাঁর সহকর্মীদের কঠোর পরিশ্রম চলতে লাগলো। অবশেষে অ্যাটক্সিল পরিবর্তিত করে এক নতুন যৌগিক পাওয়া গেল এবং নতুন যৌগটির প্রভাবে ট্রাইপ্যানোসোমে আক্রান্ত কয়েকটি ইঁদুর সেরে উঠলো। ট্রাইপ্যানোসোম জীবাণু ইঁদুরের দেহ থেকে বিদায় নিয়ে গেল বটে, কিন্তু কোন কোন ইঁদুরের রক্ত জল হয়ে গেল এবং কোন কোন ইঁদুর তাদের বাকী জীবনটা নেচে কাটাতে সুরু করলো। তারা বেঁচে গেল সত্য, কিন্তু সেজন্যে যে মূল্য তাদের দিতে হলো তাতে শয়তান যেন উল্লাসে নৃত্য সুরু করে দিল। ট্রাইপ্যানোসোম জীবাণুর আক্রমণ থেকে সম্পূর্ণ নিরাময়ের ব্যাপারটা সকলের নিকট অসম্ভব বলেই মনে হতে লাগলো।

পল ছিলেন আশাবাদী। অবিচলভাবে তিনি কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। নতুন নতুন আরও সব যৌগিক আবিষ্কৃত হতে লাগলো, কিন্তু রোগ নিরাময়ে তারা কোন কাজেই এল না। অত্যধিক মাত্রায় এই পদার্থগুলি ইঁদুরের দেহে ইনজেক্ট করবার ফলে তাদের প্রাণহানির শঙ্কা বেশী হওয়াতে তিনি অল্পমাত্রায় এসব পদার্থ ইনজেক্ট করতে লাগলেন। ফল বিপরীত হলো। অল্প মাত্রায় ব্যবহারের ফলে ট্রাইপ্যানোসোম জীবাণু এসব ওষুধের বিপক্ষে প্রতিরোধ, অর্থাৎ ইমিউনিটি সঞ্চয় করে দিব্যি আরামে ইঁদুরের রক্তে বিচরণ করতে লাগলো এবং ইঁদুরগুলি দলে দলে মৃত্যুবরণ করতে সুরু করলো।

এভাবে প্রথম পাঁচশত একানব্বইটি আর্সেনিকের যৌগিক পদার্থের সাহায্যে যে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল, তার প্রতিটির সঙ্গেই জড়িত ছিল ব্যর্থতার ইতিহাস। পল কিন্তু অবিচলিত উৎসাহে নতুন নতুন পরিকল্পনা করতে লাগলেন এবং বার্থহাইমকে নতুন নতুন যৌগিক প্রস্তুতের নির্দেশ দিতে লাগলেন। অবশেষে বহু পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে ১৯০৯ সালে পল এসে পৌঁছলেন তাঁর জীবনের আকাঙ্ক্ষিত দিনটিতে। সেদিন পল তাঁর ছয়শত-ছয় (৬০৬) সংখ্যক যৌগিকের সন্ধান পেলেন। এর আবিষ্কারের পশ্চাতে বার্থহাইমের অক্লান্ত অধ্যবসায়কেও স্মরণ করতে হবে। অসীম ধৈর্য ও যত্ন সহকারে প্রস্তুত করতে হয় এই যৌগিক পদার্থটিকে। দাহ্য ইথার নামক দ্রাবক থেকে খুব সতর্কতার সঙ্গে পৃথক করতে হয়। এতে এতদূর সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় যে, ক্ষণিকের জন্যেও বায়ুর সংস্পর্শে এলে পদার্থটি একটি মারাত্মক বিষে পরিণত হয়ে যায়। ৬০৬ সংখ্যক যৌগিককে রসায়ন বিজ্ঞানীদের ভাষায় বলা হয়—ডাইঅক্সি-ডাই-অ্যামিনো-আর্সেনো বেঞ্জোন-ডাইহাইড্রোক্লোরাইড। ট্রাইপ্যানোসোম জীবাণু ধ্বংস করতে এই পদার্থের প্রভাব ও ক্ষমতা প্রচণ্ড। এক মাত্রাতেই ট্রাইপ্যানোসোম জীবাণু সবংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং কোন প্রকার বিরূপ উপসর্গ, যেমন—রক্ত জল হয়ে যাওয়া, নাচন সুরু হওয়া প্রভৃতি আদৌ দেখা দেয় না। ৬০৬ সংখ্যক যৌগিকটি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ ওষুধ।

১৯০৬ সালে জার্মান প্রাণিতত্ত্ববিদ শওডিন সিফিলিস রোগের কারণ স্পাইরোসেটা প্যালিডা নামক জীবাণু আবিষ্কার করেন। এই জীবাণুগুলি দেখতে হাতল-ছাড়া কর্ক-স্ক্রুর মত। এই জীবাণু

সম্পর্কে শওডিন লিখেছিলেন যে, স্পাইরোসেটা প্রাণিজগতের অন্তর্গত এবং বস্তুতঃ, ট্রাইপ্যানোসোম জীবাণুর সঙ্গে এদের সম্পর্ক আছে⋯স্পাইরোসেটা থেকে কখনও কখনও ট্রাইপ্যানোসোমের উদ্ভব হতে পারে। পল একদিন এই বিবরণটি পাঠ করছিলেন। স্পাইরোসেটার সঙ্গে ট্রাইপ্যানোসোম জীবাণুর যে সম্পর্ক শওডিন একদিন কল্পনা করেছিলেন, সেই তথ্যটি পলকে আর একভাবে অনুপ্রাণিত করলো। যদি ট্রাইপ্যানোসোম আর স্পাইরোসেটার মধ্যে সম্পর্ক থেকে থাকে তাহলে যার সাহায্যে ট্রাইপ্যানোসোম ধ্বংস করা যায়, সেই একই তীরে তারই সগোত্রীয় স্পাইরোসেটাকেও নিহত করা যাবে! পল মোটেই চিন্তা করে দেখলেন না যে, ট্রাইপ্যানোসোম ও স্পাইরোসেটার মধ্যে যে সম্পর্ক কল্পনা করা হয়েছে, তা যে সত্য তার প্রমাণ কোথায়? কিন্তু অবিচলিত ও দৃঢ় পদক্ষেপে পল এগিয়ে চলেন নতুন এক দুঃসাহসিক অভিযানে।

খরগোসের মধ্যে সিফিলিসের জীবাণু ইনজেক্ট করা হলো। এই পরীক্ষাকার্যে পলের সহকারী নিযুক্ত হলেন জাপানী এক জীবাণু-শিকারী এস, হাতা। একই পরীক্ষা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বার বার করতে তিনি কখনই ক্লান্তি বোধ করতেন না। শুধু কি তাই—একই সঙ্গে বারোটি বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষাকার্যও চালাতে পারতেন, এমনই ছিল তাঁর কৌশল ও ধৈর্য। ১৯০৯ সালে অগাষ্ট মাসের একটি দিনে তাঁরা উভয়ে সেই সিফিলিস্-আক্রান্ত খরগোসের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে দেখছেন—হৃষ্টপুষ্ট গড়ন, সবই সুন্দর দেখতে; কেবল মাত্র অণ্ডকোষের চামড়া শিথিল হয়ে গেছে এবং সেখানে বড় বড় ক্ষত দেখা দিয়েছে। সেই ক্ষতস্থান থেকে রক্ত নিয়ে পরীক্ষায় দেখা গেল, সহস্র সহস্র স্পাইরোসেটা জীবাণু উল্লাসে নৃত্য করে বেড়াচ্ছে। পল এবার তাঁর সহকারীকে ৬০৬ সংখ্যক যৌগিক খরগোসটিকে ইনজেক্ট করতে নির্দেশ দিলেন। পরদিন দেখা গেল, ক্ষতস্থানের রক্তের মধ্যে একটিও জীবাণু নেই। আর ক্ষতস্থান। ধীরে ধীরে শুকাতে সুরু করে দিয়েছে এরই মধ্যে। নতুন পাত্‌লা চামড়া উঠতে সুরু করেছে সেখানে। এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে দেখা গেল, অণ্ডকোষ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে গেছে, কেবলমাত্র ক্ষতের চিহ্ন দুটি আছে। যাদুমন্ত্র প্রভাবে যেন সব মিলিয়ে গেছে। পল তাঁর ডাইরীতে লিখে রাখলেন—স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, উপযুক্ত পরিমাণ মাত্রা প্রয়োগ করলে স্পাইরোসেটা জীবাণু সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস করা যাবে একবার মাত্র ইনজেকশন প্রয়োগ করেই। এতদিনে পল তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত মায়াবী তীরের সন্ধান পেলেন।

পলের উৎসাহ কিন্তু এখানে এসেই থেমে গেল না। তিনি ভাবতে লাগলেন—এই যে সম্পূর্ণ-নিরাপদ ৬০৬-সংখ্যক আর্সেনিকের যৌগিকটি পাওয়া গেল, যার সাহায্যে ইঁদুর ও খরগোসকে সম্পূর্ণভাবে নিরাময় করা সম্ভব হলো, মানুষের দেহে এর কি কোন সফল প্রয়োগ হতে পারে না? এতে আর্সেনিকের বিষক্রিয়া মানুষের শরীরে দেখা দিবে না তো? ইঁদুর ও খরগোসের ক্ষেত্রে যা নিরাপদ, মানুষের পক্ষে তা যে মারাত্মক হবে না, তার প্রমাণ কোথায়? এই প্রকার সব চিন্তার মধ্যে পল আবার নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। প্রথম খরগোসটির ক্ষতস্থান শুকাবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর বন্ধু ডাঃ কনরাড অ্যাল্টকে তিনি চিঠি লিখলেন—সিফিলিসগ্রস্ত কোন রোগীর উপর আপনি অনুগ্রহ করে আমার এই ৬০৬ সংখ্যক যৌগিকের ইনজেকশন দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন কিনা। উত্তরে অ্যাল্ট সম্মতি জানালেন।

১৯১০ সাল। কনিগ্‌স্‌বার্গের এক বৈজ্ঞানিক সম্মিলনে উপস্থিত হয়েছেন পল আরলিখ। চারদিক থেকে অফুরন্ত প্রশংসা বর্ষিত হচ্ছে। এত মত্ততা, এত কোলাহল, বুঝি বা পলকে তাঁর ভাষণ

দেওয়া স্থগিত রাখতে হয়! অবশেষে পল জানালেন, কেমনভাবে তিনি তাঁর মায়াবী তীরের সন্ধান পেয়েছেন।

এই ওষুধের অভূতপূর্ব নিরাময় ক্ষমতায় বিশ্ব চমকিত হয়ে গেল। পৃথিবীর সব হাসপাতাল থেকে অনুরোধ আসতে লাগলো—এই ওষুধের জন্যে। স্যালভারসন (৬০৬ সংখ্যক যৌগিকের এই নাম দেওয়া হয়েছে) যাদুমন্ত্রের মত কাজ সুরু করে দিল সর্বত্র। পলের ছোট্ট লেবরেটরীটি একটা কারখানায় পরিণত হয়ে গেল। বার্থহাইম ও তাঁর সহকর্মীরা দিনরাত খেটে স্যালভারসন প্রস্তুত করতে লাগলেন। বিশ্বের চারদিক থেকে পলের কাছে সহস্র সহস্র প্রশংসাপত্র ও সম্মানসূচক নানা-প্রকার প্রতীক আসতে লাগলো। অবশেষে এই অভিনব আবিষ্কারের জন্যে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হলো।

পল জীবাণু-শিকারীদের সামনে এক নতুন পথ দ্বার উদ্ঘাটন করে দিলেন। রং থেকে ওষুধ তৈরীর রহস্যকে ঘিরে চারদিকে গবেষণা সুরু হয়ে গেল এবং তার ফলও পাওয়া গেল। পলের পুরনো কয়েকজন সহকর্মী এলবারফেল্ডের রঙের কারখানা থেকে এক নতুন ওষুধ আবিষ্কার করেন। তার নাম দেওয়া হলো Bayer-205। রোডেসিয়া ও নায়াসল্যাণ্ডের ঘুমরোগের অব্যর্থ ওষুধ এই Bayer-205। এভাবে আরও বহু জীবাণু-শিকারী আরও সব দুর্ধর্ষ জীবাণুকে শিকার করে মানুষকে রক্ষা করবে, একথা নিশ্চিত করে বলা চলে। এই নতুন পথের অগ্রদূত হলেন পল আরলিখ।
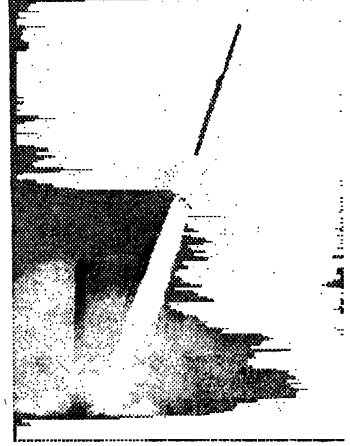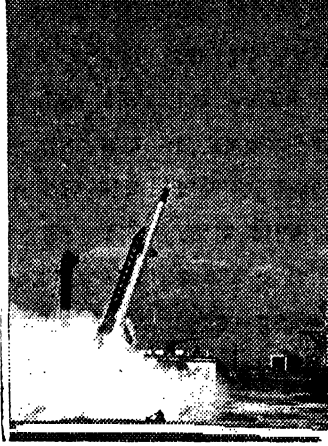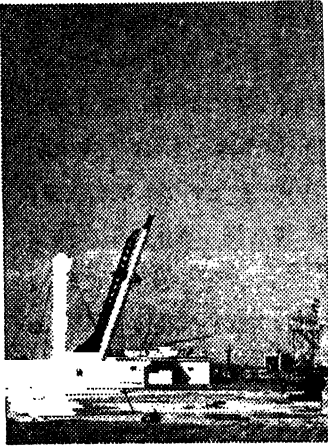
ঊর্ধ্বাকাশের তাপমাত্রার অবস্থা জানবার জন্যে বিভিন্ন যন্ত্রসমন্বিত দু-পর্যায়ী রকেট প্রেরণের ব্যবস্থা। প্রথম পর্যায়ের রকেট ৫০০০ ফুট উপরে ওঠবার পর দ্বিতীয় পর্যায় ঘণ্টায় ৩৫০০ মাইল বেগে ৮০,০০০ ফুট উঠবে। ৫৫ রকমেরও বেশী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সমেত চালকশূন্য রকেটটি ভার্জিনিয়ার ওয়ালপস্ দ্বীপ থেকে ঊর্ধ্বাকাশে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।

বিশ্ব-রহস্য

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী

বিজ্ঞানের রাজ্যে শেষ সত্য বা চরম সত্য বলে কোন মতবাদকেই মানা হয় না। যখনই আমরা কোন নতুন মতবাদকে সত্য বলে গ্রহণ করি তখনই বুঝতে হবে, এই মতবাদের সাহায্যেই সব চেয়ে ভালভাবে অনেক কিছুর ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে। কোন যন্ত্র দিয়ে কাজ করতে গেলে আমরা সেই কাজের জন্যে সব চেয়ে ভাল যন্ত্রটাকেই কাজে লাগাই। পরে তার চেয়ে ভাল যন্ত্র আবিষ্কৃত হলে আমরা আগেরটার বদলে নতুনটাকেই ব্যবহার করি। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেসব বিভিন্ন মতবাদ মানা হয় তাদের বেলায়ও একথাই খাটে। যখনই দেখা যায় কোন মতবাদের সাহায্যে একটা ব্যাপারের ব্যাখ্যা ঠিক পূর্ণাঙ্গরূপে পাওয়া যাচ্ছে না তখন কোন নতুন মতবাদকে তার ব্যাখ্যা-স্বরূপ ব্যক্ত করা হয় এবং যতদিন আর নতুন সমস্যার উদ্ভব না হয় ততদিন তাকেই মানা হয়। মানুষ বরাবরই দেখে আসছে যে, কোন জিনিষকে উপর থেকে ছেড়ে দিলে মাটিতে এসে পড়ে। এই ঘটনা কেন হয়, তার জবাব হিসাবে নিউটন বললেন যে, বিশ্বের প্রতিটি জিনিষই পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। যখন দেখা গেল, এই মত দিয়ে সব কিছুকেই ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে তখন একে সত্য বলে মেনে নেওয়া হলো। পরবর্তী কালে নিউটনের এই মতবাদ যখন কয়েকটা জায়গায় অচল হয়ে গেল তখন আইনষ্টাইন তার নতুন বাখ্যা দিলেন। দেখা গেল, আইনষ্টাইনের ব্যাখ্যায় পূর্বের সব কিছু ব্যাপারের ব্যাখ্যা তো পাওয়া যাচ্ছেই অধিকন্তু নতুন সমস্যাগুলিরও সমাধান হচ্ছে। কাজেই তখন আমরা তাঁর মতকেই মেনে নিলাম। কিন্তু এখনও আমরা বলতে পারি না বা আমাদের বলা উচিত নয় যে, আমরা এ সম্বন্ধে চরম সত্যে পৌঁছে গেছি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান বা এ সম্বন্ধে যে সব মতবাদ আছে, সে সব সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা প্রযোজ্য। উপরন্তু মুস্কিলের কথা হচ্ছে যে, এখানে আমাদের খুবই বেশী পরিমাণে নির্ভর করতে হয় অনুমান বা ধারণার উপর। তার চেয়েও বড় কথা, মানুষের চিন্তাশক্তির কোন কূলকিনারা নেই। এই মানুষই তার চিন্তাশক্তির সাহায্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আরও বড়, আরও সুদূর-প্রসারী করে দিয়েছে অথচ নিজেই খুঁজে মরছে তাকে। মানুষ যেন এক হাত দিয়ে যাকে ক্রমাগত দূরে ঠেলে এগিয়ে চলেছে, আর এক হাতে তাকেই আবার অন্ধের মত খুঁজে বেড়াচ্ছে। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য হিসাবে কোন মতবাদকে যথার্থরূপে প্রকাশের চেষ্টা অর্থহীন।

বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে মানুষ যখন থেকে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে তখন থেকেই এর দুটা জিনিষ সম্বন্ধে তাকে চিন্তা করতে হয়েছে। এক হচ্ছে, মহাবিশ্বে গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতির যে গতি তার ব্যাখ্যা, আর হচ্ছে তার সীমা।

প্রথম দিকে গ্রহ নক্ষত্র সব কিছুকেই জীবন্ত প্রাণীর ন্যায় মনে করা হতো। আকাশে এরা পাখীর মত ঘুরে বেড়ায় বা নৌকার মত ভেসে বেড়ায় বলে মনে করা হতো। প্রাচীন গ্রীকরা চাইলেন এর কোন বাস্তব যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা। তাঁদের ব্যাখ্যায় যাবতীয় বিশ্বটাই একটা বিশাল ঘূর্ণী। জলে বা বাতাসে ঘূর্ণী উঠলে খড়কুটা যেমন তার কেন্দ্রে গিয়ে জমা হয়, আমাদের পৃথিবীও তেমনি এই ঘূর্ণীর কেন্দ্রে গিয়ে

পড়েছে। পরবর্তী গ্রীক পণ্ডিতদের যুগ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত একটা নতুন মত মানা হতো। তাঁরা ভাবতেন, গ্রহ-নক্ষত্রগুলি তাদের নিজ নিজ নির্দিষ্ট বিশাল গোলকে সংবদ্ধ হয়ে আছে এবং এই গোলকগুলি পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কেন ঘুরছে, তার ব্যাখ্যা তাঁরা কিছু দেন নি বা দিতে পারেন নি। তাই তাঁরা ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর এর কারণ ছেড়ে দিয়েছেন। তারপরে আসে ডেকার্টের মতবাদ। এই মত অনুসারে যাবতীয় বিশ্বটাই হচ্ছে কতকগুলি ঘূর্ণীর সমষ্টি। এই রকম প্রতিটি ঘূর্ণীই মহাকাশে কোন নির্দিষ্ট স্থান দখল করে আছে। সূর্য হলো এই রকম একটা ঘূর্ণীর কেন্দ্রস্থিত সংহত বস্তুপিণ্ড। পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহগুলি এই ঘূর্ণীর চারদিকে খড়কুটার মত ভেসে বেড়াচ্ছে। তারপরে অবশ্য নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বের আবিষ্কারের ফলে এ নিয়ে আর বিশেষ কিছু বলবার ছিল না। তাই আইনষ্টাইনের পূর্ব পর্যন্ত এই গতির ব্যাখ্যা নিয়ে আর কোন মতবাদের উদ্ভব হয় নি।

এই বিশ্ব কত বড় এবং অসীম না সসীম? স্থান যদি অসীম না হয়ে সসীম হয় তবে সেই সীমার বাইরেই বা কি আছে? আমাদের এই যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, এ রকম কি আরও আছে? এই সব প্রশ্ন চিরদিন মানুষের মনে উদিত হয়েছে। মানবমনের এই চিরন্তন প্রশ্নের জবাব বিভিন্ন কালে চিন্তাশীল দার্শনিকেরা দিয়ে আসছেন। প্লেটো ও অ্যারিষ্টটল প্রথমদিকের এই সব দার্শনিকদের অন্যতম। তাঁরা বিশ্বকে সীমাবদ্ধ মনে করতেন। তাঁদের মতে, বিশ্বের এই সীমার বাইরে কোনও কিছু থাকতে পারে না, এমন কি শূন্যস্থানও নয়। আমরা জানি প্রাচীন গ্রীকদের মত ছিল, পৃথিবী সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্রবস্তু, আর গ্রহ-নক্ষত্রাদি সবাই তার চারদিকে ঘুরছে। এই মত মানতেন বলেই অ্যারিষ্টটল বিশ্বকে অসীম রূপে কল্পনা করতে পারেন নি। তাঁর যুক্তি ছিল এই যে, আকাশের কোন স্থান যদি পৃথিবী থেকে অসীম দূরে থাকে তবে ২৪ ঘণ্টায় তাকে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরতে অসীম পথ অতিক্রম করতে হবে। তাই তাকে অসীম গতিতে চলতে হবে। কোন পদার্থের অসীম গতিবেগের কল্পনা অবাস্তব; তাই বিশ্ব যে অসীম, এই কল্পনাও অবাস্তব। বিশ্ব যে অসীম হতে পারে না, সে সম্বন্ধে তাঁর এই যুক্তি মধ্যযুগ পর্যন্ত বেশ ভালভাবেই চলে আসছিল। কিন্তু কোপার্নিকাসের মতানুসারে যখন মেনে নেওয়া হলো যে, মহাকাশের নক্ষত্ররাজি সত্য সত্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে না, তখন অ্যারিষ্টটলের এই যুক্তি বানচাল হয়ে গেল। এই জন্যেই দেখা যায়, কোপার্নিকাসের পরবর্তী যুগে বিশ্বতত্ত্বের যাবতীয় ব্যাখ্যায় অনেকে বিশ্বকে অসীম রূপেই কল্পনা করতে প্রয়াস পেয়েছে। কোপার্নিকাস নিজে অবশ্য এ সম্বন্ধে কিছুই বলে যান নি। তিনি তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে সৌরজগৎকে সাজিয়ে তার চার দিক দিয়ে অবস্থান নির্ণয় করেছেন আমাদের দৃশ্য মহাকাশের, যেখানে আমরা নক্ষত্ররাজি দেখতে পাই। প্রকৃতপক্ষে সেই স্থানই বিশ্বের সীমা কি না, সে সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নি। তাঁর পরবর্তীদের মধ্যে তাঁর সমর্থক টমাস ডিজেসই প্রথম এ সম্বন্ধে নতুন মত ব্যক্ত করেন। মনে করুন, এক বিশাল প্রান্তর জুড়ে বহু গাছ লাগানো আছে। প্রকৃতপক্ষে একটা গাছ থেকে আর একটা গাছ কিন্তু বেশ দূরে আছে। কিন্তু বহু দূর থেকে যদি দেখা যায় তবে মনে হবে, গাছগুলি যেন পরস্পরের অতি নিকটে এক লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। বহু দূর থেকে দেখলে তাদের কোন্‌টি কাছে আছে, কোন্‌টি দূরে আছে তা বোঝা যাবে না। টমাস ডিজেস বললেন, অসীম স্থান জুড়ে নক্ষত্ররাজি ছড়িয়ে আছে; কিন্তু তারা বহু দূরে আছে বলে পৃথিবী থেকে তাদের সমান দূরেই মনে হয়। তবে তিনি এই বিশ্বের কেন্দ্র হিসাবে সৌরজগৎ ছাড়া

আর কিছুকে ভাবতে পারেন নি। এর পরেই এলেন ব্রুনো। তিনি বললেন, বিশ্ব অসীম তাই তার কেন্দ্র বলে কিছু নেই। কারণ, যা অসীম তার কেন্দ্র থাকতে পারে না। তিনি অবশ্য এই মতকে সমর্থন করেছিলেন ধর্মের দিক থেকে। যেহেতু ঈশ্বরের ক্ষমতা অসীম তাই তাঁর সৃষ্টিও অসীম—এই ছিল তাঁর যুক্তি। সে যাহোক, তাঁর মতে ছিল—বিশ্ব অসীম। আমরা যে সব নক্ষত্র দেখি, প্রকৃতপক্ষে তারাও এক একটি সূর্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি সূর্যের মধ্যে আমাদের সূর্যও অসীমের এক ক্ষুদ্র কণা। নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব অনুসারে কিন্তু পৃথিবীকে অসীম বলে বর্ণনা করবার কোন উপায় রইলো না। কারণ তাহলে মহাবিশ্বের যাবতীয় অসীম বস্তুপুঞ্জের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আকর্ষণের পরিমাণও হবে অসীম; ফলে কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব থাকবে না। বিশ্বের সীমারেখা সম্বন্ধে নিউটন মনগড়া কোন কথা বলেন নি। তিনি ভাবলেন, পৃথিবী থেকে যে সব তারাকে খুব ম্লান দেখায়, সেগুলি নিশ্চয়ই পৃথিবী থেকে খুব দূরে আছে। কাজেই নক্ষত্রাদির ঔজ্জ্বল্য দেখে তাদের দূরত্ব জানা যাবে। শুধু নিউটন নন, সেই সময়ের অনেকেই এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁদের এই মতবাদ সত্য হতো যদি সমস্ত নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্যই সমান হতো। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে, সমস্ত নক্ষত্রই সূর্যের সমান উজ্জ্বল। কিন্তু জানা যায় যে, সূর্য থেকে ৩০০,০০০ গুণ বেশী বা ৩০০,০০০ গুণ কম উজ্জ্বল নক্ষত্রও আছে। সুতরাং এই মতবাদ পরে পরিত্যক্ত হয়।

স্যার উইলিয়াম হার্শেল বিশ্বের যে রূপ দেন তা আবার সম্পূর্ণ অন্য রকমের। তিনি আকাশের নক্ষত্রগুলিকে ব্যাপকভাবে পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, মহাকাশে নক্ষত্রগুলি অবস্থিত আছে চায়ের প্লেটের মত একটা জায়গা জুড়ে এবং আমাদের সূর্য এর প্রায় কেন্দ্রস্থলে রয়েছে। এর কিছুকাল পরে স্যাপ্‌লি প্রমাণ করেন যে, নক্ষত্রগুলি আকাশে প্লেটের মত আকারের জায়গা জুড়ে আছে বটে, কিন্তু তার আয়তন হার্শেল যা অনুমান করেছিলেন তার চেয়ে অনেক বড়। তার চেয়েও বড় কথা তিনি বললেন—সূর্য এর কেন্দ্রস্থলে নেই, কেন্দ্র থেকে প্রায় ৪০,০০০ আলোক-বর্ষ দূরে আছে। হার্শেলের মতানুযায়ী কোনও কারণে মহাকাশের এক এক জায়গায় বহু নক্ষত্র একত্রিত হয়েছে। তিনি এদের নাম দেন নক্ষত্র-গোষ্ঠী। নক্ষত্রগোষ্ঠীর প্রতিটি নক্ষত্রই কিন্তু আবার তার কেন্দ্রের চারদিকে নির্দিষ্ট সময়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের সূর্য হচ্ছে এইরূপ নক্ষত্র-গোষ্ঠীর একটি নক্ষত্র। আমরা আকাশে যে সব নক্ষত্র দেখতে পাই, সে সবই সূর্য যে নক্ষত্রগোষ্ঠীর অন্তর্গত তারই অন্তর্ভুক্ত। আমাদের এই তারকাগোষ্ঠীর বাইরে আরও বহু তারকাগোষ্ঠী আছে এবং আমাদের এই তারকাগোষ্ঠী ও সেসব তারকাগোষ্ঠীতে গঠনগত কোন পার্থক্য নেই। শুধু এই নয়, হার্শেল প্রমাণ করেন যে, এক একটি তারকাগোষ্ঠী গড়ে প্রায় ১৫০,০০০ মিলিয়ন নক্ষত্র নিয়ে গঠিত। এক কথায় বলতে গেলে বহু নক্ষত্র নিয়ে এক একটা নক্ষত্রগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। এসব নক্ষত্রগোষ্ঠী মহাশূন্যে ভাসমান পদার্থের মত রয়েছে এবং এই প্রকার বহু নক্ষত্র-গোষ্ঠী বিশ্বজুড়ে অবস্থান করছে।

আইনষ্টাইনের পূর্ব পর্যন্ত বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে এই ছিল আমাদের ধারণা। তারপর তিনি এসে সব দিলেন ওলটপালট করে। এতদিন পর্যন্ত নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বের সাহায্যেই সব কিছুর ব্যাখ্যা করা হতো। আইনষ্টাইন বললেন, জগতের সব কিছু পদার্থই পরস্পরকে আকর্ষণ করে—এ ধারণা ভুল। একখণ্ড চুম্বক কোথাও রাখলে যেমন তার চারদিকে একটি চুম্বক-ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়, সেরূপ যেখানেই কোন বস্তু রাখা হয় তার চারপাশের স্থানে তার উপস্থিতির ফলে বক্রতার সৃষ্টি হয় এবং কোনও

বস্তুর চতুর্দিগস্থ স্থানে এই বক্রতার পরিমাণ নির্ভর করে সেই বস্তুর ভর ও গতিবেগের উপর। মহাকাশে সূর্যের উপস্থিতির জন্যে তার চারদিকের স্থান বক্রতা প্রাপ্ত হয়। সেই স্থানে গ্রহগুলির যে গতি তা সোজা হলেও স্থানের বক্রতার জন্যে তাদের গতিপথও বাঁকা। মনে করুন, আমি পৃথিবীর যে কোন এক জায়গা থেকে ক্রমাগত একদিকে হাঁটতে হাঁটতে আবার সেখানেই পৌঁছলাম। দেখা যাচ্ছে, আমি ক্রমাগত সোজা পথেই হেঁটে গেছি; কিন্তু আমি যে পথে পৃথিবীকে ঘুরে এলাম, সেই পথটা হচ্ছে গোল। এখানে আমি সোজা পথে বাঁকা স্থানে ভ্রমণ করেছি। আইনষ্টাইনের মতানুসারে, বিশ্বে যত পদার্থ আছে তাদের সমষ্টিগত প্রভাবের ফলে তার চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষেত্রে বক্রতা উৎপন্ন হবে। সমগ্র বিশ্বের মোট বস্তুপরিমাণ নির্দিষ্ট। তাই এই নির্দিষ্ট পরিমাণ বস্তুর দ্বারা সৃষ্ট এই বক্রতা ক্রমেই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে বিশাল মহাজাগতিক গোলকের সৃষ্টি করবে, যা হবে সম্পূর্ণ স্থিতিশীল। এই বিশ্ব নির্দিষ্ট পরিমাপের, অথচ সসীম। একটা পিঁপড়ে একটা ফুটবলের চারদিকে ঘুরে ঘুরে যেমন কোন দিনও তার শেষ খুজে পায় না, সেরূপ এই বিশ্বেরও শেষ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আইনষ্টাইনের এই ব্যাখ্যাও কিন্তু বেশীদিন স্থায়ীভাবে টিকলো না। ফ্রিড্‌ম্যান এবং ল্যে মেত্র বলে দুজন বিজ্ঞানী বললেন যে, আইনষ্টাইনের এই বিশ্বব্যাখ্যা আকৃতির দিক থেকে নির্ভুল বটে, কিন্তু এই অবস্থা স্থিতিশীল নয়। তাঁরা বললেন যে, বিশ্বের কোন জায়গায় পদার্থের ঘনত্ব কমলেই সেখানকার ক্ষেত্রের বক্রতা কমতে থাকবে, অথবা এর পদার্থের কোন স্থান বদল হলে সেই দুটি স্থানের বক্রতা বদলে যাবে, আর এর ফলে বিশ্ব নির্দিষ্ট আয়তনে স্থিতিশীল থাকতে পারবে না। ফলে, আইনষ্টাইন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সামগ্রিকভাবে যে রূপ দিয়েছিলেন তা ঠিকই রইলো বটে, তবে তিনি যাকে বলেছিলেন একটা নির্দিষ্টরূপে স্থায়ী তা আর থাকলো না। বিশ্ব সর্বদাই, হয় সঙ্কুচিত, না হয় প্রসারিত হবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গেছে যে, বর্তমানে বিশ্বের চলছে প্রসারণের যুগ। দূরস্থিত নক্ষত্রগোষ্ঠীসমূহের আলো পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, তারা যেন ক্রমাগতই দূরে সরে যাচ্ছে।

প্রসারিত বিশ্ব সম্বন্ধে একটু অন্য ধরণের কথা বলেছেন আর. সি. টোলম্যান। বর্তমানে বিশ্বের চলছে প্রসারণের যুগ। ভবিষ্যতে কোন মহাজাগতিক নিয়মের ফলে বিশ্ব আবার সঙ্কুচিত হবে। এতে বিশ্বকে একটা বেলুনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে যা অতীত কাল থেকে একবার ফুলছে, আবার চুপ্‌সে যাচ্ছে। আগেই বলা হয়েছে, কোন স্থানের বক্রতার পরিমাণ নির্ভর করে সেখানকার পদার্থের পরিমাণের উপর। কাজেই বিশ্বের এই যে প্রসারণ ও সঙ্কোচন, এও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের পদার্থের পরিমাণের দ্বারা। বর্তমানে বিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে, অর্থাৎ বিশ্বের মোট পদার্থের পরিমাণ কমছে। কাঠ পুড়ে যেমন নিঃশেষ হয়ে যায় তেমনি সূর্য, তারকা প্রভৃতি সবাই শক্তি বিকিরণ করে তাদের পদার্থ ক্ষয় করছে। আইনষ্টাইন পদার্থ ও শক্তির যে অভিন্নতার কথা বলেছেন, সেই হিসাবে আমরা অবশ্য বলতে পারি, শক্তিরূপে বিশ্বের স্থানে স্থানে সঞ্চিত যে পদার্থসমূহ ক্রমাগত মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে, তাই আবার পুনরায় পদার্থে রূপান্তরিত হতে পারে।

এই ভাবে হয়তো বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ নিঃশেষিত হয়ে আবার নতুন জগৎ, নতুন সব কিছু গঠিত হবে। এভাবে মহাবিশ্বের জীবন-মরণ, ভাঙন-গড়নের খেলা অনন্ত কাল ধরে চলতে থাকবে।

বিশ্বব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমরা যে মতবাদই মেনে নিই না কেন, বিশ্ব সম্পূর্ণ অবস্থায় স্থিতিশীল থাক বা না থাক, তার সমগ্র বস্তুসত্তার নিয়ে

ভাঙুক বা গড়ুক অথবা সমগ্র বিশ্বটা প্রসারিতই হোক বা সঙ্কুচিতই হোক, আমরা বিশ্বের সৃষ্টি সম্বন্ধে কোন কিছুই বলতে পারি না। বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের যত আলোচনা তা হচ্ছে এই নিয়ে যে, বর্তমানে বিশ্ব যে অবস্থায় এসে পড়েছে, সেই অবস্থায় সমগ্র বিশ্বটা কি ভাবে আছে? বিশ্বের অতীত, অর্থাৎ কি ভাবে বিশ্বের সৃষ্টি হলো অথবা তার ভবিষ্যৎ—অর্থাৎ বিশ্বের ধ্বংস আছে কি না, সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা অর্থহীন। আমরা জানি যে, যেখানে কোনও কিছু নেই সেখানে কোন কিছুর সৃষ্টিও সম্ভব নয়। আবার কোন কিছু ভাঙ্গলেও সেখানে আর কিছু থাকতেই হবে। কাজেই কোন কিছু আছে বললেই বুঝতে হবে, আগে থেকেই সেখানে কিছু ছিল যা রূপান্তরিত হয়ে নতুন কিছু হয়েছে। সুতরাং বিশ্বের এই যে বস্তুসম্ভার, এর সৃষ্টি হয়েছে নিশ্চয়ই কোন না কোন পদার্থ থেকে। কিন্তু সেই পদার্থই বা সৃষ্টি হলো কেমন করে? কয়েকবার হয়তো আমরা বলবো, এর আগে এই এই ছিল, কিন্তু শেষে আমাদের একবার গিয়ে চুপ করে যেতে হবেই—যখন আমাদের ধরে নিতে হবে, এখানে আগে থেকেই কিছু ছিল। তারও আগে কি ছিল, সে প্রশ্ন চলে না। বিশ্বের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নও সেইরূপ অবান্তর। কাজেই আমাদের যত কারবার সব বর্তমান নিয়ে। সেজন্যেই এখানে বিশ্বের অতীত বা ভবিষ্যৎ নিয়ে কোন আলোচনা করা হয় নি। এখানে আলোচনা করা হয়েছে, বর্তমান যে পরিস্থিতিতে বিশ্বের সমগ্র বস্তুসম্ভার রয়েছে তাকে কিভাবে সাজানো যেতে পারে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার সমগ্র বস্তুসম্ভার নিয়ে ঠিক কিভাবে গঠিত, সে সম্বন্ধে সঠিক সত্য বলতে কাকে বোঝায় জানি না। এ সম্বন্ধে যত মতবাদ সবই মানুষের আপন মনের চিন্তাশক্তির ফলে উদ্ভূত। এ সম্বন্ধে কোন মতবাদকেই নির্ভুল সত্যরূপে বর্ণনা করা যায় না। আমাদের উদ্দেশ্য, কি ভাবে ব্যাখ্যা করলে এই মহাতত্ত্বকে সর্বাপেক্ষা সার্থকরূপে বর্ণনা করা যায় তারই আলোচনা করা। সেই আলোচনাই এখানে করা হয়েছে, অতীত কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এ সম্বন্ধে মানুষের চিন্তাধারার ধারাবাহিক বর্ণনার মাধ্যমে।

সিন্ধুর স্বর্ণসম্পদ

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

সমুদ্রের অপর নাম রত্নাকর। মানুষ অতি প্রাচীন যুগেই সমুদ্রগর্ভে মণিমুক্তার সন্ধান পাইয়াছে এবং এই জন্যই সমুদ্র রত্নাকর নামে অভিহিত হইয়াছে। সমুদ্রের লোনা জল যে স্বর্ণসম্ভারে সমৃদ্ধ, মাত্র উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মানুষ এই তথ্যের সন্ধান পাইয়াছে। পৃথিবীর এই জলরাশি লোকচক্ষুর অন্তরালে যে স্বর্ণ যুগ যুগ ধরিয়া সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছে, তাহার পরিমাণ বহু কোটি টন। মানুষ এতকাল ভূত্বকের অভ্যন্তর হইতে যত স্বর্ণ উদ্ধার করিয়াছে, সমুদ্রের এই সঞ্চিত স্বর্ণরাশির তুলনায় তাহার পরিমাণ অতি অকিঞ্চিৎকর। কাহারও কাহারও হিসাব মতে, সমুদ্রের সমুদয় জলরাশি মন্থন করিয়া এই স্বর্ণ উদ্ধার করিতে পারিলে পৃথিবীতে যত লোক আছে, তাহাদের প্রত্যেকে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার স্বর্ণের অধিকারী হইতে পারে। দেবতাদের চক্ষুর অন্তরালে সমুদ্র যে রত্নসম্ভার গুপ্ত রাখিয়াছিল মানুষের কাছে তাহা ধরা পড়িয়াছে বটে, তবে এখন পর্যন্ত মানুষ

দেবতাদের মত সমুদ্র মন্থন করিয়া এই রত্ন উদ্ধারের ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারে নাই।

সমুদ্রের এই স্বর্ণ ভূভাগ হইতেই লব্ধ। কোয়ার্ট্জ্ নামক একপ্রকার প্রস্তরের সঙ্গে স্বর্ণের বিশেষ সাহচর্য বিদ্যমান। খনিতে যে স্বর্ণ পাওয়া যায় তাহা এই প্রস্তরের মধ্যেই মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। অবশ্য কোয়ার্ট্জ্ প্রস্তরমাত্রেই যে স্বর্ণকণিকা বহন করে, এমন নহে। স্বর্ণবাহী প্রস্তরখণ্ডগুলি উন্মুক্ত অবস্থায় থাকিলে আবহাওয়ার প্রভাবে ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং তদবস্থায় স্বর্ণকণিকাগুলি প্রস্তর বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। এই কণিকাগুলি এত ক্ষুদ্র যে, সহজেই জলে ভাসিয়া চলিতে পারে। কাজেই ভূভাগ হইতে এই মুক্ত কণিকাগুলি বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া প্রথমে নদীতে এবং নদীস্রোতের সঙ্গে অবশেষে সমুদ্রে স্থান লাভ করে। পৃথিবীর সেই আদিকালে সমুদ্র সৃষ্টি হইবার পর হইতে কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত এই ভাবেই ভূভাগের স্বর্ণ সমুদ্রে বিলীন হইয়াছে। ইহাই সমুদ্রের স্বর্ণসমৃদ্ধির ইতিহাস।

স্বর্ণ যে শুধু ভাসমান কণিকারূপেই সমুদ্রে পরিবাহিত হয়, এমন নহে। কিছু পরিমাণ স্বর্ণ বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হইয়াও থাকে। খুব কম মৌলিক পদার্থই স্বর্ণের সহিত সহজে রাসায়নিক সংযুক্তি লাভ করিতে সক্ষম। ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন, নাইট্রিক অ্যাসিড প্রভৃতি ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের সঙ্গে স্বর্ণের সহজেই রাসায়নিক মিলন ঘটে। ক্লোরিন ও ব্রোমিন সামুদ্রিক লবণে প্রচুর আছে। আকাশে বিদ্যুৎস্ফুরণের ফলে নাইট্রিক অ্যাসিড ও আয়োডিন সৃষ্টি হয় এবং রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়া কিছু পরিমাণ স্বর্ণ দ্রবীভূত অবস্থায় বৃষ্টিধারার সঙ্গে সমুদ্রে পরিবাহিত হয়।

সমুদ্রের জলে এই মূল্যবান ধাতুর অস্তিত্ব ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বিজ্ঞানী প্রোঃ ওয়ার্টজের একটি বক্তৃতায় সর্বপ্রথম প্রকাশ পায়। সমুদ্রের জল এত দিন শুধু একটি লবণাক্ত দ্রাবণরূপেই গণ্য হইয়া আসিয়াছে; কাজেই এই সংবাদ বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা সমুদ্রজলে কি পরিমাণে স্বর্ণ আছে এবং উহা কি ভাবে উদ্ধার করা যায়, সেই সম্বন্ধে নানারূপ গবেষণায় লাগিয়া পড়েন।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ রাসায়নিক সনষ্ট্যাড সমুদ্রের জলে স্বর্ণের পরিমাণ সম্বন্ধে একটি গবেষণামূলক বিবৃতি প্রচার করেন। তিনি ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন উপকূল হইতে জল লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার হিসাব মতে, প্রতি টন জলে স্বর্ণের পরিমাণ ৬.৫ মিলিগ্র্যাম এবং সমুদ্রে নিহিত সমস্ত স্বর্ণ উদ্ধার করা হইলে পৃথিবীর প্রত্যেক লোকের ভাগে পড়ে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার স্বর্ণ। ইহার কয়েক বৎসর পরে অষ্ট্রেলিয়ার উপকূলস্থ জল পরীক্ষা করিয়া তদ্দেশীয় একজন বিজ্ঞানী প্রকাশ করেন যে, সামুদ্রিক স্বর্ণের মোট পরিমাণ দশ হাজার কোটি টন। অতঃপর ১৯০২ খৃষ্টাব্দে সুইডেনের বিখ্যাত রাসায়নিক অ্যারহেনিয়াস তাহার পরীক্ষা হইতে পূর্ববর্তী গবেষকদের পরিমাণগত হিসাব কিছু অতিরিক্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করেন। তবে তাঁহার সঙ্গে পূর্বনির্ণীত হিসাবের পার্থক্য খুব বেশী নহে। তাহার হিসাবেও স্বর্ণের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রতি টনে ৬ মিলিগ্র্যাম। ইহার পরে প্রসিদ্ধ জার্মান রাসায়নিক হ্যাবার এই সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হ্যাবার অ্যামোনিয়া সংশ্লেষণের উপায় আবিষ্কার করিয়া জার্মেনীর এক গুরুতর সমস্যা দূর করিয়াছিলেন। ইংরেজের অবরোধে চিলি হইতে নাইট্রেট আসা বন্ধ হইলে বিস্ফোরক পদার্থের কারখানাগুলি যখন অচল হইবার উপক্রম হয় তখন হ্যাবারের আবিষ্কারের ফলেই এই সমস্যার সমাধান হয়। পরাজিত জার্মেনী যখন চতুর্দিকের নিষ্পেষণে জর্জরিত তখন ইহা হইতে মুক্তির জন্য আবার সেই হ্যাবারের শরণাপন্ন হয়। হ্যাবার যদি সমুদ্রের জল হইতে

স্বর্ণ নিষ্কাশনের উপায় আবিষ্কার করিতে পারেন তবে জার্মেনী আবার তাহার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে সক্ষম হইবে।

হ্যাবার দশ বৎসর ধরিয়া সপ্তসমুদ্র মন্থন করিয়া বেড়ান। সমুদ্রের বিভিন্ন গভীরতা হইতে জল লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন। এমন কি, বিভিন্ন সামুদ্রিক জীব এবং উদ্ভিদও তাহার পরীক্ষা হইতে বাদ পড়ে নাই। তিনি দেখিতে পান যে, গভীরতা অনুযায়ী সমুদ্রের বিভিন্ন স্তরের জলে স্বর্ণের পরিমাণ বিভিন্ন রকম। মেরু অঞ্চলের বরফে স্বর্ণের পরিমাণ চতুর্দিকের সমুদ্রের জল অপেক্ষা অনেক অধিক। সমুদ্রের উপরিভাগে ভাসমান ডায়েটম প্রভৃতি যে সব জীবকণিকা সমস্ত সামুদ্রিক প্রাণীর আহার যোগাইয়া চলিয়াছে, তাহাদের মধ্যে স্বর্ণের পরিমাণ জলের তুলনায় অনেক বেশী। প্রথম কিছুকাল সাধারণভাবে পরীক্ষার পর তিনি সমুদ্র-জলে স্বর্ণের পরিমাণ সম্বন্ধে আরহেনিয়াসের হিসাবই সমর্থন করেন। কিন্তু পরে তাঁহার নিজের কতকগুলি পরীক্ষালব্ধ ফলের অসামঞ্জস্য হেতু নিজেরই সন্দেহ উপস্থিত হয়। তিনি এইসব অসামঞ্জস্যের কারণ অনুসন্ধানে তাঁহার পরীক্ষা-প্রণালী বিশেষভাবে যাচাই করিয়া দেখিতে প্রবৃত্ত হন। তখন ধরা পড়ে যে, জল বিশ্লেষণে তিনি যে সকল রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাদের মধ্যেই খুব সামান্য পরিমাণে স্বর্ণ সংযুক্ত থাকিবার ফলে যথাযথভাবে স্বর্ণের পরিমাণ নিরূপণে গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। পরীক্ষাকার্যে ব্যবহৃত ঐ সকল রাসায়নিক পদার্থ স্বর্ণযুক্ত হওয়ার ফলে জলের নিরূপিত স্বর্ণের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ সকল পদার্থ সম্পূর্ণ স্বর্ণ বিমুক্ত অবস্থায় ব্যবহার করিবার পরে তিনি অতি হতাশাব্যঞ্জক ফল লাভ করেন। তখন তিনি দেখেন যে, প্রতি দশ টন জলে এক পেনি মূল্যের স্বর্ণও নাই। তাহার এতদিনের অক্লান্ত চেষ্টা যে পণ্ডশ্রমে পরিণত হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে তিনি এক বিষাদপূর্ণ বিবৃতি প্রকাশ করেন। ঐ বিবৃতির পরিশিষ্টে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, সমুদ্রের জল হইতে স্বর্ণ নিষ্কাশন অপেক্ষা তৃণস্তূপের ভিতর হইতে একটি হারানো সূচ খুঁজিয়া বাহির করা অনেক সহজ।

হ্যাবারের তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও কিন্তু সমুদ্র হইতে স্বর্ণ আহরণের চেষ্টা পরিত্যক্ত হয় নাই। হ্যাবারের এই বিবৃতি প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরেই, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাতাইচি যাসুদা চীন-সমুদ্রের জল পরীক্ষা করিয়া প্রকাশ করেন যে, স্বর্ণের পরিমাণ যথেষ্টভাবে নিষ্কাশনযোগ্য। তাঁহার হিসাবে, প্রতি দশ টন জলে ২৫ সেণ্ট মূল্যের স্বর্ণ বিদ্যমান। এই হিসাবে সমস্ত সামুদ্রিক স্বর্ণ ছাঁকিয়া তুলিলে পৃথিবীর জন-সমষ্টির জন্য গড়পরতা ভাগের পরিমাণ দাঁড়ায় দশ লক্ষ টাকার স্বর্ণ।

যাসুদার এই বিবৃতির পরে বিভিন্ন দেশের গবেষকগণ আবার নবোদ্যমে স্বর্ণ নিষ্কাশনের উপায় আবিষ্কারে লাগিয়া পড়েন। কে কার আগে আবিষ্কার করিতে পারে, ইহা লইয়া কিছুকাল বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা লাগিয়া যায়।

এই সময় একজন প্রখ্যাত উদ্ভাবক টমাস মিড্‌গেলি একটি বিবৃতিতে বিশেষ জোরের সঙ্গে প্রচার করেন যে, দশ বৎসরের মধ্যেই ব্যাপকভাবে স্বর্ণ নিষ্কাশনের উপায় আবিষ্কৃত হইবে। ইহার কিছু পরেই ডাউ কেমিক্যাল ওয়ার্কসের প্রেসিডেণ্ট উইলার্ড ডাউ প্রকাশ করেন যে, তাঁহাদের ব্রোমিন তৈয়ারীর কারখানায় সমুদ্রের জল হইতে স্বর্ণ নিষ্কাশনের উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার হিসাব অনুযায়ী এক ডলার মূল্যের স্বর্ণ নিষ্কাশনে তখন ব্যয়ের পরিমাণ দশ ডলার হইতে থাকিলেও তিনি আশা করেন যে, ক্রমশঃ এই ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়া আসিবে এবং ভবিষ্যতে লাভজনকভাবে স্বর্ণ নিষ্কাশন সম্ভব হইবে। সমুদ্রের জল হইতে ব্রোমিন নিষ্কাশনের অনুরূপ রাসায়নিক উপায়ে কোন দিন লাভজনকভাবে স্বর্ণ নিষ্কাশিত হইবার

সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনেকের মনেই অবশ্য সন্দেহ থাকিয়া যায়। কারণ সমুদ্রের জলে ব্রোমিনের পরিমাণ স্বর্ণের অপেক্ষা প্রায় ৬০ হাজার গুণ অধিক।

ইহার পরের বৎসরেই বিখ্যাত ইলেকট্রো-কেমিষ্ট ডাঃ ফিঙ্ক প্রচার করেন যে, ৩০ বৎসরের চেষ্টায় তিনি বৈদ্যুতিক উপায়ে সমুদ্র জলের স্বর্ণ সহজে নিষ্কাশন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাহার ব্যবস্থায় দুইটি ধাতব পাত একটি ব্যাটারীর ঋণ ও ধন তড়িৎ-প্রান্তে সংযোগ করিয়া জলে নিমজ্জিত করিলে ঋণ তড়িৎ-প্রান্তের সহিত সংযুক্ত পাতে জলস্থিত স্বর্ণ সঞ্চিত হইবে। তিনি তাহার বিবৃতিতে উল্লেখ করেন যে, জাহাজের প্রোপেলারকে ঋণ তড়িৎ-প্রান্তের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া জাহাজ চালাইলে প্রোপেলারের পাখাগুলিতে প্রত্যেক সমুদ্রযাত্রায় পুরু হইয়া স্বর্ণের আস্তরণ পড়িবে এবং এইভাবে অতি সহজে অনেক পরিমাণে সামুদ্রিক স্বর্ণ লাভ হইতে পারে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরে প্রকাশ পায় যে, ডাঃ ফিঙ্ক এই প্রক্রিয়ায় স্বর্ণ নিষ্কাশন যত সহজ মনে করিয়াছিলেন উহা তত সহজ নহে। ধাতব পাতটিকে মিনিটে অন্ততঃ পনেরো হাজার বার ঘুরান প্রয়োজন হইয়া পড়ে। হিসাব করিয়া দেখা হয় যে, এরূপ বেগে ঘুরাইতে যে খরচ পড়ে তাহার পরিমাণ, সংগৃহীত স্বর্ণের মূল্য অপেক্ষা অন্ততঃ পাঁচ গুণ বেশী।

এই সময় ওরিগন বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ক্যাণ্ডওয়েলও অনেক কাল গবেষণার পরে রাসায়নিক উপায়ে স্বর্ণ সংগ্রহের সম্ভাবনা সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি তাঁহার গবেষণার অভিজ্ঞতা হইতে দেখান যে, এই উপায়ে এক পেনি মূল্যের স্বর্ণ নিষ্কাশন করিতে চারিশত ডলার মূল্যের রিএজেণ্ট খরচ হইবে।

ইহার পরে নিয়ন ল্যাম্প ও তরল বায়ু প্রস্তুতের উদ্ভাবক ফরাসী দেশীয় জর্জেস ক্লড অন্য এক অভিনব উপায়ে সামুদ্রিক স্বর্ণ নিষ্কাশনের চেষ্টা করেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার এই পরীক্ষা আরম্ভ হয়। সমুদ্রগামী একটি জাহাজে একটি দীর্ঘ লোহার চোঙ বসান হয়। ঐ চোঙের মধ্যে আয়রন পাইরাটিসের একটি যৌগিক পদার্থ ভরিয়া উহার ভিতর দিয়া বেগে জল উঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়। আয়রন পাইরাটিসের স্বর্ণ আকর্ষণের ক্ষমতা আছে। কাজেই ঐ নলের মধ্য দিয়া যত জল উঠিবে তাহার সমস্ত স্বর্ণ উক্ত রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে সঞ্চিত হইবে, এরূপ আশা করা যায়। কিন্তু অনেক দিন ধরিয়া জাহাজ চলিবার পরে দেখা গেল যে, পাইরাটিসের মধ্যে যে স্বর্ণ সঞ্চিত হইয়াছে তাহার পরিমাণ অতি অকিঞ্চিৎকর।

সমুদ্রজলে স্বর্ণের পরিমাণ সম্বন্ধে বিভিন্ন রাসায়নিকের সিদ্ধান্তে বিশেষ অসামঞ্জস্য দৃষ্টে ক্যাল্ডওয়েল স্বর্ণ পরীক্ষার এক অতি সূক্ষ্ম প্রণালী অবলম্বনে পুনরায় তাঁহার লেবরেটরিতে এই বিষয় যাচাই করিয়া দেখেন। এই প্রণালীতে সমুদ্রের বিভিন্ন স্থানের জল পরীক্ষা করিয়া তিনি হ্যাবারের মতই হতাশাব্যঞ্জক ফললাভ করেন। তাঁহার এই পরীক্ষায় তিনি সমুদ্রের জলে স্বর্ণের পরিমাণ টন প্রতি এক মিলিগ্র্যামেরও কম পাইয়াছিলেন।

কিন্তু মানুষ ইহাতেও স্বর্ণ নিষ্কাশনের চেষ্টা হইতে নিরস্ত হয় নাই। ১৯৫১ সালে পর্যন্ত জনৈক জাপানী রাসায়নিক জাপানসমুদ্রের জল পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, স্বর্ণের পরিমাণ যথার্থই নিষ্কাশনযোগ্য। তাঁহার মতে, টন প্রতি স্বর্ণের পরিমাণ ১.৩ মিলিগ্র্যাম। তিনি রৌদ্রের তাপে জল শুকাইয়া স্বর্ণ সংগ্রহের একটি উপায়ের কথাও বলিয়াছেন। তবে এখন পর্যন্ত এই উপায়ে কোথাও স্বর্ণ নিষ্কাশনের চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

সমুদ্রের জল হইতে লাভজনক ব্যবস্থায় স্বর্ণ

নিষ্কাশনের একটি প্রধান অন্তরায়—শক্তি। সোনার পরিমাণ যেরূপ অল্প তাহাতে অন্ততঃ কিছু পরিমাণ স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে লক্ষ লক্ষ গ্যালন জল পাম্প করিয়া তুলিতে হইবে। কাজেই জল তুলিতে চাই শক্তি এবং শক্তির পিছনে আছে অর্থ। বিশেষজ্ঞদের মতে, একমাত্র এই শক্তির দিক হইতেই এক লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ নিষ্কাশন করিতে অন্ততঃ উহার পাঁচ গুণ ব্যয় হইবে।

মানুষের অদম্য উৎসাহ একদিন হয়তো ফলবতী হইবে। ভবিষ্যতে কোন দিন কেহ হয়তো সিন্ধুর স্বর্ণসম্পদ আহরণ করিবার কোন সহজ ব্যবস্থা আবিষ্কার করিয়া যশস্বী হইবেন। তবে এখন পর্যন্ত এই সমস্যা সমাধানের কোন কূল দেখা যাইতেছে না। সমুদ্র হইতে স্বর্ণ নিষ্কাশনের সমস্যাটি সমুদ্রের মতই বিশাল বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

কৃত্রিম চাঁদ

শ্রীঅশোককুমার দত্ত

আকাশের চাঁদের মত কৃত্রিম চাঁদ তৈরী হবে—গত কয় বছর ধরে এ নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের বহু জল্পনা-কল্পনা শোনা গেছে। সেই চাঁদ আজ তৈরী হয়েছে—একটি নয়, একাধিক। মার্কিন সরকার এই উদ্দেশ্যে প্রায় সাড়ে তিন কোটি ডলার ব্যয় করছেন। শুধু টাকাই নয়, পরিকল্পনাটির বাস্তব রূপায়ণে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী প্রতিভার সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়েছে। কয়েক হাজার যন্ত্রবিদ্ ও বিশেষজ্ঞ এ কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। গত তিন বছরের পরিশ্রমে ইতিমধ্যে অন্ততঃ ছয়টি কৃত্রিম উপগ্রহ সম্পূর্ণ হয়েছে। খুব সম্ভব আগামী বছরের প্রারম্ভে এই চাঁদ নতুন কক্ষে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে।

বিষয়টি নিঃসন্দেহে আমাদের কল্পনাকে উদ্দীপিত করে; কিন্তু একটি জিনিষ স্পষ্ট হওয়া দরকার। কৃত্রিম চাঁদ বলতে আকাশের চাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিতীয় চাঁদের কল্পনা করলে ভুল হবে। মানুষের তৈরী এই চাঁদ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দর্শনীয় হবে না। সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্তে অথবা অপস্রিয়মান সন্ধ্যায় তারার ন্যায় ক্ষুদ্র এক আলোকবিন্দুকে আকাশ-মার্গে অতি দ্রুত ছুটে যেতে কারো কারো চোখে পড়তে পারে—এইটিই মানুষের এত কল্পনার চাঁদ। এরই জন্যে কত পরিশ্রম ও অর্থব্যয়! কিন্তু এ শুধু বৈজ্ঞানিকদের নিছক কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে নয়। এই পরিকল্পনার সার্থকতার মধ্যে মানুষের চন্দ্র, মঙ্গল এবং অন্যান্য দূরতর গ্রহে পাড়ি দেওয়ার সম্ভাবনা নিহিত আছে।

কিন্তু এই উদ্যম সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার পথে অনেক বাধাও আছে। প্রথম অসুবিধা, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ। এই আকর্ষণ আকাশগামী কৃত্রিম চাঁদকে নিয়ত পৃথিবীর দিকে আকর্ষণ করবে। কৃত্রিম চাঁদের গতিপথ কোনও কক্ষে নির্দিষ্ট রাখতে হলে তার গতিবেগ অতি দ্রুত হওয়া প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব করে দেখেছেন, ভূপৃষ্ঠের তিন শত মাইল দূর থেকে প্রদক্ষিণের জন্যে কৃত্রিম উপ-গ্রহটির গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় আঠারো হাজার মাইল হওয়া প্রয়োজন। ঘণ্টায় আঠারো হাজার মাইল, অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টায় নব্বই বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে। গতিবেগ অতি দ্রুত সন্দেহ নেই, তবে তা কিছু পরিমাণ কম হলেও চলবে। ফ্লোরিডার পূর্ব উপকূলবর্তী কারনেভেরল অন্তরীপ থেকে কৃত্রিম চাঁদ ছাড়া হবে। এস্থান সেকেণ্ডে ১৩৪০ ফুট

বেগে পৃথিবীর অক্ষের চতুর্দিকে আবর্তিত হয়। সোজা পূর্বমুখী করে উপগ্রহটি ছাড়া হলে এই পরিমাণ গতিবেগ প্রয়োজনীয় গতি থেকে কমানো যাবে। কিন্তু এই গতিবেগ আসল সমস্যা নয়। এরোপ্লেন আজ শব্দের চেয়েও দ্রুতগতিতে ছুটতে পারে। ঘণ্টায় পঁচিশ হাজার মাইল ছুটতে সক্ষম রকেট তৈরীও আজ আর অসম্ভব নয়।

ভূপৃষ্ঠের উর্ধ্বে তিন শত মাইল—নিশ্চয়ই অপর এক গুরুতর সমস্যা। মানুষ আজ পর্যন্ত বিমানে কিঞ্চিদধিক পনেরো মাইল উঠতে সমর্থ হয়েছে। সম্প্রতি মার্কিন সরকার উর্ধ্বে ৬০ মাইল পর্যন্ত মনুষ্যবাহী বিমান চালনার চেষ্টা করছেন। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে নানা শ্রেণীর দ্রুতগামী রকেট তৈরী হয়েছে—এরোবী, বাম্পার, ডেকন—আরো কত কি! ভাইকিং রকেট যোগে কৃত্রিম চাঁদ তিন শত মাইল উর্ধ্বে তোলবার পরিকল্পনা করা হয়েছে। রকেটের তিনটি স্তর বা অংশ থাকবে। প্রথম অংশ ভূপৃষ্ঠ থেকে ছত্রিশ মাইল উর্ধ্বে গিয়ে মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে খসে সমুদ্রে পতিত হবে। এ সময় গতিবেগ উঠবে সেকেণ্ডে ৪,৫০০ ফুট। প্রথম অংশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় অংশের কাজ সুরু হয়ে যাবে। ফলে, কৃত্রিম চাঁদ খানিকটা বক্রপথে ২৬০ মাইল উপরে উঠবে। তখন গতিবেগ হবে সেকেণ্ডে ১৩,৪০০ ফুট। এবার রকেটের তৃতীয় স্তরের কাজ হবে। এই তৃতীয় অংশেই কৃত্রিম চাঁদ বাঁধা থাকবে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩০০ মাইল উঠে এই অংশটি যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, তখন কৃত্রিম চাঁদের গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ১৭,০৫৩ মাইল।
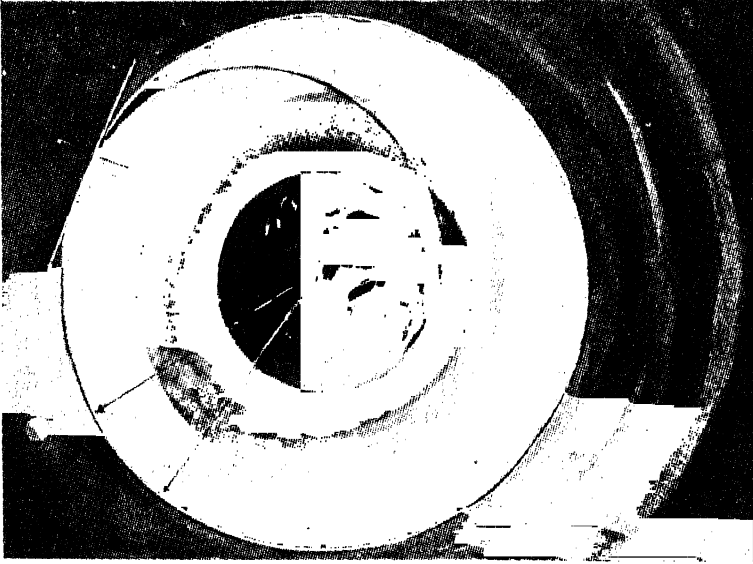
কৃত্রিম চাঁদের সম্ভাব্য কক্ষপথ। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে রকেটের সাহায্যে ৩০০ মাইল উপরে গিয়ে উপগ্রহটি নির্দিষ্ট কক্ষে স্থাপিত হবে।

বর্তমানে বৈজ্ঞানিকদের চিন্তার কারণ হলো, ৩০০ মাইল উর্ধ্বে গতিবেগ ঠিক ১৭,০৫৩ মাইল হবে কি না। অবস্থা অনেকাংশে উর্ধ্বাকাশে বাতাসের ঘনত্বের উপর নির্ভর করছে। অথচ এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের জ্ঞানও অনিশ্চিত। তাই তো ক্যাপ্টেন মেট্স্গার বলেছেন, এ হলো একটি দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা মাত্র, সফলতা দৈবের হাতে।

প্রক্ষিপ্ত বস্তুটি যদি ৩০০ মাইল ছাড়িয়ে ওঠে, অথবা এর গতি যদি ঘণ্টায় ১৭,০৫৩ মাইলের বেশী হয় তাহলে কৃত্রিম চাঁদ মহাশূন্যে মিলিয়ে যাবে। আবার প্রয়োজনীয় উচ্চতা ও গতিবেগ কম হলেও তা ক্রমশঃ পৃথিবীর দিকে এসে নিম্ন আকাশের ঘনতর বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে উল্কার মত জ্বলে ভস্মীভূত হয়ে যাবে।

কৃত্রিম চাঁদ—ভলিবলের মত। আমেরিকান সরকার প্রথম যে উপগ্রহটি ছাড়বেন তার ব্যাস হলো কুড়ি ইঞ্চি এবং ওজনও খুব কম, মাত্র সাড়ে একুশ পাউণ্ড। অথচ এরই মধ্যে বহু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এসব যন্ত্রের সাহায্যে আকাশের বিভিন্ন স্তরের তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার বিষয় জানা যাবে। ফলে, আবহাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী আরো সঠিকভাবে করা সম্ভব হবে। শুধু তাই নয়, মহাজাগতিক রশ্মি কোথা থেকে আসে, ঊর্ধ্ব আকাশ তড়িতাবিষ্ট কেন, সূর্যের ঝড় এবং আবহাওয়ার মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে কিনা—ইত্যাদি অনেক বিষয় সম্বন্ধে তথ্যাদি জানবার সুযোগ হবে। চুম্বক ও মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নূতন ধারণা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উল্কাপিণ্ড, অতিবেগুনী রশ্মি প্রভৃতি সম্বন্ধেও নতুন কিছু জানবার সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া কৃত্রিম চাঁদের গতিপথ সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে পৃথিবীর সঠিক আকার এবং ঊর্ধ্বগগনে বাতাসের ঘনত্ব বিষয়ে পদার্থবিদ্‌গণ প্রয়োজনীয় জ্ঞান সংগ্রহ করতে পারবেন। সংগৃহীত তথ্যসমূহ পৃথিবীতে প্রেরণের জন্যে একটি অতি ক্ষুদ্র বেতার প্রেরক যন্ত্র এই কৃত্রিম উপগ্রহে স্থাপিত হবে। বেতার প্রেরক যন্ত্রটি অধুনা আবিষ্কৃত সূর্য-ব্যাটারীর সাহায্যে কাজ করবে। কৃত্রিম চাঁদে টেলিভিশন সেট বসাবারও কথা আছে। টেলিভিশনের পর্দায় ভূপৃষ্ঠের আপতিত ছায়া পুনরায় পৃথিবীর টেলিভিশন কেন্দ্রসমূহে প্রতিফলনের ব্যবস্থা করে পৃথিবী সম্বন্ধে বহু অজ্ঞাত বিবরণ সংগ্রহের চেষ্টা হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রায় দু’ হাজার পর্যবেক্ষণাগার কৃত্রিম চাঁদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে।
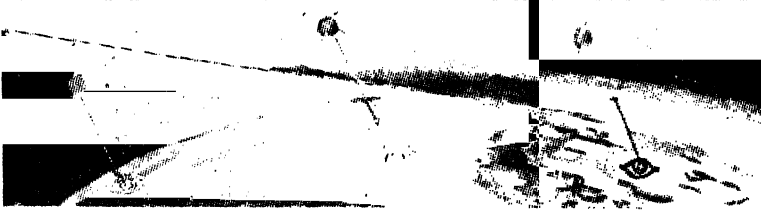
ভূপৃষ্ঠ থেকে দেখা কৃত্রিম চাঁদের কল্পিত দৃশ্য। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, খালি চোখেও কৃত্রিম চাঁদ দেখা যেতে পারে। সন্ধ্যায় বা সকালে যখন সূর্যের আলো কৃত্রিম চাঁদের গায়ে প্রতিফলিত হবে অথচ দর্শকের উপরকার আকাশে আলো থাকবে না তখনই একমাত্র এই চাঁদ ক্ষীণতম তারার ন্যায় দেখা যাবে।

এই উদ্যোগ পর্বের প্রয়োজন আছে। এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমাদের চাঁদের চেয়ে আমরা নিজস্ব পৃথিবী সম্বন্ধে কম জানি। ঊর্ধ্ব আকাশ, পৃথিবীর চৌম্বকত্ব, মেরু আলোক, সাগর ও পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই পরিমিত। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই অপূর্ণতা দূরীকরণের জন্যে ভারত সহ পৃথিবীর ৬৪টি দেশ একযোগে তৎপর হয়ে উঠেছে। বর্তমান বছরের জুলাই থেকে ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরের

মধ্যবর্তী আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বর্ষে বৈজ্ঞানিকেরা পৃথিবী সংক্রান্ত তেরোটি বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্পর্কে বিশেষ গবেষণার পরিকল্পনা করেছেন। এ বিষয়ে সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য—আকাশের বুকে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনের চেষ্টা। মার্কিন সরকার ভূ-পদার্থ গবেষণায় অনুমোদিত অর্থের প্রায় অর্ধাংশ শুধু এই উদ্দেশ্যেই ব্যয় করছেন।

কৃত্রিম উপগ্রহযোগে অনেক বিষয় জানবার সুযোগ হলেও একটি মাত্র কৃত্রিম চাঁদের সাহায্যে সব রকমের তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। যেমন উর্ধ্বাকাশের তড়িতাবিষ্টতা অনুধাবনের জন্যে কৃত্রিম চাঁদ প্লাষ্টিক ইত্যাদি বিদ্যুৎ-অপরিবাহী পদার্থে প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। অথচ প্রথমটির বাহিরাবরণ তামা, দস্তা, নিকেল, রূপা এবং খাঁটি সোনার স্তরে গঠিত। আমেরিকান সরকার ভূপৃষ্ঠের ২০০ থেকে ৩০০ মাইল উর্ধ্বে বারো থেকে পনেরোটি কৃত্রিম চাঁদ ছাড়বার পরিকল্পনা করেছেন।

অনেকে বলতে পারেন, এ সবের কি দরকার ছিল? নতুন তথ্য জানতে হলে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বেলুনের সঙ্গে বেঁধে ছাড়লেই তো চলতে পারতো! অথবা উর্ধ্বগামী রকেট তো রয়েছেই! কিন্তু বেলুন খুব উঁচুতে উঠতে পারে না, আর রকেটের সাহায্যে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা যায় মাত্র, নির্দিষ্ট কক্ষে প্রদক্ষিণ করে না বলে উর্ধ্বাকাশে রকেটের স্থায়িত্ব কয়েক মিনিটের বেশী হতে পারে না। অপর পক্ষে কৃত্রিম চাঁদ উর্ধ্বাকাশে অন্ততঃ কিছু দিন থাকবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করেন। প্রথম চাঁদটি না পারলেও দ্বিতীয় বারের চেষ্টায় যে তা সম্ভব হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মাত্র কয়েক দিন কেন, বৎসরাধিক কাল কক্ষ রক্ষা করে চলাও নিতান্ত দুরাশা নয়। বলা যায় না হয়তো প্রথম উপগ্রহের ক্ষেত্রেই তা সম্ভব হতে পারে।

কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনে সোভিয়েট রাশিয়ারও উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা আছে। এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নি, তবে তাদের পরিকল্পনা যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই অনুরূপ, এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। শোনা যায়, রাশিয়ার উপগ্রহটি দিনে ষোলবার পৃথিবী প্রদক্ষিণের চেষ্টায় পরিচালিত হবে।

আকাশের পূর্ণচন্দ্র এই আকাশচারী সামান্য বস্তুটিকে দেখে ব্যঙ্গ করবে, কিন্তু এই কৃত্রিম চাঁদ থেকে পাওয়া তথ্যাদির সাহায্যেই বোধ হয় এক দিন সেই অদ্বিতীয় চাঁদের বুকে মানুষের পদার্পণ সম্ভব হবে। বাস্তবিকই সে দিনের আর বেশী বাকী নেই, বৈজ্ঞানিক বলছেন—মাত্র পঞ্চাশ বছর।

প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে রকেটের সাহায্যও নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ভূ-পদার্থ বছরে এক মার্কিন সরকারই অনেকগুলি রকেট ছাড়বেন। এ বিষয়ে রাশিয়া ও বৃটেনেরও পরিকল্পনা আছে।

[লণ্ডনের খবরে প্রকাশ, সোভিয়েট ইউনিয়ন গত ৪ঠা অক্টোবর ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে মহাকাশে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করেছে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ৫৬০ মাইল উপরে এই উপগ্রহটি প্রতি ৯৫ মিনিটে একবার করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে। 'টাস' কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে বলা হয়েছে যে, উপগ্রহটির ব্যাসার্ধ ২৯ সে. মি.। উদীয়মান বা অস্তোন্মুখ সূর্যালোকে সাধারণ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উপগ্রহটিকে দেখা যাবে। উপগ্রহটি ঘণ্টায় ১৭ হাজার মাইল বেগে উপবৃত্তাকার পথে পৃথিবী পরিভ্রমণ করছে। যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড, জাপান ও পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মানমন্দির থেকে দূরবীক্ষণের সাহায্যে উপগ্রহটি দেখা গেছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বেতার কেন্দ্রে উপগ্রহ থেকে প্রেরিত সঙ্কেতধ্বনি শোনা গেছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন পূর্বে কোনরূপ সংবাদ প্রচার না করেই অতর্কিতে উপগ্রহটি বহিরাকাশে প্রেরণ করায় সমগ্র পশ্চিমী জগতে বিস্ময়ের সঞ্চার হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন ক্ষেপণাস্ত্র ও উপগ্রহ সৃষ্টির ব্যাপারে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে বলে মার্কিন সংবাদপত্র ও বেতারে মন্তব্য করা হয়েছে।]

পারমাণবিক চুল্লী

শ্রীঅমরনাথ রায়

আমাদের এই দৃশ্য জগতের বাইরে রয়েছে এক বিরাট অদৃশ্য জগৎ। সেই অদৃশ্য জগতেও রয়েছে কত বৈচিত্র্য—কত বিস্ময়! যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞানীরা সেই অদৃশ্য জগতের অনন্ত রহস্য উদ্ঘাটনে ব্রতী আছেন। আজও তাঁদের চেষ্টার অন্ত নেই। কোথায় কোন্ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তু গোপনে লুকিয়ে আছে—তাকে খুঁজে বের করছেন তাঁরা। শুধু খুঁজে বের করেই ক্ষান্ত হন না বিজ্ঞানীরা, কি ভাবে তাকে কাজে লাগানো যায় তার চেষ্টাও করেন।

অদৃশ্য জগতের এমনি এক বিস্ময় হলো পরমাণু। পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ—যা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অবিভাজ্য, তাকেই বলা হয় পরমাণু। পরমাণু দিয়ে গঠিত হয় অণু। আর অণু সমাবেশে গঠিত হয় পদার্থ। যে কোন পদার্থের অণুকে ভেঙ্গে তার উপাদান—পরমাণুতে পৃথক করা যায়। অবশ্য তখন আর পদার্থের নির্দিষ্ট রূপ বজায় থাকে না। আগেকার দিনে বিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে, পরমাণুই বুঝি পদার্থের শেষ কণিকা। কিন্তু গবেষণার ফলে জানা গেল যে, তা নয়—পরমাণুকেও ভাঙ্গা যায়।

পরমাণুর গঠন-ব্যবস্থাকে একটি ছোটখাটো সৌরমণ্ডলের সঙ্গে তুলনা করা যায়। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে, অর্থাৎ কেন্দ্রস্থলে আছে প্রোটন বা ধনাত্মক তড়িদ্বাহী কণিকা এবং নিউট্রন বা তড়িদ্বিহীন কণিকা। আর এই কেন্দ্রের চারপাশে নির্দিষ্ট কক্ষে আবর্তিত হচ্ছে ইলেকট্রন বা ঋণাত্মক তড়িদ্বাহী কণিকা। ইলেকট্রনের আবর্তন-কক্ষগুলি কিন্তু একই তলে অবস্থিত নয়। এরা কেন্দ্রের চারদিকে বিভিন্নতলে আবর্তিত হয়। একটা নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুসরণ করে বহির্বৃত্তের ইলেকট্রন এবং কেন্দ্রের নিউট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা বর্ধিত হয়ে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর সৃষ্টি হয়। একটি পরমাণুর মধ্যে যতটুকু ঋণাত্মক তড়িৎ থাকে ঠিক ততটুকুই থাকে ধনাত্মক তড়িৎ। উভয় তড়িতের ভারসাম্য রক্ষা হওয়ার দরুণ পরমাণু হয় তড়িৎ-নিষ্ক্রিয়।

পরমাণুর কেন্দ্রস্থিত প্রোটন এবং নিউট্রন পরস্পর সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। এতই দৃঢ় বন্ধনে এরা আবদ্ধ যে, সাধারণ অবস্থায় এদের বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। কিন্তু বিশেষ প্রক্রিয়ায় পরমাণুর বিদারণ ঘটানো সম্ভব। কৃত্রিম উপায়ে বস্তুর মৌলিক রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হলো ১৯১৯ সালে রাদারফোর্ডের পরীক্ষার ফলে। রাদারফোর্ড দেখালেন যে, রেডিয়াম থেকে নির্গত আল্‌ফা কণা সাধারণ নাইট্রোজেনের কেন্দ্রে ঢুকে একটি প্রোটনকে ধাক্কা মেরে বের করে দিতে পারে। রাদারফোর্ড বললেন যে, পরমাণুর এরূপ বিভাজন ইচ্ছামত সংঘটিত করা যায় বটে, কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় খরচ পড়ে খুব বেশী। এই কাজে রাদারফোর্ড যে আল্‌ফা কণা ব্যবহার করেছিলেন তা প্রকৃত-পক্ষে হিলিয়াম পরমাণুরই কেন্দ্র; অর্থাৎ হিলিয়াম পরমাণুর বাহিঃকক্ষের ইলেকট্রনগুলিকে অপসারিত করলে যে কেন্দ্রকণা অবশিষ্ট থাকে, সেগুলিই এই আল্‌ফা কণা।

ইলেকট্রনশূন্য হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রে দুটি প্রোটন এবং দুটি নিউট্রন থাকে। কাজেই হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্র ধনাত্মক তড়িৎ সমন্বিত। রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি স্বতঃস্ফুরণশীল পদার্থ থেকে এই কণাগুলি আপনা আপনি প্রবল বেগে

বিচ্ছুরিত হয়। যে শক্তি এই প্রবল বেগের সৃষ্টি করে তার পরিমাণ কয়েক লক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্টের সমান। এই প্রবল শক্তিসম্পন্ন আল্ফা কণাগুলি যখন মূল পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রে প্রচণ্ড ধাক্কা দেয় তখনই প্রোটন কণা নির্গত হয়। পরমাণুর কেন্দ্রকে বিদীর্ণ করলে কেন্দ্রের বিপুল বন্ধনী শক্তির একাংশ মুক্তি পায়। মুক্তিপ্রাপ্ত এই শক্তির পরিমাণও নেহাৎ কম নয়! কিন্তু আল্ফা কণাকে বুলেট হিসাবে ব্যবহার করে পরমাণু-কেন্দ্র বিদারণ-প্রক্রিয়ায় দেখা গেল যে, নবোৎপাদিত শক্তির তুলনায় অধিকতর শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। কারণ পরমাণুর কেন্দ্র তার সারা দেহের তুলনায় বহু গুণ সূক্ষ্ম। এত সূক্ষ্ম লক্ষ্যবস্তুর প্রতি আল্ফা কণা সঠিকভাবে আঘাত করতে পারে না। ফলে, পরমাণুর কেন্দ্রের অতি অল্পসংখ্যক কণা আঘাতপ্রাপ্ত হয়। উপরন্তু পরমাণু-কেন্দ্র মাত্রেই ধনাত্মক তড়িৎ সমন্বিত। আবার আল্ফা কণাও ধনাত্মক তড়িৎ সমন্বিত। তাই আল্ফা কণা যতই পরমাণুর কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয় ততই সে বিতাড়িত হতে থাকে। কাজেই প্রচণ্ড বেগবান আল্ফা কণার গতিবেগ ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে এবং অধিকাংশ আল্ফা কণাই পরমাণু কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না।

তারপর বস্তুর সত্তান্তরের পরীক্ষা চললো নানা পথে। ১৯১৯ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল যে, পরমাণু-কেন্দ্রকে ভাঙ্গতে হলে আরও বেগবান ও শক্তিশালী কণা দ্বারা আঘাত করা দরকার। এরপর ১৯৩২ সালে আবিষ্কৃত হলো নিউট্রন। ১৯৩৩ সালে ইটালীয় বিজ্ঞানী ডক্টর এন্‌রিকো ফের্মি দেখালেন যে, কোন পরমাণুর উপর নিউট্রনের গোলাবর্ষণ করলে বিশেষ প্রক্রিয়ায় নিউট্রনকে ঐ পরমাণু-কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এর ফলে গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ার দরুণ সেই পরমাণু তার একটি আইসোটোপে পরিবর্তিত হয়। ফের্মি আরও বললেন যে, কোন হাইড্রোজেনসমৃদ্ধ বস্তুর ভিতর দিয়ে পাঠিয়ে নিউট্রনের গতি কমিয়ে দিলে পরমাণুর কেন্দ্রে 'নিউট্রন অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়া' আরও সহজে সম্পন্ন হয়। পরমাণুর কেন্দ্র বিদারণের কাজে নিউট্রনকে বুলেট হিসাবে ব্যবহার করবার প্রধান সুবিধা হলো—বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ বলে নিউট্রনের গতি খুবই সহজ হয়; সমধর্মী তড়িতান্বিত হওয়ার দরুণ আল্ফা কণিকার মত সে বাধাপ্রাপ্ত হয় না।

যাহোক, নিউট্রনের বুলেট বর্ষণ করে পরমাণুর কেন্দ্রের গঠন-ব্যবস্থার পরিবর্তন দ্বারা বস্তুর রূপান্তর ঘটানোর প্রক্রিয়া যখন সবচেয়ে ভারী মৌলিক পদার্থ ইউরেনিয়ামের উপর প্রয়োগ করা হলো তখন থেকেই পারমাণবিক শক্তি উৎসারণে আধুনিকতম অধ্যায়ের সূচনা হলো। ১৯৩৯ সালে বিখ্যাত জার্মান পদার্থবিদ্ অটো. হান্ যখন ফের্মির পন্থা অবলম্বন করে ইউরেনিয়াম পরমাণুকে মন্থর গতি নিউট্রনের দ্বারা বিভাজনে নিযুক্ত ছিলেন তখন তিনি দেখলেন যে, ইউরেনিয়াম বিভাজনের দ্বারা যে পদার্থ উৎপন্ন হলো তার মধ্যে বেরিয়ামও বিদ্যমান। বেরিয়ামের পারমাণবিক গুরুত্ব মাত্র ১৩৭। এতদিনের পরমাণু ভাঙ্গবার প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন হতো সামান্যই। আঘাতপ্রাপ্ত পরমাণু একটি নিউট্রন ছেড়ে ঐ পরমাণুরই কোন আইসোটোপে পরিণত হতো। কিন্তু ২৩৮ পারমাণবিক গুরুত্বের ইউরেনিয়াম কি ভাবে ১৩৭ পারমাণবিক গুরুত্বের বেরিয়াম সৃষ্টি করতে পারে? অথচ এ তো মিথ্যা নয়—এ যে প্রত্যক্ষ পরীক্ষার ফল! এর কারণ এই যে, অত্যন্ত ভারী এই ইউরেনিয়াম পরমাণুর তেমন স্থায়িত্ব নেই। তাই ২৩৫ পারমাণবিক গুরুত্বের ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রে একটি মন্থরগতি নিউট্রন প্রবেশ করতেই ইউরেনিয়াম ভেঙ্গে পড়ে—যেমন করে ভেঙ্গে পড়ে ইটের পর ইট দিয়ে সাজানো ছোট্ট ছেলের খেলাঘর; অথবা জলের ফোঁটা বড় হতে হতে এক সময়ে যেমন প্রায় সমান দুটি অংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

এই প্রক্রিয়ায় ইউরেনিয়াম পরমাণু বিদীর্ণ হয়ে ১৩৭ পারমাণবিক গুরুত্বের বেরিয়াম ও ৮২ পারমাণবিক গুরুত্বের ক্রিপটনে পরিণত হয় এবং এই রূপান্তরণের সময় যে পরিমাণ বস্তু ক্ষয়িত হয় তা তেজরূপে প্রকাশ পায়।

আইনষ্টাইনের সমীকরণের সাহায্যে এই ক্ষয়প্রাপ্ত বস্তুমাত্রার তেজে রূপান্তরণের দ্বারা যে পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়, তা হিসাব করে বের করা যায়। এথেকে জানা যায় যে, প্রায় এক পাউণ্ড ইউরেনিয়াম থেকে উৎপন্ন তেজের পরিমাণ দুই কোটি পাউণ্ড কয়লা পোড়ানো তেজের সমান।

পরমাণু তালিকার মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রগুলির বন্ধনী শক্তি সবচেয়ে বেশী। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, দু'রকমের রূপান্তরণের ফলে প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হতে পারে। এক হলো—হাল্কা পরমাণুর কেন্দ্রকে অধিকতর ভারী কেন্দ্রে রূপান্তরণের ব্যবস্থায়, অপরটি হলো—ভারী পরমাণুর কেন্দ্রগুলিকে অপেক্ষাকৃত হাল্কা কেন্দ্রে রূপান্তরিত করবার ভিতর দিয়ে। ইউ-রেনিয়াম-২৩৫-এর বিদারণে এই শেষোক্ত প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপন্ন হয়। হাইড্রোজেন থেকে কোন উপায়ে হিলিয়াম সৃষ্টি করবার সময় আরও প্রচণ্ড শক্তি পাওয়া যেতে পারে। সূর্যে এই প্রক্রিয়াতেই প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন হয়। মানুষ আজ এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করে এইরূপ প্রচণ্ড শক্তি উৎপাদনেও সক্ষম হয়েছে।

যাহোক, পরমাণু ভেঙ্গে শক্তি আহরণ করবার যে উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে, সে উপায়ে আহৃত পারমাণবিক শক্তিকে মানুষ আজ কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত করবার চেষ্টা করছে এবং একাজে কিছুটা সাফল্যও লাভ করেছে। যে যন্ত্রের সাহায্যে পরমাণু ভেঙ্গে শক্তি আহরণ করা হয় তার নাম পারমাণবিক চুল্লী বা অ্যাটমিক রিয়্যাক্টর।

রেডিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি মৌলিক পদার্থের মত ইউরেনিয়ামও তেজস্ক্রিয় পদার্থ; অর্থাৎ রেডিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতির মত ইউরেনিয়ামও আপনা আপনি ভেঙ্গে যায় এবং তার ফলে উৎপন্ন হয় ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি কণিকা। স্বাভাবিক ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক গুরুত্ব হলো ২৩৮। এই ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতে চলে। তাই একে বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় পরিশোধন করে অধিকতর তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম-২৩৫ তৈরী করা হয়। পারমাণবিক চুল্লীর মধ্যে ইউরেনিয়াম-২৩৫ জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। চুল্লীর অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট পরিমাণ ইউরেনিয়াম-২৩৫ স্থাপন করা হলে এই ইউরেনিয়াম পরমাণু থেকে স্বতঃনিঃসৃত নিউট্রন কণিকা আর একটি ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রে আঘাত করে। এই আঘাতের ফলে দু'টি নিউট্রন বেরিয়ে আসে। এই দুটি নিউট্রন আবার দুটি পরমাণুকে আঘাত করে। ফলে চারটি নিউট্রনের সৃষ্টি হয়। এভাবে ক্রমবর্ধমান হারে নিউট্রন সৃষ্টি হতে থাকে। নিউট্রন সৃষ্টির এই প্রক্রিয়ার নাম চেইন রিয়্যাকশন বা অবিরাম পরমাণু বিদারণ ও নিউট্রন সৃজন প্রক্রিয়া। পারমাণবিক চুল্লীতে জ্বালানী ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর তেজস্ক্রিয়া নিঃশেষিত হলে তা সাধারণ সীসায় পরিণত হয়।

পারমাণবিক চুল্লীর প্রাণকেন্দ্র হলো চুল্লী-কক্ষ। এই কক্ষটির দেয়ালগুলি তাপসহ উপাদানে তৈরী করা হয়। কক্ষের ভিতরে রাখা হয় তেজস্ক্রিয় জ্বালানী। এই কক্ষের ভিতরেই চেইন-রিয়্যাকশন চলতে থাকে। রিয়্যাকশনের সময় উৎপন্ন নিউট্রন-গুলি যাতে দেয়াল ভেদ করে বেরিয়ে না যেতে পারে তার জন্যে কক্ষটির চারদিক ঘিরে রাখা হয় মডারেটর বা নিউট্রন আটকাবার পদার্থের আবরণ দিয়ে। সুইমিংপুল শ্রেণীর পারমাণবিক চুল্লীতে ভারী জলকে মডারেটর হিসাবে ব্যবহার করা হয় এবং চুল্লী-কক্ষটি এই জলেই ডুবিয়ে রাখা হয়।

চেইন-রিয়্যাকশন যখন চলতে থাকে তখন

চুল্লী-কক্ষের ভিতরে তাপশক্তির পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এই তাপশক্তির পরিমাণ একটা নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। কাজেই চেইন-রিয়্যাকশনে পরমাণু বিদারণের সময় মুক্ত নিউট্রন নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। এই কাজে, অর্থাৎ নিউট্রনের সংখ্যা কমাবার জন্যে চুল্লী-কক্ষের ভিতরে নিউট্রন শোষক বোরোন অথবা ক্যাডমিয়াম ধাতুর দণ্ড রাখা হয়। এগুলিকে চুল্লী-কক্ষের মধ্যে যথাযথভাবে সাজানো দরকার, কারণ এর উপরেই নির্ভর করে চুল্লীর নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা। চুল্লী-কক্ষের ভিতরে নিউট্রন ফ্লাক্স, অর্থাৎ নিউট্রনের সংখ্যা বা চাপ নির্দিষ্ট রাখতে পারলে নির্দিষ্ট পরিমাপের শক্তি আহরণ করা যেতে পারে। নিরাপত্তার জন্যে নিউট্রন-শোষক দণ্ডগুলিকে যুক্ত করা হয় স্বয়ংক্রিয় শক্তি পরিমাপক যন্ত্রের সঙ্গে।

পরমাণু বিদারণের ফলে চুল্লী-কক্ষের মধ্যে যে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয় তা অপসারণ করা দরকার। এই কাজে চুল্লী-কক্ষের মধ্যে স্থাপিত নলের ভিতর দিয়ে তাপ অপসারক কোন তরল পদার্থ (যেমন জল, বায়ু, হিলিয়াম অথবা তরল ধাতু) চালনা করা হয়। অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা এই তরল পদার্থ পাম্প করে নলের একমুখ দিয়ে চুল্লী-কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করান হয়। চুল্লী-কক্ষের মধ্যে সঞ্চিত তাপে সেই তরল পদার্থ উত্তপ্ত হয়ে নলের অপর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এই উত্তপ্ত তরল পদার্থকে এবার নিয়ে যাওয়া হয় তাপ-বিনিময় কক্ষে।

তাপ-বিনিময় কক্ষে উত্তপ্ত তরল পদার্থের তাপ বিনিময়ের দ্বারা জলকে বাষ্পে পরিণত করা হয় এবং সেই বাষ্প বা ষ্টীমের সাহায্যে টারবাইন চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। তাপ বিনিময়ের পর উত্তপ্ত তরল পদার্থটি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তখন তাকে আবার পাম্প করে চুল্লী-কক্ষের ভিতর দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে ঐ চুল্লীর মধ্যেকার অতিরিক্ত তাপ, তরল পদার্থের মাধ্যমে ক্রমাগত আহরণ করে বাষ্প সৃষ্টি করা হয় এবং সেই বাষ্পের সাহায্যে টারবাইন যন্ত্র চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

গোটা পারমাণবিক চুল্লীটিকে ঘিরে রাখা হয় ইস্পাত, সীসা অথবা কংক্রীটের পুরু এবং ভারী দেয়াল দিয়ে; নচেৎ নিউট্রন অথবা অন্য কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ বাইরে বেরিয়ে এসে কর্মীদের বিপদের কারণ হতে পারে।

১৯৫৬ সালের ৪ঠা অগাষ্ট বোম্বাইয়ের নিকটবর্তী ট্রম্বেতে ভারতের নিজস্ব পারমাণবিক চুল্লী থেকে শক্তি উৎপাদনের কাজ আরম্ভ হয়। মানবকল্যাণে পারমাণবিক শক্তি নিয়োগের উদ্দেশ্যে গবেষণার কাজ চালাবার জন্যে এই চুল্লীটি তৈরী করা হয়েছে। সুইমিংপুল শ্রেণীর এই চুল্লীটি তৈরী করতে খরচ পড়েছে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। ভারতের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডাঃ এইচ. জে. ভাবার নেতৃত্বে ভারতীয় বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ারদের মিলিত চেষ্টায় তৈরী হয়েছে এই পারমাণবিক চুল্লীটি।

ভারতের এই সুইমিংপুল পারমাণবিক চুল্লীটি যে ঘরে স্থাপন করা হয়েছে, সেটি দৈর্ঘ্যে ১০০ ফুট, প্রস্থে ৫০ ফুট ও উচ্চতায় ৭০ ফুট। এই ঘরে যে সমকোণী জলাধারটি আছে তার কংক্রীটের তৈরী দেয়াল ৮ ফুট চওড়া। জলাধারটি দৈর্ঘ্যে ২৮ ফুট, প্রস্থে ১০ ফুট আর গভীরতায় ২৮ ফুট। জলাধারের ভিতরের দিকের দেয়ালে এক বিশেষ ধরণের রং লাগানো আছে। ঐ জলাধারের জলের মধ্যেই চুল্লী-কক্ষটি ডুবিয়ে রাখা হয়। তাই এই চুল্লীকে সুইমিংপুল চুল্লী আখ্যা দেওয়া হয়। জলাধারের দেয়ালের উপর আড়াআড়িভাবে স্থাপন করা হয়েছে লোহার রেল। এই রেলের উপর দিয়ে চাকাওয়ালা ট্রলি চলাফেরা করতে পারে। ট্রলির সঙ্গে সুদৃঢ় কাঠামো দিয়ে জলের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে চুল্লী-কক্ষটিকে।

চুল্লী-কক্ষটি দৈর্ঘ্যে ২ ফুট, প্রস্থে ২ ফুট ও উচ্চতায় ২ ফুট। ট্রলীর সাহায্যে চুল্লী-কক্ষটিকে জলের মধ্যে ইচ্ছামত সরানো যায়। এই চুল্লী-কক্ষে তেজষ্ক্রিয় ইউরেনিয়াম-২৩৫ ও অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্কর ধাতু জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কতকগুলি লম্বা অ্যালুমিনিয়াম দণ্ডের এক প্রান্তে লাগানো থাকে জ্বালানী পদার্থ—ইউরো-অ্যালুমিনিয়াম নামক সঙ্কর ধাতু। জলাধারের উপরের ট্রলি থেকে এই দণ্ডগুলিকে এদিক-ওদিক সরানো যায় অথবা নির্দিষ্টস্থানে স্থাপন করা যায়।

আগেই বলেছি, জলাধারের জল একাধারে মডারেটর হিসাবে কাজ করে এবং উত্তপ্ত চুল্লীকে ঠাণ্ডা রাখে। পরমাণু বিদারণের সময় আল্‌ফা, বিটা, গামা রশ্মি এবং নিউট্রন নির্গত হয়। সবচেয়ে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর কণিকা হলো এই নিউট্রন। দেহের উপর নিউট্রনের প্রতিক্রিয়ার ফলে দেহের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রগুলি বিকল হয়ে যায়। মডারেটর এই বিপদের হাত থেকে কর্মীদের রক্ষা করে। চুল্লীর ভিতরে কয়েকটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রও আছে। এরা বিপদের সময় আপনা থেকেই পারমাণবিক চুল্লীকে অচল করে দেয়। যদি কোন কারণে এই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলি অচল হয়ে পড়ে অথবা চুল্লীতে বেশী তাপ সঞ্চিত হয় তবে জলাধারের জল বাষ্পে পরিণত হয়। তখন আর নিউট্রনের গতি হ্রাস করবার উপায় থাকে না। ফলে নিউট্রনগুলি আর পরমাণু বিদারণের কাজ করতে পারে না। তখন আপনা আপনিই চুল্লীর কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

চুল্লী-কক্ষ থেকে আরম্ভ করে জলাধারের কংক্রীট নির্মিত দেয়াল ভেদ করে অপর পিঠ পর্যন্ত কয়েকটি সুরঙ্গ আছে। এই সুরঙ্গগুলির মধ্য দিয়েই চুল্লী-কক্ষের মধ্যে সৃষ্ট নিউট্রন স্রোত প্রবাহিত হয়। এই সুরঙ্গপথে তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরী করা যায়, আবার এখানে পরীক্ষাধীন কোন পদার্থকে রেখে তার উপর তেজষ্ক্রিয়তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পারমাণবিক চুল্লীর দেয়ালের এক প্রান্তে ৬ ফুট লম্বা ও ৬ ফুট চওড়া একটা গর্ত আছে। এই গর্তটি খাঁটি গ্র্যাফাইট ব্লক দিয়ে বন্ধ করা থাকে। এটিকে বলা হয় তাপস্তম্ভ বা থার্মাল কলাম। এই গর্তের বিপরীত দিকে ৮ ফুট কংক্রীটের দেয়াল থাকবার কথা, কিন্তু তার জায়গায় আছে ২ ইঞ্চি পুরু অ্যালুমিনিয়ামের পাত। এই পাত্‌লা পাতের পিছনে ট্রলির উপর ৮ ফুট পুরু কংক্রীটের দেয়ালটি স্থাপন করা আছে। নিরাপদ আবরণ হিসাবে কোন্ দ্রব্যের কি কি গুণ আছে তা পরীক্ষা করতে হলে ট্রলির উপর স্থাপিত কংক্রীটের দেয়ালটিকে সরিয়ে তার জায়গাতেই সেই দ্রব্যটিকে রাখা হয় এবং পরীক্ষার কাজ চালানো যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের এই প্রথম পারমাণবিক চুল্লীটির কাজ হলো গবেষণার কাজে সাহায্য করা। আশা করা যায়—মানবকল্যাণে পারমাণবিক শক্তি নিয়োগকল্পে গবেষণার জন্যে ভারতের এই শুভ প্রচেষ্টা সর্বাঙ্গীন সাফল্যমণ্ডিত হবে।

বিজ্ঞান সংবাদ

উদ্ভিদ-বর্ধক হর্মোন জিবারিলিক অ্যাসিড

পশু-খাদ্য উৎপাদনের জন্য যে তৃণের চাষ করা হয় তাহা অতঃপর অধিকতর সার প্রয়োগের পরিবর্তে জিবারিলিক অ্যাসিড প্রয়োগেই দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

জিবারিলিক অ্যাসিড হইল একটি উদ্ভিদ-হর্মোন। বিশ বৎসর হইল জাপানীরা ইহার সন্ধান পাইয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকার বিজ্ঞানীদের সম্প্রতি এই দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

আমেরিকার বয়েস টমসন ইন্ষ্টিটিউটের কতিপয় বিজ্ঞানী কেণ্টাকি নীল তৃণের উপর ইহা প্রয়োগ করিয়া দেখেন যে, ইহার ফলে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই ঐ ঘাসের রং ফিরিয়া আসে এবং ঘাস দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

অক্টোবর মাসে যখন ঐ ঘাসের বৃদ্ধি খুব কম থাকে, সেই সময় স্প্রে করিয়া মাঠে জিবারিলিক অ্যাসিড প্রয়োগ করা হয়। ইহার ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই ঘাসগুলির নূতন পাতা বাহির হইতে থাকে এবং উহার রং উজ্জ্বল সবুজ হইয়া উঠে। ঘাসগুলি কাটিয়া ওজন করিলে দেখা যায় যে, উহা টাট্‌কা বা শুষ্ক উভয় অবস্থাতেই স্বাভাবিক ঘাস অপেক্ষা বেশী ভারী। সার সহযোগে জিবারিলিক অ্যাসিড প্রয়োগে ফল আরও ভাল হয় বলিয়া জানা গিয়াছে।

বিজ্ঞানীরা বলেন যে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শীত কালেও জিবারিলিক অ্যাসিড প্রয়োগে ঘাসের বৃদ্ধি দ্রুততর করা সম্ভব হইবে।

পেপেন প্রয়োগে খরগোসের দেহে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া

বিভিন্ন এন্‌জাইম লইয়া পরীক্ষা করিবার সময় নিউ ইয়র্কের বেলিভিউ মেডিক্যাল স্কুলের ডাঃ টমাস পেঁপে হইতে নিষ্কাশিত পেপেন নামক এন্‌জাইম একটি খরগোসের শিরার মধ্যে ইনজেকসন করেন। ইহার ফলে তিন-চার ঘণ্টার মধ্যেই খরগোসটির দেহে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। খরগোসটির খাড়া কান দুইটি স্পেনিয়্যাল কুকুরের কানের ন্যায় ঝুলিয়া পড়ে। কয়েক দিন এই অবস্থায় থাকিবার পর উহার কান দুইটি ক্রমশঃ আবার খাড়া হইয়া স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে।

এই সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া দেখা যায় যে, খরগোসের কানের ম্যাট্রিক্স নামক কার্টিলেজ অস্থি পেপেনের দ্বারা দ্রবীভূত হইবার ফলে ঐরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। পেপেন এন্‌জাইমের মধ্যস্থিত যে অংশটি এই প্রতিক্রিয়া আনয়ন করে, ডাঃ টমাস এখন তাহা পৃথকভাবে নিষ্কাশন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের দ্বারা কীট ধ্বংস

পারমাণবিক বিকিরণের দ্বারা শস্য এবং কাঠ ধ্বংসকারী কীট ধ্বংস করা সম্ভব বলিয়া এক খবরে প্রকাশ।

এক জাতীয় পোকা কাঠের ভিতর প্রবেশ করিয়া বরাবর ছিদ্র করিয়া ফেলে এবং অনেক-গুলি ছিদ্র হইবার ফলে কাঠখানি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এই পোকাগুলির দ্বারা বহু মূল্যবান আসবাবপত্র, এমন কি জাহাজ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ইংল্যাণ্ডে ওয়েষ্টমিনিষ্টার অ্যাবি, সেণ্ট পল্‌স্ ক্যাথিড্রাল ও অন্যান্য বহুকালের পুরাতন গির্জার মূল্যবান আসবাবপত্র এবং কড়ি-বরগা ইত্যাদি ডেথ-ওয়াচ নামে এক জাতীয় পোকা সম্প্রতি

কাটিয়া নষ্ট করিয়া দিতেছে। এই সকল মূল্যবান সামগ্রীর ধ্বংস নিবারণের জন্য এক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, কোবাল্ট-৬০ হইতে নিঃসৃত গামা রশ্মির প্রভাবে ডেথ-ওয়াচ ও ফার্নিচার-বিট্‌ল্‌-এর ডিমগুলি নষ্ট হইয়া যায়। সদ্যপ্রসূত ডিমগুলির উপর তিন-চার দিন বিকিরণ প্রয়োগেই ফল হয়। ডিমগুলি আরও পরিণত অবস্থায় থাকিলে বিকিরণের মাত্রা কিছু বেশী প্রয়োজন হয়। পরীক্ষায় আরও দেখা গিয়াছে যে, স্ত্রী, পুরুষ উভয় কীটের উপর বিকিরণ প্রয়োগের ফলে অনুর্বর ডিম উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অ্যালিসবেরি ফরেষ্ট প্রোডাক্ট রিসার্চ লেবরেটরির মিঃ কিসার ও মিঃ ব্লেচলি এই পরীক্ষা পরিচালনা করেন। তাঁহারা বলেন যে, পরিণত বয়স্ক ডেথ-ওয়াচ বিট্‌ল্‌ কয়েক মাস পর্যন্ত কাষ্ঠের অভ্যন্তরে অবস্থান করিবার পর বাহির হইয়া আসে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার সময় এই বিষয়ে নজর রাখা দরকার।

হারওয়েল অ্যাটমিক এনার্জি রিসার্চ এষ্টাব্লিস-মেন্টের কতিপয় বিজ্ঞানী এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করেন যে, কোবাল্ট-৬০ হইতে নির্গত গামা রশ্মি বা ভ্যাণ্ডিগ্রাফ হইতে উৎপন্ন দ্রুতগামী ইলেকট্রনের সাহায্যে ধান্যাদি শস্যের ক্ষতিকারক কীট ধ্বংস করা বা উহাদের ডিমের উর্বরতা নষ্ট করা সম্ভব।

১৩ প্রকার ক্ষতিকারক কীটের উপর তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহার ফলে কীটগুলি, হয় মরিয়া যায়, না হয় উহাদের বংশ বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়।

দৈনন্দিন খাদ্যের সঙ্গে ব্যাধির সম্বন্ধ

নিউ ইয়র্কে দেহপুষ্টি সম্বন্ধে এক সভায় সাউথ আফ্রিকান মেডিক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের ডাঃ ওয়াকার বলেন যে, অল্প প্রোটিনযুক্ত খাদ্য খাইয়া সাউথ আফ্রিকার বাণ্টু জাতি কেমন করিয়া সুস্থ সবল দেহে দীর্ঘজীবন লাভ করে তাহা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। বর্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীরা উচ্চ-প্রোটিনযুক্ত খাদ্য খাইয়াও নানাপ্রকার রোগে ভুগিয়া থাকে। ইহার ফলে অদূর ভবিষ্যতে ঐ সভ্য দেশগুলির অধিবাসীদের আয়ুষ্কাল হ্রাস পাইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যে সব পুষ্টিকর খাদ্য একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বর্তমানে বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বাণ্টুরা সেই সব অনেক খাদ্য মোটেই ব্যবহার করে না। তাহা সত্বেও অথবা হয়তো সেই কারণেই উহারা কতকগুলি রোগ হইতে মুক্ত থাকে; যেমন—হৃৎপিণ্ডের রোগ, কয়েক ধরণের ক্যানসার, মধুমেহ, পাকস্থলীর ক্ষত এবং অ্যাপেণ্ডিসাইটিস।

বাণ্টুদের খাদ্য হইল প্রধানতঃ ধান, গম, ভুট্টা, শাক ও তরিতরকারি। এই ধরণের খাদ্যে ক্যালরির পরিমাণ যথেষ্ট এবং ইহার প্রোটিন উৎকৃষ্ট জাতীয় হইলেও অনেক সময় ইহাতে ক্যালসিয়াম, রিবোফ্ল্যাভিন ও ভিটামিন-ডি মোটেই থাকে না। বিশেষজ্ঞদের মতে এই ধরণের খাদ্য অসম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়।

কিন্তু দশ বৎসর যাবৎ বাণ্টুদের পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, উহাদের মধ্যে ধমনীর কাঠিন্য রোগ অতিশয় বিরল। যদিও কোন কোন লোকের ধমনীর কাঠিন্য থাকে, তাহা হইতে আমেরিকানদের মত হৃৎপিণ্ডের রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায় না। বাণ্টুদের দেহের রক্তে কোলেষ্টেরোলের পরিমাণও আমেরিকানদের অপেক্ষা অল্প।

গর্ভবতী স্ত্রীলোক ও স্তন্যদায়িনী মাতার পক্ষে ক্যালসিয়ামের বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া জানা আছে। কিন্তু বাণ্টুদের খাদ্যে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ অতি সামান্য হইলেও বাণ্টু মাতার দুধ আমেরিকান মাতার দুধ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর এবং পরিমাণও বেশী।

খাদ্যে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিনের পরিমাণ অল্প হওয়া সত্ত্বেও বাণ্টু শিশুদের মধ্যে দাঁতের কেরিস রোগ হইতে দেখা যায় না। তাহাদের দেহের অস্থিও আমেরিকান শিশুদের মতই সবল।

ডাঃ ওয়াকার বলেন, উপরিউক্ত বিষয়গুলির বিবেচনায় বাণ্টুদের স্বাস্থ্য খুব সন্তোষজনক হইলেও কয়েকটি অবাঞ্ছিত দিকও আছে। বাণ্টু শিশুদের মধ্যে রোগ ও মৃত্যুর সংখ্যা খুব বেশী এবং বয়স্কদের মধ্যে লিভারের রোগও কম নহে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সব দিক হইতে এক সঙ্গে বিচার করিলে দেখা যায় যে, সভ্যসমাজে যে সকল রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবার ফলে মৃত্যুর হার বাড়িয়া চলিয়াছে, বাণ্টুজাতি সেই সকল রোগ হইতে মুক্ত।

ক্যান্সারের প্রভাবে দেহমধ্যস্থ আয়োডিনের সারা দেহে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান

তেজস্ক্রিয় আয়োডিনের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে, ক্যান্সারগ্রস্ত হইলে দেহস্থ আয়োডিন দেহের সর্বত্র বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে।

স্বাভাবিক অবস্থায় সমস্ত আয়োডিন থাইরয়েড গ্রন্থির মধ্যে শোষিত হইয়া থাইরয়েড হর্মোন গঠনে ব্যবহৃত হয় এবং উদ্বৃত্ত অংশ দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যায়। ক্যালিফোর্নিয়া মেডিক্যাল স্কুলের ডাঃ স্কট ও ডাঃ ড্যানিয়েল তাঁহাদের পরীক্ষায় দেখেন যে, ক্যান্সারগ্রস্ত জন্তুর দেহে আয়োডিন থাইরয়েড গ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হইয়া ক্যানসার-আব ও উহার চতুষ্পার্শ্বের তন্তুতে চলিয়া আসে এবং দেহের অন্যান্য অংশেও বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করিতে থাকে।

তবে ক্যান্সারজনিত আব যখন খুব ছোট অবস্থায় থাকে তখন উহার চতুষ্পার্শ্বের তন্তুতে আয়োডিন সংগৃহীত হয় না। কিন্তু আব যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে আয়োডিনও ততই ক্যান্সার তন্তুর নিকটে এবং ত্বক, পেশী ও রক্তের প্লাজমার ভিতর ছড়াইয়া পড়িতে থাকে।

কিন্তু ক্যান্সার প্রতিরোধী জন্তুর দেহে ইনজেকসন করিয়া দিলেও আয়োডিন থাইরয়েড গ্রন্থির বাহিরে অন্যান্য তন্তুতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে দেখা যায় না। আবটি বড় হইলেও উহার চতুস্পার্শ্বের তন্তুর মধ্যে আয়োডিনের অবস্থান পরিলক্ষিত হয় না।

বিজ্ঞানীরা দেখেন যে, ক্যান্সার তন্তুর প্রোটিনের একটি উপাদান, কোন পলিপেপটাইডের দ্বারা আয়োডিন সংগ্রহ সুরু হয়। এই রাসায়নিক পদার্থটি কোন ক্যান্সারপ্রবণ জন্তুর দেহে ইনজেকসন করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহার ফলে থাইরয়েড গ্রন্থি হইতে আয়োডিন অন্যত্র প্রেরিত হইতে থাকে।

ট্রাইটিয়ামের সাহায্যে সারা পৃথিবীর জলের আবর্তন পর্যবেক্ষণ

আমেরিকান মিটিয়রোলজিক্যাল সোসাইটির এক সভার খবরে প্রকাশ যে, ট্রাইটিয়ামের সাহায্যে সারা পৃথিবীর জলের আবর্তন পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। ট্রাইটিয়াম হইল হাইড্রোজেনের একটি রূপান্তর। সাধারণ হাইড্রোজেন অপেক্ষা তিনগুণ ভারী এই ট্রাইটিয়াম হাইড্রোজেন বোমার অন্যতম উপাদান।

পৃথিবীর কোন অংশে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটিলে সারা পৃথিবীর ট্রাইটিয়ামের পরিমাণ হঠাৎ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বিজ্ঞানীরা ইহার পরিমাপ হইতে বোমা বিস্ফোরণের খবর পাইয়া থাকেন।

এনরিকো ফের্মি ইনষ্টিটিউটের ডাঃ বিজম্যান বলেন, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের পক্ষে ট্রাইটিয়াম খুব উপযোগী। কারণ ইহা অক্সিজেনের সহিত মিলিয়া জল উৎপন্ন হয়। ট্রাইটিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা

বারো বৎসর যাবৎ পরিমাপ করা যায় এবং উহা দেহের পক্ষে মোটেই ক্ষতিকারক নহে।

সূর্য হইতে উদ্ভূত মহাজাগতিক রশ্মির আঘাতে বাতাস হইতে ট্রাইটিয়াম উৎপন্ন হয় বলিয়া বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস। তিন বৎসর পূর্বে অপারেশন কাস্‌ল্‌-এ নির্মিত হাইড্রোজেন বোমা যখন প্রথম বিস্ফোরণ ঘটান হয় তখন হইতে সারা পৃথিবীর ট্রাইটিয়ামের পরিমাণ দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছে।

প্রতি কিউবিক সেন্টিমিটার জলে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে বলিয়া জানা আছে। প্রতি কিউবিক সেন্টিমিটার জলে বর্তমানে গড়ে এক মিলিয়ন ট্রাইটিয়াম আছে বলিয়া দেখা গিয়াছে।

ডাঃ বিজম্যান ট্রাইটিয়ামের সাহায্যে উত্তর মিসিসিপি উপত্যকার জলের আবর্তন হিসাব করেন। তিনি দেখেন যে, ঐ অঞ্চলে সমুদ্র হইতে উত্থিত বাষ্পের শতকরা ৫২ ভাগ বৃষ্টির আকারে পতিত হয়। তিনি আরও পর্যবেক্ষণ করেন যে, সিকাগো অঞ্চলে যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয় তাহার দুই-তৃতীয়াংশ সমুদ্র হইতে আনীত জলীয় বাষ্প এবং বাকী এক-তৃতীয়াংশ স্থানীয় জলের বাষ্প হইতে উৎপন্ন।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

কৃত্রিম উপগ্রহ পরিকল্পনায় এইরূপ পরীক্ষামূলক ক্ষুদ্রাকৃতি বর্তুল ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইবে। ওয়াশিংটনের নৌ-গবেষণাগারে যন্ত্রবিজ্ঞানী ওয়েন ট্রেলর অ্যানটিনাযুক্ত একটি বর্তুল কম্পন পরীক্ষা করিতেছেন।

শক্তির বিকল্প উৎস

শ্রীহারাণচন্দ্র চক্রবর্তী

কয়লা এবং তেল—এ দুটা খনিজ পদার্থই হলো বিরাট শক্তির আধার। প্রায় দু-শ' বছর ধরে শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এটা লক্ষ্য করা গেছে যে, বার্ষিক খরচ ১৭ বছর অন্তর প্রায় দ্বিগুণ হয়ে পড়ে। ১৫×১০^{১৫} কিলোগ্র্যাম ক্যালোরি বা ৫×১০^{১২} কিলোওয়াট ঘণ্টা শক্তি বছরে খরচ হয়ে থাকে। এক গ্র্যাম জলকে এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তপ্ত করতে যে পরিমাণ তাপশক্তির প্রয়োজন হয় তাকে গ্র্যাম-ক্যালোরি বলে। আর ১০০০ গ্র্যাম-ক্যালোরি তাপকে বলে কিলোগ্র্যাম ক্যালোরি। সাধারণতঃ তড়িৎশক্তিকে পরিমাপ করতেই ওয়াট কথাটা ব্যবহৃত হয়। তড়িৎপ্রবাহের অ্যাম্পিয়ার সংখ্যাকে তড়িৎ-চাপের ভোল্ট সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে যে গুণফল হবে, সেটাই তড়িৎ শক্তিরপরিমাপক ওয়াট সংখ্যা। ১০০০ ওয়াট = ১ কিলোওয়াট = ১'৩৪ অশ্বশক্তি। শক্তি পরিমাপ করতে এই পরিমাপক সংখ্যাগুলিকেই বেশী ব্যবহার করা হয়। এক পরিমাপক সংখ্যাকে অন্য পরিমাপক সংখ্যাতে পরিণত করা যায়।

One watt = One joule = 10^7 ergs

One Calorie = 4·18 joules = $4·18 \times 10^7$ ergs.

কার্বন এবং হাইড্রোজেন উভয়েই দাহ্য পদার্থ। এ দুটি উপাদনই কয়লা আর তেলের মধ্যে বিদ্যমান। এদের পোড়ালে অঙ্গার অঙ্গারাম্লে পরিণত হয় আর তাপের সৃষ্টি করে। এই তাপ-শক্তিকেই যন্ত্রশক্তি, তড়িৎশক্তি প্রভৃতি অন্য শক্তিতে আমরা রূপান্তরিত করে থাকি। এক গ্র্যাম অণু, অর্থাৎ ৪৪ গ্র্যাম অঙ্গারাম্ল উৎপন্ন হলে ৯৪,৩০০ ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন হয়।

$$C + 2\,0 \rightarrow CO_2 + 94{,}300 \text{ Calories}$$
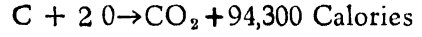
12gm 32 gm 44gm

কয়লা এবং তেলের মধ্যে আবার অনেক বাজে পদার্থ আছে। এখন বোঝা যাবে যে, কত কয়লা বা তেল পোড়ালে ঐ বিপুল পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়। এ ভাবে কয়লা ও তেল ক্ষয় হতে থাকলে এমন একদিন আসবে যখন এদের আধারগুলি শূন্য হয়ে পড়বে। সেজন্যে বৈজ্ঞানিকেরা শক্তির বিকল্প উৎস সম্বন্ধে চিন্তা করছেন।

বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিকদের শ্রেষ্ঠ অবদান হলো পারমাণবিক শক্তি আহরণের উপায় আবিষ্কার। ভবিষ্যতে কয়লা এবং তেলের পরিবর্তে মানবকল্যাণে এই শক্তি যাতে কাজ করতে পারে, সেই চেষ্টা চলছে। কিন্তু এই শক্তিকে কাজে লাগাতে গেলে অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়। তাছাড়া পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনেও অনেক খরচ পড়ে। পারমাণবিক শক্তি ছাড়া শক্তির আরও কি কি উৎস হতে পারে, সে সম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিকেরা অনেক পরীক্ষা করছেন। সে বিষয়ে এখন কিছু আলোচনা করা যাক।

১। সৌর-শক্তি

আমাদের পৃথিবী সূর্য থেকে তাপরূপে যে শক্তি আহরণ করে তার পরিমাণ বিপুল। ৪×১০^{২৩} টন শ্রেষ্ঠ কয়লা অ্যান্‌থ্যাসাইট পোড়ালে যে তাপ উৎপন্ন হয়, সেই পরিমাণ তাপ সূর্য এক বছরে বিকিরণ করে।

সূর্য থেকে আমাদের পৃথিবী প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে আছে। ঐ বিপুল সৌর-শক্তির

মাত্র ১০ লক্ষাংশের দু-সহস্রাংশ পরিমাণ, অর্থাৎ $\frac{২}{১০০০} \times \frac{১}{১০০০০০০}$ বা ২×১০^{-৯} অংশ পৌছায়। এই ক্ষুদ্রাংশই আমাদের কাছে বিপুল। কোন উন্নত দেশে যে পরিমাণ শক্তির দরকার তার চেয়ে আরও বেশী সৌর-তাপ পৃথিবীর স্থলভাগে আসে। হিসাব করে দেখা গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন যানবাহন, উৎপাদন, রান্না, গরম জল সরবরাহ এবং আরও অন্যান্য সব কাজে মাথাপিছু ১৫০০০০ ক্যালোরি বা ১৭৪ কিলোওয়াট-ঘণ্টা শক্তি খরচ হয়ে থাকে। প্রত্যেকের জন্যে প্রতিদিন সূর্য থেকে যে তাপ ও আলো পাওয়া যায় তার পরিমাণ হলো ২৭ কোটি কিলোক্যালোরি।

অঙ্গার আত্মকরণের সময় উদ্ভিদেরা মাত্র শতকরা দু ভাগ সৌর-তাপ নেয়। বাকী অংশ নষ্ট হয়ে যায়। অযথা নষ্ট না করে কিভাবে সৌর-শক্তিকে কাজে লাগানো যায়, তার জন্যে অনেক রকম যন্ত্রাদি উদ্ভাবিত হচ্ছে। সৌর-চুল্লী, ইঞ্জিন, ব্যাটারী প্রভৃতি তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বেল টেলিফোন লেবরেটরী ঘোষণা করেছে যে, বিশুদ্ধ সিলিকন দিয়ে তৈরী সৌর-ব্যাটারী শতকরা আট ভাগ থেকে এগার ভাগ পর্যন্ত সূর্যালোক তড়িৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে। সুদূর পল্লী অঞ্চলে এসব যন্ত্র টেলিফোন লাইনের জন্যে তড়িৎশক্তি উৎপাদনের কাজে আসতে পারে।

সৌর-ইঞ্জিন নতুন জিনিষ নয়। ১৮৮৪ সালে প্যারিসে এক ছাপাখানায় ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৯১৩ সালে ২০ অশ্বশক্তিসম্পন্ন সৌর-ইঞ্জিন সেচ কাজের জন্যে নীল নদ থেকে জল তুলে দিত। ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে দিল্লীতে ভারতের জাতীয় পদার্থ-বিজ্ঞান গবেষণাগারে সৌর-শক্তি এবং বাতাসের শক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। এই প্রদর্শনীতে সৌর-চুল্লী প্রদর্শিত হয়। এই সভাতে রুশ বৈজ্ঞানিক ভি. কেম রাশিয়ায় ব্যবহৃত সৌর-চুল্লী সম্বন্ধে এক বিবরণ দেন।

সৌর-শক্তিকে কাজে লাগাবার কতকগুলি অসুবিধা আছে। সূর্যতাপের উষ্ণতা কম, আলোর তীব্রতা কাজে লাগাবার জন্যে বেশী নয়; তাছাড়া আসবার সময় আলো বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে। এসব অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও অনেক সুবিধা আছে। সূর্যের আলো প্রায় সব জায়গায় ও বেশীর ভাগ সময় পাওয়া যায়। এর মধ্যে কোন ক্ষতিকারক পদার্থ নেই। সূর্যতাপকে কম বা বেশী পরিমাণে ব্যবহার করতে পারা যায়। সৌর-শক্তি চালিত যন্ত্রগুলি ছোট, সরল আর পারমাণবিক চুল্লীর চেয়ে সস্তা।

সৌর-শক্তি সংগ্রাহক যন্ত্র এমনভাবে তৈরী হচ্ছে যে, তার সাহায্যে ৩০০০° সেন্টিগ্রেডের চেয়েও উষ্ণতা বাড়াতে পারা যায়। সংগ্রাহক যন্ত্রে আছে অবিবৃত্ত আকারে কাচের আয়না। এসব আয়না সূর্যের আলো-কে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করে। যার ফলে অত উষ্ণতা উৎপন্ন হয়। শীতপ্রধান দেশে ঘর গরম রাখবার জন্যে, বিশেষ করে শীতকালে সৌর-শক্তিকে ব্যবহার করতে পারা যায়। ডাঃ ম্যারিয়া টেক্কেস এমন একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন যার সাহায্যে সূর্যতাপ সংগ্রহ করে ভবিষ্যতের জন্যে রাখা যায়। সোডিয়াম সালফেট আর জল এর জন্যে দরকার। মেঘলা বা বাদলের সময় দশদিন পর্যন্ত এই যন্ত্র তাপ সরবরাহ করতে পারে। ক্যালিফোর্নিয়া এবং ফ্লোরিডাতে বাড়ীর ছাদে কালো রং-করা পাইপের মধ্যে জল থাকে। ঐ জল সূর্যতাপে গরম হয়ে বাড়ীর কাজের জন্যে ব্যবহৃত হয়। এখন প্লাষ্টিকের সৌর-শক্তি সংগ্রাহক যন্ত্র তৈরী হচ্ছে। তার দাম কম।

বাড়ী ঠাণ্ডা রাখবার জন্যেও সূর্যরশ্মিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে খাদ্য-দ্রব্যাদি সংরক্ষণের জন্যে হিমায়ন দরকার। কম স্ফুটনাঙ্কের তরল পদার্থ নিয়ে এই সৌর-ইঞ্জিনের সাহায্যে হিমায়ণের ব্যবস্থা করতে পারা গেছে। ১৯৫৪ সালে ভারতে সৌর-শক্তি সম্বন্ধে যে সভা হয় তাতে রুশ বৈজ্ঞানিক ঘোষণা করেন যে,

রাশিয়াতে একটি সৌর-ইঞ্জিন একদিনে ২৫০ কিলোগ্রাম বরফ তৈরী করতে পারে।

পত্র-হরিৎযুক্ত উদ্ভিদের ন্যায় অ্যাল্‌গিও সূর্য-কিরণের মাধ্যমে অঙ্গার আত্মকরণের সময় অজৈব পদার্থসমূহকে জৈব পদার্থে পরিণত করে। এই জলজ উদ্ভিদকে বিভিন্ন আকারে দেখতে পাওয়া যায়। এককোষী থেকে আরম্ভ করে বিরাট আকারের পর্যন্ত অ্যাল্‌গি দেখা গেছে। এখানে এককোষী অ্যাল্‌গি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার।

বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি এখন অ্যাল্‌গির দিকে পড়বার কারণ হলো, নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় অ্যাল্‌গি, যেমন—ক্লোরেলা, বিশেষ পদ্ধতিতে চাষ করলে যে ফসল হয় তা সাধারণ ফসল অপেক্ষা দশ থেকে বিশ গুণ পর্যন্ত বাড়াতে পারা যায়। এসব পদ্ধতিতে অবশ্য উৎপাদন করতে বেশ খরচ হয়।

অঙ্গার আত্মকরণের সময় সূর্যকিরণের মাধ্যমে উদ্ভিদ পত্র হরিতের সাহায্যে শক্তি আহরণ করে। বায়ুর অঙ্গারাম্ল ও পাতার ভিতরকার জলের রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়ে শর্করা উৎপন্ন করে। অক্সিজেন বিমুক্ত হয়ে পুনরায় বায়ুতে চলে যায়। পত্র-হরিৎ এবং আলো এক্ষেত্রে বস্তুতঃ অনুঘটকের কাজ করে মাত্র।

$6CO_2 + 6H_20 + Chlorophyll + light \rightarrow C_6H_{12}0_6 + 60_2$—এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার জন্যে অণুপ্রতি ১১২ কিলোক্যালোরি শক্তি লাগে। গবেষণাগারে অ্যাল্‌গি নিয়ে গবেষণা করে দেখা যায় যে, এক অণু শর্করা তৈরী করতে আট থেকে দশ বিকিরিত আলোক-শক্তির একক দরকার। সে জন্যে কম খরচায় কেমন করে অ্যাল্‌গির চাষ করা যায় তার জন্যে চেষ্টা চলছে।

অ্যাল্‌গির অনেক গুণ আছে। অন্যান্য খাদ্য-দ্রব্যের তুলনায় বাজে জিনিষ এর মধ্যে নেই বললেও হয়। এ খুব পুষ্টিকর আর সহজপাচ্য। শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশী আমিষ জাতীয় পদার্থ এর মধ্যে থাকে। মানুষের শরীরের পক্ষে খুব দরকারী, এ রকম দশটি অ্যামিনো অ্যাসিড এই আমিষ জাতীয় পদার্থের মধ্যে আছে।

পৃথিবীতে লোকসংখ্যা বাড়ছে। তাছাড়া পৃথিবীতে এখনও এমন সব দেশ আছে যেখানে লোকে পরিমাণমত আমিষজাতীয় পদার্থ খেতে পায় না। তার ফলে তাদের শরীরের পুষ্টিসাধন হয় না। এসব জায়গায় এবং ভবিষ্যতে খাদ্য হিসাবে অ্যাল্‌গি ব্যবহারের সম্ভাবনা আছে।

গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের অধিকাংশ দেশ এখনও অনুন্নত, আর দারিদ্র্যপীড়িত। এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে সূর্যের আলো পড়ে। এক বর্গমাইলে যে পরিমাণ সূর্যের আলো পাওয়া যায় তাকে ঠিক ভাবে কাজে লাগাতে পারলে দশ লক্ষ কিলোওয়াট শক্তি উৎপন্ন হতে পারে। এই বিরাট শক্তি ব্যবহার করে এসব দেশে শিল্প গড়ে উঠতে পারে। তাহলে দেশের সম্পদ আর লোকের জীবনযাত্রার মান বাড়বে।

২। অসৌর-শক্তি

এ পর্যন্ত সৌর-শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। সূর্য ছাড়া শক্তির আর কি কি উৎস হতে পারে, সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করবো।

(ক) বাতাসের শক্তি

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ বাতাসের ব্যবহার জানতো। বাতাসের সাহায্যে সমুদ্রে পাল-তোলা জাহাজ চালাতো। পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চল এই সব পাল-তোলা জাহাজের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছে। শস্যাদি ভাঙবার জন্যে মানুষ বাতাস-কল উদ্ভাবন করে। এখন বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্রের সঙ্গে বড় বড় প্রোপেলার লাগানো হয়েছে। বাতাসে সেগুলি ঘুরলে তড়িৎশক্তি উৎপন্ন হয়। শ্রেষ্ঠ যন্ত্রগুলির সাহায্যে ঘণ্টায় চার কিংবা পাঁচ মাইল গতির এক বর্গমাইল বায়ুপ্রবাহও ১৫০০০০ কিলো-ওয়াট শক্তি উৎপন্ন করতে পারে। পল্লী অঞ্চলে বা যে সব স্থানে বৈদ্যুতিক তার কম খরচায় নিয়ে

যেতে অসুবিধা আছে, সেখানে এসব যন্ত্রকে ঠিক ভাবে কাজে লাগাতে পারলে বেশ উপকারে আসবে। প্রায় পাঁচ লক্ষ বাতাস-কল মানবসেবায় প্রতিদিন কাজ করে বাচ্ছে। এদের দিয়ে তড়িৎ-শক্তি উৎপাদন, সেচের জন্যে জল উত্তোলন এবং আরও অনেক কাজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আমেরিকার প্রেরী অঞ্চলে আর হল্যাণ্ডের পল্লী অঞ্চলে বাতাস-কলের সাহায্যে তড়িৎশক্তি উৎপাদন করে কৃষিকাজের অনেক সুবিধা হয়েছে।

(খ) জল-বিদ্যুৎ

জলপ্রপাত আর খরস্রোতা নদী থেকে তড়িৎ-শক্তি উৎপন্ন করবার ব্যাপারটা এখন সকলের কাছেই পরিচিত। পৃথিবীতে কয়েকটি দেশ আছে, যেমন নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি—যেখানে অনেক জলপ্রপাত দেখা যায়। এদের সাহায্যে সস্তায় তড়িৎশক্তি সৃষ্টি করে দেশগুলির শিল্প ও সম্পদ বেড়েছে। ভারতবর্ষের উত্তরবঙ্গ, আসাম এবং দাক্ষিণাত্যের খরস্রোতা নদী থেকে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর জল-বিদ্যুৎ আর সেচের জন্যে অনেক বাঁধ, বিরাট জলাশয়, খাল ইত্যাদি তৈরী করা হয়েছে। দামোদর নদের বাঁধ, হীরাকুদ বাঁধ, ময়ূরাক্ষী নদীর বাঁধ, ভাকরা-নাঙ্গল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সারা দুনিয়ায় দশ কোটি কিলো-ওয়াটের জল-বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র কাজে লাগিয়ে বছরে ১ ^{১২} কিলোওয়াট-ঘণ্টা শক্তি তৈরী হচ্ছে।

(গ) চান্দ্র-শক্তি

সূর্য এবং চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার-ভাটা হয়। সূর্য অনেক দূরে আছে বলে চন্দ্রের আকর্ষণই বেশী ঢেউএর সৃষ্টি করে। কয়েক জায়গায় এর উচ্চতা ২৫ থেকে ৫০ ফুট পর্যন্ত হয়। ইংল্যাণ্ডের সেভার্ন খাঁড়িতে আর নোভাস্কটিয়ার ফাণ্ডি উপসাগরে এ রকম ঢেউ দেখা যায়। ঢেউ-এর সাহায্যে শক্তি তৈরী করবার জন্যে ফাণ্ডি উপসাগরে কয়েকটি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ হচ্ছে। পরিকল্পনা-গুলি সফল হলে বছরে ১০০ কোটি কিলোওয়াট-ঘণ্টা শক্তি উৎপন্ন হবে।

এ সব উৎস ছাড়াও সমুদ্রের জল থেকে, পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে শক্তি পাওয়া যায় কি না, সে সম্বন্ধেও পরীক্ষা হয়েছে। সমুদ্রের জলের উপরি তল আর গভীর স্তরের মধ্যে উষ্ণতার তফাৎ আছে। এই উষ্ণতার তফাৎকে কাজে লাগিয়ে শক্তি তৈরী করবার জন্যে পরীক্ষা হয়েছিল, কিন্তু সে পরীক্ষায় আশাপ্রদ ফল হয় নি।

পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ এখনও গলিত অবস্থায় আছে বলে মনে হয়। সেখান থেকে তাপ সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়বহুল। ১৯৩০ সাল থেকে সজীব আগ্নেয়গিরি এবং উষ্ণ প্রস্রবণগুলি আইস-ল্যাণ্ডে শক্তি সরবরাহ করে আসছে। রেকজাভিক সহরে প্রতিদিন দশ লক্ষাধিক ঘনফুট গরম জল ঐ সব প্রস্রবণ থেকে পাঠানো হয়। ইটালীর টাসকেনীতে এক রকম প্রাকৃতিক ব্যাপার দেখতে পাওয়া যায়। প্রকৃতির এই খেয়ালকে সোফিওন বলে। মাটির ভিতর থেকে গর্ত দিয়ে বাষ্প বেরিয়ে আসে। বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালাবার জন্যে এই বাষ্প ঐ সহরে ১৮৯৪ সাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

লোকসংখ্যা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শক্তির খরচও বাড়ছে। কয়লা ও তেল ক্রমশঃ নিঃশেষিত হয়ে আসছে। যাতে শক্তির বিকল্প উৎস থেকে কম খরচায় শক্তি পাওয়া যায়, সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করে চলেছেন। যার ফলে নতুন নতুন যন্ত্র উদ্ভাবিত উন্নয়ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভবিষ্যতে হয়তো শক্তির এসব বিভিন্ন উৎস মানব-সেবায় প্রভূত পরিমাণে নিয়োজিত হবে।

বার্ধক্যে প্রস্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি

শ্রীনির্মলচন্দ্র দাস

চিকিৎসা শাস্ত্রে এযাবৎ এমন কতকগুলি রোগের সন্ধান মিলিয়াছে যাহাদের লক্ষণ দেখিয়া গুরুতর কিছু মনে হয় না। এমন কি, সেগুলি যে আদৌ কোন রোগের লক্ষণ, অনেক সময়ে তাহা সন্দেহই হয় না। সেগুলিকে আমরা বৃদ্ধ বয়সের উপসর্গ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি এবং এই ভ্রান্তির সুযোগ লইয়াই ইহারা প্রভূত দুর্গতির কারণ হইয়া থাকে ; এমন কি, সময়ে সময়ে মৃত্যুর মুখেও ঠেলিয়া দেয়। বার্ধক্যে প্রস্টেট গ্রন্থির আয়তন বৃদ্ধি ইহাদেরই অন্যতম। হাসপাতালে সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ রোগীদের মধ্যে এই রোগ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

এই রোগে কি হয় ? রোগের নামকরণ হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, বার্ধক্যর দরুণ ইহাতে প্রস্টেট গ্রন্থি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহাতে শরীরের কোন একটি বিশেষ অংশে কিছু পরিবর্তন ঘটে, যাহার জন্য কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই বৃদ্ধিকে নির্দোষ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে এই কারণে যে, ইহা টিউমার বা ক্যান্সার জাতীয় কোন উৎকট ব্যাধি নয়। প্রস্টেটের টিউমার বা ক্যান্সার রোগে এই গ্রন্থির কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অনিষ্ট-সাধনকারী এই সকল ক্যান্সার কোষগুলি শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়ে, অর্থাৎ metastasis হয় এবং রোগীকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দেয়। প্রস্টেটের এই রোগে কোষের সংখ্যা ঠিক থাকে, অর্থাৎ এই গ্রন্থিটি মোট যতগুলি কোষের দ্বারা গঠিত তাহাদের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে। এই জন্যই ইহাকে নির্দোষ বৃদ্ধি বলা যাইতে পারে। স্ত্রীলোকেরা কখনই এই রোগে আক্রান্ত হইতে পারে না ; কেন না, স্ত্রীলোকের শরীরে এই গ্রন্থির অস্তিত্ব নাই। যেসব পুরুষের বয়স ৪৫-৫০ বৎসর পার হইয়া গিয়াছে, তাহাদের উপরই ইহার আধিপত্য।

এই ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি ঘন ঘন মূত্রত্যাগ করিয়া থাকে। প্রথম প্রথম ইহা রাত্রিতেই বেশী হয়। রোগীকে রাত্রিতে ৩।৪ বার শয্যাত্যাগ করিতে হয়। এই লক্ষণ পরে দিনে ও রাত্রে সমান হইয়া-যায়। মূত্রত্যাগ করিতে বসিয়া বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর মূত্র নির্গমন সুরু হয়। ক্ষেত্রবিশেষে ইহা কয়েক সেকেণ্ড হইতে কয়েক মিনিট পর্যন্ত হইতে পারে। কোঁৎ দিয়া চেষ্টা করিলেই মূত্র নির্গমন বন্ধ হইয়া যায়। মূত্রের ধারা পূর্বেকার মত আর জোরে নির্গত হয় না, glans penis-এর অগ্রভাগ হইতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পড়িতে থাকে। কখনও কখনও আবার বেগ হইলে মোটেই ধরিয়া রাখা যায় না, বসিবার পূর্বেই মূত্র নির্গমন সুরু হইয়া যায়। মূত্রত্যাগের পর কখনই স্বস্তি পাওয়া যায় না, মনে হয় যেন মূত্রথলিতে খানিকটা রহিয়া গেল। সময়ে সময়ে মূত্রত্যাগের পর উঠিয়া দাঁড়াইবামাত্র কোথা হইতে খানিকটা বাহির হইয়া আসে। সাধারণতঃ দাঁড়াইয়া মূত্রত্যাগ করিতেই যেন সুবিধা হয়। বারে বেশী হওয়ার দরুণ প্রতিবারে মূত্রের পরিমাণও কমিয়া যায়। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি উপরোক্ত লক্ষণগুলি হয়তো অনেককাল ধরিয়াই লক্ষ্য করিয়া থাকে। কিন্তু আগেই উল্লেখ করিয়াছি, রোগী কখনই এই লক্ষণগুলিকে কোন রোগের কারণ বলিয়া মনে করে না এবং যত রোগী এই রোগে আক্রান্ত হয়, তাঁহাদের অধিকাংশই এই অসুবিধাগুলি সম্বন্ধে অভিযোগ করে না। *Acute retention of*

urine, অর্থাৎ মূত্র নির্গমন হঠাৎ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাহারা এই রোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করে না। এই retention-এর ফলে কি হয়? ইহাতে কিড্‌নি যথারীতি তাহাদের কাজ করে, অর্থাৎ মূত্রক্ষরণ করে এবং ইহা স্বাভাবিকভাবেই ইউ-রেটার বাহিয়া মূত্রথলি বা ইউরিনারী ব্লাডারে আসিয়া জমা হয়। সাধারণতঃ মূত্রথলিতে ১০ হইতে ১৩ আউন্স মূত্র জমা হইলেই মূত্রত্যাগ করিবার হয় না। মূত্রথলি হইতে অসম্ভব যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। রোগী মর্মে মর্মে বুঝিতে পারে, তাহার মূত্রথলি কানায় কানায় পরিপূর্ণ, কিন্তু অসহায়ভাবে অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

কাজেই ৪৫-৫০ বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন রোগী Acute retention of urine লইয়া আসিলে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া উপরোক্ত
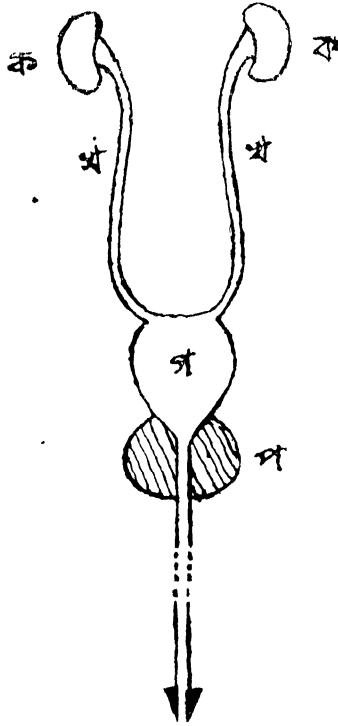
১নং চিত্র

স্পৃহা হয়। অবশ্য ২৩ হইতে ২৭ আউন্স পর্যন্ত ইচ্ছা করিয়া ধরিয়া রাখা যায়। কিন্তু এই রোগে প্রস্টেটের আয়তন বৃদ্ধি হওয়ায় এবং প্রস্টেটিক ইউরেথ্রায় মোচড় লাগিবার ফলে মূত্র বাহির হইতে পারে না। ফলে, মূত্রথলি পূর্ণ হইয়া ক্রমশঃ নাভি পর্যন্ত উঠিয়া আসে। মূত্রথলির চাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহার পেশীগুলি সঙ্কুচিত করিয়া মূত্র নির্গত করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু কোন ফলই ইতিহাস পাইলে বার্ধক্যজনিত প্রস্টেট গ্রন্থির আয়তন বৃদ্ধির কথাই সর্বাগ্রে মনে হওয়া উচিত। অবশ্য মলদ্বারের মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করাইয়া পরীক্ষা করিয়া, অর্থাৎ digital examination per rectum-এর সাহায্যে নিঃসন্দেহ হওয়া সম্ভব। এমন কি, এক্স-রে ছবি ব্যতিরেকে অনেক ক্ষেত্রেই P. R. করিয়া এই রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় করা হয়।

প্রস্টেটের আয়তন বৃদ্ধি পাইলে শরীরের কি কি পরিবর্তন হয় তাহা আলোচনা করা দরকার। এই পরিবর্তনগুলি অনুধাবন করিতে পারিলেই এই রোগের কারণ ব্যাখ্যা করা সহজ হইতে পারে। অবশ্য ইহার জন্য কিঞ্চিৎ শরীরব্যবচ্ছেদ বিদ্যা জানা প্রয়োজন। ১নং ছবিতে তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। ক ক দুইটি কিড্‌নি। ইহারা মূত্রক্ষরণ করে। খ খ দুইটি ইউরেটার বাহিয়া ইহা গ-চিহ্নিত মূত্রথলিতে আসিয়া জমা হয়। এই মূত্রথলির গলার চতুষ্পার্শ্বে প-চিহ্নিত প্রস্টেট গ্রন্থি অবস্থিত। মূত্রথলির গলা হইতেই ইউরেথ্রা সুরু হয়। ইহার তিনটি অংশ। পর্দা আছে, সেইরূপ পেট ও পেরিনিয়ামের মাঝে আছে pelvic diaphragm। এই pelvic diaphragm-এর উপর প্রস্টেটের ঘাড়ে চড়িয়া রহিয়াছে মূত্রথলি। তৃতীয় কথা—স্বাভাবিকভাবে সমগ্র ইউরেথ্রাটি ইংরেজী অক্ষর S-এর মত বাঁকা (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। চতুর্থ কথা—মূত্রথলির গলায় প্রস্টেট গ্রন্থিকে ঘিরিয়া একটি sphincter থাকে। ইহার নাম internal sphincter। perineum-এ external sphincter নামে অপর আর একটি sphincter আছে। কিন্তু প্রথমোক্ত sphincter-ই এই দুইটির মধ্যে শক্তিশালী। মূত্রত্যাগের সময় মূত্রথলির পেশীগুলি

২নং চিত্র
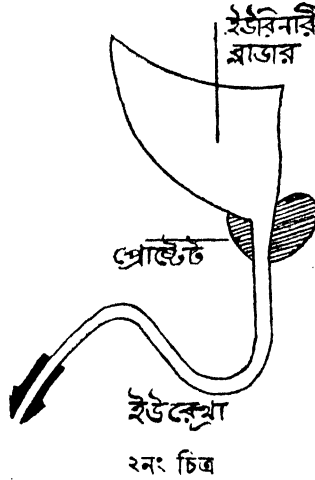
যে অংশ প্রস্টেট গ্রন্থির মধ্য দিয়া নামিয়া যায় তাহার নাম প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা। দ্বিতীয় অংশের নাম মেম্বেনাস ইউরেথ্রা। ইহা পেরিনিয়ামের দুইটি পর্দার মধ্যে অবস্থিত। তৃতীয় অংশ পুং-যৌনাঙ্গের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া ইহাকে penile part of urethra বলা হয়। ইহা glans penis-এর অগ্রভাগে external urethral meatus দিয়া বাহিরের সহিত মিশিয়াছে। কাজেই মূত্রথলি হইতে মূত্র ইউরেথ্রা দিয়া বাহিরে আসে। এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় কথা—উপরের দিকে পেট ও বুকের মাঝে যেমন মধ্যচ্ছদা নামে একটি সঙ্কুচিত হয় এবং এই internal sphincter আল্‌গা হইয়া যায়; ফলে মূত্র বাহির হইয়া আসে। পঞ্চম কথা—প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা অত্যন্ত অনুভূতিশীল এবং মূত্রথলি হইতে এক ফোঁটা মূত্র ইহার মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র micturition reflex সুরু হয়। ইহার ফলে মূত্র নির্গত হইয়া যায়।

প্রস্টেট বৃদ্ধি পাইলে কি হইতে পারে? প্রস্টেট বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রস্টেটিক ইউরেথ্রাও বৃদ্ধি পায়। কেন না, ইহা প্রস্টেটের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আবার প্রস্টেটের যে অংশ প্রস্টেটিক ইউরেথ্রার সম্মুখে থাকে তাহা মূলতঃ

সূত্রবৎ তন্তুর দ্বারা গঠিত। ইহার ফলে এই অংশটুকু বাকী অংশের ন্যায় অতটা বৃদ্ধি পায় না। কাজেই প্রস্টেটিক ইউরেথ্রার সম্মুখভাগ অপেক্ষা পশ্চাৎভাগ বেশী বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে ইউরেথ্রার স্বাভাবিক বাঁক আরও বাড়িয়া যায়। ইহাই মূত্রকে মূত্রথলি হইতে বাহিরে আসিতে বাধা দেয়। আবার প্রস্টেটের বৃদ্ধির দরুণ প্রস্টেটিক ইউরেথ্রার অনেকখানি মূত্রথলিতে একীভূত হইয়া যায় এবং কাহারও কাহারও মতে, ইহা বল-ভাল্‌ভের মত কাজ করিয়া মূত্র নির্গমনে বাধা সৃষ্টি করে।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রোগের লক্ষণগুলির সহিত ইহার সম্বন্ধ খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে যে, এই রোগের গোড়ার দিকের লক্ষণ হইল ঘন ঘন মূত্রত্যাগের ইচ্ছা। ইহার কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। আর পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই গ্রন্থির বৃদ্ধির ফলে প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা মূত্রথলিতে একীভূত হইয়া পড়ে। কাজে কাজেই ইহা ঘন ঘন উত্তেজিত হইয়া মূত্রত্যাগ করায়। কিন্তু মূত্রত্যাগের বীপ্সা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই রোগে রাত্রিতে বারে বারে উঠিতে হয় এবং ইহাতে ঘুমের যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটে। ইহা ছাড়া রাত্রিতে বারবার মূত্রত্যাগ করিবার অন্য কোন কারণ নাই। দ্বিতীয় লক্ষণ—বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলে তবেই মূত্র নির্গমন সুরু হয়। ইহার কারণ, এমনিতেই ইউরেথ্রায় স্বাভাবিক বাঁক থাকে, অধিকন্তু ইহার সম্মুখভাগ ও পশ্চাৎভাগের বৃদ্ধির অসামঞ্জস্য হেতু এই বাঁক আরও বৃদ্ধি পায়। কাজেই মূত্রত্যাগের পক্ষে এই বাধা অতিক্রম করিতে কিছু সময় লাগে। এই সময় কতটুকু হইবে তাহা নির্ভর করে, এই গ্রন্থিটি কতখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার উপর। তৃতীয় লক্ষণ—কোঁৎ দিয়া মূত্রত্যাগ করিবার চেষ্টা করিলেই তাহা বন্ধ হইয়া যায়। কারণ, কোঁৎ দিলে পেটের মাংসপেশীগুলি সঙ্কুচিত হয়, মধ্যচ্ছদাও নীচে নামিয়া আসে। ফলে, পেটের মধ্যেকার চাপ বৃদ্ধি পায়। এই চাপ উপরদিক হইতে মূত্রথলির উপর পড়ে। আবার pelvic diaphragm নীচের দিক হইতে চাপ দেয়। ফলে, ইউরেথ্রার বাঁক, যাহা প্রস্টেট বৃদ্ধির ফলে ইত্যবসরে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা আরও গভীর হইয়া যায় এবং মূত্রধারা বন্ধ করিয়া দেয়। এই কারণে মূত্রধারার জোর কমিয়া যায়। কাজেই ইহা glans penis-এর অগ্রভাগ হইতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পড়ে। এই রোগের অপর এক লক্ষণ এই যে, মূত্রত্যাগের বেগ হইলে আর ধরিয়া রাখা যায় না। পূর্বেই বলিয়াছি, মূত্রথলির গলায় প্রস্টেটের চতুষ্পার্শ্বে internal sphincter থাকে। গ্রন্থি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই sphincter প্রসারিত হয় ও কার্যতঃ ইহা নষ্ট হইয়া যায়। ফলে, মূত্রথলি হইতে মূত্র সহজেই চুয়াইয়া প্রস্টেটিক ইউরেথ্রার মধ্যে আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে micturition reflex দ্বারা মূত্র বাহির হইয়া যায়। ইহা বীপ্সার অপর একটি কারণও বটে। মূত্রত্যাগের পর স্বস্তি না হওয়া এবং খানিকটা মূত্র মূত্রথলির মধ্যে রহিয়া গেল—এই যে অনুভূতি, ইহার কারণ, প্রস্টেট বৃদ্ধির ফলে ইহা মূত্রথলির মধ্যে ঠেলিয়া উঠে। ফলে, ইহার পিছনে post prostatic বা Retroprostatic pouch-এ সকল সময়েই কিছু মূত্র সঞ্চিত থাকে। ইহার জন্য হয় cystitis, যাহা ঘন ঘন মূত্রত্যাগ করিবার তৃতীয় কারণ। Retro-prostatic pouch-এ সঞ্চিত মূত্রকে residual urine বলা হয়। এই residual urine বা অবশিষ্ট মূত্রের পরিমাণ হইতে এই গ্রন্থি কতখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা আন্দাজ করিতে পারা যায়। সময়ে সময়ে মূত্রত্যাগের পর উঠিয়া দাঁড়াইবামাত্র কোথা হইতে যেন খানিকটা মূত্র বাহির হইয়া আসে। ইহার কারণ, শরীরের ভঙ্গীমার পরিবর্তন হওয়ায় retro-prostatic pouch হইতে কিছু মূত্র আবার নূতন করিয়া প্রস্টেটিক ইউরেথ্রাকে উত্তেজিত করিয়া বাহিরে

আসে। এইজন্যে পাশ্চাত্যদেশে ট্রাউজারে মূত্রের দাগ দেখিয়া এই রোগ নির্ধারণ করা যায়। আর বসিয়া অপেক্ষা দাঁড়াইয়া মূত্রত্যাগ করিবার সুবিধার কারণ এই যে, বসিয়া মূত্রত্যাগ করিবার সময় pelvis-এর অনেকখানি পিছন দিকে হেলিয়া পড়ে। ফলে, বসিয়া মূত্রত্যাগ করিতে এমনিতেই অসুবিধা বোধ হয়।

এই তো গেল রোগের কথা। এখন ইহার উপশমের উপায় কি? এই উপায় মোটামুটি দুই প্রকারের। Acute retention-এর ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হইল মূত্রথলি হইতে মূত্র নিষ্কাশন করিয়া দিবার ব্যবস্থা করা। ইহার জন্য কতকগুলি পন্থা অবলম্বন করা হয়। (১) তলপেটে পর্যায়ক্রমে গরম ও ঠাণ্ডা প্রয়োগ করা। কিন্তু acute retention-এর ক্ষেত্রে এই চেষ্টা বৃথা। (২) মূত্রথলির পেশীগুলি সঙ্কুচিত করিবার জন্য পেশীতে atropin sulphate $\frac{1}{100}$ গ্রেন ইঞ্জেকশন দেওয়া। (৩) Enema বা ডুস দিয়া মলত্যাগের ব্যবস্থা করা। কারণ, মলত্যাগ করিবার সময় স্বাভাবিকভাবে মূত্রত্যাগ হইয়া থাকে। (৪) মূত্রথলির মধ্যে ক্যাথিটার চালাইয়া কৃত্রিম উপায়ে মূত্র বাহির করিয়া দেওয়া। প্রথমে রবার ক্যাথিটার লইয়া চেষ্টা করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রবার ক্যাথিটার ইউরেথ্রার মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে প্রস্টেটিক ইউরেথ্রায় গিয়া আটকাইয়া যায়। তখন ধাতব ক্যাথিটার এবং এই ক্ষেত্রে ধাতব প্রস্টেটিক ক্যাথিটার ব্যবহার করা হয়। (৫) উপরোক্ত চার প্রকারের কোনটিতেই ফল না পাইলে Supra-pubic cystostomy করা হয়। ইহাতে মূত্রথলি বাহির করিবার পর তাহা কাটিয়া সমস্ত মূত্র বাহির করিয়া দেওয়া হয়। পরে ইহাতে একটি Self retaining catheter লাগাইয়া দিয়া সেলাই করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এই ক্যাথিটার লাগাইয়া রাখার কতকগুলি অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ, সর্বক্ষণ পেটে এই ক্যাথিটার লাগান থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ, বাহির হইতে জীবাণু এই নল দিয়া মূত্রথলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া Cystitis সৃষ্টি করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, ক্যাথিটারের যে মুখটি মূত্রথলির মধ্যে থাকে তাহার চতুষ্পার্শ্বে পাথর জমিতে সুরু করে, অর্থাৎ Catheter Stone হইতে পারে। কাজেই retention-জনিত যে ইউরিমিয়া হয় তাহা সারিয়া গেলেই Prostatectomy করা হয়, অর্থাৎ প্রস্টেট গ্রন্থিকে কাটিয়া বাদ দেওয়া হয়। ইহাই এই রোগ উপশমের প্রকৃষ্ট উপায়।

Acute retention-এর ক্ষেত্রে রোগীর বয়স যদি কম হয় এবং retention যদি কয়েক ঘণ্টার হয়, তবে মূত্রথলিকে সঙ্গে সঙ্গে খালি করিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু রোগীর বয়স যদি ৬০-৭০ বৎসর বা তাহারও বেশী হয় এবং retention যদি ২-৩ দিনের হয় তবে মূত্র-নির্গমন এরূপ সুসংবদ্ধ করিতে হয় যাহাতে মূত্রথলি ৪৮ হইতে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে খালি হয়। এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের কারণ আছে। ৬০-৭০ বৎসরের বৃদ্ধের ক্ষেত্রে ২-৩ দিনের retention যদি কয়েক মিনিটের মধ্যে আরাম করা যায় তাহাতে রোগীর স্বস্তি হইতে পারে, যদি ইহাই তাহার জীবনে শেষ মূত্রত্যাগ না হয়। মোটের উপর রোগী কতকগুলি বিপদের সম্মুখীন হয়। কাজেই এই বিপদগুলি জানা দরকার।

(১) অতি অল্প সময়ে মূত্রথলি খালি করিয়া দিবার ফলে মূত্রথলির মধ্যেকার চাপ হঠাৎ কমিয়া যায়। ফলে, কিড্‌নির মধ্যে যথেষ্ট রক্তমোক্ষণের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ইহাতে রোগীর জীবন-মরণ সমস্যা উপস্থিত হয়।

(২) কিড্‌নির কার্যক্ষমতা বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। ফলে মূত্রের ক্ষরণই বন্ধ হইয়া যায়। ইহাও রোগীর মৃত্যুর অপর এক কারণ।

(৩) রোগীর শক্‌ লাগে, জ্বর হয়। ইহাও মৃত্যুর কারণ হইতে পারে।

(৪) মূত্রথলির কার্যক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়।

(৫) বাহির হইতে জীবাণু মূত্রথলিতে প্রবেশ করিতে পারে।

কিন্তু এত যে গণ্ডগোল এতটুকু একটি গ্রন্থিকে লইয়া, তাহা যে আমাদের শরীরে কি কাজ করে তাহাই পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় না। তবে, সম্ভবতঃ ইহা শুক্রের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ও তাহাদের কার্যক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখে। ফলে, Prostatectomy-র পর মানুষের প্রজনন-ক্ষমতা কমিয়া যাইতে পারে।

সঞ্চয়ন

যকৃতে অক্সিজেন সরবরাহের নতুন পদ্ধতি

প্রাণীদেহের যকৃৎ বা লিভারকে তুলনা করা হয় রাসায়নিক লেবরেটরির সঙ্গে। মানুষের দেহে এই যকৃৎ হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলির মধ্যে একটি। আমাদের যকৃতের মধ্য দিয়ে প্রতি ঘণ্টায় ২২ গ্যালনের মত রক্ত সঞ্চালিত হয় এবং যকৃতের মধ্য দিয়ে যাবার সময় এই রক্তের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াটি চলবার সময় যে তাপের সৃষ্টি হয়, সেটা হলো একটানা প্রায় পৌনে-চার মাইল হাঁটলে দেহে যে-পরিমাণ তাপ উৎপাদিত হয় তার সমান। এর জন্যে প্রচুর অক্সিজেন দরকার। যকৃৎ দৈনিক প্রায় ৫০ লিটার অক্সিজেন আত্মসাৎ করে। সম্পূর্ণ দেহের জন্যে মোট যে পরিমাণ অক্সিজেন প্রয়োজন শুধু যকৃতের জন্যেই প্রয়োজন তার দশ ভাগের এক ভাগ। কোন কারণে যদি এই অক্সিজেন সরবরাহে ঘাটতি পড়ে কিংবা বাড়তি সরবরাহ হতে থাকে, তাহলে লিভারের কাজ অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। যকৃতে এই অক্সিজেনের ঘাটতি-জনিত রোগকে বলা হয় লিভার-অ্যানেক্সিয়া। ইদানীং বৈজ্ঞানিকেরা মনে করছেন, দেহের কোন জায়গায় আঘাত লেগে অথবা পুড়ে গিয়ে ক্ষত হলে নানা জটিলতা সৃষ্টির ফলে লোক মৃত্যু বরণ করে। এর মূল কারণ হচ্ছে, যকৃতে অক্সিজেনের ঘাটতি। তাছাড়া যকৃতের অন্যান্য বহু রোগের মূলেও আছে এই ব্যাপারটি।

যকৃতে এই অক্সিজেন পাঠানোর কাজটি বেশীর ভাগ করে থাকে ছোট ছোট ধমনীগুলি (আর্টারী)। অক্সিজেন সরবরাহে ঘাটতি হলে এই ধমনীর পথগুলিকে চওড়া করে দিয়ে এই ঘাটতি পূরণ করবার কোনই উপায় নেই। এ ধরণের চিকিৎসার চেষ্টা করে এ পর্যন্ত কোন ফল পাওয়া যায় নি এবং অস্ত্রোপচারের পদ্ধতি শুধু সফল হয়েছে লেবরেটরিতে ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণীদের ক্ষেত্রে।

তাহলে বেঁচে থাকবার পক্ষে অপরিহার্য এই যে অক্সিজেন, তাকে যকৃতে পাঠাবার কি কোন রকম কৃত্রিম ব্যবস্থা করা যায় না? এই ব্যবস্থা করবার পর দেখা গেল, ব্যাপারটা বেশ সহজ।

অন্য সব আবিষ্কারের মতই এই আবিষ্কারটিরও ইতিহাস আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জার্মান শারীরবিজ্ঞানী এর্‌মান লক্ষ্য করেন—বাঁদা-জলের মধ্যে বাণ মাছের মত যে মাছ জন্মায় (বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এই মাছের নাম মিস্‌গুর্‌নাস্ ফসিলিস), তারা কিছুক্ষণ পর পর জলের উপরে ভেসে উঠে খানিকটা করে বাতাস ফুল্‌কোর মধ্যে টেনে নিয়ে জলের নীচে চলে যায়। ক্রমশঃ জানা গেল, এই মাছ তার অন্ত্র বা ইন্টেস্টাইন-এর সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া চালাতে পারে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের সরল গঠনের জীব তাদের দেহের সব রন্ধ্র দিয়ে অক্সিজেন শোষণ করতো। এই মাছগুলি সেই আদিম ব্যবস্থার আরেকটু উন্নততর একটা

রকমফেরকে এখনও পর্যন্ত টিকিয়ে রেখেছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার সুবিখ্যাত শারীরবিজ্ঞানী অধ্যাপক এডওয়ার্ড বাবাক এই সম্পর্কে দীর্ঘকাল গবেষণা করবার পর ১৯০৭-১৯১৩ সালের মধ্যে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে বিশ্বে যে কোন ভাষায় লেখা যে কোন পাঠ্যপুস্তকে বাবাকের এই গবেষণার উল্লেখ আছে। এর পর বৈজ্ঞানিকদের মনে প্রশ্ন জাগে—পরিপাক যন্ত্রের মারফতে কিভাবে শ্বাসক্রিয়া চালাতে হয় সেটা যদি এই মাছ ভুলে না গিয়ে থাকে তাহলে মানুষের বেলায়ই বা সেটা হবে না কেন?

অল্প কিছুকাল আগে, চেকোশ্লোভাক বিজ্ঞান-পরিষদের শারীরবৃত্ত ও বিপাক-ক্রিয়া সংক্রান্ত গবেষণাগারের প্রধান পরিচালক ডক্টর ওভাকার পুপা-র এক আবিষ্কারের ফলে সর্বত্র সাড়া পড়ে যায়। এই অদ্ভুত মাছ যে পদ্ধতিতে কাজ চালায়, ঠিক সেই পদ্ধতিতে মানুষের যকৃতেও বাইরে থেকে অক্সিজেন পাঠানো যেতে পারে বলে তাঁর মনে হয়। যে সব ক্ষুদ্র ধমনী যকৃতে গিয়ে পৌঁচেছে, সেগুলি ছাড়া রক্ত প্রবেশ করবার প্রধান আর একটি শিরাও (পোর্ট্যাল ভেন) সেই সঙ্গে রয়েছে। এই শিরা পরিপাক-যন্ত্র থেকে রক্ত সংগ্রহ করে নেয়। যকৃতে যত রক্ত গিয়ে প্রবেশ করে তার তিন-চতুর্থাংশেরই পয়ঃপ্রণালী হিসাবে কাজ করে এই শিরাটি। স্বাভাবিক অবস্থায় এই শিরা-বাহিত রক্তে (ভেনাস ব্লাড) অক্সিজেন থাকে খুব কম। কিন্তু এই শিরার দেয়ালের রন্ধ্রগুলির ফাঁক দিয়ে যদি অক্সিজেন ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তাহলে এই শিরাবাহিত রক্ত খুব বেশী রকম অক্সিজেন-সম্পৃক্ত হয়ে যকৃতে গিয়ে পৌঁছে।

এখন এই ব্যাপারটাকে যাচাই করে দেখা দরকার। যদি দেখান যায় যে, স্তন্যপায়ী প্রাণীর পরিপাক-যন্ত্র অক্সিজেন শোষণ করে নিয়ে সেটাকে রক্তের মধ্যে ছেড়ে দিতে পারে তাহলে ব্যাপারটা প্রমাণিত হবে। গত বছর গ্রীষ্মকালে এ সম্পর্কে প্রাথমিক পরীক্ষার কাজ চালানো হয়। তারপর থেকে এ-পর্যন্ত এই পরীক্ষার কাজকে নিখুঁতভাবে ধাপে ধাপে এগিয়ে আনা হয়েছে। যে প্রাণীগুলিকে নিয়ে পরীক্ষা চালানো হচ্ছে, সেগুলির পরিপাক-যন্ত্রের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় অক্সিজেন-ভর্তি অতি সূক্ষ্ম বিশেষ এক ধরণের নল ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। সেই সঙ্গে যকৃতে গিয়ে মিলেছে যে শিরাটি, সেই শিরার ভিতর থেকে অতি সামান্য পরিমাণ রক্ত মাঝে মাঝে বের করে নেওয়া হতে লাগলো। বিশেষ ধরণে নির্মিত অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে এই বিন্দু বিন্দু রক্তকে অত্যন্ত খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করবার পর দেখা গেল—যা আন্দাজ করা গিয়েছিল ঠিক তাই ঘটেছে—অন্ত্রের দেয়ালগুলির রন্ধ্রপথে অক্সিজেন গিয়ে মিশেছে রক্তের সঙ্গে এবং সরাসরি শিরা বেয়ে গিয়ে ঢুকেছে যকৃতের মধ্যে।

পরবর্তী পরীক্ষাগুলিতে প্রমাণিত হলো যে, এভাবে ভিন্ন পথে যে অক্সিজেন গিয়ে যকৃতে পৌঁছায়, তার ফলে যকৃতের কাজে আশানুরূপ উন্নতি ঘটেছে এবং রোগাক্রান্ত যকৃৎ রোগ-মুক্ত হয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে এই আবিষ্কার সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখে পাঠানো হলো সুবিখ্যাত বৃটিশ বিজ্ঞান-পত্রিকা নেচার-এ। নেচার-এ এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা গেল, অন্যান্য দেশের চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা এ-সম্পর্কে একই গবেষণার কাজ চালালেও এ ব্যাপারে প্রথম সাফল্য-লাভের গৌরব অর্জন করেছেন চেকোশ্লোভাক বিজ্ঞানীরা।

বর্তমানে চিকিৎসার প্রয়োগক্ষেত্রে এই আবিষ্কারকে কিভাবে সবচেয়ে সুনিশ্চিতভাবে কাজে লাগানো হবে, সে সম্পর্কে পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। অক্সিজেনের বিভিন্ন মাত্রা কিভাবে যকৃতের উপরে প্রতিক্রিয়া করছে তার বিস্তৃত বিবরণ রাখা হচ্ছে। যকৃতের অনিয়মিত ও অস্বাভাবিক কাজের ফলে কি কি রোগ দেখা দেয় এবং সে সব রোগের লক্ষণ ও উপসর্গ কি কি, তাও খুব খুঁটিয়ে

দেখা হচ্ছে—যার ফলে সেসব উপসর্গের লক্ষণগুলি দেখা দিলেই সরাসরি যকৃতে কৃত্রিম উপায়ে অক্সিজেন প্রয়োগ করবার এই চিকিৎসা-পদ্ধতিকে ব্যবহার করা যেতে পারবে।

ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে, ট্রম্যাটিক শক্ (আঘাতজনিত ক্ষতের পরবর্তী জটিল অবস্থায় যেসব ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে), ছোঁয়াচে ন্যাবা রোগ (ইনফেক্শাস জণ্ডিস) আর অন্যান্য কয়েক রকমের যকৃতের ব্যধিতে এই চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রয়োগ করে খুব দ্রুত সুফল পাওয়া গেছে। আগুনে পোড়া ক্ষত নিরাময়ে এবং বিশেষ কয়েক ধরণের অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

অতিকায় রেডিও-টেলিস্কোপ

চেশায়ারের অন্তর্গত জডরেল ব্যাঙ্কে নব-নির্মিত অতিকায় রেডিও-টেলিস্কোপটি দেখিলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইতে হয়। কল্পনা করা যাক, একটি বিরাট উল্টানো গম্বুজ যাহার মধ্যে অন্তত-পক্ষে ১০,০০০ লোক আরামে বসিয়া থাকিতে পারে। ৭০,০০০ বর্গ ফুট ইস্পাতের পাত দ্বারা নির্মিত এই অতিকায় গম্বুজটির ওজন ৭৫০ টন। দুইটি বিরাট ইস্পাতের থামের সহিত ইহা
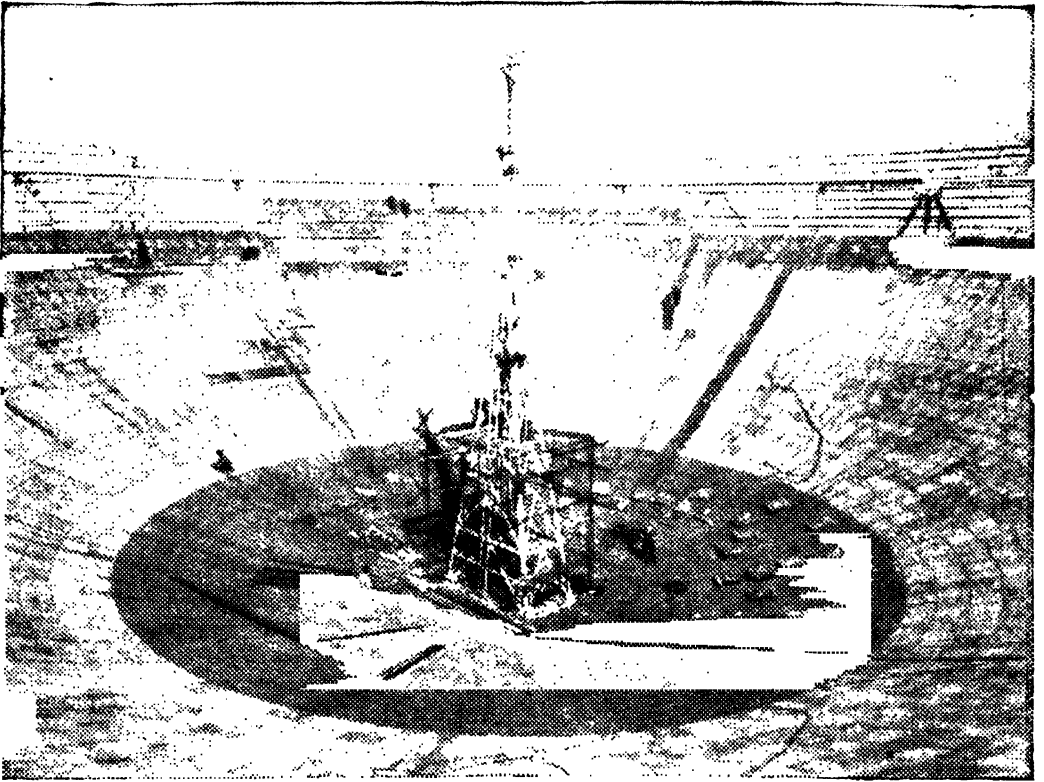
ইংল্যাণ্ডের চেশায়ারের অন্তর্গত জডরেল ব্যাঙ্কে পৃথিবীর বৃহত্তম রেডিও-টেলিস্কোপের ২৫০ ফুট ব্যাসের প্রতিফলক।

আটকানো ও ঝুলানো আছে, যাহাতে ইহাকে যখন যেদিকে ইচ্ছা ঘোরানো যায়। পৃথিবীতে এরূপ বৃহৎ ঘূর্ণায়মান রেডিও-টেলিস্কোপ আর কোথাও নাই।

বৃটিশ বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন যে, এই নূতন বিরাট টেলিস্কোপটির সাহায্যে তাঁহারা বিশ্বসৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইবেন। এই রেডিও-টেলিস্কোপের সাহায্যে মহাকাশের এমন সব অঞ্চল হইতে আগত প্রাকৃতিক বেতার সঙ্কেতসমূহ ধরা যাইবে, পৃথিবী হইতে যাহার দূরত্ব মানুষের কল্পনাতীত। ইতিমধ্যেই এইরূপ কতকগুলি সঙ্কেত ধরা যাইতেছে, যেগুলি সম্ভবতঃ ৫০০ বিলিয়ন বৎসর পূর্বে উৎপন্ন হইয়াছিল।

ঘনমেঘ বা উজ্জ্বল সূর্যালোক কিছুই ইহার কার্যকারিতায় বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না। এই কারণে ইহার সাহায্যে আকাশের সুস্পষ্ট মানচিত্র প্রস্তুত করা এবং কোটি কোটি আলোক-বৎসর দূরের স্থান সম্পর্কে মূল্যবান নূতন তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পৃথিবী হইতে সূর্যের দূরত্ব মাত্র আধ আলোক-মিনিট। এই সকল ব্যাপার কল্পনা করাও কঠিন।

জডরেল ব্যাঙ্কের সুবৃহৎ রেডিও-টেলিস্কোপের সাধারণ দৃশ্য।

নূতন যন্ত্রটির সাহায্যে উল্কা, সূর্য, চন্দ্র, তারকা, কৃত্রিম উপগ্রহ, অধিক উচ্চতায় দ্রুতগতি প্রভৃতি সম্পর্কেও নানাপ্রকার তথ্য সংগ্রহ করা যাইবে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অক্টোবর—১৯৫৭

দশম বর্ষ : ১০ম সংখ্যা
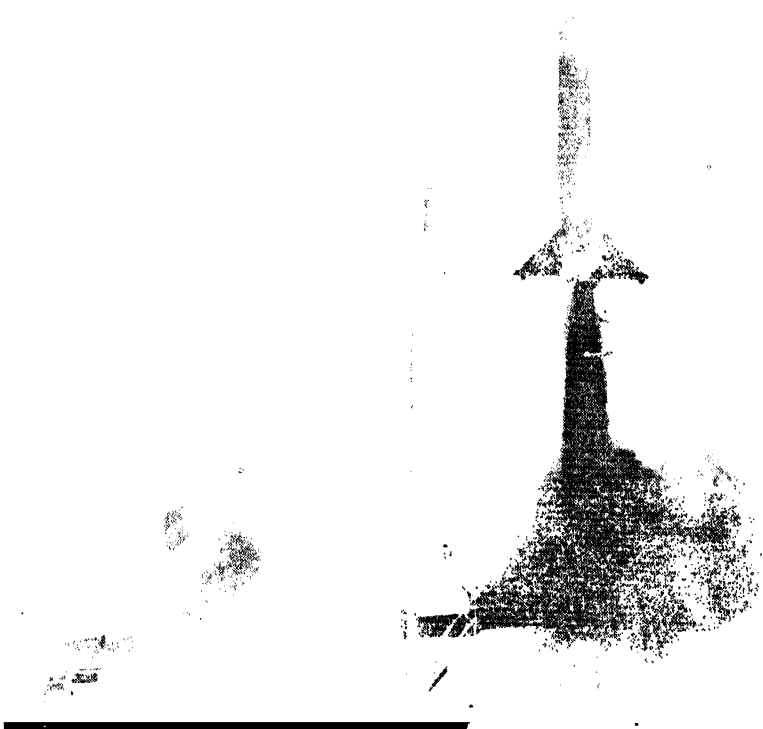
কৃত্রিম চন্দ্র উৎক্ষেপণে ইউ. এস-এর নৌ-বিভাগীয় বৈজ্ঞানিকেরা যন্ত্রপাতি সমন্বিত পরীক্ষামূলক ভাইকিং রকেট ঊর্ধ্বাকাশে প্রেরণ করিতেছেন।

মনুষ্য নির্মিত চন্দ্রের পৃথিবী পরিভ্রমণ

গত ৪ঠা অক্টোবর সোভিয়েট ইউনিয়ন রকেটের সাহায্যে মহাকাশে একটি চন্দ্র, অর্থাৎ কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করিয়াছে। উপগ্রহটি ৫৬০ মাইল উপরে থাকিয়া উপবৃত্তাকার কক্ষে ঘণ্টায় প্রায় ১৭ হাজার মাইল বেগে পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।
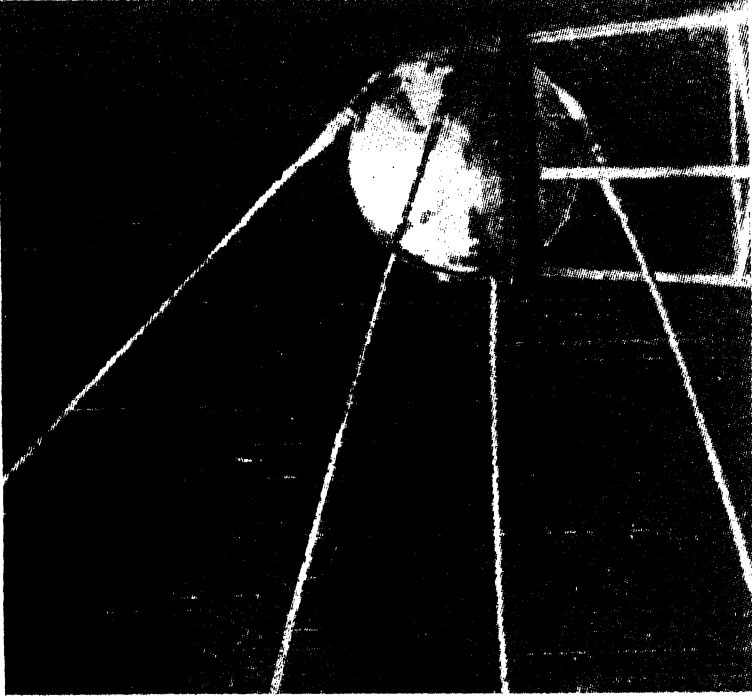
ঊর্দ্ধাকাশে নিক্ষিপ্ত হইবার পূর্বে সোভিয়েট কৃত্রিম উপগ্রহের ছবি।
উপগ্রহটির সঙ্গে চারটি অ্যান্টিনাও দেখা যাইতেছে।

মস্কো রেডিও কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে বলা হয় যে, উপগ্রহটির ব্যাসার্দ্ধ ২৯ সে. মি. এবং ওজন ৮৩.৬ কিলোগ্র্যাম।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড, জাপান এবং পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল হইতে দূরবীক্ষণের সাহায্যে উপগ্রহটিকে দেখা গিয়াছে। ইহার ট্র্যান্সমিটার হইতে যে সঙ্কেতধ্বনি প্রেরিত হইতেছে তাহা কিছুদিন ধরিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বেতার কেন্দ্রে শুনিতে পাওয়া গিয়াছে।

কৃত্রিম উপগ্রহ সম্বন্ধে প্রাভদার সম্পাদকীয় প্রবন্ধের বিশেষ টাসের বিবরণে প্রকাশ—কৃত্রিম উপগ্রহটিকে উর্ধ্বাকাশে যথাযথ কক্ষে প্রেরণ করিবার সাফল্য হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে সব গাণিতিক হিসাব অনুযায়ী পরিবাহী রকেট ও উপগ্রহটি নির্মিত হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল। পরিবাহী রকেটের সুচালো
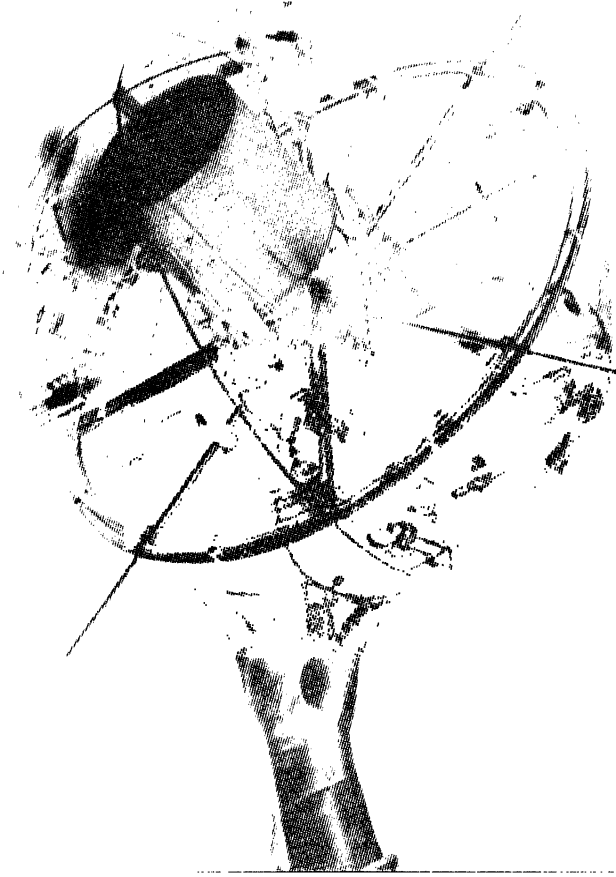
বিশেষভাবে নির্মিত এই যন্ত্রগুলি স্বর্ণমণ্ডিত কৃত্রিম উপগ্রহের (যুক্তরাষ্ট্র) মধ্যে স্থাপিত হইবে। এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে তাপমাত্রা, বায়ুর চাপ আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি, মহাজাগতিক রশ্মি, মাধ্যাকর্ষণ, উল্কা ও ভূপৃষ্ঠের অবস্থা সম্বন্ধে তথ্যাদি জানা যাইবে।

অগ্রভাগে উপগ্রহটিকে স্থাপন করিয়া কোণাকৃতির একটি কঠিন আবরণের দ্বারা সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। রকেটটি উৎক্ষিপ্ত হয় খাড়াভাবে। নিক্ষিপ্ত হইবার অল্পক্ষণের

মধ্যেই যান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইহা উর্ধ্বমুখী পথ হইতে তির্যকভাবে চলিতে সুরু করে। উর্ধ্বগতির শেষে রকেটটি কয়েকশত কিলোমিটার উচ্চতায় নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৌঁছায় এবং সেকেণ্ডে ৮০০০ মিটার গতিতে ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালে চলিতে থাকে। রকেটটি নিঃশেষিত হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই কোণাকৃতি আবরণ সহ উপগ্রহটি রকেট হইতে

ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত সিলিণ্ডারটি কৃত্রিম উপগ্রহের (যুক্তরাষ্ট্র) স্বর্ণমণ্ডিত খোলের মধ্যে স্থাপন করা হইতেছে।

নিক্ষিপ্ত হয়। রকেট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উপগ্রহটি স্বাধীনভাবে চলিতে থাকে। বর্তমানে কেবল উপগ্রহটিই নহে, পরিবাহী রকেট এবং কোণাকৃতির আবরণটিও পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরিতেছে।

মোটামুটি হিসাব অনুযায়ী এই কৃত্রিম উপগ্রহটি উপবৃত্তাকারে পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরিতেছে। এই উপবৃত্তের একটি নাভিবিন্দু পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুর কাছাকাছি। বর্তমানে

এই কক্ষপথের পৃথিবীর নিকটতম বিন্দুটি হইল উত্তর গোলার্ধে এবং পৃথিবী হইতে দূরতম বিন্দুটি হইল দক্ষিণ গোলার্ধে। উপগ্রহটির উচ্চতা পরিবর্তনশীল এবং ইহা নিয়মিতভাবে পরিবর্তিত হইতেছে।

উপগ্রহটির কক্ষপথ নিরক্ষতলের ৬৫° কোণে অবস্থিত। এই জন্যই এই কৃত্রিম চন্দ্রটি প্রায় উত্তর ও দক্ষিণ দুই মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের উপর দিয়া প্রদক্ষিণ করিতেছে। বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরগুলিতে উপগ্রহটিকে যে বাধা পাইতে হইতেছে তাহার ফলে কালক্রমে ইহার কক্ষপথটি ক্রমশঃ বৃত্তাকার হইয়া দাঁড়াইবে। উপগ্রহটি
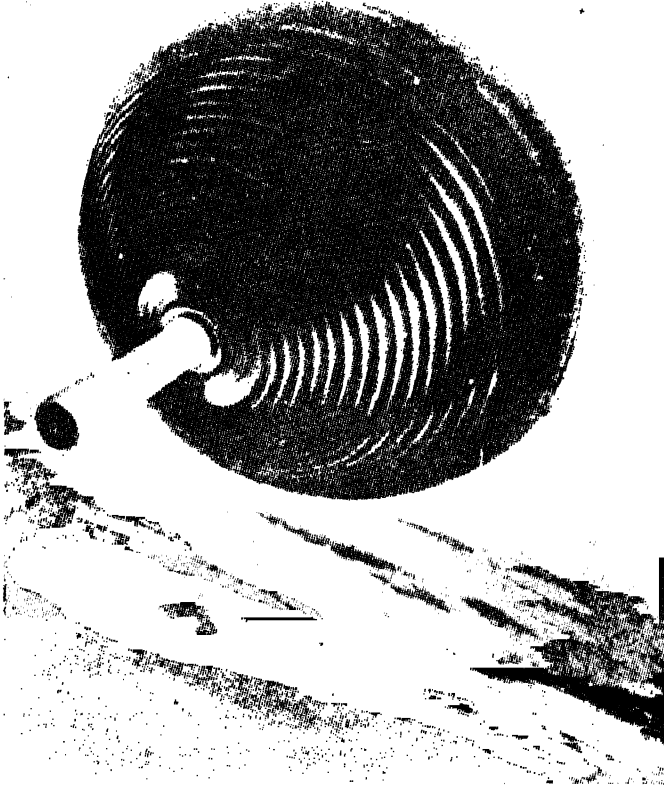
উর্ধ্বাকাশে ভ্রাম্যমান কৃত্রিম উপগ্রহের কল্পিত দৃশ্য।

যখন বায়ুমণ্ডলের আরও ঘন স্তরে আসিয়া প্রবেশ করিবে তখন অধিকতর ঘন বায়ুস্তরের সহিত সংঘর্ষে উত্তপ্ত হইয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে।

উপগ্রহটি কত দিন পর্যন্ত তাহার কক্ষপথে আবর্তিত হইতে থাকিবে, সে সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব নহে। তবে বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বস্তরগুলির ঘনত্ব সম্বন্ধে প্রাপ্ত

তথ্যাদি এবং রকেট নিক্ষেপের পথটি সম্পর্কে পরিচালিত মাপজোকের ফলাফল হইতে এইরূপ মনে করিবার কারণ আছে যে, বেশ কিছুদিন ধরিয়া উপগ্রহটি পৃথিবীর চতুর্দিকে আবর্তন করিতে থাকিবে।

অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্কর ধাতুর সাহায্যে উপগ্রহটি নির্মিত হইয়াছে। যাবতীয় যন্ত্রপাতি ইহার ভিতরে স্থাপিত হইয়াছে। নিক্ষেপ করিবার পূর্বে উপগ্রহটিতে নাইট্রোজেন

প্রোজেক্ট ভ্যাঙ্গার্ড যে সকল কৃত্রিম উপগ্রহ ছাড়িবে তাহাদের সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম মণ্ডিত প্লাষ্টিকের কতকগুলি ভূয়া উপগ্রহও থাকিবে। উপগ্রহটি শূন্যে নিক্ষিপ্ত হইবার সময় এগুলি সঙ্কুচিতভাবে থাকিবে (ডান দিকের ছবি) ; কিন্তু বহিরাকাশে মূল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার পর আপনা আপনিই ফুলিয়া উঠিবে এবং ২০ ইঞ্চি ব্যাসের গোলকে পরিণত হইবে (মধ্যের ছবি)।

গ্যাস ভরিয়া দেওয়া হয় এবং উড্ডয়ন কালে সর্বক্ষণ পাম্প করিয়া নাইট্রোজেন সরবরাহ করা হইতে থাকে। প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা অপরিবর্তিত রাখিবার জন্যই এইরূপ করা হয়। উপগ্রহটির চারদিকে কীলকের মত চারটি এরিয়েল রহিয়াছে। ইহার মধ্যে দুইটি শক্তিশালী বেতার ট্র্যান্সমিটার স্থাপন করা হইয়াছে। প্রেরিত সঙ্কেতধ্বনি যে দশ হাজার কিলোমিটার দূরত্বেও ধরা যাইতে পারে তাহা এখন প্রমাণিত হইয়াছে। এই বেতার সঙ্কেত হইতে উপগ্রহের কক্ষপথ ও আয়োনোস্ফিয়ারের অনাবিষ্কৃত স্তরগুলিতে রেডিও-তরঙ্গের ক্রমিক শক্তিহ্রাস প্রভৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি

জানিবার সহায়তা হইবে। উপগ্রহটিতে এমন কতকগুলি আলোক-সংবেদনশীল পদার্থ রহিয়াছে যাহারা উপগ্রহটির তাপ বা অন্যান্য পরিমিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কেতধ্বনির রেডিও-ফ্রিকোয়েন্সিরও পরিবর্তন ঘটায়। ইহার ফলে সঙ্কেতগুলির সময়-ব্যবধানের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে। বর্তমানে প্রাপ্ত সঙ্কেত-গুলির পাঠোদ্ধার ও বিশ্লেষণ করা হইতেছে। এই প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটির সাহায্যেই আয়োনোস্ফিয়ারের অবস্থা, ইহার রাসায়নিক গঠন-উপাদান, ঘনত্ব ও
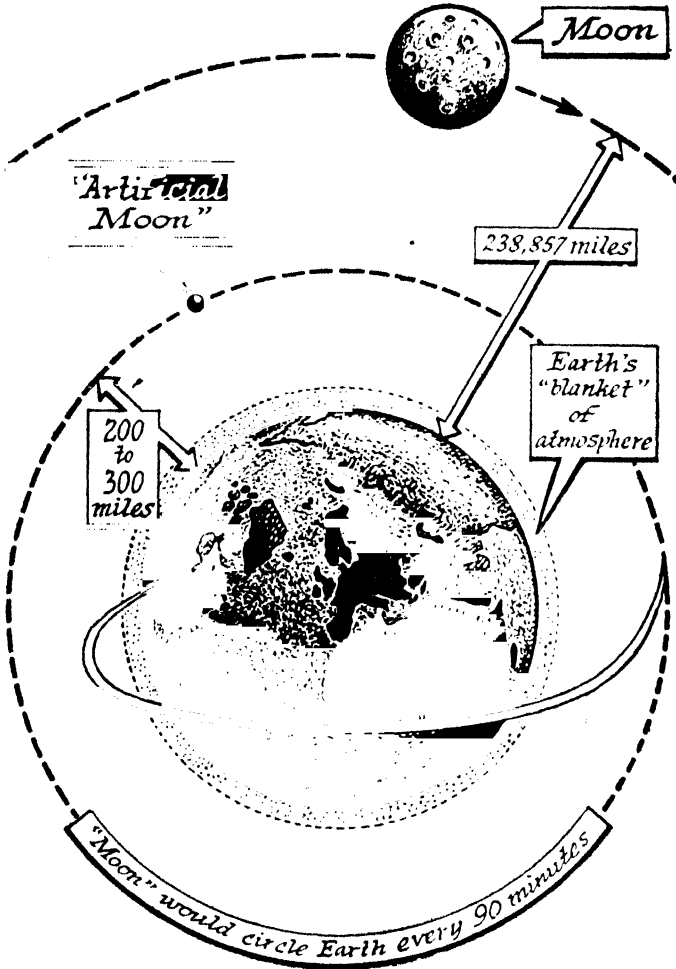
পৃথিবীর চতুর্দিকে কৃত্রিম উপগ্রহের পরিভ্রমণ-কক্ষ দেখান হইয়াছে।

চাপের পরিবর্তন, চৌম্বক-তত্ত্ব ও মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে অন্ততঃ কিছু নূতন তথ্যাদি জানা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত এই কৃত্রিম উপগ্রহটি হইল গ্রহান্তর অভিযানে প্রথম পদক্ষেপ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও কিছুদিনের মধ্যে ঊর্ধ্বাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করিবে।

প্রায় ১৭ মাস পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বৎসরে (১৯৫৭-১৯৫৮) ঊর্ধ্বাকাশে কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করিবার পরিকল্পনা করেন। ১২ হইতে ১৫টি উপগ্রহ নির্মাণ এবং সেগুলিকে ঊর্ধ্বাকাশে প্রেরণের ব্যবস্থাদির জন্য শিল্প, বিজ্ঞান এবং সরকারী সহায়তায় প্রোজেক্ট ভ্যাঙ্গার্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে কয়েকটি উপগ্রহ নির্মিত হইয়াছে এবং ভিতরে যন্ত্রাদি স্থাপন করা হইতেছে। যে তিন পর্যায়ী রকেটের সাহায্যে উপগ্রহগুলি মহাশূন্যে প্রেরিত হইবে তাহাদের প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষা শেষ হইয়াছে।
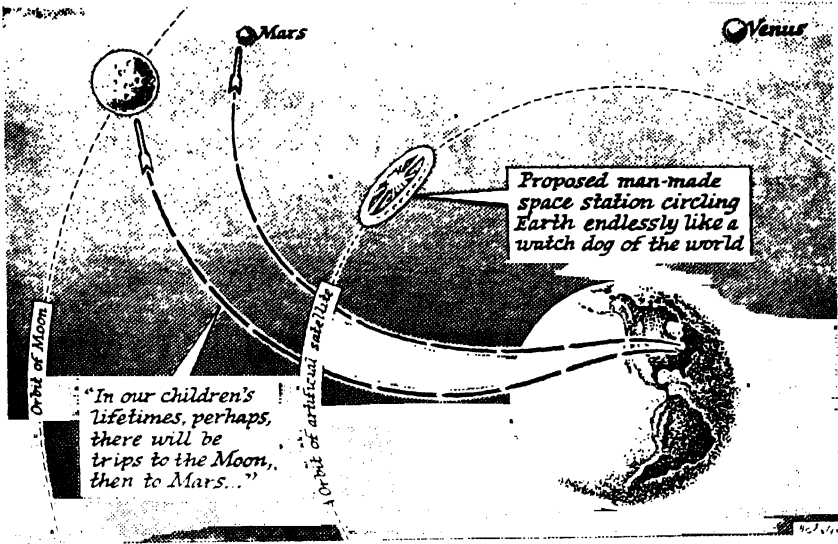
ভবিষ্যৎ গ্রহান্তর যাত্রার পথে কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথে পৃথিবী পরিভ্রমণকারী 'স্পেস ষ্টেসন' স্থাপিত হইবে।

যে কৃত্রিম উপগ্রহটি প্রথমে নিক্ষিপ্ত হইবে তাহার ব্যাস ২০ ইঞ্চি এবং ওজনে ২১½ পাউণ্ড। ১১ পাউণ্ড ওজনের বহিরাবরণটি ম্যাগ্নেসিয়ামে নির্মিত। এই ম্যাগ্নেসিয়াম আবরণটির বহির্ভাগ তামা, দস্তা, নিকেল, রূপা এবং সর্বোপরি বিশুদ্ধ স্বর্ণের আস্তরণে আবৃত। এইরূপ বিভিন্ন ধাতুর আস্তরণে আবৃত হইবার ফলে উপগ্রহটি অতিরিক্ত সূর্যোত্তাপ হইতে রক্ষা পাইবে এবং গোলকটি যখন সূর্যের আলো হইতে পৃথিবীর বিপরীত দিকে যাইবে তখন অত্যধিক শৈত্য হইতেও সুরক্ষিত থাকিবে। গোলকের মধ্যস্থিত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে পৃথিবীর উপর ক্রিয়াশীল ঊর্ধ্বাকাশের বিভিন্ন প্রভাবের বিষয় জানিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাদের সাহায্যে ঊর্ধ্বাকাশের তাপমাত্রা, বায়ুর চাপ, কস্‌মিক রে, আল্ট্রাভায়োলেট রে, মহাকর্ষ, উল্কাপিণ্ড এবং ভূপৃষ্ঠ সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য জানা যাইবে। পৃথিবী পরিক্রমার সময় কৃত্রিম উপগ্রহের ট্র্যান্সমিটার হইতে অনবরত

সঙ্কেতধ্বনি প্রেরিত হইবে। উপগ্রহটি ফ্লোরিডার কার্নেভেরল অন্তরীপ হইতে নিক্ষিপ্ত হইবে। উপগ্রহবাহী ভ্যাঙ্গার্ড রকেটটি হইবে ৭২ ফুট লম্বা তিন পর্যায়ী রকেট এবং জ্বালানী সমেত ইহার ওজন ১১ টন। প্রথম পর্যায়ের রকেটটি উপগ্রহটিকে ৩৬ মাইল উর্ধ্বে লইয়া যাইবে। প্রথম রকেটটি জ্বালানী নিঃশেষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মূল রকেট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। তখন দ্বিতীয় পর্যায়ের রকেটটি সক্রিয় হইয়া উঠিবে এবং জাইরোস্কোপিক ব্যবস্থায় তির্যকভাবে প্রায় ২৬০ মাইল উর্ধ্বে উঠিয়া যাইবে। এই সময়ে ইহার গতিবেগ হইবে সেকেণ্ডে ১৩,৪০০ ফুট। ইহার পর তৃতীয় পর্যায়ের রকেটটি সক্রিয় হইয়া ৩০০ মাইল উর্ধ্বে উপগ্রহটিকে নিক্ষেপ করিবে এবং সেটি ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালে ঘন্টায় প্রায় ১৮০০০ মাইল গতিতে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে থাকিবে। এই ভাবে পর পর কয়েকটি উপগ্রহ নির্মিত হইবে। ভ্যাঙ্গার্ড প্রোজেক্ট এই বিষয়ে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, স্বর্ণপাতে আবৃত উপগ্রহগুলি প্রতি ৯০ মিনিটে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া ভবিষ্যৎ মহাশূন্য অভিযানের পথ প্রদর্শনে সহায়ক হইবে।

বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য

বিজ্ঞানে ভাবপ্রবণতার কোন স্থান নেই। বিজ্ঞানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বস্তু-নিচয়ের অন্তর্নিহিত সত্যকে খুঁজে বের করা এবং প্রাকৃতিক বিভিন্ন নিয়মকে কাজে লাগানো। আমরা যা জানি তার বাইরেও অনেক কিছু সত্য রয়েছে আত্মগোপন করে। বিজ্ঞান সে সব গুপ্ত সত্যকে আমাদের কাছে প্রকাশ করে দেয়। এর উদ্দেশ্য মানবসেবা; ধ্বংসসাধন বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নয়। সূর্য উদিত হয় ও অস্ত যায়, চন্দ্র ও নক্ষত্রমণ্ডল গগনমণ্ডলে ঘুরে বেড়ায়, সুন্দর আবহাওয়া ও ঝঞ্ঝা, শৈত্য, উত্তাপ পর্যায়ক্রমে আসে ও যায়। বায়ু সমুদ্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, আবার মিলিয়ে যায়। অসংখ্য বৃক্ষলতা ও প্রাণীর সৃষ্টি হয়, আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু আমরা নৈসর্গিক ঘটনার উপর সামান্যতম প্রভাবও প্রয়োগ করতে সমর্থ হই না। ঘূর্ণীবাত্যা, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ পৃথিবীর বুকে প্রচণ্ড ধ্বংস এনে দেয়। একটি সুন্দর ঋতু একস্থানে সম্পদ ও প্রাচুর্যের কারণ, আবার দীর্ঘ অনাবৃষ্টি আর একস্থানে মহামারী ও দুর্ভিক্ষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমরা কি এর প্রকৃত কারণ জানি? এ সব ক্ষেত্রে আমরা অজ্ঞ। আমরা প্রকৃতির শক্তিপুঞ্জের ক্রীড়নক মাত্র।

কিন্তু বিজ্ঞান আলোচনার ফলে দেখা যায়, কতকগুলি ঘটনা নিয়মিত শৃঙ্খলায় ঘটে থাকে। সূর্য একদিকে ওঠে, অপরদিকে অস্ত যায়; কতকগুলি নক্ষত্র দিকচক্রবালের নীচে কখনও নামে না। ঋতুগুলি কমবেশী নিয়মানুগ। জল সর্বদাই অধোমুখে

প্রবাহিত হয়। অগ্নি সর্বদা দগ্ধ করে। বীজ থেকে জন্মগ্রহণ করে' উদ্ভিদ যে বীজ দান করে, তাথেকে পুনরায় সমশ্রেণীর উদ্ভিদের জন্ম হয়। যুগে যুগে প্রাণীকুল একইরূপে জন্মলাভ করে। এ সবই প্রকৃতির শৃঙ্খলার ফলে সংঘটিত হয়। এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় না। সেজন্যেই বৃন্তচ্যুত ফল উপরে না উঠে ভূতলে পতিত হয়। কিন্তু এর প্রকৃত কারণও আমরা জানতাম না। বর্তমানে বিজ্ঞানই প্রকৃতির এই সব নিয়মের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। প্রকাশ করে দিয়েছে সব গুপ্ত রহস্য। সুতরাং আমরা দেখছি, বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সত্যের সন্ধান দেওয়া।

বিজ্ঞান নানা শাখায় বিভক্ত। বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার সৃষ্টি হয়েছে মানবের হিতের জন্যে, ধ্বংসের জন্যে নয়। স্বার্থান্ধ মানুষ আজ পৃথিবীময় এমন হানাহানি সুরু করে দিয়েছে যে, মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ প্রতিভার দানগুলিও তাদের ব্যবহারের ফলে ব্যর্থ ও বিভীষিকাময় হয়ে উঠেছে। প্রাচীন যুগ থেকে যে সব মনীষী বিজ্ঞানের গবেষণা করে আসছেন, তাঁরা যদি কল্পনাও করতে পারতেন যে, তাঁদের আবিষ্কার মানুষের অমঙ্গলে নিয়োজিত হবে তবে তাঁরা এ গবেষণা করতেন কিনা সন্দেহ। বিজ্ঞানের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরকালের। বিজ্ঞানের সুষ্ঠু প্রয়োগের ফলেই মানুষ আজ অসাধ্য সাধন করতে পেরেছে। মানুষ আবিষ্কার করেছে—বিমানপোত, চলচ্চিত্র, বেতারবার্তা, টেলিভিসন জীবন বাঁচাবার নানাপ্রকার ওষুধ আর যন্ত্রপাতি এবং আরো কত কি! বিজ্ঞানের সুষ্ঠু প্রয়োগের ফলেই বহু অনুন্নত দেশ আজ উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছে।

কিন্তু অপরদিকে অপপ্রয়োগের ফলে বিজ্ঞান আজ দেখা দিয়েছে ধ্বংস শক্তি উৎপাদকের ভূমিকা নিয়ে। তারই ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে নানাপ্রকার মারণাস্ত্র—শক্তিমান বিস্ফোরক, গোলাগুলি, বোমারু বিমান, জাহাজ-বিধ্বংসী মাইন, ডেষ্ট্রয়ার। আবিষ্কৃত হয়েছে পরমাণু-বোমা, আর মারাত্মক অস্ত্র ভি-টু প্রভৃতি। প্রাচীন কালের অরণ্য আজ শহরে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সেই বন্য মানুষের মৃগয়া ও আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি সভ্য মানুষের মধ্যে আজও অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে। সেজন্যেই আজ বিজ্ঞানের এত অপপ্রয়োগ হচ্ছে। আজ একদিকে স্বার্থান্ধ মানুষ যেমন মানুষকে মৃগয়া করছে, তেমনি অন্যদিকে স্বার্থান্ধ মানুষের কবল থেকে অন্য মানুষও আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে অবিরত। একের সম্পত্তি অন্যে নিচ্ছে, এক দেশের উপর অন্যদেশ অধিকার বিস্তার করছে। আদিম আরণ্য মানুষের মত আজিকার সভ্যতাগর্বিত মানুষও তাই মারণাস্ত্র আবিষ্কারে ব্যস্ত। এই আবিষ্কার আজ ভয়ঙ্কর ও ঘৃণ্য হয়ে উঠেছে; মানুষ আজ তা মানুষের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করছে। সভ্য মানুষের আবিষ্কৃত মারণাস্ত্র আজ সমগ্র মানব সভ্যতার আত্মহত্যার অনিবার্য কারণরূপে দেখা দিয়েছে। তবুও বিজ্ঞান মানব সভ্যতার অকৃপণ দান, মানুষের জ্ঞান সাধনার দান।

বিজ্ঞানের ছোট-বড় প্রত্যেকটি দানই আমাদের কাছে পরম বিস্ময়কর বলে মনে হয়। তবুও যখন বেতার ও বেতারবার্তা নিয়ে এতটুকু চিন্তা করি তখনই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। বেতার যন্ত্রের সাহায্যে বার্তা প্রেরণ, বিজ্ঞান-জগতে এক পরম বিস্ময় বলে মনে হয়। হাজার হাজার মাইল দূরের মানুষের কথা হাজার হাজার মাইল দূরের মানুষ পরম বিস্ময়ে শুনছে। আগে কল্পনা করলেও শিহরণ জাগতো, কিন্তু আজ তা বাস্তব সত্য। আজ ছোট্ট একটি বোতাম টিপলেই বহু দূরের অজ্ঞাত পৃথিবী তার পরিচয় নিয়ে রুদ্ধকক্ষের মধ্যে এসে হাজির হয়। ছোট্ট একটি বোতাম। সত্যই বিস্ময়কর নয় কি?

বিজ্ঞানের এই বিস্ময় কোনও একটি মানুষের একক সাধনার ফলে আবিষ্কৃত হয় নি। এর পেছনে রয়েছে বহু বৈজ্ঞানিকের সাধনা। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জেমস্ ক্লার্ক ম্যাকস্ওয়েল প্রমাণ করেন যে, সাধারণ আলোক আর কিছু নয়, বিদ্যুৎ চৌম্বক শক্তির তরঙ্গ মাত্র। এর বিশ বছর পরে তরুণ জার্মান বৈজ্ঞানিক হাইনরিখ হার্ট্জ গবেষণা করে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের প্রকৃতি বিচার করে দেখান। এভাবে বেতারের প্রাথমিক দুটি অধ্যায় আবিষ্কৃত হলো।

তারপরই নাম করতে হয় ইটালীয় বৈজ্ঞানিক মার্কনীর। পূর্বের দু'জন যা' আবিষ্কার করেছিলেন ইনি তাঁদের চেয়ে উন্নত ধরণের বেতার গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্র উদ্ভাবনে সক্ষম হন। তিনি বহুদূরে বার্তা প্রেরণ করে এক আলোড়নের সৃষ্টি করেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বেতারের আরও উন্নতি ঘটে। ভারতীয় বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্রেরও এ বিষয়ে দান রয়েছে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে বহু চেষ্টার ফলে আবিষ্কার হয় বেতার ও বেতার বার্তার। আজকের এই বেতারই বৃহৎ পৃথিবীকে ক্ষুদ্র করে দিয়েছে। মনে হয় আজ পৃথিবীর দূরতম অঞ্চলও যেন আমাদের অতি নিকটে। ঘরে বসেই আজ আমরা পাই সারা পৃথিবীর খবর। পৃথিবীর কোথায় কি ঘটছে তা আমরা অতি অল্প সময়েই জানতে পারি বেতার মারফৎ। জীবনের বিভিন্ন দিকে এর প্রভাব এত অধিক যে, এটা কেবল একটা বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই নয়, একটা কলাশিল্পও বটে। এই আবিষ্কার পৃথিবীকে যেমন ক্ষুদ্র করেছে তেমনি মানুষের মনকে করেছে বৃহৎ। সারা পৃথিবীর সঙ্গে আত্মীয়তা-বোধ আজ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে এই আবিষ্কারের ফলে। অজ্ঞাত, অপরিচিতের সঙ্গে একত্ববোধই সভ্যতার চরম লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে বেতার মানুষকে অপরিমিত সাহায্য করছে।

শ্রীকানাইলাল সুর

জানবার কথা

১। পাখীরা অণ্ডজ প্রাণী, অর্থাৎ এরা প্রথমে ডিম পাড়ে তার পরে ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। বিভিন্ন পাখীর ডিমের আয়তন বিভিন্ন। এসব কথা আমাদের সবাই জানা আছে কিন্তু কোন্ পাখীর ডিম সবচেয়ে বড়, আর কোন পাখীর ডিম সবচেয়ে ছোট—এ প্রশ্ন যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তবে অনেকেই হয়তো বলতে পারবে না। সাধারণতঃ আমরা যে সব পাখীর ডিমের সঙ্গে পরিচিত তার মধ্যে রাজহাঁসের ডিমই বড়। বিশেষজ্ঞ-

১নং চিত্র

দের মতে, পৃথিবীতে যত জাতের পাখী আছে তন্মধ্যে উট পাখীর ডিম সর্বাপেক্ষা বৃহদাকৃতির এবং জ্যামাইকাতে ভারভেন হামিংবার্ড নামে এক জাতের পাখী দেখা যায়—তাদের ডিমই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতির। উট পাখীর ডিমের দৈর্ঘ্য ৬ থেকে ৭ ইঞ্চি এবং পাশাপাশি মাপ প্রায় ৪ থেকে ৬ ইঞ্চি, আর হামিংবার্ডের ডিমের দৈর্ঘ্য আধ ইঞ্চিরও কম এবং একটি মুক্তার মত দেখতে।
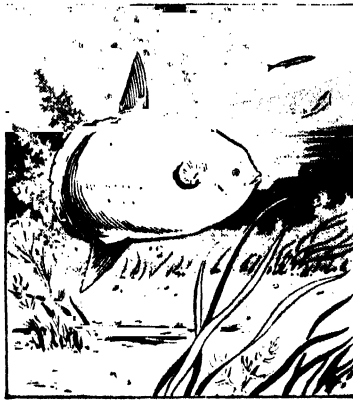
২নং চিত্র

২। সাধারণতঃ আমরা যে সব মাছ দেখি—তাদের দেহের সঙ্গে মস্তিষ্কের যে

সামঞ্জস্য দেখা যায়, সানফিস্ নামে এক জাতীয় মাছের কিন্তু দেহের তুলনায় মস্তিষ্কের মোটেই সেরূপ সামঞ্জস্য নেই। এদের দেহের তুলনায় মস্তিষ্কটি খুবই ছোট। ছবিটা দেখলেই বোঝা যায় মাছটা কিরূপ অদ্ভুত দেখতে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে আর কারোর দেহের সঙ্গে মস্তিষ্কের এই অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না।

৩। বিজ্ঞানীরা বেলুনের সাহায্যে ঊর্ধ্বাকাশের আবহাওয়া সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করে দেখেছেন যে, ঊর্ধ্বাকাশের সর্বাপেক্ষা শীতল অংশটি মেরু অঞ্চলের উপর

৩নং চিত্র

অবস্থিত নয়। ঊর্ধ্বাকাশের শীতলতম অংশটি গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া সমন্বিত প্রশান্ত মহাসাগরীয় মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের উপরে অবস্থিত। মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ বিষুবরেখার কিঞ্চিৎ উত্তরে অবস্থিত।

৪। একই পরিমাপের বিভিন্ন গাছের কাঠের ওজন এক হয় না। কোনটার খুব বেশী ওজন এবং কোনটার খুব কম। পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা হাল্কা হচ্ছে বাল্‌সা কাঠ।

৪নং চিত্র

এই কাঠের প্রতি ঘনফুটের ওজন হচ্ছে ছয় পাউণ্ড। নিশ্চয়ই এখন প্রশ্ন মনে জাগবে-

পৃথিবীতে কোন্ কাঠ সর্বাপেক্ষা ভারী? বিজ্ঞানীদের মতে, ব্ল্যাক আয়রনউড হচ্ছে পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা ভারী কাঠ। এই কাঠের প্রতি ঘনফুটের ওজন হচ্ছে ৯৩ পাউণ্ড।

৫। হাতী সম্বন্ধে অনেক বিস্ময়কর কাহিনী তোমরা শুনে থাকবে। এদের দৈনন্দিন চালচলনে এমন অনেক ব্যাপার দেখা যায়—যা আমাদের কাছে অদ্ভুত বলে মনে হয়। আফ্রিকায় অনেক হাতী দেখা যায়। কিন্তু আফ্রিকার হাতীরা কি ভাবে ঘুমায়? অনেকেই হয়তো ভাববে, এ তো জানা কথা—হাতী শুয়েই ঘুমায়! কিন্তু
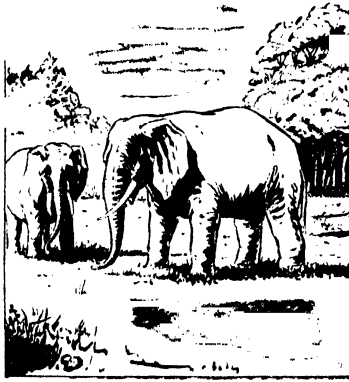
৫নং চিত্র

আফ্রিকার হাতীরা ঘুমাবার সময় সোজা দাঁড়িয়ে থাকে। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে—এরা পরিণত বয়সে বিশাল দেহ নিয়েও বহুক্ষণ একভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় ঘুমাতে পারে। এরা জীবনের শেষ ৩০।৪০ বছরেও ঘুমের সময় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। এরা কিন্তু হাঁটু ভেঙ্গে বসতে বা শুতেও পারে। তবুও এরা দাঁড়িয়ে থাকাটাই বেশী পছন্দ করে।

৬নং চিত্র

৬। রোম সম্রাট নীরোর কাহিনী তোমরা অনেকেই জান। ঐতিহাসিকেরা

বলেন যে, নীরো নিকট-দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, অর্থাৎ তিনি খালি চোখে দূরের কিছু ভাল দেখতে পেতেন না। প্রাচীনকালে রোমের অ্যাম্পিথিয়েটারে প্রায়ই দ্বন্দ্বযুদ্ধের অনুষ্ঠান হতো। রোম সম্রাটগণ এই অনুষ্ঠান দেখতে খুব পছন্দ করতেন। সম্রাট নীরো এই অনুষ্ঠান দেখবার সময় একটি অবতল মণি, অর্থাৎ এমারেল্ড ব্যবহার করতেন। এই মণির ব্যবহার থেকেই নাকি ক্রমশঃ আধুনিক চশমার উৎপত্তি হয়েছে।

৭। পৃথিবীতে কোন্ দেশের মানুষ সবচেয়ে লম্বা? অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে, নীলনদের সন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসী উপজাতিরাই হচ্ছে সবচেয়ে লম্বা। এদের
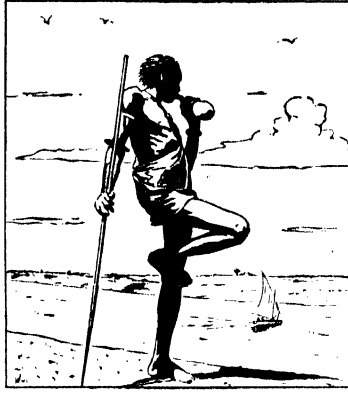
৭নং চিত্র

মধ্যে অনেকেরই উচ্চতা হচ্ছে সাত ফুট বা তারও বেশী। জাতি হিসাবে এরাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা লম্বা। অবশ্য অন্যান্য জাতির মধ্যে কখনও কখনও কারো-কারোর উচ্চতার পরিমাপ স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে যেতেও দেখা যায়।
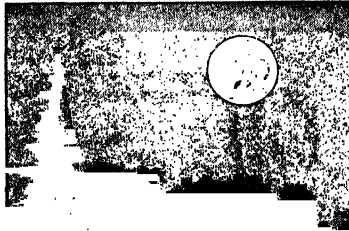
৮নং চিত্র

৮। চাঁদে যে কালো দাগগুলি দেখা যায়—সেগুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের লোকের নানারকম অদ্ভুত ধারণা আছে। কেউ কেউ মনে করে যে, ঐ দাগগুলি হচ্ছে

চাঁদে মানুষের অবস্থানের চিহ্ন। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, চাঁদের প্রাথমিক গঠনাবস্থায় আকাশস্থিত নানাবিধ বস্তুপুঞ্জের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে এবং তার ফলেই নাকি চাঁদে ঐ কালো দাগগুলির সৃষ্টি হয়। এক কথায় বলা যেতে পারে যে—দাগগুলি হচ্ছে চাঁদের গায়ে ক্ষতচিহ্ন।

৯। উরুগুয়ের অধিবাসীরা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে মাংস ভক্ষণ করে। এদের মাথাপিছু বার্ষিক মাংস ভক্ষণের পরিমাণ হলো ২৬৪ পাউণ্ড। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে দুগ্ধপায়ী হচ্ছে আইসল্যাণ্ডের অধিবাসীরা। এদের

৯নং চিত্র

মাথাপিছু গড়ে বার্ষিক দুগ্ধপানের পরিমাণ হলো ৪০০ কোয়ার্ট। আয়ারল্যাণ্ডের অধিবাসীদের খাদ্যবস্তুর ক্যালোরীর মাত্রা অন্য যে কোন দেশের অধিবাসীদের খাদ্যবস্তুর ক্যালোরীর মাত্রা থেকে বেশী।

১০। প্রত্যেক প্রাণীই শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্যে নানারকম ছল-

১০নং চিত্র

চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। অক্টোপাস, স্কুইড নামক সামুদ্রিক প্রাণীরা আক্রান্ত

হওয়ার আশঙ্কা করলেই কালীর মত একপ্রকার তরল পদার্থ নিক্ষেপ করে শত্রুর দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে ফেলে। শত্রু-প্রতিরোধকারী এরূপ স্বাভাবিক ব্যবস্থার অনুকরণে শার্ক-রিপেল্যান্ট নামক একপ্রকার অদ্ভুত কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে। এর সাহায্যে অনায়াসেই হাঙ্গরের আক্রমণ ব্যাহত করা যায়। দানাদার একপ্রকার পদার্থ ভর্তি একটা থলে সমুদ্রের জলের মধ্যে যে কোন জায়গা দিয়ে টেনে নিয়ে গেলে সে সব জায়গার জল মেঘের মত কালো এবং ঝাঁঝালো হয়ে ওঠে। এর ফলে হাঙ্গর এবং তাদের পথ-প্রদর্শক মাছের দৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং কাউকে আর আক্রমণ করবার সুযোগ পায় না।

বিবিধ

ঊর্ধ্বাকাশে পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ

পৃথিবীর সর্বপ্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটি ৪ঠা অক্টোবর তারিখে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র হইতে সাফল্যের সহিত ছাড়া হইয়াছে।

বর্তমানে এই উপগ্রহটি ভূপৃষ্ঠ হইতে হিসাব অনুযায়ী নয় শত কিলোমিটার পর্যন্ত উচ্চতায় এক উপবৃত্তাকার কক্ষপথ ধরিয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে।

গোলকের আকৃতিবিশিষ্ট এই উপগ্রহটির ব্যাস ৫৮ সেন্টিমিটার, ওজন ৮৩·৬ কিলোগ্রাম। ইহার ভিতর বেতার ট্র্যান্সমিটার বসানো আছে।

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহের উন্নয়ন সম্পর্কে গবেষণার কাজ চালানো হইয়াছে।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ইতিপূর্বেই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরণের উপগ্রহ প্রথম নিক্ষেপ করিবার সময় আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বৎসরের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া নির্ধারণ করা হইয়াছিল।

সোভিয়েট গবেষণা-প্রতিষ্ঠান ও যন্ত্রনির্মাণ-সংস্থাসমূহ কর্তৃক পরিচালিত ব্যাপক গবেষণা কার্যের ফলে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মিত হয়। এই প্রথম উপগ্রহটি সাফল্যের সহিত ঊর্ধ্বাকাশে নিক্ষিপ্ত হয়। প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত তথ্যাদি হইতে জানা গিয়াছে যে, রকেটটি (ক্যারিয়ার রকেট) এই উপগ্রহটিকে ঊর্ধ্বে লইয়া গিয়া নিক্ষেপ করে, সেই রকেটটি উপগ্রহটিকে প্রয়োজনীয় কক্ষ পরিক্রমার উপযোগী সেকেণ্ডে প্রায় ৮০০০ মিটার গতি (অরবিট্যাল স্পিড) দান করে। বর্তমানে উপগ্রহটি এক উপবৃত্তাকার কক্ষ পথ ধরিয়া পৃথিবী পরিক্রমা করিতেছে। সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় সাধারণ বাইনোকুলার, টেলিস্কোপ ইত্যাদির সাহায্যেই ইহাকে দেখা যাইতে পারে।

রকেটের সাহায্যে মহাশূন্য অভিযানের সম্ভাবনা উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেই বিশিষ্ট রুশ বৈজ্ঞানিক কনষ্টাণ্টাইন ৎসোইল্‌কোভস্কির গবেষণাকার্যের মধ্য দিয়া সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মনুষ্য-নির্মিত প্রথম এই উপগ্রহ সাফল্যের সহিত শূন্যে নিক্ষিপ্ত হইবার ফলে বিশ্বের বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক ভাণ্ডারে এক বিপুল সম্পদ সঞ্চিত হইল। মহাশূন্যের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য-গুলির রহস্য উদ্ধারে এবং আমাদের সৌরমণ্ডলের

অংশ হিসাবে পৃথিবীকে অনুশীলন করিবার পক্ষে এত অধিক উচ্চতায় সংঘটিত এই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকার্যের বিরাট গুরুত্ব রহিয়াছে।

আন্তর্জাতিক ভূপদার্থতাত্ত্বিক বৎসরে আরও কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ ছাড়িবার পরিকল্পনা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের রহিয়াছে। এইগুলি আরও ভারী এবং বৃহত্তর হইবে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার এক ব্যাপক কার্যসূচী পরিচালনায় সহায়তা করিবে।

আগামী মার্চ মাসে আমেরিকার কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যোমচারী উপগ্রহ প্রেরণের জন্য ১৩টি শক্তিশালী রকেট ব্যবহারের পরিকল্পনা করিয়াছে।

মার্কিন কংগ্রেসের ব্যয়মঞ্জুর কমিটির নিকট প্রদত্ত সাক্ষ্যের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, উহা হইতে এই তথ্য জানা গিয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ার সাফল্যজনক পরীক্ষার প্রায় দুই মাস পূর্বে এই সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হয়। উহাতে ডাঃ জন হ্যাগেন ও ক্যাপ্টেন এ. বি. মাটাজার বলিয়াছেন যে, সাক্ষ্য গ্রহণের সময় পর্যন্ত মার্কিন বৈজ্ঞানিকগণ সমস্ত পরীক্ষাতেই সাফল্য লাভ করিয়াছেন। আমেরিকার পরিকল্পিত উপগ্রহগুলি ঊর্ধ্বাকাশে দুই শত হইতে দেড় হাজার মাইল দূরত্ব রক্ষা করিয়া পৃথিবীর চতুর্দিকে আবর্তন করিতে থাকিবে।

ডাঃ হ্যাগেন কমিটিকে বলেন যে, ত্রি-পর্যায়ী সাতটি বিরাটাকৃতির রকেট পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণে ব্যবহার করা হইবে। আগামী ডিসেম্বর মাসেই এই পরীক্ষাকার্য সুরু হইবে বলিয়া প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ঘোষণা করিয়াছেন। অবশিষ্ট ছয়টি রকেট নানাবিধ যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত কৃত্রিম উপগ্রহগুলিকে বহনের জন্য নিয়োজিত হইবে। আগামী মার্চ মাসে উপগ্রহগুলি প্রেরণের কাজ আরম্ভ হইবে। মার্কিন উপগ্রহগুলির প্রত্যেকটির ওজন হইবে কুড়ি পাউণ্ড, আট আউন্সের মত এবং এগুলিতে বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতি থাকিবে।

ডাঃ জন হ্যাগেন উপগ্রহ প্রেরণ পরিকল্পনার ডিরেক্টর এবং ক্যাপ্টেন মাটাজার নৌ-গবেষণা বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ।

কয়েক বৎসরের মধ্যে গ্রহে-উপগ্রহে ভ্রমণের সুযোগ

মস্কো বেতারের সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট বিজ্ঞানী অধ্যাপক পকরোভ্স্কী ইজভেস্তিয়ায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলেন, কয়েক বৎসরের মধ্যেই চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহলোকে যাতায়াত মানুষের পক্ষে সম্ভব হইবে। আমরা শুধু স্বয়ংক্রিয় চালক-বিহীন রকেটের কথাই চিন্তা করিতেছি না। অতিকায় রকেটসমূহ যাত্রী লইয়া গ্রহে-উপগ্রহেও উপনীত হইবে।

অধ্যাপক পকরোভ্স্কী দীর্ঘকাল যাবৎ নভোমণ্ডল ও গ্রহান্তরে ভ্রমণ সম্পর্কে গবেষণা করিয়া আসিতেছেন।

তিনি বলেন, যে উপগ্রহটি শূন্যলোকে প্রেরণ করা হইয়াছে তাহার দ্বারা বিভিন্নরূপ গবেষণা ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপগ্রহ পৃথিবীর আকৃতি এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মাধ্যাকর্ষণের শক্তি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের সুবিধা করিয়া দিয়াছে।

এই উপগ্রহটি সম্পর্কে পৃথিবীর সর্বত্র বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালাইতে পারিয়াছেন। এতদ্বারা বিজ্ঞানের ভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ হইল।

এই উপগ্রহটি কেবলমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নের কৃতিত্বের কথাই ঘোষণা করিতেছে না। প্রকৃতিকে জয় করিবার সাধনায় উহা বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতারও প্রতীক।

বৈজ্ঞানিক বিস্ময়

নিউজিল্যাণ্ডের দক্ষিণ প্রান্তের আকাশে ৭০

মাইল উর্ধ্বে একটা কিছু অদ্ভুত ব্যাপার চলিতেছে। তবে উহা কৃত্রিম উপগ্রহ বা উড়ন্ত পিরিচ নহে। কতকগুলি নৈসর্গিক পদার্থ একবার উত্তরদিকে ছুটিয়া যাইতেছে আবার পিছনে চলিয়া আসিতেছে। মেরুজ্যোতি বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক বলেন, আমরা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি যে, এমন একটা কিছু ব্যাপার ঘটিতেছে যাহা আমাদের ধারণার অতীত। একটা কিছু নূতন ব্যাপার আমাদের চোখে পড়িয়াছে। কিন্তু রেডার যন্ত্রেও উহাকে সঠিকভাবে আমরা ধরিতে পারিতেছি না।

ভাবী কৃত্রিম উপগ্রহ সহস্র সহস্র মাইল উর্ধ্বে উঠিবে

প্রাভদা'য় ভিক্টর আম্বার্টসুমিয়ান নামক একজন সোভিয়েট জ্যোতিবিজ্ঞানী লিখিয়াছেন যে, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে কৃত্রিম উপগ্রহসমূহ মহাশূন্যে সহস্র সহস্র মাইল উঠিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে পারে।

তিনি বর্তমান সোভিয়েট কৃত্রিম উপগ্রহ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া বলেন যে, পরবর্তী কার্য হইবে, চন্দ্র প্রদক্ষিণকারী রকেট নির্মাণ। এইরূপ রকেটের মধ্যে স্থাপিত যন্ত্রসমূহ চন্দ্রের যে দিক পৃথিবী হইতে দেখা যায় না, সেই দিক সম্বন্ধে তথ্য পাঠাইবে।

বেলুনে উর্ধ্বাভিযান

একটি অতিকায় বেলুনে আরোহণ করিয়া নভোমণ্ডলের প্রান্তদেশে ২৪ ঘণ্টারও অধিককাল পরিক্রমার পর মার্কিন বিমান বাহিনীর বৈমানিক বিজ্ঞানী ডাঃ ডেভিড সাইমন্‌স্ নিরাপদে ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করেন। মেজর ডেভিড সাইমন্‌স্ ৩২ ঘণ্টা বেলুনে ছিলেন। সরকারী সংবাদে প্রকাশ, তিনি ১ লক্ষ ২ হাজার ফুট উঠিয়াছিলেন; কিন্তু বেসরকারী সংবাদে প্রকাশ—তিনি উঠিয়াছিলেন ১ লক্ষ ১৮ হাজার ফুট পর্যন্ত। সে যাহাই হউক, উভয়টিই নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে। কেন না, মনুষ্য আরোহী সহ বেলুন ইতিপূর্বে ৯৬ হাজার ফুট পর্যন্ত আরোহণ করিয়া রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছিল।

চক্ষুরোগের নূতন ঔষধ

ক্রমবর্ধমান অক্ষিপট প্রদাহ, অর্থাৎ প্রোগ্রেসিভ রেটিনাইটিস রোগের ক্রমবৃদ্ধিকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করিবার কোন ঔষধ এই পর্যন্ত চিকিৎসা-শাস্ত্রে জানা ছিল না। এই ব্যাধির পরিণতি হইল সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তিহীনতা। সম্প্রতি গবাদি পশুর পিটুইটারি গ্রন্থি হইতে একপ্রকার চূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে, যাহা এই রোগের ক্রমবৃদ্ধিকে স্থায়ীভাবে রোধ করিতে সক্ষম। প্রতিরোধ করা ছাড়াও এই ঔষধ ক্রমান্বয়ে এই রোগটিকে নিরাময় করিয়া তোলে এবং অক্ষিপটের আলোকানুভূতির ক্ষমতাকে স্বাভাবিক অবস্থায় লইয়া আসে। অন্ধ হইয়া যাওয়াই যাহাদের অনিবার্য পরিণতি ছিল, এইরূপ কয়েকজন রোগীর ক্ষেত্রে এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বিশেষ সুফল পাওয়া গিয়াছে। এই ঔষধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কয়েকমাস চিকিৎসাধীনে থাকিতে হয়। বর্তমানে সোভিয়েট দেশের চক্ষুরোগ-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা এই ঔষধটিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রয়োগ-পরীক্ষা চালাইতেছেন।

পেশীর বেদনা নিরাময়ে নূতন ঔষধ

পেশীর বেদনা বা মায়োপ্যাথিয়া রোগ নিরাময়ে সোভিয়েট চিকিৎসকগণ বিশেষ সাফল্যের সহিত একটি নূতন ঔষধ ব্যবহার করিতেছেন। এই ঔষধটির রাসায়নিক নাম এ-টি-পি-এইচ। সোভিয়েট বিজ্ঞান পরিষদের বায়োকেমিক্যাল ইন্‌ষ্টিট্যুট এই রাসায়নিকটি প্রস্তুত করিয়াছেন। খুব জটিল কতকগুলি জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে এই ঔষধটি পাওয়া গিয়াছে। ইহা একটি কেলাস-চূর্ণ রাসায়নিক ও জলে দ্রবণীয়। পেশীর বেদনা

নিরাময়ের জন্য এই ঔষধটিকে বর্তমানে ব্যাপকভাবে উৎপাদন করা হইতেছে।

অল্প কিছুকাল আগে পর্যন্ত এই পেশীর বেদনা বা মায়োপ্যাথিয়া রোগের চিকিৎসায় মালিশ, সেঁক ইত্যাদি চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রয়োগ করা হইত। ইহার বদলে এই এ-টি-পি-এইচ ইন্‌জেক্‌শন দিয়া অতি দ্রুত সুফল পাওয়া গিয়াছে এবং ইহার কোন পরবর্তী প্রতিক্রিয়া নাই বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই ঔষধ বিপাকক্রিয়াকে সুনিয়মিত করিয়া তোলে ও ক্ষীণশক্তি পেশীতন্তুর শক্তি ফিরাইয়া আনে এবং উহাকে নমনীয় করিয়া তোলে। তাছাড়া হৃৎপিণ্ডের সহিত মস্তিষ্কের যোগাযোগ রক্ষাকারী ধমনীগুলির পথ প্রশস্ততর ও মসৃণ করিয়া তুলিবার কাজেও এই এ. টি. পি. এইচ বিশেষ উপযোগী।

বীজঘ্ন কাগজ

কাজ করিতে করিতে একজন শ্রমিকের হাত হয়তো অতি সামান্য একটু কাটিয়া গিয়াছে। শ্রমিকটি ভাবিল, এই নগণ্য ক্ষতটুকুর জন্য আবার প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে গিয়া সময় নষ্ট করা কেন? ক্ষতস্থানটির বিষাক্ত হইয়া উঠিবার ঝুঁকি লইয়াই সে কাজ করিয়া চলিল। কিন্তু এরূপ অবস্থায় আর ডাক্তারের নিকট ছুটিতে হইবে না। নূতন আবিষ্কৃত একপ্রকার বীজঘ্ন কাগজের সাহায্যেই বীজাণুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারা যাইবে। প্রত্যেকটি শ্রমিকের পকেটে সর্বদা খানিকটা করিয়া বীজঘ্ন কাগজ (ব্যাকটেরিসাইড পেপার) থাকিবে। দেহের কোন অংশ কাটিয়া গেলেই এই কাগজ একটু ছিঁড়িয়া লইয়া ক্ষতস্থানের উপর পটি দিয়া লইলেই চলিবে।

এই বিজঘ্ন কাগজ আবিষ্কার করিয়াছেন সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক আই. কালবিন। আঁচড় লাগা, ছড়িয়া যাওয়া, ছোটখাটো কাটা-ক্ষত, উষ্ণ তরল পদার্থের হল্‌কা লাগা, ফোস্কা-গলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ক্ষতস্থানের উপরে এই বীজঘ্ন কাগজ লাগাইয়া রাখা চলিবে। ইহার ফলে ক্ষত-স্থানগুলির দ্রুত নিরাময়েও সহায়তা হইবে।

এই বীজঘ্ন কাগজের আরেকটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য কাজ হইল ঠাণ্ডা-লাগার বিরুদ্ধে প্রতিষেধক ব্যবস্থা। ছোট ছোট কাগজের টুক্‌রা ডেলা পাকাইয়া নাকের মধ্যে রাখিলে নাসিকার ভিতরে শ্লেষ্মাসৃষ্টিকারী জীবাণুগুলি আর বাঁচিতে পারে না।

৫০ হাজার বৎসর পূর্বেকার নরকঙ্কাল

ফ্রান্সের প্রাগৈতিহাসিক গুহার নিকটে ৫০ হাজার বৎসর পূর্বেকার একটি অতিবৃহৎ নরকঙ্কাল খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক বস্তু-বিশেষজ্ঞ রোজার কনষ্ট্যান্টের মতে, লোকটি অস্বাভাবিক দীর্ঘাঙ্গ ছিল এবং তাহার মাংশপেশীও ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী।

একটি কূপ খননের কালে মৃত্তিকাগর্ভে ২১ ফুট নিম্নে কঙ্কালটি পাওয়া যায়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের কঙ্কাল

মোতিগার (দক্ষিণ ফ্রান্স) নিকটবর্তী রিগো-দোতে মাটি খননের ফলে প্রাগৈতিহাসিকযুগের মানুষের সমগ্র একটি কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে।

এখনও খনন করিয়া অন্যান্য অস্থি উঠান হইতেছে। মঃ রোজা কোঁস্তাঁ নামক একজন অপেশাদার পুরাতত্ত্ববিদ প্রাগৈতিহাসিক মানুষের চোয়ালের একটি বৃহৎ অস্থি ও অন্যান্য অস্থি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ঐ সমুদয় ৪০ হাজার বৎসর পূর্বের বলিয়া অনুমিত হয়।

উক্ত পুরাতত্ত্ববিদ মনে করেন যে, তাঁহারা একটি অতি প্রাচীন গোরস্থান খনন করিতেছেন।

হৃৎপিণ্ডের মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবন

মানুষের হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া

এবং পুনরায় উহাকে ইচ্ছামত চালু করিবার একটি নূতন পদ্ধতির বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে।

চারটি মৃত ভ্রূণ মাতৃদেহ হইতে অপসারিত করিয়া আধ ঘণ্টারও বেশী সময় পরে উহাদের হৃৎযন্ত্রের উপর পরীক্ষা চালাইয়া বিশ মিনিটের মধ্যে উহাদিগকে সতেজ করিয়া তোলা হইয়াছে।

ডাঃ ডেনিস মেলরোজ এই পরীক্ষা চালান। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, সোডিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, পটাসিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম বাইকার্বনেট, ডেক্সট্রোজ ও পরিস্রুত জল ছিটাইয়া দিয়া মৃত হৃৎপিণ্ডকে সজীব করিয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে। আবার, পটাসিয়াম সাইট্রেট ছড়াইয়া দিয়া সজীব হৃৎপিণ্ডকে নির্জীব করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

শশক জাতীয় ৬০টি প্রাণী হত্যা করিয়া উহাদের হৃৎপিণ্ডের উপরও এই পরীক্ষা চালান হইয়াছে।

রঞ্জেনরশ্মি ও পারমাণবিক চুল্লী হইতে মানুষের বিপদাশঙ্কা

ভবিষ্যৎ মানবজাতির উপর বিকিরণের প্রভাব সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার গবেষকদল তাঁহাদের রিপোর্টে বলেন, রঞ্জেনরশ্মি এবং পারমাণবিক চুল্লীর বিকিরণ ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য ক্রমশঃই বেশী বিপদ সৃষ্টি করিয়া রাখিতেছে। পৃথিবীর নয়টি দেশের ২০ জন বিশেষজ্ঞ গত বৎসর অগাষ্ট মাসে কোপেনহেগেনে এক বৈঠকে মিলিত হইয়া এই সমস্যার বিষয় পর্যালোচনা করেন।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন, পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার যেভাবে প্রসারলাভ করিতেছে এবং পারমাণবিক বিস্ফোরণের উৎসকে যেভাবে ব্যবহার করা হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যৎ মানবজাতির অকল্যাণের আশঙ্কা রহিয়াছে। অথচ এই দুইটিই অপরিহার্য এবং উহারা মানবজাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে প্রভূত সহায়তা করিতে পারে। সেই জন্য নিশ্চয়ই কিছুটা ঝুঁকি লইতে হইবে। কিন্তু বিপদের মাত্রা হ্রাস করিবার জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে এবং মানবদেহের উপর তেজস্ক্রিয় রশ্মিপাতের পরিমাণ যাহাতে কম হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

রিপোর্টে আরও বলা হয় যে, জীবাণু হইতে আরম্ভ করিয়া স্তন্যপায়ী জীব পর্যন্ত সমগ্র সজীব পদার্থে যাহারা দৈহিক বিকৃতি ঘটাইতে পারে, তন্মধ্যে তেজস্ক্রিয় রশ্মিরও স্থান রহিয়াছে। প্রকৃতিগতভাবে যে পরিবর্তন ঘটে, তদতিরিক্ত কোন পরিবর্তন সাধিত হইলে বর্তমান মানবজাতি ও তাহাদের বংশধরগণের অনিষ্ট হইবে। মূল কথাটি হইতেছে এই—প্রজননের দিক হইতে কৃত্রিম বিকিরণও মানুষের পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

যৌনগ্রন্থির উপর তেজস্ক্রিয় রশ্মিপাতের ফলে দীর্ঘকাল পরে মানুষের যে বিপদ ঘটিতে পারে, তজ্জন্য রিপোর্টে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

বলা হয় যে, যৌনগ্রন্থির উপর রঞ্জেনরশ্মি বিকিরণের ফলে সন্তান-সন্ততিদের জীবনে বিপদ দেখা দেয়। সেই জন্যই যৌনগ্রন্থিকে আবৃত রাখিয়া উহাকে বিকিরণের বিপদ হইতে মুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কোন সন্তানের পিতামাতার দেহে কতটা রঞ্জেনরশ্মিপাত ঘটিয়াছে, কোন্ বয়সে তাঁহাদের যৌনগ্রন্থির উপর কি পরিমাণ রঞ্জেনরশ্মি পড়িয়াছে, সে সম্পর্কে সকল দেশে সঠিক তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন রহিয়াছে। প্রজননের দিক হইতে মানব-সৃষ্ট প্রত্যেকটি বিকিরণই অনিষ্টকর বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। প্রধানতঃ দুইটি উৎস হইতেই উহা আসে:—(১) রঞ্জেনরশ্মি টিউব ও পারমাণবিক চুল্লী, (২) কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ।

রিপোর্টের মুখবন্ধে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল ডাঃ পিয়ারে ডরোল বলেন, রোগ নির্ণয়ের জন্য যথেচ্ছভাবে রঞ্জেনরশ্মি প্রয়োগের

যে রেওয়াজ দেখা দিয়াছে, সে সম্পর্কে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী এবং তজ্জন্যই পারমাণবিক বিকিরণের ফলাফল সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের জন্য গঠিত রাষ্ট্রপুঞ্জ বৈজ্ঞানিক কমিটি এই ব্যাপার লইয়া চিন্তা করিয়াছেন। কমিটি সম্প্রতি যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, রঞ্জেন-রশ্মি বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ চিকিৎসকবৃন্দ নিশ্চয়ই তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু আরও যে সকল বিপদ ঘটিবার আশঙ্কা রহিয়াছে, সে সম্পর্কে এখনও সঠিকভাবে কিছুই বলা হয় নাই। পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারসংক্রান্ত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনেই মানব-ভ্রূণের উপর রঞ্জেনরশ্মির প্রয়োগের কুফল জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

রকেটবাহিত পারমাণবিক অস্ত্র

জাপানী বিজ্ঞানীরা বলেন, গত ২২শে অগাষ্ট সোভিয়েট রাশিয়ায় যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, তাহা রকেটযোগে ঊর্ধ্বাকাশে প্রেরিত একটি পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণ বলিয়া মনে করিবার সঙ্গত কারণ রহিয়াছে।

কিওটো বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রাগারে বহু ঊর্ধ্বের আকাশে বিস্ফোরণজাত ঝাঁকুনি ধরা পড়িয়াছে।

সোভিয়েট যন্ত্র-বিজ্ঞানী মেজর জেনারেল পকরী-উস্কী এক প্রবন্ধে বলেন, আধুনিক আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণ যন্ত্র হাইড্রোজেন অস্ত্র মুখে লইয়া পৃথিবীর যে কোন স্থানে, যে কোন লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারে। যদি লক্ষ্যচ্যুতও হয় তবুও লক্ষ্য-বস্তুর ৬ হইতে ১২ মাইলের মধ্যে উহারা নিশ্চয়ই পতিত হইবে।

তিনি বলেন, রাশিয়া যে আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ করিয়াছে, উহা বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বে ৬২৫ মাইল পর্যন্ত উঠিতে পারে এবং ঘণ্টায় ১৫৬২৫ মাইল বেগে ছুটিয়া চলিতে পারে। পৃথিবীর যে কোন স্থান হইতে এই ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা চলিতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর হইতে সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্লোরিডার ঘাঁটি হইতে একটি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছে। ইহা কি ধরণের ক্ষেপণাস্ত্র, তাহা প্রকাশ করিতে উক্ত দপ্তরের মুখপাত্র অস্বীকার করেন।

ফ্লোরিডায় কেপ কারনাভেরালে অবস্থিত মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা কেন্দ্র হইতে উক্ত ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষাকার্য নিষ্পন্ন হয়। এই ঘাঁটি হইতেই গত জুন মাসে আমেরিকার অ্যাটলাস নামক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা হয়, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বিস্ফোরণ হওয়ায় পরীক্ষা ব্যর্থ হয়।

কেপ কারনাভেরালের পর্যবেক্ষকগণ বলেন, এই ক্ষেপণাস্ত্রটির নাম জুপিটার। সেনা বিভাগ হইতে ১৫০০ মাইল পাল্লার এই ক্ষেপণাস্ত্রটি নির্মিত হইয়াছে। পর্যবেক্ষকগণ পরীক্ষা কেন্দ্রের বাহির হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পান যে, ক্ষেপণাস্ত্রটি ধীরে ধীরে উপরে উঠিলে উহার গতি বৃদ্ধি পায় এবং ৪০ সেকেণ্ড পরে উহা অদৃশ্য হইয়া যায়।

জুপিটারের পরীক্ষা পূর্বেও সফল হইয়াছিল। বেসরকারী সংবাদে জানা গিয়াছে যে, এটি ৭০০ মাইল ঊর্ধ্বে উঠিয়াছিল এবং উহার গতি ছিল ঘণ্টায় ৫ হাজার মাইলেরও বেশী।

এই পরীক্ষার সংবাদ গোপন রাখা হইলেও সাংবাদিকগণ উহার আভাস পাইয়া ঘাঁটির বাহিরে সমবেত হন।

রাশিয়ায় ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষাকার্য সাফল্যমণ্ডিত

সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান টাস গত ২৬শে অগাষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, সোভিয়েট ইউ-নিয়নে আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা সাফল্যের সহিত সমাপ্ত হইয়াছে। প্রমাণিত হইয়াছে যে,

সামরিক বিমান বাহিনীর সহায়তা ছাড়াই পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলে রকেট প্রেরণ করা সম্ভব। এই ধরণের একটি অস্ত্রের পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হইবার সংবাদ রাশিয়াই প্রথম ঘোষণা করিতে সক্ষম হইল।

সামরিক-বৈজ্ঞানিক ভাষায় আন্তর্মহাদেশীয় বক্রগতি ক্ষেপণাস্ত্রই হইতেছে মানবজাতির শেষ বা চরম অস্ত্র। বহুদূরে ছুটিয়া যাইবার ক্ষমতা এই অস্ত্রের রহিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে, ইহার পাল্লা হইবে ৫ হাজার হইতে দশ হাজার মাইল, গতি হইবে ঘণ্টায় ১০ হাজার হইতে ২০ হাজার মাইল এবং উহা উর্ধ্বে ৬ শত মাইল পর্যন্ত উঠিতে সক্ষম হইবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত জুন মাসে তাহাদের প্রথম আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র অ্যাটলাসের পরীক্ষাকার্যে অগ্রসর হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই উহা বিস্ফোরিত হওয়ায় তাহাদের চেষ্টা নিষ্ফল হয়। দ্বিতীয় আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র টাইটানের নির্মাণ-কার্য শেষ হইতে এখনও ছয়মাস বিলম্ব হইবে।

টাসের ঘোষণায় আরও বলা হয় যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অঙ্গ হিসাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন অস্ত্রেরও বিস্ফোরণ ঘটাইবে।

রাশিয়ার এই রকেটটি এত উর্ধ্বে উঠিয়াছিল, যাহার কোন নজির নাই এবং অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে উহা বহু দূরের লক্ষ্যস্থলে উপনীত হয়।

আন্তর্মহাদেশীয় বক্রগতি ক্ষেপণাস্ত্র এবং চালক-বিহীন নিয়ন্ত্রণাধীন ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য হইতেছে এই যে, ভূপৃষ্ঠে থাকিয়া রেডার যন্ত্রের দ্বারা প্রথমটির গতিপথ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নহে। সেই জন্যই ক্ষুদ্রায়তন কোন লক্ষ্যস্থলে উহা নিক্ষেপ করা সম্ভব নহে।

আন্তর্মহাদেশীয় রকেট বাস্তবিক কয়েকটি রকেটের সমাবেশ। একটি রকেট অস্ত্রটিকে ভূপৃষ্ঠ হইতে উর্ধ্বদিকে বিপুল গতিতে ঠেলিয়া দেয়। এই রকেটের কাজ শেষ হইয়া যাওয়ামাত্র অপর একটি রকেটের কাজ সুরু হয়। এভাবেই পরপর কয়েকটি রকেট সমগ্র অস্ত্রটিকে ঠেলিয়া নিয়া অগ্রসর হইতে থাকে।

শুক্রগ্রহে রকেট প্রেরণ পরিকল্পনা

নানিসিলা (যুব পত্রিকা) নামক সোভিয়েট সাময়িক পত্রে শুক্রগ্রহে রকেট প্রেরণের এক পরিকল্পনা উরি ক্লোব সোভিচ এম. এস্-সি কর্তৃক আলোচিত হইয়াছে।

তিনি লিখিয়াছেন, ১৯৬২ হইতে ১৯৬৭ সালের মধ্যে এই রকেট পাঠান যাইতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং ইহা কার্যে পরিণত করিতে আবশ্যকীয় সব কিছু ইতিপূর্বেই আরম্ভ করিয়াছে।

আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে মোট ২৫০ টন ওজনের পাঁচটি রকেটের সাহায্যে শুক্রগ্রহে পৌঁছান যাইবে। ইহাতে ১৪৬ দিন সময় লাগিবে। শুক্রগ্রহে পৌঁছিবার ২৪ ঘণ্টা পূর্বে উক্ত রকেট ৩ লক্ষ কিলোমিটার দূরে থাকিবে।

রকেটের মধ্যে শুক্রগ্রহের ফটো লওয়ার ও উহা পৃথিবীতে পাঠাইবার জন্য যন্ত্রাদি থাকিবে। যদি শুক্রগ্রহে কোন জীবনের অস্তিত্ব থাকে. তাহা হইলে রকেটের সাহায্যে উহা জানা যাইবে।

মঙ্গলগ্রহে জমি ক্রয়ের জন্য জাপানীদের আগ্রহ

রাশিয়া কর্তৃক মহাশূন্যে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের পর হইতে মঙ্গলগ্রহে ভূসম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় সংস্থা জাপানী জ্যোতির্বিজ্ঞান সমিতির ব্যবসায় খুব জোরে চলিতেছে।

মঙ্গলগ্রহে জমি ক্রয়ের জন্য জাপানীরা উক্ত সমিতির টোকিওস্থিত অফিসের সম্মুখে কিউ দিতেছে। সম্প্রতি মঙ্গলগ্রহের প্রতি একর জমির দর ৪ শিলিং হইতে বাড়াইয়া এক পাউণ্ড ষ্টার্লিং করা হইয়াছে।

উক্ত সমিতির ডিরেক্টর শ্রীমিৎসুও হারাদার বলেন যে, কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে প্রেরণের পর হইতে মঙ্গলগ্রহে জমি ক্রয়ের জন্য তাঁহার নিকট অসংখ্য দরখাস্ত আসিতেছে।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দশম বর্ষ | নভেম্বর, ১৯৫৭ | একাদশ সংখ্যা

মহাব্রহ্মাণ্ড

শ্রীদীপক বসু

প্রসিদ্ধ জার্মান কবি রিক্‌টার একবার স্বপ্নলোকে দেবদূতের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। দেবদূত বললেন —মানব, তুমি বিশ্বরচয়িতার অনন্ত রচনা দেখতে চাইছ—এস, মহাবিশ্ব দেখবে। ধারণাতীত মহা-ব্রহ্মাণ্ডের অগণিত সমাবেশ দেখে মানুষ একেবারে অবসন্ন হয়ে বললো—দেবদূত, অসহ্য এ অনন্তের ভার! এ জগতের শেষ কোথায়? তখন দেবদূত বললেন, তোমার সম্মুখে অন্ত নেই। এতেই কি তুমি অবসন্ন হয়েছ? পশ্চাতে ফিরে দেখ, এ জগতের আরম্ভও নেই।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত রূপ কি? সত্যই কি এ অনন্ত? সত্যই কি এর আরম্ভও নেই, শেষও নেই? জ্ঞানের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্ন এ যুগের বিজ্ঞানীদের মনে সাড়া জাগিয়েছে।

বহুকাল আগে অ্যারিষ্টটল, টলেমী প্রভৃতি মনীষীদের ধারণা ছিল—এই আদি-অন্তহীন বিশ্ব-জগতের কেন্দ্রে রয়েছে আমাদের পৃথিবী। চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য গ্রহসমূহ বৃত্তাকার পথে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের গতিপথের বাইরে রয়েছে গতিহীন অগণিত নক্ষত্ররাজি। পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত লোকের ধারণা এরূপই ছিল।

এই ধারণার গোড়ায় কুঠারাঘাত করলেন কোপার্নিকাস। তিনিই বর্তমান জ্যোতিবিজ্ঞানের গোড়াপত্তনকারী। দৃপ্ত কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন—সূর্য স্থির। পৃথিবী-কেন্দ্রিক জগতের পরিবর্তে সূর্য-কেন্দ্রিক জগৎ প্রতিষ্ঠিত হলো। কোপার্নিকাস আরও বললেন যে, পৃথিবী আপন অক্ষের উপর দিনে একবার ঘোরে। চন্দ্র সর্বদা পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। নক্ষত্রগুলি সূর্য থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। নক্ষত্রদের প্রকৃত অবস্থান ও গতিবিধি সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছুই বলেন নি। তখনকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণার বিরুদ্ধে কোপার্নি-কাসের এই ধারণা প্রকাশ করাতে তাঁকে যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল।

পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ যে সূর্যের চারদিকে ঘোরে, একথা আজ সবাই মেনে নিয়েছে। আজ আরও জানা গেছে যে, সূর্য হচ্ছে একটি সাধারণ তারকা মাত্র। সব তারকাই এক একটি সূর্য। আকারে তাদের কোনটা আমাদের সূর্যের চেয়ে

অনেক ছোট, কোনটা আবার তার চেয়ে অনেক বড়। সূর্যের মতই তাদের বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহ আছে। এই মতবাদের প্রবর্তক ইটালীর জ্যোতিবিদ ব্রুনো। এরূপ মতবাদ প্রচারের জন্যে এই বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে দীর্ঘদিন কারাগারে আবদ্ধ রাখবার পর অবশেষে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়।

আইনষ্টাইনের আগে পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, এই অসীম মহাশূন্যে মহাজগৎ একটি দ্বীপের মত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদ তাঁর আপেক্ষিকতা তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আজকের বিজ্ঞানীদের মতানুসারে এই মহা-বিশ্বের গ্রহ-নক্ষত্রাদির বিভিন্ন গতিবিধির কথা ভাবলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। আপন অক্ষের উপর প্রতি ঘণ্টায় ১০০০ মাইল হিসাবে আবর্তন ছাড়াও পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে ২০ মাইল গতিতে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। আবার আধুনিক ধারণা হলো, চন্দ্রই কেবল পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে না, উভয়ে উভয়ের চারদিকে, অর্থাৎ একটি সাধারণ ভরকেন্দ্রের চারদিকে ঘুরছে। সমগ্র সৌরজগৎ স্থানীয় তারকাবৃন্দের মধ্যে প্রতি সেকেণ্ডে ১৩ মাইল গতিতে ভেগা নক্ষত্রের দিকে ছুটে চলেছে। এই সব তারকাগুলি ছায়াপথের সঙ্গে সমতাল রক্ষা করে প্রতি সেকেণ্ডে ২০০ মাইল হিসাবে ছুটছে। আবার এই ছায়াপথ দূরবর্তী ছায়ালোক থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে সেকেণ্ডে ১০৬ মাইল বেগে। এই সব গতিই অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিভিন্ন দিকে।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র আজ বহু দূরের জিনিষকেও মানুষের দৃষ্টিসীমার মধ্যে এনে দিয়েছে। মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরের অতিকায় দূরবীক্ষণ যন্ত্র (১০০″ ব্যাস) ৫০ কোটি আলোক-বর্ষ পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টিসীমা প্রসারিত করেছে। মাউণ্ট প্যালোমার মানমন্দিরের দূরবীক্ষণের (২০০″ ব্যাস) শক্তি এর দ্বিগুণেরও বেশী। এছাড়া রয়েছে ৪৮″ ব্যাসের স্মীদীয় দূরবীক্ষণ, আর অতি শক্তিশালী ফটো-ইলেকট্রিক সেল। এরা সবাই মিলে মহাজগতের অনেক তথ্যই সংগ্রহ করেছে। মানুষের দৃষ্টিসীমার মধ্যে ১০০ কোটিরও বেশী নীহারিকা রয়েছে; আর তাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে ১০০ কোটিরও অধিক নক্ষত্র। এদের মধ্যে যেগুলিকে ভালভাবে দেখা যায়, সেগুলির আকৃতি কুণ্ডলীর মত। আমাদের ছায়ালোকও এরূপই; সূর্য রয়েছে তার একধারে। অতি আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে একশ' কোটি আলোক-বর্ষেরও অধিক দূর পর্যন্ত মহাশূন্য আমাদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে এসেছে। তবু এ কথা কল্পনা করতেও আজ আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ি যে, মহাজগতের সুদূরের অনেক নক্ষত্র থেকে আলো প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল হিসাবে পথ অতিক্রম করলেও আজ অবধি পৃথিবীতে এসে পৌঁছাতে পারে নি।

আধুনিক মতবাদ, অর্থাৎ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুযায়ী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নানাবিধ গতিবিধির ব্যাখ্যার গোড়ায় দুটি কথা আছে। প্রথমতঃ, আজকের বিজ্ঞানীর কল্পনায় এই মহাব্রহ্মাণ্ড হলো চার মাত্রা-বিশিষ্ট স্থান-কাল সন্ততি (Four Dimensional Space-Time Continuum)। তিন মাত্রা স্থান সম্পর্কিত, আর এক মাত্রা কাল সম্পর্কিত। কারণ এই অসীম মহাবিশ্বকে যদি একটি ক্ষুদ্র বিন্দুতে পরিণত করা যায়, তবে তাতে সময়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কল্পনা করা যায় কি? স্থান ও কাল যে পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, এই থেকেই তা বোঝা যায়। দ্বিতীয়তঃ, ইউক্লিড প্রবর্তিত জ্যামিতি মহা-জগতের মহাকর্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ সমতল ক্ষেত্রের উপর অঙ্কিত সরলরেখা ও মহা-জগতের সুদীর্ঘ সরলরেখা একরকম নয়। বহুদূরবর্তী দুটি নক্ষত্রকে যোগ করলে যে সরলরেখা পাওয়া যায়, সেটা প্রকৃতপ্রস্তাবে বৃত্তের চাপের মত। এই দুই সংস্কারের প্রবর্তক স্বয়ং আইনষ্টাইন। এই নতুন জ্যামিতি অবশ্য গঠন করেছেন জার্মান গণিতবিদ্ রীমান।

কোপার্নিকাসের পর মহাবিশ্ব সম্বন্ধে সবচেয়ে আশ্চর্য যে মতবাদ প্রবর্তিত হয়েছে তা হলো—এই মহাবিশ্ব সসীম। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, এর কোন বাধা বা সীমানা আছে। এটা হঠাৎ কোথাও শেষ হয়ে যায় নি। তথাপি অসীম নয়। স্যার জেম্‌স্‌ জীন্‌সের মতে—সাবানের বুদ্বুদের পৃষ্ঠ যদি ঢেউখেলানো হয় তাহলে যেমন হয়, আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুযায়ী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আকৃতিও সেইরূপ। জগৎ সাবানের বুদ্বুদের ভিতর দিক নয়, তার পৃষ্ঠদেশ। এরূপ সসীম অথচ অনন্ত বিশ্বের কল্পনা করা সত্যই দুরূহ। নিম্নোক্ত উদাহরণ থেকে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ, আমরা এমন কতকগুলি জীবের কল্পনা করতে পারি, যারা কেবল দুটি মাত্রা (দৈর্ঘ্য ও বিস্তার) সম্বন্ধে সচেতন। যদি এই সব জীব একটি সমতল স্থানের (যেমন টেবিল) উপর চলতে থাকে তাহলে শীঘ্রই বুঝবে যে, তাদের পক্ষে অনন্তকাল ধরে চলা সম্ভব নয়; টেবিলটার দৈর্ঘ্য অসীম হলে সেটা সম্ভব হতো; নচেৎ স্বল্পকালের মধ্যেই তারা টেবিলটার ধারে এসে দেখবে যে, তাদের গতি সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে, যদি এই প্রাণীগুলি একটি গোলকের উপর চলতে সুরু করে তাহলে তার উপর দিয়ে অনন্তকাল ধরে যখন যেদিকে খুশী চলতে পারবে। যতক্ষণ ধরেই চলুক না কেন, তাদের গতি কখনও বাধাপ্রাপ্ত হবে না। অথচ গোলকের মোট আয়তন অসীম নয়। গোলকের উপরিভাগের ক্ষেত্রের দুই মাত্রা। ব্রহ্মাণ্ডের চার মাত্রা। রীমানীয় জ্যামিতির সাহায্যে দেখানো যায় যে, দুই মাত্রাবিশিষ্ট গোলকের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত সত্য চার মাত্রা-বিশিষ্ট স্থান-কাল সন্ততির পক্ষেও সম্ভব। এই মহাবিশ্বে তাহলে আমরা অনন্তকাল ধরে সরলরৈখিক পথে চলতে পারবো, কোথাও কখনও কোন বাধার সম্মুখীন হতে হবে না। তবে অনেক চলবার পর হয়তো সবিস্ময়ে দেখবো যে, আমরা যেখান থেকে রওনা হয়েছিলাম, সেখানেই ফিরে এসেছি।

মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরের জ্যোতির্বিদ্‌ এড্‌উইন হাব্‌ল্‌ অনেক গ্রহ-উপগ্রহ ও ছায়াপথ প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করে তাদের ঘনত্বের গড় নির্ণয় করেছেন। তাঁর মতে, মহাজগতে প্রতি ঘন সেণ্টিমিটারে গড়ে ১ গ্র্যামের $১০^{৩০}$ ভাগের এক ভাগ ওজনের বস্তু আছে। এই হিসাব অনুযায়ী আইনষ্টাইন মহাব্রহ্মাণ্ডের ব্যাসার্ধ নির্ণয় করেন। এই দৈর্ঘ্য ৩৫ হাজার কোটি আলোক-বর্ষ। এই সসীমতা প্রকৃতপক্ষে অসীমতারই সামিল নয় কি?

অতিআধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে, আইনষ্টাইনের এই হিসাব কার্যকরী নয়। সম্প্রতি তাঁরা এক অত্যাশ্চর্য মতবাদ প্রচার করেছেন। তাঁরা বলেন যে, এই মহাবিশ্বের কোন নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধ থাকতে পারে না; কারণ মহাবিশ্ব ক্রমশঃ বড় হচ্ছে। অধ্যাপক এডিংটন বলেছেন—আমরা নক্ষত্র ও ছায়াপথগুলিকে একটি রবারের বেলুনের গায়ে চিহ্নিত কতকগুলি গভীর ক্ষতের মত কল্পনা করতে পারি। এই বেলুনটি যেন ক্রমশঃ স্ফীত হচ্ছে। কাজেই নিজেদের বিভিন্ন গতি আর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ফল ছাড়াও এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর অবস্থিত বস্তুগুলি—অর্থাৎ গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা ইত্যাদি পরস্পর পরস্পরের নিকট থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। কিছুদিন থেকেই দেখা যাচ্ছে, দূরের নীহারিকাপুঞ্জ ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। নীহারিকার এই নিরুদ্দেশ যাত্রার গতিবেগ থেকেই ব্রহ্মাণ্ডের স্ফীতির পরিমাণ নির্দেশ করা যায়। বর্ণালী-বিশ্লেষণ যন্ত্রের দ্রুত উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীরা সুদূর নীহারিকার সুনিয়ন্ত্রিত গতি লক্ষ্য করেন। দেখা গেছে যে, ছায়াপথের দূরাপসরণের গতি অতি দ্রুত। ১০ লক্ষ আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থিত ছায়া-পথের দূরাপসরণের গতি সেকেণ্ডে ১০০ মাইল। এই গতি দূরত্বের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। সৌর-জগতের গ্রহ-নক্ষত্র নিজ নিজ কক্ষে আবর্তন

করে। ছায়ালোকের যাত্রা নিরুদ্দেশে। কোথায় এদের যাত্রা? বিজ্ঞানী বলেন, এদের যাত্রা সৌর-জগৎ থেকে দূরে, আর পরস্পরের কাছ থেকেও দূরে।

কবে সুরু হয়েছে ছায়ালোকের এই নিরুদ্দেশ যাত্রা? বলা হয়েছে ২০০ কোটি বছর পূর্বে মহা-জাগতিক প্রভাতে যে স্ফীতি সুরু হয়েছিল, তাই এখন চলছে নীহারিকার মধ্যে। কিন্তু তাহলে এই সৃষ্টির আরম্ভ কবে? তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম থেকে সতত বিকিরণ, নীহারিকার গতিবেগ ইত্যাদি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরিমাপের সাহায্যে দেখা গেছে, আমাদের এই বিশ্বের বয়স ২০ হাজার কোটি বছর। আরও প্রশ্ন আছে। বিশ্বসৃষ্টির আগে কি ছিল? ব্রহ্মাণ্ডের আদি অবস্থা সম্বন্ধে একাধিক মতবাদ প্রচলিত আছে। যেমন, বেলজিয়ান বিজ্ঞানী অ্যাবে লিমেটারের মতে, সৃষ্টির গোড়ায় ছিল একটি অতিকায় কারণ-পরমাণু। কোন কারণে সেটি হঠাৎ ফেটে টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে যায়। তাথেকে জন্ম নেয় এই গ্রহ, নক্ষত্র ও নীহারিকাপুঞ্জ। অধ্যাপক গ্যামো মনে করেন—মহাজগতের কেন্দ্রে ছিল কারণ-বাষ্প (Primordial vapour)। তার উষ্ণতা ছিল অত্যন্ত বেশী। এই জ্বলন্ত বাষ্পপুঞ্জ ক্রমে স্ফীত হতে থাকে এবং তাথেকেই জন্ম নেয় এই মহাব্রহ্মাণ্ড।

সুরু যখন হয়েছে তখন এই মহাজগতের শেষও একদিন হবে—এ রকম আশা করা যেতে পারে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতও তাই। অনির্দিষ্ট স্থান থেকে আগত রহস্যজনক মহা-জাগতিক রশ্মির লয়, পরমাণুর ধ্বংস ও সৃষ্টি-বিলোপেরই নির্দেশক। এই ক্ষুধার্ত মহাশূন্য চারদিক থেকে তাপ ও শক্তি গ্রাস করছে। আর মহাজগৎ ক্রমাগত অগ্রসর হচ্ছে তাপক্ষয়ে মৃত্যু বা চরম অবস্থার দিকে। কোটি কোটি বছর পরে যখন এই অবস্থা আসবে তখন ব্রহ্মাণ্ডের গতিবিধি, ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে যাবে। মহাশূন্যের সর্বত্র সমান তাপ পরিলক্ষিত হবে। কোন শক্তিকেই আর ব্যবহার করা যাবে না—কারণ সব শক্তি মহাশূন্যের মধ্যে সমভাবে বিরাজমান থাকবে। মহাজগৎ থেকে প্রাণের অস্তিত্ব, আলোর অস্তিত্ব, তাপের অস্তিত্ব—সবই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। নিয়ম, শৃঙ্খলা কোন কিছুই থাকবে না। থাকবে কেবল কল্পনাতীত অলীক ভয়াবহ স্তব্ধতা!

একটা প্রশ্ন সবাইকেই কিছুদিন থেকে বিব্রত করে তুলেছে—পৃথিবী ছাড়া ব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোন স্থানে মানুষ বা অনুরূপ বুদ্ধিজীবী প্রাণীর অস্তিত্ব আছে কিনা? বিজ্ঞানীরা এ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। হয়তো আমাদের ছায়াপথেই শত শত মনুষ্য-অধ্যুষিত গ্রহ রয়েছে। শক্তিশালী ফটোইলেক-ট্রিক সেলযুক্ত দূরবীক্ষণের সাহায্যে অন্যান্য কয়েকটি দূরবর্তী নক্ষত্রের সঙ্গে গ্রহ-উপগ্রহ দেখা গেছে বলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দাবী করেছেন। আমাদের সৌরজগতে শুক্র ও মঙ্গল গ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব থাকতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। অবশ্য এ সম্বন্ধে কেউই এখনও নিশ্চিত নন।

সৌরজগতের উৎপত্তি সম্বন্ধেও অনেক মতবাদ প্রচলিত আছে। এদের মধ্যে যেটা মোটামুটি মেনে নেওয়া হয়েছে, সেই মতবাদ অনুযায়ী সৌরজগতের উৎপত্তি একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র। একটা অতিকায় নক্ষত্র সূর্যের পাশ দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে যাবার সময় গ্রহগুলি সূর্য থেকে চারদিকে ছিট্‌কে পড়ে। নক্ষত্রটি নিশ্চয়ই খুব বড় ও শক্তিশালী ছিল; আর সূর্যের খুবই নিকট দিয়ে সেটি গিয়েছিল। ফলে সূর্যের অভ্যন্তরে বিশাল ঢেউসমন্বিত জোয়ারের সৃষ্টি হয়। অবশেষে চুরুটের আকৃতি-বিশিষ্ট একটি লম্বা বাষ্পপুঞ্জ সূর্য থেকে ছিট্‌কে

দূরে চলে যায়। ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানে স্থানে বাষ্প জমা হতে স্থরু করে। এগুলিই ক্রমে ক্রমে এক একটি গ্রহে পরিণত হয়েছে।

এই ভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে মহাবিশ্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, এখানে বেশীর ভাগ গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্র বা ছায়ালোক প্রাণ বা চেতন পদার্থের অস্তিত্ববিহীন। ঐ যে বহু দূরে কোটি কোটি অগ্নিপিণ্ড কোটি কোটি বছর ধরে অফুরন্ত আলো ও উত্তাপ বুভুক্ষু মহাশূন্যের বুকে ক্রমাগত ঢেলে দিচ্ছে, তারা যেন অসীম মহাসমুদ্রের উপর ভাসমান আলোক-সঙ্কেতবাহী এক একটি নির্জন দ্বীপ। এক মুহূর্তের জন্যেই যেন মানুষ এই অপূর্ব বিস্ময়কর অনুষ্ঠান দর্শনের অনুমতি পেয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির অনেক পরে এখানে মানুষের আবির্ভাব হয়েছে এবং এর ধ্বংসের অনেক আগেই মানুষের অস্তিত্ব এখান থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে। এই প্রলয়ঙ্কর নাটকের অবশিষ্ট অঙ্কগুলি অনুষ্ঠিত হবে সব চেতনার অস্তিত্বের উর্ধে, ভয়াবহ নিস্তব্ধ রাত্রির মধ্যে।
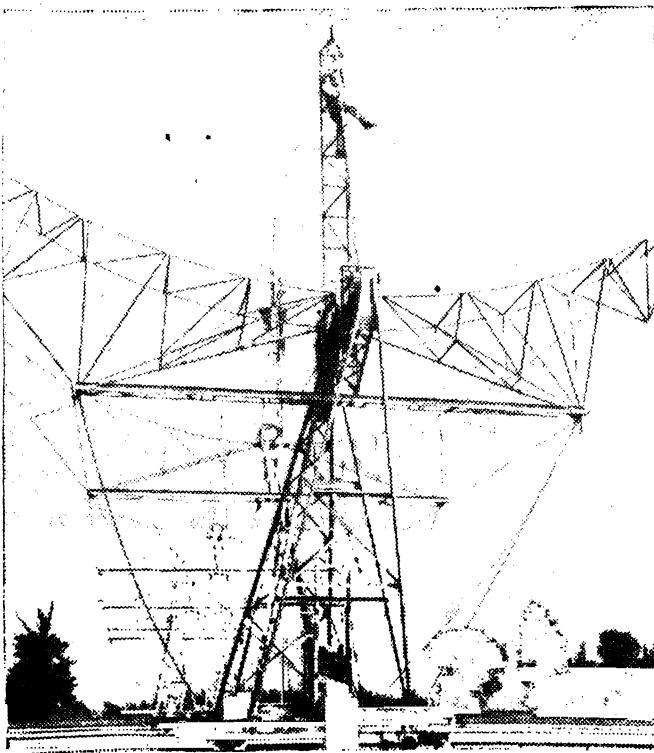
বৃটেনে নির্মীয়মান ইন্টারফেরোমিটার নামক বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে ২০০,০০০,০০০ আলোক-বর্ষ দূরের নক্ষত্রদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা যাবে।

উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ

শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্তী

প্রাণ-প্রাচুর্যে উচ্ছল আমাদের এই বর্তমান পৃথিবী চিরকালই এরূপ ছিল না। পৃথিবীর তাপ, মাটি ও জল প্রভৃতির ধারাবাহিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতেরও একটা স্বাভাবিক ক্রমপরিবর্তন ঘটে। আজকের সবুজ উদ্ভিদ-সমাচ্ছন্ন পৃথিবী ও প্রাণ সৃষ্টির প্রথম অবস্থার পৃথিবীর মধ্যে অনেক প্রভেদ। বর্তমান কালের উদ্ভিদসমূহ প্রাচীন যুগের উদ্ভিদেরই বংশধর। বর্তমান সভ্যতা যেমন প্রাচীন সভ্যতার ক্রমবিকাশের উন্নততম স্তর, তেমনি বর্তমান যুগের উদ্ভিদ এবং জীবজন্তুও প্রাচীন যুগের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম উদ্ভিদ অথবা জীবের উন্নততর ক্রমবিকাশ মাত্র। তবে এই ক্রমবিকাশের ধারা গতিশীল। সাধারণভাবে এই ব্যাপার রহস্যজনক মনে হলেও বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টার ফলে উদ্ভিদ-জগতের এই ক্রমবিকাশের কিছু আভাস পাওয়া যায়।

উদ্ভিদ-জগতের ক্রমবিকাশের কথা জানতে হলে কিভাবে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল তা জানা দরকার। প্রাণের প্রথম বিকাশ সম্বন্ধে মানবসভ্যতার বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় ও দার্শনিকেরা বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অবশ্য এসব ব্যাখ্যার সবই ছিল বৈজ্ঞানিক যুক্তিবর্জিত। বৈজ্ঞানিকদের মতে, অজৈব পদার্থ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবেই প্রথম প্রাণের বিকাশ ঘটে। সৃষ্টির কার-খানা ঘরে প্রাণহীন পদার্থ নিয়ে ভাঙাগড়া চলছিল। উপকরণ ছিল মাটি, জল, লোহা, পাথর ইত্যাদি, আর ছিল অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাস। নানাপ্রকার ওলটপালট ও জীবহীন-তার মধ্যে দেখা দেয় প্রাণ। রুশ দেশীয় রসায়ন-বিজ্ঞানী এ. আই. ওপেরিভের মতে, পৃথিবীর উত্তপ্ত অবস্থা থেকে শীতল হওয়ার সময় প্রথম কার্বাইড তৈরী হয়। এই কার্বাইড জলীয় বাষ্পের সঙ্গে মিশে হাইড্রোকার্বন তৈরী করে। হাইড্রোকার্বনের একাংশ অ্যামোনিয়ার সঙ্গে মিশে নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থের সৃষ্টি করে। এই সব নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ জলের সঙ্গে রাসায়নিক মিলনের ফলে প্রোটিনজাতীয় জটিল জৈব পদার্থের সৃষ্টি করে। প্রোটিনের ভিতরকার অঙ্গার বহুসংখ্যক পরমাণুর মিল ঘটিয়ে জৈব অণুর তহবিল ভারী করে তোলে। ক্রমে তাতে দেখা দেয় প্রাণের স্পন্দন। হয়তো এভাবে রাসায়নিক সংযোগের ফলে প্রাণের ভূমিকা সৃষ্টি হতে লক্ষ লক্ষ বছর কেটে গেছে।

উদ্ভিদ-জগতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ যে স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলেই ঘটেছে, সে সম্বন্ধে অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই একমত। তাঁদের মতে, নিম্নস্তরের আণুবীক্ষণিক এককোষী জীব থেকেই বর্তমানের বিভিন্ন উদ্ভিদের উৎপত্তি ঘটেছে। এই এককোষী জীবের সৃষ্টি হয়েছে প্রোটিন জাতীয় জৈব পদার্থ থেকেই।

পৃথিবীর বয়স প্রায় তিনশ' কোটি বছর। সৃষ্টির প্রথম যুগে এটা একটা জলন্ত অগ্নিপিণ্ড ছিল। তারপর আসে গ্যাসীয় ও তরল অবস্থা। সেই সময়েও পৃথিবীর উত্তাপ ছিল প্রচণ্ড। সেই প্রচণ্ড উত্তাপে প্রাণের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব ছিল না। তাপ হারিয়ে পৃথিবী ধীরে ধীরে শীতল হতে থাকে। ক্রমে ভূত্বক তৈরী হয় এবং প্রাণ ধারণোপযোগী অবস্থার সৃষ্টি হয়।

জীব-বিজ্ঞানীদের মতে, জীব-জগতের আদি রূপটির সন্ধান পেতে হলে আজ থেকে অন্ততঃ দেড়শ' কোটি বছর আগের সন্ধান নিতে হবে। সেই

যুগে পৃথিবীর ভাঙন মহাদেশগুলিকে তখনও মসৃণ করে তুলতে পারে নি। সমুদ্রের জল অপেক্ষাকৃত গরম ছিল। তাতে লবণের ভাগ এরকম ছিল না। অক্সিজেন তখনও তৈরী হয় নি। এই সময়ে সমুদ্রের জলে সৃষ্টি হয় ছোট ছোট অসংখ্য জীবাণু। পৃথিবীর সেই আদিম যুগে, ভূপৃষ্ঠের আদিম সমুদ্রে জেলির মত আদিম জীবেরা কোটি কোটি বছর ধরে জীবনযাপন করেছে।

জেলির মত থল্‌থলে পদার্থটিকে প্রাণী অথবা উদ্ভিদ কোন সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। উদ্ভিদ ও প্রাণীর পূর্বপুরুষ এরাই। তখনকার অন্ধকারময় পরিবেশে প্রাণের অস্তিত্ব বজায় রাখতে এদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। সামুদ্রিক জৈব ও অজৈব পদার্থই ছিল এদের পুষ্টির সহায়।

উদ্ভিদ-জগতের বিবর্তনের বিশেষ ধারাটি দেখতে পাওয়া যায়, পৃথিবীর ইতিহাসের শেষের ৫০ কোটি বছরের দিকে লক্ষ্য করলে। এক এক ধরণের উদ্ভিদ এক এক যুগে আধিপত্য বিস্তার করেছে। ফসিল থেকে আমরা বিভিন্ন যুগের উদ্ভিদের পরিচয় পেতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসের শেষের ৫০ কোটি বছরকে তিনটি বড় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই তিনটি ভাগের নাম পুরাজীবীয় (Paleozoic), মধ্যজীবীয় (Mesozoic), নব্যজীবীয় (Caenozoic)। এই সব নাম থেকেই কোন্ যুগে কোন্ উদ্ভিদের প্রাচুর্য ছিল তা জানতে পারা যায়। এক একটি যুগ শেষ হতে কোটি কোটি বছর সময় লেগেছে। আজকের দিনের ভূপৃষ্ঠের যে বৈচিত্র্য তা এই সব যুগেরই সৃষ্টি।

প্রত্যেক যুগকে আবার ভূ-বিজ্ঞানীরা ছোট ছোট ভাগে ভাগ করেছেন। পুরাজীবীয় যুগটি ছয় ভাগে বিভক্ত; যথা—(১) ক্যাম্ব্রিয়ান, (২) অর্ডোভিসিয়ান, (৩) সিলুরিয়ান, (৪) ডেভোনিয়ান, (৫) কার্বনিফেরাস ও (৬) পার্মিয়ান। মধ্যজীবীয় যুগটি তিন ভাগে বিভক্ত; যথা—(১) ট্রিয়াসিক, (২) জুরাসিক, (৩) ক্রেটাশিয়াস এবং নব্যজীবীয় যুগটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত; যথা—(১) ইয়োসিন, (২) অলিগোসিন, (৩) মাইওসিন, (৪) প্লিওসিন, (৫) প্লিষ্টোসিন। এই যুগগুলির আগের যুগগুলিকে প্রাক্-ক্যাম্ব্রিয়ান যুগ বলে উল্লেখ করা হয়।

পুরাজীবীয় যুগেই জেলির মত থল্‌থলে জীব-জগতে বিশেষ পরিবর্তন দেখা দেয়। এতদিনের বাষ্পের মেঘ কেটে গিয়ে সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছাতে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে জীবাণু রাজ্যে গুরুতর পরিবর্তন দেখা দেয়। জীবাণুরা সমুদ্রের জল ছাড়াও সূর্যের আলোর সাহায্য নিয়ে নিজদের পুষ্টিসাধনের উপায় খুঁজে বের করলো। সূর্যের আলোর প্রভাবে একদল জীবাণুর দেহে ক্লোরোফিল তৈরী হলো। ফলে তারা বাতাস থেকে নিজেদের পুষ্টিসাধনের উপাদান সংগ্রহ করতে সক্ষম হলো। বাতাসে তখন অনেক কার্বন ডাইঅক্সাইড। সূর্যের আলোও অফুরন্ত। ফলে, এদের শরীর দিন দিন হুহু করে বাড়তে লাগলো। এরূপ বেহিসাবী বাড়াবার ফলেই আদিম জীবাণুর দেহের নানাপ্রকার অদল-বদল হয়ে শেষ পর্যন্ত উদ্ভিদের জন্ম হয়। অপর একটি শাখা ক্লোরোফিলবিহীন হয়ে পরভোজী হয়ে উঠলো। তারাই ক্রমে জীবজগতের সৃষ্টি করলো।

আদিম যুগে উদ্ভিদের মধ্যে কোন লিঙ্গভেদ ছিল না। বংশবৃদ্ধির সহজ, সরল ও প্রাচীনতম প্রক্রিয়া—কোষ-বিভাজনই আদিম উদ্ভিদ-জগতের একমাত্র অবলম্বন ছিল। এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন কোষগুলির দৈহিক পার্থক্য মোটেই ছিল না। কোষ-বিভাজন দ্বারা উদ্ভূত কোষগুলি পৃথক পৃথকভাবে অথবা দলবদ্ধ অবস্থায় থাকতো। দলবদ্ধ অবস্থায় এরা বিভিন্ন কলোনী, রেখা ইত্যাদি অবস্থায় দেখা দেয়। বিভিন্ন ধরণের দলবদ্ধ অবস্থা আজও বিভিন্ন শ্রেণীর শ্যাওলাতে দেখতে পাওয়া যায়। আদিম উদ্ভিদের বিভিন্ন ঔপনিবেশিক অবস্থা থেকেই শ্যাওলার জন্ম হয়। শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদ থেকেই বর্তমান কালের উচ্চশ্রেণীর গাছপালার সৃষ্টি হয়েছে।

যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর জল, স্থল এবং আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়। সাগরের আয়তন কমে' ক্রমে স্থলভাগের আয়তন বাড়তে থাকে। সাগরের জল কমতে থাকায় কিছু উদ্ভিদ সাগরের ঢেউয়ের সঙ্গে স্থলভাগে এসে সেখানকার মাটিতে আট্‌কে যায়। সাগরের জলরাশির দ্বারা তারা মাঝে মাঝে প্লাবিত হতো, আবার জল নেমে গেলে শুকনো ডাঙ্গায় পড়ে থাকতো। এভাবে তাদের উভচর স্বভাব গড়ে ওঠে। মস্‌ জাতীয় উদ্ভিদ এই উভচর উদ্ভিদের নিদর্শন।

স্থলভাগে আসবার ফলে সূর্যের তাপের প্রভাবে উদ্ভিদদেহের ক্লোরোফিলের পরিমাণ বেড়ে ওঠে। এই সঙ্গে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণও বেড়ে যায়। ক্রমে অন্যান্য পারবর্তন দেখা দেয়। প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজকে খাপ খাওয়াবার জন্যে শরীরের চারদিকে শক্ত ত্বকের সৃষ্টি হয়। সমুদ্রের জল যাতে উভচর উদ্ভিদকে স্থানচ্যুত করতে না পারে, সে উদ্দেশ্যে শরীরকে মাটিতে সংবদ্ধ রাখবার জন্যে শিকড়ের সৃষ্টি হয়। উভচর উদ্ভিদ থেকেই স্থলজ উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ ঘটে।

জলজ উদ্ভিদ থেকে স্থলজ উদ্ভিদের সৃষ্টি পর্যন্ত উদ্বর্তনের ধারা, উদ্ভিদের শরীর-সংস্থান ও বংশ-বিস্তার প্রভৃতি পদ্ধতিকে বিভিন্ন খাতে চলতে দেখা যায়। উভচর উদ্ভিদ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বংশ-বিস্তার প্রক্রিয়ারও অনেক পরিবর্তন হয়। যৌন-প্রক্রিয়া অযৌন বংশবৃদ্ধির স্থান দখল করে। আবার যৌন-প্রক্রিয়ার প্রথম দিকে কিন্তু যৌনাঙ্গের কোন বালাই ছিল না। সাধারণ অঙ্গজ কোষেই জননকোষ তৈরী হতো। সমজননকোষী জনন-কোষসমূহের আকৃতি ও প্রকৃতি একই রকম ছিল। এরা যে বিপরীত যৌনধর্মী তা জননকোষসমূহের যুগ্ম মিলন থেকেই বুঝা যেত। স্পাইরোগাইরা প্রভৃতিতে দেখা যায়, দুটি রেখা একত্রিত হওয়ার পর একটির জৈবপঙ্ক অন্যটির জৈবপঙ্কের সঙ্গে সংযোজিত হয়। অথচ এই জাতীয় যৌনমিলন নিম্নশ্রেণীর শ্যাওলাতেই দেখা যায়। স্থলচর অবস্থায় ক্রমশঃ এই প্রথার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ক্রমে পুং-জননকোষ ও স্ত্রী-জননকোষ উৎপাদনকারী পুং-জননকোষাধার ও স্ত্রী-জননকোষাধার দেখা দেয়।

ব্রাইওফাইটা ও টেরিডোফাইটার যৌনাঙ্গ-সমূহ বহুকোষী এবং একস্তর অনুর্বর কোষের বহিরাবরণ দ্বারা আবৃত। এই বহিরাবরণ জননকোষ-গুলিকে শুকিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। স্থলচর স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গে যৌনাঙ্গসমূহ বাতাসে খোলা থাকবার ফলেই এই বহিরাবরণের উদ্ভব হয়েছে। প্রথম অবস্থায় পুংধানী ও ডিম্বাণুস্থলী দেখতে একই রকমের, অর্থাৎ এক স্তর অনুর্বর কোষ-প্রাচীর দ্বারা আবৃত কতকগুলি উর্বর কোষের সমষ্টি মাত্র ছিল। ডিম্বাণুস্থলীর বর্তমান অবস্থায় আসতে প্রথমে তার একটি সার ছাড়া অন্য কোষ-গুলি অনুর্বর হয়েছে ; পরে এই উর্বর কোষের সারের সর্বনিম্ন কোষ পরিণত হয়েছে ডিম্বকোষে। আর উপরের কোষগুলি পরিণত হয়েছে গ্রীবানালী কোষে। গর্ভাধানের পর ডিম্বাণুস্থলীর অক্ষ স্ফীত হয়ে ভ্রূণকে রক্ষা করে এবং খাদ্য চলাচলে সাহায্য করে।

শ্যাওলা, ব্রাইওফাইটা প্রভৃতির ক্ষেত্রে লিঙ্গধর উদ্ভিদেরই প্রাধান্য দেখা যায়। ব্রাইওফাইটাতেও দেখা যায়, রেণুধর উদ্ভিদ লিঙ্গধর উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। ব্রাইওফাইটার পরবর্তী স্তরে লিঙ্গধর উদ্ভিদের প্রাধান্য কমতে থাকে এবং রেণুধর উদ্ভিদের প্রাধান্য বাড়তে থাকে। টেরিডোফাইটাতে আমরা রেণুধর উদ্ভিদ দেখতে পাই। এখানে লিঙ্গধর উদ্ভিদ খুব ছোট এবং স্বল্পজীবী। যৌনমিলনের জন্যে এখানে জলের প্রয়োজন হওয়ায় যৌন-জন্ম সংক্ষেপিত হয়েছে।

লিঙ্গধর উদ্ভিদ থেকে প্রথম যুগে একই প্রকার রেণু উৎপন্ন হতো। উদ্বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রেণুধর উদ্ভিদ সমরেণুপ্রসূ থেকে অসমরেণুপ্রসূ হয়। টেরি-ডোফাইটার ফার্ন, লাইকোপডিয়াম, ইকুইজিটাম

প্রভৃতি সমরেণুপ্রসূ, কিন্তু সেলাজিনেলা অসমরেণু-প্রসূ। ক্রমে লিঙ্গধর উদ্ভিদের প্রাধান্য হ্রাস পেয়ে তা রেণুধর উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

এই সময়ের মধ্যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে উদ্ভিদের অঙ্গ-সংস্থানেও অনেক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। স্থলভাগকে নিজেদের বাসস্থান ঠিক করে নেবার পর খাদ্য-তৈরী প্রভৃতি কাজের জন্যে জল-পরিবহননালী জাইলেম এবং তৈরী খাদ্য-পরিবহননালী ফ্লোয়েম ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। পত্র সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। পাতার সাহায্যে উদ্ভিদ সহজেই নিজ প্রয়োজনের উপযোগী শ্বেতসার ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্য তৈরী আরম্ভ করে। এ ছাড়া পাতার সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজও হতে থাকে।

এই তো গেল স্বাবলম্বী উদ্ভিদের কথা। পরজীবী ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুটি মতবাদ বিদ্যমান। এক মতে, এরা শ্যাওলা থেকে উৎপন্ন হয়েছে; অন্য মতে, প্রোটোজোয়া এদের পূর্বপুরুষ। শ্যাওলা থেকে উদ্ভবের মত সমর্থনকারীদের মতানুসারে সবুজ শ্যাওলা ক্লোরোফিল সরিয়ে ফাইকোমাইসিটির জন্ম দিয়েছে। কিন্তু এদের বিপাক ক্রিয়া, সিলিয়া প্রভৃতির বিষয় বিবেচনায় এক সিলিয়াযুক্ত প্রোটোজোয়ার সঙ্গেই এদের বেশী মিল দেখা যায়। কিন্তু তাহলেও ঈষ্টবর্গীয় ছত্রাকের উৎপত্তির বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। এদের যৌনাঙ্গের সঙ্গে লোহিত শ্যাওলার যৌনাঙ্গের মিল রয়েছে। এজন্যে অনেকে মনে করেন, ঈষ্টবর্গীয় ছত্রাক লোহিত শ্যাওলা থেকেই উৎপন্ন হয়েছে।

এদের পূর্বপুরুষ যেই হোক না কেন, এদের উদ্ভবকাল যে অতি প্রাচীন তাতে সন্দেহ নেই। ডেভোনিয়ান যুগে ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদে পরাশ্রয়ী হিসাবে কিছু ফাইকোমাইসিটি জাতীয় ছত্রাক পাওয়া গেছে। ক্রাইট্রিডস্‌ই সব চেয়ে প্রাচীনতম ছত্রাক। এই শ্রেণীর ছত্রাক থেকেই বিবর্তনের ধাপে অন্যান্য ছত্রাকের জন্ম হয়। সেই প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত ছত্রাকেরা পৃথিবীতে বিরাজ করছে।

ক্রমবিকাশের বিভিন্ন ধাপে মস্‌, ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদের জন্ম হয়। মস্‌ জাতীয় উদ্ভিদে কোন শিকড় ছিল না। তারা রাইজয়েড দ্বারা নিজেদের মাটিতে সংবদ্ধ রাখতো। ব্রাইওফাইটার এন্‌থোসেরসের রেণুধর উদ্ভিদ থেকেই টেরিডোফাইটার সাইলোফাইটেসিস জাতীয় গাছের উৎপত্তি হয়েছে। আবার কারো কারো মতে, এনথোসেরস রেণুধর উদ্ভিদ থেকে লাইকোপডিয়াম জাতীয় উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়েছে। সাইলোটামজাতীয় উদ্ভিদের পাতা নেই কিন্তু লাইকোপডিয়াম ও ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদের পাতা আছে। মাটি থেকে রস সংগ্রহের জন্যে এবং গাছকে মাটির সঙ্গে আঁকড়ে রাখবার জন্যে ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদে শিকড়ের সৃষ্টি হয়। ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদের পাতা খাদ্য তৈরী ছাড়া বংশবিস্তারের জন্যে রেণু উৎপাদনের কাজও করে।

এতক্ষণ আমরা পুরাজীবীয় যুগের উদ্ভিদের কথা বলেছি। এর আরম্ভ হয় ক্যাম্‌ব্রিয়ান যুগে। এই যুগেই সামুদ্রিক শ্যাওলা এবং খুব সম্ভব কিছু সংখ্যক টেরিডোফাইটার আবির্ভাব হয়। এর পরবর্তী অর্ডোভিসিয়ান যুগে সামুদ্রিক শ্যাওলা প্রাধান্য লাভ করে। ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদের সংখ্যাও অনেক বাড়তে থাকে। তখনকার ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ আজকালকার ফার্ণের মত অত ছোট ছিল না। সে যুগে এরা (লাইকোপড এবং হর্সটেইল, টেরিডোস্পার্ম) বিশাল অরণ্য রচনা করেছিল। সে যুগের অরণ্য আধুনিক যুগের অরণ্যের চেয়ে কোন অংশে হীন ছিল না। কিন্তু অতিকায় হলেও বংশবিস্তারের ব্যবস্থায় আধুনিক ফার্ণের সঙ্গে মিল ছিল। এরা আধুনিক ফার্ণের মত অপুষ্পক উদ্ভিদ শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল। সে যুগের সীড্‌ফার্ণ বা টেরিডোস্পার্ম থেকেই

পরবর্তী কালে সপুষ্পক শ্রেণীর উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়। সপুষ্পক উদ্ভিদ নগ্নবীজ ও আবৃতবীজ—এই দু-ভাগে বিভক্ত। খুব সম্ভব অর্ডোভিসিয়ান যুগেই নগ্নবীজ উদ্ভিদের জন্ম হয়। এই জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে পাইন, সেড্রাস, ফার, অরোকেরিয়া, থুজা, সাইকাস, নিটাম প্রভৃতি প্রধান।

এরপর আসে সিলুরিয়ান যুগ। এই যুগে পৃথিবীর জলবায়ু প্রায় গরম ছিল এবং অনেক স্থান শুষ্ক ছিল। এর ব্যাপ্তিকাল ৩৪ কোটি বছর। এই যুগে নগ্নবীজ ও ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদের বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য।

ক্রমে আসে ডিভোনিয়ান, কার্বনিফেরাস ও পার্মিয়ান যুগ। এই সময়ে উদ্ভিদ-জগতে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদের বৃদ্ধি সম্পূর্ণতা লাভ করে এবং এই যুগের শেষের দিকে এরা ক্রমে নিশ্চিহ্ন হতে আরম্ভ করে। নগ্নবীজ উদ্ভিদ এই সময় প্রাধান্য লাভ করে। যুগ পরিবর্তনে উদ্ভিদ-জগতে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক অনেক পরিবর্তন হয়। বংশবিস্তার প্রণালীও সেই সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। যৌন-প্রক্রিয়ার জন্যে জলের উপর নির্ভর-শীলতা হ্রাস পায়, ফলে যৌন-জনু সংক্ষিপ্ত হয়। রেণুধর উদ্ভিদের প্রাধান্য বাড়ে। ক্রমে আরও অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গর্ভাধান প্রক্রিয়া ও ভ্রূণের উৎপত্তি হয়।

পুরাজীবীয় যুগের পর আসে মধ্যজীবীয় যুগ। মধ্যজীবীয় যুগের ট্রিয়াসিক যুগে পৃথিবীর জলবায়ু অর্ধশুষ্ক ছিল। ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদের সংখ্যা হ্রাস পেলেও এরাই অরণ্যের প্রধান উদ্ভিদ ছিল। এই সময়ে উদ্ভিদ-জগতে আরও একটা পরিবর্তন দেখা যায়। এই সময়েই ভ্রূণে সর্বপ্রথম বীজদল দেখা দেয়।

ট্রিয়াসিক যুগের পর আসে জুরাসিক যুগ। এ যুগের বয়স ১৪ কোটি বছর। এই সময় মেরু প্রদেশ শীতল ছিল। এই যুগেই দ্বিদল-বীজ উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়।

এর পর আসে ক্রেটাশিয়াস যুগ (১১ কোটি বছর)। এর প্রথম ভাগে পৃথিবীর জলবায়ু অরণ্য রচনার অনুকূল ছিল। কিন্তু পৃথিবীর আভ্যন্তরিক কারণে অনেক গাছপালা এই সময়ে ধ্বংস হয়। তবে এই যুগেই তাল, তৃণ ইত্যাদি একদল-বীজ উদ্ভিদের আবির্ভাব হয়। বর্তমান কালে যে অরণ্য আমরা দেখতে পাই, তার সূচনা হয় এই সময়ে। এই যুগের শেষ ভাগে ঘন ঘন পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বর্তমান যুগের অরণ্য বৃদ্ধি ছাড়া এই সময়ে অন্য কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নি। এই যুগেই নগ্নবীজ উদ্ভিদ থেকে কয়লার উদ্ভব হয়।

মধ্যজীবীয় যুগের পরে আসে নব্যজীবীয় যুগ। এই যুগে তৃণজাতীয় উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও সপুষ্পক উদ্ভিদের স্বাভাবিক ক্রমোন্নতি ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয় নি।

নব্যজীবীয় যুগের শেষ ভাগ প্লিস্টোসিন যুগে (৫০ লক্ষ বছর) বনলতা প্রভৃতি কোমল উদ্ভিদের বৃদ্ধি পায়, জলবায়ু ও মাটির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যেরও পরিবর্তন ঘটে। দশ-বারো কোটি বছর আগে যে অরণ্য ছিল এবং তাতে যে গাছপালা ছিল, আজ সে অরণ্যও নেই আর গাছপালাও নেই। আবার বর্তমান কালের গাছপালাও পৃথিবীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হবে এবং ভবিষ্যতে এরা না-ও থাকতে পারে।

আধুনিক যুগ একদল, দ্বিদল-বীজ উদ্ভিদের যুগ। এক সময়ে ফার্ণ ও অপুষ্পক উদ্ভিদেরা এ পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে। বর্তমানে আমরা তাদের ক্ষীণকায়, দুর্বল অল্পসংখ্যক বংশধরকেই দেখতে পাই। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, গাছপালার পরিবর্তনের একটা সূত্র রয়েছে। আদিম যুগ ছিল বিশালকায় মহীরুহের যুগ। ক্রমে সেসব মহীরুহ ধ্বংস হয়ে যে লতাপল্লবের যুগ এসে পড়েছে। কে জানে কালে হয়তো এসব লতাপল্লব ধ্বংস

হয়ে কোন নতুন ধরণের উদ্ভিদ পৃথিবীতে রাজত্ব করবে।

নীচে পৃথিবীর সাম্প্রতিক তিনটি যুগ এবং তাদের উপযুগ, বয়স ও বিভিন্ন যুগের প্রধান প্রধান উদ্ভিদের বিবরণ একটা ছক করে দেওয়া হলো:—

যুগ	উপযুগ	বয়স	প্রধান উদ্ভিদ
	প্লিস্টোসিন	৫০ লক্ষ	বর্তমান যুগের গাছ বা লতা ও কোমল গাছের প্রাধান্য
	প্লিওসিন	১½ কোটি	সপুষ্পক উদ্ভিদ
নব্যজীবীয়	মাইওসিন	৩ কোটি	তৃণজাতীয় উদ্ভিদের বৃদ্ধি
	অলিগোসিন	৪ কোটি	সপুষ্পক উদ্ভিদ
	ইয়োসিন	৭ কোটি	সপুষ্পক আবৃতবীজ উদ্ভিদ
	ক্রেটাশিয়াস	১১ কোটি	বর্তমান যুগের অরণ্য বৃদ্ধি, তাল ও তৃণের আবির্ভাব
মধ্যজীবীয়	জুরাসিক	১৪ কোটি	দ্বিদলবীজ ও ইকুইজিটাম জাতীয় উদ্ভিদের বৃদ্ধি
	ট্রিয়াসিক	১৯ কোটি	ফুলহীন উদ্ভিদের হ্রাস লেপিডোডেনড্রন, সিজিলেরিয়া প্রভৃতির পূর্ণ বিকাশ ও হ্রাস
	পার্মিয়ান	২২ কোটি	জাইগেনোপ্‌টেরিস ও সিকোমপটেরিস জাতীয় উদ্ভিদের আবির্ভাব
	কার্বনিফেরাস	২৮ কোটি	স্পেনোফাইলাম, ফেলামাইটিস লেপিডোডেনড্রন জাতীয় উদ্ভিদের পূর্ণ বিকাশ ও হ্রাস আরম্ভ, নগ্নবীজ উদ্ভিদের পূর্ণ বিকাশ
পুরাজীবীয়	ডেভোনিয়ান	৩২ কোটি	নগ্ন বীজ ও ফার্ণের বৃদ্ধি, সাইলোফাইটা জাতীয় উদ্ভিদের পূর্ণ বিকাশ ও হ্রাস
	সিলুরিয়ান	৩৪ কোটি	নগ্ন বীজ ও ফার্ণের বৃদ্ধি সাইলোফাইট জাতীয় উদ্ভিদের পূর্ণ বিকাশ
	অর্ডোভিসিয়ান	৩৯ কোটি	সাইলোফাইটের বৃদ্ধি ও সামুদ্রিক শ্যাওলার প্রাধান্য
	ক্যাম্ব্রিয়ান	৫০ কোটি	সামুদ্রিক শ্যাওলার প্রাধান্য, সাইনোফাইটের উৎপত্তি

তেজস্ক্রিয়তা

শ্রীশঙ্করনাথ সোম

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে এক্স-রে আবিষ্কারের পর পদার্থ-বিজ্ঞানীদের কাছে গবেষণার এক নতুন পথ উন্মোচিত হলো। অচেনা ও অদেখা রশ্মির অদ্ভুত প্রকৃতি বৈজ্ঞানিকদের কৌতূহলী করে তুললো, আর তাই থেকে নতুন নতুন রশ্মির আবিষ্কার সুরু হলো। সে এক চমকপ্রদ কাহিনী। এক্স-রে আবিষ্কারের পর বৈজ্ঞানিকেরা ভেবেছিলেন যে, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি ধাতুগুলি দিবাভাগে সূর্যকিরণ থেকে ফ্লোরেসেন্স এবং ফস্‌ফোরেসেন্সের গুণ অর্জন করে, কিন্তু বেকারেল দেখতে পেলেন যে, ইউরেনিয়ামের যৌগিক পদার্থগুলিকে সূর্যালোকে না রাখলেও ঐ যোগ্যতার অধিকারী হয়। এই আবিষ্কারের ফলে পদার্থ-বিজ্ঞানে আর একটি নতুন তথ্যের সংযোজন ঘটে। বেকারেল ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, ইউরেনিয়াম বা ইউরেনিয়াম ঘটিত পদার্থগুলি অনবরত এক ধরণের রশ্মি বিকিরণ করে চলেছে এবং এই রশ্মি এক্স-রে থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি আরও বললেন যে, এই বিকিরণ তাপমাত্রা অথবা রাসায়নিক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে না। পদার্থসমূহের এই নিরবচ্ছিন্ন বিকিরণ তেজস্ক্রিয়তা বলে আখ্যাত হয়েছে। কোন পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা দ্বারা আমরা বুঝি যে, সেই পদার্থগুলি অনবরত একপ্রকার রশ্মি বিকিরণ করে চলেছে। এই রশ্মিগুলি ফটোগ্রাফের প্লেটের গায়ে ছাপ রেখে যায়। আলোকের কাছে যেসব পদার্থ অনচ্ছ, এই রশ্মিগুলি তাদের মধ্যে অনেককে অতিক্রম করে যেতে পারে এবং গ্যাসীয় পদার্থকে তড়িতান্বিত করে। এই বিকিরণের ফলে কিন্তু পদার্থটির নিজের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এটা তো স্বাভাবিক! যে কোন কিছুর বিকিরণের ফলে নিশ্চয়ই শক্তির ক্ষয় হয় এবং এই শক্তিক্ষয়ের জন্যেই পদার্থের পরিবর্তন ঘটে।

প্রশ্ন ওঠে—বিশেষ বিশেষ কতকগুলি পদার্থ এমনি করে আপনাআপনি ক্ষয়িত হচ্ছে কেন? এর পিছনে রয়েছে অনেক বিস্ময়কর রহস্য।

পদার্থ হলো কতকগুলি বিশেষ অণুর শ্রেণীবদ্ধ সমষ্টি। এই অণুগুলি আবার কতকগুলি পরমাণুর সমবায়ে গঠিত। প্রত্যেকটি পরমাণুর গঠন-কৌশল অতি বিচিত্র। প্রত্যেকটি পরমাণুর মধ্যে আছে নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীয় বস্তু। নিউক্লিয়াসের ওজন পরমাণুর ওজনের প্রায় সমান। নিউক্লিয়াস ধন তড়িতাবিষ্ট এবং এর চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঋণ তড়িতাবিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা। এদের বলা হয় ইলেকট্রন। পরমাণুগুলি কিন্তু বৈদ্যুতিক হিসাবে নিরপেক্ষ। এথেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, পরমাণুর মোট ধন তড়িতাবেশ এবং ঋণ তড়িতাবেশ পরস্পর সমান। এই ঋণ তড়িতাবিষ্ট ইলেকট্রনগুলি নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে বিভিন্ন কক্ষে ঘুরে বেড়ায়। কোন্ কক্ষে ক'টি করে ইলেকট্রন থাকবে তাও বৈজ্ঞানিকেরা খুঁজে বের করেছেন। পরমাণুর এসব আভ্যন্তরীণ গঠন-রহস্য কিন্তু অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখা সম্ভব নয়। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরোক্ষ প্রমাণের সাহায্যে এসব রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে।

এই থেকে এইটুকু বুঝতে পারা যায় যে, পরমাণু যত বড় হবে, সর্বশেষ বৃত্তের ইলেকট্রনগুলির উপর নিউক্লিয়াসের আকর্ষণও তত কমে আসবে। কাজেই অল্পায়াসে এই ইলেকট্রনগুলি আপন কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। আবার বৃহৎ পরমাণুগুলির

নিউক্লিয়াসও বৃহত্তর পরিধির জন্যে নিজের মধ্যে স্থায়ী সাম্যবস্থা বজায় রাখতে পারে না। বৃহত্তর পরমাণুর ইলেকট্রন এবং নিউক্লিয়াসের মধ্যে এই অসাম্য অবস্থার ফলেই এই ধরণের রশ্মির বিকিরণ ঘটে। বিকিরণের ফলেই পদার্থের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। পরিশেষে একটা সাম্যভাব ফিরে আসে এবং বিকিরণশক্তি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু এই পরিবর্তন, পদার্থগুলির গুণগত পরিবর্তন এনে দেয়, যার ফলে তেজস্ক্রিয় রেডিয়াম বহু সহস্র বছর ধরে বিকিরণের ফলে সাধারণ সীসাতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি আল্‌ফা, বিটা ও গামা নামক তিন প্রকারের তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ করে।

আল্‌ফা রশ্মি হচ্ছে ধন বিদ্যুৎ-কণার সমষ্টি। প্রতিটি কণা দুটি ইলেকট্রনবর্জিত হিলিয়াম পরমাণুর সঙ্গে তুলনীয়। হিলিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসে দুটি বিদ্যুৎ-কণা আছে। পরমাণুর সাধারণ অবস্থায় বিদ্যুৎ নিরপেক্ষতা হেতু হিলিয়াম পরমাণুতেও দুটি ইলেকট্রন থাকবে। দুটি ইলেকট্রনকে যদি হিলিয়াম পরমাণু থেকে বের করে দেওয়া যায় তাহলে হিলিয়াম পরমাণু বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষতা হারিয়ে ফেলবে। যার ফলে সে হয়ে পড়বে ধন তড়িতাবিষ্ট এবং তার ধন তড়িতাবেশ দুই সংখ্যক পর্যন্ত হবে। এই আল্‌ফা কণাগুলি কিন্তু ধীরগতিতে আসছে না, এদের গতি প্রচণ্ড। শুধু আল্‌ফা কণা নয়, তেজস্ক্রিয় রশ্মির আল্‌ফা, বিটা ও গামা—এরা সবাই যেন পাল্লা দিয়ে ছুটছে কে কার আগে যাবে। সব চেয়ে দ্রুতগামী বলতে সাধারণতঃ সূর্য-রশ্মিকে বোঝায়। সূর্য-রশ্মির বেগ হচ্ছে সেকেণ্ডে প্রায় এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। এই আল্‌ফা রশ্মির বেগ হচ্ছে সূর্যরশ্মির $\frac{১}{১৮}$-তম অংশ। আল্‌ফা কণার বিভিন্ন ধাতুর পাত ভেদ করে যাবার ক্ষমতা বেশী নয়। দেখা গেছে—খুব বেশী হলে আল্‌ফা কণা সোনা, অ্যালুমিনিয়াম, অভ্র এবং কাচের পাতের ভিতর দিয়ে যেতে পারে—এর বেশী নয়। সাধারণ অবস্থায় আল্‌ফা কণা বাতাসের ভিতর দিয়ে মাত্র সাত সেণ্টিমিটার পর্যন্ত যেতে পারে। আল্‌ফা কণার গমনপথের এই দূরত্ব কিন্তু একেবারে অপরিবর্তনীয় নয়; এর ব্যতিক্রম আছে। বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে উৎপন্ন এই কণিকার গমনপথের দূরত্ব বিভিন্ন হয়ে থাকে। চৌম্বক বা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে আল্‌ফা কণার গতিপথ সামান্য বেঁকে যায়।

বিটা রশ্মির কিন্তু ইলেকট্রনের সঙ্গে হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এর গতিবেগ সূর্যরশ্মির গতিবেগের ২/৫ থেকে ৯/১০ ভাগ পর্যন্ত হয়ে থাকে। বিটা রশ্মির ভেদকারী ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী এবং গতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভেদকারী ক্ষমতাও বেড়ে যায়। আল্‌ফা কণার তুলনায় ওদের ভেদ করবার ক্ষমতা প্রায় একশ' গুণ বেশী। কিন্তু তড়িতান্বিত করবার ক্ষমতা কম। বৈদ্যুতিক বা চৌম্বক ক্ষেত্রে আপন গতিপথ বেঁকে যায়।

গামা রশ্মি হচ্ছে তড়িদ্ধর্ম নিরপেক্ষ। তুলনা করতে শুধুমাত্র এক্স-রে'র কথা মনে আসে। কিন্তু এক্স-রে অপেক্ষা ওদের শক্তির পরিমাণ বেশী। গামা রশ্মির ভেদকারী ক্ষমতা বিটা রশ্মির প্রায় একশ' গুণ। বৈদ্যুতিক বা চৌম্বক ক্ষেত্র এদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। আপন গতিপথে এরা দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে চলে।

পূর্বাপর বিশ্লেষণ করে এইটুকু বোঝা গেল যে, একটি বিটা রশ্মি বিচ্ছুরণের ফলে পদার্থের ঋণ তড়িৎ এক সংখ্যক কমবে, অর্থাৎ ধন তড়িৎ এক সংখ্যক বাড়বে। কিন্তু একটি আল্‌ফা কণা বহিষ্কারের ফলে এর কেবল দুই সংখ্যক ধন তড়িৎই কমবে না, আরও কিছু হবে। ওর ওজনের দিকে পড়বে ঘাটতি। একটি আল্‌ফা কণার সঙ্গে হিলিয়ামের পরিমাণগত কোন পার্থক্য নেই। শুধু আল্‌ফা কণা দুই সংখ্যক ধন তড়িদ্ধর্মী। অতএব

আল্‌ফা কণা বিচ্ছুরণের ফলে পদার্থের পারমাণবিক ওজনও দুই সংখ্যক কমবে।

আল্‌ফা এবং বিটা রশ্মির এই স্বাভাবিক পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে বৈজ্ঞানিকেরা পদার্থের ধারাবাহিক পরিবর্তন লক্ষ্য করবার প্রয়াস পান। যার ফলে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সডি, রাসেল প্রমুখ বিজ্ঞানীরা তেজস্ক্রিয়তার পরিবর্তনের নিয়ম আবিষ্কার করেন। তাঁরা বলেন যে, যখন কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে একটি আল্‌ফা কণার বিচ্ছুরণ হয়, পর্যায়বৃত্ত তালিকায় সেই মৌলিক পদার্থের স্থান বাঁ-দিকে দু-ঘর সরে যায় এবং একটি বিটা কণা বিচ্ছুরণের সঙ্গে সঙ্গে পদার্থের স্থান ডানদিকে একঘর এগিয়ে যায়।

নিম্নোক্ত তালিকা থেকে ইউরেনিয়ামের ধারাবাহিক পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করা সম্ভব হবে—

মৌলিকপদার্থ	প্রতীকচিহ্ন	পারমাণবিক ওজন	পারমাণবিক সংখ্যা	রশ্মি	অর্ধজীবন কাল
ইউরেনিয়াম-I	UI	২৩৮˙২	৯২	আল্‌ফা	৪.৫ × ১০৯ বছর
ইউরেনিয়াম-XI	UXI	(২৩৪)	৯০	বিটা	২৪½ দিন
ইউরেনিয়াম-XII	UXII	(২৩৪)	৯১	বিটা	১˙১৪ মিঃ
ইউরেনিয়াম-II	UII	(২৩৪)	৯২	আল্‌ফা	২˙৭ × ১০৫ বছর
আয়োনিয়াম	Io	(২৩০)	৯০	আল্‌ফা	৮˙৩ × ১০৪ বছর
রেডিয়াম	Ra	২২৬˙০৫	৮৮	আল্‌ফা	১৫৯০ বছর
রেডন	Rn	২২২	৮৬	আল্‌ফা	৩˙৮২ দিন
রেডিয়াম-এ	RaA	(২১৮)	৮৪	আল্‌ফা	৩˙০৫ মিঃ
রেডিয়াম-বি	RaB	(২১৪)	৮২	বিটা	২৬˙৮ মিঃ
রেডিয়াম-সি	RaC	(২১৪)	৮৩	বিটা এবং	১৯˙৭ মিঃ
৯৯˙৯৬% ০˙০৪%				আল্‌ফা	
রেডিয়াম-সি-	RaC′	(২১৪)	৮৪	আল্‌ফা	১˙৫ × ১০⁻⁴ সে
রেডিয়াম-সি =	RaC″	(২১০)	৮১	বিটা	১˙৩২ মিঃ
রেডিয়াম-ডি	RaD	(২১০)	৮২	বিটা	২২ বছর
রেডিয়াম-ঈ	Ra-E	(২১০)	৮৩	বিটা	৫ দিন
রেডিয়াম-এফ	Ra-F	(২১০)	৮৪	আল্‌ফা	১৪০ দিন
রেডিয়াম-জি	Ra-G	২০৬	৮২		

এই রেডিয়াম-জি হচ্ছে সাধারণ সীসা। এইভাবে সব রকম তেজস্ক্রিয় পদার্থ পরিশেষে সীসাতে পরিণত হয়। সেজন্যে তেজস্ক্রিয় পদার্থের মধ্যে সীসা পাওয়া যায়। তেজস্ক্রিয় পদার্থ সীসায় পরিণত হতে কত যুগ লেগেছে, তা যদি হিসাব করা যায়, তাহলে পদার্থের বয়স জানা যাবে এবং সেই সঙ্গে পৃথিবীর বয়সও জানতে পারা যাবে—অবশ্য আমরা যদি ধরে নিই যে, পৃথিবীর জন্মের সময় ইউরেনিয়াম প্রভৃতি ধাতুগুলি ছিল। সে ধারণা অনুযায়ী পৃথিবীর বয়স দাঁড়ায় ১˙৪৭ × ১০৯ বছর।

আরও একটা কথা। ইউরেনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর যাবতীয় পরমাণু একই সঙ্গে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ শুরু করে না। কেন পরমাণুগুলি একই সঙ্গে নিজেদের ক্ষয় করতে শুরু করে না, অর্থাৎ রশ্মির বিচ্ছুরণ ঘটে না, সেটা বৈজ্ঞানিকদের কাছে আজও সমস্যার বিষয়ই রয়ে গেছে।

ভাইরাস

শ্রীপ্রশান্তকুমার বসু

ভাইরাস আবিষ্কারের মূলে রয়েছে অজানাকে জানবার অদম্য আকাঙ্খা। জীববিজ্ঞানীরা যেদিন জল-স্থল মন্থন করে, নেতি নেতি বিচার করে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পৃথিবীর প্রথম প্রাণের সূচনা হয় জলে - প্রোটোপ্লাজম নামক একটা কার্বনঘটিত পদার্থে। এই প্রোটো-প্লাজমের একটা বিশেষ আকার নিয়ে দেখা দেয় অ্যামিবা নামক এককোষী জীব। এই এককোষী জীব প্রথম যখন মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় সেদিন কি আর কেউ ভাবতে পেরেছিল যে, জল-স্থল আকাশ-বাতাস জুড়ে আছে আরও সূক্ষ্মতর রোগ-জীবাণু তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে সমাজে, গোষ্ঠীতে, জীবনযাত্রার জটিলতা আর অভিনবত্ব নিয়ে ?

কৌতূহলী মানুষ তাদের জীবনযাত্রার বিশেষ ধারাটি জেনেছিল যন্ত্রের সাহায্যে। কিন্তু সে যুগে ভাইরাস ছিল মানুষের নাগালের বাইরে। ভাইরাস যে কত সূক্ষ্ম তা বলা কঠিন। সূক্ষ্ম জিনিষ দেখবার একমাত্র উপায় হচ্ছে অণুবীক্ষণ যন্ত্র। শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা বড় জোর দুই মাইক্রন, অর্থাৎ এক মিলিমিটারের হাজার ভাগের দুই ভাগ পর্যন্ত দেখতে পারি। কিন্তু এই মাইক্রনেরও হাজার ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ মিলিমাইক্রন হচ্ছে সাধারণ ভাইরাসের দেহাকৃতি। কাজেই শক্তিশালী আধুনিক অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও এই ভাইরাসকে দেখা সম্ভব নয়। আর এই ভাইরাসই হচ্ছে আজকালকার মারাত্মক ও সংক্রামক রোগগুলির অন্যতম কারণ। বসন্ত, জলাতঙ্ক, পক্ষাঘাত, হাম, চোখের বিভিন্ন রোগ, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। হয়তো আরও বহু অনাবিষ্কৃত রোগের মূলেই রয়েছে এই সব ভাইরাস।

ভাইরাস আবিষ্কারের পূর্বে এই সব রোগের কারণ সম্বন্ধে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা খুবই অসুবিধায় পড়েছিলেন। কারণ রোগ হলে জীবাণুর অস্তিত্ব থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্র এই ভাইরাসকে চোখের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয় নি। তারপর চললো অক্লান্ত চেষ্টা। মানুষের যন্ত্রণাকাতর মুখ বিজ্ঞানীদের রোগের কারণ নির্ণয়ের স্পৃহা আরও বাড়িয়ে তুললো।

বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর জলাতঙ্ক রোগের কারণ অনুসন্ধান করবার কালে প্রচার করলেন যে, তিনি কতকগুলি রোগ-জীবাণু নিয়ে পরীক্ষা করেছেন, কিন্তু জীবাণুগুলি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা না দেওয়ায় তিনি বিস্মিত হয়েছেন। ব্যাপারটা আর বেশীদূর এগোয় নি। এর পরে ইবনস্কি নামক বিখ্যাত উদ্ভিদবিদের গবেষণা থেকে ভাইরাস সম্বন্ধে আরও স্পষ্টতর সংবাদ জানতে পারা যায়। তিনি তামাক পাতার রোগ সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে দেখতে পান যে, কতক-গুলি অদৃশ্য জীবাণুকে সূক্ষ্ম ফিল্টারের মধ্যে ধরা যায়। এই ঘটনার পর ভাইরাস সম্বন্ধে ধারণা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং নতুন গবেষকেরা একটা সূত্রের সন্ধান পেয়ে বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

সেদিন থেকে সুরু হয় বিভিন্ন পরিমাপের সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট ফিল্টারের মধ্য দিয়ে রোগ-জীবাণু ছাঁকবার পদ্ধতি। এর ফলে দেখা গেল, কিছু জীবাণু ফিল্টারের উপরেই থেকে যায় আবার কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম ফিল্টারের ভিতর দিয়েও

চলে যায়। এই পর্যবেক্ষণের ফলে ভাইরাসের দেহের পরিমাপ জানবার খুব সুবিধা হয়। ফিল্টারের অদৃশ্য ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যে সব ভাইরাস গলে বেরিয়ে যায় তাদের ক্রমশঃ আরও সূক্ষ্মতর ছিদ্র-বিশিষ্ট ফিল্টারের মধ্য দিয়ে পাঠানো হলো। এর ফলে দেখা গেল—এই ভাইরাসগুলি সূক্ষ্মতর মাপের ছিদ্রযুক্ত ফিল্টারের ছিদ্র সহজে অতিক্রম করতে পারছে না; কিন্তু তার ঠিক আগের সাইজ, অর্থাৎ তার চেয়ে একটু বড় ছিদ্রের মধ্য দিয়ে চলে যাচ্ছে। এই ভাবেই বিভিন্ন আকারের ভাইরাসের আকৃতি নির্ণয় করা সম্ভব হলো।

এই ভাবে দেখা গেল যে, বসন্ত রোগের
ভাইরাসের আকৃতি—২৭৫ মিলিমাইক্রন
আর ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের
আকৃতি—১০০ ”
পক্ষাঘাত রোগের
ভাইরাসের আকৃতি—৮—১২ ”

এর পরের ধাপে বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে এল ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ—বর্তমান যন্ত্রযুগের একটি অভিনব বিস্ময়। শুধু নতুনত্ব এবং গঠনবৈচিত্র্যে নয়, এর পরিবর্ধন ক্ষমতা বিস্ময়কর। এর সাহায্যে কোন বস্তুকে লক্ষ গুণেরও বেশী বড় দেখায়। এই অভিনব যন্ত্রের সাহায্যে অনেক দিনের কঠিন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। এর সাহায্যে ভাইরাসের আকৃতি ও প্রকৃতি নির্ণয়ে বিজ্ঞানীরা উঠেপড়ে লেগে গেলেন। এর পরে দেখা গেল, বসন্ত রোগের ভাইরাস ইটের মত চৌকা, ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাস গোলাকার, আর তামাক পাতার রোগের ভাইরাস লম্বাটে ধরণের।

শুধু তাদের বহির্গঠনেই নয়, রাসায়নিক গঠনেও এই ভাইরাসগুলিও কম বিস্ময়কর নয়। কেউ কেউ বলেন, এরাও ব্যাক্‌টেরিয়া গোষ্ঠীভুক্ত, কেবল আকৃতিতে ক্ষুদ্র। আবার একদল বলেন, কতকগুলি প্রাণহীন প্রোটিনের সমন্বয়ে এই ভাইরাসের সৃষ্টি।

ভাইরাস যদি প্রাণহীন-ই হবে, তবে তাদের এত দাপট কি করে সম্ভব? তাছাড়া ব্যাক্টেরিয়ার মতই তাদের চাষ করা যেতে পারে। কিন্তু কালচার করতে হলে জীবন্ত জীবকোষ তাদের বংশবৃদ্ধির পক্ষে একান্তই প্রয়োজন। ডিমের ভিতরে এদের চাষ করা হয়। কিন্তু এক ধরণের ভাইরাস মৃত জীবকোষেও বংশবৃদ্ধি করে।

ডিমের ভিতর ভাইরাসের চাষ বা কালচার করা একটি মজার ব্যাপার। মুরগীর ডিমকে ১০।১২ দিন কৃত্রিম উপায়ে তা' দিয়ে নেওয়া হয়। তারপরে ডিমের বাইরের শক্ত খোলায় যন্ত্রের সাহায্যে একটি ছিদ্র করে তার ভিতর ভাইরাস ঢুকিয়ে দিয়ে ছিদ্রটি মোম দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই ভাবে প্রস্তুত ডিমকে ইউকিবেটরে ৩৭° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে ২।৩ দিন রাখা হয়। এর পর ডিম ভেঙ্গে ভাইরাসের পরীক্ষা চালানো হয়। ডিমের মধ্যে ভাইরাসের চাষে খুবই সুবিধা। তাই আজকাল এই পদ্ধতিই সর্বত্র গৃহীত হয়েছে।

ভাইরাস সম্বন্ধে গবেষণা অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে বটে, কিন্তু ভাইরাসের প্রকৃতির বিষয় অবগত হওয়া এখনও অনেক গবেষণাসাপেক্ষ। একদিকে প্রকৃতির এই সব আজব সৃষ্টি দিন দিন মানুষের বুদ্ধির কাছে এক একটি চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসে দেখা দিচ্ছে, আর মানুষ দুর্নিবার অধ্যবসায়ে এই চ্যালেঞ্জের উত্তর দেবার চেষ্টা করে চলেছে। এই অগ্রগতিই জীবন!

ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরী

শ্রীফণীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী

বহির্বিশ্বের জটিল সমস্যাগুলির ব্যাখ্যায় অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত আইনষ্টাইন যে মূল তত্ত্বটি উদ্ঘাটনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত যার একটা কিনারাও পেয়েছিলেন বলে মনে করেছিলেন, সেটা হলো ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরী। গণিতের সাহায্যে এই তত্ত্ব থেকে যে সিদ্ধান্তে আসা যায় তার ব্যবহারিক প্রমাণ যদিও আজ পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব হয় নি, তবুও আশা করা যায়, বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির পথে অদূর ভবিষ্যতেই এর যথাযথ প্রমাণ বা ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব হবে। প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনার ব্যাখ্যায় বৈজ্ঞানিকদের বিভিন্ন গবেষণার ফলে শেষ পর্যন্ত মৌলিক কারণ হিসাবে দুটি বিভিন্ন শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়েছে। একটি হলো বৈদ্যুতিক-চুম্বক শক্তি (Electromagnetic force) এবং অপরটি হলো মাধ্যাকর্ষণ শক্তি (Gravitational force)। প্রথম শক্তিটির কার্য-কারণ সম্বন্ধ এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যার জন্যে একদিকে যেমন রয়েছে প্ল্যাঙ্কের কোয়াণ্টাম থিয়োরী অপর দিকে রয়েছে তেমান আইষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব। এ দুটি তত্ত্ব যেন বিজ্ঞান জগতের দুটি সিংহ-দ্বার। আর এরা যেন খোলা রয়েছে দুটি বিপরীত বিজ্ঞান-রাজ্যের দিকে। একটি ক্ষুদ্রতম অণু-পরমাণুর রাজ্য, অপরটি হলো বৃহত্তম নক্ষত্রাদির রাজ্য। আইনষ্টাইনের দীর্ঘ ২৫ বছরের সাধনালব্ধ ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরী যেন এই দুটি বিভিন্ন সিংহদ্বারের উপরই সেতু রচনার প্রয়াস—অর্থাৎ কোয়াণ্টাম তত্ত্ব ও অপেক্ষিকতা তত্ত্ব আপাত-দৃষ্টিতে বিভিন্ন মনে হলেও এটি এই উভয় তত্ত্বের মূলীভূত এক সংযোজক তত্ত্বেরই প্রকাশ মাত্র।

নিউটনীয় গতিবিদ্যায় এমন কতকগুলি আইন বেঁধে দেওয়া আছে, যার সাহায্যে বস্তুর গতিধর্ম সম্পর্কে প্রায় সকল তথ্যই অতি নির্ভুলভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। অপরপক্ষে এই আইনগুলি যখন আলোর গতি, পরমাণুর গতি প্রভৃতি অতি বেগবান বস্তুর ব্যাপারে প্রয়োগ করা যায় তখন এদের অসম্পূর্ণতা এবং ব্যতিক্রম সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কোনও বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং তার ফলাফল নির্ণয়ের জন্যে যথোপযুক্ত যন্ত্রপাতি এবং নির্দিষ্ট কাঠামোর (Rigid Reference) দরকার। ধরে নেওয়া যাক, একই ধরণের যন্ত্রপাতি নিয়ে দুটি লোকের একজন যেন একটি রেলের প্ল্যাটফর্মে বসে আছে এবং আর একজন যেন একটি চলমান রেলগাড়ীর কামরায় বসে মহাশূন্যে কোনও একটি আলোর গতিবেগ নির্ণয় করছে। রেল-গাড়িটি যেন ওই আলোর গতির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে, অবশ্য আলোর গতির চেয়ে অনেক কম গতিতে। এখানে প্রথম লোকটির কাঠামো হচ্ছে রেলের প্ল্যাটফর্ম এবং দ্বিতীয় লোকটির কাঠামো হচ্ছে চলমান রেলগাড়ীর কামরা। এই দুই কাঠামোর ভিতর আপেক্ষিক গতি থাকা সত্ত্বেও কিন্তু যার যার নিজ কাঠামো তার তার কাছে স্থির বলেই মনে হবে এবং এটা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু নিউটনের আপেক্ষিক গতির ধর্মানুযায়ী তুলনামূলকভাবে এই দুটি লোকের পরীক্ষার ফলাফল বিচার করলে দেখা যায় যে, চলমান কামরায় নির্ণীত আলোর গতিবেগ প্ল্যাটফর্মে নির্ণীত আলোর গতিবেগের চেয়ে কম। আলোর গতিবেগের এই পার্থক্যের একমাত্র কারণ আমরা যা বুঝি সেটা হলো, প্ল্যাটফর্মের লোকটির

তুলনায় কামরার লোকটির আপেক্ষিক গতি বর্তমান। তাহলে দেখা যায়, দ্রষ্টার অবস্থানের উপর বা কাঠামো অনুযায়ী আলোর গতিবেগের মান নির্ভর করে। কিন্তু মাইকেলসন-মর্লির পরীক্ষা, বহুদূরে অবস্থিত তারকাদির গতিবেগ এবং ডপ্‌লার-এফেক্ট প্রভৃতি বিভিন্ন গবেষণার দ্বারা বৈজ্ঞানিকেরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, শূন্যস্থান দিয়ে আলো নিরবচ্ছিন্ন গতিতে সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগে চলে এবং দ্রষ্টার অবস্থান বা কাঠামোর আপেক্ষিক গতির জন্যে আলোর গতিবেগের কোনও ব্যতিক্রম হয় না। পরস্পর বিরোধী এই যুক্তিগুলির ব্যাখ্যার জন্যেই কিন্তু আইনষ্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিতা তত্ত্বের অবতারণা। তিনি বুঝেছিলেন যে, প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে যেমন অসামঞ্জস্য আশা করা যায় না তেমনি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলিও (যেমন এখানে আলোর গতি) কখনই দ্রষ্টার অবস্থান বা কাঠামোর গতিবেগের উপর নির্ভর করবে না। যুক্তির সাহায্যে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, আমাদের চিরাচরিত স্থান ও কালের নিরপেক্ষ অবস্থান এবং এদের বাস্তব সত্যতার ধারণা বা সংস্কারই এই অসামঞ্জস্যের মূল কারণ। স্থান ও কালের নিরপেক্ষ কোনও অবস্থান বা বাস্তব সত্যতা নেই। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বা দ্রষ্টার কাঠামোর আপেক্ষিক গতি অনুযায়ী এক কাঠামোর তুলনায় অন্য কাঠামোর স্থান ও কালের মাপও পরিবর্তিত হয়ে যায়। লোরেঞ্জ সূত্রের সাহায্যে আইনষ্টাইন দেখালেন যে, যদিও যার যার নিজ কাঠামোর স্থান ও কালের অস্তিত্ব এবং মাপ তার কাছে এক অপরিবর্তনীয় সত্য হিসেবেই প্রকাশ পায় তথাপি আপেক্ষিক গতির জন্যে এক কাঠামোর তুলনায় অন্য কাঠামোর স্থানের দৈর্ঘ্যের সঙ্কোচন এবং সময়ও মন্থর হয়ে যায়। আমাদের স্থান ও কাল পরিমাপের যন্ত্রপাতিগুলিও (Rigid rod & clock) কিন্তু আপেক্ষিক গতির তালে তালে গতির দিকে দৈর্ঘ্যে ছোট এবং সময়ের দিক থেকে মন্থর হয়ে যায়। অবশ্য এগুলির এই অদ্ভুত ব্যবহার এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের চোখে ধরা পড়ে নি। লোরেঞ্জ সূত্র অনুযায়ী আপেক্ষিক গতির স্থান ও কালের মাপের এই পরিবর্তন যদি কাঠামো অনুযায়ী হিসেব করে নিয়ে প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের বিশ্লেষণে নিয়োগ করা যায় তবেই প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি সর্বক্ষেত্রে এবং যে কোন পরিবেশে একই মানে প্রতিভাত হবে। এভাবে গড়ে উঠলো আইন-ষ্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব। এর মূল কথা হলো—সমগতিশীল (অপরিবর্তনীয় গতি) সব কাঠামোগুলিই প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণে সর্বক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য এবং প্রাকৃতিক ঘটনা বিশ্লেষণের জন্যে বিশেষ কোন কাঠামোর (specially favoured system) কখনই দরকার নেই। তবে কাঠামোগুলির আপেক্ষিক গতির দরুণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে পরিমাপ প্রণালীর পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে, তার মাপকাঠি হলো লোরেঞ্জের সূত্র।

কিন্তু এক কাঠামোর তুলনায় অন্য কাঠামোর গতি সমভাবাপন্ন না হয়ে যদি পরিবর্তনশীল হয় তখনও আইনষ্টাইন সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সাহায্য দেখালেন যে, এই কাঠামোগুলিও প্রাকৃতিক ঘটনা বিশ্লষণে সমভাবেই প্রযুক্ত হতে পারে। তবে গতি পরিবর্তনশীল। এই কাঠামোগুলির বেলায় তখন দেখা দেয় একটা মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র, যার ধর্মানু-যায়ী বস্তুর যে সব গতিপথ সমগতিশীল কাঠামোর তুলনায় সরলরৈখিক ছিল, সেগুলি এখন আর সোজা না থেকে বেঁকেই যায়। গণিতের সাহায্যে এই ক্ষেত্র সম্বন্ধে আইনষ্টাইন আলোচনা করেছেন এবং নিউটনের গতিবিদ্যায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে সব ঘটনার কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা ছিল না (যেমন বধুগ্রহের উৎকেন্দ্রিক গতি) তাদেরও একটা সহজ এবং পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাছাড়া সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে একথা বলা যেতে পারে যে, এই তত্ত্বের

সাহায্যে আইনষ্টাইন এমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, দূরে অবস্থিত নক্ষত্রের আলো যখন সূর্যের কাছ ঘেঁষে চলে যায়, অর্থাৎ সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের আওতায় এসে যায় তখন সেই আলোর গতিপথও বেঁকে যায়। শুধু তাই নয়, কতখানি বেঁকে যাবে —তাও তিনি হিসেব করে বের করেছিলেন। ১৯১৯ সালের ২৯শে মে'র সূর্যগ্রহণের দিন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন বিজ্ঞানী নক্ষত্রের আলোক-চিত্রের সাহায্যে তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে দিলেন।

এদিকে আর এক সমস্যা দেখা দিল, ঈথারের অস্তিত্ব নিয়ে। বিজ্ঞানীরা বস্তু ও তাদের গুণাগুণের সাহায্যে প্রাকৃতিক ঘটনা বিশ্লেষণ করে থাকেন। আলো ও তার সমধর্মী বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ-প্রবাহের জন্যে একটা মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যখন দেখা গেল, এই তরঙ্গগুলি শূন্যস্থান (অর্থাৎ বস্তুবিহীন স্থান) দিয়েও নিরবচ্ছিন্ন গতিতে চলে যেতে পারে তখন শূন্যস্থানে এই তরঙ্গ-প্রবাহের ব্যাখ্যার জন্যে বাধ্য হয়েই মাধ্যম হিসেবে বৈজ্ঞানিকদের স্থির ঈথারের অস্তিত্ব মেনে নিতে হয়েছে। অথচ এই ঈথারের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যে বহুরকম গবেষণার অবতারণা করেও কিন্তু এর অস্তিত্বের বিষয় প্রমাণ করতে পারা গেল না। এই গেল শতাব্দীর প্রথম দিককার অবস্থা। বৈজ্ঞানিকদের এই নিদারুণ সমস্যা থেকে উদ্ধার করবার জন্যে এগিয়ে এলেন আইনষ্টাইন। বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সাহায্যে তিনি দেখিয়ে দিলেন যে, আলো ও তার সমধর্মী তরঙ্গ-প্রবাহের ব্যাপারে স্থির ঈথারের অস্তিত্বের (বিশেষ কাঠামোর অনুমান এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের দ্বারা এর অস্তিত্বের প্রমাণাভাব—আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী হলেও আপেক্ষিক গতি অনুযায়ী কাঠামোর স্থান ও কালের পরিবর্তন এবং তদনুযায়ী মাপ প্রণালীর পরিবর্তন করে নিলেই পরস্পরের মধ্যে আর এই বিরোধ থাকে না।

নিউটনের গতিবিদ্যায় স্থান, কাল ও বস্তুর শুধু যথার্থ অস্তিত্বই স্বীকার করা হয় নাই—এরা এক অপরিবর্তনীয় সত্য হিসেবেই প্রকাশ পেয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুবিন্দুর বিভিন্নমুখী গতির জন্যে যে প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের অবতারণা হয়ে থাকে, স্থান ও কাল যেন এই ঘটনাবলীর মঞ্চাধাররূপেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেমন—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে যদি যাবতীয় বস্তু উধাও হয়ে যায়, তবে কি থাকবে? থাকবে চিরন্তন স্থান ও কাল। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর জন্যেই পড়ে থাকবে এই বিরাট স্থান ও কালের মঞ্চ। প্রথমতঃ স্থানের এই বাস্তবতা, বিশেষ করে শূন্যস্থানের অস্তিত্ব, গোড়া থেকেই দার্শনিকেরা মেনে নিতে নারাজ ছিলেন। কেন না, যার কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা নেই তার বাস্তবতা অনুমান করা যায় না। ফরাসী দার্শনিক ডেকার্টেও বলেছিলেন যে, কোন স্থানই শূন্য নয়, অর্থাৎ বস্তুবিহীন স্থান বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্ভব নয়। কিন্তু মনস্তত্ত্বের দিক থেকে অতি সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, আমাদের স্থান ও কালের ধারণার পিছনে রয়েছে বস্তু সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা। বস্তুবিন্দুগুলির পারস্পরিক সহঅবস্থানের গোটা ধারণার জন্যে সময়ের ধারণা করে নিতে হয়, যেন বস্তু সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করবার জন্যেই বস্তুকে আরও নিখুঁতভাবে, আরও সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি করা যায়। তাহলে দাঁড়ায়—বস্তুই যথেষ্ট নয়, বস্তুর অভিজ্ঞতার জন্যে চেতন মনেরও একান্ত দরকার। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, বৈজ্ঞানিক সব দৃষ্টিভঙ্গীই এই চেতন মনকে বাদ দিয়ে বস্তুর মাধ্যমে আলোচনা বা ব্যাখ্যা করে থাকে। পদার্থবিদ্‌গণ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় বস্তুর কম্পন অনুমান করে নিয়ে থাকেন, ডাক্তার বা মনস্তাত্ত্বিকেরাও তেমনি অন্যদিকে চেতন মানুষের সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা প্রভৃতি মনের আবেগকে স্নায়ুর কার্য বলে ব্যাখ্যা করে থাকেন। যেহেতু এ ধরণের ব্যাখ্যা চেতন মনকে বাদ দিয়েও বস্তু-

মাধ্যমে করা যেতে পারে, সেহেতু বৈজ্ঞানিকদের বস্তুমাধ্যমে এ ধরণের ব্যাখ্যার প্রচেষ্টাই বর্তমান জড়বাদ বা Materialism-এর মূলকথা। ইলেক্ট্রো-ডায়নামিক্সের ধর্মগুলির ব্যাখ্যায় দেখা গেছে যে, বস্তুমাধ্যমে ব্যাখ্যার চেয়ে ক্ষেত্রের মাধ্যমে এদের ব্যাখ্যা অনেক শক্তিশালী এবং বহুলাংশে উপযোগী। ক্ষেত্রের ধারণা (Classical Mechanics) ফ্যারাডে থেকে আরম্ভ করে বরাবরই চলে এসেছিল, কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর অস্তিত্ব শুধু বস্তুর মাধ্যমেই প্রকাশ পেয়েছে। ইলেক্ট্রো-ডয়ানামিক্সের ধর্মসমূহ বস্তুবিহীন শূন্য স্থানে দেখা দেয় বলে এবং এদের ব্যাখ্যা ক্ষেত্রতত্ত্বের ধারণার সাহায্যেই উপলব্ধি করা যায় বলে মৌলিক সত্তা হিসেবে এক ক্ষেত্রেরই অস্তিত্ব আইনষ্টাইন মেনে নিলেন এবং বুঝতে পারলেন যে, এতদিন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকদের বস্তুমাধ্যমে ব্যাখ্যাত অন্যান্য ঘটনা-গুলিকেও এই একই ক্ষেত্রতত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বস্তুকে বাদ দিয়ে বিশ্বের যাবতীয় ঘটনারাজির মূল হিসেবে এই ক্ষেত্রের ধারণা আইনষ্টাইনের আগে বিজ্ঞানে কোন স্থান পায় নি। স্থান ও সময় এই ক্ষেত্রেরই আকৃতিগত গুণ এবং কখনও চিরন্তন সত্য নয়—ক্ষেত্র অনুযায়ীই বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। গণিতের সাহায্যে আইনষ্টাইন এই ক্ষেত্রের ধর্ম বিভিন্ন পরিবেশে আলোচনা করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এই একই ক্ষেত্রের ধর্ম অবস্থা বা পরিবেশ অনুযায়ী কখনও বিদ্যুৎ-চৌম্বক শক্তি আবার কখনও বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হিসেবে প্রকাশ পায়—আবার বস্তু ও শক্তির বেলায়ও এই একই ক্ষেত্রের ধর্ম কখনও বস্তু কখনও বা শক্তি হিসেবে দেখা দেয়। যদিও মূলতত্ত্ব হিসেবে এরা সবাই অভিন্ন। আর এই ক্ষেত্রের ক্ষুদ্রতম ইলেকট্রন থেকে আরম্ভ করে বৃহত্তম নক্ষত্রাদি পর্যন্ত সব কিছুই বিভিন্ন অবস্থায় থেকে বিভিন্ন স্থানে এই ক্ষেত্রেরই আকৃতিগত গুণের যেমন অদল-বদল করছে, তেমনি এসব অদল-বদলের দরুণ এই ক্ষেত্রের ধর্মগুলিও কখনও বস্তু, কখনও শক্তি, কখনও বৈদ্যুতিক শক্তি, আবার কখনও বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হিসেবে প্রকাশ পায়। এভাবেই আপেক্ষিকতা তত্ত্ব থেকে আইনষ্টাইন চলে এলেন ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরী, অর্থাৎ একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বে। ফরাসী দার্শনিক ডেকার্টের মতে বলতে গেলে এই দাঁড়ায় যে, ক্ষেত্রবিহীন (বস্তুবিহীন নয়) কোন অস্তিত্বই সম্ভব নয়। বাস্তবতার দিক থেকে যদি এখন বলা যায় যে, এই ক্ষেত্রও যদি উধাও হয়ে যায়, তবে কি থাকবে—আইনষ্টাইন বললেন, কিছুই না। বাহ্যতঃ এই বিশ্বের এত জটিল সমস্যার যে এত সহজতম ব্যাখ্যা সম্ভব, এটাই হলো আইনষ্টাইনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রতিভার অপূর্ব নিদর্শন।

পরমাণুশক্তি চালিত—জাহাজের নক্সা, জাহাজের পিছনে হালের কাছে উঁচু জায়গায় পরমাণু-চুল্লীটিকে রাখা হবে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক ১৯৫৯ সালে পরমাণুশক্তি চালিত জাহাজটিকে প্রথম জলে ভাসান হবে, আশা করা হচ্ছে। ২১ হাজার টনের এই জাহাজটিকে চালাবার জন্যে ১৫০ জন নাবিকের প্রয়োজন হবে। জাহাজটি দৈর্ঘ্যে ৫৮৭ ফুট ও প্রস্থে ৭৮ ফুট এবং ঘণ্টায় কুড়ি নট বেগে চলবে।

রঙীন চমক

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু

কোন দ্রব্যের মসৃণ গাত্র হইতে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হইলে তাহা হইতে একপ্রকার ঔজ্জ্বল্য বা দীপ্তি দেখা যায় এবং যত বেশী রশ্মি প্রতিফলিত হয় দীপ্তিও ততই বাড়ে। অর্থাৎ যদি কিছু রশ্মি প্রতিফলিত না হইয়া ব্যাপীত হইয়া পড়ে তবে দ্রব্যটির ঔজ্জ্বল্য কমিয়া যায়। সব রশ্মিই ব্যাপীত হইয়া গেলে দ্রব্যটিকে অনুজ্জ্বল বা নিষ্প্রভ দেখা যাইবে। আবার যদি আলোক রশ্মির কোন অংশ শোষিত হইয়া অপর অংশগুলি প্রতিফলিত বা ব্যাপীত হয় তবে দ্রব্যটির গাত্র হইতে একটি রং দেখা যাইবে। আমরা যে বিভিন্ন দ্রব্যের উপর হইতে নানপ্রকারের রং দেখিতে পাই তাহার কারণ, বিভিন্ন দ্রব্য নিজ নিজ গুণানুসারে আলোকরশ্মির কিছুভাগ শোষণ করিয়া লয় এবং অবশিষ্ট ভাগগুলি দ্রব্যের গাত্র হইতে প্রতিফলিত, ব্যাপীত বা প্রতিসরিত হইয়া পড়ে। আলোকরশ্মি হইতে অল্প ভাগ শোষিত এবং বেশীর ভাগ প্রতিফলিত ও প্রতিসরিত হইলেই দ্রব্যটির গাত্র হইতে একটি রঙীন চমক বা দীপ্তি দেখা যায়। ধাতব দ্রব্যকে ভালভাবে পালিস করিলেই উহাদের গাত্র হইতে চমক দেখা দিবে। অধাতব দ্রব্যাদির উপর হইতে চমক আনিতে হইলে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ কাচ, পোর্সেলিন বা কাচ-কলাই (এনামেল) দ্রব্যের উপরই এই কৃত্রিম রঙীন চমক লাগাইয়া উহাদের বর্ণসৌষ্ঠব ও দীপ্তি বৃদ্ধি করা হয়। এই সকল অধাতব দ্রব্যের মসৃণ গাত্রের উপর যদি কোন ধাতুর অতি সূক্ষ্ম একটি স্তর লাগাইয়া দেওয়া যায় তবে আলোকরশ্মি ধাতুর ঐ স্তরের উপর পড়িয়া প্রতিফলিত ও প্রতিসরিত হইবে এবং ধাতুটির নিজ গুণানুসারে অল্প পরিমাণ রশ্মি শোষিত হইয়া দ্রব্যটির উপর একটি রংও দেখা দিবে। এই কাজের জন্য দুই বিভিন্ন বিভাগের ধাতু ব্যবহার করা হইয়া থাকে। প্রথম বিভাগের ধাতুগুলির বিশেষ গুণ হইল আলোক রশ্মির শোষণ ও প্রতিফলন, অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা রঙীন চমক পাওয়া যায়। ইহাদের নাম—তামা, লোহা, নিকেল, কোবাল্ট, ক্যাডমিয়াম, ইউরেনিয়াম, সোনা প্রভৃতি। এই সকল ধাতু হইতে যে যে রং পাওয়া যাইতে পারে তাহাদের বিবরণ দেওয়া হইল—

তামা হইতে লাল, বাদামী এবং ঐ ধরণের নানাবিধ রং পাওয়া যাইতে পারে।

লোহা হইতে হলুদ, বাদামী ও লাল রং পাওয়া যায়।

নিকেল হইতে হাল্‌কা বাদামী রং পাওয়া যাইবে।

কোবাল্ট দিয়া হাল্‌কা বাদামী হইতে কাল্‌চে বাদামী পর্যন্ত নানা ধরণের রঙীন চমক প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

ক্যাডমিয়াম হইতে অল্প তাপে হরিদ্রাভ লাল রঙের চমক পাওয়া যায়' কিন্তু তাপ বেশী হইলে ঐ রং ও চমক সহজেই উড়িয়া যায়।

ইউরেনিয়াম হইতে অতি সুন্দর সবুজ আভাযুক্ত হরিদ্রা রং পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আজকাল এই ধাতুটি সাধারণ কাজে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হইয়াছে; কারণ ইহা পারমাণবিক বোমা ও যন্ত্রপাতিতে ব্যবহার করা হয়।

সোনা হইতে সোনালী, গোলাপী এবং অবস্থাভেদে নীল রঙের চমক তৈয়ারী হয়।

দ্বিতীয় প্রকার ধাতুসমূহ প্রতিফলন ও

প্রতিসরণ করে মাত্র, ইহাদের দিয়া কোন রং পাওয়া যায় না। ইহারা কেবল ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তি বাড়াইয়া দেয়। ইহাদের নাম—বিস্‌মাথ, টিন, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, সীসা প্রভৃতি। দুই বা ততোধিক ধাতুর সংমিশ্রণে মনোরম রং ও চমক পাওয়া যাইতে পারে।

পুরাকালে আরব ও ইতালীর অধিবাসীরা মৃৎ-দ্রব্যের উপর রঙীন চমক লাগাইবার কাজে বিশেষ পারদর্শী ছিল। আরবদের দ্বারা স্পেন দেশ অধিকৃত হইলে উহারা কয়েকশত বৎসর ঐ দেশে বসবাস করে। সেই সময়ে তাহারা ঐ দেশে যে মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিল তাহার গম্বুজটি সোনালী রঙের চমক লাগানো টালী দিয়া নির্মাণ করা হয়। ঐ গম্বুজের উপর প্রভাত ও সন্ধ্যায় সূর্যরশ্মি পড়িয়া সোনার পাতের মত ঝিকমিক করিত। ইতালীর চমক-দেওয়া মৃৎদ্রব্যের নমুনা ইউরোপের বিভিন্ন মিউজিয়ামে দেখা যায়। ইহারা সাধারণতঃ তামা দিয়া লাল, সোনালী বা ব্রোঞ্জ রঙের চমক তৈয়ার করিত। কিন্তু ইহারা যে পদ্ধতিতে তৈয়ার করিত তাহাতে চমকে রঙের কোন নিশ্চয়তা থাকে না, অর্থাৎ প্রতিবারে রং একই রকমের হয় না। প্রাচীন পদ্ধতিতে তামা হইতে রঙীন চমক তৈয়ার করিবার উপযোগী দুইটি মিশ্রণের নমুনা দেওয়া হইল—

তাম্র কার্বনেট	—১৭	১৮
রৌপ্য কার্বনেট	—	২
বিস্‌মাথ কার্বনেট	—১৩	১০
গেরু মাটি	—৭০	৭০

তামার সহিত বিস্‌মাথ বা রূপা মিশাইবার প্রধান কারণ, তামার গলনাঙ্ক কমাইয়া দেওয়া। বিস্‌মাথের প্রতিসরণ ক্ষমতা অধিক বলিয়া তামার রঙের দীপ্তি বাড়াইয়া দেয়। অল্প পরিমাণে রৌপ্য থাকিলে একটা নীলাভ দীপ্তি পাওয়া যায় বলিয়া অনেকে উহা পছন্দ করে। গেরু মাটির কোন বিশেষ গুণ নাই, ইহা কেবল মিশ্রণের পরিমাণ বাড়াইয়া ধাতুর স্তরকে পাত্‌লা করিয়া দেয়। সুতরাং ইহার পরিমাণ কম বা বেশী করা যাইতে পারে। এই মাটি থাকিবার ফলে মিশ্রণটিতে জল মিশাইয়া দ্রব্যের উপর সহজে প্রলেপ দেওয়া যায়।

মিশ্রণকে বেশ ভালভাবে চূর্ণ করিয়া একটি ১২০ নং চালুনিতে ছাঁকিয়া লইতে হইবে; কারণ মিশ্রণের সহিত ক্ষুদ্র কাঁকর থাকিলে চমকের উপর দাগ পড়িয়া যায়। পরে মিশ্রণটি অল্প পরিমাণ জলের সহিত মিশাইয়া পাত্‌লা কর্দমে পরিণত করিয়া লইতে হইবে। এই প্রলেপ বুরুশ দিয়া গ্লেজ করা বা এনামেল পাত্রের উপর সমানভাবে লাগাইয়া দিবার পর প্রলেপটি শুকাইয়া গেলে মাফল ভাটিতে পোড়ান হয়। ভাটির তাপ ৯০০° সে.-এর বেশী হওয়া উচিত নহে। কারণ তাপ অধিক হইলে গেরু মাটি নরম হইয়া পাত্রের গায়ে লাগিয়া যাইতে পারে এবং চমকের রং-ও নষ্ট করিয়া দিতে পারে। ভাটির মধ্যে সর্বদা বিজারক তাপ থাকা দরকার, নতুবা তামা হইতে লাল রং পাওয়া যায় না। উহা জারিত হইয়া কালো তাম্র-অক্‌সাইডে পরিণত হইয়া যাইতে পারে। মাফল ভাটির মধ্যে বিজারক অবস্থা আনিবার জন্য মাঝে মাঝে ছোট ছোট কাঠের টুক্‌রা ফেলিয়া দিতে হইবে। ভাটিতে পোড়াইবার পরে প্রলেপটি জল দিয়া ধুইয়া দিলেই গেরু মাটি ধুইয়া যাইবে এবং গ্লেজের উপর রঙীন চমক দেখা দিবে।

এই পুরাতন পদ্ধতিটি সহজ, কিন্তু নির্ভরযোগ্য নহে। সুতরাং প্রতিবারে একই প্রকার ফলদায়ক একটি নূতন পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হইয়াছে। এই নূতন পদ্ধতিতে ধাতুগুলিকে প্রথমে বিশেষ প্রকার সাবানে পরিণত করা হয়, যাহাকে মেটালিক সোপ বা ধাতব সাবান বলা হইয়া থাকে। এই প্রকারের ধাতব সাবান জলে গুলিবে না, কিন্তু বিশেষ প্রকার তৈলজাতীয় পদার্থে বেশ গুলিয়া যায়। এই সকল তরল পদার্থের নাম—বেঞ্জিন,

টলুয়েন, নাইট্রো-বেঞ্জিন, তারপিন তৈল, স্পাইক লেভেণ্ডার তৈল, রোজমেরী তৈল প্রভৃতি। এই সকল বিশেষ তৈলজাতীয় দ্রাবকগুলি বেশ উদ্বায়ী, অর্থাৎ খোলা অবস্থায় রাখিয়া দিলে অল্পকালেই উড়িয়া যাইবে। ধাতব সাবান প্রস্তুত করিতে রজন, তিসির তেল অথবা ন্যাপথেনিক অ্যাসিড নামক খনিজ তৈল ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এই খনিজ তৈল বিশেষ প্রকারের পেট্রো-লিয়াম হইতে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ধাতব সাবান ও তৈলের দ্রব তুলি দিয়া বা প্রক্ষেপ করিয়া সহজেই কাচ, পোর্সেলিন বা কাচ-কলাই পাত্রের উপর লাগান হইয়া থাকে এবং উহা শুকাইতে বেশী দেরী হয় না। পাত্রগুলি শুকাইয়া গেলে উহা মাফল ভাটিতে পোড়ান হয় এবং পাত্রের প্রকৃতির উপর ভাটির তাপ নিয়ন্ত্রণ করা হইয়া থাকে। যেমন—মৃৎপাত্রের জন্য ভাটির তাপ ৮০০°-৯০০° ডিগ্রি সে-এর মধ্যে রাখা হয়, কিন্তু কাচ বা কাচ-কলাই (এনামেল) দ্রব্যের জন্য ভাটির তাপ ৬০০°-৭০০° সে-এর বেশী হওয়া উচিত নহে ; কারণ কাচ বা কাচ-কলাই অধিক তাপে নরম হইয়া বিকৃত হইয়া যাইতে পারে।

ভাটিতে পুড়িবার কালে ধাতব সাবানের জৈব অংশ সহজেই গ্যাস হইয়া যায় এবং এই গ্যাসই মাফল· ভাটির প্রকোষ্ঠকে বিজারক অবস্থায় রাখে ; যাহার ফলে ধাতু জারিত হইয়া অক্সাইডে পরিণত হইতে পারে না এবং উপযুক্ত তাপ পাইলেই নরম হইয়া পাত্রের গায়ে অতি সূক্ষ্ম স্তরের মত লাগিয়া যায়। এই অতি পাতলা ধাতুস্তরই পাত্রের উপর রঙীন চমক আনয়ন করে।

ধাতব সবান তৈয়ার করিতে হইলে প্রথমে কষ্টিক সোডা দিয়া রজন, তিসির তেল অথবা ন্যাপথেনিক অ্যাসিড হইতে সাধারণভাবে সাবান তৈয়ার করিতে হয়। এই ক্ষারীয় সাবান সহজেই জলে গুলিয়া যায়। কষ্টিক সোডার পরিবর্তে সোডা কার্বনেট ব্যবহার করা উচিত নহে, কারণ সাবানের সহিত কিছু কার্বনেট উদ্বৃত্ত থাকিলে উহা পরে ধাতব কার্বনেটে পরিণত হইয়া যায় এবং ঐ ধাতব কার্বনেট তৈল জাতীয় দ্রাবকে গলে না। কষ্টিক সোডা দিয়া প্রস্তুত সাবান জলে গুলিয়া শতকরা ১০-১৫ ভাগের মত দ্রব তৈয়ার করিতে হইবে এবং একটি পাত্রে ধাতুর যে কোন দ্রবণীয় যৌগিক জলে গুলিয়া ঐ প্রকারের দ্রব তৈয়ার করা হয়। এখন এই দুটি দ্রব একত্রে মিশাইয়া কিছুক্ষণ নাড়িলেই ধাতব সাবান অধঃক্ষিপ্ত হইয়া যায়। কিছুকাল পরে এই অধঃপতিত ধাতব সাবান পরিষ্কার জলে ২-৩ বার ধুইয়া শুকাইয়া লইলেই ধাতব সাবান প্রস্তুত হইল। ন্যাপথেনিক অ্যাসিড হইতে প্রস্তুত ধাতব সাবান ভিন্ন অন্য প্রকারের ধাতব সাবানে বেশী দিন আলো বা হাওয়া লাগিলে উহা তেলে অদ্রবণীয় হইয়া পড়ে। সুতরাং সাবান শুকাইবার পর উহা রঙীন বোতল বা টিনের কৌটায় বন্ধ করিয়া অথবা টাট্কা অবস্থাতেই তেলে গুলিয়া ছিপি-আঁটা বোতলে রাখিয়া দিতে হইবে। এই দ্রব বেশী দিন রাখিতে হইলে বোতলটি কাগজ দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া ভাল। বিভিন্ন দ্রবের জন্য কষ্টিক সোডার পরিমাণ দেওয়া গেল। প্রতি শত ভাগ বর্ণহীন ও পরিষ্কার রজনের জন্য ১৩ ভাগ কষ্টিক সোডা লাগে। কিন্তু রজন লাল হইলে কষ্টিকের পরিমাণ কিছু কম হয়। পরিশুদ্ধ কাঁচা তিসির তেলের জন্য শতকরা ১৪·৫ ভাগ কষ্টিক সোডা লাগিবে এবং ন্যাপথেনিক অ্যাসিডের জন্য (A.V. 175) শতকরা ১২·৫ ভাগ কষ্টিক লাগিবে। যদি ন্যাপথেনিক অ্যাসিডের অ্যাসিড-অঙ্ক (AV) ১৭৫-এর বেশী হয় তবে কষ্টিক সোডাও সেই অনুপাতে বেশী লইতে হইবে।

প্রতি শতভাগ ক্ষারীয় সাবানের সহিত কত পরিমাণ ধাতব লবণ দিতে হইবে তাহার অনুপাত দেওয়া হইল—

রঞ্জন-সাবান (শতভাগ)	তাম্র সালফেট —	৫৮ ভাগ
	দস্তা সালফেট —	৪৬ ,,
	লেড-নাইট্রেট —	৪১ ,,
	কোবাল্ট নাইট্রেট —	৫৫ ,,
	ম্যাঙ্গানিজ সালফেট —	২৭ ,,
কাঁচা তিসির তেলের সাবান (শতভাগ)	তাম্র সালফেট —	৪২ ,,
	ম্যাঙ্গানিজ সালফেট —	২৬ ,,
	কোবাল্ট নাইট্রেট —	৪০ ,,
	লেড-নাইট্রেট —	৪৮ ,,
	লৌহ ক্লোরাইড —	৩৩ ,,
ন্যাপথেনিক অ্যাসিড সাবান (শতভাগ)	তাম্র সালফেট —	৩৭ ,,
	দস্তা সালফেট —	৩৩ ,,

বিস্‌মাথ রেজিনেট, অর্থাৎ বিস্‌মাথ-রঞ্জন সাবান তৈয়ার করিবার একটি সহজ উপায় আছে। একটি কাচ-কলাই করা পাত্রে ৫০ ভাগ রজন লইয়া উহাকে অল্প তাপে গলাইয়া ফেলিতে হইবে এবং ঐ তরল রজনের সহিত ৮ ভাগ বিস্‌মাথ কার্বনেট অথবা ১০ ভাগ বিস্‌মাথ নাইট্রেট চূর্ণ ধীরে ধীরে মিশাইয়া লইতে হইবে। পরে মিশ্রণটি আরও উত্তপ্ত করিয়া ১৭০°-১৮০° সে. তাপে গলিত অবস্থায় রাখিতে হইবে এবং ঐ সময় একটি কাচের ঠাস নল বা রড দিয়া উত্তমরূপে নাড়া দরকার। এইভাবে নাড়িতে নাড়িতে যখন দেখা যায় যে, সাদা বিস্‌মাথ চূর্ণ গলিত রজনের সহিত সম্পূর্ণ মিশিয়া গিয়াছে এবং মিশ্রণের রং হালকা ধূসর হইয়া গিয়াছে, তখন তরল পদার্থ কিছু ঠাণ্ডা করিয়া উহাতে ৫০-৬০ ভাগ স্পাইক লেভেণ্ডার তৈল মিশাইয়া লইতে হয়। অল্প গরম অবস্থায় তেলের সহিত কিছুক্ষণ নাড়িলেই বিস্‌মাথ রেজিনেট ঐ তেলে দ্রবীভূত হইয়া যায়। তখন পাত্রটি ঢাকিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। প্রায় ২।৩ দিন পরে দেখা যাইবে যে, পাত্রের নীচে অল্প পরিমাণে সাদা বিস্‌মাথ চূর্ণ ও কিছু গাদ জমিয়া আছে। সুতরাং উপরকার পরিষ্কার তরল দ্রবটি সাবধানে ঢালিয়া লইতে হইবে। নীচের গাদটি পরের বারে ব্যবহার করা চলে। বিস্‌মাথ অল্প তাপে উড়িয়া যায় বলিয়া বিস্‌মাথ রেজিনেট একা ব্যবহার করা চলে না। টিন, অ্যালুমিনিয়াম বা লেড সাবানের সহিত মিশাইয়া বর্ণহীন চমক করা হয়। অথবা লোহা, তামা প্রভৃতির সহিত মিশাইয়া রঙীন চমক করা হইয়া থাকে। কষ্টিক সোডার সাবান হইতেও পাতিত প্রথায় বিস্‌মাথ সাবান তৈয়ার করা যায়, কিন্তু ইহার জন্য বিশেষ বিবেচনার দরকার হয় বলিয়া ঐ পদ্ধতির বিবরণ এখানে দেওয়া হইল না। টিন ও সোনা হইতে চমক তৈয়ার করিতেও বিশেষ রকমের প্রক্রিয়ার প্রয়োজন।

সোনা হইতে প্রস্তুত সোনালী চমককে লিকুইড-গোল্ড বা তরল সোনা বলা হয়। এদেশে এই তরল সোনা পোর্সেলিন ও কাচের দ্রব্যের উপর বহুল পরিমাণে ব্যবহার করা হইতেছে। কাচের চুড়ীতে এই সোণালী চমক লাগাইয়া উহার মান ও দাম বাড়ান হয়। প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে ৬-৭ লক্ষ টাকার তরল সোনা এদেশে আমদানী করা হইয়া থাকে। এই তরল সোনায় ১০-১২ ভাগ সোনা থাকে। আমাদের দেশে সোনার দাম এত অধিক যে, চড়া দরে সোনা কিনিয়া তরল সোনা প্রস্তুত করিতে তেমন পড়তা পড়ে না এবং ইহা তৈয়ারীর পদ্ধতিও বেশ জটিল। বিদেশজাত তরল সোনা অতি সুন্দর ও নিখুঁত হয় বলিয়া আমাদের কারিগরেরা বিদেশী দ্রব্যই বেশী পছন্দ করে।

রঙীন চমক তৈয়ার করিবার সময় একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, সকল ধাতুর গলনাঙ্ক সমান নহে। সুতরাং যে সকল ধাতু বেশী তাপে গলে, যেমন—লোহা (১৫৩৪° সে.), তামা (১০৮৪° সে.), কোবাল্ট (১৪৯০° সে.), সোনা (১০৬৩° সে.), অ্যালুমিনিয়াম (৬৫৯° সে.) প্রভৃতি—তাহাদের

সহিত পরিমিত পরিমাণে অল্পতাপে গলনশীল ধাতু, যেমন—বিস্‌মাথ (২৭১° সে.), টিন (২৩২° সে.), ক্যাডমিয়াম (৩২১° সে.), লেড (৩২৭° সে.), জিঙ্ক বা দস্তা (৪১৯° সে.) প্রভৃতি মিশাইয়া লইয়া মিশ্র ধাতুর গলনাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। এই মিশ্রণের দ্বারা শুধু গলনাঙ্কই নহে, রঙের প্রকার ও সৌন্দর্যও নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, শুধু লোহা হইতে যে লাল্‌চে বাদামী রং পাওয়া যায় তাহার সহিত ক্যাডমিয়াম ও বিস্‌মাথ মিশাইয়া সোনালী রং আনা যাইতে পারে এবং ঐ মিশ্র ধাতুর গলনাঙ্ক অনেক কমিয়া যায়। এই প্রকার মিশ্রণের কয়েকটি নমুনা এখানে দেওয়া হইল—

(১) বর্ণহীন চমক
বিস্‌মাথ দ্রব—২ ভাগ
অ্যালুমিনিয়াম দ্রব—২ ভাগ
টিন দ্রব—১ ভাগ

(২) রক্তপীত চমক
লৌহ দ্রব—৩ ভাগ
লেড দ্রব—১ ভাগ
বিস্‌মাথ দ্রব—১ ভাগ

(৩) ব্রোঞ্জ চমক
লৌহ দ্রব—২ ভাগ
বিস্‌মাথ দ্রব—২ ভাগ
কোবাল্ট দ্রব—১ ভাগ

(৪) সবুজাভ হরিদ্রা চমক
ইউরেনিয়াম দ্রব—৩ ভাগ
বিস্‌মাথ দ্রব—২ ভাগ

(৫) লৌহ-ধূসর চমক
কোবাল্ট দ্রব—৩ ভাগ
লেড দ্রব—১ ভাগ
বিস্‌মাথ দ্রব—১ ভাগ

সোনা দিয়া গোলাপী বা নীল রঙের চমক তৈয়ার করিতে অল্প পরিমাণ তরল সোনা বা লিকুইড গোল্ডের দরকার হয়; সুতরাং উহা তেমন মহার্ঘ হয় না। এই নীল চমকের সহিত ইউরেনিয়াম চমক মিশাইয়া অতি সুন্দর সবুজ চমক করা যাইতে পারে। লেখকের তৈয়ারী এই তিন প্রকার চমকের মিশ্রণ এখানে দেওয়া গেল—

(১) গোলাপী চমক
তরল সোনা—১ ভাগ
টিন দ্রব—১ ভাগ
বিস্‌মাথ দ্রব—৪ ভাগ

(২) নীল চমক
তরল সোনা—১ ভাগ
টিন দ্রব—৪ ভাগ
বিস্‌মাথ দ্রব—১০ ভাগ

(৩) সবুজ চমক
নীল চমক—৩ ভাগ
ইউরেনিয়াম দ্রব—২ ভাগ

উপরোক্ত উপাদানগুলির পরিমাণ কম বেশী করিয়া রঙের বিভিন্ন ধারা (Shade) আনা যাইতে পারে।

তেজস্ক্রিয়তা ও পাথরের বয়স

শ্রীমিহির বসু

মানুষ চায় পৃথিবীকে সম্পূর্ণ করে চিনতে—জানতে চায় সে এই পৃথিবীর ইতিহাস। এ জানা ও চেনার চেষ্টা অবশ্য মানুষের আজকের নয়—শত শত বছর ধরে মানুষের এই জানবার চেষ্টা চলে আসছে। তার জ্ঞানের সঞ্চয় জন্ম দিয়েছে এক নতুন বিজ্ঞানের। ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি পাথরের স্তর যেন পৃথিবীর ইতিহাসের এক একটি পৃষ্ঠা। তাই এই ইতিহাস পড়তে গেলে জানতে হয়, এসব পাথরের জন্ম-ইতিহাস, তাদের প্রাচীনত্বের ক্রম। ভূতত্ত্ব-বিদেরা এই অতীত উদ্ধারের কাজে লেগেছেন। পৃথিবীর জন্মের পর কোটি কোটি বছর কেটে গেছে। সেই সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে যে সব পরিবর্তন এসেছে—যে সব ঘটনা ঘটেছে, পাথর পরীক্ষা করে তার কিছু কিছু আভাস পাওয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও ভূতাত্ত্বিককে এই সব ঘটনার একটা ক্রম নির্ণয় করেই নিশ্চেষ্ট থাকতে হয়েছিল, যথার্থ সময় বা তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব ছিল না।

পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের যুগগুলিকে প্রধানতঃ জীবের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশের ভিত্তিতে ভাগ করা হয়েছে। স্বভাবতঃই বিভিন্ন যুগের স্থায়িত্বকাল এক নয়। ভূতাত্ত্বিক যুগ বিভাগ ও প্রাচীনত্ব এই রকম—

কেনোজোয়িক (আধুনিক জীবের যুগ)
৬ কোটি বছর

মেসোজোয়িক (মধ্যবর্তী জীবের যুগ)
১৮ কোটি বছর

প্যালিওজোয়িক (প্রাচীন জীবের যুগ)
৫০ কোটি বছর

প্রোটারোজোয়িক (অতি প্রাচীন জীবের যুগ)
৫৬ কোটি বছর

আর্কিয়োজোয়িক (আদি জীবনের যুগ)
১৫৫ কোটি বছর

এজোয়িক (জীবহীন যুগ) ২০০ কোটি বছর

পৃথিবীর জন্ম ... ৩০০ কোটি বছর (?)।

ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের সময় মাপবার জন্যে ভূবিদেরা বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করেছেন। বিভিন্ন যুগের স্থায়িত্বকাল নির্ণয় করবার জন্যে বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। কেনোজোয়িক যুগের প্রাচীনত্ব নির্ণয় করতে লায়েল (১৮৬৭) বিবর্তনের বৃত্তকে তাঁর অনুসন্ধানের ভিত্তি ধরেছিলেন। ম্যাথিউ (১৯১৪) অশ্বের বিবর্তনের ধারাকে নির্ভর করে কেনোজোয়িক যুগের প্রাচীনত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। এভাবে পুরা-প্রাণি-তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে ভূতাত্ত্বিক সময় পরিমাপের বিভিন্ন চেষ্টা হয়েছে।

অনেক সময় পাললিক শিলার মধ্যে বিভিন্ন পলির একটা নির্দিষ্ট ছন্দ দেখা যায়। একটি স্তরের পললের সময় নির্ণীত হলে সমগ্র শিলাস্তরের জন্মকাল বের করতে দেরী হয় না। বিভিন্ন যুগের সঞ্চিত পলি অনুসন্ধান করে তাদের স্থায়িত্বকাল নির্ণয়ের চেষ্টাও হয়েছে। এছাড়া প্রস্তরের ক্ষয় ও পললের সঞ্চয়ের হার থেকে বিভিন্ন যুগের আপেক্ষিক স্থায়িত্বকাল নির্ণয় করা হয়েছে। কিন্তু অতীতে এই ঘটনাগুলি যে বছরের পর বছর ধরে একই তালে চলেছিল তা বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ নেই। কাজেই এভাবে অতীত যুগের প্রাচীনত্বের যে হিসাব পাওয়া যায় তা খুব নির্ভর-যোগ্য নয়।

এছাড়াও সমুদ্রের লবণ বৃদ্ধির হার থেকে প্রথম যেদিন পরিশুদ্ধ জলের ফোঁটা পৃথিবীতে সৃষ্ট হয়েছিল তার প্রাচীনত্ব স্থির করা সম্ভব। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এসব পদ্ধতির নির্ভরযোগ্যতা অস্বীকৃত হয়।

১৮৯৫ সাল থেকে পর পর কয়েকটি আবিষ্কার বিজ্ঞান-জগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৮৯৫ সালে রঞ্জেন আবিষ্কার করেন এক্স-রে। ১৮৯৬ সালে বেকারেল দেখালেন ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা; ১৮৯৮ সালে মাদামকুরী পিচব্লেণ্ড থেকে রেডিয়াম বের করলেন। এর পর ১৯০২ সালে রাদারফোর্ড তেজস্ক্রিয় পদার্থের সাধারণ গুণসমূহের খবর প্রকাশ করেন—শক্তি ও পদার্থের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হলো। তেজস্ক্রিয় পদার্থের বৈশিষ্ট্যই হলো তাদের স্বতঃস্ফূর্ত ভাঙ্গন। একটি মৌলিক পদার্থ প্রতিনিয়ত ভেঙ্গে গিয়ে সৃষ্টি করছে নতুন আর একটি পদার্থ এবং সেই সঙ্গে বিকিরিত হচ্ছে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় কণিকা—আল্ফা, বিটা ও গামা রশ্মি। অবশ্য এসব বিভিন্ন বিকিরণের গতি-প্রকৃতি বিভিন্ন। আল্ফা কণার ভেদশক্তি অল্প। এরা দু-ভাগ পজিটিভ তড়িৎযুক্ত এবং হিলিয়াম পরমাণুর সমান ভর-সমন্বিত। এই কণাগুলি যখন চারপাশের পরমাণুর উপর এসে ধাক্কা খায় তখন সঙ্গে সঙ্গে দুটি করে নেগেটিভ তড়িৎ-যুক্ত ইলেকট্রন আহরণ করে। ফলে বিপরীত ধর্মী তড়িৎশক্তি পরস্পর বিনষ্ট হওয়ায় হিলিয়াম গ্যাস জন্ম নেয়। বিটা রশ্মি আর কিছুই নয়, নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত ইলেকট্রনের বিকিরণ। হাইড্রোজেন পরমাণুর চেয়ে এরা হাল্কা। আর গামা রশ্মি তড়িৎযুক্ত নয়, সাধারণ রঞ্জেন রশ্মির মতই এর প্রকৃতি, তবে রঞ্জেন রশ্মির চেয়ে হয়তো কিছুটা কম শক্তিশালী।

তাহলে এখন দেখা যাচ্ছে যে, রেডিয়াম বা তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে প্রতিনিয়ত হিলিয়াম কণা উৎপন্ন হচ্ছে ও সঙ্গে সঙ্গে তেজস্ক্রিয় পদার্থটি অন্য একটি মৌলিক উপাদানে রূপান্তরিত হচ্ছে। তবে এই ভাঙ্গনের কয়েকটা ধাপ আছে। ইউরেনিয়াম প্রভৃতি পদার্থ বিভিন্ন ধাপের মধ্য দিয়ে রেডিয়াম হয়ে অবশেষে নিষ্ক্রিয় সীসায় পরিণত হচ্ছে। প্রতিটি হিলিয়াম কণা বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পদার্থটির পারমাণবিক ভর কমে যাচ্ছে। হিলিয়ামের পারমাণবিক ভর ৪, ইউরেনিয়ামের ২৩৮। ইউরেনিয়াম থেকে সীসা, এই সম্পূর্ণ ভাঙ্গনের ধারায় ৮টি হিলিয়াম পরমাণু উৎপন্ন হয়; আর সবশেষে পড়ে থাকে সীসা, যার পারমাণবিক ভর $২৩৮-৮\times৪=২০৬$। ইউরেনিয়াম– সীসা, এই সম্পূর্ণ ভাঙ্গনের ধারাকে বলা হয় ইউরেনিয়াম পরিবার। আরও দুটি অভিজাত পরিবার হচ্ছে—অ্যাকটিনিয়াম ও থোরিয়াম, যাদের শেষ পরিণতি হচ্ছে—যথাক্রমে ২০৭ ও ২০৮ পারমাণবিক ভরবিশিষ্ট সীসায়।

একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থের এই যে ক্ষয় বা ভাঙ্গন, এই ভাঙ্গনের হার স্থান-কাল ভেদে অপরিবর্তিত। বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় খনিজের বেলায়ও সুপ্রাচীন ভূতাত্ত্বিক যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এই ভাঙ্গনের হার একই রয়ে গেছে এবং বিভিন্ন পদার্থের সে হার জানাও গেছে। এর ফলেই ভূতাত্ত্বিক যুগের একটা মাপকাঠির সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এক গ্র্যাম রেডিয়াম নিয়ে সুরু করলে ১৫৯০ বছর পরে তাথেকে $\frac{১}{২}$ গ্র্যাম রেডিয়াম অবশিষ্ট থাকবে। আরও ১৫৯০ বছর পরে অবশিষ্ট থাকবে মাত্র $\frac{১}{৪}$ গ্র্যাম। এই হারে রেডিয়ামের ভাঙ্গন বা ক্ষয় হয়েছে এবং হবে। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ পরিবর্তনের ফলে যে সময় অর্ধেক পরিমাণে গিয়ে দাঁড়ায়, সে সময়কে ঐ পদার্থের অর্ধ-আয়ু বলে। স্বভাবতঃই বিভিন্ন পদার্থের জন্যে এই অর্ধ-আয়ুর মান বিভিন্ন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কোন তেজস্ক্রিয় খনিজ একটা নির্দিষ্ট হারে পরিবর্তিত হচ্ছে। তাই যদি হয়, তাহলে একটি তেজস্ক্রিয় খনিজে—ধরা যাক, একটি ইউরেনিয়াম খনিজে ইউরেনিয়াম থেকে

উৎপন্ন হিলিয়াম ও অবশিষ্ট ইউরেনিয়াম কিংবা উৎপন্ন সীসা ও অবশিষ্ট ইউরেনিয়ামের অনুপাত নির্ভর করবে খনিজের বয়সের উপর। এখন যদি এই তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধায়ু জানা থাকে, তাহলে খনিজের জন্ম কাল থেকে কত বছর কেটে গেছে বর্তমান অবস্থায় আসতে, সেটাও জানা সম্ভব হবে। ১ গ্র্যাম ইউরেনিয়াম ৭৬০ কোটি বছরে সম্পূর্ণভাবে সীসায় রূপান্তরিত হয়।

ধরা যাক, আমরা কোন পাথরে এমনি একটি তেজস্ক্রিয় উপাদান পেয়েছি। এই পাথরের ভূ-তাত্ত্বিক বয়স জানা আছে, তবে ঠিক কত বছর আগে এর জন্ম তা জানা নেই। তা জানতে গেলে আমাদের তেজস্ক্রিয় পদ্ধতির সাহায্য নিতে হবে। এখন এর বয়স নির্ণয় অন্ততঃ দু-ভাবে সম্ভব—একটি হচ্ছে, সঞ্চিত সীসার অনুপাত থেকে, অপরটি হিলিয়ামের অনুপাত থেকে। যদি এই খনিজে সঞ্চিত সীসার পরিমাণ হয় সী (ইউ), আর ইউরেনিয়ামের পরিমাণ হয় ইউ তাহলে সঞ্চিত পরিমাণ সীসা উৎপন্ন হতে যে সময় লেগেছে তা হবে, অর্থাৎ খনিজের বয়স হবে $= \frac{\text{সী (ইউ)}}{\text{ইউ}} \times ৭৬০$ কোটি বছর

কিন্তু কেবল যে ইউরেনিয়াম থেকেই সীসা উৎপন্ন হয় তা তো নয়, থোরিয়াম থেকেও সীসা উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং ১ গ্র্যাম থোরিয়াম ১ গ্র্যাম সীসায় রূপান্তরিত হতে লাগে ২১,১০০০ লক্ষ বছর। সুতরাং থোরিয়াম পদ্ধতিতে খনিজের বয়স দাঁড়ায় $\frac{\text{সী (থো)}}{\text{থো}} \times ২১,১০০০$ লক্ষ বছর। এখন যদি এমন একটি খনিজ নিয়ে কাজ করতে হয় যাতে ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম দুই-ই আছে তাহলে ইউরেনিয়াম—সীসা অনুপাত বা থোরিয়াম—সীসা অনুপাত বা যুক্ত ইউরেনিয়াম-থোরিয়াম/সীসা অনুপাত যে কোন পদ্ধতিতেই খনিজের যা বয়স নির্ণীত হবে তা হবে এক বা অভিন্ন। অর্থাৎ—

$$\text{বয়স} = \frac{\text{সী (ইউ)}}{\text{ইউ}} \times ৭৬০ \text{ কোটি বছর}$$

$$\text{"} = \frac{\text{সী (থো)}}{\text{থো}} \times \frac{৭৬০}{০\cdot৩৬} \text{ কোটি বছর}$$

$$\text{"} = \frac{\text{সী (ইউ)} + \text{সী (থো)}}{\text{ইউ} + ০\cdot৩৬ \text{ থো}} \times ৭৬০ \text{ কোটি বছর}$$

এই পদ্ধতিকে বলা হয়েছে সীসা-অনুপাত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে বহু কাজ হওয়ার পর দেখা গেল যে, সব ইউরেনিয়াম খনিজই এই কাজের জন্যে নির্ভরযোগ্য নয়; ফলে সীসা—ইউরেনিয়াম অনুপাতে নির্ণীত বহু পাথরের বয়সই সন্দেহাতীত নয় বলে প্রতিপন্ন হলো। লারসেন আবার এই পদ্ধতিকে নতুন করে কাজে লাগালেন। তিনি দেখলেন জারকন, জেনোটাইম এবং কিছু মোনাজাইট এই কাজের জন্যে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য। লারসেনের পদ্ধতি খুব সহজ ও দ্রুত। এখানে সীসার পরিমাণ স্পেক্ট্রোকেমিক্যাল পদ্ধতিতে বের করা হয় এবং বয়স নির্ণয় করা হয় এই সম্পর্ক থেকে।

বয়স $= \frac{\text{ক} \times \text{সী}}{\text{আল্‌ফা}}$, যেখানে সী = দশ লক্ষাংশে সীসার পরিমাণ এবং আল্‌ফা = মিলিগ্র্যাম-ঘণ্টা প্রতি আল্‌ফায় খনিজের তেজস্ক্রিয়তা। এই অনুসারে পদ্ধতিকে বলা হয় সীসা-আল্‌ফা পদ্ধতি। ক = স্থির রাশি। ইউরেনিয়ামের জন্যে এর মান ২৬০০ এবং থোরিয়ামের জন্যে ১৯০০।

এই মূল পদ্ধতির বহু পরিবর্তিত ও উন্নত ধারা উদ্ভূত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ইউরেনিয়ামের ক্ষয়জাত সীসাকে (২১০) ব্যবহার করা হচ্ছে। ইউরেনিয়াম ২৩৫ ও ইউরেনিয়াম ২৩৮ ক্ষয়জাত সীসা ২০৭ ও সীসা ২০৬-এর অনুপাতও যথেষ্ট ফলপ্রসূ। একে বলা যেতে পারে সীসা-সীসা পদ্ধতি।

আমরা দেখেছি পূর্বোক্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভাঙ্গনে শুধু সীসা নয়, হিলিয়াম গ্যাসও উৎপন্ন হয়। হিলিয়ামের গ্যাসীয় অবস্থার জন্যে অসুবিধা না থাকলে একে সীসা-অনুপাতের মতই নির্ভরশীল

পদ্ধতি হিসাবে গণ্য করা চলতো। এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন হিলিয়াম ও খনিজে অবস্থিত ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের তুলনা করা হয়, অর্থাৎ হিলিয়াম-অনুপাত বের করে খনিজের বয়স নির্ণয় করা হয়—

$$\text{বয়স} = \frac{\text{হি}}{\text{ইউ} + ০\cdot২৭\ \text{থো}} \times ৮৮\ \text{লক্ষ বছর।}$$

গ্যাসীয় অবস্থার জন্যে সঞ্চিত হিলিয়ামের নানাভাবে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ লক্ষ লক্ষ বছরে ফাটলের মধ্য দিয়ে এ গ্যাস বেরিয়ে যেতে পারে। তবে যে সব পাথরে খনিজের বাঁধন খুব শক্ত সে সব ক্ষেত্রে এই ক্ষতির সম্ভাবনা কম। আবার যদি পাথরটি তাপ ও চাপের ফলে পরিবর্তিত হয়ে থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রেও এই ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। তেমনি জলবায়ুর আওতায় পড়ে ক্ষয়প্রাপ্ত পাথর দিয়েও এই কাজ চলবে না। এসব কারণে এই পদ্ধতি অনেকটা সীমায়িত হয়েছে।

মহাজাগতিক রশ্মি বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরে নিউট্রন কণিকার সৃষ্টি করে। এরই কয়েকটি আশেপাশের নাইট্রোজেনকে আঘাত করে। নাইট্রোজেন নিউক্লিয়াস তা গ্রহণ করে ও একটি প্রোটনকে (ভর ১) ছেড়ে দেয়, ফলে কার্বন (১৪)-এর সৃষ্টি হয়। এই কার্বন (১৪) তেজস্ক্রিয় এবং একটি ইলেক্ট্রন হারিয়ে এটি আবার নাইট্রোজেনে ফিরে যেতে চায়। এর অর্ধায়ু হচ্ছে ৫,৭০০ বছর; অর্থাৎ রূপান্তরের গতি খুবই ধীর। সাধারণ কার্বনের মত এটিও অঙ্গারাম্ল গ্যাসের সৃষ্টি করে ও জীবজগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। মৃত জীবের দেহে এই কার্বন সঞ্চিত অবস্থায় থেকে যায় ও রূপান্তরিত হতে থাকে। যখন এরকম কোন জীবাশ্ম, প্রাচীন উদ্ভিদের অংশ বা কোন জন্তুর হাড় প্রভৃতির মধ্যে তেজস্ক্রিয় কার্বনের অস্তিত্ব লক্ষিত হয় তখন ঐ বস্তুটির মধ্যে কার্বনের আপেক্ষিক পরিমাণের সঙ্গে বর্তমান জাগতিক পরিমাণের তুলনা করে ঐ জীবের মৃত্যু-কাল; অর্থাৎ যে দিন থেকে ঐ জীবটি অঙ্গারাম্ল বৃত্ত থেকে সরে পড়েছে সেই দিনটিকে নির্ণয় করা সম্ভব।

অনেক সময় পাথরে অভ্রজাতীয় খনিজে জারকন, এলানাইট প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় খনিজের ছোট ছোট দানা আটক থাকে। এই সব খনিজ থেকে অল্‌ফা কণা বিকিরিত হতে থাকে ও অভ্রের মধ্যে ০·০৩ থেকে ০·০৪ মি. মিটার পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে। এই কণাগুলি অভ্রের সংগঠক পরমাণুগুলিকে, বিশেষ করে লোহার পরমাণুকে আঘাত করে। তার ফলে রঙীন খনিজে তেজস্ক্রিয় দানার চারদিকে বেরঙা গোলকের সৃষ্টি হতে থাকে। যেহেতু বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় উপাদান থেকে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় কণিকার ভেদশক্তি বিভিন্ন, সেহেতু এভাবে কতকগুলি গোলক একটির পর একটি গড়ে ওঠে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষাকালে এগুলি প্লিওক্রোয়িক হ্যালো নামে বর্ণিত হয়। এভাবে প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্ট হ্যালোর সঙ্গে বিশেষভাবে তৈরী হ্যালো-ফটোমিটারের তুলনা করে অভ্রবাহী পাথরে বয়স নির্ণয় চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়নি।

ইউরেনিয়াম গোত্রের ভারী ধাতুর খনিজের ব্যবহার ছাড়াও তেজস্ক্রিয় রুবিডিয়াম ও পটাসিয়াম কাজের যথেষ্ট উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে। তেজস্ক্রিয় পটাসিয়াম (৪০) ও এর ক্ষয়জাত আরগন গ্যাস থেকে পটাসিয়ামযুক্ত খনিজের বয়স নির্ণয় করা হচ্ছে। রুবিডিয়াম, সোডিয়াম-পটাসিয়াম গোত্রেরই একটি ধাতু। তেজস্ক্রিয় রুবিডিয়াম (৮৭) বিটা কণা বিচ্ছুরণের সঙ্গে সঙ্গে ঐ একই ভরবিশিষ্ট ষ্ট্রন্‌সিয়াম (৮৭)-এ রূপান্তরিত হয়। এই ভাঙ্গন ঘটে খুবই ধীরে ধীরে। এর অর্ধায়ু হচ্ছে ৬০০০ কোটি বছর। সাধারণতঃ উৎপন্ন ষ্ট্রন্‌সিয়াম এত অল্প থাকে যে, তার যথার্থ পরিমাণ নির্ণয় করা প্রায়ই শক্ত হয়ে পড়ে। তবে স্পেক্ট্রোগ্রাফিক পদ্ধতিতে একই সঙ্গে ষ্ট্রন্‌সিয়াম ও রুবিডিয়ামের অনুপাত নির্ণয় করা যায়।

স্বভাবতঃই ষ্ট্রন্‌সিয়াম—রুবিডিয়াম পদ্ধতিতে সে সব খনিজই উপযোগী হবে যাতে যথেষ্ট পরিমাণ রুবিডিয়াম আছে ও তেজস্ক্রিয়তাজাত নয়, এ রকম ষ্ট্রন্‌সিয়াম থেকে মুক্ত। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযোগী হচ্ছে পেগমাটাইট প্রস্তরের অভ্র, বিশেষ করে লেপিডোলাইট জাতীয় অভ্র, যাতে রুবিডিয়ামের পরিমাণ শতকরা ১'৫। এছাড়া হাইড্রোর্থাম্যাল মাইক্রোক্লিন রুবিডিয়ামবিশিষ্ট মাস্‌কোভাইট প্রভৃতি নিয়েও কাজ স্বরু হতে পারে।

কিছুদিন হলো আমাদের দেশের তেজস্ক্রিয় খনিজ থেকে বয়স নির্ণয়ের কাজ স্বরু হয়েছে। এসব কাজ থেকে ভারতের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের প্রাচীনতম আর্কিয়ান যুগের জ্ঞান অনেকখানি এগিয়ে গেছে। ভূতাত্ত্বিক জ্ঞানের সহযোগিতায় বিভিন্ন পাথরের বয়স নির্ণয়ের ফলে কয়েকটি পর্বত অভ্যুত্থানের যুগ নির্ণীত হয়েছে ও বিভিন্ন পর্বত অভ্যুত্থানের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত খনিজ থেকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে কাজ হয়েছে, তবে তার মধ্যে তেজস্ক্রিয় ভারী ধাতুর খনিজ নিয়ে সীসা-অনুপাত পদ্ধতিতেই কাজ হয়েছে বেশী। বিভিন্ন পর্বত অভ্যুত্থানের যুগগুলির ক্রম এই রকম—

পর্বত অভ্যুত্থানের যুগ	খনিজ ও স্থান		পদ্ধতি	বয়স (লক্ষ বছর)
দিল্লী যুগ	ইউরেনিনাইট, রাজপুতানা		সীসা-থোরিয়াম ইউরেনিয়াম অনুপাত	৭৩৫০ ± ৫০
সাতপুরা যুগ	”	বিহার	”	৯৫৫০ ± ৪০০
পূর্বঘাট যুগ	মোনাজাইট,	উড়িষ্যা	”	২৫৭০০ ± ৭০০
ধারওয়ার যুগ	”	মহীশূর	”	২৩০০০ ± ১০০০
”	ফ্লগোপাইট	ত্রিবাঙ্কুর	রুবি/ষ্ট্রন্‌সিয়াম	১৬৩০০ ± ২০০০

সীসা-অনুপাত পদ্ধতিতে কয়লাখনি অঞ্চলের আগ্নেয় শিলা ও রাজমহল লাভার বয়স নির্ণয়ের চেষ্টা হয়েছে। কয়লাখনি অঞ্চলের ডাইক-এর বয়স বেরিয়েছে ৩ কোটি থেকে ৮ কোটি বছর। বয়সের এই বিরাট পার্থক্য থেকে বোঝা যায় যে, এটি নির্ভরযোগ্য নয়। অপরপক্ষে একটি ক্ষেত্রে রাজমহল লাভার বয়স নির্ণয় করা হয়েছে ২'২ কোটি বছর, ভুতাত্ত্বিক প্রমাণের সঙ্গে যা মোটেই খাপ খায় না। স্বতরাং যথেষ্ট সাবধানতা সহকারে কাজ না করলে বিপদের আশঙ্কা আছে।

মেসোজোয়িক যুগের শেষে দক্ষিণ ভারতে যে বিরাট আগ্নেয়োচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছিল তার ভূতাত্ত্বিক বয়স নিয়ে কিছু সংশয় আছে। বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত ডেকান-ট্র্যাপ শিলা থেকে বয়স নির্ণয় করা হয়েছে; কিন্তু সংগৃহীত শিলার সঠিক ভূতাত্ত্বিক অবস্থান জানা না থাকলে এই ফল কাজে লাগানো সম্ভব নয়।

পাথর	হিলিয়াম অনুপাত	সীসা অনুপাত	লক্ষ বছরে বয়স	ভূতাত্ত্বিক বয়স
ব্যাসাল্ট	৪'১৯		৩৭০	আদি ইয়োসিন
অ্যাণ্ডিসাইট		০'০০৬	৪৫৬	অলিগোসিন
ব্যাসাল্ট		০'০০৯	৬৮৪	আদি ইয়োসিন

আশা করা যায়, বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করে ভারতের বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক সমস্যার সমাধান দ্রুততর হবে। তবে সব সময়েই সমস্যা সমাধানে পদার্থবিদ্যা ও ভূবিদ্যার সংযুক্ত প্রয়াসের প্রয়োজন।

সঞ্চয়ন

টাইফাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামী শহীদ

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে চেক বিজ্ঞানী ষ্ট্যানিস্লাভ প্রোভাজেকের নাম অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। টাইফাস রোগের বিরুদ্ধে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সংগ্রামে তিনি অমর শহীদ।

যে কারণে টাইফাস রোগের উৎপত্তি হয় তাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে রিকেট্‌সিয়া প্রোভাজেকি।

টাইফাস ভয়ঙ্কর সংক্রামক রোগ। এই রোগের লক্ষণ হলো—প্রথমে জ্বর দেখা দেয়, তারপর রোগীর শরীরের নানা জায়গায় গুটির মত ফুলে ওঠে। তাই সেকালের চিকিৎসকেরা এই রোগের নাম দিয়েছিলেন এক্সান্থেমা—অর্থাৎ কুঁড়ি ফোটা। চিকিৎসা-শাস্ত্রের পরিভাষায় এই ভয়ঙ্কর রোগের অন্যতম নাম টাইফাস এক্সান্থেম্যাটিক্স।

এই টাইফাস মহামারী অতি পুরাতন। বহু নগর, এমন কি বহু দেশ পর্যন্ত এই টাইফাস মহামারীতে উচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ইতিহাসের নজির থেকে দেখা যাচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে বড় বড় সামরিক অধিনায়কদের পরিবর্তে এই টাইফাসই বড় রকম যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণ করেছে। যেমন, ১১৬৭ খৃষ্টাব্দের ২রা অগাষ্ট জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক বার্বারোসা এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে রোম অবরোধ করেন। রোম তখন নিতান্তই হৃতবল। কিন্তু তবু মাত্র চার দিনের মধ্যেই জার্মান বাহিনী সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। জার্মান সেনাদের উপর টাইফাস মহামারীর আক্রমণই ছিল এর কারণ।

১২৮৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের তৃতীয় ফিলিপকে স্পেন থেকে পশ্চাদপসরণ করতে হয় ফরাসী সৈন্যদের মধ্যে টাইফাস মহামারী দেখা দেবার ফলেই স্পেনের সেনাবাহিনী তখন তাঁর পিছনে তাড়া করে ফ্রান্সের মধ্যে ঢুকে পড়ে। কিন্তু খুব শীঘ্রই তাদেরও পশ্চাদপসরণ করতে হয় ওই একই কারণে। স্প্যানিশ সৈন্যেরা টাইফাসে আক্রান্ত হয়ে দলে দলে মৃত্যুবরণ করতে লাগলো। ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে এই রকম আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যায়।

সুতরাং এই ব্যাধির কারণ সম্পর্কে প্রাচীন কাল থেকেই অনুসন্ধান চালিয়ে আসা হচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই এর কোন প্রতিকার করা সম্ভব হয় নি। ব্যাপারটা এতই রহস্যময় যে, মধ্যযুগে সাধারণ লোকের বিশ্বাস ছিল—এই ব্যাধির প্রকোপের সঙ্গে গ্রহ-নক্ষত্রের কোন যোগাযোগ অথবা ধূমকেতুর আবির্ভাব বা ওই রকম কোন কিছুর অশুভ সম্পর্ক আছে। কিন্তু কুসংস্কারের গণ্ডী পেরিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানেও বহুকাল পর্যন্ত টাইফাসের উৎপত্তি ও নিরাময়ের ব্যাপার রহস্যাচ্ছন্নই থেকে যায়। বিজ্ঞানীরা টাইফাসের ব্যাসিলাস আবিষ্কারে সমর্থ হন নি।

এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন; কারণ, টাইফাসের কোন ব্যাসিলাসই নেই। এই ব্যাপারটা প্রমাণিত হয়েছে পরবর্তীকালে।

ইতিমধ্যে ১৮৭৫ সালের ২রা অক্টোবর দক্ষিণ-বোহেমিয়ার এক শহরে সমরবিভাগের এক কর্ণেলের ঘরে এক শিশু জন্মগ্রহণ করে। এই শিশুই পরবর্তী জীবনে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে অমর স্বাক্ষর রেখে যায়। ছ'বছর বয়সে ষ্ট্যানিস্লাভকে সেই শহরের এক চেক স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। ষ্ট্যানিস্লাভের সেই

সময়কার পরীক্ষায় ফলাফলের খতিয়ানগুলি এখনও সেই স্কুলে সযত্নে রক্ষিত আছে, এক মূল্যবান দলিল হিসাবে। এই দলিলপত্র থেকে দেখা যায়, ষ্ট্যানিস্লাভ খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং মাত্র দশ বছর বয়সেই কর্তৃপক্ষ তাঁকে উচ্চতর বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার ছাড়পত্র দিয়েছিলেন।

ষ্ট্যানিস্লাভের পাঠ্যের মধ্যে জরুরী বিষয় ছিল—বাইবেল, অঙ্ক আর চেক ব্যাকরণ। এই তিনটি বিষয়ে বরাবরই তিনি উচ্চ নম্বর পেয়ে এসেছেন। কিন্তু তিনি যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে একদিন অবিস্মরণীয় হয়ে উঠবেন, তার কোন পরিচয় ছাত্রজীবনের নথিপত্র থেকে পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে তিনি প্রাণী-বিজ্ঞানে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভের পর প্রাণী-বিজ্ঞানের অধ্যাপনায় ব্যাপৃত হন এবং এই বিষয়ে গবেষণায় মনোনিবেশ করেন।

এই প্রাণী-বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণার দিক থেকেই ষ্ট্যানিস্লাভ প্রোভাজেক প্যারাসাইটোলজির অনুশীলন সুরু করেন।

প্যারাসাইটোলজি সম্বন্ধে এই আগ্রহ থেকেই ষ্ট্যানিস্লাভ প্রোভাজেক টাইফাসের রহস্য অনুসন্ধানের দিকে আকৃষ্ট হন। ইতিমধ্যেই বৈজ্ঞানিকেরা আলোচনা করছিলেন যে, টাইফাসের যখন কোন ব্যাসিলাস নেই, তখন সম্ভবতঃ এই রোগের মূলে আছে কোন প্যারাসাইট—অর্থাৎ এমন কোন জীব যা অন্য প্রাণীদের দেহ থেকে জৈবশক্তি আহরণ করে বেঁচে থাকে এবং বংশবৃদ্ধি করে। বৃটিশ বিজ্ঞানী ডাক্তার হাওয়ার্ড টাইলর রিকেট্স্ ছিলেন এই থিয়োরির অগ্রণী প্রবক্তা। ১৯১০ সালে মেক্সিকোয় এই টাইফাস মহামারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে ডাক্তার রিকেট্স্ মারা যান।

ষ্ট্যানিস্লাভ প্রোভোজেকই প্রথম এই থিয়োরিটিকে তথ্যাদি দিয়ে প্রমাণিত করেন। তিনি আবিষ্কার করেন যে, টাইফাসের কারণ হলো এক ধরণের প্যারাসাইট। উকুনের অন্ত্রের মধ্যে এরা বেঁচে থাকে। এ হলো এক ধরণের অতিক্ষুদ্র জীব বা মাইক্রো-অর্গ্যানিজম। ষ্ট্যানিস্লাভ প্রোভোজেকই প্রথম এই প্যারাসাইটকে উকুনের দেহ থেকে পৃথক করে দেখাতে সক্ষম হন। কিন্তু এ কাজে তাঁকে প্রাণ দিতে হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে জার্মেনীর কটবাস নামক স্থানে যুদ্ধবন্দীদের শিবিরে টাইফাস মহামারীর আকারে দেখা দেয়। জার্মান গভর্ণমেণ্ট তখন কয়েকজন টাইফাস বিশেষজ্ঞের সাহায্য চেয়ে পাঠান। প্রোভোজেক সানন্দে এই কাজে রাজী হন—কারণ এ ক্ষেত্রে তিনি প্রত্যক্ষভাবে টাইফাস সম্বন্ধে আরও বেশী তথ্য ও জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। মহামারীতে আক্রান্ত এই বন্দীশিবিরে এসে হাজির হলেন মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ দু'জন নির্ভীক বিজ্ঞানব্রতী। একজন হলেন ব্রেজিলের চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ডাঃ ডা-রোচী লিমা, অন্যজন চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাণিতত্ত্ববিদ্ ষ্ট্যানিস্লাভ প্রোভোজেক।

এখানেই টাইফাস-প্যারসাইট সম্পর্কে গবেষণার কাজে আরও কিছুটা অগ্রসর হওয়ার পর ষ্ট্যানিস্লাভ প্রোভোজেক টাইফাস রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯১৫ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী মৃত্যুমুখে পতিত হন।

টাইফাস-প্যারাসাইট তত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা হাওয়ার্ড টাইলর রিকেট্স্ এবং এই প্যারাসাইটের আবিষ্কারক ষ্ট্যানিস্লাভ প্রোভোজেকের নামেই ডাক্তার ডা-রোচী লিমা এই প্যারসাইটের নামকরণ করেন—রিকেট্সিয়া প্রোভাজেকি।

ডাক্তার রিকেট্স্ এবং ষ্ট্যানিস্লাভ প্রোভাজেক টাইফাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দুই অমর শহীদ।

শিশুচন্দ্রের গতিপথে

সোভিয়েট উপগ্রহ সম্বন্ধে কে. গাবেলিয়েফ লিখিয়াছেন—মহাশূন্যে ভ্রাম্যমান যে কোন পদার্থের মতই সোভিয়েট কৃত্রিম উপগ্রহটি পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। যে নিয়মে চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে অথবা পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, গ্রহ-উপগ্রহের গতি-বিজ্ঞান সংক্রান্ত সেই নিয়মেই কৃত্রিম উপগ্রহটি পৃথিবী পরিক্রমা করিতেছে।

কৃত্রিম উপগ্রহটির পৃথিবী পরিক্রমার গতিবেগ প্রচণ্ড। পৃথিবীর আকর্ষণ যদি না থাকিত তাহা হইলে উহা বায়ুহীন মহাশূন্যে এক সরল রেখায় বরাবর একই বেগে চলিতে থাকিত। কিন্তু পৃথিবীর আকর্ষণ ইহার গতিপথকে যে ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তাহার ফলেই সে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া থাকে।

ব্যাপারটি হইল—দড়ির একপ্রান্তে বাঁধা একটি ঢিলকে যেন অন্য প্রান্তটিকে মুঠায় ধরিয়া চক্রাকারে ঘুরাইবার মত। দড়ির টানে যেমন ঢিলটি ঘুরিয়া থাকে, তেমনই পৃথিবীর আকর্ষণের টানে উপগ্রহটি ঘুরিতেছে। কিন্তু একটা তফাৎও আছে—উপগ্রহটির উপরে পৃথিবীর আকর্ষণের একটা নির্দিষ্ট মাত্রা আছে। পৃথিবীর এই আকর্ষণ শক্তির সঙ্গে সাম্য রক্ষা করিবার জন্য উপগ্রহটির একটি নির্দিষ্ট বেগ থাকা চাই, যাহাতে উহা নিজের কক্ষপথে থাকিতে পারে। ভূপৃষ্ঠের উপরে যতটা দূরত্বে উপগ্রহটি ঘুরিতেছে, তাহা অপেক্ষাকৃত কম। এই দূরত্বে আবর্তন করিবার জন্য উহার বেগ হওয়া চাই মোটামুটি প্রতি সেকেণ্ডে ৮ কিলোমিটার বা ৫ মাইল।

আরও ভারী উপগ্রহ ছাড়িবার আগে অন্যান্য কতকগুলি বাড়তি অসুবিধা কাটাইয়া ওঠা চাই। এই জন্যই এই ধরণের আরও ভারী উপগ্রহ ছাড়িবার ব্যাপারটি বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এর এক নূতন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করিবে।

পৃথিবী হইতে যত দূরে যাওয়া যাইবে, পৃথিবীর আকর্ষণও ততই হ্রাস পাইবে। সুতরাং দূরতর কক্ষপথে ভ্রাম্যমান উপগ্রহের বেগ হইবে অপেক্ষাকৃত কম। পৃথিবী হইতে হাজার কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে থাকিয়া বিভিন্ন কক্ষপথে যে সকল উপগ্রহ ঘুরিবে, সেগুলির বেগের খুব বেশী তারতম্য হইবে না। কিন্তু ভূপৃষ্ঠ হইতে খুব বেশী দূরে থাকিয়া যে উপগ্রহ পৃথিবী পরিক্রমা করিবে তাহার বেগ হইবে রীতিমত কম। যেমন, চাঁদ পৃথিবীর একটি উপগ্রহ—কিন্তু পৃথিবী হইতে প্রায় ৩,৮০,০০০ কিলোমিটার দূরত্বে থাকিবার ফলে উহা প্রতি সেকেণ্ডে ১ কিলোমিটার গতিতে চলে। কৃত্রিম উপগ্রহটির কক্ষপথ পৃথিবীর খুব কাছাকাছি হইবার ফলে উহার গতি হইল চাঁদের গতিবেগের প্রায় ৮ গুণ বেশী।

কিন্তু কৃত্রিম উপগ্রহটির একবার পৃথিবী বেষ্টন করিয়া আসিতে যে সময় লাগে, চাঁদের যে তাহা হইতে ৮ গুণেরও অনেক বেশী সময় লাগে তাহার কারণ, কৃত্রিম উপগ্রহটি ২৪ ঘণ্টায় পনেরো বার পৃথিবী পাক দিতেছে, আর চাঁদের একপাক পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে লাগে প্রায় এক মাস।

উপগ্রহটিকে উহার নির্দিষ্ট কক্ষপথে ছাড়িবার জন্য উহাকে বিরাট একটি উচ্চতায় বহন করিয়া লইয়া যাওয়া দরকার এবং সেই উচ্চতায় নির্দিষ্ট কক্ষপথে যাহাতে উহা ঠিকমত চলে তাহার জন্য উহাতে প্রয়োজনীয় বেগও সঞ্চারিত করা দরকার।

কক্ষপথে ঘুরিবার জন্য উপগ্রহটিতে বাড়তি কোন শক্তি সঞ্চার করিবার দরকার হয় না। পরিবাহী রকেটটি উহাতে যে প্রাথমিক বেগ সঞ্চার করে তাহারই শুধু প্রয়োজন।

পৃথিবীর চারিদিকের মহাব্যোম সম্পর্কে অনুশীলন চালাইবার জন্য আরও যে বহু কৃত্রিম উপগ্রহ ছাড়া হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিভিন্ন উচ্চতায়

থাকিয়া এই উপগ্রহগুলি পৃথিবী পরিক্রমা করিবে। কতকগুলির কক্ষপথ হইবে ১০০০ কিলোমিটারেরও বেশী উচ্চতায়।

একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, নির্দিষ্ট উচ্চতায় এক বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরিবার জন্য উপগ্রহটির এক নির্দিষ্ট গতি থাকা দরকার। ইহার গতিবেগ যদি প্রয়োজনীয় গতিবেগ অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর আকর্ষণের পক্ষে উপগ্রহটিকে উহার ঋজু পথ হইতে সরাইয়া আনা হইবে সহজতর। উপগ্রহটির গতিপথ সেক্ষেত্রে বাঁকিয়া পৃথিবীর দিকে নামিয়া আসিবে এবং পড়িয়া যাইতে থাকিবে। কিন্তু এই গতিবেগ যদি প্রয়োজনীয় গতিবেগ অপেক্ষা সামান্য কম হয়, তাহা হইলে উপগ্রহটি অল্প একটুখানি নামিয়া আসিবে এবং এই নামিয়া আসিবার সময় সে আবার কিছুটা গতি অর্জন করিবে যাহার ফলে সে তাহার পূর্ববর্তী উচ্চতা ফিরিয়া পাইবে। এই নামিয়া আসা আর পূর্বতন উচ্চতায় ফিরিয়া যাওয়ার ব্যাপারটির প্রত্যেকটি পাক দিবার কালে ক্রমান্বয়ে পুনরাবৃত্তি ঘটিবে। উপগ্রহের গতি যদি প্রয়োজনীয় গতিবেগ অপেক্ষা অনেক কম হয়, তাহা হইলে উহা অনেকখানি নামিয়া আসিবে এবং বায়ুমণ্ডলের ঘন স্তরগুলির মধ্যে প্রবেশ করিবে। বাতাসের সহিত সংঘর্ষের ফলে উহার শক্তিহ্রাস ঘটিবে। ফলে, পূর্বতন উচ্চতায় ফিরিয়া যাওয়া আর উহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। উহা যতই নীচের দিকে নামিবে, বাতাসের সহিত ক্রমবর্ধমান সংঘর্ষের ফলে ততই উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে এবং শেষ পর্যন্ত জ্বলিয়া উঠিয়া পুড়িয়া যাইবে।

প্রতি সেকেণ্ডে এই আট কিলোমিটার গতিকে বলা হয়, প্রাথমিক মহাজাগতিক গতি; অর্থাৎ পৃথিবীর কাছাকাছি কক্ষপথে ভ্রাম্যমান এক উপগ্রহ সৃষ্টি করিবার পক্ষে প্রয়োজনীয় গতি। সেকেণ্ডে ১১.২ কিলোমিটার গতিকে বলা হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের মহাজাগতিক গতি; অর্থাৎ ইহা হইল সেই গতি যাহা কোন জিনিষকে পৃথিবীর টান কাটাইয়া গিয়া আন্তর্গ্রহ-জগতে সৌরমণ্ডলীর এক নূতন গ্রহ হিসাবে প্রেরণ করিতে সক্ষম হইবে।

বায়ুমণ্ডলের অতি উচ্চ স্তরগুলির ঘনত্ব সম্পর্কে যেসব তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে রকেট ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বর্তমান অবস্থায় এমন উপগ্রহ ছাড়া সম্ভব যাহার অস্তিত্ব থাকিবে কয়েক কুড়ি বৎসর —এমন কি, কয়েক শত বৎসর ধরিয়াও বজায় থাকিতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে উহা পৃথিবীর এক চিরস্থায়ী উপগ্রহে পরিণত হইবে। আকাশে উহার অবস্থান-বিন্দুগুলি বহু পূর্ব হইতেই নিখুঁতভাবে হিসাব করিয়া রাখা যাইবে। এক হাজার কিলোমিটারেরও বেশী উচ্চতায় এক কক্ষপথে যদি আমরা কোন উপগ্রহ পাঠাইতে পারি, তাহা হইলে উহা কার্যতঃ বায়ুহীন শূন্যদেশেই গিয়া পৌঁছাইবে এবং অনির্দিষ্ট কালের জন্য ঘুরিতে থাকিবে।

সোভিয়েট-নির্মিত এই প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ হইল মহাব্যোমকে জয় করার পথে প্রথম পদক্ষেপ। এমন দিন খুব দূরে নহে যখন আমাদের সমসাময়িকদের মধ্যেই কেহ কেহ সম্ভবতঃ চাঁদে অথবা সৌরমণ্ডলীর অন্যান্য গ্রহে যাত্রী হিসাবে অংশ গ্রহণ করিবে।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার প্রসঙ্গে দুই জন রুশ বিজ্ঞানী

আচার্য জগদীশচন্দ্রের বিংশতিতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এম. রাদোভস্কি লিখিয়াছেন—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর খ্যাতি তাঁহার নিজ দেশের চতুঃসীমার বাহিরে বহুদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। রাশিয়ায় তাঁহার নাম ছিল সুপরিচিত এবং রুশ বিজ্ঞানীরা তাঁহাদের এই ভারতীয় সহকর্মীর

বৈজ্ঞানিক অবদানকে অতি উচ্চ মর্যাদা দিয়াছিলেন।

জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের যে দুইটি শাখায় কাজ করিতেছিলেন, রুশ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে দুই জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীও সেই একই শাখায় গবেষণা করিতেছিলেন। ইঁহাদের একজন হইলেন বেতার-বার্তা প্রেরক যন্ত্রের আবিষ্কর্তা এ. এস. পোপফ এবং অন্যজন হইলেন সুবিখ্যাত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী এ. কে. তিমিরিয়াজেফ।

পোপফের রচনাবলী ও চিঠিপত্র হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি, ইউরোপের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকায় জগদীশচন্দ্রের গবেষণার খবরাখবর প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পোপফ তাঁহার সম্বন্ধে জানিতে পারেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেণ্ট অব সায়েন্স-এর এক সম্মেলনে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু যে নিবন্ধ পাঠ করেন, সেই নিবন্ধের কথা পোপফ তাঁহার একটি চিঠিতে উল্লেখ করেন। সেই বৎসরেই ইলেকৃট্রিসিয়ান নামক বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশিত জগদীশচন্দ্রের একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পোপফ একটি চিঠিতে লেখেন—

ইংরেজী পত্রিকা 'নেচার'-এর অক্টোবর (১৮৯৬) সংখ্যায় বৃটিশ বিজ্ঞান পরিষদের সম্মেলনের এক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই সম্মেলনের একটি অধিবেশনে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ অনুশীলনের জন্য অধ্যাপক বসু কর্তৃক আবিষ্কৃত যন্ত্রটির কার্যকারিতা প্রদর্শন করা হয়।

...১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে অলিভার লজ যে যন্ত্রটির কার্যকারিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, বসুর এই যন্ত্রটি হইল তাহারই এক পরিবর্তিত রূপ। লজ এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি স্বীকার করেন যে, অধ্যাপক বসুর এই যন্ত্রটি তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্র হইতে অধিকতর সূক্ষ্ম এবং অধিকার নির্ভরযোগ্য*।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে রাশিয়ার ভৌত-রাসায়ন বিজ্ঞান সমিতির (রাশিয়ান ফিজিকো-কেমিক্যাল সোসাইটি) সভায় পোপফ তাঁহার যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন, তাহার পরে—অর্থাৎ বেতার-বার্তা প্রেরণ আবিষ্কৃত হইবার পরে, অধ্যাপক বসুর পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাহা হইলেও এই ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের নাম বেতার আবিষ্কারের পথপ্রদর্শক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ইতিহাসের সহিত চিরকালের জন্য যুক্ত হইয়া আছে এবং পোপফ জগদীশচন্দ্রকে সর্বদাই তাঁহার পূর্বসূরীদের অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

রাশিয়ার সংবাদপত্রগুলি আচার্য জগদীশচন্দ্রের গবেষণার উপরে বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী ক্রোন্সটাদ্ হইতে প্রকাশিত কোটলিন নামক সংবাদপত্রটি লিখিয়াছেন—অধ্যাপক বসু তাঁহার আবিষ্কৃত যান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্যে আলোক-প্রতিরোধক অনচ্ছ জিনিষের ভিতর দিয়া ১,৫০০ মিটার দূরত্বে আলোক-সংকেত প্রেরণে সক্ষম হন। বৈদ্যুতিক স্পন্দনকে আলোক-তরঙ্গে রূপান্তরিত করিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহী তার ব্যবহার না করিয়াই কয়েক মাইল ব্যাসার্ধ জুড়িয়া এলাকার মধ্যে সংকেত প্রেরণ করা যাইতে পারিবে। এইভাবে কুয়াশার মধ্যে সমুদ্রের বুকে প্রায়ই যে সকল দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে তাহা বন্ধ করা সম্ভব হইবে।

উদ্ভিদের শারীরবৃত্ত সম্পর্কে অধ্যাপক বসুর গবেষণাও বিজ্ঞানের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কে. এ. তিমিরিয়াজেফ তাঁহার বিভিন্ন রচনায় আচার্য জগদীশচন্দ্রের উদ্দেশে যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন, জগদীশচন্দ্রের জীবনচরিত-কারেরা তাহার উল্লেখ না করিয়া পারেন না। তিমিরিয়াজেফ তাঁহার একটি প্রবন্ধে

---

* এ. পোপফের বেতার আবিষ্কার সংক্রান্ত নথিপত্রের সংগ্রহ-গ্রন্থ। সোভিয়েট বিজ্ঞান পরিষদের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। ১৯৪৫ পৃঃ ৬৬

(১৬২০-১৯২০ পর্যন্ত তিন শতাব্দীব্যাপী প্রকৃতি-বিজ্ঞানের উন্নয়ন সম্পর্কে একটি নিবন্ধ) বিজ্ঞানের প্রগতির পর্যালোচনা করেন। তাঁহার আর একটি প্রধান রচনা হইল—বিংশ শতকের প্রারম্ভে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের কয়েকটি প্রধান সাফল্য। এই দুইটি প্রবন্ধেই এই বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্রের গবেষণার বিস্তৃত পর্যালোচনা করিয়াছেন।

তিমিরিয়াজেফের মতে, জগদীশচন্দ্রের গবেষণাগুলির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, উদ্ভিদের শারীর-বৃত্তের অনুশীলনে নিখুঁত পদার্থ-বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ-পদ্ধতিগুলির এক অতীব উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এই ভারতীয় বিজ্ঞানীর গবেষণা-কার্যের তাৎপর্যকে চিহ্নিত করিতে গিয়া তিমিরিয়াজেফ লিখিয়াছেন—শুধু তাঁহার (জগদীশচন্দ্রের) নামটিই বিশ্ব-বিজ্ঞানের ক্রমোন্নয়নে এক নূতন যুগকে চিহ্নিত করিতেছে।*

* কে. এ. তিমিরিয়াজেফের সম্পূর্ণ রচনাবলী। ৮ম খণ্ড। সোভিয়েট বিজ্ঞান পরিষদের প্রকাশন-বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। ১৯৩৯। পৃঃ ১৭৮।
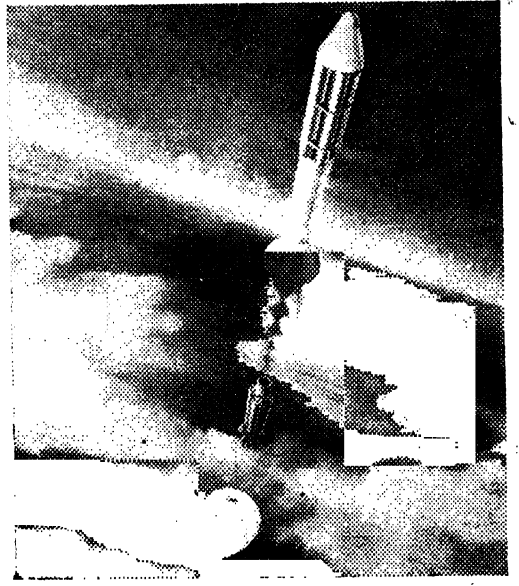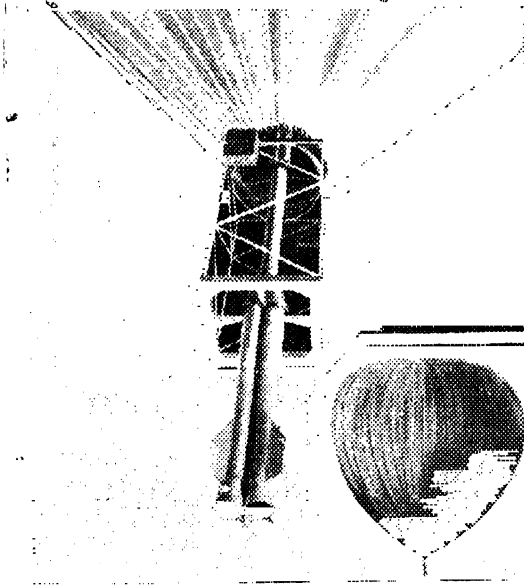
যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনী একটি বৃহৎ বেলুনের সাহায্যে ১০০,০০০ ফুট উপর থেকে চার পর্যায়ের একটি রকেট ছাড়বার পরিকল্পনা সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন। ২৩ ফুট লম্বা ও ১,৯০০ পাউণ্ড ওজনের এই রকেটটি ৩,৭৫০,০০০ ঘন ফুট পরিমিত বেলুনের নিম্নভাগ থেকে ছাড়া হবে। বিজ্ঞানীদের ধারণা—এই রকেটটির গতিবেগ ঘণ্টায় ১৭,০০০ মাইলেরও বেশী হবে। বিশেষভাবে পরিকল্পিত একটি আধারে জটিল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদিও থাকবে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে—বাঁ-দিকে ২০০ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট বেলুনবাহিত রকেটটি উর্ধ্বাকাশে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে (ভিতরে বেলুন ও চার পর্যায়ের রকেটের তুলনামূলক আকৃতি)। দক্ষিণে—দ্বিতীয় পর্যায়ের রকেট থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর রকেট উর্ধ্বাকাশে ধাবিত হচ্ছে।

লৌহ ও অঙ্গারের সম্বন্ধ

শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়

সাধারণ ইস্পাত এবং ঢালাই লোহার মধ্যে অঙ্গারই হইতেছে প্রধান নায়ক। এই নায়কের কার্যকারিতা সুদূর প্রসারী। কিন্তু সে কথা বলিবার পূর্বে লৌহের স্বাভাবিক গুণাগুণের বিষয় আলোচনা করা দরকার।

পার্থিব জগতে দেখা যায়—একই পদার্থ বিভিন্ন রূপে অবস্থান করে; যেমন—অঙ্গার। ইহাকে নয়টি বিভিন্ন রূপে পাওয়া যায়। হীরা, গ্র্যাফাইট, কাঠকয়লা, কয়লা, ভুষা, গ্যাসকয়লা ইত্যাদি। সবগুলিই অঙ্গার, তবে প্রত্যেকটিরই রূপ বিভিন্ন। অনেক পদার্থেরই এই রকম বিভিন্ন রূপ আছে। লৌহেরও আছে। লোহাকে যদি খুব উচ্চ তাপে —ধরা যাক, ১৬০০° তাপে গলাইয়া ঠাণ্ডা হইতে দেওয়া যায় এবং তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে এই পড়ন্ত তাপ সঠিকভাবে মাপা যায় তবে দেখা যাইবে যে, এই পড়ন্ত তাপ ঠিক ধাপে ধাপে শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া কমিতেছে না। এক এক জায়গায় আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া ঠিক ধাপে ধাপে নিয়মমত পড়িতে থাকে। প্রথম থমকিয়া দাঁড়ায় ১৫৩০° ডিগ্রি তাপে, অর্থাৎ ১৫৩০°-তে তাপ কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকে, পড়িতে চাহে না। এই তাপে লৌহ জমাট বাঁধিতে থাকে বা তরল হইতে কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। কঠিন পদার্থে পরিণত হইবার পরেও তাপ মাপিলে দেখা যাইবে, আবার তাপ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে ১৪০০° ডিগ্রিতে। ইহার পর তাপমান যন্ত্র আরও দুইবার হোঁচট খায় ৯০০° ডিগ্রি এবং ৭৭০° ডিগ্রিতে। তারপর কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। পদার্থটি একেবারে ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত তাপের মাত্রা নিয়মিতভাবেই কমিতে থাকে। এই যে হোঁচট খাওয়া এর আসল রহস্য কি? রঞ্জেন রশ্মির পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, এই সময় পরমাণুগুলির মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটে। এই পারমাণবিক পরিবর্তনই হোঁচট খাওয়ার জন্য দায়ী। এক একবার হোঁচট খাওয়ার সঙ্গে লৌহের এক একটা নূতন রূপ দেখা দেয়। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, লৌহ তিনটি বিভিন্ন রূপে (অ্যালোট্রপিক ফর্মে) অবস্থান করে।

সাধারণ তাপ হইতে ৯০০° ডিগ্রির মধ্যে যে রূপ তাহার নাম আল্‌ফা-লোহা। ৯০০° ডিগ্রি হইতে ১৪০০° ডিগ্রীর মধ্যেকার রূপের নাম গামা-লোহা। ১৪০০° ডিগ্রি হইতে ১৫৩০° ডিগ্রির মধ্যেকার রূপের নাম ডেল্টা-লোহা। ৭৭০°-৯০০° ডিগ্রির মধ্যেকার লোহার রূপকে আগে বিটা-লোহা বলা হইত বটে, কিন্তু পরে দেখা গেল যে, আল্‌ফা-লোহা এবং বিটা-লোহা একই পদার্থ। প্রভেদ শুধু আল্‌ফা-লোহা চুম্বকধর্মী এবং বিটা-লোহা চুম্বকধর্মী নয়। আজকাল আরও প্রমাণিত হইয়াছে যে, আল্‌ফা-লোহা এবং ডেল্টা-লোহাও এক জিনিষ। সুতরাং লৌহের সর্বশেষ রূপ দাঁড়াইল দুইটি—আল্‌ফা-লোহা এবং গামা লোহা। গামা লোহার অঙ্গার দ্রবীভূত করিবার ক্ষমতা আছে; সেই তুলনায় আল্‌ফা-লোহার ক্ষমতা খুবই কম। এই গুণটি, অর্থাৎ অঙ্গার দ্রবীভূত করিবার ক্ষমতার উপর ইস্পাতের তাপ-শোধন প্রণালী সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। এই ৯০০° ডিগ্রি এবং ১৪০০° ডিগ্রি তাপাঙ্ক, যে তাপে লোহা আল্‌ফা হইতে গামায় এবং গামা হইতে ডেল্টায় রূপান্তরিত হয়, ইহাদিগকে বলা হয় সঙ্কট-তাপাঙ্ক বা ক্রিটিকাল পয়েন্টস্।

আল্‌ফা-লোহা হইতে গামা-লোহায় রূপান্তরটা উভয়মুখী। ইহার জন্য দায়ী পরমাণুগুলির অবস্থান বা রূপসজ্জা। রূপান্তরের সঙ্গে তাহাদের অবস্থানের বা রূপসজ্জারও পরিবর্তন ঘটে। এইরূপ না ঘটিলে তাঁপ শোধনে কোন ফলই পাওয়া যাইত না। অবশ্য বিশুদ্ধ লোহার পক্ষে এরূপ সজ্জার অদল-বদলে কিছু যায় আসে না। যায় আসে ইস্পাতের বেলায়, যেখানে অঙ্গার বর্তমান। অঙ্গার বর্তমান থাকিলে উহার সহিত আল্‌ফা-লোহা এবং গামা-লোহার সম্বন্ধ বিভিন্ন রকমের হইয়া থাকে এবং ইহারই উপর তাপ শোধনের অনেক কিছুই নির্ভর করে।

বিশুদ্ধ লোহার গলনাঙ্ক ১৫৩০°। কিন্তু অঙ্গার থাকিলে এই গলনাঙ্ক ক্রমশঃই কমিতে থাকে; যেমন, সোনার সঙ্গে সোহাগার সংযোগে উহার গলনাঙ্ক কমিয়া যায়। এই কমিবার হার নির্ভর করে অঙ্গারের পরিমাণের উপর। অঙ্গারের পরিমাণ বাড়িতে থাকিলে গলনাঙ্কও ১৫৩০° ডিগ্রি হইতে কমিয়া কমিয়া নীচের দিকে নামিতে থাকে। তবে ইহারও একটা সীমা আছে, যাহার পর অঙ্গারের পরিমাণ বাড়িতে থাকিলেও গলনাঙ্ক কমিতে চায় না। এই সীমা হইতেছে ১১২০° ডিগ্রি। ব্যাপারটা কি ঘটে, একটা সাধারণ উদাহরণের দ্বারা বুঝাইতে পারা যায়।

বিশুদ্ধ জল ঠাণ্ডা করিতে থাকিলে উহা শূন্য ডিগ্রিতে জমিয়া বরফে পরিণত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সব জলটা জমিয়া বরফে পরিণত না হয় ততক্ষণ তাপের মাত্রাও শূন্য ডিগ্রির নীচে নামে না। এখন জলে যদি খানিকটা নুন (শতকরা দুইভাগ আন্দাজ) দেওয়া যায় তাহা হইলে ঐ নোনা জলের হিমাঙ্ক শূন্য ডিগ্রিতে দাঁড়াইবে না, দাঁড়াইবে আরও নীচে। উহার হিমাঙ্ক হইতে প্রায় -২° ডিগ্রির কাছাকাছি। এখন উহার তাপ যদি -২° ডিগ্রিতে নামানো যায়, তাহা হইলে খানিকটা বরফ জমিয়া পৃথক হইয়া আসে এবং যে জল পড়িয়া থাকে তাহাতে লবণের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। এই ভাবে তাপ যতই কমিতে থাকে ততই বরফ জমিতে থাকে এবং জলে নুনের পরিমাণ ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে। যখন তাপের মাত্রা -২২° ডিগ্রিতে নামে, তখন শুধু বরফের পরিবর্তে সমস্ত নুন-জলটাই জমিয়া নোনা বরফে পরিণত হয়। এই নোনা বরফের মধ্যে থাকে ২৩.৫ শতাংশ নুন, আর বাকীটা জল। এখন জলে যদি ২৩.৫ শতাংশের বেশী নুন গোলা যায় এবং সেই জল যদি ঠাণ্ডা করা হয় তাহা হইলে দ্রবণটি হইতে প্রথমে অতিরিক্ত নুন তলানী হিসাবে পড়িতে থাকে, যতক্ষণ না নুনের ভাগ ২৩.৫ শতাংশে আসিয়া দাঁড়ায়। তখন এই নুন এবং জলের মিশ্রণটি একসঙ্গে -২২° ডিগ্রি তাপে জমিয়া নোনা বরফে পরিণত হয়। এইবার যদি জলে ঠিক ২৩.৫ শতাংশ নুন গোলা যায় এবং দ্রবণটিকে ঠাণ্ডা করা হয় তবে দেখা যাইবে যে, অতিরিক্ত কোন নুনই পৃথক হইয়া তলায় পড়িবে না বা জলও জমাট বাঁধিয়া বরফ হইবে না। কিন্তু তাপ যখন কমিতে কমিতে -২২° ডিগ্রিতে আসিবে তখন সমস্ত দ্রবণটি একসঙ্গে জমিয়া নোনা বরফে পরিণত হইবে। এখন দেখা যাইতেছে, এই নোনা বরফের গঠন সুনির্দিষ্ট (২৩.৫ শতাংশ নুন এবং বাকীটা জল) এবং উহার হিমাঙ্কও সুনির্দিষ্ট (-২২° ডিগ্রি)। ইহার কোন ইতরবিশেষ নাই। এই সুনির্দিষ্ট গঠনবিশিষ্ট নুন এবং জলের মিশ্রণটিকে বলা হয় ইউটেক্‌টিক এবং ঐ সুনির্দিষ্ট তাপকে বলা হয় ইউটেক্‌টিক তাপ।

লোহা এবং অঙ্গারের মধ্যেও এই ইউটেক্‌টিক মিশ্রণ আছে এবং তাপও আছে। বিশুদ্ধ জলের মত প্রত্যেক বিশুদ্ধ ধাতুরও নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক আছে। যদি ধাতুতে খাদ মিশাইয়া অবিশুদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে উহার গলনাঙ্ক কমিতে থাকে। এই কমিয়া যাওয়া নির্ভর করে খাদের পরিমাণের উপর। বিশুদ্ধ লোহার গলনাঙ্ক ১৫৩০° ডিগ্রি। গলিত লোহার মধ্যে যদি অঙ্গার প্রয়োগ করা যায় তাহা

হইলে লোহার সহিত অঙ্গারের প্রতিক্রিয়া হয় এবং লোহার কার্বাইড (Fe_3C) উৎপন্ন হয়। এই কার্বাইডের আলাদা কোন অস্তিত্ব থাকে না। গলিত লোহার মধ্যে ইহা দ্রবীভূত হইয়া থাকে; সুতরাং লোহার গলনাঙ্ক কমিতে থাকে—যেমন, জলের গলনাঙ্ক কমে নুন প্রয়োগে। অঙ্গারের পরিমাণ যদি ক্রমশঃই বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে লোহারও গলনাঙ্ক ধীরে ধীরে কমিতে থাকে। অবশ্য এই পরিমাণ বাড়াইবারও একটা সীমা আছে এবং গলনাঙ্ক কমিবারও একটা সীমা আছে। তরল অবস্থায় থাকে, তাপ কমিবার সঙ্গে সঙ্গে উহা কঠিন হইতে বা জমিতে সুরু করে। একটা কথা বলা দরকার, জমিতে সুরু করিবার অর্থ, সমস্ত পদার্থটি এক সঙ্গে জমিয়া কঠিন হওয়া নহে। সবে কঠিন রূপে পরিণত হইতে সুরু করা—সবে দানা বাঁধিতে আরম্ভ করা। এই অবস্থায় পদার্থটি থাকে খানিকটা তরল, খানিকটা কঠিন অবস্থায়।

১নং চিত্রে ক খ গ ঘ রেখাটিকে ধরা যাক। এই রেখা বরাবর লৌহ এবং অঙ্গারের ভিন্ন ভিন্ন মিশ্রণগুলি জমিতে সুরু করে। এই রেখার উপরের

১নং চিত্র

অঙ্গারের পরিমাণ ইচ্ছামত বাড়াইয়া গলনাঙ্ক খুসীমত কমান যায় না। অঙ্গারের বেলায় ৪·৩ শতাংশই হইতেছে উহার সীমা। সে ক্ষেত্রে লোহার গলনাঙ্ক নামিয়া আসে ১১৩৫° ডিগ্রিতে, অর্থাৎ লোহার মধ্যে অঙ্গারের পরিমাণ ৪·৩ শতাংশ হইলেই উহা ১১৩৫° ডিগ্রিতে গলিয়া যায়। ৪·৩ শতাংশের বেশী অঙ্গার প্রয়োগ করিলে গলনাঙ্ক না কমিয়া বাড়িতে থাকে। ১নং চিত্রে ক, খ, গ, ঘ রেখার সাহায্যে দেখান হইয়াছে, অঙ্গার প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে গলনাঙ্ক কেমনভাবে ধাপে ধাপে কমিতে থাকে। গলনাঙ্ক কমিবার অর্থ, ইস্পাতের কঠিনরূপ ধারণ করা, অর্থাৎ উচ্চতাপে যে ইস্পাত গলিয়া অংশে লৌহ এবং অঙ্গারের মিশ্রণ সব সময়েই তরল অবস্থায় থাকে। লৌহ এবং অঙ্গারের ভিন্ন ভিন্ন মিশ্রণগুলির গলনাঙ্ক ভিন্ন ভিন্ন। এই ভিন্ন ভিন্ন তাপ যদি রেখাচিত্রে আঁকা যায় তাহা হইলে ক, চ, ছ, গ রেখার উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ এই রেখা বরাবর লৌহ এবং অঙ্গারের মিশ্রণ এক সঙ্গে জমিয়া কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। তাহা হইলে এই রেখার তলার দিকে যে তাপ, সে তাপে লৌহ এবং অঙ্গারের মিশ্রণগুলি সব সময়েই কঠিন অবস্থায় থাকে। ইহার ঠিক উপরের অংশটি, অর্থাৎ ক খ গ ছ চ গণ্ডীর দ্বারা পরিবৃত অংশটিতে লৌহ এবং অঙ্গারের মিশ্রণগুলি কিছুটা কঠিন এবং

কিছুটা তরল অবস্থায় থাকে। এখানে নুন এবং জলের কথা স্মরণ করা দরকার। ক খ গ ছ চ এলাকাতে নোনা জল এবং বরফ এক সঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করে। চ ছ গ জ রেখার তলার দিকে নুন এবং জল একত্রে জমিয়া নোনা বরফে পরিণত হয়। এখানে একটা জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে। ছ, গ, জ একটি সমান্তরাল রেখা। ছ বিন্দুতে অঙ্গারের পরিমাণ ১.৭ শতাংশ। তাহা হইলে ১.৭ শতাংশের উপর অঙ্গারবিশিষ্ট লৌহের মিশ্রণগুলি একই তাপে জমিতে আরম্ভ করে। এই তাপ হইতেছে ১১৩৫° ডিগ্রি। -২২° তাপে নুন এবং জল যখন একসঙ্গে সবটাই জমাট বাঁধে তখন সে অবস্থাটিকে আমরা বলি ইউটেক্টিক। তাহা হইলে লৌহ এবং অঙ্গারের বেলায় ১১৩৫° ডিগ্রির তাপকে আমরা বলিব ইউটেক্‌টিক তাপ এবং মিশ্রণটিকে বলিব ইউটেক্‌টিক মিশ্রণ। ১১৩৫° ডিগ্রি তাপের উপরে যে কঠিন পদার্থটি বিচ্ছিন্ন হইয়া আসে তাহা বিশুদ্ধ লৌহ নহে। উহা লৌহ এবং লৌহ কার্বাইডের একটি দ্রবণ। তুঁতে যেমন একটি রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ অথবা জল যেমন একটা রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ, ইহা তেমন নহে। অথবা বালি এবং খড়িমাটির মত মিশ্রিত পদার্থও নহে। উহা লৌহের মধ্যে লৌহ কার্বাইডের একটি দ্রবণ। যেমন, জলের মধ্যে নুনের দ্রবণ। এই কঠিন পদার্থের দ্রবণটিকে বলা হয় অষ্টেনাইটিক।

অঙ্গারের মাত্রা যদি ৪.৩ শতাংশের বেশী হয়, সেক্ষেত্রে ১১৩৫° ডিগ্রির উর্ধ্বে যে কঠিন পদার্থ বিচ্ছিন্ন বা পৃথক হইয়া আসে তাহা অষ্টেনাইট নহে। উহাকে বলা হয় সিমেণ্টাইট। উহাকে লৌহের কার্বাইডও বলা হয় (F_3C)। উহা একটি যৌগিক পদার্থ। শুধু লৌহের কার্বাইডকেই সিমেণ্টাইট বলা হয় না, ইস্পাতের মধ্যে যে কোন কার্বাইডকে সিমেণ্টাইট বলা যাইতে পারে। যেমন, ক্রোমিয়াম কার্বাইড, ম্যাঙ্গানিজ কার্বাইড। ইহারাও সিমেণ্টাইট।

অষ্টেনাইট এবং সিমেণ্টাইটের পরে আরও দুইটি পদার্থ আছে। তাহাদিগকে বলা হয় ফেরাইট এবং পার্লাইট। উদাহরণ স্বরূপ ০.৬ শতাংশ অঙ্গারবিশিষ্ট একটা ইস্পাতের কথা ধরা যাক। মনে করা যাক, ইহাকে ১০০০ ডিগ্রি তাপ হইতে ঠাণ্ডা করা হইতেছে। ১০০০° ডিগ্রি তাপে ইহার মধ্যস্থিত দানাগুলির আকৃতি সব অষ্টেনাইটিক। তাপ যখন কমিতে কমিতে ৭৮০° ডিগ্রিতে আসিয়া দাঁড়ায় তখন ইহার মধ্য হইতে বিশুদ্ধ লৌহ পৃথক হইতে আরম্ভ করে। তাপ যত কমে, বিশুদ্ধ লোহার পরিমাণও তত বাড়ে; অর্থাৎ অষ্টেনাইটের দ্রবণ হইতে বিশুদ্ধ লোহা বেশী পরিমাণে পৃথক হইয়া আসিতে থাকে। এই বিশুদ্ধ লোহাকে বলা হয় ফেরাইট। অষ্টেনাইটের মধ্য হইতে যত বেশী লৌহ পৃথক হইয়া আসিতে থাকে, উহার মধ্যে অঙ্গারের পরিমাণ ততই বাড়িতে থাকে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, ৬৯৫° ডিগ্রি তাপে ঐ অষ্টেনাইট দ্রবণটির মধ্যে থাকে ০.৮৫ শতাংশ অঙ্গার। এখন হইতে, অর্থাৎ ৬৯৫° ডিগ্রি তাপে বিশুদ্ধ লোহার পরিবর্তে বিশুদ্ধ লোহা এবং লোহার কার্বাইড একত্রে পাশাপাশি অষ্টেনাইট হইতে পৃথক হইতে থাকে, ঠিক যেভাবে নুন এবং বরফ ইউটেক্‌টিক মিশ্রণ হইতে একত্রে পৃথক হইয়া আসে। তফাৎ এই যে, নুন জলের বেলায় নোনা-বরফ যেমন তরল দ্রবণ হইতে পৃথক হইতে থাকে, ইস্পাতের ক্ষেত্রে এই দুইটি পদার্থ তেমনি কঠিন দ্রবণ হইতে পৃথক হইয়া আসে। তরল পদার্থ হইতে পৃথক হয় বলিয়া প্রথমটিকে, অর্থাৎ নোনা-বরফকে বলা হয় ইউটেক্‌টিক মিশ্রণ। আর কঠিন পদার্থ হইতে পৃথক হয় বলিয়া ইস্পাতের ক্ষেত্রে ইউটেক্‌টিক না বলিয়া ইউটেক্‌টয়েড বলা হয়। এই ইউটেক্‌টয়েডের মধ্যে থাকে ০.৮৫ শতাংশ অঙ্গার। এই পদার্থটি বিশুদ্ধ লৌহ এবং লৌহের কার্বাইড অথবা সিমেণ্টাইটের একটি মিশ্রণ। এই ইউটেক্‌টয়েড মিশ্রণটিকেই বলা হয় পার্লাইট। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের

সাহায্যে দেখিলে উহা মুক্তার মত ঝক্‌মক করে বলিয়াই ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে পার্লাইট। এইস্থলে বলা যাইতে পারে যে, ৬৯১° ডিগ্রি তাপ ইস্পাতের আভ্যন্তরিক গঠন পরিবর্তনের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে।

গলিত লৌহকে যখন ঠাণ্ডা করা হয় তখন হোঁচট খাওয়ার কথা বলা হইয়াছে। নামিতে নামিতে তাপ এক এক জায়গায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, নামিতে চাহে না। এই তাপকে বলা হয় সন্ধিক্ষণ। এই সকল সন্ধিক্ষণে লোহা খানিকটা তাপ নির্গত করিয়া এক রূপ হইতে আর এক রূপে পরিবর্তিত হয়। যেমন ডেল্টা-লোহা হইতে গামা-লোহা, গামা হইতে বীটা-লোহা এবং বীটা হইতে আল্‌ফা-লোহায় পরিণত হইবার সময় এইরূপ তাপ নির্গত হয়।

লোহার মধ্যে অঙ্গার প্রয়োগ করিলে এই তাপ-সন্ধিক্ষণের পরিবর্তন ঘটে। অঙ্গার লোহার গলনাঙ্ক কমায়; সুতরাং এই তাপ-সন্ধিক্ষণও কমিতে থাকে। ০·৮৫ অঙ্গারবিশিষ্ট ইস্পাতের তাপ-সন্ধিক্ষণ দেখা দেয় ৬৯৫° ডিগ্রিতে। অন্ধকার ঘরে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, এই তাপে ইস্পাত জল্‌জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে। কারণ অষ্টেনাইট হইতে পার্লাইটের জন্ম হইবার সময় যে তাপশক্তি নির্গত হয়, তাহারই ফলে ইস্পাত ঐভাবে জ্বলিতে থাকে। এই ঘটনাটিকে, অর্থাৎ তাপ সন্ধিক্ষণে হঠাৎ এইভাবে তাপ নির্গমনকে বলা হয় রেকালেসেন্স বা কিরণচ্ছটা।

ইস্পাত ঠাণ্ডা হইবার সময় রূপ পরিবর্তনের ফলে হোঁচট খায় নির্দিষ্ট তাপ-সন্ধিক্ষণে। এই তাপ-সন্ধিক্ষণগুলিকে অক্ষরের দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়া থাকে। এই চিহ্নগুলি হইতেছে Ar_1, Ar_2, Ar_3, Ar_4 প্রভৃতি। ১৪০৪° ডিগ্রিতে ডেল্টা-লোহা গামা-লোহায় রূপান্তরিত হয়। ১৪০৪° ডিগ্রীকে বলা হয় Ar_4 পয়েন্ট। ৯০০° ডিগ্রিতে গামা পরিণত হয় বীটায়। ইহাকে বলা হয় Ar_3 পয়েন্ট। ৭৬৮° ডিগ্রিতে বীটা-লোহা হইতে আল্‌ফা-লোহার পরিবর্তন হয়। উহাকে বলা হয় Ar_2 পয়েন্ট।

উপরে যে কথা বলা হইল তাহা বিশুদ্ধ লোহার পক্ষে প্রযোজ্য। লোহায় অঙ্গার প্রয়োগের ফলে আর একটি তাপ সন্ধিক্ষণ দেখা দেয়। এই তাপ-সন্ধিক্ষণটি হইতেছে Ar এবং ইহার আবির্ভাব হয় ৬৯১° ডিগ্রি তাপে। এই সময় লোহার মধ্যে অঙ্গারের পরিমাণ থাকে ০·৮৫ শতাংশ। এই

২নং চিত্র

সন্ধিক্ষণেই অষ্টেনাইট হইতে পার্লাইটের উদ্ভব হয়।

এতক্ষণ যাহা বলা হইল তাহা পড়্‌তি মুখের কথা, অর্থাৎ উচ্চতাপ হইতে যখন গলিত লোহাকে ঠাণ্ডা করা হয় তখন দেখা যায় যে, কয়েক স্থলে অস্বাভাবিক তাপ নির্গমন হয়। এই তাপ নির্গমনের ফলে পড়্‌তি হারে বাধা পড়ে; তাপমাত্রা কিছুক্ষণ একই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকে তারপর আবার পড়িতে আরম্ভ করে। এই ঘটনা হইতে আশা করা যায় যে, বিপরীত প্রক্রিয়ার ফলও অনুরূপ হইবে; অর্থাৎ ঠাণ্ডা অবস্থা লোহাকে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করিলে Ar পয়েন্টের পাল্টাপাল্টি কয়েকটি তাপ-সন্ধিক্ষণ পাওয়া যাইবে। এই ক্ষেত্রে তাপ নির্গমনের পরিবর্তে তাপ শোষণ করিয়া উঠ্‌তির মুখে স্থানে স্থানে বাধা জন্মাইবে। প্রকৃত-পক্ষে এইরূপ ঘটনাই ঘটিয়া থাকে। পড়্‌তির মুখেও যেমন, উঠ্‌তির মুখেও তেমনি পাল্টাপাল্টি তাপ সন্ধিক্ষণ পাওয়া যায়। তবে উঠ্‌তি এবং পড়তির তাপমাত্রা ঠিক এক হয় না, উঠতি মুখের সন্ধিক্ষণগুলি পড়্‌তি মুখের সন্ধিক্ষণ অপেক্ষা কিছু উর্ধ্বে এবং তফাতে হইয়া থাকে। সেই জন্য ইহাদের বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাদিগকে বলা হয় Ac_1, Ac_2, Ac_3 প্রভৃতি ঠিক Ar_1, Ar_2, Ar_3-এর পাল্টাপাল্টি। ২নং চিত্র দ্রষ্টব্য।

এই তাপ-সন্ধিক্ষণগুলি তাপশোধন ব্যাপারে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাপ শোধন করিতে গেলে Ac এবং Ar পয়েন্ট সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।
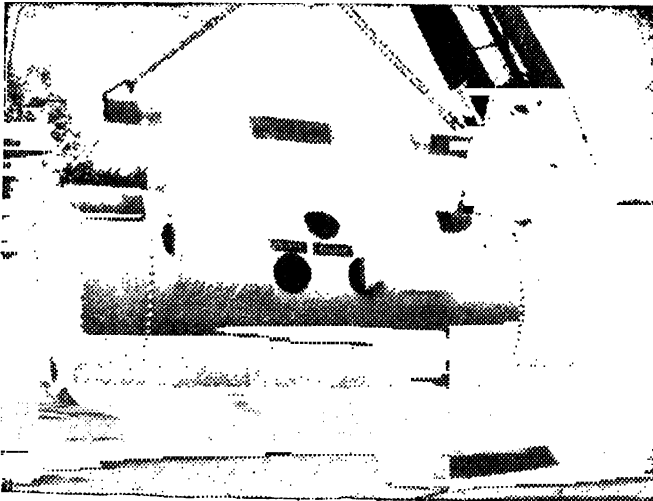
আই. সি. আই. কর্তৃক উদ্ভাবিত অভিনব প্লাষ্টিক ফিল্ম। ১ ইঞ্চির ১০০০ ভাগের ১ ভাগ বেধসম্পন্ন কয়েকটি প্লাষ্টিক ফিল্ম পুরুভাবে সাজিয়ে তার সাহায্যে ৩ টন ওজনের একটি বয়লার তোলা হচ্ছে।

পুস্তক পরিচয়

চিঠিপত্র ৬ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীপুলিন বিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত। বিশ্বভারতী, ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭। মূল্য—বোর্ড বাঁধাই ৫৲, কাগজের মলাট ৪৲।

চিঠিপত্রের আলোচ্য খণ্ডে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী সংকলিত হয়েছে।

ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের মধ্যে মানুষের যথার্থ রূপটি ধরা পড়ে। অনেক মনীষীর লেখা চিঠিপত্রের মধ্যে তাঁদের জীবনের সত্যিকার ছবি পাওয়া যায়, কারণ চিঠিপত্রের মধ্যে বিশ্বস্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে তাঁরা তাঁদের মন উন্মুক্ত করে দেন। বাংলার, তথা ভারতের দুই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের প্রকৃত পরিচয় পেতে হলে এই চিঠিপত্রের মধ্যে যথেষ্ট উপকরণ পাওয়া যাবে।

বাংলার ঋষি-কবি ও বাংলার বৈজ্ঞানিক উভয়ে ছিলেন উভয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই বন্ধুত্ব কোন্ সময়ে গড়ে ওঠে, সে সম্বন্ধে গ্রন্থের পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'তখন অল্প বয়স ছিল, সামনের জীবন ভোর বেলাকার মেঘের মত অস্পষ্ট কিন্তু নানা রঙে রঙীন, তখন মন রচনার আনন্দে পূর্ণ; আত্মপ্রকাশের স্রোত নানা বাঁকে বাঁকে আপনাতে আপনি বিস্মিত হয়ে চলেছিল; তীরের বাঁধ কোথাও ভাঙচে কোথাও গড়ছে, ধারা কোথায় গিয়ে মিশবে সেই সমাপ্তির চেহারা দূর থেকেও চোখে পড়ে নি। নিজের ভাগ্যের সীমারেখা তখনও অনেকটা অনির্দ্দিষ্ট আকারে ছিল বলেই নিত্য নতুন উদ্দীপনায় মন নিজের শক্তির নব নব পরীক্ষায় সর্ব্বদা উৎসাহিত থাকত। তখনও নিজের পথ পাকা করে বাঁধা হয় নি; সেইজন্যে চলা আর পথ বাঁধা এই দুই উদ্যোগের সব্যসাচিতায় জীবন ছিল সদাই চঞ্চল।

এমন সময়ে জগদীশের সঙ্গে আমার প্রথম মিলন। তিনিও তখন চূড়ার উপর ওঠেন নি। পূর্ব্ব উদয়াচলের ছায়ার দিকটা থেকেই ঢালু চড়াই পথে যাত্রা করে চলেছেন, কীর্ত্তি-সূর্য্য আপন সহস্র কিরণ দিয়ে তার সফলতাকে দীপ্যমান করে তোলে নি।......প্রবল সুখ দুঃখের দেবাসুরে মিলে অমৃতের জন্যে যখন জগদীশের তরুণ শক্তিকে মন্থন করছিল সেই সময় আমি তাঁর খুব কাছে এসেছি।"

এক সুবর্ণ মুহূর্তে বাংলাদেশের এই দুটি জ্যোতিষ্কের মিলন ঘটেছিল। তখনও কীর্তির পরিপূর্ণ আলোকে দুজনের কেউই উদ্ভাসিত হন নি। কিন্তু তবুও উভয়ে উভয়কে চিনেছিলেন, উভয়ে উভয়ের সাধনার সফলতা সম্বন্ধে শুধু অশান্বিত নয়—নিশ্চিত ছিলেন। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"তখন জগদীশ যে চিঠিগুলি আমাকে লিখেছিলেন তার মধ্যে আমাদের প্রথম বন্ধুত্বের স্বতঃচিহ্নিত পরিচয় অঙ্কিত হয়ে আছে। সাধারণের কাছে ব্যক্তিগত ভাবে তার যথোচিত মূল্য না থাকতে পারে, কিন্তু মানব মনের যে ইতিহাসে কোন কৃত্রিমতা নেই, যা সহজ প্রবর্ত্তনায় দিনে দিনে আপনাকে উদ্ঘাটন করেছে, মানুষের মনের কাছে তার আদর আছেই। তাছাড়া, যাঁর চিঠি তিনি ব্যক্তিগত জীবনের কৃষ্ণপক্ষ পেরিয়ে গেছেন, গোপনতার অন্ধ রাত্রি তাঁকে প্রচ্ছন্ন করে নেই, তিনি আজ পৃথিবীর সামনে প্রকাশিত। সেই কারণে তার চিঠির মধ্যে যা তুচ্ছ তাও তাঁর সমগ্র জীবন ইতিবৃত্তের অঙ্গরূপে গৌরব লাভ করবার যোগ্য।

এর মধ্যে আমারও উৎসাহের কথা আছে। প্রথম বন্ধুত্বের স্মৃতি যদিও মনে থাকে, কিন্তু তার ছবি সর্ব্বাংশে সুস্পষ্ট থাকে না। এই চিঠিগুলির মধ্যে সেই মন্ত্র ছড়ানো আছে যাতে করে সেই ছবি আবার আজ মনে জেগে উঠেছে।·····আমি গর্ব করি এই যে, প্রমাণের পূর্বেই আমার অনুমান সত্য হয়েছিল। প্রত্যক্ষ হিসাব গণনা করে যে শ্রদ্ধা, তাঁর সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা সে জাতের ছিল না। আমার অনুভূতি ছিল তার চেয়ে প্রত্যক্ষতর; বর্ত্তমানের সাক্ষ্যটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে ভবিষ্যৎকে সে খর্ব্ব করে দেখে নি। এই চিঠিগুলির মধ্যে তার ইতিহাস পাওয়া যাবে, আর যদি কোন দিন এরই উত্তরে প্রত্যুত্তরে আমার চিঠিগুলিও পাওয়া যায়, তাহলে এই ইতিহাস সম্পূর্ণ হতে পারবে।"

দুটি জ্যোতিষ্কের অভ্যুদয়ের কাহিনীই নয়, দু-জনের অন্তরঙ্গতার পরিচয়ই এই পত্রাবলীতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

জগদীশচন্দ্রের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ তত্ত্ব যখন পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীমহলে বিস্ময়ের সঞ্চার করে তখন রবীন্দ্রনাথ ১৯০১ সালে তাঁকে লিখেছিলেন—

"বন্ধু, আমার পূজা গ্রহণ কর। তোমার জয় হউক, তোমাতে আমাদের দেশ জয়ী হউক। নব্য ভারতের প্রথম ঋষিরূপে জ্ঞানের আলোকশিখায় নূতন হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর।" পত্র-১২

বিদেশ থেকে জয়তিলক ললাটে অঙ্কিত করে জগদীশচন্দ্র দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সে জয়কে রবীন্দ্রনাথ কেবল বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত জয় বলে মনে করেন নি। সে জয় তাঁর কাছে ছিল ভারতবর্ষের জয়।

এর কয়েক বছর পরে রবীন্দ্রনাথ যখন নোবেল পুরস্কার লাভ করেন, জগদীশচন্দ্র তখন লিখে-ছিলেন—

"বন্ধু, পৃথিবীতে তোমাকে এতদিন জয়মাল্য ভূষিত না দেখিয়া বেদনা অনুভব করিয়াছি। আজ সেই দুঃখ দূর হইল। দেবতার এই করুণার জন্য কি করিয়া আমার কৃতজ্ঞতা জানাইব? চিরকাল শক্তিশালী হও, চিরকাল জয়যুক্ত হও। ধর্ম্ম তোমার চির সহায় হউন।" (১৯১৩, ১৯শে নভেম্বর)

আচার্য জগদীশচন্দ্রের সহধর্মিণী অবলা বসু মহোদয়াকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীও এই খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তাছাড়া, জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, নিবন্ধ, বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট জগদীশ-প্রসঙ্গ সম্বলিত রবীন্দ্রনাথের চিঠি, রবীন্দ্র-জগদীশ প্রশ্নোত্তর, জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিকট বিভিন্ন মনীষীর লিখিত পত্র এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের আলোকচিত্র এবং উভয়ের চিঠিপত্রের কয়েকটি পাণ্ডুলিপি গ্রন্থখানিতে মুদ্রিত হয়েছে।

প্রভূত পরিশ্রম স্বীকারে বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন-ভাবে রক্ষিত উপকরণ সংগ্রহ করে শ্রীপুলিনবিহারী সেন যে এই চিঠিপত্র সংকলনে রবীন্দ্রনাথের অভীপ্সিত ইতিহাস সম্পূর্ণ করেছেন সেজন্যে তিনি সবাইরই ধন্যবাদার্হ।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

নভেম্বর—১৯৫৭

দশম বর্ষ : ১১শ সংখ্যা

দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের পেঙ্গুইন তাহার বাচ্চাকে খাওয়াইতেছে। বর্তমান ভূ-পদার্থ-তাত্ত্বিক বৎসরে অনুসন্ধান কার্য পরিচালনার ফলে ইহাদের সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জানিতে পারা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

রবার্ট বয়েল

রবার্ট বয়েলকে বর্তমান রসায়নশাস্ত্রের জনক বলা হয়। বোধ হয় তাঁহার পূর্বে তাঁহার ন্যায় প্রতিভাবান অন্য কেহ নিঃস্বার্থভাবে রসায়নের চর্চায় মনোনিবেশ করেন নাই। তাঁহার একক জীবনের সাধনা রসায়নশাস্ত্রকে বহুপ্রকার ভুলভ্রান্তি হইতে মুক্ত করিয়া বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বর্তমান যুগে ফলিত বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যায় অসাধারণ সাফল্য বিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও সার্থকতা সম্বন্ধে মানুষের ধারণা বদলাইবার উপক্রম করিয়াছে। প্রধানতঃ জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র মনে না করিয়া অনেকেই ইহাকে ধনসম্পদ, আধিপত্য ও বিলাসের উপকরণ সংগ্রহের অবলম্বন মনে করিতে সুরু করিয়াছেন। মধ্যযুগে, অর্থাৎ রেনেসাঁসের পূর্বে রসায়নের যে দুরবস্থা ছিল, অ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতি মারণাস্ত্র এবং পেটেন্ট, ব্যবসায় প্রভৃত সম্পর্কিত গোপনীয়তা ও স্বার্থপরতা বর্তমান যুগে শুধু রসায়ন নহে, সমগ্র বিজ্ঞানকেই পুনরায় সেইরূপ বিপথগামী করিতে বসিয়াছে। প্রধানতঃ সেই কারণেই নূতন করিয়া রবার্ট বয়েলের জীবনী আলোচনার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে, যাহাতে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের দিকে লোকের নিঃস্বার্থ দৃষ্টি পড়ে।

বয়েলের জীবনী আলোচনার জন্য তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে রসায়নশাস্ত্রের উন্নতি কোন্ স্তরে পৌঁছিয়াছিল তাহা জানা দরকার। প্রাচীন যুগে রসায়ন নামে বিশেষ কোন সুসংবদ্ধ আলোচনা ও চর্চার বিষয় ছিল না—যদিও ধাতুবিদ্যা, কাচ, মৃত্তিকা ও রঞ্জন শিল্প এবং সুরা, ভিনিগার উৎপাদন প্রভৃতি ফলিত রসায়নের কয়েকটি বিভাগে মিশর, ব্যাবিলন, চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে যথেষ্ট চর্চা ও উন্নতি হইয়াছিল। ক্রমে জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তীযুগে যখন অ্যালকেমি শাস্ত্রের উদ্ভব হয়, তখন জীবন রসায়ন এবং পরশ পাথরের সন্ধানই ইহার প্রধান লক্ষ্যবস্তু হইয়া দাঁড়ায়। যে জাতীয় ঔষধ মানুষকে অমর বা মৃত্যুহীন করিতে পারে (অর্থাৎ অমৃত) তাহাকেই জীবন রসায়ন বলা হইত এবং সে যুগে লোকের ধারণা ছিল, পরশ পাথরের সংস্পর্শে যে কোন সুলভ ধাতু স্বর্ণে পরিণত হইতে পারে।

এই দুইটি কাল্পনিক ও অসম্ভব বস্তুর সন্ধান মায়ামৃগের ন্যায় বহুদিন ধরিয়া অসংখ্য কর্মী ও প্রতিভাকে ভ্রান্ত পথে চালিত করিয়াছে। ইহারই ফলে স্বার্থান্ধ ও ভাগ্যান্বেষীদের হাতে পড়িয়া অ্যালকেমি অতি লোভনীয় ও গোপনীয় বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপে প্রাচীন ও মধ্যযুগে, জ্ঞান প্রসার ও প্রচারের পথ ছাড়িয়া ভাবীকালের রসায়ন শাস্ত্র বিপথগামী হইয়া পড়ে এবং উহাকে স্বার্থশূন্য ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথে ফিরাইয়া আনিতে বহু শতাব্দী কাটিয়া যায়।

এই স্বার্থান্বেষণ ও গোপনীয়তা সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত রসায়নকে কিরূপ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, রবার্ট বয়েলেরই জীবনের একটি ঘটনা হইতে তাহা প্রতীয়মান হইবে। ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে জার্মেনীর অন্তর্গত হাম্বুর্গ সহরের ব্র্যাণ্ড নামক একজন চিকিৎসক মানুষের মূত্র হইতে (উহাকে শুষ্ক ও অন্তর্ধূম পাতিত করিয়া) ফস্‌ফরাস নামক মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেন। ফস্‌ফরাস অন্ধকারে আলোক বিকিরণ করিয়া থাকে। এইজন্য এবং অন্যান্য কারণে জিনিষটি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ব্র্যাণ্ড কিন্তু ফস্‌ফরাসের উৎপাদন রহস্য সাধারণভাবে প্রকাশ না করিয়া, কিছু অর্থের লোভে ক্র্যাফ্‌ট্‌ নামক অপর এক ব্যক্তির নিকট উহা বিক্রয় করেন। ক্র্যাফ্‌ট্‌ বোধ হয় তখন দেশে-বিদেশে ফস্‌ফরাসের "ম্যাজিক" দেখাইয়া বেড়াইতে সুরু করেন এবং এইভাবে তিনি ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের রাজসভায় উপস্থিত হন। দ্বিতীয় চার্লস নিজে জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং রবার্ট বয়েল ও অন্যান্য অনেক জ্ঞানীব্যক্তিকে তাঁহার রাজ-সভায় স্থান দিয়াছিলেন। এইরূপে ক্র্যাফ্‌টের ফস্‌ফরাসের পরীক্ষা বয়েলের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে এবং তিনি উহার প্রস্তুত প্রণালী জানিতে চাহেন। ক্র্যাফ্‌ট্‌, বয়েলের নিকট এই রহস্য প্রকাশ করিলেন না। তিনি শুধু বলিলেন যে, মানব দেহের কোন জিনিষ হইতে ইহা পাওয়া যায়। এই সামান্যমাত্র ইঙ্গিত হইতেই বয়েল ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে ফস্‌ফরাস প্রস্তুত করেন এবং ইহার অন্ধকারে আলোক প্রদান প্রভৃতি অনেক রাসায়নিক ও ভৌতিক স্বরূপ প্রকাশ করেন। এদিকে কাঙ্কেল নামক অপর এক ভদ্রলোক ফস্‌ফরাসের রহস্য জানবার আশায় বহুদিন পর্যন্ত ব্র্যাণ্ড ও ক্রাফ্‌টের পিছনে ঘুরিয়া অবশেষে নিজের চেষ্টায় ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ফস্‌ফরাস পুনরাবিষ্কার করেন। এইরূপে স্বার্থপরতা ও গোপনীয়তার ফলে ব্র্যাণ্ডের আবিষ্কার বয়েল অথবা কাঙ্কেলের কোন কাজে আসিল না। বয়েল কিন্তু তাঁহার ফস্‌ফরাসঘটিত সকল পরীক্ষা ও আবিষ্কার New experiments and observations made upon the Noctiluca নামক পুস্তিকায় ১৬৮১-১৬৮২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন।

অবশ্য এইখানে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, অমৃত ও পরশ পাথরের যে সন্ধান মধ্যযুগে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া চলিয়াছিল, তাহা হইতেই পরোক্ষভাবে বহু নূতন নূতন রাসায়নিক তত্ত্ব ও তথ্যের আবিষ্কার পরবর্তীযুগে রসায়নের উন্নতি ও অগ্রগতির পথে সাহায্য করিয়াছে।

১৬২৭ খৃষ্টাব্দে আয়র্ল্যাণ্ডে রবার্ট বয়েলের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রিচার্ড একজন আর্ল ছিলেন। বয়েল প্রথমে ইটন ও পরে ইউরোপে শিক্ষালাভ করেন। ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যু ও আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটায় তিনি দেশে ফিরিয়া পৈত্রিক বাড়ীতে বাস করেন। ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে বয়েল অক্সফোর্ডে গিয়া তাঁহার সহকারী রবার্ট হুকের সঙ্গে এয়ার পাম্প, দহন প্রভৃতির পরীক্ষা সুরু করেন। ইহার পর ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে

তিনি লণ্ডনে গিয়া তাঁহার ভগ্নীর বাড়ীতে থাকেন এবং পলমলে তাঁহার পরীক্ষাগার স্থাপন করেন। শিক্ষা শেষ করিয়া ইউরোপ হইতে দেশে ফিরিয়াই বয়েল ইনভিজিবল ক্লাব নামে কয়েকজন শিক্ষিত ও উন্নতমনা লোকের একটি সমিতিতে যোগদান করেন। এই সমিতির উদ্দেশ্যে ছিল, বিজ্ঞানের চর্চা ও আলোচনা করা। সৌভাগ্যক্রমে অচিরেই ইহা তখনকার ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সুনজরে পড়ে, ফলে চার্লসের সনদ লাভ করিয়া এই ইনভিজিবল ক্লাব ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে রয়্যাল সোসাইটিতে উন্নীত হয়। রবার্ট বয়েলই সর্বপ্রথম এই ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। কিন্তু তিনি এই পদ প্রত্যাখান করায় রেন প্রেসিডেণ্ট হইলেন। বয়েল সারাজীবন রয়্যাল সোসাইটিতে উৎসাহী সদস্য হিসাবে কাজ করিয়া গিয়াছেন।

রবার্ট বয়েল

বস্তুতঃ সম্ভ্রান্ত ও ধনী বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও বয়েল আজীবন নিঃস্বার্থভাবে বিজ্ঞান ও ধর্মের চর্চা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল ছিল না এবং তিনি প্রায়ই নানাপ্রকার ঔষধ সংগ্রহ করিয়া খাইতেন ও বন্ধুদের দিতেন। শোনা যায়—তাঁহার নাকি অনেক রকমের পোষাক ছিল এবং বিদেশ ভ্রমণের সময় আবহাওয়ার তাপ অনুসারে তিনি সেইগুলি ব্যবহার করিতেন। এই জন্য তিনি সর্বদা থার্মোমিটারের সাহায্য লইতেন।

বয়েল চিরকুমার ছিলেন। জাঁকজমক ও সম্মানের পথ এড়াইয়া শান্তিপূর্ণভাবে আত্মমর্যাদা বজায় রাখিয়া বিজ্ঞান চর্চায় সময় অতিবাহিত করাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। পরবর্তী যুগের অপর বৃটিশ বিজ্ঞানী হেন্‌রি ক্যাভেণ্ডিসও এইভাবে তাঁহার দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন এবং এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেশেই বিরল। বয়েলের অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা পদার্থবিদ্যার অন্তর্গত হইলেও রাসায়নিক হিসাবেই তাঁহার প্রধান পরিচয়। কারণ, প্রথমতঃ তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, চিকিৎসাশাস্ত্র অথবা অ্যালকেমি ছাড়াও রসায়নের নিছক একটি নিজস্ব বৈজ্ঞানিক দিক বা ক্ষেত্র আছে, যাহার বিশেষ আলোচনা ও পরীক্ষা একান্ত প্রয়োজন। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ঐ সকল ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উন্নতির উপরও তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল এবং ইচ্ছা করিলে তিনি হয়তো ডাক্তারী, অ্যালকেমি, কারিগরী বিদ্যা প্রভৃতি ফলিত বিজ্ঞানের চর্চার দ্বারা প্রভূত অর্থ লাভ করিতে পারিতেন। কোন প্রকার লাভ বা স্বার্থচিন্তা লইয়া তিনি বিজ্ঞান-চর্চা করিতেন না। দ্বিতীয়তঃ, পরীক্ষামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক রসায়নের তিনিই গোড়াপত্তন করেন। তাঁহার পূর্ববর্তীগণ প্রায় সকলেই প্রাচীনকালের পুঁথিপত্র ও মতবাদের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেন; হাতেকলমে পরীক্ষার প্রয়োজন ও উপকারিতা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তৃতীয়তঃ, মৌলিক ও ভৌতিক পদার্থের সংজ্ঞা ও ধর্মনিরূপণ দ্বারা তিনি রসায়নের চর্চায় নূতন প্রেরণা দান করেন।

বয়েলের গবেষণার বিষয়বস্তু বহুধা বিস্তৃত ছিল। তাঁহার গবেষণার পদ্ধতি ও প্রণালীর কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল।

১। গ্যাস-বিজ্ঞানের পরীক্ষা (অর্থাৎ বায়ুর আয়তন ও চাপঘটিত পরীক্ষা)। বয়েলের পূর্বে টরিসেলি ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে পারদপূর্ণ চাপমান যন্ত্রের আবিষ্কার করেন এবং প্যাস্ক্যাল প্রমাণ করেন যে, সমতল ভূমি হইতে চাপমান যন্ত্রকে কোন পর্বতের উপর অথবা উচ্চস্থানে লইয়া গেলে উহার পারদস্তম্ভের উচ্চতা কমিয়া যায়। ইহার পর ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে অটো ভন্‌-গেরিকের এয়ার পাম্প আবিষ্কারের বিবরণ প্রকাশিত হয়। ইহা হইতে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে বয়েল এক নূতন ও উন্নত ধরণের পাম্প তৈরী করেন এবং উহার সাহায্যে নিম্ন চাপে পাতন ও অন্যান্য পরীক্ষার অবতারণা করেন। তিনি ইহাও লক্ষ্য করেন যে, কোন পাম্পের রিসিভারের মধ্যে চাপমান যন্ত্র (ব্যারোমিটার) বসাইয়া বায়ু নিষ্কাশিত করিতে থাকিলে পারদস্তম্ভ ক্রমাগত নামিতে থাকে। ইহা হইতে টরিসেলির সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ বায়ুর চাপই চাপমান যন্ত্রের পারদস্তম্ভকে দাঁড় করাইয়া রাখে—ইহা সর্বতোভাবে প্রমাণিত হয়। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে বয়েল তাঁহার এই সকল পরীক্ষার ফল পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিলে কোন এক ভদ্রলোক কতকগুলি মনগড়া যুক্তি ও ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে এই সকল তথ্য ও মতবাদ অস্বীকার করেন। ইহার উত্তরে বয়েল তাঁহার বিখ্যাত সূত্রটি (বয়েলের সূত্র) লিপিবদ্ধ করেন—কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাস

অথবা বায়ুর আয়তন উহার চাপের বিপরীত অনুপাতে হ্রাস বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সূত্রটি প্রমাণের জন্য বয়েল বায়ু অপেক্ষা উচ্চতর চাপে পারদপূর্ণ ইউ টিউব ব্যবহার করেন এবং নিম্নতর চাপে এক মুখ বন্ধ সরল কাচের নলে পারদস্তম্ভের উপর আবদ্ধ খানিকটা বাতাসের সাহায্য গ্রহণ করেন। অনেকেই এই সূত্রটিকে মেরিয়টের সূত্র বলিয়া জানেন; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা বয়েলেরই আবিষ্কার। বয়েলের অনেক পরে মেরিয়ট তাঁহার মত প্রকাশ করেন এবং তিনি এই বিষয়ে কোন মৌলিকতার দাবী করেন নাই।

২। মৌলিক পদার্থ

বয়েলের অন্যতম কৃতিত্ব মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের সংজ্ঞা নিরূপণে। বহু শত বৎসর পূর্বে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টটল প্রচার করেন যে, আর্দ্রতা, শুষ্কতা, তাপ ও শৈত্য—এই চারটি ধর্ম হইতে জগতের সকল বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে, যথা—শৈত্য ও আর্দ্রতার সমবায়ে জল, শৈত্য ও শুষ্কতার মিশ্রণে মাটি, তাপ ও আর্দ্রতার মিশ্রণে বাতাস ইত্যাদি। ইহার পর মধ্যযুগের অ্যালকেমিষ্টগণ প্রকাশ করেন যে, পারদ, গন্ধক ও লবণ এই তিনটি মূল বস্তু হইতে জগতের অন্যান্য সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। অ্যারিষ্টটলের চারটি ধর্মকে বলা হয় এলিমেন্ট এবং পারদ, গন্ধক ও লবণকে বলা হয় প্রিন্সিপ্‌ল্। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এলিমেন্ট ও প্রিন্সিপ্‌ল্-এর এইরূপ ধারণা শত শত বৎসরেও রসায়ন-শাস্ত্রকে কিছুমাত্র উন্নত করিতে অথবা পদার্থের গঠন-রহস্যে সামান্যতম আলোকপাতও করিতে পারে নাই। কারণ, দেখা যাইতেছে—আমাদের দেশের ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোমের ন্যায় কতকগুলি মিশ্র, যৌগিক ও কল্পিত জিনিষকে সেকালের বিজ্ঞানীরা মৌলিক পদার্থ বলিয়া জানিতেন এবং এই সকল বস্তুর অস্তিত্ব ও গুণাগুণ সম্বন্ধে তাঁহারা হাতেকলমে বিশেষ কোন পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই। বয়েল তাঁহার Sceptical Chymist নামক পুস্তকে প্রচার করিলেন যে, মৌলিক বলা যায় সেই সকল বস্তুকে যাহা হইতে কোন মতেই অন্য কোন বস্তু পাওয়া যায় না, অথচ যাহা অন্য কোন বস্তু সংযোগে রূপান্তরিত হইতে পারে। তাঁহার মতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ; কেন না এই সকল হইতে অন্য কোন নূতন বস্তু পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহাদের (অন্য বস্তু সংযোগে) রূপান্তরিত করিয়া নূতন জিনিষ পাওয়া সম্ভব। তিনি আরও বলিলেন যে, গ্রীক দার্শনিকদের ধর্মচতুষ্টয় অথবা অ্যালকেমিষ্টদের প্রিন্সিপ্‌ল্ তিনটির কোনটিই মৌল পদবাচ্য নহে।

যদিও বয়েল মৌলিক পদার্থের কোন তালিকা প্রস্তুত অথবা এই সমস্যার উপর যথোপযুক্ত আলোকপাত করেন নাই, তথাপি এই বিষয়ে তাঁহার উপরোক্ত নূতন মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গী বস্তু-বিজ্ঞানকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করিয়াছে। পরবর্তীযুগে ল্যাভয়সিঁয়ে, বার্জেলিয়াস, ডেভি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা বয়েলের সংজ্ঞার ভিত্তিতে অতি অল্প সময়ের

মধ্যেই বহু নূতন নূতন মৌলের আবিষ্কার, ধর্মনিরূপণ ও নামকরণ করিয়া রসায়ন ও পদার্থবিদ্যাকে যথেষ্ট উন্নত ও সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

৩। অন্যান্য পরীক্ষা

বায়ুঘটিত দহন ও জারণ রহস্যের উপর বয়েল যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছেন। দহনের পরীক্ষায় তিনি নিজের আবিষ্কৃত এয়ার পাম্প ব্যবহার করেন এবং শিখার সহিত বাতাসের সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। জারণের পরীক্ষায় তিনি লক্ষ্য করেন, কোন ধাতুকে বাতাসে জারিত করিলে তাহার ওজন বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং তিনি ইহার ব্যাখ্যারও চেষ্টা করেন। অল্প তাপে জারণের ফলে পারদ হইতে রক্তবর্ণ কঠিন পদার্থের উৎপত্তি এবং অধিক তাপে ঐ যৌগ হইতে পুনরায় পারদ প্রাপ্তির কথা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ফস্‌ফরাসের পরীক্ষায় বয়েল প্রমাণ করেন যে, উহা কেবল মাত্র বাতাসের সান্নিধ্যেই আলোক বিকিরণ করিতে পারে এবং এই প্রক্রিয়ায় উগ্র গন্ধযুক্ত বাতাস (ওজোন) ও একটি অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। সালফিউরিক অ্যাসিডের উপর কয়েকটি লোহার পেরেক সহ তরল অ্যাসিডপূর্ণ একটি বোতল উল্টাইয়া রাখিয়া বয়েল হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরী করেন এবং এইরূপে সর্বপ্রথম দেখান যে, বায়বীয় পদার্থ-সমূহও ছিদ্রহীন পাত্রে সংগৃহীত হইতে পারে। তিনি হাইড্রোজেনের দহনশীলতাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। অ্যাসিড, ক্ষার ও রাসায়নিক লবণের অনেক গুণাগুণের পরীক্ষা বয়েল করিয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, কতকগুলি উদ্ভিদজাত রঙ্গীন জিনিষ অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসিলে রং পরিবর্তন করিয়া থাকে, কিন্তু ক্ষার সংযোগে পুনরায় উহাদের স্বাভাবিক রং ফিরিয়া পাওয়া যায়। এইরূপে তিনি ইণ্ডিকেটর জাতীয় বস্তুর চর্চা সুরু করেন। অ্যাসিডের অম্লস্বাদ, ক্ষার সংযোগে উভধর্মী (রাসায়নিক) লবণ উৎপাদন এবং দ্রবীভূত (জলে) অ্যাসিড, ক্ষার ও লবণের অনেক ধর্মের পরীক্ষা বয়েল করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তাম্র যৌগের নীল শিখা উৎপাদন, অ্যামোনিয়া সংযোগে নাইট্রিক ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাদা ধূম সৃষ্টি এবং হরিতকী, মাজুফল জাতীয় (ট্যানিনঘটিত) পদার্থ সংযোগে হিরাকষ প্রভৃতি লৌহ যৌগের কালির রং সৃষ্টি করিবার বিষয় তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। ক্যালসিয়াম লবণের সালফিউরিক অ্যাসিড সংযোগে এবং সিলভার লবণের ক্লোরাইড লবণ সংযোগে সাদা অধঃক্ষেপ উৎপাদন, মারক্যুরিক ক্লোরাইড সংযোগে তাম্র ও বিস্‌মাথ ধাতু হইতে যথাক্রমে কিউপ্রাস ক্লোরাইড ও বিস্‌মাথ ক্লোরাইড উৎপাদন, সুগার অব লেড-এর অন্তর্ধূম পাতন, উড স্পিরিট-এর উৎপত্তি এবং তার্পিন তৈলযুক্ত সালফিউরিক অ্যাসিডের পাতনে গন্ধক উৎপত্তি প্রভৃতি তাঁহার অসংখ্য বিশ্লেষণী ও নূতন বস্তু উৎপাদনের পরীক্ষা রসায়নবিদ্যাকে সর্বতোভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে, সন্দেহ নাই।

বয়েলের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা শুধুমাত্র রসায়নের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ইতি-

পূর্বেই বলা হইয়াছে, তিনি এয়ার পাম্পের উন্নতিসাধন এবং বয়েল সূত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা বায়বীয় পদার্থের স্থিতিস্থাপকতার বিষয় প্রমাণ করেন। এয়ার পাম্পের সাহায্যে তিনি প্রমাণ করেন যে, কোন তরল পদার্থের উপরের চাপ কমাইলে উহার স্ফুটনাঙ্কও কমিয়া যায়। বয়েলই সর্বপ্রথম ইংল্যাণ্ডে পারদপূর্ণ কাঁচনলের থার্মোমিটার প্রবর্তন করেন। তিনি ফ্রিজিং মিক্‌চারের প্রবর্তন এবং অনেক কঠিন ও তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি কণাবাদে বিশ্বাস করিতেন এবং ইহার সাহায্যে রাসায়নিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যার চেষ্টা করিতেন।

শ্রীশিবনারায়ণ চক্রবর্তী

জ্ঞানবার কথা

১। পৃথিবীতে নানাজাতের অসংখ্য কীট-পতঙ্গ আছে। এদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা সহজ নয়। আমরা যত রকমের পোকামাকড় দেখি তাদের অধিকাংশের পরিচয়ই আমাদের জানা নেই। বিজ্ঞানীরা বহু দিনের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ফলে এসব কীট-পতঙ্গদের জীবনযাত্রা প্রণালী, আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে বহু মজার তথ্য

১নং চিত্র

জানতে পেরেছেন। তাঁরা এপর্যন্ত পৃথিবীতে নানা জাতীয় ৭৫০,০০০ কীট-পতঙ্গের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁদের মতে, এ ছাড়া আরও অনেক কীট-পতঙ্গ রয়েছে যাদের সম্বন্ধে কোন তথ্যই জানা সম্ভব হয় নি। বিজ্ঞানীরা সে সব অজ্ঞাত কীট-পতঙ্গ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করছেন।

২। ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর ওজন এক মণেরও বেশী হয়—একথা শুনলে অনেকেই

হয়তো বিশ্বাস করবে না। ভাববে, আজগুবি কাহিনী। ব্যাপারটা মোটেই আজগুবি নয়। দক্ষিণ আমেরিকায় ক্যাপিবারা নামে এক জাতের প্রাণী দেখা যায়। এরা আকৃতি-

২নং চিত্র

প্রকৃতিতে ঠিক ইঁদুরের মত। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইঁদুর জাতীয় জীবদের মধ্যে এরাই সর্বাপেক্ষা বৃহদাকৃতির। ইঁদুরের সঙ্গে এদের পার্থক্য হচ্ছে দেহের পরিমাপে। এদের দাঁত খুব বড় এবং ধারালো। এদের স্বাভাবিক ওজন হচ্ছে ১০০ পাউণ্ড। এদের নিকট-আত্মীয় ছোট ছোট ইঁদুরেরা যেমন বিড়াল বা ঐ জাতীয় প্রাণীকে ভয় করে, ক্যাপিবারারাও সেরূপ কাউগার এবং জাগুয়ারের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে।

৩। হিমালয় পর্বত তুষারাবৃত থাকায় সেখানে গাছপালা জন্মায় না। কিন্তু

৩নং চিত্র

হিমালয় পর্বতের তুষারাবৃত শৃঙ্গগুলির পাদদেশে কয়েকটি গভীর উপত্যকা রয়েছে যেখানে উষ্ণমণ্ডলীয় গাছপালা জন্মায়।

৪। সাইক্লোনের সময় বাতাসে প্রচণ্ড ঘূর্ণীর সৃষ্টি হয় এবং চক্রাকারে আবর্তনের ফলে জলস্তম্ভ বা ধূলিস্তম্ভের সৃষ্টি করে। সাইক্লোন সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের গবেষণায়
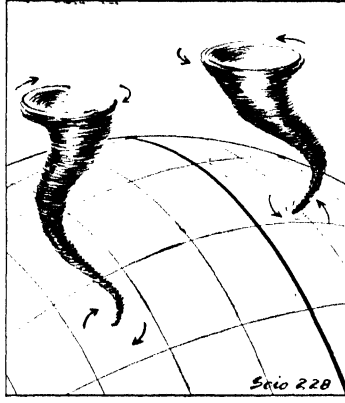
৪নং চিত্র

ফলে আরও অনেক তথ্যাদি জানা গেছে। বিজ্ঞানীদের মতে, সাইক্লোনের সময় বাতাসের ঘূর্ণী বিষুব রেখার উত্তরে ঘড়ির কাঁটার গতির বিপরীত দিকে পাক খায় এবং বিষুব রেখার দক্ষিণ দিকে বাতাস ঘড়ির কাঁটার গতির দিকে পাক খেতে থাকে।

৫। পৃথিবীতে বহু জাতের লোক বাস করে। অনেকের ধারণা আছে, জাতি হিসাবে কোন কোন জাতের লোক অন্যান্য জাতের লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু এই
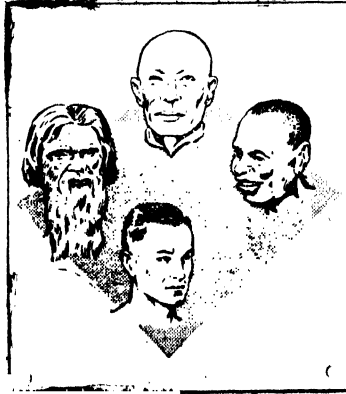
৫নং চিত্র

ধারণা ভুল। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, জাতি হিসাবে কোন জাতির লোকই অন্যান্য জাতির লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নয়।

৬। পাখীর জন্ম প্রথমে হয়েছিল, না ডিমের জন্ম প্রথমে হয়েছিল? প্রশ্নটা শুনে অনেকে হয়তো ধাঁধায় পড়ে যাবে। জেনে রাখ—ডিমের জন্মই প্রথমে হয়েছিল

বোধ হয় বিষয়টা তোমরা পরিষ্কার বুঝতে পারলে না। বিজ্ঞানীদের মতে—সরীসৃপ
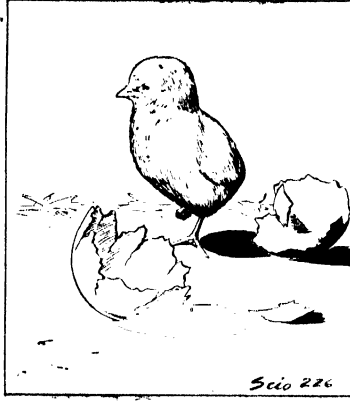
৬নং চিত্র

জাতীয় প্রাণী থেকেই ক্রমবিবর্তনের ধারায় পাখীর উৎপত্তি হয়েছে। লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে সরীসৃপেরা যে ডিম পেড়ে আসছিল, সেই ডিম থেকেই প্রথম পক্ষীশাবক জন্মায়।

৭। ব্যাং আমাদের অতি পরিচিত জীব। বর্ষাকালেই এদের আবির্ভাব হয়

৭নং চিত্র

বেশী। আমাদের দেশেও নানা জাতের ব্যাং দেখা যায় এবং সবচেয়ে বড় ব্যাং লম্বায় সাধারণতঃ ৫।৬ ইঞ্চির বেশী হয় না। পেরুর মনটারো নদী অঞ্চলে এক জাতের ব্যাং দেখা যায়, যাদের শরীরের দৈর্ঘ্য ২৪ ইঞ্চিরও বেশী। এরাই নাকি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহদাকৃতির ব্যাং। এরূপ বৃহদাকৃতির ব্যাং আর কোথাও দেখা যায় না।

৮। পৃথিবীতে নানাজাতের শিকারী কুকুর আছে; শিকারের সময় মানুষ সে সব কুকুরকে কাজে লাগায়। কিন্তু মানুষ প্রথম কোন্ জাতের কুকুরকে শিকারের কায়দা-কানুন শিখিয়েছিল? এশিয়ায় শালুকি নামক এক জাতের ছিপ্‌ছিপে কুকুর

পাওয়া যায়। খুব সম্ভব মানুষ প্রথম এই জাতীয় কুকুরকেই শিকারের কাজে নিয়োগ করেছিল। এরা অনায়াসে ঘণ্টায় ৪০ মাইল বেগে ছুটতে পারে। মজার কথা হচ্ছে এই

৮নং চিত্র

যে, এদের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় গেজেল নামক দ্রুতগামী হরিণ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

৯। অষ্ট্রেলিয়া এত বড় একটা দ্বীপ যে, তাকে সাধারণতঃ মহাদেশ বলা হয়। অষ্ট্রেলিয়াকে বাদ দিলে সাধারণতঃ গ্রীনল্যাণ্ডকেই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দ্বীপ
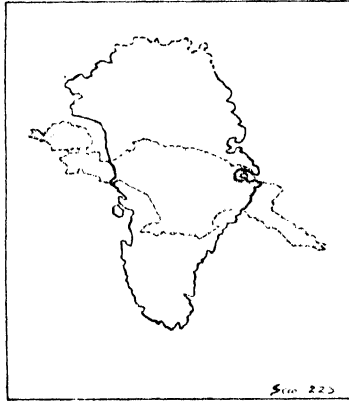
৯নং চিত্র

বলা যায়। গ্রীনল্যাণ্ডের আয়তন হচ্ছে ৮২৭,৩০০ বর্গমাইল। সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, গ্রীনল্যাণ্ড তিনটি দ্বীপ নিয়ে গঠিত। যদি এই তথ্য সঠিক প্রমাণিত হয়, তাহলে একক দ্বীপ হিসাবে নিউগিনিই হবে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় দ্বীপ। এই দ্বীপের আয়তন হচ্ছে ৩১৬,৮৬১ বর্গমাইল।

১০। পৃথিবীতে এমন অনেক গাছ আছে যাদের কথা শুনলে অবাক হতে হয়। মেক্সিকোর অন্তর্গত ওয়াক্সাকা রাজ্যে সাণ্টা ম্যারিয়া ডেল টুল নামক একটা বিরাট

গাছ আছে। এই গাছটির গুঁড়ির মাপ শুনলে অবাক হয়ে যাবে। এই গাছের গুঁড়ির পরিমাপ হচ্ছে ১৬০ ফুট। যতদূর জানা যায়, পৃথিবীতে এত বড় বেড়ের আর কোন গাছ

১০নং চিত্র

নেই। ২৭ জন লোক হাত ধরাধরি করে এই গাছের গুঁড়িকে বেষ্টন করতে পারে। এ থেকেই ব্যাপারটা অনুমান করতে পার।

১১। শুয়ে বসে নয়, রীতিমত কাজকর্ম করে কোন লোক একবারও বাড়ীর

১১নং চিত্র

বাইরে না গিয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে—একথা কি তোমরা বিশ্বাস করতে পার? কিন্তু এই অসম্ভব ব্যাপারই সম্ভব হয়েছে আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে। সেখানে বাড়ীর বাইরে না গিয়েও ভূগর্ভস্থ রেলের সাহায্যে হোটেলে থাকা-খাওয়া, দোকানে কেনা-কাটা, অফিসের কাজকর্ম ইত্যাদি সব কিছুই করতে পারে। ভূগর্ভস্থ রেলের সাহায্যে এর প্রত্যেকটির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

১২। কোন্ মাছ সবচেয়ে দ্রুতগামী? বিজ্ঞানীদের অনেকেই মনে করেন যে, সেলফিস নামক একজাতের সামুদ্রিক মাছই সবচেয়ে দ্রুতগামী। এরা ৩ সেকেণ্ডে ১০০
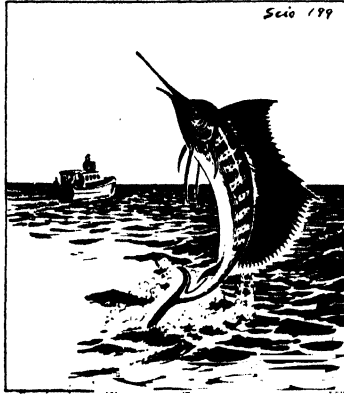
১২নং চিত্র

গজ, অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৭০ মাইল গতিতে সাঁতার কাটতে পারে। এক কথায় সেলফিসকেই শ্রেষ্ঠ সাঁতারুর সম্মান দেওয়া যেতে পারে।

বিবিধ

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের চত্বারিংশৎ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী

আগামী ৩০শে নভেম্বর, ১৯৫৭, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের চত্বারিংশৎ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী দিবস উদ্‌যাপিত হইবে। এই উপলক্ষ্যে উক্ত তারিখে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বক্তৃতাগৃহে অপরাহ্ন ৬-৩০ মিনিটের সময় ভারত সরকারের পারমাণবিক শক্তি বিভাগের ভূতাত্ত্বিক উপদেষ্টা ডা. ডি. এন. ওয়াদিয়া, এফ. আর. এস. 'ভারত এবং পারমাণবিক যুগ—পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে তাহার প্রাকৃতিক সম্পদ' সম্বন্ধে উনবিংশতিতম আচার্য জগদীশচন্দ্র স্মৃতি-বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

১৯৫৭ সালে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

বর্তমান বৎসরে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন সুইস বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড্যানিয়েল বোভেট। রেড ইণ্ডিয়ানরা তীরের ফলায় যে বিষ ব্যবহার করিত তাহার উপাদান হইতে অধ্যাপক বোভেট অস্ত্রোপচারের সময় রোগীর মাংসপেশীগুলিকে শিথিল করিবার উপযোগী একটি অত্যাশ্চর্য ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। অধ্যাপক বোভেট বর্তমানে রোমে গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন।

অধ্যাপক বোভেট ১৯০৭ সালে সুইজারল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তিনি ইটালীতে গমন করিয়া তথাকার নাগরিকত্ব লাভ করেন। তিনি ইটালীয়ান হেল্‌থ ইনষ্টিটিউটের কেমিক্যাল থিরাপী লেবরেটরীর অধ্যক্ষরূপে তাঁহার ইটালীয় পত্নী এবং অপরাপর ইটালিয়ান বিজ্ঞানীর সহায়তায় কাজ করিতেছেন।

তাঁহার পিতা অধ্যাপক পিয়েরে বোভেট শিশু-মনস্তত্ত্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

রসায়নে নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন বৃটিশ বিজ্ঞানী সার আলেকজাণ্ডার টড। বর্তমানে তাঁহার বয়স ৮১। তিনি গ্লাসগোতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় ও পরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি বৃটেনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংক্রান্ত উপদেষ্টা সংসদেও চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।

তিনি কোষস্থিত পদার্থ সম্পর্কিত গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত ভিটামিন বি$_{১২}$ এবং আফিং-এর বিষ (হাসিস) সম্পর্কিত গবেষণায়ও তিনি মৌলিক তথ্যাদি আবিষ্কার করিয়াছেন।

তিনি অ্যালান গ্লেন্‌স্ স্কুল এবং গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। ১৯২৮-'২৯ সালে তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্নেগী রিসার্চ স্কলার এবং ১৯৩৭-'৩৮ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিষ্ট্রির রীডার ছিলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্ণিয়া ইনষ্টিটিউট অব্ টেক্‌নোলজীর লেক্‌চারার হিসাবেও কাজ করিয়াছিলেন। ১৯৩৮-'৪৪ সাল পর্যন্ত তিনি মানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল লেবরেটরীর অধ্যক্ষ এবং সার সামুয়েল হল অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন।

তিনি ১৯৪৮ সালে লাভয়সিঁয়ে অ্যাকাডেমি মেডেল, ১৯৪৯ সালে ডেভি মেডেল এবং ১৯৫৫ সালে রয়্যাল মেডেল লাভ করেন। শেষোক্ত দুইটি পুরস্কার বৃটিশ রয়্যাল সোসাইটি কর্তৃক প্রদত্ত হয়।

ডাঃ সুং দাও লী এবং চেন নিং ইয়াং নামক দুইজন চীনা বিজ্ঞানী পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। উভয়েই বর্তমানে আমেরিকাবাসী। ইঁহারা উভয়েই পারমাণবিক পদার্থ-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ। অধ্যাপক চেন নিং ইয়াং-এর বয়স ৩৫ এবং ডাঃ সুং দাও লী-র বয়স ৩১ বৎসর। নোবেল পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে ইঁহারাই বোধ হয় বয়সে সর্বকনিষ্ঠ। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহারা উভয়েই বিখ্যাত চীনা মহিলা বিজ্ঞানী মিস উই চিয়েন সুং-এর সহযোগিতায় পরমাণু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্মরণীয় আবিষ্কার করিয়াছেন।

দীর্ঘকালের প্রতিষ্ঠিত পারমাণবিক পদার্থ-বিজ্ঞানের অন্যতম ভিত্তি 'প্যারিটি-ল'-এর ব্যর্থতা পরীক্ষামূলকভাবে প্রতিপাদন করিয়া নূতন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য উক্ত বিজ্ঞানীদ্বয়কে এই পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

মৌর্য ও গুপ্তযুগের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার

'কলিকাতা হইতে মাত্র ২৩ মাইল দূরে চব্বিশ পরগণা জেলার বেড়াচাঁপার নিকট চন্দ্রকেতুগড়ে খননের ফলে যে ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা মৌর্য ও গুপ্ত যুগের মাঝামাঝি কালের।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মের উদ্যোগে প্রধানতঃ চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলায় সম্প্রতি যে ব্যাপক খননকার্য চালান হইয়াছে তাহাতে জানা গিয়াছে যে, প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে গাঙ্গেয় নিম্নবঙ্গে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে বহু সহর ও বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সত্য উদ্ঘাটনের ফলে প্রচলিত জনমত ও ইতিহাস যে ভ্রান্ত তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

গত দুই বৎসরে ছয়টি স্থানে খননকার্য পরিচালিত হয়। বর্তমান বৎসরে খননের ফলে চারিটি প্রাচীন স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্থানগুলি কলিকাতার চারিধারে মালার আকারে অবস্থিত এবং কলিকাতা হইতে ৫০ মাইলের মধ্যে।

আশুতোষ মিউজিয়মের পক্ষ হইতে চন্দ্রকেতুগড় ১৯৪৮ সালে প্রথম এবং পরে ১৯৫০ সালে পরিদর্শন করা হয়। স্থানটিতে প্রায় দুই বর্গ মাইল ব্যাপিয়া প্রাচীন স্থানবিশেষের অস্তিত্বের বিষয় সম্বন্ধে জানা যায়। চারিদিকে উঁচুনীচু ঢিবির মধ্যে গড়ের চিহ্ন

পাওয়া যায়—এখনও কোথাও কোথাও গড়ের দেয়াল প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু।

চন্দ্রকেতুগড়ে খননের ফলে যে সমস্ত দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে ভারতে সর্বপ্রথম প্রচলিত একশতটি রৌপ্য মুদ্রা খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মী লিপিতে খোদাই-করা কয়েকটি পোড়ামাটির মোহর, কালো পালিশ-করা মৃৎপাত্রের টুক্‌রা, গ্রীক ভাস্কর্যের প্রভাবে গড়া পোড়ামাটির মূর্তি, কুশান যুগের ছাপমারা বা খোদাই-করা মৃৎপাত্র, মৌর্য যুগের কয়েকটি এবং সুঙ্গ ও কুশান যুগের পোড়ামাটির অসংখ্য সুন্দর মূর্তি, হাতী, টানা রথ, ভেড়া, ঘোড়া প্রভৃতি খেলনা, সুঙ্গ যুগের নানা ধরণের মিথুন মূর্তি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহা ছাড়া গুপ্ত যুগের একটি দুষ্প্রাপ্য স্বর্ণমুদ্রা বাংলা দেশে এই প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছে। মুদ্রাটিতে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সহিত কুমার দেবীর বিবাহ দৃশ্য খোদিত হইয়াছে। এই মুদ্রা সমুদ্র গুপ্ত চালু করেন। পোড়ামাটির অপূর্ব সূর্যরথটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা পশ্চিম ভারতের ভোজ গুহার খোদাইয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

সম্প্রতি একটি অদ্ভুত বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। লাল বেলেপাথরে খোদাই করা ছোট্ট মূর্তিটি। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মথুরার শিল্পীরা যে আসীন বুদ্ধমূর্তি তৈয়ার করিতেন, এই মূর্তিটি হুবহু সেই রকম—কাজেই সেই যুগেরই হইবে।

তারপর ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ পাটনা, হস্তিনাপুর ও তমলুকে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর মৌর্য যুগে তৈয়ারী যে নরনারীর মূর্তি আবিষ্কার করিয়াছেন, ঠিক সেই রকম একটি পোড়ামাটিতে তৈয়ারী নারী মূর্তির মস্তক পাওয়া গিয়াছে। মস্তকের চারিধারে অদ্ভুত কতকগুলি বৃত্ত আছে। এই দ্রব্যগুলির অপূর্ব কলা সৌন্দর্য ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও প্রাচীন লিপি ও চিত্রসমন্বিত অসংখ্য মোহরগুলির বিশেষ গুরুত্ব আছে। ইহাদের পাঠোদ্ধার করা হইলে খৃষ্ট যুগ সুরু হইবার পূর্বে ও পরে গঙ্গার শাখানদী বিদ্যাধরীর ধারে ধারে যে সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, সে সম্বন্ধে কিছু হদিস পাওয়া যাইবে।

গত মার্চ মাসে (১৯৫৭) বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দল চব্বিশ পরগণায় চন্দ্রকেতুগড়ে দুই সপ্তাহ ধরিয়া পরীক্ষামূলক খননকার্য চালায়। এই খননের ফলে মৌর্য-সুঙ্গ যুগ হইতে গুপ্তোত্তর যুগ পর্যন্ত জনবসতির বিভিন্ন পর্যায়ের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। বিশেষ ধরণের লাল মৃৎপাত্রের অস্তিত্ব মৌর্য-পূর্ব যুগেরও সূচনা করে।

প্রথম যুগের জনবসতির নিদর্শন স্বরূপ কর্দমের ভিতের উপর কাঠ, বাঁশ, টালি ও কর্দমের দেয়াল-বিশিষ্ট কাঁচা বাড়ী পাওয়া গিয়াছে। অতীতে আগুন লাগিয়া এই বাড়ীগুলি যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে।

বেশ কিছু পরে ইটের বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছিল এবং দুই সারির ইটের তৈয়ারী শানের মেঝের ভগ্নাংশ খননের সময় পাওয়া গিয়াছে।

অতীতে যে মাটির নল ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। নলগুলি লম্বায় ২ ফুট ৭ ইঞ্চি এবং চওড়া দিকের ব্যাস ৮ ইঞ্চি ও সরু দিকের ব্যাস ৫ ইঞ্চি। মাটি হইতে ১৩ ফুট নীচে এই নলগুলি খুঁড়িয়া পাওয়া গিয়াছে। এই নলগুলি নিঃসন্দেহে মৌর্য যুগের। কারণ মৌর্য বা মৌর্য-পূর্ব যুগে উত্তর ভারতে ব্যবহৃত কালো পালিশ-করা ধাতব শব্দবিশিষ্ট চকমকে খোলামকুচিও এখানে পাওয়া গিয়াছে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য দ্রব্য হইল পূর্ব হইতে পশ্চিমে ঢালু একটি কংক্রীটের দেয়াল। মাটির ৮—৯ ফুট নীচে ইহা পাওয়া গিয়াছে। জোয়ারের সময় জলোচ্ছ্বাস বা বন্যা রোধের জন্য প্রাচীন অধিবাসীগণ সম্ভবতঃ ইহা তৈয়ার করিয়াছিল। পরে মানুষ ও প্রকৃতির হাত হইতে সহর রক্ষার জন্য কর্দমের বিরাট প্রাচীর গঠিত হইয়াছিল।

ছোটখাট জিনিষের মধ্যে কতকগুলি জীর্ণ তাম্রমুদ্রা, নানা আকারের পোড়ামাটির দ্রব্য, মকর মূর্তি, চাকা, তারকা, সূর্য ও পদ্মখচিত কালো পালিশ-করা খোলামকুচি, গৃহস্থালীর নানা বাসনপত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যাধরী নদীর তীরে অবস্থিত চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত ভগ্নাবশেষ এক সমৃদ্ধ আন্তর্জাতিক বন্দরের অস্তিত্বের নিদর্শন। একদিন এই বন্দর তাম্রলিপ্তের সহিত পাল্লা দিত।

মিউজিয়ামের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত খনন-কার্যের ফলে বিদ্যাধরী যে এককালে একটি বিশিষ্ট বাণিজ্যপথ ছিল এবং ইহার ধারে ধারে সমৃদ্ধ নগর ও বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।'

মহাশূন্যে সোভিয়েটের দ্বিতীয় উপগ্রহ প্রেরণ

গত ৩রা নভেম্বর মস্কো বেতারে ঘোষণা করা হয় যে, মহাশূন্যে দ্বিতীয় উপগ্রহ প্রেরণের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। রাশিয়ার এই দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহটির ওজন প্রায় অর্ধ টন। উহা পৃথিবীর ৯৩০ মাইল উর্ধ্বে থাকিয়া ১০২ মিনিটে একবার করিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে। মস্কো বেতারে আরও জানান হয় যে, কৃত্রিম উপ-গ্রহটিতে একটি কুকুর রহিয়াছে।

মস্কো বেতারে বলা হয় যে, দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহটি প্রথম উপগ্রহটির ন্যায় ঘণ্টায় ১৮ হাজার মাইল বেগে আকাশ পরিক্রমায় নিযুক্ত রহিয়াছে। উহার কক্ষপথ অধিকতর উর্ধ্বে অবস্থিত বলিয়া বিশ্ব-পরিক্রমায় উহার অপেক্ষাকৃত বেশী সময় লাগিতেছে।

ইহাতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও রেডিও ট্রান্স-মিটার রাখিবার জন্য কয়েকটি বাক্স আছে। বাক্স-গুলি ও যন্ত্রপাতির ওজন ৫০৮.৩ কিলোগ্রাম; অর্থাৎ ১১২০.৭ পাউণ্ড—প্রায় আধ টন।

বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বতর স্তর এবং মহাজাগতিক শূন্যে জীবন্ত প্রাণীর উপর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বৎসরের কার্যক্রম অনুসারে গত ৩রা নভেম্বর সোভিয়েট ইউনিয়নে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসহ রকেটবাহিত দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহটি উর্ধ্বাকাশে প্রেরিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহে হ্রস্ব তরঙ্গে সৌর-বিকিরণ এবং বর্ণালীর অতিবেগুনী রশ্মির এলাকা সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য যন্ত্রপাতি রাখা হইয়াছে। মহাজাগতিক রশ্মি এবং তাপ ও চাপ সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহের যন্ত্রপাতিও রহিয়াছে। কুকুরের জন্য খাদ্য দেওয়া হইয়াছে এবং মহাজাগতিক শূন্যলোকে উহার অবস্থা এবং দৈহিক কার্যকলাপের বিবরণ সংগ্রহার্থে যন্ত্রপাতি রাখা হইয়াছে।

দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহে ৪০.০০২ এবং ২০.০০৫ মেগাসাইকেলে (তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য প্রায় ৭.৫ এবং ১৫ মিটার) দুইটি বেতার প্রেরক যন্ত্র কাজ করিতেছে। উহাদের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

উল্লিখিত সমস্ত যন্ত্রপাতি, কুকুর এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার মোট ওজন ৫০৮.৩ কিলোগ্রাম।

স্পুটনিককে কক্ষপথে ভ্রমণের জন্য সেকেণ্ডে প্রায় ৮ হাজার মিটার গতিবেগ দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের ফলে পাওয়া হিসাব হইতে জানা গিয়াছে যে, ভূপৃষ্ঠ হইতে স্পুটনিকের সর্বাধিক দূরত্ব ১৫০০ কিলোমিটার। ইহার একবার সম্পূর্ণভাবে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে ১ ঘণ্টা ৪২ মিনিট লাগিতেছে।

পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ যে, দ্বিতীয় রুশ কৃত্রিম উপগ্রহের আরোহী লাইকা নামক কুকুরটির মৃত্যু হইয়াছে। সরকারীভাবে এই সংবাদ মস্কো হইতে প্রচার করা হইয়াছে।

নূতন মূল পদার্থ আবিষ্কৃত

যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং সুইডেনের বিজ্ঞানীদের

একটি দল মিলিতভাবে গবেষণা করিয়া একটি নূতন রাসায়নিক উপাদান আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা ১০২-তম মৌলিক পদার্থ।

গবেষণাকারী এই দলটিতে ছিলেন মার্কিন পরমাণু-শক্তি কমিশনের আরগোন ন্যাশনাল লেবরেটরীর রসায়ন শাখা, বৃটেনের হারওয়েলস্থিত পরমাণু-শক্তি কমিশন এবং সুইডেনের ষ্টকহলমস্থিত নোবেল ইনষ্টিটিউট অব ফিজিক্সের বৈজ্ঞানিকগণ।

নোবেল ইনষ্টিটিউটে সাইক্লোট্রনের সাহায্যে কার্বন আয়নের গতি বর্ধিত করিয়া সেই ক্রমবর্ধিত গতিসম্পন্ন বস্তুটির সঙ্গে ৯৬-তম উপাদান কিউরিয়ামের সংঘর্ষ ঘটানো হয় এবং এই সংঘর্ষের ফলেই নূতন উপাদানটি পাওয়া যায়। গত মার্চ মাসে এই বৈজ্ঞানিক দলটি গবেষণা সুরু করেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই নূতন উপাদান বা মূল পদার্থটির অস্তিত্বের আভাস পাওয়া যায়। এই পদার্থটির মধ্যে তেজস্ক্রিয়তার লক্ষণ দেখা যায়। ইহার রাসায়নিক গুণাগুণও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া জানা যায়।

ইহার পর এপ্রিল মাসে আবার এই ব্যাপারটি লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইয়া বৈজ্ঞানিক দল একই বস্তুর সন্ধান লাভ করেন। সম্প্রতি পুনরায় অনুরূপ পরীক্ষার ফলেও উক্ত আবিষ্কার সমর্থিত হইয়াছে।

ব্যবহৃত নিকেল অনুঘটক হইতে নিকেল উদ্ধারের নূতন পদ্ধতি

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শিল্প বিজ্ঞান বিভাগে বনস্পতি শিল্পে ব্যবহৃত নিকেল অনুঘটক হইতে নিকেল উদ্ধারের একটি নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

স্বাভাবিক মাত্রায় বা একটু বেশী সালফিউরিক, নাইট্রিক বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ব্যবহার করিলে ৯০/৯৩ শতাংশ নিকেল পাওয়া যায়। অ্যাসিড ব্যবহারের ফলে চর্বি জাতীয় পদার্থটি অপসারিত হয়। হাইড্রোজেন পারক্সাইডের সাহায্যে নিকেল লৌহ হইতে মুক্ত করা হয়।

ভারতে বনস্পতি শিল্পে প্রচুর পরিমাণে নিকেল অনুঘটক লাগে। ভারতে নিকেলের অভাব থাকায় সমস্ত সম্পদ পুরাপুরি কাজে লাগাইবার চেষ্টা চলিতেছে।

বনস্পতি শিল্পে নিঃশেষে ব্যবহৃত নিকেল অনুঘটক হইতে নিকেল উদ্ধারের পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ গত সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৫৭) প্রকাশিত "জার্ণাল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

জল লবণমুক্ত করিবার ব্যবস্থা

সিরিয়ার অন্তর্গত তোব্রুকে শীঘ্রই এমন একটি যন্ত্র স্থাপন করা হইবে যাহার সাহায্যে সুলভে অত্যধিক লবণাক্ত জল পানীয় জলে রূপান্তরিত করা সম্ভব হইবে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বৈজ্ঞানিক ও শ্রমশিল্প গবেষণা সংস্থা এবং নেদারল্যাণ্ডসের কেন্দ্রীয় কারিগরী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বৃটেনের একটি ফার্ম উক্ত যন্ত্রটি উদ্ভাবন ও নির্মাণ করিয়াছেন। তোব্রুকের যন্ত্রটিতে দৈনিক ২,২০০ গ্যালন জল পরিশুদ্ধ করা সম্ভব হইবে এবং ইহাতে খরচ পড়িবে ১০০০ গ্যালন প্রতি ৫ শিলিং মাত্র।

পৃথিবীর বৃহত্তম বিমান

মস্কো বেতারে ঘোষিত হইয়াছে যে, রাশিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও দ্রুতগামী চার ইঞ্জিনযুক্ত বিমান নির্মাণ করিয়াছে। আন্তর্মহাদেশীয় পাল্লায় এই বিমানের ১৭০ জন যাত্রী বহনের ক্ষমতা আছে; কিন্তু নিকট পাল্লায়, যেমন মস্কো হইতে কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী সোচি বন্দর পর্যন্ত (দূরত্ব অনুমান ৮৫০ মাইল) উহা ২২০ জন যাত্রী লইয়া যাইতে পারিবে। বিমানে একটা রেঁস্তোরা আছে। উহাতে ৪৮ জন লোক বসিতে পারিবে এবং দুইটি পাকশালা হইতে উহাতে আহার্য পরিবেশন করা

হইবে। পাকশালা দুইটি একটার উপর আর একটা অবস্থিত এবং একটা লিফ্‌ট দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত।

মহাশূন্যে মার্কিন রকেট নিক্ষেপ

ওয়াশিংটনস্থিত মার্কিন বিমান বহরের হেড-কোয়ার্টার হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, চার বার ব্যর্থতার পর সাফল্যের সহিত মহাশূন্যে রকেট নিক্ষেপ করা হইয়াছে। কিন্তু রকেটটি চার হাজার মাইল উর্ধ্বে উঠিয়াছে বলিয়া লস্‌ এঞ্জেলস্‌-এর একটি সংবাদপত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হেডকোয়ার্টার হইতে সমর্থিত হয় নাই। বিমান দপ্তর হইতে বলা হইয়াছে যে, ২১শে অক্টোবর সাফল্যজনকভাবে পরীক্ষাকার্যটি অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সংবাদপত্র বলিয়াছে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্রবাল দ্বীপের এক লক্ষ ফুট উচ্চে একটি বেলুন হইতে রকেটটি নিক্ষেপ করা হয়।

উক্ত সংবাদপত্রের বিজ্ঞান বিভাগীয় সম্পাদক লিখিয়াছেন যে, রকেট কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি লইয়া যেসব বৈজ্ঞানিক দেশে ফিরিয়াছেন তাঁহাদের নিকট তিনি সাফল্যজনক রকেট নিক্ষেপের সংবাদ পান।

সংবাদে বলা হইয়াছে, রুশ উপগ্রহের ন্যায় পৃথিবী পরিক্রমা করিবার জন্য রকেটটি নির্মিত হয় নাই। সবচেয়ে উর্ধ্বে উঠিবার জন্যই রকেটটি প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ

গত ২১শে অক্টোবর লণ্ডনে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মস্কো হইতে এক জরুরী তারবার্তা পাইয়া জডরেল ব্যাঙ্কে (চেশায়ার) স্থাপিত বৃটেনের বৃহত্তম রেডিও-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহবাহী রকেটের অবস্থান নির্ণয় করা হইয়াছে।

এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক এ, সি, বি, লোভেল বলেন যে, সোভিয়েট জ্যোতি-বিজ্ঞান পরিষদ রকেটের মোটামুটি অবস্থান জানাইয়া উহা ঠিক কোন জায়গায় রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া তাঁহাদিগকে জানাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

মস্কোর এক খবরে প্রকাশ, মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য নিকট ভবিষ্যতে মহাশূন্যে বিচরণকারী একটি গবেষণাগার পৃথিবী প্রদক্ষিণ সুরু করিবে।

আমেরিকার নূতন ক্ষেপণাস্ত্র

একটি নূতন ধরণের ক্ষেপণাস্ত্র ও একটি টেলিস্কোপিক ক্যামেরা আবিষ্কারের কথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনী ঘোষণা করিয়াছে। এই দুইটিই দেশরক্ষা ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক হইবে। ক্ষেপণাস্ত্রটির নাম দেওয়া হইয়াছে রাসকেল। উহা বিমান হইতে ভূতলে অবস্থিত বস্তুর উপর ক্ষেপণ করা যায়। কত দূর হইতে ক্ষেপণ করা যায়, বিমান বাহিনী তাহা প্রকাশ করে নাই তবে বেসরকারীভাবে জানা গিয়াছে যে, উহা ৩০০ হইতে ৫০০ মাইল দূরবর্তী লক্ষ্যবস্তুর উপর ক্ষেপণ করা যাইবে। শত শত মাইল দূরবর্তী দ্রুতগতি বোমারু বিমান হইতে উহা যাহাতে লক্ষ্যবস্তুর উপর সঠিকভাবে নিক্ষেপ করা যায়, সেইভাবেই উহা নির্মিত হইয়াছে।

যে টেলিস্কোপিক ক্যামেরা আবিষ্কার করা হইয়াছে উহার সাহায্যে প্রায় ১০০ মাইলের মধ্যে ক্ষেপণাস্ত্রের ছবি তোলা যায়। রেডারের সাহায্যে উহার 'ফোকাস' আপনা হইতেই ঠিক হইয়া যায়। ক্ষেপণাস্ত্র ও ক্যামেরা দুই-ই সাফল্যের সহিত ব্যবহার করা যাইতে পারে বলিয়া পরীক্ষায় জানা গিয়াছে।

ধূমবিহীন কয়লা

এই খবরটিতে অনেকেই উৎফুল্ল হইবেন। জিয়ালগোরার কেন্দ্রীয় ইন্ধন গবেষণাগার নন-

কোকিং ও ছোট ছোট ইষ্টকের আকারবিশিষ্ট কয়লা হইতে গৃহে ব্যবহারের উপযোগী কয়লা উৎপাদনের যে পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা যদি ব্যবসায় ক্ষেত্রে আরও বেশী প্রয়োগ করা সম্ভব হয় তাহা হইলেই অচিরে উৎকৃষ্ট ধূমবিহীন কয়লা পাওয়া যাইবে।

এই গবেষণাগারে উদ্ভাবিত পদ্ধতি অনুসারে একটি জ্বালানী কক্ষে কয়লাকে নিয়ন্ত্রিত হারে অঙ্গারে পরিণত করা হয়। কয়লার উদ্বায়ী পদার্থ জ্বালাইয়া অঙ্গার প্রস্তুত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় তাপ সৃষ্টি করা হয়। ঐ উদ্বায়ী পদার্থ ঠিকমত জ্বালাইবার জন্য জ্বালানী কক্ষের বিভিন্ন বিভাগে বায়ু প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়োজন ঘটে। অব্যবহৃত গ্যাসের তাপ বাষ্প তৈয়ার, চুন জ্বালান, ইট তৈয়ার এবং সিমেন্টের পাঁজা জ্বালাইবার কাজে লাগে।

এই গবেষণাগারে পরীক্ষার জন্য দৈনিক দশ টন ধূমবিহীন কয়লা উৎপাদনের ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি অল্প মূল্যের যন্ত্র বসান হইয়াছে। এইভাবে যে কয়লা তৈয়ারী হয় তাহা দেখিতে কাঠ কয়লার মত।

মেহেদী পাতার সাহায্যে বস্ত্র রঞ্জন

দিল্লী পলিটেকনিকের ফলিত বিজ্ঞান বিভাগে গবেষণার ফলে মেহেদী পাতা হইতে কাপড় রঙ্গাইবার একটি নূতন উপাদান পাওয়া গিয়াছে। এই নূতন রঞ্জক ব্যবহার করিবার ফলে কাপড় রঙ্গাইবার খরচ বেশ কমিয়া যাইবে। এতদিন মেহেদী পাতা চুল, আঙ্গুল ও নখ রঙ্গাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত।

মেহেদী পাতা হইতে বিশুদ্ধ ও শুষ্ক অবস্থায় শতকরা মাত্র একভাগ উল্লিখিত নূতন রঞ্জক পাওয়া যায়। মেহেদী পাতার মূল্য পাউণ্ড প্রতি এক আনা। অনেক সময় তারও কম মূল্যে পাওয়া যায়।

এই নূতন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ "জার্ণাল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ" পত্রিকার সেপ্টেম্বর (১৯৫৭) সংখ্যায় পাওয়া যাইবে।

কলিকাতায় পদার্থ-বিজ্ঞানের আলোচনা সভা

বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ-মঞ্জুরী কমিশনের উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে গত সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় পদার্থ-বিজ্ঞানীদের একটি আলোচনা সভা হইয়া গিয়াছে। ভারতের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপকগণ এই সভায় যোগদান করেন। মাসাচুসেট্‌স্ ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজির অধ্যাপক ডাঃ বুকনারও এই আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর বিভাগে পদার্থ-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞানী নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করেন এবং একটি উন্নত শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তনের বিষয় আলোচিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ পি, সি, ভট্টাচার্য তাঁহার বিভাগের শিক্ষাপদ্ধতির একটি বিবরণী দান করেন এবং সমাগত সুধীবৃন্দকে স্বাগত জানান। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যক্ষ ডাঃ ডি. এম. বসু পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে তাঁহার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার বিবরণ দেন এবং ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার একটি উন্নত শিক্ষাপদ্ধতি ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের উপযোগিতা সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করেন। পরিশেষে ডাঃ বসু আমেরিকার অনুকরণে এদেশেও পরমাণু সম্পর্কিত গবেষণার উন্নতি বিধানের জন্য আঞ্চলিক ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

ডাঃ বুকনার তাঁহার অভিভাষণে বলেন—ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োজনানুরূপ সরকারী সাহায্য ও উৎসাহ পায় না। সরকারের যথোপযুক্ত অনুপ্রেরণা না পাইলে স্নাতকোত্তর গবেষণা কার্যের আশানুরূপ উন্নতি বিধান করা কোন দেশেই সম্ভব নহে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্নাতকোত্তর গবেষণার জন্য সরকারী সাহায্য লাভের চেষ্টা করা কর্তব্য। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে সুসংবদ্ধ গবেষণা কার্য পরিচালিত হয় তাহার গুরুত্ব সর্বাধিক। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সরকার পরিচালিত বহু গবেষণাগার আছে; কিন্তু বিশ্ববিদ্যলয়গুলির গবেষণা কার্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ তাঁহাদের স্নাতকোত্তর শিক্ষা পদ্ধতির বিবরণ দান করেন এবং এতদ্বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির উন্নতি বিধানের জন্য সকলের অভিমত ও পরামর্শ চাহেন।

বিজ্ঞপ্তি

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা—(৩য় বর্ষ)

এতদ্দ্বারা বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার তৃতীয় বার্ষিক প্রতিযোগিতা আহ্বান করা যাইতেছে। বিজ্ঞানের নিম্নলিখিত শাখা দুইটির অন্তর্গত যে কোন বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া সহজ ভাষায়, জটিলতা-বর্জিত জনপ্রিয় প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে:—

(ক) জড় বিজ্ঞান (Physical Science)

রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ধাতুবিজ্ঞান ইত্যাদি।

(খ) জীব বিজ্ঞান (Biological Science)

উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, শারীরবৃত্ত, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি।

উক্ত শাখাদ্বয়ের প্রত্যেকটির জন্য বিভিন্ন বিষয়ক উৎকৃষ্ট তিনটি প্রবন্ধের লেখকগণের প্রত্যেককে ৫০৲ (পঞ্চাশ) টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। মোট পুরস্কারের সংখ্যা হইবে ছয়টি। প্রবন্ধের গুণাগুণ বিচারে পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত পরীক্ষকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। প্রতিযোগিতায় প্রেরিত কোন প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হইবে না। কোন প্রবন্ধ যোগ্য বিবেচিত হইলে পরিষদ যথাসময়ে তাহা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারিবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক লেখককে জানানো দুঃসাধ্য—পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম আগামী মার্চ '৫৮ মাসের প্রথম ভাগে দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে ও 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হইবে।

আগামী ৩১শে ডিসেম্বর '৫৭ তারিখের মধ্যে সকল প্রবন্ধ পরিষদের কার্যালয়ে (কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। ২৯৪।২।১, অপার সারকুলার রোড, ফেডারেশন হল। কলিকাতা-৯) পৌছান চাই। প্রবন্ধ **কালি দিয়া কাগজের এক পিঠে** পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে—প্রবন্ধের সঙ্গে ছবি থাকিলে তাহা 'চাইনিজ ইঙ্কে' আঁকা ভাল ছবি হওয়া দরকার। প্রত্যেকটি প্রবন্ধের আয়তন হাতে লেখা অর্ধ ফুলস্ক্যাপ (১৩″×৮″) আট পৃষ্ঠার অধিক বা ছয় পৃষ্ঠার কম না হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের গায়ে কোন নাম ঠিকানা থাকিবে না—**পৃথক কাগজে** লেখকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা দিতে হইবে। প্রবন্ধের শীর্ষে **প্রতিযোগিতার জন্য** এই কথাটি লিখিতে হইবে।

কর্মসচিব,

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দশম বর্ষ | ডিসেম্বর, ১৯৫৭ | দ্বাদশ সংখ্যা

আকাশ-রহস্য

শ্রীকমলেশ মৈত্র

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক ও তৎকালীন আরও অনেক মনীষীর বিশ্বাস ছিল—এই যে নীলবর্ণের আকাশ, যা রাত্রিকালে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, তা স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝখানে একটি বিশাল যবনিকা বিশেষ। এরই মধ্যে কতকগুলি ছিদ্র দিয়ে স্বর্গের পবিত্র রশ্মি নির্গত হয়ে মর্ত্যে নেমে আসে—যা আজ আমাদের কাছে সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র নামে পরিচিত। সর্বপ্রথম যাঁরা এই ভুল ভাঙ্গেন, তাঁদের মিথ্যাবাদী, নাস্তিক ইত্যাদি বহু অপবাদ সহ্য করতে হয়। গ্যালিলিওর আবিষ্কৃত টেলিস্কোপ যন্ত্র পর্যন্ত উক্ত সত্যবাদী দার্শনিকদের কাছে শক্তিশালী কাচের একপ্রকার যান্ত্রিক কৌশল বলে অনুমিত হয়েছিল। এই যে রহস্যময় আকাশ যা নিয়ে এত বাদানুবাদ, সে সম্বন্ধে আজ আমরা কিছু আলোচনা করবো।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবী থেকে পঞ্চাশ কোটি আলোক-বর্ষ দূরে (এক আলোক-বর্ষ=১৮৬০০০×৩৬৫×২৪×৬০×৬০ মাইল)। বিশ্বের এক নির্দিষ্ট অংশে অন্ততপক্ষে কুড়ি লক্ষ নীহারিকা ছড়িয়ে আছে। এগুলির এক একটা এত বড় যে, এদের প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথক বস্তু-জগৎ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। এদের মধ্যে অনেকেরই প্রায় দু'শো কোটি সূর্য উৎপন্ন করবার ক্ষমতা আছে। একটা থেকে আর একটার দূরত্বও বড় কম নয়—গড়ে প্রায় কুড়ি লক্ষ আলোক-বর্ষ; অর্থাৎ একটা থেকে আর একটা নীহারিকায় আলো পৌঁছাতে লাগে কুড়ি লক্ষ বছর। এই রকমই একটা নীহারিকা-জগতের মধ্যে আমরা বাস করছি। এই জগতের নক্ষত্র-সংখ্যা দশ হাজার কোটি, আর এরা প্রত্যেকেই এক একটা জলন্ত সূর্য। আমাদের সূর্যও এই নক্ষত্রদেরই একজন। তবে সূর্য আমাদের কাছে আছে—এটাই হলো নক্ষত্রদের সঙ্গে তার পার্থক্য। আমাদের সূর্য কত বড় হতে পারে, তার হিসাব করা যাক।

মহাশূন্যের মধ্যে ছড়ানো জ্যোতিষ্কপুঞ্জের সমাহারকে বিশ্ব বলা যেতে পারে। যদি এই মহাবিশ্বের প্রত্যেক জায়গা থেকে গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা প্রভৃতি সংগ্রহ করে একটা জায়গায় রাখা হয়, তবে আমাদের সূর্য হবে সেই বিপুল স্তূপের কেবল একটা কণা মাত্র। বিশাল হিমালয়

পর্বতের সঙ্গে একটা বালিকণার তুলনা করলে এই পরিমাণের কিছুটা আভাস দেওয়া যেতে পারে।

আমাদের সূর্যকে ঘিরে যেমন বিরাট শূন্য স্থান রয়েছে, তেমনি প্রত্যেক নক্ষত্রের চারদিকেও ঘোরবার মত বিরাট স্থান আছে। সূর্য থেকে পঁচিশ লক্ষ কোটি মাইল দূরে গেলে একটা ক্ষীণ তারকার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে একটা নক্ষত্রের কাছে অন্য একটা নক্ষত্রের আসবার সম্ভাবনা যে কত কম, তা সহজেই অনুমেয়। অবশ্য সব নক্ষত্রই এই শূন্যমার্গের একক যাত্রী নয়; কখনও কখনও দুটি, তিনটি বা অনেকগুলি নক্ষত্রকে একসঙ্গে এই মহাশূন্যে ভেসে বেড়াতে দেখা যায়। সপ্তর্ষি-মণ্ডলই (Great bear) এর বিশিষ্ট উদাহরণ। নক্ষত্র, নীহারিকা ছাড়া গ্রহ-উপগ্রহ প্রভৃতি যেসব জ্যোতিষ্কগুলিকে আকাশের স্থানে স্থানে বিচরণ করতে দেখা যায়, বিশ্ব-বস্তুর পরিমাণ হিসাব করবার সময় সেগুলি এত তুচ্ছ হয়ে পড়ে যে, তখন তাদের স্বচ্ছন্দেই বাদ দেওয়া চলে।

জ্যোতিষ্কগুলি ছাড়া আকাশে অনেক কিছুই থাকতে পারে, কিন্তু সে সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে ধারণা করা কঠিন ব্যাপার। আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান—ফটোগ্রাফ, স্পেকট্রাম বা বর্ণালীর সাহায্যে বিজ্ঞানীরা আন্তর্নাক্ষত্রিক স্থানের মধ্যে এমন সব বড় বড় জ্যোতিহীন বস্তুপিণ্ডের সন্ধান পেয়েছেন যাদের এক একটার আকারের বিশালত্বের কথা শুনলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। এই সব বস্তুপিণ্ডের এক একটার মধ্যে যে পরিমাণ উপাদান আছে তা দিয়ে অন্ততঃ পঞ্চাশ কোটি সূর্য তৈরী হতে পারে। এগুলির ঘনত্ব অত্যন্ত কম। বাতাস এদের তুলনায় বহু গুণ ভারী। এসব বস্তু-পিণ্ডের সাত হাজার ঘন মাইল এক এক খণ্ডের ওজন এক আউন্স বললে, তাদের ওজন সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যেতে পারে। নীহারিকা আকারের এই বস্তুপিণ্ডগুলির মধ্যে অনেক ছোট বড় কণিকা আছে। এগুলি যদি কোন নক্ষত্রের খুব কাছাকাছি থাকে তবে নক্ষত্রের মুখামুখি এদের খানিকটা অংশ অত্যন্ত ক্ষীণভাবে আলোকিত হয়। এগুলির জন্যে আমরা অনেক নক্ষত্র দেখতে পাই না; আবার কয়েকটাকে ক্ষীণভাবেও দেখা যায়। এই অস্বচ্ছ পদার্থ ছায়াপথের মাঝখানে পড়ে বলেই তা খাপছাড়া দেখায়, আর সে জন্যেই তার ঔজ্জ্বল্য সব জায়গায় সমান হয় না।

ছায়াপথ যে বহুসংখ্যক নক্ষত্র নিয়ে তৈরী, গ্যালিলিও তা অনেকদিন আগেই আবিষ্কার করে-ছিলেন। খালি চোখে সব নক্ষত্রকেই এক রকম মনে হয়। আসলে কিন্তু তা নয়; পৃথিবীর মত ছোট এবং সূর্যের চেয়ে বহুগুণ বড় নক্ষত্রেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। নক্ষত্র যেমন ছোট বা বড় হয়ে থাকে, নীহারিকাও সেই রকম ছোট বা বড় হয়।

সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি যে সব জ্যোতিষ্কগুলিকে আমরা যেমন উজ্জ্বল দেখি, নীহারিকাগুলিকে কিন্তু তেমন উজ্জ্বল দেখায় না; সেগুলিকে কুয়াসা মত অথবা হাল্কা মেঘের মত দেখায়। এর প্রধান কারণ, এগুলি আমাদের কাছ থেকে কল্পনাতীত দূরত্বে অবস্থিত। এই নক্ষত্রমণ্ডলীতেই দু-রকমের নীহারিকা দেখতে পাওয়া যায়। এক রকম হলো গ্রহরূপী, আর এক রকমের হলো অসম আকৃতির। প্রথমোক্ত নীহারিকা সংখ্যায় অল্প। সেই জন্যে এগুলির তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এগুলিকে চক্রাকারে ঘুরতে দেখা যায় বলে এদের এই নাম দেওয়া হয়েছে। এগুলির নাম নীহারিকা দেওয়া হলেও এরা কিন্তু নক্ষত্র শ্রেণীরই অন্তর্গত। বিশাল বাষ্পমণ্ডল এদের প্রত্যেকটিকে ঘিরে আছে। একটা রকেট ঘণ্টায় পাঁচ হাজার মাইল বেগে চললে নয় বছরে একটা বড় নক্ষত্রের একদিক থেকে আর একদিকে পৌঁছাতে পারে; কিন্তু তা নব্বই হাজার বছরের কম সময়ে এই নীহারিকাগুলির কোনটাকেই অতিক্রম করতে পারবে না। মোটের উপর এক একটা নক্ষত্র

থেকে এরা প্রায় দশ হাজার গুণ বড় বলে ধরে নেওয়া যায়। এদের বাইরের উষ্ণতাও বড় কম নয়! সেন্টিগ্রেড স্কেলে সত্তর থেকে পঁচাত্তর হাজার ডিগ্রী পর্যন্ত হয়ে থাকে। সূর্য বা অন্যান্য তারকার ভিতরের উষ্ণতা এর চেয়ে বেশী হলেও (সূর্যের কেন্দ্রের উষ্ণতা সম্ভবতঃ কয়েক কোটি ডিগ্রি সি.) আকাশের কোন জ্যোতিষ্কেরই বাইরের উষ্ণতা এত নয়। আমাদের সূর্যের বাইরের উষ্ণতা মাত্র ছয় হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এমন কি হোয়াইট-ডোয়ার্ফ নামক নক্ষত্রেরও বাইরের উষ্ণতা এত নয়। কি করে এই দূরস্থিত বস্তুপিণ্ডগুলির বাইরের উষ্ণতা নির্ণয় করা হয়? বস্তুর উষ্ণতা যত বেশী বাড়ে তা থেকে তত বেশী তাপ বিকিরিত হয়। এই ভাবে উষ্ণতা ৫৫০° সি.-এ এলে তাথেকে আলো নির্গত হতে থাকে। এই ভাবে ১০০০° সে. থেকে নক্ষত্র বা অন্যান্য জ্যোতিষ্কের আলোর বর্ণালী পরীক্ষা করে, তার বাইরের উষ্ণতা নির্ণয় করা হয়। এ ছাড়া রেডিওমিটার যন্ত্রের সাহায্যেও উষ্ণতার পরিমাপ করা হয়ে থাকে।

এ হলো গ্রহরূপী নীহারিকার কথা। এবারে অসম আকৃতির নীহারিকা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। এই নীহারিকাগুলি আছে ছায়াপথের সীমানার মধ্যে। আকারের সমতা নেই বলেই এদের এই নাম দেওয়া হয়েছে। এই জ্বলন্ত বাষ্পের স্তূপগুলি অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। এগুলি এত বড় যে, এদের ফটোগ্রাফ নিলে দেখা যায় যেন একটা মস্ত বড় জালে ভরা রয়েছে কোটি কোটি নক্ষত্র। এ থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, গ্রহরূপী নীহারিকা এর তুলনায় কত ছোট! এসব নীহারিকা থেকে যে আলো আসে, তা যদি অনেকক্ষণ ধরে ফটোগ্রাফির ফিল্মে পড়তে দেওয়া হয় তাহলে দেখা যায় যে, এগুলি ভাঙাচোরা নয় বরং সুগঠিত এবং সুবিন্যস্ত। এসব নীহারিকা থেকে যে আলো বিকিরিত হয় তা সূর্যের আলোর চেয়ে হাজার হাজার গুণ শক্তিশালী।

আর এক শ্রেণীর নীহারিকা আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে বিশ্ব-জগতের ক্রমপরিণতির বিষয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক কিছু জানতে পেরেছেন। এরা পৃথিবী থেকে এত দূরে অবস্থিত যে, এই দূরত্বের কথা কল্পনা করাও এক রকম অসম্ভব ব্যাপার। এই যে ধরণের নীহারিকা সব চেয়ে কাছে আছে তা থেকে আলো আসতে সময় লাগে প্রায় আট লক্ষ বছর। অর্থাৎ পৃথিবীতে যে সময়ে প্রথম মানুষের আবির্ভাব হয়, তখন এই নীহারিকা থেকে যে আলো চলতে সুরু করেছে, সেই আলো আজ পৃথিবীতে পৌঁছাচ্ছে।

এখন প্রশ্ন উঠছে—এত দূরে থাকা সত্ত্বেও এগুলিকে দেখতে পাওয়া যায় কেন? এর প্রধান কারণ হলো, এগুলির আকারের বিশালত্ব। যে রকেট নব্বই হাজার বছরে গ্রহরূপী নীহারিকার এক দিক থেকে আর এক দিকে যেতে পারে—বহির্বিশ্বের এই সব নীহারিকার এক দিক থেকে আর এক দিকে যেতে তার সময় লাগবে দশ হাজার কোটি বছরেরও বেশী। হিসাবে দেখা গেছে যে, একটা বড় নীহারিকার ওজন সূর্যের ওজনের চেয়ে তিন হাজার পাঁচশ' কোটি গুণ বেশী। সব শেষে যে নীহারিকার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সেগুলিকে সহজেই চেনা যায়। কারণ, সেগুলির আকার অন্যান্য নীহারিকা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। তাছাড়া বর্ণালীর মধ্য থেকে এদের সহজেই বেছে নেওয়া যায়। আধুনিক বিজ্ঞানীরা উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, এগুলির বাইরের অংশ নক্ষত্রের দ্বারা তৈরী। এগুলির ভিতরের দিকে কোন নক্ষত্র দেখা না গেলেও ছোট ছোট বস্তুকণার উপস্থিতি জানতে পারা গেছে। বিজ্ঞানীরা এই কণাগুলিকে গ্যাসের অণু বলে অনুমান করেছেন। সুতরাং নীহারিকা থেকেই যে নক্ষত্র আর বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি হয়েছে—এ কথাটা কাল্পনিক নয়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—এই নীহারিকা কোথা থেকে

এলো? জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডিংটন এর উত্তর দিয়েছেন।

বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি হওয়ার আগে আকার বিশিষ্ট কোন জিনিষই এই মহাশূন্যে ছিল না—নক্ষত্র, নীহারিকা সূর্য—কিছুই না। পদার্থ আর শক্তির মাঝামাঝি জিনিষ ইলেকট্রন আর প্রোটন সমস্ত বিশ্ব জুড়ে সমান ভাবে ছড়ানো ছিল, প্রতি লিটার (এক লিটার=১০০০ সি. সি) তফাতে তফাতে; অর্থাৎ এত দূর শূন্যতা আমাদের পক্ষে কল্পনা করা কঠিন। প্রথমে এগুলির কোন গতি ছিল না। কিন্তু পরে ধীরে ধীরে এদের মধ্যে গতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইলেকট্রন আর প্রোটনের মধ্যে গতিবেগ আসবার সঙ্গে সঙ্গে একে অপরের সঙ্গ খুঁজতে থাকে এবং প্রবল আকর্ষণের ফলে এরা পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে হাইড্রোজেনের সরল পরমাণুর সৃষ্টি করে। পরে এই হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে অন্যান্য পরমাণুর সৃষ্টি চলতে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, হাইড্রোজেন পরমাণুই সব চেয়ে আদি বস্তুকণা। হিসাবে দেখা যায়, বিশ্ববস্তুর শতকরা নব্বই ভাগ এখনও হাইড্রোজেন। হাইড্রোজেন পরমাণু ক্রমেই সংখ্যায় বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সারা বিশ্বময় একটা বিরাট গ্যাসীয় পিণ্ডে পরিণত হয়। গতি সঞ্চারিত হওয়ার ফলে এই বিরাট পিণ্ড পরে ছিন্নভিন্ন হয়ে অসংখ্য পৃথক পৃথক স্তূপের সৃষ্টি করে। এগুলিই হলো প্রথম স্তরের নীহারিকা। আজকাল যে গ্রহরূপী নীহারিকা আর নক্ষত্র দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলি কিন্তু চিরকালই এ রকম ছিল না—এ হচ্ছে নীহারিকাগুলিরই ক্রমবিকাশের ফল।

নীহারিকা তৈরী হওয়ার পর সেগুলি সেকেণ্ডে এক কিলোমিটার বেগে ঘুরতে থাকে। এই ঘূর্ণনের ফলে তাদের মধ্যে ভীষণ তাপের সৃষ্টি হয়। এই জন্যে সেগুলি ক্রমে ক্রমে জলতে সুরু করে দেয়। এই ভাবে তারা পরে নক্ষত্রে পরিণত হয়। আমাদের সূর্যের উৎপত্তি এই নীহারিকা থেকেই হয়েছে। নীহারিকা থেকে যেমন নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়, তেমনি নক্ষত্র থেকে গ্রহ, আর গ্রহ থেকে উপগ্রহের সৃষ্টি হয়। সূর্য যে একটা নক্ষত্র—একথা আগেই বলা হয়েছে।

সূর্যের পদার্থ-সমুদ্রে যেমন মাঝে মাঝে জোয়ার আসে, অন্যান্য নক্ষত্রের পদার্থ-সমুদ্রেও তেমনি মাঝে মাঝে জোয়ার আসে। এই জোয়ারের ফলে তাদের দেহে ভীষণস্ফীতি দেখা দেয়। কোন কারণে যদি দুটা নক্ষত্র খুব কাছে আসে, তাহলে পরস্পর আকর্ষণের ফলে উভয়েরই দেহ ভীষণভাবে ফুলে ওঠে। যার আকর্ষণ-শক্তি কম হয়, তার দেহ থেকে স্ফীত অংশ ছিটকে বেরিয়ে এসে তাকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে। তবে এইভাবে গ্রহের উৎপত্তির সম্ভাবনা লক্ষ নক্ষত্রের মধ্যে একটার মাত্র থাকতে পারে। কোন গ্রহ বা উপগ্রহ জন্ম থেকেই এখনকার মত নিরেট দেহ নিয়ে ছিল না। ক্রমে ক্রমে শক্তিক্ষয়ের ফলেই তাদের এই পরিণতি ঘটেছে। আমাদের পৃথিবীও একদিন একটা বাষ্পীয় গোলক ছিল; ক্রমশঃ শীতল হওয়ার ফলে জমাট বেঁধেছে। আবার গ্রহ থেকে হয়েছে উপগ্রহের সৃষ্টি। যেমন, পৃথিবীর দেহ থেকে চন্দ্র, অন্যান্য গ্রহ থেকে তাদের উপগ্রহ, আর শনির দেহ থেকে তার বলয়ের উৎপত্তি হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, গতি-বেগ থেকেই বিশ্বে নতুন নতুন জিনিষের সৃষ্টি হচ্ছে। বিশ্বে কোন জিনিষই স্থির নেই। বিশ্ব-জগতের যাবতীয় জড়বস্তুর সব চেয়ে ছোট অংশ হলো পরমাণু। এই পরমাণু থেকে আরম্ভ করে গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা—সকলের মধ্যে একই চাঞ্চল্য দৃষ্টিগোচর হয়। নীহারিকার কিরণ পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা দেখতে পেয়েছেন, প্রত্যেকটি নীহারিকাই প্রচণ্ড বেগে এগিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবী থেকে কল্পনাতীত দূরত্বে অবস্থিত নীহারিকারই বেগ খুব বেশী। যে নীহারিকার দূরত্ব

এখান থেকে পনেরো কোটি আলোক-বর্ষ, তার গতিবেগ সেকেণ্ডে পনেরো হাজার মাইল। সম্প্রতি জানা গেছে, সূর্য তার সম্পূর্ণ সৌরজগৎকে নিয়ে অভিজিৎ (Vega) নামে একটা নক্ষত্রের দিকে সেকেণ্ডে বারো মাইল বেগে ছুটে যাচ্ছে। তাছাড়াও বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডেরও হয়তো এই রকমের একটা অজ্ঞাত গতি আছে।

বিজ্ঞানে একটা মতবাদ আছে যে, বিশ্ব-জগতের আকারের স্থিরতা নেই; এটা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। অনেক বিজ্ঞানীর মতে; বিশ্বের পরিধি প্রতি একশ' ত্রিশ বছরে দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। এই জন্যে এর পরিধি ঠিকভাবে বের করা যায় না। আর একদল বিজ্ঞানী কল্পনা করেছেন, বিশ্ব অসীম—এর সীমা-পরিসীমা নেই। বিশ্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞান-জগতে এই ধরণের যে সব ধারণা ছিল, আপেক্ষিকতা বাদের আবিষ্কর্তা আইনষ্টাইন তা একেবারে ধ্বংস করে বিশ্বের রূপ নতুন করে দেখিয়েছেন বিজ্ঞানীমহলকে। বিশ্ব অসীম নয় বরং সসীম; সীমারেখা এরও আছে। এর আয়তন, অন্তস্থিত বস্তু ও শক্তির পরিমাণ পর্যন্ত তিনি গাণিতিক হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।

কিছুদিন আগে বিশ্বের সৃষ্টি ও ধ্বংস সম্পর্কে বিজ্ঞানীমহলে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। জেম্‌স্ জীন্‌স্, এডিংটন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, বিশ্ব-জগৎ ধ্বংসের পথে চলেছে। তাঁদের মতে—সূর্য, নক্ষত্র, প্রভৃতির পদার্থসমূহ শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। জীন্‌স্ হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, এই রূপান্তরের ফলে সূর্যের ভর প্রতি মিনিটে প্রায় পঁচিশ কোটি টন (এক টন =২৭২ মণ) কমে যাচ্ছে।

আইনষ্টাইন এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, ধ্বংসই বিশ্বের শেষ পরিণতি নয়। একদিকে যেমন পদার্থের ধ্বংস হবে, সেই সঙ্গে শক্তিরও আবির্ভাব হবে অপর দিকে। আবার শক্তি যখন পদার্থে রূপান্তরিত হতে থাকবে, শক্তি-সমুদ্রে তখনই ভাটা পড়তে থাকবে। মোট কথা, বিশ্বে পদার্থ ও শক্তির মিলিত পরিমাণ যে কোন অবস্থায় স্থির থাকবে; অর্থাৎ বদ্ধ পাত্রে রাখা নির্দিষ্ট পরিমাণ জলের উষ্ণতার তারতম্য অনুযায়ী একবার জমে যাওয়া এবং আবার গলে যাওয়ার মতই বিশ্বের এই ভাঙা-গড়ার ক্রিয়া আবহমান কাল ধরে চলতে থাকবে।

দেহের রক্তস্রোত

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

ধমনী, শিরা-উপশিরার পথে আমাদের দেহের সর্বাংশে নিয়ত রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছে। আমাদের শরীর প্রধানতঃ রক্তের উপরই নির্ভরশীল। যে অক্সিজেন ছাড়া আমরা মুহূর্তকাল জীবনধারণে অক্ষম তাহা ফুস্‌ফুস হইতে রক্তের মাধ্যমেই দেহের সর্বাংশে পরিচালিত হইতেছে। খাদ্যের সারাংশ হইতে অস্থি, মাংস প্রভৃতি দেহের অংশগুলির যে বৃদ্ধি ও রক্ষণ সাধিত হইতেছে, সেই সকল পদার্থও পাকস্থলী এবং অন্ত্র হইতে রক্তে শোষিত হইয়াই দেহের সর্বস্থানে পরিচালিত হয়। দেহে জলের অংশের সমতা রক্ষণ, তাপ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি অন্যান্য দেহরক্ষামূলক ব্যবস্থাও রক্তের উপর নির্ভরশীল। দেহের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থার সঙ্গেও রক্ত যুক্ত রহিয়াছে।

হৃৎপিণ্ড হইল সর্বদেহে ব্যাপ্ত রক্তসঞ্চালন যন্ত্রের কেন্দ্রস্থল। ইহা একটি স্বয়ংক্রিয় পাম্পবিশেষ। ইহার সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলেই রক্তধারা সর্বদেহে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। ইহাকে আমাদের জীবন-ঘড়িও বলা চলে। মাতৃজঠরে থাকিবার সময়েই ইহা স্পন্দিত হইতে আরম্ভ করে এবং মৃত্যু পর্যন্ত এই স্পন্দনের বিরতি ঘটে না। হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক স্পন্দনের গতি সকল লোকের ঠিক একরূপ নয়। বয়স ও দৈহিক অবস্থাবিশেষে এই গতির অনেক তারতম্য ঘটে। তবে পরিণত বয়সে সাধারণতঃ স্বাভাবিক হৃৎস্পন্দনের গতি প্রতি মিনিটে ৭০।৮০র মধ্যেই থাকে। এই হিসাবে যে লোক ৭০।৮০ বৎসর পরমায়ু লাভ করে, জীবনব্যাপী তাহার বক্ষঃস্থলে অবস্থিত এই যন্ত্রটির মোট স্পন্দন-সংখ্যার পরিমাণ হইবে কয়েক শত কোটি। স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত এই যন্ত্রটির অদ্ভুত কর্মক্ষমতা বিস্ময়কর, সন্দেহ নাই।

রক্তের মোট পরিমাণ দেহের ওজনের প্রায় শতকরা ৮ ভাগ। ১৪ ষ্টোন ওজনবিশিষ্ট কোন লোকের দেহে যে রক্ত থাকে তাহার মোট পরিমাণ ৬ লিটারের কাছাকাছি। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ায় এই রক্ত ক্রমাগত অতি দ্রুতগতিতে দেহের মধ্যে আবর্তিত হইয়া থাকে।

হৃৎপিণ্ড বাম ও দক্ষিণ এই দুই অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশে উপরে নীচে দুইটি করিয়া প্রকোষ্ঠ আছে। ঊর্ধ্ব ও নিম্ন প্রকোষ্ঠগুলিকে যথাক্রমে অলিন্দ ও নিলয় বলা হয়। প্রতি স্পন্দনে কিছু পরিমাণ অক্সিজেনবাহী বিশুদ্ধ রক্ত বাম নিলয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ধমনীর পথে প্রবাহিত হয় এবং ঐ পরিমাণ দূষিত রক্ত শিরার পথে কার্বন ডাইঅক্সাইড বহন করিয়া দক্ষিণ অলিন্দে প্রবেশ করে। হৃৎস্পন্দনের ফলেই আবার দক্ষিণ অলিন্দ হইতে দূষিত রক্ত দক্ষিণ নিলয় হইয়া ফুস্‌ফুসে উপস্থিত হয় এবং সেখানে কার্বন ডাইঅক্সাইড মুক্ত হইয়া যথাক্রমে বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ে প্রবেশ করে। হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে এই ভাবেই দেহে রক্তের আবর্তন ঘটিয়া থাকে।

বিশ্রামকালে প্রতি স্পন্দনে হৃৎপিণ্ডের বাম নিলয় হইতে ধমনী পথে যে বিশুদ্ধ রক্ত নিষ্ক্রান্ত হয় তাহার পরিমাণ প্রায় ৬০।৬৫ সি.সি। এইভাবে প্রতি মিনিটে হৃৎপিণ্ড হইতে ধমনীর পথে প্রায় ৪½ লিটার বিশুদ্ধ রক্ত প্রবাহিত হয় এবং ঐ পরিমাণ রক্তে যে অক্সিজেন বাহিত হয় তাহার পরিমাণ প্রায় ২৫০ সি.সি। বিশ্রামাবস্থায় প্রতি স্পন্দনে নিলয় হইতে যে পরিমাণ রক্ত নিষ্ক্রান্ত হয়, নিলয়ের ধারণ ক্ষমতা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। পরিশ্রান্ত অবস্থায় বা দেহের তাপ বৃদ্ধি পাইলে

যখন হৃদস্পন্দনের গতি দ্রুত হয় তখন প্রতি স্পন্দনে নিলয় হইতে নিষ্ক্রান্ত রক্তের পরিমাণও অনেক বৃদ্ধি পায়। নিলয়ের ধারণ ক্ষমতা ১৪০ হইতে ২০০ সি.সি.। পরিশ্রান্ত অবস্থায় নিলয় হইতে প্রতি মিনিটে সঞ্চালিত রক্তের পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় ৪।৫ গুণ অধিকও হইতে পারে।

রক্তের তরল অংশকে বলা হয় প্লাজমা। প্লাজমা ও তন্মধ্যে সমভাবে বণ্টিত কতকগুলি ভাসমান কোষ বা করপাস্‌ল্‌ লইয়া রক্ত গঠিত। রক্তের প্লাজমা ও কোষজ অংশের ওজন সমান হইলেও কোষজ অংশের আপেক্ষিক গুরুত্ব অধিক এবং এই কারণে উহা রক্তের মোট আয়তনের শতকরা মাত্র ৪৫ ভাগ অধিকার করিয়া থাকে। কোন আধারে রক্ত রক্ষিত হইলে কোষজ অংশ নীচে থিতাইয়া পড়ে এবং ঐ অংশকে গাঢ় লাল দেখায়। ঈষৎ হরিদ্রাভ প্লাজমার অংশ উপরে থাকে।

রক্তের কোষজ অংশ প্রধানতঃ তিন প্রকারের কোষ লইয়া গঠিত; যথা—লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা এবং অনুচক্রিকা বা প্ল্যাটালেট। এক ঘন মিলিমিটার রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা গড়ে ৫০ লক্ষ, শ্বেতকণিকার সংখ্যা ৮ হাজার এবং অনু-চক্রিকার সংখ্যা ৩ লক্ষ। এই তিন প্রকার কোষের মধ্যে একমাত্র শ্বেতকণিকায় নিউক্লিয়াস বা কোষ-কেন্দ্রিন বর্তমান। লোহিত কণিকা ও অনুচক্রিকায় কোষকেন্দ্রিন নাই। এই কোষগুলির মধ্যে অনু-চক্রিকাই সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র।

রক্তের লোহিত কণিকাগুলিই অক্সিজেন বহন করিয়া সর্বত্র সরবরাহ করে। দেহে রক্তের পরিমাণ ৬ লিটার থাকিলে তন্মধ্যে লোহিত কণিকার মোট সংখ্যা হইবে প্রায় ৩০ লক্ষ কোটি। ইহাদের প্রত্যেকটি কণিকা প্রায় প্রতি ৩০ সেকেণ্ডে একবার দেহের সর্বত্র ঘুরিয়া আসে। তেজস্ক্রিয় পদার্থের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে, লোহিত কণিকার পরমায়ু ১২০ দিন। ঐ সময় অন্তে উহারা ধ্বংস হইয়া যায়। লোহিত কণিকার মধ্যে হিমোগ্লোবিন নামক লৌহ সংযুক্ত প্রোটিন অতি প্রয়োজনীয় অংশ। এই হিমোগ্লোবিনই অক্সিজেন বহন করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করিয়া আনিয়া ফুস্‌ফুসে বিমুক্ত করে। লোহিত কণিকা ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত উহার হিমোগ্লোবিন তাহার মোট ওজনের হাজার গুণ অক্সিজেন ও দেড় হাজার গুণ কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন করিয়া থাকে।

শ্বেতকণিকা ও অনুচক্রিকা দেহের প্রতিরক্ষা-মূলক কাজে অংশ গ্রহণ করে। কোন ব্যাধির সংক্রমণ ঘটিলে শ্বেত কণিকাগুলি রোগ জীবাণুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এই সংগ্রামে শ্বেত কণিকা রোগ জীবাণু ধ্বংস করিয়া জয়ী হইলে আমরা উক্ত ব্যাধি হইতে মুক্তি পাই, অন্যথায় ব্যাধি প্রকাশ পায়। কোন সংক্রমণ ঘটিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রক্তের শ্বেত কণিকার সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অনুচক্রিকাগুলি ক্ষতমুখে জড় হইয়া রক্ত জমাট বাঁধায় সাহায্য করে। জমাট রক্ত ক্ষতমুখ রুদ্ধ করিয়া রক্তক্ষরণ বন্ধ করে।

রক্তের তরল অংশ প্লাজমা জৈব, অজৈব নানা পুষ্টিকর পদার্থে পূর্ণ। খাদ্যের সারাংশ প্লাজমার মাধ্যমেই দেহতন্তুতে পরিবাহিত হয়। নানা-প্রকার প্রোটিন প্লাজমার মধ্যে দ্রবীভূত থাকে। প্রতি লিটার প্লাজমায় প্রায় ৭০ গ্র্যাম পরিমাণ প্রোটিন থাকে। প্রোটিন ব্যতীত প্লাজমার মধ্যে কয়েক প্রকারের লবণ ও অন্যান্য জৈব পদার্থও থাকে; যেমন—সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ফস্‌ফেট, বাইকারবনেট, গ্লুকোজ, অ্যামিনো অ্যাসিড, ইউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি।

প্লাজমার মধ্যে এই পর্যন্ত ৬০ প্রকারের প্রোটিনের অস্তিত্বের কথা জানা গিয়াছে। এই প্রোটিনগুলি বিভিন্ন পরিমাণে নানাপ্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড সংযুক্ত হইয়া গঠিত হয়। আমাদের দেহে প্রায় ১৮ প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড বর্তমান।

দেহে ৬ লিটার পরিমাণ রক্ত থাকিলে তাহাতে প্লাজমা-প্রোটিনের পরিমাণ হইবে প্রায় ৭$\frac{1}{2}$ আউন্সের কাছাকাছি। এই প্লাজমা-প্রোটিনের প্রতিটি অণুর আয়ুষ্কাল ৮ হইতে ২৮ দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অথচ স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তের সহিত ইহার আনুপাতিক পরিমাণের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, দেহের মধ্যে এই অণুগুলির ধ্বংস ও পুনর্গঠন পাশাপাশি চলিয়াছে। অবশ্য এইরূপ ধ্বংস ও পুনর্গঠন রক্তের অন্য অংশেও ঘটিয়া থাকে। রক্তের কোন উপাদানই জীর্ণ অবস্থা সহ্য করিতে পারে না।

প্লাজমা-প্রোটিন দেহের পক্ষে একটি বিশেষ পুষ্টিকর পদার্থ। প্রয়োজন ঘটিলে রক্তের এই প্লাজমা-প্রোটিনের অংশ দেহে শোষিত হয়। অবশ্য রক্তে সঞ্চালিত শর্করা, অ্যামিনো অ্যাসিড প্রভৃতি খাদ্যের সারাংশগুলি যতক্ষণ অবশিষ্ট থাকে ততক্ষণ এইরূপ প্রয়োজন উপস্থিত হয় না। দেহের পুষ্টিকর ও শক্তি উৎপাদক পদার্থের সমস্ত পুঁজি নিঃশেষিত হইলেই সর্বশেষ রক্তের এই প্লাজমা-প্রোটিনের উপর টান পড়ে। এইরূপ সঙ্কটাবস্থা উত্তীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আবার দেহের মধ্যে প্রথমেই প্লাজমা-প্রোটিনের গঠন আরম্ভ হয় এবং পূর্ণভাবে ইহার ক্ষয় পূরণ না হওয়া পর্যন্ত দেহের অন্য ক্ষয় পূরণের কার্য স্থগিত থাকে।

রক্তস্রোত দেহের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট। হর্মোন নামক যে পদার্থ দ্বারা দেহের সর্ববিধ নিয়ন্ত্রণ সংঘটিত হইয়া থাকে তাহা দেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কতকগুলি নালিবিহীন গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত হয়। এই সব গ্রন্থি নিঃস্রাব দেহের এক স্থান হইতে অপর স্থানে রক্তের মাধ্যমেই পরিবাহিত হয়।

পিটুইটারী গ্রন্থি দেহের এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কেন্দ্র। ইহা হইতে আবশ্যক মত নানাপ্রকার হর্মোন নিঃসৃত হইয়াই অপরাপর গ্রন্থিগুলিকে বিশেষ বিশেষ হর্মোন ক্ষরণে উত্তেজিত করে। এই পিটুইটারী গ্রন্থি মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিত এবং মস্তিষ্কের দ্বারাই পরিচালিত হয়।

দেহের মধ্যে রক্ত ব্যতীত অন্য তরল পদার্থও আছে। তন্তুর মধ্যে কোষান্তর্বর্তী ফাঁকগুলি এইরূপ একটি রসে পূর্ণ। কোষগুলি এই রসের আবেষ্টনী হইতেই প্রয়োজনীয় উপাদান শোষণ করে। ঐ সব পদার্থ অবশ্য রক্তের মাধ্যমেই রসে সঞ্চালিত হয়। কোষের মধ্যে নিয়ত নানা প্রতিক্রিয়ায় যে ক্ষার বা অম্লের সৃষ্টি হয় তাহা রসের মধ্যেই নির্মুক্ত হয়। তন্তুর এই রসের মধ্যে ক্ষার বা অম্ল সঞ্চিত হইয়া থাকিলে কোষের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হইত। রক্ত নিয়ত রস হইতে এই সকল পদার্থ শোষণ করিয়া লইবার ফলেই উহার সাম্যাবস্থা রক্ষিত হয়। রক্তে এইভাবে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষার ও অম্ল শোষিত হইলেও নিজের সাম্যাবস্থা বজায় রাখিতে পারে। প্লাজমা-প্রোটিন রক্তের অজৈব পদার্থের সহযোগে অনেক পরিমাণে ক্ষার বা অম্ল শোষণ করিয়াও আপন সাম্যাবস্থা সংরক্ষণ করিতে পারে।

দেহের জলীয় অংশের সমতা সংরক্ষণও রক্তের দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। দেহের মোট ওজনের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগই জল। দেহের এই জলীয় অংশ নিয়ত গতিশীল অবস্থায়ই থাকে। পানীয় ও খাদ্যের অংশরূপে আমরা দিনে প্রায় ১৪ লিটার জল পান করিয়া থাকি। এই জল দেহের অভ্যন্তরে সঞ্চালিত হইয়া আবার মল, মূত্র ও ঘর্মের সঙ্গে দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। অথচ এইরূপ গতিশীল অবস্থা লাভ করা সত্ত্বেও সাধারণতঃ দেহে ইহার আনুপাতিক পরিমাণের পরিবর্তন ঘটে না।

দেহের বিপাকসংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রতিক্রিয়াতেই জলের অণু অংশ গ্রহণ করে। রক্তের মাধ্যমেই দেহের সর্বাংশে জলের সরবরাহ ঘটিয়া থাকে। কৈশিক নালীর মধ্য দিয়া রক্ত সঞ্চালনের সময় চাপ বৃদ্ধির ফলে রক্তবাহিত জল নালীর পর্দা অতিক্রম করিয়া

তন্তুর রসের সঙ্গে মিলিত হয়। আমাদের দেহে এই কৈশিক নালীর মোট সংখ্যা প্রায় সহস্র কোটি। কাজেই এই ব্যবস্থায় রক্ত হইতে যথেষ্ট পরিমাণে জল সহজে তন্তুর রসের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। আবার এই রস হইতেও রক্তে জল শোষণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। প্লাজমা-প্রোটিনের জলের উপর বিশেষ আকর্ষণ আছে। প্লাজমার 'অস্‌মোটিক প্রেসার' বেশী থাকায় রস হইতেও রক্তে জল শোষিত হইয়া থাকে। রস ও রক্তে জলের প্রবেশ ও নির্গমনের এইরূপ সহজ ব্যবস্থার মাধ্যমেই দেহের জলীয় অংশের সমতা রক্ষিত হইয়া থাকে।

দেহের মধ্যে জল চলাচলের এই সহজ ব্যবস্থা হইতেই দেহের তাপের পরিমাণও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে; আবহাওয়ার গুরুতর পরিবর্তনেও কোন ব্যতিক্রম ঘটে না।

জলের আপেক্ষিক তাপ খুব বেশী; অর্থাৎ জলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করিতে অনেকটা উত্তাপের প্রয়োজন হয় এবং জলের বাষ্পীভবনে অনেক পরিমাণ তাপ ক্ষয় হয়।

দেহে তাপ শোষিত হইলে ত্বকের ছিদ্রপথে দেহ হইতে জল বাষ্পীভূত অবস্থায় নির্গত হইয়া ঐ তাপ ক্ষয় করে। ত্বকের ভিতর দিয়া বাষ্পীভবনের ফলে ত্বক শীতল হয় এবং শীতল ত্বকের সংস্পর্শে তন্মধ্যস্থ রক্তস্রোতও শীতল হয়। শীতল রক্ত সঞ্চালিত হইয়া দেহের আভ্যন্তরীণ তাপের পরিমাণ হ্রাস করে। আবার দেহের মধ্যে জল চলাচলের সহজ ব্যবস্থার মাধ্যমেও দেহের উপরিভাগ ও অভ্যন্তর ভাগে তাপের বিনিময় ঘটে। এইরূপ স্বাভাবিক বাষ্পীভবনের দ্বারা দেহের অতিরিক্ত তাপের পূর্ণ অপসারণ সম্ভব না হইলে ঘর্মের সৃষ্টি হয় এবং ঘর্মের বাষ্পীভবন হইতে অধিক পরিমাণে তাপ ক্ষয় হইয়া থাকে।

রক্ত একদিকে যেমন দেহের সর্বত্র পুষ্টিকর পদার্থের যোগান দিয়া থাকে, সেইরূপ আবার সঙ্গে সঙ্গে দেহের আবর্জনা দূর করিয়া ইহাকে নিরাপদ করে। দেহতন্তুতে নানা বিপাক প্রক্রিয়ায় উপজাত পদার্থরূপে অনেক অবাঞ্ছিত পদার্থের উদ্ভব ঘটে। এইসব পদার্থ দেহে সঞ্চিত হইয়া থাকিলে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারে। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের অপসারণ প্রয়োজন। রক্ত এই সকল পদার্থ বহন করিয়া প্রথমে যকৃতে লইয়া যায়। যকৃতের মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া ইহাদের অধিকাংশ পদার্থ নির্বিষ হয়। রক্ত অতঃপর এই নির্বিষ পদার্থগুলি ও অন্য যে সকল পদার্থ যকৃতে প্রবেশে অক্ষম হয় তাহাদিগকে কিড্‌নীতে আনিয়া উপস্থিত করে। সেখানে রক্ত পরিস্রুত হইয়া এই সমস্ত পদার্থগুলি মূত্রের সঙ্গে দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়।

দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় রক্তের শ্বেত কণিকা কিরূপ অংশ গ্রহণ করে, সে সম্বন্ধে পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্লাজমার গ্লোবিউলিন নামক প্রোটিনের অংশ রক্তের মধ্যে প্রতিরোধক পদার্থ-রূপে নানাপ্রকার নূতন প্রোটিন সৃষ্টি করিয়া বিভিন্ন ভাইরাস ও জীবাণু-সংক্রমণ রোধ করিতে সক্ষম।

রক্তের অপর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় জমাট রক্ত সৃষ্টিতে অনুচক্রিকা যে সম্বন্ধযুক্ত, সে সম্বন্ধেও পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ক্ষতস্থানে দলবদ্ধ অনুচক্রিকা-গুলি ভাঙ্গিয়া গিয়া সে স্থানে ফাইব্রিন নামক একটি প্রোটিন সৃষ্টির ফলে রক্ত জমাট বাঁধে। কিড্‌নী হইতে ফাইব্রিনোজেন ও প্রোথ্রম্বিন নামক দুইটি প্রোটিন সৃষ্টি হইয়া প্লাজমার মধ্যে অবস্থিত থাকে। দেহে ভিটামিন-কে-এর পরিমাণ যথেষ্ট থাকিলে প্রোথ্রম্বিনের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ক্ষতস্থানে অনুচক্রিকা হইতে থ্রোম্বোপ্লাষ্টিন নামক একটি এন্‌জাইম নির্গত হইয়া প্রোথ্রম্বিনকে থ্রোম্বিনে পরিবর্তিত করে। এই থ্রোম্বিন এবং ফাইব্রিনোজেনের প্রতিক্রিয়া ঘটিয়া ফাইব্রিন গঠিত হয়।

পাস্তুরীকরণ

শ্রীচিত্তরঞ্জন আচার্য

দুধের মধ্যে শরীর গঠনের যাবতীয় উপাদান কিয়ৎ পরিমাণে বর্তমান। তাছাড়া সহজপাচ্য এবং মুখরোচক পদার্থ হিসাবে দুধকে পূর্ণাঙ্গ খাদ্যের পর্যায়ে ফেলা যায়; কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে দুধকে বোধ হয় পূর্ণাঙ্গ খাদ্য বলা যায় না। কাজেই একে বলা হয় প্রায় সম্পূর্ণ খাদ্য। এক গ্লাস দুধের খাদ্যমূল্য দুটি মুরগীর ডিমের খাদ্যমূল্যের সমান। দুধে শরীর গঠনকারী অধিকাংশ রাসায়নিক পদার্থই বর্তমান। হাজার হাজার বছর ধরে দুধ মানুষের একটি অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। অথচ এই দুধই আবার যুবকদের পক্ষে ততবেশী পুষ্টিকর বলা যেতে পারে না, যতটা বলা যায় শিশুদের পক্ষে। এর কতকগুলি কারণ আছে। যেমন ধরা যাক, দুধে যে পরিমাণ লৌহ বিদ্যমান, সেটুকুই যুবকদের দেহের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েদের দেহে লৌহ যে পরিমাণ জমা থাকে তার চেয়ে আরও বেশী পরিমাণ দরকার হয়। তাই চিকিৎসকেরা ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে অনেক সময় ছাগল কিংবা মেষের দুধ খাওয়াবার ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। কারণ ছাগল কিংবা মেষের দুধে কেবল লৌহ-ই নয়, সর্বপ্রকার ধাতব পদার্থের পরিমাণই কিছু বেশী থাকে (·৯৫%)। কিন্তু তুলনামূলকভাবে গরুর দুধে ধাতব পদার্থের ভাগ কম (·৭৫%)। বিভিন্ন প্রাণীর দুধের উপাদানে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়; যেমন—মহিষের দুধে চর্বি সবচেয়ে বেশী (৭·৫%) এবং মেষের দুধে প্রোটিনের ভাগ সবচেয়ে বেশী (৫·১৫%)।

কিন্তু আমাদের এই অতি প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্যটি সহজেই বাইরের হাওয়ায় বাহিত নানাপ্রকার ব্যাক্টিরিয়া ও ভাইরাসের সংস্পর্শে এসে নষ্ট হয়ে যায়। বিস্ময়ের ব্যাপার হলেও এটা সত্যি যে, সদ্য আহরিত দুধের প্রতি সি. সি-তে ৩০০-এর বেশী জীবাণু থাকে এবং সেই দুধ আমরা বিনা দ্বিধায় পান করে থাকি। কিন্তু এ তথ্যটি আগে জানা সম্ভব হয় নি। পরে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। সুতরাং এই জীবাণুগোষ্ঠীকে ধ্বংস করাই বর্তমান দুগ্ধ-শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সব জীবাণুকে সাধারণতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়; যথা—(১) যেসব জীবাণু অতি সামান্য তাপ সহ্য করতে পারে; (২) যেসব জীবাণু মানুষের দেহধারণের পক্ষে উপযোগী তাপে বেঁচে থাকতে পারে; (৩) যেসব জীবাণু অত্যন্ত বেশী তাপেও বেঁচে থাকতে পারে। এসব জীবাণুর মধ্যে কতকগুলি রোগ সৃষ্টি করতে পারে, কতকগুলি আবার কোন প্রকার রোগ সৃষ্টি করতে পারে না। এগুলিকে নষ্ট করতে না পারলে দুধের খাদ্যমূল্য কোন রকমেই বাড়ানো যায় না, উপরন্তু এরা অচিরেই দুধ নষ্ট করে দেয় অথবা দুধকে এমন অবস্থায় আনয়ন করে যা গ্রহণের অযোগ্য। যেমন, দুধ কেটে যাওয়ার কথা আমরা প্রায় শুনতে পাই।

বহুকাল থেকেই আমাদের দেশে দুধ জ্বাল দিয়ে পান করবার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। দুধ গরম করে খেলে তার সব রকমের অবিশুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যায়; কিন্তু তাতে দুধের খাদ্যমূল্য কতটা হ্রাস বা বৃদ্ধি পেল, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কারণ দুধকে ২১২° ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপে উত্তপ্ত করলে আমাদের শরীরের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় তার খাদ্যপ্রাণের অধিকাংশই নষ্ট হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, দুধে যে চার রকমের এন্‌জাইম আছে তাও নষ্ট হয়ে যায় এবং দুধের

ঘনত্ব কমে যায়। দুধকে ১৪৫° ডিগ্রীর (ফাঃ) বেশী তাপ দিলে তার মূল্যবান চর্বির কিছু অংশও নষ্ট হয়ে যায়। সুক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, দুধকে ১৫০° ডিগ্রী ফারেনহাইটের বেশী উত্তপ্ত করলে তার মধ্যে অ্যালবুমিন, অর্থাৎ এক জাতীয় প্রোটিন জমে যেতে থাকে এবং প্রায় ৩০ মিনিট ধরে ১৬৫° ডিগ্রী তাপে উত্তপ্ত করলে পাকস্থলীর রেনেট নামক এক রকম এন্‌জাইমের উপর সহজেই কাজ করে। এতে বদ্‌হজম হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এজন্যে বিশেষজ্ঞেরা জ্বাল-দেওয়া দুধ পান করা কোন মতেই সমর্থন করেন না। তবে কি আমাদের সেই জীবাণুপূর্ণ কাঁচা দুধই খেতে হবে? না, সে দুধও আমাদের অপেয়। কাজেই এই সমস্যা সমাধানের জন্যে গবেষণা সুরু হয়।

নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক গবেষণার পর ফরাসী বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তুর দুধ পরিশোধনের এক নতুন উপায় উদ্ভাবন করেন। তাঁরই নাম অনুসারে এই নতুন প্রক্রিয়ার নামকরণ হয় পাস্তুরীকরণ। এভাবে বিশুদ্ধিকরণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—(১) দুধের মধ্যে অবস্থিত রোগ-সংক্রমণকারী জীবাণু নষ্ট করে দেওয়া; (২) দুধের রক্ষণ-ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া; (৩) দুধের খাদ্যমূল্য কোন প্রকারে নষ্ট না করা। এতেও দুধকে সামান্য পরিমাণে এবং অল্প সময়ের মধ্যে গরম করা হয়, কিন্তু তাতে পুষ্টিমূল্যের কোন ক্ষতি হয় না। পাস্তুর এই প্রক্রিয়ার প্রথম পরীক্ষা করেন মদের উপর। মদের রক্ষণ-ক্ষমতা বাড়াবার উপায় সম্পর্কে গবেষণার ফলেই পাস্তুরীকরণের প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হয়েছিল। এই প্রকার বিশুদ্ধিকরণের সঙ্গে আগুনে জ্বাল দিয়ে পরিশোধনের কিছু পার্থক্য আছে। প্রথমতঃ, প্রায় সব রকমের রোগ-সংক্রমণকারী জীবাণু নষ্ট হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ, দুধের উপাদানগুলির খাদ্য-মূল্য প্রায় সবটাই বজায় থাকে। তৃতীয়তঃ, দুধের খাদ্যপ্রাণ এবং এন্‌জাইমগুলি সহজে নষ্ট হয় না। সেজন্যে এই প্রক্রিয়ায় দুধ পরিশোধন করাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এই প্রক্রিয়া কাজে লাগাতে হলে দুধকে একটি ইস্পাতের ট্যাঙ্কে রেখে নির্দিষ্ট তাপে (১৪২° ডিগ্রী ফারেনহাইট বা তার বেশী) এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (৩০ মিনিট অথবা আরও কম) উত্তপ্ত করতে হয়। এই উত্তাপ প্রয়োগের ফলে রোগ-সংক্রমণকারী জীবাণুগুলি নষ্ট হয়ে যায়। তারপর সেই দুধকে তৎক্ষণাৎ আবার নির্দিষ্ট তাপে ঠাণ্ডা করতে হয়। কারণ ঠাণ্ডা করবার ফলে দুধের জীবাণুগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়া দ্রুতগতিতে করা দরকার। সেই দুধকে এরপর ধাতব নল দিয়ে একটি ট্যাঙ্কে পাঠানো হয়। সেখানকার তাপমাত্রা থাকে শূন্য ডিগ্রী। এই ট্যাঙ্ককে বলা হয় চিলিং চেম্বার। ঐ দুধে যে অল্প কিছু জীবাণুর স্পোর থাকে, এই চিলিং চেম্বারের মধ্যে তারা আর বংশ বিস্তার করতে পারে না। তারপর সেখান থেকে একটি বিশেষ উপায়ে বিশুদ্ধিকৃত দুধ বোতলে ভর্তি করে বাজারে দেওয়া হয়। বোতলের মুখ এমনভাবে বন্ধ থাকে যে, বাইরের বাতাসের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ থাকে না। এই পাস্তুরীকরণকে আবার দু-ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হচ্ছে কম তাপে বেশী সময় রাখা; অর্থাৎ ১৪২° ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপে ৩০ মিনিট উত্তপ্ত করে তারপর চিলিং চেম্বারে পাঠাতে হয়। আর দ্বিতীয় প্রক্রিয়া হচ্ছে—তাপমাত্রা বাড়িয়ে এবং সময় কমিয়ে দুধকে ১৬০° থেকে ১৬৫° ডিগ্রী তাপে ১২ থেকে ১৬ সেকেণ্ড পর্যন্ত গরম করবার পর পূর্ববৎ চিলিং চেম্বারে পাঠাতে হয়। সুতরাং এই দুটি প্রক্রিয়া মূলতঃ একই রকমের; কেবলমাত্র সময় এবং তাপের কম-বেশী পার্থক্য আছে। শুধু দুধ কেন, এই উপায়ে মাখন, পনির ইত্যাদি পরিশোধন করাও সম্ভব। পৃথিবীর সকল প্রগতিশীল দেশেই এভাবে দুধ পরিশোধন করা হয়।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে কলকাতায়

যে কয়েকটি দুগ্ধ-প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানেও এই ভাবে দুধ পরিশোধন করা হয়। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত যে দুগ্ধ-প্রতিষ্ঠান হরিণঘাটায় রয়েছে সেখানে এই প্রক্রিয়ায় এবং উভয় উপায়েই দুধ পরিশোধন করা হয়। তারপর সেই দুধ ভালভাবে বোতলে ভর্তি করে দুধের গাড়ীতে কলকাতা এবং তার আশেপাশে বিক্রয়ের জন্যে পাঠানো হয়। এভাবে পরিশোধিত দুধের দাম খুব বেশী হয় না; খুব বেশী হলেও প্রতি পাউণ্ডে ২ থেকে ৩ পয়সার মত বেশী লাগে। কিন্তু তাতে জাল-দেওয়া দুধ অপেক্ষা অনেক গুণে বিশুদ্ধ দুধ আমরা পাই। প্রচুর পরিমাণে উপযুক্ত খাদ্য না হলে কোন জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। কাজেই দুধের বিশুদ্ধতার দিকে আমাদের সকলেরই লক্ষ্য রাখা উচিত।
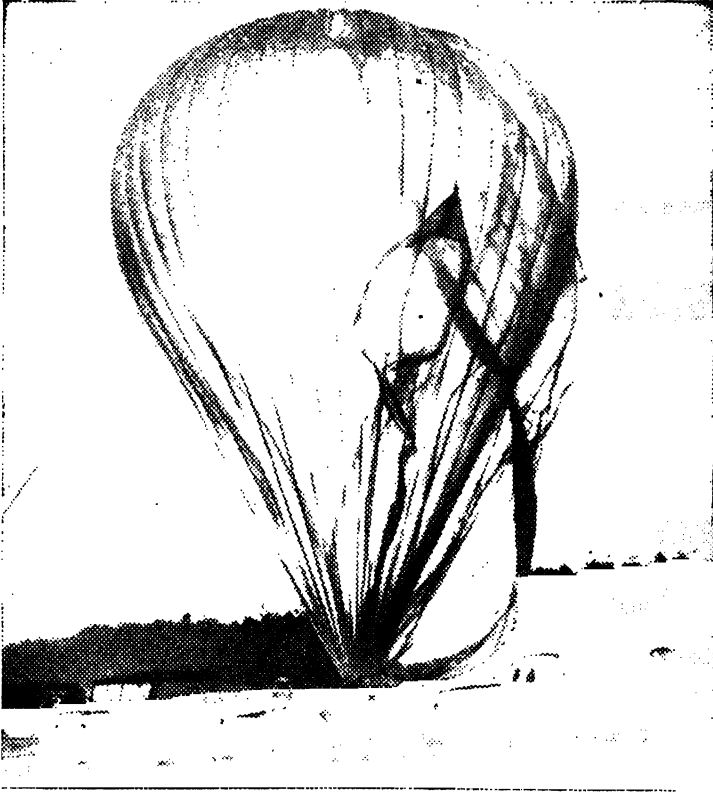
ঊর্ধ্ব নভোমণ্ডলের বায়ুপ্রবাহ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্যে যুক্তরাষ্ট্রে যন্ত্রপাতি সমন্বিত বৃহদাকৃতির এই বেলুন ব্যবহৃত হচ্ছে। বেলুনে ৩,০০০,০০০ কিউবিক ফুট হিলিয়াম গ্যাস ভর্তি থাকে। ৯০,০০০ ফুট ঊর্ধ্বে বেলুনের ব্যাসের পরিমাপ হয় ২০০ ফুট। বেলুন কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেতার-সঙ্কেতের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠস্থ ষ্টেশনে ধরা পড়ে।

কৃত্রিম উপগ্রহের ভূমিকা

শ্রীকরুণাময় দাশ

অনেকেরই ধারণা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই কৃত্রিম উপগ্রহ নিক্ষেপে অগ্রণী হবে। তার একটা কারণ অবশ্য তাঁদের এই সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারকার্য। কিন্তু সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন গত ৪ঠা অক্টোবর মহাকাশে মানুষের গড়া প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ নিক্ষেপ করেছে। শুধু তাই নয়, প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাবার আগেই আরও ঊর্ধ্বে এবং পূর্বের চেয়ে উন্নত ধরণের আর একটি উপগ্রহ ক্ষেপণে সক্ষম হয়েছে এবং এই দ্বিতীয় উপগ্রহটি একটি জীবন্ত প্রাণী সমেত ঘণ্টায় ১৮০০০ মাইল বেগে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে (পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ যে, প্রাণীটির মৃত্যু হয়েছে)। মনে হয়, কোন কিছুতেই আর মানুষ অক্ষম নয়। অষ্ট্রেলিয়ার এক বিজ্ঞানী বিহ্বল হয়ে মন্তব্য করেছেন—এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়; আমরা ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছি।

কিন্তু এতটা নৈরাশ্যের হয়তো কারণ নেই। মানব-সভ্যতা ক্রমাগত যে পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে, সেখানে বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রা অবধারিত। এই অসাধারণ অগ্রগতিকে কোন কিছুই বাঁধা দিতে পারবে না। একে বাঁধা দেওয়া চলে না, তাহলে মানুষের সৃজনীশক্তিকে উপেক্ষা করা হয়। আমাদের বর্তমান সমস্যা হলো, বিজ্ঞানের এই অভাবনীয় উৎকর্ষকে মানুষের কল্যাণেমূলক কাজে নিয়োগ করা। এই কারণে চিন্তাশীল মানুষ মাত্রেই ভাবছেন, বিজ্ঞানের এই যুগান্তকারী অগ্রগতিকে সামরিক প্রয়োজন ছাড়া মানুষের আর কি কাজে লাগানো যেতে পারে। সোভিয়েট ইউনিয়ন কৃত্রিম উপগ্রহকে সামরিক কোন প্রয়োজনে ব্যবহার করবে না শুনে সকলেই কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছেন।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপগ্রহ ক্ষেপণে সাফল্য নিশ্চিতই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এর সাহায্যে বহু অজানা বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা যাবে। এর সাফল্যে অন্ততঃ প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষের পক্ষে কোন বস্তুকে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে ক্ষেপণ করা সম্ভব এবং আমাদের গ্রহান্তর যাত্রায় যে গতিবেগ প্রয়োজন তাও আজ আমাদের আয়ত্তাধীন। কোন কিছুকে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে ক্ষেপণ করবার অর্থ—সেই বস্তু আর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের সম্পূর্ণ প্রভাবাধীন নয় এবং যদিও সেই বস্তুটি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের সম্পূর্ণ প্রভাব-মুক্তও নয় তবুও তার নিজস্ব গতিশীলতা অনির্দিষ্ট কালের জন্যে তাকে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে চালিত করে। মহাকাশের যে উচ্চতায় এই কৃত্রিম উপগ্রহ ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেখানে এমন কিছুই নেই যা তার এই অসাধারণ গতিকে ব্যাহত করতে পারে।

বৈজ্ঞানিকদের ধারণা, মহাকাশের এই উচ্চতায় কোন বায়ুস্তর নেই। চন্দ্রপৃষ্ঠেও কোন বায়ুমণ্ডল নেই এবং চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর তুলনায় এত তীব্র নয়। তাই সেখানে মাত্র কয়েক ফুট উচ্চতায় একটি কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করা চলে। অবশ্য এই উচ্চতা ঠিক করতে হবে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবস্থিত পর্বতাশিখরকে বাদ দিয়ে; অন্যথায় নিক্ষিপ্ত বস্তুটির গতিপথ অস্বাভাবিকভাবে ব্যাহত হবে। যদি চন্দ্রপৃষ্ঠ একেবারেই সমতল হয় (যা অবশ্য নয়) তাহলে সেখানে মাত্র ১০ ফুট ঊর্ধ্বে একটি উপগ্রহ স্থাপন করা চলে।

সেজন্যে কৃত্রিম উপগ্রহের গতিবেগ বিশেষ অর্থ-পূর্ণ। মাধ্যাকর্ষণ ও বায়ুস্তরের সংঘর্ষের ফলে যে বাঁধা, তার একটা নির্দিষ্ট পরিমাপ মেনে নিয়ে

বস্তুটির গতিবেগ এতখানি হওয়া দরকার যাতে বস্তুটির পতনের সঙ্গে ভূপৃষ্ঠের আকারের সাম্য রক্ষিত হয় এবং বস্তুটি সর্বদা ভূপৃষ্ঠের সমান্তরাল থাকে। সাধারণ এরোপ্লেনের গতিবেগও এই দুই শক্তির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। বায়ুস্তরের সংঘর্ষ এড়াতে পারলে গতিবেগ স্বভাবতঃই অনেকটা বেড়ে যায়। বায়ুস্তরের সংঘর্ষের ফলে একটি কামানের গোলার অসাধারণ গতিবেগও প্রতিহত হয়।

কৃত্রিম উপগ্রহ ক্ষেপণের প্রধান সমস্যা ছিল একটি বহু পর্যায়ের রকেট নির্মাণ করা, যা উপগ্রহটিকে বায়ুস্তরের ঊর্ধ্বে একটি নির্দিষ্ট কক্ষ-পথে অন্ততঃপক্ষে সেকেণ্ডে পাঁচ মাইল গতিবেগ প্রদান করবে। মানুষের সে চেষ্টা সফল হয়েছে।

বর্তমান উপগ্রহগুলির নিজস্ব কোন শক্তির আধার নেই। পৃথিবী পরিক্রমার সময় তাদের গতিবেগ সম্পূর্ণ নির্ভর করে ভরবেগের (momentum) উপর; অর্থাৎ সর্বশেষ পর্যায়ের রকেট কর্তৃক প্রদত্ত শক্তির উপর। কতক্ষণ এই শক্তি তাকে চালিত করবে বলা কঠিন। কারণ বায়ুস্তরের প্রভাব এড়াতে পারলেও মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব এড়ানো যায় না, যার ফলে এদের গতিবেগ ক্রমশঃ কমে আসবে এবং উচ্চতা কমবার সঙ্গে সঙ্গে কোন সময়ে বায়ুস্তরের সংঘর্ষে উল্কাপিণ্ডের মত পুড়ে যাবে। সংবাদ পাওয়া গেছে যে, সোভিয়েট প্রথম উপগ্রহবাহী রকেটটি সম্প্রতি ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করেছে। হয়তো সেটা সম্পূর্ণরূপে পুড়ে নিঃশেষিত হয় নি, কিছুটা ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।

আশা করা যায়, কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে যাত্রার পথে বিভিন্ন পর্যায়ে বায়ুস্তরের আয়তন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে, যা ভবিষ্যৎ উপগ্রহ পরিকল্পনার কাজে বিশেষ সহায়ক হবে।

কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ করবার বিশেষ সুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা। পৃথিবী সম্বন্ধে ভৌগোলিক জ্ঞান আমাদের অনেকখানি সীমাবদ্ধ এবং ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের দূরত্বও সঠিকভাবে জানা নেই। উপগ্রহের সাহায্যে এসব তথ্য সহজেই জানা যাবে। পৃথিবীতে অবস্থিত যে কোন উন্নত ধরণের মানমন্দিরের চেয়ে এর অবস্থান অনেকাংশে সুবিধাজনক। মহাজাগতিক রশ্মি, তড়িৎ-চৌম্বক শক্তি, আলোক ও বিদ্যুৎ-তরঙ্গ এবং তার বিস্তৃতির সঠিক পরিমাপ করা সম্ভব হবে, যা ভূপৃষ্ঠ থেকে করা সম্ভব নয়। কারণ আলোক-প্রবাহের অনেক রশ্মিই বায়ুস্তর ভেদ করে পৃথিবীর বুকে নেমে আসতে পারে না, যেমন পারে না উল্কাপিণ্ডের দল। পর্বতশিখরে অবস্থিত মানমন্দির ও বেলুনের সাহায্যে মহা-জাগতিক রশ্মি সম্বন্ধে নানাপ্রকার গবেষণা হয়েছে। কিন্তু এদের ক্ষমতাও পরিমিত। বেলুনের সাহায্যে মানুষ মাত্র ১৯ মাইল পর্যন্ত উঠতে সক্ষম হয়েছে। এ ছাড়াও বায়ুমণ্ডলে বায়ুপ্রবাহ এবং মেঘের গঠন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে যাতে দু-এক দিনের পরিবর্তে কয়েক মাস অথবা বছরের আবহাওয়া সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীও সম্ভব হতে পারে। কৃষি সংক্রান্ত বিষয়, সমুদ্র ও আকাশ-পথে চলাচলের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি। টেলিভিসন ও বেতার-বার্তা প্রেরণে এর দ্বারা উল্লেখযোগ্য উন্নতির আশা করা যায়। এদের রিলে ষ্টেশনের মত ব্যবহার করে রেডিও ও টেলিভিসনের প্রভাব পৃথিবীময় বিস্তৃত করা যেতে পারে। এরই সঙ্গে আমাদের দূর পাল্লার সংযোগ ব্যবস্থারও উন্নতি সাধন করা সম্ভব। আমাদের ঊর্ধ্বে বায়ুমণ্ডলে যে ক্রমাগত ভাঙ্গন চলছে তারও কিছু হদিশ পাওয়া যেতে পারে। উপর্যুপরি পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে তেজস্ক্রিয়তার বিস্তৃতি সম্বন্ধে নানারকম গবেষণা করাও সম্ভব এবং মানব-কল্যাণে এর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

তবে এগুলি হলো প্রত্যাশিত সম্ভাবনা—যা হয়তো সম্পূর্ণ সম্ভব নাও হতে পারে। অনেকেই

হয়তো বলবেন—বিজ্ঞানের অগ্রগতি কখনও এতটা সুপরিকল্পিত ভাবে হয় নি। অনেক সময় এর অগ্রগতি হয়েছে একান্ত আকস্মিকভাবে। কিন্তু সে হয়েছে গোড়ার দিকে। যখন থেকে মানুষ তার পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে কতকগুলি মৌলিক প্রাকৃতিক নিয়ম জানতে পেরেছে, সেইদিন থেকে বিজ্ঞানের অগ্রগতি কিছুটা পরিকল্পিতভাবেই হয়েছে। আজকের দিনে তা আরও সত্য, কারণ আজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্র এত ব্যাপক হয়েছে যে, তার বিভিন্ন বিভাগ এবং বিজ্ঞান ও কারুশিল্পের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করবার প্রয়োজন হয়েছে। কার্যক্ষেত্রে পরিকল্পিত ও সংগঠিত উদ্যম ছাড়া আর উপায় নেই।

শুধু মাত্র প্রয়োজন ছাড়াও মানুষের উদ্যমের পিছনে আরও কিছু আছে—অজানাকে জানবার এবং দুর্গমকে জয় করবার আকর্ষণ। তাই সে হয়তো গ্রহান্তরে যাবার স্বপ্ন দেখছে এবং আজ সেই স্বপ্নকে সফল করবার জন্যেই তার এই দুর্দমনীয় উদ্যম। গ্রহান্তরে গিয়ে মানুষের কি লাভ হবে তা বলা শক্ত, কিন্তু তবুও সে যাবেই। হয়তো শুধু যাবার জন্যেই যাবে। পর পর দুটি উপগ্রহের মহাকাশে অভিযানের পর গ্রহান্তর যাত্রাকে আর অবাস্তব বলে মনে হয় না।

মহাকাশে প্রথম উপগ্রহ স্পুটনিক (বাংলায় যার অর্থ পথের সাথী) ক্ষেপণের পর ভবিষ্যতে সোভিয়েট পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানা গেছে। সম্প্রতি Konstantin Tsiokovsky-র (যাকে সোভিয়েট দেশে রকেট শিল্পের জন্মদাতা রূপে মনে করা হয়) জন্মশতক উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে তাঁদের এই সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়। ১৯৫১ সাল থেকেই সোভিয়েট ইউনিয়ন রকেট সম্পর্কে সুপরিকল্পিতভাবে গবেষণা চালিয়েছে এবং এর আগেও মহাকাশে ১০০ মাইল পর্যন্ত রকেটে কুকুর পাঠিয়ে তাকে প্যারাসুটের সাহায্যে জীবন্ত অবস্থায় নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। আজ তাঁরা মনে করেন, উপযুক্ত ব্যবস্থায় শূন্য ভ্রমণের দরুণ মানুষেরও কোন শারীরিক অথবা মানসিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা নেই। আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক বছরে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা আর্কটিক ও অ্যান্টার্কটিক অঞ্চলে অবস্থিত গবেষণা কেন্দ্রগুলি থেকে শত শত রকেট মহাকাশের বিভিন্ন উচ্চতায় নিক্ষেপ করবেন বলে জানা গেছে। মহাকাশে লব্ধ বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ নিয়ে এদের আবার ভূপৃষ্ঠে ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করা হবে। তবে সর্বাধিক আকর্ষণীয় পরিকল্পনা যা তাঁরা করেছেন এবং রুশ ভাষায় যার নামকরণ হয়েছে L. V. M. Project (অর্থাৎ চন্দ্র, শুক্র ও মঙ্গলগ্রহ অভিযান পরিকল্পনা) তার উদ্দেশ্য হলো পাঁচটি তিন-পর্যায়ের রকেটের সাহায্যে একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রবিশিষ্ট ছোট-খাটো গবেষণাগার প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের জন্যে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করানো এবং পরে সম্ভব হলে মানব-নিয়ন্ত্রিত একটি স্থায়ী গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

এদিকে জাপানের একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এখনই মঙ্গলগ্রহে জমি বিক্রয় আরম্ভ করে দিয়েছে এবং বৃটেনের 'পিপল' নামক সংবাদপত্র প্রথম চন্দ্রলোক যাত্রীকে ৫০ হাজার ষ্টার্লিং পুরস্কার দেবে বলে ঘোষণা করেছে। তাঁরা মনে করেন যে, মানুষের পক্ষে এখন চন্দ্রলোকে যাওয়া শুধু সময়ের প্রশ্নমাত্র।

বর্তমান বৎসরে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

সম্প্রতি পারমাণবিক পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা গুরুতর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। বিপ্লবটা ঘটিয়াছে পারমাণবিক পদার্থ-বিজ্ঞানের অন্যতম ভিত্তিস্তম্ভ 'প্যারিটি-ল' সম্পর্কে। কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির সাম্প্রতিক পরীক্ষালব্ধ কয়েকটি ফলাফল হইতে দেখা যাইতেছে যে, 'প্যারিটি ল' পদার্থ-বিজ্ঞানীদের দীর্ঘকাল পোষিত একটি ধারণা মাত্র, বিশেষ কোন কোন ক্ষেত্র ব্যতীত প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর সহিত ইহার কোন বাধ্যবাধকতা নাই; অর্থাৎ প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সাধারণতঃ এই নিয়ম মানিয়া চলে না। 'প্যারিটি-ল' অনুসারে যে সকল বস্তু দর্পণে প্রতিফলিত একে অন্যের প্রতিবিম্বের মত, তাহারা একই নিয়ম মানিয়া চলিবে। বিগত প্রায় ৩০ বৎসর যাবৎ পারমাণবিক পদার্থ-বিজ্ঞানে ইহা অতি প্রয়োজনীয় নিয়ম হিসাবে বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। 'প্যারিটি-ল' মানিয়া চলে না—এরূপ

ডাঃ লি

কোন নূতন তত্ত্ব বা মতবাদ কখনও স্বীকৃতি লাভে সক্ষম হয় নাই। আধুনিক পারমাণবিক পদার্থ-বিজ্ঞানের অনেক কিছুই এই 'প্যারিটি-ল'-এর উপরে ভিত্তি করিয়া গঠিত হইয়াছে।

টাউ-থিটা সমস্যা

পরমাণু ভাঙ্গিবার জন্য ব্রুকহ্যাভেনের কস্‌মোট্রন এবং বার্কলির (ক্যালিফোর্ণিয়া) বিভাট্রন নামক প্রচণ্ড শক্তিশালী যন্ত্র দুইটির গত কয়েক বৎসরের

ডাঃ ইয়াং

কার্যাবলীর ফলে পারমাণবিক পদার্থ-বিজ্ঞানের যে সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব হইয়াছে তাহা অপেক্ষা সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে অনেক বেশী। পরমাণুর নিউক্লিয়াস হইতে প্রচণ্ড ধাক্কার ফলে কে-মেসন নামক ক্ষণস্থায়ী কণিকার উৎপাদন হইল ইহাদের মধ্যে একটি বিভ্রান্তিকর সমস্যা। সাধারণতঃ কে-মেসনগুলি সবই এক রকমের। কিন্তু ইহাদের মধ্যে টাউ কে-মেসন নামে কথিত কতকগুলি কণিকা বিলুপ্ত হইয়া তিনটি পাই-মেসন উৎপাদন করে, অথচ থিটা কে-মেসন নামক কণিকাগুলি বিলুপ্ত হইয়া দুইটি মাত্র পাই-মেসন উৎপাদন করে। কে-মেসনগুলির এরূপ বিভিন্ন রকমের আচরণ 'প্যারিটি-ল'-এর সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য-বিহীন। অধিকাংশ পদার্থ-বিজ্ঞানী 'প্যারিটি' বজায় রাখিয়া 'টাউ-থিটা সমস্যা' সমাধানের বৃথাই চেষ্টা করেন। কিন্তু ডাঃ লি এবং ডাঃ ইয়াং 'প্যারিটি প্রিন্সিপলে'র উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া বলিলেন—কে-মেসনের মধ্যে কোন সমস্যার ব্যাপার নাই, সমস্যার কারণ রহিয়াছে সম্ভবতঃ ঐ 'প্যারিটির' মধ্যেই। যদি 'প্যারিটি' উপেক্ষা করা যায় তবে অনায়াসেই কে-মেসনের অদ্ভুত আচরণের ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

একটি যুক্তিপূর্ণ নিবন্ধে ডাঃ লি এবং ডাঃ ইয়াং দেখাইয়াছেন যে, 'প্যারিটি 'প্যারিটি-ল' বাদ দিয়াই

এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। 'প্যারিটি' সত্যসত্যই ভিত্তিমূলক নিয়ম কিনা, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কিভাবে পরীক্ষা চালাইতে হইবে, সেই সম্বন্ধেও তাঁহারা নির্দেশ দিয়াছেন। পরীক্ষামূলকভাবে তাঁহাদের মতবাদের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দিয়াছিলেন এবং বিশ্বের তাত্ত্বিক পদার্থ-বিজ্ঞানীরা এই পরীক্ষার ফলাফলের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

শৈত্যের মধ্যেও পাক-খাওয়া বন্ধ হয় না; কিন্তু যথেচ্ছ তাপীয় গতি থাকে না বলিলেই হয়। এরূপ ব্যবস্থা করিয়া শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে স্থাপন করিলে কোবাল্টের নিউক্লিয়াসগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুম্বকের মত একমুখী হইয়া যায়। তেজস্ক্রিয়ার উপর তাপের কোন প্রভাব নাই; কাজেই একমুখী সজ্জিত অতি-হিমায়িত কোবাল্ট পরমাণুগুলি স্বাভাবিকভাবেই ক্ষয়িত হইয়া ইলেকট্রন বিকিরণ

ডাঃ উ

কলাম্বিয়ার আর একজন চীনা মহিলা বিজ্ঞানী প্রোফে. চিয়েন-সিয়াং উ এই পরীক্ষাকার্যে প্রবৃত্ত হন। প্রচণ্ড শৈত্য উৎপাদক যন্ত্রাদির সাহায্যে তিনি তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট ৬০-কে চরম শৈত্যের (-২৭৩·১° সে.) উপরে ০·০১° ডিগ্রিতে ঠাণ্ডা করিবার ব্যবস্থা করেন।

কোবাল্টের নিউক্লিয়াসগুলি নিজের অক্ষরেখার উপর লাটুর মত অনবরত পাক খায় এবং প্রচণ্ড

করিতে থাকে। 'প্যারিটি প্রিন্সিপল্' অনুসারে একমুখী সজ্জিত নিউক্লিয়াসগুলির পাক খাইবার অক্ষরেখা বরাবর ডান ও বাম—উভয় দিকেই সমান সংখ্যক ইলেক্ট্রন বিচ্ছুরিত হইবার কথা। যদি উভয় দিকে অসমানভাবে ইলেক্ট্রন বিচ্ছুরিত হইতে থাকে তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, 'প্যারিটির' সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়মের কোনই সামঞ্জস্য নাই;

অর্থাৎ β-decay-র ব্যাপারে 'প্যারিটি প্রিন্সিপলে'র ব্যর্থতাই প্রমাণিত হইবে।

এই হিমায়িত কোবাল্ট নিউক্লিয়াসের পরীক্ষা খুবই দুরূহ ব্যাপার। ডাঃ উ এরূপ দুরূহ পরীক্ষা সম্পাদন করিয়া যে ফলাফল প্রকাশ করিলেন, তাহাতে দেখা গেল—কোবাল্ট নিউক্লিয়াসের

তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট-৬০ নিউক্লিয়াসের সাহায্যে পরীক্ষার পরিকল্পনা

অক্ষরেখা বরাবর দুই দিক হইতেই সমান সংখ্যক ইলেক্ট্রন বিচ্ছুরিত হয় না। ডাঃ উ-এর পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে ডাঃ লি সহযোগী প্রোফেসর লেডারম্যানকে মিউ-মেসন লইয়া পরীক্ষার কথা বলেন। লেডারম্যান আইরভিংটনে ৩৮৫ মিলিয়ন ভোল্ট কলাম্বিয়া সাইক্লোট্রনে কাজ করিতেন। তিনি সাইক্লোট্রনে পাই-মেসন রশ্মি উৎপাদনের ব্যবস্থা করেন; পাই-মেসন উৎপন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মিউ-মেসনে রূপান্তরিত হয়। 'প্যারিটি'র সত্যাসত্য যাচাই করিবার জন্য মিউ-মেসনের সাহায্যে পরীক্ষার কথা প্রায়ই আলোচিত হইয়াছে। ডাঃ লেডারম্যান ও তাঁহার সহকর্মী এই পরীক্ষার জন্য এক নূতন উপায়ে সহজ পরীক্ষার ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন। এক ইঞ্চি পুরু এবং ৬ বর্গইঞ্চি পরিমিত একটি কার্বন ব্লক বিদ্যুৎ-পরিবাহক তারকুণ্ডলীর দ্বারা বেষ্টন করিয়া সেটিকে তাঁহারা সাইক্লোট্রন হইতে নির্গত মিউ-মেসন রশ্মির পথে স্থাপন করেন। মিউ-মেসন এক সেকেণ্ডের দুই মিলিয়ন ভাগের এক ভাগ সময়ে ভাঙ্গিয়া গিয়া দুইটি নিউট্রিনো এবং একটি ইলেক্ট্রন

উৎপাদন করে। এই সময়টা এতই কম যে, কার্বন ব্লকের তাপীয় গতি ইহাদের উপর তেমন কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারে না বলিলেই চলে। মিউ-মেসনগুলি কার্বন ব্লকের মধ্যে প্রবেশ করিবার পর একই দিকে পাক খাইতে থাকে। এই অবস্থায় 'প্যারিটি' নিয়ম অনুযায়ী তাহাদের সাধারণ অক্ষরেখা বরাবর সকল দিকেই সমসংখ্যক ইলেক্ট্রন নির্গত হওয়া উচিত। কিন্তু সেরূপ কিছু ব্যাপার না ঘটিয়া মেসন হইতে একদিকে দ্বিগুণ সংখ্যক ইলেক্ট্রন নির্গত হইতে দেখা যায়। আবার তারকুণ্ডলীর মধ্য দিয়া সামান্য তড়িৎস্রোত প্রবাহিত

সালের একটি ব্যাপারের সঙ্গে এই ব্যাপারের তুলনা করা যাইতে পারে। তখন মাইকেলসন-মর্লির পরীক্ষার ফলে 'লুমিনিফেরাস ইথারের' মতবাদ পরিত্যক্ত হয়। বায়ুশূন্য স্থানে আলোক-তরঙ্গ ইথারের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়—তখনকার দিনের পদার্থ-বিজ্ঞানীরা এই মতবাদের উপরেই নির্ভর করিতেন। আলোক-তরঙ্গ পরিবহনের জন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজন নাই—আপেক্ষিকতা বাদ ও কোয়াণ্টাম মতবাদের সাহায্যে ইহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা মিলিবার পর অনেকেই পূর্বোক্ত ধারণা পরিত্যাগ করিতে দুঃখ বোধ করিয়াছিলেন। লুমিনিফেরাস
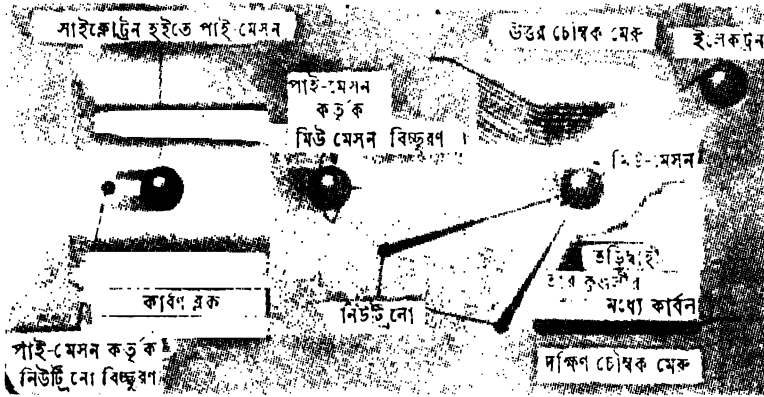
মিউ-মেসনের সাহায্যে 'প্যারিটি'র যৌক্তিকতা যাচাই করিবার পরিকল্পনা

করাইলে মেসনগুলি ঘুরিয়া গিয়া বিপরীত দিকে ইলেক্ট্রন নির্গত করিতে থাকে। ইহা হইতে দেখা যায়, মেসন যেন দর্পণে প্রতিফলিত যুগ্মবস্তুর মত, অথচ তাহাদের আচরণ সেরূপ নহে। কাজেই এই সকল পরীক্ষা হইতে 'প্যারিটি প্রিন্সিপলে'র অযৌক্তিকতা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হইতেছে। ইহার জন্যই ডাঃ লি ও ডাঃ ইয়াংকে এই বৎসর পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দানে সম্মানিত করা হইয়াছে।

ইহার ফলে অনেক পদার্থ-বিজ্ঞানীই মনে করিতেছেন যে, পারমাণবিক পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নূতন যুগের সূচনা হইয়াছে। ১৮৮৭

ইথার সম্বন্ধে এই ভ্রান্ত মতবাদ, বস্তুতান্ত্রিক বিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটনে অনেক দিন পর্যন্ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছিল। এই ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের পর পদার্থ-বিজ্ঞান অব্যাহত গতিতে আগাইয়া চলিয়াছে। পারমাণবিক পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও 'প্যারিটি' সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে 'প্যারিটির' অযৌক্তিকতা প্রমাণিত হইবার পর অনুরূপ অগ্রগতি সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ইহার ফলে হয়তো অনেক পদার্থতাত্ত্বিক মতবাদকে 'প্যারিটি' বাদ দিয়া আবার নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজাইতে হইবে। এই সকল অভিনব মতবাদ হয়তো ভৌতিক বিশ্ব সম্বন্ধে নূতন ধারণা

প্রদান করিবে। পদার্থ এবং 'স্পেস' সম্বন্ধে বিজ্ঞান এতদিন পর্যন্ত যাহা অবগত ছিল তাহা হয়তো ডান দিকে প্যাঁচওয়ালা স্ক্রুর মত ডান-মোড়ের বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে; অথবা পৃথিবীতে হয়তো বাঁ-মোড়ের পদার্থ সৃষ্টি বা সংযোজনও সম্ভব হইতে পারে, যাহার ফলে পার্থিব বস্তুর ধর্ম সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে প্রতিভাত হইবে। —গ

প্রবন্ধের ছবিগুলি 'লাইফ' হইতে গৃহীত

স্তনগ্রন্থি ও স্তনদুগ্ধ

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়

ভবিষ্যৎ সন্তানদের সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলবার জন্যে স্তন্যপায়ী জীবের ক্ষেত্রে জননীর পয়োধরে সঞ্চিত হয়ে থাকে পীযূষধারা। এই পীযূষধারা ক্ষরিত হয়ে থাকে এক বিশেষ ধরণের গ্রন্থি থেকে, যাকে বলা হয় স্তনগ্রন্থি। স্তনগ্রন্থি মানুষের ক্ষেত্রে সংখ্যায় দুটি। এই গ্রন্থি পুরুষ ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই বক্ষোপরি অবস্থিত।

জন্মের পর এই গ্রন্থি ক্ষুদ্র দাগের মত দেখা যায় এবং যৌবনের পূর্বাবস্থা পর্যন্ত একভাবেই থাকে। তখন বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত এর কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না। কিন্তু যৌবন আগমনের পর এর অস্বাভাবিক পরিবর্তন হতে থাকে স্ত্রী-লোকের ক্ষেত্রে। কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে এর কোনও পরিবর্তন সাধারণতঃ দেখা যায় না, পূর্বাবস্থায়ই থেকে যায়।

স্তনগ্রন্থির উৎপত্তি হয়ে থাকে সাধারণতঃ অন্যান্য গ্রন্থিরই মত ভ্রূণে, তন্তুর অবনমনের দ্বারা। একটি গর্তকে ঘিরে কতকগুলি দানাদার জৈবপঙ্কের কোষ-প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এই কোষগুলিই পীযূষধারা উৎপন্ন করে থাকে। এক একটি স্তর উপর থেকে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, প্রথম স্তরটি ত্বকের দ্বারা (চিত্র-ক) এবং তার পরেরটি লসিকা নালীর দ্বারা গঠিত (চিত্র-খ)। এর পরে গ্রন্থির তন্তুগুলিকে ঘিরে চর্বি থাকে (চিত্র-গ)। তারপরে থাকে গ্রন্থি-তন্তুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা (চিত্র-ঘ)। সবশেষে দেখা যায় গ্রন্থি-কোষগুলিকে (চিত্র-ছ)। এদের নালীগুলি প্রত্যেকের নিজস্ব ছিদ্রের দ্বারা বোঁটার অগ্রভাগে এসে বাইরের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে (চিত্র-চ)। বোঁটাটি একটি মাংসপিণ্ডাকার ও বেশ গাঢ় রঙের এবং স্তনের মধ্যস্থলে এসে শেষ হয়েছে (চিত্র দ্রষ্টব্য)। প্রথমে বোঁটাটি বেশ একটু ছোট এবং স্তনগ্রন্থিটিও বেশ আঁটসাঁট থাকে। কিন্তু গর্ভসঞ্চারের পর বোঁটাটি বেশ বড় হতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বোঁটার চার দিকের রং আরও গাঢ়তর হয়ে ওঠে। আগেই বলা হয়েছে যে, পুরুষদের ক্ষেত্রে এটি পূর্বাবস্থায় থেকে যায় চিরকাল। এর কারণ, স্তন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার জন্যে যে যে হর্মোনের প্রয়োজন হয় তা পুরুষের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ পাওয়া যায় না; কিন্তু স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে তা বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। তবে অনেক সময় পুরুষদের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে, তাদের স্তন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। এর কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে—স্ত্রী ও পুরুষের যৌনসংক্রান্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি এক নয় এবং তারা বিভিন্ন ধরণের ক্ষরণ করে থাকে। কিন্তু তাছাড়া এমন কতকগুলি বিশেষ গ্রন্থি আছে, যেগুলি স্ত্রী বা পুরুষের বৈশিষ্ট্য অবধারক উত্তেজক রস ক্ষরণ করে থাকে। যখন ঐ বিশেষ গ্রন্থিগুলি বেশ কার্যক্ষম হয়ে ওঠে তখনই কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ রকম অস্বাভাবিক

ধরণের ক্ষরণ হতে পারে, যার প্রভাব পৌরুষত্বকে নষ্ট করে নারীত্বের দিকে টেনে আনে।

আমাদের দেহের মধ্যে তিন রকমের গ্রন্থি দেখতে পাওয়া যায়। এক রকমের গ্রন্থি আছে যাদের নিজস্ব কোন নালী নেই, কিন্তু তাদের ক্ষরিত রস রক্তের মাধ্যমে চলে যায় বিশেষ বিশেষ স্থানে। আবার আর এক রকমের গ্রন্থি আছে

প্রোজেষ্টেরোন এবং পিটুইটারী গ্রন্থির পুরো-ভাগের প্রোল্যাক্টিন ও কিড্নীর উপরে অবস্থিত সুপ্রারেনাল গ্রন্থির কর্টিকোল্যাকৃটিন প্রভৃতি উত্তেজক রসের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে স্তনগ্রন্থির বৃদ্ধি সম্ভব হয়ে থাকে। ইষ্ট্রোজেনই যৌবন প্রাপ্তির সময় এবং গর্ভাবস্থায় স্তনের বোঁটার বৃদ্ধি সাধন করে। ইষ্ট্রেজেনকে সাহায্য করবার জন্যে
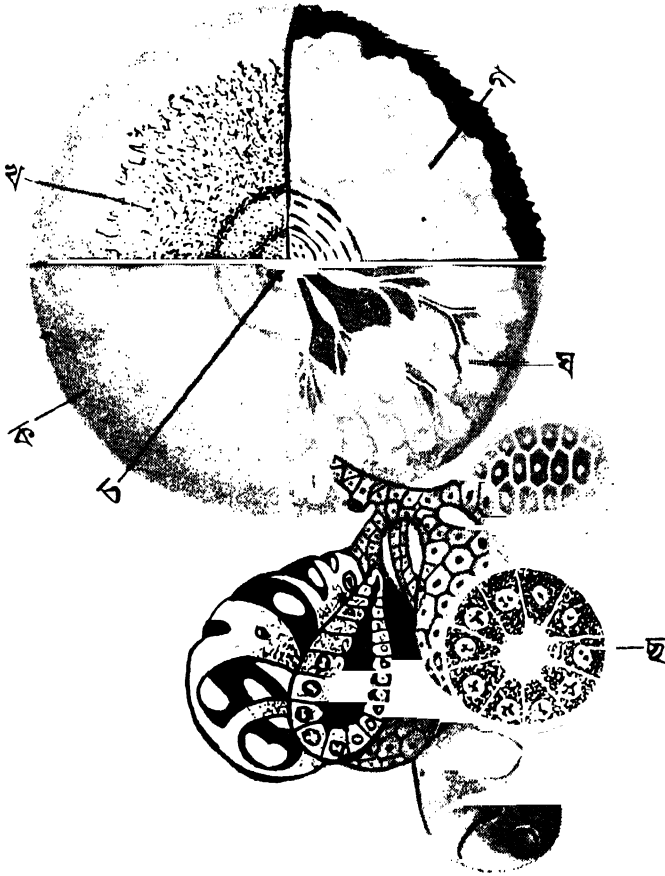
স্তনের আভ্যন্তরিক গঠন

যাদের দ্বারা উভয় প্রকারের কাজই সাধিত হয়ে থাকে। উপরিউক্ত গ্রন্থিগুলির মধ্যে যেগুলির ক্ষরণ রক্তের মাধ্যমে নীত হয়, সেগুলিকে বলা হয় অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি। অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি থেকে যে রস ক্ষরিত হয় তাই উত্তেজক রস বা হর্মোন নামে পরিচিত। যৌনসংক্রান্ত স্ত্রী-গ্রন্থির ইষ্ট্রোজেন এবং

প্রোজেষ্টেরোন সম্মিলিতভাবে কাজ করে' সব রকমের বৃদ্ধি সাধন করে থাকে। কিন্তু দুগ্ধক্ষরণের সঙ্গে এদের কোনও সংযোগ থাকে না; কাজেই গর্ভাবস্থায় দুগ্ধক্ষরণ হওয়া সম্ভবপর হয়। কিন্তু এবার পিটুইটারী গ্রন্থি থেকে প্রোল্যাকৃটিন এবং সুপ্রারেনাল গ্রন্থির কর্টিকোল্যাকৃটিন

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত স্তনের উপর কাজ করে দুগ্ধক্ষরণের জন্যে ভিতরের গ্রন্থি-কোষগুলিকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করতে থাকে। কিন্তু তবুও দুগ্ধক্ষরণ সম্ভব হয় না, সন্তান প্রসবের পরে যতক্ষণ পর্যন্ত গর্ভফুল (placenta) নিষ্ক্রান্ত না হয়। সেটি নিষ্ক্রান্ত হওয়ার ফলে সহসা তজ্জাত সব উত্তেজক রসের উৎপত্তি বন্ধ হয়ে যায় বলে মাতৃরক্তে ইষ্ট্রোজেন জাতীয় উপাদানের হ্রাস ঘটে। সেই কারণে পিটুইটারী গ্রন্থির পুরোভাগের প্রোল্যাক্টিন নামক হর্মোনের রক্তের সঙ্গে মিশ্রণের বাধা দূর হয়ে যায় বলে তারই প্রভাবে পয়োধরে দুগ্ধের ক্ষরণ হতে আরম্ভ করে। গর্ভের শেষ অবস্থা থেকে আরম্ভ করে যতদিন শিশুকে স্তন্যদান করা হয় ততদিন পর্যন্ত শেষোক্ত উপাদানটি সক্রিয় অবস্থায় পর্যাপ্ত দুগ্ধক্ষরণের ব্যবস্থা করতে থাকে। গর্ভাবস্থায় যে স্তন-বৃদ্ধি দেখা যায় তার জন্যে কোন স্নায়বিক প্রভাব ব্যতীত বিভিন্ন হর্মোনের সম্মিলিত ক্রিয়াই বেশী দায়ী। স্তনে দুগ্ধ যতই প্রস্তুত হোক না কেন, শিশু যতক্ষণ মুখ দিয়ে নিজের খাদ্য আহরণ করতে না পারে ততক্ষণ পর্যন্ত দুগ্ধক্ষরণ সম্ভব নয়। স্তনবৃন্ত থেকে খাদ্য আহরণের সময় একপ্রকার স্নায়বিক প্রভাব কাজ করে থাকে, যার ফলে দুগ্ধক্ষরণ সম্ভবপর হয়। আর একটি কথা—শিশুকে স্তন্যদান করলে জননীর বেশ একটি উপকার সাধিত হয়। এর ফলে প্রতিবর্তন ক্রিয়ারূপে (reflex action) গর্ভাশয়ের পেশীর স্বভাবকুঞ্চন (tonicity) বেড়ে যায় এবং গর্ভাশয় ক্রমশঃ ছোট হয়ে স্বাভাবিক আকারে ফিরে আসে। এজন্যে শিশুকে উপযুক্ত-ভাবে স্তন্যদান করা প্রসূতি ও সন্তান উভয়ের পক্ষেই প্রয়োজন।

সন্তান প্রসবের পর প্রথম দু-তিন দিন স্তন থেকে সাদা চট্চটে একপ্রকার ঘন তরল পদার্থ বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। একে বলা হয় কলোষ্ট্রাম। পদার্থটি স্বাভাবিক দুগ্ধের মত নয়। এতে প্রোটিন ও লবণজাতীয় পদার্থ অধিক পরিমাণে থাকে। কিন্তু কেজিনোজেন জাতীয় প্রোটিন একেবারেই থাকে না বললেই চলে। এটি শিশুর পক্ষে মোটেই উপযোগী নয়। তাই শিশুকে প্রথম দু-তিন দিন মাতৃদুগ্ধ খেতে দেওয়া উচিত নয়। তাই সচরাচর দেখা যায়, সদ্যোজাত শিশুকে মাতৃদুগ্ধ দেওয়া হয় না।

দুগ্ধ সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য। ঈষৎ নীলাভাযুক্ত এই শ্বেতবর্ণের তরল পদার্থটি লিট্মাস কাগজের প্রতি উভক্রিয়াসম্পন্ন (amphoteric)। এর আপেক্ষিক গুরুত্ব হলো ১০৩০। এক ফোঁটা দুধ একটি কাচের স্লাইডের উপর রেখে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করলে দেখা যায়, তাতে ছোট ছোট দানার মত স্নেহজাতীয় পদার্থ ভাসছে। নীচে তুলনামূলকভাবে মাতৃদুগ্ধ ও গোদুগ্ধের উপাদান-গুলির পরিমাণ দেওয়া হলো। এথেকে বোঝা যাবে, দুগ্ধ হিসাবে কোন্‌টি কিরূপ প্রয়োজনীয়।

উপাদান	মাতৃদুগ্ধ	গোদুগ্ধ
(১) জলীয় অংশ	৮৭·৮%	৮৮·৪%
(২) কঠিন অংশ	১২·২%	১১·৬%
(ক) জৈব পদার্থ		
(১) প্রোটিন < ল্যাক্ট-অ্যালবুমিন—	১%	০·৫%
কেজিনোজেন—	০·৫%	৩%
(২) স্নেহ পদার্থ (emulsified)	৩%	৩·৫%
(৩) লেসিথিন ও কলেষ্টেরোল	সামান্য পরিমাণ	সামান্য পরিমাণ
(৪) শর্করা (ল্যাক্টোজ)	৭%	৪%
(৫) খাদ্যপ্রাণ	এ ও ডি বেশী পরিমাণ এবং বি ও সি অল্প পরিমাণ	এ ও ডি বেশী পরিমাণ এবং বি ও সি অল্প পরিমাণ
(৬) এন্‌জাইম	কিছু পরিমাণ	কিছু পরিমাণ
(খ) অজৈব পদার্থ (সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, ক্লোরিন এবং অতি অল্প-মাত্রায় লৌহ)	২%	৬%

উপরের বিবরণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মাতৃদুগ্ধে যথেষ্ট পরিমাণে শর্করা (ল্যাকটোজ) থাকলেও প্রোটিন ও লবণজাতীয় পদার্থগুলি গোদুগ্ধ অপেক্ষা বেশ কম। তাই শিশুর পরিপাক যন্ত্রের উপর অযথা যাতে বেশী চাপ না পড়ে, মাতৃদুগ্ধে প্রাকৃতিক নিয়মে তারই ব্যবস্থা হয়েছে। কাজেই শিশুর পক্ষে মাতৃদুগ্ধের মূল্য গোদুগ্ধ অপেক্ষা অনেক বেশী। অনেক সময় মাতৃদুগ্ধের অভাবে গোদুগ্ধের সঙ্গে সমপরিমাণে জল মিশিয়ে শিশুর উপযোগী করা যেতে পারে। এদিক থেকে গাধার দুধ খুবই উপযোগী। কারণ একমাত্র চর্বির উপাদান মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা প্রায় ১% কম হলেও অন্যান্য উপাদানগুলি ঠিকই থাকে। সেজন্যে গাধার দুধকে মাতৃদুগ্ধের সমপর্যায়ী বলা যায় এবং এটি নির্বিঘ্নেই ব্যবহার করা যেতে পারে।

সদ্যোজাত শিশুর পক্ষে মাতৃদুগ্ধই যে প্রকৃষ্ট এবং ৬।৭ মাস পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা উপযোগী খাদ্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর দ্বারাই শিশু স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। তাই যে শিশু উপযুক্তভাবে মাতৃদুগ্ধ পায় না তার স্বাভাবিক বৃদ্ধিও হয় না। দেখা গেছে—যে মায়ের স্তনে দুগ্ধের পরিমাণ কম, সেই মায়ের শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু যদি মায়ের স্তনে দুগ্ধের পরিমাণ বেশী থাকে তবে শিশুর বৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই হয়ে থাকে।

সন্তান প্রসবের পর থেকে সুস্থ জননীর সাধারণতঃ ন'মাস পর্যন্ত ক্ষরিত দুধের পরিমাণ প্রায় .৫ আউন্স থেকে ৪০ আউন্স পর্যন্ত হয়ে থাকে। গুণ ও পরিমাণানুসারে খাদ্য উপযুক্ত না হলে স্তন্যদানের প্রথম কয়েক মাস জননীর দেহ থেকেই স্তন্যের স্বাভাবিক উপাদানগুলি উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধের সঙ্গে বের হয়ে আসে বলে জননীর দেহ ক্ষয় হতে থাকে। পরবর্তীকালে দুগ্ধের পরিমাণ ও খাদ্য হিসাবে মাতৃদুগ্ধের উপযোগিতাও কমে আসে। সেজন্যে তখন খাদ্যের দিক থেকে জননীর সতর্ক হওয়া কর্তব্য। দুগ্ধের ক্ষরণ ও উপাদানগুলি শুধুমাত্র যে জননীর খাদ্যের উপরই নির্ভর করে তা নয়, এটি আবার ভয়, ক্রোধ, দুঃখ, মানসিক চাঞ্চল্য প্রভৃতি উপরও নির্ভর করে। আবার সময় সময় জননীর অসুস্থতার দরুণও এর ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা যায়। ১৮ থেকে ৩২ বছর বয়স্কা জননীর দুগ্ধই সবচেয়ে পুষ্টিকর বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। তার মধ্যে প্রথম সন্তান প্রসবের সময়ে উপাদানগুলি সঠিক এবং সুষ্ঠুভাবে থাকে। তাই সাধারণতঃ প্রথম শিশুকে সবল, স্বাভাবিক দেখা যায়। অনেক সময় দেখা গেছে—যে সব জননী অতিরিক্ত মাদক দ্রব্য, ব্রোমাইড, আয়োডাইড, বেলেডোনা, আফিম জাতীয় ওষুধ ব্যবহারে অভ্যস্ত তাদের স্তনদুগ্ধে এগুলির কতকাংশ বেশ দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি হচ্ছে শিশুর পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক; কাজেই শিশুর মধ্যে এর বিষক্রিয়া বেশ দেখা যায়। সেজন্যে জননীর পক্ষে তাদের ভবিষ্যৎ সন্তানকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলবার জন্যে এগুলি যতদূর সম্ভব বর্জন করাই শ্রেয়ঃ। অসুখের জন্যে ও চিকিৎসকের পরামর্শে এগুলি যখন গ্রহণ করতে হয়, তখন শিশুকে স্তন্যদান বন্ধ করে দেওয়াই কর্তব্য।

পদার্থের স্বতঃবিকিরণ

শ্রীপ্রণবকুমার গুহঠাকুরতা

ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, রেডিয়াম, অ্যাক্টিনিয়াম প্রভৃতি কতকগুলি মৌলিক পদার্থ হইতে অতি শক্তিশালী অদৃশ্য রশ্মি স্বতঃই নির্গত হইয়া থাকে। এই রশ্মি এতই তীক্ষ্ণ যে, ইহা আপাত অস্বচ্ছ পদার্থ-সমূহ ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইতে সক্ষম। পদার্থ বিশেষের এই ধর্মই স্বতঃবিকিরণ বা তেজস্ক্রিয়তা বলিয়া পরিচিত। স্বতঃবিকিরণ সম্বন্ধে গবেষণার ফলে আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বহুবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইহার সাহায্যে মানুষ পরমাণুর গঠন-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, খৃষ্টীয় ১৮৯৬ সালে খ্যাতনামা বিজ্ঞানী স্যার হেনরী ব্যাকারেল প্রথম তেজস্ক্রিয়তা বা স্বতঃবিকিরণের ব্যাপার আবিষ্কার করেন। ইউরেনিয়াম ধাতু লইয়া গবেষণাকালে তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, কাগজ বা অন্য কোনও আপাত অস্বচ্ছ পদার্থ দ্বারা এই ধাতুটিকে আবৃত করিয়া রাখিলেও তাহার নিকটবর্তী কোন ফটোগ্রাফিক প্লেট এক প্রকার অজ্ঞাত রশ্মি দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই বিষয়ে তাহার দৃষ্টি পড়িলে তিনি বারংবার পরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইউরেনিয়াম ধাতু হইতে সর্বদা একপ্রকার রশ্মি বিচ্ছুরিত হয় যাহা রঞ্জেন-রশ্মির ন্যায় আমাদের পরিচিত কোন কোনও অস্বচ্ছ পদার্থকে অতিক্রম করিতে পারে এবং কোন কোন বায়বীয় পদার্থকে আয়নিত করিয়া (ionise) দেয়। কিন্তু এই বিষয়ে ইহার বেশী তিনি আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

অতঃপর রাদারফোর্ড ও ভিলার্ডের গবেষণা হইতে জানা যায় যে, ব্যাকারেল বর্ণিত অজ্ঞাত রশ্মির মধ্যে আল্‌ফা, বিটা, গামা—এই তিন প্রকারের নূতন রশ্মি বর্তমান। পরবর্তী বিজ্ঞানীরা দেখাইলেন যে, ইউরেনিয়াম ছাড়া আরও অনেক ধাতু, যেমন—থোরিয়াম, রেডিয়াম প্রভৃতির মধ্যে এই গুণটি বিদ্যমান। এই সকল বিজ্ঞানীদের মধ্যে ম্যাডাম কুরী এবং তাঁহার স্বামী পিয়ের কুরীর নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই আল্‌ফা-রশ্মি, বিটা-রশ্মি এবং গামা-রশ্মি বিচ্ছুরণের বিশেষ গুণটির নামই হইল তেজস্ক্রিয়তা এবং যে সকল পদার্থের এই বিশেষ গুণটি আছে তাহাদের বলা হয় স্বতঃবিকিরক বা তেজস্ক্রিয় পদার্থ।

রাদারফোর্ড ও তাঁহার পরবর্তী বহু বিজ্ঞানীর চেষ্টার ফলে এই তিনটি নবাবিষ্কৃত রশ্মির স্বরূপ নির্ধারিত হয়। আল্‌ফা-রশ্মি ও বিটা-রশ্মি যথাক্রমে আল্‌ফা-কণা ও বিটা-কণা নামক কতকগুলি দ্রুত-গতিসম্পন্ন তড়িতান্বিত কণার সমষ্টি মাত্র।

আল্‌ফা-কণার উপর চৌম্বক ও বৈদ্যুতিক প্রভাব লইয়া গবেষণার ফলে জানা গেল যে, উহার ভর (mass) একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের চার গুণ এবং উহার ধনাত্মক তড়িতাধান একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রীনের তড়িতাধানের দ্বিগুণ। প্রকৃতপক্ষে উহা একটি হিলিয়াম পারমাণুর কেন্দ্রীন। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, কোনও একটি বিশেষ পদার্থ হইতে নির্গত সকল আল্‌ফা-কণাই সমান গতিসম্পন্ন এবং উহাদের গতিপথও সমান দীর্ঘ। ইহাদের কোন পদার্থ ভেদ করিবার ক্ষমতা খুবই কম। সাধারণতঃ অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর $\frac{1}{50}$ মিলিমিটার অথবা কয়েক সেন্টিমিটার বায়ুস্তর অতিক্রম করিবার পরেই ইহারা একেবারে গতিহীন হইয়া পড়ে।

বিটা-কণার উপর অনুরূপ পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, এইগুলি প্রকৃতপক্ষে খুব দ্রুত গতিসম্পন্ন ইলেক্ট্রন, অর্থাৎ ইহাদের ভর ও ঋণাত্মক আধান একটি ইলেক্ট্রনের ভর ও আধানের সমান। আল্‌ফা-কণা অপেক্ষা ইহাদের বায়বীয় পদার্থকে আয়নিত করিবার ক্ষমতা অনেক কম। ইহাদের গতি অত্যন্ত বেশী। অনেক সময়ে ইহাদের গতি আলোর গতির $\frac{৯৪}{১০০}$ হইতে $\frac{৯৬}{১০০}$ ভাগ পর্যন্ত উঠিয়া থাকে।

গামা-রশ্মিগুলি রঞ্জেন-রশ্মি ও আলোক-তরঙ্গের মতই তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ। ইহাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য রঞ্জেন রশ্মি অপেক্ষাও অনেক ছোট। সেই জন্য অনেক সময় ইহাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য প্রত্যক্ষ উপায়ে নির্ধারণ করা যায় না; পরোক্ষ উপায়ের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় (ফটো-ইলেক্ট্রিক ব্যবস্থায়)। পদার্থ ভেদ করিবার ক্ষমতা ইহাদের অত্যন্ত বেশী। ইহারা সময়ে সময়ে ত্রিশ সেন্টিমিটার পুরু লোহার-পাতও অতিক্রম করিতে পারে।

তেজস্ক্রিয় পদার্থ লইয়া গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে যে, আল্‌ফা-কণা ও বিটা-কণা বিচ্ছুরণের ফলে ঐ সকল পদার্থের ভর এবং উহাদের কেন্দ্রীনের মোট তড়িতাধানের পরিবর্তন ঘটে এবং ফলে উহারা অন্য পদার্থে পরিণত হয়। বিজ্ঞানী সডি এই সকল মৌলিক পদার্থের পরিবর্তনের কারণ-বিন্যাসে এক অতি সহজ নিয়মের প্রবর্তন করেন। ইহা "সডিস্ রুল্" বলিয়া বিখ্যাত। এই নিয়ম অনুযায়ী কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণু একটি আল্‌ফা-কণা বিচ্ছুরণ করিলে উহার পারমাণবিক ভর হইতে ৪ এবং পারমাণবিক সংখ্যা হইতে ২ কমিয়া যাইবে এবং একটি বিটা-কণা বিচ্ছুরণ করিলে উহার পারমাণবিক ভরের কোনও পরিবর্তন না হইলেও পারমাণবিক সংখ্যা ১ বাড়িয়া যাইবে। এই নিয়মটির কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। যেহেতু একটি আল্‌ফা-কণার ভর একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের ৪ গুণ, সেহেতু একটি আল্‌ফা-কণা বিচ্ছুরণের ফলে পদার্থের পারমাণবিক ভর হইতে ৪ কমিয়া যায়। আবার একটি আল্‌ফা কণার মধ্যে দুইটি ধনাত্মক তড়িতাধানের একক আছে; অতএব কোনও পরমাণুর কেন্দ্রীন হইতে একটি আল্‌ফা-কণা চলিয়া গেলে উহার মোট ধনাত্মক তড়িতাধানের সংখ্যা হইতে ২ কমিয়া যাইবে। কারণ, পারমাণবিক সংখ্যা কেন্দ্রীনের মোট ধনাত্মক তড়িতাধানের সংখ্যার সমান। এইরূপে একটি বিটা-কণার বহিষ্কারের ফলে পরমাণুর মোট তড়িতাধান হইতে একটি ঋণাত্মক তড়িতাধান কমিয়া যায়, অর্থাৎ একটি ধনাত্মক তড়িতাধান বাড়িয়া যায় এবং তাহার ফলে পারমাণবিক সংখ্যা ১ বাড়িয়া যায়। এই নিয়মের সাহায্যে ইউরেনিয়াম ও অন্যান্য তেজস্ক্রিয় ধাতুর ক্রমিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যা করা চলে।

১নং চিত্রে ইউরেনিয়াম ধাতুর ক্রমিক পরিবর্তন দেখান হইয়াছে। উপরিউক্ত চিত্রে বাম হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত ক্রমিক সংখ্যাগুলি পারমাণবিক সংখ্যার নির্দেশক এবং উপর হইতে নীচ পর্যন্ত বিস্তৃত সংখ্যাগুলি পারমাণবিক ভরের নির্দেশ দিতেছে। ইউরেনিয়াম-I হইতে একটি আল্‌ফা কণা বহিষ্কারের ফলে উহা ইউরেনিয়াম-x_1 এ পরিণত হয়। ইউরেনিয়াম-x_1 হইতে একটি বিটা কণা বহিষ্কারের ফলে উহা ইউরেনিয়াম-x_2-তে পরিণত হয়। ইউরেনিয়াম-x_2 হইতে একটি বিটা-কণা বহিষ্কারের ফলে উহা ইউরেনিয়াম-II-তে পরিণত হয়। ইহা ইউরেনিয়াম I-এর একটি আইসোটোপ। সম-পারমাণবিক সংখ্যাবিশিষ্ট বিভিন্ন ভরের মৌলিক পদার্থকে আইসোটোপ বলা হয়। ইউরেনিয়াম-II হইতে একটি আল্‌ফা-কণা নির্গত হইলে উহা আয়োনিয়ামে রূপান্তরিত হয়। অনুরূপ ভাবে আল্‌ফা-কণা বহিষ্কারের ফলে আয়োনিয়াম হইতে রেডিয়াম, রেডিয়াম হইতে রেডন (গ্যাস) এবং এইভাবে রেডিয়াম-A ও রেডিয়াম-B-এর উৎপত্তি হয়। রেডিয়াম-B হইতে বিটা-কণা নির্গত হইয়া যথাক্রমে রেডিয়াম-c ও রেডিয়াম-c′-এর সৃষ্টি

করে। অনুরূপ ভাবে রেডিয়াম-c'', রেডিয়াম D, রেডিয়াম-E এবং রেডিয়াম F-এর সৃষ্টি হয় এবং পরিশেষে সমস্তই সীসাতে পরিণত হয়। একইভাবে থোরিয়াম ও অ্যাক্টিনিয়াম ধাতুর কেন্দ্রীনের ভাঙ্গনও বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই দুই ক্ষেত্রেও পরিশেষে বিভিন্ন ধরণের সীসার সৃষ্টি হয়। ফলে অ্যালকেমিষ্টদের স্বপ্ন সার্থক হইতে চলিয়াছে।

পূর্বোক্ত ইউরেনিয়াম ধাতুর ক্রমিক রূপান্তর হইতে দেখা যায় যে, এইরূপ রূপান্তরের ফলে উৎপন্ন বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের স্বতঃবিকিরণ ক্ষমতা ক্রমশঃ কমিতে থাকে; কারণ সর্বশেষ উৎপন্ন পদার্থ সীসা সম্পূর্ণরূপে তেজস্ক্রিয়তা-মুক্ত। দেখা গিয়াছে

পারমাণবিক সংখ্যা → / পারমাণবিক ভর ↓	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২
২৩৮												UI
২৩৬												
২৩৪										UXI	UX2	UII
২৩২												
২৩০										Io		
২২৮												
২২৬								Ra				
২২৪												
২২২						RaEm						
২২০												
২১৮				RaA								
২১৬												
২১৪		RaB	RaC	RaC'								
২১২												
২১০	RaC''	RaD	RaE	RaF								
২০৮												
২০৬		Pb										

১নং চিত্র

U-ইউরেনিয়াম, I_o-আয়োনিয়াম, Ra-রেডিয়াম RaEm-রেডন, Pb-সীসা।

অ্যালকেমিষ্টরা এক সময়ে কৃত্রিম উপায়ে মৌলিক পদার্থের রূপান্তর সাধনের চেষ্টা করিতেন এবং পারদ প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ হইতে স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার আশা রাখিতেন। তখন অবশ্য বিজ্ঞান এতটা উন্নত হয় নাই এবং তাঁহারা তাঁহাদের প্রয়াসকে অসম্ভব বলিয়া পরিত্যাগ করেন। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে কৃত্রিম উপায়ে এক মৌলিক পদার্থকে অপর এক মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত করা সম্ভব হইয়াছে। অ্যাটমিক পাইল, সাইক্লোট্রন প্রভৃতি যন্ত্র উদ্ভাবনের যে, কোনও তেজস্ক্রিয় পদার্থের তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ কোনও সময়ে I_0 হইলে, t সেকেণ্ড পরে উহার তেজস্ক্রিয়তা হইবে $I_t = I_0 e^{-\lambda t}$; এখানে λ একটি স্থির সংখ্যা। ইহার মান বিভিন্ন পদার্থের পক্ষে বিভিন্ন। এই সূত্রের সাহায্যে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধায়ু নির্ণয় করা সম্ভব হইয়াছে; যথা—ইউরেনিয়াম-I-এর অর্ধায়ু ৪.৫×১০^{৯} বৎসর, রেডিয়ামের ১৫৮০ বৎসর, রেডনের ৩.৮২৫ দিন এবং রেডিয়াম-c'-এর $১০^{-৬}$ সেকেণ্ড।

ইউরেনিয়াম প্রভৃতি স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছাড়াও বিজ্ঞানীদের চেষ্টার ফলে অনেক কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন, তেজস্ক্রিয় সোডিয়াম। সাধারণতঃ সোডিয়াম তেজস্ক্রিয়ত্ববিহীন পদার্থ; কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ফলে ইহাকেও তেজস্ক্রিয় করা যায় এবং তখন ইহা স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় পদার্থের মতই আচরণ করে এবং একটি বিটা-কণা বিচ্ছুরণ করিয়া ক্রমশঃ ম্যাগ্নেসিয়াম ধাতুতে পরিণত হয়। $^{24}Na_{11} \longrightarrow {}^{24}Mg_{12}$ + বিটা-কণা + গামা-রশ্মি। এই তেজস্ক্রিয় সোডিয়ামের অর্ধায়ু হইল ১৬ ঘণ্টা। এই কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় সোডিয়ামকে বলা হয় রেডিও-সোডিয়াম। অনুরূপভাবে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাসকে রেডিও-ফস্‌ফরাস বলা হয়।

এই কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ উৎপন্ন করিবার অনেক প্রণালী আছে। যথা—অ্যালুমিনিয়াম ধাতুকে যদি একটি নিউট্রন কণার দ্বারা আঘাত করা যায় তাহা হইলে তেজস্ক্রিয় সোডিয়াম ধাতুর সৃষ্টি হয় এবং একটি আল্‌ফা-কণা নির্গত হয়।

$$^{27}Al_{8} + {}^{1}n_{0} \rightarrow {}^{24}Na_{11} + {}^{4}He_{2}$$
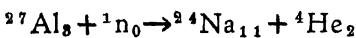
(আল্‌ফা-কণা)

নিউট্রন ছাড়াও দ্রুত গতিসম্পন্ন প্রোটন, ডয়টেরন অথবা আল্‌ফা-কণা এই কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। এই সকল তড়িতাধানপূর্ণ কণিকাকে দ্রুত গতিসম্পন্ন করিবার জন্য আজকাল নানাবিধ যন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সাইক্লোট্রন, সিন্‌ক্রো-সাইক্লোট্রন, বিভাট্রন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা নির্ধারণের জন্য আজকাল বহুবিধ যন্ত্রের প্রচলন হইয়াছে। তন্মধ্যে উইলসন্স ক্লাউড চেম্বার এবং গাইগার কাউন্টারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত যন্ত্রটিরই ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা বেশী।

উইলসন্স ক্লাউড চেম্বার যন্ত্রটিতে একটি চতুর্দিক আবদ্ধ পাত্রে ধূলিকণা-বর্জিত ও জলীয় বাষ্প মিশ্রিত বায়ু নেওয়া হয় এবং কোন বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা চাপ কমাইয়া সেই বায়ুর জলীয় বাষ্পকে হঠাৎ অতিসম্পৃক্ত অবস্থায় আনা হয়। কোনও তেজস্ক্রিয় পদার্থ উক্ত যন্ত্রটির নিকটে থাকিলে, সেই পদার্থটি হইতে নির্গত রশ্মি যন্ত্রস্থিত বায়ুকে আয়নিত করে এবং সেই আয়নগুলিকে কেন্দ্র করিয়া ধূম্রাকারে জলকণার সৃষ্টি হয়। যান্ত্রিক কৌশলে উহার ফটো গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা আছে। এই ভাবেই এই যন্ত্রে পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা নির্ধারিত হয়।

২নং চিত্র

ক-সিলিণ্ডার, খ-তার, গ-ইলেক্ট্রোমিটার, ব ব্যাটারী, ভ ভূমি

গাইগার কাউণ্টারে (২নং চিত্র) ক-চিহ্নিত একটি সিলিণ্ডারের মধ্যে খ-চিহ্নিত একটি তার আছে। সিলিণ্ডারটি একটি ব্যাটারীর এক প্রান্তে বৈদ্যুতিকভাবে সংযুক্ত এবং তারটি গ-চিহ্নিত ইলেক্ট্রোমিটারের মাধ্যমে ব্যাটারীর অপর প্রান্তের সহিত সংযুক্ত।

ক এবং খ এর মধ্যে এমন ভাবে তড়িৎ-বিভবের পার্থক্য রাখা হয় যে, উভয়ের মধ্যে অবস্থিত বায়ু সামান্যতম আয়নিত হইলেও বিদ্যুৎ ক্ষরণ হইতে থাকে এবং ইলেক্ট্রোমিটারে তার নির্দেশ পাওয়া যায়। পদার্থ অতি লঘু তেজস্ক্রিয় হইলেও এই যন্ত্রে তাহা ধরা সম্ভব হয়।

স্বতঃবিকিরণশীল পদার্থের ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিবার ফলে ইহার চাহিদাও ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। কৃষি, চিকিৎসা বিজ্ঞান, শিল্প এবং শক্তি উৎপাদনে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহার সভ্যতার ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করিতে চলিয়াছে। কৃষি-বিজ্ঞানে, বিশেষতঃ সার সম্বন্ধীয় গবেষণার ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রয়োগ বিশেষভাবে সফল হইয়াছে। ইহার সাহায্যে উদ্ভিদবিশেষের কি পরিমাণে কোন্ কোন্ খাদ্য উপাদান প্রয়োজন তাহা যথাযথভাবে জানা যাইতে পারে। তেজস্ক্রিয় পদার্থের সাহায্যে পরিব্যক্তি ঘটাইয়া উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদ সৃষ্টি সহজ হইয়াছে এবং এই ভাবে কৃষিজ উপাদান বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থের (রেডিও-আইসোটোপ) আজকাল বহুল প্রচলন সুরু হইয়াছে। ব্রেন-টিউমারের অবস্থান নির্ণয়ে—রেডিও-আয়োডিন, রক্তে লোহিত-কণার পরিমাণ নির্ণয়ে—রেডিও-ফস্‌ফরাস, বাহ্যিক ক্ষত নিরাময়ে—রেডিও-ষ্ট্রন্‌সিয়াম প্রভৃতি বর্তমানে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আজ শত শত চিকিৎসা-বিজ্ঞানাগারে বিজ্ঞানীরা উদরী, হৃদ্‌-রোগ, বহুমূত্র এবং বিভিন্ন প্রকারের ক্যান্সার রোগের উৎপত্তির কারণ নির্ণয়ে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহার করিতেছেন। রেডিও-কোবাল্ট, রেডিও-গোল্ড এবং রেডিও-আয়োডিন আজ ভয়াবহ ক্যান্সার রোগের সহিত যুঝিবার মত যথেষ্ট শক্তি মানুষকে দিয়াছে।

নানাপ্রকার তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ এখন শিল্প-উন্নয়নে ব্যবহৃত হইতেছে। তেজস্ক্রিয় পদার্থের সাহায্যে এখন ৩০০ মিলিমিটার পুরু ইস্পাত বা অন্য ধাতব বস্তুর ভিতরের দোষ-ত্রুটি উদ্ঘাটন করা সম্ভব। ইহার সাহায্যে ইঞ্জিনের বয়লারের গুণ, বাষ্পচালিত যন্ত্রাদির সাজ-সরঞ্জাম, ব্লাষ্ট ফারনেসের ওয়েল্‌ডেড্ কেসিং এবং সকল প্রকার কাষ্টিং-এর খুঁটিনাটি সাফল্যের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হইয়াছে। ধাতু-শোধন, খাদ-মিশ্রণ ও ধাতুর রাসায়নিক বিশ্লেষণ প্রভৃতি সকল ব্যাপারেই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে সহজভাবে সম্পাদিত হইতেছে। শুধু ধাতু শিল্পই নয়, অন্যান্য শিল্পেও ইহা প্রবেশ করিয়াছে। এমন কি—রং, মোম প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থসমূহ উৎপাদনেও ইহা বিশেষ সাফল্যের সঙ্গেই ব্যবহৃত হইতেছে। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে যন্ত্রের ক্ষয়ের কারণ নির্ণীত হইয়া উহার প্রতিকারের ব্যবস্থা সহজ হইয়াছে। ধাতু, রবার প্রভৃতির পাত বা কাগজের পুরুত্বের সমতা রক্ষা এখন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সহায়তায় সহজে করা যায়। এই ভাবে বিভিন্ন শিল্পে এখনই ইহার যথেষ্ট প্রসার লাভ ঘটিয়াছে।

জাতির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন শক্তির। এই পর্যন্ত কয়লা এবং খনিজ তৈল (পেট্রোলিয়াম) হইতেই এই শক্তি আহৃত হইয়া আসিয়াছে এবং তাহার ফলে পৃথিবীতে সঞ্চিত কয়লা এবং খনিজ তৈলের অদূর ভবিষ্যতে নিঃশেষিত হইবার সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে। কিন্তু তেজস্ক্রিয় পদার্থের সাহায্যে পারমাণবিক শক্তির অফুরন্ত উৎস আজ মানুষ স্বীয় অধিকারে আনিয়াছে। এখন পৃথিবীর সঞ্চিত কয়লা ও খনিজ তৈল নিঃশেষিত হইলেও দুর্ভাবনার কোনও কারণ নাই। এই অফুরন্ত পারমাণবিক শক্তি এখন কল-কারখানা চালাইতে এবং পথ ও গৃহ আলোকিত করিতে পারিবে। পাশ্চাত্য দেশে এখনই স্থানে স্থানে "অ্যাটমিক পাওয়ার প্ল্যান্ট" স্থাপন করিয়া পারমাণবিক শক্তি

হইতে তাপ ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

নানাবিধ তাত্ত্বিক রহস্য সমাধানেও তেজস্ক্রিয় পদার্থের যথেষ্ট অবদান আছে। এখন তেজস্ক্রিয় কার্বনের পরিমাপ হইতে প্রত্নতাত্ত্বিক বয়সকাল নিরূপণ সহজ হইয়াছে। পৃথিবীর বয়স সম্বন্ধে সঠিক অনুমান এতদিন কঠিন ছিল। এখন পিচব্লেণ্ড, ইউরেনাইট প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরীক্ষা হইতে পৃথিবীর বয়স সম্বন্ধে অনুমান অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এই সকল পদার্থে রেডিওজেনিক সীসা এবং অপরিবর্তিত ইউরেনিয়াম অথবা থোরিয়াম ধাতুর পরিমাণ হইতে পৃথিবীর বয়স নির্ণয়ের সূত্র মিলিয়াছে। এইরূপ পরীক্ষার ভিত্তিতে পৃথিবীর বয়স প্রায় ৩৩৫ কোটি বৎসর হওয়া সম্ভব বলিয়া বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

পরমাণুর গঠনপ্রণালীর রহস্য উদ্‌ঘাটনেও তেজস্ক্রিয়তার যথেষ্ট অবদান আছে। পরমাণুর মধ্যে সমগ্র ধনাত্মক তড়িতাধান কিরূপে অবস্থান করিতেছে, সে বিষয়ে রাদারফোর্ড এবং জে. জে. টমসনের মধ্যে মতানৈক্য ছিল। টমসন মনে করিতেন যে, পরমাণুর ধনাত্মক তড়িতাধান সমগ্র পরমাণুর ভিতরেই সমভাবে বণ্টিত; কিন্তু রাদারফোর্ডের মতে, পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে একটি অতি ক্ষুদ্র কেন্দ্রীনে উহার সমস্ত ধনাত্মক তড়িতাধান অবস্থান করে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে নির্গত রশ্মি লইয়া গবেষণাকালে এই মতানৈক্যের মীমাংসা হইয়াছে এবং উহার ফলে রাদারফোর্ডের মতই সমর্থিত হইয়াছে।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের সাহায্যে মানুষ আজ প্রকৃতিকে পদানত করিতে চলিয়াছে। অপরিমেয় শক্তির উৎস তাহার হাতে আসিয়াছে। তেজস্ক্রিয় পদার্থের সাহায্যে আজ সে কৃষি ও শিল্পে বিপ্লবাত্মক উন্নতি সাধন করিতে অগ্রসর হইয়াছে। ব্যাধির আক্রমণ উপেক্ষা করিতেছে। মানব-কল্যাণকর এই তেজস্ক্রিয় পদার্থের মধ্যে আবার ধ্বংসের প্রচণ্ড বীজও নিহিত আছে। মানুষের দানবীয় প্রবৃত্তির ফলে ইহা যখন অ্যাটম-বোমা, হাইড্রোজেন বোমা রূপে আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাহার প্রলয়ঙ্করী সংহার মূর্তির কল্পনা করিতেও শরীর শিহরিয়া ওঠে।

এই সকল পারমাণবিক এবং থার্মো-নিউক্লিয়ার বোমা বিভিন্ন-রূপে ধ্বংসের কাজ করিয়া থাকে। প্রথমতঃ, ইহাদের বিস্ফোরণের ফলে যে প্রচণ্ড উত্তাপের সৃষ্টি হয় তাহা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল এককালে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে; দ্বিতীয়তঃ, ইহাদের তাপমাত্রা হঠাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রবল বায়ুচাপের সৃষ্টি হয় এবং তহার ফলে বাড়ী-ঘর, ইমারত প্রভৃতি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। অতঃপর ইহাদের মধ্য হইতে নির্গত তেজস্ক্রিয় কণাসমূহ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় এবং তাহা হইতে নির্গত তেজস্ক্রিয় রশ্মি, পূর্বোক্ত বিপদ হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত জীবসমূহের ধ্বংস সাধন করে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে নির্গত গামা-রশ্মি শরীরের সমস্ত রক্তকোষ ধ্বংস করিয়া ফেলে এবং তাহার ফলে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় মানুষের মৃত্যুবরণ করিতে হয়।

শুভ লক্ষণ এই যে, হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে ইহার ধ্বংসলীলার অভিজ্ঞতা মানবসমাজকে যথেষ্ট সতর্ক করিয়াছে। ইহার ধ্বংসাত্মক ব্যবহার নিরোধকল্পে পৃথিবীময় আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। এই পরম সম্পদ যাহাতে একমাত্র মানুষের কল্যাণ সাধনেই নিয়োজিত হয়, তাহার জন্যই সকল দেশের শান্তিকামী জনসাধারণ আজ ধ্বনি তুলিয়াছে।

বিজ্ঞান সংবাদ

নকল কিড্‌নী

শিকাগোর মেডিক্যাল সোসাইটির এক সভায় ডাঃ কল্‌ফ্‌ প্রকাশ করেন যে, অতি অল্প ব্যয়ে ক্ষুদ্রকায় কৃত্রিম কিড্‌নী নির্মাণ করা সম্ভব হইয়াছে। প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করিয়া পরে সেগুলিকে ফেলিয়া দেওয়া যাইবে। পূর্বে বৃহদাকার কৃত্রিম কিড্‌নী নির্মিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ব্যবহার করিবার পক্ষে অনেক ঝঞ্ঝাট আছে; যেমন—উহা পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করিতে অনেক সময় অতিবাহিত হয় এবং কার্যক্ষেত্রে ব্যবহার করিবার সময় বহু প্রকার সাজসরঞ্জামও দরকার হয়। নূতন ধরণের ক্ষুদ্রকায় যন্ত্রটির ঐ সকল বিষয়ে অনেক সুবিধা আছে।

প্রায় এগারো গজ লম্বা একটি সেলোফিনের নলের দুই পাশে দুইটি ফাইবার গ্লাসের পর্দা সংযুক্ত করিয়া এই নকল কিড্‌নী প্রস্তুত করা হইয়াছে। ফাইবার ও সেলোফিনের নল একত্রে জড়াইয়া কুণ্ডলীর আকারে উহা একটি চার ইঞ্চি কৌটার মধ্যে সজ্জিত অবস্থায় অপর একটি বৃহত্তর পাত্রে সংরক্ষিত থাকে। এই অবস্থায় উহা জীবাণুশূন্য করিয়া প্রয়োজন মত ব্যবহার করিবার জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়।

রোগীর ধমনীর সহিত নকল কিড্‌নীর সেলোফিনের নলটি সংযোগ করিয়া দিলে উহার ভিতর দিয়া রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকে। নলের কুণ্ডলীটি একটি তরল দ্রাবণের ভিতর ডুবানো থাকে। পাম্পের সাহায্যে পাত্রস্থিত দ্রাবণ নিম্ন হইতে ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া পাত্রটির উপর দিক দিয়া বাহির হইয়া যায়। এই ভাবে একই দ্রাবণকে পুনঃপুনঃ নিম্নদিক হইতে সঞ্চালিত করা হয়।

রক্তের মধ্যস্থিত বিষাক্ত পদার্থ সেলোফিনের নলের চতুষ্পার্শ্ব দিয়া চুয়াইয়া বাহির হইয়া আসে এবং দ্রাবণের মাধ্যমে অপসারিত হইয়া যায়। রোগীর একটি শিরার মধ্য দিয়া শোধিত রক্ত আবার রোগীর দেহে সঞ্চালিত করা হয়।

এই প্রক্রিয়াকে ডায়ালিসিস বলে। কিড্‌নীর কার্যকারিতা হঠাৎ বন্ধ হইবার ফলে অনেক সময় রোগী মরণাপন্ন হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় উপরিউক্ত নকল কিড্‌নীর সাহায্যে বহু রোগীর জীবন রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে।

মস্তিষ্ক-নিষ্কাশন প্রয়োগে উন্মাদ রোগ-উৎপাদক ঔষধের ক্রিয়া বন্ধ

এল. এস. ডি-২৫ নামক একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগে মানুষের মধ্যে উন্মাদ রোগের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। সম্প্রতি নিউ ইয়র্কের স্টেট হাসপাতালের বায়োলজিক্যাল লেবেরেটরীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, গরুর মস্তিষ্ক নিষ্কাশন করিয়া সেই পদার্থ প্রয়োগে উপরিউক্ত এল. এস. ডি-র কার্যকারিতা বন্ধ হইয়া যায়।

শ্যাম দেশীয় যোদ্ধা মাছ লইয়া এই পরীক্ষা করা হয়। চৌবাচ্চার জলে কিছু এল এস. ডি ২৫ ফেলিয়া দিলে মাছগুলির উপর ইহার ক্রিয়ার ফল পরিলক্ষিত হয়। ঔষধটি প্রয়োগের পনেরো মিনিট পরেই সমস্ত মাছ মাথা উপরের দিকে রাখিয়া খাড়াভাবে অবস্থান করিতে থাকে। কিন্তু গরুর মস্তিষ্কের নিষ্কাশন অতি সামান্য মাত্রায় প্রয়োগ করিবার পর অধিকাংশ মাছের ঐ অস্বাভাবিক অবস্থা কাটিয়া যাইতে দেখা যায়।

মস্তিষ্কের নিষ্কাশনের মধ্যে সেরোটোনিন নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ থাকে বলিয়া জানা

আছে। 'সেরোটোনিন হইল দেহের একটি অতি প্রয়োজনীয় শক্তিশালী রাসায়নিক পদার্থ। সম্ভবতঃ এই পদার্থটি এল. এস. ডি-র কার্যকারিতা বন্ধ করিয়া দেয়, এই বিশ্বাসে সরাসরি সেরোটোনিন ব্যবহার করা হয়। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, কেবল মাত্র সেরোটোনিন প্রয়োগে মাছের এল. এস. ডি কর্তৃক উৎপন্ন ঐ অস্বাভাবিক অবস্থা দূর হয় না। মস্তিষ্ক-নিষ্কাশিত কোন্ পদার্থটি এল. এস. ডি-র প্রভাব দূর করে তাহা এখনও জানা যায় নাই।

এল. এস. ডি প্রয়োগে মানুষের মধ্যে যে উন্মাদ রোগের লক্ষণ দেখা যায়, মস্তিষ্ক-নিষ্কাশিত পদার্থটির দ্বারা তাহা বন্ধ করা যায় কি না, ইহাই হইবে বিজ্ঞানীদের ভবিষ্যৎ কার্যসূচী। এই সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগৃহীত হইলে মস্তিষ্ক বিকারের কারণ ও তাহা নিরাময় করিবার একটি পন্থা জানা যাইবে বলিয়া বিজ্ঞানীরা আশা করেন।

অতিকম্পশীল শব্দ-তরঙ্গের সাহায্যে রোগের টিকা প্রস্তুত

শিকাগো ইউনিভার্সিটির মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের ডাঃ বস্কো অতিকম্পনশীল শব্দ-তরঙ্গের সাহায্যে রোগ-উৎপাদক জীবাণুর কোষ-প্রাচীর ছিন্ন করিয়া ঐ রোগের টিকা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া এক খবরে প্রকাশ।

সেকেণ্ডে চার লক্ষ বার কম্পনশীল শব্দ-তরঙ্গ মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয়ের অনুভূতির বাহিরে; কিন্তু ঐ কম্পনের ফলে কালচার মিডিয়ামে অবস্থিত জীবাণুগুলির দৃঢ় কোষ-প্রাচীর ছিন্ন হইয়া উহা হইতে সাইটোপ্লাজম বাহির হইয়া পড়ে। এই প্রক্রিয়ার ফলে জীবাণুগুলি মরিয়া যায়, কিন্তু কোষগুলির রাসায়নিক গঠন অবিকৃত থাকিয়া যায়। কাজেই ইহা হইতে টিকা প্রস্তুত অল্প আয়াসসাধ্য।

২০০০ ভোল্ট ৮০০ ওয়াট কোয়ার্টজ ক্রিষ্ট্যাল জেনারেটরের সাহায্যে অতিকম্পনশীল শব্দ-তরঙ্গ উৎপন্ন করা হয়। এই উপায়ে কোষ-প্রাচীর অতি সহজে জীবাণুর দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। প্রচলিত উপায়ে জীবাণুর উপর অ্যাসিড ও অ্যালকোহল প্রয়োগ করিলে উহার রাসায়নিক গঠন পরিবর্তিত হয়।

ডাঃ বস্কো ইটালীতে সর্বপ্রথম অতিকম্পনশীল শব্দ-তরঙ্গ ব্যবহার করিয়া পরীক্ষামূলকভাবে কলেরা ও টাইফয়েডের মৃত জীবাণু সংগ্রহ করেন এবং ঐ গুলি জন্তুর দেহে ইনজেক্‌সন্ করিয়া টিকা প্রস্তুত করেন। মৃত জীবাণুগুলি জন্তুর দেহে প্রতিরোধী রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনের উত্তেজনা যোগায়। তার পর জন্তুটির রক্তের সিরাম সংগ্রহ করিয়া শোধন করিয়া লইলেই টিকা প্রস্তুত হইল।

উদরের শল্য-চিকিৎসায় স্নায়বিক রোগ নিরাময়

মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত ইণ্টারন্যাশন্যাল কলেজ অব সায়েন্সের এক সভায় ডাঃ রোজেনবার্গ বলেন যে, উদরে এক বিশেষ ধরণের অস্ত্রোপচারের দ্বারা স্নায়বিক রোগীকে সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করা সম্ভব। অনেক রোগীকে এই শল্য-চিকিৎসায় আরোগ্য করা হইতেছে।

চিকিৎসকদের ভাষায় এই শল্য-চিকিৎসাকে ডিউডেনোজেজুনোষ্টমি বলা হয়। প্রায় ২০ বৎসর পূর্বে এইরূপ চিকিৎসা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইত, কিন্তু বর্তমানে ইহার কোন ব্যবহার নাই। চিকিৎসাটি হইল ক্ষুদ্র অন্ত্রের দুই মুখ যোগ করিয়া একটি বিকল্প পথ নির্মাণ করিয়া দেওয়া। ক্ষুদ্র অন্ত্রের কোন অংশ সঙ্কুচিত হইবার ফলে যে বাধা সৃষ্টি করে এই সংযোগের দ্বারা তাহা দূরীভূত হয়। বমনেচ্ছা বা বমি হওয়া, অগ্নিমান্দ্য এবং পেটের যন্ত্রণা এই রোগের সাধারণ দৈহিক লক্ষণ। কিন্তু এক্স রে পরীক্ষায় অন্ত্রে কোন সঙ্কোচনের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। রোগীকে তখন স্নায়বিক রোগগ্রস্ত বলিয়া চিকিৎসকেরা হাল ছাড়িয়া দিয়া থাকেন। কিন্তু এই শল্য-চিকিৎসার পর রোগীকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে দেখা যায়।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

বিশ্বের সৃষ্টি-রহস্য

শ্রীপ্রদীপকুমার ঘোষ

গ্রহ, নক্ষত্র আর নীহারিকায় ভরা এই যে বিশ্ব তারও সৃষ্টির আগে ছিল আরও পুরাতন আর এক বিশ্বের অস্তিত্ব। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান আজও খুঁজে বের করতে পারে নি, কোন্ কারণে সেই বিশ্বের পতন ঘটেছিল; তবে এইটুকু ধারণা করা যায় যে, সেই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ ভেঙ্গে-চুরে একীকৃত হয়ে তৈরী করেছিল এক বিরাট পদার্থমণ্ড। সেই পদার্থমণ্ডের সঙ্কোচন চাপের ফলে ভয়ানকভাবে বেড়ে গিয়েছিল তার তাপমাত্রা আর ঘনত্ব। ঘনত্ব যখন চরমে পৌঁছলো তখন আরো সঙ্কোচন হলো অসম্ভব এবং আগের বিরাট সঙ্কোচনের প্রতিক্রিয়া রূপে দেখা দিল বিরাট এক প্রসারণ। আইনষ্টাইনের সমীকরণ অনুযায়ী—

[শক্তি] = [ভর] × [আলোকের গতি]²

আলোকের গতি স্থিরাঙ্ক। কাজেই প্রত্যেক শক্তির সঙ্গেই জড়িত রয়েছে সমতুল্য ভর। প্রতি একক আয়তনে ভরের পরিমাণই ঘনত্বের মাপ। সুতরাং আইনষ্টাইনের সমীকরণ থেকে বোঝা যায় যে, যে কোন শক্তিরই নির্দিষ্ট একটা ঘনত্ব রয়েছে। আগেই দেখেছি যে, সঙ্কোচনের ফলে তাপমাত্রা ভয়ানকভাবে বেড়ে গিয়েছিল। তার ফলে সুরু হয়েছিল বিপুল শক্তি বিকিরণ। কিরণচ্ছটা বিচ্ছুরণকারী সেই শক্তির তেজ ছিল প্রচণ্ড। স্বাভাবিকভাবেই সেই বিকিরিত শক্তির সঙ্গে যে সমতুল্য ঘনত্ব জড়িত ছিল তার মান ছিল অত্যন্ত বেশী এবং সেই তুলনায় সাধারণ পদার্থের ঘনত্বের মান ছিল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ফলে পদার্থের মণ্ডের নিউটনীয় মাধ্যাকর্ষণের শক্তি হয়ে পড়লো নিতান্তই অকেজো এবং পদার্থের প্রসরণ এবং শক্তির বিকিরণের আর কোন বাধা রইলো না। সেই বিরাট প্রসরণের প্রারম্ভেই তাপমাত্রা যখন খুব তাড়াতাড়ি কমতে আরম্ভ করলো তখনই পদার্থের মধ্য থেকে ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন মিলে তৈরী করতে লাগলো বিভিন্ন জটিলতার পরমাণু এবং বিশেষ করে হাইড্রোজেন আর হিলিয়ামের কেন্দ্রীন। এই বিরাট পারমাণবিক সংঘটনে সময় লেগেছিল ঘণ্টাখানেক মাত্র। পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তাপমাত্রা ছিল ১,০০০,০০০,০০০° সেণ্টিগ্রেডের কাছাকাছি এবং ঘনত্ব ছিল অত্যন্ত কম—অনেকটা পৃথিবীর উচ্চ বায়ুমণ্ডলের ঘনত্বের মত। এর পাশে চলছিল উচ্চশক্তির গামারশ্মির বিকিরণ। প্রসারণ চলতে লাগলো, আর সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা নামতে সুরু করলো ধীরে ধীরে।

তাপমাত্রা যখন কমে কোটি কোটি ডিগ্রী থেকে কয়েক হাজার ডিগ্রীতে এসে পৌঁছলো, তখন যে সব মৌলিক পদার্থের গলনাঙ্ক খুব বেশী সেগুলি ঘনীভূত হয়ে সেই প্রসরণশীল হাইড্রোজেন আর হিলিয়ামের অনন্ত মহাসমুদ্রে ভেসে বেড়াতে লাগলো। তখন থেকে চিরকালই যদি এই রকম চলতো তবে বর্তমান বিশ্বে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র আর নীহারিকার দল থাকতো না, শুধু প্রতি লক্ষ লক্ষ ঘনকিলোমিটারে পাওয়া যেত অল্প কিছু হাইড্রোজেন, হিলিয়াম গ্যাস আর মাত্র কয়েক মিলিগ্র্যাম ধূলিকণারূপে ভারী পরমাণু। কিন্তু তা হওয়ার নয়—বিশ্বের ভবিষ্যৎ লেখা হয়েছিল হয়তো অন্য রঙের তুলিকায়।

মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে জ্যোতির্বিজ্ঞানী জীন্স্ দেখিয়েছেন যে, কোন সীমাহীন গ্যাসরাশি যদি মাধ্যাকর্ষণের আওতায় থাকে তবে তা স্বাভাবিকভাবেই হবে অস্থায়ী এবং সেই সীমাহীন

গ্যাসরাশি অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবেই। সেই বিভক্ত গ্যাসীয় গোলকসমূহের ব্যাস এবং ঘনত্ব নির্ভর করবে, প্রসরণের কোন্ অবস্থায় তাদের বিভাজন ঘটেছে—তার উপর। আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলেও এইরকম ঘনীভবন হওয়া স্বাভাবিক। তবে তা স্থায়ী হয়ে আমাদের বায়ুমণ্ডলকে ভাগে ভাগে বিভক্ত করে দেয় না; কারণ আমাদের বায়ুমণ্ডল বেশী পুরু নয়; কাজেই মাধ্যাকর্ষণের শক্তি অত্যন্ত দুর্বল। এই সব বিভক্ত গ্যাসীয় গোলকের স্থায়িত্ব নির্ভর করে তাদের পৃষ্ঠের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উপর; যদি তা গ্যাসীয় অণুর তাপীয় গতি অপেক্ষা বেশী হয় তবেই তা স্থায়ী হবে, অন্যথা নয়।

কিন্তু বিশ্বসৃষ্টির সেই পর্যায়ে সেই বিপুল গ্যাসরাশির এই রকমের কোন অসুবিধা ছিল না। সেখানে মাধ্যাকর্ষণের শক্তিও ছিল প্রচুর এবং ফলে বিভক্ত গ্যাসীয় গোলকসমূহের আবার পরস্পর মিশে গিয়ে একাকার হয়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কাজেই সেই প্রসরণশীল বিপুল গ্যাসরাশি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর গ্যাসীয় গোলকে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পরেই তাদের মধ্যাবকাশের অবস্থা হলো প্রায় বায়ুশূন্য। এই গোলকসমূহের সর্বনিম্ন ভর বের করবার জন্যে জীন্‌সের সমীকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে।

$$[\text{সর্বনিম্ন ভর}] = ৩\cdot৯ \times ১০^{২২} \sqrt{\frac{(\text{তাপমাত্রা})^{৩}}{[\text{ঘনত্ব}]}}\ \text{গ্র্যাম}$$

উপরের সমীকরণে সংখ্যাসূচক মান বসিয়ে দেখা যায়—সর্বনিম্ন ভরের মান $১০^{৪০}$ গ্র্যামের কাছাকাছি যায়, যা নাকি আমাদের সূর্যের ওজনের চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বেশী এবং নীহারিকাগুলির ওজনের প্রায় সমান। আমরা যে নীহারিকায় বাস করি তার ওজন প্রায় $৩\cdot২ \times ১০^{৪৪}$ গ্র্যাম, যা সর্বনিম্ন ভরের চেয়ে অনেক বেশী। এই তারতম্যের সামঞ্জস্য খুব সহজভাবেই খুঁজে পাওয়া যায় যখন দেখা যায় যে, উপরের সমীকরণে সর্বনিম্ন ভর পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই কার্যক্ষেত্রে ভর তার অনেক বেশীই হতে পারে। তাছাড়া জীন্‌সের সমীকরণ অতি সূক্ষ্মভাবে শুধু প্রসরণবিরত গ্যাসরাশির পক্ষেই প্রযোজ্য, যদিও এক্ষেত্রে প্রসরণশীল গ্যাসরাশির উপর সমীকরণটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

যদিও জীন্‌সের সমীকরণে সময়ের স্থান না থাকবার জন্যে গ্যাসীয় নীহারিকার ভর সময়ের উপর নির্ভর করে না, কিন্তু তাদের জ্যামিতিক আয়তন নির্ভর করে তার উপর, কখন তারা জন্মগ্রহণ করেছে। একথা জানা আছে যে, প্রসরণের সঙ্গে সঙ্গেই গড় ঘনত্ব কমে আসছে। প্রসরণের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে ঘনতা ছিল অভাবনীয় বেশী, আজকে গড় ঘনত্ব এসে দাঁড়িয়েছে $\frac{১}{১০^{২৪}}$-তে বা $১০^{-২৪}$ গ্র্যামেরও কম প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে। কাজেই প্রসরণের অপেক্ষাকৃত প্রাথমিক পর্যায়ে সীমাহীন গ্যাসরাশি থেকে যে সব গ্যাসীয় নীহারিকা জন্মগ্রহণ করেছিল তাদের আয়তন স্বাভাবিকভাবেই হবে খুব কম। কারণ গড় ঘনত্ব তখন বেশী ছিল এবং প্রসরণের অপেক্ষাকৃত পরবর্তী পর্যায়ে যাদের জন্ম হয়েছে তাদের ঘনত্ব হবে কম; কাজেই আয়তন হবে বেশী। কিন্তু আজ পর্যন্ত উচ্চশক্তির দূরবীক্ষণের সাহায্যে যেসব তথ্যাদি পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায়—বিশ্বের প্রায় ১০,০০০,০০০,০০০টি নীহারিকার মধ্যে বেশীর ভাগেরই আয়তন প্রায় আশ্চর্য রকম সমান এবং তাদের গড় ব্যাস হলো ২৫ কিলোপারসেক বা $৭\cdot৫ \times ১০^{২২}$ সেন্টিমিটার বা ৮২৫০০ আলোক-বর্ষ। অর্থাৎ এথেকে আমরা স্থির সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, সৃষ্টি এবং প্রসরণের যে পর্যায়েই হোক না কেন, যাবতীয় নীহারিকাই জন্মগ্রহণ করেছে প্রায় একই সময়ে। কোন্ সময়ে গ্যাসীয় নীহারিকার দল জন্মগ্রহণ করেছে তা সহজেই বের করা যেতে পারে যদি ধরে নেওয়া যায় যে, গ্যাসীয় নীহারিকার জন্ম হওয়ার পর থেকে তাদের গড় ঘনত্ব স্থিরই

রয়েছে, কেবল প্রসরণের ফলে আন্তর্নৈহারিক দূরত্বই বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন। যেহেতু একথা জানা আছে যে, কোন দুটি প্রতিবেশী নীহারিকার পারস্পরিক দূরত্ব তাদের গড় ব্যাসের প্রায় ১০০ গুণ বেশী, সেহেতু স্বভাবতঃই আশা করা যায় যে, আকাঙ্খিত সময়টা বর্তমান বিশ্বের বয়সের একশতাংশ মাত্র। অর্থাৎ বিশ্বের বয়সকে যদি ৩×১০^{৯} বছর ধরে নেওয়া হয় তবে সেই তারিখ দাঁড়াবে $৩\times১০^{৯}\div১০০=৩\times১০^{৭}$ বছর যখন পৃথিবীর বয়স।

সেই সময়কার প্রসরণশীল বিশ্বে পদার্থের ঘনত্ব ছিল আজকের নীহারিকাগুলির গড় ঘনত্বের সমান; অর্থাৎ ৫×১০^{-২৩} গ্র্যাম প্রতি ঘন সেন্টিমিটারের কাছাকাছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে—

$$[\text{তাপমাত্রা}]=\left[\frac{১\cdot৫\times১০^{১০}}{\sqrt{(\text{সময়})}}-২৭৩\right]^{\circ}\text{ সেন্টিগ্রেড}$$

সমীকরণের সাহায্যে বুঝা যায়, বিশ্বের সৃষ্টি এবং প্রসরণ সুরু হওয়ার ৩×১০^{৭} বছর, অর্থাৎ $৩\times১০^{৭}\times৩৬৫\times২৪\times৬০\times৬০$ সেকেণ্ড পরে তাপমাত্রা ছিল প্রায় ২৭° সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি। এই তাপমাত্রায় কিরণচ্ছটা বিচ্ছুরণকারী শক্তিরও ঘনত্ব দাঁড়ায় প্রতি ঘনসন্টিমিটারে $১০^{-২৮}$ গ্র্যামের কাছাকাছি। কাজেই বোঝা যাচ্ছে কিরণচ্ছটা-বিসারী শক্তির ঘনত্ব যখন সাধারণ পদার্থের ঘনত্ব থেকে ধীরে ধীরে কমে গেল, তখনই পদার্থের মধ্যে নিউটনীয় মাধ্যাকর্ষণ পেল শ্রেষ্ঠতরের সম্মান। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ফলে জীন্সের সমীকরণ অনুযায়ী ভেঙে পড়লো সেই অবিচ্ছিন্ন গ্যাসরাশি অসংখ্য গ্যাসীয় নীহারিকায়। বিশ্বের বিবর্তনের ইতিহাসে আর এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হলো।

কোন অবিচ্ছিন্ন পদার্থ যখন ভেঙে যায় ভয়ানকভাবে, তখন তার ব্যবহারযোগ্য শক্তির আধাআধি শক্তি বিভক্ত অংশগুলিকে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়; আর প্রায় আধাআধি শক্তি থেকে বিভক্ত অংশগুলিতে দেখা দেয় আবর্তনকারী কৌণিক গতি। কাজেই সেই বিশাল গ্যাসীয় নীহারিকাগুলি যখন জন্মগ্রহণ করলো বিশালতর অবিচ্ছিন্ন গ্যাসরাশি থেকে তখন সেই সব সদ্যোজাত গ্যাসীয় নীহারিকার দল ছুটে চললো পরস্পরের কাছ থেকে ভীষণ গতিতে এবং সঙ্গে নিয়ে চললো বিরাট আবর্তনকারী কৌণিক গতি। যেখানে বিশাল বিশাল দেহ নিয়ে গ্যাসীয় নীহারিকাগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেখানে নীহারিকার মধ্যে গ্যাসরাশির প্রবাহ কখনও শান্ত বা মৃদুপ্রবাহী থাকতে পারে না। প্রথমতঃ, যে সব গ্যাসরাশি নীহারিকার কেন্দ্র থেকে বেশ দূরে রয়েছে তাদের কৌণিক গতি কেন্দ্রের অপেক্ষাকৃত কাছের গ্যাসরাশির কৌণিক গতি অপেক্ষা অনেক কম। দ্বিতীয়তঃ, বৃটিশ পদার্থবিদ্ অসবোর্ণ রেনল্ডস্ দেখিয়েছেন যে, কোন প্রবহণক্ষম পদার্থের গতি যখন একটা নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে যায়, তখন প্রবাহের সহজ সরল গতি পরিণত হয় বিক্ষুব্ধ ঘূর্ণন গতিতে।

সাধারণ কোন তরল পদার্থের ঘূর্ণী আর গ্যাসীয় পদার্থের ঘূর্ণীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। গ্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম হলো—সঙ্কোচনশীলতা। সেজন্যে গ্যাসের মধ্যে ঘূর্ণীর সৃষ্টি হলেই গ্যাসীয় অণুর মধ্যে অনবরত বিশৃঙ্খলভাবে সংঘাত সুরু হবে; যার ফলে অবধারিতভাবে দেখা দেবে স্থানীয় সঙ্কোচন। এই সঙ্কোচনের শক্তি ভয়ানকরূপে বেড়ে যায় যদি প্রবাহের গতি সেই পদার্থের ভিতর দিয়ে শব্দের গতির চেয়ে বেশী হয়। কোন পদার্থে শব্দের গতি সেই পদার্থের অণুর তাপীয় গতির সমান। আগেই দেখেছি, গ্যাসীয় নীহারিকার মধ্যে গ্যাস-প্রবাহের গতি অণুর তাপীয় গতির প্রায় দশ গুণ, অর্থাৎ শব্দের গতিরও দশ গুণ—অর্থাৎ স্থানীয় সঙ্কোচন প্রায় মাত্রা ছাড়িয়ে চলে যেতে চাইবে গ্যাসীয় নীহারিকার ভিতরে।

যদি সেই গ্যাসরাশির মধ্যে কোন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি না থাকতো তবে সে সব স্থানীয় সঙ্কোচন হতো

অস্থায়ী, কিন্তু নিউটনীয় মাধ্যাকর্ষণ থাকবার দরুণ তা হওয়ার উপায় নেই। ফলে গ্যাসীয় নীহারিকা-গুলিতে দেখা দিল এই রকম স্থানীয় সঙ্কোচন। সঙ্কোচনের ফলে বাড়তে সুরু করলো সেই সঙ্কুচিত গ্যাসমণ্ডলগুলির উত্তাপ। উত্তাপ বেড়েই চললো, সুরু হয়ে গেল উত্তাপ-তরঙ্গ বিকিরণ। তাপমাত্রা আরও বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল আলোক-তরঙ্গমালা। বিশ্ব অন্ধকারে ভরা ছিল এতদিন, এইবার দেখা দিল প্রথম আলোক রশ্মি, ঘুচিয়ে দিল লক্ষ লক্ষ বছরের অন্ধকারের শেষ বিন্দুটুকু। আরও সঙ্কোচন, আরও উত্তাপ, আরও আলোক। তাপমাত্রা যখন কেন্দ্রীন সংঘটন প্রতিক্রিয়ার সর্বনিম্ন মাত্রা অতিক্রম করলো তখনই সুরু হয়ে গেল কেন্দ্রীনের রূপান্তর আর প্রচণ্ড শক্তির বিকিরণ। জ্বলে উঠলো এই রকম লক্ষ লক্ষ সঙ্কুচিত গ্যাসরাশি হাজার হাজার নীহারিকার মধ্যে। অনন্ত দূরত্ব থেকে যদি কেউ দেখতো তবে দেখতে পেত, ঘোর অন্ধকারের মধ্য থেকে আস্তে আস্তে ঝিলমিল করে উঠতে সুরু করেছে কোটি কোটি নক্ষত্র—আর এরই সঙ্গে জন্মগ্রহণ করলো আর একটি নক্ষত্র—নাম তার সূর্য।

ছায়াপথ নামে নীহারিকায় আমাদের সূর্যের জন্ম হলো নীহারিকার কেন্দ্র থেকে ২৭০৬০ আলোক-বর্ষ দূরে। পৃথিবীকে খবর দিতে ছুটে চললো তক্ষুনি আলোক-তরঙ্গ। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব মাত্র ৯২৯৬০০০০ মাইল। আলোক-তরঙ্গ সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল ছুটে কয়েক মিনিটে খবর নিয়ে এলো পৃথিবীতে। রক্তিম সূর্য জন্মের প্রথম শুভক্ষণে পূর্বদিগন্তে দেখা দিল, পূণ্য লাভ করলো পৃথিবী, সার্থক হলো তার সূর্যস্নান, সার্থক হলো তার সৌর-শক্তির তপস্যা। রাত্রির তপস্যা আনলো নূতন দিন।

ভূমিকম্প কেন হয়?

শ্রীসুবিমল সিংহরায়

ভূমিকম্প কথাটির সঙ্গে একটা অজানা শঙ্কা ও ভীতি বিশেষভাবে জড়িত। কিন্তু ছোটখাটো কোন ভূমিকম্প থেকে যে তার আসল মারাত্মক রূপটির কল্পনা করা যায় না, সে কথা সত্য। দুপুর রাত্রে হঠাৎ সমস্ত সহর কেঁপে উঠলো, সহরবাসীর ঘুম ভেঙ্গে গেল, শিশুদের কান্না, বয়স্কদের অব্যক্ত আতঙ্ক আর বৃদ্ধদের চাঞ্চল্য সব মিলে রাত্রির গভীরতাকে আরও ভীতিপ্রদ করে তুললো। ভাবতেও যেন ভয় লাগে!

ভয় কি শুধু আজকের মানুষেরাই করে? অতীতের মানুষেরা শুধু যে ভয়ই পেত তা নয়, অবাক হয়ে যেত—আর ভাবতো কঠিন পাথরে গড়া এই পৃথিবী কেমন করে কাঁপে?

একদল লোক ভাবতো পৃথিবী আকাশকে নিয়ে বিরাট এক জলাধারে নিমজ্জিত—নীচে জল আর আকাশ পেরিয়ে আবার জল। এই জলে থাকতো এক অতিকায় জীব। মাটির নীচে যখন ওটা চলাফেরা করতো তখন পৃথিবী নড়ে উঠতো। তার ফলে হতো ভূমিকম্প।

গ্রীক পণ্ডিতেরা ভাবতেন, পৃথিবী ভাসছে জলে, আর সেই জলপৃষ্ঠের উঠা-নামার জন্যে পৃথিবী নড়তো। অ্যারিষ্টোটল কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাঁর মতে, ভূগর্ভস্থিত গহ্বরসমূহে যে বায়ু অথবা গ্যাস আবদ্ধ থাকতো তারা উন্মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে নিকটবর্তী অঞ্চলকে কাঁপিয়ে তুলতো।

এসব গেল পুরনো মতবাদ। বিজ্ঞান এগুলিকে মেনে নিতে চায় নি। তাই আধুনিক যুগের মানুষ ভূমিকম্পের কারণ হিসাবে পূর্বোক্ত ধারণাকে বিশ্বাস করতে পারে নি। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে যা জানতে পেরেছে তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান।

টেক্টনিক ভূমিকম্প—১৯০৬ খৃষ্টাব্দে হ্যারি ফিল্ডিং রেইড ক্যালিফোর্নিয়ার বিখ্যাত ভূমিকম্পের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছিলেন যে, ভূমিকম্পটি টেক্টনিক কোন কারণের জন্যেই হয়েছে। এ থেকেই তিনি ইলাষ্টিক রিবাউণ্ড করে। এই পীড়নের মাত্রা ক্রমশঃই বাড়তে থাকে। অবশেষে তার মাত্রাধিক্যে ফাটল দেখা দেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত শিলার উপর ন্যস্ত এই টান সম্পূর্ণ অথবা কিছু পরিমাণে মুক্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত শিলা নিজের স্থিতিস্থাপক পীড়নের ফলে প্রতিক্ষিপ্ত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ ভীষণ-ভাবে কেঁপে ওঠে। (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)

এরূপ ভূমিকম্পে ফাটলের পর শিলার সংস্র হওয়ার আগে অত্যধিক পরিমাণে স্থৈতিক শক্তির উদ্ভব হয়। ক্যালিফোর্ণিয়ার ভূমিকম্প থেকে এই শক্তির পরিমাণটা কিছুটা অনুমান করা যায়।

১নং চিত্র

স-স—সংস্ররেখা; কখগ—স্থিতিস্থাপক টানের সাহায্যে সংস্র-বলয় তৈরী হবার আগে শিলার উপর কোন একটি রেখার অবস্থান; ছভগ—কয়েক বছর পরে শিলার প্রভূত পরিবর্তনের ফলে ঐ রেখার পরিবর্তিত অবস্থান; ঙবগ—সংস্র বা চ্যুতির অব্যবহিত পূর্বে সেই রেখার অবস্থান; ঙচ, খগ—সংস্রের পর ঙবগ রেখাটির দুটি চ্যুত অংশ; গ—সংস্র বলয়ের বাইরে একটি স্থির বিন্দু।

মতবাদের প্রবর্তন করেন। মতবাদটি সংক্ষেপে হচ্ছে—প্রাকৃতিক কারণে শিলাসমূহের উপরে স্থিতি-স্থাপক টান ন্যস্ত হয়। কিন্তু এই টানের একটা নির্দিষ্ট পরিমাপ আছে। ঐ নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করলেই শিলায় ফাটল ধরে। উপরিউক্ত কারণ-গুলির মধ্যে সাধারণতঃ হঠাৎ কোন বিদারণ অথবা ভূত্বকের ধীর স্থানচ্যুতিই প্রধান। এই স্থানচ্যুতি ভূত্বকের কোন না কোন স্থানে পীড়নের উদ্ভব ঐ ভূমিকম্পে ১৩০ × $১০^{১৫}$ ফুট পাউণ্ড পরিমাণ স্থৈতিক শক্তি উৎপন্ন হয়েছিল।

অগ্ন্যুৎপাত সঞ্জাত ভূমিকম্প—জাপানে ভূমিকম্পের কারণ অনুসন্ধান করবার সময় অধ্যাপক জন মিলনে এবং ওমরি দেখালেন যে, আগ্নেয়গিরির সঙ্গে ভূমিকম্প বিশেষভাবে জড়িত। এর কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, ভূত্বকের নীচের শিলা অত্যধিক তাপ ও চাপের ফলে গলিত অবস্থায় থাকে।

সমুদ্রজল যদি কোন কারণে ঐ উত্তপ্ত গলিত শিলার মধ্যে গিয়ে পড়ে তাহলে গলিত লাভা জলীয় বাষ্প ও অন্যান্য উত্তপ্ত গ্যাসের সঙ্গে ভীষণবেগে পৃথিবীপৃষ্ঠে উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে। একে অগ্ন্যুৎপাত বলে। এই অগ্ন্যুৎপাতের পিছনে যে শক্তি থাকে তা থেকেই হয় ভূমিকম্প। সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে এবং সমুদ্রতলদেশে ভূমিকম্পের আধিক্যকে এদিক দিয়ে বিচার করে দেখলে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। এরূপ ভূমিকম্প উপকেন্দ্রে ভীষণরূপ ধারণ করে, কিন্তু সেখান থেকে কিছু দূরে আর সেই প্রাবল্য থাকে না।

বড় বড় ভূমিকম্পগুলি উপরিউক্ত সাধারণতঃ দুটি কারণেই ঘটে থাকে। তবে কোন কোন ভূতাত্ত্বিক আরও কয়েকটি মতবাদ প্রচার করেছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দুটিই প্রধান।

ভূত্বকের সঙ্কোচন—আদিম পৃথিবীর চতুর্দিকেই ছিল গলিত শিলার বিস্তৃতি। পৃথিবীপৃষ্ঠ ধীরে ধীরে শীতল হয়ে ভূত্বকের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর এই তাপ হারানোর জন্যে এই ভূত্বক ক্রমশঃই সঙ্কুচিত হয়ে পর্বতশ্রেণীর সৃষ্টি করে অবশ্য এই সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অনেকে বলেন পৃথিবীর এই পবিবর্তনই ভূমিকম্পের কারণ। যদিও এই মতবাদের বিরুদ্ধে বলবার আছে অনেক, তবুও বহু ভূকম্পবিদ্ এই মতই পোষণ করেন যে, পৃথিবী-পৃষ্ঠের বর্তমান বিন্যাস এবং এর সঙ্গে জড়িত ভূমি-কম্পের কারণগুলির জন্যে ভূত্বকের অবিরাম সঙ্কোচন কিছু পরিমাণে দায়ী।

ক্ষয় ও অবক্ষেপন—ভূমণ্ডলকে আমরা খুব সুস্থিত বলেই মনে করি; কিন্তু আসলে তা নয়। আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে প্রকৃতি নানা ভাবে ভূত্বকের অবিরাম পরিবর্তন করে চলেছে। এই পরিবর্তন—ক্ষয় ও অবক্ষেপন অতঃপর সমস্থিতির দ্বারাই প্রধানতঃ সম্পন্ন হয়ে থাকে। এই পরি-বর্তনের ফলে ভূত্বকের শিলায় পীড়নের অসমতার সৃষ্টি হয় এবং শিলায় সংস্র বা চ্যুতি ঘটে। তারই ফলে ভূমিকম্প হতে পারে।

শিলায় যদি রেডিয়া সমন্বিত কোন তেজস্ক্রিয় খনিজ থাকে তাহলে সেটা প্রাকৃতিক নিয়মে অনবরত তাপ বিকিরণ করতে থাকে। কিন্তু সে তাপ ভূত্বকের আচ্ছাদন পেরিয়ে খুব তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না। জোলির মতে, পৃথিবীর আদিম তাপ ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতার কোন পরিবর্তন সাধন করতে সমর্থ হয় নি। কিন্তু তেজস্ক্রিয় পদার্থের তাপ বিচ্ছুরণের ফলে ভূত্বকের অভ্যন্তরে ক্রমে ক্রমে তাপ বেড়ে চলে। আগেই বলা হয়েছে যে, এই তাপ সহজে বেরিয়ে আসতে পারে না। তাই এমন একটা সময় উপস্থিত হয় যখন অভ্যন্তরের অত্যধিক উত্তাপে ভূত্বকের কিছুটা অংশ গলে যায় এবং ভূত্বক ক্রমশঃ পাতলা হতে থাকে। এই অবস্থায় ভূত্বক সহজেই বিদারিত হতে পারে এবং ভূমিকম্পের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করে তুলতে পারে।

এছাড়া ছোটখাটো ভূমিকম্পগুলিকে মেরুর অপসরণের জন্যে উদ্ভূত পীড়ন, সূর্যকলঙ্কের বিবর্তন এবং চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণের পরিবর্তন প্রভৃতির দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলতে পারে। তবে এসব কারণগুলিকে যুক্তি সহকারে পরীক্ষা করেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নি। তাই ভূমি-কম্পের প্রধান কারণগুলির তালিকায় এরা আজও অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

সঞ্চয়ন

কৃত্রিম মূত্রাশয়

কৃত্রিম মূত্রাশয় সম্বন্ধে সেভেরিন ডাউম লিখেছেন—১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে প্রাগের চার্লস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২নং চিকিৎসালয় সুইডেন থেকে একটা যন্ত্র পেয়েছিল, যার নাম হচ্ছে কৃত্রিম মূত্রাশয়। এটা প্রথম ব্যবহার করা হয় একজন রোগীর জন্যে, যার মূত্রাশয়ের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। যদিও তার অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছিল এবং ডাক্তারদেরও ওই যন্ত্রটা তিন বার ব্যবহার করতে হয়েছিল, তবু শেষ পর্যন্ত সেটা সাফল্য লাভ করে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত প্রাগের বিভিন্ন হাসপাতালের ডাক্তারেরা ৩৬ বার ঐ রকম যান্ত্রিক মূত্রাশয় ব্যবহার করেছেন।

মূত্রাশয়ের সাধারণ ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে কৃত্রিম মূত্রাশয় ব্যবহার করা হয়। কারণ মূত্রাশয় সাময়িকভাবে বন্ধ হলেও তার ফলে শরীর বিষাক্ত হয়ে রোগীর মৃত্যু ঘটতে পারে। সে ক্ষেত্রে এই কৃত্রিম মূত্রাশয় শরীরের মধ্যে সঞ্চিত বিষাক্ত জিনিষ বের করে দেয় এবং রোগীর মূত্রাশয় যখন একদম কাজ করা বন্ধ করে তখন তাকে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, কৃত্রিম মূত্রাশয় তখনও কাজে আসে যখন শরীরের বিষাক্ত জিনিষের পরিমাণ বেশী হয়ে যায় এবং যখন সুস্থ মূত্রাশয় তা শরীর থেকে টেনে নিতে পারে না। এসব ক্ষেত্রে এই যন্ত্র রোগ সারাতে সাহায্য করে।

এই রকম যন্ত্র তৈরী করবার চেষ্টা চলছে ১৯১৩ সাল থেকে। আজকে ইচ্ছে করলে এই যন্ত্রটা ভাজ করে নিয়েও বেড়ানো যায়। যে ধরণের যন্ত্র প্রাগ ক্লিনিকে ব্যবহার করা হচ্ছে, তা দীর্ঘ গবেষণার পরে তৈরী করেছেন সুইডেনের লুণ্ড ক্লিনিকের পরিচালক ডোসেণ্ট আলওয়াল। ইউরোপের লুণ্ড, জুরিখ, ভিয়েনা, প্রাগ এবং আমেরিকা, ক্যানাডা আর অষ্ট্রেলিয়াতেও এই রকম যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে মার্কিন চিকিৎসকে ছাড়া সুইডেনের চিকিৎসাবিজ্ঞানী-দেরই এই যন্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সবচেয়ে বেশী।

এই কৃত্রিম যন্ত্র কিভাবে কাজ করে? রক্তশোধন করবার কাজে লাগাবার জন্যে এই যন্ত্রটাকে তৈরী করতে ২।৩ ঘণ্টা সময় লাগে। সাধারণ কলের জল আরও পাত্‌লা করবার জন্যে আর এক রকম জল ব্যবহার করা হয়। পাইপের সাহায্যে তা ৭০০ লিটারের ট্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত করবার পর সেটা অক্সিজেন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের দ্বারা পরিশোধিত করে ৩৮° সেন্টিগ্রেড তাপে রাখা হয়। কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ সহযোগে রোগীর রক্ত পরীক্ষা করে সেই অনুপাতে এতে কয়েকটি বিশেষ ধরণের লবণ মেশানো হয়। যে তরল পদার্থটা তৈরী হয় তাতে লবণের পরিমাণ থাকে রক্তের পরিমাণের সমান। রোগ অনুসারে এর মধ্যে এমন সব জিনিষ মেশানো হয় যা রোগীর শরীরে কম থাকে। এই তরল পদার্থটা কৃত্রিম মূত্রাশয় সংলগ্ন একটা সেলোফেন নলের সাহায্যে রক্ত-প্রবাহের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। রোগীর শরীর ও রক্তে যে দূষিত পদার্থ জমে, সেগুলি এই সেলোফেন নলের মধ্য দিয়ে তরল পদার্থের মধ্যে এসে মিশে যায়। রক্তে যে লবণের ভাগটা কম থাকে সেটা তরল পদার্থের মধ্য থেকে রক্তে এসে মেশে। প্রধানতঃ এটাই কৃত্রিম মূত্রাশয়ের কাজের আসল বনিয়াদ। তরল পদার্থটা টাট্‌কা অবস্থায় প্রত্যেক দু-ঘণ্টা পর পর ট্যাঙ্ক থেকে পাওয়া চাই। এই যন্ত্রের সবচেয়ে

গুরুত্বপুর্ণ অংশ হচ্ছে-সেলোফেনের নল। এটা এমনভাবে তৈরী থাকে যাতে বেশীর ভাগ রক্ত ওই তরল পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারে।

যন্ত্রটার ভিতর রক্ত প্রবেশ করে বাহুর ধমনী থেকে। তারপর পরিশোধিত হয়ে কনুইয়ের শিরা দিয়ে আবার সেই হাতেই ফিরে যায়। রোগীর অবস্থা বিবেচনা করে ডাক্তারেরা ৬ থেকে ১২ বার পর্যন্ত এই কৃত্রিম মূত্রাশয় ব্যবহার করেন। কোন কোন সময়ে এই চিকিৎসা পুরা একটা রাত স্থগিত রেখে আবার পরের দিন নতুন করে আরম্ভ করা হয়। ৪ থেকে ৬ ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর অবস্থার পরিবর্তন অনুভব করা যায়। এই ৬ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে রোগীর রক্ত ওই যন্ত্রটার মধ্য দিয়ে ১৫ বার প্রবাহিত হয়; কৃত্রিম মূত্রাশয়ের সাহায্যে এই রকম চিকিৎসার জন্যে সময় লাগে গড়ে প্রায় ২৬ থেকে ৩০ ঘণ্টা। রোগীর অবস্থা এবং যন্ত্রটার কাজের উপর অনবরত সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়; কারণ রোগী এবং যন্ত্র উভয়েরই কিছু গোলমাল হতে পারে। কাজেই সহকারী ডাক্তার এবং নার্সদের দিনরাত পাহারা দিতে হয়।

কৃত্রিম মূত্রাশয় ব্যবহার করবার ব্যাপারটি অত্যন্ত পরিশ্রমসাপেক্ষ এবং এর জন্যে লাগে রীতিমত বড় একটি ডাক্তার ও নার্সের দল। কৃত্রিম মূত্রাশয় ব্যবহার করে রোগীর প্রাণ বাঁচাবার সাফল্য নির্ভর করে প্রধানতঃ কঠিন আর সমবেত শ্রমের উপর।

জীবজন্তুর যক্ষ্মা রোগ

যক্ষ্মারোগের আক্রমণ হইতে মানুষ ও জীবজন্তু কেহই রক্ষা পায় না। অবশ্য বন্য পশুর মধ্যে যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব খুবই কম। কিন্তু উহারাই যখন গৃহে প্রতিপালিত হয় তখন অনায়াসেই এই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। আবার ঐ সকল গৃহপালিত জীবজন্তুর সংস্পর্শে আসিবার ফলে মানুষেরও এই রোগ হইবার আশঙ্কা থাকে।

এক মানুষ হইতে অপর মানুষে যেমন যক্ষ্মারোগ সংক্রামিত হয়, তেমনই এক পশু হইতে অপর পশুতেও উহা সংক্রামিত হইয়া থাকে। যক্ষ্মারোগাক্রান্ত মানুষ বা অপর পশুর সংস্পর্শে আসিলে বানরদের মধ্যে মহামারীরূপে এই রোগ দেখা দিতে পারে। এই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয় না, এইরূপ পশুর কথা জানা যায় না। অনেক পশুরই সহজে এই রোগ হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

যক্ষ্মারোগের আক্রমণ সম্পর্কে মানুষের যেমন ভয় আছে, পশুদের—বিশেষতঃ খাদ্য ও কৃষির প্রয়োজনে গৃহে প্রতিপালিত গরু, মহিষ এবং ভেড়ারও সেরূপ ভয় আছে। তথাপি এখন পর্যন্ত মানুষই এই রোগে বেশী আক্রান্ত হইতেছে। জীবজন্তুর মধ্যে বানর, গরু এবং মহিষ ছাড়াও বহু যক্ষ্মারোগাক্রান্ত শূকর ও হাতী দেখা যায়। পাখী, সরীসৃপ, কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া, হরিণ নীলগাই, পায়রা, টিয়া প্রভৃতিরও এই রোগ হইয়া থাকে। তবে উহাদের রোগ সম্পর্কে মানুষের ভাবনা খুব বেশী নয়।

দেখা গিয়াছে যে, খুব সহজেই বানরেরা যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হয়। বন্দী অবস্থায় উহাদের এই রোগ আরও তাড়াতাড়ি হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া সহরাঞ্চলের বানরের তুলনায় পল্লী ও বনাঞ্চলের বানরের মধ্যে যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব কম। বানর হইতে মানুষে এই রোগের প্রসারের সম্ভাবনা খুব বেশী না হইলেও দেশের কোন কোন অঞ্চলে বানরেরা দলবদ্ধভাবে লোকালয়ে হানা দেয় বলিয়া উহাদের সম্পর্কেও সতর্ক হওয়া উচিত।

স্থানবিশেষে কম-বেশী হইলেও ভারতের সর্বত্র যক্ষ্মারোগাক্রান্ত গবাদি পশু দেখা যায়। ভারতীয় পশু গবেষণা মন্দিরের হিসাবে দেখা যায়—

পাঞ্জাব ও বোম্বাই প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে গবাদি পশুর মধ্যে এই রোগ মহামারীরূপে ছড়াইয়া আছে এবং এই মারাত্মক রোগ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে ঐ সকল স্থানের রোগাক্রান্ত সমস্ত গবাদি পশু ধ্বংস করা বাঞ্ছনীয়। জবাই-করা গরু ও মহিষ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পাঞ্জাব ও বোম্বাইয়ে এই রোগ ব্যাপকভাবে এবং মাদ্রাজ, মহীশূর ও বাংলাদেশে কম হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ পালের একটি গরু বা মহিষের এই রোগ হইলে ধীরে ধীরে সমগ্র পালটি ইহার আক্রমণের নিকট নতি স্বীকার করে। রোগাক্রান্ত গরু বা মহিষের দুধ পান করিয়া মানুষেরও এই রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে আশার কথা এই যে, ভারতে দুধ ফুটাইয়া পান করা হয় বলিয়া পাশ্চাত্য দেশসমূহের তুলনায় গবাদি পশুর দুধের মাধ্যমে এদেশে কম লোক যক্ষ্মারোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়।

অধিকাংশ ভারতীয় মালিক এইরূপ বিশ্বাস করেন যে, ছাগল যক্ষ্মারোগ বিশেষভাবে প্রতিরোধ করিতে পারে এবং উহার দুধে মানুষের যক্ষ্মারোগ সারাইবার উপাদান রহিয়াছে। কিন্তু এই সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি এখনও পাওয়া যায় নাই। সময় সময় এইরূপও দেখা যায় যে, ছাগলের গায়ের ও মূত্রের গন্ধে যক্ষ্মারোগ সারিবে, এইরূপ বিশ্বাসের ফলে যক্ষ্মারোগীর ঘরে ছাগল বাঁধিয়া রাখা হয়। তবে দেখা যায় যে, উন্মুক্ত স্থানেই ছাগলের এই রোগ বেশী হইয়া থাকে এবং একবার ছাগলের পালে যক্ষ্মারোগ ঢুকিলে উহাকে নির্মূল করিয়া ছাড়ে।

বোম্বাইয়ের কষাইখানায় জবাই-করা শূকর পরীক্ষা করিয়াও এই রোগের ব্যাপক প্রসার দেখা গিয়াছে।

অধিকাংশ রোগাক্রান্ত কুকুর মরিবার পূর্বে উহাদের যে যক্ষ্মারোগ হইয়াছিল তাহা বুঝা যায় না। এই কারণে রোগাক্রান্ত কুকুর বিশেষ বিপজ্জনক। উহাদের আদর করিতে গিয়া অনেক লোক, বিশেষতঃ শিশুরা এই রোগের কবলে পতিত হয়।

কুকুরের তুলনায় বিড়ালের যক্ষ্মারোগ বেশী হইতে পারে। তবে এখনও উহাদের মধ্যে এই রোগ দেখা যায় না। তাহা ছাড়া, যে শ্রেণীর যক্ষ্মাবীজাণু মানুষের ক্ষতি করে, বিড়ালের তাহা প্রতিরোধের যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে।

এই সকল কারণে দেখা যাইতেছে—দেশে পশুপক্ষী, বিশেষতঃ গৃহপালিত জীবজন্তুর উন্নতি সাধন করিতে হইলে উহাদের যক্ষ্মারোগের আক্রমণ হইতে রক্ষার ব্যাপকতর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। শুধু উহাদের প্রয়োজনেই নয়, দেশবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষা ও অধিকতর খাদ্যবস্তু সরবরাহের জন্যও এইরূপ ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক।

আয়নমণ্ডল

শ্রীহারাণচন্দ্র চক্রবর্তী

আমাদের পৃথিবী বায়ুমণ্ডল দ্বারা পরিবেষ্টিত। জীবজন্তু, গাছপালা সবাইর পক্ষেই বায়ু অপরিহার্য। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে কতকগুলি স্তর আছে। ভূপৃষ্ঠ থেকে আট মাইল পর্যন্ত ঊর্ধ্বে বিস্তৃত স্তরকে বলা হয় ট্রপোস্ফিয়ার। এই স্তরে চাপ ও তাপের বৈষম্যের জন্যে বিভিন্ন প্রকারের বায়ু-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। ট্রপোস্ফিয়ারের উপরের স্তর হচ্ছে ষ্ট্র্যাটো-স্ফিয়ার। ট্রপোস্ফিয়ার আর ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের মধ্যে অবশ্য আরও একটি স্তর আছে। সেটি হলো টপোপোজ। ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার স্থির এবং শীতল। ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের উপরের স্তর হচ্ছে আয়নোস্ফিয়ার বা আয়নমণ্ডল। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল ঊর্ধ্বে এই স্তর অবস্থিত।

আয়নমণ্ডলই হলো বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে ঊর্ধ্বে বিস্তৃত সুবিশাল স্তর। এর আয়তন নিম্নস্তরের বায়ুমণ্ডলের আয়তন অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী। কিন্তু এর ভর নিম্নস্তরের বায়ুমণ্ডলের চেয়ে অনেক কম। সেজন্যে এই মণ্ডলের ঘনত্ব কম।

বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরের বায়ুর উষ্ণতা, আর্দ্রতা, গতিবেগ ইত্যাদি বিষয় সহজ পরীক্ষার সাহায্যেই জানা যেতে পারে। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশের কেন্দ্রস্থলেই আবহাওয়া-অফিস স্থাপিত হয়েছে। সেখান থেকে আবহাওয়া সম্বন্ধে পূর্বাভাস দেওয়া হয়।

বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে পরীক্ষা করা কষ্টকর এবং ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। কিন্তু তাই বলে বৈজ্ঞানিকেরা নিশ্চেষ্ট নন। তাঁরা ধৈর্য সহকারে পরীক্ষা করে চলেছেন। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, নিম্নস্তরের বায়ুর চেয়ে উচ্চ স্তরের বায়ুর অন্য কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। মেরুজ্যোতি, চুম্বক ঝড় প্রভৃতির জন্যে আয়নমণ্ডলই দায়ী। বেতার-তরঙ্গ আয়ন-মণ্ডলের দ্বারা প্রতিফলিত হয়। উচ্চস্তরে পরীক্ষা করে অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সূর্যের মধ্যে কি ঘটছে, পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কিছু জানা সম্ভব হয়েছে।

সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি উচ্চস্তরের অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি বায়বীয় পদার্থগুলির অণুকে পরমাণুতে পরিণত করে এবং পরমাণুগুলিকেও আয়নিত করে।

সূর্য থেকে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি কণিকা প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়। এসব কণিকা উচ্চস্তরের বায়ুমণ্ডলকে আয়নিত করে। তবে এদের গতি আলোর গতির চেয়ে অনেক কম। আয়নিকরণ বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রকমের হয়। সূর্যের অবস্থান, দিন ও রাত্রি এবং ঋতুভেদে আয়নিকরণের ব্যতিক্রম ঘটে।

আয়নিকরণ কি করে হয়? অতিবেগুনী রশ্মি এবং সূর্য থেকে নির্গত কণিকাগুলি বায়বীয় পদার্থের পরমাণুকে ভেঙ্গে ফেলে। তার ফলে ইলেকট্রন আর আয়নের সৃষ্টি হয়। পরমাণু সাধারণতঃ ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন দিয়ে গঠিত। প্রোটন ও নিউট্রনের ভর হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের প্রায় সমান। প্রোটন ও নিউট্রন পরমাণুর কেন্দ্রীনে থাকে, আর ইলেকট্রন কেন্দ্রীনের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। হাইড্রোজেন পরমাণুতে কিন্তু একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন আছে। প্রোটন এবং ইলেকট্রন 'একক' তড়িৎ-শক্তি বহন করে; প্রথমটি ধনাত্মক আর দ্বিতীয়টি ঋণাত্মক। ইলেকট্রনের ভর হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের $\frac{1}{1840}$ ভাগ মাত্র। নিউট্রনের কোন তড়িতাবেশ

নেই। প্রোটন আর ইলেকট্রন মিলে কিন্তু পরমাণুকে তড়িৎবিহীন করে।

যে ইলেকট্রনটি পরমাণুর কেন্দ্রীনের সবচেয়ে বাইরে ঘোরে, আয়নিত হওয়ার সময় সেটি বেরিয়ে যায়। ফলে পরমাণুর বাকী অংশটি ধনাত্মক তড়িৎশক্তি বহন করে। এই অংশটিকেই আয়ন বলা হয়। ইলেকট্রন ঘুরতে ঘুরতে ধনাত্মক তড়িৎ-শক্তি বহনকারী আয়নের কাছে এলে উভয়ে মিলে পুনরায় একটি পরমাণুতে পরিণত হয়। অতি-বেগুনী রশ্মির দ্বারা বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে পরমাণুগুলি একদিকে এরূপে ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং অন্য দিকে আবার আয়ন ও ইলেকট্রনের মিলন হচ্ছে।

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকার আসে না, আরও কিছুক্ষণ আলো থাকে। এই আলো কোথা থেকে আসে? পৃথিবীর যে অংশে আমরা বাস করি, সে অংশটি সূর্যাস্তের পর ছায়ার মধ্যে গেলেও সূর্য তখন পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরগুলিকে আলোকিত করে। বায়বীয় পদার্থের অণু এবং পরমাণুর সংস্পর্শে এসে সূর্যের আলো চারদিকে বিচ্ছুরিত হয়। এই বিচ্ছুরিত আলোর কিছু অংশ আমাদের কাছে আসে। এই সময়কে গোধূলি বলা হয়। ঊষাকালেও আমরা এভাবেই আলো পেয়ে থাকি।

পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, বায়ুমণ্ডলের প্রায় ১৮০ মাইল উর্ধ্বে যে স্তর আছে, সেই স্তরই বেশীর ভাগ আলো গোধূলির সময়ে আমাদের কাছে পাঠায়। এই আলোর ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য দেখে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের ঘনত্ব, চাপ ও তাপ মাপা যায়। বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরগুলি যে বেশ গরম তা প্রমাণিত হয়েছে। হিসাব করে দেখা গেছে যে, ১২৫ মাইল দূরে অবস্থিত স্তরের তাপ-মাত্রা প্রায় ৬০০° সেন্টিগ্রেড।

পৃথিবীর মেরু অঞ্চলে প্রায় ছয় মাস সূর্যের কিরণ পড়ে না। কিন্তু সেখানে অন্ধকার থাকে না। এক রকম আলো দেখতে পাওয়া যায়, যাকে বলে মেরুজ্যোতি। মেরুজ্যোতি কি করে হয়? পূর্বে বলা হয়েছে যে, সৌর কণিকাগুলি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে বায়বীয় পদার্থের পর-মাণুকে আয়নিত করে; আঘাতের ফলে পরমাণু-গুলি উত্তেজিত হয়। তার ফলে পরমাণু থেকে আলো নির্গত হয়। তাহলে তো পৃথিবীর সর্বত্রই এরূপ জ্যোতি দেখা যেত। কিন্তু তা হয় না। কেবল মেরু অঞ্চলেই এরূপ জ্যোতি দেখা যায়। তার কারণ হলো, পৃথিবী নিজে একটা বিরাট চুম্বক। চুম্বকের মেরু দুটি ভৌগলিক মেরু অঞ্চলের প্রায় নিকটেই অবস্থিত। পৃথিবী চুম্বকক্ষেত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত বলে সৌর কণিকাগুলি পৃথিবীর কাছে এলে মেরু অঞ্চলের দিকে আকৃষ্ট হয়। অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা সৌর কণিকাগুলি মেরু অঞ্চলেই পরিমাণে বেশী হয়। এসব কণিকা বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরের বায়বীয় পদার্থের পরমাণুগুলিকে আঘাত দিয়ে উত্তেজিত করে, যার ফলে নানারকম জ্যোতি দেখতে পাওয়া যায়।

কেমন করে মেরুজ্যোতির সৃষ্টি হয়, সে বিষয়ে নরওয়ে দেশের বার্কল্যাণ্ড নামে একজন বৈজ্ঞানিক তুলনামূলক পরীক্ষা করেন। পরীক্ষার জন্যে একটি ছোট গোলাকার লৌহপিণ্ড লওয়া হয়। পিণ্ডের চারদিকে এমন একটি পদার্থের প্রলেপ দেওয়া হয় যাতে ইলেকট্রনের আঘাতে সেই পদার্থ থেকে আলোক নির্গত হতে থাকে। তারপর পিণ্ডটিকে খুব কম ঘনত্বের বায়বীয় পদার্থে পূর্ণ একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে রেখে তার উপর ইলেকট্রন কণিকা ফেললে পিণ্ডের চারদিক থেকে সমানভাবে আলো নির্গত হয়। এখন এতে চুম্বকশক্তি প্রদান করলে দেখা যায় যে, এর মেরু অঞ্চল থেকে আলো বেরুচ্ছে।

সৌর কণিকাগুলি তড়িৎ-ধর্মী বলে নিজেরাও নিজেদের চারপাশে চুম্বকক্ষেত্র তৈরী করে। এসব কণিকা পৃথিবীর কাছে এলে পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্রে

ব্যতিক্রম ঘটায়। তার ফলে অদৃশ্য চুম্বক-ঝড়ের সৃষ্টি হয়। তবে মেরু অঞ্চলে প্রায়ই প্রবল চুম্বক-ঝড় হয়ে থাকে। চুম্বক-ঝড়ের প্রভাবে টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, এমন কি—অনেক সময় বেতার যন্ত্রে সংবাদ আদান-প্রদান অসম্ভব হয়ে ওঠে।

সূর্য একটি অতি বিরাট অগ্নিগোলক। আয়তনে পৃথিবীর চেয়ে ১,৩০০,০০০ গুণ বড়। হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম নামক বায়বীয় পদার্থগুলি এর মধ্যে আছে। সৌর-গোলকের উপরে মাঝে মাঝে কালো দাগ দেখতে পাওয়া যায়। এগুলিকে সৌর-কলঙ্ক বলা হয়। সূর্যের বাইরের দিকে উত্তাপ হলো প্রায় ৬০০০° সেন্টিগ্রেড। এই জ্বলন্ত অগ্নিগোলকের মধ্যে প্রায়ই প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। তার ফলে কয়েক স্থানে উত্তপ্ত বায়বীয় পদার্থগুলি প্রচণ্ড-বেগে ঊর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। বাইরে আসবার পর বায়বীয় পদার্থগুলি সম্প্রসারিত হয়ে পড়ে। আর ঐ সব স্থানের তাপমাত্রা প্রায় ৪৫০০° সেন্টিগ্রেডে নেমে যায়। কাজেই সূর্যের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এসব জায়গা থেকে কম আলো নির্গত হয়। সেজন্যে ওখানে কালো দাগ দেখা যায়। দাগের উৎপত্তি স্থান থেকে প্রচুর পরিমাণে অতিবেগুনী রশ্মি আর কণিকা নির্গত হয়। পৃথিবীর কাছে এলে অতিবেগুনী রশ্মি এবং কণিকাসমূহ মেরুজ্যোতি, আয়নমণ্ডল ও চুম্বক-ঝড়ের পরিবর্তন আনে। সৌরকলঙ্ক নানা আকারের হয়। বড় আকারের সৌরকলঙ্ক দেখা দিলে বেতারে সংবাদ আদান-প্রদান কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

প্রেরক যন্ত্র থেকে বেতার-তরঙ্গ উৎপন্ন হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পরে। পৃথিবীর পৃষ্ঠের উপর দিয়ে যে সব বেতার-তরঙ্গ যায় তারা ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে। পৃথিবীপৃষ্ঠের সমুদ্র, সমতল ভূমি, মরুভূমি, তুষারাবৃত অঞ্চল, বন প্রভৃতি প্রত্যেকের নিজস্ব বিভিন্ন বৈদ্যুতিক গুণাবলী অনুযায়ী বেতার-তরঙ্গের বিস্তারে বাধা দেয়। যে সব বেতার-তরঙ্গ উপরের দিকে যায় তারা আয়নমণ্ডলে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে আবার ফিরে আসে। আয়নমণ্ডল অদৃশ্য প্রতিফলকের মত কাজ করে। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত হয়ে বেতার-তরঙ্গ পুনরায় উপরে উঠে যায়, আবার সেখান থেকে নীচে ফিরে আসে। এভাবে আয়নমণ্ডল আর পৃথিবীপৃষ্ঠের মধ্যে প্রতি-ফলিত হয়ে বেতার-তরঙ্গ সারা পৃথিবী ঘুরে আসতে পারে। সেজন্যে গ্রাহক যন্ত্র বহুদূরের বেতার তরঙ্গ ধরতে পারে। আয়নমণ্ডলের দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এসে বেতার-তরঙ্গ গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ে। বেতার-তরঙ্গের গতি জানা আছে। যেতে এবং আসতে যে সময় লাগে তার অর্ধেক দিয়ে বেতার-তরঙ্গের গতিকে গুণ করলে আয়নমণ্ডলের উচ্চতা পাওয়া যাবে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ডিসেম্বর—১৯৫৭

দশম বর্ষ : ১২শ সংখ্যা
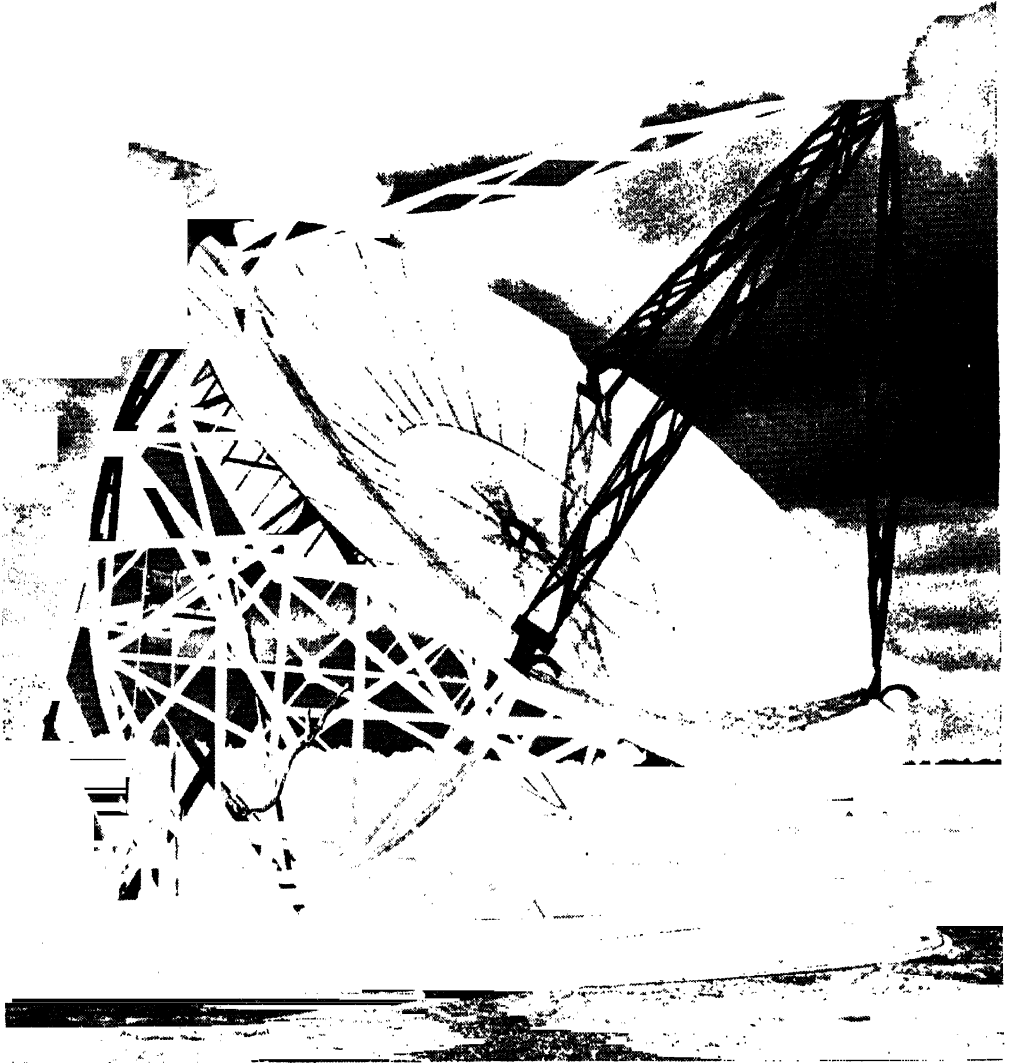
লিনয়েসে নির্মিত রেডিও-টেলিস্কোপ

ধ্বংসোন্মুখ জীবজগৎ

অনেক দিন আগে—লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি বছর আগে এক সময়ে পৃথিবীতে ছিল বিরাটকায় জীবজন্তু। তাদের অনেকেই ছিল এক ডজন হাতীর চাইতেও আয়তনে বড়। তারা বহুদিন পূর্বেই ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিদায় নিয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা তাদের এই অবলুপ্তির অনেক কারণই নির্দেশ করেছেন; কিন্তু তাদের এই অবলুপ্তিতে মানুষের কতখানি হাত ছিল তার কোন প্রমাণ তাঁরা দিতে পারেন নি। কারণ মানুষের নিজের ইতিহাসই আজ পর্যন্ত পঞ্চাশ লক্ষ বছরের উপরে জানা যায় নি। তবে এটা ঠিক যে, মানুষ তার প্রয়োজন, নির্বুদ্ধিতা আর নিষ্ঠুরতার জন্যে অন্যান্য বহু জন্তুজানোয়ার, মাছ, পাখী, সরীসৃপের উপরে এত অত্যাচার করেছে যে, বহু প্রাণীই—যারা পৃথিবীতে সেদিন পর্যন্তও ছিল, তারা শেষ হয়ে গেছে। পৃথিবীতে সে সব প্রাণী আর কোন দিন হবে না, থাকবে না, দেখা যাবে না।

মানুষের দেশ-বিদেশ আবিষ্কার, সফর এবং জয়ের ইতিহাস মাত্র কয়েক শত বছরের। এরই মধ্যে মানুষ জীবজগতের উপরে যে কি অত্যাচার করেছে তা অবর্ণনীয়। অষ্ট্রেলিয়ায় এক ধরণের পাখী ছিল, তার নাম ডোডো। সারা অষ্ট্রেলিয়ায় জুড়ে সে পাখী ছিল হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি। বিরাট ভূখণ্ড ছিল মনুষ্য-বসতিশূন্য, কেবল উত্তরাংশের জঙ্গলে ছিল সামান্য কিছু জংলী মানুষ, সভ্য মানুষেরা যাদের নাম দিয়েছে বুশম্যান। এমনি এক পরিবেশে তারা যুগযুগান্ত ধরে বসবাস করে ওড়বার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। ক্যাপ্টেন কুক অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করবার পর দলে দলে ইউরোপীয়েরা গিয়ে সেখানে বসবাসের সুযোগ খুঁজতে লাগলো, আর তাদের প্রথম খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতে লাগলো এই ডোডো পাখীগুলিকে। রাজহাঁসের মত সুবৃহৎ ডানাহীন পাখী নির্ভয়ে তাদের সামনে আসতো; যেহেতু তারা ইতিপূর্বে কোনদিন মানুষ দেখে নি। এই নিষ্ঠুর মানুষেরা লাঠির ঘায়ে তাদের হত্যা করতো। এমনি করে দু-তিন শ' বছরের মধ্যে শেষ হয়ে গেল সেই ডোডো পাখীর দল—লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি পাখী। বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়ার জঙ্গল, পাহাড় পর্বত খোঁজা হচ্ছে—যদি কোথাও দু-চারটা ডোডোর সন্ধান মেলে; কিন্তু এখনও তা পাওয়া যায় নি।

তেমনি আমেরিকায় গত তিন শ' বছরের ভিতরে আর একটি পাখীও শেষ হয়েছে। তার নাম Passenger Pegion, অর্থাৎ পথিক পারাবত। সে ছিল একটি সুন্দর বুনো পায়রা—সাধারণ পায়রার চাইতে আকারে প্রায় দ্বিগুণ। তাদের অপরাধের মধ্যে ছিল তারা মানুষের রসনার পক্ষে অতি সুস্বাদু, আর সংখ্যায় ছিল তারা অফুরন্ত। প্রথম যখন ইউরোপীয়েরা আমেরিকায় গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করতে লাগলো তখন তাদের

প্রতিদিনকার ভোজ্য তালিকার প্রধান অঙ্গ ছিল এই পায়রা। হাজার হাজার পাখীর ঝাঁকে দু-চারটা ছিটাগুলি ছাড়লেই পড়তো একরাশ পাখী। ভারী মজা ছিল ওদের। লক্ষ লক্ষ বেওয়ারিশ পায়রা শেষ হয়ে গেল শ'খানেক বছরের মধ্যে।

নিউজিল্যাণ্ডে ছিল উট পাখীর মত এক প্রকার সুবৃহৎ পাখী—নাম তার মোয়া। তারাও শেষ হয়েছে এই ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের অত্যাচারে। নিউজিল্যাণ্ডে আরও একপ্রকার পাখী আছে যারা প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। এদের নাম কিউই। কিউই বলে যে জুতার রং আছে তার কৌটার উপরে সে পাখীর ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

উত্তর মেরুতে পেঙ্গুইনের এক জাত ভাই ছিল অক পাখী। আইসল্যাণ্ডের উপকূলে এদের বহু সংখ্যায় দেখা যেত। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া এবং বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের উত্তরাংশেও এরা অপরিচিত ছিল না। এরা এই অল্পদিন হলো শেষ হয়েছে। গত শতাব্দীর শেষ দিক পর্যন্তও সামান্য অক পাখী দেখা যেত। ইংল্যাণ্ড এবং ইউরোপের অন্যান্য জায়গার মিউজিয়ামে অনেক অক পাখীর শরীর রক্ষিত আছে; কিন্তু জীবন্ত অক পাখী আর পৃথিবীতে নেই।

আফ্রিকাতে সাধারণ হরিণের মত আয়তনের জিরাফ আর জেব্রার মাঝামাঝি এক রকম জানোয়ার পাওয়া যেতো। তাদের নাম ছিল ওকাপি। এক সময়ে জানা গিয়েছিল, ওকাপিরা সব শেষ হয়ে গেছে। পৃথিবীতে তাদের আর কখনও দেখা যাবে না। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে কিছু ওকাপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এখন বিশেষ বন্দোবস্ত করে তাদের বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করা হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন এবারকার মত ওকাপি টিকে গেল।

সিংহলের হাতী অনেক কমে এসেছে। ভারতবর্ষে হাতী পাওয়া যায় মালাবার, মহীশূর, আসাম ও হিমালয় অঞ্চলে। মালাবার ও মহীশূরের হাতী অনেক কমে গেছে। তবে বর্তমানে তাদের সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির নানারকম ব্যবস্থা হয়েছে। কাজেই মনে হয় যে, তারা হয়তো খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে না। এক সময়ে মধ্যভারতের নাগপুরের পাহাড় ও জঙ্গল অঞ্চলে হাতী ছিল। মোগল বাদশারা সেখানে হাতী শিকার করতে যেতেন—সে কালের ইতিহাসের দপ্তরে তার উল্লেখ আছে। এখন সে সব পাহাড়ে আর একটাও হাতী নেই। সেখান থেকে তারা একেবারেই শেষ হয়ে গেছে।

ভারতবর্ষে এক সময়ে বহু সিংহ ছিল। বহু পূর্বে—বৈদিক যুগে তারা ছিল সারা ভারতবর্ষে। সেদিন পর্যন্তও, অর্থাৎ মোগলদের আমলেও হিমালয়ের উপরে সিংহ ছিল। তারা এখন আর নেই। ভারতবর্ষে যে সামান্য কিছু সিংহ এখন পর্যন্ত টিকে আছে, তারা আছে গুজরাট অঞ্চলের জুনাগড়ের গির নামক জায়গার বনে। কিছু দিন আগে তাদের একটা সংখ্যা নির্দেশের চেষ্টা হয়েছিল। দেখা গেছে তাদের সংখ্যা শ'তিনেকের মধ্যে। তাদেরও বংশবৃদ্ধি করবার চেষ্টা হচ্ছে।

বাঘ ভারতবর্ষে যদিও যথেষ্ট আছে, তবুও বাংলার বাঘ, যাকে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বলা হয়, তারা অনেক কমে এসেছে। রয়্যাল বেঙ্গল বলা হয় ডোরা-কাটা বাঘকে। এ বাঘ থাকে বাংলা দেশের দুটি জায়গায়। উত্তর অঞ্চল ডুয়ার্স ও দার্জিলিং-এর কাছাকাছি হিমালয়ের উপরে, আর সুন্দরবনে। সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সব চাইতে বড় আর দেখতে সুন্দর। কিন্তু সুন্দরবনের উপরে মানুষের যে অত্যাচার হচ্ছে তাতে বাংলার এই ব্যাঘ্র সম্পদ আর বেশী দিন থাকবে না। বাংলার রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের জাতভাই আছে আসামে, আর মহীশুরের শিমোগা অঞ্চলে; কিন্তু তারা বাংলার বাঘের মত বড় নয়।

ভারতবর্ষের চিতা হচ্ছে দু-রকমের। এক রকমের চিতার গায়ে টিকার মত কালো কালো দাগ, আর এক রকমের গায়ে কালো কালো চক্কর। মনে হয় যেন একটি ইংরেজী O-কে যেন দুমড়ে বাঁকাচোরা করে দিয়েছে। চক্করওয়ালা চিতার অবস্থা এখনও মোটেই খারাপ নয়, কিন্তু টিকা-মার্কা চিতা এত কমে গেছে যে, আর কিছুদিন বাদে সে আর থাকবে না।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৃথিবীর প্রায় সব জায়গাতেই গণ্ডার ছিল; আর তারা ছিল বহু জাতের। এক এক সময়ে এক এক জাত করে শেষ হতে হতে তারা এখন একটা সীমাবদ্ধ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এখন গণ্ডার আছে কেবল আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, জাভা ও সুমাত্রায়। ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, জাভা ও সুমাত্রার গণ্ডার একই জাতের। আফ্রিকার গণ্ডার একটু ভিন্ন ধরণের। ভারতবর্ষে গণ্ডার আছে এক মাত্র আসামে। তাও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তবে সুখের বিষয় এই যে, সরকার থেকে তাদের সংরক্ষণ ও বাড়াবার বন্দোবস্ত হয়েছে। গত কয়েক বছরে তারা একটু বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছুদিন পূর্বে তাদেরও একটা সংখ্যা গণনার চেষ্টা হয়েছিল। তাতে দেখা গেছে যে, তারা আছে মাত্র সাড়ে চার শ-এর কাছাকাছি।

আরবের মরুভূমি বলতে মনে হয় যেন সেখানে উট ছাড়া আর কোন জন্তুই থাকতে পারে না। কিন্তু আসলে তা মোটেই নয়। পৃথিবীর সব জায়গায়ই জন্তু-জানোয়ারেরা কম-বেশী বাস করে এবং সে জায়গার আবহাওয়ার সঙ্গে বেশ মানিয়েও নেয়। আরবীয়েরা উট ছাড়াও ঘোড়া, ভেড়া, গাধা ও ছাগল পুষে থাকে। ওখানকার ঐ বালুকাময় বিশাল মরুপ্রান্তরে অনেক জংলী জন্তুও থাকে, যদিও জঙ্গল বলতে সেখানে কোন জিনিষই নেই। সেখানকার নানাবিধ জন্তুর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য জন্তু হলো ওরিক্স্ আর গেজেল নামে দুটি ভারী সুন্দর ছোট জাতের হরিণ। এক সময়ে এরা সিরিয়া, জর্ডন ও আরব দেশ জুড়ে ছিল। ওখানকার লোকেরা পুরুষানুক্রমে ওদের খেয়ে অনেক কমিয়ে এনেছে। তারপর আরব দেশে ইউরোপীয়দের যাতায়াত আরম্ভ হওয়ার পর শুধু শিকারের সখেই মানুষের বন্দুকের মুখে তারা অগণিত সংখ্যায় প্রাণ

দিয়েছে। এ রকম আর কিছুকাল চললে এ তুটি সুন্দর জীবও পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যাবে।

উত্তর মেরুপ্রদেশের সীল নামক জন্তুরা মানুষের হাতে অনেক ক্ষতি সহ্য করেছে। যদিও তারা এখন পর্যন্ত একেবারে ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়ায় নি, তবুও তাদের পূর্বের সে বৈভব আর নেই। আগে মেরুপ্রদেশের মাইলের পর মাইল জোড়া বরফের চাঙের উপর বসে তারা রোদ পোহাতো। চারদিকে দেখা যেত কেবল সীল আর সীল। এখন আর সে রকম দৃশ্য বেশী চোখে পড়ে না। মানুষ এদের মেরে কমিয়েছে তাদের চামড়ার জন্যে। সীলের চামড়া ইউরোপের লোকদের পোষাকের একটা দামী উপকরণ।

উত্তর মেরুর তিমিও এমনি করে অনেক কমে গেছে। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ তিমি শিকার করেছে তাদের চর্বির জন্যে। তিমির চর্বি দিয়ে তৈরী হয় মোমবাতি এবং এই মোমবাতি দিয়েই চলতো ইউরোপীয়দের বাতি জ্বালবার কাজ। এখন অবশ্য আগেকার মত মোমবাতির প্রয়োজন মানুষের আর নেই; কারণ তার বিকল্প কেরোসিন, গ্যাস আর ইলেক্ট্রিকের আলো বেরিয়েছে। কাজেই তিমির অন্য প্রয়োজন থাকলেও আগেকার মত বিরাট তিমি শিকারের অভিযান আর হয় না। তাই অল্প সংখ্যক তিমি আপনা থেকে শেষ হয়ে না গেলে মানুষের অত্যাচার থেকে হয়তো বেঁচেও যেতে পারে।

মানুষের হাতে পোকা-মাকড়ও কম ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। শস্য, ফলমুল ক্ষতিকর পোকার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে তুঁতের জল, গন্ধকের জল ইত্যাদি বিষ এবং বিষবাষ্প ক্ষেতখামারে মাঝে মাঝে ছড়াতে হয়। তাতে ক্ষতিকর পোকা মরে বটে, কিন্তু অনেক উপকারী পোকাও মারা পড়ে। গত পঞ্চাশ বছর পূর্বে পৃথিবীতে যত রকম বিপুল সংখ্যক প্রজাপতি ছিল আজ আর তারা নেই।

পশু, পাখী এবং মাছ এই তিনটিরই বহু জাত মানুষের হাতে শেষ হয়েছে এবং শেষ হওয়ার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃতির নিয়মে অনেক জীব শেষ হয়েছে বটে, কিন্তু বেশীর ভাগই শেষ হয়েছে মানুষের প্রয়োজন মেটাতে। মাংস, লোম, চামড়া, হাড়, চর্বি, পালক মানুষের দরকার। মানুষ শুধু তার প্রয়োজনমত বস্তু সংগ্রহ করেই ক্ষান্ত হয় নি, ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ের জন্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত হত্যা চালিয়েছে। অনেক সময়েই টাকার লোভে মানুষ বেহিসাবী হত্যা করেছে। মানুষের জমির প্রয়োজনেও অনেক সময় পশুপাখীর আবাস স্থল আত্মসাৎ করায় তাদের বংশ অনেক লোপ পেয়েছে। সর্বোপরি রয়েছে মানুষের নির্বোধ নিষ্ঠুর শিকারের আনন্দ। অত্যাচারী বিপজ্জনক জন্তুজানোয়ারকে নিজের নিরাপত্তার জন্যে কখনও কখনও মেরে সায়েস্তা করবার দরকার হয়; তা নইলে নিজের বাঁচা চলে না; কিন্তু নিরীহ, নির্ঝঞ্ঝাট সুন্দর পশু-পাখীগুলিকে শুধু হত্যার আনন্দে হত্যা করবার কোন মানে হয় না, মানুষের তাতে কোন অজুহাতের সাফাই-ই নেই।

শ্রীবিনায়ক সেন

ধূমবিহীন চুল্লী

কম ইন্ধনে বেশী কাজ পাওয়া যাইবে, এইরূপ একটি চুল্লী সম্বন্ধে বহুদিন হইতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার পর দেখা গিয়াছে যে, দুইটি চেম্বারবিশিষ্ট চুল্লীতেই তাহা ঠিকমত হইতে পারে। ভিতরের চেম্বারটির আয়তন তিন ইঞ্চি এবং দ্বিতীয়টি ও চুল্লীর মুখের আয়তন আড়াই ইঞ্চি হওয়া চাই। চুল্লীর পাইপের দৈর্ঘ্য আট ফুট হওয়া দরকার। আর খড়ের চাল হইলে এই আট ফুটের দুই ফুট চালার উপরে থাকিবে।

এই পাইপের ব্যাস চার ইঞ্চি হওয়া দরকার। এই ধরণের চুল্লীতে হাওয়া হইতে প্রচুর অক্সিজেন পাওয়া যাইবে। ফলে দ্বিতীয় চেম্বারে বেশ আঁচ হইবে, কম ইন্ধন লাগিবে এবং ধোঁয়া সহজেই বাহির হইয়া যাইবে। চিত্রে একটি ধূমবিহীন চুল্লী নক্সা দেওয়া হইল।
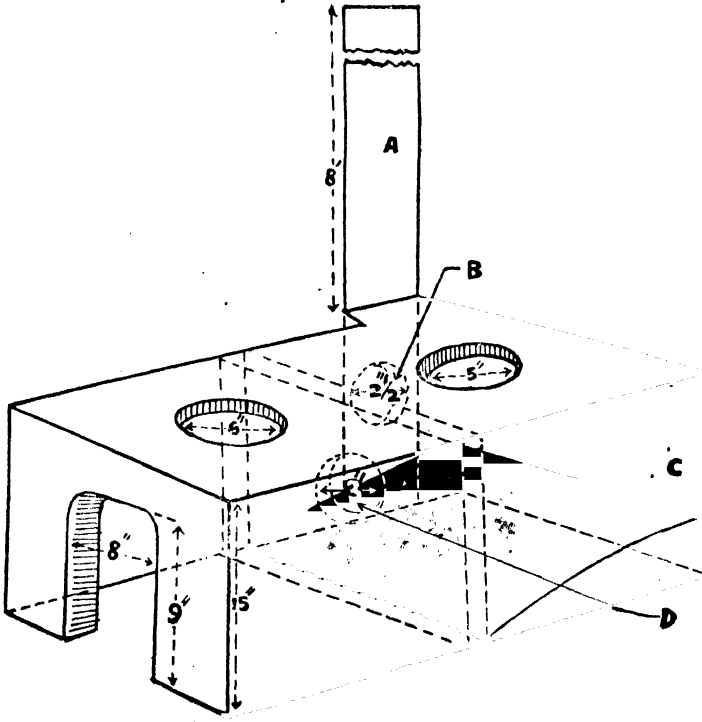
(এ) ফ্লু পাইপ ; (বি) প্রথম ও দ্বিতীয় চেম্বারের মধ্যবর্তী পথ ; (সি) দ্বিতীয় চেম্বার ; (ডি) প্রথম ও দ্বিতীয় চেম্বারের মধ্যবর্তী পথ।

আকাশ-পথে মেরু অভিযান

(কথায় ও চিত্রে)

১। মেরু বিজেতা রিচার্ড ই. বার্ড—তুষারাবৃত মেরু অঞ্চল সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল অপরিসীম। এই কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে মেরু প্রদেশ আবিষ্কারের জন্যে অনেক দুঃসাহসী অভিযাত্রী জলপথ ও স্থলপথে মেরু অভিযান করেছিলেন। এই অভিযান ছিল খুব বিপদসঙ্কুল। প্রতি মুহূর্তে ছিল মৃত্যুর ভয়। তবুও তাঁরা নিরুৎসাহ হন নি।

১নং চিত্র

অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে তাঁরা মেরু আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছিলেন। এই অভিযানে সার জন ফ্রাঙ্কলিন, ক্যাপ্টেন পিয়ারী, আমুণ্ডসেন, ক্যাপ্টেন স্কট, স্যাবল্টন, ন্যানসেন প্রমুখ অভিযাত্রীদের নাম চিরস্মরণীয়। কিন্তু আকাশ-পথে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অভিযানে সর্বপ্রথম সাফল্য লাভ করেন রিচার্ড ই. বার্ড। তিনি দক্ষিণ মেরুর ১০০,০০০ বর্গমাইল স্থানব্যাপী তাঁর অভিযান চালিয়েছিলেন।

২নং চিত্র

২। মেরু বিজয়ের আশা—১৮৮৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ার অন্তর্গত

উইনচেষ্টারে রিচার্ড ই. বার্ড জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১২ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-গবেষণা কেন্দ্র থেকে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি লাভ করেন। ছোটবেলা থেকেই মেরু অঞ্চল সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল ছিল অদম্য এবং আকাশ-পথে সেই দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল দেশ অভিযানের আশা তাঁর মনে ছিল। তাঁর আশাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্যে তিনি সচেষ্ট হলেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, দক্ষিণ মেরু সমুদ্র নয়, সেটি হচ্ছে একটি মহাদেশ।

৩। বিমান-চালনা শিক্ষা—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে রিচার্ড বার্ড ফ্লোরিডার অন্তর্গত পেনসাকোলায় চলে যান এবং সেখানে বিমান-চালনা শিক্ষা করেন। সেই সময়ে তাঁর প্রধান চিন্তাই ছিল, কিভাবে মেরু অভিযান চালানো যায়। এ ব্যাপারে তাঁকে অনেক বাধার সন্মুখীন হতে হয়; কিন্তু তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল দুর্দমনীয়। তিরিশ বছর
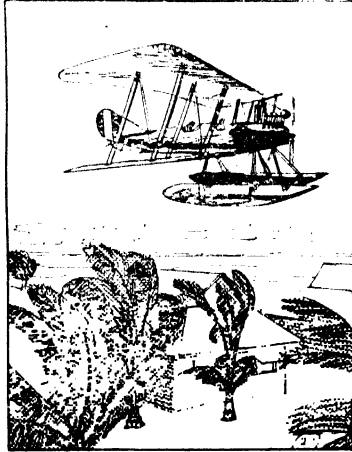
৩নং চিত্র

তিনি এ ব্যাপারে এমনভাবে মেতেছিলেন যে, সংসারের সঙ্গে তাঁর প্রায় কোনঃ সম্পর্কই ছিল না। তাঁর পূর্বেই অনেকে মেরু অভিযান করেছিলেন; কিন্তু মেরু সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান খুব বেশী ছিল না। চাঁদ সম্বন্ধে যতটুকু তথ্য জানা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল—মেরু অঞ্চল সম্পর্কে তাও জানা সম্ভব হয় নি।

৪। উদ্যোগের প্রারম্ভেই নৈরাশ্য—১৯২৪ সালে উত্তর মেরুতে আকাশ-পথে একটি অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়। সেই পরিকল্পনায় বার্ডকেও একটি নির্দিষ্ট কাজের ভার দেওয়া হয়। বার্ড এ ব্যাপাবে খুবই উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু কোন কারণে প্রেসিডেণ্ট কুলিজ এই পরিকল্পনা বাতিল করে দেন। এতে বার্ড খুব নিরাশ হলেন

বটে, কিন্তু দমলেন না। বিমানে মেরু অভিযানের জন্যে তাঁর জেদ আরও বেড়ে

৪নং চিত্র

গেল। সঙ্কল্পকে কাজে পরিণত করবার জন্যে তিনি পথ খুঁজতে লাগলেন।

৫। প্রথম আয়োজন—১৯২৫ সালে ফ্লয়েড বেনেট নামক একজন দক্ষ বিমান-চালকের সহযোগিতায় বার্ড আকাশ-পথে গ্রীনল্যাণ্ডে যাত্রা করেন। এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের ভৌগলিক সমিতি তাঁদের খুব সাহায্য করেন। তাঁদের এই গ্রীনল্যাণ্ড

৫নং চিত্র

যাত্রা সাফল্যমণ্ডিত হয়। কিন্তু বার্ড বুঝলেন যে, তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের পথ কি ভীষণ বিপদসঙ্কুল—প্রতি পদক্ষেপেই রয়েছে বিপদের সম্ভাবনা।

বিবিধ

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের চত্বারিংশৎ প্রতিষ্ঠা-দিবস উদ্‌যাপন

চত্বারিংশৎ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গত ৩০শে নভেম্বর বসু বিজ্ঞান মন্দিরে কেন্দ্রীয় পারমাণবিক শক্তি দপ্তরের ভূতাত্ত্বিক উপদেষ্টা ডাঃ ডি. এন. ওয়াদিয়া ১৯তম আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু স্মৃতি-বক্তৃতা প্রদান করেন। ডাঃ ওয়াদিয়ার বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ভারত এবং পারমাণবিক যুগ—আণবিক শক্তি উৎপাদনে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ'।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাঃ ওয়াদিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ শিল্প সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে আণবিক শক্তি সংক্রান্ত গবেষণার গুরুত্ব উল্লেখ করিয়া বলেন যে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভারতকে ইংল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে হইবে। বর্তমানে ইংল্যাণ্ডে কয়লার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াই আণবিক শক্তির সাহায্যে শহর এবং কারখানার বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে বলিয়া তিনি জানান।

ডাঃ ওয়াদিয়া বলেন যে, প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদন ছাড়াও পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে ভারতের পরিত্যক্ত অনুর্বর জমি উর্বরা করা সম্ভব এবং পশ্চিম রাজপুতানা, দক্ষিণ পাঞ্জাব প্রভৃতি মরুভূমিসদৃশ স্থানে শস্য উৎপাদনের ক্ষমতা ফিরাইয়া পাওয়া যাইতে পারে।

তিনি আরও বলেন যে, আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উপযুক্ত জরীপকার্য চালাইলে ভারতের মাটিতে বহু পারমাণবিক ধাতুর সন্ধান মিলিবে। তবে ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, বেরিলিয়াম, লিথিয়াম, জিরকোনিয়াম, গ্র্যাফাইট ইত্যাদি পারমাণবিক ধাতু ভারতে পাওয়া যায়। রাজপুতানা এবং বিহারে অনুমান ২৫ হাজার হইতে ৩০ হাজার টন ইউরেনিয়াম আছে এবং থোরিয়াম ধাতু পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী ভারতেই আছে বলিয়া তিনি জানান। প্রায় ২৫০০০০ টন থোরিয়াম ভারতে পাওয়া সম্ভব বলিয়া ডাঃ ওয়াদিয়ার অনুমান।

এই বক্তৃতার পূর্বে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যক্ষ ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন গবেষণামূলক কার্যকলাপের কথা উল্লেখ করেন এবং আগামী বৎসর নভেম্বর মাসে আচার্য জগদীশ চন্দ্রের শততম জয়ন্তী উৎসব কিভাবে পালন করা হইবে তাহার এক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী

আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক ব্যাপক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইতেছে। আচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবন, তাঁহার সাধনা ও তাঁহার কার্যের সুষ্ঠু পরিচয় যাহাতে দেশবাসীর নিকট তুলিয়া ধরা যায় তজ্জন্য ইতিমধ্যেই এক জরুরী উৎসব-কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ঐ কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছেন।

আগামী ১৯৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর আচার্য বসুর জন্ম-শতবর্ষ পূর্ণ হইবে এবং তখন এই জয়ন্তী পালন করা হইবে।

ফিল্‌ম্ ডিভিশন এই জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আচার্য বসুর জীবন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁহার মৌলিক দান সম্পর্কে একখানি ডকুমেণ্টরী ছবি তুলিবেন বলিয়াও জানা গিয়াছে।

জগদীশচন্দ্রের জীবনী ও গ্রন্থগুলির পুনর্মুদ্রণ, বাংলায় একখানি জীবনী গ্রন্থ প্রণয়ন, আচার্য বসু সম্পর্কে সংবাদপত্রের মন্তব্য, সমকালীন ব্যক্তিগণের স্মৃতিকথা ইত্যাদির প্রকাশ প্রভৃতি কার্যও করা হইবে। আচার্য জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের যে শাখায় নিজকীর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই

বিষয়ের উপর বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের লেখা প্রবন্ধাবলী লইয়া একখানি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করিবার পরিকল্পনাও করা হইয়াছে।

এই উৎসব উপলক্ষ্যে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের আধুনিকতম মতবাদ, বিদ্যুৎ-তরঙ্গ, জড় ও জীবনের প্রতিক্রিয়া, উদ্ভিদের গঠন প্রভৃতি বিষয়ে সহজবোধ্য বক্তৃতামালার ব্যবস্থাও করা হইবে।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের চিঠিপত্র, পাণ্ডুলিপি, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, যে সব যন্ত্রাদির সাহায্যে আচার্য বসু নানাবিধ পরীক্ষাকার্য চালাইয়াছিলেন, সেই সকল যন্ত্রের ব্যবহার ইত্যাদি এবং বসু বিজ্ঞান মন্দিরের কার্যাদির এক প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

বিশ্বের প্রচণ্ডতম ভূমিকম্প

৪ঠা ডিসেম্বর বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের ভূকম্প-জ্ঞাপক যন্ত্রে সাম্প্রতিককালের প্রচণ্ড কম্পন ধরা পড়ে। কিন্তু কোথায় যে এই ভূমিকম্প হইয়াছে, সেই সম্পর্কে মতৈক্য হয় নাই। কম্পনের চাপে হেলসিঙ্কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূকম্পজ্ঞাপক যন্ত্রটি ভাঙ্গিয়া যায়।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জানান হইয়াছে যে, চীনে সম্ভবতঃ এই ভূমিকম্প হইয়াছে। ১৯০৬ সালে সানফ্রান্সিসকোর ভূমিকম্পের তীব্রতার সহিত ইহা তুলনীয়। সুইডেনের উপ্‌শা মানমন্দিরে যে কম্পন ধরা পড়িয়াছে, তাহাতে মঙ্গোলিয়ায় এই ভূমিকম্প হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। নিউ চায়না নিউজ এজেন্সীর পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ যে, মঙ্গোলিয়াতেই এই প্রচণ্ডতম ভূমিকম্প হইয়াছে।

গত ১০ই ডিসেম্বর পশ্চিম ইরাণে এক ভয়াবহ ভূমিকম্পের ফলে যথেষ্ট ক্ষতি এবং বহু লোক হতাহত হইয়াছে।

আকাশে উপগ্রহ প্রেরণের মার্কিন প্রচেষ্টা ব্যর্থ

৬ই ডিসেম্বর যে ভ্যাংগার্ড রকেটটির আমেরিকার প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটি লইয়া শূন্যলোকের দিকে পাড়ি দিবার কথা ছিল, যাত্রার নির্দিষ্ট সময়ের তিন মিনিট পরে যাত্রাস্থলেই সেটি বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই দুর্ঘটনায় কেহই হতাহত হয় নাই।

দুর্ঘটনার বিবরণ প্রকাশ করিয়া ভ্যাংগার্ড হেড কোয়ার্টার্সের মুখপাত্র বলেন, যাত্রার দুই সেকেণ্ড পর রকেটের প্রথম পর্যায়ের প্রেসার-চেম্বার অকেজো হইয়া পড়ে। ফলে রকেটটি মঞ্চের উপরই পড়িয়া যায় এবং পূর্বদিকে সমুদ্রের ধারে ছিটকাইয়া গিয়া ফাটিয়া যায়।

তিন-পর্যায়ী রকেটটি ৬ই ডিসেম্বর সকাল ৭টায় যাত্রা করিবার কথা ছিল। কিন্তু রাত্রি সাড়ে তিন ঘটিকায় কোন কারণ না দর্শাইয়া উহা স্থগিত রাখিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। তিন ঘণ্টা পরে যন্ত্রটি পুনরায় পরীক্ষা করিয়া দেখা আরম্ভ হয়।

মুর্শিদাবাদে তৈল-সন্ধানে খননকার্য সুরু

ইণ্ডো-ষ্ট্যানভাক পেট্রোলিয়াম প্রোজেক্টের পরিচালক ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানী তৈল নিষ্কাশনের উদ্দেশ্যে বঙ্গের অববাহিকা অঞ্চলে তৃতীয় বার পরীক্ষামূলক খননকার্য সুরু করিয়াছেন। মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী গ্রামের ছয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এই নূতন তৈল কূপটি অবস্থিত। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'জলঙ্গী এক্স—১'।

ইতিপূর্বে এই কোম্পানিই গলসী ও বর্ধমানে অনুরূপ খননকার্য চালাইয়াছিলেন। বর্ধমানের কূপটি ৮৯২০ ফুট ও গলসীর কূপটি ৪২৫০ ফুট পর্যন্ত খনন করা হয়। জলঙ্গীতে সম্ভবতঃ দশ হাজার ফুট বা তাহারও বেশী খনন করা হইবে।